CC-H04:66-10 · P030298

বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

P30298

(10)

৯ম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪২—আষাঢ়, ১৩৪৩

756.3
.0056

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল্

পরিচালক

সুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস)

বিচিত্রা নিকেতন লিঃ

২৭।১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য—৬॥০

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিষয়-সূচী

(মাঘ, ১৩৪২—আষাঢ়, ১৩৪৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কাল বর্ষণ—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ...	১৪৮	আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা —শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৮৭
কাল বোধন—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার ...	১৭৪	আমার কবিতা—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ...	৭২৫
ল সিকি—আবুল হাসানাৎ ...	৬৮৮	আমাব নিজ কাজ—শ্রীসুখরঞ্জন রায় ...	১৮৬
ত্তার যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীঅজিত ঘোষ ...	১০৫	আমি—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ...	৬৯৭
নী বোস—শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক ...	৮১৭	আমি একা বাতায়নে—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৫৮
গার—শ্রীসরোজমোহন চক্রবর্ত্তী ...	১২৯	আলো—শ্রীশান্তি পাল ...	২৫৫
শীলা—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৭৫০	উদাসিনী—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	৬৩২
বধ—শ্রীসুশীল জানা ...	৮৩০	উষালোক—শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী ...	৬০
জ্ঞান—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	১১, ১৪৯, ২৯৯, ৪৪২, ৫৮৯, ৭২৬	একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান —ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য ...	১০৮
নন্দন—শ্রীমতী রুবী বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮২৯	একটি সকাল—মৌলভী মোবারেক আলী ...	২১৯
বাদন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ...	২০০	ওয়াটার পোলো—শ্রীশান্তি পাল ...	৮৫
সার—শ্রীমতী ইলা দেবী ...	৪৬৭	কথিকা—শ্রীপ্রনাদ বসু ...	৩৮৪
ক—শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী ...	২২৪	কবিতা পাঠ—শ্রীনবেন্দু বসু ...	৪৭৭
াপিকা—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ...	৪৪	কবি হুইটম্যান—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস ...	৫২৩
সঙ্গম—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২০৩	কর্ম্মহীন অবসরে মোর—রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু রায় ...	৬৬১
কাশ-কুসুম—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায় ...	৬৭৭	কলাবুদ্ধি ও কলবুদ্ধি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭১
াবাশ ও পৃথিবী—শ্রীকরুণাময় বসু ...	৬৮৩	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত বাংলা বানানের নিয়ম —শ্রীভোলানাথ ঘোষ ...	৭৮৯
াবাশ ও মৃত্তিকা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৪৭৯	কাগজওয়ালা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ...	৫৬৩
াগামী কাল—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৮৫, ৪২৮	কাছে এসো—শ্রীপ্রতাপ সেন ...	৭৪৯
াজকে তুমি এলে একি বেশে ?—শ্রীহিরণ্ময় দত্ত	২২৮		
াদর্শ বনাম বাস্তব—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ...	১৪৫		

খ

বিষয়	পৃষ্ঠা
কানামাছি খেলা—শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য ...	৫০১
কাম-রূপ—শ্রীচরণদাস ঘোষ	৩১, ১৬২, ৩৩৫
কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীত—শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ রায় ...	৬৬২
কুমারী বাণী ঘোষ ...	৪১৬
কেন—শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী ...	৭৮০
কৃষ্ণলীলায় কামায়ন—শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ...	৬১১
খাঁটির মর্য্যাদা—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ...	১৭৬
খাটুনীর মাহাত্ম্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৮৪
খুকীর স্বপ্ন—শ্রীসুবোধ বসু ...	৬১
খেলা-ধূলা—শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী	৫৫৫, ৬৯৯, ৮৪৪
খোকী কাঁহা—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ...	৮৪
গল্প—শ্রীমতী রমলা দেবী ...	২২৫
গল্প লেখকের বিপদ—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী ...	২৪০
গীতার কর্ম্ম ও যজ্ঞ—শ্রীঅনিলবরণ রায় ...	৭৪১
গোড়ায় গলদ—শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি ...	৮৩৮
গ্রীণ্ মতবাদে ভূপৃষ্ঠ পরিকল্পনা —শ্রীজ্যোৎস্নাশঙ্কর ভাদুড়ী ...	৪৯৩
ঘুড়ী—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	৭৮৮
চব্বিশ বৎসর—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস ...	২০১
চ্যাঙের আত্মকথা—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ...	৬৪৯
ছন্দের মায়া—শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ...	৬৪৫
জন্মতিথি—শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	৪১৯
জনসেবা না দেবসেবা—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ ...	৪৫১
জর্জ্জ টমাস—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২১
জীবনের কবিতা—শ্রীসুশীলকুমার দেব ...	৩৯২
টাট্টভ্ স্কী—শ্রীমুকুট রায় ...	৫৬
তনুত্যাগে—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ...	৬১৭
তবু—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ...	[illegible]
তোমা বই জানি না—শ্রীসুনীল সরকার ...	৮৩
তোমারে পেয়েছি যেন—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ ...	১১
তৃণের কামনা—শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত ...	[illegible]
দান—শ্রীমতী সুপ্রভা দত্ত ...	
দেওঘর হইতে—শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তাফী ...	৫৫
দেবতার হাসি—শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা ...	৪৮
দেবদারু—শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ...	৩১
দেবদাস—শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী ...	৫
দেশের কথা—শ্রীসুশীলকুমার বসু ...	৯
	২২৯, ৩৬৬, ৫৩৪, ৬৬৮, ৮
ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ...	৭১
নব-বর্ষোৎসব—শ্রীসুশীলকুমার বসু ...	৬১
নবযুগভাব—শ্রীনবেন্দু বসু ...	৬৬
নবাগতা—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ...	২৪
ন সাপেক্ষ—শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য ...	৭৫
নানা কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৩
নানা কথা	১৩৩, ২৭৯, ৪২৪, ৫৬৭, ৭০৮, ৮৫
নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন —শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	১২
নিষ্কলুষ আত্মারে প্রণাম—শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায়	৩২
নৃত্য ও নৃত্যনাট্য—শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় ...	৩১
নেপথ্যে—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায় ...	৫২৯
পট ও মঞ্চ—আনন্দ ...	৪০৭
পত্নী-শিকার—কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ...	৩৫৫
পথিক বন্ধু—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী ...	৬৩৯
পথের মানুষ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১

বিষয়	পৃষ্ঠা
-দূত—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ...	৬
ওরিয়া এলভিওলারিস—ডাঃ ডি, এন, দাশগুপ্ত	৪০১
ল পুরী—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দে ...	১১২
কবা 'খুনে'—ডাক্তার ...	১০১
রিচয়	১২৬, ২৭৬, ৪২১
ক—শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ...	৫০০
শায়—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	৫৪২
তী—কে, এম, শমশের আলি ...	৩৬৫
াবী স্কুল—শ্রীমতী সুরবালা গুপ্ত ...	৪১৭
তপুরী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	৩২৪
াসিতেছে—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৩৭৯
—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ...	৪৩৬
া কথা-সাহিত্যের কয়েকটি অভাব —শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ...	৫৭৫
া বানানের নিয়ম —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত	৭৮১
স্তী মলয়—সুখময় দাস ...	১৯৪
কী—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ...	৩০৬
-জীবন—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ...	৬৮২
য়ব দান—শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় ...	৮২৯
র ভয়—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ...	১৪৪
—শ্রীমত ইন্দ্রাণী রায় ...	১৯৩
'প্রকৃতি—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৫৯, ৩৪৭, ৫০৭, ৬০১
র্ণ রাতে—শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত ...	৬১০
সাঁতার—শ্রীশান্তি পাল ...	৫৪৯
ষ্ণ জ্ঞানের প্রণালী—শ্রীঅনিলবরণ রায় ...	৩০৭
—শ্রীগোপাল বটব্যাল ...	৪৮৮
বৌদ্ধ বিহারে কয়েকদিন—শ্রীরাধাভূষণ বসু ...	৭৩১
ব্যথার স্মৃতি—শ্রীমতী উষা বিশ্বাস ...	২৯৭
ব্যায়ামবীর মূলার—শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু ...	৫২০
ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গোস্বামী ...	৬০৬
ব্যর্থ—শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ...	৫০০
ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন—ডাঃ আর ঘোষ ...	৫৬৬
ভারতীয় পুরাণ মহাকোষ—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ...	৪২০
ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতি— শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ...	৪৮৯
ভারতের সাধনায় গীতার দান—শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী	১৫৫
মহাশক্তি—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার ...	২৫৩
মাটিরে ছাড়িয়া মোর বাঁধি নাহি ঘর— মোহাম্মদ শওকাত আলি ...	১২৫
মিলনদূতি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	২৫৬
মুসাফিরের ডায়েরী—শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী ...	৫৬,৪০৩
মূকদেবতা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা ...	৮২৩
মূকবধির চিত্র-শিল্পী শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী— শ্রীসুনীলকুমার দেব ...	৫১৪
মেডিকোর আর্ট গ্যালারী—শ্রীবিমল সেন ...	১১৫
যদি কান পেতে শোন—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার	৬৮০
যূথভ্রষ্ট—শ্রীকানুবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	২৬৭
যে মালা মোর—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার ...	৬৩৮
রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'—শ্রীমতী রুবী বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫২
রবীন্দ্রনাথের প্রতি—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য ...	৪৩৪
রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু ...	৬৮৪
রবীন্দ্রপরিচয়—শ্রীঅবনী রায় ...	৪৬৫
রামায়ণের এক অধ্যায়—শ্রীমতী প্রীতি গুপ্ত ...	৪৩৬
রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর—শ্রীহরিহর শেঠ	৬৯৩

ঘ

বিষয়		পৃষ্ঠা
বেণী-ডে—শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত	...	৪১
রূপকথা—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	...	৮০১
শরবী—শ্রীমতী সুপ্রভা দত্ত	...	৫৫
শরতের শিউলী—শ্রীমতী মৃণালিনী বসু	...	৩৯৪
শিবপুর শিল্প-প্রদর্শনী	...	৫৯৪
শিল্প-প্রদর্শনী—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়	...	২০৩
শুকতারা—শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার	...	৫২৮
শুক্লানিশি—শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	...	৫৪৩, ৬১৮, ৬৮
শেষ কথা—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়	...	৩৯১
শেষ পহরে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৭১৫
শেষ-সুরু—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর	...	৩৯৩
শেষের মৌন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪২৭
টোস্ত্ ফেটালিটি—শ্রীবিমল সেন	...	৬৩৩
সংক্ষেপ বাংলা বর্ণমালা—শ্রীরমেস সর্মা	...	৭৮৭
সরস্বতী পূজা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত	...	১৪৩
সহজিয়া-সাধনা ও চণ্ডিদাস—শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		৩৮৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
সয়দাবাদ—শ্রীশান্তি পাল	...	
সম্পদের বিপদ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ	...	
সাঁওতাল—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস	...	
সাহিত্য বনাম নভেল—শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	...	
সাহিত্যিক অসাধুতা—শ্রীআশীষ গুপ্ত	...	
সিনিক—শ্রীকালিপ্রসাদ বিশ্বাস	...	
সুকবি ভারতচন্দ্র—মৌলভী মনসুরউদ্দীন	...	
সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়	...	
সুশান্ত সা'—শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত		১৭, ১৮১, ৩ 458, ৬৬৫,
সে আজি বিদায় নেবে—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়		
সেদিন আর আজ—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়		
স্বপ্ন—শ্রীঅনুপম ঘটক	...	
স্বর্গীয়া কমলা নেহেরু—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	
হাইনের প্রেমকাব্য—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস	...	
হেমন্ত—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণ-পৃষ্ঠ)

বিষয়		পৃষ্ঠা
অন্ধ্র-বালিকা (রঙিন)—শ্রীইন্দু রক্ষিত	...	১৩৯
উৎকণ্ঠিতা (রঙিন সূচী-শিল্প)—কুমারী শান্তি মিত্র		৪৯৮
জননী (একরঙা)—শ্রীবিনয়ভূষণ বারিক	...	৭২
তৃপ্তি (রঙিন)—শ্রীসৌরেণ সেন	...	৪২৭
প্রত্যাগত (একরঙা)—শ্রীঅনন্তকুমার বসু	...	২০২
বিচিত্রা (একরঙা)—স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষাল	...	৩৬২

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিশ্রাম (রঙিন) শ্রীবিজয়কুমার সেনগুপ্ত	...	
বীণাপাণি (রঙিন)—বি, মিত্র	...	
মাছ ধরা (রঙিন)—শ্রীনলিনী কর্ম্মকার	...	
মাটকোঠা (রঙিন)—শ্রীকানাই ভড়	...	
মালবিকা (রঙিন)—শ্রীচিন্তামণি কর	...	
হর-পার্ব্বতী (রঙিন)—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়		

বিচিত্রা　　বীণাপাণি　　বি, মিত্র

মাঘ, ১৩৪২

বিচিত্রা

LIBR

নবম বর্ষ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৪২ | ১ম সংখ্যা

পথের মানুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতিথিবৎসল,
ডেকে নাও পথের পথিককে
তোমার আপন ঘরে,
দাও ওর ভয় ভাঙিয়ে।
ও থাকে প্রদোষের বস্তিতে,
নিজের কালো ছায়া ওর সঙ্গে চলে
কখনো সমুখে কখনো পিছনে,
তাকেই সত্য ভেবে ওর যত দুঃখ যত ভয়।
দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার আলো তুলে ধরো,
ছায়া যাক্ মিলিয়ে
থেমে যাক্ ওর বুকের কাঁপন॥

বছরে বছরে ও গেছে চলে
তোমার আঙিনার সামনে দিয়ে,
সাহস পায়নি ভিতরে যেতে,
ভয় হয়েছে পাছে ওর বাইরের ধন
হারায় সেখানে।
দেখিয়ে দাও ওর আপন বিশ্ব
তোমার মন্দিরে,
সেখানে মুছে গেছে কাছের পরিচয়ের কালিমা,
ঘুচে গেছে নিত্যব্যবহারের জীর্ণতা,
তার চিরলাবণ্য হয়েছে পরিস্ফুট॥

পান্থশালায় ছিল ওর বাসা,
বুকে আঁকড়ে ছিল তারই আসন, তারি শয্যা,
পলে পলে যার ভাড়া জুগিয়ে দিন কাটাল
কোন্ মুহূর্ত্তে তাকে ছাড়বে ভয়ে
আড়াল তুলেছে উপকরণের।
একবার ঘরের অভয় স্বাদ পেতে দাও তাকে
বেড়ার বাইরে॥

আপনাকে চেনবার সময় পায়নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দ্দায় ;
পর্দ্দা খুলে দেখিয়ে দাও সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারি সঙ্গে তার রূপের মিল।
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে
তার জীবনের সুখদুঃখ আহুতি দাও,
জ্ব'লে উঠুক্ তেজের শিখায়,
ছাই হোক যা ছাই হবার।

হে অতিথিবৎসল,
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
সে পাক্ আপনাকে॥

শান্তিনিকেতন
২৪ অক্টোবর, ১৯৩৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সার—এক কথায় ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্ম্মের, ভগবৎ-সাধনার, আত্মানুভূতির বহু পথ ও মত আছে—তাহাদের এক একটি ধরিয়া এক একটি মার্গ, সম্প্রদায়, এমন কি জাতি পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদান্ত ও তন্ত্র মার্গ, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান জাতি—ইহারা প্রত্যেকে ঘোষণা করে ও বিশ্বাস করে যে আসল ও পূর্ণ সত্য সে'ই পাইয়াছে এবং অতিরিক্ত গোঁড়া যাঁহারা তাঁহারা নিজের সত্যকে সত্য বলিয়াই সন্তুষ্ট নহেন অপরের সত্যকে মিথ্যা, অন্তত অর্দ্ধ বা ইতর সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনা ও উপলব্ধির দ্বারা—শুধু চিন্তা জগতে বিচারের ও তর্কসিদ্ধান্তের দ্বার নয়—প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যাবতীয় ধর্ম্মপথের, অধ্যাত্মসাধনার মূল এক ও অভিন্ন। একই মূল সত্যকে নানা নামে, নানারূপে, নানা রঙে মানুষের প্রতীতি অভিব্যক্ত করিয়াছে। সে মূল সত্য সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়—তাহা অনন্ত অনির্ব্বচনীয়; স্বরূপে তাহা অরূপ, নির্গুণ নিরাকার, অবাঙমনসগোচর—তাহাই আবার রূপের মধ্যে সাকার, সগুণ, সান্ত; তাহা পরম জ্ঞান, পরম শক্তি, পরম প্রেম—আবার তাহাই নেতি নেতি, নির্ব্বিকল্প, কৈবল্য, শূন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মের, অধ্যাত্মের মর্ম্মস্থানে পৌছিয়াছেন, কারণ তিনি তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন ঐ মর্ম্মের পথে। শুদ্ধ বৈদান্তিক ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চলেন জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—বিচার বিতর্ক, ধ্যান-ধারণা-সমাধির পথে; তিনি মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিয়া মস্তিষ্কের উপর উঠিয়া যান, তাহার সত্তার চেতনার মুখ্যতঃ হইল এই উর্দ্ধায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ একই ব্রহ্মোপলব্ধিকে পৌছিয়াছেন ঐ রকম বুদ্ধির উর্দ্ধায়নের ফলে ততখানি নয় যতখানি হৃদয়ের মধ্যে, অন্তর্হৃদয়ের মধ্যে—এই যে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে,—গভীর অভিনিবেশের, অবগাহনের ফলে; অন্তরাত্মার অতলে তিনি এতখানি চলিয়া গিয়াছেন যে পরিশেষে দেখি তিনি সেই একই উর্দ্ধভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আবার হৃদয়পথে তিনি অতখানি গভীরে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণ বৈষ্ণবসুলভ ভাববিলাসিতা, আবেগ আতিশয্য অতিক্রম করিয়া তিনি একটা ভাবঘন স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। আর তান্ত্রিকের প্রাণশক্তি সাধনায় অবান্তর উপাঙ্গ সব পরিহার করিয়া, উহার মূলতত্ত্ব যে প্রাণকে মায়ের চিন্ময় শক্তিতে ভরিয়া তোলা তাহা সংসিদ্ধ তিনি করিয়াছিলেন সে প্রাণকে অন্তরাত্মার তীব্র আস্পৃহা-বহ্নিতে সমিদ্ধ ও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া। ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার বৈশিষ্ট্যই হইল, এই অন্তঃপুরুষের একাগ্র একান্ত তীব্র আস্পৃহা, তাহার নৈসর্গিক অযত্নসুলভ বিবেক বৈরাগ্য পরানুরক্তি ও সমাহিতি অন্তশ্চেতনার সেই সব সহজ আদিশক্তি যাহাদের সহায়ে পথের জটিলতা কুটিলতা দীর্ঘতা হইয়া উঠে সরল ঋজু হ্রস্ব। এক একটি সাধনধারা, স্বাভাবিক গতিতে চলিলে যাহাতে প্রয়োজন হয়, সমস্ত জীবন, এমন কি একাধিক জীবন এবং দারুণ কৃচ্ছ্র-প্রয়াসপূর্ণ জীবন, তাহাদের প্রত্যেকটি তিনি আপনার অন্তঃপুরুষের প্রদীপ্ত চেতনার মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া ধরিয়াছেন, হেলায় যেন তাহার সিদ্ধি আনিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানে ছিল স্বয়ম্প্রকাশ অব্যর্থতা, সহজ নিশ্চয়তা, তাঁহার ভক্তিতে প্রীতিতে অকুণ্ঠ আত্মদানের নিবিড়তা ও সারল্য—কিন্তু তাঁহার শক্তি আরও চমৎকার, অনির্ব্বচনীয়। কারণ, এই শক্তির বাহ্য আড়ম্বর নাই, জোর-জবরদস্তি নাই, নাই উগ্রতা প্রচণ্ডতা—এত স্বাভাবিক, এত কমনীয়, অথচ এত তেজোময় সামর্থ্যময়। সে ব্রাহ্মণ্যশক্তির কিঞ্চিৎমাত্র বিবেকানন্দের বিপুল ক্ষাত্রবিক্রমে শরীরী হইয়া

দেখা দিয়াছিল। কারণ সে শক্তি অন্তঃপুরুষের সহজাত অঙ্গভঙ্গ, চেতনার নিজস্ব ছন্দ, সত্তার আপন প্রভা বিকীরণ।

২

জগতে যুগে যুগে যে মহাপুরুষেরা অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা এক একটি সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক ঘটনা-মাত্র নয়। স্থূলপ্রকৃতির মধ্যে একটা ক্রমবিবর্ত্তন চলিয়াছে, তাহা আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি—সেই রকম আধ্যাত্মিক বা অন্তশ্চেতনার ক্ষেত্রেও সৃষ্টির মধ্যে চলিয়াছে এক ক্রমবিবর্ত্তন। অবতার, বিভূতি—ইঁহারা এই ক্রমবিবর্ত্তনের বিভিন্ন ও বিবিধ সোপান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এক এক জন উপর হইতে এক একটি বিশেষ চেতনা ঐহিকের মধ্যে নামাইয়া ধবেন, মানব-চেতনার পক্ষে তাহাকে আয়ত্ত করা বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ-সাধ্য করিয়া তোলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে এক যুগাবতার ছিলেন। তিনি নিজের মধ্যে মূর্ত্ত করাইয়াছেন "অধিমানস" চেতনা—মনের বুদ্ধির অব্যবহিত উপরে যে বিশ্বগত সার্ব্বভৌম চেতনা—যাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি গীতার বিশ্বরূপদর্শনে তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। বুদ্ধের অবদান "বোধি"-উর্দ্ধতর, সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ বুদ্ধি; এই বৃত্তির ভিতর দিয়া, ইহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি অধ্যাত্ম-চেতনাকে মানবচেতনার গোচর করিয়া ধরিয়াছেন। শঙ্করের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা আরও এক ধাপ কাছে আসিয়াছে—কারণ, শঙ্কর হইলেন তর্কবুদ্ধির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার অবতরণ, অধ্যাত্মচেতনার মধ্যে তর্ক বুদ্ধির উন্নয়ন। খৃষ্ট অধ্যাত্ম-চেতনাকে মানুষের আরও ঘবের কাছে আনিয়া, মানুষেব আপনার এবং অন্তরঙ্গ করিয়া দিয়াছেন—অধ্যাত্ম-চেতনাকে হৃদয়ে নামাইয়া আনিয়া, ফুটাইয়া ধরিয়া, উপলব্ধি করিয়া এবং উপলব্ধি করাইয়া। মহম্মদের মধ্যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল অধ্যাত্মচেতনাকে কেবল মনে নয়, হৃদয়ে না—প্রাণের কর্ম্মৈষণার মধ্যে, জীবনীশক্তির মধ্যে আরও বাস্তব, আরও সজীব ও মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে। চৈতন্যের মধ্যে সংসিদ্ধ হইয়াছিল এই প্রাণেরই আর এক অংশেব দীক্ষা বা অধ্যাত্ম-উপনয়ন—যাহা হইল কামনার, আসঙ্গ-লিপ্সার, আবেগের ক্ষেত্র।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, এই সকল মহাপুরুষেরা যে যে বৃত্তি ধরিয়া অধ্যাত্ম-চেতনা উপলব্ধি করিয়াছেন বা যে যে বৃত্তিকে অধ্যাত্ম-চেতনার প্রভায় রূপান্তরিত করিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে ব্যক্তিগত ভাবে আর কেহ সে বিশেষ সাধনা করে নাই বা তাহাতে সিদ্ধি পায় নাই; আমরা বলিতেছি ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত চেতনার কথা—মানুষের মধ্যে, একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীগত সিদ্ধির পথ ও সম্ভাবনা ইঁহারাই আপন আপন ভাবে তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। আগে যেখানে গভীর জঙ্গলে পায়ে-চলা পথের দাগ ছিল কি না ছিল, হয় ত ছিল শুধু দূরে দূরে দুই একটি বিচ্ছিন্ন পদচিহ্ন মাত্র—সেখানে এই সকল অবতার বিভূতিগণ পাকা সড়ক যেন বাঁধাইয়া দিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা সে সহজেই ও পথে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে।

৩

মন প্রাণ শুধু নয়, স্থূল চেতনা দিয়া ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করা, দেহের মধ্যে দেহকোষেবই মর্ম্মে দেহগত অন্তঃপুরুষেব জাগরণ—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে যেন এই পার্থিব লোকেবই আত্মা সচেতন হইতে চাহিয়াছে। আমি বলিযাছি রামকৃষ্ণ হইলেন মূলত হৃদ্‌পুরুষের দিব্য-চেতনা—এই হৃদ্‌পুরুষই ব্যক্ত-আধারেব, দেহপ্রাণমনের নিগূঢ় অধ্যক্ষ, ইহারই মধ্যে আসিয়া আধারের সকল নাড়ী মিলিয়াছে। হৃদপুরুষেরই সম্যক জাগরণে, মনোময় প্রাণময় এমন কি অন্নময় পুরুষ জাগ্রত হয়—ভগবৎমুখী হয়, চায় আত্মার সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য। মানুষের এই অন্তঃপুরুষ চিরদিনই ভগবানকে চাহিয়া আসিয়াছে—তাহার স্বাভাবিক গতিই হইল অধ্যাত্মের দিকে; মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে যে একটা ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তন আছে, তাহার মূল এইখানে। অন্তরাত্মার চেতনা যতখানি জাগ্রতের মধ্যে প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে, সেই জাগ্রতও ততখানি ভগবৎমুখী হয়, ভগবৎ সত্তায় গড়িয়া উঠে। অন্তরের চেতনা ধরিয়া, অন্তরের উর্দ্ধতর লোকে স্থিতিতে উঠিয়া যাওয়া মানবচেতনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ অতীতে বেশীর ভাগ সাধনমার্গের লক্ষ্য এই ধরণের ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে অধ্যাত্মসাধনার মোড়টি যেন ঘুরিয়া গিয়াছে। অতীতের

সকল সাধনার ধারা তিনি নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছেন, তাহাদের সারটী আত্মসাৎ করিয়াছেন, এইভাবে চেতনাকে, আধারকে বিশুদ্ধ করিয়া, শাণিত করিয়া, ভরাট করিয়া তাহাকে প্রযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন এক নূতন লক্ষ্যের দিকে। সে লক্ষ্য আর কিছু নয়—জাগ্রতে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা, আধিভৌতিক অধ্যাত্মের রাজ্য স্থাপন করা, এই জড়-আয়তনকে, এই নিরেট নিথর অজ্ঞানকে পরম জ্যোতির আনন্দের স্পর্শে সঞ্জীবিত, রূপান্তরিত করিয়া তোলা। অবশ্য এই লক্ষ্যটি ঠিক এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য চেতনায় যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সজ্ঞানে এই উদ্দেশ্যেই যে তিনি কাজ করিতে-ছিলেন, এমন হয়ত বলা চলে না। কিন্তু এই লক্ষ্যের ভিত্তি তিনি গড়িয়া দিয়াছেন, এই লক্ষ্যের দিকে গতির সূচনাও তিনি করিয়া গিয়াছেন।

তন্ত্রের দিক হইতে তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের সাথে সাথে তন্ত্রের উপর সমান—বা অধিকতর—জোর দিয়াছেন। তাই কামিনীকাঞ্চন লইয়া, ব্যাধি লইয়া তাঁহাকে বিশেষ দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ভোগ করিতে হইয়াছে। নতুবা আশ্চর্য্য বোধ হয় না কি—অনেক সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্পতর শক্তি লইয়া এতখানি দ্বন্দ্বসংঘর্ষের হাত এড়াইয়া গিয়াছেন কি রকমে? রহস্যের মীমাংসা এই হইতে পারে—নিম্নতর প্রাণের মধ্যে, স্থূল দেহেরও মধ্যে অন্তরাত্মার জ্যোতি ও আস্পৃহা শ্রীরাম-কৃষ্ণের চেতনাকে ধরিয়া নামিয়া আসিতে চাহিয়াছে, যাহাতে এই নিম্নতর ও নিম্নতম অঙ্গেরও অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠে, ইহারাও চায় ভগবানকে, অধ্যাত্ম-চেতনাকে। অবশ্য এই ধারার শেষ বা পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ নহেন, তাঁহার কাজ শেষ করা নয়, সুরু করা—তিনি পরিণতি নহেন তিনি হইলেন নবজন্ম।

এই দিক হইতে দেখিলে তাই আমরা বলিতে পারি, পার্থিব চেতনার জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ সদ্যোজাত ভাগবত চেতনা—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাগবত চেতনা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছে তাহার লোকাতীত স্থিতি হইতে এই লৌকিকের দিকে—সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলতরের মধ্য আপনাকে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে চাহিয়াছে; কিন্তু এ যাবৎ স্থূলতম স্থূলকে তাহা স্পর্শ করে নাই—আর এই জন্যই সূক্ষ্মতর জগতেও সাধারণ ভাবে অধ্যাত্মের অবিসম্বাদী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দৈবদুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন যাহার ভিতর দিয়া দ্যুলোক আসিয়া ভূলোককে স্পর্শ করিয়াছে। স্বর্গ পৃথিবীতে আসে নাই, কারণ পৃথিবী স্বর্গকে চায় নাই—আত্মা দেহকে অমৃতময় করিয়া তোলে নাই, কারণ দেহ নিজে আত্মাকে চিনে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ হইলেন স্বর্গের সেই যাদুস্পর্শ, আত্মার সেই স্ফুলিঙ্গ যাহা পার্থিব আয়তনের অন্তর্যামীকে জাগ্রত করিয়াছে, শারীর আত্মাকে, অন্নময় পুরুষকে সচেতন করিয়া ঊর্দ্ধমুখী করিয়াছে।

আবার বলি রামকৃষ্ণের নিজের লক্ষ্য এই রকম ছিল অথবা সজ্ঞানে এই আদর্শের সাধনা তিনি করিয়াছেন তাহা হয় ত নয়। আমি বলিতেছি তাঁহার সাধনার স্বাভাবিক পরিণতির কথা, বিশ্ব-প্রকৃতি বা ঊর্দ্ধতর প্রচ্ছন্ন চেতনা তাঁহাকে কোন সার্থকতার যন্ত্র করিয়াছে সেই রহস্য।

বহিরায়তন অবধি, একান্ত স্থূল অঙ্গ ও ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অন্তঃপুরুষের, ভাগবত চেতনার প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার—নবযুগে অধ্যাত্মের এই অভিযান ও দিগ্‌বিজয় মূর্ত্ত হইয়াছে বিবেকানন্দের মধ্যে। বাহির অপেক্ষাও বাহির স্থূল হইতেও স্থূল হইয়া পড়িয়াছে মানুষের চেতনা যে দেশে, পাশ্চাত্যের ও পাশ্চাত্য সেই আধুনিক আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের এই তেজঃ-স্ফুলিঙ্গটি কেন ও কি উদ্দেশ্যে যে আসিয়া পড়িল, তাহার অর্থ আমরা বুঝি এই রকমে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে একটা যুগান্তর, অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্ত্তনে মানব চেতনার একটা নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পদাঙ্কদূত

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা বিরচিত সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ

১

কৃষ্ণবিরহে কমললোচনা রাধা পাগলিনী প্রায়,
আলুলিত কেশ, দীর্ঘশ্বাসে কাঁপে দুরু দুরু হিয়া,
যমুনা পুলিনে মঞ্জুকুঞ্জে বুঝি আছে শ্যামরায়,
এই পরমাদে ছুটে যায় সেথা 'ভ্রান্তি' দূতীরে নিয়া।

২

না হেরি' মাধবে প্রিয়তমা সখী 'মূর্চ্ছা'রে বুকে ধ'রি'
হারাল সংজ্ঞা, অচিরে আবার জ্ঞান যবে উপজিল,
—হেরিল প্রিয়ের চরণ-চিহ্ন রয়েছে দেহলি 'পরি,
বজ্রপতাকা চক্রকমল পদাঙ্কে লিখা ছিল।

৩

গগনে গরজে গুরু গুরু মেঘ প্রণয়বিভল হিয়া
যাচে পাগলিনী প্রণয়োন্মাদে পদচিহ্নের কাছে,
—যদিও সে মূক অসাড় বধির, তথাপি সম্বোধিয়া
কহে তারে বালা,—তুমি দূত মোর,
শোন কি বারতা আছে।

৪

হে সুধীর, তুমি ধরিছ বক্ষে কমলকুলিশ রেখা,
আমার প্রিয়ের চরণ-চিহ্ন-কর্ব্বর দেহ তব,
কেবল নূপুর নাহিক তোমার, মৌনটি আছে শেখা,
গোপীর দৌত্যে কুশলী তুমি যে, অকপটে সব ক'ব।

৫

নারীর শ্রেষ্ঠ দূত তুমি জানি, মধুপুরী পঁহুছিলে
পুণ্যশীলেরা জলজ সুরভি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
পূজিবে তোমারে ওগো মনোহর, শোভা তব নিরখিলে
নয়নে অশ্রু ঝরিবে তাঁদের পুলকিত হবে হিয়া।

৬

অণিমায় লঘু এ হিয়ারে দূতী করিয়া প্রিয়ের কাছে
পাঠালেম যবে, মুগ্ধা রহিল চরণলগ্না তাঁর,
আকাঙ্খা-ভরা গুরুভার দেহ হেথায় পড়িয়া আছে,
তুমি বিনা হায় মথুরায় যেতে কে আছে বল রাধার ?

৭

'হোয়ো না উতলা, মধুপুরী হ'তে অচিরে ফিরিব আমি'
এত বলি শ্যাম চলি' গেল হায়, আর কভু ফিরিলনা !
এখনো শ্রবণে আশ্বাসবাণী বাজে মোর দিবাযামী,
কারণ কার্য্যে হয় ফলবান্, কথা তার ফলিল না।

৮

পদাঙ্ক, তুমি অবিলম্বে সে মধুপুরী পানে ধাও,
বিরহের ব্যাধি ঘুচিবে আমার, তোমারও পুণ্য হ'বে।
বৃন্দারণ্যে অমেয় সুকৃতি, মধুপুরী নাহি চাও,
—বোলো না একথা, পুণ্যবৃদ্ধি বল কে না চায় ভবে ?

৯

ব্রজবালাদের চিরশত্রু সে অক্রূর হয় হোক্
সুখী তোমা হেরি' নাহি তায় খেদ।
জানি হবে অবসান
আমার দুখের, আসিবেন হরি ঘুচাতে মোদের শোক,
শুনি' তব মুখে ব্রজের বারতা গলিবে পাষাণ প্রাণ।

১০

কোটি অপরাধ রয়েছে গোপীর কোটি মাতঙ্গ সম,
তোমার স্মৃতির অঙ্কুশ আছে, তাই লয়ে অনায়াসে
মথি' গজযূথ মধুপুরী পথে যেতে হবে সক্ষম ;
বিরহ জলধি পার হ'ব বলি রহিনু তোমারি আশে।

১১

মথুরাপুরীতে যদুকুলমাঝে হেরিবে চক্রপাণি,
অথবা গোকুলে মিলিবে তাহারে, অমলকমল পরে
যেথা অলিকুল গুঞ্জনাকুল ; জানি লয়ে যায় টানি'
পূর্ব্বস্মৃতি অনুরাগ ভরে বাল্যের খেলাঘরে।

১২

ঘূর্ণীভীষণা নক্রবহুলা থাক্ না যমুনা মাঝে,
তুমি অনায়াসে যাবে পার হয়ে ; ভবজলধির পারে
চ'লে যায় জীব কেবল তোমারে ক্ষণতরে স্মরিয়া যে !
তোমার যাত্রা ক্ষুদ্র সে নদী কভু কি রোধিতে পারে ?

১৩

হে পদচিহ্ন তোমারে নেহারি' নিমেষে বুঝেছি আমি
বিরহজলধি পার হয়ে পুন উঠিব জীবনতীরে,
মুখচন্দ্রমা হেরিব তাহার আনন্দে দিনযামী
কুসুমসুরভি রম্যকুঞ্জে পাব হারানিধি ফিরে।

১৪

তোমার পরশে কালিন্দী তটে সোপানপরম্পরা,
রাজার সরণি পথতরুরাজি পাবে শোভা অভিরাম,
পদ্মরাগের দ্যুতি ঝলমল কান্তি লভিবে ধরা,
তাদের মিনতি এড়ায়ে চলিও নিজবেগে দুর্দ্দাম।

১৫

যাহারা সতত হেরিছে এখন মাধবের শ্রীচরণ,
—কনকভূষণ মঞ্জীরশোভী বিকচ কমল দুটি,
—তাহাদেরও তুমি হবে মনলোভ, তুমি যে কর ধারণ
পদাঙ্করেখা, বজ্রপদ্ম চক্রে রয়েছে ফুটি'।

১৬

অহল্যা যাঁর চরণ পরশে লভিল জনম নব,
নারদাদি ঋষি মহিমান্বিত হলেন যাঁহার ধ্যানে,
সেই মুরারীর চরণকমলে হ'ল তব উদ্ভব,
কৃপাকটাক্ষে চাবে না কি তুমি গোপিনীগণের পানে ?

১৭

কৃষ্ণচরণচিহ্ন লিখন ছিল কালিয়ের শিরে
তাই অনায়াসে ভুলিল ভুজগ গরুড়ের মহাভয়,
গয়াসুর শিরে পিণ্ডাপর্ণ লয় ভবাব্ধি তীরে,
উপকার হেতু মহৎ যে, তাই জানি তুমি দয়াময়।

১৮

হে চরণলিপি, শীকরস্নিগ্ধ, শতদল সৌরভে
সুরভিপবন, কম্প্রপর্ণ শিখী যার বেগভরে,
—সেবিবে সে বায়ু মধুপুরী পথে
আগুসারি যাবে যবে,
যাত্রা তোমার হবে মধুময় রমণীয় পথ 'পরে।

১৯

চির পরিচিত জন্মভূমিরে ছাড়ি' যবে যাবে চলি'
করিওনা খেদ, মহতের প্রাণ পরোপকারের তরে,
ঋষি অগস্ত্য বিশ্বজনের হিত সাধিবেন বলি'
ত্যজি বারাণসী দক্ষিণাপথে চলি গেলা অকাতরে।

২০

হে পদালেখ্য, কহিও কেশবে কর্পূর-সুরভিত
বৃন্দাবিপিনবারি বিস্বাদ বৈতরণীর পারা,
পিকের কূজন অলিগুঞ্জন বেসুরে যে উপনীত,
স্নিগ্ধ শীতল চাঁদের কিরণে ঝরিছে গরল ধারা।

২১

বজ্রচিহ্ন পদমূলে তব, তাই কহে সুধীজন৷
যাত্রা তোমার হবে অবারিত; বিরহে শঙ্কাকুল
মোরা ব্রজনারী 'যাও' 'যাও' বলি' দিতেছি প্রবর্ত্তনা,
ব্যাপ্যজ্ঞানে প্রমাণিত হয় ব্যাপকতা নির্ভুল।

২২

যমুনাকালিয় কথা প্রসঙ্গে করিয়াছি নিবেদন
এ জগতে তব নাহি কোনো ভয়। শুধু ক্ষণেকের তরে
স্মরিলে তোমায় জানি যমভয় করে দূরে পলায়ন
তব পদতল রীতির নিয়মে অশনি চিহ্ন ধরে।

২৩

অধিক কি কব? যে পাদপদ্ম উঠিল ফণীর শিরে,
সে চরণ হ'তে জন্ম লভিয়া তুমি যে অকুতোভয়।
কারণের সম কার্য্যের রূপ, ধরিতেছ মুরারীরে
চরণচিহ্নে আপনবক্ষে, তাই মৃত্যুঞ্জয়।

২৪

বজ্রচিহ্ন ধরিতেছ বটে, জানি তা' বজ্র নয়।
তাহা হ'ত যদি নেহারি' সে রেখা আনন্দাশ্রু ধারা
বহিত কভু কি মুগ্ধ নয়নে? দূর হ'তে ত্রাস হয়
নির্ঘোষে য'র, তার রূপে কভু ভুলিত কি আঁখি তারা?

২৫

ফণীভুক্ শিখী মেঘদরশনে হরষে নৃত্যকরে,
তারি গরজনে ভয়াকুল জীব! মিথ্যা যে মনে হয়
কলাপীর সুখ, হ'ল জর্জ্জর হিয়া অতনুর শরে
হেরি অম্বরে স্নিগ্ধশ্যামল সজল জলদোদয়।

২৬

এক ক্রোশ পথ চলা হ'লে শেষ চরণ প্রক্ষালিও,
ছায়াতরুমূলে বিশ্রাম লাভ করিও অতঃপর।
চরণবিহীন তুমি—হেন কথা কভু না উচ্চারিও,
যে পরমপদ সেবকেরে দেয় সে যে পদাধীশ্বর।

২৭

হৃদয় আমার তুরগ তোমার অশ্বারোহণে ধাও,
তপন তোমারে সজল জলদে করিবেন ছায়া দান।
পদ্মচিহ্ন ধরি' কেন মিছে বৃষ্টিরে ভয় পাও?
কমলপ্রণয়ী রবি নিবারিবে পর্জ্জন্যের বান।

২৮

কোরো না অছিলা, বলিও না তুমি—পঙ্কিল পথঘাট
ব্রজললনার নয়নের জলে। ধূলিময় কভু নয়
মোদের অশ্রুসিক্ত সে পথ, ছাড় ছলনার ঠাট,
এই লহ মম মন-তুরঙ্গ রাখো মোর অনুনয়।

২৯

মোদের অশ্রুবন্যার জলে যমুনা ওঠেনি ভরি',
কৃষ্ণবিরহদহনে শুষ্ক শীর্ণ আজি সে হায়।
তা যদি না হ'ত বহিত প্লাবন গোকুল মগ্ন করি',
করিওনা ভয় পঁহুছিবে তুমি অনায়াসে মথুরায়।

৩০

সত্যই বটে মাধব-বিরহে কৃশা কালিন্দী আজি,
মিথ্যা বলে সে, যে কহে যমুনা হয়েছে অধুনা পীনা
ব্রজরমণীর নয়নের জলে, ব্রজপুরে তরুরাজি
নরনারী সবে বিশীর্ণ অতি সে মুরলীধর বিনা।

৩১

বস্তু থাকিলে ব্যাপ্তিও থাকে এ তত্ত্ব জানে সবে,
শুধু আঁখি জলে দুকুলপ্লাবিনী হয় না ত নদীধারা,
উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হৃদয় রহে যদি বল তবে
ভূরি ভোজনে কি পরিপুষ্টতা লভে কভু সুখহারা?

৩২

চিন্তাপনয় নাহি যদি হয় পুষ্টি কেমনে হবে?
কারণ অভাবে কার্য্য কদাপি সম্ভব কভু নয়।
ক্রিয়া অহেতুকী যৌক্তিক নয়, এ কথাত জানে সবে,
স্বর্গসিদ্ধি যজ্ঞ বিনা কি লভ্য কদাচ হয়?

৩৩

মলয় পবনে বেদনা দহন মূর্চ্ছায় সান্ত্বনা,
সকলি বিধির বিধানানুগত, অশুভও শুভ হয়।
চাঁদের কিরণে মলিনা নলিনী, ভানুর উদ্দীপনা
তপ্ত কিরণে ফুটায় তাহারে হোক্ তাহা দাহময়।

৩৪

রমণীর প্রেম প্রণয়ীর তরে কভু নয় ঘুচিবার,
তাই পদাঙ্ক, করি অনুনয় মথুরায় যাও তুমি।
মদনের বানে নিপীড়িতা রতি, তথাপি নিধনে তাঁর
সে কী হাহাকার তুলিলা বিধবা জানে তা শ্মশানভূমি।

৩৫

জানি মনসিজ চায় বধিবারে একে একে ব্রজনারী,
তাই অনঙ্গ ভুজঙ্গ সম ফুলবাণ বুকে হানে।
মোরা কুলবধূ সে নিশিত শর কেমনে রোধিতে পারি?
পঞ্চসংখ্য কুসুমসায়কে মোদেরে বধিল প্রাণে।

৩৬

যে গরল পান করিলেন হর লোকরক্ষার তরে,
সেই কালকূটে মকরকেতন দহে নিখিলের প্রাণ,
তাই ত্রিলোচন নয়ন-অনলে দহিলেন সেই স্মরে,
মরেও মরেনি তবু সে নিঠুর, হানে তার ফুলবাণ।

৩৭

পুষ্পনায়কে আছে যে গরল ন্যূন তাহা কভু নয়
সে বিষের চেয়ে নীলকণ্ঠ যা একা করিলেন পান,
মন্মথ বাণে সেই ত্র্যম্বক বেদনায় নির্দ্দয়
হলেন বলিয়া পুষ্পধন্বা হল ভস্মাবসান।

৩৮

কৃষ্ণবিরহদহনের জ্বালা বেড়ে যায় অনুদিন,
বৃন্দারণ্য বসতি এখন হ'ল যে বেদনাময়,
মোদের অশ্রু আসারে যমুনা কূলবন্ধনহীন
হয় যদি তবে কুটীর কুঞ্জ ডুবে যাবে সমুদয়।

৩৯

কৃষ্ণের ধ্যানে রয়েছে যে সুখ অমরায় তাহা নাই,
হেন আনন্দ লভিবেনা কভু ব্রহ্মের দরশনে,
—শুনেছ এ বাণী ঋষিদের মুখে ; অবাক হয়েছি তাই
হেরিয়া তোমার ঔদাসীন্য শ্যামের অন্বেষণে।

৪০

মাধব-চরণে প্রণয়-বেদনা গোপীদের নিবেদিও,
কোরো না প্রকাশ স্বরূপ্ আপন রহিও অন্তরালে,
তোমারে হেরিলে হর্ষোল্লাসে মোদের পরাণপ্রিয়
অশ্রুপুলকে হবে উন্মনা, শুনিবেনা কি শোনালে।

৪১

নির্জ্জনে যদি পাও দেখা তার বোলো তারে অকপটে
নিজ পদাঙ্কলিখা ব্রজধাম ভুলেছ কি একেবারে ?
ভুজবন্ধনে বাঁধিতে তোমারে নাহিক সেথায় বটে
কুব্জা রূপসী, তাই কালো শশী ভুলিলে কি রাধিকারে?

৪২

চিত্ত মোদের নিরাকুল অতি, আকাঙ্ক্ষা নিপীড়িত ;
বাণী যদি হয় মরমধর্ম্মী হানি নাহি হবে তায়,
প্রণয়-বচন নিবেদিও তাঁরে যে প্রেমে উতলা চিত,
নতুবা কেমনে হেন আকুলতা বুঝিবেন শ্যামরায় ?

৪৩

শুনি তব বাণী আসিবে তুর্ণ জানি সে হৃদয়বান্,
যাহা অলক্ষ্য অলীক যে তাহা এ কথা সত্য নয়।
দৃষ্টিগোচর নহে যাহা তার প্রমাণ যে অনুমান,
বুঝি অনুভবে পাব সে মাধবে নাহি মোর সংশয়।

৪৪

চার্ব্বাক্ মত অতথ্য অতি, মূল তার মাটি তলে
রয়েছে লুকান ; বলেছি তোমারে অলখ অলীক নয়।
আমাদের তনু পুষ্পধনুর প্রহরণে নিতি জ্বলে,
স্বয়ং মদন সাক্ষী আপনি এ জীবন জ্বালাময়।

৪৫

ক্ষণভঙ্গুর বিশ্ব এ কথা অর্ব্বাচীনেরা বলে,
হরি বিরহজ মোদের প্রণয় জানিও চিরন্তন।
অচিরস্থায়ী শব্দ ও বাণী জেনো এ ভূমণ্ডলে,
কৃষ্ণাশ্রিত গোপিকার প্রেম শাশ্বত সনাতন।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৭

কালের চাকায় সময়ের কাঁটা মাস ছয়েক এগিয়ে গেছে। চৈত্র মাসের শেষ ভাগ। জহরলাল চৌধুরী তাঁর কলিকাতার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে সদ্য-লব্ধ সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময়ে একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবেশ ক'রে নত হ'য়ে যুক্তকরে জহরলালকে অভিবাদন করলে।

চশমার রীমের উপর দিয়ে আগন্তুকের প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে জহরলাল বললেন, "কি কেশব, খবর কি? কখন এলে?"

বিনীত কণ্ঠে কেশব বললে, "আজ্ঞে মহারাজ, আজ এসেই বাসায় জিনিসপত্র ফেলে হুজুরে হাজির হয়েছি।"

"আচ্ছা, বোসো সব শুনছি।" ব'লে জহরলাল আলবোলার নল মুখে দিয়ে অসমাপ্ত সংবাদটুকু শেষ করতে উদ্যত হ'লেন।

ফরাসের নিকটে কাঠের পালিশ করা একটা বেঞ্চ ছিল। কেশব সন্ত্রস্তভাবে তার এক প্রান্তে উপবেশন করল। কেশব, অর্থাৎ কেশবচন্দ্র হালদার, জহরলালের বিশ্বস্ত নায়েব। জমিদারী পরিচালনার জন্য যে বুদ্ধির অথবা কূট বুদ্ধির প্রয়োজন, কেশবের তা যথেষ্ট ছিল শুধু তাই নয়; সুনীতি এবং বিবেক নিন্দিত যে কোনো দুঃসাধ্য কর্ম্মসাধনের জন্য বিচক্ষণতার সহিত যে দুঃসাহসের প্রয়োজন তাও তার অল্প ছিলনা। সে জন্য দুরূহ অথবা গোপনীয় বিশেষ কোনো কার্য্যসাধনের প্রয়োজন হ'লে জহরলাল কেশবের সহায়তা গ্রহণ করতেন।

সংবাদের অপঠিত অংশটুকু সমাপ্ত করে জহরলাল চক্ষু হ'তে চশমা খুলে রেখে কেশবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, "কি খবর বল কেশব। আপাতত কোথা থেকে আসছ?"

"আজ্ঞে মহারাজ, কাশী থেকে।"

"সেখানে সন্ধান কিছু পেলে?"

"বিশেষ কিছু পাই নি, কিন্তু প্রমথ যে বউ-রাণীমাকে নিয়ে কাশী গিয়েছিল এ বিষয়ে আমার খুব বেশি সন্দেহ নেই।"

কেশবের কথা শুনে জহরলালের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হ'ল; ঈষৎ ভৎর্সনার সুরে বললেন, "মুখে বলেছি, চিঠিতে লিখেছি বউরাণীমা বোলোনা তাকে, এ পরিবারের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই, তবু বারম্বার ঐ কথাটা ব্যবহার করবে!"

অপ্রতিভ ভাবে কেশব বললে, "মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় হুজুর, এখনো অসম্মানের কথা উচ্চারণ করতে মুখে বাধে!"

জহরলাল বললেন, "তার ত' কুলত্যাগ ক'রে প্রকাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে একটুও বাধল না, তোমারই বা বাধে কেন? কাশীতে কি সন্ধান পেলে বল শুনি।"

কেশব বললে, "কাশীতে পাণ্ডাদের মধ্যে সন্ধান করতে করতে শঙ্কর পাণ্ডা নামে একজন পাণ্ডার কাছে টের পেলাম যে প্রমথ নামে এক ব্যক্তি মাস পাঁচ ছয় আগে সস্ত্রীক কাশীতে এসেছিল; কিন্তু দু চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতেই কি তার মনে হ'ল, হয়ত আমাকে গোয়েন্দা ব'লেই সন্দেহ করলে, আর কোনো কথা ভাঙলে না। শুধু সে-ই নয়, তারপর যাকেই প্রমথর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি সে-ই মাথা নাড়ে আর বলে কিছু জানিনে। খুব সম্ভবতঃ শঙ্কর পাণ্ডার পরামর্শে। শঙ্কর পাণ্ডা যে দোকান থেকে ফুল বিল্বপত্র নেয়, যে দোকান থেকে ফলমূল কেনে, যে দোকানের মিষ্টান্ন ব্যবহার ক'রে—সব জায়গায় চেষ্টা করেছি, কিন্তু আর কোনো সন্ধান পাই নি।"

জহরলাল বললেন, "আর কোনো সন্ধানে দরকারও নেই,

যতটুকু পেয়েছ তাই যথেষ্ট। প্রকাশের বাড়ি থেকে সে কাউকে না জানিয়ে প্রকাশের বিনা অনুমতিক্রমে প্রমথ নামে একজন অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, আর বাপের বাড়ি কিম্বা অন্য কোনো আত্মীয়ের বাড়ি নেই,—এ কথায় ত তোমার কোনো সন্দেহ নেই ?"

কেশব মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

জহরলাল বল্‌লেন, "এ-ই যথেষ্ট। আর কিছু দরকার নেই।" তারপর কেশবের সহিত অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ক'য়ে তাকে বিদায় দিলেন।

প্রমথর সহিত সন্ধ্যার প্রকাশের গৃহপরিত্যাগ করার পর নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রকাশ অবিলম্বে সে কথা সন্ধ্যার পিতাকে পত্র লিখে জানায়, এবং জহরলালকে সে কথা জানানো-না-জানানোর কর্ত্তব্য নিরূপণের ভার তাঁরই বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যার পিতা বেণীমাধব কিন্তু সহসা একথা জহরলালকে জানানো সমীচীন মনে করেননি, কারণ তা হ'লে সন্ধ্যার শ্বশুরালয়ে প্রবেশের যৎ-সামান্য আশাটুকুও যে চিরদিনের মতো নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাবে সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে কথাটা অন্যদিক থেকে একটু গোলমেলে ভাবে জহরলালের কানে এসে পৌঁছায়। পীরনগরের পাঁচ-আনা তরফের ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুধারাণীর স্বামী, জামসেদপুরে চাকরী করে। ইন্দ্রনাথের নিকট হ'তে জহরলাল একখানা চিঠি পান তার প্রধান বক্তব্য এইরূপ।—'কাকাবাবু, আমার েখানকার একটি বন্ধুর মুখে আজ কথায় কথায় শুনলাম যে, মাস তিন চার পূর্ব্বে প্রকাশ ভায়ার গৃহে সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ে সহসা একদিন আবির্ভূত হয় এবং কিছুকাল তথায় অব-স্থান ক'রে আর একদিন সহসা সকলের অগোচরে প্রমথ নামে একটি যুবকের সহিত অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ সন্ধ্যা আমাদের অপহৃতা বধূমাতা সন্ধ্যা কি না জানবার জন্য আমাদের অত্যন্ত ঔৎসক্য হয়েছে। কিন্তু আমার সহিত প্রকাশ ভায়ার অকারণ বিরোধ এবং অসরস আচরণের কথা আপনি ত সমস্তই অবগত আছেন, সুতরাং বুঝতেই পারছেন তাঁর নিকট গিয়ে একথা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এ কথাও মনে হচ্ছে যে, জামসেদপুরে প্রকাশ ভায়ার অপেক্ষা আমি আপনার অনেক নিকটতর আত্মীয়, সুতরাং বধূমাতা হ'লে তিনি খুব সম্ভবতঃ আমার গৃহেই আসতেন। এ যদি আর কোনো সন্ধ্যা হয় তা হ'লে প্রকাশের কাছে এ কথা তুলে তার অধিকতর বিরাগভাজন হব। সে কারণ কথাটা অবিলম্বে আপনাকে জানালাম। আপনি প্রকাশকে পত্র লিখে অনুসন্ধান করবেন এবং যথাকালে অনুসন্ধানের ফল অনুগ্রহ ক'রে আমাকে জানাবেন।' এই চিঠি পাওয়ার পর জহরলাল কেশবকে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

দ্বিপ্রহরে জহরলাল পত্নী মমতাময়ীর নিকট কথাটা উত্থাপিত করলেন; বল্‌লেন, "কেশব আজ ফিরে এসেছে মমো।"

মমতাময়ী বুঝলেন যে সংবাদ যদি জহরলালের মতের অনুকূল না হ'ত তা হ'লে এত শীঘ্র এবং এত উৎসাহ সহকারে তিনি কখনই ত বল্‌তে উদ্যত হ'তেন না। তথাপি নিজের অন্তরের অবুঝ ঔৎসুক্যকে অপ্রকাশ রেখে বল্‌লেন, "কি খবর আন্‌লে ?"

জহরলাল মুখ গম্ভীর ক'রে বল্‌লেন, "খবর আর নতুন কি আনবে, আমি যা মনে মনে জানতাম তাই। প্রকাশের বাড়ি থেকে একটা বকাটে ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে কাশীতে দুজনে বাস করছে।"

বস্তুত কথাটা সত্য হ'তে বিশেষ দূরবর্ত্তী মিথ্যা না হ'লেও জহরলাল প্রকৃত কথার মধ্যে এমন একটু অসত্য এমন ভাবে মিশিয়ে দিলেন যার দ্বারা সমস্ত জিনিষের আকৃতিটা অনেক-খানিই কদর্য্য হ'য়ে উঠল। কথাটা কিন্তু মমতাময়ীর নিকট সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বোধ হ'ল না; বললেন, "এ কথা তুমি সত্যি ব'লে মনে করছ ?"

জহরলাল বল্‌লেন, "কথাটা এমন কি অপরাধ করলে যে, মিথ্যা ব'লে মনে করতে হবে ? তুমি জাননা মমো, ও-সব মেয়ের এই রকম পরিণতিই হ'য়ে থাকে।"

জহরলালের কথা শুনে মমতাময়ীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, "দেখ, এত বড় অধর্ম্মের কথা মুখে এনো না! হিন্দু সমাজের জাঁতি-কলে তাকে ফেলেছ, যত ইচ্ছে পীড়ন করো; কিন্তু নিজেদের সাফাই গাইবার

জন্যে মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না। তুমি তার কি জানো যে, ও-সব মেয়ে বলছ? আমি জানি সে মেয়ে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ।"

মমতাময়ীর তীব্র প্রতিবাদে জহরলাল ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন; বললেন, "তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝ্‌চ মমো। আমার বলবার উদ্দেশ্য, এ রকম ঘটনার পর ও-সব মেয়ের আর দ্বিতীয় কোনো উপায় থাকে না ব'লে প্রকৃতিও সেইভাবে বদ্‌লে যায়। একটা কথা আছে, বিষাক্ত সাপের মুখ থেকে যে ব্যাঙ্‌ কোনো রকমে রক্ষা পেয়ে পালায়, সে-ও বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে। এও তেম্‌নি আর কি।"

মমতাময়ী বল্‌লেন, "সে যাই হোক্‌, এ কথা তুমি প্রিয়কে জানিয়ো না। তুমি যে মনে করেছ, এ কথার জোরে বউমার উপর থেকে প্রিয়র মন তুলে নিয়ে তুমি তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করবে, তা কিছুতেই হবে না।"

"কেন?"

"কেন? তুমি পুরুষমানুষ হ'য়ে জিজ্ঞেস করছ, 'কেন?' এ কথা শুনে হয় সে কাশী গিয়ে একটা খুনোখুনি ব্যাপার করবে; নয় চিরদিনের জন্যে এমন অশ্রদ্ধা হ'য়ে যাবে যে, জীবনে কখনো মেয়েমানুষের মুখ দেখ্‌বে না। কত ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের স্বামী সন্ন্যেসী হ'য়ে গেছে তা তুমি ভুলে যাচ্ছ? বিপিন বৈরিগীর কথা মনে নেই তোমার? পরাণ হালদারের কথা ভুলে যাচ্ছ? তা ছাড়া, এমন কথা যদি মনে হয় যে, আমাদের জবরদস্তির জন্যেই এ কাণ্ডটা ঘট্‌ল, তা হ'লে আমাদের উপর হয় ত' এমন অভিমান হবে যা জীবনে কোনো দিন যাবে না। স্ত্রী ভ্রষ্টা, এ কথা কি সহজে কোনো পুরুষ-মানুষকে বল্‌তে আছে? অনর্থ ঘটে যাবে যে।"

মমতাময়ীর ভয়-প্রদর্শনে জহরলাল চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। এ অভিসন্ধি তাঁর মনে মনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই যে সন্ধ্যার প্রতি প্রিয়লালের মনে একটা ঘৃণা উৎপাদন করতে পারলে কতকটা সহজে তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহে স্বীকৃত করতে পারা যাবে। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে ব্যাধির উপশম না হ'য়ে বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা আছে কি-না সে কথা ভেবে দেখ্‌বার অবসর হয়নি।

স্বামীকে নির্ব্বাক এবং চিন্তিত দেখে মমতাময়ী বল্‌লেন, "অত কি ভাবচো?"

জহরলাল বল্‌লেন, "ভাবচি, প্রিয়র মনের অবস্থা যদি কোনো রকমে না বদলায় তা হ'লে ও যে কখনো আবার বিয়ে করতে রাজি হবে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। দেখ্‌লে ত' রামলাল চাটুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে কি কাণ্ডটা করলে।"

মমতাময়ী বল্‌লেন, "তা কি করবে? সকলেরই কি অদৃষ্টে সব সুখ থাকে। স্ত্রী-ভাগ্য ওর যদি ভালই হবে তা হ'লে অমন বউই বা হারাবে কেন। রূপে গুণে যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা! মনে মনে কত সাধ করেছিলাম যে, এই কলকাতার বাড়ি সে আলো ক'রে থাক্‌বে। কত দুঃখ কষ্ট পেয়ে এ বাড়িতে এসে দাসী হ'য়ে থাক্‌তে চেয়েছিল। দিলাম তাকে দূর দূর ক'রে শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে! একদিক্‌ দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত করতে হবে।—ছেলেটাই না হয় সন্ন্যেসী হ'য়ে থাক্‌বে, অদৃষ্ট যখন তার এতই মন্দ।" ব'লে মমতাময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছলেন।

জহরলাল বল্‌লেন, "অদৃষ্ট শুধু প্রিয়র মন্দ নয় মমো, আমাদেরও মন্দ—নইলে এ দুঃখ কে-ই বা চেয়েছিল বল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছ কেন? পাপ কোথায় যে তার প্রায়শ্চিত্তর কথা তুলছ?"

"পাপ যদি না থাক্‌বে—তা হ'লে দিবারাত্র মনের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে কেন?"

"সেইটেই ত' অদৃষ্ট।"

"তাই যদি হয় তা হ'লে ছেলেরও অদৃষ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যেয়োনা; ও যেমন দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে তেমনি করুক।" ব'লে মমতাময়ী কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন।

কথাটা সেদিনের মতো সেই খানেই শেষ হ'য়ে গেল।

স্বামীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে না পেরে মমতাময়ী সেই দিনই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য জামসেদপুরে গোপনে সবিতাকে চিঠি লিখলেন। দিন দুই পরে কিন্তু সবিতার নিকট থেকে উত্তর পেয়ে পড়তে পড়তে তাঁর মুখ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেল। সবিতার পত্রের মর্ম্ম জহরলালের কাহিনীর পরিপন্থী নয়, বরং তার প্রথমাংশের পরিপোষক। সবিতা লিখেছে,—মামীমা, এ কথা সত্য, সন্ধ্যা আমাদের না জানিয়ে প্রমথ বাবুর সঙ্গে কোথায় চ'লে গিয়েছে; কিন্তু সে কোথায়

গিয়েছে, অথবা কাশী গিয়েছে কি-না, তা আমরা জানিনে। কাশী যাওয়া অবশ্য কিছুই আশ্চার্য্য নয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে সে যে প্রমথবাবুর সঙ্গে অসঙ্গত জীবন যাপন করছে, এ আমার সহজে বিশ্বাস হয় না। তার অদৃষ্ট মন্দ, কিন্তু প্রকৃতি মন্দ নয়। মেয়েমানুষের দুর্নাম অনেক সময়েই অকারণে হয় মামীমা, আপনারা ভাল ক'রে সন্ধান নেবেন, এবং ফলাফল অনুগ্রহ ক'রে আমাদের জানাবেন।"

একটা কোনো কাহিনীর পারম্পর্য্যের মধ্যে কতকটা অংশ সত্য ব'লে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হওয়ার পর বাকি অংশকে মিথ্যা বলে সন্দেহ করবার প্রবলতা অনেকখানি কমে যায়। মমতাময়ীরও তাই হ'ল; সবিতার নিকট হ'তে এ চিঠি পাওয়ার পর জহরলালের কথার কোনো অংশকেই আর অসত্য ব'লে অগ্রাহ্য করবার সাহস রইল না; সুতরাং স্বামীর প্রতি বিরূপতার প্রায় সবটাই অন্তর্হিত হ'ল; এমন কি, স্বামীর সততার বিষয়ে মনের মধ্যে যে সংশয় উৎপন্ন হয়েছিল তা অকারণ মনে ক'রে মনে মনে একটু অনুতপ্তও বোধ করলেন। অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে সকলের অগোচরে আত্মীয়ের গৃহত্যাগ করার পর কাশী গিয়ে অসঙ্গত জীবন-যাপন করার মধ্যে এমন একটা সহজ সম্ভাবনীয়তা আছে যা প্রতিকূল প্রমাণের অভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। যে ব্যক্তি উগ্র বিষ সংগ্রহ ক'রে রেখেছিল ব'লে জানি, সে একদিন বিষপানে প্রাণত্যাগ করেছে শুনলে কথাটা সম্ভব ব'লেই মনের মধ্যে স্থান লাভ করে।

কিন্তু সে যাই হোক্ না কেন, কথাটা প্রিয়লালকে তার উপস্থিত মানসিক অবস্থায় সহসা জানানো যে নিতান্তই অসমীচীন হবে সে বিষয়ে মমতাময়ীর কোনো সন্দেহ ছিল না,—বিশেষতঃ কথাটা এখন যখন প্রকৃত ব'লেই প্রতিপন্ন হবার উপক্রম করেছে।

কিন্তু প্রিয়লালের সেই মানসিক দুরবস্থারই জন্য জহরলালের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সমাজের অনুশাসন প্রতিপালন করতে গিয়ে যে অনিবার্য্য আঘাত দিতে হয়েচে তার জন্য তিনি দায়ী নন,—এই যুক্তি সন্ধ্যার পক্ষে জহরলাল যেমন অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করতেন, প্রিয়লালের পক্ষে তেমন পারতেন না। দৈবের অনিবার্য্যতা প্রিয়লালের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা ছিল না, তাই তার জন্য জহরলালের চিন্তারও অবধি ছিল না। এমন কি সদ্য ঘটিত ব্যাপারে প্রিয়লালের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে তিনিই নিমিত্তভাগী, এমন একটা গ্লানি মনের মধ্যে নিরবসর কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করত। সেজন্য এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। অবশেষে একটা উপায় মাথার মধ্যে দেখা দিলে।

চতুর্দ্দিক থেকে বিচার বিবেচনা ক'রে উপায়টিকে পাকা ব'লেই মনে হ'ল,—সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না—সেই শ্রেণীর একটা নিখুঁৎ কৌশল। এবার কিন্তু জহরলাল মমতাময়ীর সহিত পরামর্শ করলেন না, 'মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ' চাণক্য নীতি পালন করলেন। তলব পড়ল গুপ্তমন্ত্রী কেশব হালদারের। সমস্ত সবিস্তারে শুনে কেশব কৌশলটি অনুমোদিত করলে।

জহরলাল বললেন, "দেখো, চিঠি যেন খবরদার নিজের হাতে লিখো না,—তোমার লেখা অনেকেই এখানে চেনে।"

জহরলালের কথা শুনে কেশবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে; বললে, "মহারাজ, এতদিন ধ'রে নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ ক'রে, আজ এই উপদেশ দেওয়া দরকার মনে করছেন?"

এই অনধিকার স্তুতির চাটুবাণীতে প্রসন্ন হয়ে জহরলাল বললেন, "তা বটে, কিন্তু চিঠি একটা লিখবে, না দুটো লিখবে কেশব?"

"আমি বলি মহারাজ, তিনটে;—একটা হুজুরকে, একটা বেণীবাবুকে একটা প্রকাশবাবুকে। কাজ করতে গেলে সাহস ক'রে সব দিক মেরে না করলে কাঁচা কাজ হয়। এক সঙ্গে সকলকে চিঠি দিয়ে অবস্থা এমন করুন যাতে মোকাবিলা হ'লে সব জায়গায় একই কথা শোনা যায়। প্রমথর দেখা এখন কেইবা পাচ্ছে আর কেই বা চাচ্ছে যে, আসল কথার মোকাবিলা হবে।"

মনে মনে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে জহরলাল বললেন, "মন্দ নয়, তাই তবে কর। কিন্তু তোমার চিঠি নিয়ে কাশীতে যাকে পাঠাবে সে বিশ্বাসী লোক ত?"

"হুজুর যেমন আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি তেমনি তাকে করি।"

"কবে পাঠাবে তাকে?"

"আজ্ঞে, আজ রাত্রেই।"

মনে মনে হিসাব ক'রে জহরলাল বললেন, "তা হ'লে বুধবারের ডাকে এখানে আমরা চিঠি পাব। এ সময়টা তোমার এখানে উপস্থিত থাকাই ভাল, নইলে লোকের মনে কোনোরকম সন্দেহ হ'তেও পারে।" এ 'লোক' অর্থে প্রধানত যে মমতাময়ী, সে কথা অবশ্য জহরলাল প্রকাশ ক'রে বললেন না।

তৃতীয় দিন বেলা দশটার সময় ডাক এল। জহরলাল ইচ্ছা ক'রেই দমদমার বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর হাত হ'য়ে চিঠিখানা মমতাময়ী বা প্রিয়লালের হাতে পড়ে এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। পিয়ন যখন এল তখন প্রিয়লাল বার-মহলে তার পড়বার ঘরে ব'সে এম্-এ ক্লাসের একটা পাঠ্য পুস্তকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। পিয়ন চিঠির বাক্সে চিঠি ফেলতে উদ্যত হ'য়েছে দেখতে পেয়ে সে পিয়নকে ডেকে তার হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে নিলে। পাঁচ ছ খানা চিঠি; ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা পোষ্টকার্ডের ভিতরে গোটা দুই তিন কথা চোখে পড়তেই মাথাটা গেল ঘুরে। কোনো প্রকারে সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে চিঠিখানা প'ড়ে শেষ করলে। চিঠিটা এই—

সবিনয় নিবেদন, কাশীধাম

গত কল্য রাত্রি দেড়টার সময়ে অভাগিনী সন্ধ্যা চিরদিনের মতো আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। তিন দিনের কলেরা রোগে তার মৃত্যু ঘটল। এক সময়ে সে আপনার পুত্রবধূ ছিল, এখনো সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নি ভেবে যদি অশৌচাদি পালন করেন সেই জন্য এ পত্র দিলাম। ইতি

বিনীত

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ঘরের দরজা জানলাগুলো রুদ্ধ ক'রে দিয়ে এসে টেবিলে মুখ গুঁজে প্রিয়লাল কিছুক্ষণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করলে, তারপর বস্ত্রে চক্ষু মার্জ্জিত ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে বসল। দুঃখ ও অনুশোচনার একটা মর্ম্মন্তুদ গ্লানিতে সমস্ত মন, এমন কি অন্তরিন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিল। মনে মনে বললে, অপরাধ করেছিলাম সন্ধ্যা, গুরুতর অপরাধই করেছিলাম, কিন্তু তাই ব'লে এমন শাস্তি দিলে যে, জীবনে কোনো দিন যে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে নোবো তার পথ রাখলে না। অভিমান কি এম্‌নি করেই করতে হয়? জানকীও বোধকরি হতভাগ্য রামচন্দ্রের উপর এমন দুর্জ্জয় অভিমান ক'রে পাতাল প্রবেশ করেননি, তুমি যেমন আমার উপর ক'রে প্রাণত্যাগ করলে। প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র যে পাপ ক'রেছিলেন, পিতৃ-মনোরঞ্জনের জন্য আমি তার চেয়ে গুরুতর পাপ ক'রেছিলাম। প্রকাশ দাদার বাড়িতে তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েও তোমার মনে সান্ত্বনার একটু ক্ষীণ আলো জেলে রাখিনি।—প্রিয়লালের চক্ষু হ'তে পুনরায় টপ্ টপ্ ক'রে বড় বড় অশ্রুবিন্দু টেবিলের উপর ঝ'রে পড়তে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে কাশীর চিঠিখানা ছাড়া বাকি চিঠিগুলা চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়ে প্রিয়লাল মমতাময়ীর নিকট উপস্থিত হ'ল। প্রিয়লালের আকৃতি দেখে মমতাময়ী আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লেন; ব্যগ্রকণ্ঠে বল্‌লেন, "কি হয়েছে প্রিয়?"

প্রিয়নাথ বল্‌লে, "আপদ একেবারে চুকেচে মা, আমাদের কলঙ্ক ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

তীক্ষ্নকণ্ঠে অধীরভাবে মমতাময়ী বল্‌লেন, "কি হয়েছে খুলে বল্ না!"

প্রিয়লালের মুখমণ্ডল একটা বিচিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল,—ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত মহানগরীর ভগ্নস্তূপের উপর প্রভাত সূর্য্যের প্রথম কিরণ পড়লে যেমন দেখায়, দেখালো ঠিক তেম্‌নি। পোষ্টকার্ডখানা মমতাময়ীর দিকে আগিয়ে ধ'রে বললে, "প'ড়ে দেখ।"

চিঠিতে দৃষ্টিপাত ক'রেই মমতাময়ী চীৎকার ক'রে উঠলেন, "একি সর্ব্বনাশের কথা নিয়ে এলি প্রিয়!" তারপর ভূমিতলে ব'সে প'ড়ে চ'খে কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "বুকের মধ্যে ভারি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে মা!—আমি আমার ঘরে কিছুক্ষণের জন্য শুতে চল্‌লাম।" ব'লে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে ফিরে এসে বল্‌লে, "তুমি আমার সব দুঃখ-কষ্ট বোঝো ব'লেই তোমাকে বল্‌ছি মা, আমাকে যেন তোমরা সান্ত্বনা দিতে যেয়ো না। কিছুতে ও কাজ কোরো না। আমার এ দুঃখ আপনিই শেষ হ'তে দিয়ো।"

এ যে জহরলালের প্রতি প্রিয়লালের অব্যক্ত মর্ম্মান্তিক

অভিমান তা বুঝ্‌তে মমতাময়ীর বিলম্ব হ'ল না। প্রিয়লালের প্রতি কাতর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বল্‌লেন, "ওরে প্রিয়, একবার আমার কাছে এসে বোস্ বাবা!"

প্রিয়লাল নিকটে উপবেশন করলে তার মাথাটা নিয়ে মমতাময়ী ক্ষণকাল নিজের বক্ষের মধ্যে চেপে ধ'রে রইলেন, তারপর দু-চারবার সযত্নে তার উপর হাত বুলিয়ে বল্‌লেন, "যাও বাবা, শুয়ে থাক গে; কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।"

কিছুক্ষণ পরে জহরলাল ফিরে এলেন। রোদনবিক্লিন্না গম্ভীর আকৃতি দেখে আকাশ থেকে পড়লেন; বল্‌লেন, "কি হয়েছে মমো?"

মমতাময়ী বল্‌লেন, "বউমা নেই! সব শেষ হ'যে গেছে!"

"তার মানে?"

"কলেরা হ'য়ে মারা গেছেন।"

জহরলাল চম্‌কে উঠ্‌লেন। কপট অভিনয়ের চমকটা বোধহয় একটুখানি মাত্রা অতিক্রম করেই গেল; বল্‌লেন, "বউমা বাপের বাড়ি এসেছিলেন নাকি?"

মমতাময়ী মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "না গো, কাশীতেই এই ব্যাপার ঘটেছে!" তারপর টেবিলের উপর থেকে পোষ্টকার্ড-খানা নিয়ে জহরলালের হাতে দিলেন।

চিঠি প'ড়ে জহরলালের মুখের মধ্যে নিবিড় বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল, কিন্তু তারই অন্তর্গত একটা দুর্নিবার্য্য আনন্দের দীপ্তি সেই ছায়াকে একটু ফিকে ক'রেও রইল। অন্য দিকে মুখটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে জহরলাল বললেন, "বেই বাড়িতে চিঠি লিখে খবরটা একটু ভাল করে জানলে হয় না?"

"আবার কি ভাল ক'রে জান্‌বে?"

একটু ইতস্ততঃ সহকারে জহরলাল বললেন, "খবরটা ঠিক পাকা কি-না?"

আর্ত্তকণ্ঠে মমতাময়ী বললেন "দুঃসংবাদ কখনো মিথ্যে হয় না।"

"সে কথা ঠিক।" ব'লে জহরলাল একটা চেয়ারের উপর ব'সে পড়লেন।

মমতাময়ীর অবস্থা দেখে এবং প্রিয়লালের কথা শুনে জহরলাল বুঝলেন ঔষধ ক্রিয়াশীল হয়েচে। নিজের শুভ-বুদ্ধির প্রমাণে মনের মধ্যে একটা বিশেষ রকম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। ভাবলেন, যে দুষ্ট গ্রহ পুত্রকে এতদিন সংসারবিমুখ ক'রে রেখেছিল মৃত্যুর দ্বারা তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় এবার পুত্রকে সংসারী করা সহজ হবে।

কিন্তু দিন তিনেক পরে মমতাময়ীর নিকট হ'তে পুত্রের মানসিক অবস্থার ও সঙ্কল্পের পরিচয় পেয়ে আশঙ্কা হ'ল ঔষধ বুঝি সক্রিয় হয়ে বিপরীত ফলই ফলায়। অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে প্রিয়লাল সুদূর পশ্চিম দেশে যাত্রা করবার জন্য উন্মুখ হয়েছে।

মমতাময়ী বললেন, "আমি অনেক বুঝিয়ে দেখেছি, তাকে আটকানো যাবে না। কিছুদিন ঘুরে এলে হয় ত' তাকে সুস্থ মনেই ফিরে পাবে। আমি মা, আমি যখন বলছি তখন তুমি অমত করো না।"

জহরলাল কিন্তু শুধু মমতাময়ীর কথার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চেষ্ট থাকলেন না, নিজেও অনেক চেষ্টা করলেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য হার মানতেই হ'ল।

মাস দুয়েক পরে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে পি অ্যাণ্ড ওর সুবৃহৎ ষ্টিমারে প্রিয়লাল অধীর উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় নিয়ে সুদূরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলে।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৬

মাস ৪।৫ কেটে গেছে, ১৭ই অগ্রহায়ণ দাদার সঙ্গে মণ্টীর বিয়ে। সেই সময় কটা দিন খুবই উত্তেজনায় কেটেছিল। আমার সমস্ত প্রাণে উৎসাহ যেন আর ধরেনা। ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙ্গে যেত এবং মনে হত সারা দিনটা আমার সামনে কেবল আনন্দ আর আনন্দ—দুহাত দিয়ে কুড়িয়ে নিলেই হয়। বাড়ী ঘর দোর আত্মীয়স্বজনে ভরে গেছে, মফস্বল থেকে কত নতুন নতুন আমলা কর্ম্মচারী পাইক পিয়াদা এসেছে এবং বাসিবিয়ে ও ফুলশয্যার দিন আমাদেরই বার-বাড়ীর প্রাঙ্গণে কলকাতার বিখ্যাত প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রা হবে—ভাবতেও আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম।

মণ্টী আমার বোঠান হবে—ভাবতে প্রাণে যে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা এখন প্রায় কেটেই গেছে। বোঠান কে হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তখন আর বিবেচনার বিষয়ই ছিলনা। 'বোঠান' একজন হচ্ছে আর তাঁরই আগমনীর সুরে আমাদের বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠেছে—এইটেই হয়ে উঠেছিল আমার প্রাণের প্রধান উপভোগ। তবুও মাঝে মাঝে গভীরতম তলদেশ থেকে একটা ব্যথা কখনও যে উকি মারেনি এমন নয়। মুকুন্দর বোন মণ্টী না হয়ে যদি আর কেউ আমার 'বোঠান' হত তবে যেন এই উৎসবে আমি আরও মসগুল হয়ে উঠতে পারতাম। মণ্টীকে নিয়ে এত বড় উৎসবের আয়োজন ঠিক যেন শোভন হচ্ছিল না।

সে যাই হোক, মণ্টীর সঙ্গে, এই বিবাহ উপলক্ষে আমার যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল, আমি কিন্তু বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবং বোধহয় সেইদিনই আমার প্রাণের এই হতাশার দিকটা চিরকালের মত গেল কেটে—আমার আনন্দে ষোলকলা পূর্ণ হল।

বিবাহের দিন সকাল বেলা। দিনটাও মনে আছে বুধবার। তার আগের দিন শুনেছিলাম, কনের নৌকা বুধবার ভোর হতে না হতেই মুকুন্দদের ঘাটে এসে লাগবে। মঙ্গলবার সমস্ত রাত একটা উত্তেজনায় আমি ভাল করে ঘুমুতেই পারিনি।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি আমাদের সা চৌধুরী ঘরের ছেলেরা 'চলে' গিয়ে বিয়ে করেনা, কনে 'তুলে' আনে। অর্থাৎ আমাদের বংশের ছেলেরা নাকি কারও বাড়ী গিয়ে বিয়ে করে না, কনেকেই নিয়ে আসা হয় আমাদের বাড়ীতে এবং আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণেই বিবাহ হয়। আমাদের বংশের এই প্রথা তিন পুরুষ ধরে চলে আসছে। এই প্রথার জন্য আমাদের বংশের ছেলেদের বিবাহ ব্যাপারটা অতীতে অনেক সময়েই সহজ হয়নি। আমাদের ঘরের ছেলের জন্য অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে পাওয়া ত ছিল এক রকম অসম্ভব, এবং গরীব ঘরের মেয়েদের বাপেরাও অনেক সময় এ অপমান স্বীকার করতে নাকি রাজি হয়নি।

যাই হোক তবুও এ প্রথা ভাঙ্গবার নয়, অন্ততঃ রতন সার আমলে ত নয়ই।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন ভোর হতে না হতেই ছুটে আমাদের বাড়ীর পুকুরপারে গিয়ে মুকুন্দদের বাড়ীর নদীর

ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলাম। ভোরের আলোয় চারিদিক তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু আকাশে তখনও সূর্য্যদেব দেখা দেননি। মুকুন্দদের বাড়ীর সামনের দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পেলাম, বাবার মফঃস্বলে যাওয়ার সবুজ রংয়ের বজরাখানা মুকুন্দদের বাড়ীর সোজা নদীর ঘাটে বাঁধা রয়েছে। ঐ বজরাখনাই মণ্টীকে আনতে ত্রিচলায় গিয়েছিল। ইচ্ছে হল তখুনিই ছুটে গিয়ে মণ্টীকে একবার দেখে আসি। কিন্তু প্রচলিত প্রথার দিক দিয়ে সেটা উচিৎ হবে কিনা বুঝতে না পেরে পেছিয়ে গেলাম।

খানিকটা পরেই মুকুন্দ আমাদের বাড়ীতে এল। বল্লে "শান্তদা! চলনা বজরায়। মণ্টীর সঙ্গে দেখা করে আসবে।"

সেই দিনটাই বিয়ের দিন। এই দিনটার জন্য অন্ততঃ দাদা রাজা আর মণ্টী রাণী। তাই, মণ্টী, মুকুন্দর মামাত বোন মণ্টী, কতবার তাকে ছেলেবেলায় মুকুন্দদের বাড়ী দেখেছি—আজ তার সঙ্গে দেখা করা—সেটা যেন একটা মস্ত বড় ঘটনা। অনেক নিয়ম কানুন অনুমতি সাপেক্ষ। অতটুকু একটা মেয়ে তার আজ এত বড় প্রভাব—সারা মাধবপুর গ্রামটা তোলপাড় করে তুলেছে। ভোর হতে না হতে আমাকে বিছানা থেকে তুলে এনেছে পুকুর ঘাটে। আমাদের সারা বাড়ীটায় ভরিয়ে দিয়েছে একটা অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য।

তারই আগমনী সমানে বাজছে ঐ আমাদের বাড়ীর সামনে নহবতে। এই হেমন্তকালের সরস সকালটা, সোনার রোদ্দুরটুকু, ঐ গাঢ় নীল আকাশ—সবই যেন রূপে রসে গন্ধে ভরিয়ে দিয়েছে সেই একফোঁটা মেয়ে—মণ্টী। হঠাৎ এইসব ভেবে আমি যেন কেমন অবাক হয়ে গেলাম।

মুকুন্দ আবার বল্লে "চলনা শান্তদা! যাবে?"

আমি বললাম "মাকে একবার জিজ্ঞেস কর।"

মুকুন্দ বলল "কেন? এর আবার জিজ্ঞেস করব কি?"

আমি বললাম "কি জানি, হয়ত এখন বজরায় দেখতে গেলে মা রাগ করবেন।"

"আচ্ছা চল, জ্যাঠাইমাকে জিজ্ঞেস করি।"

এই বলে মুকুন্দ আমার হাত ধরে বাড়ীর ভেতরের দিকে ছুটল।

মা শুনে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। বল্লেন "বেশত, কিন্তু বেশীক্ষণ থেকনা।"

বাড়ী থেকে বেরিয়ে মুকুন্দ বললে "চল শান্তদা, এক কাজ করা যাক। তোমার গামছাখানা নিয়ে চল নদীতে একেবারে স্নান করে আসব।"

কথাটা মন্দ বলেনি। নদীতে স্নান করতে ছেলেবেলা থেকেই আমার অত্যন্ত ভাল লাগত। নদীর জলে নামলেই আমার সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠত, কেমন যেন একটা আনন্দ উপভোগ করতাম সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে—আজও মনে পড়ে। কিন্তু তবুও নদীতে রোজ স্নান সম্ভব হয়ে উঠত না, তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, আমাদের বাড়ীর সোজা নদীর ঘাটটা বাঁধান ছিলনা এবং মুকুন্দদের বাড়ীর সামনের বাঁধান ঘাটটাতে রোজই স্নান করতে যেতে কেমন যেন ভয় ভয় করত হয়ত বাবা রাগ করবেন। তাই মাঝে মাঝে মার অনুমতি নিয়ে যে দিনই যেতাম, স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে অঙ্গের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে একটা অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ মাখিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতাম—ভাবতে আজও শরীর শিউরে ওঠে। বললাম "তা মন্দ বলিস্ নি। তাই চল্, মাথায় একটু তেল মেখেনি।"

আমি ও মুকুন্দ ছুটে বাড়ীর ভিতর গিয়ে, দুজনেই মার ভাঁড়ার থেকে মাথায় খানিকটা সরষের তেল বুলিয়ে নিয়ে, গামছাটা কাঁধে ফেলে ছুটলাম মুকুন্দের বাড়ীর ঘাটের দিকে। অন্দরমহল থেকে বেরুবার সময় উঠান হতেই মাকে চেঁচিয়ে বলে এলাম, "মা!—অমনি আমি নদীতে নেয়ে আসব।" উত্তরের অপেক্ষাও করিনি।

কথাটা মা শুনলেন কিনা জানিনা, কেন না মা ঠিক চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন না। কিন্তু আজ যে আমার প্রাণ আনন্দে উৎসাহে ভরা—ভয় ডরের কোন ঠাঁই ছিল না সেখানে।

দুজনে হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছি—কিন্তু বজরার কাছাকাছি এসেই, কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। খালি গায় ছিলাম; কখন যে ধুতিটা ঘুরিয়ে গায় জড়িয়ে নিয়েছি নিজেই টের পাইনি।

মুকুন্দকে বললাম "মুকুন্দ! মণ্টি হয়ত বজরায় নেই, তোদের বাড়ী গেছে।"

মুকুন্দ বল্‌ল "না শান্তদা। মণ্টী বজরাতেই আছে। রাঙামামা সকালে উঠেই বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমি ত সেখানেই ছিলাম। মণ্টী আজকের সমস্ত দিনটা নাকি বজরাতেই থাকবে। মা নেমে উঠে মন্দির কাছে যাবেন।"

ঘাটের কাছে গিয়ে দেখি বজরার সিঁড়ি পাতা রয়েছে। মুকুন্দ হন্ হন্ করে উঠে গেল, আমিও তার পেছন পেছন গিয়ে বজরায় উঠলাম। আমাদেরই একটা লম্বা চওড়া হিন্দুস্থানী বুড়ো বরকন্দাজ—মাথায় তার সাদা রংএর মস্ত পাগড়ী, গায় একটা লম্বা গাঢ় নীল রংয়ের কোট এবং তার কাঁধে ও হাতে রুপালী জরীর কাজ, হাতে একটা মস্ত লম্বা লাঠি নিয়ে বজরার সামনে দাঁড়িয়ে, বোধ হয় বজরা পাহারা দিচ্ছিল। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল "কি দাদাবাবু! বহু দেখতে এলেন।"

কথাটা শুনে বড় লজ্জা হল। লোকটার উপরে রাগও হল খুব। ভারী অসভ্য ত—বহু, বহু বলে চেঁচায় কেন। ও কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মুকুন্দর পিছু পিছু বজরার ভিতরে ঢুকলাম।

মুকুন্দ ঢুকেই বলে উঠল—"কি গো! মণ্টি বোঠান! তোমার দেওর তোমায় দেখতে এসেছে।"

বজরায় দুটী কামরা। একটি সামনে একটি পিছনে। সামনের কামরাটীর দুপাশে তিনটী তিনটী ছটী জানালা খোলা রয়েছে এবং জানালাগুলির নীচেই দুপাশে টানা টানা দুটী বেঞ্চ। মাঝখানে পাটাতনের উপর সতরঞ্চের ফরাস পাতা। পিছনের ঘরটী শোবার ঘর।

মণ্টী বোধহয় নীচেই সতরঞ্চের উপর শুয়ে ছিল। হঠাৎ আমাদের দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার মুকুন্দর সঙ্গে চোখোচোখি হওয়া মাত্র তড়িৎ চাহনিতে আমার দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। একটা দুষ্ট হাসি যে এক নিমিষে তার চোখে মুখে খেলে গেল সেটুকু কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি।—একটা বুড়োঝি, মণ্টীর বাপের বাড়ীর লোক, বোধহয় মণ্টীর পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, সেও আমাদের দেখে জড়সড় হয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল, চেয়ে রইল বাইরের দিকে।

মুকুন্দ গিয়ে বেঞ্চির উপর বসে মণ্টীকে ডাকলে "আয়! বোস।" মণ্টী ধীর পদক্ষেপে একটু এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চির এক কোণে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরাল। মুকুন্দ আমাকে ডেকে বল্‌ল—"বস শান্তদা।"

মুকুন্দর ভাব দেখে মনে হল সেই যেন বজরার সর্ব্বময় বুড়ো কর্ত্তা।

মণ্টীর দিকে দু-এক বার চেয়ে দেখলাম। বেশ লাগল মণ্টীকে আজ আমার চোখে।—একখানা গাঢ় নীল রংয়ের সিল্কের সাড়ী তার পরিধানে, মাথায় এক মাথা চুল, এখনও স্নান করেনি—খোলা রয়েছে, সামনে কপালের উপরে সঁাথির দুপাশে একটু উস্কখুস্কু ভাবে ছড়ান। গায়ের রং যতটা কাল মনে মনে ভেবেছিলাম, ততটাত নয়ই বরং হঠাৎ যেন আমার ফর্সা বলেই মনে হল। সুগোল বাহুযুগলের মধ্যেই শুধু নয়, সারা অঙ্গেই একটা পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের সুমধুর বিকাশ—প্রথম যৌবনের সদ্যপরশে লাবণ্যময়ী। চোখ দুটী বড় বড় না হলেও চোখে মুখে দেখেছিলাম একটা প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি—একটা দুষ্ট চাপা হাসির মধ্যে সমস্ত মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশেষ লক্ষ্য করে দেখলে কোনও অঙ্গের মধ্যেই প্রশংসা করার বিশেষ কিছু না থাকলেও, মণ্টীকে দেখতে ভালই লাগে, অবহেলা করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া চলেনা।

আমি বোধ হয় এই ধরণেরই কিছু একটা ভাবছিলাম, হঠাৎ মুকুন্দ বল্‌ল "বেশ ত শান্তদা! চুপ করে রইলে যে? আলাপ করতে এসেছ—কথা কও।"

ভাবলাম মুকুন্দ ত ঠিকই বলেছে। কথা ত আমারই কওয়া উচিত। কথা কইচিনা—মণ্টী ভাবছেই বা কি! হয়ত ভাবছে একটা আস্ত বোকা।

কিন্তু কি বলি তাও ত ভেবে পাচ্ছিনা। অগত্যা চুপ করেই থাকতে হল।

মুকুন্দ বলল "এইবার মণ্টীকে ত তোমায় প্রণাম করতে হবে শান্তদা। জান ত মণ্টী আমার চাইতেও দুমাসের ছোট।"

আমি বল্লাম "তা কি হয়েছে। সম্পর্কে ত বড়।"

মুকুন্দ বলল "সে ত আমারও। তাই বলে আমি ওকে প্রণাম করব নাকি—ইস্।"

লক্ষ্য করেছিলাম মণ্টীর ঠোঁটে একটু ঈষৎ হাসি খেলে গেল।

হঠাৎ মুকুন্দ আবার জিজ্ঞেস করল "বলত শান্তদা—মণ্টীর ভাল নাম কি?" খবর্দ্দার, বলিস্‌নি মণ্টী।"

বললাম "আহা! তা যেন আর জানিনা। "উমা—"

মুকুন্দ বোধহয় আশ্চর্য্য হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে "কি করে জানলে? ওর ভাল নাম ত ওর বাবা মা আর আমি ছাড়া কেউ জানেনা।"

এইবার মণ্টীর সামনে নিজের একটু বাহাদুরি দেখাবার সুযোগ হল। বললাম—

"আমি যে গুণতে জানি। লোকের মুখ দেখে তাদের নাম বলে দিতে পারি—জানিস্‌।"

মুকুন্দ একটু কি ভাবলে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে—

"সবাই ত 'মণ্টী' বলেই জানে, 'উমা' নামটাত কেউই জানেনা। কে বলেছে বলনা শান্তদা।"

একটু হেসে বললাম—

"বলেছি ত গুণতে জানি।"

মুকুন্দ মণ্টীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—

"কে বলেছে বলত?—কেউত জানেনা।"

মণ্টীর দিকে চেয়ে দেখি মণ্টী ওপরের ঠোঁট ও দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে বাইরের দিকে চেয়ে আছে, চোখ দুটি ভরিয়ে দিয়েছে একটা চাপা হাসিতে।

মুকুন্দ নিজের মনেই বলতে লাগল—

"তা তুই কি করে জানবি! তোর সঙ্গে ত এই প্রথম দেখা। সকাল থেকে ত রাঙামামার সঙ্গেও দেখা হয়নি।"

বললাম "বিশ্বাস হচ্ছে না আমি গুণ্‌তে জানি। আমার যে কত বিদ্যে বুঝতে তোর অনেক দেরী।"

মুকুন্দ বলল "যাও, যাও চালাকী করোনা। গুণ্‌তে জান, না ছাই।"

বললাম "তবে বলনা কি করে জানলাম! বল দেখি? কেউ ত জানে না অথচ আমি জানি—দেখলিত।"

মনে মনে ভাবছি আমার বাহাদুরী ষোল আনা ছাড়িয়ে আঠারো আনা প্রমাণ হয়ে গেল। মুকুন্দ ত মুকুন্দ মণ্টীও নিশ্চয় অবাক হয়ে গেছে আমার বুদ্ধির দৌড় দেখে। মুকুন্দর দিকে চেয়ে দেখি মুকুন্দ বোকার মত চেয়ে আছে। আত্মপ্রসাদে আমার মনটা ভরে গেল। সগৌরবে পরাজিত মুকুন্দের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কেমন—বিশ্বাস হল?"

মুকুন্দ বোধ হয় কাতরভাবে মণ্টীর দিকে চেয়েছিল। মুকুন্দর দুর্দশায় মণ্টীর বোধ হয় মুকুন্দর উপর দয়া হল, আস্তে বললে "নেমন্তন্ন চিঠি।"

মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল। আমাকে কেউ বোধহয় পাহাড়ের উপর থেকে নীচে সজোরে দিল ফেলে।

* * *

খানিকক্ষণ পরে আমি আর মুকুন্দ যখন স্নান করবার জন্য নদীর জলে নামলাম চেয়ে দেখি মণ্টী বজরার জানালা দিয়ে ঘাটের দিকেই চেয়ে আছে। হঠাৎ উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে উঠল। চিৎসাঁতার, ডুব সাঁতার—সাঁতারের নানান্ রকম বাহাদুরী, যত রকম আমার জানাছিল, আজ যেন তার পরীক্ষা দিতে এসেছি। নদীটা সাঁতরে পারই হলাম পাঁচ-সাত বার। মুকুন্দকে টেনে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম বজরার জানালার দিকে।

* * *

সেদিন রাত্রে শুভ লগ্নে মণ্টীর সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত

830228

জর্জ্জ টমাস

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ বি-এল পি-আর-এস্‌

যুদ্ধ হিসাবে জর্জ্জগড় অমীমাংসিত হইলেও যুদ্ধের পর সকল সুবিধা টমাসের দিকে ছিল। তিনি যদি এই সময় করায়ত্তপ্রায় সুযোগের সদ্ব্যবহারে তৎপর হইতেন-তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সাফল্যলাভ করিতেন। স্কিনারও প্রকারান্তরে সে কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছেন, 'আমরা বরাবরই টমাসকে সাহসী, সুচতুর, কর্ম্মক্ষম, সুদক্ষ যোদ্ধা বলিয়া জানিতাম। কিন্তু পক্ষকালের মধ্যেও তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করিবার অথবা হান্সিতে আশ্রয় লইবার কোন চেষ্টা করিলেন না দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ঐ দুইটি কার্য্যের মধ্যে তিনি যেটা করিতে চাহিতেন তাহাতেই যে সফলকাম হইতেন সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তখন আমাদের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে তিনি আমাদের দিকে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা দেখাইবামাত্র আমরা সে স্থান হইতে পলাইতাম। আমাদের অধিনায়ক মেজর লুই বুর্কুয়াঁ যে শুধু কাপুরুষ ছিলেন তাহা নহে; তিনি মহামূর্খও ছিলেন। যে সকল লোক শুধু তোষামোদের জোরে উঠে, তিনি তাহাদের অন্যতম ছিলেন। মেজর বার্নিয়ে না থাকিলে আমাদের নিশ্চয়ই পরাজয় ঘটিত। সাহসী ও সুদক্ষ মেজর বার্নিয়ের জন্যই আমরা সমূলে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। কারণ যুদ্ধের মধ্যে কেহ একবারও বুর্কুয়াঁকে দেখিতে পায় নাই, যুদ্ধারম্ভের সহিত তিনি দূরে পশ্চাতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং যতক্ষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল একবারও তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিপজ্জনক স্থানে দেখা দেন নাই।" স্মিথ আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন "টমাস যদি বুর্কুয়াঁর অজ্ঞতা এবং বুদ্ধিহীনতার সুযোগ গ্রহণে তৎপর হইয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সেনাদলকে আক্রমণ করিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহাদের ধ্বংস করিয়া পেরঁর সকল শক্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু বিগত সমরে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইলেও জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে টমাস কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যদি এই সময় নিজ অভ্যস্ত সাহস তৎপরতা এবং সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতেন তাহা হইলে শত্রুর সৈন্যদল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইত। পেরঁর বাহিনীতে টমাসের যে সকল বন্ধু ছিলেন তাঁহারা আর নির্লিপ্ত না থাকিয়া প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতেন; এবং তিনি অপর একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই টমাস দিল্লী এবং তৎসহিত বাদসাহকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সকল আধিপত্য চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সিন্ধিয়ার পক্ষ হইতে টমাসকে ঐ আধিপত্য প্রদানে কোন আপত্তি হইতনা, কারণ তাঁহার নামে হিন্দুস্থানে যে কেহ শাসন করুক না কেন, বাধাদানে অক্ষমতা বশতঃ তাহাতে তাঁহার উদাসীন থাকা এবং শিক্ষিত বাহিনীর অধিনায়ক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যে কোন সৈনিককে স্বীকার করিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না।"

কিন্তু জীবনের এই পরম সুযোগ টমাস হেলায় হারাইলেন। স্কিনারের কথাই সত্য। তিনি কয়েকদিন ধরিয়া অপরিমিত মাত্রায় মদ্যপানে বিভোর হইয়া শিবির মধ্যে রহিলেন,—সে সময়ের মধ্যে না দিলেন সিপাহীদিগকে একবার দেখা, না করিলেন যুদ্ধের কোন ব্যবস্থা। কেহ কেহ বলেন যে হপকিন্সের শোক চাপা দিবার জন্য তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন; আবার আর এক মতে বিষম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও অবসাদের জন্য তিনি সুরাদেবীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক। এই কয়দিনের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই পরিণামে যে অত শীঘ্র তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সময় টমাস বোতলবাহিনীর অর্চ্চনা করিতে-

25,228

ছিলেন সে সময় যুদ্ধের সকল ভার তাঁহার অবশিষ্ট দুইজন ইউরোপীয় অফিসর বার্চ্চ ও হিয়ার্সের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের কোন সামরিক যোগ্যতা ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহারা জর্জ্জগড়ে আত্মরক্ষা করিবার আয়োজন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে হান্সীতে আশ্রয় লওয়া ইঁহাদের উচিত ছিল। উহা টমাসের সমরসম্ভারের ডিপো ছিল, সেখানকার সুদৃঢ় দুর্গ দীর্ঘকাল প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করা সম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে জর্জ্জগড় একটি খোলা ক্যান্টন-মেণ্ট মাত্র ছিল, সেখানে আত্মরক্ষার কোন সুবিধা ছিল না। এইরূপে অমূল্য সময় যখন টমাস ও তাঁহার সহকারীদ্বয় হেলায় হারাইতেছিলেন তখন শত্রু সৈন্য চারিদিক হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে সমবেত হইতেছিল। বুর্কুয়্যাঁর ব্যর্থতায় পেরঁ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং "জগদীশ্বর জানেন, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই" তাঁহার এবম্বিধ শপথ সত্ত্বেও তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্ণেল এডওয়ার্ড পেদ্রঁকে তাঁহার স্থলে সেনাপতিত্ব দিয়াছিলেন। আলিগড় হইতে তাঁহার নিজের পাঁচ এবং আগ্রা হইতে হেসিঙ্গের পাঁচ ব্যাটালিয়ন নূতন সৈন্য লইয়া তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তদ্ভিন্ন দিল্লী হইতে ড্রুজিঁয় (Drugeon), সাহারাণপুরের ফৌজদার বাপু সিন্ধিয়া, ভরতপুরের ও হাথরাসের রাজারা, টমাসের পুরাতন শত্রু শিখরা সকলেই সৈন্য সাহায্য পাঠাইলেন। এইরূপে মোট ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং ১১০টী তোপ লইয়া পেদ্রঁ টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার বিশাল বাহিনীর ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের কৃষককুল, টমাসের প্রজারা,—তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল এবং পূর্ব্ববৎ দুর্গরক্ষীদের জন্য রসদ সংগ্রহকার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিল।

এতকাল পরে টমাসের চমক ভাঙ্গিল। তিনি আবার সজীব হইয়া উঠিয়া স্বহস্তে যুদ্ধভার লইলেন। কিন্তু তখন সকল সুযোগ অন্তর্হিত হইয়াছিল, তখন নিতান্ত অসময়। টমাস শীঘ্রই বুঝিলেন যে তাঁহার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর উন্মুক্ত প্রান্তরে শত্রুর সহিত বল পরীক্ষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, নিজ আশ্রয় মধ্যে থাকিয়া সাধ্যমত আত্মরক্ষা করা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে অপর কোন পথ নাই। রসদের হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে দুর্গ মধ্যে যে আহার্য্য আছে তাহাতে কোন মতে এক মাস চলিতে পারে। লকবা দাদা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে শীঘ্রই তিনি তাঁহার সাহায্যকল্পে আসিতেছেন। তিনি যতদিন না আসিয়া দেখা দেন ততদিন কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া কাটাইয়া দিবেন স্থির করিয়া টমাস তাঁহার আগমন পথ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু দাদা নিজেই তখন অম্বাজীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় বিষম বিব্রত, ঘোর বিপন্ন ছিলেন। টমাসকে কোন রূপ সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

অতঃপর জর্জ্জগড় অবরোধ আরম্ভ হইল। তাহার দীর্ঘ বিবরণ অনাবশ্যক। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল। লকবার কোন সংবাদ নাই। টমাসের রসদ হ্রাসপ্রাপ্তি ব্যতীত আর কোন লাভ হইল না। শত্রুসৈন্য ক্রমশঃ চারিদিক হইতে দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল; কোন দিকে আর কোন ফাঁক রহিল না। তাহাদের অশ্বারোহীগণের জন্য অবরুদ্ধদিগের আর বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া সম্ভব ছিলনা। বিপদের পর বিপদ, দুর্গের কূপগুলিও নিঃশেষ-প্রায় হইয়া আসিল। ক্রমে সৈনিকগণের প্রভুভক্তিতে ভাঙ্গন ধরিল। বিপক্ষের তুলনায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তন্মধ্যে আবার যাহাদের প্রতি তিনি পূর্ণ প্রত্যয় করিতে পারিতেন তাহারা সংখ্যায় দুই হাজারের বেশী ছিল না। তাঁহার পুরাতন অনুচর ও সকল সুখ দুঃখের সাথী হপকিন্সের ব্যাটালিয়ন ও রাজপুত-গণ শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুর কার্য্যসাধন-রত ছিল। অপরাপর সৈনিকগণ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে সংগৃহীত হইয়াছিল এবং তাহারা যে প্রদেশের অধিবাসী ছিল তাহা শত্রুর হস্তগত হওয়ার ফলে তাহাদের পরিবারবর্গ উহাদের সদাচরণের জামীনস্বরূপে ধৃত হইয়াছিল। এ অবস্থায় কয়জন অবিচল ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে? পেরঁ লব্ধ সুযোগের সদ্ব্যবহারে বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার চরগণ দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৈনিকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। জর্জ্জগড়ের কিল্লাদার সাতাব খাঁ এবং ১ম সংখ্যক রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষ খয়রাৎ খাঁ পেরঁর জায়গীরের অধিবাসী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার আদেশে তাঁহাদের পরিজনবর্গকে নজরবন্দী

করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং উঁহাদের দুইজনকে জানান হইয়াছিল যে টমাসকে পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং উঁহাদের বেইজ্জৎ করা হইবে। টমাসের অনুচরবৃন্দকে ভাঙ্গাইবার জন্য উৎকোচ, ভীতি-প্রদর্শন, প্রতিশ্রুতি প্রদান ইত্যাদি সর্ববিধ উপায় অকুণ্ঠিতভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য অনেকেই এ প্রলোভন কাটাইতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল টমাসের নিজ হাতে গড়া মানুষ। সামান্য অবস্থা হইতে "জাহাজী সাহেবে"র জন্যই তাহারা উচ্চপদ, মানগৌরব ও অর্থলাভে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিপদের সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে তাহাদের এতটুকুও বাধিল না। দুর্গ মধ্যে প্রতি রাত্রে রসদের গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে লাগিল। স্বল্প পুঁজি শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া গেল। মনুষ্য বা গবাদি পশু কাহারও কোন আহার্য্য আর রহিল না। পেঁত্র দুর্গের ভিতরকার সকল সংবাদই চরমুখে পাইতেছিলেন। ২৩শে অক্টোবর তারিখে তিনি নিজ শিবির হইতে অদূরে একটি পতাকা উত্তোলন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে কেহ তথায় আশ্রয় লইবে তাহার প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ দেখান হইবে। সেই রাত্রে টমাসের দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য দুর্গ হইতে তথায় পলায়ন করিল। কয়েক দিনের মধ্যে সরিফ খাঁ হাসজা খাঁ, খয়রাৎ খাঁ, আলি গুল প্রমুখ সেনানায়কগণ স্ব স্ব অনুচরবৃন্দ সহ একে একে তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন।

এত বিপদেও টমাস ধৈর্য্য হারাইলেন না। সৈনিকদিগের নিরুদ্যম-চিত্তে নানা আশ্বাস বাক্যে উৎসাহ সঞ্চার করিয়া তিনি যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬ই নভেম্বর তারিখে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য নৈশান্ধকারে অতর্কিতে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গমধ্যে বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিলনা। পূর্ব্বাহ্নে সকল সংবাদ পাইয়া শত্রুসেনা তজ্জন্য প্রস্তুত ছিল। ফলে টমাস পরাজিত ও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় অবরুদ্ধ দুর্গবাসীদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। দুর্গমধ্যে আহার্য্য ও পানীয়ের বিষম অনটন ঘটিয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়া দুর্গবাসীগণ যাবতীয় গবাদি পশুর বধসাধন করিয়া শুধু মাংস খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। ফলে ঐরূপ খাদ্যে অনভ্যস্ততাবশতঃ উঁহাদের মধ্যে অনেকে বিষম উদরাময় ও রক্তাতিসারে আক্রান্ত হইয়াছিল। গোলা গুলি বারুদেরও অপ্রাচুর্য্য ঘটিয়াছিল। নিতান্ত সাহসী ব্যক্তিও হয়ত এমন অবস্থায় এ অসমান সমর পরিত্যাগ করিত। তাহাতে লজ্জা বা অপযশের কিছু ছিল না। কিন্তু টমাসের প্রকৃতি সেরূপ ধাতুতে গড়া ছিলনা, এ অবস্থাতেও আত্মসমর্পণের চিন্তা একবারের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া হান্সিতে আশ্রয় লইয়া পুনরায় নবীন উদ্যমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা সমর পরিষদের অধিবেশনে টমাস তাঁহার কর্মচারীদিগকে সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব কেহই সমর্থন করিল না; সকলে এক বাক্যে বলিল যে বিনাসর্ত্তে শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন আর করিবার কিছু নাই। তখন টমাসও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে "চারিদিকে ভীষণ নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃশ্য ব্যতীত কোথাও আশার ক্ষীণ আলোকও দেখা যায় না।" এমন সময় টমাসের নিকট সংবাদ আসিল যে দুর্গরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রোহিলা সৈনিকগণ শত্রুর আশ্রয়ে পলায়ন করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই টমাস দেখিলেন যে তাঁহার মুসলমান সৈনিকগণের মধ্যে পলায়ন প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; সকলেই আত্মপ্রাণ বাঁচাইতে তৎপর; যে যেদিকে পারে পলায়ন আরম্ভ করিয়াছে। তাহার অল্পপরেই সংবাদ আসিল যে পেঁত্র দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শেষ খড়ের গাদায় আগুন লাগিল। সাতার খাঁ শত্রু পক্ষের সহিত উক্ত সঙ্কেতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লেলিহান অগ্নিশিখায় যখন অর্দ্ধনৈশ গগন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে তখন টমাস শুনিলেন যে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কিল্লাদার সদল বলে শত্রু শিবিরে যাইবার অভিপ্রায়ে অশ্বারোহণ করিতেছেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইবার জন্যও পরিত্যক্ত স্থানসমূহ অধিকার করিবার জন্য একদল মারাঠা সৈন্যও প্রাচীরের অদূরে আসিয়া দেখা দিয়াছে। টমাস দেখিলেন আর বড় জোর এক ঘণ্টা, তাহার পর দুর্গ বিপক্ষের করায়ত্ত হইবে।

তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই পলায়ন করিবার জন্য তিনি তাঁহারা অবশিষ্ট দুইজন অফিসর বার্চ্চ ও হিয়ার্সে এবং দুইজন ইউরোপীয় সার্জ্জেন্ট ও তিনশত অশ্বারোহী সৈনিক সহ দুর্গ হইতে বাহির হইলেন। তখন রাত্রি নয় ঘটিকা (১০।১১।১৮০১)। কর্ণেল জর্জ্জ হেসিঙ্গের সৈন্যগণ যে দিকে ছিল তিনি সেই পথে গিয়াছিলেন এবং তাহারা ব্যাপারটা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম কবিবার পূর্ব্বেই ব্যূহভেদ করিয়া দ্রুত-বেগে বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারা অধিক দূর যাইবার পূর্ব্বেই বিপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনী তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং শীঘ্রই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তীব্র আক্রমণ টমাসের মুষ্টিমেয় নিবীর্য্য সৈনিকগণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই মহাজন বাক্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। শুধু টমাস এবং অপর চারিজন উইরোপীয় কোন মতে একত্রে থাকিতে সমর্থ হইলেন। শত্রুহস্তে ধৃত হইবার ভয়ে তাঁহারা সোজা পথে হান্সী যাইতে সাহস না করিয়া দীর্ঘপথ ঘুরিয়া নৈশান্ধকারে পাপাপাশি অশ্ব পরিচালন করিতে লাগিলেন। জর্জ্জগড় হইতে হান্সীর দূরত্ব ষাট মাইলের অধিক হইবে না; কিন্তু তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদিগকে ইহার প্রায় দ্বিগুণ পথ পাড়ি দিতে হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট একটি পারস্য দেশীয় অশ্বপৃষ্ঠে টমাস অধিরূঢ় ছিলেন। অশ্ববর কোথাও একবারও না থামিয়া ২৪ ঘণ্টারও কম সময় মধ্যে এই দীর্ঘপথ প্রভুকে বহন করিয়া ১১ই নভেম্বর সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে রাজধানীতে পৌছাইয়া দিয়াছিল। *

হান্সিতে পৌছিয়া টমাস আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মুসলমান সৈনিকদিগের বিশ্বাসঘাতকতা হইতে তিনি যে বিষম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ফলে এবারে আর উহাদিগের হস্তে দুর্গ রক্ষাভার না দিয়া ঐ কার্য্যে রাজপুত-দিগকে নিযুক্ত করিলেন। দুর্গ মধ্যে কার্য্যক্ষম মাত্র দুইটি তোপ ছিল। কয়েক দিনের মধ্যে আরও আটটি নূতন তোপ তিনি ঢালাই করিয়া ফেলিলেন। সহর হইতে কয়েক মাইল দূর পর্য্যন্ত যাবতীয় কূপ ও পুষ্করিণী ভরাট অথবা গো শূকর মাংস যোগে অপবিত্র করা হইল। নগরপ্রাকার আরও সুরক্ষিত করা হইল। তজ্জন্য টমাস কুতব (অথবা দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী), হিসার (অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখী), ও বারসি (অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখী), প্রবেশ পথের সম্মুখে তিনটী সুদৃঢ় ফাঁড়ি নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এই সময় কত ছিল তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ অসম্ভব। তিনি নিজে তাহা মাত্র ১২০০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্কিনার তাহা পাঁচ হাজারেরও অধিক বলেন। কিন্তু সর্ব্বত্র যেমন স্কিনারের কথা এখানেও অত্যুক্তি দোষদুষ্ট। সে যাহা হউক, রাজপুত-গণ ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি টমাসের আর আস্থা ছিলনা। তিনি এক্ষণে সে জন্য দুর্গ মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন এবং রাত্রে যথোচিত প্রহরীর বন্দোবস্ত না করিয়া শয়ন করিতেন না।

ইতোমধ্যে বুর্কুয়াঁ হান্সি অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জর্জ্জগড় যুদ্ধের পর পেঁরো তাঁহাকে সৈন্যদলের ভার পুনঃপ্রদান করিয়া আলিগড়ে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি হান্সীতে আসিয়া পৌছিলেন। প্রথমটায় তিনি তোপখানার সাহায্যে দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইতেছে না, দুর্গের মৃৎপ্রাচীর গাত্রে গোলা সমূহ কোন ক্ষতি না করিয়া প্রোথিত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি অতঃপর কামান দাগা বন্ধ করিয়া সম্মুখ আক্রমণে দুর্গ অধিকারের আদেশ দিলেন। সে জন্য প্রবেশ পথের সম্মুখবর্ত্তী ফাঁড়ি তিনটী সর্ব্বপ্রথম দখল করা আবশ্যক ছিল। ২১ শে নভেম্বর তাঁহার সৈন্যদল তিন অংশে বিভক্ত হইয়া আক্রমণে অগ্রসর হইল। কাপ্তেন জেমস স্কিনার, মেজর অগুস্ত্যাঁ বার্ণিয়ে এবং লেফ্‌টেনাণ্ট রবার্ট ম্যাকেঞ্জি যথাক্রমে উহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। যেরূপ সহজে স্কিনার ও ম্যাকেঞ্জি তাঁহাদিগের আদিষ্ট কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে টমাস উহার মূলে বিশ্বাসঘাতকতা ছিল বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বার্ণিয়ের দলকে সবিশেষ বাধা পাইতে হইয়াছিল। তাহাদের সম্মুখীন শত্রুসেনা

* এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে তাঁহার পতনের পর বৃটিশ রাজত্বে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরে টমাস অম্বুপসহরের রেসিডেন্ট সার ফ্রেডারিক হামিল্টনকে ঘোড়াটী উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার আস্তাবলে দীর্ঘকাল পেন্সনভোগী হইয়া অশ্বটী জীবিত ছিল।

মহাবীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিহত করিল। ছত্রভঙ্গ সৈনিকদিগকে সম্বদ্ধ করিতে গিয়া স্বয়ং বার্ণিযে প্রাণ হারাইলেন। অধিনায়কের পতনে মহাক্রোধে সৈন্যগণ শত্রুকে পুনরাক্রমণ করিল এবং অচিরে তাহাদের উপ-দুর্গ অধিকার করিয়া তত্রস্থ যাবতীয় ব্যক্তির প্রাণসংহার করিল।*

অতঃপর বুর্কুর্যা দুর্গ অধিকারে সচেষ্ট হইলেন। কয়েক-দিনের মধ্যে গোলন্দাজদল ঐ তিন স্থানে তাহাদের তোপমঞ্চ বসাইল। তাহাদের প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টিতে কয়েক দিনের পর দুর্গ প্রাচীরের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সৈন্যগণ পূর্ব্ববৎ তিন অংশে বিভক্ত হইয়া দুর্গ আক্রমণে ছুটিল। ইহাই ঐতিহাসিকের নিকট "Grand assault on Hansi' নামে পরিচিত। স্কিনার ৩রা ডিসেম্বর উহার কালনির্দ্দেশ করিলেও বার্ণিযের সমাধিলিপিমতে উহা ১০ই তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। স্কিনার, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবার্ট স্কিনার এবং রবার্ট ম্যাকেঞ্জি আক্রমণকারী দল তিনটীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বার্চ্চ, হিয়ার্সে ও এলিয়াস বেগ যথাক্রমে ইহাদের বাধাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রবার্ট স্কিনার বা ম্যাকেঞ্জিকে বিশেষ কোন বাধা পাইতে হয় নাই। কিন্তু বার্চ্চ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমাগত সৈন্যগণকে দুইবার বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে স্কিনার স্বয়ং বলিয়াছেন "আমার সৈন্যদল বার্চ্চ কর্ত্তৃক বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। জলন্ত খড়ের চালা, বারুদের পাত্র, হাতের কাছে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা লইয়াই তিনি আমাদিগকে দুই বার প্রতিহত করিয়াছিলেন। পরিশেষে আমি প্রাচীরের উপর উঠিয়াছিলাম এবং সেই সময় দেখিলাম যে প্রায় ২০ গজ দূর হইতে বার্চ্চ একটি দোনলা বন্দুক লইয়া আমার প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিতেছেন। আমার এক বিদ্যালয়ের পুরাতন সহপাঠীর নিকট হইতে এ ধরণের সম্বর্দ্ধনা পছন্দকর না হওয়ায় আমি আমার হস্তস্থিত বর্শা তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তাহার আঘাতে বার্চ্চের মাথা হইতে টুপি খসিয়া পড়িয়া গেল এবং তাঁহার লক্ষ্যও ভ্রষ্ট হইল। তখন তিনি দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ আগেই পলাইয়াছিল। আমরা প্রায় দুর্গদ্বার অবধি তাহা-দিগকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া গেলাম। সহসা দ্বার খুলিয়া গেল এবং ভিতর হইতে একজন ইউরোপীয় সৈনিক নিক্রান্ত হইলেন। উত্তোলিত দুই বিশাল বাহুর উপরি-দেশে তাঁহার জামার হাত গোঁজা ছিল; তাঁহার এক হস্তে একটি ঢাল ও অপর হস্তে প্রকাণ্ড একটি তরবারী শোভা পাইতেছিল। তাঁহাকে এরূপ ভীষণ দেখাইতেছিল যে বাবে-কের ভয়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র করিয়াই আমি ফিরিয়া পলায়ন আরম্ভ করিলাম। আমার সিপাহীরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়াছিল। আমি অধিকাংশ ব্যক্তির সম্মুখীন হইতে অসমর্থ নহি, কিন্তু উহাঁকে তখন এরূপ ভয়ঙ্কর দেখা-ইতেছিল যে আমি বাস্তবিকই ভয় পাইয়াছিলাম।" *

* স্কিনারের আত্মচরিতে এই ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সে কথা সত্য বলিয়া মনে করিবার পক্ষে প্রধান বাধা এই যে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হাঁসির অদূরে পূর্ব্বোক্ত বারসি গ্রামে বার্ণিযের যে ভগ্ন সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ফলকলিপি হইতে জানা যায় যে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে হাঁসির মূল দুর্গ আক্রমণ করিবার কালে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। স্কিনারের কথাই ঠিক এবং সমাধিলিপির কথা সত্য নহে কেহ কেহ মনে করিলেও কিন্তু শেষোক্ত প্রমাণ অত সহজে বাদ দেওয়া চলে না। ঘটনাবলীর দীর্ঘকাল পরে স্কিনার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সব কথা যথাযথভাবে তাঁহার মনে না থাকাই সম্ভব। তাঁহার আত্মচরিতে যে বহু ভ্রমপ্রমাদ অতিবঞ্জন স্থান পাইয়াছে সে কথা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে।

* বার্চ্চের প্রথম জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। স্কিনার তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সতীর্থ বলা হইতে মনে হয় তাঁহারা উভয়ে সমবয়স্ক ছিলেন। স্কিনারের বয়স এই সময় ২৩ বৎসর ছিল। জর্জ্জগড় ও হাঁসির যুদ্ধে তিনি টমাসকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। টমাসের পতনের পর তিনি সিন্ধিয়ার কর্ম্ম লইয়া ছিলেন। মারাঠা-দিগের সহিত ইংরাজ গভর্ণমেন্টের যুদ্ধ বাধিলে সিন্ধিয়ার সেনাদল-ভুক্ত যে সকল বৃটিশ জাতীয় সৈনিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের আশ্রয় লওয়ার জন্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বার্চ্চ নামক একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। একজন মাসিক ৩০০৲ এবং অপর জন ২০০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বক্ষ্যমান ব্যক্তি কোনটী নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। দিল্লী ইংরাজ-দিগের হস্তগত হইলে কর্ণেল অক্টারলোনির প্রতি নগর রক্ষার ভার প্রদত্ত হয়। তাঁহার অধীনে দুই ব্যাটালিয়ন অনিয়মিত সেনার

এইরূপে শত্রুসেনা যখন তিন বিভিন্ন স্থান হইতে নগর প্রাকার অধিকার করিয়া টমাসের সৈন্যগণকে দুর্গমধ্যে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন টমাস নূতন সৈন্য লইয়া তাহাদের রক্ষার্থ আগুয়ান হইয়াছিলেন এবং রবার্ট স্কিনারের দলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে আবার প্রাচীর সন্নিকটে বিদূরিত করিলেন। এমন সময়ে জেমস আসিয়া ভ্রাতার সহিত যোগ দিলে উভয়ের সম্মিলিত সৈন্যদল আবার টমাসকে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করিল। অতঃপর নগরের কেন্দ্রদেশ বাজারের নিকট বুর্কুয়াঁর তিন দল সৈন্য সম্মিলিত হইল। উভয়পক্ষে ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল, রাজপথে রক্তের স্রোত বহিল, সঙ্কীর্ণ স্থান হতাহতদিগের দেহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। রবার্ট স্কিনার টমাসকে নিকটে পাইয়া অসিহস্তে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু টমাসের পরিহিত বর্ম্মে ঠেকিয়া তাঁহার তরবারীর আঘাত ব্যর্থ হইল। প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধের পর সংখ্যাধিক্যবশতঃ মারাঠারা বিজয়লাভ করিল। টমাস শত্রুহস্তে হান্সিনগর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। স্কিনারের মতে এই যুদ্ধে তাঁহাদের ১৭০০ লোকক্ষয় হইয়াছিল। টমাস বলেন তাঁহার পক্ষে ৫০০ এবং অপর পক্ষে ইহার দ্বিগুণ সৈনিক হতাহত হইয়াছিল। *

নেতৃত্ব বার্চ্চ লাভ করেন। উহাদের লইয়া তিনি সাহাবাণপুরের ফৌজদার বাপু সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া শত্রুকরে চারিটি তোপ ফেলিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া অক্টারলোনি বলিয়াছিলেন যে আর কখনও তিনি ভূতপূর্ব্ব মারাঠা অফিসারদের হস্তে ভরসা করিয়া কোম্পানীর কামান দিবেন না। পর বৎসর বার্চ্চ পঞ্জাবসীমান্তে প্রেরিত হন এবং জেমস্ স্কিনারে সহযোগিতায় শিখদিগকে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করেন।

* মেজর বার্নিয়েরর সমাধিলিপি মতে তিনি এই সময় নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে আক্রমণকারী কোন দলের নেতৃত্ব করিতে তাঁহাকে দেখা যায় না। তাই মনে হয় স্কিনারের কথা সত্য হইলেও হইতে পারে। রবার্ট ম্যাকেঞ্জি এই যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ বাধিলে তিনি ও লেফটেনান্ট লাঙ্গিমান নামক অপর একজন ইউরোপীয় সৈনিক গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারাগারে তাঁহাদের প্রতি নাকি বিষম উৎপীড়ন করা হইয়াছিল। তাহার অল্পকাল পরেই, সম্ভবতঃ অত্যাচারের ফলে স্বাস্থ্য হানিবশতঃ, ২৫শে ডিসেম্বর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল। আগ্রার ক্যাথলিক সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার কবর আছে।

যুদ্ধজয় হইবামাত্র বুর্কুয়াঁ তাঁহার নিরাপদ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া মহাসমারোহে আসিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। শ্রান্তক্লান্ত সৈনিকদল বিশ্রামের অবকাশ লাভ করিল, তাহাদের স্থলে অপর দল যুদ্ধে আদিষ্ট হইল। পরদিবস গোলন্দাজদল দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। পদাতিকগণও দুর্গ হইতে মাত্র ২০০ গজ দূরে আসিয়া পৌছিল। এদিকে দুর্গের ভিতরের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয়তর হইয়া উঠিতেছিল। সৈনিকগণের আর সাহস বা উদ্যম বলিয়া কিছু ছিল না; আসন্ন বিপদের কাল ছায়ায় সকলেই মুহ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। পলাতকগণের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। মুসলমান সৈনিকগণ স্পষ্টই বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই বুঝিতেছিল টমাসের পতনের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু তিনি নিজে এ অবস্থাতেও নিরাশ না হইয়া দৃঢ়চিত্তে সাধ্যমত আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন। আত্মসমর্পণের চিন্তা একবারের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।

জর্জ্জগড়ের যুদ্ধে টমাসের নিকট বিপর্য্যস্ত হইয়া এবং এক্ষণে তাঁহার এই অসমসাহসিক আত্মরক্ষার জন্য কিছু করিয়া উঠিতে না পারিয়া বুর্কুয়াঁ তাঁহার প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অপর কোন ব্যক্তি হয়ত এরূপ অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরত্বে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। কিন্তু তাঁহার সঙ্কীর্ণচিত্তে সে উদারতার স্থান ছিল না। তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন "জীবিত অথবা মৃত যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন, তিনি ঐ হতভাগা আইরিশটাকে একবার হাতে পাইতে চাহেন এবং যদি জীবিত অবস্থায় পা'ন তাহা হইলে উহাকে তিনি লৌহপিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখিবেন।" বুর্কুয়াঁ যে প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা হইতে ইহা মিথ্যা ভীতি-প্রদর্শন বলিয়া মনে হয় না, তিনি ঐ কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। টমাসের সৈনিকগণের সহিত তিনি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। স্থির হইল শীঘ্রই তাহারা টমাসকে বন্দী করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিবে।

কিন্তু বিপক্ষসেনা দলভুক্ত টমাসের স্বজাতীয় সৈনিকগণ তাঁহাকে এ বিষম অবমাননা হইতে রক্ষা করিলেন।

তাঁহারা সকলেই টমাসের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। মেজর স্মিথের কথায় বলিতে "বুর্কুর্ঁয়ার ঐ ধরণের ভাষা আমরা পছন্দ করিলাম না; তাঁহার ঐ হীন চক্রান্তও আমাদের পছন্দকর হয় নাই। উক্তরূপ ষড়যন্ত্র হইতে যদি টমাসের পতন হয় তাহা হইলে উহা যে বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে, সে বিষয়ে আমরা সকলেই একমত ছিলাম।" বুর্কুর্ঁয়ার বৃটিশ বংশোদ্ভূত অফিসরগণ তাঁহার সহিত তাঁহার অনুসৃত উপায়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহু আয়াসে তাঁহাকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে অবৈধ উপায়ে টমাসকে হস্তগত করার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে নিজে হইতে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ দিলে তাঁহার নিজেরই মান গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। বুর্কুর্ঁয়া সহজে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। "একদিন জলযোগের পর মদ্যপানের ফলে তিনি যখন বেশ খুস-মেজাজ ছিলেন" সেই সময় সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরায় শেষপর্য্যন্ত তিনি রাজি হইলেন।

টমাস ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাষ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আর তাহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। বিশ্বস্ত রাজপুতগণের সাহায্যে যতদিন চলে তিনি আত্মরক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লীলাখেলা যে ফুরাইয়াছে, আর কোন আশা নাই সে কথা তিনি নিজেও বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য যখন বুর্কুর্ঁয়ার বাহিনীভুক্ত ইউরোপীয়গণের প্রতিনিধিরূপে সহোদরবিয়োগবিধুর মেজর স্মিথ তাঁহার নিকট সন্ধিকামী হইয়া আসিয়া সম্মানজনক সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিবার কথা বলিলেন তখন টমাস কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার মুখে অফিসরগণের সদিচ্ছার পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে সর্ত্ত নিরূপণ করিয়া দিবেন তিনি তাহাতেই সম্মত হইবেন। বহু বাদানুবাদের পর বুর্কুর্ঁয়াও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে স্থির হইল যে টমাসকে নিজ যাবতীয় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিসহ ইংরাজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইবে; সিপাহীদিগকে নিজ নিজ দ্রব্যাদি লইয়া যদিচ্ছা গমনে অনুমতি প্রদত্ত হইবে, এতদ্ভিন্ন দুর্গমধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু বিজেতৃপক্ষের লভ্য হইবে। এ বিষয়ে টমাস নিজে পরে বলিয়াছিলেন—"আমার সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে আমার শত্রু শিখ এবং ফরাসীদিগের প্রতি অনুকূল শক্তিসমূহকে বর্ত্তমানে পর্য্যুদস্ত করিবার আশাও বিনষ্ট হইয়াছিল; লাকবা যোধপুরে চলিয়া যাওয়াতে কোনদিক হইতে আমার কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না, আর অধিক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিলে আমার অর্থবলও বিনষ্ট হইবে, এই সকল বিবিধ কারণে আমি দুর্গ ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম।"

এইরূপে টমাসের রাজলীলার অবসান হইল। সন্ধিপত্র লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইলে উভয় পক্ষে সমরানল নিবৃত্ত হইল। অতঃপর টমাস একদিন বুর্কুর্ঁয়ার সহিত দেখা করিতে হান্সি সহর মধ্যে তাঁহার বাসস্থানে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য ব্রিগেডের ইউরোপীয় অফিসরগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুভদ্র ব্যবহারে সকলেই পরম মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রবার্ট স্কিনারকে দেখিয়া টমাস সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং ১০ই ডিসেম্বরের হাতাহাতি যুদ্ধে নিজ কোমরবন্ধে তাঁহার কৃত তরবারীর আঘাত তাঁহাকে হাসিয়া দেখাইয়াছিলেন। টমাসের সহজ সুভদ্র ব্যবহারে বুর্কুর্ঁয়ার উদ্ধতভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি টমাস এবং বার্চ্চ ও হিয়ার্সেকে পরদিবস তাঁহার সহিত নৈশ ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যথা সময়ে ৫০ জন দেহরক্ষী সৈনিক লইয়া টমাস বুর্কুর্ঁয়ার শিবিরে গিয়াছিলেন। উত্তেজনার মুখে পূর্ব্বদিন তিনি যে অচঞ্চল ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, তখন আর তাঁহার সেভাব ছিল না। দুর্ভাগ্যের বিষম ভাবে তাঁহাকে তখন নিতান্ত শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন দেখাইতেছিল। ডিনারে উপস্থিত অপরাপর অফিসরগণ টমাসের পক্ষে কষ্টকর হইবে বুঝিয়া তদানীন্তন ঘটনাবলীর কোন অবতারণা না করিয়া সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভোজন ব্যাপার অবসান হইলে পানীয় আনীত হইল। নিজ চিন্তাভার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য টমাস তাহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্লাসের পর গ্লাস স্বাস্থ্যপান করিয়া সকলকার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই ভাবে রাত্রি আটটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। হঠাৎ বুর্কুর্ঁয়ার কি খেয়াল হইল। তিনি নিজ পানপাত্র তুলিয়া ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে

বলিলেন "এবার জেনারেল পেরঁর অস্ত্রের সাফল্য কামনা করিয়া পান করা যাউক।" এ প্রস্তাবে কেহই কর্ণপাত করিল না, সকলেই নিজেদের অসম্মতি জানাইবার জন্য গ্লাসগুলি উল্টা করিয়া রাখিলেন। কিন্তু টমাস একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল তাঁহাকে উপহাস করিয়াই বুর্কুয়াঁ ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ অসি কোষমুক্ত করিয়া 'One Irish sword is still sufficient for a hundred Frenchmen' বলিতে বলিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সবেগে ধাবিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তথায় সমুপস্থিত অফিসরদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, অপর সকলে বুর্কুয়াঁকে ঠেলিয়া শিবির হইতে বাহির করিয়া দিল, কালান্তক যমের মত টমাসকে তাঁহার অভিমুখে উন্মুক্ত কৃপাণ করে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি নিজেই আসন ছাড়িয়া পলায়নে তৎপর হইয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া টমাসের সৈনিকগণ ব্যাপার দেখিবার জন্য ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে তাহাদের সাহেব বাহাদুর মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়াছেন মাত্র; অপর কিছু ঘটে নাই। এ দিকে টমাস তখন মহোল্লাসে টেবিলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া শূন্যে তরবারী আস্ফালন করিতে করিতে হিন্দুস্থানী ভাষায় চীৎকার করিতেছিলেন "দেখ! দেখ! শালা ফরাসী কেমন শেয়ালের মতন পালাইতেছে, দেখ!" সকলে তাঁহাকে কোন মতে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিলেন যে বুর্কুয়াঁ ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে কোন অপমান করেন নাই; অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপানের ফলে তিনি কাণ্ড-জ্ঞান হারাইয়াছিলেন মাত্র। টমাসও উক্ত কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেন। তখন বুর্কুয়াঁ আবার শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ পানকার্য্য চলিতে লাগিল।

পানোন্মত্ত টমাস আবার কখন কি করিয়া বসেন এই ভয়ে জেমস স্কিনার কিয়ৎক্ষণ পরে টেবিল হইতে উঠিলেন এবং অশ্বারোহণে নগর মধ্যে গিয়া পথে যেখানে যেখানে ফাঁড়ি ছিল প্রহরীদের সকলকেই বলিয়া রাখিলেন যে সে রাত্রে টমাস যখন দুর্গমধ্যে ফিরিবেন তখন কেহ তাঁহাকে যেন আহ্বান না করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কুতব-দরওয়াজা অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব-কোণের ঘাঁটিতে সংবাদ দিতে তাঁহার ভুল হইয়া গেল। অদৃষ্টক্রমে খানিকপরে টমাস সেই পথেই দুর্গে ফিরিলেন। গভীর নিশীথে সশস্ত্র সৈনিকগণকে আসিতে দেখিয়া শাস্ত্রী দূর হইতে হাঁকিল,—"হু-কুম-দার?"

"সাহেব বাহাদুর"

টমাসের কণ্ঠ তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত জবাব দিতে বিলম্ব করিল না। কিন্তু তখন সে পাশ পোর্ট অচল হইয়া গিয়াছে। প্রহরী জানাইল "সাহেব বাহাদুর" নামক কাহাকেও সে চিনে না এবং উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতিরেকে সে তাহাদিগকে যাইতে দিতে অপারগ। ইহাতে টমাসের ক্রোধের অবধি রহিল না। তিনি মনে ভাবিলেন সকলে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অপমান করিতেছে। "কি? সাহেব বাহাদুরকে চেননা।" বলিতে বলিতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে হত-ভাগ্য সৈনিকের দক্ষিণবাহু সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তিত হইয়া ভূপতিত হইল। চারিদিকে ঘোর গোল বাধিয়া গেল। প্রহরী সৈনিকগণ টমাসকে আক্রমণে অগ্রসর হইল। এমন সময় স্কিনার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ সৈনিকগণ প্রতি-নিবৃত্ত হইল। অতঃপর স্কিনার টমাসকে শিবিকাযোগে দুর্গমধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর নেশার ঝোঁক কাটিলে পূর্ব্বরাত্রিতে নিজ আচরণের কথা শুনিয়া টমাস নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন। আহত সিপাহীকে নিজের কাছে ডাকিয়া পাঠাইয়া তিনি তাহাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং বুর্কুয়াঁর নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বুর্কুয়াঁ টমাস-কৃত ক্ষমাপ্রার্থনা বাহ্যতঃ গ্রহণ করিলেও বদমেজাজী অতিথিকে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার তিন দিন পরে ১লা জানুয়ারি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস অনুপসহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঠিক আট বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে তিনি বেগম সমরুর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর নূতন ভাগ্যা-ন্বেষণের ক্ষেত্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কি ঘোর পরিবর্ত্তন—কত কাণ্ডই না ঘটিল। টমাসের তখন কি মনে হইতেছিল, কে বলিবে? নিজ ধন-

সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য টমাস অনুপসহরে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের অতিথিরূপে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তখনও সর্ব্বসমেত তাঁহার নিকট প্রায় ৩া০ লক্ষ টাকা মজুত ছিল। বেগম সমরুর আশ্রয়ে নিজ স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিগণকে পরিত্যাগ করিয়া এবং তাহাদের ভরণপোষণ জন্য তাঁহার হস্তে লক্ষ টাকা দিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন মানসে টমাস ইউরোপগামী পোতারোহণ জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন। মার্চ্চ মাসে তিনি কাশীতে আসিয়া পৌছিলেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি তখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। টমাসকে তিনি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত দিল্লীর পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী ভূভাগ বা তথাকার অধিবাসীগণ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। লাট বাহাদুর টমাসের নিকট হইতে শিখজাতি এবং দেশীয় নৃপতিগণের সৈন্যবিভাগ সম্বন্ধে বহু আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে মানচিত্রটী লইয়া উভয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া টমাস তাহার কারণ জানিতে চাহেন এবং ইংরাজরাজ্য ঐভাবে চিহ্নিত হইয়া থাকে শুনিয়া পঞ্চনদ প্রদেশের উপর হস্ত রাখিয়া সখেদে বলিয়াছিলেন —"এই হস্তের দ্বারা আমি উহাকে লাল করিয়া তুলিতে পারিতাম, যদি উহারা আমাকে একা ছাড়িয়া দিত।" তাহার পর সমস্ত ম্যাপটির উপর অঙ্গুলি বুলাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "এ সমস্তই লাল হইয়া যাওয়া উচিত।"

বারাণসী হইতে টমাস কলিকাতা যাত্রা করেন। দীর্ঘপথ নৌকাযোগে পাড়ি দিবার কালে তিনি তাঁহার সঙ্গী কাপ্তেন ফ্রাঙ্কলীনের নিকট স্বীয় জীবনের যে ঘটনাবলী বলিয়াছিলেন তাহা তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া পর বৎসর "Military Memoirs of George Thomas" নামে কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থের আর এক সংস্করণ লণ্ডন-নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল। টমাসের ইংরাজী বর্ণজ্ঞান ছিল না। দীর্ঘকাল দেশীয় সাহচর্য্যে বাস করার ফলে তিনি খুব দ্রুত উর্দ্দু ও ফরাসী বলিতে, পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অনভ্যাসের ফলে মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করা কষ্টকর দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রথমটায় ফ্রাঙ্কলীনকে উর্দ্দুতে নিজ জীবনস্মৃতি বলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

টমাসকে কিন্তু আর কলিকাতা পর্য্যন্ত পৌছিতে হয় নাই। সুকঠোর পরিশ্রম, অপরিমিত পানদোষ ও দুর্ভাগ্যের বোঝায় তাঁহার লৌহবৎ সুদৃঢ় শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। পথিমধ্যে বহরমপুরে আসিয়া পৌঁছিবার পর সামান্য কয়েকদিন জ্বর ভোগ করিয়া ২২শে আগষ্ট ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। বহরমপুরে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল।

টমাসের পরিজনবর্গ সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উহাদিগকে বরাবরের মতই এ দেশে পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভাগ্যান্বেষীদিগের মধ্যে অনেকে ঐরূপ কার্য্য করিত। অনেক সময় আবার উহাদিগের দেশীয়া বা দেশীয়ভাবাপন্না বর্ণসঙ্করজাতীয়া পত্নীগণ স্বামীসহ অপরিচিত ইউরোপে যাওয়া অপেক্ষা এদেশে থাকাই পছন্দ করিত। বেগম তাঁহার প্রতি ন্যস্ত ভার সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। টমাস ও মারিয়ার তিন পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে জন ও জেকব নামক পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল। জন বেগমের অন্যতম ধর্ম্মপুত্র ছিল। বেগম তাহাকে সবিশেষ স্নেহ করিতেন এবং আগা ও যাদুস নামক তাঁহার জনৈক আর্ম্মানী সৈনিকের কন্যা জোয়ানা বা সোহাগুণ বেগমের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বেগমের প্রাসাদ মধ্যে মুসলমানী পরিচ্ছদ পরিহিত জনের একটি তৈলচিত্র রক্ষিত ছিল। যাঁহারা সে ছবি দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে আলেখ্যাঙ্কিত যুবকের আননে শুধু লাম্পট্য প্রীতির নিদর্শন দেখা যায়, টমাসের পুত্রের উপযুক্ত বুদ্ধি, দৃঢ়তা ও উৎসাহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। জন একজন উচ্চাঙ্গের উর্দ্দু-কবি ছিলেন। দিল্লীর শিক্ষিত সমাজে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তথাকার বহু সাহিত্যিক ব্যাপারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। "খাঁ সাহেব" এই ছদ্মনামে তিনি কবিতা রচনা করিতেন। * উহারা সকলেই বেগমের নিকট হইতে বহু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মারিয়াকে ৭০০০৲, জনকে ১৮০০০৲, জোয়ানাকে ৭০০০৲, জেকবকে ১০০০০৲, এবং তাহাদের অপর ভ্রাতা জর্জ্জকে ২০০০৲, অর্থাৎ উহাদের কয়জনকে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৪০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। কন্যাটির বিবাহেও

* তখনকার দিনে বহু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উর্দ্দুভাষায় কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ছিল। কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে "হিন্দুস্থান রিভিউ" (১৯৩৪খৃঃ) পত্রে প্রকাশিত ডাঃ সবেদো লিখিত "Contributions of Anglo-Indians to Hindusthani Poetry" দেখিতে পারেন।

তিনি যথেষ্ট যৌতুক দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাহার বংশধরগণ দিল্লীতে বাস করে বলিয়া শুনা যায়।

বেগম সমরুর মৃত্যুর পর কোম্পানী তাঁহার জায়গীর অধিকার করিয়া সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিলে জেকব টমাস পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের কর্ম্মে প্রবেশ করেন ও মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে এক ব্যাটালিয়ন নজিব বা পঞ্জাবী মুসলমান সিপাহীসেনার নেতৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। খালসা বা বৃটিশ সরকারের দফ্তরে জেকব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু প্রথম আফগান যুদ্ধে উপস্থিত ইংরাজ লেখকগণের রচনামধ্যে প্রসঙ্গক্রমে জেকব টমাস সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে রণজিতের মৃত্যুর প্রায় সমসময়ে খালসা সৈন্যদলের অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেশ বুঝা যায় বলিয়া কর্ণেল বার (Barr) নামক জনৈক সৈনিকের "Journal of a March from Delhi to Kabul" নামক গ্রন্থ হইতে একাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল—"কর্ণেল জেকব টমাস জাতিতে বর্ণসঙ্কর ইউরেশীয় এবং নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি। সেদিন তাহার রেজিমেণ্টকে অগ্রসর হইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কিছু পরেই সে আসিয়া কাপ্তেন ওয়েডকে বলিল * যে কেহই তাহার আদেশ পালনে তৎপর নহে। এই ঘটনা হইতেই উহার রেজিমেণ্টের কর্ম্মক্ষমতা ও সিপাহীগণের উপর তাহার প্রভাব কিরূপ ছিল বুঝা যাইবে।...১৪ই তারিখে নজিব রেজিমেণ্টে একটি বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। শিখ সৈন্যদলে সামরিক বশ্যতা যে কত অল্প এবং আমাদের সহযোগীগণের যে কত গুণ উহা হইতে জানা যাইবে। কর্ণেল জেকব টমাসের প্রভাব প্রতিপত্তির উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। তাহার সিপাহীগণ এবার তাহার উপর বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিয়া স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাকেও তাহার এডজুটাণ্টকে শিবির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া উহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল এবং জানাইয়াছিল যে অতঃপর আর ঐ দুইজনের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব নাই।

অধিনায়কের প্রতি "সম্মান" দেখাইবার জন্য তাহারা সাধারণতঃ জেকব যেখানে বসিত সেইখানে তাহার চেয়ারটি উল্টাইয়া রাখিয়া দিল। পরে তোপগুলিও ঐ ভাবে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া তাহারা পরম নিশ্চিন্তভাবে অতঃপর কি ঘটে তাহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অফিসারদিগের প্রতি বিরাগ, বেতনাভাব এবং অন্যায়ভাবে তাহাদিগকে পেশোয়ারে প্রেরণ করাতে অসন্তোষ (নিতান্ত অল্পকালের মধ্যে তাহাদিগকে তিনবার পেশোয়ার অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল), ইহাই ছিল তাহাদের ক্রোধের কারণ। কিন্তু আমাদের প্রতি যে তাহাদের কোন বিরাগ নাই তাহা দেখাইবার জন্য প্রতিদিনকার মত সেদিনও সূর্য্যাস্তের পর তাহারা প্রহরার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কর্ণেল ওয়েড যখন তাহাদিগকে প্যারেড করিতে আদেশ দিলেন তখনও তাহারা তাহা পালনে বিলম্ব করিলনা। তিনি কিন্তু তাহাদিগকে জানাইলেন যে অতঃপর আর তাঁহার নিকট উহাদের থাকা সম্ভব নহে। তখন কয়েকদিনের মধ্যেই তাহারা শিখ ক্যাণ্টনমেণ্টে ফিরিয়া গিয়াছিল।" *

বিদ্রোহীদিগকে মার্জ্জনা করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাহাদের লাহোরে পাঠান সম্ভব ছিল না; নূতন যাহারা আসিবে তাহারাই বা কি ধরণের হইবে সে বিষয়েও কোন স্থিরতা ছিল না। কে জানে তাহারা আরও মন্দ হইতে পারিত। জেকবের রেজিমেণ্ট ইংরাজ সৈন্যদলের পার্শ্বে থাকিয়া খাইবারপাস অধিকারে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং কাবুল অধিকারেও উহাদের সহগামী হইয়াছিল। রণজিতের দেহান্তের পর পঞ্চনদ প্রদেশে অরাজকতার দিনে জেকবকে হাজারা অঞ্চলে অবস্থিত থাকার জন্য ঘটনাজালে আর বিজড়িত হইতে হয় নাই। পণ্ডিত জাল্লা যখন খালসা হইতে অবশিষ্ট ইউরোপীয়দিগকে বিতাড়িত করেন তখন কর্ম্মচ্যুত জেকব টমাস সার্দ্ধানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। তথা হইতে সে বারম্বার লাহোর দরবার ও তত্রস্থ ইংরাজ রেসিডেণ্টের নিকট বক্রী বেতন ও কর্ম্মচ্যুতির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য অর্থের জন্য পত্র লিখিতে থাকে। দীর্ঘকাল পরে তাহার ধৈর্য্যের ফল ফলিয়াছিল এবং তাহাকে দিবার জন্য সার্দ্ধানার বিশপের নিকট দুই হাজার টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ পিতার মত জেকবেরও ইংরাজী অক্ষর পরিচয় ছিল না।

সিপাহীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব রাখিতে অক্ষমতার জন্য অনেকে জেকবকে নিন্দা করিলেও এ বিষয়ে শুধু সে একাই দোষী ছিল না। তখনকার দিনে খালসা মধ্যে যে ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বহিতেছিল তাহাতে অনেক খাটি ইউরোপীয় সেনানায়কের পক্ষেও সৈন্যদলে সামরিক বশ্যতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ আবার মিশ্র-বিবাহজাত সন্তানেরা ভারতীয় আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইলে কতদূর অধঃপতনে যাইতে পারে জন ও জেকব টমাসকে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একথার কিন্তু কোন অর্থ হয় না। ইউরোপীয়ভাবে বর্দ্ধিত ইউরোপীয় মাত্রেই কি উচ্চস্তরের জীব?

* খালসা-সৈন্যদলের সহিত অবস্থিত বৃটিশ পোলিটিক্যাল এজেণ্ট।

* p. 222—23.

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কামরূপ

শ্রীচরণদাস ঘোষ

এক

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া চন্দন কবে যে বাড়ী ছাড়িয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কামরূপে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে আসিয়া যখন হঠাৎ দেখা দিল, তখন তাহার বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। তার নগ্নপদ, পরিধানে চীরবাস, কণ্ঠে তুলসীর মালা, সর্ব্বাঙ্গে তিলকের ছাপ—"রাধাকৃষ্ণ"

আষাঢ়মাস—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে সেদিন দেবী-দর্শনের বিশেষ এক 'যোগ'। দেশ-দেশান্তর হইতে যাত্রী আসিয়াছে—কত গৃহস্থ, কত সাধু, কত সন্ন্যাসী। সকলেই করিতেছে মারামারি, ঠেলাঠেলি—সর্ব্বাগ্রে 'দর্শন' করিবে প্রত্যেকেই, 'মায়ের আশীর্ব্বাদ' নিঃশেষ হইবার অতি অগ্রে হাত পাতিবে সবাই! চন্দনও ছট্‌ফট করিয়া বেড়াইতেছিল, বারকয়েক এদিক-ওদিক করিয়াই যেমন ওই দুর্ভেদ্য ভীড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, অকস্মাৎ জনতার গা বহিয়া কে একজন ঠিকরিয়া আসিয়া তার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"তা হয় না।"

চন্দন চম্‌কিয়া উঠিল। দেখিল, তার হাত ধরিয়া—এক তরুণ সন্ন্যাসী! মুখে বাঙ্গালা কথা, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অশ্রুতপূর্ব্ব এক স্বতন্ত্র ভাষার সংমিশ্রণে সম্পাদিত। চেহারা ও দেহের গঠন দেখিয়া চন্দন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল—বাঙালী নহে। তার সর্ব্বদেহ সযত্নে আবৃত, কণ্ঠে জবার মালা, হস্তে ত্রিশূল, মস্তকে বুঝি বা নিবিড় জটাভার—পত্রপুষ্পে ঢাকা। সবচেয়ে যাহা চন্দনকে বেশি বিহ্বল করিয়া তুলিল, তাহা তার দেহের রূপ—রূপ আর রূপ! মুখটি কচি-কচি—নিখুঁত, নিটোল।

চন্দন সম্মোহিতের ন্যায় প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?"

"শক্তির উপাসক। আপনি?"

"আমি?—আমি বৈষ্ণব।"

"দেবী-দর্শনে আপনার অধিকার নেই।"

চন্দন এক মিনিট কাল নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "অধিকার নেই!—হেতু!"

"ধর্ম্মের নিষেধ!"—বলিয়াই ছেলেটি হাত ছাড়িয়া দিল।

ধর্ম্মকে লইয়াই চন্দনের কারবার। বেদে, পুরাণে, উপনিষদে সে সরস্বতী—তন্নতন্ন করিয়া প্রত্যেক শ্লোক ছন্দটি বিচার করিয়াও সে এই খাম-খেয়ালি তথ্যের খোঁজ পায় নাই। এতদ্ব্যতীত জীবন ভরিয়া সে কত দেশ, কত তীর্থ ঘুরিয়াছে, কত যোগী, কত ঋষি, কত পণ্ডিতের কাছে কত না ধর্ম্মের, স্মৃতির ও শ্রুতির ব্যাখ্যা শুনিয়াছে, কিন্তু এই এমন অভিনব প্রলাপ-কাহিনী কোথাও সে শোনে নাই! আর, আজ এই ফাজিল ছেলেটা আসিয়া তাহার কাছে ধর্ম্মের গুরুগিরি করিয়া যাইবে?

চন্দন ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "কোন্ শাস্ত্রে তোমাকে এ 'শাসন' দিয়েছে?"

ছেলেটি সংযত কণ্ঠে জবাব দিল, "আমার শাস্ত্র বিবেক!"

"তুমি ভ্রান্ত! দেবতা-দর্শনে সমান অধিকার—সবারই!"

এমনি সময়ে মন্দিরে আরতির বাজনা উঠিল, এবং শশব্যস্তে চন্দন যেমনি অপর পক্ষকে এড়াইয়া মন্দিরের মুখে ঝাঁপ দিবে, ছেলেটি কঠিনকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভ্রান্ত আপনি—"

"আমি?"—চন্দন আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটির মুখে হাসি আর ধরে না! নির্ভীক কণ্ঠে কহিল, "একশ—বার!"

চন্দনের অন্তঃস্থল এইবার যেন একটু এলোমেলো হইয়া পড়িল। ছেলেটির মুখের দিকে বার কয়েক ছিন্ন চাহনি ফেলিয়া কহিল, "তোমার কথা যদি না মানি!"

"পাপ করবেন।"

"কেন—তা' আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার?"

"পারি। নাবুন—নিচে আসুন!" বলিয়াই ছেলেটি পশ্চাৎ ফিরিয়া মন্দির হইতে অবতরণ করিতে লাগিল, চন্দনও মূঢ়ের ন্যায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

কোথায়, কোন্ পথ দিয়া নীচে নামিল চন্দন তাহা টের পাইল না। ছেলেটির নির্দ্দেশ মত একখণ্ড উঁচু পাথরের উপর আসিয়া সে বসিল। নির্জ্জন একান্ত—চারিদিক নিঝুম, নিঃশব্দ। মাথার উপর রাত্রি—আশে পাশে নিবিড় অন্ধকার। ছেলেটিও বসিল, চন্দনের গা ঘেঁষিয়া।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দেই কাটিয়া গেল। অতঃপর আচম্কায় ছেলেটি এক মুখ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ভাবছেন হয়ত, কি মুস্কিলেই না পড়লাম!"

"না। কিন্তু—"

"বুঝিয়ে দেব—এই ত?"

চন্দন নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় সায় দিল—হুঁ।

ছেলেটি একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় চন্দনের হাতটি নিজের কোলের উপর টানিয়া আনিল। তারপর, তার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, "বলুন ত, কি বড়—মানুষের বিবেক, না, পুঁথির শাস্ত্র?"

চন্দন মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দুই-ই সমান। একক বাদ দিলে, অপরের অর্থ থাকে না। মানুষের সারথি হচ্ছে বিবেক, আর শাস্ত্র ওর নির্দ্দেশ।"

"এক কথায় জবাব দিন—কোন্‌টি বড়?"

"বিবেক।"

ছেলেটি এক মুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "একটু আগে বিবেককে উপহাস করলেন—তাই বুঝি?"

চন্দন এ শ্লেষ সহ্য করিতে পারিলনা, তাই তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া মুখটা নীচু করিল। পরক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া বলিল, "তা নয়! বিবেক আর মনের অবাস্তব নির্দ্দেশ এক নয়!"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ তোমার ওই নিষেধ বিবেকের মন্ত্র নয়! এ হতেই পারে না—দেবতা স্বতন্ত্র, বৈষ্ণবের আর শাক্তের!"

ছেলেটি যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—"সহস্র, লক্ষ, কোটিবার।" অতঃপর কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নীচু করিয়া বলিতে লাগিল, "সত্যিকথা—দেবতা একই, আলাদা নয়—হতে পারে না! কিন্তু পৃথক করে রেখেছে মানুষ—ওঁর কাছে পৌঁছবার পৃথক পথ করে! এই পথের দায়িত্ব যে স্বীকার না করে, সে ভণ্ড!" একটা ঢোঁক গিলিয়াই আবার সুরু করিল, "আপনিই স্বীকার করেছেন, আপনি বৈষ্ণব, অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক, দীক্ষা আপনার বিষ্ণুমন্ত্রে—কেমন ত? জবাব দিন—হ্যাঁ, কি, না?"

চন্দন ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল—"হ্যাঁ!"

ছেলেটি পুনশ্চ সুরু করিল, "কিন্তু, ওই দীক্ষার দায়িত্ব কতটা—জানেন আপনি? ভুলে যান—আপনি মানুষ, স্মরণ্ রাখুন শুধু—আপনি বৈ—ষ্ণব, উপাস্য দেবতা আপনার—বিষ্ণু!"

চন্দন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলিয়া ফেলিল, "এই জানি—উনিই আমার ঠাকুর!"

বিজয়ের গর্ব্বে ছেলেটির সারা মুখটি দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "তাই যদি হয়, বল্‌তে পারেন, কোন্ অধিকারে, কোন্ শাস্ত্রের জোরে শক্তির মন্দিরে ঢুকতে চাইছিলেন? এ তীর্থ আপনার ত নয়?"

চন্দনের মুখে কথা সরিল না, যেন এক অকাট্য প্রশ্নের মুখে তার সমগ্র যুক্তিতর্ক উবিয়া গিয়াছে। যেন বা, সে মোহাচ্ছন্ন, যেন তার আজন্ম সন্ন্যাস আজ ব্যর্থ হইতেই চলিয়াছে—এই ছেলেটির কাছে সে আজ পরাস্ত! বড়মুখ করিয়া তার জ্ঞানের ভাণ্ডার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল, কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর নাই! তাহার সন্ন্যাস-অভিজাত-গৌরবের কাছে হাত পাতিল, কিন্তু উহা যেন নিঃস্ব! সেই অনন্তবিস্তারী তমিস্রার বুক চিরিয়া নেত্রপাত করিল—দূর পর্ব্বতবাসী কতনা মহাপুরুষ, কতনা যোগী-ঋষি, কতনা বেদব্যাস-বাল্মিকী-বশিষ্ঠের পানে, কিন্তু এই তার একান্ত অসময়ে কেহই আজ মুখ তুলিয়া চাহিল না! অতঃপর ছেলেটির মুখের দিকে নির্ব্বোধের ন্যায় বার কয়েক চাহিয়া হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত বলিয়া উঠিল, "কিন্তু অপরাধ—এর ত আমার সীমা নেই! অনেক শক্তির মন্দিরে ঢুকেছি, অনেক মন্দির মলিন করেছি—কেউ মানা করেনি! আজ আমায় তুমি কোন্ দেবদূত?—মন্ত্র দাও, দীক্ষা দাও, ভেঙে-চুরে নতুন কোরে—আবার

আমাকে তৈরী করো।" বলিয়াই ছেলেটির পদতলে ঝুঁকিয়া পড়িল।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি তার হাত ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "নিজেকে এত খাটো করবেন না।" বলিয়াই বিপরীত দিকে একবার মুখ ফিরাইল, যেন এক গোপন হাসির ছটায় তাহার মুখটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, যার রশ্মি পাশের ওই মানুষটির দিকে ফেলিবার নয়! পরক্ষণেই আবার তেমনি করিয়া বলিল, "অতীত অনন্তের যাত্রী, তার পানে চোখ ফেরালে, কামনায় অভিশাপ পড়ে। বর্ত্তমানের রথে উঠুন—পারবেন?"

"পারবো! কিন্তু, সারথি হবে—তুমি?"

ছেলেটি একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি"!

"হাঁ, কেন না, তোমার ভেতর আমি আজ মিলিয়ে গেছি!"

"তবে, শপথ করুন, বলুন—"তুমিই আমার শক্তি!"

"তুমিই আমার শক্তি!—তোমার নাম?"

ছেলেটি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "বল্লাম ত—শক্তি!" বলিয়াই হাত দুটি জড় করিয়া না-জানি কাহার উদ্দেশে মাথায় ঠেকাইল, তারপর চন্দনের হাতে একটা টান দিয়াই কহিল, "আসুন, আমার আশ্রমে! কতদূর জানেন—বারো দিনের রাস্তা!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "আমরা বাইরে আসিনে, কিন্তু, জানতাম—আপনি আজ এখানে আসবেন, তাই এসেছি!" বলিয়াই অগ্রসর হইল।

কথার উপর কথা সাজাইয়া কথা কহিবার শক্তি চন্দনের আর ছিল না। শুধুই অপরিমিত বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

কিয়দ্দূর গিয়াই ছেলেটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "একটু দাঁড়ান—" বলিয়াই অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল, এবং অত্যল্পকাল পরেই একটি ঘোড়া আনিয়া বলিল, "চমকে উঠছেন? ঘোড়ায় চড়েই বেড়াই—পাহাড়ে মানুষ কিনা।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অশ্বারোহণ করিল ও চন্দনকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া সুমুখে বসাইয়া ছুট দিল। কোথায়, কে জানে!

দুই

আসামের এক স্তব্ধ বন ও পাহাড়ের ভিতর একটি মন্দিরে ধ্যানে বসিয়া রাজ-পুরোহিত ও রাজ চিত্ররথ—তাঁর অবয়ব সুদীর্ঘ, মূর্ত্তি প্রশান্ত, ললাটে দীর্ঘ চন্দনের রেখা, সবচেয়ে চোখে লাগে—দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু। বয়স আন্দাজ সত্তর। মন্দিরের বিগ্রহ—'শ্রীকৃষ্ণের রাখাল-রূপ।' বাহিরে দাঁড়াইয়া এক বিরাট নারীবাহিনী—সকলেই শ্রেণীবদ্ধ, সকলেই সংযত, সকলেই করযোড়ে মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া। দেবকন্যা কখনো চোখে পড়ে নাই, কিন্তু ইহাদিগকে হঠাৎ মানবী বলিলেও মারাত্মক ভুল হয়। তাদের রূপের ঝলকে ও-অঞ্চলে বুঝিবা রাত নামে না, দেহের আভায় রৌদ্রের ঝাঁঝ নিস্তেজ! যৌবন তাদের অফুরন্ত—স্বচ্ছল, সতেজ, পরিপূর্ণ! মুখ—পরিষ্কার, যেন বনে ফুল আর ফোটে না! সকলেই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া—কাহারো মুখে কথা নাই, হাসি নাই, যেন এক মৌনব্রতে আত্মহারা!

ক্ষণকাল পরে চিত্ররথ স্মিতমুখে বাহির হইয়া আসিলেন—তাঁর চক্ষে দীপ্তি। তরুণীরা মাথা নত করিয়া মাটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিত্ররথ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "আমার নিষেধের অর্থ পেয়েছ ত?"

একটি তরুণী অগ্রণী হইয়া নিবেদন করিল, "পেয়েছি, রাজা! এইটুকুই যে, মন্দিরের দেবতার চেয়ে আজ আর এক বড় দেবতার আবির্ভাব হবে—মানুষ!"

"কে জান?"

"অতিথি, আর—"

চিত্ররথ হাত তুলিয়া বাধা দিয়া কহিলেন, "সে পরে। প্রথমেই, তিনি অতিথি!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিলেন, "তাই, আজ থেকে জমিয়ে রাখো—তোমাদের নাচ, তোমাদের গান, তোমাদের হাসি! উপহার দেবে—তাঁকেই!"

সকলেই মাথা নীচু করিল।

"চমৎকার! কিন্তু, কেন জান?—মন্দিরের দেবতার চেয়ে এ-রাজ্যে বড় অতিথি!"

সকলেই সমস্বরে বলিল—"জানি!"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমিও জানি—তোমরা জান! জান বোলেই, এই নিষেধ—নাচ-গান, হাসির মালা

মন্দিরে আর পড়বে না! দুর্লভ তোমাদের সেবা! আকাশের দেব্‌তাকে মন্দিরে পাথর করে রেখেচ, এইবার নিথর করবে পৃথিবীর মানুষকে! যাও—প্রস্তুত হয়ে থাকো—"

তরুণীরা ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিল, তারপর এদিক-ওদিক চতুর্দ্দিক দিয়া ঝোঁপ-বন, পাহাড়ের গায়ে মিশিয়া গেল।

এইবার রাজ-পুরোহিত বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। চিত্ররথ এক নিবিড়-চিন্তায় বার কয়েক এদিক-ওদিক করিয়া রাজ-পুরোহিতকে প্রশ্ন করিলেন, "ঠাকুর! এই কি আপনার নিয়ম?"

"হ্যাঁ! জাতির গৌরব!"

"কিন্তু, বিনিময়—নারী?"

রাজ-পুরোহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চিত্ররথের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "রাজা! বি—নিময়? ত্রিভুবন বিনিময় হতে পারে, কিন্তু—নারী হয় না! কেন জান?—নারীকে কেনা যায় না। সব দিয়ে সব মেলে, কিন্তু কিছুই দিয়ে এক খণ্ড নারী মেলে না!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিলেন, "নারী—শক্তি! তোমার এই নিবেদন—শক্তির ছোঁয়াচ! ভুলে যাও—নারী মানবী, ভুলে যাও—নারী রক্ত-মাংসের মূর্ত্তি, ভুলে যাও, রাজা—নারী স্থূল প্রতিমা! নারীর স্থান—ওপরে! ওখানকার ও বিদ্যুৎ—আকর্ষণ নিয়ে মাটিতে নামে, আকর্ষণ দিয়ে ওপরে উঠে যায়!"

খুব সত্য কথা। তাই বলিয়াই এ-রাজ্যে নারীর আদর এত! আর তাই বলিয়াই এ-রাজ্যে নারী এত স্বচ্ছন্দ, এত সহজ—বিধি নাই, নিষেধ নাই, শাসন নাই! বনের এরা ফুল—আপন মনে আপনিই ফোটে, গাছের এরা পাখী—আপন খেয়ালে, আপনিই শীষ্‌ দেয়, তরুর এরা লতা—আপন গতি নিয়ে আপনিই চলে। মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, ঝঞ্ঝা নাই, এদের মনের পথ নির্ম্মল, নির্ম্মুক্ত, নির্ব্বিবাদ।

এই বিশ্লেষণ, এই অনুভূতি—চিত্ররথের মনে শিহরণ তুলিল। চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণকাল রাজ-পুরোহিতের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, "জানি ঠাকুর, নারী বস্তু কি? কিন্তু, বাইরের প্রশ্ন?"

"বিশ্রী? তা হোক, তাই-ই হয়। কারণ, প্রশ্ন তুমি করতে পার না। তোমার নীচের স্নান যদি কোনোও দিন ওপরে ওঠে—বাইরের সঙ্গে মিশে যায়, তখন—বাইরে থেকে আসবে বিস্ময়, প্রশ্ন নয়!"

রাজ-পুরোহিত চিত্ররথের দিকে একটিবার তাকাইয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "সেই বিস্ময়কেই আমন্ত্রণ করে আসছ তুমি।"

চিত্ররথের মুখে এক উৎকট চিন্তার ছায়া পড়িল। কহিলেন, "কিন্তু এখনো ঘুলিয়ে যাচ্ছি! ঠাকুর, নীতির দিক দিয়ে?"

"রাজনীতি এ নয়। সমাজনীতি—এ জাতীয়তা! জাতির রক্ত হাতে নিয়ে তুলে ধরতে চলেছ! মিশিয়ে দিতে চলেছ একে, বাইরের সঙ্গে। এ ত অনাচার নয়, রাজা!"

"না হোক্। কিন্তু, ফাঁদ—"

রাজ-পুরোহিত একটু হাসিয়া কহিলেন, "না, রাজা! নর-নারীর মিলন মানুষের হাতে নয়। মানুষ বাঁধবে সমাজ, যখন হয়ে যাবে ওদের মিলন—যখন পরস্পর পরস্পরকে চিনে বেছে নেবে, সংযমের ভেতর দিয়ে, অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে, আচারের ভেতর দিয়ে।" রাজার দিকে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনশ্চ কহিলেন, "ঈশ্বরের চাক্ষুষ প্রকাশ সৌন্দর্য্য, এরই প্রতীক নারী। এদের ভেতর যারা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ রূপে আর গুণে অলৌকিক—ঈশ্বরের প্রকাশ তাদের ওপরই বেশি! তোমার রাজ্যের মেয়েরা—এরই মালিক। তাই এদের রূপে এত আকর্ষণ, গুণে শক্তি এতটা! রাজা, এই জন্যেই নিমন্ত্রণ—বাইরের অতিথির! এদের মিলন—বিধির নির্দ্দেশ, তোমার ফাঁদ নয়।

চিত্ররথের চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিতেছিল, যেন এক নূতন পৃথিবী একটু একটু করিয়া বাড়িয়া বড় হইয়া খাম্‌কা তাঁর চোখের উপর নিজেকে মেলিয়া ধরিয়াছে—যাহার ভিতর এক রঙের এক মাথার, এক বয়সের অফুরন্ত ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে মানব-সমাজের মহা-মিলনে মাতিয়া সারা হইতেছে—তাহাদের সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই, যেন সমাজ ইহাই চায়, ধর্ম্ম ইহাই অনুমোদন করে! কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিতে গিয়া তাঁর মুখখানা শুকাইয়া গেল। কহিলেন, "কিন্তু, ওদের মুখে যে শুধুই কলঙ্ক।

"কারণ, তোমার বুকে শুধুই ক্ষমা! রাজা, হিন্দুস্থান ওদের একার নয়! দ্বারীর কাঁটায় ওরাও যা, তুমিও তাই! হিন্দু তুমিও—সমাজে অংশ তোমারও আছে। তোমারও অধিকার আছে—ওদের বক্তে!"

"তবুও—"

"মুখ পাওনা? সে প্রশ্ন কর—মানুষের স্বার্থকে! জবাব পাবে—তুমি অহিমিয়া, জাতে নীচ!"

চিত্ররথ প্রশ্ন করিলেন, "এমন স্বার্থে মানুষের প্রয়োজন কি—বিশেষ?"

রাজ-পুরোহিত শ্লেষকণ্ঠে জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই! নইলে, সহোদরকে উপেক্ষা করা চলেনা, অবিচারের কদর থাকে না! রাজা, এই পাপকেই ধ্বংস করতে তোমার এই অভিযান। জাতিই বল, আর ধর্ম্মই বল—নারীই সমস্তর হৃদপিণ্ড! যে-দেশের শক্তি তোমার মেয়েদের মত এমন নারী সে-দেশ জাতেও খাটো নয়, ধর্ম্মেও ছোট নয়। এদেরই সুমুখ করে সত্যের বিচারশালায় চলেছ তুমি!"

"না হলে, আমাদের অপমান"—একটি পরমাশ্চর্য্য তরুণীর আবির্ভাব হইল। তাহার সৈনিকবেশ—হাতে ধনুর্ব্বাণ, সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পালঙ্কার, গলদেশে লম্বিত পুষ্পমাল্য।

উভয়েই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিলেন। চিত্ররথের কণ্ঠ দিয়া যেন আচম্‌কায় নির্গত হইল—'সুমিত্রা?"

সুমিত্রা উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ রাজা! এই মাত্র ফিরে আস্‌ছি। ওরা এতক্ষণ সীমান্ত পার হয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে।"

রাজ-পুরোহিত বিশেষ এক উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করিলেন, "পানীয়—"

"সবরেই পান করানো হয়েছে—অতিথি এখন অচেতন!"

কিজানি কি-এক দুঃসহ আনন্দ রাজ-পুরোহিতের চোখ-মুখ ফুঁড়িয়া বাহির হইতে লাগিল। প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "সাবাস্!" একটু থামিয়াই আবার প্রশ্ন করিলেন, "আর, শক্তি?"

"সম্পূর্ণ সুস্থ!" বলিয়াই সুমিত্রা যেন ঈষৎ লজ্জায় মুখটি নীচু করিল। পরক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "অজেয়কে সে জয় করেছে!"

চিত্ররথ নির্নিমেষনেত্রে এতক্ষণ সুমিত্রার দিকে চাহিয়া ছিলেন, রহিলেনও তেম্‌নি করিয়াই—যেন তিনি নির্ব্বিকার, নিশ্চেষ্ট, নিস্পন্দ! ক্ষণেক পরে ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "জানি সুমিত্রা! এ হবেই হবে!" একটু থামিয়াই যেন ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, আর অপেক্ষা করো না তুমি—সন্ধ্যা নেমেছে! প্রচার করে দাও—আজ রাত্রে রাজ্যের সমস্ত দ্বারই বন্ধ থাক্‌বে, এক প্রাণীও বাইরে না আসে, একটি রবও না ওঠে!"

"তাই যদি হয়, রাজা?"—মন্দিরের পাশ দিয়া একটি নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখের আভা সেখানে যেন আলো ফেলিল। মূর্ত্তিটি রাজ-পুরোহিতের পদস্পর্শ করিয়া পুনশ্চ রাজার দিকে ফিরিয়া প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করিলেন, "তাই যদি হয়?"

চিত্ররথ সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন, "রাণী, তুমি?"

রাণী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার প্রশ্নের জবাব ও ত নয়!"

চিত্ররথ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। জবাব দিলেন রাজ-পুরোহিত, কহিলেন, "রাজ-নিষেধের অপমান—কঠোর শাস্তি!"

"বিচারক?"

"রাজা!"

"না। রাণী।"

চিত্ররথ বিস্ময়ে রাণীর দিকে তাকাইতেই রাণী গম্ভীর মুখে কহিলেন, "জান্‌তে চাইছ—কেন? রাজা, এ-রাজ্যে নিষেধ কোনোদিন নামেনি, শৃঙ্খল কেউ পরেনি। পরছে—আজ! তাই, শাসন তোমার, বিচার আমার!" রাজার দিকে এক কটাক্ষ করিয়া উক্তিটা শেষ করিলেন, "তাই—" বলিয়া আর দাঁড়াইলেন না।

সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল, যেন নরলোকে এইমাত্র আকাশ-বাণী হইয়াছে, মানুষে যেন তার সূত্র খুঁজিয়া পাইবে না।

ক্ষণকাল পরেই চিত্ররথের চমক ভাঙ্গিল। সুমিত্রার দিকে ফিরিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাজ আদেশ—"

সুমিত্রা একটিবার নতশির হইল, তারপর তেম্‌নি করিয়াই যেমন বাহির হইয়া যাইবে, চিত্ররথ পুনশ্চ ডাকিলেন।

কহিলেন, "বাইরে থাকবে তুমি, আর তোমার রক্ষী। কিন্তু, মনে রেখো, তোমাদের আড়াল—অতিথির পথ!"

সুমিত্রা আর দাঁড়াইল না।

বাকি রহিলেন—চিত্ররথ ও রাজ-পুরোহিত, মুখোমুখি হইয়া, অথচ কাহারো মুখে কথা নাই, যেন তাঁদের মুখ খোলা আর চলে না, মানায় না।

তিন

নূতন-পথের যাত্রী। চন্দন আর কোনও প্রশ্ন করে নাই। তাহার খণ্ড-জীবনের একপ্রান্ত কোথাকার কোন্ নির্দ্দেশহীন তীর্থে পড়িয়া আছে, তাহাকেই সে খুঁজিয়া লইয়া বুকে ধরিবে!

নীরব, নিঃশব্দ বনপথ। ইহারই ভিতর দিয়া শক্তি ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে—লোক নাই, লোকালয় নাই—বন আর পাহাড়, পাহাড় আর বন। এরই ফাঁকে-ফাঁকে সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথ—উঁচু-নীচু, নীচু-উঁচু। রাস্তায় অবরোধ পদে-পদে। কোনো স্থানে বৃক্ষশাখা পাশ হইতে গলা বাড়াইয়া দেয়, আর অম্নি শক্তি চন্দনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘোড়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। কোনোও স্থানে বা এক ঝাঁক পাতার ঝোপ তাদের বুকে আসিয়া পড়ে, চন্দন অম্নি শক্তির কোলের ভিতর মাথা গুঁজিয়া ফেলে—শক্তিও তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া উহা কৌশলে কাটাইয়া পার হইয়া যায়। এইরূপ সারারাত্রি উঁহারা ছুটিয়াছে—মাখামাখি হইয়া। ভোরের দিকটায় সুরু হইল ফুলের বন—ফুল আর ফুল। বনের শ্যামরূপ আর চোখে পড়ে না—সুমুখে যেন শাদা-রাঙা-হলুদের ঢেউ উঠিয়াছে, অনন্তবিস্তারী। একটি উৎরায়ের মুখে নাম্‌তেই অশ্বের গতিরোধ হইল। দেখিল, রাস্তার দুইধার হইতে সারি দিয়া লতা-পল্লব রাস্তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঠেকাঠেকি হইয়াছে—মাথায় ফুলের গোছা, যেন রাস্তার দুটি পাশ হাত যোড় করিয়া পথিককে নিবেদন করিতে চায়—তাহাদের সৌখীন প্রভাত!

শক্তি চন্দনকে মাথা নীচু করিতে ইঙ্গিত করিয়া একহাতে ঘোড়ার রশ্মি ধরিল ও অপর হাতে লতাপাতা ঠেলিয়া উঠাইয়া মাথা নোয়াইয়া নির্গত হইয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সহস্র ফুল বোঁটা খসিয়া তাহাদের উপর ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গেল।

শক্তি একটিবার ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কি হলো বলুন দিকি?

চন্দন সবিস্ময়ে শক্তির দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি হলো?

"ওরা কেঁদে ফেল্‌লে!"

চন্দন হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি কাঁদিয়েছি?"

শক্তি আর বিরুক্তি করিল না। শুধুই আড়চোখে একটিবার কটাক্ষ করিয়াই গন্তব্য পথে পুনশ্চ ছুট্ দিল। কিয়দ্দূর গিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, বেশ মিষ্টি গন্ধ, না?

"সত্যি!"

"ভালো লাগে?"

চন্দন বলিল, "ফুলের গন্ধ ভাল না লাগে কার?"

"ফুলের তুলনা কি, জানেন?"

"বল না?"

"পণ্ডিত মানুষ, আপনি জানেন না?"

চন্দন এইবার যেন একটু বিপদে পড়িল। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "স্রষ্টার রূপ!"

"ও হলো বাজে কথা! স্রষ্টার রূপ কেউ কোনোদিন চোখে দেখেনি। সুতরাং, যা অ-দেখা তা' কিছুরই উপমা হয় না!"

তর্ক করা চলে না—খাঁটি সত্য কথা! আর ইহাও মিথ্যা নয়—সে যাহা বলিয়াছে; হাতের গোড়ায় পুঁথি থাকিলে সে এই দণ্ডেই উহা প্রমাণ করিয়া এই সৃষ্টিছাড়া ছেলেটাকে পরাজিত করিত! কিন্তু সে যে নিরুপায়! কাযেই, ঠকিবার আশঙ্কায় কোন আকস্মিক বাস্তবকে ঠেলিয়া কল্পনাকে গ্রহণ করিতে তার সাহস হইল না। কহিল, "তবে?"

"নারী।"

অশ্ব দৌড় দিয়াছে, নইলে চন্দন নিশ্চয়ই লাফ মারিত। চম্‌কিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া উঠিল, যেন পিঠে বেত পড়িয়াছে! বলিল, কি বলছ? স্বর্গীয় বস্তুর সঙ্গে নরকের নোংরার উপমা? আমাদের সন্ন্যাস-তন্ত্রে বলে—নারী নরকের দ্বার!"

"তাই নাকি?"—শক্তি যেন নির্ব্বোধ।

"নিশ্চয়ই। এই জন্যই সাধুরা আগেই ত্যাগ করেন—কামিনী!"

শক্তি ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিল।

এইরূপে তাহারা ছয় সাতদিনের রাস্তা অতিক্রম করিয়াছে। মাঝে-মাঝে থামে, নামে—বিশ্রাম করে; শক্তি ফল-মূল আহরণ করিয়া আনে, উভয়ে আহার করে—যেন বেশি করিয়া বনের মানুষ শক্তি, বনের খবর সেই-ই রাখে বেশি করিয়া। অতঃপর এমনিই এক দুর্ভেদ্য নিবিড় অরণ্যের মুখে আসিয়া পড়িল, যে তাহার ভিতর আর ঢোকা চলে না। ইহাই যদি বা আদি হয়, তবে কোনো দিন, কোনও কালে নিশ্চয়ই অন্ত এর আর মিলিবে না; যেন ত্রিভুবনের ইহা এক তৃতীয়াংশ—ভূলোক বলিয়া যে আর এক ধরিত্রীর প্রচার, তাহা উপকথা। শক্তি থমকিয়া দাঁড়াইল—যেন ইহাদের পশ্চাতের আর-সব মুছিয়া গিয়াছে, যেন পশ্চাতে পড়িয়া কোনও কথা নাই, কাহিনী নাই, ইতিহাস নাই, ভূগোল নাই, সত্য নাই, মিথ্যা নাই! সবই সম্মুখে—ওই বিরাট, ওই মহান, ওই ভয়ঙ্কর—ত্রিলোকের ওই একমাত্র ইহলোক!

চন্দনের মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে! কিন্তু, সে বনচারী সন্ন্যাসী—বিভীষিকা তার কাছে উপহাস! সুতরাং, তাচ্ছিল্য সহই কহিল, "পথ হারিয়েছ বুঝি?"

"না। এই-ই পথ—"

"ওই পথ?"

"হ্যাঁ! ওই যে দেখছেন সারি সারি গাছ, পায়ে পায়ে জড়িয়েছে—ওই যে রয়েছে অন্ধকার, কালো-কালো—ওই যে ওই পটভূমি—ওরই ফাঁকে-ফাঁকে এঁকে বেঁকে রাস্তা!"

"তারপর?"

"তারপর?—ওরই ভেতরে-ভেতরে চল্‌বো আপনি আর আমি!"—আর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই শক্তি ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

দুর্গম পথ, রুক্ষ প্রণালী, কর্কশ নির্দেশ—তাহারই ভিতর দিয়া ঘোড়া চলিয়াছে, কোনো স্থানে ছুটিয়া, কোনো স্থানে আস্তে, কোনো স্থানে লাফাইয়া, কোনোও স্থানে বা হাটিসই হইয়া! এমনিভাবে খানিকটা রাস্তা আসিয়াই শক্তি হঠাৎ ঘোড়া থামাইল। সহাস্যে বলিল, "আর শুধু-হাতে যাওয়া চল্‌বে না—বাঘ-ভালুক আছে!" বলিয়াই নামিয়া পড়িল, তারপর ঘোড়ার লাগামটা চন্দনের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "একটুখানি অপেক্ষা করুন, তীর-ধনু আনি—কাছেই আছে—"

"এইখানে?"

"হ্যাঁ, আসবার সময় একটা গাছে বেঁধে গেছি—অস্ত্র না আন্‌লে এ-রাস্তায় কি নিস্তার আছে, ঠাকুর!"—একমুখ হাসিয়াই শক্তি বনের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

চন্দন নির্ব্বাক হইয়াই রহিল,—তাহার আর প্রশ্ন করাই নিরর্থক। শুধুই তার মনে আঘাত পড়িল—'এ ছেলেটা কে? এই নির্জ্জন অভিযান, দুর্ভেদ্য বনপথ, বাঘ-ভালুক, পদে পদে মৃত্যুর করতালি, সবই কি এর অবহেলার বস্তু?' এইসব কথা মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতেই শক্তি ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিল। একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল "ভয় পেয়েছেন নাকি?" বলিয়াই আবার ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িল। অতঃপর মুখের কাছে মুখ আনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "পেয়েছেন?"

একখানি পরিষ্কার—পরিপাটি মুখ! চড়া কথাও চলে না। একটু পরে গম্ভীর মুখে চন্দন বলিল, "তীরধনুকে কি আট্‌কাবে, শুনি?"

শক্তির মুখে যেন হাসি লাগিয়াই আছে। বলিল, "দেখ্‌বেন—সাম্‌নে পড়ি!"

"তা' হলে, পড়্‌বে—এটা ঠিক?"

"পড়তেও পারি।"

ইহার অপেক্ষা সরল জবাব আর হইতেই পারে না। কাজেই চন্দন আর কথা কহিল না।

এইরূপে আরও প্রায় তিন দিনের রাস্তা তাহারা পার হইয়াছে—সেই আতঙ্কের বুক মাড়াইয়া। শক্তি মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করে—'ভয় করছে?' চন্দন প্রত্যুত্তর করে—'আর কতদূর?' শক্তি হাসিয়া বলে—'আর এসে পড়েছি!' চন্দন নীরব হইয়া থাকে। এ ছাড়া ত উপায় নাই! সুমুখে-পশ্চাতে—চতুর্দ্দিকে অরণ্য, বিচরণ করিবার এই তার

বর্ত্তমান ক্ষেত্র, এই তার লক্ষ লক্ষ বৃন্দাবন! নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—তার অতীতের আলোক-বর্ত্ম, মুছিয়া গিয়াছে তার পশ্চাতের ইতিহাস, নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তার ইহলোকের দেবভূমি! জীবনের এই পরমাশ্চর্য্য ক্ষণে, ইষ্টদেব তার—এই বন, এই অন্ধকার, ওই বাঘ-ভালুক, আর এই বুনো সঙ্গীটি!

হঠাৎ ঘোড়াটা লাফাইয়া উঠিল ও চন্দন সজোরে শক্তির বুকের উপর হেলিয়া পড়িল। ওকি—

শক্তি তাড়াতাড়ি চন্দনকে তুলিয়া বসাইয়া দিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে বলিল "বাঘ দেখেছে!"

ঘোড়াটা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না—পশ্চাতে হটিয়া আসিবার জন্য জোর ধরিল। শক্তি রশ্মি টানিয়া ধরিয়া তাকে ঠাণ্ডা করিয়া এদিক-ওদিক লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ যে! ওই ঝোপের ভেতর—"

চন্দন তখন আর একটু পিছাইয়া বসিয়াছে। আড়ষ্ট কণ্ঠে কহিল—"কৈ?"

শক্তি চন্দনকে বুকের কাছে একটু টানিয়া আনিয়া এক হাতে তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া অপর হাত দিয়া সমুখে নির্দ্দেশ করিল, "দেখুন সামনে—ওই ঝোপ—ওরই ভেতর—"

নির্দ্দেশমত চোখ ফেলিতেই চন্দনের মুখখানা শুকাইয়া গেল। অবশকণ্ঠে বলিল, "সুমুখেই!"

শক্তি নির্ব্বিকারচিত্তে জবাব দিল, "তাই থাকে!"

"আর কি রাস্তা ছিল না?"

শক্তি এইবার হাসিয়া ফেলিল, "না।"

সাধু-সন্ন্যাসীদের একটি প্রধান অবলম্বন—মৌনব্রত, তাই চন্দন আর কথাটি কহিল না।

শক্তি ঝোঁপটার দিকে কিয়ৎক্ষণ স্থির লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওদিকে মুখ করে আছে, এম্‌নি ও যাবে না!" বলিয়াই ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর লাগামটা চন্দনের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, 'খুব শক্ত করে ধরে রাখবেন, আর এই নিন্ তীরধনু—'

"তুমি?"

"তাড়িয়ে দিয়ে আসি, নইলে ঘোড়া চল্‌বে না!"

"শুধু হাতে?"

শক্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "গাছের ডাল ভেঙে নেব'খন! হ্যাঁ—খুব সাবধান! যদি আপনার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তীর ছুঁড়বেন—পারবেন ত?"

বলে কি! এদের কথাও দুর্ব্বোধ্য কাহিনীও অশ্রুত! চন্দন জবাব দিল, "প্রাণী হিংসা আমাদের নিষেধ!"

"এমন বনে নয়! শীগগীর ধরুন—এদিকে মুখ ফেরালে আর নিস্তার নেই!"

চন্দনের অহিংসাতত্ত্ব আপাততঃ চাপা রহিল, তাড়াতাড়ি ধনুকটা সজোরে ধরিয়া বলিল, "ছুঁড়বো কেমন করে?"

"তবেই হয়েছে!—এম্‌নি করে গো, এম্‌নি করে—" বলিয়া শক্তি তাহাকে একটিবার দেখাইয়া দিয়াই কহিল, "কিন্তু ঝাঁপিয়ে না এলে ছুঁড়বেন না, কখখনো! তা হলেই, মুস্কিল!"—বলিয়াই শক্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

চন্দনের অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইল, বলা যায় না, তবে তার মুখ চোখের আকার দেখিয়া ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, সে বৈষ্ণবের দেবতাকে সবংশে স্মরণ করিয়াছে! একবার করিয়া ঝোঁপটার দিকে চায় ও একবার করিয়া ধনুকে তীর জুড়িয়া দেখে—তেম্‌নিটি হইল কি না!

এক মিনিট, দু'মিনিট—পাঁচ মিনিট যাইতে-না-যাইতেই ঝোঁপটার ভিতর আলোড়ন উঠিল, আর অম্‌নি চন্দনও প্রাণপণ শক্তিতে সেইদিকে তীর নিক্ষেপ করিয়া বসিল। মুহূর্ত্তও অপব্যয় হইল না—বাঘটা গর্জ্জন করিয়া বাহির হইয়া আসিল ও সুমুখে তার আততায়ীকে দেখিতে পাইয়াই তাহার উদ্দেশে লাফ মারিয়া যেমন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে, অম্‌নি পাশের বন ফুঁড়িয়া বিদ্যুতের ন্যায় একটি অশ্বারোহিনী ঠিক চন্দনের অশ্বের সাম্‌নে বুক পাতিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—ছবির ন্যায়! বাঘটাও ঠিক একই সঙ্গে তাহার গা গড়াইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পর ভয় পাইয়াই হউক বা যে কারণেই হউক বাঘটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বনের ভিতর ছুট দিল।

তখন চন্দনের দিকে আর চাওয়া যায়না! তীরধনু হাত হইতে খসিয়া গিয়াছে, ঘোড়ার লাগাম হস্তচ্যুত—নিজেও নীচে পড় পড় হইয়াছে!

মূর্ত্তিটি এইবার চন্দনের দিকে সরিয়া গিয়া কহিল, "খুব ভয় পেয়েছেন, না?"

চন্দন তখনোও প্রকৃতিস্থ হয় নাই। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

মূর্ত্তিটি একমুখ হাসিয়া পুনশ্চ কহিল, "আর ত ভয় নেই!"

আবার এক হাসিমুখ! যেন এঁর মুখেও মৃত্যুর টুকরায় সোনার রঙ্ ধরিয়াছে! কিন্তু ইনি কে? চন্দন মূঢ়ের ন্যায় প্রশ্ন করিল, "আপনি?" বলিয়াই নামিয়া দাঁড়াইল।

মূর্ত্তিটি স্মিতমুখে উত্তর দিল, "দেখছেন না?"

"নাম?"

"সুমিত্রা।"

পদধূলি দিন—"চন্দন যেমন মাথা নীচু করিবে, অমনি অকস্মাৎ কে আসিয়া তার হাতটা ধরিয়া ফেলিল। চন্দন চাহিয়া দেখিল—শক্তি।

শক্তি মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "করেন কি! নরকের দ্বার—নারী!"

"অস্ত্র দাও—জিভ্ কেটে ফেলি! শক্তি—ওকি! কোথায় তিনি—"

"মিলিয়ে গেছেন।"

"মিলিয়ে গেছেন?"

"তাই যায়। সন্ন্যাসি! আচম্‌কায় নারী আসে পুরুষকে বাঁচাতে, বাঁচিয়ে আবার আচম্‌কায় চলে যায়! দাঁড়িয়ে থাকে না!"

চন্দনের মুখে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকিল, পরক্ষণেই মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "শক্তি, আমাকে নিয়ে চল সেই লোকালয়ে—যেখানে নারীর পূজো হয়।"

হাসিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তত্রাপি, শক্তি অনর্থক একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠকে যাবেন! নারী পুরুষের পূজো নেয় না! কি নেয় জানেন?—প্রেম!"

"অর্থাৎ—"

"ভালবাসা!"

"তার মানে?"

"আপনি বোঝেন না!" বলিয়াই শক্তি চন্দনকে ঘোড়ায় উঠিতে নির্দ্দেশ করিল।

চন্দন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুখে বাধিল। এবং নির্ব্বাক হইয়াই অশ্বারোহণ করিল, শক্তিও পূর্ব্বের ন্যায় পশ্চাতে উঠিয়া বসিয়া পুনশ্চ যাত্রা সুরু করিল।

চার

চন্দন আর শক্তি, শক্তি আর চন্দন।

গায়ে-গায়ে বসিয়া—উভয়েই নির্ব্বাক। যেন আর কেহ মুখ খুলিবে না, প্রশ্ন করিবে না—যেন বা, নিজেকে নিজে শাসনে রাখিয়াছে, নিষেধ করিয়াছে, দিলেশা দিয়াছে। কেন যে, তাহাও কেহ জানে না, যেন ইহাই নিয়ম, বিধি!

অল্লাধিক একটা দিনের রাস্তা পার হইতেই, চন্দনের চোখে হঠাৎ এক-পৃথিবী আলো পড়িল। বুঝিল, বন অতিক্রম করিয়াছে। তারপর চোখে পড়িল, ভূখণ্ডের এক পরমাশ্চর্য্য ছবি—এ কোন্ দেশ? দূর-বিস্তৃত পটভূমি—এখানে-ওখানে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া শিলামঞ্চ, সবগুলিই স্বাধীন, পৃথক, উন্নতচূড়। উহাদের গাত্র ভরিয়া লতাপুষ্প—নানারঙের, নানাজাতির। দূর হইতে মনে হয়, গায়ে-গায়ে রঙ্ ধরিয়াছে—কত কি! প্রত্যেকটি ভিন্ন রঙের, ভিন্ন জাতির। কিংবা বিচিত্র ও পুষ্পের দেউল! যেখানে যেটি যে ব্যবধানে রাখিলে মানায়, ঠিক্ তেম্‌নি করিয়াই কে-যেন একদিনে এক নিঃশ্বাসে গাঁথিয়া, বসাইয়া, সাজাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়াছে! প্রত্যেকটির চারিদিক বেড়িয়া লতাকুঞ্জ—ডালে-ডালে জড়ানো, পাতায় পাতায় মুখোমুখী। প্রতি পাতাটি রঙীণ, রঙ্ও স্বতন্ত্র। * * * চন্দন তন্ময় হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল—ধরিত্রীর এক স্বপ্নরূপ!—এ কোন্ দেশ?

সহসা অশ্বের গতি থামিতেই, চন্দনের চমক ভাঙ্গিল। প্রশ্ন করিল, "এইখানেই—তোমার আশ্রম?"

"না। আরও একদিনের পথ।"

"থাম্‌লে?"

শক্তি মুখখানা ভারি করিয়া বলিল, "আমার ক্ষিদে পায়নে, বুঝি! দেখুন, খুব ছোট্টবেলায় রামচন্দ্র একবার লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন—শিকার করতে! লক্ষ্মণ আরও কচি, ক্ষিদেয় আর নড়তে পারে না—ওকি! অমন করে চাইছেন আমার দিকে?" মুখখানা যেন কাঁদ-কাঁদ করিয়া আবার সুরু করিল, "রামচন্দ্র কি করলেন, জানেন?—একটি ফল পেড়ে লক্ষ্মণের মুখে দিলেন, আর অম্‌নি ক্ষিধে-তেষ্টা এম্‌নি উড়ে গেল তাঁর, যে পরে বনে গিয়ে চোদ্দ বছর আর 'শ্রীবিষ্ণু' করেন নি!" একটু থামিয়াই পুনশ্চ কহিল, "আর আপনি?—সাধু মানুষ কি না! নইলে, বিশ্বামিত্র-ঋষি আর রাম লক্ষ্মণকে রাক্ষসীর মুখে ঠেলে দেয়!"

চন্দন লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, "এ-পথে তুমিই আমার অগ্রজ।"

"খুব হয়েছে।"

শক্তি আবার ঘোড়া ছাড়িয়া দিল। মাইল দুয়েক গিয়াছে, এক নারীকণ্ঠের সঙ্গীত তাহাদের কাণে আসিল। শক্তি চমকিয়া ঘোড়া থামাইয়া সেইদিকে কাণ পাতিতেই, চন্দন বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এখানে মানুষ আছে?"

শক্তি যেন তন্ময় হইয়াই প্রত্যুত্তর দিল, "মেয়েমানুষ!

বোধ করি, কোনো আশ্রম-বালিকা।" বলিয়াই সেইদিকে অগ্রসর হইল। কাছাকাছি হইতেই দেখিতে পাইল, এক পাহাড়ের নীচে একটি লতাকুটীর, তাহারই মুখে দাঁড়াইয়া একটি তরুণী।

গান থামিতেই, উভয়ে নিকটে সরিয়া গেল, এবং তাহাদের এই আকস্মিক আবির্ভাব মেয়েটিকে অকারণে লজ্জায় ফেলিয়া তার মুখটি রাঙাইয়া দিল।

শক্তি পরিচয় দিল—'অহমিয়া।'

মেয়েটি বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সৌভাগ্য!"

চন্দন চমকিয়া উঠিল, কহিল, "একি! আপনি?"

মেয়েটি চন্দনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "অর্থাৎ—"

চন্দনের মুখে আর কথা সরে না। শুধুই বিহ্বলের ন্যায় মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু, বেচারাকে লজ্জায় ফেলিল শক্তি। বলিল "মেয়েমানুষের পানে অমনি করেই চাইতে হয়?"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কুটীরের ভিতর হইতে তৃণাসন আনিয়া পাতিয়া দিল।

বসিল চন্দন, বসিল শক্তি—চন্দন মুখ নীচু করিয়া, শক্তি মুখ উঁচু করিয়া।

মেয়েটি শক্তিকে একটু মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "খামকা ওঁকে আপনি লজ্জা দিলেন।"

শক্তি অকারণে একমুখ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "মোটেই না। লজ্জা হচ্ছে মনের পাপ। উনি যে বৈষ্ণব।"

মেয়েটি যেন এইবার তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ দিয়াছে। তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল ফেলিয়া চন্দনকে প্রণাম করিল। তারপর সহাস্যে বলিল, "হ্যাঁ, আমি—সুমিত্রা।"

লজ্জা করিলে আর চলিবে না, কারণ শক্তি এইমাত্র সরমের অর্থ করিয়া দিয়াছে। কাযেই নেহাৎ সপ্রতিভ হইয়াই কহিল, আপনার নিবাস এইখানে?"

"ঠিক নেই। যেখানে যেদিন সুবিধে।"

"একলাটি?"

সুমিত্রা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "সঙ্গী মেলেনা, ভাই।" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, ভয় করে না, জিজ্ঞেস্ করছেন? —বাঘ ভাল্লুকের কত ভয়, তার প্রমাণ পেয়েছেন!—মানুষের ভয়? যে মানুষ, তার কাছে আমাদের ভয় থাকেনা। তার কাছে—নারী পুজোর দেবী! যে পশু, তার জন্য আমাদের অস্ত্রও রয়েছে—চোখের চাউনি, দেহের রূপ!"

শক্তির মুখচোখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল, সে যেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ক্ষমা করবেন—ও-সব আলোচনা ওঁর সঙ্গে করা বৃথা। উনি পশুও নন, মানুষও নন—উনি মহা-মানুষ। তার মানে—পশুর ওপরে মানুষ, মানুষের ওপরে সাধু! উপস্থিত, বোধ করি, আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে—আপনাকে ছলনা করতে এসেছি।

সুমিত্রা হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমিও প্রস্তুত—"বলিয়াই কুটীরে প্রবেশ করিল এবং অবিলম্বেই দুইটি পত্র-পাত্র ভরিয়া নানাবিধ ফলমূল আনিয়া তাহাদের সুমুখে ধরিয়া দিল। অতিথিদ্বয়ও নির্বিবাদে সে গুলির যথারীতি মর্য্যাদা রক্ষা করিল। অবশেষে পানীয় পাত্রে মুখ দিয়াই শক্তি বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!"

চন্দনও তখন প্রায় অর্দ্ধেকটা নিঃশেষ করিয়াছে. বলিল, "সত্যি! এত মিষ্টি এখানকার জল?"

সুমিত্রা একটু হাসিয়া বলিল, "জল নয়। গাছের রস! এ পান করলে ক্ষুধা তৃষ্ণায় মানুষ চট্ করে কাতর হয় না—মনে অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি পায়!—আর একটু দেব?"

চন্দন চুমুক দিয়া বাকিটুকু শেষ করিয়া বলিল, "দি—ন!" সহসা কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিল।

সুমিত্রা আর খানিক আনিয়া ঢালিয়া দিল। এবং চন্দন তৎক্ষণাৎ সেটুকুও নিঃশেষ করিয়া পুনশ্চ ইঙ্গিত করিল—'আবার।' তখন তার চোখদুটি বুজিয়া আসিয়াছে।

সুমিত্রা মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। শক্তি মুচকিয়া হাসিয়া চন্দনের পিঠের কাছে আসিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তির বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল, অচেতন হইয়া। অতঃপর শক্তি একপ্রকার ইঙ্গিত করিতেই, সুমিত্রা এক অপরূপ সাজে সাজিল, যেন এইমাত্র এক রণে জয়-পতাকা উড়াইয়া আসিয়াছে। তারপর পাহাড়ের আড়াল হইতে একটি ঘোড়া বাহির করিয়া আনিয়া আরোহণ করিয়া, অদৃশ্য হইয়া গেল।

কোথায় ছুটিয়াছে, সেই-ই জানে, আর জানে বুঝিবা শক্তি। সোজা পথ—বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, নিষেধ নাই। মাঝে মাঝে রাস্তা সরু—দুইপাশে ঘন-অটবী। এমনিই এক রাস্তায় ঢুকিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াছে, হঠাৎ সে থমকিয়া ঘোড়ার লাগাম টানিয়া ধরিল—সম্মুখেই কার ছায়া যেন পথ রোধ করিয়াছে। * * * ঘোড়াটিকে খানিকটা পিছাইয়া আনিয়া স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে প্রার্থনা করিল,—"পথ ছাড়ো।"

সেই বনের বুক ফুঁড়িয়া এক অতি কাতকণ্ঠের জবাব আসিল, "ভুল হয়েছে। এ যে তোমার পথ।"

"না। রাজপথ।"—কথা কয়টি সুমিত্রার মুখ দিয়া বাহির হইতে-না-হইতেই ছায়াটি মিলাইয়া গেল, সুমিত্রারও হাতের মুঠি সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল। অতঃপর পুনশ্চ তার গতি সুরু হইল ওই রাজপথে, যার আর এক প্রান্তে পড়িয়া শক্তি—চন্দনকে বুকে করিয়া! (ক্রমশঃ)

শ্রীচরণদাস ঘোষ

রেণী-ডে

শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত

তোমার ওখানে কালো মেঘে মেঘে
আকাশ ছাওয়া,
বৃষ্টি পড়ছে,—ইস্কুলে তাই
হবে না যাওয়া।
ঝম্‌ঝমাঝম্ চারিদিক ভ'রে
নেমেছে জল ;
সকাল বেলায় সন্ধ্যার মত
গগনতল !

একলা তোমার জানালার ধারে
ব'সেছ তুমি,
পাহাড়ী বাতাস সোহাগ করিছে
নয়ন চুমি'।
উতলা-আকুল প্রভাতে এসেছে
শুভক্ষণ,—
তোমার সকাশে পাঠায়েছে তা'র
নিমন্ত্রণ !

ইস্কুল থেকে খবর এসেছে
রেণী-ডে আজ ;
ওভারকোট্‌টা খুলিয়া রেখেছ,
ছেড়েছ' সাজ।
হেড্‌মিসট্রেস্ বিভা সেন তবে
মন্দ নয় !
বরষার দিনে তারো মনে জানি
কী ভাব বয় !

জানো কি রাঙাদি, আমরা যখন
কলেজে পড়ি,—
বিভাদি'র নামে য়্যাক্রস্‌টিক্
রচনা করি।
প্রভাতী আবার তাই নিয়ে তাঁকে
দেখিয়েছিল ঃ
বিভাদির প্রাণে তখনো আসেনি
মলয়ানিল !

দার্জ্জিলিঙ্-এর পাহাড় বাহিয়া
নামিছে বারি ;
ঝর্‌ণা গাহিছে, "প্রাণের বাসনা
রুধিতে নারি।"
পাইনের বনে সুরের কাঁপন
উঠিছে রণি' ;—
রাঙাদি, তোমার অন্তরে তা'রি
প্রতিধ্বনি !

বাহিরের পথে ঘনবরষণ
কাঁদিয়া ফিরে,
ছায়ালোক হ'তে আসে আবাহন
অশ্রুনীরে।
এমন রেণী-ডে বিফল হবে না
জানি গো জানি ;
নয়নে তোমার শাঙন নেমেছে
বাদলরাণী !

আজিকার দিনে সত্যই তুমি
বাদলরাণী ;
রাঙাদি' তোমার অশ্রুধোয়ানো
আননখানি—
ঢাকিয়া র'য়েছে মেঘের মতন
কেশের গুছি,
মিনতি আমার—অশ্রু-মুকুতা
নিয়োনা মুছি' ।

ভাবিছ হয়তো কত পথিকের
কথার রেখা—
মিলাইয়া যায় স্মৃতির ভেলায়
যায় না দেখা ।
কে যেন কখন ব'লেছিল কোন্
বিদায়-ক্ষণে,—
"তোমার স্নেহের সকল পরশ
রহিবে মনে ।"

বহুদিন পরে কেহ ব'লেছিল
আরেকদিন,
"রাঙাদি, তোমার না-বাজা সেতার
তুলনাহীন !
আকাশ হইতে এনেছ' ছন্দ
চরণতলে,
চিত্ত ভরিয়া আনিয়াছ স্নেহ
নয়ন জলে ।"

সে-কথা থাকুক, সে-কথায় আজ
কাজ ত' নাহি,
মানসনেত্রে আজ রহিয়াছি
সুদূরে চাহি ।

বলিতেছিলাম, তোমার ওখানে
মেঘের মেলা ;
বিজন রেণী-ডে, বিজন দুপুর
বিজন বেলা ।

ভাবনা চ'লেছে শূন্যের পথে
অনেকদূর !
'মেঘদূত' নাহি, আছে 'চয়নিকা'
রবিবাবুর ।
'শেষের কবিতা' আছে, আর আছে
বাদলবায় ;—
আজিকার দিনে মন নাহি বসে
চয়নিকায় !

যেদিকে চাহিছ শুধুই পাহাড়,—
শিলঙ্ যেন ;
মনে হয় তোমা রবিঠাকুরের
'বন্যা' হেন ,—
চূর্ণ-চিকুর ছড়ানো তোমার
আঁখিপাতায়,
অন্তর ভরি' ধ্যানের মূরতি
'অমিত রায়' !

সেদিন এমনি মেঘমন্থর
প্রভাতকাল ;
অপমান বহি' চ'লে গিয়েছিল
শোভনলাল ।
আহত প্রেমের ব্যথিত বাসনা
মন্ত্র জানে ;
প্রতিশোধ নিল নবরূপে আসি'
'মিতা'র প্রাণে ।

স্বপ্নের মত দিন কেটে যায়
শিলঙ্‌ চূড়ে ;
নিবারণ-মিতা, বন্যা-রবির
ছন্দে-সুরে ;—
ব্রাউনিঙ্‌ কীটস্‌, শেলী কালিদাস
সবারে চাই ;—
মিল আছে ঠিক, ছন্দও আছে,
কবিতা নাই !

তারপরে এলো 'কেতকী মিত্র'
ভাঙ্গিল সব ;
শোভনের প্রেম দেখিল সেদিন
মহোৎসব ।
'বন্যা' কহিল, "খুলিতে বলোনা
হে মোর প্রিয়,
কেতকীর হাতে তোমার পরানো
অঙ্গুরীয় !..."

রামগড়, সে ও পাহাড়ের দেশ
এমনিধারা ;
বিজয়ী শোভন চাহিয়া রয়েছে
তন্দ্রাহারা !
জয়ী প্রেম তার, চূর্ণ ক'রেছে
অহঙ্কার ;
'বন্যা' মরিয়া হল 'লাবণ্য'
চমৎকার !

শেষের কবিতা আসিল, তখন
বিদায়-বেলা ;
হয়তো সেদিন এমনি আকাশে
মেঘের খেলা ।
বন্যা লিখিল, "বন্ধু, বিদায় !
রহিল প্রেম,
তারে আমি প্রিয় তব উদ্দেশে
রেখে এলেম !"

* * * *

'বন্যা'র মত চাহিয়ো, পাইয়ো,
ক'রোনা ভুল ;
'শোভনলালের' চিত্তে ফুটায়ো
হাসির ফুল ;
'অমিত রায়ের' কথার চাতুরী,
গোপন করা ;—
তোমার সজল কাজল নয়নে
পড়িবে ধরা !

দেখ, দেখ চেয়ে 'কাঞ্চন'-চূড়ে
কিরণ-লেখা ;
মেঘের আড়ালে সোনার সূর্য্য
দিতেছে দেখা ।
চোখের পাতায় পরশ করিছে
তন্দ্রা-চুম্‌ ;
রেণী-ডে আজকে, ইস্কুল নাই,
আসিছে ঘুম !

অসমাপিকা

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

"Life differs from the play only in this—it has no plot—all is vague and unconnected—till the curtain drops with the mystery unsolved."

এ গল্পে কারো নাম ধাম পরিচয় নেই। গল্পের নায়িকা, আর আমি, কেবল দুজনকে নিয়ে এই মনশ্চাঞ্চল্যের ইতিহাস। তার মধ্যে একজন মাত্র এটা সম্পূর্ণ জানে, আর একজনের কাছে অনেকটাই অজ্ঞাত।

আমি কে তা জেনে লাভ নেই। আমার বিদ্যা কতদূর, কি পরিমাণ বিত্ত, বয়স কত, বিবাহিত কি অবিবাহিত, আধুনিক কি পৌরাণিক, আপাততঃ সে সব পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

যে মেয়েটির কথা বলছি, তার পরিচয়ও নাই বা দিলাম। সে যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত কিনা, যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্ত কিনা, আধুনিক দিনের মত ভয়েল শাড়ী কুঁচিয়ে পরে কিনা, এসব কথা এখানে নিরর্থক। পাঠক যেমন ইচ্ছা কল্পনা করে নিতে পারেন, গল্পের তাতে রসভঙ্গ হবে না। কেবল একটিমাত্র পরিচয়ই এখানে যথেষ্ট, তা পরে আপনিই ব্যক্ত হবে।

* * * *

অনেক ঘটনারই কিছু পূর্ব্বসূচনা থাকে। প্রথমে সেটা ধরা যায় না, কিন্তু পরে টের পাওয়া যায়।

কেন জানি না, হঠাৎ মনের মধ্যে কয়েকদিন থেকে মীরাবাই-এর সেই গানটা কেবলই গুঞ্জন করতে লাগলো—

'নয়না ললচাওত, জীয়রা উদাসী'

কেবল কথাগুলো নয়, এর ভাবটাও যেন মনকে পেয়ে বসেছিল। নয়ন আমার লালসান্বিত হয়েছে, দেখবার জন্যে আকুল হয়েছে, প্রতীক্ষায় থেকে জীবন উদাসী হ'য়ে উঠলো। কবে দেখতে পাবো, কবে বাঁশী শুনবো, কবে কোন ফুলের সুবাস হ'য়ে প্রিয়ের প্রথম অনুভূতি আমার অন্তরে প্রবেশ করবে? সকলেরই মন কি অজানার উদ্দেশে এই রকম ব্যাকুল হয়? একটা কিছু যেন চাইই চাই,—কিন্তু সে কী, তার নাম বলতে পারছে না। যখন পাবে তখনই বলতে পারবে, কী সে চেয়েছিল।

মনের অবস্থাটা যখন এই রকম অনির্দ্দেশের সন্ধানী, তখন একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মেয়েটির প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম। কি উপলক্ষে দেখার সুযোগ হোলো, কেমন করে তার পরিচয় পেলাম, সে কথা এখন নিতান্তই অনাবশ্যক। কিন্তু তাকে দেখে যে তৃপ্তি পেলাম সেটা স্মরণীয়।

সুন্দরকে দেখতে দোষ নেই, এ কথা নিঃসঙ্কোচেই বলবো। সুন্দর দেখলে সকলেই খুসী হই। সৃষ্টিকর্ত্তাও যে সুন্দর গড়তে পারলে খুসী হন তাতে সন্দেহ নেই। সুন্দর গড়বার তাঁর যে কত প্রচেষ্টা, তা নিত্যই দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের মধ্যে যখন দু'-একটা ভাল জিনিস উৎরে যায়, বিধাতা তখন ভারী খুসী হ'য়ে উঠেন। সেই সৌন্দর্য্যকাঙ্ক্ষা উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরাও কিছু কিছু পেয়ে গেছি। সুতরাং সুন্দর দেখে যদি তখনই চোখ ফিরিয়ে নিতে না পারি, বিধাতা সে দোষ ক্ষমা করেন।

সৌন্দর্য্য এমন অতর্কিত ভাবে আমাদের চমকিত করে, যেন হঠাৎ পথে বেজে ওঠা বাঁশীর আওয়াজের মত। শুনতে পেলেই হাতের কাজ একেবারে থেমে যায়, ঘর থেকে বেরিয়ে ভালো করে শুনতে ইচ্ছে করে, সেই বাঁশীর সুর দূরে মিলিয়ে যাবার পরেও মনটা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিচলিত হ'য়ে থাকে।

সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে খুব সুলভ নয়। শরীরের ভালো মন্দ নিত্যই লেগে আছে, মনের মধ্যেও কত ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব, ঝড়-ঝাপটা, আর ধুলো-কাদার আবর্জ্জনায় চারিদিক স্তূপাকার, তার মধ্যে সুন্দর জিনিষ জন্মালেও শীঘ্র মলিন হ'য়ে যায়। এর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য কিছুকালের জন্যেও অম্লান থাকে, তাও অতি আশ্চর্য্য বস্তু।

মেয়েটি যে নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সচেতন, এ আমি বেশ বুঝতে পারতাম। হাত মুখের একটু মাজাঘষা আর কাপড় জামার একটু বিশেষ পারিপাট্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য করেছি। অসতর্ক মুহূর্ত্তে গেলে কিছুতেই সে সামনে আসতো না। প্রথমে মনে করতাম ভ্যানিটি। তারপর বুঝতে পারলাম তা নয়, এটা তার স্বভাব। সাময়িক চেষ্টাকৃত পারিপাট্য সব সময় বজায় থাকে না, কখনো কখনো অগোছালো হ'য়ে পড়ে। ওর যেটুকু ছিল সেটুকু নিত্যকার এবং নিন্দার্হ নয়। যাদের সৌন্দর্য্য আছে তাদের এটুকু যত্নজ্ঞান থাকাই ভালো। সৌন্দর্য্যের মতো মূল্যবান জিনিষ যে পেয়েছে সে যদি তার অমর্য্যাদা করে, তা হ'লে তার সুখ্যাতি করা যায় না।

ওর রূপটা ছিল স্বচ্ছ। হাসলে দেখতে পাওয়া যেতো ওর ভিতরটা পর্য্যন্ত হাসছে। আঙুরের খোসার উপর থেকেই যেমন দেখা যায় যে ভিতরটা রসাল, তেমনি ওর উপর থেকেই কি একটা ভিতরের রসের আভাষ পাওয়া যেতো। রূপ আর রংএর অতীত যে বস্তু যা অকিঞ্চিৎকর রূপকেও অনির্ব্বচনীয় করে তোলে, যা একজনের চোখে হয়তো পড়ে কিন্তু আর একজনের চোখে পড়ে না, সেই সৌন্দর্য্য ওর নানা ভঙ্গীতে দেখতাম।

তা হোক্, কেবল রূপ দেখেই এত কথা বলছি না। রূপের মোহ বেশীদিন থাকে না। কিছুদিন পরেই মনে হয় ভুল বুঝেছিলাম, ওর মধ্যে এমন কিছু মাধুর্য্য নেই। কিন্তু ওর সৌন্দর্য্যেরও অন্তরালে ছিল একটা সৌরভ,—যেটা মনের ভিতর থেকে উঠতে থাকে, এবং লাগে এসে মনে। রূপের মোহ যেতে না যেতেই আমি তারই পরিচয় পেতে লাগলাম। দেখলাম এ সৌরভ অম্লান, অনবদ্য, স্নিগ্ধ।

আলাপ পরিচয়ের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। শীঘ্রই দুজনের মধ্যে চমৎকার একটা মনের মিল জন্মে গেল।

আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস মানুষের মনে মনে যে এমন মিল হয়, এর জন্যে বিধাতাই অনেকটা দায়ী, শুধু ঘটনাচক্র নয়। কখনো কখনো হয় তো তিনি জোড়া রেখে মন তৈরী করেন। মানুষের মনের জোড়-বিজোড় আছে নিশ্চয়। অবশ্য প্রকৃতির মিল থাকলেই যে সব সময় মনগুলি যুক্ত হ'তে পারে, তা নয়। শরীরের ব্যবধান, দূরত্বের ব্যবধান, আরো কত রকমের ব্যবধান সংসারে আছে। কিন্তু মানুষ যদি শরীরী না হোতো এবং অশরীরী হ'য়ে ঘুরে বেড়াতো, তা হ'লে হয়তো অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন মন পরস্পর সংযুক্ত হ'য়ে থাকতো।

কিন্তু তবু শরীর থাকা নিশ্চয়ই দরকার। নির্দ্দিষ্ট বস্তুস্বরূপে কিছু একটা না পেলে আকর্ষণ প্রবল হয় না, কারণ তার অভিব্যক্তি হয় না। প্রথমে একটা কিছু রূপ এসে মনকে আকর্ষণ করে, তারপর মনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেয়। বৈষ্ণব মহাপুরুষরা বোধ হয় এই জন্যেই বলতেন ভগবানকে পাওয়ার সহজ উপায় একটা ঘনিষ্ঠ শরীরসম্পর্ক অবলম্বন ক'রে তাঁর আরাধনা করা। তাঁরা বলতেন ভগবানও স্বয়ং তাই করেন; যে সুন্দরকে মূর্ত্তি দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন, তারই আস্বাদ পাবার জন্যে নিজেও ইন্দ্রিয়ময় শরীর ধারণ করেন। এ-সব কথা আমাদের হেঁয়ালির মত লাগে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ই যে সুন্দরের প্রথম প্রবেশ-দ্বার, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে না এলে যে সুন্দরের উপলব্ধি হ'তে পারে না, এটা আমরা বুঝি।

* * * *

আলাপ বেশ জমে উঠলো। আলাপ আর কিছুই নয়, কেবল মৌখিক আলাপ। কিন্তু মুখের কথার ক্ষমতা কি কম? কথাতেও মনের মধ্যে সাড়া বাজে। সেতারের তারগুলোর মত মনের তারগুলো সর্ব্বদা ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু পাশ থেকে কোনো একটা যন্ত্র সুরে বেজে উঠলেই সেই সুপ্ত তারগুলো ঝন্ ঝন্ ক'রে ওঠে। সঙ্গীতের প্রয়োজন হয় না, যে কোনো একটা মিলসুর বাজলেই হোলো। এক জনের অতি তুচ্ছ কথাতেও আর একজনের মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হ'তে পারে। যার মনটি বেজে ওঠে সেই তাতে চমৎকৃত হয়, তৃতীয় ব্যক্তি কিছুই টের পায় না। সেই কথাই সকলের চেয়ে দামী, যার অর্থ এত তুচ্ছ যে নিভৃতে শোনার কোনো প্রয়োজন নেই, অথচ যা হাল্কা ফানুশের মত মনের আকাশে ক্রমাগতই উপরে উঠতে থাকে।

তুচ্ছ কথা নিয়েই ছিল আমাদের আলাপ। তার বিষয়ও

তুচ্ছ, বস্তুও তুচ্ছ। বলবার মতো নয়, তবু কিছু কিছু নমুনা দিলাম :—

(১)

—এক গ্লাস জল দিন দেখি, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

—অসময়ে শুধু জল খাবেন ? বরং একটু চা ক'রে দিই।

—না না জলের তেষ্টাই পেয়েচে, আগে একটু জল দিন।

—এই নিন। তেষ্টার সময় জল ছাড়া কিছুই ভালো লাগে না তা সত্যি। তবে আপনি চা খেতে ভালবাসেন কি না, তাই চায়ের কথা বলছিলাম।

—বেশ করেচেন। এইবার চা করে দিন খাই।

—ওমা, সে কি ? এইমাত্র ঠাণ্ডা জল খেয়ে আবার গরম চা খাবেন ? ওতে শরীরের অনিষ্ট হ'তে পারে।

—ওসব বাজে কথা। ও নিয়ম হচ্ছে অসুস্থ লোকের জন্যে, সুস্থ লোকের নয়।

নিঃশব্দে চা প্রস্তুত ক'রে কাপে ঢেলে দেওয়া হোলো।

—চা-টা বোধহয় তেমন ভালো হয় নি ?

—চমৎকার হয়েছে। আপনি তো জানেন যে আপনার হাতের চা খুব ভালো হয়, সেই জন্যেই আমি চেয়ে চেয়ে খাই, তবু এ-কথা প্রত্যেকবার বলেন কেন ?

নিঃশব্দে হাসি।

(২)

—উঃ, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, এখনো বসে বসে সেলাই করচেন ? দিনরাত সেলাই করতে আপনার ক্লান্তি বোধ হয় না ?

—ক্লান্তি কেন হবে ? এই তো আমাদের কাজ।

—কখখনো না। ওটা দর্জ্জিদের কাজ। সামান্য মজুরীতে দর্জ্জি যে কাজ ক'রে দেবে, তার জন্যে আপনি অনর্থক নিজের পরিশ্রমের অপব্যয় করচেন। দর্জ্জি এই কাজ অল্প সময়েই করবে; কিন্তু আপনার অনেক বেশী সময় লেগে যাবে। যার যেটা পেশা তাকেই সেটা করতে দেওয়া উচিত। সেলাই করা আপনার পেশা নয়, আপনি ওর চেয়ে ঢের বড় কাজ করতে পারেন।

—আপনাদের হিসেব ঐ রকম বটে, কিন্তু আমাদের হিসেব অন্য রকম। সেলাইয়ের মধ্যে একরকম আমোদ আছে, সেইজন্যেই সেলাই করি, পয়সা বাঁচাবার জন্যে নয়। এও একরকম জিনিষ-গড়া। আপনারা কত বড় বড় জিনিষ গড়েন, আমরা এইসব ছোট্ট ছোট জিনিষ গড়ি। রেঁধে খাওয়ানো আর বুনে পরানো, এতে যে কি সুখ হয় সে আমরাই জানি। কাজটা যাই হোক না কেন, তৃপ্তিটাই হচ্ছে আসল। সেলাই করতে করতে কত কথাই যে ভাবা যায় তা কি আপনারা জানেন ? যাক্ গে, আমার একটু কাজ করে দিতে হবে। এই রং মিলিয়ে কতকগুলো পশম কিনে দিতে পারবেন ? সবাইকে তো এ ফরমাস করা যায় না, আপনাকেই বলবো মনে করে রেখেচি।

—তা না হয় দেবো, কিন্তু আপনার সাহস তো কম নয়। যে ব্যক্তি এই মুহূর্ত্তে সেলাইয়ের বিরুদ্ধে এত লেক্‌চার দিলে, তাকেই আবার পশম কেনার ফরমাস্ ?

—তার কারণ আমরা জানি কি না, আপনারা তর্ক যা করেন, মনে মনে তা বলেন না। আমরা কথায় ভুলি না, লোক চিনি,—কাকে দিয়ে কি কাজ করিয়ে নিতে হয় তা জানি।

—অন্ততঃ পশম কেনার লোক চিনতে যে আপনার ভুল হয়নি, একথা মানতেই হবে।

—কেন, আপনি লোকটা মন্দই বা কি ? যা কেবল একটু বেশি বকেন, নইলে আর কোনো রকম দোষ তো দেখা যায় না।

—ও, এই কথাই বুঝি আমার সম্বন্ধে আপনি বলে বেড়ান ?

—ইস্, তাই নাকি ? আপনার কাছেই না হয় বলছি। কিন্তু এই কথাই অন্য কেউ আপনার সম্বন্ধে বলুক দেখি, তার সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে যাবে। আমাকে কম ঝগড়াটে মনে করবেন না।

(৩)

—অতো বড় কি বই খানা পড়েছিলেন ?

—এই মহাভারত।

—এঃ, আপনি দেখছি নিতান্ত সেকেলে। আগে পড়েননি বুঝি ?

—অনেকবার পড়েছি, তবু আর একবার পড়ছি।

—আর কোনো বই নেই বুঝি? বলেন তো কয়েকখানা নতুন বই এনে দিতে পারি।

—বইয়ের অভাব নেই, আজকালকার বই ঢের পড়েছি; সেই জন্যেই এখন আবার রামায়ণ মহাভারত পড়তে বেশী ভালো লাগচে।

—অর্থাৎ আপনি নতুন গল্প শুনতে ভালোবাসেন না, পুরোনো গল্পই পুনর্ব্বার শুনতে চান?

—ঠিক বলেচেন। পুরোনো আনন্দ আমার নতুন করে পেতে ভারী ইচ্ছে করে। ঐ যে রাস্তার মোড়ে খোট্টা দোকানদার বুড়ো রোজ রোজ সেই একখানা তুলসীদাসের রামায়ণ খুলে সুর ক'রে ক'রে পড়ে, আমার দেখতে ভারী ভালো লাগে। ও নিশ্চয় তাতে এই রকম আনন্দ পায়। ওতে নতুন কিছু ঘটবার নেই; যার পর যেটি হবার আশা করি, তার পর ঠিক সেইটেই বইয়ের মধ্যে পড়তে পাই, তাহাতেই খুসী হয়ে ওঠে।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু নতুন বইও কিছু কিছু পড়া দরকার। মানুষের চিন্তাধারা কোন দিক দিয়ে বইছে তার খবরটাও জানা চাই।

—সে তো বটেই। কিন্তু এখনকার বইগুলো যেন কেমন কেমন লাগে, তেমন আনন্দ হয় না। সব কথা ঠিক বুঝতেও পারিনা। মনের মধ্যে কোথায় দুধারা স্রোত বইছে, গল্পের পরিণতি কোন দিকে হোলো তা লেখক নিজেই স্পষ্ট ক'রে বলতে পারছে না—এই সব গোলমালের মধ্যে প'ড়ে অন্তরে কোনো তৃপ্তিই আসে না। আপনিই বলুন, একখানা রামায়ণ কিনলে যে অমূল্য সম্পদ পেলাম ব'লে মনে হয়, আজকালকার কোনো নভেল কিনলে তা মনে হয় কি?

—বলেছেন মিথ্যে নয়। তবে আপনি তো আর ইংরেজী পড়েন না। আপনি হয়তো জানেন না, ইংরেজীতে এবং অন্যান্য ভাষায় খুব ভালো ভালো বই আছে। বাংলা ভাষাতেও যে একেবারেই ভালো বই নেই, একথা বলা যায় না।

—তা হবে, আমাদের আর কতটুকুই বা বিদ্যে। আপনাদের কথা স্বতন্ত্র, আপনাদের মনও স্বতন্ত্র। কিন্তু আমরা হচ্ছি নদীর জাত। একটানা স্রোতে একধারাতে চলতেই আমাদের ভালো লাগে। মাঝে যদি বাধা পাই তবে আমরাও হয় তো দুধারা হ'য়ে পড়ি, কিন্তু সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এক রকমের গল্প, এক রকমের আনন্দ এক রকমের জীবন, এই আমাদের বেশী ভালো লাগে।

(৪)

—দেখুন, আজ একটা বিশ্রী কাণ্ড হ'য়ে গেছে।

—কি হয়েছে?

—আজ বিকেলে বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছিলাম। গাড়ীটা যেমনি গলির মোড় ঘুরেচে, অমনি দেখতে পেলাম ঠিক যেন আপনি রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। ভাবলাম ভালোই হোলো, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে আপনাকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। যতই ডাকি, কোনো সাড়া পাই না। গাড়ীটা যখন খুব কাছাকাছি এসেছে তখন চেঁচিয়ে বললাম—কালা হ'য়ে গেলেন না কি, এত ডাকছি তবু শুনতে পাচ্ছেন না? সেই লোকটি তখন ফিরে চাইলে, —বললে আমায় বলচেন? তখন দেখি, ওমা এ কে! পিছন থেকে একেবারে অবিকল আপনার মতো। ঐ রকম পাঞ্জাবী গায়ে, ঐ রকম পায়ে চটি, ঠিক আপনার মতো শরীর, আপনার মতো চলার ভঙ্গী। আশ্চর্য্য! কিন্তু মুখখানা একেবারে অন্যরকম।

—ওঃ এই কাণ্ড? এ রকম ভুল তো লোকের কতই হয়।

—কাণ্ড নয়? ছি ছি, মেয়েমানুষ হ'য়ে বেহায়ার মতো পথের মাঝখানে যাকে তাকে চেঁচিয়ে ডাকা? আমাদের এ রকম ভুল হওয়া উচিত নয়। অন্যলোক হ'লে হয়তো আমিও ভালো ক'রে না বুঝে ডাকতাম না। কিন্তু যেমনি দেখেছি আপনি, অমনি ব্যস্ত হ'য়ে ডাকতে আরম্ভ করেছি তখন আর কে অত বিচার করে। তারপর যে লজ্জাটা হোলো তা আর কি বলবো।

(৫)

—আচ্ছা আপনি ভগবান মানেন?

—মানি বৈ কি।

—ঠাকুর দেবতাও মানেন?

—তেত্রিশ কোটি দেবতা?

—তা বলছি না। যে সব দেবতাকে সকলেই মেনে থাকে। যেমন মনে করুন শিব ঠাকুর।

—আপনি বুঝি শিব ঠাকুরকে মানেন?

—আমি-তো মানিই।

—তাই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে পুজো করেন?

—তাও করি। ওতে মনে খানিকটা শান্তি পাই। নইলে এত লোকেই বা পুজো করে কেন? সত্যি ঠাকুর আছেন কি না জানি না, কিন্তু যদি নাও থাকেন, তবু মানুষের পুজো করবার জিনিষ কিছু থাকাই ভালো। আপনি কি বলেন?

—সে কথা বোধ হয় ঠিক। ভক্তিও একটা উৎকৃষ্ট বৃত্তি, তার চর্চ্চা করলে অন্ততঃ মনের যে কিছু উন্নতি হয় তাতে সন্দেহ নেই।

—তা হ'লে আপনিও ঠাকুর দেবতা মানেন বলুন?

—আমি মানি কি না তা জেনে কি লাভ?

—জানতে ইচ্ছে হয়। যারা আমার আপনার লোক, তাদের মনটা আমারই মতন কি না দেখতে ইচ্ছে হয়। তা মানলেও তো আপনারা স্বীকার করবেন না। তবু বোধ হয় মনে মনে এসব মানেন। বলুন ঠিক কি না?

—দেখুন, এ কথার জবাব দেওয়া বড় শক্ত। সত্যি কথা যদি জানতে চান তা হ'লে কিছু বলতেই পারবো না, কারণ ও বিষয়ে বেশী কিছু ভেবে দেখি নি। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, ও সব না মানলেও চলে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির অতীতও অনেক জিনিষ আছে, এ কথা সবাই বোঝে।

—তা হ'লে সন্দেহ ক'রে মানেন বুঝি?

—ও কথাও ঠিক হোলো না। কখনো মানি আবার কখনো মানি না, এই কথাই বোধ হয় ঠিক। দেখুন, মনের মধ্যে যা ভাবি তা সব সময় নিজের জিনিষও নয়, অনেক সময় তা বাইরের জিনিষের একটা প্রতিধ্বনি। সেবার সুবর্ণরেখার ধারে একটা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে পাহাড়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে কোনো একটা শব্দ করলেই তার চমৎকার প্রতিধ্বনি হয়, শুনে কিছুতেই বোঝা যায় না যে সেটা একটা প্রতিধ্বনি,—মনে হয় আসল শব্দ। আমাদের মনের মধ্যেও ঐ রকম প্রতিধ্বনির জায়গা আছে,—কিছু বোঝবার উপায় নেই যে আমি যা বলছি তা নিজে বলছি, না কারো প্রতিধ্বনি করছি।

—আপনাদের ঐ কেমন স্বভাব, সোজা কথা জিজ্ঞেস করলেও বড় বড় কথা দিয়ে তার জবাব দেন, অথচ আসল উত্তর কিছুই মেলে না। যাক্‌, আপনি পরলোক মানেন তো?

—বেশী জোর ক'রে চেপে ধরলে হয় তো মানতেই হবে। কিন্তু তা মানলেই বা লাভ কি, আর না মানলেই বা ক্ষতি কি?

—লাভ অনেক আছে। পৃথিবীতে আমার আপনার লোক আছে জানলেও যে লাভ, পরলোকে আমার আপনার লোক কিংবা ঠাকুর দেবতা আছে জানলেও সেই লাভ। ছেলেবেলায় আমার যখন খুব অসুখ করতো, তখন বাবা মা সবাই ভেবে অস্থির হ'য়ে উঠতেন, কিন্তু আমি খুব খুসী হতাম। অসুখ হ'লে আমার মোটে ভয় করতো না। ভাবতাম আমার আর এতে ভয় কি, বাবা মাই জব্দ হোলো, তারাই এখন ভেবে মরুক। আমার জন্যে যে লোকে কত ভাবে, অসুখ হ'লে তারই পরিচয় পেতাম, সেই জন্যে অসুখ হওয়া আমার ভালো লাগতো। তেমনি বড় হ'য়েও এখন জানতে পারছি যে বিপদে আপদে আমার জন্যে ভাববার লোক কেউ আছে। তারা পরলোকেই থাক আর দেবলোকেই থাক, এটা জানি যে বিপদে পড়লেই তারা এসে রক্ষা করবে। সেই জন্যে কোনো কঠিন বিপদ হ'লেও আমার ভয় হয় না, মনে বেশ সাহস থাকে।

—কিন্তু যুক্তিটা আপনার ঠিক হোলো না। ছেলেবেলাকার রক্ষাকর্ত্তাদের আপনি চোখে দেখতে পেতেন, কিন্তু এখনকার রক্ষাকর্ত্তাদের চোখে দেখতে পান না, অনুমান করেন মাত্র। ওটা হয়তো আপনার একটা ধারণা। ছেলেবেলা থেকে নির্ভর ক'রে থাকা এমনি অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে এখন নির্ভর করবার জন্যে একটা কিছু অনুমান ক'রে নিতে হয়।

—তা নয়, ও আমি বেশ বুঝতে পারি। আপনাকে হয় তো বোঝাতে পারবো না, কিন্তু বিপদ আসবার আগেই

আমি টের পাই যে এবার একটা বিপদ আসচে, আবার বিপদ কাটবার আগেই জানতে পারি যে সেটা কেটে যাবে। কোনটাতে আমার ভালো হবে আর কোনটাতে মন্দ হবে, এ যেন আমি আগের থেকেই টের পাই। যাঁরা আমাকে ভালোবাসেন, মনে হয় তাঁরা এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন, আর তখনই জানি যে ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনি হয় তো হাসবেন, কিন্তু আমার ধারনা যে সত্যি হয় তা আমি হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে পারি।

—অর্থাৎ যা আপনি বিশ্বাস করেন, তার সঙ্গে যুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। যুক্তি দিয়ে তা বোঝানোও যাবে না, যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করাও যাবে না। বিশ্বাস হচ্ছে আন্তরিক বৃত্তি, যুক্তির সঙ্গে তা মিশ খাবে না। এই কথাই তো বলচেন?

—হাঁ, তাই। কিন্তু এই বিশ্বাসের জোরেই আমি বেঁচে আছি। এটা না থাকলে আমি বাঁচতাম না, কিম্বা অন্য রকম হ'য়ে যেতাম। যাঁদের আমি বিশ্বাস করি তাঁরাই আমাকে এ রকম ক'রে রেখেচেন। কত বিপদ থেকে তাঁরা বাঁচিয়েচেন।

—অর্থাৎ অনেক বিপদই যখন আপনি নিজের ক্ষমতায় নিবারণ করতে পারেন না, তখন এমন একটা অবলম্বন আপান ধ'রে নিয়েচেন যার কাছে বিপদ নিবারণের আশা ক'রেও মন আপাততঃ সুস্থির থাকে। বিশ্বাস ক'রে অনেক সময় ফল পেয়েচেন, কাজেই সে বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হয়েচে। এই কথাই তো বলতে চান?

—হাঁ, কথাটা হয়তো তাই। আমাদের মনের কথা আপনি বেশ পুরুষের ভাষায় গুছিয়ে বলচেন। কিন্তু এ আমার একলার কথা নয়। স্বীকার করুন আর নাই করুন, আপনিও হয়তো অনেক সময় একটা কোনো অসাধারণ শক্তির ওপর নির্ভর করেন।

—কি ক'রে জানলেন?

—ঠিক জানি মশাই! কাজ তো সবই নিজের চেষ্টাতে করেন, কিন্তু সেই চেষ্টায় প্রথমে আপনাদের লাগিয়ে দেয় কে? চলবার প্রথম ধাক্কাটা কে দিয়ে দেয়? মনে মনে বোঝেন সবই; তবু স্বীকার করতে চান না।

—হার মানছি, এ-তর্কে আপনারই জিৎ।

(৬)

—এই যে! সারা বাড়ীটা খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর আপনি এই সন্ধ্যাবেলা ছাতের কোণে একা দাঁড়িয়ে আছেন? অন্ধকারে কি দেখচেন

—সন্ধ্যা হওয়া দেখচি। এই দেখতে আমার বেশ লাগে।

—অন্ধকারে দেখবার কি আছে? দেখচেন না ভাবচেন?

—তা বলতে পারি না। মস্ত বড় এই পৃথিবী দেখতে দেখতে চারদিক থেকে অন্ধকার হ'য়ে গেল, এইটেই কেমন আশ্চর্য্য মনে হয়। দুরন্ত পৃথিবীটার যেন হঠাৎ ঘুম পেয়েচে। অস্ত যাবার আগে সূর্য্য যখন খুব লাল হয়, মনে হয় ওর যেন চোখটাই ঘুমে লাল হ'য়ে গেছে। তার পর সূর্য্য একটু একটু ক'রে ডোবে, তখন এমনি দেখায় যেন ওর চোখের পাতা দুটো ক্রমশঃ বুজে যাচ্ছে, আর তারাটা অল্পে অল্পে ছোটো হ'য়ে আসছে। এমনি ধীরে ধীরে ঘুমটা আসে, যেন কেউ ওর দুরন্তপনা থামিয়ে দিয়ে চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। অন্ধকার হ'লে চারদিকে আলো জ্বলে ওঠে, আকাশে তারা ওঠে, জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে, তখন মনে হয় এইবার ও স্বপ্নরাজ্যে চলে গেল, আর এখন থেকে ওর স্বপ্ন দেখা সুরু হোলো।

—ওঃ, এ যে একেবারে কালিদাসের উপমা! মনে মনে এই সব উপমা গাঁথছিলেন বুঝি?

—ঠাট্টা করচেন তো? তা জানি, আপনাদের কাছে কিছু বলতে নেই। আপনাকেও মন খুলে কিছু বলা যায় না দেখচি।

না না, ও কি কথা! যা মনে উদয় হবে অনায়াসে তাই বলবেন। উপমাটা সত্যিই চমৎকার।

—আবার ঠাট্টা করচেন? তা করুন, কিন্তু এই সব হচ্চে আমার আজগুবি কল্পনা। লোকে শুনলে হয়তো পাগল মনে করবে। মনে মনেই ভাবি, আর মনে মনেই হাসি।

—এই সব ভাববার জন্যেই বুঝি রোজ ছাতে আসেন?

—রোজ নয়, তবে মনে কোনো কষ্ট হ'লেই এখানে পালিয়ে আসি। আগেকার কালের রাণীদের গোষাঘর

থাকতো জানেন তো? তেমনি এই জায়গাটি বর্ত্তমানে আমার গোষাঘর। এ সন্ধান কেউ জানে না। জানেন, আমাদের মনের মধ্যেও এমনি একটা গোষাঘর লুকানো আছে, যার কথা কাউকে বলা যায় না। সেখানকার কথা অত্যন্ত প্রিয় লোককেও আমরা বলিনা।

—কিন্তু আমি যে শুনে ফেল্‌লাম?

—ওঃ, আপনি? আপনার কথা ছেড়ে দিন। রাত হ'য়ে গেছে, চলুন নীচে যাই।

*　*　*

নমুনা ঢের হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝবার পক্ষে এই যথেষ্ট। ওর কথাগুলো অনেকটা কনজার্ভেটিক ধরণের হ'লেও তার মধ্যে ছিল একটা নিজস্ব স্বাধীন ভাব, আর তা প্রকাশ করবার শক্তি। আর ছিল একটা অপূর্ব্ব অসঙ্কোচ। কিন্তু একে যদি কেউ প্রণয় বলে' সন্দেহ করেন, অর্থাৎ যদি মনে করেন যে এতে কিছু লালসাগন্ধী মোহ আছে, তা হ'লে মস্ত ভুল হবে। তবে এখনকার যুগে সে কথা বিশ্বাস করানোই কঠিন। আমি নিজেই যখন ঐ রকম ভুল করে ফেলেছিলাম, তখন অন্যে তো করবেই।

ওর সঙ্গে এই রকম আলাপ করাটাই ছিল আমার একমাত্র আকর্ষণ, তা ছাড়া অন্য কোনো রকম প্রলোভন ছিল না। মেয়েটির কথাগুলোর মধ্যে কেমন এক আন্তরিকতা ছিল। অধিকাংশই মেয়েলি কথা, তার মধ্যে কতক তুচ্ছ, কতক বা গম্ভীর, কতক রহস্য, কতক বা অভিমান। কিন্তু আমার কাছে ওর সব কথাতেই একটা চমৎকারিত্ব ছিল। যতবারই শুনেছি ততবারই নতুন বিস্ময় অনুভব করেছি। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আমার এই ছিল যে কেমন করে' ও অমন নিশ্চিন্তভাবে আমাকে নিকটে নেয়, আর বিনা দ্বিধায় তার অন্তর উন্মুক্ত করে। মানুষকে মানুষ এত বিশ্বাস করতে পারে? অভিজ্ঞতা থেকে এই জানতাম যে লোকে নিজেকে ছাড়া আর প্রায় সকলকেই ঘৃণা করে, সকলকেই দূরে রেখে চলে, খুব কাছে কাউকে আসতে দেয় না। যতটুকু সে ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশী মিথ্যা কথা বলে। মনের ভিতরে অনেক কুৎসিত জিনিষ আছে, সেই জন্যে কেউ খুব ঘনিষ্ঠ হ'তে চায় না। ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক যেখানে, সেখানেও কিছু কিছু ফাঁকি রেখে দেয়। কিন্তু ওর আত্মীয়তা সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় হ'লেও তার মধ্যে কিছু ফাঁকি দেখলাম না। এবং আমি সব চেয়ে বেশী মোহিত হতাম তাতেই।

আপনারা বলবেন সুন্দর মুখে যদি সুন্দর কথা শোনা যায় সে তো এমনিই ভালো লাগে। কথাটা সত্যি বটে, কিন্তু তা কি রোজ রোজ ভালো লাগে? আমি জানি এর মধ্যে আরো একটা আকর্ষণ ছিল যার কোনো সংজ্ঞা নেই, যার কোনো হেতু জ্ঞানগোচরের মধ্যে নেই। মনের মিল ছাড়া সেটাকে আর কি নাম দেবেন?

এক বছর, দু' বছর, তিন বছর, একভাবেই কেটে গেল। আকাঙ্ক্ষাবিহীন একটা নির্ম্মল আনন্দের আস্বাদ পেলাম। মনে ভাবতাম এই আনন্দই চিরকাল একভাবে থেকে যাবে। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ একটা মারাত্মক ভুল ক'রে ফেল্‌লাম।

যা কিছু অন্যায় আমরা করি, তা কি সবই জেনে শুনে করি? অবিবেচনায় এমন কাজও হ'য়ে যায় যা পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জানতে পারি না, তখন মনেও হয় না যে কিছু অন্যায় করছি, কিন্তু বুঝতে পারি তার পরে। অজ্ঞাত-মনের দ্বারা এই সব কাজ হয়। মন অতি বিচিত্র কল।

কি উপলক্ষে তাদের বাড়ী সেদিন ভোজ ছিল। সন্ধ্যা থেকে একবারও তার দেখা পাই নি। খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত্রি হ'য়ে গেল। তবু একবার দেখা না করে যাও হয় না, তা হ'লে নিশ্চয় রাগ করবে, এই ভেবে ওর ঘরে গিয়ে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে ও হাতে পান নিয়ে প্রচুর হাসতে হাসতে এসে বল্‌লে—"অন্ধ হয়েছেন তো? জানি, দেখা না করে যাবার উপায়ই নেই। এই নিন, আপনার জন্যে পান আনলাম"

পান দেবার জন্যে আমার খুব কাছে এলো। হঠাৎ আমি এক কাণ্ড করে ফেল্‌লাম। কেন তা জানি না। সাজগোজের কিছু নূতনত্ব দেখেই হোক্, কি হাসির বাহুল্য দেখেই হোক, যা হোক্ একটা কারণে কি-একটা মানসিক বিকৃতি ঘটলো।

কি করেছিলাম তাও ঠিক করে এখন বলতে পারবো না। বোধ হয় সেই মুহূর্ত্তে তার হাতখানাই চেপে ধরেছিলাম, কিংবা হয়তো কাঁধে হাত দিয়ে টেনেছিলাম। অশিষ্ট ভাবে হঠাৎ তার অঙ্গস্পর্শ করেছি, এইটুকুই এখন মনে আছে।

ও তখন যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই একেবারে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল,—নড়লোও না, কথাও কইলে না। কিন্তু দেখতে দেখতে মুখখানা একেবারে আশ্চর্য্যরকম পাংশু হ'য়ে গেল। হাসিটা কোথায় মিলিয়ে গেছে, দৃষ্টিতে যেন চাঞ্চল্য কোনো কালেই ছিল না, মুখে কালী ঢালা, জীবনের কোনো চিহ্ন নেই, একেবারে যেন মরা মুখ। সে মুখটা এখনো বেশ মনে পড়ে।

মুখ দেখেই বুঝলাম কি অন্যায় করেছি। টলতে টলতে বাড়ী ফিরে গেলাম। হাত পা গুলো বরফের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে কাঁপতে লাগলো, অথচ গায়ে একটা জ্বালা।

ছাতে গিয়ে শুলাম, ঘরে শুতে পারলাম না চোখ বুজিয়েই রইলাম, ঘুম হোলো না। মনের মধ্যে কেবল ধিক্কার উঠতে লাগলো।

ছি ছি, কি কাণ্ডই করলাম! মুখখানা একেবারে পাংশু ক'রে দিলাম! কি দরকার ছিল আমার ধরতে যাওয়ার? গাছের ফুল গাছেই ফুটেছিল, আমাকে তার সৌরভ দিতে একটুও কার্পণ্য করেনি, তবু কেন আজ তাকে মুঠো করে' ধরতে গেলাম? হাত দিয়ে না ধরলে কি স্পর্শানুভূতি হয় না? ছি ছি, অমন জীবন্ত মানুষকে একেবারে মড়ার মত পাংশু করে' দিলাম!

ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়লো। লজ্জাবতী লতা দেখলেই আমি ছুঁয়ে দিতাম, পাতাগুলো কেমন বুজে যেতো দেখে আমোদ পেতাম। একদিন ভাবলাম পাতায় হাত দেবো না, আগ্‌গোছে গোড়া ধ'রে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে যাই, পাতায় হাত না লাগলে তো কিছু হবে না। এই মনে ক'রে যেমনি ডালের গোড়ায় হাত দিয়েছি, অমনি তার সমস্ত পাতাগুলো এক সঙ্গে বুজে গেল। আজ যেন আবার তাই হোলো।

চোখ বন্ধ ক'রে বার বার সেই মুখটাই দেখতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম না চোখে দেখছি না মনে দেখছি। বুঝতে পারলাম না জেগে দেখছি না ঘুমিয়ে দেখছি। মনে হোলো বেকল বুঝি স্বপ্নই দেখছি। সেই নিমন্ত্রিতদের জটলা, তাদের সেই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে উচ্চ হাস্য-পরিহাস, অতিরিক্ত আহার, অতিরিক্ত গণ্ডগোল, তারপর সেই ঘটনা,—সমস্তই যেন ধারাবাহিক স্বপ্ন, ঘুম ভাঙলে এখনি সব মিটে যাবে। স্বপ্নই বুঝি লজ্জাবতী লতাটার ঐ রকম রূপান্তর ক'রে দিয়েছে।

আচ্ছা, ও আমাকে নিশ্চয়ই ভয়ানক পাষণ্ড বলে' মনে করছে? নিশ্চয়ই ভাবছে, লোকটা কি বিশ্বাসঘাতক! ও যে তখনই চেঁচিয়ে ওঠেনি এই যথেষ্ট। তাই যদি উঠতো, আমি তখন কি করতাম?

কিন্তু ও আমার মনটা দেখলে না, কেবল কাজটাই দেখলে। নইলে কিই বা দোষ করেছি? পূর্ব্বে এমনি কতবারই তার হাত ধরেছি, কতবারই স্পর্শ করেছি। অবশ্য তা এরকম ভাবে নয়। কিন্তু এতেও আমার অন্য কোনো অভিসন্ধি ছিল না। ও যদি এটাকে সরলভাবে নিতো, তা হ'লে আমারও ক্ষণিক উত্তেজনা থেমে যেতো। ব্যাপারটাকে সেই কালিমাযুক্ত করলে। মেয়েদের মন বড় বেশীরকম সন্দিগ্ধ। এতদিন আমাকে দেখছে, এটুকু বিশ্বাস হোলো না?

একজন নামজাদা লেখক বলেছেন, আমাদের মনটা ঠিক দুমুখো সাপের মতো, একটু কিছু ব্যতিক্রম হ'লেই তা দেখতে পাওয়া যায়। এর একটা মুখ যখন কাঁদে, আর একটা মুখ তাই দেখে হাসতে থাকে। আমারও সেই অবস্থা হোলো।

নিজের অন্যায় কিছুতে সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। মনের একটা মুখ যা স্বীকার করে, অন্য মুখ তা খণ্ডন করে। দুই মুখ থেকে দু'রকম কথা শুনে অবশেষে আমি স্থির ক মথআরলাওমরা ভুল হয়েছে বটে, কিন্তু ওর ভুলটাই বেশী। ওকে জানিয়ে দিতে হবে যে ও যা মনে করেছে আমি তা নই। আমি তার আপন জন নয় ব'লেই সে সামান্য জিনিষ-টাকে বড় ক'রে দেখছে, কিন্তু আমি যদি তার সম্পর্কে কেউ হতাম, তা হ'লে এতে দোষ হোতো না নিশ্চয়! তবেই দেখা যাচ্ছে যে মনের সম্পর্কের কোনো দাম নেই! এই কথাটাই তাকে বলতে হবে।

ভাবতে ভাবতে একটু রাগ হোলো। সকালে গিয়েই কয়েকটা কড়া কথা তাকে শোনাতে হবে। তিন বৎসরের সম্পর্ক শুধুই তার মুখে? আমি তাকে ভেবেছি আপন, আর সে ভেবেছে পর? মনে মনে রচনা ক'রে ফেললাম

আরো কি কি কথা বেশ আঘাত দেবার মতো ক'রে বলা যেতে পারে।

কিন্তু অভিমানের ফাঁক দিয়ে মধ্যে মধ্যে একটা হাহাকারের আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। ভিতর থেকে যেন কে একজন বলছে,—ভুলটা যেদিক থেকেই হোক, অন্ততঃ একটা কথা পরিষ্কার বোঝা গেল। তোর যে-নিজত্বটাকে মনে করতিস্ খুব দামী, পরের কাছে একটু মর্য্যাদা পেয়েই মনে মনে তুই যে আত্মশ্লাঘা করতিস্, এখন দেখা যাচ্ছে তার কোনোই মূল্য নেই। ক্লেদপূর্ণ মানুষ, ক্লেদপূর্ণ তার মন আর শরীর, পাছে কেউ দেখতে পায় এইজন্যে সর্ব্বদা তাকে ঢেকেই রাখতে হয়। এর মধ্যে অনেকখানি অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য থাকলে তবে লোকে তাকে ভালোবাসে। তেমন সৌন্দর্য্য তোর কী আছে যাতে অন্ধ হ'য়ে লোকে তোকে ভালোবাসবে, দোষ হ'লেও ক্ষমা করবে? যাক, এখন পরীক্ষা হয়ে গেল। তুই সুন্দর নয়, কুৎসিত। তুই অসাধারণ নয়, সাধারণ। ঐ মুখ নিয়েই আবার ওখানে যেতে তোর লজ্জা হবে না?

মন সে কথায় কিন্তু সায় দিলে না। বল্লে, এ নিতান্ত বাড়াবাড়ি কথা। এমন কিছু হয়নি যাতে এতদূর পর্য্যন্ত ভেবে নিতে হবে। ওর আর দোষ কি? শিষ্টতার যে সীমা আছে, আমিই তা লঙ্ঘন করেছি। ও শুধু নিঃশব্দে তার প্রতিবাদ করেছে। তারও কি এতে কম কষ্ট হয়েছে? আহা বেচারা! এ কষ্ট বেশীক্ষণ হ'তে দেওয়াটা ঠিক নয়, যত শীঘ্র পারা যায়, এ অনর্থক কষ্টভোগ দূর করতে হবে। উদ্বেগ আর সহ্য করা যায় না। রাত পোহাবার প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম।

সকালে উঠেই ওদের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম। রাত্রে ওর ঘরে একটা জিনিষ ফেলে গেছি এই ছুতা ক'রে তার খবর নিলাম। শুনলাম ওর ঘরের দরজা বন্ধ, এখনো ঘুমোচ্ছে।

বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেচারার সমস্ত রাত্রি নিশ্চয় ঘুম হয় নি, তাই এখন ঘুমোচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানাকথা ভাবতে লাগলাম।

সামনের রাস্তায় দুটো কুকুর একটা হাড় নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। এরাই আছে ভালো। যখন যা করে, পরমুহূর্ত্তেই তা ভুলে যায়। এদের কোনো যুক্তির বালাই নেই, মনের বৃত্তি অনুসারে চলে। ভুল করেছি ব'লে অনেকখানি ভাবতেও হয় না, কোনো রকম ভবিষ্যৎ বুঝেও চলতে হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত দিব্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকে।

আমাদের মনের ভিতর অনেক রকম সূক্ষ্মবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু তার দ্বারা কতটুকুই বা সুখ পাই? দুঃখ ভোগটাই হয় বেশী। আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলোর নাম দেওয়া উচিত দুঃখভোগের বৃত্তি। এত স্ব-চেতন মন নিয়ে আমাদের সুখ আশা করাই উচিত নয়। মন পেয়েছি দুঃখানুভূতির জন্য, এই কথাই মেনে নিতে হবে। কিংবা গোড়া থেকেই দুঃখটাকে সুখের মত সহজে গ্রহণ করতে অভ্যাস করা দরকার। আমাদের দেশের মহাপুরুষরা তাই ব'লে গেছেন। এবার থেকে আমিও তাই অভ্যাস করবো।

দারুণ বৈরাগ্য নিয়ে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর বুঝতে পারলাম জিনিষ নেবার ছুতায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখাচ্ছে না। এখন ফিরে যাই, সন্ধ্যার পর আবার আসা যাবে। এত উদ্বেগ কিসের?

সন্ধ্যার সময় ওর দেখা পেলাম। মুখটি অত্যন্ত ম্লান, লজ্জাবতীর বোজা পাতার মত চোখের পাতা একেবারে নত, কাজের অছিলায় ঘোরাফেরা করতে লাগলো, কোনো কথা বললে না। আমি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। এক সময় ডেকে বললাম—

—একটিমাত্র কথা বলবো, শুনবেন কি?

—কি?

—আপনি খুব ভুল করচেন। যা আপনি অন্যায় ভাবচেন তা আমি অন্যায় মনে করি নি। আপনাকে আমার ছোটো বোনের মতো ক'রেই ভাবতাম, তাই একটু স্নেহের প্রশ্রয় নিয়েছিলাম। বুঝতে পারচি আমার সেটা ভুল হয়েচে। সত্যি যদি ছোটো বোন হতেন তা হ'লে কখখনো রাগ করতেন না। যাক্, আমাকে ক্ষমা করুন, এইটুকুই এখন বলতে চাই।

এর কোনো জবাব পেলাম না। একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ও চলে গেল। তা হোক্, কথাটি গুছিয়ে ব'লে আমার মনের

কতক বোঝা নেমে গেল। কথাগুলো নিশ্চয় ওর মনে ক্রিয়া করবে।

কি ফল হয় দেখবার জন্যে পরের দিন গেলাম। দেখলাম মুখের ঘোর অনেকটা কেটেছে। দু' একটা কথাও কইলে, এক পেয়ালা চা-ও পেলাম, কিন্তু ও-সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই।

মনটা তবু খুসী হোলো না, যেন একটা অনিশ্চিন্ত ভাব থেকে গেল। পরের দিন তাই দুপুর বেলা অসময়ে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম তখন সদ্যস্নাত প্রফুল্ল মূর্ত্তি, বিষণ্ণতার লেশমাত্র নেই। ভিজে চুলের রাশি কতক সুমুখে কতক পিছনে পড়েছে, গলায় আঁচল জড়িয়ে কি একটা কাজে ব্যস্ত। বুঝলাম মেঘ কেটে গেছে তবু বললাম—

—ক্ষমা পেয়েছি কিনা সেইটুকু জানতে এসেছি।

একটু মৃদু হেসে সে বললে—

—কি মুস্কিল, আপনার কি কাজ-কর্ম্ম নেই, দিনে দুপুরে কেবল ঐ কথাই ভাবচেন?

এবার নিশ্চিন্ত হলাম। অন্যান্য কথার পর চলে এলাম।

তার পর আর কয়েক দিন দেখা হয় নি। হাতে কতকগুলো কাজ এসে পড়েছিল ব'লেই হোক, কিংবা নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেছি ব'লেই হোক, দিন কতক সেদিকে যেতে পারিনি। তারপর যেদিন গেলাম, দেখি আমাকে দেখেই ওর হাসি। কোনো কথাই বলে না, কেবল হাসতে থাকে। আবার কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলাম—

—এত হাসচেন কেন?

—ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে, তাই হাসচি।

—কি মিলে যাচ্ছে?

—এই আপনাদের ভাই-বোনের সম্পর্কটা। আপনাদের দস্তুরই এই। আপনার লোকের চাইতে আপনাদের কাছে পরই ভালো।

—কিন্তু মিলে যাচ্ছে কি বলছিলেন যে?

—বোনের সঙ্গে আপনারা যে রকম ব্যবহার করে থাকেন, আমার সঙ্গেও ঠিক তাই করচেন দেখচি। মুখে দেখান যে বোনকে ভারী ভালোবাসেন, কিন্তু দেখাশোনা করবার একটুও সময় হয় না। বোন মনে করে ভাই আমার কাজে ব্যস্ত, তাই দেখতে আসবার ফুরসৎ নেই। যাক্, আপনার কথার খুব ঠিক আছে তা বলতে হবে। যেমনি মুখে বল্লেন, কাজেও ঠিক তাই করতে লাগলেন। হয়তো কত কাজ বাকী আছে, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে না তো?

ভয়ানক অপ্রস্তুত হলাম। তার পর কয়েক দিন আবার ঘন ঘন যাতায়াত করলাম। কিন্তু তবু কোনো ত্রুটী হ'লেই ঐ কথা শুনতে হোতো। ভয়ে ভয়ে থাকতাম, কখন আবার বিদ্রূপ শুনতে হয়।

তার পর বেশী দিন আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। ঘটনার চক্র এমন জোরে ঘুরে গেল যে দুজনে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলাম। জীবনে কত গল্পই সম্পূর্ণ হয় না—হঠাৎ মাঝখানে থেকে সূত্র ছিড়ে যায়।

আপনারা বলবেন গল্পের এরকম পরিণতিটা ভাল হোলো না। নিঃসম্পর্কীয় ভাবে মাধুর্য্যের যে রহস্য ফুটে উঠেছিল, সম্পর্কের দোহাই দিয়ে অনর্থক সেটা নষ্ট হ'য়ে গেল। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? অনাত্মীয় হোক বা আত্মীয় হোক, বন্ধু হোক বা বোন হোক, মনের জিনিষ সমানই থাকে, ওজনের তাতে কম বেশী হয় না। চাই যা, তা তো ঐ স্নেহ। যে দিক দিয়েই হোক একটু সহানুভূতি, একটু প্রীতি, এইটুকুই কেবল কাম্য। তৃষ্ণার জল যেখানে মিললো, সেখানে তলা হাৎড়ে মণিমুক্তার খোঁজে দরকার নেই। আগেই এ কথা বুঝেছিলাম, কিন্তু তা আরো ভাল ক'রে বুঝলাম ঐ ভুলটা করবার পর।

যে কথা আমি ঠিক বোঝাতে পারছিনা, কবি একটি কথায় তা ব'লে দিয়েছেন—

"মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা,
তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে তা হীরা সোনা,
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।"

মরুভূমি নিশ্চয়। চারিদিক শুষ্ক, রুক্ষ, একটু হাসি মেলাই ভার। এখানে হীরা সোনা নিয়ে লাভ কি? ও যেখানকার জিনিষ সেখানেই থাক, খুঁজে দেখ কোথাও একটু জলের উৎস, কোথাও একটু ছায়াতল আছে কি না। উৎসের সন্ধান যদি পাও তবে হীরা সোনা ফেলে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াও। এখানে ঐ জলেরই বড় অভাব।

অবশ্য এ কেবল আমার মনের কথা। অন্যের মনের খবর আমার জানা নেই। নিজের মনই সবটা জানি না, পরের মনের কথা কি জানবো ?

* * *

বহুকাল কেটে গেছে। কতকাল তার হিসাবে কাজ কি ? মনের কাছে কালের পরিমাণ নেই। দু' পাঁচ বছরও হ'তে পারে, বিশ পঁচিশ বছরও হ'তে পারে। এর মধ্যে মনের পরিবর্তন অনেক হয়েছে। কাঁচা মন এখন কঠিন হয়েছে, অল্প জলে আর তৃষ্ণা মেটে না, উৎসের সন্ধান অন্যত্র করতে হয়।

অবসরকালে চুপ ক'রে বসে আছি। চঞ্চল, উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খল একটি পাঁচবছরের মেয়ে কাছে ব'সে খেলনা পুতুল নিয়ে খেলা করছে। ভয়ানক ব্যস্ত, যেন গুরুতর কিছু একটা কার্জ করছে। বক্ বক্ ক'রে অনবরত বকছে, কখনো ধমকে কখনো আদর ক'রে কার সঙ্গে কথা কইছে। পরম কৌতূহলে আমি তার খেলা দেখছি, এক একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করছি ব্যাপারটা কি,—কিন্তু আমার কথার কোনোই জবাব পাচ্ছি না। আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে সে আপন মনে খেলতে লাগলো, চেষ্টা ক'রেও তার কোনো সাড়া পেলাম না। তবুও থেকে থেকে তার নাম ধ'রে ডাকতেই লাগলাম। জানতাম যে খেলার সময় ডাকলে কোনো জবাব পাবো না, তবু তাকে বার বার ডেকে কৌতুক অনুভব করছি। এও একরকম খেলা।

খানিক পরে উঠে দাঁড়ালাম। যেন আপন মনেই বল্‌লাম,—আমার সঙ্গে তো কেউ কথা কইবে না, তার চেয়ে ও-ঘরে গিয়ে বসি।

কিন্তু এক পাও যেতে পারলাম না। বালিকা তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে হাত ধরে আমাকে বসিয়ে দিলে। বল্‌লে—কোথাও যেতে পাবে না, এইখানেই ব'সে থাকতে হবে।

আমি ডাকলেও সাড়া দেবে না, অথচ আমাকে কোথাও যেতেও দেবে না। আমাকে কাছে রাখা চাই, আমার সাড়া পাওয়া চাই, অথচ সে নিজে কোনো সাড়া দেবে না।…

সন্ধ্যা হোলো। বালিকার ঠাকুমা প্রদীপ নিয়ে আমাদের সুমুখ দিকে ঠাকুরঘরে গেলেন। বালিকা নিমেষের মধ্যে খেলা ফেলে ঠাকুমার পিছু পিছু ছুটলো। ঠাকুর ঘরের দরজায় গিয়ে একেবারে গম্ভীর হ'য়ে শান্তভাবে দাঁড়ালো। ঠাকুমা ঘরে প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন। বালিকা তাঁর দেখাদেখি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলো। কেউ তাকে ব'লে দেয়নি, সে আপনিই এটা শিখেছে। বোধহয় মনে করে এও একরকম খেলা, শান্ত হ'য়েই এ খেলতে হয়। কার সঙ্গে কি রকম ভাবে খেলতে হয় তা সে বুঝেছে। কোথায় ডাক শুনলেও সাড়া দিতে হয় না, আর কোথায় সাড়া না পেলেও ডাক দিতে হয়, তা সে প্রথম থেকেই শিখতে সুরু করলো।

হঠাৎ আমার বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনা মনে পড়ে গেল। এ-ঘটনার সঙ্গে সে-ঘটনার কোথায় মিল আছে তা জানি না। যার পর যা মনে জেগেছে তাই বল্‌লাম।

পশুপতি ভট্টাচার্য্য

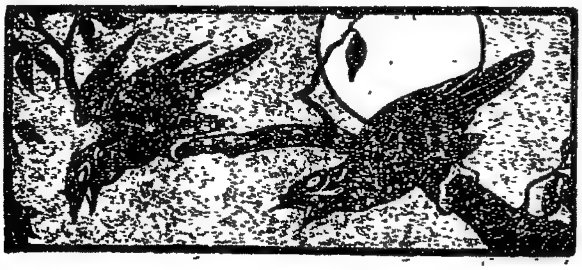

শবরী

শ্রীসুপ্রভা দত্ত এম্-এ

এসেছ বুঝি করিয়া ভুল নিরালা বনতলে ?
যে নভোতলে হয়নি তারা জ্বালা,
যে পথ'পরে কুসুমবীথি নাহিক' ছায়া-ধরা
যে বেদীমূলে নাহি প্রদীপ-মালা !

তবুও যদি করেছ ভুল, ভুলের অবসরে
ক্ষণেক তরে কাটায়ে যাও বেলা,
দিবস যায়, রজনী আসে; রজনী অপগত ;
হেথায় শুধু আসা যাওয়ার খেলা।

কারেও নাহি বাঁধিতে চাই আমার বাহুপাশে,
জেনেছি মনে বাঁধন নাহি রয়।
জীবন দিয়ে বাঁধিব যারে, কখন চুপে চুপে
মরণ আসি হরিয়া তারে লয় !

হাসির ধারে মোহিত করি, সহসা দেখি হায়
পরাণ ভরি জাগে দীরঘশ্বাস !
প্রভাতে গাঁথি কুসুম মালা, অস্ত সমাগমে
কণ্ঠে বাজে শূন্য ডোরের ফাঁস !

হেরগো ওই আঁধার এল সকল বন ছেয়ে ;
অন্ধকারে নয়ন ডুবে যায় ;
সারাটি দিন কয়েছি কথা, গেঁথেছি গীতহার,
এবার তারা মরিবে মৌনতায় !

নয়নে মেলি' চাহিয়া রব, নয়ন লব ভরি',
মরণ সম সুনীল আঁধিয়ারে,
কবরী যদি এলায়ে পড়ে বায়ুর লীলাভরে,
অলকপাশ ঘিরিবে চারিধারে !

প্রহর গত, রাজার পুরে ঘণ্টাধ্বনি বাজে ;
লগন কবে হবে, নাহিক' জানি।
আমার শুধু চাহিয়া থাকা, চাহিয়া থাকা শুধু,
আমার শুধু আছে বেদনখানি !

এসেছে যারা, গিয়েছে চলে, আবার আসে ফিরে,
গাঁথিয়া রাখি ক্ষণকালের মালা ;
হে চিরকাল, বিরহ-নিশি-প্রভাতে দিলে দেখা
পরাব গলে ক্ষণকালের মালা।

ডষ্টিভ্স্কী

শ্রীমুকুট রায়

Dostoevskyর উপন্যাসে আমাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত জগৎ উদ্ঘাটিত হয়। সে জগতের লোকেরা কথা কয়, চলে ফেরে, তাহাদের মত নয় যাহাদের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় আছে। জানি রুশিয়াবাসীরা আদৌ আমাদের মত নয়। কিন্তু কেবল তাহাদেরই বিষয় জানিবার কৌতূহলে আমরা ডষ্টিভ্স্কীর উপন্যাস পাঠ করি না।

বরং তাহা পাঠ করি এই জন্যই যে তাহাতে মনে করাইয়া দেয় আমাদেরই আপন আত্মকথা, আমরা নিজে যাহা ভুলিয়া গিয়াছি। যেমন কোন পুষ্পাসবের ক্ষণিক সৌরভ আঘ্রাণে বালককালের কোন বিস্মৃত লোকালয়, অতীতের কোন মনোরম দৃশ্য—দৈবাৎ স্মরণ-পথে আসিয়া উদিত হয়। পুষ্প সৌরভে পুনর্জাগরিত সেই স্মৃতির যথার্থতা যেমন নিঃসন্দেহ ডষ্টিভ্স্কীর সত্যও আমাদের নিকট তেমনি নিঃসংশয়। বিস্ময়কর সেই সত্য,—কেননা তাহা ছিল, শৈশবের স্মৃতির মতই আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সুপ্ত। এই সত্য সপ্রমাণ করিবার তাঁহার কোন আবশ্যকতা নাই; আমাদের পরিচয়ের জন্য যখনই তিনি পুনবায় উপস্থিত করিয়াছেন আমরাও চিনিয়াছি সেই মুহূর্তে, তাহা আমাদের চিরাভ্যস্ত বিশ্বাসের যতই বিসদৃশ হউক না কেন।

ডষ্টিভ্স্কীর রচনাপদ্ধতির মধ্যেই ডষ্টিভ্স্কীর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ঔপন্যাসিকের সহিত তাহার প্রভেদ সেই খানেই; কারণ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ও অপরের হইতে পৃথক। শুধু গল্পাংশ বা প্লটবিশিষ্ট উপন্যাস সার্থকতা বা ব্যর্থতার উপসংহার লইয়া ব্যাপৃত। উপন্যাসের নায়ক যেমন কোন বিশিষ্ট কাজ সম্পাদন করিতে বাধ্য, আমরাও তেম্নি উপন্যাস পড়িয়া দেখিতে চাই যে সেই ব্যক্তি তাহার কর্তব্য পালনে কতদূর কৃতকার্য্য। চরিত্রবিশ্লেষণপটু উপন্যাসগুলিতে প্লট বা গল্পাংশ গঠিত হয় প্রায়ই সফলতা বা বিফলতার সমাপ্তিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপন্যাসের চরিত্র-চূড়ামণি প্রেমে পতিত হন ও তাঁহার সুখ ও দুঃখের দোলায়মানতায় গল্প অগ্রসর হয়। কিন্তু ডষ্টিভ্স্কীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ চরিত্রটীরও আপন সুখ দুঃখের উপর কোন ঔৎসুক্য নাই, কারণ ডষ্টিভ্স্কীর নিকট মানুষের সুখ দুঃখ মানুষের বহিরিন্দ্রিয় বিষয়-ভুক্ত; জীবনের সফলতা বা বিফলতার সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। মানবাত্মার অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস এত দৃঢ় এবং তাহার সঙ্গে বিশ্বজগতের শৃঙ্খলার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা এত গভীর যে তিনি ইহ জীবনের উপরেই শেষ কসি টানিয়া দিতে পরাঙ্মুখ।

অধিকাংশ লেখক প্লট বা গল্পাংশের প্রচেষ্টায় জীবনটাকে এমন একটা জবরদস্তি পরিসমাপ্তির মধ্যে আনিয়া তবে ক্ষান্ত হন যাহা বাস্তবিক জীবনের সুসঙ্গত পরিণাম বলা যায় না। সুতরাং নভেলে আমরা সেই একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধা প্লট্ দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত। বাঁধাবাঁধি গল্পাংশের গঠনকৌশল, ন্যায় অন্যায়, কলাফল, আমাদের চক্ষে সুনিয়মিত নিশ্চয়তার যে মোহ উৎপাদন করে তাহা চিরন্তন মানবধর্মে আমাদের ক্ষীণ বিশ্বাসেরই অনুকূল। ডষ্টিভ্স্কীর মানবধর্ম মানবমনের সুখ স্পৃহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; সুখের তারতম্যে তাহা অভিভূত হইবার নহে, এমন কি মানবাত্মার সাময়িক অবস্থান্তরেও তাঁহার ধর্মবিশ্বাস কখন বিচলিত হয় না। নিজের জীবনে তিনি দুঃখে অবগাহন করিয়াছেন, কাজেই দুঃখের চরমতম পরিচয়ও তিনি পাইয়াছেন আপন অভিজ্ঞতায়।

তত্রাচ তাঁহার গ্রন্থসমূহে এমন শান্তিপূতভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাহার তুলনায় নিজ জীবনের যত দুঃখ যত যন্ত্রণা তাঁহার নিজের নিকটেই অপ্রকৃত ও অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান। টলষ্টয়ের সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ এইখানে। টলষ্টয় সেই শান্ত

সংষত ভাব দূর হইতে দেখিয়াছিলেন কিন্তু স্পর্শ করিতে পারেন নাই। একদিকে মানবাকাঙ্ক্ষার স্বাধীনতা, অপরদিকে তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস, উভয়ের অনিবার্য্য সংঘাতপীড়িত মানব-জীবন টলষ্টয়ের সৃষ্ট কল্পনা। কঠিন আত্মবিচারের দ্বারা টলষ্টয় সেই সাধীনতা ও সেই বিশ্বাস, উভয়পক্ষ, মানবজীবনে বিচার করিয়াছেন। এবং যেমন নিজের উপরে তেমনি অপরের উপরেও আপোষ মীমাংসার অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যে অনুপপত্তির পশ্চাদনুধাবন তিনি করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থে তাহারই ভূরি ভূরি প্রমাণ; মানবজীবনের সফলতা ও বিফলতা প্রায় তুল্যমূল্য। টলষ্টয়ের ধারণা সুখই জীবনের চরম পরিণতি; যদিও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে শ্রেষ্ঠতম ধার্ম্মিক মহাত্মার দ্বারাও সেই সুখ অপ্রাপ্য ও অলভ্য। পঞ্চমকার পীড়িত মানুষের তো কথাই নাই।

টলষ্টয়ের নিজের জীবনেও দুঃখের উৎপত্তি ও অশান্তির আশ্রয় এই মানবাকাঙ্ক্ষার স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের শাসনের সংঘর্ষে। ডষ্টিভ্স্কীতে এই সংঘর্ষের শান্তি। তিনি জীবনে সুখ যে কি বস্তু তাহা কখন দেখেন নাই অথচ সুখ-মৃগ-তৃষ্ণিকার অনুসরণ করিতেও লেশমাত্র উৎকণ্ঠিত নহেন। কি নিজের কি অপরের আত্মোৎকর্ষ, সুখের মাপকাঠি দিয়া তিনি পরিমাপ করেন নাই। মানবাত্মার প্রতি তিনি এতাদৃশ শ্রদ্ধাবান যে তিনি সেই আত্মাকে পারিপার্শ্বিক বিষয়ের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত দেখিয়া থাকেন এবং কর্ম্মের ভিতর স্বকীয় প্রকাশ হইতে সেই আত্মাকে প্রায় নির্ম্মুক্ত দেখিতে পান। সত্য বটে মানবাত্মার প্রকাশ—কর্ম্মের সহিত অবস্থা গতিক কলুষতা, রক্তমাংস সংশ্লিষ্ট প্রবৃত্তি, ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে পাপ-পুণ্য ভোগ, ভালমন্দের মিশ্রিত খাদযুক্ত,—ডষ্টিভ্স্কী তথাপিও সেই আত্মাকে সর্ব্বেব মুক্ত দেখিতে প্রয়াসী।

বাহ্যবস্তু বা চতুর্দ্দিকে অবস্থার প্রভাবে মানুষের চরিত্রগত বৈচিত্র্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ডষ্টিভ্স্কী সেই বৈচিত্র্য বা বৈষম্য ধরিয়া মানুষকে পরীক্ষা করেন না। তাঁহার নিকট মানুষের চরিত্রানুযায়ী বহির্ব্বিষয়ের পার্থক্য অপেক্ষা মনুষ্যের অন্তরাত্মা অধিকতর নিত্য ও সত্য। যে শক্তির দ্বারা মানুষ আপন আত্মার স্বরূপ প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন করে ডষ্টিভ্স্কীর লক্ষ্য তাহারই উপর। সুতরাং তাঁহার উপন্যাসের গোড়ার কথা মানুষের অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করা। মানুষের চরিত্র বিচার করিয়া দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় করা কিম্বা তাহাদের জীবন এ জগতে স্বার্থক কি ব্যর্থ তাহা সাব্যস্থ করা তাঁহার প্রতিপাদ্য নহে। এই উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্যই তাঁহার রচনাপদ্ধতিকে বৈশিষ্ট্যতা দান করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মানব শরীর হইতে বা চারিদিকের বেষ্টনী হইতে সেই আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে তিনি চেষ্টা করেন নাই; কারণ তাহা হইলে নিজের অভিজ্ঞতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ফলে তাঁহার আচরণও হইত বিপরীত। বরং তিনি অন্তরাত্মাকে দুঃখ-দৈন্য-ভ্রান্তিক্লিষ্ট দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই; কেবল নিজের নিকটেই নহে অপর সাধারণের নিকটেও। কিন্তু এমন করিয়াই এই দুঃখ দারিদ্র্য ভ্রান্তি চিত্রিত করিয়াছেন যাহাতে সেই অবস্থার অতি গুপ্ত অন্তরালস্থিত অন্তরাত্মার সত্য স্বরূপটী আমাদের মানসের দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার আখ্যায়িকাভুক্ত ব্যক্তিরা যদৃচ্ছা গা ভাসাইয়া চলে; এমন দীর্ঘায়ত অসংযত বাক্যালাপ করে যাহার সহিত মূল উপা-খ্যানের কোথাও কোন যোগ নাই; অনাবশ্যক কলহের ও লজ্জা সরমের জ্ঞান বিরল—তাহাদের আচরণ অসহনীয় মনে হয়। বাস্তবিক জীবনে সেই সকল লোক অতিশয় নিন্দনীয় ও ঘৃণার পাত্র। কিন্তু পাঠকের পাঠ যতই অগ্রসর হইতে থাকে তাহার মন হইতে ধীরে ধীরে ঘৃণার ভাব যে কেবল কমিয়া যায় তাহা নহে বরং পাঠক সেই চরিত্রেরই অন্তস্থলে নিজের আত্মরূপ দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হয়। তাহার মধ্যে আমরা নিজেকে দেখি ও চিনি—ঠিক দর্পণে মুখ দেখার মত; মুখ নয় —নিজের অন্তরাত্মাকে খুঁজিয়া পাওয়ার মত। তাহাদের কথায় নয়, ব্যবহারে নয়, কিন্তু কথা ও ব্যবহারের দ্বারা অন্তঃ-স্বলিলা ফল্গু-রূপিণী যে চিৎশক্তি প্রকাশ পায়—তাহারই মধ্যে আপনার অন্তরাত্মার প্রতিরূপ দেখিতে পাই।

তাঁহার কল্পিত ব্যক্তিগুলি অতিরিক্ত স্পষ্টবাদী। জানি না রুশীয়দের স্পষ্টবাদীতা চরিত্রগত লক্ষণ কিনা, কিন্তু ডষ্টিভ্স্কীর রচনারীতিতে ইহার প্রাদুর্ভাব সমধিক। রুশীয়ার অপরাপর ঔপন্যাসিক কল্পিত চরিত্রে অত্যধিক বাচালতা দেখা যায় না। ডষ্টিভ্স্কী লোকগুলিকে এমন করিয়াই অপকট কথা বলাইয়া,

অযথা কাজ করাইয়া থাকেন যাহাতে তাহাদের অজ্ঞতসারে তাহারা নিজ হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন দিকটা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে; অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কাজে বা কথায় তাহারা কোন সৌজন্যের সীমা মানে না কিন্তু তথাপিও অতিরঞ্জিত বা অবিশ্বাস্যও নহে।

নভেলে সাধারণতঃ ব্যর্থতা বা সার্থকতা প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই উদ্দেশ্যে গল্পের নিপুণ পরিকল্পনার সহিত আমরা যেরূপ অভ্যস্ত তাহাতে ডষ্টভস্কীর রচনাধারায় কোন ধারাবাহিক প্লটের ঐকান্তিক অসদ্ভাব আমাদের আর্ট-প্রিয় মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ডষ্টভস্কী তদভাবে নিজেও যেন কিছু সঙ্কুচিত অন্তরাত্মার প্রকাশকল্পে তদীয় বশীভূত যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সমাবেশ করিতে গিয়া নিজস্ব গল্পগুলি তেমন ভাল করিয়া বলিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ সম্যক উপভোগ করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায় গল্পাংশকে একেবারে বিস্মৃত হওয়া; কারণ গল্পটাই গ্রন্থমধ্যে অকিঞ্চিৎকর। স্ত্রী পুরুষের আত্মবিশ্লেষণ গ্রন্থের প্রাণ—ইহার রচনা সৌষ্টবের অভাব দেখিলেই বুঝা যায় যে সেই জায়গায় ডষ্টভস্কী নিজ বক্তব্য বলিবার জন্যে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন।

যাঁহাদের বিশ্বাস আত্মা একটা কাল্পনিক প্রহেলিকা মাত্র (অনেকেরই বিশ্বাস তথৈব, যদিও নিজের সম্পূর্ণ কোন জ্ঞান নাই।) তাঁহারা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে ডষ্টভস্কী নিজের কত পদস্খলন, কদাচার, ভ্রম ভ্রান্তির ভিতর দিয়া আত্মার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস, সদসৎ যাহাই হউক, ঔপন্যাসিক ডষ্টভস্কীর যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাও কম কাজে লাগে নাই। অন্যায় অত্যাচার দুঃখ যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ পরিচয় তিনি যেরূপ পাইয়াছেন বর্ত্তমানে কোন লেখকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার রচনায় তাঁহারই অভিজ্ঞতার আবেদন। স্বকীয় অভিজ্ঞতায় তিনি জানিয়াছিলেন দুঃখ দারিদ্র্যের উৎপীড়ন বিধাতৃ-বিহিত সংসারের সনাতন নিয়ম; কোন বর্জ্জিত বিধি বা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। অপর লেখকেরা সংসারের দুঃখ দৈন্যের চিত্রাঙ্কণ দ্বারা সচরাচর আপন জীবন ও সমাজ বা বিশেষ বিধি ব্যবস্থার সহিত নিজের মত বিরোধ বা অভিমত অঙ্কিত করেন। কিন্তু ডষ্টভস্কীর কাহারও সহিত কোন বিরোধ,—কোন সংগ্রাম নাই; তাঁহার নিকট অবজ্ঞার বিষয় কিছুই নাই, সম্ভ্রমের সলজ্জ কুণ্ঠা নাই, নৈরাশ্যও নাই। রুশীয় গভর্ণমেন্টের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছনার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে তথাপি তিনি সেই অমানুষিক অত্যাচারের জন্য গভর্ণমেন্টকে কোন ক্রূর হিংসাবৃত্তির অবতার মনে করেন নাই। যেমন নিজের, যেমন অপর সাধারণের ব্যক্তিগত অসদাচরণ,—গভর্ণমেন্টের অসদাচরণও তাঁহার নিকট একই পর্য্যায়ভুক্ত।

যখন মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে হয় না, যখন তাহার মধ্যে এমন প্রবৃত্তি দেখি,—আমাদের চক্ষে যাহা বীভৎস, তখন মানুষের প্রতি স্বতঃ ঘৃণা জন্মে। ঔপন্যাসিক যদি স্ব-রচিত চরিত্রের দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে নিজের ঘৃণার দ্বারা রঞ্জিত করেন তবে সেই চরিত্র জীবন্ত হয় না,—হয় অস্বাভাবিক। এই লেখকের মতই অবজ্ঞাপরায়ণ পাঠক ভিন্ন অপর সাধারণের প্রাণে তাহার রচিত চরিত্রে কৌতুহল উদ্দীপন করে না। শুদ্ধ মাত্র নিজের অবজ্ঞার প্রভাবে টলষ্টয়ের কোন কোন চরিত্র অস্বাভাবিক ও প্রাণহীন। ডষ্টভস্কী কাহাকেও ঘৃণা করেন না; তাঁহার আগ্রহ প্রত্যেক প্রবৃত্তির পিছনে আত্মার স্বরূপটা দেখিতে। কি কথায় কি কাজে, প্রবৃত্তির তাড়নে মানুষ নিজ অন্তরের প্রকৃত রূপটা প্রকাশ করিয়া ফেলে কিম্বা গোপন করিতে সমর্থ হয়; কাজেই তাঁহার সকল কৌতুহল মানুষের সেই প্রবৃত্তিনিচয়ের উপর নিবদ্ধ।

ডষ্টভস্কীর গ্রন্থে পাষণ্ড, দুর্ব্বৃত্ত দুরাচারীর চিত্র অপ্রচুর নয়, কিন্তু কেবল পাপের প্রতি নিজের ঘৃণা প্রকাশের অভিপ্রায়ে বা গল্পাংশের পারিপাট্যের জন্যে অথবা পাপের সবিশেষ পরিচয় দিবার জন্যে পাপ-কাহিনী বিবৃতি করা তাঁহার আদৌ পছন্দ নয়। সাধু অসাধু নির্ব্বিচারে সকলেরই অন্তরাত্মার উপর তাঁহার সমান দৃষ্টি,—কেবল পুণ্যাত্মার আত্মাই আত্মা আর পাপিষ্ঠের আত্মা আত্মাই নয়, এরূপ মানবধর্ম্ম তাঁহার বিশ্বাসবিরুদ্ধ। পাপীর হৃদয়টাকে তিনি যেমন জানেন নিজের অন্তরের বিষয় সত্যকার না জানা থাকিলে কেহ তাহা জানিতে পারে না। পাপিষ্ঠের চরিত্র পর্য্যাবেক্ষণ ও আলোচনায় তাঁহার শক্তি পর্য্যবসিত হয় না। যত মহাপাপীই

হউক তাঁহার অকপট সমবেদনায় সে জীবন্ত হইয়া উঠে। ছাগল ও ভেড়ার মত পশুর শ্রেণী বিভাগ করিয়া মানুষকে তিনি দেখেন নাই, কিম্বা অভিপ্রায়ানুযায়ী ভেড়াকে ছাগল অপেক্ষা চিত্রে স্পষ্টতর করেন নাই; যদিও প্রায় সকল উপন্যাসেই এইরূপ দেখা যায়। ডষ্টিভ্স্কীর দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে অনৈক্য অপেক্ষা ঐক্যের লক্ষণই বেশী কারণ সকলের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান। সতত তাঁহার জ্ঞান হইতেছে সকলের মধ্যেই আত্মা বিরাজমান; তাহাদের মধ্যে ভেদাভেদ ভাব তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিপরীত। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে কেবল ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সমান নহে,—ভাল মন্দ, পাপ-পুণ্য,—তাঁহার চক্ষে অভেদাত্মক। অসংযমী, সুরাপায়ী হত্যাকারীর প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ও সমবেদনার অভাব নাই। ডিকেন্স রচিত পাপিষ্ঠের চরিত্র অপেক্ষা অনেক ঘোরতর পাপীকে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ডিকেন্স যেমন পাপীদের দুর্ব্বলতার প্রতি নিজের কৌতুক ও বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, ডষ্টিভ্স্কী তাহাদিগকে সেরূপ অবজ্ঞা করেন নাই বরং তিনি তাহাদিগের অসংযত ব্যবহারের প্রতি সতত স্নেহার্দ্র কৌতূহল পরায়ণ; যে আচরণের বা প্রবৃত্তির তাড়ণার উৎপত্তিস্থল সাধারণের চক্ষু এড়াইয়া যায় সেই স্বেচ্ছাচারিতার অন্তরালস্থিত, ভস্মস্তূপে অগ্নিকণার মত মানুষের অন্তরাত্মাটীকে তিনি দেখিতে পান।

আত্মা অভেদ, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে। অবয়বের বিভিন্নতা আত্মাকে স্পর্শ করে না। কাজেই নারীর নারীত্বের উপরেই তাহার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় না। পুরুষের সহিত যেমন স্ত্রীলোকের সহিতও তাঁহার তেমনই পরিচয়; কারণ স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সৃষ্টির মানবপর্য্যায়ভুক্ত। যৌন সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল স্ব স্ব প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় নয় অন্তরাত্মার উপর তাহার প্রভাবে। নিবৃত্তি-নিবোধিত প্রবৃত্তির সংযম তাঁহার শিল্পকলাকে আরও গভীর ও আধ্যাত্মিক করিয়াছে, পাঠকের প্রবৃত্তির উপাসনা তিনি করেন নাই; উচ্চ অঙ্গের গায়ক যেরূপ কেবল মাত্র সুরের বোধের মধ্যেই সঙ্গীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন না। বোধাতীত অন্তলোকই তাঁহার লক্ষ।

সাধু মহাত্মারা যেমন সংসারের দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হন তিনিও সেইরূপ দুঃখ ভোগ দ্বারা পরিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের সাহায্যে নির্য্যাতনের সোপাণ বাহিয়াই তিনি 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—আর্টিষ্ট বা কলাবিদের পক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক। নিজের ক্ষুৎ পিপাসার হিসাবে নিজ নিজ রুচির পরিচয় দিতে গেলে আর্ট পক্ষপাতদুষ্ট ও অবান্তর হইয়া উঠে। নিজের ব্যক্তিত্ব হইতে ডাষ্টিভ্স্কীর কল্পিত চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক। অপর লেখক নিজেকে নিজের রচনা হইতে এরূপ সম্পর্কশূন্য রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা জানি না। পাপানুষ্ঠান দর্শনভীতি ও পুণ্যসুলভ দাম্ভিকতা বা তজ্জনিত কোন সামাজিক নীতি বা বিধান প্রতিষ্ঠার আড়ম্বরে আসল মানব জীবনের প্রতি তাঁহার সস্নেহ উদার দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত হয় নাই।

প্রাচ্য ভারতের জ্ঞানানুশীলনের একমাত্র লক্ষ্য—আত্মার মুক্তি। ডষ্টিভ্স্কী সেই মুক্তভাবের উপাসক। তাঁহার সৃষ্টি প্রত্যেক চরিত্রে সেই নির্ম্মুক্ত আত্মারই আভাষ। অন্যান্য ঔপন্যাসিক ব্যক্তিগত সাধুতা বা আসাধুতা দেখাইতে গিয়া তাহাদের প্রত্যেক আচরণে এমন জোর দিয়া থাকেন যে মানবিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া যান। তেমনি প্রতীচ্য চিত্রকলায় সাধু মহাত্মাকে আমরা চিনি তাঁহার শিরোবেষ্টিত কিরণমণ্ডলে এবং পরিমূঢ় পবিত্রতার কৃত্রিম দৃষ্টিবিভ্রমে। সংসারে তদাকৃতি ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই না বলিয়া সাধুকেও চিনিতে পারি না। নিজেও হয়ত আমরা সেই মূর্ত্তি পছন্দ করি না—আন্তরিক ঔদার্য্য অপেক্ষা অবয়বের ভঙ্গিমাই যাহাতে প্রধান। প্রাচ্য আদর্শের উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি,—গম্ভীর অচঞ্চল, আড়ম্বর-লেশশূণ্য মূর্ত্তি, শুদ্ধমাত্র তাহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অন্তর্লোকের উচ্চতর অভিযানের ইঙ্গিত করিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। সাধুর আদর্শ প্রাচ্য দেশের; প্রতীচ্যে তাহা বাহ্যিক ব্যবহারিক কাঠামো মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কৃতকার্য্যতার দ্বারা জীবনের উৎকর্ষতা নির্ণয় করে—প্রতীচ্য, স্বার্থ সিদ্ধি-মাত্রকে জীবনের সার্থকতা বলে—প্রতীচ্য, বাহিরকে অন্তর অপেক্ষা সত্য জানে—প্রতীচ্য। কিন্তু প্রাচ্য উদাসীন! কি ফলাফল, কি স্বার্থসিদ্ধিতে, একমাত্র অন্তরাত্মাই যাহার লক্ষ্য—'নাল্পে সুখমস্তি'।

ভীষণ কোন নৃশংসতার অভিনয় চক্ষের সম্মুখে ঘটিতে

দেখিলে, অথবা দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার অসহনীয় বৃত্তান্ত পড়িলে ধর্ম্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস সংশয়িত হইয়া উঠে। মনে হয় মানবজীবন মস্ত একটা বিভীষিকা। আমাদের প্রতিদিনের আরামপ্রদ চলন্তিকা বসুমতী এক মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ ভূমিস্যাৎ হয়। কিন্তু ডষ্টিভ্স্কীর গ্রন্থনিচয়ে এই সাংসারিক প্রহেলিকাজনিত ত্রাস ও নৈরাশ্য আমাদের অলক্ষিতে অতি পরিচিত সুকুমার সৌন্দর্য্যসুষমায় লীলায়িত হয়। তাঁহার অঙ্কিত দুর্নীতি ও নৃশংসতার চিত্র আমাদের কল্পনারও অতীত। পৃথিবীতে তাহার তুল্য পাপাত্মার সত্যকার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলে নরপিশাচ শব্দটি বৃথা হইত না। আশ্চর্য্যের বিষয়,—পরক্ষণেই পাপের তাণ্ডব নৃত্য, বিরোধ ব্যঞ্জনা, শঠতা ও নৃশংসতার নেপথ্যে চির স্থির শান্ত সুমধুর মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় তিনি যে অনির্ব্বচনীয় অন্তর্লোকের নির্ম্মল আলোক-প্রস্রবণ আনয়ন করেন তাহা আমাদের চিরকালের নিজস্ব, লেহ্য এবং পেয়। মানুষের নিষ্ঠুরতাই যেমন নির্ম্মল সত্য বলিয়া জানিয়াছিলাম, আবার তেমনিই মানবাত্মার অনাবিল ধ্রুব সত্য উপলব্ধি করি। আর কায়-মনোবাক্যে অনুভব করি, যে মানুষ সেই জীবনকাহিনী কহিতেছেন, তিনি জীবনের সকল শঙ্কা সকল বিভীষিকা অতিক্রম করিয়াছেন। বারংবার দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষায় প্রমাণিত তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণতা আমাদিগের সকল অভিজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য সন্দেহ নাই।

মুকুট রায়

উষালোক

শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী এম-বি

বিকশিত উষালোক নির্জীব জগতে,
অন্ধ তমসারাশি বিগলিত চূর্ণ,
বিহগ-কাকলি-কল-নিঃস্বন মরতে
জাগ্রত চেতনায় করে পরিপূর্ণ।

সখি, তব দু'নয়ন মেল মম নয়নে,
এখনি যেও না চলি' সংসার-বরণে,
গুঞ্জরি' গাহ গাথা বিলগ্নি' বক্ষে—
শুভ-জাগরণে যেন করিওনা ক্ষুণ্ণ।

আসে দিবা, আসে রাতি, আসে যুগকল্প,
চাহি শুধু ক্ষণিকের তুচ্ছ ও স্বল্প।
জয়-যাত্রার পথে দাও প্রেম-চিহ্ন,
ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখ, ক'রো নাক ছিন্ন,—
মধুর প্রভাতে প্রিয়ে সুমধুর ছন্দে
উজ্জ্বল করি' তোল হৃদয়ের শূন্য।

খুকীর স্বপ্ন

শ্রীসুবোধ বসু

রান্নাঘরের উনানের পাশে যেখানে গৃহিণী ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া ফেলিবার অপেক্ষা করিতেছিল, মহিমচরণ সেখানে আসিয়া সোৎসাহে কহিল, শুনচো, আজ বিকেলে যে অবিনাশ আসচে।

চোখ তুলিয়া হৈম কহিল, অবিনাশ ঠাকুরপো? ওরা সব পুজোয় কলকাতায় এসেচে বুঝি?

মহিমচরণ খুসি চাপিয়া কহিল, ঠিক কলকাতায় নয়,—পুজো পেরিয়ে যাবে পুরীতে। চাঁপাতলার মোড়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। বল্লে নিজেই আসত একদিন। তা আসত সে। টাকা হয়েছে,—কিন্তু বদলায় নি, মানমান্যির বালাই নেই।

হাঁড়ি নামাইয়া সকৃতজ্ঞভাবে হৈম কহিল, সত্যিই বড় কিনা—। গরীব আত্মীয়স্বজনের ওপরও তার হেলা নেই। সেবার যখন এলো, সঙ্গে এক ঝুড়ি খাবার। বল্লে, বৌদি, ও তোমার খুকীর জন্য।

মহিমচরণ নিজেই আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না,—অবিনাশ তার শৈশবের সঙ্গী, তার একান্ত আত্মীয়,—না হয় সৌভাগ্যকে প্রসন্ন করিয়া সে এখন ধনীই হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে ছেঁড়া জামা গায়ে দুইটী রোগা ছেলে মেয়ে খেলা করিতেছিল, মহিমচরণ তাদের ডাকিয়া কহিল, ও খুকী, ও নেতাই, আজ তোদের অবিনাশ কাকা আসবে যে রে।

এ খবরে ছোট ছেলেটীর কোনও ভাব ব্যতিক্রমই হইল না দেশলাইয়ের বাক্সটায় দড়ি বাঁধিয়া সে তেমনি গাড়ি টানিতে লাগিল। কিন্তু খুকী বাহির হইতে চেঁচাইয়া কহিল, কোন্ অবিনাশ কাকা, বাবা? আর বার যে আমায় রঙিন জামা দিয়েছিলো?

মহিম কহিল, হ্যাঁ।

এবার খুকী ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। বাপের গা ঘেঁষিয়া লোভীর মত কহিল, এবার আবার দেবে না?

মা কহিল, দূর্ লোভী, পরশু তো একটা সাড়ী পেলি, জামা পেলি।

খুকী প্রায় তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, ভারি তো সে জামা। জানো মা, বোসেদের বাড়ির নন্দরাণী কেমন লাল জামা কিনেচে, দু-দুটো তার গোলাপফুল। তারপর অসন্তুষ্টভাবে কহিল, বাবা যে কি ছাই আনে কেবল সস্তা!

মহিমের মুখ শাদা হইয়া উঠিল, এবং মা ধমকাইয়া কহিলেন, লক্ষ্মীছাড়ীর কিছুতেই খুসী নেই।

মহিম মেয়ের পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কহিল, সাজ বিকেলে খুব খেতে পাববি খুকী,—কাকা কি আর তোর শুধু হাতে আসবে,—যা তার বড় দৃষ্টি!

খুকী কহিল, কি আনবে বলো না?

—রসগোল্লা সন্দেশ এইসব।

খুকী কহিল, আমি কিন্তু একটা আস্ত নেব। কক্ষনো যদি তোমরা একটা আস্ত খেতে দেবে। তারপর মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, ভাঙ ভাঙ নেতাইকে অর্দ্ধেকটা দেই—খাওয়ার যদি জো আছে। তারপর বাহিরে লক্ষ্য করিতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, এই নেতাই, গাড়ি দিয়ে আমার পুতুলের বাড়ি খবরদার ভেঙে দিস্‌নে। পুজো পেরুলেই ওদের আমি বিয়ে দেব—বড় মেয়ে না গলার কাঁটা, বলিয়া কন্যাদায়ভারাক্রান্ত এই প্রাচীনা গৃহিণী নিতাইর উদ্দেশ্যে ছুট দিলেন।

হৈম কহিল, যাওনা, নেতাইয়ের জামাটা বদলে নিয়ে এসো না, যা আঁট হয়েচে, গায়েই লাগে না, তা পরবে কি? বেরুবার আর জামাও নেই।

'পুজোর বাজার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মহিম কহিল, 'এখন আবার ফেরত দিলে হয়। দাও,—দেখে আসি।'

যে-ঘরে তারা আসিয়া প্রবেশ করিল, সেটা বাড়ির এক-

মাত্র বাস করিবার ঘর। দেওয়ালগুলি অধিবাসীদের কাপড়ের মতই ময়লা। ছেঁড়া মাদুরটা কেরোসিন কাঠের তক্তাপোষের রুগ্ন জীর্ণ শরীরটাকে আড়াল করিতে পারে নাই। ভাঁড়ারের প্রায় যাবতীয় জিনিষপত্র এই ঘরেই কোন প্রকারে ঠাসা আছে। নির্লজ্জ দারিদ্র্যতার সমস্ত চিহ্ন চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

তক্তপোষের তলা হইতে একটা প্যাটরা বাহির করিয়া হৈম নিতাইয়ের গায়ে না-হওয়া জামাটা বাহির করিয়া দিল। হাতে লইয়া পুরাতন একটা পত্রিকায় সেটা জড়াইয়া মহিম বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু এমন সময় কোথা হইতে নিতাই চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। 'পুজোর সময় যে আমায় রেলের গাড়ি কিনে দেবে বলেছিলে, দিচ্চো না কেন ? না আনলে আজকে আর আমি ওষুধ খাবো না কিন্তু, বাবা।'

ক্লান্তভাবে মহিম কহিল, দাওনা গো, গণ্ডা চারেক পয়সা বের করে,—ছেলেটাকে অনেক দিন ধরে বলচি—। হৈম কহিল, কি হবে ও-ছাই দিয়ে,—মিছামিছি পয়সা ফেলা।

নিতাই চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ জানাইল।

মহিম কহিল, তা হোক, দাও,—অকিঞ্চনের ঘরে এসেচে বলেই না—

মহিম বাহির হইয়া যাইতেছিল, দরজার কাছে খুকী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত। কহিল, আমার এক বাক্স ফুলঝুরি চাই কিন্তু বাবা,—বোসেদের বাড়ির ঠাকুরের মুখের কাছে ধরবো।

—কেন, এক বাক্স লাল-নীল বাতি এনে দিইচি যে।

—দূর, শুধু তাতেই কি হয় ? গম্ভীরভাবে খুকী কহিল, 'ফুলঝুরি না হ'লে আবার বাজী। নন্দরাণী যা-সব এনেচে—।'

—সে আরেক দিন হবে, বলিয়া অপ্রসন্ন খুকীকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়া মহিম পথে নামিয়া পড়িল। নিতাই চেঁচাইয়া কহিল, ঠিক ভুলোর মত গাড়ি হওয়া চাই কিন্তু বাবা, —গাড়ি থাকবে, লাইন থাকবে, ইঞ্জিন থাকবে—

খুকী গম্ভীরার মত কহিল, নেতাই কেবল মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করার যম। এটা দাওরে, ওটা চাইরে—

দুপুর গড়াইয়া বিকালে পড়-পড়। কোথা হইতে খুকী মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। হৈম তখন কাঁথায় নকসা তুলিতেছিল, খুকী হাঁপাইতে হাপাইতে কহিল, পয়সা, দুটো পয়সা দাও না শীগ্‌গীর,—বায়স্কোপ, দেখব—শীগ্‌গীর, চলে যাবে যে। ছেঁদা দিয়ে টগরী এতক্ষণে সব দেখে ফেল্লে গো।

মা কহিল, সে আবার কি রে ?

—ঐ যে, ছেঁদা দিয়ে দেখি,—বায়স্কোপ। ঐ যে সব জার্মানীর যুদ্ধ !

মা কহিল, ওঃ। সে তো রোজই যায় যে।

'হ্যা হ্যা, তুমি দাও', মায়ের আঁচল অসহিষ্ণুভাবে টানিয়া খুকী কহিল, 'পুজোর সময় দেখতে দেবে, বলেছিলে যে।'

হৈম আঁচল ছাড়াইয়া কহিল, মিছিমিছি জ্বালাস্‌নি খুকী, —ধাড়ী মেয়ে, তার পয়সা নষ্ট।

খুকী ছুটিয়া জানলা দিয়া গিয়া একবার দেখিয়া আসিল, তারপর আবার আসিয়া কহিল, শুধু আজ দাও মা, আর কক্ষনো চাইব না। নন্দরাণী বলে, কি সব চমৎকার ছবি,—কি সব দিল্লীর সহর, বড় বড় জাহাজ...। দাও না গো শীগ্‌গীর, চলে যাবে যে।

মা কহিলেন, ও-সব বাজে জিনিষে পয়সা নষ্ট করতে নেই, খুকী। যাদের ঢের টাকা আছে, তারা করুক গিয়ে।

খুকী অনেক আশা করিয়া আসিয়াছিল, একেবারে কাঁদিয়া দিল।

ছোট্ট মেয়েটার জন্য মায়ের মনে যে ব্যথা সঞ্চিত হইয়াছিল, এতক্ষণে নিরুপায়ের মধ্যে তাহা স্তব্ধ মূক ছিল। খুকীকে কাঁদিতে দেখিয়া সহসা হৈম বিষম রাগিয়া উঠিল। কহিল, দূর হ' লক্ষ্মীছাড়ী, দিনরাত কেবল পয়সা আর পয়সা। একটা চড় বসাইতে উদ্যত হইয়াও কোন প্রকারে সম্বরণ করিল।

খুকী নড়িল না,—ঠোঁট ফুলাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এতটুকু মেয়ে,—সারা বৎসর ধরিয়া প্রলোভন-দেখানো দুটী পয়সার প্রমোদ হইতে তাকে বঞ্চিত করিতে হইবে,—দরিদ্র মায়ের এ-দুঃখের তুলনা নাই। নিজের দু-চোখে একবার হাত বুলাইয়া হৈম সান্ত্বনার সুরে কহিল, যারা মিথ্যি মিথ্যি পয়সা নষ্ট করে, দুর্গামা কিন্তু তাদের দেখতে পারে না খুকী, জানিস্। ঐ বাটিটাতে একটু হালুয়া আছে,—খাবি যা।

খুকী হালুয়া ছুইলও না, বিরাট অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল। হৈম স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই বসিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল।

ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া নিতাই রেলগাড়ি দেখিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, এ-নয়, এ নয়, এ আমি নেবো না, কক্ষনো না।

মহিম কহিল, কেন, আবার কি হলো। বেশ তো রঙিন দেখতে।

কিন্তু নিতাইর গলা ক্রমেই সপ্তমে চড়িল। এটা ছাই গাড়ি, এটা ভুলোর মত নয়, এর লাইন নেই, কলে ইঞ্জিন

চলে না ইত্যাদি। মহিম প্রমাদ গণিল। নিতাইয়ের বর্ণনা মত রেলগাড়ি আনিতে হইলে তার সিকিটার মত আরো তিনটা সিকির প্রয়োজন হইত,—অথচ নিতাই এই বিষয়টা কিছুতেই বোঝে না।

সমস্ত বাড়িটা চীৎকারের চোটে মাথায় চড়িয়াছিল, এমন সময় অবিনাশ কাকা মুটের মাথায় এক হাঁড়ি খাবার চাপাইয়া আসিয়া উপস্থিত।

মহিম ও হৈম ব্যস্তসমস্ত হইয়া আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু লুব্ধ শিশু দুটী ক্রন্দন থামাইয়া খাবারের ভাণ্ডটার একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল,—যেন মধুর ভাণ্ডে মৌমাছি পৌঁছিয়াছে।

মহিম ডাকিল—ও খুকী, ও নেতাই, কাকাবাবুকে পেন্নাম ক'রে যা। কাকাবাবু আসবে শুনে তো কত লাফালাফি করছিলি।

খুকী কোন প্রকারে প্রণাম সারিয়া তাড়াতাড়ি আবার হাঁড়ির কাছে দাঁড়াইল। নিতাই কিন্তু মোটেই নড়িতে পারে না এ লোভনীয় হাঁড়িটাকে ছাড়িয়া কাহাকেও সৌজন্য দেখানো তার পক্ষে অসম্ভব।

নানা সুখ-দুঃখের গল্প হইল। যাইবার পূর্ব্বে অবিনাশ শিশু দুটীকে বলিলেন :

—বাজী কিনেচিস্, খুকী ?

—তুমি এক বাক্স ফুলঝুরি দিও,—বাবা যদি কিছুতেই দেয়।

—আর তোর কি নেতাই ?

—আমার রেলের গাড়ি।

হৈম কহিল, দুষ্টু ছেলে, আজই না রেলগাড়ি এনে দিয়েচে,—না না, ওসব প্রশ্রয় দিয়ো না, ঠাকুর পো।

নিতাই প্রতিবাদ করিয়া কহিল, ওটা ছাই, ওটায় লাইন নেই, কলে চলে না—

অবিনাশ কহিল, কি তামসা দেখবি তোরা খুকী ?

খুকী কহিল, বোসেদের বাড়ি পুজো হবে যে,—মস্ত বড় ঠাকুর।

অবিনাশের মনে পড়িল তার দরিদ্র দিনের কথা, আর বড় করুণ লাগিল এই দরিদ্র শিশু দুইটীর অল্পে তুষ্ট হওয়া। কহিল, বায়স্কোপ দেখেচিস্, খুকী ? খুকী অভিযোগ করিয়া কহিল, আজ তো এখান দিয়েই যাচ্ছিল—সেই যে ছেঁদা দিয়ে দেখে, কেমন তো ? মাকে এত বল্লুম, দুটো পয়সা দাও না, তাকে কি দিলে ?

অবিনাশ কহিল, ওরে সে নয়। এ সত্যিকারের বড় বায়স্কোপ।

খুকী চোখ দুটী উৎসুখ করিয়া কহিল, সে কেমন কাকাবাবু ?

—পর্দ্দার ওপর সাহেব মেম এসে নাচে, গায়, কত তামসা করে।

—ছবি ?

—হ্যা, ছবি গান গায়, নাচে।

খুকী প্রায় ভাবিতেই পারে না। ছবি নাচে ? গায় ? অবাক্ কাণ্ড। একি সত্যি না গাঁজাখুরি গল্প। লোভীর মত কহিল, আমায় দেখাবে কাকাবাবু ?

—বেশ, আসচে শনিবারদিন জামাকাপড় পরে থাকিস্, বিকেল বেলা নিয়ে যাবো।

তখন খুকীকে বাড়িতে ধরিয়া রাখে কার এমন সাধ্য। অন্তত নন্দরাণীকে এই মুহূর্ত্তেই এ-খবরটা জানাইতে হইবে। ছবি নাচে, গায়,—তার উপর আবার সাহেব মেমের ছবি—একবার কাণ্ড দেখ।

হৈম কহিল, ওরা বুঝবেও না, গিয়ে তোমাদের শুধু জ্বালাতন করবে।

খুকী রাগিয়া আগুণ,—এমন সৌভাগ্য মায়ের জন্য ফস্কাইয়া যাক্, তবেই হইয়াছে। চেঁচাইয়া কহিল, না, আমি একটুও জ্বালাতন করবো না,—আমি যাবই।

এ কয়টা দিন খুকীর একটা অসহ্য প্রতীক্ষার মধ্যে কাটিয়া গেল।. সাহেব নাচে, মেমও। ছবিতে গান গায়। কে জানে, কি যে সব আজগুবি কথা! সাহেব দেখিলেই খুকীর ভয় করে, অথচ সেই সাহেব মেমেরাই আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিবে। শনিবার যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন ঘরে থাকা খুকীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

মাকে যাইয়া খুকী বলে, জানো মা, নন্দরাণী বলে, আসিস আজ অষ্টমী পূজার আরতি দেখতে। আমি বল্লুম, হ্যা, আজ যেন আমার ও-ছাই দেখবার সময় আছে। যাব আজ মেমের নাচ দেখতে, ইংরেজিতে মা কালীর গানটা শোনাবো এসে,—দেখিস্।

মা বলে, ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। কিন্তু খুকী আজ মেমসাহেবের নাচের স্বপ্ন দেখিতেছে, ছবি কথা কহিবে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সে দেখিতে যাইবে, কিছুতেই সে কেয়ার করে না।

টকিতে যাইবার জন্য অবিনাশের দল যখন দুই ট্যাক্সিতে চাপিয়াছে, তখন অভিনয় আরম্ভ হইবার বড় জোর আধঘণ্টা বাকী ছিল। স্ত্রী বলিল, শীগগীর হাঁকাতে বলো, যা দেরি হয়ে গেছে, টিকিট পেলে হয়।

অবিনাশ কহিল, একবার চাঁপাতলা মহিমদার বাড়িটা ঘুরে—

স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কেন শুনি ?

'ওর ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাব বলেছিলাম।'

'কোথাও বেরুতে হলেই' সরোষে স্ত্রী কহিলেন, 'তুমি একটা ন্যাকড়া বাঁধাবে। ওরা ছবির বুঝবে কি শুনি? বরঞ্চ যে-দিন আলিপুর চিড়িয়াখানায় যাব, সেদিন নিয়ে যাব এখন। এই ড্রাইবার,—জোবসে—হাঁ, চৌরঙ্গী—

নাঃ কিছুতেই আসে না। দুপুর তিনটায় খুকী মাকে জ্বালাতন করিয়া, গা মুখ ধুইয়া, জামা পরিয়া, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হইয়া গেল, পথের দিকে তাকাইতে তাকাইতে দু-চোখ এখন জ্বালা করিতেছে, কিন্তু অবিনাশ কাকার ছায়াটি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। আর পারা যায় না,—অসহ্য! সাহেব মেমেরা হয়তো এতক্ষণে নাচ সুরু করিয়াছে, ছায়া গান সুরু করিয়াছে। ছাই, ভালো লাগে না,—এমন দেরি করিতে পারে অবিনাশ কাকা!

অধৈর্য্য খুকী বারবার বাড়ি আসিয়া মা'র কাছে প্রশ্ন করিতেছে। হৈম শুধু আশ্বাস দেয়, অথচ অভিনয় কখন আরম্ভ হয়, সে-জ্ঞান পর্য্যন্ত তার নাই।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। যে যে-কোনো মুহূর্ত্তে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত, সে কিছুতেই আর আসিতেছে না। কত পদধ্বনিই যে খুকীর নিকট ব্যর্থ হইল, কত পথিক যে খুকীর নিকট ভুল লোক প্রতিপন্ন হইল, তার সংখ্যাই রহিল না। যখন আর পারা যায় না, তখন হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া দুই ভাই বোন মার কাছে আসিয়া উপস্থিত।

হৈম সান্ত্বনা দিয়া কহিল, আসবে, আসবে।

খুকী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কহিল, ছাই আসবে।

—সময় যায়নি এখনো।

—না, যায় নি, পড়ে আছে। মেম কি না তোমার মতন!

মেম নাচিতেছে, গাহিতেছে, ছবি কত যে ছড়া কাটিতেছে তার তুলনা নাই, অথচ সে, খুকীই শুধু দূরে রহিল। ওঃ আর সহ্য যায় না। খুকীর চীৎকার ও নিতাইর কান্না মেমের নাচের আসরের দ্বারে যাইয়া বারম্বার ব্যর্থ আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

মহিম বাড়ি ফিরিয়া তাদের কাঁদিতে দেখিয়া কহিল, এ কি, যাস্‌নি নাকি তোরা?

হৈম কহিল, কোথায়, নিতে তো এলো না। সময় হয়নি নাকি এখনো?

—সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ভাঙতেও আর দেরি নেই। ভুলেই গেছে বোধ হয়,—কবে বলে গেচ্‌ল, ও কি আর মনে থাকে?

শুনিয়া অকস্মাৎ খুকীর কান্না চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। আশা তবে আর মোটেই নাই।

মহিম দুঃখিত ভাবে কহিল, চল্‌, কাঁদিস্ নে, তোদের চানাচুর কিনে দিই গে। চল্ চল্, দুই পয়সার দেবো।

এই একান্ত লোভনীয় জিনিষটার নাম শুনিয়া নিতাইয়ের কান্না যেন মন্ত্রে থামিয়া গেল। খুকী কিন্তু, থামা দূরে থাক্, একেবারে হাউমাউ করিয়া উঠিল। মহিম দুইটা পয়সা বাহির করিয়া দিল, বলিল, নে, গলি দিয়ে কাল যখন বায়স্কোপ যাবে দেখিস্। খুকীর হাতে দিতেই সে পয়সা প্রাণপণে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

—ছাই, ও বায়স্কোপ আমি দেখি না।

—কেন রে, বেশ তো সে। জার্ম্মানীর যুদ্ধ...

—ছাই যুদ্ধ!

খুকীর চীৎকার ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। মহিম বিরক্ত হইয়া কহিল, থাম্ না রে বাপু বাড়িখানা যে মাথায় তুলেছিস্।

খুকী তবু থামিল না।

হৈম কহিল, ভালো চাস্ তো খেতে চল। খুকী তবু চীৎকার করিয়া মেঝেতে পা দাপড়াইতে লাগিল।

বাতাসহীন ক্ষুদ্র ভাপ্‌সা রান্না ঘরটা উনানের আঁচে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর খুকীর এই চীৎকারে হৈমের আর ধৈর্য্য রহিল না।

গরমের চোটে অমনি বাঁচা দায়, তার ওপর লক্ষ্মীছাড়ী বাড়ি মাথায় তুলেচে বলিয়া সাজোরে সে খুকীর পিঠে দুম্‌দাম্ করিয়া কয়টা কিল বসাইয়া দিল। খুকী, বাবাগো মেরে ফেল্লে গো বলিয়া প্রবল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। রাগিয়া হৈম তার মুখ টিপিয়া, চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। কহিল, এমন মেয়ে মরলে হাড় জুড়োয়, কিছুতেই আর মনে ওঠে না।

মেম নাচিতেছে, গাহিতেছে, কিন্তু খুকী কোথায়? মিথ্যা, ওসব আজগুবি। মেম কি আর সত্যি কখনো নাচে? সত্যি কি আর ছবি গান গাহিতে পারে, ও সব মিথ্যা গাঁজাখুরি কল্পনা, স্বপ্নেই শুধু অমন হইতে পারে, জাগিয়া থাকিলে কি আর ও-সব সম্ভবপর।

খুকীর ঘুমের মধ্যে গানের শব্দ আসে সভঙ্গ পদক্ষেপ ও লীলায়িত বাহু আসিয়া উপস্থিত হয় ছায়া, কবিতা আবৃত্তি করে···

শ্রীসুবোধ বসু

মুসাফিরের ডায়রী

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম্-এ

আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীরাধাভূষণ বসু বি-এস-সি, বি-কম

৩

হোটেলের কাছেই ওয়ার্ড লেক। এই লেক্‌টি কৃত্রিম, মানুষের হাতের রচনা—নিপুণ ক'রে ছবির মত করে গ'ড়ে তোলা। চারিধারে নানাবিধ গাছের সারি—ঢালু টিলার মত পাড়ে সবুজ ঘাসের বিছানা—দূর থেকে মনে হয় যেন একখানা সবুজ ভেলভেটের আস্তরণ বিছান রয়েছে। নীল স্ফটিক-স্বচ্ছ জলে বৃক্ষশ্রেণীর ও দূরের বাড়ীগুলির ছায়া, তীরের ভ্রাম্যমান নরনারীর প্রতি-বিম্ব আয়নাতে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছায়ার মত স্পষ্ট হোয়ে ফুটে উঠেছে। জলের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ, ছোট হাউস, ব্যাণ্ড ষ্টাণ্ড, এপার থেকে ওপারকে সংযুক্ত ক'রে সাদা একটা কাঠের পুল—সমস্ত জড়িয়ে জায়গাটাকে একটি মনোরম সৌন্দর্য্যশ্রীতে অপূর্ব্ব ক'রে তুলেছে। খুব সম্ভব ওটা একটা ডালির মত ছিল —চারিধারে পাহাড়ের টিলা, মধ্যে একটা খাদের মতই হয় ত ছিল। শিল্পী মানুষ তাকে হ্রদের রূপ দিয়েছে।

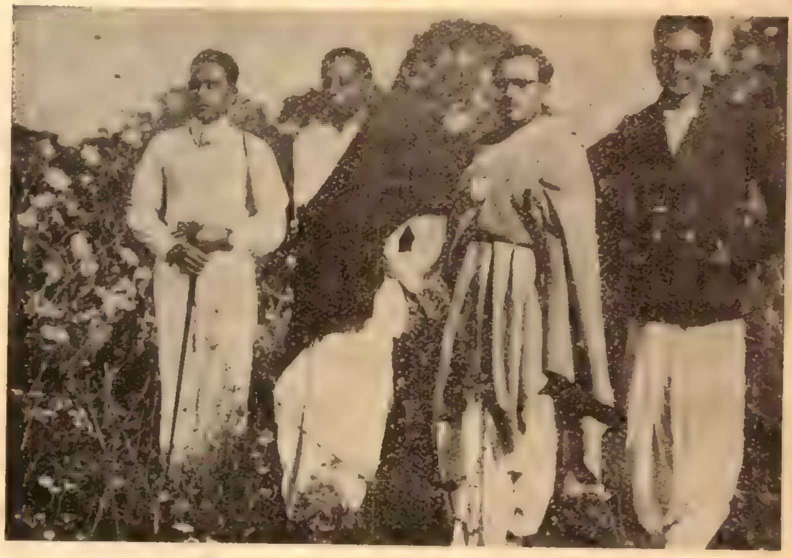

শিলং হোটেলে তোলা (ডানদিক থেকে) আলোকচিত্র-শিল্পী, লেখক, অমূল্য সেন, সমর দে।

হ্রদটির বাঁ দিকে বোটানিকাল গার্ডেন—পাথরের গাঁথনি দিয়ে হ্রদের জলকে গার্ডেনের দিকে বাঁধ দেওয়া হ'য়েছে—এই বাঁধের উপর দিয়ে মোটর পথ ঘুরে গভর্ণমেণ্ট হাউসের পাশ দিয়ে চ'লে গেছে। হ্রদ থেকে গভর্ণমেণ্ট হাউসটি খুব সুন্দর দেখায়—জলে স্বচ্ছ সূর্য্যকিরণে তার প্রতিচ্ছায়াও অনেক সময়ে প্রতিফলিত হয়। পোষ্ট অফিসটিও হ্রদের সীমানা পার হোয়েই বড় রাস্তার উপরে পড়ে। সন্ধ্যায় এবং সকালে বহু নর নারী হ্রদের তীরে বেড়াতে অসেন। উঁচু পাড়ের উপর নরম ঘাসের বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে অনেকে বিশ্রামসুখ অনুভব করেন। মাঝে মাঝে দু-চারটি গার্ডেন-বেঞ্চও আছে —সেগুলি সকাল সন্ধ্যায় প্রায়ই খালি থাকে না। সন্ধ্যার পর ইলেকট্রিক আলোগুলো জ্বলে উঠলে সত্যিই এ স্থানটীকে একটি পরীরাজ্য বলে মনে হয়। কুয়াসায় অনেক সময় কোলের মানুষকেও চেনা যায় না; তবুও এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসে মনকে কল্পনার পাখা মেলে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। লাল, নীল, সাদা, সবুজ কত রকমের রং-বেরং পাহাড়ে ফুল মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাতছানি দেয়, ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা সুর করুণ বাঁশীর সুরের মত ভেসে আসে—মনকে উদাস ক'রে দেয়, বিহ্বল ক'রে তোলে চোখের ভাষাকে। আমিতো এই হ্রদটির নামকরণ

ক'রে ফেল্লাম Lover's bower। কত তরুণ প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য নিকেতনে প্রেমের কারবারে হৃদয় হারাতে যে হয়েছে তার ইতিবৃত্ত লিখলে হয় ত অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করা যেতে পারে। অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাও এই লাস্যময়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেদের বয়সের সন্ধ্যাকে হারিয়ে ফেলে যৌবনধর্ম্মীর মতই তাঁরা দুজনে দুজনার হাতে হাত বেঁধে পুরাতন বিগলিত প্রেমকে নূতন ক'রে তোলবার আনন্দে এমনি বিভোর হোয়ে পড়েছেন

শিলং—বড় বাজারের একটা দৃশ্য।

যে, দেখেছি, পথচারী পান্থদের উপস্থিতিও অনেক সময়ে তাঁরা ভুলে ব'সেছেন।

হ্রদের দিকে একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম—বিভ্রান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘুরতে ঘুরতে শাদা পুলটার উপর যখন এসে দাঁড়িয়ে জলের দিকে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে দিয়েছি, মন যখন পারিপার্শ্বিকতার বাইরে উধাও হোয়ে গেছে, তখন হঠাৎ একটা হাসির তীব্র স্বরে চেতনা যেন ফিরে এল। মুখ তুলে দেখলাম্ রাধাভূষণ পাকা সাহেবী বেশে ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে হো হো ক'রে হাসছেন। সে হাসির ছোঁয়াচ আমাকেও লাগল—অকারণ হাসির পুলকে তখন দু'জনেই দু'লে উঠলাম।

হাসি থামিয়ে রাধাভূষণ বললেন—কবির যে বেজায় ভাব লেগে গেছে—ডেকেও সাড়া মেলে না! মনে মনে কি কবিতা রচনা করছিলেন বলুন তো।

তাঁর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই ওপাশ থেকে মেয়েলি হাসির স্বর কানে এসে বাজল। মুখ ঘুরিয়ে দেখি নির্ম্মল বাবু ও তাঁর ভগ্নিদ্বয় শ্রীমতি লতিকা ও শেফালিকা আমার কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে হাসছেন। আমি কৃত্রিম ক্রোধের ভান ক'রে বললাম—ওঃ তাহ'লে আপনারা ষড়যন্ত্র ক'রেই আমার ধ্যানভঙ্গ ক'রতে হাজির হোয়েছেন। কিন্তু স্বাগত,—কবিতা রচনার শক্তি আমার নেই—এ সৌন্দর্য্যকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে হোলে যতখানি অনুভূতির প্রয়োজন তার অভাব এখনও আমার মধ্যে রয়ে গেছে। বিশ্বকবির একটা কবিতায় কটা লাইন মনে প'ড়ল, জলের দিকে চেয়ে তাই ভাবছিলাম্—

"দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার,
এল তা'র ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে
কালো জলে,
অন্ধকার গিরিতট তলে
দেওদার তরু সারে সারে
মনে হোল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে নাপারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

বোস বললেন—কবি সাহেব একটা অনুরোধ জানাচ্ছি—সমস্ত কবিতাটি আবৃত্তি করুন।

আমি বললাম—বিপদে ফেললেন, পুরো কবিতা একটা মুখস্থ রাখা আমার স্মৃতিশক্তির বাইরে! ছেলে বেলায় খুব মুখস্থ করতে পারতাম—তারই মধ্যে এখনও দু-চারটে লাইন মনে আছে—সময় সময় সেগুলো আপনি মনের মধ্যে পাল তুলে ভেসে ওঠে, কিন্তু গোটা একটা কবিতা আবৃত্তি করা আমার শক্তিতে কুলাবে না।

নির্ম্মলবাবু ব'লেলন—চেষ্টা করুন, ভারী সুন্দর লাগল আপনার আবৃত্তি।—

আমি বললাম—চেষ্টা করলেও হবে না নির্ম্মলবাবু, বরং একদিন বই দেখে প'ড়ে আপনাদের শুনাব। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একটা যাদু আছে, যেমন ক'রেই পড়ুন না কেন, ধ্বনির মাধুর্য্য আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

লতিকা দেবী ব'ল্লেন—কবি পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছেন, তা যান—রাধুদা তুমি ওঁকে কালই দুপুরে আমাদের বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে যাবে।

বোস ব'ললেন—কি দাদা, শুনলেন তো আসামী ধ'রে নিয়ে যাবার ভার পড়ল আমার উপরে। বইটইগুলো স্যুট-কেশ থেকে বার ক'রে রাখবেন। ভয় পাবেন না, বিদেশে একটু আনন্দ না হয় দিলেনই আমাদের। কাব্যের ধারতো ধারিনে, যদি আপনার দয়ায় তার সাথে পরিচয় কিছু ঘটে যায়, তাতে আপনার নারাজ হওয়া কিন্তু উচিত নয়।

নির্ম্মলবাবু ব'ললেন—চ'লুন বোট হাউসটায় গিয়ে বসা যাক্।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হোয়ে আমরা বোট হাউসটায় গিয়ে উঠলাম্—ভারী সুন্দর—আলো-অন্ধকারে জলের উপরে ভাসা ঘরটিতে দু-সার বেঞ্চ, টবে গুটিকত ফুলের গাছ আর অর্কিড সুন্দর ক'রে সাজান। আমরা এসে একটা বেঞ্চে ব'সলাম্। সামনের বেঞ্চটায় একজন প্রৌঢ়, বোধ করি স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে মধুর সন্ধ্যা যাপন করছিলেন।

আমরা শিলং-এ দ্রষ্টব্য স্থানগুলির একটা মোটামুটি খস্ড়া আলোচনা করছিলাম্ এবং স্থির করলাম্ যে-কটা দিন আমরা শিলং-এ থাকব এক সঙ্গেই দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়াব। সামনের বেঞ্চে যে পৌঢ় ভদ্রলোকটি ব'সে-ছিলেন, তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে আলাপ ক'রবার সুরে ব'ললেন—"পূজোর ছুটীতে আপনারা বেড়াতে এসেছেন বোধ হয়।"

কাকে যে প্রশ্নটি করা হোল ঠিক বুঝতে না পেরে প্রথমে সকলেই চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কেউই উত্তর দিচ্ছেনা দেখে আমি বললাম—"আজ্ঞে হাঁ, আপনিও বোধ করি সেই কারণেই এখানে এসেছেন।

প্রৌঢ় একটু হেসে বললেন—ঠিক্ তা নয়, আমার এখানে ছোটখাট একটি কুঁড়ের মত আছে, প্রায় প্রতি বছরই এখানে আসি, জায়গাটা ভারী সুন্দর আর স্বাস্থ্যকর। তা' আপনারা উঠেছেন কোথায়?' সকলের হোয়ে এবারও আমাকেই উত্তর দিতে হোল।

নির্ম্মলবাবুর ভগ্নিদ্বয় সামনের বেঞ্চে গিয়ে আসন গ্রহণ ক'রে ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বসলেন। ভদ্রলোকটির নাম বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কথায় কথায় আমি বললাম—এখানে আমায় একটি বিশেষ

শিলং—বড় বাজারের একজন পসারিনী।

ফুল এবং একজন বিখ্যাত মহিলা কবির সন্ধান করতে হবে, বসন্তবাবু। আপনি বোধ করি খবর দুটিই আমাকে দিতে পারবেন।

বসন্তবাবু বললেন,—জানা থাকলে স্বচ্ছন্দে।

আমি বললাম,—এক নম্বর হোচ্ছে "রডোডেনড্রেন" ফুলের খোঁজ আর দ্বিতীয় নম্বর হোচ্ছে কবি অপরাজিতা দেবীর তল্লাস। এঁকে নিয়ে কলকাতার লোক একটা রহস্যের মধ্যে আছে। ইনি যে কে আজ পর্য্যন্ত কেউই জানতে পারেন নি। শুনেছি ইনি শিলং-এই থাকেন, তাই মনে মনে বাসনা আছে এঁর খোঁজটা একবার নেবার চেষ্টা ক'রব!

বসন্তবাবু বললেন—প্রথম নম্বরের খোঁজ আপনি বটানিকাল গার্ডেনের সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ এম, এন, ব্যানার্জ্জির কাছে পেতে পারেন। দ্বিতীয় নম্বরের সম্বন্ধে আপনিও যে তিমিরে আমারও সেই তিমিরে।

আমার মেয়ে শিল্পী শিলং-এর সমস্ত বাঙালী বাড়ীতে গিয়ে গিয়ে অপরাজিতা দেবীর খোঁজ করছে, কিন্তু কবির তল্লাস করতে পারেনি।

রাধাভূষণ বললেন—তবে কি ও নামের কেউ নেই?

শিলং—বড় বাজারের হাটের দিনে।

শিল্পী দেবী এবার কথা কইলেন—"ব'ললেন, আমার তো তাই মনে হয়, আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিন্তু সন্ধান করতে পারিনি। "বুকের বীণার" কবির ওটা খুব সম্ভব একটা সিউডোনেম (Pseudonym)।

আমি বললাম—কিন্তু অপরাজিতার যাঁরা বিশেষ বন্ধু তাঁরা কিন্তু বলেন, "বুকের বীণার" কবির ওইটাই আসল এবং সত্য নাম আর তিনি শিলং-এই আছেন। যাই হোক এখান থেকে যাবার পূর্ব্বে এ খোঁজটা আমায় ভাল ক'রে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

—খোঁজ নেবার আমি চেষ্টা যথেষ্ট ক'রেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি—"বুকের বীণার" কবিকে রহস্যের আড়াল থেকে বার করতে আমিও সক্ষম হইনি। কেউ কোনদিন হয় ত পারবেনও না!

কথায় কথায় রাত অনেক হয়ে গেল, শীত না করুক, ঠাণ্ডাটা বেশ জমাট হয়ে উঠেছিল, সুতরাং সেদিনের মত আসর ভাঙল। নির্ম্মল বাবুকে লাবানে ফিরতে হবে, অনেক খানি পথ, আমারও একটু শীত লাগতে সুরু করছিল কাজেই উঠবার তাড়াটা আমার দিক থেকেও কম হোল না। পথে বেরিয়ে নির্ম্মল বাবু একখানা ট্যাক্সী ধরলেন—'শুভ রাত্রি' জ্ঞাপন ক'রে তাঁরা বিদায় নিলেন। বসন্ত বাবু তাঁর স্ত্রী ও কন্যা সহ লাইমথরার পথ ধরলেন। রাধাভূষণ ও আমি পুলিস বাজারের পথে এগুলাম। পথে যেতে যেতে রাধাভূষণ অনেক কথাই বললেন এবং কথায় কথায় জানা গেল তিনি আমার এক cousin শ্রীমান কনকচন্দ্রের সতীর্থ। কনকচন্দ্র আমার ন'জ্যেঠামশাই স্বর্গীয় ডাঃ সুরেশপ্রসাদের পুত্র এবং নিজেও ডাক্তার।

রাধাভূষণ বিদায় নেবার সময় বললেন—আপনাকে আমার যে কী ভাল লেগে গিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ ক'রে বলতে পারিনে। এর পর এক দণ্ডও আপনার সঙ্গ ছাড়া হোয়ে থাকা কঠিন হবে। আপনাদের হোটেলে যদি সিট খালি থাকে কালই "স্বাস্থ্য নিবাস" থেকে আপনাদের ওখানেই উঠে আসব।

আমি হেসে বললাম—তা'হলে তো ভালই হয়—বেশ এক সঙ্গে থাকা যাবে, গল্প স্বল্প করে একসঙ্গে বেড়িয়ে সময়টা আমার কাটবে ভাল—সিট খালি আছে, কালই তাহ'লে উঠে আসুন, বিদেশে আপনাদের মত বন্ধু পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

ঠিক হোল রাধাভূষণ পরদিন সকালেই শিলং হোটেলে উঠে আসবেন। রাতের মত বিদায় নিয়ে হোটেলে ফেরা গেল।

অমূল্যভায়া ও শিল্পী সমর দে শিলং হোটেলেই উঠেছেন। অতুল প্রসাদ চন্দও একই মুসাফিরখানার পথিক। হোটেলে ফিরে কজনে ব'সে গল্প ক'রছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক

আমাদের দরজায় ঘা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। ঘরের ভিতরে এসেই তিনি প্রশ্ন ক'রলেন—"গজেন বাবু এ ঘরে উঠেছেন মশাই ?"

আমাদের কাছে 'না' উত্তর শুনে তিনি আশাভঙ্গের বিশেষ কোন চাঞ্চল্য না দেখিয়ে সামনের চেয়ারটায় ব'সে প'ড়লেন। তারপর বেশ সপ্রতিভভাবে ও হাসিমুখে ব'ললেন—"আপনারা বুঝি বেড়াতে এসেছেন; তা' কোথা থেকে আসছেন আপনারা? থাকৃচেন কদিন? মশাইদের নাম জানতে পারি কি?" ইত্যাদি একাধিক প্রশ্ন এক নিঃশ্বাসেই!

বুঝলাম গজেন বাবুর সন্ধানটা অছিলা মাত্র, নবাগতদের পরিচয় সংগ্রহার্থেই এঁর আগমন হোয়েছে। বিদেশে গেলে এবং বি[illegible]টেলে উঠলে এঁদের হিড়িকটা একটু সইতে হয়। সুতরাং আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে সকলের যথাযোগ্য পরিচয় দিয়ে খুসী করা গেল। তিনিও স্থান ত্যাগ করলেন এবং যাবার সময় ম্যানেজারকে হুমকি দিয়ে গেলেন সমস্ত দিনেতেও আমাদের নাম ধাম ইত্যাদি খাতায় ওঠেনি কেন? ম্যানেজার কি উত্তর দিলেন তা' জানবার বিশেষ কোন আগ্রহ আমাদের কারুরই দেখা গেল না।

রাত নটার সময় হঠাৎ ঘরের ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌টার আলো fuse করবার মত কমে যেতে যেতে আবার জলে উঠ্‌ল। আমরা মনে করলাম বোধ হয় fuse হবার দাখিল হোয়েছিল। কিন্তু পরে জানা গেল—প্রতিদিন ঠিক রাত নটায় সারা শিলং সহরের আলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অমনি ভাবে কমে গিয়ে আবার জলে ওঠে—এইটাই ওখানকার Time Signal—কলকাতার একটার তোপের কাজটা এই Signal-এর দ্বারাই সূচিত হয়।

এবার শিলং সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিচয় দেব'র চেষ্টা করা যাক্।

শিলং সহরটি খাসিয়া পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত এবং আসাম গভর্ণমেন্টের হেড্‌কোয়ার্টার ও ক্যাপিটাল সিটি। ১৮২৬খৃঃ ইউরোপিয়ানদের প্রথম দৃষ্টি এই প্রদেশটির উপরে পড়ে। আসাম এবং সিলেটকে সংযুক্ত করবার জন্য খাসিয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি পথ তৈরী করবার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেন্ট ও খাসিয়া পাহাড়ের সামন্ত রাজাদের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়। মিঃ ডেভিড স্কটস এই চুক্তিপত্রের নায়কত্ব গ্রহণ করেন। সেই চুক্তির বলে ১৮২৯খৃঃ দুর্গম গিরিসঙ্কটকে খণ্ডবিখণ্ডিত করে পথ নির্ম্মাণের কাজ সুর করা হয়। কিন্তু পাহাড়ে জাত ভীত সন্ত্রস্ত হোয়ে উঠল তাদের স্বাধীনতায় বুঝিবা এইবার হাত পড়ল, তাদের রাজ্য বুঝিবা হস্তচ্যুত হোল! তারা

শিলং—খাসিয়াদের একটা বাড়ী।

মরিয়া হোয়ে উঠল, পথ নির্ম্মাণের কাযকে প্রতিরোধ করবার জন্য হঠাৎ তারা আক্রমণ করে বসল। সে আক্রমণের ফলে দু'জন ইউরোপিয়ান অফিসার এবং ষাটজন ভারতীয় কুলির প্রাণনাশ ঘটল। একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে খাসিয়াদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল, পথ নির্ম্মাণে বাধা পড়ল। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট একদল সশস্ত্র ফৌজ পাঠিয়ে অনেক যুদ্ধের পর পাহাড়ীয়াদের দমন করলেন। ১৮৩৩ খৃঃ শেষ খাসিয়া সামন্ত রাজা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হোলেন।

নথিপত্রে অবশ্য খাসিয়া সামন্তদের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় এবং তাদের রাজ্যকে বৃটীশ টেরিটারীর বহির্ভুক্ত বলেই ধরা হয়। বর্ত্তমানে খাসিয়া পাহাড়ে ২৫ জন সামন্ত রাজা আছেন—সিয়েম্ নামে এঁরা পরিচিত।

খাসিয়া জাতকে ইন্দোচাইনিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করা হোয়েছে।

শিলং—খাসিয়াদের গীর্জ্জা—বড় বাজারের সামনে, মথর পল্লীতে—

এদের ভাষার সঙ্গে ভারতীয় অন্য কোন ভাষার কোনরকম সামঞ্জস্য নেই। ভাষাতত্ত্ববীদরা বলেন—"Their language has no analogy elsewhere in the whole of India and it is monosyllabic in the agglutinative stage. This language has a parallel only in the Mon-Kumer language spoken by the tribes in Anam in cambodia.

খাসিয়ারা প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি, জোয়ান, পেশীবহুল এবং দুদ্ধর্ষ। মুখাকৃতি অনেকটা মোঙ্গলিয়ান প্রকৃতির—নাক চেপ্টা, চোখ ছোট, গালের হাড় উঁচু, মুখমণ্ডল বড়। গায়ের রং দুধে-আলতার মত—বিশেষ ক'রে মেয়েদের গায়ের রং, পুরুষরা বরং একটু তামাটে ধরণের। কিন্তু আজকাল খুব সম্ভব সংমিশ্রণের ফলে এদের অনেকের আকৃতি বদলাতে সুরু ক'রেছে। এমন অনেক মেয়ে এবং পুরুষ চোখে প'ড়েছে যাদের মুখে আর্য্যজাতির ছাপ প'ড়ে গেছে। পরিষ্কার উন্নত নাক, বড় বড় টানা টানা চোখ, সুন্দর মুখাবয়ব লম্বা দৈহিক আকৃতি আজকাল অনেকেরই দেখা যায়—অন্তত আমাদের চোখে এমনি অনেক মেয়ে পুরুষ প'ড়েছে। সুগঠিত দেহ সুন্দর চেহারার মেয়েদের দেখলে মেম সাহেবদের সঙ্গে তুলনায় তাদেরই বেশী সুন্দর ব'লতে ইচ্ছা ক'রে। গায়ের রং গোলাপী, গালে বেদানার রং ফেটে পড়ছে—রোজ্ পাউডার মাখবার প্রয়োজন তাদের হয় না। মেয়েরা খুব পরিশ্রমী—দোকান হাট তারাই চালায়; বন থেকে কাঠ কেটে পিঠে বোঝা বেঁধে পাহাড়ে পথে অনায়াসে যাতায়াত করে—সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে নিঃসঙ্কোচে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, খেলার মাঠে রেস্ কোর্সে, সিনেমায় দল বেঁধে মেয়েরা ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা করে। স্ত্রী স্বাধীনতার মর্ম্ম এরাই বুঝেছে বলে মনে হয়। সম্পত্তির মালিক হয় বাড়ীর কনিষ্ঠ মেয়ে।

এদের পোষাক একটু অদ্ভুত ধরণের; ঘাঘ্‌রার মত একটা প'রে তার উপরে মাথা থেকে মুড়ি দিয়ে পা পর্য্যন্ত কালো বা হাল্কা নীল বা বেগুনে রংয়ের একখানা কাপড় জড়িয়ে নেয়—ঘাড়ের কাছে কাপড়টির প্রান্ত দুটিতে একটা ফাঁস বেঁধে নেয়। দেহকে যথা সম্ভব এরা আবৃত রাখতে চেষ্টা করে। আমাদের সভ্য প্রগতিবাদিনী মেয়েরা ব্লাউজের ভি-শেপ্‌কে ক্রমশঃ নিচে নামাতে চেষ্টা করছেন, হাতার বালাই কেটে ছেঁটে একেবারে বাদ দিতে চাইছেন, পিঠের কাপড়টাকে প্রজাপতির পাখনার মত উড়িয়ে দিয়ে হাল্কা হাওয়ায় শরীরকে তাজা রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রছেন, ফের্‌তা দিয়ে সাড়ী পরার কায়দা কানুন রপ্ত ক'রে শরীরকে আঁট সাঁট প্রমাণ ক'রতে ব্যস্ত হোয়ে উঠছেন আর স্যাণ্ডেলের নিত্য-নূতন ডিজাইন খুঁজছেন, সে-সবের বালাই এই স্বাধীন পাহাড়িয়া মেয়েদের

মধ্যে নেই। অসভ্য বর্ব্বর তারা দেহকে যথাসম্ভব বস্ত্রাচ্ছাদনে ঢেকে রেখে এরা নিজেদের প্রসাধনের একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চ'লেছে এখনও। তবে কালের হাওয়া লাগলে কি হবে বলা শক্ত। অনেক খাসিয়া মেয়ে আজকাল হাইহিল জুতো এবং মোজা ব্যবহার সুরু ক'রেছে। কিন্তু অধিকাংশ মেয়ের চরণযুগল পাদুকা বা স্যাণ্ডেলবিহীন। সুন্দর সুগঠিত চরণ-যুগল ঝাঁমা এবং পাথর ঘসে তারা পরিষ্কার রাখে, পায়ের পাতার চারিদিকে স্বাভাবিক লাল আভা আমাদের সৌখীন মেয়েদের অলক্তক রঞ্জিত স্যাণ্ডেল শোভিত পদযুগকেও লজ্জা দেয়—এ কথা আমার একার নয়—শিলং যাত্রী মাত্রেই এটা স্বীকার করবেন।

ওদেশের মেয়েরা খুব সৌখীন বুটে—সিল্কটা ব্যবহার করে খুব; ফুল ভালবাসে, সাজগোজ পছন্দ ক'রে, মাথায় বেণী রচনা ক'রে, পান খেয়ে পাতলা ঠোঁটকে রঞ্জিত ক'রে তোলে, হাতে পয়সা থাকলে ট্যাক্সী চ'ড়ে আমোদ ক'রে, সিনেমায় গিয়ে ফুর্ত্তি করে, কিন্তু পরিশ্রমী তারা যথেষ্ট। ঘর সংসারের কাজ ছাড়া, রোজগার করতে বার হয় তারাই। পুরুষরা ওদের দেশে পরগাছার মত। মেয়েরাই তাদের খাওয়ায় পরায়—তারা Drone-এর মত ঘুরে ফিরে বেড়ায়, ফুর্ত্তি করে, মদ খায়, দাঙ্গা হ্যাঙ্গামা বাধায়। বিয়ে হোলেই বরই কনের বাড়ী যায় ঘর সংসার ক'রতে। স্ত্রীর প্রভুত্ব তাকে মেনে নিতে হয়। কোট-পাস্তলুনের ব্যবহারটা সংক্রামক রোগের মত তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। খালি পা, কিন্তু পাস্তলুন, কোট চড়িয়ে মুখে পাইপ অথবা সিগারেট লাগিয়ে বেশ একটা চালের মাথায় এরা পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়।

চেরাপুঞ্জীর পথে একটা জল প্রপাত।

ধর্ম্মের কোন বিশেষ সংজ্ঞা বা বোধ খাসিয়াদের নেই। মিসনারী পাদরীদের কৃপায় খৃষ্টধর্ম্মে অনেকেই দীক্ষিত হোয়েছে। অনেকে সাপ পূজো ক'রে—এইটাই এদের আদিম পূজা পদ্ধতি এবং সাপই হোল এদের আদিম দেবতা। এই সাপ পূজাকে "থলেম" পূজা বলে। "থলেম"-পূজায় নর রক্তের প্রয়োজন—বহুপূর্ব্বে থলেম পূজার জন্য নর রক্তের প্রয়োজন হোলে এরা নিজেদের জাতের মধ্যেই কাউকে ধ'রে তার নাকের মধ্য দিয়ে বা কাণের মধ্য দিয়ে একটা

শলাকা মাথা পর্য্যন্ত চালিয়ে দিত তার ফলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে রক্ত পড়ত, সেইটাকে একটা পাত্রে ভরে থলেম বা সাপ দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হোত। উম্‌থার বা বিধর্ম্মীদের রক্তে কিন্তু থলেম পূজা নিষিদ্ধ। এখন বৃটীশ রাজত্বে মানুষ খুন আইনত দণ্ডণীয় হ'য়ে পড়ায়, এ প্রথার লোপ পেতে বসেছে। কিন্তু তবুও মাঝে মঝে নাকে বা কানে শলাকা বেঁধা মৃত

চেরাপুঞ্জীর পথে "ডাম্‌পেগে"
ট্রাফিক্‌ কন্‌ট্রোল।

ব্যক্তির দেহ পাহাড়ের জঙ্গলে এবং খাদের মধ্যে পাওয়া যেতে দেখা গেছে। দণ্ডের ভয়ে প্রকাশ্যে এ প্রথার লোপ হোলেও গুপ্তভাবে সুযোগ পেলেই থলেম দেবতার প্রীত্যর্থে এখনও এইভাবের নর বলি চলে।

খৃষ্টান মিসনারীদের কৃপায় এদের অনেক কুপ্রথা দূরীভূত হোয়েছে তবে তার বিনিময়ে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতও হোতে হোয়েছে। মেয়ে পুরুষে গো মাংস, শূকর মাংস খাওয়াটা এদের ধাতস্থ হোয়ে গেছে। ডাইভোর্স প্রথা খুব চলে—পত্যন্তর এবং দ্বারান্তর গ্রহণের পক্ষে অসুবিধা কিছু নেই।

এরা খুব সরল, বিশ্বাসী, সত্যপরায়ণ আর বন্ধুত্ব করতে এদের জুড়ী আর নেই। অতিথিবৎসলও এরা খুব। তবে প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা জাগলে এরা ভীষণ হোয়ে ওঠে—পাহাড়ে জাতের প্রতিশোধপরায়ণতার বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে পুরো মাত্রায় বর্ত্তমান। বিষাক্ত তীর মেরে মানুষ খুন করতে এরা পাকা ওস্তাদ—লক্ষ্যভেদ শক্তিও এদের অদ্ভুত।

আজকাল রামকৃষ্ণ মিসন অনেক কাজ করছেন এদের উন্নত ক'রে তোলবার জন্য। হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে অনেককে খৃষ্ট ধর্ম্ম থেকে ফিরিয়েও আনছেন এঁরা। শিক্ষা-বিস্তার, জ্ঞানবিস্তার ধর্ম্মপ্রচার—সব দিক্‌ থেকেই রামকৃষ্ণ মিসনের সন্ন্যাসীরা অনেক কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক'রে ফেলেছেন। এদের কর্ম্মপদ্ধতি সত্যিই শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রশংসনীয়। অনুন্নত জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে, আত্মচেতনা বোধের শক্তি জাগাতে খাসিয়াদের মধ্যে এঁরা যে কি অসামান্য ধৈর্য্য ধ'রে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাজ ক'রে চ'লেছেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা বা বোঝা যায় না। সংসারত্যাগী আত্মভোলা সন্ন্যাসীর দল এদের নিয়ে নতুন সংসার রচনা করে বসেছেন—মানবের কল্যাণের জন্য এক মহাধর্ম্মের প্রচারের জন্য, নরনারায়ণের সেবায় এরা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হোয়ে ব'সে আছেন।

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী

বিচিত্রা

জননী

শ্রীবিণয়ভূষণ বারিক

নঁ সাপেক্ষেঁ

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

ক্ষেত্রনাথের দুটী বোন। বড়টী খেতুর দুবছরের ছোট; বয়স ষোল; গতবারে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে, এবারে বিবাহ হইয়াছে। ছোট বোন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।

ছেলেবেলা থেকে বড় বোনটী এই সংসারে সবার উপর কর্তৃত্ব খাটাইয়া আসিতেছে; চাকর বাকর, ছোট বোন সবাই, এর শাসন নিয়মে চলিয়া থাকে, মায় মা ও বাপ। ক্ষেত্রনাথও এযাবৎ এট মানিয়া আসিয়াছে, ইদানীং বি-এ ক্লাসে উঠিয়া বোনের শাসন challenge করিতে সুরু করিয়াছে।

ভাই বোনেদের মধ্যে প্রীতিটা গভীর থাকিলেও অনেক সময়ে কলহের ছলনা উপরে তরঙ্গায়িত দেখা যায়। খেতুর বোনেরা সময়ে অসময়ে নারীর অধিকারের ভণিতা ধরিয়া ভ্রাতার পৌরুষের উপর কটাক্ষ করে; আর ক্ষেত্রনাথও অমনি আস্তিন গুটাইয়া রণোন্মুখ হয়। নিত্য কলহের এই একটী বিষয়।

মাসিকপত্রাদি পড়িয়া ও এদিকে-সেদিকে নানাবিধ আলোচনা শুনিয়া দুইবোন নারীত্বের দাবী ও সমানাধিকার সম্বন্ধে লম্বা-চৌড়া অনেক কথাই বলে যেগুলোর মানেও তারা জানে না। বোনেদের মুখে ক্ষেত্রনাথ এই দাবী ও অধিকারের কথাগুলি শুনিলেই ক্ষেপিয়া ওঠে। ছোট ছোট মেয়েগুলি—অর্থাৎ তার বোনেরা; যারা স্বভাবতই তার চেয়ে বয়সে ছোট হইয়া জন্মিয়াছে; তারা তার সমান হইতে চায় কোন হিসাবে?

সেদিন ছোট বোন মালতী কোনো একটা মাসিক পত্রিকায় এক জাঁদরেল মেয়ে লেখিকার একটা প্রবন্ধ পাইল। তাহারই দু-চারটে কথা মুখস্থ করিয়া সে দাদার কাছে সদর্পে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল;—"মনু পরাশরের যুগ কেন; এরও পূর্ব্বকাল থেকে তোমরা স্বার্থান্ধ পুরুষনামধারী কাপুরুষগণ আমাদিগকে অবলা করিয়া রাখিয়াছ, আজ আমরা নূতন আলোক পাইয়া জাগ্রত হইয়াছি—উচ্চকণ্ঠে চাহিব আমাদের ন্যায্য অধিকার—"

ভবভূতি নামক এক সেকেলে বৈজ্ঞানিককৃত 'উত্তর চরিত' নামক গ্রন্থমধ্যে পাষাণের দুঃখানুভূতি ও ক্রন্দনশক্তি আছে এরূপ একটা অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পাইয়া খেতু ভারি কৌতূহলী হইয়া পড়িয়াছিল, এবং আচার্য্য বসুর আবিষ্কারের সঙ্গে কোন অংশে এটা মিলিয়া যায় তাহাই ভাবিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়টায় বাধা পাইয়া সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

ভেঙচাইয়া বলিল—'ন্যায্য অধিকার! তোর ন্যায্য অধিকারটা কি? ঘাগরা পরে বিনুনি দুলিয়ে লজেঞ্চুস চিবোতে চিবোতে ইস্কুলে যাওয়া তো? এ অধিকার আবার কে কেড়ে নিতে গেল? ছুটতে পারিস্ আমার সঙ্গে—যে পুরুষের সঙ্গে সমান হতে চাস্? পনের পার হলোনা এখনি 'নারী' হয়ে উঠ্ছেন!'

মালতীর সাহায্যে অগ্রসর হইয়া বড় বোন অণিমা বলিল—তা মিথ্যেই বা কি? বরাবর আমাদের গালাগাল দিয়ে আসছ, সমানাধিকার দূরে থাক্, কোনো অধিকার আমাদের দিয়েছ কি? ভাবি তো পৌরুষ, ধম্‌কি আর হুমকি সার।

এখন, ভাই ও বোনের অধিকার সম্বন্ধে ক্ষেত্রনাথের আশৈশব যেরূপ অভিজ্ঞতা তাহাই সে তর্কক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর উপর চাপাইয়া থাকে। ছেলেবেলা থেকে সে সমানাধিকারের denialটাতেই অভ্যস্ত; অর্থাৎ যতখানি খাবারের ভাগ সে গায়ের জোরে আদায় করিয়া আসিয়াছে তার অর্দ্ধেকটাও দুই বোনের সমবেত ভাগে পুবায় নাই। সুতরাং সে মাথাটা ঝাঁকিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—'সমানাধিকার পেতে চাস্ তোরা আমার সমান? লম্বা হিসেবে নয়, গায়ের জোরে নয়, ফুটবল খেলায় নয়, লুচিখাওয়ায় নয়,—এমন কি—

খেতুর একটু গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে, সেইটা মুচড়াইবার আড়ম্বর করিয়া—

"অনেক কিছুতেই নয়।"

অণিমা হাসিল দেখিয়া খেতু আরও চটিয়া বলিল, "পরের ধন নিয়া গর্ব্ব করতে মেয়েরাই পাবে। মিষ্টার ঘোষের (অর্থাৎ অণিমার স্বামীর) ঝাঁকালো গোঁফ আছে তাতে তোর এলো গ্যালো কি? তোরা চিরকালই শ্মশ্রুহীন অবলা।"

ঝাঁকালো গোঁফের উল্লেখে অণিমা সুতরাং নিরস্ত হইল। 'বিহুনি দুলানো আর লজেঞ্চুস চিবানো' মালতী নীরবে হজম করিতে পারিত, কিন্তু ঘাগরা পরার কুৎসিত অপবাদে সে রুষ্ট হইয়াছিল, মুখ বাঁকাইয়া কহিল,—'গায়ের জোরের অধিকারটাই বরাবর দেখতে পাই, বিদ্যেবুদ্ধির অধিকার নিয়ে উচ্চবাচ্য কোরো না।'

নাকমুখ সিটকাইয়া খেতু মহাজন বাক্য quote করিল, "মেয়েদের আবার বুদ্ধি! আধখানা বৈ পুরা কখনও দেখলাম না, নারিকেলের মালার মাপে—As Saint Kamalakanta says."—মালার মাপে কতটুকু হয় হাতের ভঙ্গি করিয়া তাহা দেখাইয়া দিল এবং বিজয় গর্ব্বে বসিয়া পড়িল।

ভাই বোনদের মধ্যে এরূপ বাগযুদ্ধ প্রায়ই হয় আর ক্ষেত্রনাথের যুক্তি তর্কও একই ধারায় চলে।

বিধু ক্ষেত্রনাথের সমপাঠী বন্ধু। এ পরিবারে তার গতায়াত আছে, এইরূপ তর্কযুদ্ধের নমুনাটাও তার জানা আছে। সেও এতে সানন্দে যোগদান করে। কিন্তু সে হয় খেতুর বিপক্ষ পার্টি, বোনেদের পক্ষে। একজন বিভীষণের সহায় পাইয়া বোনেরা খুব উৎসাহিত হয়।

একদিন খেতু সমানাধিকার লইয়া তার practical demonstrationএ বোন দুটীকে আহ্বান করিল। খেতুর সুযোগ ঘটিয়াছিল, কারণ বিধু তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

ক্ষেত্রনাথ টেবিলটা পিছনে রাখিয়া আর চেয়ারটা bulwark স্বরূপ সামনে ঠেলিয়া, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আস্ফালন করিয়া বীরদর্প করিল,—"আয়, এগিয়ে আয় তোরা, মেনীমুখো মেনশেভিক্‌, তোদের দাবী আর সমানাধিকার আজ ঘুচিয়ে দি।"

বোন দুটী দুখানা বাঁধানো বই তুলিয়া লইয়া রণরঙ্গিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঠিক এই climaxএ বিধু আসিয়া হাজির হইল।

নিমেষমধ্যে বোন দুটী হাতের বই নামাইয়া অত্যন্ত সভ্য হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু খেতু থামিল না, বিধুকে টানিয়া চেয়ারে বসাইতে বসাইতে বলিতে লাগিল, "সমানাধিকার নিয়ে আর আসবি তোরা? কেমন শিক্ষা পেয়ে গেলি? দেখলি তো আমার পৌরুষ? (নাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) উঃ নাকটা একেবারে থেঁতলে গেছে, দেখত ভাই, কানটা আঁচড়ে গেছে বুঝি? আর ঘাড়ে রক্ত পড়ছে নাকি?"

বিধু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, অণিমা হাসি চাপিতে মুখ ফিরাইল। মালতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আমরা কক্ষণো তোমায় আঁচড়াইনি, তোমার কাছেও যাই নি। মিছামিছি ভদ্রলোকের সামনে বানিয়ে বলছ।"

বিধুকে ঠেলিয়া খেতু বলিল,—"দেখলে মজা? ওরা আঁচড়ে দিয়েছে একথা কখন বললাম? আর দ্যাখ কনিষ্ঠা ভগিনি! আঁচড় কামড়ের natural historyতো জানিস না—যাদের শক্তির অভাব তারাই আঁচড় কামড় আশ্রয় করে। দেখেছিস্ তো মেনী বিড়ালটা? বাঘার সামনে গিয়ে রোঁয়া ফুলায় আর ফ্যাঁচ করে, বাঘা ঘেউ বলে আর ল্যাজ নাড়ে, কিনা মজাটা উপভোগ করে। নাকের উপর থাবাটা কিন্তু তারই খেতে হয়।—"

এই বলিয়া খেতু নিজের নাকটায় আর একবার হাত বুলাইয়া লইল। বিধুর সামনে এরূপ সম্মানহানিকর ইঙ্গিত পাইয়া মালতী রাগে পিছন ফিরিল।

বিধুর বোন বেলা মালতীর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। সেদিন সকাল বেলা সে দাদার কাছে পড়াটা বুঝিয়া লইবার জন্য বই খাতা লইয়া তক্তপোষের উপর আসিয়া বসিল। Translationএর খাতাটা লইয়াই সে হঠাৎ বিধুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা, তুমি মালতীদের বাড়ী যাও বুঝি?"

বিধু উত্তরে বলিল, "হাঁ, কেন?"

"আর তাকে translationগুলি বলে দিয়ে আস বুঝি?

বিধু বলিল, "হাঁ, কালও বলে দিয়ে এসেছি, তার কি হয়েছে ?"

বেলা বলিল,—"আর তোমার জন্যে ক্লাসে বকুনি খাই আমরা। পণ্ডিত মশাই বলেন, তোরা একজনে আর এক-জনেরটা নকল করে নিয়েছিস।" তার কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

বিধু ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ধমকাইয়া বলিল, "হয়েছে কি বল্‌না পোড়ারমুখী।"

বেলা যা বলিল তার মর্ম্ম এই—বেলা ও মালতীতে খুব ভাব, ক্লাশে দুজনে পাশাপাশি বসে। কাল তাহাদের home task translation দেখিতে গিয়া ইংলিশ টিচার মিস্ দত্ত আবিষ্কার করেন যে তাদের দুজনের লেখার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য রকমের মিল রহিয়াছে। তাদের একত্র পাশাপাশি বসা ও খাতার লেখার মিলের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকিতেও বা পারে এরূপ একটা সংশয়ও প্রকাশ করেন। বেলা বলে বাড়ীতে দাদা বলিয়া দিয়াছেন, আর মালতী বলে দাদার বন্ধু বলিয়া দিয়াছেন। Translation উভয়েরই নির্ভুল হওয়ায় মিস দত্ত আর কিছু বলেন নাই।

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের কাছ থেকে তত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না,—ভুলগুলিও হুবহু একই রকম হইল কেমন করিয়া ? কাকতালীয় ন্যায় হার মানে যে! তিনি বেশী কথা বলিলেন না, অন্য একটা মেয়েকে বেলা ও মালতীর মধ্যে বসাইয়া দিলেন। মালতী শক্ত মেয়ে, সে দমিল না, কিন্তু বেলা আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না।

অনুবাদ বলিয়া দিতে গিয়া এরূপ অনর্থ ঘটাইয়া বিধুর দুঃখও হইল, হাসিও পাইল খুব। বেলা অবশ্য হাসিটা দেখিয়া মোটেই প্রীত হইল না, সে ভাবিতে ছিল, আজ translationটার কি উপায় করিবে, দাদা যে এটা মালতীকে বলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

বিধুকে বলিল, "আচ্ছা, মালতীর দাদা কেন তাকে পড়া ব'লে দেন না ? তুমিই বা পরের বোনকে বলে দিতে যাও কেন ?"

বিধু হাসিয়া উত্তর করিল, তোরা যে অনর্থ ঘটাবি তা তো জানিনা, জিজ্ঞেস করলে, বলে দিলাম,—তা বরং আর কোনো দিন বলব না।

আপোষের কথায় বেলার ক্ষোভ কমিল, ইংরেজী পড়াটা দেখিয়া নিতে আরম্ভ করিল।

Rip Van Winkleএর বাঙলা তর্জ্জমা করিতে গিয়া বিধু যখন গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ ক্ষেত্রনাথ বিধুর নাম ধরিয়া ডাকিয়া সে ঘরটীতে প্রবেশ করিল। বিকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার উপলক্ষ্যে বিধুকে ডাকিতে সে সাধারণত এখানে আসে। আজ কলেজ ছুটী ছিল, তাই সকালবেলাই বাহির হইয়াছে।

বিধু Rip Van এর হাত থেকে রেহাই পাইল, সানন্দে চেয়ারটা আগাইয়া দিয়া বন্ধুকে বসিতে বলিল। ক্ষেত্রনাথ বসিতেই বেলা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

বিধু বেলাকে বলিল, "এই—যাসনে।"

বেলা দাঁড়াইল।

খেতুকে বলিল,—"একটা অনর্থ ঘটিয়ে ফেলেছি ভাই !"

বিধু তখন বেলা ও মালতীর দুর্দ্দশার ইতিহাসটী সবিস্তর করিয়া বর্ণনা করিল। সংস্কৃতের অনুবাদের অপকীর্ত্তির কথা শুনিয়া খেতু আর হাসি রাখিতে পারিল না। বেলারও মুখ ফিরাইতে হইল।

উপসংহারে বিধু খেতুকে অনুরোধ করিল "আজ ভাই, তুমিই বেলার পড়াটা বলে দিয়ে যাও। বেলা অনুযোগ করছিল, তোমার বোনকে কেন আমি গিয়ে পড়া বলে দিতে গেলাম। সেটারও শোধ বোধ হ'য়ে যাবে। আর ভাই, ঐ সংস্কৃতটা—জানোই তো আমি কত বড় দিগগজ। মেয়েগুলোর কাছে খাটো হয়ে যাবো, এই ভয়ে যা মনে এলো তাই বলেছি, শেষটায় বেপরোয়া অনুস্বার আর বিসর্গ।"

ক্ষেত্রনাথ বেলার পানে তাকাইয়া বলিল, "দেখি তোমার পড়া।"

বেলা পড়িল বিপদে। দাদা ছাড়া আর কাহারও কাছে সে পড়া লইয়া কোনো দিন যায় নাই ; বড় বাধ বাধ ঠেকিল।

বিধু সাহস দিয়া বলিল, "লজ্জা কিরে, ওর বোনেরা তো আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কয়। দেখবি 'খন আমার চেয়ে বোঝাবে ভাল।"

খেতু হাসিয়া বলিল, "সার্টিফিকেট যে আগেই দিলে !"

বেলার এই সঙ্কোচভাবটুকু খেতুর বড় মধুর লাগিল। মেয়েটি তার বোনেদের মত ফর্সা নয়—তা হোক, দেখিতে তো বেশ। মুখখানি, চলিবার ফিরিবার ভঙ্গী, শাড়িটী

পরিবার ঢঙ সবই সুন্দর। তক্তপোষের পাশে আলগাভাবে কেমন করিয়া পা দুখানি অদৃশ্য রাখিয়া বসিয়া পড়িল, খেতু তাহা চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তবে কথা বুঝি কম কয়, হাঁ, একটু গম্ভীর বৈ কি।

পড়াইতে পড়াইতে খেতু যখন দেখিল, প্রায়ই হাসে অথচ কথা কয় না,—অর্থাৎ হাসি দিয়া কথার প্রয়োজন সারিয়া নিতে চায়, তখন ঠিক করিল, মেয়েটি তা হ'লে দুষ্টুও বটে।

বেলা সেদিন পড়িয়া ভারি খুসী হইয়া গেল। খেতুর বুঝাইবার কায়দা বিধুর ছিল না। ইংরাজী কথাগুলি বাংলায় যে এমন সুন্দর হয়, তা বেলার আগে ধারণা ছিল না; আর সংস্কৃতের খুঁটিনাটিগুলি যে এত সহজ করিয়া বোঝানো যায় সেটা সে তাদের পণ্ডিত মহাশয়ের ক্লাসে টের পায় নাই।

মেয়েটার একাগ্রতা (এবং আরও কিছু) দেখিয়া খেতু উৎসাহে একটু বেশী সময় লইয়া তার সমগ্র পড়াটা বুঝাইয়া দিয়া আসিল।

এর পরে বেলা দাদার কাছে পড়িতে গিয়া আর কোনই সুবিধা পাইল না; যেটুকু বোঝে, তা অস্পষ্ট, মনটা খুঁতখুঁত করে। ভাবিল, খেতুবাবুর কাছে পড়াটা বুঝিবার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় কি না। দাদা অসন্তুষ্ট হইবেন বা কি ভাবিবেন, এরূপ একটা সঙ্কোচ সে অবশেষে কাটাইয়া একদিন দাদাকেই বলিল,—"মালতীর দাদা যদি আসতেন, পড়াটা দেখে নিতাম।" কথাটা বলিয়াই তার কেমন একটা লজ্জা করিতে লাগিল।

বিধু হাসিয়া উত্তর করিল—"তা কয়েক দিন ধরেই টের পাচ্ছি আমার পড়ানোটা আর তোর পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু খেতুকে বলাটা কেমন দেখায় তাই ভাবি। আর এমন খেয়ালী ছেলে, ওকে দিয়ে কোনো নিয়মের কাজ হয় না।"

বেলা কহিল, "থাক্, কাজ নেই।"

বেড়াইয়া ফিরিবার কালে বিধুর হঠাৎ বেলার কথাটা মনে পড়িল; ভাবিল, খেতুকে একবার বলিয়া দেখিবে। তারমত বন্ধুর কাছে কোনো ভূমিকার দরকার হয় না, আর বিধু সে সব কিছু জানেও না। খেতুকে বলিল, "রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাসায় হাজির হবি।"

খেতু উত্তরে বলিল, "অপরাধ?"

বিধু বলিল, "চা খাবি,—আর—।"

খেতু কহিল, "হুঁ—আর?"

বিধু বেলাকে পড়াইবার কথাটা বলিল। খেতু স্বীকার করিল, তবে সর্ত্ত করিয়া; অর্থাৎ নিয়মমত প্রত্যহ হাজিরা দেওয়া চলিবে না; কেননা, নিয়মে চলাটা তার ললাট লিখনের অন্তর্গত নয়। অল্প পরিসর স্থানটুকুতে ভূরি ভূরি সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়া এইটার জন্য আর বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না।

এর পরে ক্ষেত্রনাথ প্রায় প্রত্যহই সান্ধ্য ভ্রমণের পর বিধুদের বাসায় উপস্থিত হইতে লাগিল। দুই বন্ধুর মধ্যে গল্পগুজবটা বেশ জমিয়া উঠিল। বিধুদের বাসায় চা প্রাত্যহিক ব্যাপারের মধ্যে ছিল না, সেটাও ঘটিতে লাগিল। এদিকে বেলারও অবসর জুটিত, খেতুর কাছে পড়া দেখিয়া লইতে লাগিল।

প্রথমটা বেলার খুব সঙ্কোচ বোধ হইল। দু-চার দিনে সেটা কাটিয়া যাইবার পর ক্ষেত্রনাথ টের পাইল, যেমন তেমন করিয়া হেলায় অশ্রদ্ধায় এ মেয়েটিকে পড়ানো চলে না। এ-কে কোনো ফাঁকি দেওয়ার উপায় নাই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সে নিজের জ্ঞাতব্য আদায় করিয়া নিতে পটু।

সেদিন বেলা পড়া সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া গেলে পর বিধুর দিকে চাহিয়া ক্ষেত্রনাথ বলিল, "মুস্কিলের ব্যাপার।"

বিধু বলিল—"পূর্ব্বেই বলেছি, বোনটি আমার মত নির্ব্বোধ নয়। ওর কাজকর্ম্মে নেশা যদি দেখ তো অবাক হবে।"

এর পরে মাস তিনেক চলিয়া গিয়াছে। অণিমা এই তিন মাস শ্বশুরঘর করিয়া দু-চার দিন হইল ফিরিয়া আসিয়াছে।

মালতীদের ক্লাসের periodical examination হইয়া গিয়াছিল। সে সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরিয়াই ঘরে ঢুকিয়া আনন্দে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আমি এগজামিনে সেকেণ্ড হয়েছি, দিদি; আর দাদা, তোমার ছাত্রীটি ফার্ষ্ট।" অণিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, "দাদার ছাত্রী!" মালতী দিদির কথা লক্ষ্য করিল না; সোৎসাহে বলিতে লাগিল—"তিনটেতে ফার্ষ্ট, দাদা;

ইংরেজী বাঙ্‌লা আর সংস্কৃত। বুড়ো পণ্ডিতমশাই পর্য্যন্ত কত প্রশংসা করলেন।"

ছোটবোনের পরীক্ষার ভাল খবর শুনিয়া খেতু যখন 'বেশ' কথাটী উচ্চারণ করিল তখন মালতী ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে; কাজেই সেই 'বেশ' কথাটী গিয়া তারই ভাগে পড়িল যে ফার্ষ্ট হইয়াছে;—অন্তত অণিমা এইরূপই বুঝিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার ছাত্রীটী কে, দাদা?"

খেতু বই-এ অত্যন্ত মনোনিবেশ করিয়া বলিল,—"ঐ যে বিধুর বোন, তাকে কয়েকটা দিন পড়া বলে দিয়েছিলাম,—বিধু ধ'রে পড়ল কি'না—"

অণিমা বলিল,—"বেলা বুঝি?"

খেতু বলিল, হুঁ। আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, অণিমা তক্তপোষের উপর ভাল করিয়া বসিল।

অণিমা কিনা তিন তিনটা মাস অন্যত্র কাটাইয়া আসিয়াছে, দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা তো আর কহিতে পারে নাই, তাই আজ অনেক দিন পরে অনেক কথাই কহিতে লাগিল। এই ধর ফুটবলের কথা, কলেজের কথা, মার পেটের অসুখের কথা, বিধু বাবুদের কথা, তিনি আগেকার মত আসেন কিনা তার কথা, দাদার বিকেল বেলার চা খাওয়াটা সেখানেই হয় কি-না তার কথা, Sherlock Holmes এখানো জীবিত আছেন কিনা তার কথা, মালতীর পড়াশুনার কথা, হাঁ মালতী যে বললো বেলা ফাষ্ট হয়েছে, তা মেয়েটাতো বেশ intelligent, তার কথা ইত্যাদি বহুবিধ সংবাদই অণিমা জিজ্ঞাসা করিল।

অণিমা উঠিয়া গেলে খেতু আশ্চর্য্য হইল,—এই সেদিন-মাত্র—বল্‌তে গেলে পরশুদিন—যে বোনটী ফ্রক পরিয়া বিনুনী নাচাইয়া দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইত, তার পেটে এত সয়তানী বুদ্ধি ঢুক্‌লো কবে? আর এত বাজে কৌতুহলও মেয়েগুলির থাকে!

কয়েকদিন ধরিয়া ক্ষেত্রনাথ বিধুদের বাসায় যাইতে পারে নাই। বেলাদের সাময়িক পরীক্ষা হইয়া গেল, এখন দুই একদিন পড়ানো বাদ গেলেও কোনো ক্ষতি নাই। বিশেষ এই কয়মাস পরে বোনটী আসিয়াছে—প্রথম কয়েকদিন সন্ধ্যাকালের গল্পগুজব আমোদ-প্রমোদে অনুপস্থিত থাকাটা কেমন দেখায়, এই জন্যই খেতুর বেলাকে পড়াইতে যাওয়া হয় নাই।

এদিকে বেলার প্রকৃতিই এরূপ যে, সকল কাজে নিয়ম রাখিয়া চলে। খেতু না যাওয়াতে তার শৃঙ্খলাবদ্ধ কাজের মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। দুই তিন দিন সে সেলাই লইয়া কাটাইয়া দিল, কিন্তু পড়াটা আর হইতেছে না। বিধুর কাছে শুনিয়াছিল যে অণিমা আসিয়াছে। কিন্তু তাতে এতদিনের মধ্যে একবারও এখানে না আসিবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অনেকদিন পরে দেখা হইবার আনন্দটা কি এতদিনেও পুরাণো হয় নাই? (বেলা ক্ষুণ্ণ মনে ভাবিল) অন্তত হওয়াটা নেহাৎ উচিত।

জিদ করিয়া সে আজ পড়িতে বসিল, সে এমন হাবা মেয়ে নয় যে নিজের চেষ্টায় পড়াটা তৈয়ারী করিতে পারিবে না। কিন্তু পড়ায় তার মন বসিল না; দাদার কাছে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন আড়ম্বর করিয়া গিয়া পড়াটা দেখিয়া নিতে বসিল।

বিধু বেলার ইংরাজী Selection খানার কভার, বাঁধাই ও সাইজ ভাল করিয়া দেখিয়া সেখানা হাতে লইয়া চিৎপাত হইয়া একটা হাই তুলিল। বেলা রাগ করিয়া বইখানা খপ করিয়া কাড়িয়া লইয়া বইখাতা গুটাইয়া উঠিল। বিধু বোনের রাগ দেখিয়াও তাহাকে প্রসন্ন করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস করিল না। এখন তার বৃথা সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ খুব মনোযোগসহকারে সে একখানি continental novel পড়িতেছিল।

বিধু ও বেলার একটী ছোট ভাই আছে; বয়স ৮।৯ বছর নাম বলাই। এতক্ষণ যে তার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই, সেটা তাকে তুচ্ছ মনে করি বলিয়া নয়; তুচ্ছ করিবার মত পাত্রই সে নয়। সে তার রাজত্বে অর্থাৎ সমগ্র বাসায় সর্ব্বদা আপনার প্রচণ্ড অস্তিত্ব ও স্বাধিকার উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিয়া প্রজামণ্ডলীকে অনুভূত করাইয়া থাকে। বেলাদিদি তাহাকে আদরে ও শাসনে কখনও কখনও রাগ মানাইয়া বই লইয়া বসায়।

পড়িবার ঘরে আজ সকাল বেলা সে সক্রোধে চীৎকার

করিয়া পাড়ার লোককে জানাইয়া দিতেছিল, A fat cat ran at a rat, এমন সময়ে খেতু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বলাইয়ের fat catএর দৌড় অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল, সুতরাং ratটা রক্ষা পাইল।

খেতু কয়েকদিন আসে নাই এটা বলাই লক্ষ্য করিয়াছে। এ কয় দিনে খেতুর না আসা এবং দিদির খিটখিঠে মেজাজ, তদনুযায়ী পৃষ্ঠদেশে আহার্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে একটা কাকতালীয় ন্যায় তার মনে খেলিয়া যাইতেও বা পারে, কেন না 'the child is the father of the man" ; অতএব বলাই খেতুর আগমন সংবাদ লইয়া সলম্ফ চীৎকার করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিল। বিধু বাসায় ছিল না। রান্নাঘরে বেলা মার সাহায্য করিতেছিল, মা তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

বেলা ঘরে ঢুকিতেই একবার দাঁড়াইয়া গেল। দাদা বাড়ী নাই, খেতুর সঙ্গে একেলা কথা বলিতে হইবে, এরূপ এযাবৎ হয় নাই। বেলার মত লাজুক মেয়ের পক্ষে একটু মুস্কিলের কথা বৈকি ? বলাইকে সহায় করিয়া সে অগত্যা পর্দ্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। খেতু টেবিলের বইগুলি হাতড়াইতেছিল, ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিধু কোথায় ?"

বেলা মুখ নত করিয়া উত্তর কবিল, "বাইরে গেছেন, কিছু বলে যাননি।" খেতু দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল একলাটী অর্থাৎ বিধুর অনুপস্থিতিতে বসিবে কিনা। বেলার খেয়াল হইল যে বসিতে অনুরোধ না করাটা অভদ্রতা হইয়া যাইতেছে। খেতুর দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "বসুন না ;— দাদা এখনি এসে পড়বেন।"

ক্ষেত্রনাথ চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া বেলাকে বলিল, "তুমি ফার্ষ্ট হয়েছ।" বেলা মুখ নত করিয়া নীরবে রহিল।

"মালতী বললো, তিনটেতে ফার্ষ্ট, পড়ানোটা তা হ'লে সার্থক হয়েছে দেখছি"।

বেলার কোনো কথা যোগাইল না, মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিল না ; কারণ, খেতু যে তাব মুখেব দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছে সেটা সে বুঝিতেছিল।

সঙ্কটে উদ্ধার করিল বলাই। ঐ পড়ানো কথাটা তার কাণে যাইতেই তার নিজের অপ্রীতিকর অবস্থাটা মনে পড়িল। মনে হইতেই, a fat cat ran at a rat বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রথমে দিল এক লাফ, দ্বিতীয় দফায় সেটা আবৃত্তি করিতে করিতে fat catএর মতই ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

খেতু উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল, বেলা অতিকষ্টে হাসি থামাইল, কিন্তু তার সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল।

এর পর কথাবার্ত্তার আলাপ উভয় দিকেই সহজ হইয়া উঠিল। কথাবার্ত্তাগুলি অনেকটা নিরর্থক, যেমন নেতে তেনে তেনে নেতে ইত্যাদি। আলাপটিই অভিষ্টতম বস্তু। যে সুরটী আকাশে বাতাসে ভাসিতে থাকে, ধরিতে গিয়া উভয় পক্ষই বেদিশা হইয়া পড়ে, সেই সুরটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই এই অনর্থক কথার বাহুল্য।

ছাত্রী ও শিক্ষক বিচার করিয়া ঠিক করিল যে পড়িবার ও পড়াইবার সুবিধার সময়টা আগের মতন সন্ধ্যার পরেই হইবে, অতএব ইত্যাদি—ইত্যাদি। পরীক্ষার ফলের কথা খেতু যখন আবার তুলিল, বেলা ততক্ষণে সপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে, বলিল, "সেটার credit আপনারই প্রাপ্য, কত যত্ন ক'রে আপনি পড়ালেন।"

এরূপ মনোহর বাক্য মিথ্যা জানিলেও শুনিতে লোকে ভালবাসে, খেতু যে বেশ খুসী হইল তাহাতে বিচিত্র কি ? সে ফিরিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, বেলা যে দেখিতে শুনিতে এত চমৎকার, তাহা এত দিন ধরিয়া তার নজর এড়াইল কি করিয়া ?

অণিমা খেতুকে বলিল, দাদা, তোমার ছাত্রীটিকে একদিন এখানে নিয়ে এসনা।

মালতী এ প্রস্তাবে নাচিয়া উঠিল, ক্লাশে বেলার সঙ্গে তো তার খুবই ভাব, কিন্তু তাকে বাড়ীতে আনিবার কথা এযাবৎ তার মনে হয় নাই।

খেতু বলিল,—আমি পারিব না।

কেন যে পারিবে না তাহা অণিমা দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাইল না।

এখন, জানিতে চাহিয়া যে বিষয়ের কোনো পরিচয় মেলেনা, তাহার সম্বন্ধে একটা সংশয় হইয়া থাকে। এবং

সংশয় জন্মিলেই অযথা নিন্দার অবকাশ ঘটে, এসব মনো-বিজ্ঞানের কথা। এ কারণেই পূর্ব্বকাল থেকে সুধিবৃন্দ নারী চরিত্র সম্বন্ধে সংশয় করেন, কেননা দেবা ন জানন্তি। নিন্দাও করিয়াছেন ভূরি ভূরি। ভগবান সম্বন্ধেও ঐ কথা। কিছুই জানেনা বলিয়াই লোকে করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু—প্রভু তুমি,—নাথ তুমি প্রভৃতি মিথ্যা কথা আরোপ করিয়া নিন্দা চর্চ্চা করিয়া থাকে।

কাজেই এ ক্ষেত্রে অণিমা দাদার সম্বন্ধে সংশয় জানাইতে যে মুখ টিপিয়া হাসিল, তাহা স্বাভাবিক।

খেতু কিন্তু অণিমার হাসির দিকে নজর না দিয়া মন দিয়া বই পড়িতে লাগিল।

অণিমা কিন্তু সহজে ক্ষেত্রনাথকে অব্যাহতি দিল না; মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "দাদা, লক্ষ্মীটি।"

ক্ষেত্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছুতেই না।"

অগত্যা মালতী যখন volunteer করিল, সে গিয়া বেলাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিবে, দাদা যেন মাপিয়া সাত হাত দূরে তার পিছু পিছু যায় এবং ফিরিবার বেলা অন্য দিকে তাকাইয়া থাকে, তখন খেতু হার মানিল এবং বিকাল বেলাই মালতীকে সঙ্গে করিয়া গিয়া বিধুদের বাসায় উপস্থিত হইল।

মালতী চোখা মেয়ে বেলার মার কাছে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বক্তৃতা করিল। তাদের ইস্কুলের কথা অর্থাৎ বেলার সঙ্গে তার ভাব হইবার ইতিহাস, বাবা, মা দাদা, এদের খবর, অণিমার শ্বশুর বাড়ী, জামাই বাবু কখানা চিঠি দেন, এসব যাবতীয় খবর, ইতিমধ্যে সে বেলার মাকে জানাইয়া দিল।

বেলার মা বেলাকে পাঠাইলেন।

অণিমা বেলাকে পাইয়া ভারি খুসী হইল। মেয়েরা মেয়েদের সৌন্দর্য্য দেখে না, এরূপ একটা কথা শোনা যাচ্ছে; কিন্তু অণিমা মনে ও মুখে স্বীকার করিল বেলা দিব্যি সুন্দর। সে বেলাকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় তুলিয়া লইয়াই মার কাছে নিয়া হাজির করিল। শান্তশিষ্ট বেলা এবম্বিধ আদরে একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

খেতুর মা বলিলেন, 'ঐ ছেলেটীর বোন? বেশ তো মেয়েটী।' বেলা লজ্জিত হইয়া প্রণাম করিল।

তারপর এঘর সেঘর দেখা, নানা বিয়ের নানা ব্যাপারের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, হাসি কৌতুক প্রভৃতিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। ফিরিয়া যাইবার বেলা বিধুকে পাওয়া গেল; তাকে দিয়াই বেলাকে পাঠানো হইল। খেতু সে দেশেও ছিলনা; অণিমা দেখিল, দাদা এখন আর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে চাহে না—ভাবি তুচ্ছ করে।

খেতু আবার নিয়মিত ভাবে পড়ানো সুরু করিয়াছে। ছাত্রী ও শিক্ষকের মধ্যের পূর্ব্বেকার সঙ্কোচ ভাবটা এখন আর মোটেই নাই, এখন পড়ার মধ্যে গল্প ও হাস্য কৌতুকের কমা, সেমিকোলন পড়িতে থাকে; কখনও বা পড়াটায় ফুলষ্টপ পড়িতেও দেখা যায়। বিধু অনুপস্থিত থাকিলেও পড়া তথা পড়ানোর কোনো ব্যাঘাত হয় না।

অভ্যাসে শক্তি বাড়ে, খেতুর পড়াইবার ধারায় বেশ উন্নতি দেখা যাইতেছে, এটা বেলা লক্ষ্য করিতেছিল। খুব বিশ্রী সংস্কৃতের খটমটগুলি খেতু বেশ রসাল করিয়া বুঝাইতে পারে, বেলার বুঝিবার মধ্যে আর কোনো গোল থাকে না। একটু নমুনা দেখানো যা'ক।

বিধু তখনো বেড়াইয়া ফেরে নাই। ভয়ানক এক বাঘ গলায় হাড় ফুটিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিল, বলাই এতক্ষণ ধরিয়া তাহার বিবরণ পাঠে ভারি স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল। পরক্ষণেই যখন দেখিল রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পরম ধার্ম্মিক এক বক সেবাব্রত লইয়া বাঘের গলার কাঁটা তুলিয়া দিল, তখন এত মনঃক্ষুণ্ণ হইল যে বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেল।

খেতু বেলাকে সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য এইরূপ বুঝাইতেছিল—সন্ধিটার বেলা ঘটনাবশত দুইবর্ণ একত্র একবেঞ্চে বসিয়া গেছে, যেমন ট্রেনে বা ট্রামে দেখা যায়। উচ্চারণের সুবিধার জন্য মাত্র গায়ে গায়ে বসা, শব্দগুলির মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়ায় নাই। অবস্থা বুঝিয়া সুবিধা করিয়া নানা-ভাবে বসিতে হয়, যেমন কোলে বসা—সন্ধির বেলা যেটা উভয়ে মিলিয়া একবর্ণ। নিরীহ সহযাত্রীর পুঁটলীটি বেমালুম সরাইয়া বসা, যেমন একবর্ণের লোপ। পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া বসা, যেমন রেফ পরবর্ণের মস্তকে যায়—

গম্ভীর মুখে ক্ষেত্রনাথ এরূপ বুঝাইয়া যাইতেছে; বেলা

মুখে আঁচল চাপিয়া হাসিবার শব্দ থামাইল দেখিয়া খেতু ধমকাইয়া বলিল,—"ভারী অমনোযোগী তো! যা বলছি ভাল ক'রে শোনো।" বেলা আবার ভব্য হইয়া বসিল।

খেতু বুঝাইতেছে—'সমাসটায় কিন্তু একেবারে ভিন্ন সম্বন্ধ, সন্ধির বেলা ছিল শব্দের উচ্চারণের সুবিধার জন্ম বর্ণের মিল, এখানে আসে শব্দের অর্থের মধ্যে মিল,—অর্থাৎ সম্বন্ধ। দুই পদে মনের মিল হইলে সমাস হয়; সম্বন্ধটা হয় বৈবাহিক সম্বন্ধ; অর্থাৎ বিয়ে হ'তে পারে এরূপ মনের মিল। সমাসটা বিবাহ।

বেলা কিন্তু লাল হইয়া উঠিয়াছে। খেতু বুঝি মনে করিল, আলোটা কমিয়া যাইতেছে, তাই বেলাকে ওরূপ দেখাইতেছে; সে আলোটা একটু বাড়াইয়া দিয়া বুঝাইতে সুরু করিল।

—সমাস দুই রকম নিত্য আর অনিত্য। আমাদের দেশে চলে নিত্য সমাস, বিয়েটা ভাঙ্গে না। বিলাতে অনিত্য, separation চলে।

নিত্য সমাসে বিগ্রহ বাক্য নাই, অন্তত থাকার কথা নয়; তবে আমাদের দেশাচারে ওটার চলতি আছে, হরগৌরী থেকে আরম্ভ। বিলিতি অনিত্য' সমাস আমি বুঝাইব না, ইংরাজি নভেল পড়িতে সুরু করিলে নিজেই বেশ বুঝিবে। Ibsenএর Grammarএ বিশদ করা আছে।

আবার সাপেক্ষ হইলে অপর দুই পদে সমাস হয় না। সাপেক্ষটা কি তাহা বোঝাই—এই ধর aর সঙ্গে bর সম্বন্ধ আছে, এই অবস্থায় bএর সঙ্গে cএর যদি কোনো সম্বন্ধ অর্থাৎ মনের মিল ঘটে, তবে aকে অপেক্ষা বা উপেক্ষা করিয়া b এবং cর মধ্যে কোনো মিলন হয় না, মিল করিতে গেলে অশুদ্ধ হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক—রাঙা মুখের শোভা (যেমন সামনের কোনো ব্যক্তির) এখানে রাঙা কথাটা ভিন্ন রাখিয়া মুখের শোভা সমাস হইতে পাবে না, ভাষার ভুল। সুরেশ যখন অচলাকে টানে, তখন অচলা আর মহিম একত্র ঘর করে কি করিয়া? ব্যাকরণ না মানিয়া একত্র ঘর করিতে গেল, নিয়তির ভাষায় ভুল হইয়া গেল, ঘরখানা পুড়িয়া গেল।

দুই তিন দিন পূর্ব্বে শ্রীমতী বেলা দাদার টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া 'গৃহদাহ' বইখানায় এতই নিবিষ্টমনা হইয়াছিল যে খেতু ঘরের মধ্যে আসিয়া তার পিছনে কখন দাঁড়াইয়াছে তাহা সে আদৌ টের পায় নাই। সেদিনকার পলায়ন ব্যাপারটা ক্ষেত্রনাথ ঘুণাক্ষরেও আর উল্লেখ করে নাই; তবে পড়া বুঝাইতে অনেক রকম illustration দরকার হয় বৈ কি।

বেচারা বেলা উঠিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু ভদ্রলোক কষ্ট স্বীকার করিয়া বুঝাইতেছেন, সে যদি বসিয়া না শোনে তো আর কিছু না হউক অভদ্রতা তো খুবই হয়। ছাত্রীটী যে শিষ্ট শান্ত খেতু তাহা জানে বলিয়াই মাঝে মাঝে, অর্থাৎ যখন দুটীতে একলা হয়,—বেলাকে ধমক দেয়। ধমকির ভয়ও বেলার আছে, তাই নিরুপায় হইয়া তার বসিয়া থাকিতে হইল, বিদ্যালাভও যথেষ্ট হইতে লাগিল।

জনপ্রবাদ এই যে বাস্তব নামে একটা ভূত, যার অস্তিত্ব অবাস্তব বলিয়াই ভয়ঙ্কর, ছেলেমেয়েদের খেলার আয়োজনের মধ্যে অহরহ উঁকি মারে আর ভেংচি কাটে। খেতু যখন খেলায় মাতিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন ঐ বাস্তব ভূতটা তার খেলার পুতুলটী ধরিয়াই টানাটানি সুরু করিল। ব্যাপারটী এই—

বিধুদের কাকার টাকাকড়ি খুব, অতএব বিদ্যা বুদ্ধি কম; কোচবিহারে থাকেন। বিধুদের উপর তাঁর অসীম স্নেহ মমতা, যেটা কুম্ভকর্ণের মত সারা বছর ঘুমায়, অর্থাৎ প্রয়োজনের বেলা কোনো উপকারে আসে না। যখন জাগে তখন তার রাক্ষসী ক্ষুধার সাইক্লোন তুলিয়া চলে।

বহুকাল পরে এবার সে স্নেহ মমতার নিদ্রাভঙ্গ হইতে যে সাইক্লোন উপস্থিত হইল, তার বেগে বিধুদের ছোট-খাট সংসারে বহু পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিল। তার মধ্যে যেটা লইয়া আমাদের উপস্থিত প্রয়োজন, সেটা এই;—পরম স্নেহের পাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী বেলার বিবাহের বয়স পার হইয়া যাইতেছে। অবিলম্বে পাত্রস্থা না করিলে বেলার বাবার কিছু না হোক, কোচবিহারী কাকা মহাশয়ের মায় চৌদ্দ পুরুষ অবীচি নামক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নোংরা স্থানে বাস করিতে হইবেই। অতএব, তারপর "অতএব" আরও দুই

তিনটী অতএবেব পব বেলার সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছে; কার্ত্তিকের মত সুযোগ্য পাত্র ইত্যাদি, ভদ্রলোকেরা শুধু একবার বেলাকে দেখিবেন।

পরিবারের সকলের নামে নামে প্রচুর আশীর্ব্বাদ লইয়া এইরূপ সুখবরের ভারি একটা বন্যা সাইক্লোন বেগে আসিয়া ধুপ্ করিয়া বিধুদের দাওয়ায় পড়িল।

বিধু একেবারে বিদ্রোহী হইল, মাথা নাড়িয়া বলিল, এ হতেই পারে না।

মা বলিলেন, মেয়েটা যে বড় হোলো, আজকাল বিয়ে দেওয়া কি কম ঝঞ্ঝাট? বিয়ে দেবার মত সাধ্য আমাদের আছে কৈ?

বাবা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তাই তো! ভদ্রলোক নেহাৎ ভাল মানুষ।

বিধু বলিল, পড়া বন্ধ করে বিয়ে এখন হতেই পারে না। বেলা পড়ায় কত ভাল দেখছ তো; বিয়ের চিন্তা নাই, আমি ভাল বর এনে দেবো।

দেখা গেল কিছুই স্থির হইল না। এদিকে খবরের সঙ্গে সঙ্গেই সাইক্লোনে ভাসিয়া পবের দিন কয়েকটী ভদ্রলোক আসিয়া বাসায় উপস্থিত হইল। তারা কথায় জানাইল মেয়ে দেখিতে আসিয়াছে, অর্থাৎ বরপক্ষের শুকসারণ। এবং কার্য্যে জানাইল তারা চা লুচি এবং টুচি পাবে, তামাক টানিবে, কোলাহল করিবে এবং ঘরেব মধ্যে অনবরত থু থু ফেলিবে।

খেতু এত সব কিছুই জানে না। সে দুদিন আসিতে পাবে নাই, সেটা পুবাইবার জন্য আজ একটু সকাল সকাল আসিয়া বিধুদের বাসায় আসিয়া ঢুকিল।

সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর কলরব অর্থাৎ কথাবার্ত্তার মধ্য থেকে খেতু উদ্ধার করিল,—মেয়েটি অপূর্ব্ব সুন্দরী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পণের কথা কিছুই নয়, কাকা যখন দেবেন। তিনি কি আর স্নেহের ভাইঝিকে নিরাভরণা দান করিবেন শুভ কর্ম্মটা সত্বর সুসমাধা হইলে সর্ব্ব বিষয়ে সুবিধা।

'স' এর অনুপ্রাসে খেতু অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িল, নিরিবিলি বিধুকে ধরিয়া খবরটা জানিয়া লইল।

খেতুর মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল, এসব কি বিশ্রী ব্যাপার? বেলার আবার বিয়ে! তার পড়াটা এবং আরও সাংঘাতিক কথা নিজের পড়ানোটা একেবারেই বন্ধ। একি কাণ্ড! নেহাৎ বিশ্রী, নিতান্ত অসভ্য, অস্বাভাবিক, অসঙ্গত, monstrous, abominable! তার আক্রোশটা বাঙলা মুলুক ডিঙাইয়া বিলাত পর্য্যন্ত পৌছাইল।

এই হাসি তামাসার নিশ্চিন্ততা ও ক্রীড়া কৌতুকের মধ্য দিয়া ছুটিযা চলিতে গিয়া আচম্বিতে তাহাকে—

আনমনা হইয়া খেতু রাস্তায় চলিতেছিল, ভাবনাটার এই স্থানে আসিয়া সে বিষম হোঁচট খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল।

অণিমা দাদাকে অসময়ে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ আর পড়াতে গেলে না, দাদা?

খেতু মুখ বাঁকাইয়া বলিল, ছাত্রীর আজ পড়বার অবসর নেই। এইরূপ অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ উত্তর দিয়া খেতু একখানি বই খুলিয়া বসিল। অণিমা সরিয়া গেল না দেখিয়া সে পূর্ব্ব কথার ভাষ্যস্বরূপ বলিল—বিয়ের জোগাড় হচ্ছে।

গালে হাত দিয়া অণিমা কহিল,—বিয়ের জোগাড়? কনে পেলে কোথায়? কই আমরাতো কিছুই—

খেতু চোখ লাল করিয়া তাকাতেই অণিমা থামিল। বস্তুতঃ এখন খেতুর ফাজলেমি ভাল লাগিতেছিল না। উচ্চকণ্ঠে বলিল, বেলার বিয়ে হবে, আনন্দে নাচছে দেখলাম।

অণিমা এতসব কিছুই বিশ্বাস করিলনা; আসল ব্যাপার জানিবার কৌতূহলে ধমক খাইয়াও দাঁড়াইয়া রহিল। আর যাই হউক, দাদার ভাবভঙ্গিতে রহস্য কৌতুকের গন্ধ ছিল না।

অগত্যা খেতুকে বেলার বিবাহসংক্রান্ত খবরটি বলিতে হইল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—দেখলে মেয়েটার আক্কেলখানা? চুপ চাপ নিজের বিয়েটা যোগাড় করে নিয়েছে। দেখতে ভিজে বেরালটি পেটে পেটে সয়তানী। —বলিয়া হাতের বইখানা সজোরে টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিল।

"পড়াটা বলে দেবার বেলা আমি, আর বিয়ের বেলা আমায় একবারটি জিজ্ঞেসও করলেনা। উঃ কি ungrateful! তোদের মেয়েদের জাতশুদ্ধ এই রকম।"

খেতুব রোষ, ক্ষোভ ও বেলার প্রতি অকৃতজ্ঞতার

অভিযোগে অণিমার হাসি পাইল, বলিল, বেলার দোষ কি দাদা? সে শান্ত শিষ্ট মুখচোরা মেয়ে—তা তুমি ছেড়ে দিচ্ছ কেন? এতদিন ধরে যত্ন করে পড়ালে, তোমার কি কোনো দাবী নেই? অমন ছাত্রীটিকে অমনি হাত ছাড়া করবে?

মাথা চুলকাইয়া খেতু বলিল, কি করি বোন, সবাই কি মনে করবে?

অণিমা কহিল, সে চিন্তা কোরো না দাদা, সবাইকে বোঝাবার ভার আমার রইল।

সে দাদার টেবিল থেকে "উদ্বোধন" পত্রিকাটা তুলিয়া লইয়া উচ্চকণ্ঠে পড়িয়া গেল—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

বরান্ কথাটা খেতুর কানে কেমন অস্পষ্ট শোনাইল। বৈদিক সংস্কৃত কিনা, অণিমা সঠিক উচ্চারণ করিতে পারে নাই, হয়ত একার বেশী দিয়াছিল, আর 'র' য়ে ল য়ে তফাৎ তো নাইই।

এরূপ উচ্চারণ দোষ খেতু বরদাস্ত করে না, তাই সে স্বগত অর্থাৎ অণিমাকে শুনাইয়া অনেক মন্তব্য করিল যথা—বরাবরই সে দেখে আস্চে যে মেয়েগুলি অতীব ধৃষ্টা, বয়সের বড় এবং পুরুষ যে দাদা, তাকে মান্য করিয়া চলে না। আর, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেলেই যে দাদার চড় চাপড়ের অধিকার থাকে না, মনুর এই শাসন সে অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া অগ্রাহ্য করে।

অণিমা যাইবার মুখে বিনীত নিবেদন করিয়া গেল,—'মেয়েদের জাত তুলে কোনো অন্যায় মন্তব্য যেন বেলার সুমুখে কোরো না দাদা। আমরা তোমার শিষ্ট শান্ত লক্ষ্মী বোন তাই আমরা নীরবে সয়ে যাই। ইতি—

অণিমা মার কাছে গিয়া দাদার নামে অনেক অভিযোগ করিল; শেষে দাবী করিয়া বসিল, ঘরের একটী মেয়েকে তো পর করে দিলে, সেটার অভাব পূরণ করতে পরের একটী মেয়েকে ঘরে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা যত শীগগির হয় ততই ভালো, নইলে দাদা—ইত্যাদি।

বেলার নাম শুনিয়া মা খুব খুসী হইয়া অমনি সায় দিলেন। অণিমা এসব ব্যাপারে বাবার মতামত নিষ্প্রয়োজন মনে করিল, টাকা চাহিবার বেলা তাঁহাকে জানালেই চলিবে; তিনি এ পরিবারে কেসিয়ার মাত্র।

দাদার (এবং ইদানীং অন্য কোনো এক ব্যক্তির) পৌরুষের উপর অণিমার মোটেই শ্রদ্ধা নাই; বিশেষত এইরূপ সঙ্কটস্থলে। তাই পরের দিন বিধু আসিবা মাত্র অণিমা তাকে ডাকিয়া লইল ও তার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিল।

বিধু খেতুর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিধুর আনন্দের অবধি ছিল না; বার বার বলিতে লাগিল—শুনে' সবাই যে কি খুসীই হবেন। আর বেলা—"

কথাটা শেষ না করিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল। খেতু বলিল বা-রে অত হাসছিস কেন?

বিধু বলিল—ভাবছি আগেই বেলাকে ডেকে সামনে রেখে মার কাছে খবরটা বলতে থাকব। শুনতে শুনতে বেলা কি করে, আর মুখখানা কি রকম হয়—দেখতে—হাঃ হাঃ।

কল্পনাটায় খেতুরও হাসি পাইল। সে বিধুদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিবার মুখে বলিল—ভাখ ভাই, যতক্ষণ তোমাদের বাসায় আছি ততক্ষণ কিন্তু তোমার চুপ করে থাকতে হবে; আমি চলে গেলে যা খুসী বোলো।

বিধু স্বীকার করিল।

কয়েক দিন ধরিয়া বেলার ইস্কুলে যাওয়া হয় নাই, পড়াটায় বাধা পড়িয়াছিল, আজ সে বই-টই গুছাইয়া আলোটা সামনে রাখিয়া পড়িতে বসিয়াছিল।

বিধু খেতুকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকিল এবং তাহাকে বসিতে বলিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল, বলিল,—আসছি এক্ষুনি।

খেতু গিয়া এদিকে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িতেই বেলা ধড়মড় করিয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। খেতু বলিল, বোসো বেলা; আজ পড়বে তো?

একনেকদিন পড়া বন্ধ গিয়াছে, তার কারণটা মনে করিতেই বেলার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে পুনরায় বসিল।

খেতু বলিল, একটা সুসংবাদ পেলাম। বড়ই আনন্দের কথা।

বেলা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

"তোমার পড়াটা তো বন্ধ হ'তে চলল দেখছি।"

বেলা নীরব, কি উত্তর দিবে?

খেতু হাসিমুখে বলিতে লাগিল, পড়াটা বন্ধ হ'ক এটা কারুরই ইচ্ছে নয়; তোমার তো নয়ই, আর আমারো নয়। এমন ছাত্রীটিকে আমি কি অমনি অমনি ছেড়ে দেবো ভেবেছ?

বেলা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া খেতুর মুখের দিকে তাকাইল, ক্ষণকাল বিমূঢ়ের ন্যায় রহিল,—কিন্তু একটা সংশয়িত অর্থ বিদ্যুতের মত তার মনে খেলিয়া গেল—যে অর্থটা নিতান্ত অসঙ্গত, লজ্জাজনক এবং অপূর্ব্ব পুলকাবহ। তার মুখখানা হঠাৎ অত্যন্ত রক্তিমাভ হইল।

কিন্তু তার সংশয় করিবার অবকাশ রহিল না। খেতু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বেলার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। তার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিয়া তুলিয়া বলিতে লাগিল—আমার এত সাধের ছাত্রীটিকে যে-আমি ছেড়ে দিতে পারি না, তা বুঝি তুমি বোঝনি, দুষ্টু মেয়ে? সেই সমাসের নিয়মটা মনে আছে তো,—তোমায় আমায় যে সাপেক্ষ হয়ে গেছে।

বেলা কোনো কথা কহিল না, মুক্ত হইবারও কোনো চেষ্টা করিল না, সে চোখ চাহিতেও পারিল না।

ভিতরের দিকে বিধুর সাড়া পাইয়া খেতু সরিয়া দাঁড়াইল। বিধু ঘরে ঢুকিতে শুনিতে পাইল, খেতু বেলাকে সমাস বুঝাইতেছে—ন সাপেক্ষে সমাসঃ—অর্থাৎ কি না—বিধুকে দেখিয়া বলিল, আজ চললাম ভাই।

বিধু যখন চা খাইবার অনুরোধ জানাইয়া খেতুকে ফিরাইবার জন্য ডাকিতে সুরু করিয়াছে, তখন খেতু রাস্তায় ছুটিয়া চলিয়াছে।

ছোট ভাই বলাই আগের দিন সরলা প্রে দেখিয়া আসিয়াছিল; খেতুকে ছুটিতে দেখিয়া সে চেঁচাইয়া বলিল—"ঐ চরলে ডি ডি।"

গল্পটার একটু ইতিহাস আছে।

এই বরিশাল সহরে কোনো এক দাদা-মশাইয়ের একটী নাতনী আছে; এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।

মেয়েটীর বয়স ১৪।১৫ বছর; বর্ণ টা শ্যামাভ, brunette বলা যায়, আর গুণে একটী coquette। ব্যাকরণে এদুটীর masc. form নাই, কিন্তু মেয়েটী তাতে দুর্ভাবনা করেনা। সে বেশ জানে তার মত গুণবতী মেয়ের collegeএ ছেলেদের সঙ্গে পড়িতে গেলেই ঢের masc. form মিলিবে, সেটা হবে pirate।

দুএকটী দোষও এর আছে। মেয়েটী হাঁটিতে পারে না, অর্থাৎ সর্ব্বদাই ছুটিয়া চলে। ভাল শুনিতেও পায় না, কারণ চুল দিয়া কান দুটী পরিপাটি করিয়া ঢাকা। আর নিজেই এত কথা বলে যে পরকে কথা বলিবার সুযোগই দেয় না তা শুনিবে কি?

কোনো একটী ১৪।১৫ বছরের মেয়ে কোন্ কোন্ দ্রব্য ভালবাসে, একথাটা কলেজের ছেলেদের জানিয়া রাখা ভাল, কেননা তারা বিদ্যার্থী আর knowledge is power। অতএব know ye all whom it may concern, তিনটী দ্রব্য এই মেয়েটীর অতীব প্রিয়—সিনেমা, প্রেমের গল্প আর কুলের আচার।

এই নাতনী আজ দাদামশাইকে ধরিয়া পড়িয়াছে, একটা নূতন প্রেমের গল্প তাকে লিখিয়া দিতে হইবে। দাদামশাই ভাবিয়া বলিলেন, আজকালকার সাহিত্যিকগণ রুচি মেয়েদের ভারি অবহেলা করিতেছে। তোর মত মেয়ে যারা ইস্কুল ছাড়ায় নাই, এরূপ নায়িকা লইয়া প্রেমের কাহিনী লেখে না। তোকেই নায়িকা করে একটা গল্প লিখে ফেলি আর আমিই নায়ক হতে চাই, যদি ভরসা দিস।

নাক মুখ সিটকাইয়া নাতিনী উক্তি করিল, preposterous!

দাদামশাই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, তবে এক ছোকরাকেই নায়ক করি—

নাতিনী কাছে আসিয়া কহিল—দাদামশাই তোমার এত চুল পেকে গেছে, আজ তুলে দেবো' খন।

গল্পটী শেষ করিয়া দাদামশাই নাতিনীকে কহিলেন—

এটা তোদের ইস্কুলে পাঠ্য করে দেবার চেষ্টা করবো। ব্যাকরণ শিক্ষাও হবে আর ঐ সঙ্গে প্রেমের কালচারও চলবে। প্রেম করাটা মেয়েদের ইস্কুলেই শিখে ফেলা উচিত—কলেজে অদৃষ্টগুণে কাজে লাগ্‌তেও পারে তো?

নাতিনী গল্পের শেষে মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছে—এটা পাঠ্য করিবার জন্য লেডি প্রিন্‌সিপ্যালকে দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলেন—love makingটা মেয়েদের শেখাতে হয় না; এ বিষয়ে তাদের অশিক্ষিতপটুত্ব চিরপ্রসিদ্ধ। আর ব্যাকরণ শেখবার জন্য উপক্রমণিকা পাঠ্য আছে, অতএব আমাদের ইস্কুলে এটা পাঠ্য হতে পারবে না।

আমার কাছে গল্পটা মোটেই ভাল লাগে নাই, একেবারে commonplace। মাসিক কাগজে বরং পাঠাইয়া দিবেন। ইতি—

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

"খোকী কাঁহা?"

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক বছর বাদে আবার শিলঙেই বদ্‌লী হ'লাম।

গতবছর সেখানে যখন সরকারী কাজে ছিলাম অনেকেরই সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারপর তাঁদের ছেড়ে সুদূর বর্মায় যখন চলে যেতে হ'ল মনের ভেতরটা তখন ব্যথায় সত্যিই উঠেছিল ভারী হ'য়ে। তাই যখন খবর পেলাম শিলঙেই আমাকে আবার ফিরে যেতে হ'বে মনটা সত্যিই আনন্দে নেচে উঠ্‌ল।

গতবছর যে বাড়ীতে ছিলাম এবারেও ঠিক কর্‌লাম সে বাড়ীটিতেই থাক্‌ব।

দুপুর প্রায় বারটার সময় মোটর এসে শিলঙের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার তলায় দাঁড়াল। অনেকেই সেখানে ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন অভ্যর্থনা করবার জন্যে। গাড়ী থেকে নাবতে যাচ্চি এমন সময় বাড়ীর পুরোনো মালি ছুটে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। বল্‌ল, বাবুজী—খোকী কাঁহা?

সে অতি যত্নে তার গায়ের গাম্‌ছার ভেতর থেকে বার করল একটি ছোট অতি সাধারণ কাঁচের পুতুল ও দু'ছড়া পুঁতির মালা। খোকীকে দেবার জন্যে সে তার যৎসামান্য আয় থেকে ও'গুলি কিনে এনেছে।

কিন্তু খুকী আজ কোথায়?

নিজের আভিজাত্য ভুলে গেলাম। সামান্য একজন পাহাড়ী মালির সাম্‌নে আমার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝর্‌তে লাগল। সে কিছু বুঝল না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

কানের কাছে কে যেন বারে বারে জিগ্‌গেস কর্‌তে লাগ্‌ল—'খোকী কাঁহা, খোকী কাঁহা?'

হিমেল হাওয়া হা হা করে হেসে উঠল।

ওয়াটার পোলো

শ্রীশান্তি পাল

আমি অন্যত্র ওয়াটাব পোলোর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। এই প্রবন্ধে খেলোয়াড় সম্বন্ধে কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় বিবৃত কবিব। ওয়াটার পোলো খেলায় "গোল-কীপার" অর্থাৎ "জিম্মাদাব," ব্যাক্ অর্থাৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী খেলোয়াড, হাফ্-ব্যাক্ মধ্যবর্ত্তী খেলোয়াড ও ফরওয়ার্ড, অগ্রবর্ত্তী খেলোয়াডদিগের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা কবিব। আমরা দেখিতে পাই যে ওয়াটার পোলো খেলায় জয়-পরাজয় অনেকাংশে হাফ্-ব্যাক্ ও গোল-কীপারের উপর নির্ভর করে। গোল-রক্ষকের ক্ষিপ্রতা, তৎপরতা ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রভাবে অনেক সময়ে খেলায় জয়লাভও হয়। গোল-রক্ষক গোলে অর্থাৎ নির্দ্দেশক খুঁটির মাঝখানে দাঁড়াইয়া ক্রীড়া-ক্ষেত্রের সমস্ত অংশটি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায় এবং পশ্চাতের, মধ্যের ও অগ্রের খেলোয়াড়দিগকে পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। যদি স্বপক্ষীয় কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড়ের নিকট হইতে ভুলক্রমে বা উত্তেজনা বশতঃ দূরে গিয়া পড়ে, গোলরক্ষক তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। ওয়াটাব পোলো খেলা জোড় বাঁধিয়া খেলিবার নিয়ম। এই নিয়মেব ব্যতিক্রম হইলে বিপদ হইতে পারে। অর্থাৎ যে কোন পক্ষ খেলোয়াড়কে মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করিলে সেই শূন্য স্থান হইতে গোল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। বল গোল-কীপারের নিকট আসিলেই তাহার উচিৎ তৎক্ষণাৎ সেই বল স্বপক্ষীয় দলের মধ্যে যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা কবিবে তাহার হস্তে সমর্পণ করা। গোল-রক্ষক হয় পিছনেব না হয় মধ্যেব খেলোয়াড়ের হস্তে বল সমর্পণ করিয়া দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পায়। মধ্যে মধ্যে বল নিজের কবায়ত্তে রাখিয়া

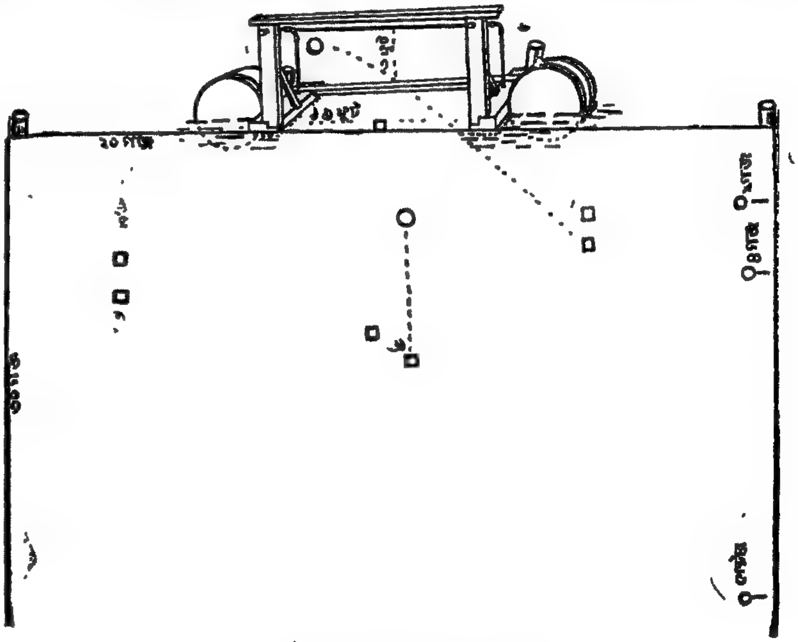

ওয়াটাব পোলো খেলিবাব ক্ষেত্র

পিছনেব বা মধ্যেব খেলোয়াড়কে প্রতিপক্ষের নিকট হইতে পৃথক হইবার অবসর দিয়া থাকে। যে মুহূর্ত্তে স্বপক্ষীয় খেলোয়াড পৃথক হয় সেই মুহূর্ত্তে বলটি তাহাব হস্তে নিক্ষেপ করে। বল নিক্ষেপ হইলেই খেলার কায়দা বা ভঙ্গী পবিবর্ত্তিত হয়, এবং সেই খেলোয়াড সঙ্গে সঙ্গে বলটি হয় অগ্রের খেলোয়াড়েব হস্তে অর্পণ করে না হয় গোলে ছুঁড়িয়া দেয়। ওয়াটাব পোলো খেলায় গোলবক্ষকের ভাব ঐ দলেব একজন

দীর্ঘ অবয়ব ও বাহু-বিশিষ্ট উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, খরদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির উপর অর্পণ করাই সর্ববাদীসম্মতিক্রমে শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করি। উৎকৃষ্ট গোলকীপার হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিতে হইলে,—অর্থাৎ কোন কোন গুণ থাকিলে ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ স্থানে খেলিবার উপযুক্ত হয়—তাহাকে নিয়মিত ভাবে সাধনা করিতে হইবে। এই সকল গুণাবলী উৎকৃষ্ট গোলরক্ষকের অলঙ্কার। তাহাকে যুগপৎ দ্রুত ঘূর্ণন, কিরণ, হেলন, উঁচুলাফ, উঁচুঝাপ ও পরিশেষে সাঁতারের চর্চ্চা করা একান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইলে, গোলকীপারকে রীতিমত স্কিপিং অর্থাৎ দড়ি-ঝাঁপ ও স্থলানুশীলন অভ্যাস করিতে হইবে। অবশ্য অন্যান্য উপায় অবলম্বনে ক্ষিপ্রতার বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এরূপ স্থলে গোলরক্ষককে নিয়মিতরূপে গোলে অর্থাৎ নির্দ্দেশক খুঁটির মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দুই কিংবা তিনটি বলের দ্বারায় ভিন্ন ভিন্ন কোণ হইতে উপর্য্যুপরি বলের দ্বারা আক্রমণ করিলে অনেক সময়ে বেশ ভাল সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সময়সাপেক্ষ। উপরিলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবার পর জলে অল্পক্ষণ অভ্যাস করিলেই উৎকৃষ্ট গোলকীপার হওয়া যায়।

ব্যাক্ বা পিছনের খেলোয়াড়ঃ—

ফুটবলের ন্যায় দুই জন করিয়া ব্যাক্ ওয়াটার পোলো খেলায় থাকে। পিছনের খেলোয়াড়ের গোলরক্ষকের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ অবিকল সেরূপ সম্বন্ধ স্বপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষের অগ্রের খেলোয়াড়ের সহিত আছে। ব্যাককে প্রতিপক্ষের অগ্রের খেলোয়াড়কে চৌকি দিতে এবং স্বপক্ষীয় অগ্রের খেলোয়াড়কে বল সরবরাহ করিতে হয়। পিছনের খেলোয়াড়ের কর্ত্তব্য যে, যে মুহূর্ত্তে প্রতিপক্ষের তরফ হইতে বলটি গোল-পোষ্টের দিকে নিক্ষিপ্ত হইবার সূচনা দেখিবে সেই মুহূর্ত্তে সে নিজের অবস্থানের জন্য সুবিধামত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইবে অর্থাৎ শূন্য স্থানে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বলটি গোল-রক্ষকের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বপক্ষীয় দলের মধ্যের কিংবা অগ্রের উপযুক্ত খেলোয়াড়কে নির্ব্বিবাদে হস্তান্তর করিতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত, যখনই বলটি প্রতিপক্ষের হস্তে থাকিবে তখনই ঐ পক্ষের খেলোয়াড়কে সতর্কতার সহিত চৌকি দিবে যাহাতে সে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া না যায়। যে মুহূর্ত্তে বলটি স্বপক্ষীয় দলের হস্তে পতিত হইবে সেই মুহূর্ত্তে সামান্য পৃথক হইবার নিয়ম, কারণ এই উপায় অবলম্বনে প্রতিপক্ষকে এড়াইয়া বলটি গোলে নিক্ষেপ করিবার সুবিধা পাওয়া যায়; বলটি নিক্ষিপ্ত হইলেই পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া চৌকি দিতে হয়। এই নিয়মে খেলিলে বিপদের সম্ভাবনা কমই থাকে। বৃথা দৌড় ঝাঁপ বা হুড়াহুড়ি করিবার কোন প্রয়োজন করে না।

খেলিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকে স্মরণ রাখিবে যে সে কোন্ স্থানে খেলিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে খেলোয়াড় বাহাদুরি করিবার জন্য বা উত্তেজনা বশতঃ প্রতিপক্ষকে চৌকি না দিয়া অকারণে বল লইয়া বেগে সাঁৎরাইয়া বিপক্ষ-দলের গোলপোষ্ট পর্য্যন্ত গিয়া, পরিক্লান্ত হইয়া বলটি এমন ভাবে নিক্ষেপ করে, যাহাতে বলটি হয় সীমার বাহিরে চলিয়া যায়, না হয় বিপক্ষের হস্তে গিয়া পড়ে; ফলে সেই বল মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই শূন্যস্থানে, অর্থাৎ যে স্থানে প্রতিপক্ষের অগ্রের খেলোয়াড় দাঁড়াইয়া আছে, হস্তান্তরিত হয় এবং সেও সেই অবসরে গোল দেয়। ফুটবল খেলায় হাফ্-ব্যাক্ যেরূপ স্বপক্ষীয় দলের অগ্রের খেলোয়াড়দের বল সরবরাহ করে, ওয়াটার পোলো খেলায় পিছনের খেলোয়াড় ঠিক সেইরূপে বল সরবরাহ করিয়া থাকে। কারণ এই খেলা মাত্র ৩০ গজ পরিমিত ক্ষেত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সকল খেলোয়াড়ই বল নিক্ষেপের দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করে।

ওয়াটার পোলোয় পিছনের খেলোয়াড় খুব দ্রুতগামী সাঁতারু না হইলেও চলে। কিন্তু অধিক দূর পর্য্যন্ত টিপযুক্ত বলক্ষেপণ তাহাদের শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক্। কাঁচি-পাড়িযুক্ত সাঁতারুর ব্যাক্ খেলিলেই ভাল হয়, কারণ তাহাতে ঠিক সময় মত জলে ধাকা মারিয়া বলটি নিজের আয়ত্তে আনিবার সুবিধা হয়। এই পাড়ীতে বলটী প্রতি পক্ষের অগ্রের খেলোয়াড়ের নিকট গোল দিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইলেই, যেখানে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বল পাইবার আশায় উদ্বিগ্ন

চিত্তে পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দেশিত স্থানে দাঁড়াইয়া আছে—সে তৎক্ষণাৎ লাফ্ দিয়া শূন্যপথে কিম্বা প্রতিপক্ষের হস্ত হইতে বলটি অতি সহজেই কাড়িয়া লইতে সক্ষম হয়। কাঁচি পাড়ি যুক্ত সাঁতারুব পদদ্বয় জলের অভ্যন্তরে থাকার জন্য আক্স্মিক লাফের যথেষ্ট সুবিধা পায়। 'ক্রলার অর্থাৎ দুন পাড়ি যুক্ত সাঁতারুর শরীর সর্ব্বদাই ভাসিয়া থাকে তাহাদের গতির ক্ষিপ্রতা পাদচালনার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এই বেগ আনিতে প্রায় ২।৩ সেকেণ্ড সময় লাগে—এই কারণেই বিলম্ব হইয়া পড়ে। দুন্-পাড়ীর সাঁতারু অগ্রে খেলিলেই ভাল হয়।

হাফ্-ব্যাক বা মধ্যের খেলোয়াড়ঃ—

ওয়াটার পোলোয় একজন মাত্র হাফ্ ব্যাক খেলিবার নিয়ম। হাফ্-ব্যাকের স্থান অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। তাহাকে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত খেলিতে হয়। হাফ্-ব্যাক দুর্ব্বল হইলে সেই দলের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। খেলার সাফল্য অধিকাংশই উহার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ টিমের শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড় এই দায়িত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। মোট কথা হাফ্-ব্যাকই দলের মেরুদণ্ড স্বরূপ। হাফ্-ব্যাক দ্রুত, কৌশলী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বিশিষ্ট সাঁতারু হইলেই ভাল হয়। হাফ্-ব্যাকের কর্ত্তব্য প্রতিপক্ষের অগ্রের খেলোয়াড়েব, অর্থাৎ, "সেণ্টাব ফরোয়ার্ড"এর আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং স্বপক্ষীয় দলের সকলকেই প্রয়োজন মত বল সরবরাহ ও সাহায্য করা। মধ্যে মধ্যে তাহাকে ব্যাকের শূন্য স্থান অর্থাৎ যে স্থলে ব্যাক্ খেলিতে খেলিতে উত্তেজনা বশতঃ নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থান ভুলিয়া অন্য স্থানে আসিয়া পড়ে—পূরণ করিতে হয়। পুনরায় মধ্য ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া অগ্রের খেলোয়াড়দিগকে বল যোগাইয়া তাহাদের গোল দিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। কখনও কখনও বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দিগের অজ্ঞাতে রাখিয়া সম্মুখে আসিয়া খেলিতে হয়।

হাফ-ব্যাকের—'ওয়াটার পোলো বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য রীতি মত ভাবে অভ্যাস করা আবশ্যক। নানা ভাবে নানা কৌশলের সহিত হাফ-ব্যাকের বল সরবরাহ করা উচিত। কখনও দক্ষিণ হস্ত, কখনও বাম হস্ত কখনও পার্শ্ব হইতে, কখনও চিৎ হইয়া, কখনও দাঁড়াইয়া সোজাসুজি সমান্তরাল ভাবে, কখনও ব হাত ঘুরাইয়া অর্দ্ধ চক্রাকারে বলক্ষেপণ অভ্যাস করা শ্রেয়ঃ।

সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য "বাহাদুরী করিবার জন্য প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে বলের সহিত নাচাইয়া বা ঘুরাইয়া বৃথা সময়ের অসদ্ব্যবহার যেন না করা হয়।" জলে এই সব কৌশল স্থায়ী হয় না। যতটুকু সময় আবশ্যক ততটুকু সময় বল নিকটে রাখিয়া পরিশেষে সেই বল অগ্রের খেলোয়াড়ের হস্তে অর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে নিজের দায়িত্বের অনেকাংশের লাঘব হয়। হাফব্যাকের আর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, সে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে দল ছত্রভঙ্গ না হইয়া পড়ে। মোট কথা খেলার জয় পরাজয় বহুল অংশে হাফ-ব্যাকের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে।

ফরওয়ার্ড বা অগ্রের খেলোয়াড়—

ওয়াটার-পোলোয় তিন জন করিয়া অগ্রের খেলোয়াড় থাকে। একজন মধ্যে সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং দুইজন দুই পার্শ্বে "লেফট এণ্ড রাইট আউট।" মধ্যে যে খেলোয়াড় থাকে তাহাকে প্রত্যেক ক্ষেপে বল ধরিতে হয়। সময় সময় পার্শ্বের খেলোয়াড়কেও পরিবর্ত্তিত ভাবে রেফারী কর্ত্তৃক বল কেন্দ্রস্থলে পতিত হইবামাত্র সেই বল ধরিয়া স্বপক্ষের হস্তে দিয়া প্রতিপক্ষের গোলপোষ্ট অভিমুখে গিয়া ৪ গজ হইতে ৬ গজের মধ্যে গোল দিবার জন্য অবস্থান করিতে হয়। অগ্রের খেলোয়াড় সকলেই দলের দ্রুত সাঁতারু। উহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ এবং যাহার টিপ-উৎকৃষ্ট সেই সাধারণতঃ কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া খেলে। অগ্রের খেলোয়াড়ের বল ক্ষেপণের কায়দা পিছনের বা মধ্য খেলোয়াড়ের মত নয়। পিছনের খেলোয়াড়ের মত বল নিক্ষেপ করিলে অর্থাৎ অর্দ্ধ-চক্রাকারে বলটি কব্জির মধ্যে ধরিয়া হাতকে সম্পূর্ণ ঘুরাইয়া অনেক সময় সেই বল গোল পোষ্টের বহির্দ্দেশে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। অগ্রের খেলোয়াড় বটিদেশের সোজাসুজি হাত রাখিয়া অর্থাৎ গোল পোষ্টের সহিত সমান্তরাল ভাবে, কোণ লক্ষ্য করিয়া বল ক্ষেপণ করিলেই ভাল হয়। ইহাতে বলের টিপ পাওয়া যায় এবং সেই বল গোলের বহির্দ্দেশে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

ওয়াটার পোলো খেলায় যথেষ্ট দক্ষতা ও সাধনা প্রয়োজন। ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই খেলায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে রীতিমত সাধনা করিতে হয়। খেলোয়াড়দিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, খেলিবার সময় তাহারা সর্ব্বদাই সর্ব্বতো ভাবে দক্ষিণ হস্ত মুক্ত রাখিয়া খেলিবে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে সর্ব্বদাই নিজের বাম পার্শ্বে রাখিবার চেষ্টা করিবে। এই নিয়মের কোন ক্রমে যেন ব্যতিক্রম না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিধেয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সকল খেলোয়াড়ই তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়া চলিবে। রেফারীর নিষ্পত্তি সর্ব্বতো ভাবে মানিয়া চলা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের প্রধান কর্ত্তব্য।

শান্তিপাল

স্বপ্ন

শ্রীঅনুপম গুপ্ত

[কার্ল মার্কসের মেয়ে ও জামাই প্রৌঢ় বয়সে আত্মহত্যা করেছিলেন—materialism দর্শনের সাথে পুরোপুরি তাল বজায় রাখতে। এইটুকুই এর সত্য। বিগত মহা-যুদ্ধের কয়েক বছর আগে এদের মৃত্যু হয়। তার আগে লেনিন ও তাঁর স্ত্রী এঁদের সাথে দেখা করেন।]

প্যারিস সহরের নিকটবর্ত্তী একগ্রামের একটি বাড়ীর ছোট ফুলবাগান সেদিন জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় মোহময় হ'য়ে উঠেছে। সামান্য তুষারপাতের সঙ্গে চাঁদের আলো মিশে এমন একটা আব্‌ছায়ার সৃষ্টি করেছে—যার মাঝে পথচারী মানুষদের কোন্ রহস্যলোকের বাসিন্দা বলে মনে হয়। বাগানের প্রতি ঝোপে, ফুলের কেয়ারিতে, ফালি ফালি সবুজ জমিনের 'পর সেই আব্‌ছায়ার অপূর্ব্ব সমারোহ। একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ হাতে হাত মিলিয়ে এ ঐশ্বর্য্য গায়ে মাখ্‌ছে—বাগানের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে অতি ধীরে—স্বপ্নের মধ্যে মানুষ যেমন করে হাঁটে—তেমনি হাঁটছে যেন। দু'জনের পরণেই লাল রঙের পোষাক। তুষারমণ্ডিত ফেকাশে আলোর আভাতে স্থানে স্থানে তামাটে রঙের ছোপ লেগেছে। আর সেই আলোর ছায়া পড়েছে ওদের মুখে চোখে—ওদের নগ্ন হাতে। ওরা আজকে রাতে যেন মাটির মানুষ নয়,—আকাশেরও নয়।

একটী 'forget-me-not'এর ঝোপের কাছে গিয়ে দু'জনেই থেমে যায়।

'দেখো, দেখো ফুটেছে কতো' স্ত্রীটি বললো। পুরুষটীর হাত ছেড়ে দিয়ে ফুলগুলির 'পর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন। পরমুহূর্ত্তে দু' পা পিছিয়ে এসে পুরুষটির হাত ধরে বলে, 'ওগুলিকে আর তুললাম না। কি বল পল্?'

'তাই ভালো। প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে আমরা এখন এক পা বের করে দিয়েছি। আর এক পা টেনে নিতেই বা সবুর কতো? এমন সময় ওদের আর কোনো দরকার নেই। প্রকৃতির দেনা আমাদের কাছে এখন শোধবোধ হ'য়ে গেছে। তাই নয় লরা?'

লরা ঘাড় কাত করে স্বামীর কথায় সায় দেয়। মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে শুধু বের হয়, 'হুঁ'।

তারা আবার হাঁটতে থাকে। কিছুদূরে—ওদের থাকবার ঘরের সাথে লাগোয়া একখণ্ড সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমিনের 'পর বেঞ্চ বসানো আছে। তারা দুজনে সেই বেঞ্চের 'পর যেয়ে বস্‌লো।

পল ডাকে, 'লরা।'

উত্তর আসে, 'পল্।'

'আর কিছুক্ষণ পরে আমাদের অনুভূতি লোপ পাবে। আমাদের ভাষা থাক্‌বে না, চিন্তা করবার শক্তি থাক্‌বে না। আজকের এমন রাত্রির জন্য তোমার কিছু বলবার আছে?'

'কিছুই না। অনুভূতি, ভাষা এবং চিন্তা নিয়ে আমরা আদি-অন্তকাল বেঁচে থাকি না। প্রকৃতির দিন-রাত্রির মানে চিরদিনই একজনের কাছে সুস্পষ্ট থাকা সম্ভব নয়। তাহলে ছাড়্‌তে মায়া করে লাভ?'

'আমি জানি তুমি এমনি কথাই বলবে। এছাড়া অন্য কথা তোমার মুখে শোভনও নয়। কিন্তু আমি কি শুন্‌তে চাচ্ছি তুমি কি আজ তা বুঝতে পার না?'

'আমাদের এই মরণে জগত কি বলবে—এই শুন্‌তে চাচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ তাই।'

'জগৎ সব সময় সব কাজ তার খাপ মতো হ'চ্ছে কি না তা বুঝতে পারে না। কিন্তু তাই বলে বাবা তাঁর 'Capital' লেখা বন্ধ করে রাখেন নি।'

'ঠিক বলেছ লরা, ঠিক বলেছ। পৃথিবী এতোদিন দেখেছে আদর্শের জন্যে মরতে, দুঃসাহসের জন্যে মরতে, ভালো-

বাসার জন্যে মরতে। তারা কী করে বুঝবে নিছক মরণের জন্যেও মরতে প্রয়োজন আছে।'

তাইতো পল্। সেদিন আমি রাস্তান্ মেয়েটাকে বলেছিলাম 'দেখো আমার স্বামী কেমন করে তাঁর দার্শনিক মত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেন'।'

সফলতার খুসিতে দু'জনের মুখেই আনন্দের ক্ষণিক দ্যুতি খেলে যায়।

পল আবার বলে, 'হাঁ, আমাদের মৃত্যু খবর ওরা যখন পাবে তখন বোংকরি ঐ ছেলে মেয়ে দু'টী আমাদের মনোভাব বুঝবে। তবু ভাল কয়েকটী লোক জানবে আমরা স্বপ্ন বিলাসী নই।'

'লোকে জানুক আর না জানুক, আজকে রাতে আমরা স্বপ্নবিলাসীই হ'বো। তারা স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে—আমরা দেখি জাগ্রত স্বপ্ন। তারা যেখানেই আঁধার দেখে সেখানেই পরাজয় মানে। ঘুমের কোলে দেয় নিজেকে এলিয়ে। স্বপ্নজাল বোনে। নিরুপায় তারা—তাই রূপকথার ছড়াছড়ি করে। কিন্তু আমরা তা করবো না। তাদের যেখানে আরম্ভ আমাদের সেখানেই হ'বে শেষ।'

'ঠিক বলেছ লরা। সর্ব্বহারা বিপ্লবের ধ্বনি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আমাদের যা করার তা আমরা করেছি। আজ শক্তিহীন, জরাগ্রস্ত। তাই মৃত্যুই আমাদের একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। অবশ্যম্ভাবীকে যারা রোধ করতে চায় তারাই তো বিপ্লবের বিরোধী। তাকে দ্রুত আনবার কাজে যে সহায়তা করে সেই বিপ্লবী। আমরা যে বিপ্লবী। এখনও যে আমাদের একটু কাজ বাকী রয়ে গেছে। তুমি নিয়ে এস মৃত্যু-সুধা। চোখের সামনে গেঁথে তোল সর্ব্বহারা বিপ্লবের স্বপ্ন-মালা। Materialistরা জানুক যে তাদের দর্শন মৃত্যুর এ পারের কথাই চিন্তা করে, তার স্বপ্ন বাস্তবের শক্ত পাথরের ভিতে প্রতিষ্ঠিত। যাও লরা—আর দেরী ক'বো না। প্রকৃতির বাকি ঋণটুকু দু'জনে শোধ করে দিয়ে মুক্ত হই।'

লরা পলের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর এক পা এক পা করে ঘরের দিকে চলে,—শরীরের সমস্ত স্পন্দনই যেন নিরর্থক হ'য়ে গেছে।

পল তাকিয়ে থাকে লরার হাঁটার দিকে। সবুজ ঘাসের জমিনটুকু পেরিয়ে গেলো। সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকলো লরা। ধব্‌ধবে বাড়ীখানা জ্যোৎস্নায় নয়তো যেন দুধে স্নান করে উঠেছে। রূপকথার স্বপ্ন-পুরীর মতন লাগে। পলের আজকে কল্পনা করতে ইচ্ছে যাচ্ছে। বাস্তব-শ্রম-ক্লান্ত আঁখি দু'টী তার আলগোছে বুজে আসে। এই তো তার মৃত্যু। লরার জুতোর আওয়াজ পেলে আর একবার সে চোখ চাইবে শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে। এক নিঃশ্বাসে একটা চুমুকেই সেই মুহূর্ত্তটিকে শুষে নেবে। তারপর তাকে আর কণিকা প্রয়োজনও নেই এ বাস্তবের।

লরা ঘরে ঢুকে সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোতে সারা ঘরখানা হেসে উঠ্‌লো। লরা ভাবে: বিজ্ঞানের দান এতোটুকু ম্লান হয়নি। তার আঁখির আলোই মিলিয়ে গেছে। এতো ঔজ্জ্বল্য সে আর সহ্য করতে পারে না এখন। এই তো তার মৃত্যু।

ঘরের মধ্যে এটা-ওটা অনেক খুচ্‌রো জিনিষ। একদিকে আলমারী বোঝাই রয়েছে শুধু বই। এখন তাদের সবই অপ্রয়োজনীয়, সেগুলিকে ব্যবহার করতে এখন তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। শক্তিহীন হ'য়েছে তারা, তাইতো আজ মৃত্যুর প্রয়োজন।

লরা গিয়ে খাবারের আলমারীটা খুললো। যে প্লেটে করে স্বামীকে পনির খেতে দিয়েছে তাতে ঢাল্‌লো বিষ। জগতের কোন্ প্রিয়া তার প্রিয়তমকে এমন করে পরিবেষণ করেছে? এমন পানীয় এনে দিয়েছে!

জুতোর আওয়াজ পেয়েই পল চোখ খুলে দেখলো লরা প্লেট হাতে করে তার একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এই যে তুমি এসে পড়েছ, আমার পাশে বসো এবার', বলে পল লরাকে তার পাশে বসায়।

একজন ডান হাতে ও অপর জন বাঁ হাতে প্লেটটা ধরে একসাথে দুজনে চুমুক দেয়।

জ্যোৎস্না তুষারের আবছায়াতে দেখা যায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন স্বপ্নবিলাসী দু'টী মানুষ ঘুমিয়ে পড়লো—সমাপ্তিহীন ঘুমে। আর সেই সাথে জানিয়ে গেলো Scientific materialism জড়বাদ বা ভোগবাদ নয়—অজ্ঞানের সাথে খাঁটি জ্ঞানের যুদ্ধকৌশল।

অনুপম গুপ্ত

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

জাতীয় জীবনে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের স্থান

ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক রাষ্ট্রিক অথবা অর্থনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং মিথ্যা। কিন্তু, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মানুষকে অবস্থার যে সকল ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত সমাজের প্রধান ভিত্তি ইহাই থাকিয়া যাইবে; পৃথিবীর সকল দেশেই ইহা আছে। কিন্তু অন্যসকল দেশে, রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতীয়তা, শ্রেণী-সচেতনতা প্রভৃতির শক্তিশালী ও বর্দ্ধিত দাবী সমাজের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনের বাহিরে জনসাধারণকে এতটা দূরে লইয়া গিয়াছে যে, ধর্ম্ম বা তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে লোকে অন্যান্য স্বার্থের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া মনে করে না। কিন্তু, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সদা-বর্ত্তমান দ্বন্দ্বের জন্য এবং অন্য কোন প্রকার চেতনা না জাগার ফলে, সম্প্রদায়কেই আমরা সকল স্বার্থের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমাদের এই মিথ্যা ধারণাকে বাঁচাইয়া রাখিবার এবং নিজেদের নানাবিধ স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে তাহাকে ব্যবহার করিবার লোক থাকায়, এই মিথ্যা ধারণা কিছুতেই অপসৃত হইতেছে না।

একজন হিন্দু এবং অপর ব্যক্তি মুসলমান বলিয়া দুই জনের রাষ্ট্রিক স্বার্থ কখনও ভিন্ন হইতে পারে না। শিক্ষা এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য কিন্তু ব্যাপারটি সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যকর হইয়া উঠে যখন আমরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অর্থনীতির কথা বলিয়া থাকি। হিন্দু বা মুসলমানের পৃথক পৃথক আর্থিক সমস্যা কিছু নাই। আর্থিক বিভাগের প্রত্যেক পৃথক স্তরের সকল সম্প্রদায়ের লোকের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে এক। আর্থিক বিভাগই সমাজের প্রকৃত বিভাগ এবং সকল প্রকার স্বার্থের দ্বন্দ্বের মূল এখানেই নিহিত। কাজেই, হিন্দু, মুসলমান বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক আর্থিক সমস্যার বিষয় যখন আলোচনা করেন বা সমাধানমূলক কোন প্রচেষ্টা অবলম্বন করেন তখন তাহাতে সমাধানের সম্ভাবনা আরও দূরে সরিয়া গিয়া ব্যাপারটি শুধুমাত্র জটিলতর হইয়া উঠে।

হিন্দু জমিদার ও প্রজার স্বার্থ এক নহে; হিন্দু মহাজন ও খাতকের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু অপরপক্ষে হিন্দু ও মুসলমান জমিদারের স্বার্থ এক; হিন্দু ও মুসলমান প্রজার স্বার্থ এক; হিন্দু ও মুসলমান মহাজনের স্বার্থ এক, এবং হিন্দু ও মুসলমান খাতকের স্বার্থ এক।

তবুও লোকের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে যাঁহারা নিজেদের কাজে লাগাইতেছেন, তাঁহারা লোকের ভুল ভাঙ্গিবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইতেছেন এবং সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই দোষ হইতে কোন সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহেন।

বাংলায় মুসলমানদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং আর্থিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য একটি সম্মিলিত দল গঠিত হইয়াছে। সমাজ যখন পৃথক আছে এবং তাহার কিছু কিছু বিশিষ্ট সমস্যাও আছে তখন সামাজিক প্রচেষ্টা সমূহের পরিচালনার জন্য দলের প্রয়োজন থাকিলেও রাষ্ট্রিক, বিশেষ করিয়া আর্থিক স্বার্থকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন নূতন চেষ্টা, সকলের কল্যাণ-কই অধিকতর দূরবর্ত্তী করিবে।

এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী মৌলবী আস্রাফউদ্দীন চৌধুরীর বিবৃতির কয়েকটি অংশ 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"....এই প্রকার দলগঠন আমি সমর্থন করি না এবং ইহাকে আমি বিহিত পন্থা বলিয়া মনে করি না। পরাধীনদেশে সম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হইতে পারে না।...যদি এই রকম দল গঠিত হইয়া উহার নীতি কার্য্যে পরিণত করে, তবে মুসলমান সমাজের আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে। এই রকম অবস্থার উদ্ভব হইলে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনষ্ট হইবে।

"বাংলাদেশের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীই মুসলমান এবং তাহাদের বৃহত্তম অংশই কৃষক ও শ্রমিক। মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষক ও শ্রমিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন। মুসলমান চাষী মজুরের ন্যায় হিন্দু চাষী মজুরও আজ তাহাদের অভাব অভিযোগ আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার শিক্ষা ও চৈতন্য সঞ্চয় করিতে পারে নাই এবং সমগ্র সমস্যার তুলনায় সরকারী চাকুরীর প্রশ্ন অতি নগণ্য।...

"যদি মুসলমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হয় (আমাদের সম্প্রদায় অর্থে আমি আমাদের সম্প্রদায়ের শতকরা ৯৫ ভাগ দুর্গত, অজ্ঞ ও ভাষাহীন লোকের কথাই বলিতেছি), তাহা হইলে দেশের দুর্গত, জনসাধারণকে ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে, শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাদের অন্তরে চৈতন্য ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে হইবে।

..."সংযোগবিহীন রাজনীতি চলিতে পারে না এবং ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে এক এক সম্প্রদায়ের জন্য এক এক রকম রাজনীতি হইতে পারে না।...আজ বাংলাদেশে যাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়ের হিতৈষণা জাহির করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেই 'কুশন-চেয়ারী' হিতৈষী। যাহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা এত কথা বলেন তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা তাঁহারা খুব কমই অনুভব করেন। আমাদের সম্প্রদায়ের দরিদ্র ক্ষুধিত ও অর্দ্ধনগ্ন লোকেরা কি কখনও তাঁহাদিগকে তাহাদের সহিত ঘুরিতে কাজ করিতে ও দুঃখ দুর্দ্দশার অংশ লইতে দেখিয়াছে?

..."অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের প্রকৃত স্বার্থ হইতে আমাদের সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বার্থ পৃথক নহে। উপরে যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই যত গোল বাধান। আমার সম্প্রদায় যদি বর্ত্তমানে মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সহিত একমত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অবলম্বনীয় একমাত্র পন্থা হইতেছে বাংলার কৃষক ও রায়তের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন পরিচালনা করা। আমাদের কয়জন তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তি এই যে নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য হইল সম্প্রদায়কে ভাঙ্গাইয়া নিজেদের আসন পাকা করিয়া লওয়া।"

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই স্পষ্ট, নির্ভীক ও সত্য উক্তি শুধু মুসলমান সপ্রদায়ের নহে, সকল সম্প্রদায়ের এবং উপসম্প্রদায়ের নেতা ও কর্ম্মীদেরও বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

শিক্ষা ও বেকার সমস্যা

সাধারণ লোকের মনে এই প্রকার একটা ধারণা হইয়াছে যে, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দেশের বেকার সমস্যাকে জটিলতর ও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায় যে, যাঁহারা শিক্ষিত হইয়া কাজ পাইতেছেন না, তাঁহারা অশিক্ষিত থাকিলে কাজ পাইতেন। শিক্ষা কর্ম্মক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিতেছে না, কাজেই প্রত্যক্ষভাবে এই কথা সত্য হইতে পারে না; তবে, পরোক্ষভাবে ইহা এই হিসাবে সত্য যে, অশিক্ষিত থাকিলে ইঁহারা স্বল্প পারিশ্রমিকের যে-সকল কাজ করিতে পারিতেন, শিক্ষিত হইবার পর, তাহা করিতে পারেন না, এবং করিলেও লেখাপড়ার জন্য যে অর্থব্যয় হয়, তাহাতে তাহা পোষাইবার কথা নহে। কাজেই, ইঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইতেছে এবং তাহার ফলে সমস্যাটি দেখা দিয়াছে। স্বল্প বেতনের শারীরিক শ্রমসাপেক্ষ কাজ যদি প্রচুর থাকিত, ও বর্ত্তমানের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা এই সকল কাজ করিলে যদি কাজের

অভাব না হইত এবং অপর কতকগুলি কর্ম্মচ্যুত না হইয়া পড়িতেন তবে একথা আংশিক মাত্র সত্য হইত। সত্য আংশিক এইজন্য যে, শিক্ষালাভের পর আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়া যায় এবং মনেও অভিমান জাগে ; তাহাতে স্বল্পবেতনের কাজ করিলে জীবনযাত্রা চলে না এবং লোকে যাহাকে অসম্ভ্রমসূচক মনে করে এমন কাজ করিতে অভিমানে বাধে। কিন্তু প্রশ্ন যখন উদরান্নে আসিয়া ঠেকে তখন জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য তলাইয়া যায়, শুধুমাত্র অভিমানের কথা থাকে। সম্ভ্রমে আঘাত না লাগে স্বল্পবেতনের এমন কাজের জন্য শিক্ষিত লোকের আগ্রহের কথা সকলেই জানেন। অভিমানের জন্য যদি তাঁহারা অন্যান্য কাজ না করিতে চাহেন তবে, তাঁহাদের সেই বিশেষ মানসিক অবস্থার জন্য অন্য কাহাকেও বা অন্য কিছুকে দায়ী করা যায় না।

কিন্তু, প্রকৃত কথা এই যে, শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া নাই এবং আরও বহুসংখ্যক লোক ইহাদ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে যাঁহারা এই সকল কাজ করিতেছেন, তাঁহাদেরও সকলের করিবার মত কাজ নাই। সকল লোকই আংশিকভাবে বেকার এবং অনেকেই কাজের অভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারেন না। শুধু শিক্ষিত লোকদের অপেক্ষা ইঁহারা কম সংঘবদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের ন্যায় নিজেদের অভাব অভিযোগের বিষয় উচ্চকণ্ঠে জানাইতে পারেন না বলিয়া ইঁহাদের দুর্গতির কথা আমরা জানিয়াও জানিতে চাহি না। যখনই আমরা শিক্ষিত যুবকদের কৃষির দিকে ঝুঁকিবার কথা বলি তখন ভুলিয়া যাই যে বর্ত্তমানে প্রতি কৃষকের ভাগে কত স্বল্প পরিমাণ জমি রহিয়াছে ; ভুলিয়া যাই যে, বৎসরের অধিকাংশ সময় কাজের অভাবে কৃষকদের বসিয়া থাকিতে হয় এবং ভূমিহীন বহু লোককে স্বল্পমূল্যে শ্রম বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। শিক্ষিত লোকেরা যদি এদিকে ভিড়িয়া পড়েন তবে, আত্মরক্ষায় অক্ষম, ঐক্যহীন, নিরক্ষর এই সকল লোকের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় হইবে তাহা পরামর্শদাতারা হয় ভাবিয়া দেখেন না অথবা দেশের দুঃখ বলিতে তাঁহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখের কথাই মাত্র বুঝিয়া থাকেন।

কাজেই, শিক্ষার ফলে বেকার সমস্যা তীব্রতর হইতেছে, একথা বলা ঠিক নহে। শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের দাবী উচ্চকণ্ঠে জানাইতে পারেন বলিয়া সমস্যাটি তীব্রভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশ হইতেছে, এই মাত্র। কর্ম্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ না ঘটিলে এই সমস্যার নিরাকরণ সম্ভব নহে।

বিদ্যার যে আর্থিক মূল্য দিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, মনের সে অভ্যাসকে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যতদিন না ইহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ হইতেছে ততদিন যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য হিসাবে তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে।

নূতন সার্ব্বজনীন হিন্দুমন্দির

কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটি নূতন সার্ব্বজনীন হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মন্দিরটির নির্ম্মাণে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। অন্যত্র আরও ২।১টি এইরূপ সার্ব্বজনীন মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক কাজগুলির জন্য যখন সামান্য অর্থ জুটিতেছে না (শুধু মাত্র হিন্দুদের কথা ধরিলেও ইহা সত্য), তখন মন্দির নির্ম্মাণের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয় সমর্থনযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য এই সকল অর্থ ব্যয়িত হইলে তাহা অধিকতর মঙ্গলপ্রদ হইতে পারিত। সৎকার্য্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা সংস্কারাশ্রিত বলিয়া, সৎকার্য্যের নামে অনেক সময় যে অর্থের অপব্যয় হয়, এই দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে।

এই প্রকার সার্ব্বজনীন মন্দিরের দ্বারা সমগ্র হিন্দু সমাজের কল্যাণ হইবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের জানা দরকার যে, ইহা আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেছে এবং অবর্ণ হিন্দুদের প্রতি আমাদের মনে যে গভীর ঘৃণার ভাব আছে, এই সকল কার্য্যের ছদ্মবেশে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাদ্বারা এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, সামান্যতম অধিকার ছাড়িয়া দিতে পারি নাই বলিয়াই, এই সামান্য ব্যাপারের জন্যও পৃথক মিলনক্ষেত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা একপক্ষের লজ্জা ও গ্লানির

কথা এবং অন্যপক্ষের অপমান হীনতার কথা। আমাদের সকল চিন্তার ও সকল কার্য্যের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করিয়া কঠোর আত্মপরীক্ষার সময় আসিয়াছে।

আমাদের দারিদ্র্য

আমাদের দারিদ্র্য যে অতিশয় শোচনীয়, অল্পাধিক তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু দেশে অল্প যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে তাহা সামান্য সংখ্যক লোকের হাতে থাকিয়া দেশের উপরিভাগে রহিবার সুবিধা পাইয়াছে বলিয়া এই দারিদ্র্যের তীব্রতা ও ভয়াবহ ব্যাপকতা সম্বন্ধে সম্যক ও সঠিক ধারণা অনেকেরই নাই। এই অর্থটা যাঁহাদের হাতে আছে, দেশের শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য রাজনীতি প্রভৃতি গতিশীল যে-সকল অবস্থা ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া মানুষের অস্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহার সকলগুলিই তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় (যেমন অন্য সকল দেশে থাকে) ঐশ্বর্য্যই সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং দারিদ্র্যের স্বরূপ ইহার নীচে চাপা পড়িয়া যায়। আমাদের দেশে বাসোপযোগী ভাল বাড়ীর সংখ্যা অধিক নহে, প্রাসাদোপম বাড়ীর সংখ্যা আরও কম, তবুও সংখ্যাতীত পর্ণকুটীরের অতিশয় দীনচিত্র ইহারা ঢাকিয়া রাখে, অত্যল্প লোক বিলাসব্যসনের সুবিধা পায়, অল্পলোকেই ভালভাবে খাইতে পরিতে পায়, তবুও ইহাদের কোলাহলের মধ্যেই অগণিত অভুক্ত ও নগ্ন এবং অর্দ্ধভুক্ত ও অর্দ্ধনগ্ন লোকের করুণ আর্ত্তনাদ ও শোকাবহ ইতিহাস ডুবিয়া যায়।

আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিচয়সূচক কয়েকটি অঙ্ক Jather & Beeir Indian Economics নামক পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। "৬০০০ লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১০০,০০০ টাকা, অর্থাৎ মোট ৬০০০,০০০০০ টাকা এবং ইহাতে ৩০,০০০ লোক প্রতিপালিত হয়।

২। "২৩০,০০০ লোকের আয়কর দিতে হয়। ইহারা ১,১৫০,০০০ জন লোক প্রতিপালন করিয়া থাকেন।"

৩। "২৭০,০০০ লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫০০০ টাকা—অর্থাৎ মোট আয় ১৩৫,০০,০০,০০০ টাকা। এই টাকায় ১,৩৫০,০০০ জন লোক প্রতিপালিত হয়।

৪। ২,৫০০,০০০ জন লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১০০০ টাকা; অর্থাৎ ইহাদের মোট আয় ২৫০,০০,০০,০০০ টাকা। ইহাতে ১২,৫০০,০০০ জন লোক প্রতিপালিত হয়।"

৫। "৩৫,০০০,০০০ লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২০০ টাকা, অর্থাৎ ইহাদের মোট আয় ৭০,০০,০০,০০০ টাকা। ইহাতে ১০০,০০০,০০০ জন লোকের ভরণ-পোষণ চলে।"

৬। "অবশিষ্ট সকল লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫০ টাকা, এবং ইহাদের মোট বার্ষিক আয় ৮২৫ কোটি টাকা।

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের মোট ধনের এক তৃতীয়াংশ মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ লোকের মধ্যে আবদ্ধ। ইহাদের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার হিসাব ধরিলেও এই ধন উর্দ্ধপক্ষে মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশের মধ্যে নিবদ্ধ। মোট ধনের অপর এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী (৩৫%) নির্ভরশীল জনসংখ্যার হিসাব ধরিয়াও, মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের মধ্যে আবদ্ধ। মোট জনসংখ্যার শতকরা অবশিষ্ট ৬০ জন, মোট ধনের মাত্র ৩০ শতাংশ ভোগ করিয়া থাকেন।

নীচের দিকের আরও হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, এই ৩০ অংশেরও অধিকাংশ কথিত ৬০ জনের অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ এবং বেশীর ভাগ লোক নিতান্তই দরিদ্র। ভারতবর্ষ স্বভাবতই দরিদ্র দেশ, তবু যদি ইহার মোট সম্পদ জনগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইত, অর্থাৎ নীচের ৬০ জন লোকের হাতে যদি মোট ধনের শতকরা ৬০ ভাগ থাকিত তবে, ইহাদের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমান সময়ের দ্বিগুণ ভাল হইতে পারিত। Comish'এর The Standard of Living নামক পুস্তক হইতে অন্যান্য কয়েকটি দেশের ১৯১৯ সালের আর্থিক অবস্থার পরিমাপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইউ-এস-এ মাথাপিছু বার্ষিক আয়, ৫৬১ ডলার।

গ্রেটব্রিটেন, ৩৩৭; ফ্রান্স ৩০; রাশিয়া ৪০; ইটালি ২০৮; জাপান ৪৬; পর্ত্তুগাল ৮৩; গ্রীস ১২; রুমানিয়া ১৩; জার্ম্মানি ১৫৪; অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারি ৯৪; বুলগেরিয়া ৮৪; তুর্কি ৪২।"

উভয়মুখী বাণিজ্য চুক্তি

শ্রমশিল্পে ভারতবর্ষ পশ্চাদ্বর্ত্তী দেশ বলিয়া বিদেশ হইতে আমাদিগকে যতটাকা মূল্যের জিনিস কিনিতে হয় তত টাকা মূল্যের জিনিস বিদেশে আমরা পাঠাইতে পারি না। কিন্তু, যে সকল দেশ আমাদের নিকট অনেক টাকার মাল বিক্রয় করে, চেষ্টা করিলে তাহাদের নিকট হইতে আমরা কিছু কিছু পরোক্ষ সুবিধা আদায় করিতে পারি।

কারখানার কার্য্যে আমাদের যুবকদের শিক্ষালাভের যে প্রয়োজন বর্ত্তমানে আছে, সে প্রয়োজন ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। অথচ বিদেশের নাম করা ভাল কারখানাগুলিতে আমাদের যুবকদের প্রবেশ পথ বিশেষ সঙ্কীর্ণ, এবং নানাভাবে তাহা ক্রমেই সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িতেছে।

যাহারা আমাদের নিকট জিনিস বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছে, তাহাদের কারখানায় যাহাতে তাহারা আমাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যুবককে শিক্ষা দিতে বাধ্য হয় সেজন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারত-সরকারকে ও ইণ্ডিয়ান-চেম্বার-অব-কমার্সকে সচেষ্ট হইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

জার্ম্মানির সহিত ভারতের বাণিজ্যের হিসাব ভারতের পক্ষে অনুকূল নহে। অথচ, জার্ম্মান কারখানাগুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষালাভ করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। এই দ্বিবিধ অসুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত বসু ভারত সরকার ও ইণ্ডিয়ান-চেম্বার-অব কমার্সকে দায়ী করিয়াছেন। অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার সময় পারস্পরিক নীতির অনুসরণ এবং এই প্রকারের চুক্তি ইউরোপে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষও সহজে এই নীতির অনুসরণ করিতে পারে। তুর্কী, পারস্য প্রভৃতি দেশ যেমন জার্ম্মানির নিকট হইতে কোন জিনিস ক্রয় করিবার পূর্ব্বে জার্ম্মানি কারখানাসমূহে নিজ নিজ দেশের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোক শিক্ষা পাইবে, এরূপ চুক্তি করিয়া লয়, ভারত সরকারও ঐরূপ সর্ত্ত চাপাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, জার্ম্মানি এই প্রকার সর্ত্তে রাজী হইতে বাধ্য হইবে। ভারত-সরকার এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেই অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়; না হইলে ইণ্ডিয়ান-চেম্বার-অব-কমার্সও কাজ করিতে পারেন।

"ব্যবসায়ীরা যদি সংঘবদ্ধ ভাবে ইণ্ডিয়ান চেম্বার-অব কমার্সের মধ্য দিয়া এই প্রকারের কোন দাবী করেন তবে সেই দাবী নিশ্চয়ই পূরণ করা হইবে। আমি জানিলাম, গত বৎসর ভারত সরকার প্রায় ২০—৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিসের বায়না জার্ম্মানি ব্যবসায়ীদিগকে দিয়াছেন। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা কি পাইতেছি তাহা কি একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারি। ইহার পাশাপাশি জেকোশ্লাভেকিয়ার কথা বিচার করিয়া দেখা যাক। যে বৈদ্যুতিক এবং ইস্পাতের জিনিসের (কলকব্জা ধরিয়া) জন্য জার্ম্মানির বিশেষ খ্যাতি আছে, জেকোশ্লাভেকিয়া তাহার অনেকগুলিতে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, এবং ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য সে উৎসুকও আছে। অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে সে যে পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিতেছে তদপেক্ষা অনেক অধিক জিনিস সে ভারতের নিকট হইতে ক্রয় করিতেছে। উপরন্তু, জেকোশ্লাভেকিয়ার স্কোডানের ন্যায় বিখ্যাত কারখানা সমূহে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকেন। এই প্রকারের অবস্থায় জেকোশ্লাভেকিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যের হিসাব জেকোশ্লাভেকিয়ার পক্ষে প্রতিকূল না হওয়া ন্যায় সঙ্গত। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে কিছু পরিমাণ জিনিষের বায়না যদি আমরা জার্ম্মানির পরিবর্ত্তে জেকোশ্লাভেকিয়াকে দিই তবে যে, শুধু মাত্র তাহার প্রতিই সুবিচার করা হইবে তাহা নহে, ইহা দ্বারা ভারতের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও আকাঙ্ক্ষা সমূহের প্রতি জার্ম্মানিকে অধিক মনোযোগী হইতে বাধ্য হইতে হইবে। ভারত হইতে জিনিস রপ্তানি প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, হাম্বার্গের ন্যায় জার্ম্মান বন্দর সমূহে যে সকল মাল নামে তাহা শুধু জার্ম্মানিতে নহে, মধ্য ইউরোপের অন্যান্য দেশেও যায়। জার্ম্মান সরকারের প্রদত্ত হিসাব এই জন্য অনেক সময় ভ্রমাত্মক হয়।"

স্পেশাল টেরিফ বোর্ড ও বাংলার বস্ত্রশিল্প

কার্পাসজাত দ্রব্যের বাংলা একজন বড় খরিদ্দার। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া মিল প্রতিষ্ঠার দ্বারা বস্ত্র-শিল্পকে বাংলা দেশে প্রসারিত করিবার বিশেষ প্রচেষ্টাও চলিতেছে।

সুতরাং বিদেশী বস্ত্রের আমদানী ও প্রতিযোগিতার সহিত বাংলাদেশের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু ইহা স্বত্বেও কিছুদিন পূর্বে, মোদীলিজ প্যাক্ট শেষ হইবার পর বিলাতী বস্ত্রের উপর কি হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত তিনজন সভ্য লইয়া যে স্পেশাল টেরিফ বোর্ড গঠিত হইয়াছে তাহাতে একজন বাঙ্গালীও না থাকায় বঙ্গদেশের স্বার্থ অবহেলিত হইবার আশঙ্কা আছে।

স্পেশাল বোর্ডকে যে যে বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলা হইয়াছে (terms of reference) তাহাতে পর্য্যাপ্ত রক্ষণ শুল্কের অর্থ করা হইয়াছে:
"duties which will equate the prices of imported goods to fair selling prices of similar goods produced in India." অর্থাৎ,—উপযুক্ত রক্ষণ শুল্ক বলিতে, "যে শুল্ক ধার্য্য করিলে বিলাতী বস্ত্র একই প্রকারের ভারতীয় বস্ত্রের সহিত সমান দরে বিকাইতে পারিবে তাহাই বুঝাইবে"। অন্যভাবে বলিতে গেলে,—ভারতীয় বস্ত্রের উৎপাদন মূল্যের তুলনায় বিলাতী বস্ত্রের উৎপাদন মূল্যের পড়তা কত পড়ে স্পেশাল টেরিফ বোর্ডকে তাহাই অনুসন্ধান করিতে বলা হইয়াছে।

বোম্বে-আমেদাবাদ অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পের তুলনায় বাংলার বস্ত্রশিল্প শিশু: তদুপরি ঐ সকল অঞ্চলের মিলজাত দ্রব্যের উৎপাদন মূল্যের তুলনায় বাংলার মিলজাত দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য অধিক পড়ে। আবার ব্যয়বাহুল্য, অ-ব্যবস্থা (mis-management) প্রভৃতির দোহাইয়ে, ভারতীয় বস্ত্রের উৎপাদন মূল্যের ন্যায্য পড়তা সুব্যবস্থাদ্বারা বর্তমান উৎপাদন মূল্যের পড়তা হইতে অনেক কম পড়িবে বলিয়া, ল্যাঙ্কশায়ারের প্রতিনিধিগণ দেখাইতে চেষ্টা করিবেন। সুতরাং প্রকৃত উৎপাদন মূল্যের পড়তা অপেক্ষা কম পড়তা ধরিয়া কিংবা বোম্বে-আমেদাবাদ অঞ্চলের মিলগুলির উৎপাদন মূল্যের পড়তা ধরিয়া বিলাতী বস্ত্রের উপর রক্ষণ শুল্কের পরিমাণ ধার্য্য যাহাতে না হইতে পারে, সেদিকে বাংলা মিল ওয়ালাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা উচিত।

স্পেশাল টেরিফবোর্ডের অধিবেশনে বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের প্রতিনিধি সাক্ষ্য প্রদান কালে, ক্রেতাদের সস্তায় বস্ত্র কিনিবার সুযোগদানের অজুহাতে বিলাতী বস্ত্রের উপর শুল্ক হ্রাস করিবার কথা তুলিয়াছেন। অবশ্য, ক্রেতাদের স্বার্থ দেখিবার এ ধুয়া নূতন নহে। যখনই, কোনও দেশীয় শিল্পের পরিবর্দ্ধন ও পরিপুষ্টিকল্পে বিলাতী শিল্পজাতের উপর রক্ষণ শিল্পের কথা উত্থাপন করা হয় তখনই কর্ত্তারা ও বিলাতী শিল্পজাতের আমদানীকারীরা ক্রেতাদের স্বার্থের ধুয়া তুলিয়া থাকেন। ক্রেতাদের স্বার্থ অবশ্যই দেখা উচিত। কিন্তু, ক্রেতাদের স্বার্থের অজুহাতে বিলাতী বস্ত্রের উপর রক্ষণ শিল্প অন্যায় ভাবে হ্রাস করিয়া ভারতীয় তথা বাংলা-দেশের বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস সাধন না করা হয় সে দিকও সকলের দৃষ্টি থাকা অনেক অধিক প্রয়োজনীয়। কারণ, তাহাই একমাত্র ক্রেতাদের স্বার্থ ভবিষ্যতে সুরক্ষিত করিতে পারিবে।

মোদীলিজ প্যাক্টে, ল্যাঙ্কশায়ারের ভারতীয় তুলা অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করিবার কথা ছিল। অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করা সত্ত্বেও, ১৯৩৪-৩৫-এর বাণিজ্যের হিসাবে প্রকাশ: ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতীয় তুলার মোট রপ্তানীর শতকরা ১০ ভাগ মাত্র ইংলণ্ড ক্রয় করিয়াছে; পক্ষান্তরে জাপান ক্রয় করিয়াছে শত করা ৫৮ ভাগ। সুতরাং ল্যাঙ্কসায়ার অপেক্ষা জাপানই যে ভারতীয় তুলার বড় ক্রেতা সে বিষয় সন্দেহ নাই। জাপানের ক্ষতি হইতে পারে এরূপ ভাবে বিলাতী বস্ত্রের উপর শুল্ক হ্রাস করিলে, জাপান, হয়ত জাপ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তি ত্যাগ করিয়া ভারতীয় তুলা ক্রয় করা কমাইতে পারে। বস্তুতঃ, ১৯৩৩ সালে ভারতীয় তুলা ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিয়াই জাপান ভারতকে জাপানের সহিত বাণিজ্য চুক্তি করিতে বাধ্য করিয়াছিল। মোদীলিজ প্যাক্টে ও প্যাক্টের প্রাক্কালে ল্যাঙ্কশায়ারের প্রতিনিধিগণ ভারতীয় তুলা অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এখন সেরূপ কোন প্রতিশ্রুতির কথাও শুনা যাইতেছে না।

হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস

হিন্দু-মহাসভার পুনা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত এন, সি, কেলকার তাঁহার অভিভাষণের একস্থানে হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—"সেন্সাসে দেখা যায়, বোম্বাই প্রদেশে ১৯২১ সালে যতজন হিন্দু ছিল,

১৯৩১ সালে হিন্দুর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা মাত্র শতকরা ১২·২ জন বেশী হইয়াছে ; কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টানের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১৬·৭ ও ২৫·৭ বেশী হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এই বৃদ্ধির তারতম্য স্বাভাবিক কারণে ঘটে নাই। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ বিস্তৃতভাবে হিন্দুদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন বলিয়াই এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।... নবদীক্ষিত খৃষ্টানের সকলেই অস্পৃশ্য হিন্দু।" আদমসুমারীর বিবরণেও হিন্দুদের এই আপেক্ষিক সংখ্যাহ্রাসের উল্লিখিত কারণ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ডাঃ মুঞ্জেও মজঃফরপুরের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এক সময়ে সমগ্র আফগানীস্থান কাশ্মীর ও বেলুচিস্থান কেবল মাত্র হিন্দু-অধ্যুষিত প্রদেশ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐ সকল স্থান হইতে হিন্দুগণের সংখ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছে। বাংলায়ও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা ৫৫ জন ছিল, আর মুসলমানের সংখ্যা ছিল-শতকরা ৪৫ জন, কিন্তু, বর্ত্তমানে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া গিয়াছে।

অবশ্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণই বাংলার হিন্দুদের সংখ্যাহ্রাসের একমাত্র কারণ নহে। হিন্দুবহুল পশ্চিম বঙ্গের ক্রমবর্দ্ধিত অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব প্রভৃতি এবং হিন্দু সমাজের অনেক দুষ্ট প্রথা বাঙ্গালী হিন্দুদের সংখ্যাহ্রাসের অন্যান্য প্রধান কারণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

মুসলমান খেলোয়াড়ের বিদেশের অভিজ্ঞতা

কলিকাতা মহমেডান স্পোর্টিং টিমএর ক্যাপটেন সদ্য সিংহল-প্রত্যাগত মিঃ হবিবুল্লাহ চট্টগ্রাম সাহিত্য মজলিসের এক বিশেষ অধিবেশনে "সিংহলের তরুণ আন্দোলন" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষে থাকিতে মহমেডান স্পোর্টিংএর খেলোয়াড়রা তাঁরা মুসলমান এই কথাটাই বেশী করিয়া চিন্তা করিতেন। সিংহলে আসিয়াই তাঁরা বিশেষ করিয়া অনুভব করিলেন যে তাঁরা ভারতীয়। তাঁহাদের ধর্ম্মমত কি, একথা কেহ তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন নাই। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল টিম বলিয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছে।"

সিংহলে যে পর্দ্দাপ্রথার বিশেষ অত্যাচার নাই, সকল সম্প্রদায়ের লোকই যে এখানে সদ্ভাবে বাস করেন, ধর্ম্মকে রাজনীতির সহিত মিশাইবার যে এখানে আগ্রহ নাই, এসকল কথাও বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ধর্ম্ম মানুষের গণজীবনে কোন বৃহৎ স্থান জুড়িয়া নাই, কোন প্রকারের স্বার্থ বা দলের ভিত্তিস্বরূপে ধর্ম্মকে অন্য কোন দেশে গ্রহণ করা হয় না। কাজেই, আমরা যে এই ব্যাপারটি এত বড় করিয়া দেখিয়া থাকি এবং ইহাকেই অন্য সকল স্বার্থের ভিত্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকি, এই অদ্ভুত কথাটা অন্য কোন স্থানের লোকের পক্ষে সঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। বিদেশে থাকিবার সময় আমাদের এই মনোভাবের কৃত্রিমতা বাহির ও নিজেদের মন এই উভয় দিক হইতেই উপলব্ধি করিতে পারি। এমন কি, একজন বাঙ্গালী হিন্দু যখন ভারতের অন্য কোন প্রদেশে (যেখানে অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী নাই) যান তখনও তাঁহার মন হইতে একজন বাঙ্গালী মুসলমানের মুসলমানত্বের কথা অন্তর্হিত হইবে। একজন বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অবহেলা করিলে চলিবে না

আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতির জন্য অনুকূল বিশ্ব জনমত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা একাধিকবার বলিয়াছি এবং ইহার জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার কথাও প্রশংসার সহিত পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি ইউনাইটেড প্রেসের নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মিশরের জাতীয়তাবাদী দলের জয়লাভের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"আমাদের শিখিতে হইবে যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে কেবলমাত্র নিজেদের ও কষ্ট স্বীকারের উপরেই সাফল্য নির্ভর করে না—আমরা কি ভাবে আন্তর্জাতিক সুযোগ সমূহকে কাজে লাগাইতে পারিব, সাফল্য তাহার উপরও সমভাবে

নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয়, তাহা হইলে চরম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও সামান্য মাত্র ফল পাওয়া যায়। আবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে সামান্য মাত্র ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াই অধিকতম ফল লাভ করা যাইতে পারে।

"জনগণকে অধিকতর ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই নেতৃত্বের একমাত্র পরিচয় নহে— আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানও নেতার কর্ত্তব্য। বহু বৎসর আন্দোলন করিয়াও মিশর ১৯২৩ সালের শাসনতন্ত্র লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই; অথচ, রাজনীতিক পরিস্থিতি যখন অনুকূল হইল, তখন মাত্র কয়েক দিনের চেষ্টার ফলে তাহারা সাফল্য লাভ করিল।

"আমাদের দেশের বিগত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে উপযুক্ত ভাবে কাজে না লাগাইয়া আমরা কি মারাত্মক ভুল করিয়াছি। আশা করা যায় যে, অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি আর হইবে না।"

কংগ্রেস সুবর্ণ-জয়ন্তী ঃ—

কংগ্রেসের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ইহার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব দেশের প্রায় সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আনন্দ, জয় এবং গৌরবের ইতিহাসকে স্মরণ করিবার জন্য এইরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু শোচনীয় পরাজয়ের অব্যবহিত পরে এবং গত সংগ্রামের ক্ষতচিহ্ন লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ উৎসবের অনুষ্ঠানকে অনেকেই বিশেষভাবে অশোভন মনে করিয়াছেন। এইজন্য জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া যুবকদের মধ্যে এই ব্যাপারে যথোচিত উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। দেশের সর্ব্বত্র যখন নৈরাশ্য, অবসন্নতা ও ক্লান্তি তখন এইপ্রকার কোন উৎসবে যে অধিক লোক যোগ দিবে না এবং তাহার ফলে কংগ্রেসের দৌর্ব্বল্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে, একথা কর্তৃপক্ষের পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করা উচিত ছিল।

সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশ ঃ—

সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যেই যে রাষ্ট্রিক চেতনা কিছু পরিমাণে জাগিয়াছে, কল্পিত কৃত্রিম স্বার্থ অপেক্ষা যে লোকে প্রকৃত স্বার্থকে অধিক মূল্য দিতে শিখিয়াছে, সোজাসুজি সাম্প্রদায়িকতার নামে যে আর লোককে ভুলান যাইতেছে না, সে কথা খিলাফৎ কনফারেন্সের সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণদ্বয়ে খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিজেদের সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টাকে কিছু পরিমাণে ঢাকিবার জন্য, ইহাদের অর্থনীতি ও রাজনীতির অনেক সূত্র আওড়াইতে হইয়াছে এবং নিতান্ত বিপরীত জিনিষসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্য লোকের পক্ষে অসাধ্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে।

ইহাদের মতে, বাংলাদেশে জনসাধারণ বলিতে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান; কাজেই, মুসলমানদের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এমন সকল কাজে প্রকৃত পক্ষে দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ-ই রক্ষা পাইবে এবং মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষারই নামান্তর মাত্র এ কথার উত্তরে যদি বলা যায় যে, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৮ জন যখন হিন্দু তখন হিন্দুদের (অর্থাৎ শতকরা ৬৮ জনের) স্বার্থ যাহাতে পুষ্ট হইতে পারে এমন সকল কাজই প্রকৃতপক্ষে দেশের অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই কল্যাণকর এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই এই প্রকার কার্য্যে সহায়তা করা বিধেয় তাহা হইলে কথাটা একই প্রকার দাঁড়ায়।

কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকাংশ মুসলমান, কাজেই, মুসলমানদিগের স্বার্থেই শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ; কথাটা এইভাবে না বলিয়া যদি বলা যায় যে, শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থই যখন বক্তাদের প্রধান লক্ষ্য এবং ইহাদের অধিকাংশই যখন মুসলমান তখন, ঘুরপথে লক্ষ্যস্থলে না গিয়ে খুব স্পষ্টভাবে ইহারা বলুন না কেন যে, কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থই সকলের লক্ষীভূত হওয়া উচিত এবং এই চেষ্টার দ্বারাই মাত্র মুসলমানদের (অন্যদেরও বটে) স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে, তাহা হইলেই ইহাদের কপটতা ধরা পড়িবে। দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক স্বার্থগত বিভাগকে যদি ইহারা রাজনীতির ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে, সাম্প্রদায়িক কৃত্রিম ভেদবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যাহাতে আর্থিক ভিত্তিতে দল গঠিত হইতে পারে, তাহার জন্যই ইহারা চেষ্টা করিতেন।

নিজেদের সদিচ্ছার সত্যতার প্রমাণের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলিয়াছেন, আর্থিক বিভাগ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িক বিভাগকে অনুসরণ করিয়া থাকে তবে বলিতে হইবে যে তাহা আকস্মিক ও শোচনীয় হইয়াছে। শোচনীয় যে হইয়াছে তাহা আমরাও স্বীকার করি। কারণ প্রকৃতপক্ষে যে অভিযোগ অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও আর্থিক সীমানায় এই আংশিক মিশ্রণের ফলে তাহাকে সাম্প্রদায়িক অভিযোগ বলিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে ভুলান যাইতেছে এবং এইভাবে কৌশলে তাহাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি শানিত করিয়া স্বীয়স্বার্থসিদ্ধির কার্য্যে তাহাদিগকে নিয়োগ করা যাইতেছে।

অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের স্বার্থ ও মুসলমানদের স্বার্থ এক বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মিলিত মুসলিমদলের সহিত সহযোগিতা করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু এমন কথা বলা যায় নাই যে, উভয়ের স্বার্থ যখন এক তখন, উভয়ে মিলিয়া সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জিত দল, স্বার্থের ভিত্তির উপর গঠন করা যাক। অবশ্য অনুন্নত হিন্দুদের সম্বন্ধে ইঁহাদের সহানুভূতির কারণ পঞ্চাশৎ বার্ষিক ইস্‌লামীকরণ পরিকল্পনার মধ্যেই স্পষ্ট হইয়াছে।

আর্থিক-বিভাগই দল গঠনের প্রধান ভিত্তিরূপে গৃহীত হইবে (অঃ সঃ সভাপতির উক্তি) এবং এই উদ্দেশ্যেই সম্মিলিত মুস্‌লিম গঠিত হইয়াছে; বিবোধীজিনিসের সমন্বয়ের এইরূপ হাস্যকব চেষ্টা কদাচিৎ দেখা যায়।

আরও কয়েকটি কথা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলিয়াছেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতি, মধ্যবিত্তদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও কলহকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতে হইবে এবং দেশের লোক ও জনসাধারণের স্বার্থই রঙ্গমঞ্চের প্রধান স্থান অধিকার করিবে।

এই কথায় কাহারও আপত্তির কারণ নাই এবং অনেকেই ইহাই চাহিবেন। কিন্তু, যাঁহারা এই কথা বলিতেছেন, তাঁহারাও মধ্যবিত্তশ্রেণীরই লোক এবং জনসাধারণের এক শ্রেণীর মধ্যে যাহাতে নিজেদের আসন অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্ত পাকা থাকে, এই প্রকারে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত যে মুসলমান জনসাধারণের বিচ্ছেদ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা ইঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই জন্যই ইঁহাদের উচ্চকণ্ঠে বলিবার দরকার হইতেছে যে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মে মুসলমান সেই জন্যই মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থের আমরাই প্রকৃত প্রতিনিধি। ইহার ফলও কিছু হইবে। ইঁহারা যে আসলে অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর লোকদেরই প্রকৃত জ্ঞাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের সহিত যে ইঁহাদের স্বার্থের প্রকৃত বিরোধ আছে, অজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণ এই চালে সে কথা ভুলিয়া, কিছু দিন পর্য্যন্ত মনে করিতে পারেন যে ইঁহারাই (সমধর্ম্মী বলিয়া) তাঁহাদের প্রকৃত বন্ধু। একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত লোকের, জনসাধারণের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার ইহা একটি অভিনব কৌশল মাত্র।

জনসাধারণের আর্থিক স্বার্থের কথা, ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধের কথা ইহারা সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন এবং সুকৌশলে সরিয়া গিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকাংশই যখন মুসলমান তখন আমরা মুসলমান বলিয়াই সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী রাখি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহারা মুসলমানদিগের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের কথাও বলিয়াছেন।

মুসলমান সম্মিলিত দল ও অনুন্নত সম্প্রদায়

খিলাফৎ কন্‌ফারেনসের সভাপতিদ্বয় সম্মিলিত মুসলিমদলের প্রতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুদের আনুগত্য আশা করিয়াছেন ও চাহিয়াছেন। মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ যে হিন্দু কৃষক শ্রমিকদের স্বার্থের সহিত অভিন্ন সে কথা আমারও স্বীকার করি এবং সম্মিলিত মুসলিম দলকে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করিবার জন্য মুসলমান কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল কোন কোন কাজ করিতে হইবে এবং তাহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অনুন্নত হিন্দুরা লাভবান হইবেন, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দলের আনুগত্য স্বীকার এই জন্য করিতে পারিবেন না বা করা উচিত হইবে না যে, এই দলের নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত ও ধনিক

শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতে থাকিবে বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে স্বার্থবোধ জাগ্রত হইবার পক্ষে বাধা জন্মিবে এবং তাঁহারা সাম্প্রদায়িক নেতাদের ক্রীড়নক হইবেন মাত্র। এই সকল নেতারা মুখে সকলের স্বার্থের কথা বলিলেও, সকল সমস্যাকে স্বীয় সম্প্রদায়ের ইচ্ছা এবং কল্যাণের (যাহা প্রকৃত পক্ষে হয়ত অকল্যাণই) মাপ কাঠিতেই মাত্র মাপিয়া দেখিবেন এবং তদনুযায়ী কাজ করিবেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই এই সকল নেতাদের হাতে গিয়া শক্তি পড়িবে বলিয়া প্রয়োজন হইলেও অন্যেরা ফলদায়ক বাধা কখনও দিতে পারিবেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে এই দল শিক্ষা-নীতির যে সকল পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন, তাহা অনুন্নত হিন্দুদের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। অথচ, যদি, এই অনুন্নত হিন্দুরা এই দলের শক্তি অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করেন তবে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহাদের আপত্তি কার্য্যকরী হইবে না। এই প্রকার বহু অবস্থার সৃষ্টি ক্রমাগতই হইতে থাকিবে, এবং দু' একটি লাভের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জনসাধারণকে ভুল পথে লইয়া যাওয়া, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিকূলে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সিদ্ধ করা সহজ হইবে। কিন্তু, আর্থিক স্বার্থের ভিত্তিতে দল গঠিত হইলে এই সব ভুল এবং সাম্প্রদায়িক নীতির অনুসরণ কথনই সম্ভব হইত না!

[খিলাফৎ কন্‌ফারেন্‌স ও বড়দিনের সময় অনুষ্ঠিত আরও ২।১টি সভা ও সম্মিলন সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার কথা অবশিষ্ট রহিল। আগামী সংখ্যায় সে-সবের আলোচনার ইচ্ছা থাকিল।]

হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক কি না

হিন্দু মহাসভার দু'একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে দেখাইয়া অনেক সময় এই কথা বলা হইয়া থাকে যে মহাসভা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে সমর্থন করে না এবং জাতীয়তার ও মহাসভা'র আদর্শে কোন পার্থক্য নাই। পুণা অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কেলকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হওয়ায় এবং মালব্যজী সভাপতি হওয়ায় অনেকের মনে এই ধারণা কতকটা দৃঢ় হইয়াছে।

যাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সকল লোক দৈবক্রমে কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও তাহাকে সাম্প্রদায়িক মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু হিন্দুমহাসভা তাহা নহে। ইহা হিন্দুদের স্বার্থ-রক্ষার (অন্যায় স্বার্থ না হইতে পারে) জন্য হিন্দুদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত এবং এজন্য সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক। হিন্দুদের নানা প্রকার সামাজিক সমস্যা আছে; কোন সম্প্রদায়ের পৃথক কোন রাষ্ট্রিক স্বার্থ না থাকিলেও সম্প্রদায়কেই বর্ত্তমানে রাষ্ট্রিক দলের ভিত্তি স্বরূপে ধরা হইয়াছে বলিয়া এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য দলবদ্ধ হইতেছেন বলিয়া যাহাতে নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য সজাগ হইবার সাময়িক প্রয়োজনও হয়ত আছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার নীতি ও উদ্দেশ্যকে অসাম্প্রদায়িক বা জাতীয়তার অনুগামী মনে করিলে ভুল করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিকে নিকটবর্ত্তী করিতে পারিব মনে করিলে ভুল করা হইবে।

জনসংখ্যা ও খাদ্যাভাব

ঢাকা অর্থনৈতিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত মনোহর লাল আমাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"ভারতবর্ষকে হয় তাহার জনসংখ্যার সঙ্কোচসাধন করিতে হইবে, নতুবা বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে। ১৯২২—'৩১ সালের মধ্যে আমাদের জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহাকে সেন্‌সাস্ কমিশনার ডাঃ হাটন 'শঙ্কার বিষয়' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ধীরমস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞেরা সরকারি কাগজ-পত্রে অনেকবার বলিয়াছেন যে, কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ইতিপূর্ব্বেই পরিমিত মাপ ছাড়াইয়া গিয়াছে।"

লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' লিখিয়াছেন :—

"ষোড়শ শতাব্দীতে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দশ কোটি। ১৯৩১ সালে লোক সংখ্যা হইয়াছিল ৩৫·৩ কোটি এবং এখন দাঁড়াইয়াছে ৩৭·৩ কোটি। কেবলমাত্র বাংলাদেশে বাঙ্গালী বাড়িয়াছে এই তিন শতাব্দীতে অনুমান এক কোটি হইতে

পঞ্চ কোটির অধিক, পাঁচগুণ। গত ১৯১১ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৪৪; কিন্তু সমগ্র ভারতে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়িয়াছে মোটে শতকরা ৭·৪ এবং খাদ্যশস্যভূমির পরিমাণ আরও কম বাড়িয়াছে, শতকরা ৬।..."

"১৯৩১ সালে খাদ্য কম পড়িয়াছিল ২·২ কোটী টন। ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা গণনা অনুসারে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় আহার্য্যের পরিমাণ মোট ৭·২ কোটী টন। সুতরাং বলা যাইতে পারে প্রয়োজনের প্রায় এক চতুর্থাংশ খাদ্য আমরা বৎসর বৎসর কম যোগান দিতে পারিতেছি।... অকর্ষিত ভূমি গ্রহণ করিলেও, বৎসরের খাদ্য আমদানী এবং উৎপন্ন শস্যের আধুনিক মান ধরিয়া ভারতবর্ষ মোট ৩৬·৭ কোটী লোকের বেশী ভার গ্রহণ করিতে পারেই না। আমরা এই সালেই হইয়াছি এখন ৩৭·৩ কোটী এবং বৎসর বৎসর ৪০ কোটীর দিকে দ্রুত ধাবমান। গড়পড়তা ১৯৩১ সালে ভারতবাসী পাইয়াছে খাদ্য ১,৬৫৭ ক্যালরী, কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ততঃ ২,৪০০ ক্যালরী না হইলে চলিবে না। ইউরোপীয়গণ প্রত্যেকে ৩,৪০০—৩,৫০০ ক্যালরী খাদ্য সঞ্চয় করিতে পারে।"

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইঁহারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে নিখিল ভারত ও আরও কয়েকটি নারী সম্মিলনে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সমর্থনসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে একদল লোক অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ঘনত্ব ইউরোপের অধিকাংশ এবং এসিয়ারও কয়েকটি দেশ অপেক্ষা কম এবং গত ৫০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধি অন্যান্য অনেক দেশ অপেক্ষা কম হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে এবং চাষযোগ্য জমির যে বৃহৎ অংশ প্রতি বৎসর পড়িয়া থাকে, তাহাও চেষ্টার দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। এই সকল কারণে ইঁহারা সমস্যাটিকে বিশেষ গুরুতর মনে করেন না।

কিন্তু, অন্যান্য দেশের জনসংখ্যার সহিত ভারতের তুলনা করিবার সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর অনেক দেশের মত ভারতের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য উপনিবেশ এবং বাণিজ্য নাই, যাহার সহায়তায় এই সকল দেশের ন্যায় দুর্ব্বল ও আত্মরক্ষায় অক্ষম জাতিদের শোষণ করিয়া, নিজের বিপুল জনসংখ্যাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। ভারতবর্ষ শ্রমশিল্পে অগ্রসর নহে; অগ্রসর হইতে পারিলেও তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পৃথিবীর বাজারে নিজের জিনিষ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থের দ্বারা অন্যদেশ হইতে খাদ্য শস্য আমদানী করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনাও কম। কাজেই ভারতবর্ষকে সব সময়েই নিজের উৎপাদন ক্ষমতার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। প্রতিকূল আবহাওয়া প্রভৃতির জন্য চাষযোগ্য কিছু জমি সব সময়েই পড়িয়া থাকিবে। অবশ্য চেষ্টার ফলে ইহা কিছু কমিতে পারে এবং বর্ত্তমানের পতিত জমিরও অনেকাংশ শস্যোৎপাদনের যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমানের খাদ্যাভাব ও জীবনযাত্রার অতিশয় নিম্নমান এবং বহুসন্তানসন্ততিসমন্বিত পিতা মাতার দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া এই হিসাবের উপর নির্ভর করা যায় বলিয়া মনে হয় না।

এই সম্পর্কে আমাদের একথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকারে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেও, এই প্রকার অবস্থার মধ্যে কোন সভ্যতার উদ্ভব ও পরিপুষ্টি সম্ভব নহে।

অবশ্য জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উপর জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রভাব অন্য কোন কোন দিক দিয়াও বিচার করিয়া দেখিবার আছে।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর নূতন বিপদ

কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে আমেরিকানরা কয়েকটি বায়স্কোপের বাড়ী কিনিয়া লইয়াছেন এবং একটি নূতন প্রকাণ্ড বাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার জন্য ইঁহারা প্রবেশ-মূল্যও কমাইয়াছেন। কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে বায়স্কোপ ব্যবসায়ে বাঙ্গালীদের প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খাটিতেছে; কিন্তু, এই প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীর বায়স্কোপগুলির টিকিয়া থাকা দুষ্কর হইবে। অবশ্য বাঙ্গালী দর্শকেরা এ বিষয়ে সাবধান ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইলে আশঙ্কার তাদৃশ কারণ নাই। শুধু মাত্র বাঙ্গালীর বায়স্কোপে ছবি দেখিবার জন্য সকল বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া তরুণ-তরুণীদিগকে অনুরোধ করিয়া বাঙ্গালী রক্ষাসমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যাইতে পারে, ইঁহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে না।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পাশ করা "খুনে"

"ডাক্তার"

সেবার আমাদের পাড়ার "মেজদা" নগদ ৩৷৵০ দিয়ে "সরল গৃহচিকিৎসা" সহ এক হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স কিনে ফেল্লেন। ব্যস্, সেই থেকে "মেজদা" জগতের যাবতীয় পাশ করা "খুনে"দের উপর চটে গেলেন বেজায়। মেজদা বলতেন "হুঁ, এ্যালোপ্যাথদের কি ওষুধ বলে কিছু জিনিষ আছে! ফুল্লো টন্‌সিল দাও কেটে, ব্যথা হ'ল এপেনডিক্সে দাও উড়িয়ে। এদের আবার চিকিচ্ছে। হ্যাঁ ওষুধ চাও ত এস আমার হোমিওপ্যাথিতে; এমন কোন সিম্‌টম নেই যার ওষুধ আমাদের শাস্ত্রে নেই। বই দেখ, ওষুধ দাও, ঠিক্ হ'ল ত সেরে গেল, না ঠিক্ হ'ল ত দাও বদলে।" "এলোপ্যাথ" কথাটা যে কোথা থেকে এল তা আমার জানা নেই। হোমিওপ্যাথী আমার তখনও জানা ছিল না আজও নেই। যাঁরা হোমিওপ্যাথী প্র্যাকটিস্ করেন তাঁদের অনেকের কাছে শুনতে পাই এই শাস্ত্রের সুবিধা এবং বিশেষত্ব হচ্ছে যে ওষুধ ভুল হলে কোন ক্ষতি হয় না। হয় ত তাঁরা ঠিক জানেন না, কারণ এটা আমার বুদ্ধির অগম্য যে, যে ওষুধ ভাল করতে পারে তা খারাপ করতে পারে না। যাই হোক্ যেহেতু আমি ও বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ সেহেতু আমি ওবিষয়ে তর্ক করতে রাজী নই এবং ভালমন্দ মতামত দিতে রাজী নই। রুগীর যদি উপকার হয় তাহলে হোমিওপ্যাথি কেন আমি জগতের সব প্যাথিতেই বিশ্বাস করতে রাজী আছি; এমন কি পিসীমার "মাদুলী"প্যাথী শুদ্ধ।

আমি নিজে "এ্যালোপ্যাথ," তার মানে এ নয় যে আমি ঐ শাস্ত্রে বেজায় পণ্ডিত। তবে যেটুকু জানি, তাতে আমি এটুকু মানতে রাজী নই যে আমাদের শাস্ত্রে কোন চিকিৎসা বলে জিনিষ নেই, কেবল আছে খুন করবার ব্যবস্থা। যদিও কেউ কেউ বলেন আমাদেরই কোন খুনে ডাক্তার তিরিশ বছর আগে তাঁকে ৫ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়েছিল বলে আজও তাঁর জলে ভিজলে সর্দ্দি হয়।

প্রত্যেক রোগের একটা বিশেষ ওষুধ বলতে যা বুঝায় (যেমন ডিপথিরিয়া সিরাম) তা আমাদের খুব কমই আছে। মাত্র কয়েকটি রোগের আছে। তার মানে এ নয় যে অন্য সব রোগ আমাদের চিকিৎসায় সারবে না। আমাদের শাস্ত্রের একটা বড় কথা হচ্ছে যে চিকিৎসাশাস্ত্রের চরম অবস্থায় আমরা পৌছাইনি। এমন কি ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের বেলাতেও তা নয়। আমাদের বিদ্যার শেষ এখনও হয় নি এবং কখনও হবে বলে জানি না। চিরকালই আমরা চেষ্টা করছি এবং করব এই শাস্ত্রের উন্নতি করতে। "এ্যালোপ্যাথী"কে আমরা living science বলতে চাই। আজকে যে কথাটা সত্য বলে জানি, কাল যদি তার ভুল বুঝতে পারি তাহলে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন জিনিষের সন্ধানের চেষ্টা করব। তিনশ বছর আগে একজন যে কথা বলে গেছেন সেইটেই যে অভ্রান্ত সত্য একথা মানতে চাই না আমরা। ঋষিবাক্য বলে কোনও ব্যাপার আমাদের নেই। ঋষি যে কথা বলে গেছেন সেটা সত্য হতে পারে কিন্তু তার একটা বিশেষ স্থান কাল এবং পাত্র আছে। জাস্তিপুরের মহারাজার সামান্য সর্দ্দি হলে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকা উচিৎ নিশ্চয় কিন্তু বুদ্ধন্ ঝাড়ুদারের যদি বেশী জ্বরও হয় তাহলে তার ত শুয়ে থাকার উপায় নেই। ছেলে যে কাঁদবে খাবার জন্যে। কালিদাসের কালে সুন্দরীরা হ'য় ত কালাগুরুর ধোঁয়া ব্যবহার করতেন। এখন কিন্তু সেটা শিশিতে না হলে চলে না। ভগ্নদূত এখন আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসে না, সে তার খবর বেতারে পাঠায়। স্বর্গত স্যার আশুতোষকে বাড়ীতে কেউ জামা গায়ে দিতে দেখেছেন কি না সন্দেহ, কিন্তু পাঞ্জাবের কাউকে প্রায়ই খালি গায়ে দেখা যায় না, এমন কি রাস্তার ভিখারীকেও না।

তিনশো বছর আগে কেন পঁচিশ বছর আগে জগতের

যে অবস্থা ছিল আজ কি তা আছে? তখন বিলেত থেকে লোক আসতে অন্ততঃ ২০।২১ দিন লাগত, এখন আর ৫।৬ দিনের বেশী লাগে না। আর সেই জন্যে রোগ ছড়াতেও আর দেরী হয় না এবং কতকগুলো রোগ যা আগে হ'তে পারত না সেগুলোও আজকাল আমাদের দেশে আসতে পারছে এবং ছড়াচ্ছে।

চিকিৎসা শাস্ত্রেরও আজ আর ২৫ বছর আগেকার অবস্থা নেই। ২৫ বছর আগে আমাদের দেশে কালা-আজরের কি ভয়ানক প্রকোপ ছিল সে কথা আজও অনেকের মনে আছে। কালা আজর হওয়া আর ওপারের পরওয়ানা আসা তখন এক কথা ছিল। স্বর্গত গণেন মিত্র মহাশয় তখন সোয়ামিন দিয়ে এ রোগ সারাবার চেষ্টা করছেন। আফ্রিকাতে এণ্টিমনি তখন স্লিপিং সিকনেসের ওপর পরীক্ষা হচ্ছে। তার পরেই স্বর্গত হরিনাথ ঘোষ, কর্ণেল রজার্স এবং স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এই কালব্যাধিতে এণ্টিমনি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। দেশ থেকে এই রোগ তাড়াতে খুব বেশী দিন লাগল না। আজকে এই ভীষণ রোগের ভীষণত্ব চলে গেছে। এমন দিন ছিল যখন বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশী কোন রোগ হয় পরীক্ষাতে এই প্রশ্ন উঠলে মেডিকেল কলেজের ছেলেদের কালা আজরের নাম করতে হ'ত। আর আজ সেই জায়গায় ছেলেদের সব সময় এই কেস দেখার সৌভাগ্য (?) হয় না।

১৯২২ সালের আগে যদি কোনও ডায়বিটিস্ রুগীর একটু বড় রকমের ঘা হ'ত তা হলে ডাক্তাররা এক রকম হাল ছেড়ে দিতেন বল্লেই হয়। ঘা যদি একবার বাড়তে আরম্ভ করত তা হলে তার গতি বন্ধ করা মানুষের অসাধ্য বলেই প্রায় মনে হত। তখন রুগীকে উপোষ করে রাখাই একমাত্র চিকিৎসা ছিল। উপোষ করিয়ে রাখলে হয়ত ঘা একদিন সারত কিন্তু তার অনেক আগেই রুগী ইহলোক থেকে সরে পড়তেন। ব্যাণ্টিং এবং বেষ্টের ইন্‌সিউলিন্ আবিষ্কারের পর এ রোগের ভয়ঙ্করত্ব অনেকটা কমে গেছে। ইন্‌সিউলিন্ দিলে ডায়াবিটিস্ একেবারে সেরে যায় না সত্য, কিন্তু যে সব কারণে রোগটাকে সকলে ভয় করতেন সে সব আর নেই বল্লেই হয়। এতখানি অবধি যখন পাওয়া গিয়েছে তখন মনে হয় একেবারে ডায়াবিটিস যাতে সারে তার ওষুধ পেতে আর বেশী দেরী নেই।

কিছুদিন আগে অবধি থাইসিস্ আর মৃত্যু দুটোই প্রায় একার্থবোধক কথা ছিল। এখন অবস্থা ঠিক সে রকম নয়। এখনও থাইসিসের বিশেষ কোনও ওষুধ বার হয়নি বটে কিন্তু তার এমন সব চিকিৎসা বেরিয়েছে এবং হচ্ছে যাতে করে রুগী সুস্থ হয়ে সমাজে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে বাস করতে পারে। এখন আর সে 'হরিজন' নয়। এটা সম্ভব হ'ল 'কক' এর টিউবারকল ব্যাসিলাই আবিষ্কারের পর থেকে। রোগ হ'বার কারণ জানা গেলে তাকে নাশ করবার উপায় বার করা সোজা হয়ে যায় অনেকটা।

এখন অবধি সবচেয়ে অসাধ্য রোগ বোধ হয় "ক্যান্‌সার্"। ক্যান্‌সার্ বলতে অনেকে বড় রকম একটা 'ঘা' বোঝেন। জিনিষটা ঠিক্ তা নয়। ক্যান্‌সার্ মানে এক রকমের টিউমার অর্থাৎ আব, যেটার বৃদ্ধির এবং ছড়িয়ে পড়ার সীমা নেই বল্লেই হয়। এই বৃদ্ধিই হচ্ছে এর সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব। সেই জন্যে সব টিউমারই ক্যানসার হবে তা নয়। যত টিউমার দেখা যায় তার মধ্যে খুব কমই ক্যানসার। প্রশ্ন হতে পারে "এ রকম অদ্ভুত বৃদ্ধি হয় কেন"? এর উত্তরে উল্টে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে "হবে নাই বা কেন? মানুষ যখন জন্মায় তখন তার ওজন সাধারণতঃ ২।০ সের থেকে ৫ সের অবধি হয় আর সেই মানুষ পরিণত বয়সে ২।০ মন অবধিও ত হয়। আর সেই ৴২।০ ওজনের হবার আগে ত সে ছিল মাত্র দুইটী কোষ যা চর্ম্মচক্ষের বাইরে। দুইটা মাত্র কোষ থেকে যদি এত বড় একটা মানুষ হতে পারে তা হলে সেই মানুষের শরীরের যদি ২।৪ টে কোষ হঠাৎ অনবরত বাড়তে থাকে তাতে আশ্চর্য্য হবার খুব বেশী সঙ্গত কারণ নেই। ক্যানসার হবার একটা কারণ অনেকে মনে করেন যে ক্রমাগত যদি শরীরের কোন এক জায়গায় খোঁচা দেয়া হয় তা হলে সেখানে ক্যান্‌সার্ হতে অনেক সময় দেখা যায়। সেই "খোচানটা" কোনও শক্ত জিনিষ দিয়েও হতে পারে আবার কোনও বিষাক্ত জিনিষ দিয়েও হতে পারে। যেমন যাঁরা ঠোঁটের এক পাশে চেপে পাইপ খান তাঁদের অনেকের ঠোঁটের কোণে অনেক সময় ক্যান্‌সার্ হয়। আমাদের দেশে যাঁরা

পান দোক্তাব 'ঠুলি' করে সমস্ত দিন গালে রেখে দেন তাঁদের মধ্যেও ২।১ জনের হতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে।

খ্রীষ্ট জন্মের ৪০০ বছর আগে Hippocrates বলেছিলেন লোহা এবং আগুনই ক্যানসারের চিকিৎসা, আর আজ খ্রীষ্ট-জন্মের দুহাজার বছর পরেও মূলতঃ সেই চিকিৎসাই আছে। ছুরী দিযে কেটে ফেলা এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা আজও এর চিকিৎসা তা' সে আগুন ডায়াথারমি, রেডিয়ম্‌ কিম্বা x'ray যাই হোক্‌। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে একজন এর virus পেয়েছেন। সে কথা যদি সত্য হয় তা হলে শীঘ্রই antivirus পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

২০।২২ বছর আগে অবধি উত্তর ভারতের সহবকে সহর প্লেগে উজাড় হয়ে যেত—আজ সে কথা আর শোনা যায় না। জলাতঙ্ক রোগেব আতঙ্ক Louis Pasteur প্রায় নষ্ট করেছেন। Jenner বসন্তের টীকা আবিষ্কার করবার পর যাদের বসন্ত হয় সে দোষটা তাদেরই। Ehrlich এবং Hataব আবি-ষ্কারের পব সিফিলিস্‌ রোগীর সে বীভৎস চিকিৎসা এবং চেহাবা আর অতটা চোখে পড়ে না। টীকা এবং জলশোধ-নেব ব্যবস্থা হবার পর পুরীতে রথের সময় কিম্বা গঙ্গাসাগরে যাবার সময় কলেরার ভয়ে উইল করে যাওয়াটা একান্ত প্রয়ো-জন হয় না।

কুইনাইন আবিষ্কারের পরও যে বাংলার গ্রামকে গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যাচ্ছে সে দোষ কুইনাইনের ঘড়ে চাপালে অন্যায় হবে। সে দোষ আমাদের কুঁড়েমীর, দৈন্যের আর অসহায়তার। পানামার মতন ম্যালেরিয়ার জন্যে বিখ্যাত জায়গায় আজকাল লোকে হাওয়া বদলাতে যান্‌।

Behring ডিপথিরিয়া রুগীর যে কি উপকাব করে গেছেন সে কথা বোধ হয় কারুরই অজ্ঞাত নেই।

এতগুলি রোগের চিকিৎসা সবই যে গত ২৫ বছরের মধ্যে হয়েছে একথা বলতে চাই না, তবে বেশীর ভাগই যে এই বিংশ শতাব্দীতে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রোগ হ'লে তা সারাবার চেষ্টা ত চিরকালই হচ্ছে, এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে রোগ যাতে না হতে পারে তার চেষ্টা। মনে হয় কিছুদিন পরে অনেক রোগের নাম কেবল ছাত্রদের বই পড়েই মুখস্থ করতে হবে, 'কেস্‌' দেখতে আর পাবে না।

আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, "তখন তা হলে লোকে মরবে কিসে? এখন অবধি বড়লোকেরা কম বয়সে মারা যায় বলে তাঁদের ছেলেরা উঠ্‌তি বয়সে সম্পত্তি পায় এবং ওড়ায়। গোটাকতক মোসাহেব তাতে খেতে পায়।" তা'র উত্তরে বলতে হয়, "সেকালে শুনতে পাওয়া যায় লোকে অনেক বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করতেন, অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের দরুণ তাঁদের সব অঙ্গ একে একে অকর্ম্মণ্য হয়ে থেমে যেতো আর সেই জন্যেই তাঁদের মৃত্যু হ'ত ভবিষ্যতেও তাই হ'বে। এতে অবশ্য বড়লোকের ছেলেদের এবং তাঁদের মোসাহেবদের যথেষ্ট অসুবিধা হবে।"

আমার এই এতক্ষণ বক্তৃতা শোনার পর আমাদের 'মেজদা' বলে উঠ্‌লেন "হুঁঃ—যতো সব।"

ডাক্তার

আদর্শ সংসার

বাড়ীর অন্তঃপুরে একবার যাওয়া যাক।

এদেশের গ্রীষ্মের সায়াহ্ন। মধ্যবিত্ত একটি ভারতীয় পরিবারের অনাড়ম্বর শোবার ও বসবার ঘরটি আমাদের দৃশ্য। সমস্ত পরিবার সেখানে একত্র হয়েছে। চা পরিবেশন করা চলেছে।

একটি টিপয়ের ওপর কাঠের ট্রেতে চা তৈয়ারীর সমস্ত সাজসরঞ্জাম সাজান। চীনে-মাটির পাত্রটি হয়ত একেবারে সরেস নয়। পেয়ালা ও ডিসগুলি হয়ত সব এক ছাঁচের নয়। হয়ত পেয়ালার চেয়ে চামচ সংখ্যায় কম কিন্তু এসবে কিছু আসে যায় না। আসল যা জিনিষ সেই চা'টি চমৎকার। সকলের আনন্দোজ্জল মুখগুলি দেখলেই এবং তাদের খোস গল্পগুলি শুনলেই সে কথা বুঝতে আর দেরী হয় না।

দেখলেই জানা যায় যে, এই পরিবারটি বেশ বিচার করে

ভাল দেখে চা ব্যবহার করে, সযত্নে চা তৈরী করে এবং প্রাত্যহিক সায়াহ্নের এই চায়ের অনুষ্ঠান ঠিক প্রায় ধর্মাচরণের মতই আগ্রহ নিয়ে পালন করে।

কথায় বলে,—'যে যার ঘর নিজেই গড়ে'। আমরা লোকের মুখে অনেক সময় আদর্শ সংসারের কথা শুনি। কিন্তু আজকালকার দিনে, প্রাত্যহিক জীবনে চায়ের উপযুক্ত মর্য্যাদা যে সংসার না দেয় তাকে কিছুতেই আদর্শ বলা যায় না। ধরুন, কোন 'আদর্শ' সংসারে কোন বন্ধুজন এসে চা পেলেন না। তিনি সে বাড়ীর লোকজনকে কি মনে করবেন? অতিথি-বিমুখ? না, তিনি শুধু জানবেন যে সংসারে সমাজিকতার ভিত্তি স্বরূপ, জীবনের একটি সহজ আনন্দের অভাব আছে—সে আনন্দ চা-পানের।

শুধু নিজেদের জন্যে নয়, আমাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও যে সংসার আমরা গড়ে তুলি,—যে সংসারে তারা এসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তাকেই আদর্শ সংসার বলা যায়। বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গ চায়ের মত এত সহজে আর কিছুতেই আনন্দময় করে তুলতে পারে না। খাওয়া মাত্র মন প্রসন্ন হয়ে উঠে, আমাদের মুখ খুলে যায়। ইচ্ছামত যখন খুসী নিজেদের তৃপ্তি ও পরকে আনন্দ দেবার জন্যে চায়ের আয়োজন যেখানে সদাই প্রস্তুত না থাকে তাকে আদর্শ গৃহ বলা যায় না।

চেতনার স্বরূপ

সচেতনতা ও অচেতনতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে কিছু বদলে গেছে। আমাদের আগের যুগেও গাছপালার চেতনা আছে বলে স্বীকার করা হ'ত না। আমাদের নিজেদেরও যে সচেতন একটি সত্তা আছে, এ কথাও এযুগের আবিষ্কার। মনের গভীর স্তর তলিয়ে দেখবার চেষ্টা প্রত্যহই আমরা বেশী করে করছি। 'পথ-চেতনা', 'আকাশ-চেতনা', 'চা-চেতনা' প্রভৃতি কথা আমরা প্রথম ব্যবহার করেছি।

দার্শনিকতার খোলস বাদ দিলে চেতনার সোজা অর্থ দাঁড়ায় জানার অনুভূতি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আমাদের মন থাকতে পারে কিন্তু তার দ্বারা একথা বোঝা যায় না যে যা কিছু আমাদের গোচর, সে সব সম্বন্ধে আমাদের মন সক্রিয়ভাবে সচেতন।

চা সম্বন্ধে সাধারণ ভারতবাসীর মনোভাবেই এ বৎসরের একটা সহজ উদাহরণ পাওয়া যায়। চা যে কি বস্তু এবং কেমন করে উৎপন্ন হয়, সাধারণে তা জানে। চা যে একরকম গাছের পাতা, এই দেশের মাটিতেই যে তা উৎপন্ন হয়, এই দেশের লোকের পরিশ্রমেই যে তা তৈরী হয় একথা সাধারণ ভারতবাসী জানে। চা যে এ দেশের সবচেয়ে বড় একটি শিল্প ব্যবসায় তাও তার অজ্ঞাত নয়। চা যে তৃপ্তিদায়ক ও পুষ্টিকর একথাও মাঝে মাঝে চা খেয়ে হয়ত সে জেনেছে। তবু তাকে চা সম্বন্ধে সচেতন কি বলা চলে? না, চায়ের প্রতি তার নিজস্ব মূল্য ও বহু গুণের জন্যে সত্যিকার অনুরাগ যার নেই, মাত্র কখন কখন যে চা পান করে থাকে এমন লোকের সম্বন্ধে তা বলা চলে না। চায়ের মত আমাদের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পানীয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও তার নিয়মিত ব্যবহারই চা সম্বন্ধে সচেতনার সত্যকার লক্ষণ।

সুতরাং চা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মানে চায়ের প্রয়োজন ও মূল্য জানা। আমাদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলির অন্যতম এই অভ্যাসটি গঠন করাও তার ভেতর ধরতে হবে।

আমাদের প্রকৃতির অনুরূপ ও তার সঙ্গে জড়িত এই সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সময় লাগে; কিন্তু এ জাগরণের সমস্ত পর্য্যায়ের ভেতর দিয়ে স্মরণ রাখতে হবে যে এ জাগরণ সার্থক। পানীয় হিসাবে চায়ের প্রয়োজন ও বহু উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়লেও, দেখা যায়, আমাদের কারুর কারুর মধ্যে এ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে একটু দ্বিধা থাকে। সমগ্র পৃথিবীকে চা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছি বলে আমরা গর্ব্ব করতে পারি আর আমাদের নিজেদের চা সম্বন্ধে অচেতনার অখ্যাতি কতদিনে ঘুচবে? এই ঔদাসীন্য দূর করতেই হবে। আত্মজ্ঞান লাভের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে যা কিছু মধুর ও সার্থক করে, তার মূল্য আরো ভাল করে বোঝবার জন্যে সে জ্ঞান আমাদের প্রয়োগ করা উচিত। চা বাদ দিয়ে বাঁচায় আনন্দ আছে কি?

অজন্তার যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীঅজিত ঘোষ

উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতবর্ষ যে অনুপম শিল্পকলার অধিকারী বর্ত্তমান যুগে তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আগ্রার তাজমহল নয়, অজন্তা গুহাভ্যন্তরস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরের চিত্রাবলী।—যে পরিমাণ যত্নের সঙ্গে সম্যকরূপে অজন্তা চিত্রাবলীর বিচার বিশ্লেষণ করলে তাদের উৎকর্ষ এবং প্রয়োজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হত অদ্য বধি তা হয়নি; এবং ওই চিত্রাবলী যে বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে গ্রীক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সঙ্গে প্রথম পংক্তিতে এক আসনে স্থান লাভ করেছে, একথা শিল্প সমালোচকেরা এখনও পর্য্যন্ত সম্যক উপলব্ধি করেন নি।

অজন্তা চিত্রাবলী জাতকে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন জন্মের দৃশ্য অবলম্বনে অঙ্কিত। পাশ্চাত্য শিল্পীরা যেমন সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত বৃহৎ প্রাসাদ সজ্জিত করেন, অজন্তাগুহার চিত্রাবলী কেবল মাত্র সেই রকম দেওয়াল সজ্জার জন্য অঙ্কিত হয়নি। যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু ওই চিত্রসমূহ অঙ্কিত করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবনের সহিত বুদ্ধ-জীবনের যে পুণ্যকাহিনী নিগূঢ় ভাবে জড়িত সেই কাহিনীকে প্রীতি এবং শ্রদ্ধার সহিত রূপ প্রদান করার জন্য ওই দেওয়ালের স্থানটুকুকে মহামূল্যবান বলে মনে করতেন। অতএব তাঁদের অঙ্কিত চিত্রসমূহ হয়ে উঠেছিল ধর্ম্মবিশ্বাসের সপ্রেম নিদর্শন। কয়েকটি বিশেষ উদাহরণের সাহায্যে আমরা অজন্তাচিত্রের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং অঙ্কনরীতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে পরিস্ফুট করে' তুলতে পারি। আমাদের প্রথম চিত্রের বিষয় হচ্ছে "রাজা সন্ন্যাসীর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের জন্য যাইতেছেন।" এর আখ্যান ভাগ আছে মহাজন জাতকে। চিত্রের বামভাগে এবং মধ্য নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় রাজাকে নিয়ে রাজকীয় শোভাযাত্রা নগরদ্বারের পথে বহির্গমন করছে, এবং চিত্রের উপরিভাগে অঙ্কিত হ'য়েছে এক সন্ন্যাসী ধর্ম্মোপদেশ দান করছেন ও সম্মুখোপবিষ্ট নৃপতি শ্রদ্ধাসহকারে সেই উপদেশ শ্রবণ করছেন। প্রথম দৃষ্টিতে, চিত্রখানিতে প্রাঞ্জলতার অভাব আছে বলে মনে হ'তে পারে। কিন্তু যদি আমরা আর একটু মনঃসংযোগ করে দেখি তা'হলে বুঝতে পারব, যে রাজকীয় শোভাযাত্রা, নগরদ্বার-পথে বহির্গত হ'য়ে যে উচ্চ স্থানে বসে' সন্ন্যাসী তার ধর্ম্মোপদেশ দান করছেন, সেখানে উপনীত হ'য়েছে।—প্রতিপাদ্য বিষয়ের জটিলতা শিল্পীর কৃতিত্বে মনোরম হ'য়ে উঠেছে।—চিত্রের দৃশ্যমুখে আমরা দেখতে পাই মধ্যস্থলে উপবিষ্ট নৃপতি সমভিব্যাহারে রাজকীয় শোভযাত্রা, এবং চিত্রের পশ্চাদ্বর্ত্তী অস্পষ্টাংশে অবস্থিত সন্ন্যাসী ও তৎসম্মুখে যুক্তকরে সমাসীন ভূপতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।—রাজপ্রাসাদের মহিলাবর্গ, রাজকীয় শোভা-যাত্রা এবং সন্ন্যাসী ও তাঁর ভক্তিমান শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রের

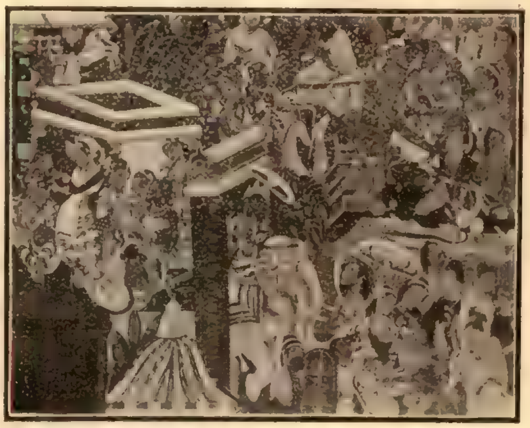

রাজা সন্ন্যাসীর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের জন্য যাইতেছেন

তিনটী বিভিন্ন অংশই অতীব প্রশংসনীয় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হ'য়েছে এবং শিল্পী প্রত্যেক মূর্ত্তিটিকে স্বতন্ত্রভাবে মনোহর ও স্বাভাবিক রূপ প্রদান করতে সক্ষম হ'য়েছেন।—এটি ১নং গুহার একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র।

বোধিসত্ব পদ্মপাণি

১নং গুহার আমাদের পরবর্ত্তী চিত্র বোধিসত্ব পদ্মপাণি মহিমা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিচিত্র সমন্বয় প্রকাশের জন্যই বোধ হয় অজন্তাচিত্রাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। বোধিসত্বের মুখমণ্ডল উদার অনুকম্পায় উদ্ভাসিত। দেবমূর্ত্তি কল্পনায় এই যে অনন্ত করুণার প্রকাশ, এর দ্বারা শিল্পী নিজেকে সত্যই মহিমান্বিত করেছেন। যুগে যুগে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে অন্যতম অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হচ্ছে এই চিত্রে অঙ্কিত ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক বিভূতি এবং অনুকম্পাপ্রোজ্জ্বল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি।—শিল্পী চিত্রের সম্মুখভাগে বোধিসত্বের বিস্ময়কর প্রতিরূপ অঙ্কনের পরে পৃষ্ঠপটের গভীরতায় অন্যান্য মূর্ত্তিকে ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর আকৃতিতে নির্ব্বাসিত করেছেন। পুষ্পাঞ্জলিহস্তে বামভাগে দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি এবং দক্ষিণভাগের সঙ্গীতোল্লাসী কিন্নরগণ এই গৌরবোজ্জ্বল মণ্ডলীর প্রধান মধ্যমূর্ত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হ'লেও যে স্বতন্ত্রভাবে শিল্পকলার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন সে বিষয়ে সংশয় নেই।

১৭নং গুহার এক চিত্রে (বর্ত্তমান নিবন্ধের ৩য়) স্বর্বাসিগণ বোধিসত্বের জন্য নভঃপথে নৈবেদ্য বহন করে আনছে। আধুনিক শিল্পীর দৃষ্টি এ ক্ষেত্রে এক মধুর দৃশ্যের পরিকল্পনা করে নিয়েছে, কিন্তু এই চিত্রান্তর্গত মূর্ত্তিসমূহের মুখমণ্ডল এবং আবয়বিক গঠনে প্রকৃত অজন্তার তীক্ষ্ণতা ও সবলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৭নং গুহার "রাজকুমারীর প্রসাধন" শিল্পোৎকর্ষের এক চমৎকার উদাহরণ। রাজকুমারীর মূর্ত্তিটি অনবদ্য। সে তার অপূর্ব্ব সুন্দর ভঙ্গী এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের নিটোল পরিপূর্ণতায় আমাদের মুগ্ধ করে। সহজ প্রবহমান রেখার সাহায্যে অঙ্কিত এই চিত্রে মানুষের মূর্ত্তি এবং জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টির পরিচয় বিদ্যমান, কারণ একথা স্মরণ রাখতে হবে যে এই মনোরম সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপেই কাল্পনিক—কোনও জীবন্ত আদর্শের প্রতিরূপ এ নয়। অথচ কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়েই না শিল্পী এমন এক প্রসাধনরতা স্ব-সৌন্দর্য্যবিহ্বলা অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত করেছেন,—যে নারীমূর্ত্তিকে চিরন্তন সত্যের প্রতীক বলা যেতে পারে। যে শিল্পীদের মধ্যে সৌন্দর্য্য বোধ ছিল এত গভীর তাঁরা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশাল আনন্দে নিমগ্ন হ'য়ে থাকবেন এটা প্রত্যাশিত। সমস্ত

বোধিসত্বের জন্য নৈবেদ্যসহ নভঃপথে স্বর্বাসিগণ

সপ্রাণ জগৎকে তাঁরা তাঁদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। কেবল মাত্র রাজা মহারাজ অথবা সাধারণ

লোকের প্রকৃত জীবনযাত্রার প্রণালী নয়। প্রাণিজগৎ এবং উদ্ভিদজগতের দৃশ্যাবলীও তাঁরা আমাদের অবলোকন করিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৫ম গুহার রুরুমৃগ কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েও এর মধ্যে প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সুকঠোর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করার বিষয়ে তার ক্ষমতাও কম নয়।

—একথা বলা বাহুল্য যে, যে বোদ্ধা নয় সে সম্পূর্ণ

রাজকুমারীর প্রসাধন

রসিকও নয়।—অজন্তাশিল্পীর প্রাণবহুল চিত্র যাঁকে আকর্ষণ করে এবং সেই সকল চিত্রের গভীরতা ও বর্ণসুষমা যাঁকে চঞ্চল ক'রে তোলে, সেরূপ শিল্পসমালোচকও ওই চিত্রবলীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না, যেহেতু অজন্তাচিত্রের সকল অর্থ সকল রহস্য তিনি পরিজ্ঞাত নন।

রুরু মৃগ

যে স্বপ্ন তাঁকে অনুপ্রাণিত করত, ভক্তিমান ভিক্ষু-শিল্পী বর্ণে এবং রেখায় সেই স্বপ্নকেই রূপ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত আলেখ্য জীবনের সকল প্রাচুর্য্যে, সকল মাধুর্য্যে স্পন্দিত হ'ত কেবল তাঁদেরই কাছে যাঁরা যাপন করতেন সেই ভিক্ষুরই জীবন, কেবল মাত্র যাঁরা ছিলেন সেই ভাবেরই রসিক।—আমরা শুধু বিস্ময়াপ্লুত শ্রদ্ধায় চেয়ে থাকতে পারি মাত্র।

শ্রীঅজিত ঘোষ

একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

সে আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কলিকাতার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে একটী অতি ক্ষুদ্র ভাড়াটীয়া বাড়ীতে জনৈক এম-এ ক্লাসের ছাত্র দুটী স্কুলের ছেলেকে লইয়া বাস করিতেন। যুবক টিউশনী করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতে নিজের ও গরীব ছেলে দুটীর আহারাদি ও শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত—অবশ্য খুব কষ্টে। এম-এ পাশ করিবার পরও ঐ রূপই চলিতে লাগিল। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন—তাঁহার নিকট পল্লীর অনেক ছাত্র যাতায়াত করিত। তাহারা আক্ষেপ করিত "—বাবু, আপনার এখানে কেমন সদালোচনার সুবিধা হয়, কিন্তু আমাদের বাড়ী, মেস্ হোষ্টেল বা কলেজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমনই, যে কোনরূপ সদ্ভাব বা সদভ্যাসের কথা জানিতে পারিলে সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপাদি দ্বারা অস্থির করিয়া তুলে।" যুবকের মনে তখন এই চিন্তার উদয় হইল যে এমন যদি একটী পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়িয়া তুলা যায় যেখানে থাকিয়া দরিদ্র সচ্চরিত্র যুবকগণ বিনা ব্যয়ে কলেজের পড়াশুনা করিবে এবং তাহার সহিত স্বাস্থ্য, সদাচার, ব্রহ্মচর্য্য, এবং অপর অপর উচ্চ আদর্শসমূহের আলোচনা করিবার এবং নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার প্রচুর অবসর পাইবে তাহা হইলে শিক্ষার দিক দিয়া দেশের মস্ত বড় একটি শুভ কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। শ্রীভগবান সকল শুভ উদ্যমের সহায়ক হন। যুবকের ওই মঙ্গল ইচ্ছা অচিরেই কর্ম্মে পরিণত হইতে চলিল। কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে একটি ছোট ভাড়াটীয়া বাড়ীতে ৭।৮ জন দরিদ্র ছাত্রকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্ট্‌স্ হোমের প্রথম সূত্রপাত হইল।

আশ্রমের ঠাকুর ঘর ও খাবার ঘর

যুবক কোচিং ক্লাস করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতেই 'হোমে'র ব্যয় কষ্টে সৃষ্টে চলিতে লাগিল, প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সহিত বর্ত্তমান কালের কলেজীয় শিক্ষার সম্মিলনে উদ্ভূত হইল এক অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছেলেরা কলেজে গিয়া পড়িয়া আসিত, কিন্তু কলেজের বিষ সঙ্গে বহন করিয়া আনিত না; যদিও বা কিছু আনিত আশ্রমের আবহাওয়ায় উহা কাটিয়া যাইত। হোমে ছেলেরা পড়াশুনা করিত—উহা সকল ছেলেই করে—কিন্তু সকল ছেলে যাহা করে না—পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহা তাহাদিগকে করিতে দেয় না—এমন অনেক কিছু হোমের ছেলেরা করিত। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে তাহারা একটী ছোট ঘরে সমবেত হইয়া স্তোত্র পাঠ ভগবৎ সঙ্গীত এবং আপন আপন অভিরুচি অনুযায়ী উপাসনা করিত। তাহার পর আশ্রমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর কর্ম্ম-

গুলি নিজেরাই সম্পন্ন করিত। রন্ধনের জন্য পাচক নির্দ্দিষ্ট ছিল—উহাও হয়ত নিজেরাই পারিত, কিন্তু কলেজের পড়াশুনা করিয়া রন্ধন করিতে গেলে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন—তাহা তাহাদের কুলাইত না। কলেজ হইতে আসিয়া কিছু জলযোগান্তে সকলে মিলিয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইত। অধ্যক্ষও থাকিতেন। কিছু খেলিত—কিছু বেড়াইত—আবার কথায় কথায় নানা প্রকার আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিত। দেশ বিদেশের কথা, আমাদের দেশের নানা সমস্যার কথা, শিক্ষা, সমাজ, সেবার কথা—আবার ধর্ম্ম, দর্শন, নীতির কথা। হোমে ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ সান্ধ্য উপাসনায় ব্যয় করিয়া আবার পড়াশুনা করিত। রাত্রে ভোজনের পর সকলে এক ঘরে সমবেত হইয়া কিছুক্ষণ হাস্য পরিহাস, বিশ্রম্ভালাপে দিবসের কর্ম্মক্লান্তি দূর করিয়া নিয়মিত সময়ে শয়ন করিতে যাইত। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া কলেজের পড়ার সঙ্গে শিখিত তাহারা স্বাস্থ্যনীতি, ভগবদ্বিশ্বাস, সৎসাহস, পীড়িত ব্যথিতের প্রতি সহানুভূতি, আমাদের জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা, দেশ ও সমাজের প্রতি গভীর ভালবাসা। শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা এই চারিটিরই সমকালীন বিস্তারে একটা পূর্ণ মানুষ হইবার আদর্শ তাহাদের সম্মুখে ছিল সর্ব্বদা উপস্থিত।

এই ক্ষুদ্র আশ্রম ধীরে ধীরে কলিকাতার দুই একজন শিক্ষানুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। বাহির হইতে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য আসিতে আরম্ভ করিল—ছাত্রের সংখ্যাও দুটী একটি করিয়া বাড়িয়া চলিল। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তাঁহাদের শাখাকেন্দ্ররূপে ইহাকে অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাদের দুইজন কর্ম্মী এখানে কাজ করিতে লাগিলেন। ১৯২৩ সালে একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ীতে আশ্রম স্থানান্তরিত করা হইল এবং ছাত্রসংখ্যা হইল ১৪। কিন্তু এই বাড়ীও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়াতে ১৯২৫ সালে বহুবাজারের হালদার লেনে একটি বড় বাড়ীতে আশ্রম উঠিয়া আসে এবং ছাত্র সংখ্যাও বাড়িয়া ২৬ হয়। এখন হইতেই কলিকাতার উপকণ্ঠে ইহার একটি স্থায়ী বাড়ী নির্ম্মাণের পরিকল্পনা চলিতে থাকে।

জনৈক মহানুভব ভদ্রলোক (স্বর্গীয় রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়) দমদমে ২০ বিঘা জমি ও ৬ (ছয়) হাজার টাকা দিয়া স্থায়ী আশ্রম নির্ম্মাণের সূত্রপাত করিয়া দিলেন।

আশ্রমের ছেলেদের বাসভবন

কয়েক বৎসরের মধ্যে কর্ম্মীগণের অক্লান্ত চেষ্টা এবং 'হোমের' বিশিষ্ট বন্ধুদিগের উদ্যম ও সহায়তায় ঐ কুড়ি বিঘা জমির সহিত আর ও ১০ বিঘা জমি ক্রীত হইয়া আশ্রমের গৃহাদি নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে নবনির্ম্মিত আবাসে হোম উঠিয়া আসে। তখন মাত্র ১২ জন ছাত্র থাকিবার উপযোগী একটী বাড়ী এবং একখানি রান্না বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার পর এই তিন বৎসরে আশ্রমে ছাত্রদের জন্য আরও দুটী বাড়ী এবং রাস্তা, ঘাট প্রভৃতিও কিছু কিছু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আশ্রমে ৩৩টী সিট্। তাহার মধ্যে কয়েকটী সিট্ আংশিক খরচ দিয়া এবং কয়েকটী পূর্ণ খরচ দিয়া থাকিবার। ২২টী সিট্ দরিদ্র ছাত্রদের জন্য। তাহাদের কলেজের শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার আশ্রমই বহন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান ষ্টুডেণ্টস্ হোম্ দমদমের যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহার নাম গৌরীপুর। দমদম এরোড্রোমের অতি সন্নিকটেই বিস্তীর্ণ নব্বই বিঘা জমির উপর আশ্রমের নৈসর্গিক দৃশ্য প্রকৃতই মনোরম। প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা এখানে গড়িয়া তুলিবার যথেষ্ট অবসর। আশ্রমের নিজের বাসে ছেলেরা কলিকাতার কলেজে যাতায়াত করে। পড়াশুনা, উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ, সদালোচনা, ব্যায়াম, খেলাধুলা, নানাপ্রকার হাতের কাজ এবং কিছু কিছু কৃষিকার্য্য এই সকল দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে এখানকার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। সময়ে সময়ে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ এবং উৎসবাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। শুভক্ষণে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এই 'হোমে'র পরিকল্পনা হইয়াছিল—আজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোম্ বাংলার তথা ভারতের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া দেশের এক প্রকৃত গৌরবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিদ্যাশিক্ষার সময়টীতে বিদ্যার্থীর গুরুগৃহবাস পদ্ধতির মূলে ছিল শাস্ত্রকারদিগের একটা গভীর বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন কেবল অন্ধস্নেহের পরিবেষ্টনে জীবন গড়িয়া উঠে না—আবার স্নেহ-দৃষ্টির একেবারে অন্তরালে কঠোর নির্ম্মম বিরস আবেষ্টনীতেও উহার গতি প্রতিহত হয়। চাই সমন্বয়—একটা প্রেম-সতর্ক দৃষ্টির অভিভাবকতা—বিলাস-ব্যসন বর্জ্জিত অশন, বসন, চাল চলনের খানিকটা কঠোরতা এবং প্রয়োজনমত নির্ম্মম শাসনভয় এইগুলির সম্মিলনে একটা শুভ পারিপার্শ্বিক অবস্থা। গুরুগৃহেই ইহা মিলা সম্ভবপর হইত। জনকোলাহল হইতে দূরে, সৌন্দর্য্যময়ী স্তব্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে থাকিত গুরুদিগের আবাস। সেখানে ছিল তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুর উদার অপত্যস্নেহ, দৈনন্দিন জীবনে ছিল সম্পূর্ণ অনলসতা, নিয়মনিষ্ঠা, সংযম, ত্যাগ, সেবা ও পবিত্রতা। পৃথিবীর কোন মলিনতা সেখানে থাকিত না, অথচ সে জীবনে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না, নিজের বাড়ীর মতই সেখানে ভালবাসা যত্ন ও স্বাধীনতা মিলিত। এই গুরু গৃহবাস বিদ্যার্থি-গণকে যথার্থ মানুষ করিয়া তুলিত—স্বাস্থ্য, নীতি, জ্ঞান, বীর্য্য, স্থৈর্য্য, উদারতা ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপরায়ণতার একত্র সম্মিলনে মহা বলীয়ান চরিত্র সমূহের সৃষ্টি হইত।

কালের গতি আজ ফিরিয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা, কর্ম্মধারা, জীবনধারা আজ প্রাচীনকালের ন্যায় নহে—তাই আজ শিক্ষার ব্যবস্থাও অন্যরূপ। পাশ্চাত্য হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, রাষ্ট্রের নূতন নূতন ভাবধারা জল-স্রোতের মত ভারতকে প্লাবিত করিতে উপস্থিত। সে স্রোতে কল্যাণকর অনেক কিছু বর্ত্তমান, কিন্তু অকল্যাণকর বহু জিনিষও পশ্চাতে পশ্চাতে উপস্থিত। পাশ্চাত্যকে দূরে রাখি-বার উপায় নাই—উহার কল্যাণকর ভাবগুলি আমাদের জাতীয় জীবনে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে—জাতির অভ্যুদয়ের জন্য; কিন্তু অকল্যাণকর অংশগুলি সতর্ক মনোযোগে ত্যাগ করিয়া চলিতে হইবে—নচেৎ আমাদের যুগ-যুগ প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংস হইয়া যাইবে। আপন ঘর সামলাইয়া ঘরের উন্নতিসাধন এইটীই যেন আজ দেশবাসীর আদর্শ হয়। আমাদের যুবকদিগের জন্য শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এই আদর্শ বিশেষভাবে অব্যাহত রাখিতে হইবে। বলিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, মেধাবী, উদারহৃদয়, জাতীয় আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত যুবকসঙ্ঘই দেশের ভবিষ্যৎ। এইরূপ যুবকসঙ্ঘ দলে দলে গড়িয়া তুলিবার শত শত কল বসাইতে হইবে। কি সুখেরই বিষয় হইত যদি ভারতের এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়, এত কলেজ, স্কুল গুলির প্রত্যেকটী এইরূপ এক একটী কল হইত। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয় দেশের এই সকল শিক্ষালয়গুলিতে মানুষ তৈরী হয় না—তৈরী হয় ভগ্নস্বাস্থ্য গ্রন্থকীট—জাতীয় রীতি ও সংস্কৃতির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত, পাশ্চাত্যভাবের অন্ধ-অনুকরণশীল বিলাসপ্রিয় তরলচিত্ত যুবকবৃন্দ—তৈরী হয় কর্ম্মকুণ্ঠ, আরাম-অন্বেষী, নৈতিকচরিত্রহীন জীবন সংগ্রামের সম্পূর্ণ অনুপযোগী স্বার্থপর মানুষের দল। কথাগুলি হয়ত অতি কটু কিন্তু বড় মর্ম্মান্তিক সত্য। শিক্ষার এই অবস্থা আশু ফিরাইতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। বর্ত্ত-মান বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজ সব উঠাইয়া দিয়া জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়, জাতীয় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার আশা ও সামর্থ্য এখন বহু দূরের কথা। বর্ত্তমানের শিক্ষালয়েই আমাদের সন্তানগণকে পাঠাইতে হইবে—অথচ এমন কিছু করা চাই যে ঐ শিক্ষালয়ের শিক্ষার অভাবগুলি তাহাদের চরিত্রে পূরণ হইয়া যায়। ইহার হয়ত নানা উপায় থাকিতে পারে, কিন্তু

গৌরীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের ন্যায় আদর্শ ছাত্রাবাস সমূহ গড়িয়া তুলা যে ইহার একটী অন্যতম প্রধান উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সেই প্রাচীন গুরুগৃহবাসের উপকারিতা এইরূপ প্রতিষ্ঠানেই বহুলতম অংশে পাওয়া যাইতে পারে। গুরুগৃহবাসের কথা শুনিয়া অভিভাবকগণের ঘাবড়াইয়া যাইবার কোন কারণ নাই। এই গুরুগৃহবাসকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। এখন জটাবল্কল ধারণ, সমিদাহরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, আহারের কঠোর নিয়ম প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। যে সকল উদ্দেশ্যে ঐগুলির ব্যবস্থা ছিল অন্য কালোপযোগী উপায়ে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। এক কথায় আজিকার যে আশ্রমজীবন যুবকদের সম্মুখে ধরা হইবে তাহা যেন তাহাদের জীবন ও চিন্তার সহিত বিদ্রোহ উপস্থিত না করে—উহা যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, প্রীতিপ্রদ হয়। সুখের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস্ হোম যে আদর্শে তাঁহাদের বিদ্যার্থীগণকে গড়িয়া তুলিতেছেন তাহা এইরূপই একটী কালোপযোগী আদর্শ। বিংশতাব্দীর যুবকের নিকট ইহা বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না।

গৌরীপুর বিদ্যার্থি-আশ্রম কলিকাতার উপকণ্ঠে; উহা কলিকাতার কলেজের মুষ্টিমেয় ছাত্রের অভাব মিটাইতে পারে। এইরূপ 'হোম' জেলায় জেলায় হওয়া দরকার। স্কুল কলেজের বোর্ডিং হোষ্টেলগুলিকেও ঐ হোমের আদর্শে ঢালাই করিয়া লইতে পারিলে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের অনেকটা পর্ব্ব সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ কি এই দিকে মনোযোগ দিবেন না?

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

তোমারে পেয়েছি যেন

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ এম-এ

জানি সখি, জানি তোমারে পা'বনা আমি
পরশ-বন্ধনে। কল্পনার ইন্দ্রধনু
বিচ্ছুরিত বর্ণস্তরে, তব রূপ তনু
স্পর্শাতীত র'বে জানি চির দিবাযামী।
জানি সখি, জানি আমি দূর সিন্ধুপারে
স্বপ্নময় যে-মাধুরী জাগে ধীরে ধীরে
সুনীল আকাশ আর বনাঞ্চল ঘিরে'
তা'রি মত র'বে চির রহস্য-আঁধারে।

তবু জানি···ব্যথা ম্লান বিধুর সন্ধ্যায়
বসিয়া একেলা যবে পূর্ণানদীতীরে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই ধ্যানের তিমিরে,
সহসা ঘনায় স্বপ্ন মগ্ন-চেতনায়
'তোমারে পেয়েছি যেন'···অপূর্ব্ব স্বপন;
অশ্রুজলে ভ'রে আসে মুগ্ধ দু'নয়ন।

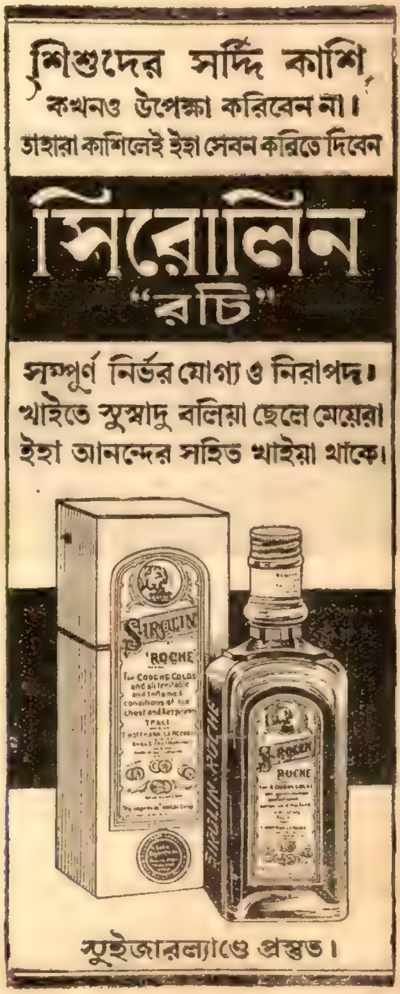

পাতালপুরী

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দে

স্বাস্থ্যলাভার্থে গিয়েছিলাম "গিরিডি"তে। অবশ্য আর একটা অর্থও ছিল সেটা কয়লার খনির সাক্ষাৎ দর্শন লাভের আগ্রহ। সেবারে কলিকাতা থেকে মোটরে কয়লার খাদ-গুলির বুকের উপর দিয়ে গেলাম, এবং ফিরে এলাম। তাদের অন্তঃস্থলের রূপ কেমন, মানশ্চক্ষে কল্পনা করা ছাড়া প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটে উঠ্‌ল না।

প্রতিবেশিনীরা সকলেই প্রথম আলাপেই "গিরিডি"র

পাতালপুরীর উপরের দৃশ্য

দ্রষ্টব্যের তালিকা দিলেন। কয়লার খনি দেখবার সুপ্ত আগ্রহ সঙ্কল্পে পরিণত করলাম। শ্রীগোবিন্দ এবং সেনবাবুকে পাঠালাম সুবন্দোবস্তের জন্য যাতে আমাদের কয়লার খাদ দর্শন অবাধ হয়। কিন্তু বাধা ঘটেছিল পদে পদে, সে কথা বলব পরে।

"গিরিডি"র বাসিন্দা যাঁরা, তাঁরা দেখি তাঁদের দেশের খবর খুবই রাখেন! একাধিক আলাপি লোকের মুখে শুনলাম মেয়েদের খাদে নামা নিষেধ এবং পুরুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিতে হয় এবং ছেলেদের পাতালপুরীতে নামতেই নেই। খনিওয়ালাদের বিধানে শিশুদের বারো বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তার আগে কোল-ফীল্ডের নীচের মাটির টানের চেয়ে উপরের 'মা'-টির কোলের টান অনেক প্রবল।

খাদের খোদ বড়বাবু কিন্তু অন্য কথা বল্লেন। নিয়ম হচ্ছে, মজুরদের তহবিলে মাথা পিছু এক টাকা দান করলে খাদে নামবার অধিকার স্ত্রী-পুরুষের সমান এবং স্বাস্থ্য সকলের ভাল বলেই গণ্য করা হয়। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না; "গিরিডি"র অধিবাসীরা কয়লার খনি বোধকরি দেখতে যায় না—সুতরাং কোন খবরও রাখে না। নইলে এমন উল্টা কথা তারা বলবে কেন? সব জায়গাতেই কিন্তু এই একই ব্যাপার! কলকাতায় চৌদ্দ পুরুষের বনেদী বাসিন্দে এমন অনেকে আছেন যাঁরা এ পর্য্যন্ত যাদুঘর দেখেন নি। আলোর কোলটাই আঁধারে ভরা!

স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ভগ্নস্বাস্থ্য সমেত খাদে নামবার অনুমতি পাওয়া গেল। যা পাওয়ার আশা ছিল না তাই পেয়ে মন আনন্দে ভরে উঠল।

গাড়ীর আড্ডায় আবদুল রহমানের ট্যাক্সিখানা বেশ সস্তাতেই পাওয়া গেল। আশে পাশের লোকগুলো কিন্তু দেখি মুচকি মুচকি হাসছে। ভূতের বাড়ীর মত ভূতের গাড়ীও থাকে শুনেছিলাম। ও দুটোই সস্তায় ভাড়া পাওয়া যায়। এ হাসির অর্থ অবশ্য পরে বুঝেছিলাম। গাড়িখানা একটা দস্তুর মতো বাধা এবং তার ড্রাইভারটি একটি পরিপূর্ণ গাধা।

খনির এলাকায় প্রবেশ পথে নেপালি দ্বাররক্ষী ছাড়-

পত্রের দাবী জানালে। ছাড়পত্রদাতা স্থানান্তরে ব্যস্ত, সেখানে ছিলেন না। কর্ত্তব্যপরায়ণ নেপালী কোনও কথাই শুনে না। দুই আনা মূল্যে তার কর্ত্তব্যের একটু ফাঁক ক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেই সে ফাঁকি দিতে উদ্যত, এমন সময় বাধা দিল এসে নেপালীর একজন সতীর্থ বেহারী। নেপালীর সাহস হ'ল না। দুই আনার প্রলোভন কাটিয়ে সে সোজা খাড়া হ'য়ে দ্বাররক্ষা করতে লাগল, এবং ঘুষ নেওয়ার লজ্জা হ'তে রক্ষা পেল। মোটর ঘুরিয়ে পাশবাবুর আড্ডা আবিষ্কারে এবং পাশ সংগ্রহ করতে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল। শুক্ল পক্ষের প্রায় পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নাধারা তখন উন্মুক্ত খাদের প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

কয়লার খাদ অন্ধ। দিবারাত্রি তার কাছে সমান। সূর্য্যালোকের প্রবেশ পথ নাই। তাই বলে যাত্রের বাধা খাদে নামতে অসুবিধা ঘটায় না। দিবারাত্র সেখানে কাজ হচ্ছে।

কয়লার জন্ম কথার বিষয়ে সকলে একমত নয়। গল্পদাদার মতে পুরাকালের যজ্ঞপরায়ণ মুনিঋষিদের যজ্ঞাবশিষ্ট অঙ্গার স্তূপকে কয়লার আকারে ধরিত্রী সযতনে বুকে ধারণ ক'রে আছেন। যদি তাই হয় তা হ'লে যজ্ঞফল ত আমরাই এতদিন পরে ভোগ করছি; কেন না বর্ত্তমান সুখ-সুবিধার অনেকটাই ত এই কয়লার অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। মুনিঋষিদের যজ্ঞের পাকা ফলটি আমাদের হাতে তুলে ধরলেন লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস। তাঁরই শাসনকালে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আমরা ভারতবাসী কয়লার ব্যবহার প্রথম শিখলাম। আজ কয়লা আমাদের জীবন যাত্রার পথের অপরিহার্য্য উপকরণ।

বৈজ্ঞানিক দাদা কিন্তু আমাদের অন্য কথা বুঝাতে চান। তাঁর মতে সর্ব্বনাশা ভূকম্পের ফলে দেশকে দেশ যা ভূগর্ভস্থ হয়, হাজার হাজার বছর পরে কয়লারূপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সেই সকল অপহৃত জিনিস আবার ফিরে পাওয়া যায়। এ একেবারে খাঁটি লেন-দেনের ব্যাপার। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ধনে আমরা ধনী হয়ে উঠি। এই হিসাবে প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পের ধ্বংসলীলার প্রয়োজন আছে। প্রতি বৎসর আমরা বসুন্ধরার বুক ফাটিয়ে কয়লা সংগ্রহ করে থাকি প্রায় ১২৫ কোটি টন। এমন ভাবে খরচ করলে একদিন বসুমতীর বুক একেবারে খালি হয়ে যাবে। তখন কি হবে তা ভেবে পৃথিবীর পণ্ডিত বৈজ্ঞানিকগণ মাথা ঘামাচ্ছেন। কয়লার পরিবর্ত্তে এমন কি জিনিষ ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে কয়লার অভাবকে উপেক্ষা করতে পারা যায় তা তাঁরা ভাবতে থাকুন, প্রকৃতি দেবী কিন্তু নিশ্চিন্ত আছেন। কয়লা তাঁকে যোগাতেই হবে; তাই মাঝে মাঝে ভূকম্পের সাহায্যে তাঁকে কয়লার বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

কয়লার ব্যাপারে আমাদের রেল কোম্পানীগুলির ক্ষিধে কম নয়। তিন ভাগের একভাগ কয়লা তাদেরই খাওয়াতে হয়। এর কৃতজ্ঞতায় বার কোটী টাকা তারা দাদন দিয়ে বসে আছে।

এক ইউনাইটেড কিংডম ছাড়া ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী কয়লা পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ আর ঝরিয়া এই দুইটা জায়গায় কয়লার খনি সবচেয়ে বেশী।

আমরা প্রবেশাধিকার পেলাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর খাস খাদ শ্রীরামপুরের সেণ্ট্রাল পিট-এ। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই খনি ই, আই, আর-এর খাসে আসে। বি, এন, আর-এর সঙ্গে আধা-আধি ভাগে বেশ বড় একটা কয়লার খাদ এদের আছে। হাজারীবাগ জেলার বোকারো নামক জায়গায় এই খাদের আয়তন ২২০ বর্গমাইল। এই রেল কোম্পানীর অধিকারে 'গিরিডি'তে আরও একটা খাদ আছে নাম কারহার বাড়ী।

পেশাদার প্রদর্শক ইংরাজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলে। দেখা এবং বোঝা—এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ বেধে গেল। মোটামুটি খানিকটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম অনেক। সবই নূতন কিনা—পুলকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। প্রথমেই খাদের ভিতর একান্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিষ নির্ম্মল শুদ্ধ বাতাস। দেখলাম এ সম্বন্ধে সুপরিচালিত এই খনিটার অদ্ভুত আয়োজন আছে। নানা কারণে খাদের ভিতর অনবরত দূষিত বায়ুর সৃষ্টি হচ্ছে, সুতরাং তাকে তাড়িয়ে নির্ম্মল বাতাসের প্রয়োজন। এই কাজ খুব ক্ষিপ্রতার সহিত অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমাধা হচ্ছে। খনির ভিতর এক এক জায়গায় শীতল মলয় পবনের পরশ পর্য্যন্ত আমরা অনুভব করেছিলাম।

লিফ্‌টের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন ভূগর্ভ থেকে হুস্ করে কোলাহল করতে করতে একদল ভূত পেত্নী উঠে এল। এরাই পাতালপুরীর কর্ম্মী, চেহারায় মনে হয় প্রেতপুরীর বাসিন্দা। এই দেখবার পর যখন লিফ্‌টে উঠবার ডাক পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘণ্টাধ্বনি হল তখন মনে পড়ল কবীন্দ্রের একটী ছত্র—"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?" তখন "মোদের দুরু দুরু হিয়া কাঁপে", চক্ষু মুদ্রিত হ'য়ে আসে, বোধকরি ভগবানকেও একবার স্মরণ হয়। নিমেষে চক্ষের পলকে পাতালগামী রথখানি আমাদের হৃৎপিণ্ডটা উল্টে দিয়ে হাজির হল পাতালপুরীতে ৫৬০ ফিট নীচে।

সবই কয়লা! মাথার উপরে পায়ের তলায় দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি যায় সবই কয়লা! কয়লা কেটে কেটে পথ করা হয়েছে, লম্বা লম্বা পথ। কলকাতার সরু গলির মত চলনসই প্রশস্ত। দুই ধারে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত। রাস্তার মাঝে লাইন পাতা, তার ওপর ছোট-ছোট ট্রলী কয়লা বোঝাই করা। পাশে ড্রেন, কল কল করে অনবরত জল বয়ে যাচ্ছে। নির্ম্মল বাতাস প্রচুর পরিমাণে অনুভব করলাম। রাস্তা পাকা রাস্তার মত, তবে সবই কয়লার। জায়গায় জায়গায় কয়লা কাটতে কাটতে পাথর বেড়িয়ে পড়েছে। কোথাও বা কাঠের চাড়া দেওয়া আছে। এসব "গিরনে মাংতা" কয়লার স্তর। অর্থাৎ বিপজ্জনক, মাথায় পড়তেও পারে। কাজ করতে গিয়ে সময়ে সময়ে জানও দিতে হয়।

পাতালপুরী কি না, রসাতলের সঙ্গে সম্বন্ধটা মর্ত্তের চেয়ে নিবিড়, তাই অনবরত অকাতরে জল সরবরাহ হচ্ছে, আর মর্ত্তের যন্ত্রগুলির সাহায্যে অদম্য উৎসাহে দ্রুততর গতিতে পাতাল-মুখ জল উগার করে মর্ত্তের মাটীকে মোলায়েম করছে। এই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন কয়লার রাজ্যে দুই ঘণ্টা ঘুরে ফিরে দেখে দেখার সাধ মিটে গেল। ঊর্দ্ধমুখী রথে উঠে দাঁড়ালাম। এবারে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। মাটির ওপরের মানুষ আমরা, পুনরায় পায়ের তলায় মাটি পেয়ে প্রকৃতিস্থ হলাম।

আবদুল রহমানের ট্যাক্সির ভূতটা ভর ক'রে বস্‌ল মেসিনের ওপর; খানিকটা গিয়েই মোটর ভূতাবিষ্ট হল। রহমান সাহেব বাঁধা বুলি আওড়াতে লাগল। কখন বলে, তেল বহুত হ্যায়, লিক করতা। কখন বলে, মেসিন ঠিক্ হ্যায়, তেল নেহি হ্যায়। অবশেষে বললে, আপলোক চুপ চাপ বৈঠ রহিয়ে, হাম বাজারসে কেরাসিন ছ বোতল লে আতে হেঁ। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। মোটর তার কেরাসিনে চলে, তাই ইঞ্জিনের মাঝে মাঝে হামেসাই অভিমান হয়! তার খোরাক হল পেট্রোল তাকে দেওয়া হয় কিনা কেরাসিন! তাহলে ভূতে-পাওয়া গাড়ী বলে সস্তা নয়—কেরোসিনে চলা মোটর বলে এত সস্তা। কেরাসিন তেল বোতল চারেক ঢালা হল, কিন্তু খানিকটা গিয়ে গাড়ী আবার বন্ধ। বোধকরি আমাদের বাক্যবাণ আর সহ্য করতে না পেরে এবার আবদুল ছুটল পেট্রোল আনতে। এই গাড়ীতে রাত্রের মধ্যে আমরা বাড়ী পৌঁছুতে পারব এ আশা ছেড়ে দিলাম। গাড়ীতে বসে দেখলাম পায়ে হেঁটে বাড়ী পৌঁছুবার পক্ষে অনেকগুলি অনুকূল অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী—পথ নির্জ্জন—সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত। সঙ্গে একদল সাথী—আর কণ্ঠে আমাদের সদ্য-দেখা খাঁদের আলোচনা। মনে হল ভালই হয়েছে গাড়ীর কল বিগড়ে। রাস্তায় নেমে পড়লাম। কোলাহল কর্ত্তে কর্ত্তে পথ চলা সুরু হল। গন্তব্যস্থানে যখন পৌঁছলাম তখন মনে হল রাস্তাটা আরও খানিকটা দীর্ঘ হলে ক্ষতি ছিল না।

বাড়ী এসে পাঁজি খুলে দেখলাম সেদিন যাত্রা বেশ ভাল ছিল, সবদিকেই সব সময়ে। অশ্লেষা, মঘা, ত্রয়োস্পর্শ, দিক্‌শূল—এ সবের কোন সংস্পর্শ-ই ছিল না। তবে এত বাধা কিসের? তা হ'লে বোধকরি হাঁচি টিক্‌টিকির বাধা পড়েছিল। কিন্তু কই কেউ ত যাত্রাকালে হাঁচে নি, তবে কেন এমন বাধা ঘটল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি ঘরের দেওয়ালে একটা ল্যাজকাটা টিক্‌টিকি ছোট্ট একটা পিঁপড়ের পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

টিক্‌টিকির বাধা,
না শুনলেই গাধা।

আবদুল রহমানকে গাধা ব'লে ভাল করিনি।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দে

'মেডিকো'র আর্ট গ্যালারি

শ্রীবিমল সেন

মস্ত বড় হল্।

সারি সারি লম্বা লম্বা টেবিল সাজান; এবং উহার প্রত্যেকের গায়ে নম্বর দেওয়া আছে।

দুই নম্বর টেবিলে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি মনুষ্যদেহ শায়িত। তাহার কপালের ঠিক মাঝখান দিয়া একজন গভীর মনোযোগ সহকারে করাত চালাইতেছে। মানুষটি স্থির—অচল। করাতের কাজ শেষ হইলে লোকটি 'চিসেল্' এবং হাতুড়ির সাহায্যে উহার মস্তকের উর্দ্ধাংশে আলাদা করিয়া ফেলিতেই একটা বিষাক্ত পচা গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল।

'ব্রেন্' পচিয়া গলিয়া পড়িতেছে।

সকলে নাক চাপা দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

তিন নম্বর টেবিলে আর একটি দেহ রাখা। বুক হইতে তলপেট অবধি ফাঁক করা। বুকের হাড়গুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। হাত নাই, পা' নাই, চোখ দুইটা বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহার ডান হাত পাঁচ নম্বর এবং বাঁ হাত আট নম্বর টেবিলে রাখা।

পনের নম্বরের উলঙ্গ মেয়েটার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে, সে যেন বলিতে আসে—শোন, একটা মজার কথা বলি। আমার মানুষটি কিন্তু আজও ভাবছে, আমি বেঁচে আছি।

অন্যান্য টেবিলগুলির কোনটাতে আছে রাশিকৃত হাড়—পায়ের, হাতের, বুকের, মাথার। কোনটায় আছে একটা হাত কিম্বা পা', কোথাও শুধু বুকের অংশটা।

সারি সারি মৃত দেহ।

কেহ শূন্যের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া। কেহ শুধু হাসে। কেহ আবার মুখ বিকৃত করিয়া যেন ভয় দেখায়। অনেকগুলি দেহ, বড় বড় পোকার বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে।

হলের চারি কোণে চারিটি কঙ্কাল, মাথায় 'হুক' পরাইয়া ফ্রেমের ভিতর ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। দুটি পুরুষের এবং অন্য দুটি নারী-দেহের। একটির মুখে সিগ্রেট প্রবেশ করাইয়া দিয়া কে যেন তাহার হাত পায়ের হাড়গুলি এমন ভাবেই সাজাইয়া রাখিয়াছে, দেখিয়া মনে হয়, সে যেন গর্ব্বিত ভাবে দাঁড়াইয়া সিগ্রেটে টান দিতেছে।

বিশ নম্বর টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে একটি ছেলে। কোন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা একটা "হার্ট" হাতে লইয়া, অস্ফুট স্বরে আওড়াইতেছে—'রাইট অরিক্ল্, লেফ্ট্ ভেন্ট্রিক্ল্, পাল্মোনারি আর্টারি—'

পচা এবং বোটকা গন্ধে ঘরের বাতাস বিষাক্ত।

এ যেন সাক্ষাৎ নরক—মেডিক্যাল কলেজের শব-ব্যবচ্ছাদাগার।

প্রত্যেক টেবিলের চারি পার্শে ছয়-সাতটি করিয়া ছেলে, হাতে চিমটা এবং ছুরি লইয়া দাঁড়াইয়া। ঐ গলিত, পোকা ভরা শবদেহগুলির উপর শকুনির মত ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাদের বুকে, পিঠে অবাধে ছুরি চালাইয়া ছেলেরা দেখে—কোন্ ধমনিটি কোথায় সুরু হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে, কোন্ মস্ল্টার কি কাজ, হার্টের ভিতর কটা চেম্বার। এই ভয়াবহ দৃশ্য, মনুষ্যদেহের এই শোচনীয় পরিণতিতে, তাহাদের মনে কোন রেখাপাতই হয় না।

উহারই ভিতর, হয়ত তাহারা কোন নারিদেহকে কেন্দ্র করিয়া হাসি-তামাসা করিতেছে। কেহ হয়ত এক খণ্ড মাংস কাটিয়া লইয়া অন্যের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিতেছে। এ যেন কিছুই নহে—খেলাঘর।

এ হলে অনেকগুলি ছাত্রীও আছে। তাহারাও তাহাদের পেলব হস্তে ছুরি ধরিয়া নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে মৃতদেহগুলি চিরিয়া ফাড়িয়া ফেলে।

যে টেবিলের সম্মুখে তাহারা বসিয়া, সেই সব টেবিল ঘিরিয়াই ছেলেদের ভীড় বেশী।

অকারণেই ঘোরাঘুরি করে।

মেয়েরা কৃপা করিয়া যদি কখনও একটু মিষ্ট হাসি বিতরণ করে, তাহাতেই উহারা খুশী।

কেহ হয়ত আসিয়া, সেই টেবিলে কার্য্যরত কোন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে, 'রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়েল নার্ভ'টা পেয়েছিস? যদিও ও নার্ভটা দেখিবার তাহার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই।

বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে, কোন এক বড় শহরের মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু, এখানেও বাঙালী ছাত্র অনেক আছে।

পাঁচ নম্বর টেবিলে কাজ করিতেছিল—অমর রায়। পার্শ্বে বসিয়া আর একটি ছেলে গুন গুন করিয়া বই পড়িতেছে, আর সে বই-এর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ছুরি চালাইয়া যাইতেছে। এই ছেলেটিই তাহার "পার্টনার।"

কিছুক্ষণ কাজ করিবার পর, হঠাৎ "পার্টনারের" বই পড়া বন্ধ হইয়া যাওয়াতে অমর মাথা না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—বাইসেপ্স মাস্‌ল্ সরিয়েছি, তারপর?

কিন্তু সাড়া না পাইয়া মাথা তুলিয়া দেখিল, 'পার্টনার' বই হাতে করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টির ভিতর অন্ততঃ এমন কেহ নাই, যাহাকে দেখিয়া বই পড়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

কিছুদিন হইতে অমর তাহার 'পার্টনারটি'র ভিতর এই বিষাদ-ভরা অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে না। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। 'পার্টনার' বলিয়াই এই দেশীয় লোক হওয়া সত্ত্বেও তাহার সহিত অমরের হৃদ্যতা একটু বেশী।

ডান হাতের কনুই দিয়া সামান্য আঘাত করিয়া বলিল—স্বর্গের ফুল-বিছান গলি-ঘুঁচি ছেড়ে, মর্ত্ত্যের কঠিন পথে নেমে এসো বন্ধু গোখলে। আমি যে এদিকে অপেক্ষায় বসে আছি।

বলিতে বলিতে হঠাৎ গোখলের ভিতর একটা অধীর চঞ্চলতার ভাব লক্ষ্য করিয়া অমর তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, সতের নম্বরের মিস্ প্যাটেল—এ কলেজের সেরা সুন্দরী—কাজ ছাড়িয়া তাহাদের টেবিলের দিকে আসিতেছে।

অমরের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এ কলেজে বোধ হয় এমন কোন ছেলে নাই, যাহার বুকে ঐ মেয়েটি ঝড়ের সৃষ্টি না করিয়াছে। তাহার সহিত দুটা কথা কহিতে পারিলে সকলে জীবন সার্থক বলিয়া মনে করে এবং সে ছুতা আবিস্কার করিতে ছেলেদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

মিস্ প্যাটেলের এ সত্যটি জানা আছে। তাই, মাঝে মাঝে ছেলেদের সহিত একটু-আধটু 'ফ্লার্ট' করিতে তাহার আপত্তি নাই। যদিও সে স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সবে কিছুদিন হইল, তাহার ভিতর এই নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে।

ছেলেরা তাই ভারি খুসী।

অমর এবং গোখলের সহিত তাহার আলাপ আছে। শুধু আলাপই নহে—অমর এই মেয়েটির জন্য নিজের বুকে সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছে, অত্যন্ত সংগোপনে। সেই সোনার সিংহাসনে বসিয়া মেয়েটি ধীরে ধীরে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে। অমরের স্বপ্নরাজ্যের পরিবাণী সে।

গোখলে কিন্তু তাহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসে না।

মিস্ প্যাটেল নিকটে আসিয়া, অমরকে হাসিভরা দৃষ্টি উপহার দিয়া বলিল—মাপ করুন, আপনার একটু সময় নষ্ট করতে এলুম।

সেও গোখলের প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না।

অমর বলিল—স্বচ্ছন্দে। কি চাই বলুন!

আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া মিস্ প্যাটেল বলিল—"ব্র্যাকিয়েল প্লেক্সাসের' রিলেশনটা আমাকে দয়া করে বুঝিয়ে দিন না। কিচ্ছু পাচ্ছি না।

এই মেয়েটি যেমনই কলেজের সেরা সুন্দরী, তেমনি ছাত্রী হিসাবেও প্রথম। সে তাহার নিকট 'ব্র্যাকিয়েল প্লেক্সাস' বুঝিয়া লইতে আসিয়াছে! অমর কৃতার্থ হইয়া গেল। মাথা তুলিয়া দেখিল সে হলের প্রায় প্রত্যেক ছেলের দৃষ্টি তাহাদের প্রতি নিবদ্ধ। যোড়া যোড়া চোখ উহাদের যেন গিলিয়া খাইতেছে।

পুরুষের পৌরুষের গর্ব্ব এইসব ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়াইয়া

নায়। মনে মনে ভাবি খুসী হইয়া সে মিস্ প্যাটেলের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিল।

কিন্তু মিস্ প্যাটেল ঠিক এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই সেখানে যায় নাই।

—আপনি চমৎকার 'ডিসেকশন্' করেন।..কি করে ঐ সব সূক্ষ্ম 'নার্ভ' গুলো 'ট্রেস্' করেন বলুন ত? শিখিয়ে দেবেন?

অমর হাসিয়া বলিল—আপনাকে কি আর আমি শেখাতে পারি? আপনি নিজে যে আমাদের অনেক ·····

—ইস্, মিছে কথা। ঐ দেখুন না গিয়ে আমার 'ডিসেকশন্' করবার ছিরি। ক্লামজি।

তারপর, গ্রীবা বাঁকাইয়া কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া ছোট্ট খুকিটির মত আবদারের সুরে বলিল—দিন না শিখিয়ে।

কী সুন্দর! ওর চোখ দুটো কিসের স্বপ্নে ভরা!

দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অমর বলিল—আপনাকে শেখাবার মত শক্তি আমার নেই।

—আপনি বড় বিনয়ী।

বলিয়া ছোট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—সবাই যদি আপনার মত ভাল মানুষ হত, দুনিয়ায় তাহলে কোন জ্বালা কোন দুঃখ থাকত না।

—মিঃ রয়!

বলুন।

একটু দ্বিধা করিয়া, মুখে রক্তিমাভা ফুটাইয়া সে প্রশ্ন করিল—আপনার বন্ধুটিকে আজ দুদিন হল দেখছিনি যে?

কথা শুনিয়াই অমরের বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কাহার সম্বন্ধে সে এ প্রশ্ন তাহা সে জানে। তবু জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ বন্ধু?

—আপনার নিকটতম বন্ধুর কথাই জিজ্ঞাসা করছি। কোন ক্লাসেই আসেন না ত!

—ও, মুখার্জ্জি?...হ্যাঁ, সে দুদিন কলেজে আসেনি।

—কেন?...অসুখ-বিসুখ করেনি ত? তাহার কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠা এবং ভয়ে ভরা।

—না, ভালই আছে।

—কলেজে আসেন না কেন তাহ'লে?

অমরের বুকের ভিতর এতক্ষণে যে আনন্দটুকু সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে উবিয়া যাইতে লাগিল। জবাব দিল—ঈশ্বর জানেন আর সে-ই জানে।

—আচ্ছা, আপনি তাঁর সঙ্গে এক ঘরেই থাকেন—না?

—হ্যাঁ।

—তাহলে, কেন তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলেন না যে, এ ভাবে ক্লাসে কামাই করা ভাল নয়। এতে যে তাঁরই ক্ষতি হয়, তা কি তিনি বোঝেন না?...আজ তাঁকে বলবেন যে, ঘরে বসে বসে খালি 'ক্রম' করলে এগজামিনে পাশ করা চলে না; আর তাতে অন্য কারুরই কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।...বলবেন কিন্তু। আমি যে বলেছি, তা' বলবেন না যেন! কেমন?

—বলব।

মিস প্যাটেল যেন নিজের মনেই বলিল—এমন লোক আর দুটি দেখিনি। ঘরে বসে বসে কি যে ভাবেন! আচ্ছা, আপনাকে কখনও কিছু বলেন না

সেই ত ললিতের দোষ। অমর যে তাহার মনের গোপন কথা বাহির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু, টলাইতে পারে নাই।

—ওঁর মেডিক্যাল কলেজে পড়তে আসা ভুল হয়েছে। তার চেয়ে, লোটা কম্বল নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করলে ঠিক মানাত

বটে, বটে, এতদূর অগ্রসর হইয়াছে! অমর জানে, এই মেয়েটি তাহার সহপাঠী বন্ধু ললিতের প্রতি আসক্তা। কিন্তু, সে আসক্তি যে এতটা গভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। অথচ, রাস্কেলটা কিছুতেই একথা স্বীকার করে না!

তাহার চোখের সম্মুখে সব যেন ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল।

মিস্ প্যাটেল তখন নিজের টেবিলে ফিরিয়া—গিয়াছে।

অস্ফুট কণ্ঠে অমর ললিতের উদ্দেশ্যে বলিয়া ফেলিল—নাকি ব্রুট্।

গোখলে তখনও মাথা নীচু করিয়া বই পড়িতেছিল। ইহাদের কথাবার্তা তাহার বোধহয় কর্ণেও প্রবেশ করে নাই।

* * *

পরদিন। ললিত এবং গোখলে কলেজের 'কমন রুমে' বসিয়া গল্প করিতেছিল। ক্লাসের তখনও পঁচিশ মিনিট বাকি। এমনি সময়ে মিস প্যাটেল সারা ঘরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ললিতকে দেখিয়া তাহার আনন্দ যেন উথলিয়া পড়িতেছিল। মুখে-চোখে জ্যোতি ফুটাইয়া বলিল—এই যে, গুড্-মর্ণিং, মিঃ মুখার্জ্জি, আজ কলেজের কী সৌভাগ্য। আপনার চরণধূলি পেয়ে সে ধন্য হযে যাবে। তেমন কোন 'ইম্‌পর্টেণ্ট্' ক্লাস ত নেই, আজও না এলে পারতেন।

এ মেয়েটি তাহাকে বুঝি একেবারে পাগল না করিয়া ছাড়িবে না। কেন দেখা হইলেই ছুটিয়া আসে? কেন এত দরদ দেখায়? কলেজে না আসিলে কেন অভিমান করে?

অথচ, ললিত ভালভাবেই জানে যে, ইহার অন্তর অমরের প্রতি ভালবাসায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে; অমরও ইহাকে ভালবাসে।

তবে? কিসের এ অভিমান?

মাথা নীচু করিয়া বলিল—কাঁহাতক্ আর ক্লাস এ্যাটেণ্ড্ করব, বলুন।...ভাল লাগে না।

—হুঁ, এখন ভাল লাগে বুঝি ঘরে বসে 'ব্রুড্' করতে?

'ব্রুড্' করা ছাড়া আমার আর কি আছে, বলুন।

মিস্ প্যাটেল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, রাগ করিয়া বলিল—আপনি আজই বেরিয়ে পড়ুন—গায়ে ছাই মেখে, গেরুয়া পরে, হিমালয়ে গিয়ে ধ্যান করুন গিয়ে। এ সব আপনার পোষাবে না।

মেয়েটির সারা অঙ্গ ঘেরা হেঁয়ালি। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার!

এ দুইদিন ললিত অকারণেই বাড়ীতে বসিয়া ছিল না। শরীর ভাল নাই, সর্দ্দি হইয়াছে। রুমালে নাক চাপা দিয়া হাঁচিতেই মিস্ প্যাটেল শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ওকি, সর্দ্দি হয়েছে বুঝি?

—সামান্য।...সেই জন্যেই ত আসিনি দুদিন।

—তাহলে আজই বা এলেন কেন? শরীর ভাল নেই, অথচ ক্লাস এ্যাটেণ্ড না করলে চলবে না? এদিকে কোন ক্লাসেই ত আসেন না।

—ও কিছু নয়, সেরে গেছে।

কিন্তু মেয়েটি বলিতে লাগিল—কিছু নয় কি রকম?—না, তা' হবে না, বাড়ী ফিরে যান। 'রেষ্ট্' নেওয়া উচিত। চারিদিকে কেমন 'ইনফ্লুয়েঞ্জা,' 'নিউমোনিয়া' হচ্ছে দেখছেন ত!...যান, আর ক্লাসে গিয়ে কাজ নেই।

ললিত হাসিবে, কি কাঁদিবে, বুঝিয়া উঠিতেছিল না। মুখ চোখ লাল করিয়া সে ঘন ঘন একবার মিস্ প্যাটেলের দিকে, এবং একবার গোখলের দিকে চাহিতে লাগিল।

গোখলে তখন 'হাইজিয়া'তে প্রবন্ধ পড়িতে ব্যস্ত।

—আপনার বন্ধুকে দেখছিনি কেন, মিঃ মুখার্জ্জি? সারা কলেজময় খুঁজে বেড়িয়েছি। আসেন নি বুঝি?

স্বর্গের নন্দন কানন হইতে ললিতের পা পিছলাইল।

এইত! এতক্ষণ কেন যে এ প্রশ্ন হয় নাই, তাহা ভাবিয়াই সে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল। তাহার স্বপ্ন-প্রাসাদ এক মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া চৌচীর হইয়া গেল। হায়রে, সে কি জানে না, কেন দেখা হইলেই মেয়েটি ছুটিয়া আসে? সে কি বোঝেনা, কিসের জন্য এতখানি আগ্রহ, এত উৎকণ্ঠা?

ও চায়, ললিত অমর সম্বন্ধে কিছু বলুক। নিজের সম্বন্ধে অমর কিছু বলে কিনা, এবং কি বলে, কৌশল করিয়া সমস্তই সে ললিতের নিকট হইতে জানিয়া লয়। এ কথা এতক্ষণ সে ভুলিয়া গিয়াছিল কেমন করিয়া?

এ দরদের কণামাত্র যদি সত্যই তাহার জন্য হইত! সে যেন ইহাদের দুইজনের প্রেমের পথের সোনার সিঁড়ি। তাহার বুকখানা পায়ে দলিয়া ইহারা ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে।

মিথ্যা কথা বলিল—অমরের কথা বলছেন? তারও আজ শরীর ভাল নেই—জ্বর আসবে বোধ হয়।

—জ্বর?

চমকিয়া এ প্রশ্ন করিয়া মিস্ প্যাটেল কিছুক্ষণ ললিতের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। শেষে, ধীরে ধীরে তাহার মস্তক বুকের উপর নুইয়া আসিল।

বলিল—তাই আজ সারাদিন দেখতে পাইনি!

কোন উচ্ছ্বাস, কোন বাড়াবাড়ি নাই। ললিতের হাঁচি শুনিয়া যাহার মুখে খৈ ফুটিয়াছিল, অমরের জ্বরের কথা শুনিয়া সে একেবারে নীরব।

কিন্তু, ললিত 'সাইকোলজি' পড়িয়াছে। এ নীরবতার অর্থ বুঝিতে তাহাকে বেগ পাইতে হইল না।

মিস প্যাটেল সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি তা'হলে বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন ত? দয়া করে আমার একটা কাজ করবেন?

—এসেছি যখন, ক্লাসটা এ্যাটেণ্ড করেই যাই। কি কাজ বলুন, ক্লাসের পর…

মিস প্যাটেল যেন হুকুম করিয়া বলিল—না, ক্লাস এ্যাটেণ্ড করতে হবে না। বাড়ী যান এখুনি।

বুকের ভিতর খচ খচ করিতে থাকিলেও, ললিত মনে মনে ভারি খুশী হইয়া উঠিল। এ কিসের অধিকারের দাবী? ঐ ক্ষুদ্র মেয়েটির কেন তার উপর এতখানি জোর?

হাসিমুখে বলিল—আপনার কি কাজ বলুন না।

—মিঃ রয়কে একখানা চিঠি দেব—তাঁকে দিয়ে দেবেন।

এত ভণিতার অর্থ এতক্ষণে পরিষ্কার হইয়া গেল। এই জন্যই তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার এত তাড়া! এই জন্যই এতখানি ভুয়ো উৎকণ্ঠা! হায় নারী!

ললিতের সারা অন্তর বিষাইয়া উঠিল। না, সে কিছুতেই যাইবে না। রাগ করে, করুক—বহিয়া গেল! তাহাকে হংসদূত ঠাওরাইল নাকি?

বলিল—ও, তা-ই বলুন! তা গোখলে এখুনি মুখার্জ্জীকে দেখতে যাবে বলছিল, তাকেই দিয়ে দিন না চিঠিখানা। এ ক্লাসটা আমি 'মিস' করতে চাই না।

ভাবিয়াছিল, এই সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা না করাতে মেয়েটি হয়ত দুঃখিত হইবে। কিন্তু মুখ দিয়া এ কথা বাহির হইতে না হইতে উহার দুই চোখে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরাইয়া গেল; এবং এতক্ষণ যাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহে নাই, সেই গোখলকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে বলিল—সত্যি, মিঃ গোখলে? Will you please, oblige me?

গোখলে তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল—নিশ্চয়ই! চিঠি দিন। 'নোট বুক'-এর পাতায় চিঠি লিখিয়া, গোখলের হাতে দিয়া মিস প্যাটেল বলিল—অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট দিলুম।

—Not at all, not at all বলিতে বলিতে গোখলে চিঠি লইয়া সেই সময়েই বাহির হইয়া গেল।

* * * *

সেইদিন এ্যানাটমি লেক্‌চার থিয়েটারে প্রফেসার লেক্‌চার দিতেছিলেন। ছাত্রদের ভিতর কেহ দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া ঝিমাইতেছে; কেহ সম্মুখের বেঞ্চে উপবিষ্টা ছাত্রীদের ভিতর কাহার খোঁপাটা বড়, কাহার চুলের বেণী কোথায় গিয়া ঝুলিতেছে, এবং কাহার 'প্রোফাইল্' দেখিতে কিরূপ, তাহা লইয়া বিষম তর্ক বাধাইয়া তুলিয়াছে। কেহ আবার সম্মুখের 'ডেস্ক'-এ কুঁদিয়া কুঁদিয়া সুন্দর করিয়া লিখিতেছে—'ই-ন্দি-রা'।

অমর মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া বলিল—যতই তর্ক কর, আমার ষোল আনা বিশ্বাস যে, মিস প্যাটেল তোমাকেই 'প্রেফার' করে। তার একাধিক প্রমাণ পেয়েছি।

ললিত পাশেই বসিয়াছিল; বিরক্তভাবে জবাব দিল—ফের আবার সেই একই কথা! তোমাকে বোঝান দেখছি ভগবানের অসাধ্য কাজ।…তুমি ত একাধিক প্রমাণ পেয়েছ, আর আমি যে হাজার হাজার প্রমাণ দিলুম, তার কি হল? She is head and ears in love with you—তুমি যা-ই…

অমর বাধা দিল। এইমাত্র যাহা লইয়া এত কথা কাটাকাটি হইয়াছে, পুনরায় সে তর্ক তুলিয়া লাভ নাই। এ এক মহা ঘোরাল ব্যাপার। অমর ভাবে মিস প্যাটেল ললিতকে ভালবাসে; ললিতেরও দৃঢ় ধারণা যে, সে অমরের জন্য পাগল। অথচ, দুইজনেই মেয়েটার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে। দুই জনেই পরস্পরের কথা শুনিয়া মনে মনে খুশী হইয়া ওঠে—আহা, সত্যই যদি তাহা হইত!

শেষে অমর দুঃখিত ভাবে বলিল—নিজেকে আমি তোমার বন্ধু বলেই জানতুম, ললিত। আমার কাছে তুমি ব্যাপারটা যে এমন করে লুকোবে, তা' ভাবিনি।

ললিতের এইবার রাগ দেখা দিতেছিল। অমরের এমন

ন্যাকা সাজিবার কি প্রয়োজন? সে কি জানিয়া-শুনিয়া এ রসিকতা করিতেছে? ললিত যে চাকবাবুর 'হাইফেন'এর মতই ইহাদের দুইজনের ভিতর বিরাজ করিতেছে, তাহা কি সে জানে না?

রাগ করিয়া শুনাইয়া দিল—তোমার সঙ্গে আর তর্ক করতে চাই না আমার শেষ কথা যদি শোন, তা' হলে বলছি যে, তার প্রতি আমার কিছুমাত্র 'ইণ্টারেষ্ট' নেই। I would rather hate her, who tries to use me as a...as a.....

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

অমর নিতান্ত বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। ললিতের কথায় তাহার মনে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। মিস প্যাটেল কি সত্যই তাহার জন্য এতটা আগ্রহান্বিতা? সত্যই কি সে ললিতের কাছে তাহার সম্বন্ধে এত কথা জানিতে আসে?

কিন্তু ইহা যে অসম্ভব! মিস প্যাটেলের ব্যবহারে যে ...নাঃ, ইহা শুধু ললিতের চালাকি। তাহাকে মূর্খ প্রমাণ করিয়া মজা দেখিতে চাহে। নহিলে, নিজের সম্বন্ধে সে একেবারে নীরব কেন? কেন এত বড় মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিল যে, সে মিস প্যাটেলকে ঘৃণা করে?

উঃ, ললিতটা এত বড় রাস্কেল!

* * *

সেইদিন, গোখলে অমরের ঘরে না গিয়া নিজের ঘরেই ফিরিয়া গেল। অমরের অসুখ বিসুখ কিছু হয় নাই, এবং ললিত যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, তাহা সে জানে। কাপড় ছাড়িয়া, সে মিস্ প্যাটেলের চিঠিখানা পড়িতে বসিল—এইমাত্র অমরের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছে। এই জন্যই সারাদিন খুঁজিয়াও তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই। যদি জ্বরই আসে, তাহা হইলে অমর যেন অবশ্য হাঁসপাতালে যায়। পরিশেষে, শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়া, সে যে চিরদিন তাহারই মিস প্যাটেল,—সে কথাও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া চিঠি শেষ করিয়াছে।

নিজের অলক্ষিতেই গোখলের মুখ লাল হইয়া উঠিতেছিল। ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে লইতে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

* * *

আজ 'কলেজ ডে'র উৎসব রজনী।

ছাত্র-ছাত্রী, প্রফেসার এবং প্রিন্সিপাল, হাসপাতালের নার্স এবং সিষ্টারেরা সকলেই উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। কলেজের বাড়ী অসংখ্য আলোর মালায় এবং নানাবর্ণের পতাকায় অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। কলেজ কম্পাউণ্ডের এক পার্শ্বে বিরাট চাঁদোয়া খাটাইয়া ভিতরে 'ষ্টেজ' বাঁধা হইয়াছে। চারিটি বিভিন্ন ভাষায় চারিটি ফার্সের অভিনয় হইবে—তাহাতে নার্স এবং ছাত্রীরাও যোগ দিয়াছে। ইহা ব্যতীত, 'গর্বা' নৃত্য, 'হাওয়াইয়ান ডান্স,' ম্যাজিক, গান, এবং সিনেমাও আছে। লনের এক দিকে 'ডিনার'-এর জন্য সারি সারি টেবিল এবং চেয়ার পাতা। মাঝখানের মঞ্চের উপর ব্যাণ্ড বাজিতেছে। তালে তালে সকলে খাইবে।

সবাই সাজে ব্যস্ত। আনন্দের সীমা নাই।

বৎসরান্তে এই একটি দিনের জন্য সকলে উদগ্রীব হইয়া বসিয়া থাকে। কারণ, আজিকার রাত্রে কোন নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি নাই। ছেলেরা নির্ভয়ে প্রফেসার এবং প্রিন্সিপালের সম্মুখে নার্সদের সহিত কথা-বার্তা কহিতে পারে। ছাত্রীরাও উৎসবের বন্যায় গা ভাসাইয়া দেয়।

তাই, এ-কোণে সে-কোণে, ঝোপ-ঝাড়ে, যোড়া যোড়া ছেলেমেয়ের আজ ছড়াছড়ি।

* * * *

কথা কহিবার ছুতা আবিষ্কার করিতে আজ আর বেগ পাইতে হয় না।

—সেকেণ্ড সীন-এর সকলে তৈরি হয়ে গেলে, তবে যেন 'ড্রপ' তোলা হয়; নইলে ভারি গণ্ডগোল হবে।... তোমাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে—ঠিক পরীর মত...চার্মিং... ওয়াণ্ডারফুল...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর সব ঠিক আছে ড্রেসটা সেলাই করেছ?

—হ্যাঁ করেছি। ডিনারের সময়ে আমার পাশে বোসো কিন্তু।

* * * *

একটি ছেলে রঙীন কাগজের খোঁজে, লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া আলোর 'সুইচ' টিপিয়াই আবার নিভাইয়া দিল। বলিল—এক্সকিউজ মী—ঐ কাগজের তাড়াটা চাই।

সঙ্গে সঙ্গে ধপ করিয়া কাগজগুলি তাহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। ছেলেটি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

অমর এবং ললিতের ভিতর মহা তর্ক বাধিয়া গিয়াছে, কাহার সাহস বেশী। কে আজ নার্স উডকে কলেজের ছাতে; চাঁদের আলোয়, মুক্ত বায়ু সেবন করাইতে লইয়া যাইতে পারে।

অমর বুক ফুলাইয়া বলিতেছে, সে আর এমন শক্ত কাজ কিসে? ইচ্ছা করিলে এখনি সে···

কিন্তু, ললিত তাহার সৎসাহসের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছে যে, উহা অমরের কাজ নহে, বরং সে চেষ্টা করিলে হইতে পারে।

নার্স উড এ হাসপাতালে নূতন আসিয়াছে। রাসভারি মানুষ। কেহ তাহার কাছে ঘেঁসিতে এখনও সাহস পায় না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পরও যখন কোন মিমাংসা হইল না, তখন অমর সহসা বলিল—আচ্ছা আয়, আজ পরীক্ষা করে দেখা যাক—কার কত সাহস।

—বেশ, এসো কি করতে চাও?

অমর কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইল। শেষে বলিল—হ্যাঁ হয়েছে। আজ ঠিক রাত বারোটার সময়ে 'ডিসেকশন হল'এ গিয়ে, দশ নম্বর 'বডি'র, ডান হাতের একটা আঙুল কেটে আনতে হবে। তারপর, আমি গিয়ে বাঁ হাতের আর একটা আঙুল কেটে আনব। পাঁচ মিনিট করে সময় থাকবে। বল, রাজি?

ঠোঁট উল্টাইয়া তাচ্ছীল্যের স্বরে ললিত বলিল—হুঁঃ, ভারি কাজ হল!

বেশ, আমি তোয়ের।

মেডিক্যাল কলেজের ছেলেদের ভিতর এ বাজিটা প্রায়ই ধরা হয়। কিন্তু তাহা কখনও কাজে পরিণত হয় না।

গোখলে এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। হঠাৎ বলিল—আচ্ছা আমি পাঁচ টাকার মিষ্টি খাওয়াব। আঙুল কেটে এনে আমাকে দেখাতে হবে।

ব্যাপারটা এবার লোভনীয়ও হইয়া দাঁড়াইল।

অমর এবং ললিত মহা উৎসাহে হাতে হাতে চাপড়াইয়া বলিল—রাইট।

উৎসবের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। ষ্টেজের উপর এখানকার শ্রেষ্ঠ গায়কদের একজন বিকট ভাবে মুখব্যাদান করিয়া একটা কান তানপুরায় ঢাকিয়া অন্য কানে হাত রাখিয়া তান ছাড়িতেছেন। গানটা যে কি, তাহা এখনও বোঝা যায় নাই। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ শুধু গগনভেদী—'আ—আ—আ—আ' শোনা যাইতেছে।

ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল।

ললিত অমরের হাত টিপিয়া বলিল—ঐ শোন্, বারোটা বাজছে। এইবারে কেমন?

অমর উঠিয়া দাঁড়াইল। গোখলের এতক্ষণ দেখা পাওয়া যায় নাই। হঠাৎ সেও আসিয়া উপস্থিত হইতে, জানাইল যে, ঘর হইতে 'ছুরি' লইয়া তাহারা 'ডিসেকশন হল'এ চলিল; সে যেন সাক্ষী হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

চারতলায় উঠিয়া, 'হল'এর কাছে আসিয়া অমর বলিল—আমি এইখানে রইলুম। তুমি এই দোর দিয়ে ঢুকে, নিজের কাজ করে, ঐ পেছন দিককার দোর দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ঠিক পাঁচ মিনিটের পর আমি ঢুকব; তার আগেই তোমার 'হল' ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া চাই। তা না হলে বাজি হেরে যাবে।

ললিত বলিল—রাইট।

অন্ধকার ঘর। শুধু ও পাশের জানালাগুলি দিয়া চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ভাসিয়া আসিতেছে। সেই আলোতেই ঘরের ভিতরকার প্রায় সব জিনিষই আবছায়ার মত দেখা যায়।

সারি সারি মৃত দেহ।

হাত, পা, মাথা, হাড়, মাংস এবং কঙ্কালের যেন বাজার বসিয়াছে।

পচা বোটকা গন্ধ।

অত বড় 'হল'এ জ্যান্ত মানুষ আর কেহ নাই।

এক কোণের কঙ্কালটা যেন হাঁ করিয়া হাসিতেছে।

অন্যটা, মুখে 'চক' লইয়া আরামে সিগ্রেট টানিতেছে। ঐ মেয়েটা, তখনও যেন বলিতেছে—'শোন, শোন···'

দিনের বেলায়ই এ ঘরে আসিলে অঙ্গ শিহরিয়া ওঠে।

কিন্তু, ললিত কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া দশ নম্বর টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

নারী দেহ। সেই দিনই আনা হইয়াছে। তাই, তাহার হাত, পা, এখনও অঙ্গচ্যুত করা হয় নাই।

বড় বড় জট-পাকান চুল

চোখের মণি দুটি উর্দ্ধমুখী হইয়া আছে।

হাঁ করা মুখ।

চক্ষের নিমেষে, ছুরি বাহির করিয়া ললিত উহার দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি কাটিয়া লইল।

ঘড়ি দেখিল, তিন মিনিটও হয় নাই।

কাজ শেষ হইয়াছে; তাই ঐদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য দরজায় হাত রাখিতেই সহসা 'হল' এর দক্ষিণ কোণ হইতে শোনা গেল—'সুৎ,-সুৎ-সুৎ'

এ দেশে দূর হইতে কাহাকেও ডাকিতে হইলে, লোকে ঐ রূপ শব্দ করিয়া থাকে।

ললিত থমকিয়া দাঁড়াইল। অমর ডাকিতেছে?

কিন্তু অমরের কোন চিহ্নই সেখানে নাই।

শুনিতে ভুল হইয়াছে ভাবিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইতেই আবার সেই শব্দ-'সুৎ-সুৎ'। এবার আরও পরিষ্কার এবং 'হল'-এর ভিতর হইতেই কেহ ডাকিতেছে।

ললিত সাহসী পুরুষ হইলেও, এমনি সময়ে এ স্থানে ঐ শব্দ শুনিয়া তাহার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল।

সাহসে বুক বাঁধিয়া হাঁকিল—কে?

কিন্তু, তাহার কণ্ঠস্বর বোধহয় 'হল' ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারে নাই।

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ কোণের কঙ্কালটা নড়িয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখা গেল, যেন সে হাত তুলিয়া ডাকিতেছে।

রাত্রি বারোটা। 'ডিসেক্শন্ হল'। চতুর্দ্দিকে প্রেত-পুরীর বাসিন্দারা।

আবার হাত নড়িয়া উঠিল। এবং যেন ছাত হইতে অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—এদিকে এসো।

সর্ব্বনাশ। এ সময়ে এখানে আসিয়া ললিত ভাল করে নাই। হয়ত সত্যই কিছু আছে। হয়ত ওরা একেবারে ভুয়ো জিনিষ নহে।

—শুনে যাও; ভয় নেই।

এবং ললিত লক্ষ্য করিল, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার পা' দুইটাকে কে যেন সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

কঙ্কালটি 'হুক্'-এর সহিত তেমনি ভাবেই ঝুলিতেছে।

—ব্যস, আর এগিয়ো না, ঐখেনে দাঁড়াও···আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

যেন কোন্ উর্দ্ধলোক হইতে কথাগুলি ভাসিয়া আসিতেছে। ললিত মন্ত্রমুগ্ধের মতই জিজ্ঞাসা করিল—কি অনুরোধ?...কে তুমি?

—কেন ঐ মেয়েটার আঙ্গুল কেটে নিয়ে যাচ্ছ, জান?

ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কোন প্রকারে ললিত জবাব দিল—বাজি রাখা হয়েছে বলে।

—হঠাৎ এ বাজির কথা কেন তোমাদের মাথায় এল, বলতে পার?

—আমার মাথায় আসেনি।···এ সব ঐ অমরের······

শূন্য হইতে হাসির শব্দ শোনা গেল।

—দোষের কিছু হয়নি।···শোন বলি,—যার হাত থেকে আঙ্গুল কেটে নিয়ে এলে, সে আমার স্ত্রী। একবার ছেলের অসুখ হয়েছিল; তা'তে সে গণপতির পায়ে মানত করে যে, ছেলেকে সারিয়ে দিলে নিজের ডান হাতের আঙ্গুল কেটে রক্ত দেবে। ছেলে ভাল হল; কিন্তু সে রক্ত দিতে পারলে না।···সেই পাপে ছেলে ত মলই, আমি এই 'হুক্'-এর সঙ্গে ঝুলছি, আর ওর নিজের দেহ তোমাদের ছুরিতে কেটে টুক্রো টুক্রো হতে বসেছে।···আজ ও এঘরে এসেছে; তাই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে তোমাদের ডেকে এনেছি। আঙুলটা কাল গণপতির নাম নিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ো—ওর আত্মার শান্তি হবে।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ললিত কথাগুলি শুনিতেছিল।

আর বুঝি সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, সংজ্ঞা লোপ হইতে আর দেরী নাই। পরদিনই এ কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বলিল—এবার যাই ?

—দাঁড়াও...আমিও তোমার একটা উপকার করতে চাই।

—কি ?

—তুমি ভালবেসেছ—না ?

—হ্যাঁ বেসেছি।

—বেশ, তোমার মনে যা' নিয়ে দ্বন্দ্ব বেধেছে, সেই সঠিক খবরটা দিতে চাই।

...মিস্ প্যাটেল তোমাকেই ভালবাসে। অন্য যা' কিছু বলে বা করে, তা' শুধু তোমাকে চটিয়ে পরীক্ষা করবার জন্যে। পিছিয়ে যেয়ো না।

ইতোমধ্যে বাহিরে অমরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ওয়ান মিনিট্ মোর—'

কঙ্কাল আবার বলিল—তার সঙ্গে যদি মিলিত হতে চাও, তাহ'লে আর ঠিক আধঘণ্টার পর তোমাদের কলেজের পেছনকার যে ঝোপটাতে বেঞ্চ পাতা আছে—সেখানে তার দেখা পাবে। এইবার তুমি যেতে পার।

* * *

ললিতের মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল। গায়ের জামা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। পায়ের কম্পন তখনও থামে নাই। যেন কোন্ স্বপ্নপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। মনের ভিতর আলোড়ন তুলিয়া বার বার বাজিতে লাগিল—মিস্ প্যাটেল তাহাকেই ভালবাসে। আজ তাহাদের মিলনের রাত্রি।

উৎসবের আসর তখনও জম্ জম্ করিতেছে।

কিন্তু সেদিকে ললিতের লক্ষ্য ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও গোখলের দেখা পাওয়া যায় নাই। অজুলটা আর তাহাকে দেখান গেল না। কারণ এদিকে আধঘণ্টা অতীত হইয়া যায়।

তাই, সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া সে সেই 'বেঞ্চ পাতা ঝোপে'র দিকে অগ্রসর হইল।

স্থানটা ঝোপে-ঝাড়ে জঙ্গলাকীর্ণ। পুরাতন বেঞ্চ পাতা আছে।

কেহ সেদিকে যায় না।

দুরু দুরু বুকে অতি সন্তর্পণে ডাল পালা সরাইয়া বেঞ্চির পিছন হইতে উঁকি মারিয়া, চাঁদের আলোয় প্রথমেই যাহা তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে সে সহসা যেন পাথরের মত অচল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

বিস্ময়ে চোখ দুইটা বুঝি ঠিকরাইয়া বাহির হইতে চাহে। একেবারে চোখের সম্মুখে, বেঞ্চিতে বসিয়া আছে গোখলে এবং তাহার বুকের ভিতর মাথা গুঁজিয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িতে পড়িতে মিস্ প্যাটেল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—মাপ কর,...বল একবার যে, মাপ করেছ ; এ ভাবে সত্যিই আর পেরে উঠছি না।...আমি হার মেনেছি, সত্যি হার মেনেছি।

গোখলে তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—আমি কিন্তু প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম—কেন হঠাৎ তোমার মধ্যে এ পরিবর্তন, কেন হঠাৎ এমন করে সবার সঙ্গে ভাব করতে সুরু করে দিয়েছিলে।...সর্ব্বদা আমার চোখের সামনে কত ভাবেই না 'জেলাস্' করে তোলবার চেষ্টা করেছ ; কিন্তু জিততে পারনি।...যাক, এখন বুঝতে পেরেছ ত যে, তুমি ছাড়া আমার.........

মিস্ প্যাটেল কাতরকণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ, বুঝেছি।...ভুল শুনেছিলুম ; কে আমাকে বলেছিল যে, তুমি নার্স রে'র সঙ্গে...তাই ত আমার এ অভিমান হয়েছিল, দেখাতে চেয়েছিলুম যে, আমিও কেয়ার করি না।...সে যাক, এবারে মাপ করলে ত ? সত্যিই আর পারছি না। ব্যাপারটা খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওরা দুজনেই ভাবে যে, আমি—

গোখলে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, ললিত ভাবে যে তোমার 'হীরো' অমর ; আর অমরও ভাবে যে তুমি ললিতকে ভালবেসেছ। অথচ দুই জনেই একেবারে এক গলা জলে ডুবে আছে। কিন্তু আমি জানি, তুমি চিরদিন আমার আছ চিরদিনই থাকবে।

একটু থামিয়া বলিল—এতদিনের অভিমান সাঙ্গ হবার পর আজ আমাদের মিলনের সাক্ষী রইলেন ঐ চন্দ্রমা, ঐ আকাশভরা অসংখ্য তারা, আর আর আরো দুজন বন্ধু। এঁদের আমি অনেক কৌশলে আজ এখানে উপস্থিত রাখতে পেরেছি।

বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া ডাকিল—কৈ এবার বেরিয়ে এসো তোমরা।

ললিতের মনে হইতেছিল, তাহার পায়ের তলা হইতে মাটি যেন ধ্বসিয়া যাইতেছে।

সহসা, তাহার পাশেই ঝোপের ভিতর হইতে মাথা বাড়াইয়া অমর মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া বলিয়া উঠিল—কংগ্র্যাচুলেশন্স গোখলে!

শ্রীবিমল সেন

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন কণ্ঠ-সঙ্গীতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেরূপ যন্ত্র সঙ্গীত এবং নৃত্যকলারও যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। সেজন্য গত বৎসরের ন্যায় এবারেও যন্ত্র-সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সাধারণের যথেষ্ট উপভোগ্য হইয়াছিল।

যন্ত্র সঙ্গীত

স্বরোদে আলাউদ্দীন সাহেবের যত নাম এত বোধহয় খুব কম যন্ত্রীরই আছে। ইনি শুধু স্বরোদে গুণী তা নন, অন্যান্য যন্ত্রেও ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। ইহার বাড়ী ত্রিপুরা, এবং বাল্যে প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া হিন্দু ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরে রামপুরের বিখ্যাত স্বরোদী আহম্মদআলী খাঁ এবং উজির খাঁর নিকট শিক্ষা করেন। ইনি এখন মাইহার ষ্টেটে নিযুক্ত আছেন এবং ইহার সৃষ্ট মাইহার ব্যাণ্ড ভারতপ্রসিদ্ধ। এলাহাবাদে ইহার তোড়ীর আলাপ এবং গৎ খুবই ভাল হইয়াছিল।

হাফেজ আলি সাহেব নান্নে সাহেবের পুত্র। স্বরোদে ইঁহারও যথেষ্ট সুনাম আছে। ইনিও রামপুরের প্রসিদ্ধ বীণকার উজির খাঁ সাহেবের নিকট স্বরোদ শিক্ষা করেন। ইঁহার হাত সুমিষ্ট। ইঁহার কেদারা এবং দুর্গার আলাপ ও গৎ খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ভারতের অন্যতম পাখোয়াজী পর্ব্বত সিং ইঁহার সহিত সঙ্গত করিয়াছিলেন।

পাতিয়ালা দরবারের সভাবাদক আবদুল আজিজ খাঁ সাহেবের নাম গুণী সমাজে এবং যন্ত্রীদের নিকট সুপরিচিত। বিচিত্র বীণায় দুর্গার আলাপ ও গৎ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

এনায়েৎ খাঁ সাহেব গত বৎসরের ন্যায় এবারেও অসুস্থ থাকায় খুব জমাইতে না পারিলেও তাঁহার গুণের তারিফ না করিয়া পারা যায় না। ইনি ভারতপ্রসিদ্ধ সেতারী ইমদাদ খাঁ সাহেবের পুত্র এবং কলিকাতায় সুপরিচিত। ইনি ইমন্ এবং খাম্বাজের ঠুমরী বাজাইয়াছিলেন।

সঙ্গীউল্লা সাহেবের সেতারে লছমী তোড়ী খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। ইনি এখন কলিকাতায় নাটোরের মহারাজার নিকট আছেন এবং একজন গুণী ওস্তাদ।

শ্রীযুক্ত শ্যামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতার একজন উদীয়মান স্বরোদী। ইনি সম্ভ্রান্ত বংশজাত এবং প্রসিদ্ধ তবলাবাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের (নাটুবাবুর) কনিষ্ঠ সহোদর এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের খুল্লতাত ভ্রাতা। ইনি প্রসিদ্ধ যন্ত্রী করমতুল্লা এবং কুকুভ খাঁ সাহেবের ছাত্র খড়দাহ নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বসুর ছাত্র এবং তাঁহার নিকট ৫ বৎসর বয়স হইতে স্বরোদ শিক্ষা করিতেছেন। ২৩ বৎসর বয়সে এই প্রথম এলাহাবাদ সম্মিলনে যোগদান করিলেও ইঁহার বাদ্য খুবই উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। প্রথম দিন জিলা ও দ্বিতীয়দিন পাহাড়ী বাজাইয়া খুবই সুনাম পাইয়াছেন। ইঁহার সঙ্গে হীরুবাবুর সঙ্গত খুবই জমিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ মৈত্র রাজসাহীর জমিদার রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয়ের পুত্র এবং ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের সুযোগ্য ছাত্র। গতবারে এলাহাবাদে স্বরোদ বাজাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করাতে এবারে স্বরোদ বাজাইবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রথমদিন বাগেশ্রী এবং পিলু গৎএর সঙ্গে সঙ্গত করিয়াছিলেন ঢাকার জমিদার রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এল সি, এবং দ্বিতীয় দিন কাফী গৎএর সঙ্গে সঙ্গত করিয়াছিলেন শ্রীসূর্য্যকুমার পাল। ইঁহার বাদ্য খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও তাঁহার দলের ঐক্যতান বাদ্য, নন্দলালের সানাই, শ্রীযুক্ত গগন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা, শ্রীযুক্ত ঘোষের

ক্লারিওনেট ও শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পাঠকের সেতার ভাল হইয়াছিল।

নৃত্য

নৃত্যের কথা বলিতে গেলে প্রথমে শ্রেষ্ঠ গুণী লক্ষ্ণৌ নিবাসী পণ্ডিত কালকাদীনের পুত্র এবং পণ্ডিত বিন্দাদীনের ভ্রাতুষ্পুত্র শম্ভুপ্রসাদের কথক নৃত্যের কথা বলিতে হয়। একদিন আমাদের দেশ পণ্ডিত কালকা বিন্দার নামে মুখরিত ছিল। কথক নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত, তাল, লয়, বোল, ভাব প্রভৃতির কত নিকট সম্বন্ধ তাহা না দেখিলে বোঝা যায় না। ইনি দুই দিন নৃত্য দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

জয়পুরের মোহনলাল এবং তাঁহারা ছাত্রী কুমারী আশা ওঝা তাঁহাদের নৃত্যে সমস্ত দর্শককে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

কুমারী অমলা নন্দী উদয়শঙ্করের শিষ্যা এবং ইউরোপের বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহার নৃত্য খুবই সমাদৃত হইয়াছিল।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে কতক নৃত্যের প্রচলন নাই। এলাহাবাদে বাঙ্গালী সঙ্গীত ও বাদ্যে কতদূর উন্নত তাহা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইরূপ এই শ্রেণীর নৃত্য যদি বাংলাদেশে প্রচলন হয় তাহা হইলে অন্য দেশ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হয় না। এই দেশে এই ধরণের নৃত্যের সমাদর হওয়া উচিত।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয় সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টাও সার্থক হয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

মাটিরে ছাড়িয়া মোর বাঁধি নাহি ঘর

মোহাম্মদ শওকাত আলি

মাটিরে ছাড়িয়া মোর বাঁধি নাই ঘর,
ধূল-ভরা জগতেরে বাসিয়াছি ভাল ;—
এই জল—এই বায়ু—সুধাময় আলো,
হেথা নহি ভিন্ন কেহ—অনাত্মীয়-পর !

রচিয়াছি চতুঃসীমা দিক্‌চক্র দিয়া,
জীবনের পূর্ণ ধ্বনি শুনি এর মাঝে।
রক্ত-চক্ষু-দণ্ড-বিধি-আইনের সাজে
সঙ্করিছে সত্য-রাজ স্নেহ আবরিয়া !

প্রথম-প্লাবনে-ভাসা ক্ষুদ্রতম বীজ
বিটপী-জনম নিল রৌদ্র-ছায়া-তলে,
প্রথম আশিস লয়ে জাগে পলে পলে
পূণ্য-পাপে দগ্ধ-তনু স্বর্ণ-মনসিজ।

জন্মে জন্মে জনমিল মানব-মহান্—
এ মোর মাটির স্বর্গে সার্থক সে দান !

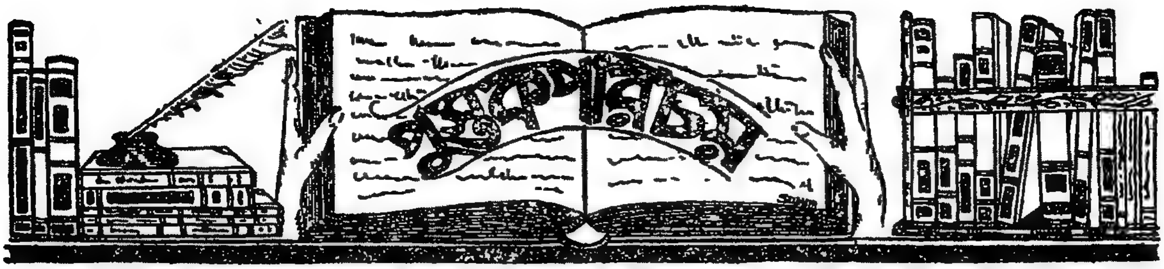

সচিত্র কলিকাতার কথা (মধ্যকাণ্ড) শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক প্রণীত। শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

এই বহু মূল্যবান এবং বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ পুস্তকটি পাঠ করিয়া আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় গ্রন্থকারকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। গ্রন্থখানি কত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান হইয়াছে তাহা এই পত্র পাঠ করিলেই সকলের ধারণা হইবে।

"কল্য বিকাল বেলা অবসর পাইবামাত্র আপনার "কলিকাতার কথা" লইয়া অতি আগ্রহ সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। গ্রন্থখানি বহু তথ্যপূর্ণ এবং পড়িতেও বেশ কৌতূহলপ্রদ। পুস্তক খানিতে শুধু প্রাচীন কলিকাতার নগরীর কথা বিবৃত হয় নাই, উহাতে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতা এবং তখনকার ব্যবসা, শিল্প বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। উহা সঙ্কলনে আপনার যে অসাধারণ পরিশ্রম ও একাগ্রতার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা অতীব প্রশংসনীয়। Verily, you are the living Encyclopedia on informations, connected with Calcutta and its origin. ইহার ভাষাও সহজ ও প্রাঞ্জল। আশা করি প্রত্যেক বাঙ্গালীর কাছেই ইহা সমাদর লাভ করিবে।"

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয় কলিকাকার একজন সুপ্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি। বহু পরিশ্রম গবেষণা এবং সময় সাপেক্ষ তাঁহার রচিত বর্ত্তমান এবং অন্যান্য পুস্তকাবলী বাঙলা দেশের ধনবানগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ যদি বাণীরও সেবক হন তাহ'লে সাহিত্য ও দেশ এইভাবে লাভবান হয়।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শেকোয়া। শ্রীযুক্ত আশরাফ আলী খান প্রণীত। এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীযুক্ত মাহফুজার রহমান খান কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

পাঞ্জাবী কবি মোহাম্মদ ইক্‌বালের "শেকোয়া" নামক খণ্ডকাব্যের অনুবাদ। ইকবাল যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য সে বিষয়ে মতভেদ নাই, কিন্তু ইকবাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এ কথাও কেউ কেউ বলেন যে তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর কবিত্বকে খর্ব্ব করেছে। শেকোয়া কাব্যখানি অবশ্য কবি ইকবালের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়, তা হলেও এ কাব্য খানিতে যে কৃত্রিমতার আবেষ্টন আছে, শ্রেষ্ঠ কবির যে-কোন লেখাতে তা' থাকা উচিত নয় এবং থাকেও না। শেকোয়াতে খোদার বিরুদ্ধে যে অভিমান ফুটে উঠেছে তা ভক্তের অভিমান নয়, ওসব খেয়ালেরও নয়, তা একেবারে আদুরে ছেলের অসঙ্গত আবদার। কবি ইকবাল আরব-তুর্কী-জাতির গৌরবময় বিজয় অভিযানের উল্লেখ করে দুঃখ করেছেন—"আমাদের" এখন এমন দুর্দ্দশা কেন? "আমরা" তোমাকে প্রচার করেছি, তবু হে খোদা তোমার নেক্‌নজর থেকে "আমরা" বঞ্চিত হলেম কেন? সমস্ত কাব্যখানিতে "আমাদের" পূর্ব্ব গৌরব এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবৃত আছে। কিন্তু এই "আমরা" কাহারা? নিশ্চয়ই কবি ইকবাল এবং তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ নন, কেননা ভূমিকাতে দেখছি কবি ইকবাল অমৃতসরের এক

ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত। দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দুছিলেন এবং এখনও তাঁর পাঞ্জাবিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। অতএব তিনি আরব-তুর্কী-জাতির বিজয় গরিমার অংশ "আমাদের" ব'লে দাবী করেন কোন হিসাবে? এই কারণেই তাঁর খোদার উপর অভিমানটা নিতান্তই কৃত্রিম ব'লে মনে হয়।

কিন্তু অনুবাদকের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক নাই। কবি আশরাফ আলী খান্ তাঁর অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কান্তি ঘোষের ওমর খৈয়াম অনুবাদ যে সব গুণে লোকপ্রিয় হ'য়েছে, তার অনেকগুলি গুণই এই অনুবাদে বর্ত্তমান। দু'একটা সামান্য যতি পতনের কথা বাদ দিলে, ছন্দের অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি এবং মূল কাব্যের রসধারা অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই মনে হয়। কাব্যানুবাদ একমাত্র কবির হাতেই সার্থক হ'য়ে ওঠে—একথা কবি আশরাফ আলী খান্ তাঁর এই গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন। আমরা তাঁর কবিত্ব-শক্তির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। —ভৃগু—

দিল্‌রুবা। শ্রীযুক্ত আবদুল কাদির প্রণীত। ৪০নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এই কাব্যখানি আগাগোড়া স্নিগ্ধ মধুর রসে সিঞ্চিত। একখানি সত্যকার কাব্যগ্রন্থ। "হজরত মহম্মদ" শীর্ষক চারটী কবিতা যে কোনও শ্রেষ্ঠ কবির রচনাকে গৌরব দান করত—সেগুলি ভাষা, ভাব এবং ছন্দের দিক থেকে এতই উচ্চশ্রেণীর। বঙ্গ সাহিত্যে কবি আবদুল কাদির উচ্চস্থান অধিকার করেছেন।

—ভৃগু—

মরু-নির্ঝর—মৌলভী মোবারক আলী বি-এ প্রণীত। আহসানুল্লার বুক হাউস লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা মাত্র।

মৌলভী মোবারক আলী সাহেব বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার সোফিয়া নামক উপন্যাসখানার সমালোচনা এই পত্রিকায় করেছিলুম। বর্ত্তমানে তাঁহার 'মরুনির্ঝর' পেয়ে এবং পড়ে খুশী হয়েছি। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার হজরত মুহম্মদের জীবন অভিনব উপায়ে লিপিবদ্ধ করেছিল,—পত্রাকারে। তিনি সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর ভাষায়, সুমার্জ্জিত রীতিতে, এবং সুন্দর ভাবে এই গ্রন্থের বক্তব্য বলেছেন।

আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন উভয় সম্প্রদায়ের সাধু এবং মহাপুরুষদের উদার—উন্নত এবং বলশালী জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হবার। হিন্দু-মুসলমান দুইটী বৃহৎ সমাজের মিলন সম্ভবপর করে তুলতে হলে উভয়ের সমাজের মধ্যে পুঞ্জীভূত অজ্ঞানতা এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত অন্ধতা ও বিভেদ দূর করতে হবে। সে দুরূহ সমস্যার সমাধান শুধু এই জ্ঞানবর্দ্ধন দ্বারাই সম্ভব।

হজরত মুহম্মদের জীবনী যে এত সরল করে এবং চমৎকার ভাবে রচনা করা যেতে পারে মরুনির্ঝর পাঠের পূর্ব্বে তা ধারণা ছিল না। শিল্পীর দরদ এবং ঐতিহাসিকের লিখা এই গ্রন্থে একত্রে সম্মিলিত হয়েছে। মোস্তাফা চরিতকে পাদ্রীসুলভ বক্তৃতা ও হাস্যকর বাংলা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে বালু চাপা দিয়েছিলেন দেখে, যাঁরা দুঃখিত হয়েছিলেন তাঁরা উপরোক্ত মরুনির্ঝরের আনন্দ প্রদায়িনী জীবনধারা দেখেও সুখী হবেন। —জরীন কলম—

কনট্রাক্ট ব্রিজ। শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী বি-এল প্রণীত ও তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য একটাকা চার আনা।

তাস খেলা জিনিষটা বহু পুরানো। আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে এর আদর আছে। সেই তাস খেলার মধ্যে যে খেলাটি আজকাল আমাদের মধ্যে অতিশয় প্রচলিত হয়ে পড়েছে তা হচ্ছে ব্রিজ। প্রকার ভেদে দুরকম ব্রিজ খেলা আছে; এক অকশান ব্রিজ; আর এক কনট্রাক্ট ব্রিজ। উল্লিখিত গ্রন্থে গ্রন্থকার কনট্রাকট্ ব্রিজের মূল সূত্রগুলি বিশদভাবে উদাহরণের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

যে খেলার প্রচলন ও জনপ্রিয়তা এত বেশী সে সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা হওয়া অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়। ইংরাজীতে এ সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রিজ খেলোয়াড় স্বনামধন্য ক্রলি কালবার্টসন এ সম্বন্ধে একাধিক বই রচনা করেছেন।

কনট্রাকট ব্রিজ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙলা বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানিনে; আমরা অন্তত এই প্রথম দেখলাম। বইখানি ভালো লেগেছে। এ খেলায় যাঁরা নূতন ব্রতী তাঁরা এই বই পড়ে লাভবান হবেন। বই খানির মধ্যে সব চেয়ে যা ভালো লাগলো তা হচ্ছে এর বিষয়বস্তুর সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা। অনেক সময়ে এই ধরণের technical গ্রন্থের মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সাজানোর ভিতর শৃঙ্খলার অভাব ঘটে এবং সে কারণে তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বলতে আনন্দ বোধ করছি, আলোচ্য গ্রন্থে সেরূপ কোন বিক্ষোভ ঘটে নি। অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু-উৎসব। শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। ২১ নম্বর ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট হইতে শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি "রহস্যচক্র সিরিজ" নামে মাসে মাসে যে ডিটেকটিভ ও য়্যাডভেঞ্চার কাহিনী প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেছেন "মৃত্যু-উৎসব" সেই সিরিজের ২৫নং গ্রন্থ।

মৃত্যু-উৎসব গল্পটি সাধারণ ডিটেকটিভ কাহিনী নয়; এর মধ্যে জীবনের একটি বিচিত্র ও আপাত-অসম্ভব ঘটনাকে রূপায়িত করা হয়েছে। গল্পটি আগাগোড়া যেমন বিচিত্র তেমনি চিত্তাকর্ষক; লেখার ষ্টাইল, লিপিকৌশল ও ঘটনা সংস্থাপন নৈপুণ্যের গুনে গোটা উপন্যাসটি যারপরনাই উপ-ভোগ্য হয়ে উঠেছে। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন ছবিঘরে বসে কোন উত্তেজক ছবি দর্শন করছি। যাঁরা এই ধরণের লোমহর্ষক উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন তাঁরা আলোচ্য বইখানি প'ড়ে প্রচুর আনন্দ পা'বেন। ছাপা বাঁধাই ও গেট্-আপ্ চমৎকার বল্লে অতিশয়োক্তি করা হয় না।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সংশোধন—উপন্যাস শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ প্রণীত। দীপিকা কার্য্যালয়, কুষ্টিয়া, নদীয়া হইতে প্রকাশিত। ১১৮ পৃঃ মূল্য দশ আনা।

উপন্যাসখানির প্লট সাধারণ উপন্যাস হইতে একটু স্বতন্ত্র। সমীর নামক একটি যুবক দেশোদ্ধার করিয়া বেড়াইত—বিবাহে মতি ছিল না। ইহা লইয়া বিধবা মাতার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। ইতিমধ্যে বাড়ীর পাশেই এক বিধবা মহিলা এক বিবাহযোগ্যা কন্যা লইয়া আসিয়া বাসা বাঁধিলেন এবং উভয় পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য হইয়া গেল। সমীর সুজাতাকে পড়াইবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিল। ইহা দেখিয়া সমীরের মাতা এবং সুজাতার মাতা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—ইহার মধ্যে বিধাতার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দেখিতে পাইয়াছেন মনে করিলেন। কিন্তু সমীর সুজাতাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল না। ইতিমধ্যে সমীরের মাতা হঠাৎ মারা গেলেন। সুজাতার মাতা যখন বুঝিতে পারিলেন যে সমীরের সঙ্গে সুজাতার বিবাহ সম্ভব নয় তখন মেয়ের অন্যত্র বিবাহের চেষ্টা করিতে বলিলেন। সুজাতা নিজেই যক্ষ্মারোগসম্ভাব্য সুহাস নামক তার গৃহশিক্ষককে পতিত্বে স্বেচ্ছায় বরণ করিল। সমীর সুজাতাকে অনুরোধ করিল সে যেন তাহাকে ভুলিয়া যায়। সুজাতার ইহা লইয়া দারুণ অভিমান হইল। পরে সুহাস যক্ষারোগেই মারা গেল। সমীর তাহা শুনিয়া নিজের বিবাহের চেষ্টা করিতেছে এমন সময় বিধবা সুজাতা আসিয়া সমীরের আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং বলিল "মাঝের এই কটা দিনে নিশ্চয়ই তুমি এত ছোট হ'য়ে যাওনি যে তোমার পাশে থাকতে আমার কোন অসুবিধে হবে।"

প্লটের অসামঞ্জস্য এই যে সমীর যে কেন সুজাতাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল না তার যথোপযুক্ত কারণ দেওয়া হয় নাই। সুজাতার মত অতি ফরোয়ার্ড মেয়ে হিন্দু সমাজে দুর্লভ। গল্পে যে episode দেওয়া হইয়াছে তার সঙ্গে মূল প্লটের কোন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত গল্পের মধ্যে একটা অতি নাটকত্ব ভাব (over-dramaticness) আছে যাহা রসবোধে পীড়া জন্মায়। লিখিবার ধরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত (terse) কাটা ছাঁটা—কোথাও এতটুকু বাহুল্য বর্ণনা পর্য্যন্ত নাই। ঘটনার গতি দ্রুত না হইয়া আরো মন্থর হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বইখানি সাধারণের নিকট আদরণীয় হওয়া উচিত। গ্রন্থকারের অনেক ছোট গল্প পড়িয়াছি মনে পড়ে—সে বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত। উপন্যাস তাঁর এই প্রথম। ভূমিকায় তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "আধুনিক যুগে দরিদ্র গ্রন্থকারের পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ করা একান্ত কষ্ট সাধ্য।" ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। প্রকাশকবর্গের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

গ্রন্থকারের ভাষা সুন্দর, সাবলীল। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁ'র আসন স্থায়ী হউক এই কামনা করি।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

অধিকার

শ্রীসরোজমোহন চক্রবর্ত্তী

রোগিণীর ঘরে সেই চিরন্তন মৃত্যু ও মানুষের সংগ্রাম চলেছে। একটা দুঃস্বপ্নের মত নিরানন্দ, কালো জালে সমগ্র বাড়িটা ভারাক্রান্ত। কারো মুখে এতটুকু হাসির আভাস পর্য্যন্ত নেই। চোখে, মুখে সকলেরই একটা অনিশ্চিত বিচ্ছেদের কাতরতা।... রোগিণী, নির্ম্মলা!

ক্রমাগত কয়েকদিন হ'তে জ্বরের আর বিরাম নেই। বাড়ির লোকে, আত্মীয়স্বজন, দিনের পর দিন, অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা ক'রে চলেছে; কিন্তু রোগের গতি বৃদ্ধির দিকেই চলেছে তার অসমান, দ্রুতমন্থর, বক্র গতিতে।

নির্ম্মলার মামাবাড়ি আমাদেরই গ্রামে। ছোটবেলো হ'তেই নির্ম্মলার মামা অবিনাশ বাবুর সহিত আমাদের জানাশোনা। আমাদের বাড়ির পর খান দুই বাড়ি বাদে ওই নিম ও জাম গাছের অন্তরালের বাড়িটাতে তাঁরা পুরুষানুক্রমে বাস ক'রে আসছেন। শোনা যায়, এককালে তাঁদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এখন অবস্থা যদিও পূর্ব্বের ন্যায় ভাল নয়, তবুও এই পতনোন্মুখ অবস্থাতেও সংসারে কোন অভাব, অনাটন নেই।

বেশ মনে পড়ে, আমি যেবার কলেজের পড়া শেষ ক'রে এসে বাড়িতে বসলুম, সেইবারই নির্ম্মলারা প্রথম এই গ্রামে আসে। নির্ম্মলার পিতা নাকি পশ্চিমে কোন এক বড় সহরে ভাল চাকরি ক'রতেন; হঠাৎ তার মৃত্যু হওয়াতে নির্ম্মলার মা সরমা দেবী কন্যার হাত ধ'রে এসে বড় ভাই অবিনাশ বাবুর সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সরমা দেবী তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন স্বামীর সঙ্গে পশ্চিমেই কাটিয়েছেন। বাঙ্গালীর সমাজ ছাড়া হ'য়ে তাঁর সমাজ ও সংস্কারের বন্ধন অনেকটা শিথিল হ'য়ে পড়েছিল। যদিও তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কোনো স্কুল-কলেজে হয়নি, তবুও বুদ্ধিমতী ব'লে তিনি আধুনিক কালের আবহাওয়া এবং স্বামী ও নিজের সখী সাথীদের সঙ্গে সমান তালে নিজেকে মানিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বামী তাঁর বহু অর্থ উপার্জ্জন ক'রে গেছেন এবং মৃত্যুর পর যা'কিছু তিনি রেখে গিয়েছেন, তাতে একমাত্র কন্যা নির্ম্মলা এবং তার মাতার জীবন সুখে স্বচ্ছন্দেই চলে যেতে পারে।

স্বামীর সঙ্গে পশ্চিমেই সারা জীবন কাটিয়েছেন; সরমা দেবীর সেই কারণেই শ্বশুরকুলের সহিত তেমন সুদৃঢ় স্নেহের বন্ধন কিছু দাঁড়াতে পারেনি, যাতে স্বামীর মৃত্যুতে শ্বশুরগৃহে কন্যাসহ আশ্রয় নিতে পারেন। সেইজন্যই সেই দুঃসময়ে স্বজন-বান্ধবহীন, বিদেশে দুঃখশোকের প্রথম আঘাতটা একটু সামলিয়ে নিতেই প্রথম মনে হ'ল জ্যেষ্ঠের সংসারের কথা এবং তাই একদিন কন্যার হাত ধ'রে এসে দাদাকে বলেছিলেন,—দাদা, সংসারে ছোট বোনকে একটু আশ্রয় দাও।

অবিনাশ বাবুদের সহিত আমাদের কোনও রক্তসম্বন্ধ না থাকলেও আত্মীয়তা যথেষ্ট। উভয় পরিবারের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দের অভাব কোনোদিন কেহ লক্ষ্য করে নাই। দু পরিবারের মধ্যেই যাওয়া-আসা, কাজে-কর্ম্মে, সামান্য সামান্য উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া সচরাচর প্রায়ই হ'য়ে থাকে।

নির্ম্মলারা যখন প্রথম এল আমাদের এই গ্রামে, তার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের সঙ্গেও সেই সহজ ভাবের সম্বন্ধই স্থাপিত হ'য়ে গেল। বাড়িতে মা যেমন শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেইমতই নির্ম্মলার মাকে পিসীমা ব'লে ডাকতুম। নির্ম্মলার সঙ্গে কিন্তু আমার পরিচয় হ'ল অতি সামান্য; কারণ বাঙ্গালীর ঘরে আমাদের দু'জনের বয়সটাই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ, আলাপ-পরিচয়ের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়;—সংস্কারেও বাধে।

সেই নির্ম্মলার আজ অবস্থা ভাল নয়। জ্বর বিরামহীন। শুনলুম ডাক্তার ব'লে গেছেন,—কখন কি হয় কিছুই বলা

যায় না। রোগিণীর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। আজ দু'দিন জ্ঞান নেই, চেতনাহীন বিকারের ঝোঁকে প্রলাপ বকে চলেছে। শিয়রে সরমা দেবী; স্থির, ম্লান মূর্ত্তিখানি তাঁর মাতৃহৃদয়ের ব্যথা, বেদনায় কি এক রকম কঠোর হ'য়ে গেছে। চোখে মুখে ভীতি, আশঙ্কার ম্লান ছায়া সুপরিস্ফুট। ঘরে আর ছিলাম আমরা দু'জন—অবিনাশ বাবু ও আমি।

রাত্রি তখন দুটো। সরমা দেবী বললেন,—দাদা, তুমি যাও একটু গড়িয়ে নেও। সারা রাত আর কত বসে বসে জাগবে?

অবিনাশ বাবু, বোধকরি কয়দিন যাবৎ রাত জেগে জেগে সেদিন আর কিছুতেই পেরে উঠ্‌ছিলেন না; তাই কোনো প্রকার দ্বিরুক্তি মাত্র না ক'রেই তিনি পাশের ঘরে উঠে গেলেন।

নির্ম্মলার মা ডাকলেন,—নির্ম্মলা, নির্ম্মলা,—অ-নিমু। নির্ম্মলা আজ তিন দিন পরে এই প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখল। মা বললেন, এই ওষুধটুকু খাও তো, মা। রোগিণীর চোখ কিন্তু ততক্ষণ পুনরায় নিমীলিত হ'য়ে গেছে। এই ওষুধটুকু খা। একবার চোখ চা, মা,—চেয়ে দেখ। ও—মিমু।

নির্ম্মলা পুনর্ব্বার চোখ মেল্‌ল; বলল কে মা? বলে তার বড় বড় কালো চোখের সতৃষ্ণ, স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর কেমনতর মুখখানা উজ্জ্বল ক'রে বলল,—সেই থেকে বসে আছো? মায়ের দিকে বা তাঁর কথায় তখন আর তার মন নেই। আমায় মৃদু কম্পিত স্নেহের কণ্ঠে বল্‌ল,—শোন,—শোন; এগিয়ে এসো।

যতবার সে আমায় ডাকে, কেমন যেন বক্ষের দিকে নীচু পানে মুখখানা একটু একটু দুলিয়ে ঠোঁটের দুকোণ দু'দিকে ঈষৎ বিস্তৃত এবং কুঞ্চিত করে সচেষ্ট ভঙ্গিতে ডাক দেয়,—শোন, শোন। এডাকে সাড়া দিতে সঙ্কোচ হয়; কিন্তু প্রাণমন আকুল হ'য়ে ওঠে।

নির্ম্মলার সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত আমার মুখের পরিচয় খুবই সামান্য। তার সঙ্গে আমার যত কিছু কথা—যত কিছু পরিচয়, সকলই চোখে চোখে। আমি উঠতুম ছাদে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই একখানা হা'তে করে আর সে উঠত তার মামার ছাদে;—দুজনায় কত কথা হত অস্পষ্ট চোখের দৃষ্টিতে,—ও-ই অতখানি দূর থেকে। দিনে সে কাজে, বিনা কাজে দশ পনরো বার ছাদে আসত; আর আমি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি চিলে কোঠার ছাদে কতবার কত ছলে যে উঠতুম তার সীমা সংখ্যা নেই। প্রতিবার, প্রতিদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হ'ত, কথা হ'ত, নতুন ক'রে পরিচয় হ'ত, চোখের ভাষায়। মনে মনে আমরা পরস্পরকে বুঝতুম, চোখে চোখে চেয়ে দেখতুম; তারও মধ্যে আবার কত লুকোচুরি হ'ত। নির্ম্মলার যখন লজ্জা হ'ত বা কেউ দেখে ফেলার ভয় হ'ত নিম গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াত। এমনি ক'রে দিন হ'য়ে আসত শেষ। সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসত শ্রান্ত এই পৃথিবীর বুকে, তার শান্ত-মধুর, রঙের আলো ছায়ার মাধুর্য্য নিয়ে। পশ্চিম দিগন্ত পারের অচেনা, অজানা গাছগুলোর পেছনের আকাশ রাঙা হ'য়ে উঠত। গোধূলির আলোর শেষ জ্যোতিটুকুও ক্রমশঃ ম্লান হ'য়ে মিলিয়ে যেত। দূরবর্ত্তী দুই ছাদের দৃষ্টি অস্পষ্ট হ'য়ে উঠত, তবু দুইটি হৃদয় সন্ধ্যার অন্ধকারে পরস্পরের অস্পষ্ট ছায়াটুকুই দিনের শেষে, শেষ বারের মত দেখে নিত। তৃপ্তি, অতৃপ্তির সে এক মধুর মিলন।

ও বাড়ির ছাদটাই ছিল যেন আমার সেই রূপকথার মেঘমালার দেশ। বৈকালের রৌদ্রহীন ঝাপসা সন্ধ্যায় নিম গাছ ও জাম গাছ আমায় কেমনতর আকর্ষণ করত; কেমন যেন মনে হ'ত,—ওই বহুদূর—বহুদূর পারের স্বপ্নপুরী, মাধুর্য্য তার অপরূপ, উদাস ক'রে দেয় প্রাণ মন। পশ্চিম দিক হ'তে একটানা মাঠগুলো এসে পশ্চিম দিগন্তের গাছের সারিকে যোগ করে দিত এই গ্রামের প্রান্তের সাথে। মনে হ'ত, আমার বাস বুঝি ওই দূরে, অতিদূরে। সেখান হ'তে এসেছি আমি এই মায়াপুরীর সৌন্দর্য্যের উৎসখানি জয় করে নিতে।

আর একটা দিনের সামান্য একটা কথা আজ বারে বারেই মনে পড়ে। কি উপলক্ষ্যে নির্ম্মলাদের বাড়ি নিমন্ত্রিত হ'য়ে খেতে গিয়েছি। পরিবেশন ক'রল নির্ম্মলা, তার মা কাছে বসেছিলেন। সে দিন নির্ম্মলার কি হাসি, কি আনন্দ, কেবলি বলে, কিছু খেতে পারো না,...মাগো! খাওয়া শেষে মুখ-ধোয়ার জল সেই এগিয়ে দেয়, পান নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কাছে। মুখ টিপে টিপে কেবলি হাসে। বোঝা যাচ্ছিল

আনন্দ হয়েছে তার অনেকখানি। পান দেয় হাতে তুলে, চোখোচোখী হ'য়ে যায়;—কত কথা মুহূর্ত্তের বিদ্যুৎস্ফুরণে হ'য়ে গেল। একটা অজানা আনন্দের শিহরণ এনে দিল প্রাণে।

যাক্ সে কথা, নির্ম্মলা যখন বার বার ডাকতে লাগল তখন তার মা, বোধ করি, মনে করলেন, এও বিকারের প্রলাপ; তবুও তিনি বললেন, সরে এসো তো, বাবা, কী ও বলতে চায় বলুক।

এগিয়ে এলুম। কিন্তু নির্ম্মলা তার মিনতিভরা, কম্পিত কণ্ঠে কেবলি বলতে লাগল, আরও এগিয়ে এসো না। আর একটু এগিয়ে এসো।

আরও এগিয়ে যখন তার হাতের কাছটিতে এসে বসলুম, সে তার কোমল, রোগশীর্ণ হাতখানা আমার হাতের ওপর রাখল এবং আমার হাতে একটু আকর্ষণ ক'রে বলল—শোন, শোন! সমস্ত শরীর আমার সঙ্কোচে, ভয়ে, আনন্দে শিউরে উঠল। মাথা আমার আপনা হ'তেই নত হয়ে তার হাতে ধরা দিল।

আমার মুখটা তার মুখের কাছে নিয়ে নির্ম্মলা বলল—শোন, লজ্জা ক'রবার আর আমার সময় নেই। আমি একমনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিলেম, তাই ও বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে; কিন্তু যা' চেয়েছিলুম, তা বুঝি আর পেলুম না। তার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

সরমা দেবী এতক্ষণ কি করছিলেন লক্ষ্য করিনি, কিন্তু নির্ম্মলার কথা শুনে মুখ তুলে দেখলাম, তিনি তাঁর থানের কাপড়ের আঁচলখানি চক্ষে তুলে, দ্রুত গতিতে, একটা অদম্য ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসকে সবলে চাপতে চাপতে কম্পিত কলেবরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নির্ম্মলা আমার মুখটা হাত দিয়ে তার দিকে ফিরিয়ে বলল,—ওগো, জীবনে আমার কোনো সাধই পূর্ণ হল না; ভগবান ডেকেছেন। মাকে একটু দেখো, তাঁর তো আর কেউ রইল না। চোখ তার ছল ছল করে উঠল।

যে লজ্জার বাঁধটুকু তখন পর্য্যন্ত যাই, যাই করেও যায়নি, তাও আর রইল না। বললুম, নির্ম্মলা, নির্ম্মলা, তুমি ভাল হও, ভাল হও। তোমায় ছেড়ে—। আর কিছু বলতে পারলুম না। হুহু করে জল এসে গেল চোখে।

নির্ম্মলা একটু কেমনতর ম্লান হাসি হাসল এবং আমার মস্তকটি আরও একটু আকর্ষণ করে মুখখানা তার মুখের ওপর চেপে ধরল। নিজেকে কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না। অশ্রুতে চোখ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রোগিণীর প্রলাপ ব'লে আর কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারলুম না; স্থান, কাল সকল ভুলে একটি চুম্বন অঙ্কিত ক'রে দিলুম তার সুন্দর, শুভ্র কপালে।

একটা তৃপ্তির আনন্দে মুখখানি তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। শান্ত, ধীর কণ্ঠে সে বলল, আর আমার দুঃখ নেই।

দু'চোখ বেয়ে অশ্রু উদ্বেল হ'য়ে ঝরে পড়ছিল। উপুড় হ'য়ে প'ড়ে তাই সামলিয়ে নিচ্ছিলাম; নির্ম্মলা তার হাতখানা আমার মাথার উপর রাখল।

যখন পুনরায় মুখ তুললুম, দেখলুম, নির্ম্মলার হাতখানা ক্রমে অসাড় হ'য়ে ধারে গড়িয়ে পড়ল। চোখ বুজে আসছে। ডাকলুম, নির্ম্মলা, নির্ম্মলা। কণ্ঠে স্বর ফুটল একটা অস্পষ্ট উত্তেজিত আর্ত্তনাদের মত। চোখ ফেটে জল এল।

নির্ম্মলা যেন অতি কষ্টে চোখ মেলে বলল,—কি?

বললুম, ভয় নেই,—তুমি শীগগির ভালো হ'য়ে উঠবে।

সে অবসাদগ্রস্ত, নিদ্রাতুর কণ্ঠে উত্তর দিল, আচ্ছা।

তারপর সেই যে জ্ঞান লোপ হ'ল, আর নির্ম্মলার জ্ঞান ফিরল না। পরদিন সন্ধ্যায়, কত সন্ধ্যার স্মৃতি বুকে নিয়ে সে চলে গেল।

সকলে মিলে তাকে ঘর থেকে বের করল। আঘাতের প্রথম ধাক্কায় বুঝেই উঠতে পারলুম না কি হল। কি যে হারালুম, কত যে আমার ক্ষতি সে বুঝে ওঠার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকবে। পরিত্যক্ত খাটখানার ওপর উপুড় হ'য়ে পড়লুম, মুখ দিয়ে শুধু বের হ'ল—নির্ম্মলা, সত্যি চলে গেলে?

কতক্ষণ যে ঐ ভাবে ছিলুম মনে নেই; হঠাৎ অবিনাশ বাবুর ডাকে চমকে উঠলুম। দুই বিন্দু অশ্রু আমার দু'চোখের কোণ বেয়ে অজ্ঞাতেই গড়িয়ে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছলুম, কিন্তু অশ্রু বাধা মানতে চায় না, বারে বারে চোখ জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে;—সমস্ত ঝাপসা হ'য়ে একাকার হ'য়ে গেল সম্মুখ হ'তে।

অবিনাশ বাবু কি মনে করলেন জানিনা। আমার যে কোথায় ব্যথা, কত বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখ যে বুকের ভেতর পাষাণের মত চেপে ধরে কণ্ঠ অবধি রোধ করে আনছে, তা' তিনি কেমন ক'রেই বা জানবেন।

বাইরে সরমাদেবীর নিকট গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, সমস্ত অন্তর মথিত ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুকের ভেতর হ'তে। তাঁর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। সরমাদেবী কিন্তু আমাকে দেখেই আর্ত্ত, ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন, অমি, অমি, এ আমার কি হ'ল, বাবা? আমার সোণার চাঁদ, মা আমার, কোন প্রাণে অভাগিনীকে ফেলে চলে গেল? কন্যার মৃত্যু' কঠিন বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে তিনি কেঁদে উঠলেন, একটা দুঃসহ রোদনের আবেগে সমস্ত শরীর তাঁর কেঁপে উঠল।

সেইখানেই বসে পড়লুম। কেবলি মনে হ'তে লাগল, নির্ম্মলার মায়ের মত যদি একবার ঐ শীতল বুকে মুখ রেখে কেঁদে নিতে পারতুম।

সকলে মিলে নির্ম্মলার দেহটাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। সরমাদেবী শোকে আকুল হ'লেও বাধা দিলেন না। ডাকলেন, দাদা। অবিনাশ বাবু ফিরে দাঁড়াইতেই তিনি বললেন, নির্ম্মলার মুখাগ্নি আমিই করবো সমস্ত আপাদমস্তক আমার কেঁপে উঠল। নির্ম্মলার মা আমাকে একপ্রকার বুকে টেনে নিয়েই অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, বাবা, অভাগিনীর জীবনের কোনো সাধই পূর্ণ হয়নি; এতেও হয়তো একটু শান্তি পাবে সে।

রাত্রি হ'য়ে গেছে। ছোট্ট নদীর পাড়ে গ্রাম্য শ্মশান। চিতার আলোয় এ পারের বালুচরটার অনেক খানি আলোকিত হয়েছে; নদীর বুকেও সে আলোর খানিকটা প'ড়ে ছোট ছোট তরঙ্গ গুলোকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। ওপারের কালোজলে ওপারের গাছগুলোর অন্ধকার ছায়া পড়েছে। প্রকৃতি নিঃসাড়, নিস্তব্ধ। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে জীবননাট্যের শেষ দিকটা এক মনে, একদৃষ্টে, তন্ময় হ'য়ে দেখছে। আমার অদৃষ্টের কথাই ভাবছিলাম। কেবলি মনে হচ্ছিল, আমাকে ভালবেসেছিল তাই বুঝি সে চলে গেল।

চিতার আগুন নিবে এল। বালুচর, নদীর জল, চারিদিকের প্রকৃতির সঙ্গে এক সাথে ক্রমেই যেন ম্লান হ'য়ে আসছে। মনে মনে বললুম,—এ হতভাগ্যকে ভালবেসেছিলে, নির্ম্মলা, তাই বুঝি চলে গেলে। বুকে ক'রে নিয়ে গেলে আমার স্মৃতিটুকু, দিয়ে গেলে শুধু নিঃসঙ্গ স্বামীর অধিকার। স্বামীর অধিকারেই আজ মুখাগ্নি করলুম। চোখের পাতা আপনিই ভিজে উঠল; বললুম, ভগবান, জগদীশ্বর, নির্ম্মলাকে চরণে টেনে নিলে, তাতে দুঃখ করিনে। পৃথিবীর বুকে দীর্ঘ সতেরো বছরের জীবন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে, কোনো আশা কোনো আকাঙ্খাই তার সফল হয়নি, দেখো, তোমার কাছে আর যেন সে দুঃখ না পায়;—শান্তি দিও, শান্তি দিও, প্রভু।

সরোজমোহন চক্রবর্ত্তী

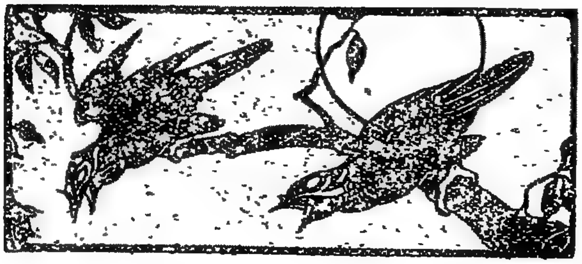

ইংলণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

১৮৩৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম। বর্ত্তমান ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। সেজন্য ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে সারা ১৯৩৬ সাল ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ইংলণ্ডে উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির (51, Lancaster Gate, London, W. 2) উদ্যোগে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। President : E. T. Sturdy Esq. Vice Presidents · The Lady Isabel Margesson, Dr. W. Stede, H. S. L. Polak Esq., Kanti Ghosh Esq., Swami Avyaktananda. Treasuror : Miss. S. R. Childers. Joint Secretaries : Miss N. Hazell, Mrs. M. E. Lease. Assistant Secretaries : Mrs. H. Rand, G. Mukherjee Esq. Miss Isabelle Raetzer. Financial Secretary . Mrs. A. French Publication Secretaries. Dr. E. R. Morris, Miss Silvia Ryle.

আগামী ফাল্গুন মাস থেকে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের এই অবতারের শতবার্ষিকী আরম্ভ হবে। আমরা আশা করি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে বাঙলা দেশ এই অনুষ্ঠানে শীর্ষ স্থান লাভ করবে।

আচার্য্য স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জয়ন্তী

গত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ ইণ্ডিয়ান ফিলসফিকাল কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে কলিকাতা সেনেট হলে আচার্য্য শীল মহাশয়ের ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁর সম্মানে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়েছিলেন ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়। সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণে আচার্য্য শীলের বহুতর গুণাবলীর কীর্ত্তন করেন। উপসংহারে আচার্য্য শীল মহাশয় তাঁর প্রতিভাষণে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন, "My last days are embittered by one thought, the wranglings of those who as the children of India should be bound by ties of brotherhood and friendship. Remember that Hindu or Moslem, Christian or Sikh, you can fulfil the best in your religion by a spirit of give and take, by giving out of your abundance and taking in a spirit of sincere amity and goodwill. All that is merely sectarian and communal must yeild to the spirit of a common nationality and nationality itself must be fulfilled in one common brotherhood of man in Universal Humanity."

আচার্য্য শীলের মতো প্রগাঢ় জ্ঞান বুদ্ধি এবং বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির এই সদুপদেশ পালন করবার শুভবুদ্ধি ভারত-বর্ষের যুযুধান সম্প্রদায়গুলির হবে কি?

বাংলা বইয়ের দুঃখ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বাংলা বইয়ের দুঃখ"

বিষয়ে যে আলোচনার অবতারণা করেছিলেন তৎসম্পর্কে নিম্নলিখিত পত্রটী কৌতূহলোদ্দীপক।

"আশ্বিনের 'বিচিত্রা'র 'বাংলা বই-এর দুঃখ' শীর্ষক শরৎ বাবুর বক্তৃতাটা দেখে বড় আনন্দ হল। যে সভায় এই বক্তৃতাটা দেওয়া হয়, সৌভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলুম। তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে বারবার এই কথাই মনে হচ্ছিল, শরৎচন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক জোরালো এবং স্পষ্টভাষায় এ যুগের একটা মস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করেচেন। কথাটা সাহিত্য-সেবক আমাদের সকলেরই মনে বহুদিন থেকে গুমরে মরছিল। কিন্তু সকলের কথা সচল এবং সজীব নয়। অন্য কোন সাহিত্যিকের মুখ থেকে বেরোলে যা' শুধু ফাঁকা কথাই থেকে যেত, শরৎচন্দ্রের মত প্রতিভাবানের মুখ থেকে সে কথাই বাংলাদেশের দিকে দিকে গুঞ্জন তুলেচে। গত মাসের মধ্যে যেখানেই গেচি, এর আলোচনা শুনেচি। শরৎচন্দ্রের আবেদন পক্ষেই হোক বা বিপক্ষেই হোক শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সাড়া জাগিয়েচে। এমনকি আমি কয়েকজন লোককে জানি, যাঁরা কথাশিল্পীর কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে ইতিমধ্যেই যথাসাধ্য বই কিনতে সুরু করেচেন। এ কিছু আশ্চর্য্য নয়। সাধারণ মানুষের কর্ত্তব্যবোধ চিরদিন ব্যক্তিত্বের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে দেখা যায়, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রভাব মানুষকে প্রেরণা দেয় বলেই মানুষ এগিয়ে যেতে পেরেচে।

খুব উপযুক্ত সময়ে এই প্রয়োজনীয় কথাগুলো শরৎচন্দ্রের মুখ থেকে বেরিয়েচে—তিনি আমাদের নমস্য। ইতি

ভবদীয়—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বাঙলা বানানের নিয়ম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিভাষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙলা বানানকে নিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে ঐ বিষয়ে একটি প্রশ্ন-পত্র আমাদের পাঠিয়েছেন। প্রশ্ন-পত্রের মুখবন্ধে লিখিত হয়েছে—"আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভাষায় দুই রীতি চলিতেছে—'সাধু' ও 'চলিত'। বহুকাল বহু প্রচারের ফলে সাধু ভাষায় প্রযুক্ত শব্দসমূহের বানান প্রায় সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু চলিত ভাষায় তাহা হয় নাই, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রীতিতে বানান করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে চলিত-ভাষা স্থান পাইয়াছে, পরীক্ষার্থী প্রশ্ন-পত্রের উত্তর চলিত ভাষায় লিখিতে পারে এমন অনুমতিও কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন। বাঙলা শব্দের বিশেষতঃ চলিত-ভাষায় প্রযুক্ত শব্দের বানান পদ্ধতি নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা, শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই পদে পদে সংশয়ে পড়িতে হইবে। বানানের একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম গৃহীত হইলে লেখক মাত্রই সুবিধা বোধ করিবেন। বাঙলা বানানের নিয়ম সংকলনের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সমিতির প্রথম কার্য বিশিষ্ট লেখকগণের অভিমত সংগ্রহ।"

কিছুকাল পূর্ব্বে বিচিত্রায় বিতর্কিকা বিভাগে আমরা এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি উত্থাপিত ক'রেছিলাম এবং তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছিল। আমরা সে সময়ে বলেছিলাম যে, একটি প্রতিপত্তিশালী সমিতি গঠিত হ'য়ে যদি একাধিক বানান বিশিষ্ট শব্দগুলির একটি মাত্র বানান নিরূপিত হয়ে যায় তা' হ'লে প্রথমে অনেকেই এবং অবশেষে সকলেই সেই নির্দ্ধারিত বানানগুলি মান্‌তে বাধ্য হবে, সুতরাং উপস্থিত চলতি ভাষার বানান নিয়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যথেচ্ছাচারিতা চলেছে তখন তার অস্তিত্ব থাক্‌বেনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়টি নিজ হস্তে গ্রহণ করাতে আমাদের আশা হচ্ছে এবার আমরা অভীপ্সিত ফলটি পাব। সমস্ত বিচারণীয় শব্দগুলির বানান নিরূপিত হ'য়ে যাওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি সেই বানান অনুযায়ী একটি সম্পূর্ণ বাঙলা অভিধান প্রকাশিত করেন তা হ'লে পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা এবং স্কুল কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ ত' সেই অভিধানের বানান পদ্ধতি অবলম্বন করবেনই, ক্রমশঃ অপর সকলকেও সেই বানানের পক্ষপাতী হ'তে হবে। নূতন সংস্করণের সময়ে চলিত অভিধান গুলিতেও নিরূপিত বানানই গৃহীত হ'তে পারবে।

আমরা আশা করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান নিরূপণ সমিতি এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি না ক'রে আলোচনা এবং মত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সময় দেবেন।

হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলন: দ্বিতীয় অধিবেশন

গত ২০শে পৌষ ১৩৪২ চাতরা নন্দলাল স্কুল গৃহে এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। বিচিত্রা সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর সভাপতিত্বের ভার পড়েছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কর্ত্তৃক অভিভাষণ পাঠের পর অভিনন্দন পত্রাদি প্রদান করা হয়। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় "পুরাতন ও আধুনিক" সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও কয়েক জন প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। কুমারী উমা মিত্র এবং কুমারী গৌরী সেন গুপ্তার গান এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অমর গোস্বামীর আবৃত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সভাপতির অভিভাষণের বিষয়-বস্তু ছিল, "সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের নূতন রূপ।"

সভায় পাঁচ শতাধিক মহিলা ও ভদ্রলোকের সমাগম হয়েছিল। তন্মধ্যে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দে, শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সভায় একটি স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাঁতারু মদনমোহন সিংহ

মদনমোহন সিংহ আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্য। এঁর বর্ত্তমান বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। গত বৎসর গঙ্গায় সাঁতার শিক্ষার পর প্রসিদ্ধ সাঁতারু শান্তিপালের শিক্ষাধীনে ইনি প্রভূত উন্নতি লাভ করেন। গত বৎসর শ্রীমান গঙ্গবক্ষে সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মাল্লিকের সহিত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, এবং ঐ বৎসরই হুগলীতে ১ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত মাল্লিককে পরাজিত ক'রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসর বেঙ্গল অলিম্পিক কর্ত্তৃক অনুমোদিত সকলগুলি প্রতিযোগিতায় শ্রীমান প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমানের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।

সাঁতারু মদনমোহন সিংহ

এঁর সাঁতার কাটবার ধরণ অত্যন্ত উন্নত ধরণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বিশ্বাস আগামী বার্লিন অলিম্পিকের জন্য ভারতবর্ষ হ'তে অল্পদূর সাঁতারের জন্য রাজারাম সাহুকে ও অধিকদূর সাঁতারের জন্য মদনমোহন সিংহকে নির্ব্বাচিত করলে সন্তরণ ক্ষেত্রে ভারতের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হ'বে।

লিলুয়া ই-আই-আর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

আমরা লিলুয়া ই-আই-আর রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদকের নিকট হ'তে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পত্রটি সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করলাম।

"আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লিলুয়া, ই, আই, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটের দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও টপ্পা উচ্চ-শ্রেণীর সঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত ও কীর্ত্তন এবং যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগে এসরাজ, সেতার, সুরবাহার, বেহালা ও তবলা সঙ্গত প্রতিযোগিবৃন্দের বয়সানুপাতে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণী বিভক্ত করিয়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও ব্যবস্থা হইয়াছে।

জানুয়ারী মাসের ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতার আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে।

বিশদ বিবরণী জ্ঞাত হইবার জন্য লিলুয়া ই, আই, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা বিভাগের সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট পাঁচ পয়সার ডাক টিকিট সহ আবেদন করুন।"

চিরন্তন সন্ধান

জীবনের সরসতা বৈচিত্র্যে। বৈচিত্র্য কে না খোঁজে? নিজের নিজের ধরণে আমরা সবাই তার সন্ধান করছি। মুস্কিল শুধু এই যে আজকের আনন্দ অতি সহজেই কাল বিষাদে পরিণত হয়। সুখের এ সন্ধান চিরন্তন।

অজানা পথে যারা জীবনের আনন্দ সন্ধান করতে যায় তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয় সবার আগে। নিজের দৌড় আমাদের জানা দরকার। আমাদের বোঝা উচিত এক পেয়ালা চায়ে যে সহজ আনন্দ পাওয়া যায়,—নিছক প্রাণের উল্লাসে যে আনন্দ আমরা গ্রহণ করি, তা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। বাঁচবার বাসনার আমাদের মধ্যে অভাব নেই, অভাব জীবনের উল্লাসের।

চা-পানের মত নিছক আনন্দের ব্যাপারে বুঝদার কোন লোক এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কারুর গায়েপড়া উপদেশ শুনতে রাজি হবে না। নিজের সুখের অধিকার সকলেরই আছে। নির্দ্দোষ সরল আনন্দ বেছে নেবার বেলায়ও যদি আমাদের অভিজ্ঞতার বিরোধী মতামত মেনে চলতে হয় তাহলে ত সত্যিই দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজের মন বুঝিনা বলেই আমাদের মাথা গোলমাল হয়ে যায়, আর কোনো সমাজেই বাস্তবাগীশ সেই সব মোড়লের অভাব নেই, পরের জীবন যাপনে শুধু নয় চিন্তা প্রণালীতেও বাধা দেওয়া যাদের কাজ।

চা-পানের ভেতর দোষ ধরবার সত্যি সত্যি কি যে আছে তা বুঝতে পারি না; আর এসব ছিদ্রান্বেষণ ভালও লাগে না। চা জীবনের আনন্দ বাড়িয়েই দেয়, কমায় না কোন দিকেই। শুধু তাই নয়। এদেশে চা যে পান করে সে সত্যিই সমাজের উপকারী। নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তর দ্বারা সে স্বদেশের এই উন্নতিশীল শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে। এই শিল্পই দশলক্ষের বেশী ভারতীয় শ্রমিকের কাজ জোগায়, এ সমস্ত শ্রমিকের অধিকাংশই এসেছে পল্লী অঞ্চল থেকে। ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। ভারতের মাটি থেকে প্রতি বৎসর চায়ের এই বিপুল সম্ভার যারা উৎপাদন করে সেই কৃষকেরা এবং তাদের সঙ্গে আরো অনেকে আমাদের মতই আনন্দের সন্ধানী; এই জাতীয় শিল্পই তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস।

ভারতে সত্যই এই চা-আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দেশবাসীকে চায়ের কথা আরো ভালো ক'রে জানান ও পানীয় হিসাবে তার ব্যবহার আরো বাড়িয়ে তোলা। খুব গভীরভাবে ভাবলে স্পষ্টই বোঝা যায় চায়ের আন্দোলন দেশবাসীকে উন্নততর জীবন ও গভীরতর আনন্দের সন্ধানে এগিয়ে দিচ্ছে।

ইউরোপে ভারতীয়া ছাত্রীদল

শ্রীঅরবিন্দ সিংহ

সুপ্রসিদ্ধ লয়েড্ ট্রিয়েষ্টিনো কোম্পানীর বিখ্যাত জাহাজ "কণ্টে রোসো" কুড়িজন ভারতীয়া ছাত্রী লইয়া ২৩শে মে ১৯৩৫ সালে বোম্বাই বন্দর পরিত্যাগ ক'রে। লাহোর ফোরম্যান্ খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ এস কে দত্ত মহাশয়ের বিদুষী ভার্য্যা এই দলের অধিনায়িকা। ভারতীয়া ছাত্রীদল লইয়া দত্তজায়ার ইউরোপ ভ্রমণ এই প্রথম নয়। ২৪শে মে ১৯৩৪ সালে তিনি ২১ জন ছাত্রী লইয়া ইউরোপের ইটালী, ফরাসী, জর্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করেন। এই প্রথম প্রচেষ্টায় তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে দ্বিতীয় বারের অভিযানে উৎসাহিত করে। এই প্রসঙ্গে যদিও বা দত্তজায়ার সামান্য পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হয়—তথাপি তাহা বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

দত্তজায়া বিদুষী স্বচ্ মহিলা Y.W. C.Aএর সহিত তাঁহার সম্পর্ক বহু পুরাতন। ১৯১৫ সালে তিনি Y. W. C. A এর National Secretary ছিলেন। তারপর ১৯১৮ সালে বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি ফরাসী দেশে যান এবং সেখানে Y.W.C.Aর বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তাঁহাকে দেওয়া হয়। যুদ্ধাবসানে ১৯১৯ সালে তিনি আবার তাঁহার কর্ম্মভূমি ভারতে চলিয়া আসেন এবং সেই বৎসরেই ডাঃ এস কে দত্ত মহাশয়কে (ইনি পাঞ্জাবী) বিবাহ করেন।

মহাযুদ্ধের পর জিনিভাতে যখন বহু প্রকারের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেই সময় সেখানে এক আন্তর্জাতিক ছাত্রীদলের প্রতিষ্ঠা হয়। দত্তজায়া ১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্টা ছিলেন এবং জিনিভা তাঁহার কর্ম্মজীবনের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই সময় তিনি পাশ্চাত্যের বহু বিখ্যাত নরনারীর ও তাহাদের নানান প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন এবং এইখানেই তিনি ভারতীয়া ছাত্রীদলের পশ্চিম ভ্রমণের প্রথম কল্পনা করেন।

গুজরাট, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশের ছাত্রী লইয়া এই দল গঠিত, এমন কি সুদূর আফগানিস্থানের প্রতিনিধিও আছে এই দলে, নাই শুধু বাংলার। লণ্ডনের ১১২ নং গাওয়ার ষ্ট্রিটে ভারতীয় ছাত্রাবাসে ইউরোপীয় ও ভারতীয় দুই প্রকার আহারের ব্যবস্থা আছে। এক মাস জাহাজে ও পশ্চিমের নানান্ দেশে পাশ্চাত্য খাবার খাইয়া ছাত্রীদলের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য গাওয়ার ষ্ট্রীটের ভারতীয় ভূরি ভোজন তাঁহাদের বিশেষ তৃপ্তিদায়ক হইয়াছিল। ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, ডিমের ডালনা,

লণ্ডন চেকোশ্লেভিয়াতে ভারতীয় ছাত্রীদল

লণ্ডন সহরে যে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এই সংবাদ তাঁহারা নাকি বহু পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন এবং সেই ক্ষীণ আশা তাঁহাদিগকে অনেক সময় সান্ধ্যভোজে আশ্বাস দিয়াছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিকের কন্যা এলিস্ ম্যাসারিক এই ছাত্রীদলকে চা'এর নিমন্ত্রণ করেন। তথায় চেকোশ্লোভাকিয়ার বহু বিখ্যাত নরনারী নিমন্ত্রিত হয়। ছাত্রীদলের বেশ ভূষা, কি বৃদ্ধা, কি তরুণী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাড়ী যে এমন সুন্দর সুবিন্যস্ত ভাবে পরিধান করা যায় তাহা এই পোষাকপাগল পশ্চিমের ধারণার বাহিরে। ঐ সেদিন নিউজ ক্রনিকল্ খবরের কাগজ শ্বেত দ্বীপের শ্রেষ্ঠ বাস পরিহিতা শ্বেত কন্যাকে এক হাজার পাউণ্ড পারিতোষিক দিল। অথচ এই দেশের প্রায় প্রত্যেক নরনারীর মতে ভারতীয় মেয়েদের সাড়ী নাকি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর! লণ্ডনেরও এক অভিজাত বংশে সময় সময় সাড়ীর ব্যবহার চলে। সেদিন কাভেণ্ট গার্ডেন 'অপেরা হাউসে' দু' এক অভিজাত মহিলা সাড়ী পরিয়া গিয়াছিলেন। তাই বলিয়া ইহারা যে কোন কালে আমাদের দেশের মেয়েদের মত সাড়ী পরিয়া ঘর সংসার করিবে সে অতি দুরাশা, কিন্তু রুচিশিল্পের দিক হইতে ইহা ভারতের এক মস্ত বড় দান। পশ্চিমে আজ সাড়ীর উপর নজর পড়িয়াছে। আমাদের মেয়েদের নিকটে শুনিলাম বহু স্থানে এদেশের মেয়েরা সাড়ী পরিবার কৌশল শিখিতে চাহিয়াছে। কে বলিতে পারে অতীতের কাশ্মীরী শালের মত বেনারসী সাড়ী হয় তো বা একদিন পশ্চিমের নারীজগতে আভিজাত্যের চিহ্নরূপে পরিগণিত না হইবে। ভারতের ব্যবসায়ীরা কি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না?

বেলজিয়ামে আসিয়া মেয়েরা দেশের রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, দুঃখের বিষয় তিনি আর ইহজগতে নাই। তিনি ভারতের নারী-জাগরণ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। যেখানেই ছাত্রীদল গিয়াছেন, সেখানেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সমাজ, সেবাসদন এই সবই তাঁহাদের প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল—ইংলণ্ডে তাঁহারা এইরূপ নানা প্রতিষ্ঠান দেখিয়া গিয়াছেন ও অনেক জায়গা হইতে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। ডচেস্ অফ্ ইয়র্কের সহিত ইঁহারা একদিন সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পান।

Lord Lothian একদিন এই ছাত্রীদলকে আলাপ-পরিচয়ের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান ও তথায় ইণ্ডিয়া বিল ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতীয়া নারীর স্থান, এই প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ১৫ই জুন তাঁহারা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন এবং ফিরিবার পথে ফ্রান্স হল্যাণ্ড ও সুইজ্যারল্যাণ্ড ভ্রমণ করিয়া ১০ই আগষ্ট ইটালী হইতে পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করেন।

বাংলাদেশে শিক্ষিতা মেয়ের অভাব নেই আর লক্ষ্মী সরস্বতীর কৃপা বহু বাড়ীতেই আছে, সেইজন্য যখন কোনও বাঙ্গালী মেয়েকে এই দলে দেখিতে পাইলাম না তখন সন্দেহ হইয়াছিল হয়তো বাংলাদেশে এ খবর পৌছায় নাই; কিন্তু দত্তজায়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, Associated Pressএর মারফতে তিনি সব স্থানেই খবর পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা হইতে কোনই উত্তর পান নাই। আগামী বৎসরে যে ছাত্রীদল আসিবে আশা করি তাহাতে যেন বাঙ্গালী মেয়ের অভাব না থাকে। জাহাজ ভাড়া ও অন্যান্য সমস্ত খরচ লইয়া প্রতি ছাত্রীর প্রায় ২,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

ছাত্রীদল ফিরিয়া চলিলেন পাশ্চাত্যের রুচি সৌন্দর্য্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্য বিলাসিতা ও নারী-স্বাধীনতার ছবি তাঁহাদের তরুণ মনে যে ভাবরাজ্যের সৃষ্টি করিবে তাহার প্রতিক্রিয়া চলিবে বহুদিন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিবার সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছেন, সেই জন্য এই ভ্রমণ তাঁহাদের মাতৃভূমির যাহা কিছু অসত্য ও অসুন্দর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া সত্য ও সুন্দরের মহিমাকে আরও সুন্দরতর করিয়া তুলিবে।

লণ্ডন

শ্রীঅরবিন্দ সিংহ

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya-Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and Published by the same from 27-1, Fariapooker St. Calcutta.

বিচিত্রা — অন্ধ বালিকা — শ্রীইন্দু রক্ষিত

ফাল্গুন, ১৩৪২

বিচিত্রা

নবম বর্ষ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৪২ | ২য় সংখ্যা

নানা কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের হৃদয় ছড়িয়ে আছে মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায়, তার গন্ধে তার গানে। অতীতকালের সংখ্যাতীত মৃত মানুষের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না প'রে আছে; তাই যখন শুনি আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সময়েও "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু" দেখা যেত, তখন আমাদের আপনাদের মধ্যে আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের সত্তা অনুভব করি, তাঁদের সেই মেঘদেখার সুখ আমাদের সুখের সঙ্গে যুক্ত হয়, বুঝতে পারি যাঁরা গেছেন তাঁরাও আছেন।

বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চেয়েছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি ছাপ দিয়ে গেছে। বহুদিন থেকে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে সে গাছে যেমন হরিৎবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে। আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে প্রতিফলিত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শতসহস্র সঙ্গীর বাস, স্বদেশে আমাদের শতসহস্র বৎসর পরমায়ু।

সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সঙ্গে আমাদের জীবনের তুলনা দিয়ে থাকে। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর থেকে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনি স্বাভাবিক যে একবার জাল ছিঁড়লে দেখতে দেখতে আবার শত শত বন্ধন গাঁথতে বসি, আবার ভুলি জাল ছিঁড়বেই। নতুন জায়গায় যাই সেখানে নতুন বন্ধন জড়াতে থাকি। সেখানকার গাছে ভূমিতে আকাশে, সেখানকার চন্দ্র সূর্য্য তারায়, সেখানকার মানুষে,

সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখানকার আচার ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন করে দিই, মাঝখানে রাখি আপনাকে। এমনি আমরা মাকড়সার জাতি।

আমরা বদ্ধ না হলে মুক্ত হতে পাইনা। ইংরাজিতে যাকে freedom বলে তা আমাদের নেই, বাংলায় যাকে স্বাধীনতা বলে তা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাই স্বাধীনতা। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ, আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যার গৃহ নেই, তাকে কখনো গাছের তলে, কখনো মাঠে, কখনো খড়ের গাদায়, কখনো দয়াবানের কুটীরে আশ্রয় নিতে হয়; যার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নয়। যে নৌকো হালের অধীন নয় সে কিছুতেই স্বাধীন বলে গর্ব্ব করতে পারে না, কারণ সে শতসহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ু-হিল্লোলের অধীনতায় দশদিকে ঘুরে মরতে হবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অতএব স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নয়, স্বাধীনতার অর্থ কখনো হাল কখনো নোঙরের শৃঙ্খলকে সম্মান করা।

সেদিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করছিলেন, নূতন কবির আর প্রয়োজন কী? পুরাতন কবির কবিতা তো বিস্তর আছে। নূতন কথা এমনই কী বলা-হচ্ছে? পুরাতন নিয়েই তো কাজ চলে যায়।

নূতনই পুরাতনকে রক্ষা করে থাকে। পুরাতনের মধ্যেই নূতনের বাস। নূতন পুরাতনে বিচ্ছেদ হলেই জীবনের অবসান। যেদিন দেখব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠছে না, সেদিন জানব পুরাতন কবিদের সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়েছে।

নূতন কবিতার ধারা শুষ্ক হলে পুরাতনে পৌঁছবার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ করে রাখছে কে? নূতন কবিতা।

প্রত্যেক বসন্ত পুরাতনকেই পায় নূতন গানে নূতন ফুলে। আমরা বলি নবীন বসন্ত কিন্তু প্রত্যেক বসন্তই পুরাতন বসন্ত।

ব্যাপ্ত হলে যা অন্ধকার, সংহত হলে তা আলোক, আরো সংহত হইলে তা অগ্নি। সংহতিই প্রাণ। সংহত হলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। আমরা জড়োপাসক শক্তি-উপাসক বলেই বৃহত্ত্বের উপাসনা করে থাকি, বৃহত্ত্বে অভিভূত হয়ে যাই। কিন্তু বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র

অধিক আশ্চর্য্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পরাশি অপেক্ষা এক বিন্দু জল আশ্চর্য্য। সুবিস্তৃত নীহারিকা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সৌরজগৎ আশ্চর্য্য। আরম্ভ বৃহৎ, পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্ত্তের মুখ অতি বৃহৎ, আবর্ত্তের শেষ বিন্দুমাত্র। সুবিশাল জগৎ ঘুরে ঘুরে এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে বিন্দুত্বের দিকে চলে। কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সংক্ষিপ্ত হয়ে কেন্দ্রত্বে আত্মবিসর্জ্জন করতে যায়।

যত বৃহৎ হই তত দেশকালের অধীন হতে হয়। আয়তন নিয়ে আমাদের নিরন্তর যুদ্ধ। কার সঙ্গে? দানব কাল ও দানব দেশের সঙ্গে। দেশকাল বলে—আয়তন আমার; আমার জিনিষ আমাকে ফিরিয়ে দাও। অবিশ্রাম লড়াই করে অবশেষে কেড়ে নেয়। শ্মশানক্ষেত্রে তার ডিক্রিজারি।

কিন্তু আমরা জানি অমরা মৃত্যুকে জিতব। অর্থাৎ দেশকালকে অতিক্রম করব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে এক সেনাপতি আছে। সে যুদ্ধ করছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরছে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নেই। আমরা সংহতিকে অধিকার করে ব্যাপ্তিকে জিতব—মনুষ্যত্বের এই সাধনা।

•

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাষ্পের মতো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। হু হু করে ব্যাপ্ত হয়ে পড়া যেমন বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ, আমরাও তেমনি স্বভাবতই চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি। অভ্যন্তরে সুদৃঢ় আকর্ষণশক্তি না থাকলে আপন হয়ে আমরা পর হয়ে যাই। আপনাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করাই শক্ত। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে স্থায়ী হবার জন্য বৃহৎ সংসারের আশ্রয় ছেড়ে সূচ্যগ্রস্থানের জন্যই লড়াই করেন। তাঁরা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করবেন। সঙ্কীর্ণতার বলে পরিকীর্ণতা লাভ করবেন।

সংহত দীপশিখা তার আলোকে সমস্ত গৃহ অধিকার করে। কিন্তু সেই শিখা যখন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কড়িতে বরগায় তার উপকরণে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে তখন গৃহই তাকে বদ্ধ করে রাখে, সে জাগতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হব ততটা অধিকার করব, এর উল্টোটাই ঠিক। অর্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হবে তুমি ততই অধিকৃত হবে। কিন্তু চারিদিক থেকে আপনাকে প্রত্যাহার করে যখন বহ্নিশিখার মতো স্বতন্ত্র দীপ্তি পাবে তখন তোমার সেই তেজস্বী স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারিদিক উজ্জ্বলরূপে অধিকার করতে পারবে।

ভারতবর্ষীয় চরম সাধনার লক্ষ্য সংহতি অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগ। প্রাণশক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সংহত করতে পারলে তবেই অন্তরকে বাহিরকে জয় করা যায়।

আমার কোনো বন্ধু লিখেছেন অতীতকাল অমরাবতী। অতীতে অমৃত আছে। অতীত সংক্ষিপ্তি। বর্ত্তমান কেবল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত, অতীতকালে সেই মুহূর্ত্তরাশি সংহত হয়ে যায়।

বর্ত্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। যাকে প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে দেখি আমরা প্রতিক্ষণে তার মৃত্যুই দেখতে পাই, যাকে অতীতে দেখি তার অমরতা দেখতে পাই।

যখন গড়তে আরম্ভ করি তখনই প্রতিমা চোখের সম্মুখে জেগে থাকে, যখন শেষ করে ফেলি তখন দেখি তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুদূর লক্ষ্যাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তখন লক্ষ্যের প্রতি এত টান যে লক্ষ্য যেন প্রত্যক্ষ, আর পথপ্রান্তে যখন যাত্রা শেষ করি তখন পথের প্রতি এত মায়া যে লক্ষ্য আর মনে পড়ে না। যাকে আশা করি তাকে যতখানি পাই আশা পূর্ণ হলে তাকে আর ততখানি পাইনে। অর্থাৎ চাইলে যতখানি পাই পেলে ততখানি পাই না।

আসল কথা শেষ মানুষের হাতে নেই। 'শেষ হ'ল' বলে যে আমরা দুঃখ করি তার অর্থ এই— শেষ হয়নি তবুও শেষ হ'ল! আকাঙ্ক্ষা রয়েছে অথচ চেষ্টার অবসান হল। এইজন্য মানুষের কাছে শেষের অর্থ দুঃখ। কারণ মানুষের সমাপ্তির অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১২৯২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সরস্বতী পূজা

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌

কাল যে দেবীর আমরা অর্চ্চনা ক'রেছি তিনি কলার দেবতা ও বিদ্যার দেবতা। তাঁর হাতের বীণা যে-কলার প্রতীক তা স্পষ্টই ললিতকলা। তাঁর হাতের পুঁথি হস্তলিখিত পুস্তক,—নিশ্চয়ই কাব্য-গ্রন্থ। কিন্তু বাগ্‌দেবী ত স্তুধু রসাত্মক বাক্যের দেবতা নন; বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ—জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান সকলের তিনি অধিদেবতা। কাব্য যে এ সবার প্রতিনিধি তার অর্থ সরস্বতী যে-বিদ্যার দেবতা সে বিদ্যা কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় নয়। আমাদের দেশের রসবেত্তারা কাব্যের আস্বাদকে বলেছেন ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর, অর্থাৎ সে আস্বাদের ফল কি এ প্রশ্ন ওঠে না, যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের ফল কি এ প্রশ্ন মূর্খের জিজ্ঞাসা। মানুষের মনের প্রাচুর্য্য তার সাংসারিক প্রয়োজনের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে নিজের স্বচ্ছন্দ লীলায় যে-সব বিদ্যার সৃষ্টি ক'রেছে সরস্বতী সেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যে বিদ্যা স্তুধু কর্ম্মের উপায় তার দেবতা সরস্বতী নন, বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মারও পূজা আছে, কিন্তু সে পূজা সরস্বতী পূজা নয়। ললিতকলার সঙ্গে সারস্বত বিদ্যার এখানেই মিল। মানুষের জৈবিক প্রয়োজনে এরা নিরাসক্ত। এদের রসচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চা সাংসারিক কামনার গন্ধশূন্য। সরস্বতী বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের দেবতা, কারখানার যন্ত্রশালার নয়; আর্টিষ্টের তিনি উপাস্য দেবী, আর্টিজেনের নয়।

সরস্বতী পূজার এই তত্ত্ব আজকের দিনে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। পৃথিবী জুড়ে মানুষের জীবনযাত্রা আজ জটিল হ'য়ে উঠেছে; তার উপকরণ ও উপায়ের ভার দিন দিন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠছে। জাতিতে জাতিতে এ নিয়ে প্রকট ও গোপন দ্বন্দ্বের বিরাম নেই। প্রত্যেক সভ্যজাতির জীবিকা-সঞ্চয়ের চেষ্টা অপর সব সভ্যজাতির কাছে আজ বিভীষিকা। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিষয়ের আয়োজনে প্রতি জাতিকে তার উৎসাহ ও বুদ্ধির নিয়োগ করতে হচ্ছে আপ্রাণ চেষ্টায়। মানুষের ইতিহাসে সব চেয়ে দীর্ঘ যুগ শরীরের কাছে মনের দাসত্বের যুগ, যে যুগে মনের যা কিছু চেষ্টা তার লক্ষ্য ছিল শরীরের প্রয়োজন মেটান। এ দাসত্ব থেকে মনের আংশিক মুক্তি মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে অতি অল্পদিনের কথা। এই মুক্ত মনের মনন চেষ্টার ফল জ্ঞান-বিজ্ঞান কাব্য-কলা, সভ্যতার যা পরম সম্পদ। আজ যদি সভ্যমানুষের মনকে আবার নিঃশেষে ব্যয় ক'রতে হয় জীবিকা সংগ্রহের প্রতিযোগিতায়, তবে সে ফিরে যাত্রা সুরু ক'রবে সেই আদিম বর্ব্বরতার দাসত্বের দিকে। শরীর মহারাজের প্রয়োজন যে ইতিমধ্যে বিরাট ও বিচিত্র রূপ ধারণ ক'রেছে, আর মনের শক্তি ও প্রসার বেড়েছে লক্ষগুণে তাতে এ সত্য ঢাকা পড়ে না। উপকরণের বাহুল্য দিয়ে শরীরকে দেহাতিরিক্ত আর কিছু করা যায় না, প্রচুর কাজে প্রচণ্ড শক্তি ও বিপুল বুদ্ধি নিয়োগ ক'রছে বলেই দাস অদাস হয় না।

আমরা পূব দেশের লোক, যারা এ যুগের জীবনযাত্রার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছি, এ ভ্রান্তি তাদের মনে আসা স্বাভাবিক। পশ্চিম দেশের লোকদের যে প্রবল কর্ম্ম-শক্তিতে আমরা অভিভূত তার প্রকট মূর্ত্তি হচ্ছে জীবনযাপনের উপকরণ সৃষ্টিতে মনের বিপুল উদ্যম। এ উদ্যম যে সম্ভব হ'য়েছে পশ্চিমের মুক্ত মনের জ্ঞানের নিষ্কাম তপস্যায়, চোখ চেয়ে না দেখ্‌লে সে খবর গোপন থেকে যায়। ভুল হয় পশ্চিমের প্রতিনিধি বুঝি আইনষ্টিন নয়, হেনরি ফোর্ড। আধুনিক ইউরোপ মানুষের মনকে মুক্তি দিয়ে ব্যবহার-নিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বিরাট সৃষ্টি ক'রে চলেছে, তার অতি সামান্য, স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য, কাজে লাগিয়ে পশ্চিমের মানুষ অভাবের মহৎ ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় পেয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বহতা ভাগীরথী থেকে ইউরোপের কলকারখানা, সাবমেরীন-এরোপ্লেন সেচের ছোট ছোট কাটা খাল। জলের

অভাবে যাদের ক্ষেত শুকিয়ে যাচ্ছে নদীর চেয়ে খালের প্রয়োজন তাদের কাছে বেশী মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবে বিনা নদীতে খাল কাট্‌লে তাতে জল-সঞ্চারের অবশ্য সম্ভাবনা নেই।

জীবিকা-সংগ্রহের কাড়াকাড়িতে কোণঠাসা হ'য়ে আজ আমরা আমাদের শিক্ষার নিন্দা ক'রছি। বলছি সে শিক্ষার দোষ যে, তা 'ভোকেসনাল্' নয়; তা আমাদের জীবিকা উপার্জ্জনের হদিস ব'লে দেয় না। কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে যখন আমাদের টিকে থাকৃতে হবে তখন 'ভোকেসনাল' শিক্ষাব প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহ নেই; কিন্তু একথা যেন মনে না করি যে শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছাত্রকে জীবিকা অর্জ্জনের উপযুক্ত করা। এ ভুল যেন না করি যে ইউরোপের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফল ক্লাইব ষ্ট্রীটের বড় সাহেব। দুর্ভাগ্য সেই মানুষ, হতভাগ্য সেই জাতি যার মনের সমস্ত শক্তি খরচ হ'য়ে যায় সুধু জীবিকার অন্বেষণে। ব্যর্থ সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীকে শেখায় না শুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ আনন্দের সৃষ্টিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'র্‌তে। আজকের চাপাচাপির পৃথিবীতে খুব সম্ভব প্রত্যেক জাতির মনের প্রকাণ্ড অংশকে ব্যয় ক'র্‌তে হবে সুধু বেঁচে থাকার চেষ্টায়। কিন্তু মানুষের বিরাট মন 'ব্যাপ্য তিষ্ঠেদ্দশাঙ্গুলম্‌' প্রাণের সমস্ত দাবী মিটিয়েও নিঃশেষ হ'য়ে যায় না। যাদের হয় তারা সভ্যতার পোষাক প'রলেও অন্তরে বর্ব্বর।

বিশ্বকর্ম্মা ও লক্ষ্মীর পূজার অর্ঘ্য আমাদের রচনা ক'র্‌তে হবেই। কিন্তু প্রাচীন ও বর্ত্তমান পৃথিবীর যারা শ্রেষ্ঠ-জাতি, মানুষের সভ্যতাকে যারা ঐশ্বর্য্যশালী ক'রেছে, তারা তাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়েছে দেবী সরস্বতীর পূজায়। অন্নলোকের উর্দ্ধে যে বিজ্ঞান ও আনন্দলোক মানুষকে তারা তার যাত্রাপথ দেখিয়েছে। জীবিকা-যুদ্ধের কঠোরতায় আমরা যেন দীনচিত্তে সুধু এই প্রার্থনা না করি, 'Give us our daily bread'। এ প্রার্থনাও যেন ক'রতে পারি

> বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চযৎ।
> ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥

অন্ন আমাদের চাই, কিন্তু অন্নসর্ব্বস্বতা থেকে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।

গত ১৫ই মাঘ ১৩৪২ কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সারস্বত সম্মেলনে পঠিত

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বিদায়ের ভয়

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

সে দিন তুমি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলে বকুল তলার পাশ দিয়ে মেঠো রাস্তার পথ ধরে, আমি তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম একদৃষ্টে।

পথকে তুমি ক্রমেই পিছনে ফেলে যাচ্ছিলে আমার দিকে, আমি যেন আর তাকে টেনে টেনে শেষ করতে পারি না, ব্যাকুল হয়ে তোমার স্পর্শ পেতে অন্তরের শত বাহু বাড়িয়ে দিই, নাগাল পাই না। এই ত তুমি ছিলে কাছে, এখন চলে যাচ্ছ দূরে, আরও দূরে।

আমার মনকে মেলে ধরেছিলাম তোমার চলার পথে পথে। সে তোমার পদতলের গতির স্পর্শ পেয়েও যেন পায় না, তুমি কেবলই সরে যাচ্ছ সামনে।

ঐ মাঠ পার হয়ে উঁচু ডাঙ্গা, তার পরে ডাইনে ঘুরে বাঁক, সেখান দিয়েই তুমি যাবে। তার পরে—তারপরে ঐ গাঁয়ের আড়াল, সেখানে গেলে আর তোমাকে দেখা যাবে না।

দেখা যাবে না?—মনটা কেঁপে উঠল।

তুমি গাঁয়ের আড়ালে গিয়ে অদৃশ্য হলে। কোথায় গেলে, কে জানে। আমি উচ্চকিত দৃষ্টি মেলে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম ঐ তোমার অন্তর্দ্ধান-পথের দিকে। দিনের আলো ঝাপসা হয়ে এল, রাত্রির অন্ধকার বিস্তীর্ণ হল দিক দিগন্তে। আজ তুমি এসেছ যদি, কাছে বস; কথা বল, সব ভুলে গিয়ে বসে থাক এই নিরালায় আমার পাশে। যাওয়ার কথা আর বলো না, যাবে ত ঐ সেদিনকার পথ দিয়েই। সে পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, কে জানে।

আজ তুমি শুধু বসে থাক আমার হাতে হাত রেখে

আদর্শ বনাম বাস্তব

অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌-এ

আধুনিক যুগের বহু সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে আদর্শবাদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের সুর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ইবসেন ছিলেন এই বিদ্রোহস্পৃহার কেন্দ্রবর্ত্তী প্রভাব। ইঁহারা চান আদর্শের চাপ হইতে ব্যক্তি-মানবকে মুক্তি দিতে। কথাটা একটু তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। সমাজে, গৃহে, ধর্ম্মে, রাজনীতিতে বিচারালয়ে, বিষয়-কর্ম্মে—সর্ব্বত্রই আমরা কতকগুলি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়া চলিতেছি। এই পূজা যে যত নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করে, প্রাত্যহিক জীবনে এই আদর্শগুলিকে যে যত মানিয়া চলে সেই হিসাবে সে লোকসমাজে মর্য্যাদা পায় ও ভাল-লোক বলিয়া পরিগণিত হয়। আদর্শগুলি যে সব সময়ে এক থাকে তাহা নহে, যুগে যুগে তাহাদের রূপান্তর হয়, এক আদর্শের স্থানে অন্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়, নবনব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাহারা শরীর গ্রহণ করে। কিন্তু এমন কোন যুগ মানুষের ইতিহাসে পাওয়া যায় না যখন সমাজে কোন আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা নাই। বাস্তবিক ইতিহাস ধরিয়া বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে এই আদর্শপূজা মানব প্রকৃতিরই একটি বিশেষ ধর্ম্ম। শুধু তাহাই নহে—এই আদর্শপূজাই মানবসমাজ ও মানব সভ্যতার উন্নতির মূল কারণ। যাহা আছে, যাহা বাস্তব, তাহাতেই যদি মানুষ চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিত তাহা হইলে উন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিত না। ভারতের বর্ণাশ্রম, গ্রীসের সৌন্দর্য্যপূজা, ইউরোপীয় মধ্যযুগের বীরধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্ম, রেনাসেন্স যুগের ঐহিকতা মাননিকতা, ফরাসী বিদ্রোহের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সাধনা, এই সমস্ত আদর্শের সাধনাই ত মানব সভ্যতার ইতিহাস।

তাই যদি হইল তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ কেন? এ যে সভ্যতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ! মানুষ কি তাহা হইলে সমস্ত আদর্শ ত্যাগ করিয়া জড় বাস্তবের সেবা করিতে করিতে তাহার আদিম পশুত্বে ফিরিয়া যাইবে? কথাটা কিন্তু এত সরল নয়। কারণ মানুষের প্রকৃতি জটিল—তাহাতে নানা তত্ত্ব দ্বন্দ্ব করিতে করিতে চলিয়াছে। সে চলিতেও চায়, আবার বসিয়া থাকিতেও ভালবাসে; তারকামণ্ডিত সুনীল আকাশ দূর হইতে তাহাকে ডাক দেয়, আবার শ্যামল ধরণীর স্নেহবন্ধনও সে ছিঁড়িতে পারে না; আত্মা তাহার ভূমা ও অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে চায়, ইন্দ্রিয় তাহাকে সসীম সান্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখে; সে একদিকে আদর্শপন্থী অন্যদিকে বাস্তবপন্থী। যাঁহারা বলেন মানুষ স্বভাবতঃ বাস্তবধর্ম্মী, কেবল কতকগুলি চতুর বা বাতুল লোকের ফন্দী বা খেয়ালে পড়িয়া সে আদর্শরূপী আকাশকুসুমের ব্যর্থ সন্ধানে ঘুরিয়া মরে মাত্র—তাঁহারা ভুল বলেন। আবার যাঁহারা বলেন আদর্শ-সাধনাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বাস্তবটা একটা জড় বাধামাত্র সহজেই তাহাকে সরাইয়া দিয়া মানুষ তাহার দিব্য স্বরূপ লাভ করিতে পারে, তাঁহারাও একদেশদর্শী। বাস্তবিক পক্ষে আদর্শের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের আকর্ষণ উভয়ই মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বস্তু। কোনটিই বাহির হইতে আসিয়া মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসে নাই। সুতরাং আদর্শ ও বাস্তবের এই দ্বন্দ্ব মানব জীবনের চিরন্তন সমস্যা। মানুষ অনেক সময় এই সমস্যার সহজ সমাধানকল্পে এ দ্বন্দ্ব স্বীকার করিতে চায় নাই। সে কখনও বলিয়াছে—"আদর্শ একটা কাল্পনিক বস্তু, আকাশকুসুম মাত্র; বাস্তবই একমাত্র সত্য-বস্তু; আদর্শ কেবল মায়া মরীচিকার ন্যায় মানুষকে বাস্তববিমুখ করিয়া মারে—অতএব এ মায়াকুহক কাটাইয়া বাস্তবকে আঁকড়াইয়া ধর, তাহাতেই জীবন চরিতার্থ হইবে।" আবার কখনও সে আদর্শকেই একমাত্র সত্য মানিয়া লইয়া বাস্তবকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। বাস্তবের দাবী প্রকৃতির দাবী

অস্বীকার করিয়া সে আদর্শের আকাশমার্গে উড়িতে চাহিয়াছে। এ উভয় চেষ্টার কোনটিই সম্পূর্ণ বা স্থায়ী সাফল্য লাভ করে নাই। এই একদেশদর্শী সমাধানের বিরুদ্ধে মানব-প্রকৃতি বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসের যে মূলধারা তাহার মধ্যে দেখা যায় মানব-প্রতিভা একদেশদর্শী চরম পন্থার নেশা কাটাইয়া ধীরে ধীরে বহু আয়াসে এক সমন্বয় পন্থা কাটিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। সে এমন কতকগুলি রীতি নীতি আচার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে যাহাতে দেহের সহিত আত্মা, কর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম, জড়ের সহিত চেতন, প্রবৃত্তির সহিত ভাবরস, মর্ত্ত্যের সহিত স্বর্গ, বাস্তবের সহিত আদর্শ পরিণয় সম্বন্ধে গ্রথিত হইয়া যায়। স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্মিলন একটা প্রাকৃত ব্যাপার; সেই প্রাকৃত ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিল বিবাহ ও গৃহধর্ম্ম, একনিষ্ঠ প্রেম ও কল্যাণের আদর্শ। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের আধিপত্য একটা প্রাকৃত ব্যাপার; এই বাস্তব ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিল রাজ-ধর্ম্মের বিরাট আদর্শ। আদিম মানব জীবনসংগ্রামে পদে পদে নানা রহস্যময় অজ্ঞাত শক্তির পরিচয় পাইয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, এই সমস্ত বিরাট বিশ্বশক্তির সম্মুখে নিজের নিঃসহায় অক্ষমতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, এ হইল একটা প্রাকৃত অনুভূতি। এই প্রাকৃত অনুভূতির উপর গড়িয়া উঠিল বিচিত্র ধর্ম্মপদ্ধতি ও উপাসনামন্দির। বাস্তব ও আদর্শের এই পরিণয়—ইহাই হইল মানব সভ্যতার যুগব্যাপী সাধনা। পঙ্ক ও পঙ্কজ, ধরিত্রী ও আকাশ, বন্ধন ও মুক্তি, ইহারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া যে সমৃদ্ধ সুষমা লাভ করে, তাহারই সাধনায় মানুষ নানা ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতেছে।

মনে রাখিতে হইবে এ সাধনা এখনও চলিতেছে, সিদ্ধি বহু দূরে—হয়ত এ সাধনার শেষ নাই। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি-মানব এই সাধনায় লিপ্ত থাকিয়াই নিজ নিজ জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতেছে। মানুষ বুঝিয়া লইয়াছে যে আদর্শকে ছাড়িয়াও তাহার নিস্তার নাই, বাস্তবকে উড়াইয়া দিবারও উপায় নাই। এবং উভয়ের সমন্বয় সাধনের একটা পদ্ধতিও সে আবিষ্কার করিয়াছে এবং সমাজ-ব্যবস্থায়, ধর্ম্মানুশাসনে, সাহিত্যে, শিল্পে, সর্ব্বত্র এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনও গোল মিটিতেছে না। যত সহজ করিয়া এতক্ষণ বুঝিবার চেষ্টা করা গেল ব্যাপারটি তাহা অপেক্ষা অনেক জটিল। সমস্ত মানুষের প্রকৃতির গঠন যদি একরূপ হইত এবং চিরকাল একরূপ থাকিত, সমস্ত মানুষের মনে যদি আদর্শের কল্পনা একরূপ হইত এবং বাস্তবের ধারণা এক হইত, তাহা হইলে এ সমস্যা এত জটিল হইত না। কিন্তু তাহা নহে। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন এবং পরিবর্ত্তনশীল। কেহ বা বাস্তব অপেক্ষা আদর্শের আকর্ষণ অধিক অনুভব করেন, কেহ বা আদর্শ অপেক্ষা বাস্তবেই অধিক অনুরক্ত। আবার আদর্শের কল্পনাও সকলের এক নহে। দেশ কাল জাতি, শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা কারণে মানুষে মানুষে বৈষম্যের অন্ত নাই। কিন্তু এই বৈষম্যই চরম সত্য নহে; যদি হইত তাহা হইলে মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠিত না। কারণ "সভ্যতা" জিনিষটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। যেখানে সভা নাই অর্থাৎ মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র নাই, সেখানে সভ্যতা নাই, অর্থাৎ সমাজ নাই, রাষ্ট্র নাই, ধর্ম্ম নাই, সাহিত্য নাই, শিল্প নাই। ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা বা individualismএর চরম পরিণতি অরণ্য-বৃত্তি। মানুষ বহুকাল পূর্ব্বে সে অরণ্য-বাস ছাড়িয়া লোকালয় গঠন করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়াছে যে নানা ভেদ-বৈচিত্র্যের অন্তরালে মানুষে মানুষে একটা গভীর ঐক্য আছে। এই ঐক্যানুভূতির ব্যাপ্তি ও নিবিড়তা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে একরূপ হয় নাই, তথাপি ইহারই প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র সমাজ প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং এইরূপে প্রত্যেক দেশ, জাতি বা সমাজের মধ্যে সাধারণ ভাবে কতকগুলি আদর্শ আদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি সমাজের ইতিহাসেই দেখা যায় এক এক যুগে এক একটা ভাবের বন্যা আসিয়া সেই সেই সমাজ বা জাতির ঐক্যানুভূতি প্রবল করিয়া দিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের এই সমস্ত সন্ধিক্ষণে সমাজের উচ্চ নীচ সকলেই সমস্ত পার্থক্য ভুলিয়া এক মহৎ আদর্শের পতাকা তলে সমবেত হইয়াছেন। যতদিন এই ভাব-বন্যা প্রবল থাকে ততদিন ব্যক্তিগত বৈষম্য

চাপা পড়িয়া থাকে, মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু বন্যা চিরকাল থাকে না, কিছুদিন পরে নামিয়া যায়। সমাজ কিন্তু সহজে এ ভাব-সম্পদ চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিতে চাহে না। সাহিত্য, শিল্প, রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নানা ভাণ্ডের মধ্যে এই ভাবসম্পদ স্থায়ী ভাবে ধরিয়া রাখিতে চায়। শুষ্কতার দিনে, অবসাদের দিনে এই সঞ্চিত ভাব ও আদর্শই তাহার জীবনযাত্রার প্রধান মূলধন

তাহার পর গোল বাধিতে থাকে। বন্যা নামিয়া গেলে যেমন গাছ পালা তৃণ গুল্ম সমস্ত আবার মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠে, ভাবের বন্যা নামিয়া গেলেও মানুষের নানামুখী প্রকৃতি নিজ নিজ স্বরূপ ধারণ করিয়া বৈষম্য ফুটাইয়া তুলে। প্রথাপ্রতিষ্ঠানধৃত ভাব ও আদর্শ সকল মানুষের মনের উপর আর তেমন ভাবে রাজত্ব করিতে পারে না। প্রচলিত প্রথায় শাসন, প্রতিষ্ঠিত আদর্শের ছাপ তখন মানুষের অন্তরাত্মাকে বাহির হইতে পীড়ন করিতে থাকে। সমাজে তখন দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক নিরীহ, ধর্ম্মভীরু, প্রচলিত আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং যথাসাধ্য সেই আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করিতে যত্নবান। বিদ্রোহী প্রবৃত্তি, বিরুদ্ধ চিন্তা দমন করিয়া পরম্পরাগত ধর্ম্মসাধনায় আত্মনিয়োগ—এই হইল তাঁহাদের জীবনের গতি। আত্মদমন, আত্মশাসন, আত্মপীড়ন—এই তাঁহাদের সাধনা। সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর লোক উঠিয়া পড়েন যাঁহারা অপরকে শাসন ও শোষণ করিয়া আত্মপুষ্টি করেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হন প্রচলিত আদর্শের ধ্বজাধারী সমাজযন্ত্রের পরিচালকরূপে। তোমরা ধর্ম্মপালন কর, আত্মপীড়ন কর, আত্মবিসর্জ্জন কর, আমি তাহার ফল ভোগ করি, আমি চাই ভোগ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, তোমরা হও আমার ভোগৈশ্বর্য্য সাধনার যন্ত্র এই হইল তাঁহাদের মনের কথা,—সুতরাং উভয় দলে সম্বন্ধ দাঁড়াইল যন্ত্র ও যন্ত্রীর সম্বন্ধ।

কিন্তু এ অবস্থা অস্বাভাবিক। মানুষ মানুষের যন্ত্র হইয়া থাকিবে, ইহা অপেক্ষা মানবত্বের ঘোরতর অবমাননা কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের অন্তরাত্মা চায় স্বাধীন বিকাশ, স্বাধীন স্ফূর্ত্তি। আমি তোমার পায়ে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে পারি, তোমার দাসত্ব স্বীকার করিতে পারি আমার অন্তরাত্মার প্রেরণায়, তাহাতে আমার কোন অবমাননা বা গ্লানি নাই। কিন্তু তুমি আমাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবে, তোমার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমাকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া লইবে, তাহাতে আমার চরিতার্থতা কোথায়? এ অবস্থায় বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। এবং এই বিদ্রোহের বাণীই আধুনিক সাহিত্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। পতি স্বচ্ছন্দচারী, পত্নী হইবে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আদর্শ; প্রবল জাতি ভোগ-সমৃদ্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত, দুর্ব্বল জাতি হইবে তাহার সাম্রাজ্য-লালসাগ্নির ইন্ধন, তাহার উন্নত সভ্যতার ভারবাহী সেবক, মহাজন ক্রোড়পতি হইবেন, শ্রমিক হইবে তাঁহার যন্ত্র এবং শ্রমমাহাত্ম্য আদর্শের উপাসক; পিতা নিজ জীবনে তাঁহার বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিলেন না, পিতৃভক্ত পুত্র তাহার অন্তরাত্মার প্রেরণা উপেক্ষা করিয়া হইবে পিতৃ-কামনা সাধনের যন্ত্র—এইরূপ নানা আকারে চারিদিকে মানবাত্মার যে পীড়ন ও অবমাননা চলিতেছে তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছেন ইবসেন ও তদনুবর্ত্তী বহু আধুনিক সাহিত্যিক।

তাঁহারা বলিতেছেন—"মানবাত্মাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দাও;—যে ধর্ম্ম এখন কেবল বাহিরে, আকার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ, যে আদর্শের প্রেরণা মানুষ অন্তরে অনুভব করিতেছে না সেই বাহ্য আদর্শের শুষ্ক ও ব্যর্থ সাধনা হইতে মানুষকে মুক্তি দাও। মানুষকে পুনরায় তাহার বাস্তব ভিত্তিতে দাঁড় করাইয়া দাও। যাহা অসত্য, যাহা ভান ও ভণ্ডামি মাত্র তাহা হইতে কোন কল্যাণের উদ্ভব হইতে পারে না। মিথ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলে তবে মানুষ নিজের অন্তরাত্মার প্রেরণা হইতে পুনরায় এবং নূতন জীবন লাভ করিবে, নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিবে।

এই হইল ইবসেনিয়ানার বাণী। কিন্তু ইহাই কি চরম কথা? ইহাতে মিথ্যার আগাছা সরাইয়া নূতন ফসলের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কথা আছে, কিন্তু নূতন সৃষ্টির বীজমন্ত্র নাই। আদর্শ ও বাস্তবের পরিণয় সাধনের জন্য মানব সভ্যতার যে যুগব্যাপী আকাঙ্ক্ষা,—সে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির উপযোগী কোন কল্পনা বা চিন্তার আভাস তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে

সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। মানুষ বাহিরের পুঞ্জীভূত আদর্শের চাপ হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া নিজের অন্তরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেখানে যদি দেবতার আসন শূন্য দেখে, সেখানে যদি বাস্তব প্রবৃত্তির শুষ্ক কোলাহল ভিন্ন গভীরতর সঙ্গীত সে না শুনিতে পায়, তাহা হইলে সে কি করিবে? বাহিরের দেবতাকে সে বর্জ্জন করিল বটে কিন্তু অন্তরের দেবতাকে সে জাগাইয়া তুলিবে কি প্রকারে? যে পরম্পরাগত মানব-সভ্যতা আজ তাহাকে বাহির হইতে পীড়ন করিতেছে তাহার মধ্যেও কি ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ প্রচ্ছন্ন নাই? ব্যক্তি-মানবকে নিজের চরম চরিতার্থতা লাভের জন্য পুনরায় কি সমষ্টিমানবের দ্বারস্থ হইতে হইবে না? এ সব প্রশ্ন এখনই উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্র সাহিত্যে এ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা পাওয়া যায় না। সে সাহিত্য মুখ্যতঃ যৌবনধর্ম্মী; তাহাতে যৌবনের উদ্দীপনা আছে; যৌবনের স্বপ্নাভিযান আছে; বার্দ্ধক্যের স্থবির বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে; আবার সঙ্গে সঙ্গে আছে জ্বালা, বিক্ষোভ, অশান্তি, অবসাদ, অকাল বার্দ্ধক্য। তাহাতে নাই পরিণত বুদ্ধির সমগ্রদর্শিতা, নিরন্ত-সংযুক্ত বিচিত্র কর্ম্মপ্রচেষ্টার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী প্রেরণা, সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করিবার অপ্রমত্ত ধৈর্য্যশীল সাধনা। নব সৃষ্টির প্রবর্ত্তক এই প্রৌঢ় সাহিত্যের প্রতীক্ষায় যৌবন-পরিশ্রান্ত মানব আজ উন্মুখ হইয়া আছে।

গত ১৫ই মাঘ, ১৩৪২ কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে সারস্বত সম্মেলনে পঠিত

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

অকাল বর্ষণ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বিদায় তোমারে দিয়াছে যাহারা শ্রাবণ শেষে,—
তাহাদেরি দ্বারে আসিলে আবার ক্ষণিক হেসে।
নূতনের গীতি নূতন বাঁশীতে
বেজে উঠেছিল এই ধরণীতে,
এমন সময় প্রাচীন বন্ধু পুরাণো বেশে
তাহাদেরি দ্বারে আসিলে আবার তেমনি হেসে।

সহসা হেরিনু বেতসের বনে জাগিল সাড়া,—
মাতিয়া উঠিল বেণুতালিবন পাগল পারা।
ধান্যের ক্ষেতে পুলকে উছলি
দুরন্ত হাওয়া বোয়ে গেল চলি,
আপন ছন্দে বাজায়ে ঘুঙুর নামিল ধারা;
সহসা হেরিনু বেতসের বনে জাগিল সাড়া।

দূরে শালবন দুলিয়া জানালো চিনেছি তারে,—
সজল সমীর শাখীরে শুধালো এসেছি দ্বারে,
নদীকূলে কূলে কল্লোল তান,—
বরষার সুরে গাহিল যে গান,
পুলকে শিহরি শুনিল বনানী সে গীতিকারে,
দূরে শালবন দুলিয়া জানালো চিনেছি তারে।

উতরোল বায়ে ব্যাকুল যূথিকা পড়িল ঝরে,—
রজনীগন্ধা উঠিল কাঁপিয়া আগুন পরে,
মুছে গেল মনে নূতনের সুর,
শুধু বরষার ছন্দ মধুর,
মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিল আমার হর্ষভরে;
হে অতিথি, আমি বরিব তোমারে কী সমাদরে!

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৮

মেয়ারসাই বন্দরে জাহাজ পরিত্যাগ ক'রে রেলযোগে প্রিয়লাল প্যারিসে উপনীত হ'ল। জাহাজে একজন ভাটিয়া যুবকের সহিত তার আলাপ হয়েছিল। বছর পাঁচেক সে প্যারিসে আছে, মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে আসবার প্রয়োজন হয়। মাস তিনেক পূর্ব্বে তেমনি প্রয়োজনে ভারতবর্ষে এসেছিল, এখন ফিরে চ'লেছে। প্রথমে প্রিয়লাল স্থির করেছিল যে প্যারিসে উপস্থিত হ'য়ে টমাস কুক এণ্ড সনের অফিসের সাহায্যে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা ঠিক করে নেবে; কিন্তু ভাটিয়া যুবকটির নিকট প্যারিসের প্লাস-ডো-লাপেরা অঞ্চলের একটি বিখ্যাত হোটেলের সন্ধান লাভ ক'রে সে সেখানেই গিয়ে উঠল।

হোটেলটি অনেক দিক থেকে ভালো লাগায় প্রিয়লাল স্থির করলে কিছু কাল সেই খানেই বাস করবে। প্রথমে দিন কতক সে হোটেল পরিত্যাগ করে সহজে কোথাও বহির্গত হ'ত না। নিজের নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব কক্ষে আবদ্ধ হয়ে দুরন্তের চিন্তায় এবং পুস্তকপাঠে দিনের পর দিন অতিবাহিত করত। হঠাৎ একদিন মনে পড়ল লুভ্‌র্‌ মিউজিয়মের কথা। চিরকাল চিত্রের প্রতি তার অনন্যসাধারণ অনুরাগ। মনে পড়বা মাত্র একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে তখনি তথায় উপস্থিত হ'ল। এতদিন পর্য্যন্ত একান্ত শ্রদ্ধা এবং কৌতূহলের সহিত যে-সকল বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের কথা শুনে এসেছে, সেই র‍্যাফায়েল, দাভিঞ্চি, মুরিলো, ভ্যান ডাইক, রেমব্রাঁ, মিলে প্রভৃতির অঙ্কিত মূল চিত্রাবলীর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রিয়লাল একেবারে আত্মহারা হ'ল। যে দুরপনেয় বেদনা অহরহ অনুক্ষণ তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখত, তার চাপ যেন অনেকটা লঘু হ'য়ে গেল। নিঃস্বাদ নিস্পন্দ জীবনের মধ্যে একটা অনুভূতির সাড়া দেখা দিলে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সমস্ত দ্বিপ্রহরটা প্রিয়লাল লুভ্‌র্‌ মিউজিয়মে অতিবাহন করতে লাগল। 'মোনা লিসা'র সম্মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, 'ফ্লাইট অফ্‌ লট' দেখে দেখে দেখবার আগ্রহ কিছুতেই পরিতৃপ্তি মানে না!

কিন্তু মাস ছয়েক পরে হঠাৎ এক দিন তার মনের মধ্যে এমন একটা কি পরিবর্ত্তন এল যে, এ আকর্ষণ আর তাকে প্যারিসে আটকে রাখতে পারলে না। হোটেলের পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে তল্পীতল্পা বেঁধে রেলষ্টেশনে এসে টিকিট কিনে গাড়িতে চড়ে বসল। তারপর মাস চারেক ধরে কণ্টিনেন্টের নানাস্থান পরিভ্রমণ করে অবশেষে একদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হ'য়ে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হ'ল।

লণ্ডনে তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের একান্ত অভাব না থাকলেও সে তাদের অগোচরে একটা হোটেলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হ'লে সহসা ইংলণ্ড আগমনের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে উৎপীড়িত হবার আশঙ্কায় প্যারিসেরই মতো কতকটা অজ্ঞাত-বাস অবলম্বন করে রইল।

লণ্ডনে আগমনের মাসখানেক পরে একদিন ভারতবর্ষের ডাকে সে তার শ্বশুর বেণীমাধবের একখানা চিঠি পেলে। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে যেমন বিস্মিত হ'ল, তেমনি হ'ল বিরক্ত। বেণীমাধব লিখেছেন যে, ইম্পিরিয়াল সারভিসের একটি পাত্রের সহিত তাঁর কন্যা সাধনার যে বিবাহ-প্রস্তাব প্রায় স্থির হয়ে এসেছিল তা'-ই শুধু ভেঙে যায়নি, তারপর তিনি অপরাপর বহু স্থলে যত চেষ্টা করেছেন সমস্তই বিফল হয়েছে, তাঁর কন্যা সাধনা পরমা সুন্দরী, শিক্ষিতা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং এরূপ দুর্ভেদ্য সঙ্কটে একমাত্র প্রিয়লালের বিবেচনা এবং সহৃদয়তার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই ব'লে তিনি

তার সঙ্গে সাধনার বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এ প্রস্তাব যে অসমীচীন নয় তা প্রমাণ করবার জন্য বেণীমাধব দ্বিবিধ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রথমতঃ, মৃত্যুর দ্বারা সন্ধ্যা যখন ইহলোকের এবং ইহকালের পক্ষে একেবারে গত হয়েছে তখন সে ঘটনা যত শোচনীয়ই হোক না কেন, তার অনুশোচনা পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ শাস্ত্রের প্রত্যাদেশ হচ্ছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। এবং দ্বিতীয়তঃ, সন্ধ্যাকে গৃহে স্থান না দেওয়ার জন্য তার জীবনের যে মর্ম্মন্তুদ পরিণাম ঘটল তজ্জনিত প্রত্যবায়ের যদি কোনো অংশ প্রিয়লালের থাকে তা হ'লে সাধনাকে বিবাহ করলে তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে, কারণ তার অতি-বিপন্ন শ্বশুর যে দুশ্ছেদ্য সমস্যা নিয়ে বিপর্য্যস্ত হয়েছেন তা কখনই উপস্থিত হ'ত না যদি তাঁর অভাগিনী কন্যা স্বামীগৃহে স্থান লাভ করতে সমর্থ হ'ত। বেণীমাধবের চিঠিখানা অনুনয় এবং অনুযোগের দ্বিবিধ সুরে রচিত,—অনুযোগের সুর অত্যন্ত ক্ষীণ, এবং অনুনয়ের বৎপরোনাস্তি প্রবল।

প্রিয়লাল সেইদিনই বেণীমাধবের পত্রের উত্তরে লিখলে, "যার হাতে আপনার একটি মেয়ে অমন নির্দ্দয়ভাবে নিগৃহীত হয়েছে তার হাতে আপনার আর একটি মেয়েকে সমর্পণ করবার দুঃসাহস দেখে সত্যই বিস্মিত হয়েছি। বাঙলা দেশের মেয়ে কি বাপ-মার পক্ষে এত বড়ই পাপ যে, তার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য একজন নামজানা দুর্ব্বৃত্তের হস্তে তাকে সমর্পণ করবার প্রস্তাব অনায়াসেই করা চলে? সন্ধ্যাকে নিগৃহীত করার জন্য যে প্রত্যবায় হয়েছে ব'লে আপনি লিখেছেন, আমি নিজেকে তার অংশভাগী ব'লে মনে করিনে, সে প্রত্যবায়ের ষোল আনাই আমার ব'লে আমি জানি। এবং সমস্ত জীবনব্যাপী দুঃখ এবং অনুশোচনার দ্বারা তার দণ্ড ভোগ করতে চাই। সাধনাকে বিবাহ করলে সে প্রত্যবায়ের ক্ষয় হবে না, বৃদ্ধিই হবে। সন্ধ্যার প্রতি আমার আচরণের দ্বারা পরোক্ষভাবে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিপদগ্রস্ত করেছি ব'লে যদি মনে করেন তা হ'লে অর্থের দ্বারা যদি সম্ভবপর হয় আমি আপনার সে ক্ষতিপূরণ করতে প্রস্তুত আছি; অর্থলোভে বশীভূত ক'রে আপনি সাধনার জন্য মনোমত পাত্র সংগ্রহ করুন, সে অর্থের ভার রইল আমার উপর। আপনি জানেন উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহর নিকট হতে আমি কম অর্থ পাইনি, সুতরাং আমার সে অর্থের জন্য বাবার নিকট আবেদন করবার প্রয়োজন হবে না।"

বেণীমাধবের পত্রের সঙ্গে এক ডাকেই জহরলালেরও চিঠি এসেছিল। সে চিঠির মর্ম্ম—দীর্ঘকাল গত হ'ল প্রিয়লাল গৃহ ছাড়া হ'য়ে আছে, সেজন্য তার পিতামাতার দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, সুতরাং আর বিলম্ব না ক'রে অচিরে যেন সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

যোগ-স'জসের মৈত্রীর দ্বারা এই দুটী চিঠি যে পরস্পর-আবদ্ধ, এমন একটা সন্দেহ প্রিয়লালের মনে সহজেই দেখা দিলে। উত্তরে সে জহরলালকে লিখ্‌লে, ইংলণ্ডে যখন এসেই পড়েছে তখন বৎসর দুই এখানে যাপন ক'রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডির ডিগ্রীটার জন্য চেষ্টা করা তার একান্ত ইচ্ছা, সুতরাং এখন গৃহ প্রত্যাগমন করা উচিত হবে না।

কিছুকাল ধ'রে জহরলাল এবং প্রিয়লালের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক পত্রব্যবহার চল্‌ল, কিন্তু অবশেষে জহরলালকেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল,—পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর জন্য প্রিয়লালের ইংলণ্ডে অবস্থান করাই স্থির হ'ল।

অতঃপর প্রিয়লালের ডক্টরেট্ লাভ করা পর্য্যন্ত বৎসর দুয়েকের কথা এ আখ্যায়িকার পক্ষে প্রয়োজনীয়ও নয়, কৌতূহলাবহও নয়।

পুত্র পি-এইচ্-ডি ডিগ্রী অধিকার করেছে অবগত হওয়ার পর জহরলাল এবং মমতাময়ী তাকে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন। জহরলাল লিখলেন, শরীর আমার অতিশয় অসুস্থ, তুমি যদি এখনো আসতে বিলম্ব কর তা হ'লে হয়ত আর দেখা হবে না। মমতাময়ী লিখলেন, কিছুকাল হ'তে উনি রক্তচাপ রোগে ভুগচেন, শরীরের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়; এখনো যদি তুমি অবিলম্বে এসে উপস্থিত হও তা হ'লে হয়ত সামলে উঠতে পারেন।

এ সংবাদ পাওয়ার পর মাসখানেকের মধ্যে প্রিয়লাল প্রবাসের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষের জন্য রওয়ানা

হ'ল। কিন্তু তিন বৎসর পরে গৃহে উপনীত হ'য়ে দেখলে মাত্র পাঁচ দিনের জন্য বিলম্ব ক'রে এসেছে। পাঁচ দিন পূর্ব্বে মৃত্যু এসে জহরলালকে হরণ করে নিয়ে গেছে। জননীর বিধবা-বেশ দেখে প্রিয়লাল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করতে লাগল। মমতাময়ীও দুই বাহুর দ্বারা প্রিয়লালকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন।

শ্রাদ্ধ-শান্তির মাস দুই পরে প্রিয়লাল একদিন মমতাময়ীকে বললে, "মা, দিন কতক একটু ঘুরে আসি।"

বিস্মিত হ'য়ে মমতাময়ী বললেন, "এরি মধ্যে আবার?"

প্রিয়লাল বললে, "এবার বেশি দিনের জন্যে নয় মা, মাস চারেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

"কোথায় যাবি?"

"প্রথমে দিন পাঁচ সাতের জন্যে বেরিলীতে আমার একটি বন্ধুর কাছে, তারপর লাহোরে পান্টু মামার কাছে। সেখান থেকে পান্টু মামাকে নিয়ে রাউলপিণ্ডি হয়ে কাশ্মীর, তারপর কাশ্মীর থেকে তোমার কাছে।"

বিষণ্ণ গম্ভীরমুখে মমতাময়ী বললেন, "এটা কি এখন না করলেই নয় প্রিয়?"

এক মুহূর্ত্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে মমতাময়ীর প্রতি মুখ তুলে প্রিয়লাল ব'ললে, "কিছু ভাল লাগছে না মা।"

"তা'ত বুঝলাম, কিন্তু আমারই কি ভাল লাগছে বাবা?"

অপ্রতিভ আর্দ্রকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "তোমার কি ক'রে ভাল লাগবে মা! তোমার নিশ্চয় ভাল লাগছে না। বেশ ত, তুমিও আমার সঙ্গে চলনা। তুমি যদি যাও, তাহ'লে আমি বেরিলী লাহোর কাশ্মীর ছেড়ে দিয়ে তীর্থে তীর্থে তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। যাবে আমার সঙ্গে?"

প্রিয়লালের কথা শুনে মমতাময়ীর মুখে অতি ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নামল অশ্রুর প্রবল বর্ষণ। অঞ্চলে চোখ মুছে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "এই সংসারের যে খোঁটায় তিনি আমাকে বেঁধে দিয়ে গেছেন তা থেকে আমার সহজে মুক্তি নেই প্রিয়। যে কাজের ভার আমাকে দিয়ে গেছেন তা শেষ ক'রে তবে তীর্থই বল আর যাই বল,—তার আগে চৌধুরী বংশের এই বাড়িই আমার কাশী বৃন্দাবন হয়ে রইল।"

কথাটা সেদিন আর বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে এই খানেই শেষ হল। কিন্তু দিন পাঁচ সাতের মধ্যে স্থির হয়ে গেল যে, জহরলালের মৃত্যুর জন্য আইন আদালত সংক্রান্ত যে সামান্য বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে তা সম্পন্ন করেই প্রিয়লাল পুনরায় দেশভ্রমণে নির্গত হবে।

২৯

শ্রাবণ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। অপরাহ্ণের দিকে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, কিন্তু পূর্ব্বদিকে পুনরায় মেঘের উপর মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে,—মনে হচ্ছে অবিলম্বে প্রবলভাবে বর্ষণ আরম্ভ হবে। কলিকাতা বালীগঞ্জের একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত অঞ্চলে বিস্তৃত কম্পাউণ্ড সংযুক্ত একটা ত্রিতল গৃহের দোতলার বারান্দায় ব'সে সন্ধ্যা একটা বই পড়ছিল। এমন সময়ে ভৃত্য সাধুচরণ এসে ডাকলে, "মা!"

বই হতে মুখ তুলে সাধুচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সন্ধ্যা বললে, "কি সাধুচরণ?"

বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সাধুচরণ বললে, "মেঘ করেছে ব'লে কি বেলা হয়নি মা? বেলা যে গড়িয়ে শেষ পোহোরে পৌছল!"

"ক'টা বাজল?"

অধিকতর মুখ-বিকৃতির সহিত সাধুচরণ বললে, "সে তোমাদের বিশ পঁচিশটা ঘড়ি আছে দেখে নাও কটা বাজল, কিন্তু এমন ক'রে পিত্তি পড়িয়ে অত্যেচার করলে শরীর আর কতদিন টে'কবে বল দেখি? সেই শ্রষ্টি মাসের মত আবার যদি অসুখে পড় তাহ'লে আর উঠতে পারবে কি?"

বারান্দার পিছন দিকে একটা ক্লক্ টাঙ্গানো ছিল, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বললে, "ওমা তাই ত, সাড়ে তিনটে বাজে যে! কিন্তু তিনি না খেয়ে বাইরে রয়েছেন, আমি কি করে খাই সাধু?"

সাধুচরণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,—"তেনার কথা ছাড় দাও! ছেলেবেলা থেকে তেনাকে নিয়ে আমার হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে আছে; তেনার এ সব অত্যেচার বরদাস্তও হয়। কিন্তু তোমার?"

"আমারও ত' তাহ'লে বরদাস্ত হওয়া উচিত সাধু। কিন্তু সে কথা যাক, তোমরা সকলে খেয়ে নিয়েছ ত?"

"তোমার আলি হুকুম জারি আছে, তারা ছেড়েছে কি না! সব খেয়ে দেয়ে এতক্ষণ এক ঘুম সেরে নিলে!"

"আর তুমি? তুমি খেয়েছ?"

সাধুচরণ মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "আরে, আমার কথা ছাড় দাও! আমি তোমার আর সব চাকর-বাকরদের সঙ্গে এক গোত্তোর না কি?"

সন্ধ্যা বললে, "না, তা নও, কিন্তু তুমি বুড়োমানুষ, এই বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে রয়েছ সাধু?"

সাধুচরণ তেমনি মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "বুড়োমানুষের অত ক্ষিদে তেষ্টা লাগে না মা! তুমি সোমোখো মেয়ে, তুমি ক্ষিধের লেগে ছটফট করছ,—আর আমি খাব?"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি ছটফট করছি তুমি কি ক'রে জানলে সাধু? কই আমি ত' একটুও ছটফট করছি নে?"

সাধুচরণ বললে, "আরে, তুমি না কর, তোমার আত্মি ত' করছে।"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বললে, "ওমা, সে আবার কি? আত্মি কাকে বলে?"

কিন্তু এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, গেটের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় সাধুচরণের মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল। ঝঙ্কার দিয়ে সে বললে, "অই নাও! ছাতা মাথায় দিয়ে আবার একটা সাধু আসছে! আজকের মতো তোমাদের খাওয়া দাওয়া সিকেয় তুলে রাখ!"

সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে গৈরিক বসন পরিহিত এক জন সন্ন্যাসী বৃষ্টির তাড়না থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে ছাতা দিয়ে দেহের উর্দ্ধাংশের প্রায় সবটা প্রচ্ছন্ন করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে অনুমানে বুঝলে ভারতী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের স্বামী অচলানন্দ।

সাধুচরণ বললে, "মা, বল তো বাবা বাড়ি নেই ব'লে সাধু মহারাজকে বিদেয় করে আসি।"

সন্ধ্যা বললে, "তাতে হয়ত' সুবিধে হবে না সাধু, তোমার বাবু আসা পর্য্যন্ত উনি হয় ত অপেক্ষা করতে চাইবেন। তার চাইতে আমি গিয়ে ওঁর কাজ সেরে দিয়ে আসি।" তারপর স্মিতমুখে বললে, "কিন্তু সাধু, তোমার নিজের নাম সাধুচরণ অথচ সাধুদের ওপর তুমি এত চটা কেন বল দেখি?"

সাধুচরণ চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বললে, "এদের তুমি সাধু বল মা? তুমি জাননা, এরা এক-একটি লবাব। চেহারা দেখে বুঝতে পার না যে, দস্তরমতো দুধ-ঘী-খেকো শরীর? আর ঐ যে গেরুয়া রঙের খদ্দর দেখ, ওর একটি তোমার তিনখানা ধুতিকে হার মানাতে পারে। বড় মানুষের দোরে এসে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে যায় আর এই সব লবাবী করে!"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না সাধু, তুমি জান না, এঁরা সত্যি-সত্যিই সাধু। এঁরা যে টাকা নিয়ে যান তাতে অনেক সৎকার্য্য করেন। গরীব দুঃখী রোগীর সেবা, দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো—এইরকম অনেক ভাল কাজ এঁদের দ্বারা হয়।"

তা হয়ত' হয়। কিন্তু তথাপি সাধুচরণ সন্ন্যাসীদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। অপ্রসন্ন মুখে বললে, "তা হ'লে বসাবো না কি?"

"হ্যাঁ বসাওগে, আমি এখনই যাচ্ছি।"

বিড়বিড় ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে কি বলতে বলতে সধুচরণ প্রস্থান করলে। সেটা যে সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে অভিলষণীয় মন্তব্য নয় তা সহজেই বোঝা গেল।

সাধুচরণ প্রমথর পিতার আমলের ভৃত্য। প্রমথর যখন চোদ্দ বৎসর বয়স তখন তার বিধবা মাতা মৃত্যু-শয্যায় অপর কোনো যোগ্যতর ব্যক্তির অভাবে বিশ্বস্ত ভৃত্য সাধুচরণের উপর একমাত্র পুত্রের ভার সমর্পণ করেন। সে আজ পনের ষোল বৎসরের কথা হবে। সাধুচরণ যথাশক্তি সব বিষয়েই প্রমথকে শাসন ক'রে আসছিল, কিন্তু জ্ঞাতি-গৃহে বিবাহ উপলক্ষে দেশের বাটীতে কিছুদিন একাকী অবস্থান কালে প্রতিবেশিনী বিধবা কন্যা বনমালতীর হাতে ঘটনাচক্রে প্রথম তালিম নিয়ে প্রমথ যে কর্দ্দমাক্ত পথের পথিক হ'ল সে পথের গতি কিছুতেই সে রোধ করতে সমর্থ হল না। বিপদ দেখে সাধুচরণ প্রমথর বিবাহ দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল। প্রমথর অর্থের প্রভাবে সুন্দরী পাত্রীকে সম্মুখে ফেলে প্রমথকে লুব্ধ করবার ব্যবস্থা কঠিন হ'ল না। কিন্তু কোন মতেই তাকে বশীভূত করা গেল না,—প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সে বলে, কিছুতেই না সাধু, কিছুতেই না; পায়ে শেকল লাগিয়ে তুই যে আমাকে এক জায়গায় বেঁধে ফেলতে চাস, তা কিছুতেই হবে না। তা ছাড়া, যে লোক চিংড়ি মাছ খেতে অভ্যস্ত হয়েছে তাকে মালপোয়া খাওয়ালেই সে যে চিংড়ি মাছ খাওয়া পরিত্যাগ করবে তার কোনো মানে নেই।

ক্রমশঃ সাধুচরণেরও মনে সংশয় উপস্থিত হ'ল যে হয়ত সত্যিই তার কোনো মানে নেই। তখন অগত্যা হতাশ হ'য়ে সে হাল ছেড়ে দিলে।

তারপর আট দশ বৎসর কেটে গেছে, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বিচিত্র কীর্ত্তি-কলাপের দ্বারা প্রমথ তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট উদ্বেগ দিয়েছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বৎসর তিনেক দেশে না এসে প্রবাসে অজ্ঞাতবাস ক'রে যেমন দিয়েছে তার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। তাই গত বৎসর বৈশাখের প্রারম্ভে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ যখন তার দীর্ঘ প্রবাস বাসের পর

কলিকাতার বাটিতে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন প্রথম তিন চার দিন সাধুচরণ ঘৃণায় বিদ্বেষে, কথা কওয়া ত দূরের কথা, সন্ধ্যার মুখের প্রতি ভাল করে দৃষ্টিপাতও করেনি। তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সম্বোধনে বাধ্য হ'য়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা করার পর বিতৃষ্ণার মূলে প্রবল একটা অঘাত পড়ল,—সন্ধ্যা হয়ত বা ঠিক চিংড়িমাছ শ্রেণীর জীব নয়, মনের মধ্যে এ সংশয়ও সুস্পষ্টভাবে দেখা দিলে। ক্রমশঃ দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে বিতৃষ্ণা রূপান্তরিত হ'ল স্বভাব আসক্তিতে,—এমন কি পর্য্যায়ের ক্রমে প্রমথও একদিন সন্ধ্যার কাছে পিছিয়ে পড়ল। এখন সময়ে সময়ে সাধুচরণের মনে হয়, হয়ত বা সন্ধ্যা প্রমথর বিবাহিত স্ত্রীই। অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাছে এ ধারণা ভুল ব'লে প্রমাণিত হয় সেই ভয়ে অনুসন্ধান করে না,—মনে মনে ভাবে, যে-চাকে এত মধু, সে চাক মৌমাছিরই হবে—বোলতার সম্ভবতঃ নয়।

নিচে এসে অফিস ঘরে প্রবেশ ক'রে স্বামী অচলানন্দকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা বললে, "এই বৃষ্টি-বাদলায় কষ্ট ক'রে কেন এলেন, ভারি কষ্ট হয়েছে আপনার।"

প্রতিনমস্কার করে অচলানন্দ বললেন, "না, একটুও কষ্ট হয়নি, ভারি আনন্দে এসেছি। আমাদের আশ্রমে আপনার আশাতীত অর্থসাহায্যের জন্যে অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়েছি। সেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজ সকালে আপনাকে একখানা চিঠি লিখলাম। তারপর ভাবলাম চিঠিখানা বহন করে নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে আপনার হাতে দেওয়ার আনন্দ থেকেই বা বঞ্চিত হই কেন।" ব'লে খামে-মোড়া একখানা চিঠি সন্ধ্যার হাতে দিলেন।

চিঠিখানা খুলে পড়তে পড়তে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; চিঠি শেষ ক'রে অচলানন্দের প্রতি অপ্রতিভ মুখ উত্তোলিত ক'রে বললে, "সামান্য সাহায্য, তার জন্যে এত বেশি করে ব'লে লজ্জিত করেছেন—"

মাথা নেড়ে অচলানন্দ বললে, "সামান্য নিশ্চয়ই নয় মিসেস মুখার্জ্জি। দশ বৎসরের জন্যে মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা, এ সত্যিই সামান্য নয়। এর জন্যে আমাদের আশ্রম চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু আপনাদের লক্ষ্ণৌ যাওয়া কবে স্থির হল? আমরা মনে করছিলাম শীঘ্রই একদিন আপনাদের দুজনকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সামান্য একটু অভিনন্দনের উৎসব করব।"

অচলানন্দের কথা শুনে সন্ধ্যা চকিত হয়ে উঠল; বললে, "না, না, কখনো তা করবেন না অচলানন্দজী। আমি ত হ'লে ভারি লজ্জিত হব।"

অচলানন্দ স্মিতমুখে বললেন, "বাইরের কোনো লোককেই ত' বলব না। শুধু আশ্রমবাসীদের মধ্যে আপনাদের দুজনকে নিয়ে একটু আনন্দ।" করজোড়ে বললেন, "অনুমতি দিন!"

ব্যস্ত হয়ে আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "এ কি করছেন আপনি! আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু আমরা যে পরশু চ'লে যাচ্ছি।"

"বেশ ত' কাল সন্ধ্যা ৬টার সময়ে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে?"

একটু চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা। কিন্তু উনি ত' এখনো এলেন না, ওঁকে ত বলা হ'ল না।"

অচলানন্দ স্মিতমুখে বললেন, "সে জন্যে কিছু আটকাবে না। আপনাকে বলা হ'লেই তাঁকেও বলা হ'ল।" আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমরা নিজেদের সন্ন্যাসীমানুষ বলে গর্ব্ব করি, লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের ভাল দেখায় না। কিন্তু তবু একটা কথা বলবার লোভ সামলাতে পারছিনে।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা বললে "কি কথা বলুন না?"

"আমাদের ইচ্ছে, 'নারী-কল্যাণ মণ্ডলী'র চাঁদার খাতাটা আপনাকে দিয়ে আরম্ভ করি।"

অচলানন্দের কথা শুনে বৎপরোনাস্তি অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "ছি ছি, দেখুন, আমি একেবারে ভুলে গেছি। আপনি একটু বসুন; আমি এখনি এনে দিচ্ছি।" ব'লে সে দ্রুতপদে উপরে গেল, তারপর একটা হাজার টাকার চেক লিখে এনে অচলানন্দর হাতে দিয়ে বললে, "এইটে প্রথম কিস্তি।"

চেকে টাকার তায়দাদ দেখে অচলানন্দের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ মিসেস মুখার্জ্জি। আর আপনার ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্যে এখনো যে খানিকটা খোলা রইল, তার জন্যে সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু লক্ষ্ণৌ থেকে আপনার ফিরচেন কবে?"

"মাস দুই পরে,—সম্ভবতঃ পূজোর আগে।"

মনে মনে একটু কি চিন্তা করে অচলানন্দ কতকটা স্বগতই বললেন, "আচ্ছা, তা হ'লেও হবে।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি হবে মহারাজ?"

"সে কথা এখন আপনাকে বললে আপনি ভারি আপত্তি করতে থাকবেন" ব'লে সহাস্যমুখে অচলানন্দ প্রস্থান করলেন।

বৈকালের দিকে আবার সজোরে বৃষ্টি নেমেছিল। দক্ষিণ-দিকের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শয়ন করে প্রমথ বৃষ্টি এবং বাতাসের মাতামাতি উপভোগ করছিল। কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটা প্রস্ফুটিত কদম-গাছে গোটা দশ বার বাদুড় ঝুলছিল আর দুলছিল। কয়েক বৎসর আগে কোনো অজ্ঞাত কারণে তাদের পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ ক'রে এক

বাছড়-দম্পতি এই গাছে এসে আশ্রম বাঁধে, তারপর ক্রমশঃ তাদের সন্তান-সন্ততির জন্মের ফলে দল পুষ্ট হয়েছে।

সন্ধ্যা এসে প্রমথর নিকট আর একটা ইজিচেয়ারে উপবেশন করলে, তারপর হাত বাড়িয়ে অচলানন্দের চিঠিখানা প্রমথর হাতে দিলে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "এ কি উষা?"

স্মিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "আমার কাঁধে চাপানো তোমার যশের বোঝা।"

"আমার যশের বোঝা? দেখি, কি এমন সৎকার্য্য করলাম যে আমার যশের বোঝা তোমার কাঁধে চাপল!" নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের সঙ্গে চিঠিখানা শেষ ক'রে প্রসন্নমুখে প্রমথ বললে, "চমৎকার লিখেছেন!—আর, সমস্তই ঠিক লিখেছেন। হবেই বা না কেন? যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, তেমনি উদার অন্তঃকরণ! একথা তুমি নিশ্চয় জেনো উষা, অচলানন্দ ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির এম্-এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছিলেন এইটেই তাঁর পাণ্ডিত্যের সব চেয়ে বড় কথা নয়। তাঁর মত অত বড় বৈদান্তিক বাঙলা দেশে আর কেউ আছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সে কথা যাক্, তুমি এ চিঠিখানাকে আমার যশের বোঝা বলছিলে কেন?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "টাকা যখন তোমার, যশ তখন তোমার নয় ত কার?"

কপট ক্রোধভরে ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রমথ বললে, "মন্ত্র-পড়া বউ নও ব'লে ভারি তোমার দম্ভ হয়েছে দেখছি! চুল-চেরা ভাগ করে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখে দিয়েছি তবু টাকা আমার? রোসো, জব্দ করছি! একদিন একজন পুরুত ডাকিয়ে কয়েকটা অনুস্বর বিসর্গের মন্ত্র পড়িয়ে নিচ্ছি, তারপর কার টাকা তুমি বল, দেখা যাবে! নিতান্ত আমাকে ভালমানুষ পেয়েছ, তাই!"

"তাই, কি?"

"তাই এ-সব কথা বলতে সাহস পাও!"

সহসা সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে এল; বললে, "তাই শুধু এ সব কথা বলতেই সাহস পাইনে, আরও অনেক কিছুতে সাহস পাই। তুমি যে ভালমানুষ, তুমি যে ভদ্রলোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যিই তুমি ভদ্রলোক।"

সন্ধ্যার কথায় এবং কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হ'য়ে প্রমথ বললে, "এ কি উষা! আমি যে-জিনিষটাকে রঙিন করছিলাম তুমি তাকে একেবারে সঙ্গিন ক'রে তুললে যে! বেশি ভদ্রলোক ভদ্রলোক কোরো না, নাই পেয়ে শেষকালে অভদ্র না হয়ে উঠি।" তারপর সহসা কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল; বললে, "কিন্তু তাই বলে মনে কোরো না উষা, আমাকে ভদ্রলোক ব'লে তুমি খুব খুসি করলে। একটু আঘাতই বরং দিলে।"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বললে, "কেন?"

"কেন? দীর্ঘ চার বৎসর একত্র বাসের পর আজ তুমি আমাকে বলছ ভদ্রলোক। এটা কি সত্যিই একটা compliment উষা? তা ত নয়, বস্তুতঃ এটা একটা tragedy। এর মূলে জেগে রয়েছে সেই সংস্কার—'যতই তুমি আমার আপন হওনা কেন তবুও আমি তোমার পরস্ত্রী, যদিচ আমি যার স্ত্রী সে আমাকে একটুও আপনার মনে করে না।' চার বৎসর তোমার সঙ্গে মনের কারবার চালিয়ে মনের মানুষ হলাম না, হলাম ভালমানুষ; পেলাম শ্রদ্ধা, পেলাম না তার বেশি আর কিছু। এ কি তোমার কাছে আমার সামান্য পরাজয় উষা?"

পশ্চিম আকাশে মেঘের একটা ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভ আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সন্ধ্যা বললে "একটা কথা শুনেছ?"

এটা প্রসঙ্গান্তরের ভূমিকা সুতরাং এ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ বুঝতে পেরে প্রমথ বললে, "যদি এ পর্য্যন্ত না ব'লে থাক তা হ'লে শুনিনি।"

"কাল সন্ধ্যেবেলা আমার অভিনন্দন।"

"আনন্দের কথা। কিন্তু কোথায়?"

"অচলানন্দজীর আশ্রমে।"

"টাকা যখন আমার, তখন তোমার অভিনন্দন কি রকম?"

"সে কৈফিয়ৎ তাদের কাছে নিয়ো। শুধু আমার নয়, তোমারও।"

সোচ্ছ্বাসে প্রমথ বললে, "যুগলে?—কিন্তু পরশু সকালে লক্ষ্ণৌ যাওয়া, কাল সন্ধ্যায় অতখানি সময় দিলে অসুবিধে হবেনা ত?"

"কি করব বল? হাত জোড় করলেন, অস্বীকার করতে পারলাম না।"

"তা ভালই করেছ,—কিছু অসুবিধে হবে না। এখন চল, মিস্ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে কথাটা শেষ ক'রে আসা যাক্।"

সন্ধ্যা বললে, "চল।"

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"ভারতের সাধনায় গীতার দান"

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী পুরাণরত্ন

ভারতের সাধনার কথা আলোচনায় জানা যায় অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই তার সাধনার চরম লক্ষ্য। ভারতের বেদ উপনিষদ দর্শন পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেই সাধনার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি দেখান হইয়াছে। আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন ভাবে জাগতিক সকল বিষয়ের বিচার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও ভারত আধ্যাত্মিক বিচারকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে। ১।

আধ্যাত্মিক বিচারই চরম সত্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায় স্থির হওয়ায় ভারতীয় শাস্ত্রাদির মধ্যে সেইরূপ মীমাংসার অনুকূল বিধি-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ভারতের উপনিষদ দর্শন ও গীতা এই তিন শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেই এই সাধনার ক্রম বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই তিন শাস্ত্রগ্রন্থকে "প্রস্থান ত্রয়" বলা হয়। ভারতীয় সাধনার যে কোন ক্রম বা পদ্ধতি এই প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত হইলে তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

মহাভারতান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদাখ্য সপ্তশত শ্লোক যুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিলে জানা যায় যে গীতা প্রচারের সময় উক্ত প্রস্থানত্রয়ের অন্য দুই ভাগের মূল উপপাদ্য বিষয়গুলি ভারতীয় সাধক মণ্ডলীর অপরিজ্ঞাত ছিল না, কারণ গীতায় যে মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা উপনিষদ বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনের মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই করা হইয়াছে। উপনিষদ ও দর্শনের জটিল ব্যবহারিক জীবনে অসাধ্য এবং পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবগুলির উপর সবল সত্য ও সহজসাধ্য ভাবধারা প্রদান করিয়া গীতাকার গীতা-উপনিষদ-রূপ এক অভিনব শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই গীতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সাধক বলিয়াছেন,—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত গীতাশাস্ত্র সম্যক অধ্যয়ন করিলে আর অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন কি।

গীতা প্রচারের পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিচার ও মীমাংসায় অশেষ জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় থাকিলেও তাহাদের মধ্যে এমন এক অসম্পূর্ণতা এমন একটা অভাব রহিয়া গিয়াছিল যাহার জন্য সে সকলের চর্চ্চায় ব্যবহারিক জগতে কর্ম্মজীবনে অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা চরমসত্যের উপলব্ধি সম্ভব হয় নাই। গীতা তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্বরূপ এক নূতন তত্ত্ব সংযোগ করিয়া দিয়া তাহাদের সকল অভাব সব অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া ভারতের সাধনার এক অভিনব পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। জগত ব্যাপার বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহাকে সেই ভাবে বিচার করার নাম আধিভৌতিক বিচার, যেমন সূর্য্যকে কোন দেবতা বলিয়া না মানিয়া কেবল পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের এক গোলা বলিয়া উহার উষ্ণতা প্রকাশ আকর্ষণ প্রভৃতি গুণ ধর্ম্মের আলোচনাকে সূর্য্য সম্বন্ধে আধিভৌতিক আলোচনা বলা যায়; আর এই পাঞ্চভৌতিক সূর্য্যের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী সূর্য্য নামে কোন দেবতা আছেন তাঁহার দ্বারাই জড় সূর্য্যের উক্ত গুণধর্ম্মের ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে এইরূপ বিচারকে সূর্য্যের আধিদৈবিক বিচার বলা যায়। এইরূপ পার্থিব যাবতীয় বস্তু বৃত্তি বা গুণ-বিশিষ্ট সৃষ্টির অন্তর্গত সহস্র সহস্র জড় পদার্থের মধ্যে সহস্র সহস্র স্বতন্ত্র দেবতা নাই, কিন্তু বাহ্য দৃষ্টির সর্ব্বকার্য্য পরিচালক মানবের দেহ মধ্যে আত্মস্বরূপে অবস্থিত এবং মনুষ্যের সকল সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিধায়ক ইন্দ্রিয়াতীত এক মাত্র চিৎশক্তি এই জগতে অধিষ্ঠিত আছেন যে শক্তি দ্বারা এই জগৎ চলিতেছে, সূর্য্য চন্দ্রাদির ক্রিয়া এমন কি গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়া সেই অচিন্ত্যশক্তির প্রেরণায় হইতেছে। জগৎ সম্বন্ধে এই রূপ বিচারকে আধ্যাত্মিক বিচার বলা যায়। "গীতা রহস্য" শ্রীতিলক।

ভারতীয় দর্শনাদির বিচারে জীব জগৎ ও ঈশ্বর বিষয়ক বহু প্রকার বিচার ও মীমাংসার কথা থাকিলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিবার মত কোন কথা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। মানবের দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনে ঈশ্বর উপলব্ধির কোন সহজ ও সরল মত কিছু পাওয়া যায় না। দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ন্যায দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতি গৌণ। ন্যায় দর্শনকার মানবের মুক্তির যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখান নাই। এই দর্শনের বিচারে প্রমাণ প্রমেয় সংশয় ইত্যাদি ষোড়শ বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই মানবের অপবর্গ বা মুক্তি লাভের উপায় বলিয়া কথিত। বৈশেষিক দর্শনেও ঈশ্বর অস্বীকার না করিলেও তাঁহাকে মুখ্য স্থান দেন নাই। এতদুক্ত দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব এই সপ্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভেই মানব মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন। ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু থাকুন আর নাই থাকুন বৈশেষিকের তাহাতে কিছু যায় আসে না। তাহার নির্দ্দিষ্ট সপ্ত পদার্থের জ্ঞানই মানবের মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। পরে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সমর্থক মীমাংসা দর্শনে যাগ যজ্ঞাদি নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানের পুণ্যফলে মানুষ এই দুঃখময় মর্ত্তলোক ত্যাগ করিয়া সুখময় স্বর্গলোকের অধিকারী হইতে পারেন বলিয়া কথিত। "যজেত স্বর্গকামঃ" স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে। "যজতের্জাতমপূর্ব্বম্" যজ্ঞের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। এই দর্শন মতে বিধিপূর্ব্বক বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানব স্বর্গরূপ সুখময় স্থান লাভ করিয়া দুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। ইহাতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। মানুষ নিজ কর্ম্মানুসারেই স্বর্গসুখ বা নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অপেক্ষা করে না। আবার সাংখ্যদর্শনোক্ত জ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞানই পরম শ্রেয় লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া কথিত, 'জ্ঞানান্মুক্তি'। এই দর্শন মতে কর্ম্ম বহুদোষযুক্ত, কারণ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের পুণ্যফলে কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ হয় বটে কিন্তু সে পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় জীবকে দুঃখময় মর্ত্তলোকে আসিতে হয়, সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা কখনই ঐকান্তিক মুক্তি লাভ হয় না। অতএব নানা দোষের আকর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিকার সহিত প্রকৃতি ও পুরুষরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের (১) জ্ঞান লাভার্থে সাধনাই মানবের পরম শ্রেয়লাভের একমাত্র উপায়। ইহাতেও ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখান হয় নাই।

"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র যত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটীমুণ্ডীশিখীবাপী মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

যাহার ষোড়শ বিকার সহিত অষ্ট প্রকৃতি (২) ও পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বা আরণ্যক যে কোন আশ্রমীই হউন তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত। এইরূপ পাতঞ্জল দর্শনেও ঈশ্বর মাহাত্ম্য (৩) স্বীকৃত হইলেও যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম (৪) ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিলেই মানব সমাধি লাভ করিতে পারিবেন এবং সেই সমাধিতেই মানব সকল দুঃখের পারে মুক্তির আনন্দ লাভের অধিকারী হইবেন। একমাত্র বেদান্ত দর্শনই ঈশ্বর-প্রতিপাদক দর্শন। উপনিষদের জীব ও ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশক ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মন্ত্রগুলি সূত্রাকারে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন নামে প্রচারিত। ইহাতে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যাকারী অনেক সূত্র এবং জীব ও ব্রহ্মবিষয়ক প্রসঙ্গ বহুভাবে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীনকালে এই দর্শন সংসারত্যাগী চতুর্থাশ্রমীরই আলোচনার বিষয় ছিল (৫)

ফল কথা গীতা প্রচারের পূর্ব্বে প্রচলিত শাস্ত্রাদিতে জীব জগৎ ও ঈশ্বর বিষয়ক বিচারের যে তত্ত্ব ও ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে তৎকালীন প্রচলিত শাস্ত্রাদির মীমাংসায় ঈশ্বরের স্থান অতি গৌণ এবং তদুক্ত সাধন প্রণালীর ব্যবস্থায় অধ্যাত্মসাধনেচ্ছু মানবের জন্য মাত্র দুইটি পথ নির্দ্দিষ্ট ছিল,—একটি সংসারে থাকিয়া প্রচলিত

(১) অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ পুরুষঃ।

(২) অব্যক্তং বুদ্ধিরহংকারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি ইত্যেতা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানীত্যেতে ষোড়শ বিকারাঃ॥ সাংখ্য সূত্রবৃত্তি।

(৩) ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা—১।২৩ সূত্র।

(৪) যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি। ২।২৯ সূত্র।

(৫) "গীতায় ঈশ্বরবাদ"—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শাস্ত্রবিধি অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের করণীয় নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য (১) কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তদ্দ্বারা প্রাপ্ত পুণ্যফলে এই দুঃখময় জগৎ ত্যাগ করিয়া স্বর্গরূপ সুখময় স্থান লাভ এবং দ্বিতীয় সংসারের সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান সাধন দ্বারা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান ও যোগের সাধন। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির এই দুই চরম সিদ্ধান্তের উপর মনুষ্য জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ব্যবহারিক জগতের অনেক কর্ত্তব্য, নির্ম্মম প্রয়োজনের জগতের অনেক কার্য্যই এই দুই বিচারের মুখে বাধা প্রাপ্ত হইত, কারণ শাস্ত্রানুমোদিত নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য সব কার্য্যই 'নিষিদ্ধ' বলা হইত, কাজেই কার্য্যাকার্য্যের সূক্ষ্ম বিচারের সম্মুখে ব্যবহারিক জগতের অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যই অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং বাস্তব জগতের অতি-অবশ্য কর্ত্তব্য অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যের অকর্ত্তব্যতায় একদিকে যেমন মানবের বাস্তব জীবনের উন্নতির পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল অপর দিকে সেইরূপ প্রকৃত বৈরাগ্যহীন মর্কট সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় অধ্যাত্ম সাধনার নামে কর্ম্মহীনতাই প্রচারিত হইতেছিল। গীতাই তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির এই অভাব এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভারতের লুপ্তপ্রায় কর্ম্ম-শক্তির উদ্বোধন করেন। গীতার প্রথম শিষ্য অর্জ্জুনের চরিত্র আলোচনায় ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

মহাভারতোক্ত অর্জ্জুন-চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় স্বকীয় সাধনা ও ঘটনাস্রোতের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া অর্জ্জুন তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানাবিধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে অর্জ্জুন যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে তৎকালীন শিক্ষা ও সভ্যতার একটি জীবন্ত আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে কালের প্রচলিত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিষয়ে সম্যকরূপে জ্ঞান-বান হইয়াও জীবনব্যাপী সাধনা ও সংকল্প লইয়া কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত আপন আত্মীয় বন্ধু ও গুরুজনদিগের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন,—

"দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥" গীতা-১।২৮

যুদ্ধাভিলাষী এই সকল স্বজনকে সমবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই আত্মীয় এবং গুরুজন। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম হইলেও উপস্থিত যুদ্ধ আত্মীয় এবং গুরুজনের বিপক্ষে, কিন্তু আত্মীয় ও গুরুজন আততায়ী হইলেও তাহাদিগের সহিত বিবাদ এবং অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে হত্যা করা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে "নিষিদ্ধ কর্ম্ম"; কারণ আত্মীয় হত্যায় কুলনাশ এবং শাস্ত্রবিধানে কুলনাশ ও গুরু হত্যা মহাপাপ শাস্ত্র বাক্য অর্জ্জুন জ্ঞাত ছিলেন

"স এব পাপিষ্ঠতমো যঃ কুর্য্যাৎ কুলনাশনম্"

কুলনাশকারী ব্যক্তি মহা পাপিষ্ঠ। এবং,—

গুরুং হুংকৃত্য ত্বংকৃত্য বিপ্রান্নির্জ্জিত্যবাদতঃ।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিত॥

যে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি হুংকার বা তর্জ্জন কিংবা তুই ইত্যাকার পদ ব্যবহার করে অথবা সাধু ব্রাহ্মণকে বাদ বিবাদে পরাস্ত করে সে মরণান্তে কঙ্কগৃধ্রের নিবাসস্থল হইয়া শ্মশানে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগকে হত্যা করিলে তো কথাই নাই। এইরূপ তৎকালীন প্রচলিত শাস্ত্র তাঁহাকে আত্মীয় ও গুরুজন হত্যাজনক পাপময় যুদ্ধকার্য্যে বাধা দিয়া ব্যবহারিক জগতের কর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করিল। ব্যবহারিক জগতের কার্য্যে বিরাগ জন্মিলে প্রচলিত শাস্ত্র তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণরূপ দ্বিতীয় পন্থা দেখাইয়া দিল। কারণ শাস্ত্রের বিধান "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ," যখনই জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্য আসিবে তখনই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। তাই অর্জ্জুনও অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম বৈরাগ্যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় পন্থা সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের এই বৈরাগ্য সংসারের অসারতা জ্ঞানজনিত আন্তরিক বৈরাগ্য নহে। ইহা তাঁহার আত্মীয়

(১) নিত্যকরণীয় স্নান সন্ধ্যা তর্পণাদি কর্ম্মই নিত্য কর্ম্ম। কোন কারণ উপস্থিত হইলে যাহা করা আবশ্যক হয় সেই কর্ম্ম নৈমিত্তিক কর্ম্ম; যেমন অনিষ্ট গ্রহশান্তি, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি। কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত শাস্ত্রানুসারে যে কর্ম্ম করা হয় তাহা কাম্য কর্ম্ম।

ও গুরুজন হত্যারূপ অশাস্ত্রীয় কর্ম্মের প্রতি বিরাগ। শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যাকার্য্যের বিচারের মুখে পড়িয়া যুদ্ধের লৌকিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না,—যুদ্ধের ফলাফলের জন্যও তাঁহার কোন চিন্তা হইল না। যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা যাহাই থাক, তার ফল যাহাই হউক আত্মীয় ও গুরুজন হত্যাই তার পরিণাম। সুতরাং এই আত্মীয় ও গুরু হত্যারূপ পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করাই শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য। ১। কর্ম্মবীরের সমস্ত কর্ম্মশক্তি ব্যবহারিক জগতের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্রবিধির বিচারে পঙ্গু হইয়া পড়িল। প্রচলিত কোন ধর্ম্ম কোন শাস্ত্রই যখন তাঁহাকে তাঁহার লৌকিক জীবনের এক অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রেরণা দিতে পারিল না বরং তাঁহাকে কর্ম্মজগৎ হইতে দূরে সরাইয়া নিক্রিয়তারূপ মর্কট বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিল তখন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিষয়ের এই অজ্ঞানতা গ্লানি দূর করিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত ভগবান গীতার বাণী শুনাইয়া তাঁহার এই মোহ দূর করিলেন। প্রচলিত শাস্ত্রজ্ঞানে কর্ম্মবীরের যে বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল গীতার উপদেশে তাহা দূরীভূত হইল।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চাতুর্বর্ণ্যের করণীয় নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন আর সব কর্ম্মই দোষযুক্ত, কিন্তু ব্যবহারিক জগতের প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে হইলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ভিন্ন আরও অনেক কাজ করা প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া পরিত্যাগ করায় এবং মতান্তরে সকল কর্ম্মই দুঃখের কারণ ভাবিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় একদিকে বাস্তব জীবনের পরাজয় এবং অপর দিকে প্রকৃত বৈরাগ্যহীন মর্কট সন্ন্যাসীর দ্বারা দলপুষ্ট হওয়ায় ভারতের প্রকৃতই ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই ধর্ম্মগ্লানি দূর করিতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান গীতা উপনিষদ প্রচার দ্বারা ভারতের সাধনপথের বিঘ্ন অপসারণ করেন। গীতার সুপরিচিত বাণী এই কথাই প্রচার করিতেছে,—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> গীতা।৪।৭।

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখনই আমি (ঈশ্বর) আবির্ভূত হইয়া থাকি। ভগবানের এইরূপ আবির্ভাব বা অবতারবাদ ভারতীয় মনস্তত্ত্বের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। জগৎ ও জীব সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক বিচারে প্রত্যেক মানবের অন্তরাত্মারূপে এবং জাগতিক জড় ও চেতন প্রত্যেক বস্তুতেই ভগবান বিরাজ করিতেছেন,

> "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"
> কঠ উপনিষদ ২।২।৯

একই অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি বিভিন্ন পদার্থের সহিত সংযোগ বশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপী ভগবান বাহিরের বিভিন্ন আধার বশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন। প্রত্যেক জীবের অন্তরাত্মারূপে ভগবান বিরাজিত থাকিলেও মানব সাধারণ বহির্জ্জগতের মমতার আবেষ্টনে আত্মবিস্মৃত। শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের মনীষীগণই সেই বিস্মৃত আত্মার উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ভারতের বেদ বেদান্ত দর্শন ইত্যাদি এই প্রচেষ্টারই ফল বলা যাইতে পারে। এই প্রচেষ্টা বা সাধনার পথে চলিতে চলিতে মানুষ যখন নিজ শক্তির শেষ সীমায় আসিয়া আর পথ দেখিতে পান না. পথের সন্ধানে সমস্ত শক্তি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তখনই তিনি পথপ্রদর্শক গুরুর জন্য প্রার্থনা করেন এবং সেই প্রার্থনার ফলে ভগবান পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া মানবের যাত্রার পথের বিঘ্ন অপসারিত করেন। স্বীয় দিব্যজ্ঞানালোকে সাধকের সম্মুখের তমসাচ্ছন্ন পথকে আলোকিত করিয়া তাহার অগ্রগমনের সহায়তা করিতে সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মারূপী ভগবান কর্ম্মজগতে অবতীর্ণ হন। ইহাই ভারতীয় মনস্তত্ত্বে অবতারের কথা।

জগতে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইলে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান আবির্ভূত হন। ধর্ম্ম অর্থে যাহা ধরিয়া যাহা অবলম্বন

।১। গুরূন্ হত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহ লোকে। ২।৫।

করিয়া মানব কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়া তার অন্তরাত্মারূপী ভগবানের স্বরূপ জানিবার পথে অগ্রসর হইতে পানেন, মানবের সেই অগ্রগমনের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তার আকুল প্রার্থনায় সেই বিঘ্ন দূর করিতে তিনি আসেন এবং ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সকল গরিমা ত্যাগ করিয়া মর্ম্মস্থলের সকল গ্লানি দূর করিয়া গর্ব্বশূন্য হৃদয়ে কর্ণদ্বার উন্মুক্ত রাখিলে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পরশে তার গান।" ইহা ভারতীয় সাধক মণ্ডলীর অনুভূত বিষয়, তাই গীতা পাঠে আমরা জানিতে পারি জীবনব্যাপী সাধনা ও সংকল্প লইয়া জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরত্বের গর্ব্ব এবং বেদ বেদান্তাদি অষ্টাদশ বিদ্যার গরিমা লইয়া জগৎপূজ্য মহাবীর অর্জ্জুন রণাঙ্গণে আসিয়া এমন এক সমস্যার সম্মুখে পড়িলেন যাহাতে তাঁহার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। যে ধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া তিনি এতদিন কত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া কত সমস্যার সমাধান করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, আজ এমন একস্থানে উপস্থিত যেখানে তাঁর সেই ধর্ম্ম আর তাঁহাকে পথ দেখাইতে পারিল না। আজ তাঁর সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া তিনি আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না বরং এতদিনের কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া নিষ্ক্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু আজীবন কর্ম্মের সাধক নিষ্ক্রিয়তারও প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করিতে না পারিয়া বিমূঢ়চিত্তে যখন সকাতরে বলিয়া উঠিলেন আর পারি না প্রভো, আর আমি ভাবতে পারি না, আমার সকল শক্তি নিঃশেষিত, বল প্রভো কোন পথে অগ্রসর হব, কোন পথ আমার পক্ষে কল্যাণকর

"কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয় স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহিতন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাংত্বাং প্রপন্নম্।

গীতা ২।৭

চিত্তের দীনতা বশতঃ আমার প্রকৃতি অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত, যাহা আমার পক্ষে কল্যাণকর তাহা আমার শিক্ষা দাও। এইরূপ গর্ব্বহীন শরণাগতকেই ভগবান কৃপা করেন। যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জ্ঞানের বিপাকে পড়িয়া তিনি অন্যায়ের প্রতিকার ও পৈত্রিক রাজ্যোদ্ধার রূপ ব্যবহারিক জীবনের এক অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিচারবুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন শরণাগতের গুরু ভগবান 'উপকারায় ভক্তানাম্' ভক্তের উপকারের জন্য প্রচলিত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জ্ঞানকে স্বীয় দিব্য ভাব ধারায় উদ্ভাবিত করিলেন।

যদিও কর্ম্মবাদীর মতে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন আর সব কর্ম্ম নিষিদ্ধ এবং জ্ঞানবাদীর মতে সকল কর্ম্মই বন্ধনের মূল, কিন্তু গীতা সেই প্রচলিত জ্ঞান ও কর্ম্মবাদের নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন—জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে নির্ম্মম প্রতিযোগিতার জগতে বাঁচিতে হইলে অশাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনীয় কোন কর্ম্মই ত্যাগ করিলে চলিবে না, কিংবা কর্ম্ম বন্ধনের কারণ বলিয়া কর্ম্ম জগৎ হইতে পলাইয়া যাইলেই কর্ম্মের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে না, কারণ জগতের কর্ম্মব্যবহার কখনও বন্ধ হইবার নহে। মানুষ কর্ম্মজগতে থাকুক আর নাই থাকুক প্রকৃতি নিজ গুণধর্ম্মানুসারে সতত জগতের কর্ম্ম চালাইতে থাকিবে, কাজেই এরূপ কোন বিশেষ বিধি বা কৌশল অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে সর্ব্ব কর্ম্ম করা যাইবে অথচ কর্ম্মজনিত বন্ধন বা পাপ ঘটিবে না। কর্ম্ম করিবার এইরূপ কৌশলকে গীতা কর্ম্মযোগ বলিয়া প্রচার করিলেন।

"—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" গীতা। ২। ৫০

কর্ম্মের বিশেষ বিধি বা কৌশলই কর্ম্মযোগ। এই কৌশল বা যোগ অবলম্বন করিয়া সংসারে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিয়া যাইলে মানব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম শ্রেয় লাভ করিবেন, এবং মানবের কর্ম্মক্ষেত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লীলাভূমি না হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইবে। কর্ম্মের এই কৌশল বা যোগ দ্বারা কিরূপে কর্ম্ম সম্পাদন করা যায় বহু প্রকারে গীতা তাহার ক্রম ও পরিণতি দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্বতন দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি যেরূপ ঈশ্বরকে গৌণস্থানে রাখিয়া জগৎব্যাপারের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিষয়ক বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন গীতা সেরূপ না করিয়া ঈশ্বরকে সকল বিষয়ের শীর্ষস্থানে রাখিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিষয়ক মীমাংসা করিয়াছেন,

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

গীতা।১৮।৬১

হে অর্জ্জুন ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ শক্তিতে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বদেহাভিমানী জীবকে চালিত করেন। মানবের অন্তর্য্যামীরূপে সমুদায় জ্ঞান ও কর্ম্মের জগত তিনিই চালনা করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার জন্যই আমরা সকলে জীবিত রহিয়াছি, কর্ম্ম করিতেছি, যুদ্ধ করিতেছি, সকল মানবজীবন তাঁহাতেই গ্রথিত থাকিয়া তাঁহারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে,—

মযি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।

গীতা।৭।৭॥

সূত্রে গ্রথিত মণির ন্যায় সমুদায় জীব-জগৎ আমাতে (ঈশ্বরে) গ্রথিত রহিয়াছে। তিনিই সর্ব্ব কর্ম্মের নিয়ন্তা ভোক্তা ও ফলদাতা সুতরাং শুভাশুভ সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। জগতে যাহা কিছু সব তাঁরই প্রকাশ, তিনিই একমাত্র সদ্বস্তু। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বহৃদয়স্থিত সর্ব্বভূতের ঈশ্বর মনুষ্যের গোপন হৃদয়বিহারী অতীন্দ্রিয় অন্তর্য্যামী ভগবানই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা সর্ব্ববস্তুর অধিশ্বর,—

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥"

গীতা।৫।২৯॥

ঈশ্বরই সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা ভোক্তা—সর্ব্বলোকের গুরু ও সুহৃদরূপে সকলের হৃদয়ে থাকিয়া মানবের সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এইরূপ বুদ্ধিতে নিজেকে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মাত্র জ্ঞানে কামনা ও মমতাশূন্য হৃদয়ে সংসারে যথাপ্রাপ্ত শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও অনুষ্ঠাতা সর্ব্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম শ্রেয়োলাভের অধিকারী হইতে পারেন।—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

গীতা।৩।৩০

সমুদায় কর্ম্ম আমাতে (ঈশ্বরে) অর্পণ পূর্ব্বক তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যই ভগবানের কার্য্য এবং সকল কার্য্যের ফল তাঁহারই, 'আমি তাঁহারই অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি মাত্র এই বিশ্বাসে নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর, শোক করিও না।

"যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥"

গীতা।৩।৩১

যাহারা শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াহীন হইয়া সর্ব্বদা আমার এই মতের অনুবর্ত্তন করেন তাহারা সমুদায় কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। এইরূপ বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম করাকে কর্ম্মযোগ এবং এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মীকে কর্ম্মযোগী বলা হইল, এবং কর্ম্মযোগী হইতে হইলে কর্ম্মীকে কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। কর্ম্মীকে কর্ম্মযোগে উপনীত হইতে হইলে পর পর তিনটী সোপান অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথম, কৃতকর্ম্মের ফলের আকাঙ্খা ত্যাগ করিতে হইবে।—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

গীতা।২।৪৭

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। দ্বিতীয়, কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ প্রকৃতিরই গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে, কাজেই নিজেকে কর্ত্তা মনে করা অহংকারের পরিচয়। প্রকৃতির দ্বারাই জগতের সমস্ত কর্ম্মব্যবহার চলিতেছে বুঝিয়া কৃতকর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

গীতা।৩।২৭

প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদিত হইতেছে কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'আমিই কর্ত্তা' এইরূপ মনে করিয়া থাকে। তৃতীয়, 'ঈশ্বরার্পণ' ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইবে। মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্ম করে নিজের জন্য, সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য, স্বার্থের প্রেরণায় তাহার প্রত্যেক কর্ম্মের মূলে স্বার্থানুসন্ধান জড়িত থাকে। সে আপনাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সেই জন্য তাহার কর্ম্ম সকাম হইয়া পড়ে। গীতার উপদেশ—সমস্ত

কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে, সর্ব্বতোভাবে তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥"
গীতা।১৮।৫৭

চিত্তদ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম ॥
গীতা।৯।২৭।

তুমি যেই কার্য্য অনুষ্ঠান কর, যাহা কিছু আহার কর হোম কর দান কর বা তপস্যা কর সে সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে। যিনি এরূপভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রীতি নহে, তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কার্য্য সাধন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের করণমাত্র মনে করেন, তিনি ঈশ্বরে আপনার ক্ষুদ্র সত্তা ডুবাইয়া দিয়া সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করেন। যিনি এইরূপ করিতে পারেন তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। (১)।

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম ॥"
গীতা।১৮।৫৬।

সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ অর্থাৎ ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার প্রসাদে সনাতন নিত্যপদ প্রাপ্ত হন। কাজেই কর্ম্মযোগী মাত্র কর্ম্মী নন, তিনি একাধারে কর্ম্মী জ্ঞানী এবং ভক্ত। কারণ জ্ঞানী না হইলে প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণের দ্বারা জগদ্ব্যাপারের সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে এ জ্ঞান হয় না, এবং ভক্ত না হইলে ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর পরায়ণ হইতে পারেন না। কাজেই এই কর্ম্মযোগের বাণী প্রচার দ্বারা গীতা এক দিকে দর্শন ও উপনিষদোক্ত কর্ম্মবাদ জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিলেন এবং অপর দিকে ভারতের লুপ্তপ্রায় কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে পুনর্জীবিত করিয়া নির্ম্মম প্রয়োজনের জগতের প্রতিযোগিতার সম্মুখে মর্কট বৈরাগ্যের মোহ হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়া জীবন যুদ্ধে অগ্রসর হইতে প্রবুদ্ধ করিলেন, এবং মানবের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের মধ্যে ঈশ্বর উপলব্ধির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া ভারতকে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিপাক হইতে রক্ষা করিলেন। তাই গীতার বাণী শুনিয়া গীতার শিষ্য বলিলেন,

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদাৎময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।
গীতা।১৮।৭৩।

হে অচ্যুত তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি আত্মানুসন্ধানরূপ স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইলাম, আমার সমুদয় সন্দেহ দূর হইয়াছে। এক্ষণে তোমার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিব।

উপনিষদের ঋষি দর্শনের বিচারক যাহ দিতে পারেন নাই তাঁহাদের অশেষ জ্ঞান ও গবেষণার বাণীতেও ভারত কর্ম্মজীবনে অধ্যাত্ম সাধনার যে তত্ত্বলাভ করিতে পারেন নাই শরণাগত শিষ্য অর্জ্জুনকে উপদেশ ছলে "সর্ব্বলোকহিতায়" অবতীর্ণ ভগবান বাসুদেব গীতা-উপনিষদে সেই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। গীতা মানবের ব্যবহারিক জগতে দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সর্ব্ব কর্ম্ম করিবার কৌশলরূপ কর্ম্মযোগের তত্ত্ব প্রচার করিয়া ভারতের ব্যবহারিক জীবন অধ্যাত্ম সাধনায় এক অতি সরল ও সহজসাধ্য সার্ব্বজনীন পথের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। ইহাই ভারতের সাধনায় গীতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলা যাইতে পারে। গীতার শিষ্য ভারত সাধন পথে আজও সেই তত্ত্বেরই অনুশীলন করিতেছেন। ভারতের নব যুগের গুরু শ্রীচৈতন্যের বাণীতে আমরা গীতার এই কর্ম্মযোগের কথারই প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি,

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি প্রেম।

নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যে কর্ম্ম তাহার নাম কাম। এই কামই সকল দুঃখ ও বন্ধনের কারণ এবং কৃষ্ণ বা ঈশ্বর প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম তাহাই প্রেম নামে অভিহিত। এই প্রেমই মানবের সকল শান্তির মূল। এই প্রেমের সাধনাই মানবের সকল সাধনের সার। বর্ত্তমান জগতের কর্ম্মগুরু, স্বামী বিবেকানন্দও "Work for works sake" 'কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিবে ফলের জন্য নহে' এই যে নিষ্কাম কর্ম্মের বাণী শুনাইয়া ভারতকে নবভাবের কর্ম্মপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ করিয়াছেন তাহাও গীতার সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগেরই বাণী,

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ॥"

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী

(১) গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কাম-রূপ

শ্রীচরণদাস ঘোষ

পাঁচ

এক তরুণ রাত্রি অকস্মাৎ নিথর হইয়াছে।

রাজ-আদেশ সুমিত্রা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। দুর্ভেদ্য পাহাড়ে ঘেরা দেশটি। ভিতরেও ছোট-বড় রাশি-রাশি দেব-শিলা, যেন হাতে গড়া, শ্রেণীবদ্ধ। ইহারই কোলে-কোলে লোক-মন্দির—পত্র-পুষ্পে ঢাকা। এর সমগ্র দ্বার, সমস্ত মুখই একে একে রুদ্ধ হইয়া গেল। কোথাও কলরব নাই, কোলাহল নাই—লোক-চাঞ্চল্য আজ নিস্তেজ, নিশ্চিহ্ন, নির্ব্বিরোধ। রাস্তাঘাট আজ সুস্থির, গাছপালা প্রশান্ত, আকাশ-বাতাস নির্ব্বাক। মাত্র বাহিরে ছড়াইয়া আছে—সুমিত্রা, আর, তার সঙ্কেতের মাথায় রক্ষী। সুমিত্রার সতর্ক দৃষ্টি এখানে-ওখানে, কাছে-দূরে, সর্ব্বত্র। তাহার শাসন, নিষেধ, মিনতি— ঘরে-ঘরে, বাড়ী-বাড়ী, দ্বারে-দ্বারে।

রাজপথের একপার্শ্বে এক শিলাখণ্ডে বসিয়া সুমিত্রা। তার সমগ্র চেতনা, সমস্ত অনুভূতি, সব আত্ম-কল্পনাই যেন কোন্ দূর একান্তে গিয়া ঠেকিয়া আছে। উপরে চন্দ্রাতপ, নীচে পত্রপুষ্পের ছাউনি, তার নীচে—তরল অন্ধকার।

এম্‌নি সময়ে কাহার পদশব্দে, সুমিত্রা চমকিয়া উঠিল, চাহিয়া দেখিতেই তার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। অস্ফুট কণ্ঠে নির্গত হইল—'কি করলে, সুমার।'

"জানিনে।"

"আজকের রাজ-আদেশ কি—এ'ত জান?

এক অস্বাভাবিক-কণ্ঠে সুমার সহসা হাসিয়া উঠিল। বলিল, "জানি। জানি, তার জন্যে রয়েছে—রাজার শাস্তি।"

"তবে?"

"সুমিত্রা। রাজদণ্ডের অধীন দেহটা—অন্তর নয়।"

সুমিত্রার মুখটি ঝুলিয়া পড়িল। পরক্ষণেই আবার মুখ উঠাইল, দেখিল—সম্মুখের এই মুখটি নির্ভীক, প্রশান্ত, অচঞ্চল। —পৃথিবীর শাসন তার কাছে তুচ্ছ, মানুষের আইন উপহাস। যেন, কোনো অস্তিত্ব-প্রহেলিকার পথ বহিয়া এক মৃত্যুহীন জন্মে হঠাৎ আসিয়া ঠেকিয়াছে। আর খানিক নির্নিমেষ নেত্রে তাকাইয়া থাকিতেই, তার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। অশ্রুনিরোধ কণ্ঠে কহিল, "কেন এমন করলে—তুমি!"

সুমার সম্মুকে আসিয়া দাঁড়াইল। আস্তে আস্তে হাতদু'টা ছড়াইয়া সুমিত্রার মুখটি হাতের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া একটু উঠাইয়া বলিল, "কেন করলাম?—রাজার শাস্তি নেব বোলে। যেন মনে হচ্ছে, পলে-পলে আমি পাপ করছি—তোমাকে প্রাণ দিয়ে। সুমিত্রা, এ-রাজ্যের এক প্রতিমা তুমি, রাজ-নিয়মে তুমি ত আমার নও।"

এ-কাহিনীর বুঝিবা জবাব নাই, তাই সুমিত্রা চুপ করিয়া রহিল।

সুমার আবার সুরু করিল, "পাপের সৌরভ বুকে আর ধরছে না। তাই, রাজার কাছ থেকে শাস্তি চেয়ে নেব। কি জান,—নির্ব্বাসন, কিংবা মৃত্যু।" একটু থামিয়াই আবার বলিতে লাগিল, "যদি নির্ব্বাসিত হই—পথে-পথে বেড়াব তোমার নাম গেয়ে, কণ্ঠে পরবো তোমার নামের রুদ্রাক্ষ। আর কি করবো শুনবে, সুমিত্রা?—এক অতি নির্জ্জন অরণ্যে, এক ঋষির তপোবনে, এক নিষ্কাম মাটির ওপর একটি মন্দির গেঁথে তুলবো—যার পূজারী হবো আমি, প্রতিমা হবে তুমি।" যেন তার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, গলা ঝাড়িয়া বলিল, 'তারপর—"হঠাৎ সুমিত্রার মুখটি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "তারপর ঠিক এম্‌নি করে সেই মুখটি বুক চিরে ভেতরে রাখবো।" বলিয়াই সুমিত্রার মুখ ছাড়িয়া দিল। মিনিট কয়েক সুমিত্রার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ আরম্ভ করিল "আর যদি মৃত্যু পাই, মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কাছে বর চেয়ে নেব—যেন এ-রাজ্যের বাইরে আমার জন্ম হয়।"

"সুমার—"

"আমায় ডাকছ ?"

"না, না! হ্যাঁ, সু-মার!"

সুমার একটু হাসিল, সে হাসি ম্লান, নিস্তেজ! কহিল, বুঝেছি! ডাকতে পারনা, অথচ ডাকতেই হবে! বল—"

"তোমাকে আমি চাইনিত!"

সুমার একটু হাসিল। বলিল, "তা জানি! কিন্তু, বলতে পার, কোন্ দিন তোমার কাছ থেকে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ ?"

সুমিত্রা অধোমুখে ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সংযতকণ্ঠে কহিল, "তুমিও বলতে পার, কি বড় ?—নিষেধ, না, নারী ?

"কি শুনতে চাও ?"

"যা তুমি বলতে পার!"

এক পলকা হাসি সুরূপের মুখে চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "নিষেধ!"

"তবুও—"

"তবুও এ-অপরাধ আমি করেছি! কেন করেছি, তার অর্থও পেয়েছি! এক বুক পাপ নিয়ে লোকালয়ে চলাফেরা করা চলেনা, সুমিত্রা!"

ঠিক এম্‌নি সময়ে দূরপথে অশ্বপদ-শব্দ হইল। সুমিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল। তারপর একটু পিছাইয়া আসিয়া একখণ্ড পাথরের উপর যেন ভাঙিয়া বসিয়া পড়িল।

সুমার কঠিনকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সুমিত্রা! স্মরণ রেখো—আজ রাত্রে তুমি কে, আর আমি কি!"

সুমিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল—একপা অগ্রসর হইল আবার খানিক পিছাইয়া আসিল। তারপর—

তারপর কটিবন্ধের দিকে হাত নামাইল, তারপর—তারপর একটি বাঁশি টানিয়া লইয়া হঠাৎ আওয়াজ করিয়া বসিল, যেন কি করিল সে জানে না, অথচ তাহাকে করিতেই হইত!

সঙ্গে সঙ্গে একটি যমাকৃতি সশস্ত্র লোক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া সুমার স্মিতমুখে বলিল, "এ-সবের প্রয়োজন নেই! তোমার কারাগার আমার চেনা!"

সুমিত্রা ক্ষণকাল সুমারের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া লোকটার প্রতি কি ইঙ্গিত করিতেই সে আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আজ বুঝিবা সুমারের হাসিবার দিন! তাই সে হাসিল—আবার, একটু আলোকহীন, দীপ্তিহীন, বলিল, "ভয় খেয়ো না—বিশ্বাস করো। জেনে রাখো—আমি মুক্তির আশ্রয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ছি!" বলিয়াই অস্থিরপদে খানিক টলিয়া ঠিকরিয়া গিয়াই অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

অতঃপর সুমিত্রা এক সময়ে যেন অকস্মাৎ টের পাইল—ঠিক সম্মুখে, অগ্রে, দূর দূরান্ত ধরিয়া এক নির্মম কুহেলিকা প্রকৃতির বাতাসরূপে কালি ফেলিয়াছে, যেন বা এক নিরুচ্ছাস-ময়ী তটিনীর উপকূলে কত কথা, কত ব্যথা উঠিয়াছিল, কত মিলন, কত কলহ হইয়াছিল, এইমাত্র সব নীরব হইয়াছে!

এদিকে অশ্বের দৌড় সরিয়া আসিল ও দেখিতে-দেখিতে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই শৃঙ্খল রচনা—সেই ভয়ঙ্কর অপরূপ নিমেষে একটিবার সম্মুখে পড়িয়াই সোজা ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল—তখন সুমিত্রা পথ ছাড়িয়া আড়ালে গিয়া আত্মগোপন করিয়াছে।

স্তব্ধ নিশীথে, ততোধিক স্তব্ধ এক পুষ্পবাটিকায়, জনহীন একটি সুরম্য হর্ম্যে শক্তি প্রবেশ করিল—চন্দনকে বুকে ফেলিয়া। তখনো চন্দন তেমনিই চেতনাহীন। কক্ষটির পরিচয়—দীর্ঘ। পুষ্পের স্তবকে ভিতরকার প্রাচীরগাত্র আবৃত, চতুষ্কোণে লতাপুষ্পের ঝাড়, মেঝেয় এখানে-ওখানে পত্রপুষ্পের রচিত কুঞ্জ—তাহারই ভিতরে-ভিতরে বাতির আলো, যেন মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেছে। ঠিক মাঝখানটিতে বিস্তৃত একখানি বাঘছাল। কক্ষের প্রত্যেক বস্তুই যেন সজীব, সচল—ইহারাই ছুটিয়া গিয়া ওদের বরণ করিল, বলিল—'এসো!'

শক্তি আস্তে আস্তে চন্দনকে বাঘছালে শোয়াইয়া দিয়া একটিবার স্থির লক্ষ্যে তাহার দিকে চাহিয়াই পা টিপিয়া-টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর রাত্রির এক অতিরিক্ত স্তব্ধক্ষণে চন্দনের চেতনা হইল। চোখ মেলিয়া তাকাইতেই, কক্ষের সমগ্র চমকই যেন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং মুহূর্তেই তার চোখ দুটি

আবার বুজিয়া আসিল, যেন এক দুর্লভ আতঙ্ক তাহাকে তাড়া করিয়াছে! আবার চোখ মেলিল, চারিদিকটায় তাকাইল—একি, কোথায় সে? আর—

আর, শক্তি?

আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিহ্বলের ন্যায় এদিক-ওদিক পা বাড়াইল—ওকি? চারিদিকেই তন্দ্রা, চারিদিকেই স্বপ্ন!

"শক্তি—"

সাড়া নাই, শব্দ নাই!

আবার ডাকিল, "শক্তি,শক্তি—"

ঠিক এমনি সময়ে বাহিরে—দূরে—যেন ধরিত্রীর এক কিনারায় অকস্মাৎ বাঁশি বাজিয়া উঠিল। চন্দন কাণ পাতিল—অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া গেল, একান্ত হইয়া নিজেকে ফিরাইয়া ধরিল সেইদিকে—যেদিকে বাঁশি বাজিয়াছে। ক্রমশঃই বাঁশির আওয়াজ সরিয়া আসিতে লাগিল, কাছে, আরও কাছে, আরও—আরও। অতঃপর চন্দন তন্ময় হইয়া এক সময়ে টের পাইল—সেই স্বরে গান মিশিয়াছে, নারীর!

গান থামিতেই বহির্দ্দেশে কাহার পদশব্দ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি নারীমূর্ত্তি আসিয়া হাসিয়া কহিল, "ঘুম ভেঙেছে?"

চন্দন চমকিয়া উঠিল, তার চোখ দু'টি নামিয়া পড়িল। বিহ্বলনেত্রে অবলোকন করিল—সে এক প্রতিমা। পা দুটি রাঙা-রাঙা, পরণে হালকা সবুজ সাড়ী, পিঠময় এলো চুল, গলদেশে পুষ্প-মালিকা! মুখটি—

"চিনতে পারছেন না?"

"আপনি—"

মেয়েটি মুখের হাসি যেন হাতে করিয়া ঘরময় মুঠি-মুঠি ছড়াইয়া দিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি আপনার—'তুমি'!"

"শক্তি!"

শক্তি একটিবার তাকাইয়াই ধীরে-ধীরে মাথা নীচু করিল।

ছয়

দুর্য্যোগের পর দেব-নিবাসে নির্ভয়ের রেখা উঠে এবং সেইদিকে মর্ত্ত্যের লোক নেত্রপাত করিয়া থাকে। তেমনি করিয়াই চন্দন শক্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। উভয়েই নির্ব্বাক, উভয়েই নিশ্চল, উভয়েই তন্ময়।

"শক্তি—"

সহসা বাহিরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। শক্তি ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "উঠুন। দীক্ষা নেবেন—" বলিয়াই চন্দনের হাতে একটা টান দিয়াই পিছন ফিরিল।

আচ্ছন্নের ন্যায় চন্দনও তদভিমুখ হইল। শক্তি যে-দিকে পা বাড়াইল, চন্দনেরও পা সেইদিকেই পড়িল, কিন্তু কোথায় তাহা সে জানে না—যেন পড়িবার কথা, পড়িবেই পড়িবে—তাই পড়িয়াছে।

আঁকিয়া বাঁকিয়া পা ফেলিয়া পথ শেষ করিয়া বাহির হইয়া উভয়ে পার্শ্বের একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। চন্দন দেখিল, সম্মুখে একখানি কুশাসন পাতা, এককোণে কোশা-কুশি।

শক্তি চন্দনের দিকে আড়চোখে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিল, "জপে বসুন—"

অবহেলা করিবার নয়, কাযেই সে-নির্দ্দেশ চন্দন ঠেলিতে পারিল না। পা বাড়াইয়া যেমন আসনে উঠিবে, শক্তি খপ্ করিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "এই নোংরা কাপড়েই?"

চন্দন নির্ব্বোধের ন্যায় শক্তির দিকে তাকাইতেই, শক্তি সেই কক্ষের সংলগ্ন আর একটি কক্ষ দেখাইয়া বলিল, "ওই ঘরে যান—সব আছে।"

সেই কক্ষের ভিতর দিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইবার রাস্তা। চন্দন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রবেশ করিল এবং যথারীতি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শক্তির সম্মুখে পড়িতেই, সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিয়া উঠিল "ওকি! "মালাগাছটি?

"সৌখীন সাজ!"

"তার মানে?"

"আমি গৃহত্যাগী।"

শক্তি তৎক্ষণাৎ যেন বাজি রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "এক্কেবার! তাইতো, হিমালয় ছেড়েছেন শিব, আর শ্মশান ছেড়েছেন মা-কালী!"

চন্দনের মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, "আমি ত বলিনি তা!"

শক্তি এম্‌নিই ভাব দেখাইল, যে বিস্ময়ের তার সীমা-

পরিসীমা নাই। কহিল, "কিন্তু, মালা যে ওঁদের গলায় দোলে! শিবের গলায়—ধুত্‌রোর, আর কালীর গলায় জবার!"

"লোকে দুলিয়ে দেয়!"

"তাই বলুন—'ওগো! পরিয়ে দাও—" বলিয়াই শক্তি হাসিয়া উঠিয়া চন্দনকে টানিয়া লইয়া পুনশ্চ ওই ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর উহারা যখন বাহির হইয়া আসিল তখন দেখা গেল—চন্দনের পরিধানে সুচিক্কণ কাষায়-বস্ত্র, মাথার চুলগুলি সুবিন্যস্ত, মুখটি ধুইয়া মুছিয়া পরিপাটি, গলদেশে বিলম্বিত পুষ্পহার!

এইবার চন্দন জপে বসিবে! আসন গ্রহণ করিয়া, যথারীতি আচমন করিয়া যেমন মুদ্রিতনেত্র হইবে, শক্তি ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওকি?"

চন্দন অপটুনেত্রে শক্তির দিকে তাকাইতেই, শক্তি গম্ভীর হইয়া বলিল, "জপতপ চোখ বুজে করা চলে না। তা হলে সৃষ্টির বাসবে কলঙ্ক পড়ে!"

জপতপ, ধ্যান-ধারণাই চন্দনের পেশা। সুতরাং, এবার আর তাকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না! সগর্বে বলিয়া উঠিল। "মিছে কথা!"

শক্তি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সত্যি, সত্যি, সত্যি! কেন জানেন?—মনের পথ চোখ! একে চাপা দিলে, দেবতার প্রবেশ পথও চাপা পড়ে!" একটু থামিয়াই আবার কহিল, "আমরা দেহী—একথা ভুলবেন?"

চন্দন একটু দমিয়া গেল। প্রশ্ন করিল, "কিন্তু, মন বসবে, কেন?"

"সে গরজ মনের! আপনার কাষ—মনের ভেতর দেবতার পথ ছেড়ে দেওয়া!" বলিয়াই শক্তি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। পরক্ষণেই আবার সুরু করিল। "জপের বস্তু চোখের অতিথি। এর সেবায় মন কৃতদাস—এই মাত্র।"

"বাইরের কলরব?"

"ও পৃথিবীর সম্মান—ধরিত্রির আমন্ত্রণ; মনে রাখবেন—আপনি পৃথিবীর মানুষ, আকাশের দেবতাও নন, বনের পশুও নন! এই কলরবের ভেতর আপনার জন্ম, কোলাহলের মাঝে মানুষ আপনি—সৃষ্টির এই আগ্রহে আপনি কল্পতরু। আপনার সুমুখে কলরব রইবে না ত, রইবে কার সুমুখে?" শক্তির মুখটি চকচক করিয়া উঠিল। পুনশ্চ ধীর ও সংযত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মানুষ, মানুষ সৃষ্টি করছে কলরব—অর্থাৎ মানুষ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছে ঈশ্বরের সৃষ্টির! আপনি যদি একে এড়িয়ে চলেন, তা হলে এড়িয়ে চলবেন কাকে জানেন?—আপনার জন্মকে!"

চন্দন শিহরিয়া উঠিল, যেন বসবাস করিবার চিরপরিচিত পৃথিবী তার সম্মুখে এক ছদ্মবেশ খুলিতে সুরু করিয়াছে! বলিল, "কিন্তু, যোগী-ঋষিরা?"

শক্তির মুখের উপর এক গোছা চুল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে-গুলাকে উপরদিকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া সহাস্যে কহিল, "ওঁরা? ওঁরা অক্ষম—আধমরা মানুষ!" পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "ওঁদের নিয়ে সৃষ্টির অঙ্ক কসলে, কোনো দিনই উত্তর মিলবেনা! ঈশ্বরের বাস্তব ইচ্ছা এই সৃষ্টি—এর মান ওঁরা রাখেন না!" খানিক কি ভাবিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "পাপপুণ্যের বিচার আমি করতে বসিনি! কিন্তু, ওঁদের তপস্যা যদি সত্যি হয়, তা হলে ওঁরা মিথ্যা—সৃষ্টির নকল লোক!"

চন্দনের চোখদুটা বড় হইয়া উঠিল! কি বলিতে চাহিল পারিলনা! শুধুই আনাড়ির ন্যায় মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল!

শক্তি হাসিল। হাসিয়া বলিল, "ও চাউনি আমি চিনেছি! সত্যি বলছি, জীবনকে ঠকিয়ে রাখতে ওঁদের জোড়াটি মেলেনা! ওঁদের যিনি তপস্যার ঠাকুর, তিনি কিন্তু ও-তপস্যা আদৌ গ্রহণ করেন না। তিনি মুখ চেয়ে থাকেন তাদের, যারা সৃষ্টির তপস্যায় ভোর হয়ে থাকে!" শক্তি চুপ করিল। একটু পরেই ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "বসুন জপে?"

চন্দন থতমত খাইয়া গেল! মিনিটখানেক ওই 'বিস্ময়ের' পানে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাকিয়ে?"

"নিশ্চয়ই! নইলে, আমার মুখ আপনার চোখে পড়বে কেন?" বলিয়াই শক্তি আড়চোখে চাহিয়া হাসি মুখে, চন্দনের সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

শনির কৃপায় এক শ্রেষ্ঠ দেবকুমারের মুণ্ড উড়িয়া যাইবার

পরমুহূর্ত্তেই ছেলেটির অবস্থা যেমন হইয়াছিল, চন্দনের অবস্থাটাও তদ্রূপ দাঁড়াইল। মূঢ়ের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া কহিল, "জপের ঠাকুর—তুমি?"

শক্তি নিশ্চল, নিরুদ্বেগ, নিসংশয়কণ্ঠে জবাব দিল—"না—মানুষ।"

সাত

চন্দন সেদিন শক্তিকে বলিয়াছিল তাহাকে লইয়া যাইতে সেই লোকালয়ে, যেখানে নারীর পূজা হয়! আজ ওই মেয়েটির মুখে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে তার মনে আঘাত পড়িল—এই কি সেই দেশ! সত্যিই কি ধরিত্রীর বুকের এক টুকরা এইখানে পড়িয়া, যেখানে পুরুষের দেব-দেবী—নারী?

চন্দন তন্ময় হইয়া তাকাইয়া—শক্তির পানে! সুষমায় আচ্ছন্ন ওই মুখটি, মহিমায়—অপরূপ! কতক্ষণ কাটিয়াছে, সে জানেনা—এক সময়ে হঠাৎ তার মনে হইল, যেন সে-মুখ কোথায় সরিয়া গিয়াছে, তার স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে কে যেন গান ধরিয়াছে, কার মুখে বাঁশি বাজিয়াছে—যেন বা এখনই আবার সে ছুটিয়া আসিয়া গলা ধরিয়া বলিবে—'আমি'! তারপর আর এক সময়ে অবলোকন করিল—এক অভিনবীন স্বচ্ছন্দ লোকালয় তাহার সম্মুখে সরিয়া আসিয়াছে, তার বুকে-বুকে মানুষ, মানুষের গায়ে মানুষ—সেখানে নিয়ম নাই, আইন নাই, বাঁধন নাই—দৈন্য সেখানে নীরব, কলহ সেখানে নিশ্চিহ্ন, অস্ত্র সেখানে নিস্তেজ! সৃষ্টির সে এক বিচিত্র রূপ!

কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে। চন্দনের চোখ আর নামে না! শক্তি আচম্‌কায় হাসিয়া উঠিল, বলিল, "থাক! আজ আর নয়!" বলিয়াই কোশা-কুশি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল। তারপর কক্ষের এক কোণ হইতে একপাত্র ফলমূল আনিয়া চন্দনের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিল, "এইবার—আর এক পূজো!"

চন্দন যেন ভোজবাজি দেখিতেছে! একবার পাত্রটির দিকে, আর একটিবার শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি?"

শক্তি মুচকিয়া হাসিয়া আড়চোখে চাহিয়া বলিল, "এক পাতেই?" মুহূর্ত্তেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "আপনার আগে হোক্—হোক্‌না?"

চন্দন আর কথান্তর করিল না। দু'একটি ফল মুখে ফেলিয়াই কহিল, "শক্তি, আসলে তুমি মেয়ে মানুষ!"

"নইলে আর পূজো পাই?"

"কিন্তু, অমন ছদ্মবেশে আমাকে আন্‌লে কেন?"—চন্দনের কণ্ঠস্বরে ইহাই প্রকাশ পাইল যে প্রশ্নটা অনেকক্ষণই তার বুকে উঠিয়াছিল, কিন্তু, লোকালয়ে বাহির করিবার অবসর সে এইমাত্র পাইয়াছে!

শক্তিও প্রস্তুত হইয়াছিল। মুহূর্ত্তেই জবাব দিল, "এ-রাজ্যের এই নিয়ম!"

"এ কোন্ রাজ্য?"

"যেখানে শিবের অভাব!"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ—যেখানে শক্তি আছে, শিব নেই!"

"বুঝলাম না ভালো"—

শক্তি একমুখ হাসিয়া জবাব দিল, "কি মুস্কিল! ওগো—যেখানে আমি আছি, তুমি নেই!"

কাজিল মেয়ে! চন্দন তাড়াতাড়ি মুখ নামাইয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার কি মনে করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "তোমার আশ্রম?"

"এই।"

"এই?"

"হ্যাঁ! যেখানে—তুমি আর আমি!"

চন্দন তখন এক বিপদে পড়িয়াছে। একটি ফলে রস অযথা বেশি। অন্যমনস্কভাবে উহার গায়ে আঙুলের চাপ দিতেই খানিকটা রস ছিটকিয়া তার চোখে আসিয়া লাগিয়াছে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া নিজেকে একটু সুস্থ করিয়া বলিল, "রাজ্যের এ-ও কি নিয়ম—এ-আশ্রমে মানুষ জপে বসে তোমার?"

শক্তি এইবার গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "না—মানুষের! 'আমি' মানে—মানুষ!" একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "কেন, জানেন? মানুষ ছাড়া মানুষের দেবতা নেই! আকাশের দেবতা পূজো চান না। তিনি চান—মানুষ পূজো করবে মানুষকে!"

"মানুষ পূজো করবে মানুষকে?"

"হ্যাঁ! মানুষ পূজো করবে—মা-মুষকে!" একটা কটাক্ষ করিয়াই শক্তি আবার সুরু করিল, "শিল্পী ছবি আঁকে। সে চায়—লোকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকুক তার ছবির পানে, তার পানে নয়! তেমনি ঈশ্বরের নির্দ্দেশ হচ্ছে—তাঁর সৃষ্টির রূপেই মানুষ বসুক, তাঁর রূপে নয়!"

তা হোক! কিন্তু, এ-যুক্তি চন্দনের মনে পৌঁছিল না—উঠিতে গিয়াই ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। আকাশের দেবতাকেই সে যে নিজেকে বিলাইয়া রাখিয়াছে। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তাহলে মন্ত্র-তন্ত্র শাস্ত্র-ব্যাখ্যা মিথ্যে বলতে চাও?"

দৃঢ়কণ্ঠে শক্তি জবাব দিল, "না। তা চাইনে! তবে সত্যি বলেও মেনে নিতে পারিনে!" একটা ঢোক গিলিয়াই আবার বলিল, "মিথ্যে বলতে চাইনে এইজন্যে—ও-সবের রচয়িতা আমার গুরুজন! আর মেনে নিতে পারিনে কেন—আমার অন্তর, সাক্ষাৎ সত্য—এর প্রতিবাদ তোলে! দুনিয়ার মালিক এত কাঙাল নন, যে, স্তোকবাক্যের নীচে আঁচল পাতেন!"

চন্দন বিদ্রোহ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "না হোক্! কিন্তু দেবার কায মানুষের—এই জন্যেই তার জন্ম!"

শক্তি হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বেবাক ভ্রান্তি!" পরক্ষণেই সহজ গলায় বলিতে লাগিল, "তা নয়! স্বীকার করি, সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষ তাই দিয়ে এসেছে! কিন্তু বলতে পারেন, কেউ কি খবর নিয়েছে কোনওদিন—নেবার মালিকের কাছে ও-সমস্ত পৌঁছয় কিনা?

পুঁথির কাহিনী চন্দনের জিহ্বাগ্রে। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল "নিশ্চয়ই! প্রমাণ—ধ্রুব, প্রহ্লাদ—"

"থামুন! নিছক 'হরি-হরি' বোলে কেউ এর মুক্তি পায়নি! পেয়েছে 'হরির' নির্ব্বাক নির্দ্দেশ মেনে! স্মরণ করুন—এদের ওপর অকথ্য নির্য্যাতন, আর স্মরণ করুন—কি চমৎকার এদের ক্ষমা, অহিংসভাব! এখানে হরির ওই ইঙ্গিত—'মানুষ পূজনীয়—তোমাদের শত্রু মানুষ নয়!" বলিয়াই শক্তি চুপ করিল। ক্ষণপরেই খামকা হাসিয়া উঠিয়া আবার বলিল, "কিন্তু সারাটা রাত এমনি করেই কাটবে?"

চন্দন অপ্রতিভ হইয়া গেল। শুষ্কমুখে বলিল, "যে ঘুলিয়ে দিচ্ছ আমাকে!" বলিয়াই আবার পাত্র স্পর্শ করিল। চন্দন সর্ব্বত্যাগী নিস্পৃহ! সুতরাং, অবশেষ কিছু রাখিতে যেন তার স্পৃহা রহিল না। সর্ব্বশেষ ফলটির উপর হাত নামাইতেই, শক্তি খপ্ করিয়া হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল "এটি থাক্—আমার!" বলিয়াই পাত্রটা উঠাইয়া লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। একটু পরেই, আবার ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহাস্যে বলিল, "এইবার গাত্রোত্থান হোক্—মুখটি ধুয়ে-মুছে দিই!"

সেই প্রতিমা!

শক্তির এই স্বল্পকালের অনুপস্থিতিতে, চন্দনের বুকে কি তর্ক উঠিয়াছিল, যেন স্তূপাকার সমস্যা—রাশি-রাশি প্রশ্ন একজোট হইয়া বিদ্রোহ তুলিবার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু শক্তির পুনরাবির্ভাবেই সে-সমস্ত অন্তর্হিত হইল। তাহার মুখে আর কথা সরিল না, জড়ের প্রায় শুধু বসিয়াই রহিল—যেন অপর পক্ষের ডাক তার কানে পৌঁছে নাই।

শক্তি আবার ডাকিল, "বেশ ত! উঠুন—"

এইবার চন্দনের চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "আর একটা কথা—"

শক্তি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আপনার-আমার কথা একটায় ফুরোয় না! কি মুস্কিল, বলুনই না?"

"মানুষের মুখ, ঈশ্বরের রূপ আড়াল করে! করে না?"

ঈষৎ পশ্চাতে একখানা উচ্চ কাষ্ঠাসন ছিল। শক্তি একটু পিছাইয়া গিয়া তাহার উপর বসিয়া বলিল, ঠিক এই কথাটাই আমি বোঝাতে চেয়েছি! মানুষ ঈশ্বরের সজীব ছবি। পূজোর ভেতর দিয়ে, জপের ভেতর দিয়ে—তপস্যার আলো নিয়ে মানুষের চোখ যদি মানুষের মুখের ওপর পড়ে, সে পড়ে ঈশ্বরের মুখেই! আড়ালে সরে যায় মানুষের মুখ—ঈশ্বরের মুখকে রাস্তা দিয়ে!"

চন্দন কি বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। মুখ তুলিয়া, মুখ নামাইয়া, আবার মুখ উঠাইয়াই বলিয়া ফেলিল "মানুষ মানে—আচ্ছা, স্ত্রীলোকের?"

শক্তি একমুখ হাসিয়া উঠিল, বলিল "তাই বলুন! আমার মুখ ভারি মিষ্টি, না?" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল

"মেয়েমানুষ, কি মানুষ নয়? নরের এক অংশ নারী, নারীর এক অংশ নর! টুকরো দুটো এক না হয়ে একজন পুরুষও হয়নি, একটি মেয়েও হয়নি! এইজন্যেই আপনার মিষ্টি লাগছে আমাকে, আমার মিষ্টি লাগছে আপনাকে!' আর ঠিক এই জন্যেই আপনার জপের বস্তু—আমি!" বলিয়াই চন্দনের চোখের উপর স্বীয় মুখটি তুলিয়া ধরিল, যেন তার বুকে চাঁদ উঠিয়া মুখে আলো ফেলিয়াছে!

এক অভিনব বিস্ময়ে চন্দন বিহ্বল হইয়া পড়িল! অবশ-নেত্রে শক্তির দিকে তাকাইতেই, শক্তি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বুঝতে পারছেন না? আমার যে-রূপে আপনি চুমুক দিচ্ছেন সে-রূপ আপনারই!"

"তোমার ভিতর আমি?"

"নিশ্চয়ই! নইলে, মেয়েমানুষ হ'য়ে আমি আপনার পানে চেয়ে রই?"

চন্দনের মুখখানা রাঙা হইয়া নামিয়া পড়িল—পড়িবারই কথা? কিন্তু, তত্রাপি সে কক্ষ হইতে পারিল না, যেন ওই মেয়েটি ইহলোকের এক আকস্মিক 'মন্ত্র'—সৃষ্টির অর্থ করিতে বসিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, দারুণ সংশয়ে প্রশ্ন করিল, "তা হলে, তুমি এই-ই বলতে চাও—মানুষ জপ করবে নিজকেই, নিজেই নিজের দেবতা—যার প্রকাশমাত্র অপরের ভেতর?"

মুহূর্তেই শক্তি জবাব দিল, "নিশ্চয়ই! নইলে, মানুষ আয়নায় মুখ দেখতো না!"

চন্দনের মুখের ভাব দেখিয়া প্রতীয়মান হইল যে যুক্তিটা তার কাছে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শক্তির দৃষ্টি উহা এড়াইল না। হাসিয়া বলিল, "এই—আমার মুখটি এমন যে পদ্মফুল, তবুও আপনার সুমুখে যদি একখানা আয়না খুলে ধরি, তা' হলে কার মুখ আগে দেখবেন—আমার, না, আপনার?" পরমুহূর্তেই গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্যি মানুষ মুক্তি পাবে সেইদিন, যে-দিন মানুষের মুখে-মুখে সে নিজের মুখই দেখবে! আর ঠিক সেইদিনই আকাশের দেবতার মোহও তার ঘুচ্‌বে!"

"তা হলে—এত তীর্থ, এত মন্দির, এত দেব-প্রতিমা, সমস্তই মিথ্যে?"

শক্তির ঘাড়ে এবার দুষ্টা সরস্বতী চাপিল। চন্দনের দিকে এক বিজয়ী মূর্ত্তি ধরিয়া কটাক্ষ করিয়া, সরিয়া আসিয়া, মুখোমুখী হইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আগে বলুন—আমার মুখটি?" পরক্ষণেই নিজেকে এক কঠিন সংযমের মোড়কে পুরিয়া বলিতে লাগিল, "মিথ্যেও নয়, সত্যিও নয়! কেন জানেন?—মিথ্যে হলে মানুষের ওপর শাসন থাকেনা, মানুষ সৃষ্টির মর্য্যাদা হারায়, সাজ তছরূপ করে! আর সত্যি নয় এই জন্যে—শাসনের নীচে যে দিন কাটায়, সে মানুষ হয় না!" একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "তাই এমন দেবতার মানুষের প্রয়োজন, যে চোখের কাজল হয়ে থাকবে, যেমন—আপনি আমার, আমি আপনার!"

"আমার শ্রীকৃষ্ণ—"

"তুমি!"

"আমি?

"চমকে উঠোনা! একখানা ছুরি আনো, আমার বুক চিরে দেখ—কার মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে!"

ঠিক এম্‌নি সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিল, "শক্তি—"

উভয়েই যুগপৎ চোখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, দুয়ারের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া—সুমিত্রা।

আট

সুমিত্রা যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহা কক্ষের প্রাণীদুটির কেহই টের পায় নাই। এইবার সে কক্ষে প্রবেশ করিল—চোখে পাখীর কলরব, মুখে উষার আলো, সর্ব্বাঙ্গ উড়াইয়া প্রভাত সমীরণ! চন্দনের সঙ্গে চোখোচোখী হইতেই সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারপর শক্তিকে এক দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলিয়াই পুনশ্চ চন্দনের দিকে ফিরিয়া বলিল, "চিন্‌তে পারছেন না?"

চন্দন এতক্ষণ বিস্মিতনেত্রে ওই মেয়েটির দিকেই তাকাইয়া ছিল—কে এই মেয়েটি, বারবার দেখা দেয়? বলিল "আ—পনি?"

"তার মানে?"

"সু—"

সুমিত্রার চোখদুটি যেন দুষ্টামিতে ভরা। বলিল "হ্যাঁ, সু-মিত্রা!"

"আপনি এখানে?"

"আপনাদের বাসর তুল্‌তে!" বলিয়াই সুমিত্রা এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া, হাসিয়া, ঠিকরিয়া বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে এক রুক্ষ আতঙ্ক চন্দনের বুকের ভিতর যেন মূর্ত্তি ধরিয়া উঁকি মারিয়া গেল। এ মেয়েটি কে, কেন এর যাতায়াত, এদের সঙ্গে সম্পর্কই বা কি—এ-সমস্ত প্রশ্ন আর তার মনে ঠাঁই পাইল না। সে যেন হঠাৎ খবর পাইল—সমস্ত-এ এক লোমহর্ষণ অভিনয়, যার অন্তরালে তার বুকে বসিবার মৃত্যুবাণ গোপন রহিয়াছে। অতঃপর যে তার পুরাতন আত্মা এই কয়েকদিন একটু করিয়া পিছাইয়া অনাদরে একপাশে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া ছিল, উহাই আবার এইবার ফাঁক পাইয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়া তাহাকে কশাঘাত করিল। পুনরপি, তার চোখে পড়িল—জীবনের সেই তার ধারাবাহিক মানচিত্র, যেখানে নারীর প্রবেশ নিষেধ। স্পষ্ট করিয়াই সে বুঝিল—এ এক বিভীষিকার দেশ, পথময় ছড়ানো নারী। পুরুষকে ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করাই এদের কায। সহসা তার মনের ভিতর হইতে এক রুক্ষ স্বর উঠিল—ফিরে চল!

চন্দন ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল, এবং তন্মুহূর্ত্তেই মনে-মনে ঠিক করিল—এই দণ্ডেই সে নিজেকে টানিয়া, ছিঁড়িয়া হিঁচড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবেই যাইবে! প্রাণপণ শক্তিতে সে শক্তির দিকে মুখ তুলিল, তুলিতেই দেখিল—সেই ছবি! তার মুখে নিষেধও নাই বিদ্রোহও নাই—সমগ্র মুখটি ভরিয়া ছাই মিনতি, আর, মিনতি! আবার তার মুখখানা ঝুলিয়া পড়িল—দেখিল, নীচেটায় অন্ধকার! অধিক্ষণ পারিল না, পুনশ্চ মুখ উঠাইল, দেখিল—সম্মুখে এক ঝলক চন্দ্রালোক! চন্দনের মনের সর্ব্বাংশ পুনশ্চ বিশৃঙ্খল হইয়া গেল এবং এই মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার ওই রুক্ষ আয়োজন আবার পণ্ড হইয়া গেল—যেন ও-মুখ আড়াল করিবার নয়, করিলে তার নরজন্মে ছাই পড়িবে! তবে?

হঠাৎ চোখোচোখী হইয়া পড়িল। চন্দন তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল—কতনা সে অপরাধী! শক্তি স্মিতমুখে বলিল, "ভোর হয়ে এসেছে! চলনা, বাগানে একটু বেড়ানো যাক্‌—"বলিয়াই চন্দনের হাতে একটা টান দিয়াই বাহির হইয়া গেল, চন্দনও সম্মোহিতের ন্যায় তদনুসরণ করিল—যেন করিতে হয় বলিয়া।

চারিদিকে ছড়ানো গাছপালা, গাছে-গাছে ফুল—লতা-পাতার নমস্কার! খানিক এদিক-ওদিক বেড়াইয়া শক্তি একটি মর্ম্মর প্রস্তরবেদীর উপর বসিল, চন্দনকেও পার্শ্বে বসাইল। অতঃপর চন্দনের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "কি ফাজিল মেয়ে, সুমিত্রা!"

চন্দনের গোটামুখটিই আরক্তিম হইয়া উঠিল! একটিবার মুখ তুলিয়া বলিল, "তাই যদি হয়—জিত আমারই!" পরক্ষণেই কণ্ঠ সতেজ করিয়া পুনরপি বলিয়া উঠিল, "এ কথা আজ তোমারই শপথ করে বলছি, শক্তি!"

শক্তির বুকের চলতি রক্ত যেন হঠাৎ থমকিয়া থামিয়া গেল! নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় কিয়ৎক্ষণ অপলকনেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া নিতান্ত অকারণেই আচমকায় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সত্যি?"

"সত্যি কি, মিথ্যে—সে জান তুমি, আমি নই!" বলিয়াই চন্দন শক্তির মুখের উপর তার চোখের সমগ্র জ্যোতিঃ ফিরাইয়া ধরিল—যেন এক দুঃসহ তৃপ্তি ও আদর তার বুক হইতে উঠিয়া চোখ দিয়া উপ্‌ছিয়া পড়িতেছে! একটু পরেই আবার সুরু করিল, "যে শপথ করে তোমার সঙ্গে এসেছি তা ভুলিনি—ভুলিনি, তুমিই আমার শক্তি! আশা-নিরাশার, গতি-মুক্তির যতকিছু পণ, যতকিছু দিলেশা—সে গচ্ছিত রয়েছে তোমারই কাজে!" তার অন্তরের প্রস্রবণ এখনো থামে নাই, পুনশ্চ আরম্ভ করিল, "শক্তি আজ বেশি কোরেই বুঝতে পারছি—কি লক্ষ্যহীন পথেই এতদিন না চলে এসেছি! ঠক্‌বার প্রবৃত্তি আর আমার নেই!"

"আমি যে মেয়েমানুষ!"

"তাই বোলেই, আমি তোমার! পুরুষকে মানুষ করতে মেয়েমানুষ ছাড়া কেউ পারে না—আমাদের অর্থ করে দেয় মেয়েমানুষ, মর্য্যাদার বড় করে নারী, পৃথিবীর বুকে উঁচু কোরে তুলে ধর—তোমরাই!"

শক্তি বুঝিবা আজ দিন পাইয়াছে! এক মুখ দুষ্টামি করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি বলছেন?—আপনি যে সন্ন্যাসী!"

চন্দনের মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিল। বলিল,

"সে হয়েছি এখন, তোমার নাম নিয়ে! সন্ন্যাসী এতদিন ছিলাম না, শক্তি! ছিলাম—ভণ্ড! আজ তোমার মন্ত্রে আমার দেহান্তর হয়েছে!" একটু থামিয়াই আবার বলিতে লাগিল "আজ বেশী কোরেই বুঝেছি, শক্তি তৃপ্তিই জন্মের অর্থ! আর, এই তৃপ্তি মুঠো মুঠো এনে দাও—তোমরা, যারা ঈশ্বরের হৃদ্‌পিণ্ড! তোমাদের অনুগ্রহ যে-জন্মে যত বেশি, মহিমায় সে-জন্ম তত বড়! ইহলোকে তোমাদের এড়িয়ে চললে পরলোকের সঞ্চয় আর কিছুই থাকে না! এই জন্যেই দ্বাপরে নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণ, ত্রেতায়—রাম!"

শক্তি মাটির দিকে মুখ করিয়া স্থির নেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইবার মুখ তুলিল। চন্দনের দিকে আড়চোখে চাহিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, "ইস্! মেয়েমানুষের ওপর টান—এত!"

চন্দন অবিচল কণ্ঠে জবাব দিল, "সে প্রশ্ন কর নিজেকে! শক্তি শুনিছি, শব-সাধনায় বসলে সুমুখে বিভীষিকা আসে। যে আঁতকে ওঠে সেই ঠকে, যে জোর ধরে বসে থাকে—সেই পায় দেবতার সাক্ষাৎ! ভয় পেয়ে এতদিন অনেক পেছিয়েছি, টলাতে আর পার না তুমি!"

এমনিই সময়ে অদূরে মিশ্রিত নারীকণ্ঠের সঙ্গীত উঠিল। চন্দন শক্তির মুখের দিকে তাকাইতেই শক্তি বলিল, "তোমারই গান!"

চন্দন বুঝিবা এক সহেতুক সরমে মুখ নামাইতেই, শক্তি মুখটা ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "মুখ নামিয়ো না—তুমি রাজার অতিথি!" মুখ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "এরা রাজ সভার নিমন্ত্রণ নিয়ে আস্‌ছে!"

দেখিতে দেখিতে এক বিরাট নারী-বাহিনীর আবির্ভাব হল—তাহাদের প্রত্যেকেরই একদেহ করিয়া রূপ, একমুখ করিয়া গান, একচোখ করিয়া চাহনি—হাতে এক সাজি করিয়া ফুল। ত্বরিৎপদে সরিয়া আসিয়া সকলেই একযোগে মাথা নোয়াইয়া চন্দনের পদতলে ভাঙ্গিয়া পড়িল, অতঃপর বাড়ীর মেয়েরা যেমন করিয়া তুলসীমূলে গঙ্গাজল দেয় তেমনি করিয়াই চন্দনের পদতলে সাজির ফুলগুলি একে-একে ঢালিয়া দিল!

গান থামিয়া গেল। তারপর যে-মেয়েটি অগ্রণী সে এক ইঙ্গিত করিতেই সকলেই নতশিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। বাকী রহিল—একা ওই মেয়েটি!

মেয়েটি এইবার হাসিমুখে একখানি পত্র বাহির করিয়া চন্দনের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "রাজার নিমন্ত্রণ!"

এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে চন্দন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পত্রখানি আদিষ্টের ন্যায় গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া মেয়েটির দিকে শুধু চাহিয়াই রহিল।

মেয়েটি সে-দিকে যেন লক্ষ্য না করিয়াই বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করিল, "প্রস্তুত হয়ে থাকবেন—অবিলম্বেই অশ্ব আসবে।" আর দাঁড়াইল না।

এইবার চন্দনের চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল, সবাই গিয়াছে, পড়িয়া আছে শুধু—এক স্বচ্ছ প্রভাত, প্রকৃতির স্তব পুষ্পের মিনতি—তাহারই মাঝে বসিয়া সে, আর শক্তি।

চন্দন অন্যমনস্কভাবে পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল এবং ভিতরটায় চোখ পড়িতেই তার চোখ দুটা বড় হইয়া উঠিল। অতঃপর শক্তির দিকে চোখ ফিরাইতেই, শক্তি হাসিয়া বলিল,

"বুঝেছি! বাঙ্গলায় চিঠি—চম্‌কে উঠেছ!"

"তোমরা বাঙ্গালী?"

"না। অহমিয়া!—এতদিন এ-কথা জিজ্ঞেস্ করনি?"

"অবসর দাওনি! এই দণ্ডে আর এক দিক থেকে আমারই ভাষা এসে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে! কিন্তু তোমরা এমনিটি হয়ে পড়েছ—বাঙ্গালীর মেয়ে?"

শক্তি আড়চোখে একটিবার তাকাইয়াই বলিল, "নইলে এমন কোরে তোমাদের পাই আমরা?" ঈষৎ অপেক্ষা করিয়া আবার কহিল, "এখানে শেখাবার লোক আছে—বাঙ্গালী মেয়ের অভাব?"

চন্দন চোখমুখ আড়ষ্ট করিয়া শক্তির দিকে তাকাইতেই, শক্তি হাসিয়া বলিল, "ও চাউনি আমি চিনেছি! কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হবার যোটি নেই!" পরক্ষণেই উঠিয়া পড়িয়া শশব্যস্তে বলিল, "আর নয়! রাজার ডাক পড়েছে!"

চন্দনও উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু, মুখে যেন তার একমুখ প্রশ্ন, যেন বা কি বলি-বলি করিয়াও সে বলিতে পারিতেছে না, অথচ না বলিলেও নয়। চিঠি খানা ভাঁজ করিয়া মুঠির ভিতর পুরিয়া সজোরে এক চাপ দিয়াই বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমার অতিথি—রাজার ত নই!"

এক নির্ম্মল হাসি হাসিয়া শক্তি তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তা জানি! কিন্তু, আমিই রাজার—আমাকে নিয়ে রাত কাটালে, তার একটা জবাবদিহি করবে না?" বলিয়া এক কৌতুক কটাক্ষ করিয়া পেছন ফিরিয়া সমুখের দিকে পা বাড়াইল। চন্দনও বুঝিতে পারিল, তাহাকেও টান পড়িয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচরণদাস ঘোষ

সুকবি ভারতচন্দ্র

মৌলভী মনসুরউদ্দীন এম্‌-এ

সাহিত্যের সঙ্গে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার গভীর সংযোগ রহিয়াছে তাহা বলিবার জন্য রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় সামাজিক ইতিহাস আমাদের এখনও লিখিত হয় নাই, কাজেই সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে যাওয়া শঙ্কাসঙ্কুল। "সাহিত্য প্রবুদ্ধ জ্ঞানেরই সৃষ্টি।" সাহিত্যিকের 'মন' ও 'কালে'র সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কালের সম্বন্ধ রাজার সহিত এবং মনের সম্বন্ধ সমাজের সহিত। এই জন্যই আমরা ভারতচন্দ্রকে মানুষ ও কবি হিসাবে দেখিতে প্রয়াস পাইব। তাঁহার জীবন ও কাব্যে সমাজ ও কালের কতটুকু চিহ্ন রহিয়াছে তাহ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কেননা "জাতির মন যখন একটা বিশিষ্ট ও পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে তখনই তা সাহিত্যে বিকশিত হয়।" এবং মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনা কল্পনার চিত্রই ত সাহিত্য।"

[শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর দিল্লী অভিভাষণ পৃ ১৩]

ভারতচন্দ্র ১১১৯ *সালে (১৭১২ খৃঃ] বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণার মধ্যে পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। [প্রথম চরিতাষ্টক পৃ ৩৫] 'ভারতের যখন নয় দশ বৎসর বয়স তখন বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র মাতার আদেশ অনুসারে ভারতের পিতা নরেন্দ্র নারায়ণের "উপর ক্রোধ করিয়া তাহার বাড়ী লুঠ ও সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন।" কাজেই নিঃস্ব নরেন্দ্রনাথ 'অতিকষ্টে পরিবারের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।' 'এই সময় ভারতচন্দ্র বাটী হইতে পলায়ন করিয়া [মণ্ডল ঘাট পরগণার মধ্যে হাজীপুরের নিকট নওয়া পাড়া গ্রামে] মাতুলালয়ে গমনপূর্ব্বক তথায় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও ['অমর কোষ'] অভিধানাদি অধ্যয়ন করেন' এবং 'বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন' হন। এই সময়ে তাজপুরের নিকট সারদ গ্রামে কেশরকুনি কোন ব্রাহ্মণ গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী যান এবং এই অযোগ্য বিবাহের নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করেন। এতৎব্যতীত তাঁহাদের ক্রোধের অন্য কারণ এই যে ভারতচন্দ্র পারশী না পড়িয়া অকেজো সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কেননা 'তৎকালে পারশী অর্থকরী বিদ্যা ছিল' এবং 'যবনেরা * এ দেশের রাজা।' এইজন্য তিনি মনোদুঃখে গৃহ ত্যাগ করিলেন এবং হুগলীর সমীপস্থ দেবানন্দপুর গ্রামের 'কায়স্থ রামচন্দ্র মুন্সী গৃহে উপস্থিত হইয়া পারশী পড়িতে লাগিলেন।' তিনি 'একবার

* শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন ও শ্রীকালীময় ঘটক প্রদত্ত জন্মসংবৎ মিলিয়া যায়, কিন্তু ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১৭১২ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন [Vide Dr. Sens' History of Bengali Language and Literature P 662]। ন্যায়রত্ন ও ঘটক মহোদয়গণ কবির জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলা বলিয়াছেন কিন্তু ডাঃ সেন হুগলী জেলা লিখিয়াছেন এবং গ্রামের নামে ন্যায়রত্ন মহাশয় পেঁড়ো নামক গ্রাম, ঘটক মহাশয় পাণ্ডুয়া গ্রাম এবং ডাঃ সেন Poron Basantapur বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন ঘটক ও ডাঃ সেন মহোদয়গণের মধ্যে জন্ম-তারিখ, গ্রাম ও জেলার মধ্যে অনৈক্য দেখা যাইতেছে।

* প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহোদয় বলেন, যবন শব্দ ঘৃণা তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা ও বিদেশী (foreigner) অর্থ বোধক। পূর্ব্বে এই শব্দ গ্রীকদিগকে বুঝাইত। বর্ত্তমানে উহার অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়া মাত্র মুসলমানদিগকে বুঝায়। মুসলমানেরাও বিদেশ আগত এবং গ্রীকদিগের মত তাঁহাদিগকে যবন বলা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই শব্দ পূর্ণ অর্থ বোধক নহে। যবন শব্দে গ্রীক বুঝায় না পরন্তু খাস করিয়া মুসলমানদিগকে বুঝায় এবং ইহা ঘৃণ্য ও জঘন্য অর্থ সমন্বিত, এবং এই জন্যই মুসলমানেরা এই শব্দে অভিহিত হইলে ক্রুদ্ধ ও আহত হন, যেননা তাঁহাদের নিজস্ব নাম রাখিয়া অন্য কেহ শ্লেষ করিয়া ইহা বলিয়া অভিভাষণ করে, ইহা তাঁহাদের মনঃপূত নহে। এই শব্দটা যখন বিদ্বেষমূলক তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সমীচীন নহে।

রাঁধিয়া দুই বেলা খাইতেন—একটী বেগুন পোড়ার আধখানি দিনমানে খাইয়া আর আধখানি রাত্রির জন্য রাখিতেন।' 'এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন কিন্তু কোন বিষয়ে রীতিমত বর্ণনা করিয়া কাহাকেও দেখাইতেন না। মনে মনে তাহার অনুশীলন করিতেন।'

ভারত যে নিগূঢ় কবিত্ব রত্নের আকর তাহা কেহই জানিতনা কারণ সে পর্য্যন্তও তিনি রীতিমত কোন-রূপ রচনাই করেন নাই। একদা মুন্সীবাবুদের বাটীতে সত্য-নারায়ণের সির্ণি উপস্থিত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান আছে বলিয়া ভারতকে সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়িতে আদেশ করা হয়। শ্রোতারা সভাস্থ হইলে মুন্সী মহাশয় পুঁথি-খানি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এই অবকাশে ভারত আপন বাসা হইতে পুঁথি আনিবার ছল করিয়া উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে একখানি নূতন পৃথক পুস্তক ত্রিপদী ছন্দে রচনা করিয়া সভাস্থলে আসিয়া পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং ভারতের ভূরিভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ে রচনা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। 'কিছুদিন পরে আর একবার তথায় সির্ণি দেওয়ার ব্যাপার উপস্থিত হইলে ভারত পূর্ব্ব রচিত পাঁচালী-পাঠ না করিয়া চৌপদী ছন্দে হিন্দি মিশ্রিত অপর এক পাঁচালী * রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই উভয় পাঁচালীর শেষভাগে ভারতের পরিচয়াদি প্রদত্ত হইয়াছে।

"দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দধাম,
হীরারাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়,
নায়কেরে গোষ্টির সহিত ॥
ব্রত কথা সাঙ্গ হ'ল সবে হরি হরি বল,
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত।" তথা।
ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হত কংস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত,
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপা দায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, সঙ্ক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি না করিও দূষনা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁর, হার হোল বরদায়
ব্রত কথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা ॥" ১১৩৪

"যৎকালে এই পাঁচালী রচিত হয় তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর।" [১৭২৭ খৃঃ]

ভারত দেবানন্দপুর হইতে অনুমান ১৩৩৯ সালে বাড়ী গিয়া পিতামাতার ও ভ্রাতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। * তাঁহাকে সংস্কৃত ও পারশী ভাষায় বিলক্ষণ কৃতাবিদ্য দেখিয়া সকলে আহ্লাদিত হইলেন।' ইতি মধ্যে তাঁহার পিতৃদেব কিছু ইজারা লইয়াছিলেন এবং 'তাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্মে সুনিপুণ বোধ করিয়া ইজারা লওয়া বিষয়ের খাজানা দাখিলাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করণার্থ মোক্তার স্বরূপ বর্দ্ধমান রাজভবনে প্রেরণ করেন।' কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের সেই ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ের খাজানা দাখিল না হওয়ায়

---

* শ্রীকালীময় ঘটক চরিতাষ্টকে পৃ ৩১ লিখিয়াছেন "এখন (1890 A.D.) তাঁহার রচিত সত্যনারায়ণের দুইখানি পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়খানি কোন সময়ে কোথায় থাকিয়া রচনা করিয়াছিলেন, বলা যায় না।' শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন দ্বিতীয়খানির কালও নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন [বাঙ্গলা সাহিত্য পৃঃ ১৭২]। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মাত্র A Short Poem in Honour of the Deity (God Satyanarayan) P 663 লিখিয়াছেন, তিনি দুইটী কবিতার মোটেই উল্লেখ করেন নাই। [ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণের পুঁথিই এখন ছাপা পাওয়া যায় কিনা?]

* ডাঃ সেন লিখিতেছেন, 'At this time his parents permitted him to return'; এইখানে পণ্ডিত ন্যায়রত্ন বা ঘটক মহাশয় কেউ permitted লিখেন নাই কারণ উভয়েই 'গৃহত্যাগ' বা 'বাটী হইতে পলাইবা' বাওবাব কথাই লিখিতেছেন। কাজেই এস্থলে ভারতচন্দ্রের পিতৃদেব ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বাটী গমন নিষেধ বা বাটী হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন নাই। ডাঃ সেন এই "অনুমতি" কোন source হইতে লিখিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা হয়। মনস্থির

গোলযোগ উঠে এবং সেই গোলযোগে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজ কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হন। * ভারতচন্দ্র কিছুকাল দুর্ব্বিষহ কারা ক্লেশ সহ্য করিয়া 'কারাধ্যক্ষকের অনুকূলতায় তথা হইতে পলায়ন করেন, এবং রাজার অধিকার যতদূর ছিল তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একজন নাপিত ভৃত্য সমভিব্যাহারে তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্যতম রাজধানী কটকে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মহারাষ্ট্র সুবাদার শিবভট্টের আশ্রয় লয়েন' (ক) এবং কিছুদিন সেখানে থাকিয়া পুরুষোত্তম গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে 'শাসনকর্ত্তা তত্রত্য পাণ্ডাদিগের উপর চিঠি দিলেন' (খ)। সেই চিঠি থাকাতে শ্রীক্ষেত্রের যেখানে-সেখানে মাশুল না দিয়া বাস করিতে পারিতেন এবং আহারের জন্য প্রত্যহ পুরী হইতে একটী করিয়া 'আটকে' পাইতেন। সঙ্গের চাকর ও আপনি দুইজনে তাহা ভাগ করিয়া খাইতেন। 'তথায় তিনি শ্মশ্রু ধারণ, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি উদাসীনের বেশ পরিগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবদিগের দলে মিশিয়াছিলেন এবং ভাগবত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনেক গ্রন্থ পাঠ করেন।' কিয়দ্দিনান্তর তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত নগ্ন পদে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে একদিন খানাকুলকৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে তাঁহার ভায়রা ভাইয়ের বাড়ী ইহা ঐ ভৃত্য অবগত ছিল। সে গোপনে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ায় তাঁহারা অনেকে আসিয়া ভারতকে ধরিলেন এবং নানারূপ বুঝাইয়া উদাসীন বেশ অপনয়নপূর্ব্বক অনেক যত্নে তাঁহাকে সংসার ধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। (১) তিনি বাটীতে গমন করিলেন না। কেননা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 'যতদিন না অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি ততদিন আর বাড়ী যাইবনা।' 'অনন্তর ভারত শ্বশুরালয়ে গমনপূর্ব্বক পরমানন্দ সহকারে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন এবং পত্নীকে সেইস্থানে রাখিয়া পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া ফরাসডাঙ্গার ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্ব দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ দেওয়ান চৌধুরীর সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা করিতে আসিতেন। একদিন তিনি ফরাসডাঙ্গায় উপস্থিত হইলে চৌধুরী মহাশয় ভারতের পরিচয় দিয়া তাঁহার প্রতিপালনের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে তিনি কবিকে রাজধানী কৃষ্ণনগরে যাইতে বলিয়া গেলেন। ভারত তথায় গেলে মাসিক ৪০৲ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বাসা দিলেন।' তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দুইটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। (২) রাজা ভারতের উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধি দিলেন। (৩) তাঁহার আজ্ঞায় পরম যত্নে "অন্নদামঙ্গল" রচনা করেন এবং তাঁহার মধ্যে পরম কৌশল সহকারে 'বিদ্যাসুন্দর' ও মানসিংহের উপাখ্যান যোজনা করিয়া দেন। এই গ্রন্থ ১৭৫৫ খৃঃ [ডাক্তার সেন বলেন ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ] সমাপ্ত হয়।

এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি আপন ইচ্ছা ও রাজার অনুমতি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীর সমীপে ফরাসডাঙ্গার পরপারবর্ত্তী মূলাজোড় গ্রামে বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে পরিবারাদি আনয়ন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিষমাগ্নি রোগে পরলোক গমন করেন।

মনস্থুরউদ্দীন

---

* একদল সাহিত্যিক বলেন যে, মুসলমানেরা কবিদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন এবং এইজন্য বাংলা সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রকে কারারুদ্ধ দেখিয়া তাঁহারা কি বলিতে চান? বর্ত্তমান যুগেও যে কাজী নজরুল ইসলাম কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছেন সেই সম্বন্ধেই বা তাঁহাদের বক্তব্য কি? নজরুলকে বন্দী করিল বলিয়াই কি বলিতে হইবে যে ইংরাজ বাংলা সাহিত্যের মুণ্ডপাত করিলেন? আসল কথা রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কোন কারণে যদি দণ্ড হয় এবং তাহা যদি বিশেষ করিয়া কবিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য না হয় তবে তাহা কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে? মুকুন্দরামকে কি মুসলমান নরপতি—যাঁহাদের লালনপালনে বাঙ্গলা সাহিত্য পরিবর্দ্ধিত—স্বয়ং বা স্বেচ্ছায় ত্রাস করিয়া অত্যাচার করিয়াছিলেন? আর যদি সুলতানের চাকর একজন অত্যাচারী হয় তবে সেই দোষ চাকরের ঘাড়ে না চাপাইয়া সুলতানের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা কি ভাল? যদি সুলতান বিশেষ ফরমানে মুকুন্দরামকে কবি বলিয়াই শাস্তি দিতেন তবে তাহা দোষণীয় হইত সন্দেহ নাই। এই রাজনৈতিক কারণেই আরোপিত অপরাধে সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি আলওয়ালকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। মুসলমান কবি বলিয়াও ত রাজা তাঁহাকে মুক্তি দেন নাই? এতদ্ব্যতীত 'শিবায়ন লেখকের প্রতি কে অত্যাচার করিয়াছিল? চৈতন্যদেবের পিতৃদেবকে ব্রাহ্মণের হিন্দু হইয়াও দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কাজেই মুসলমান রাজাদের উপর অথবা অযৌক্তিকভাবে দোষারোপ সমীচীন নহে এবং লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বিচারবুদ্ধিসঙ্গত নহে।

(ক) ডাঃ সেন শিবভট্টের আশ্রয় গ্রহণের কথা তাঁহার History of Bengali Literatureএ উল্লেখ করেন নাই।

(খ) ডাঃ সেন শিবভট্টের চিঠি দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন নাই।

(১) শ্রীকালীময় ঘটক বা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন গোপন ভৃত্য কর্ত্তৃক সংবাদ প্রদান করার কথা লিখেন নাই। 'অনেকে আসিয়া ধরিলেন' পণ্ডিত ন্যায়রত্নের গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঘটক মহাশয় লিখিয়াছেন 'ভারত আসিতেছেন শুনিবা মাত্র ভায়রা ভাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।' ডাঃ সেনও ইহা লিখিয়াছেন। গোপনে সংবাদ প্রদান তবে কি সত্য নহে?

(২) ডাঃ সেন বা পণ্ডিত ন্যায়রত্ন কেহই একথা উল্লেখ করেন নাই।

(৩) ডাঃ সেন "গুণাকর" উপাধি প্রদানের কথা লিখেন নাই অথচ Bharatchandra Raigunakar লিখিয়াছেন।

সুদুর্গমের দুর্গপুরে
বন্দিনী সে রাজার মেয়ে
তোমার লাগি নয়ন ঝুরে
তোমার লাগি আছেন চেয়ে।

শৈল কঠিন তেপান্তরে
অশ্ব ছোটাও দর্পভরে,
তীব্র হ্রেষার উন্মাদনে
নাচবে শোণিত বক্ষপরে!

থাকবে পিছে অরণ্যতল
থাকবে পিছে শৈলমালা
মুক্ত করি বন্ধনদল
উদ্ধারিয়ে আনবে বালা!

জয়শ্রী আজ দুর্গপুরে
কঠিন ডোরে আছেন বাঁধা,
তাঁর লাগি মোর নয়ন ঝুরে
মোচন লাগি মন্ত্র সাধা।

বঙ্গদেশ আজ গানের রাজা
তাহার বাণী মূর্ত্তিময়ী
বিশ্বে কেহই দেখে না যা,—
গানের জোরে দিগ্বিজয়ী।

দিগ্বিজয়ের অকাল বোধন
এই পূজাটি পুণ্যতম
দুর্গা খোলেন দুর্গমদ্বার
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

খাঁটির মর্য্যাদা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। একটু যেন বেশী রকম প্রফুল্ল ভাব।—এমনি কুকুর বেড়াল দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, আজ আসিয়াই আমার জিমিটাকে, টুসকি দিয়া, শিশ দেওয়ার চেষ্টা করিয়া নাচাইতে লাগিল। বলিল—"জাতটা বড্ড নোংরা, নৈলে মন্দ নয়, যদি কামড়াবার আর পাগল হওয়ার ভয় না থাকত; আর এই এক ঘাড়ে ওঠা আর হাত চাটা রোগ! ...য'-যা, গেট্ এ্যাওয়ে।"

বলিলাম—"বোস্, কি খবর বন্ধু? আজ সকালে ছিলি কোথায় রে? তোর জন্যে আমরা সব ব'সে—ব'সে—ব'সে..."

বন্ধু বলিল—"তোমাদের কি ভাই?—দিব্যি খাচ্চ দাচ্চ, আর রাজা-উজির মেরে বেড়াচ্চ, আগে পড় আমার মত ইয়ের পাল্লায়..." বলিয়া ছোট্ট করিয়া একটু হাসিল।

এটা বন্ধুর পেটেণ্ট বুলি, সরল অর্থ হইতেছে—"বিয়ে না করিয়া ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরিয়া বেড়াও, তোমরা আমার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের কথা আর কি বুঝিবে বল..."

ইহার পরে সামান্য একটা সূত্র ধরিয়া টান দিলে বউয়ের কথা আসিয়া পড়ে। সে সব কায়দা কানুন আমাদের সব জানা আছে। যখন বন্ধুর মনটা বেশী রকম হৃষ্ট থাকে, আমাদের কিছুই করিতে হয় না, নিজেই সূত্রটা হাতে করিয়া ধরাইয়া দেয়।

সেই প্রশ্ন করিল—"কৈ চসমার কথা জিজ্ঞাসা করলি নি?"

বলিলাম—"হ্যাঁ, তাইতো জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম—কি হ'ল তোর চসমা বন্ধু?"

"বউ ভেঙ্গে দিয়েচে।" কথাটা বলিয়া এমন ভাবে ফিক্ করিয়া একটু হাসিল যে বেশ বুঝা গেল ব্যাপারটিতে বন্ধু বেশ আনন্দ পাইয়াছে। শ্রোতার তরফ থেকে কোন রকম ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিলেও চলিত, তবুও প্রশ্ন করিলাম—"সত্যি নাকি? চোখে কোন রকম আঘাত লাগেনি তো?"

বন্ধু আবার হাসিল, বলিল—"যদি লাগতই আঘাত, ধর যদি নেহাৎ চোখ দুটো যেতই তো কোর্টে তো আর নালিশ করতে যাওয়া যেত না? ভায়া, এযে কী হ্যাঙ্গাম তা তোমরা কি বুঝবে বল? নির্ঝঞ্ঝাট আছ, দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্চ, হুঁ..."

বলিতে লাগিল—"পরশু বলে—'আজ সিনেমা দেখতে চল।' আমি সোজা বলে দিলাম—'না।'...ও অভিনয় দেখা আমার ধাতে সয় না—থিয়েটারই হ'ক, সিনেমাই হ'ক বা মিলিটারী প্যারেডই হ'ক। যে যা নয়—সে তাই সেজে ন্যাকামি করবে, কিম্বা ছোট হাজরি খেয়ে এসে গড়ের মাঠে নিরীহ বাঙ্গালীদের দেখিয়ে দেখিয়ে ফাঁকা আওয়াজ দাগতে থাকবে এসব তঞ্চকতায় যার মন ওঠে উঠুক, বন্ধার ওঠে না। এর ওপর কোন কথা আছে?...নিকুঞ্জ ময়রাও অর্জ্জুন নয়, ভৈরব তেলীর বখাটে ছেলে যতেও কিছু অভিমন্যু নয়, অথচ, আসরে সেজে গুজে ভোল ফিরিয়ে কি বাহবাটাই না লুটবে! তোমরা যখন দেখচ নিকুঞ্জ অভিমন্যুর মৃত্যুতে ছেলের কপগুণ ব্যাখ্যানা ক'রে হাপুস নয়নে কাঁদচে, আর খুলেযাওয়া গালপাট্টা একহাতে চেপে অন্য হাত নেড়ে ভীষণ প্রতিহিংসা নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করচে, আমি ততক্ষণে স্পষ্ট দেখচি অভিমন্যু যতে সাজঘরে পরচুলাটা বগলে ক'রে গাঁজায় দম মারচে। দেখার ভুলে তোমরা দাও বাহবা আর আসল রূপটি মনশ্চক্ষের সামনে থাকে ব'লে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। যতেকে যদি চেনো তো বুঝতে পারবে সপ্তরথীতে মিলে তাকে সাবাড় করে পাড়ার কী উপকারটাই করেচে!—অবশ্য যদি সত্যি সাবড়াতে পারতো। রোজ সকাল থেকে সন্ধে পর্য্যন্ত মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে দু'শো লোকে

তার মৃত্যুকামনা ক'রচে—আবার আশ্চর্য্য দেখ একটা স্থ-মলেব সাজ প'রে সেই যতেই ম'রেচে ব'লে তারাই সব কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্চে—লজিক্যালি দেখতে গেলে যতে যথার্থই ম'ল না ব'লেই যাদের কাঁদা উচিৎ ছিল।...মিচে ব'লচি?

সিনেমা দেখতে গেলে—এতে আর্টের আরও কারচুপি—তার মানে ভাঁড়ামি আরও একপর্দ্দা চাড়িয়ে। সেবারে কি একটা ইংরিজী সিনেমা দেখে এসে বউ তো রাত্রিবে আহার নিদ্রাই ত্যাগ ক'রলে একরকম; কেবলই—'অহা, অমন সতীলক্ষ্মীর এত হেনস্তা!'...যত বলি—'ও গল্প, ওসব কি ধবতে আচে?' কিন্তু এসা গেঁথে ব'সে গেচে মনে, কিছু কি শুনতে চায়? শেষে ব'ললাম—'তোমার ঐ সতীলক্ষ্মী নায়িকার খোঁজ ক'রে দেখতে গেলে একাধিক্রমে বোধ হয় আট-দশটি বিবাহ, তা'ভিন্ন স্বাধীন প্রেমেব পরীক্ষা যে মনে মনে কত চ'লচে,...

ব'লতে বা দেরী!—সে আমার যে নাকালটা হ'ল তা' আর ক'য়ে কাজ নেই। হিন্দুর মেয়ে নিজের গা বাঁচিয়ে স্বামী দেবতাকে যতটা গালমন্দ দিতে পারে সে তো হবই, সে রাত্রে অনাহাব, তার পরেব দিন সাধন ময়বার দোকান না থাকলে তাই হ'ত; তিন দিন কথা বন্ধ, চার দিনের দিন ঘাট মানিয়ে শান্তি স্থাপন হ'ল. বলে—'টের পেলে তো সতী-লক্ষ্মীর নামে কুকথা বলার মজা?'

বিদ্যাসাগর মশাই গিরীশ ঘোষকে জুতো ছুঁড়ে মেরে-ছিলেন শুনেই তোমাদের তাক্ লেগে যায়, প্রবঞ্চনাটা কদ্দূর এগুতে পাবে বোঝ!—স্বামী স্ত্রীতে মুখ দেখ'দেখি বন্ধ!

কি কথায় কি কথা এসে পড়ল। হ্যাঁ, পরশু বলজে—'আজ সিনেমা দেখতে চল।' সাফ জবাব দিলাম—'কোন মতেই না'।...'যেতেই হবে'...'আলবৎ যাব না, আমারও মরদকা বাৎ'—একেবারে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে রইলাম। দাঁতে দাঁত দিয়ে উঠে টেবিল থেকে এ্যাশ-ট্রেটা নিয়ে মানলে ছুঁড়ে জানলায়, আমার চোখ ঘেঁসে সোজা গিয়ে গরাদে বেগে চুর চুর হ'য়ে গেল। ব'ললাম—'চোখটা যে যেত এক্ষুনি...

"উপযুক্তই হত"—ব'লে সিগারেটের টিন থেকে এক গোছা সিগারেট বের ক'রে দুহাতে ছিঁড়ে কুঁচি কুঁচি ক'রে ঘরময় দিলে ছড়িয়ে। বলে 'হিন্দুর মেয়ের ঘরে এসব নেশা-পত্র চ'লবে না!'...'বেশ, চলবে না তো চ'লবে না, আর আসবে না এ-ঘরে'...আবও উঠল আগুন হ'য়ে; ও গবমের সময় বরফ আর রাগের সময় ঠাণ্ডা জবাব মোটেই বরদাস্ত ক'রতে পারে না। আমার হাতটা ধবে মাবলে একটা হ্যাঁচকা, দোবের দিকে আঙুল দেখিয়ে ব'ললে—'তুমিও যাও বেরিয়ে, এ ঘবে নেশাখোরের জায়গা নেই—হিঁদুর ঘব'। আমিও গোঁ ধ'বে ব'সে আচি—বক্কার গোঁ বাবা!—আস্তে আস্তে আসচি বেরিয়ে,—'ঐ নাও তোমাব নেশার সরঞ্জাম'—ব'লে দিলে সিগারেটের খালি টিনটা ছুঁড়ে, বেলিঙে ঠিকরে পাযে লেগে পড়ল গিয়ে উঠোনে।

আমাব জিদটা গেল আবও বেড়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম—'বটে!'—তারপর হন্ হন্ ক'বে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। মনে মনে ব'ললাম—'না, আর প্রশ্রয় দেওয়াটা ঠিক নয়, ঢের হ'য়েচে।"

বন্ধু মুখটা একটু বাঁকাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে একদিকে তাকাইয়া রহিল। আমি বলিলাম—"না গিয়ে ঠিকই করেচিস্; ও-জাতের সব কথাতে সায় দিলে..."

বন্ধুর মুখটা মোলায়েম হইয়া আসিল। আমার দিকে না চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"তোমাদের কি ভাই?—বেপরোয়া জীবন, দিব্যি...কত ধানে কত চাল তা' তো জানো না; বলে দিলে—'না গিয়ে ঠিকই ক'রেচিস।' না যাওয়া এমনি মুখেব কথা কিনা।

যাক্, তোকে কত আর ব'লব, কতই বা তুই শুনবি?—শেষ পর্য্যন্ত আমার জিদটা গিয়ে বাগে দাঁড়াল; ঘুরে এসে ব'ললাম—'বেশ চল, যাচ্চি।'

পুরুষকে বোঝা যায়; কিন্তু কথায় বলে—স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং—মেয়েমানুষেব মেজাজ বোঝা দায় রে ভাই।—এই এতক্ষণ বেগে কাঁই হ'য়েছিল দেখলে তো? আমি যেই রাজী হ'লাম, সঙ্গে সঙ্গে জিদ ধ'রে ব'সল—'কক্ষণই যাব না!'...'কেন যাবে না? এই এর জন্যে এত কাণ্ড হ'য়ে গেল!'...'আমি যাব না, আমার খুসি!—খুসি আমার!!' ব'লে সে এক ঘব-ফাটান চীৎকার! সঙ্গে সঙ্গে গলা ভেঙে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, নিজের খোঁপা টেনে ছেঁড়া; গায়ের ব্লাউস্ ছিঁড়ে, ড্রয়ার থেকে সাবান, পাউডার, জরির ফিতে, আলতার শিশি

টান মেরে ফেলে দিয়ে, পানের ডিবে আছড়ে বালিসে মুখ গুঁজে প'ড়ল।"

বন্ধু থামিল—যেন সন্তই ঐ দুর্যোগটার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটু বিশ্রাম লইতেছে।

আমি বলিলাম—"যাক্, এবার তা' হ'লে আত্মনেপদ হ'ল; তোর জিনিসপত্র এবং পৈত্রিক শরীরটা বেঁচে গেল। তবু ভাল।"

বন্ধু বলিল—"মুখের কথায় তো কিছু লাগে না, অমনি ব'লে দিলে—'তবু ভাল।' হ'লে টের পাবি রে ভাই পরস্মৈপদীর চেয়ে আত্মনেপদীর হেপা সামলান কত শক্ত। নিজের গায়ে একটা চোটফোট লাগলে তবু ভরসা থাকে—দেখে বোধ হয় একটু মমতা হবে একসময় না একসময়। জিদ, রাগ মাথায় রইল, খোসামোদ ক'রতে ক'রতে প্রাণান্ত। আর এই সময় খোসামোদই কি কম শক্ত? কোন্ কথা সে কি ভাবে নেবে ঠাহরই হয় না; ওর চেয়ে চার হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করা ঢের সহজ।

যাক্, বিস্তর সাধাসাধির পর যেতে রাজী হ'ল; কিন্তু শাসিয়ে দিলে—'খবরদার, শেষে কোনদিন যদি খোঁটা দাও য জিদ ক'রে বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম তো ভাল হবে না। নেহাৎ অবাধ্য ব'লে লোকের কাছে দুষবে তাই রাজী হ'চ্চি।'

ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললাম—'বাঃ, জিদটা তোমার হ'ল কোন খানটা? গোড়া থেকে নেহাৎ গোঁ ধ'রে ব'সে আছি, না নিয়ে গিয়ে ছাড়ব না তাই না যাচ্চো?—দয়া মানে জিদ্ হ'ল?"

বঙ্কিম স্ত্রীর সামনের সেই বিস্ময়ের ভাবটি মুখে ফুটাইয়া কথা বলিতেছিল, আমার হাসি লক্ষ্য করিয়া বলিল—"হাসচ? বেশ, হেসে নাও যদ্দিন পার।...তখন ব'ললে—'যাব তো, কিন্তু আলতার শিশিটা গেল তোমার পাল্লায় প'ড়ে।'

ব'ললাম, 'তোমার নিজের দোষ; কেন বালিসের ওপর ছুড়ে ফেলতে পারলে না? নিদেন আমার গায়ে এসে পড়লেও আমি সামলে নিতে পারতাম তো?'

ভয়ে ভয়ে হাসবার চেষ্টা ক'রে একটু ঠাট্টাও ক'রে দিলাম চোখ কান বুজে ব'ললাম—'মনে ক'রতাম না হয় মানের পালার পর একটু হোলি খেলাই হ'য়ে গেল।'

ও-ও হেসে ফেললে, মুখ ঘুরিয়ে ব'ললে—'নাও, আর রঙ্গ ক'রতে হবেনা; কতই জানেন।'

পকেটে একটা টাকা ফেলে দিয়ে দোকানে বেরিয়ে গেলাম।

ফার্ষ্ট শো'তে যাওয়ার সময়ই পাওয়া গেল না; কাজেই যখন বায়স্কোপ দেখে ফিরে এলাম তখন বারোটা বেজে গেচে। শুতে সাড়ে বারোটা হয়ে গেল। তখন থেকে ঠায় আড়াইটা পর্য্যন্ত বায়স্কোপের গল্প শুনে কাটাতে হ'ল—'আচ্ছা, ইলা ব'লে ঐ মেয়েটির সেইখানটা তোমার কেমন লাগল?—সেই যেখানটা ডাক্তারের কথায় অম্লান বদনে নাড়ি কেটে রক্ত দেওয়ার জন্যে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলে? নাড়ি কেটে রক্ত দিতে আমার বেশ লাগে, হ্যাঃ, তা'বলে তোমার যেন কিছু হ'য়ে কাজ নেই, মা ওলাই-চণ্ডী রক্ষে করুন।...কিরকম আস্তে আস্তে নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ল মেয়েটা! আহা, কি রকম আচে কে জানে...আমার সেই থেকে মনটা এমন হ'য়ে আচে...সেই আস্তে আস্তে চোখ দু'টি বুজে আসচে, সেই ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলবার চেষ্টা, সেই দু'বার ডান হাতটি তোলবার চেষ্টা ক'রে হার মেনে ডাক্তারের দিকে চাওয়া—ডাক্তার ভাগ্যিস বুঝে নিয়ে হাতটা তুলে সীতেশের কাঁধে রেখে দিলে! তুলে দিতে চোখদু'টি কেমন বুজে এল আপনি আপনি! শেষকালে যতক্ষণ না হাঁসপাতালে বেঁচে উঠতে দেখলাম আমার মনের মধ্যে কী যে হ'চ্ছিল! আর তোমার মনে?'

আমার বোধ হয় চোখ ঢুলে এসেছিল একটা ঠেলা দিয়ে ব'ললে—'ছাই হ'য়েছিল ওঁর মনে; হ্যাঁ-গা তোমার—চোখে ঘুম আসচে আজকে? মনিষ্যি না কী!'

আমি সামলে নেবার চেষ্টা ক'রে ব'ললাম—'আমার সেই গানের সুরটা কানে লেগে রয়েচে, হাজার চেষ্টা করেও চোখ চেয়ে থাকতে পারচি না। এখনও যেন শুনতে পারচি—নিশি ভোর হ'ল শুধু জাগরণে...'

বউয়ের গলার স্বর বদলে গেল; আস্তে আস্তে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করলে—'এটা সেই বাইজীটার গান না?'

ঝাঁ ক'রে আমার ঘুমটা ছুটে গেল। আবার সামলাবার চেষ্টা করে বললাম—'হ্যাঁ, সেই পেত্নী বেটীর নাকে কাঁদুনি; শুনে আমার এমন মাথা ধ'রে গেচে যে কোন মতেই নেয়ে থাকতে পারচি না। ঠিক এই ভুরুর ওপরটা যেন...

বউ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল; তারপর চিপটেন কেটে ব'ললে—'দেখ, আমি কিছু খুকীটি নই, কিছু কিছু বুঝি। এসব কথা ব'লে কি আর মেয়েছেলেদের ঠকান যায়?...ওঁর মাথা ধ'রে গেচে তাই চোখ চাইতে পারচেন না।...আসলে সে মাগী তোমার মাথা চিবিয়ে খেয়েচে। সীতেশ বাবুকে প্রায় শেষ ক'রেছিল, এবার তোমার দফা নিকেশ ক'রতে ব'সেচে।'

শাসিয়ে বললে—'কিন্তু স্থির জেনো আমি ইলার মত নাড়ী কেটে রক্ত দিতে পাবব না। ঘুমোও, আর বড় বড় ক'রে বকে আমায় জালিও না। উনি পেত্নী দেখেচেন। আমার চোখে ধুলো দেবে, না?'

আমার বেজায় রাগ হল।—একি ব্যাপার! প্রতিজ্ঞা ভেঙে, খোসামোদ করে নিয়ে গেলাম, এক কঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ, তার ওপর প্রায় দু'ঘন্টার ওপর বসে যেন পিঞ্জরেয় বদ্ধ হযে মৃত্যু যন্ত্রণা, তার পুবস্কার গিয়ে এই দাঁড়াল, একেবারে চরিত্র নিয়ে সন্দেহ?

পাছে রাগের মাথায় উৎকট একটা কিছু করে বসি এই ভয়ে আর কোন কথা কইলাম না। রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে সকালবেলা মুখহাত ধুয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। চা টা সারলাম পুরন্দরদের বাড়ি, সেইখানে প্রায় ন'টা পর্য্যন্ত কাটিয়ে মনে করলাম এইবার বাড়ি যাওয়া যাক।...গিয়ে কি দেখলাম বল্ তো?"

"কি জানি, বুঝি মনস্তাপে..."

বন্ধু একটা কঠিন ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল—'হয়েচে; মনস্তাপ! না পড়েই সব বিদ্বান হয়েচ কিনা। মনস্তাপ ওর শত্রুর হ'ক।...গিয়ে দেখি নীচে ঝিটা থামে ঠেস দিয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। উনুনে আঁচ পড়েনি। বেড়ালটা ধীরে সুস্থে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিচ্ছু নেই, চুরিও করতে হয়নি, নাহক লোক দেখেই বা ভড়কাতে যাবে কেন? ঝিকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি যাচ্ছেতাই করে জিজ্ঞাসা করলাম বউ কোথায়। বললে—ওপরে। সেই রাগ মাথায় করে ওপরে উঠে গেলাম। দেখি বউ শোবার ঘরে শোফাটায় হেলান দিয়ে বসে, টিপয়ে একটা হাত আলগা ভাবে ফেলে রেখে জানলার বাইরে চেয়ে আচে।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার সিনেমায় একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল।—সীতেশ একমাস কোন চিঠিপত্তর না দিয়ে আজ বাড়ি এসেচে, ইলা ঠিক এইরকম ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারি হয়ে বসে আচে। সীতেশ এসে ঘরে ঢুকল তারপর একচোট নানারকম বিটকেল পশ্চার দেখিয়ে শোফার একপাশটিতে বসল; তারপর মানভঙ্গের সে একপালা!

আমার, দুঃখে, রাগে ঘেন্নায় মনটা যে কী ক'রে উঠল ব'লতে পারি না। আমি দশটা পর্য্যন্ত বাড়ি নেই, পরের বাড়ি চা খেয়ে বেড়াচ্চি, সমস্ত রাত চক্ষে ঘুম নেই, আর ও কিনা বসে বসে অভিমানের পোজ্ অভ্যেস করচে! যে অভিনয়কে, ন্যাকামিকে, আদিখ্যেতাকে আমি এত ঘেন্না করি শেষকালে তাই কিনা আমার বাড়ীর মধ্যে! ওর আমি কি অত্যাচার, কি আবদারই না সইচি! ঝগড়াঝাটি, গালমন্দ, ছেঁড়াছেড়ি—কোনটা বাদ যাচ্চে? কখন কখন রেগেচি বটে, সেটা বেটাছেলের পক্ষে স্বাভাবিক—কিন্তু মনে গ্লানি উপস্থিত হয় নি আজ পর্য্যন্ত। তার কারণ কি, না—সে গুলো ওর মনের খাঁটি অভিব্যক্তি—অভিনয় নয়। সেই ও কিনা আজ...

বন্ধু একটু গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"তক্ষুণি ফিরলাম, মনে মনে কড়া দিব্যি করলাম সমস্ত দিন আর বাড়ীতে পা দোব না; থাক্ ও ওর পোজ্ নিয়ে..."

"ঠিক করেছিলি"—বলিয়া আমি বন্ধুর কার্য্যের সমর্থন করিতে যাইতেছিলাম; আমার কথায় কান না দিয়া—বলিল "কিন্তু সিঁড়ির কাছে এসে মনে হ'ল—এ ঠিক হচ্চে না; পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে চলবে নাতো, ঠিক করে বুঝে নিতে হবে ব্যাপারটা। খাঁটি, না সত্যিই মেকি; একেবারে কৃতনিশ্চয় হ'য়ে তারপর অন্য ব্যবস্থা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা বের করতে হবে।—

আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে শোফার ধারে ওর পেছনটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক সীতেশ যেমনটি করে একমাস পরে এসে

দাঁড়িয়েছিল।—অবশ্য যতটা পারলাম। বুঝলে—এসেচি, কিন্তু ফিরে চাইলে না। আমি তখন একটু সামনে এগিয়ে গেলাম, ও-ও ঠিক সেই পরিমাণ অন্যদিকে ঘুরে গেল। ঠিক মিলে যাচ্চে। দুঃখে বিরক্তিতে আমার গা জলে যাচ্চে, কিন্তু ছাড়লাম না। একটু মুখে হাসি টেনে এনে শোফাটা ঘুরে সামনে এসে দাঁড়ালাম। বউ জানালার উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল;—হুবহু সীতেশ-ইলা, আর কোন সন্দেহই নেই। পাশ ঘেঁসে সোফাটাতে ব'সে পড়লাম,—কোণটাতে স'রে গিয়ে শোফার হাতলে মাথা গুঁজড়ে দিলে।···বুঝতে পারচ তো? তুমি সব সিনেমাতেই অভিমানের এই মার্কমারা অভিনয় দেখতে পাবে—পেটেন্ট। ইংরিজী ফিল্‌ম্ থেকে বাঙ্গালা ফিল্‌মে এসেচে—সেখান থেকে এখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ঢুকেচে; ভীম দ্রৌপদীই বল, আর সীতেশ ইলাই বল, ঐ এক জিনিস।

আমি মনের রাগ মনে চেপে স্থির ক'রে বসে আচি—শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হবে। ঘুরে মাথা গুঁজড়ে ব'সতেই আমি আমার ডান হাতটা ওর ডান হাতের চুড়ির ওপর তুলে দিলাম, তারপর বাঁ হাতটা পিঠের ওপর দিয়ে সীতেশী ষ্টাইলে যেই খোঁপার ওপর রাখব, ব্যস আর কোথায় আচে! বন্ ক'রে ঘুরে গিয়ে দিলে টিপয়টা লাথিয়ে ঠেলে, সেটা ছিট্‌কে গিয়ে একটা ঠ্যাং ভেঙে গড়িয়ে প'ড়ল; তারপর উঠে আমার চসমাটা টেনে নিয়ে মারলে আছাড়,—চুর চুর হয়ে কাঁচগুলো ছড়িয়ে প'ড়ল—ষোল টাকা দামের চশমা!—তারপর আমার ফাউন্টেন পেনটা পকেটসুদ্ধ ছিড়ে টেনে ফেলে, বোতামগুলোয় একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে, কেঁদে, চেঁচিয়ে সে এক মহামারি কাণ্ড ক'রে তুললে; তাতেও যখন আশ মিটল না, আমি সাবধান হবার আগেই—খোঁপায় টান দিলে কেমন লাগে এই দেখ—দেখ এই'—ব'লে আমার সামনের চুলটা দু'মুঠোয় কষে ধ'রে, দু'টো কড়া ঝাঁকানি দিয়ে, আছড়ে সোফায় প'ড়ে ফোঁফাতে সুরু ক'রে দিলে। বড় জোর দু'টি মিনিট—কিন্তু ঘরে যেন একটা খণ্ড প্রলয় হ'য়ে গেল!"

আমি, মেয়েছেলের এতটা স্পর্দ্ধায় একটা রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইতেছিলাম হঠাৎ বন্ধুর মুখে প্রসন্ন হাসির উদয় দেখিয়া থামিয়া গেলাম। বন্ধু আমার হাত থেকে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা লইয়া হাসি মুখেই বলিল—"বুঝতে পারলি তো?"

বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু সিগারেটে একটা টান দিল, তাহারপর হাসিতে একটু ব্যঙ্গ মিশ্রিত করিয়া বলিল—'এইটুকু আর বুঝলি নে?—বোকা!...অভিনয় নয়, খাঁটি জিনিস—আমারই ভুল হয়েছিল; অভিনয় হলে কি আর মাথার চুল ধরে হ্যাঁচকা মারে।

সেই থেকে ভাই, মনটি এমন হাল্কা হয়ে আচে, কি বলব! একবার ভেবে দেখ না, সন্দেহে সন্দেহে একেবারে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছিলাম—সোজা কথা!

অনেকক্ষণ পরে, বিস্তর সাধ্যিসাধনার পর ঠাণ্ডা হ'ল, কথা কইলে। তখন জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা, কি চাই বল।"

ব'ললে—"পদ্মলতা পাড়ের শাড়ী।"

মনে পড়ল—ফিল্‌মে ইলা ঐ রকম একখানা শাড়ী পরেছিল বটে। তা হ'ক," দিলাম একখানা এনে।" বলিয়া বন্ধু খুব পরিতৃপ্ত একটি হাসি হাসিয়া, সামনের চুলগুলা ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলিয়া দিতে লাগিল।

তাহাদের গোড়ায় বোধ হয় খাঁটি সুখের আমেজ তখনও লাগিয়াছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৯

সাবিত্রী ওরফে সাবির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় হ'ল আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে।

* * *

দাদার বিয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিবাহ উপলক্ষ্যে পড়াশুনার ক্ষতি কম হয়নি এবং বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্ব্বে আমার বেশ একটু ভয় হয়েছিল এবার পরীক্ষায় হয়ত প্রথম স্থান অধিকার করতে পারবনা।

যাই হোক দিন কয়েক খুব পড়াশুনার জন্য খেটেছিলাম, বেশ মনে আছে।

চিরকালই আমার স্বভাব, সারা বছরটা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার দু এক মাস আগে থেকে দারুণ খেটে পড়াশুনা তৈরী করে ফেলতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এ বছরেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এ বছর পরীক্ষার কিছুদিন আগেই দাদার বিয়ের ধূম লেগে গেল। তাই বিয়ের হাঙ্গামা চুকে গেলে, মনের মধ্যে আবার যখন ফিরে এল শান্ত অবসর, মণ্টী বোঠানও মাস দু-এর জন্য বাপের বাড়ী ত্রিচলায় গেল চলে, তখন হঠাৎ একদিন আমার খেয়াল হল পরীক্ষার আর সামান্য কটা দিন বাকি মাত্র। কথাটা যেদিন প্রথম চমক ভাঙ্গিয়ে আমাকে ভাবিয়ে তুলল, সে দিনটা ছিল মঙ্গলবার। 'বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠ' এই শাস্ত্র বচনের দোহাই দিয়ে ঠিক করে ফেললাম বৃহস্পতিবার থেকে রোজ আটঘণ্টা করে পড়াশুনা করব। একটা সাদা কাগজ নিয়ে রুল টেনে ঘর কেটে সমস্ত বইয়ের পাতা গুণে হিসেব করে, পরীক্ষার যে কটা দিন বাকি আছে, সেই কটা দিনের সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে মস্ত একটা রুটিন লিখে ফেললাম। এই কাজটিতেই মঙ্গল বুধ দুটো দিন গেল কেটে।

ঠিক বৃহস্পতিবারই পড়াশুনা আরম্ভ করে, রোজ রীতি মত আটঘণ্টা পরিশ্রম করেছিলাম কিনা, এখন আমার ঠিক মনে নাই। তবে ঐ সময়টা কদিন খুব খেটেছিলাম এখনও মনে আছে। এবং পরীক্ষার ফলে, প্রথম স্থান অধিকার করে যে প্রথম শ্রেণীতে উঠেছিলাম—সেটা আজও ভুলিনি।

পরের বছরটার কথা বিশেষ কিছুই এখন মনে পড়ে না। কেবল এইটুকু মনে আছে পড়াশুনার একটা খুব চাপ পড়েছিল আমার উপরে। স্বয়ং এসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার নিযুক্ত হলেন, রোজ সন্ধ্যার পরে একঘণ্টা আমাকে এসে ইংরেজী পড়িয়ে যেতেন। এ ছাড়া হেড পণ্ডিত মশাই সংস্কৃত পড়াবার জন্য প্রত্যেক শনিবারে তিনটের সময় আসতেন। মোটের উপর বাবা যেন হঠাৎ একটু বেশী রকম সজাগ হয়ে উঠলেন আমার পড়শুনার প্রতি।

তার বোধহয় একটু বিশেষ কারণও ছিল, এখন ভেবে মনে হয়। আমাদের সাচৌধুরী বংশের তিনপুরুষের মধ্যে আমিই বোধহয় এই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চলেছি। তাই একদিকে যেমন আমার লেখাপড়ার প্রতি বাড়ীশুদ্ধ

আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ছিল বিশেষ সজাগ—কোনও দিকে যেন আমার কোনও অসুবিধা না হয়—অন্যদিকে আমারই বাড়ীতে আমার আদর যত্ন গেল অন্ততঃ দশগুণ বেড়ে। লক্ষ্য করেছিলাম দুবেলায় আমার খাওয়ার দুধের বরাদ্দ দ্বিগুণ না হলেও দেড়গুণ বেড়ে গেল এবং প্রায় প্রত্যহই মাছের একটা বড় মুড়ো আমার পাতে দেওয়া হত। মাকে কে যে এসব বুদ্ধি দিয়েছিল জানিনা, তবে সেই বছরটা খাওয়া দাওয়ার আদর যত্নে আমি এক এক সময় হাঁপিয়ে উঠতাম।

আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছি—এই গর্ব্বটা বাবা মার মনে সেইসময় নিশ্চয়ই খুব বড় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই গর্ব্বের প্রকাশ ছিল সব চেয়ে বেশী দাদার মুখে। কতবার যে কত লোকের কাছে দাদাকে বারে বারে বলতে শুনেছি, "সুশন এবার এন্ট্রেন্স দেবে কি না তাই—।" সেই বছরই আমাদের স্কুল থেকে প্রথম বৃত্তি পেল। শুনলাম হরিশ দশটাকা জলপানি পেয়েছে। খবরটা গ্রামে বেশ একটু চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছিল আজও মনে আছে। এই খবরটা পাওয়ার পর দাদা আমলা কর্ম্মচারী সকলের কাছেই বলেছিলেন "তা আমাদের সুশন ত হরিশের চাইতেও ভাল ছেলে। সব মাষ্টাররাইত বলে আমি শুনেছি। আমাদের সুশন নিশ্চয়ই ১৫৲ টাকা জলপানি পাবে।"

একদিনের একটা ব্যাপার মনে পড়ে। তখন পরীক্ষার খুব বেশী দিন বাকি নেই। আমি রাত প্রায় ১২টার সময় পড়া বন্ধ করে বাড়ীর ভিতরে গেছি, খেয়ে শুয়ে পড়ব। আমি আমার শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকা মাত্র দাদার ঘরের দরজা খট্ করে খোলার শব্দ পেলাম। মণ্টী বোঠান বেরিয়ে এসে আমার ঘরে ঢুকলেন।

এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। এটা প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে সকালবেলা খুব ভোবে কোনও কালেই আমি উঠতে পারিনা। তাই পরীক্ষার আগে চিরকালই আমি একটু বেশী রাত জেগে পড়াশুনা করতাম। বিশেষত এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা সামনে।

রাত্রে খেয়ে উঠে পড়া, আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। ছেলেবেলা থেকে কোনও কালেই রাত্রে খেয়ে উঠে আমার দ্বারা কোনও কাজ হত না। তাই বরাবরই নিয়ম ছিল। যখন আমি বেশী রাত অবধি পড়তাম, আমার খাবার আমার ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকত। অন্য অন্য বছর রাত দশটা হলেই মা ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিতেন; কিন্তু এবছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমাকে কেউ ডাকত না, সে যত রাতই হোক্‌না কেন।

চিরকালই জানি রাত্রে ১০টার পরে মার জেগে থাকা ছিল এক রকম অসম্ভব।

ওদিকে মা ভোর ৫টা বাজতে না বাজতে উঠে পড়তেন; কিন্তু যেদিন আমি রাত দশটার পরেও পড়াশুনা করেছি, ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও যেদিন আসেনি, একটু বেশী রাত্রে পড়া শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে দেখতাম মা আমার ঘরে আমারই বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। আমি ঘরে গিয়ে, মাকে না ডেকে, ঢাকা তুলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে, মাকে ঠেলে তুলে দিতাম; এবং মা রোজই বলতেন "আহা! খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, তা আমায় ডাকলিনা কেন?" আর কোনও কথা না বলে ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায়ই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। এখন ভেবে দেখি আর মনে হয়, বোধ হয় সে সব রাত্রে মার খাওয়াই হত না।

কিন্তু এ বছর মণ্টী বোঠান এসেছে, তাই আমার বেশী রাত্রে খাওয়া তত্ত্বাবধানের ভার পড়েছিল মণ্টী বোঠানের উপরে। তার প্রধানতঃ দুটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ এ ভার মণ্টী বোঠান স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন আমি জানি; দ্বিতীয়তঃ, মার শরীর এ বছর বিশেষ খারাপ হয়ে পড়েছিল; প্রায়ই অম্বলের ব্যথা ধরত—তাই বদ্যি কবিরাজ মাকে বেশী রাত্রে খাওয়া এবং বেশী রাত্রে ঘুম একেবারে নিষেধ করেছিলেন। এবং চিরকালই জানি বাবার মার প্রতি আর কোন বিষয় শাসন থাকুক বা না থাকুক, মার শরীরের অযত্ন তিনি একেবারেই সইতে পারতেন না।

মণ্টী বোঠান ঘরে আসা মাত্র আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তা বোঠান! তুমি কি হাত গুনতে জান নাকি?"

বোঠান আমার দিকে চেয়ে হেসে প্রশ্ন করলেন "কেন?"

আমি বললাম "ঠিক আমি ঘরে এসে ঢুকলাম আর—তোমারও দরজা খুলল। আমি নিঃশব্দে পা টিপে টিপে

এসেছি পাছে তোমার ঘুম ভাঙ্গে, ঘরে এসেও কোনও শব্দ করিনি, কিন্তু তুমি ঠিক টের পেলে।"

বৌঠান ইতি মধ্যে সযত্নে আমার খাবার গুছিয়ে দিতে লাগলেন। আমিও খেতে বসে গেলাম। বৌঠান বললেন

"তা আমিত ঘুমুইনি ঠাকুরপো।"

আমি খেতে খেতে বললাম "এ ভারি অন্যায়, এত রাত পর্য্যন্ত তুমি না ঘুমিয়ে আমার জন্য বসে থাকবে—"

বৌঠান হাসতে হাসতে বললেন "বসেত ছিলাম না, শুয়েই ছিলাম। আর ঘুমুবার যে আমার কিছু অসাধ ছিল তাও ত নয়।"

বললাম "তবে। ঘুমোওনি কেন।"

বৌঠান বললেন "ঘুমুবার কি জো ছিল। যে দাদাটী আপনার ঠাকুরপো। পাঁচমিনিট অন্তর অন্তর নিজেও চমকে উঠছেন আমাকেও চমকে দিচ্ছেন।"

বললাম "কেন। ভূতের ভয়ে নাকি?"

বৌঠান তেমনি হাসিভরা মুখে বলতে লাগলেন, "ভূতের ভয়ত আমার নেই। তবে আপনার দাদার ভূতের ভয় হলে ত ভালই হত। ভূতের ভয়ে আপনার দাদাটী ঘুমিয়ে পড়লে, আমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচতাম।"

বললাম "তবে! তবে, চমকে উঠছিলেন কেন?"

বৌঠান বললেন "খালি থেকে থেকে—'ঐ সুশন এল বুঝি—ওঠ, দেখ।' বাপরে বাপ—ভাই যেন জগতে আর কারো হয় না।"

বৌঠানের কথা শুনে দাদার সেই মমতামাখা সরল মুখখানা প্রাণের মধ্যে হঠাৎ ভেসে উঠে আমাকে তন্ময় করে দিয়েছিল খানিকক্ষণের জন্য। খানিকক্ষণ নীরবে খেয়ে যেতে লাগলাম কোনও কথা বলিনি।

হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এল। বললাম "তা দাদাকে বললে না কেন—তোমার ভাই, তুমি বোঝগে যাও। আমায় কেন জালাতন করছ। আমি ঘুমুই—"

বৌঠানের চোখে, আমার কথাটা শুনে একটা দুষ্ট চাপা হাসি খেলে গেল। এটা বৌঠানেরই চোখের নিজস্ব—আর কারও চোখে দেখিনি। বললেন "হ্যাঁ তা বটে। বল্লেই হত। অতখানি বিচার বুদ্ধি কি আমার ঘটে আছে ঠাকুরপো? থাকলেত আমিই এট্রেন্স দিতাম।"

কথাটা ঘুরিয়ে সুদে আসলে শোধ দিলেন। ঐ বয়সেই কি বুদ্ধি—এখন ভাবি আর অবাক হই।

* * * *

যথা সময় বাবার, মার, মণ্টী বৌঠানের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সদরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ায় জন্য যাত্রা করলাম। সঙ্গে গেলেন দাদা ও আলীমিঞা। ৫।৬ দিন সদরে থেকে পরীক্ষা শেষ করে বাড়ী ফিরে এলাম। পরীক্ষার সময় দাদা প্রত্যেক দিন অন্ততঃ পাঁচবার করে জিজ্ঞেস করতেন,

"কেমন রে সুশন! বৃত্তি পাবি ত?"

* * * *

পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাবিত্রীর সঙ্গে সহজ মেশামেশির মধ্য দিয়ে পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল।

সাবিত্রী আমাদেরই গ্রামের মেয়ে। সাবিত্রী মানুষ হয়ে বড় হয়ে উঠেছে আমাদেরই গ্রামের আকাশের নীচে—মাধবপুরের জল হাওয়ায়। সাবিত্রী এরই মধ্যে তার জীবনের বারোটি বৎসর কাটিয়ে দিয়েছে আমাদেরই গ্রামের মাঠে মাঠে বনে বনে, আমাদেরই বেগবতী নদীর কূলে কূলে, ঘাটে ঘাটে।

আমাদেরই গ্রামের উত্তর পাড়ায় ছিল সাবিত্রীর বাড়ী। সাবিত্রীরা ছিল আমাদেরই স্বজাত। মুকুন্দদের বাড়ীর পেছন দিয়ে, আমাদের বাড়ীর উত্তর দিয়ে একটা সরু গ্রাম্য পথ কখনও মাঠের উপর কখনও এর ওর বেড়া দেওয়া বাগানের পাশে পাশে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে গ্রামের উত্তর পাড়ার দিকে। এই পথটীর পাশেই, আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় এক পোয়া দূরে ছিল সাবিত্রীর বাড়ী। পথের ধারেই ছিল সাবিত্রীদের বাড়ীর কটক—দুপাশে বাঁশের খুঁটী পোতা এবং তাতেই দড়ি দিয়ে ঝোলান একখানি ছেঁচা বাঁশের ঝাপ। এই ঝাপ তুলে সাবিত্রীদের বাড়ীর অঙ্গনে দাঁড়ালে সামনেই দেখা যায় একখানা জীর্ণ পুরাতন পাকা বাড়ী—বাইরে বেশীর ভাগই চুণ বালির আস্তর বহুকাল খসে গিয়েছে, এমন কি বেরিয়ে পড়া ইটগুলীর ওপরেও স্থানে স্থানে স্যাওলা ধরে কালো হয়ে

গেছে! এই বাড়ীখানির চারিপাশে বহুকালের কতকগুলি আম কাঁঠাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে —বাড়ীখানির দৈন্য সমস্ত জগত থেকে যেন আড়াল করে লুকিয়ে রাখতে চায়। বাড়ীর উঠানে ভাঁটা গাছ এবং বড় বড় ঘাসের বন। কোনও রকমে যেন বাড়ীর ঠিক সামনের একটু খানি স্থান পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। বাড়ীখানি পশ্চিম মুখী—এবং বাড়ীটার পাশেই উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটা ছোট পুষ্করিণী এবং তার চারি পাশেই কলাগাছের সারি।

ছেলেবেলা থেকেই সাবিত্রীকে দেখে এসেছি—কখনও লক্ষ্য করিনি। ছেলেবেলা থেকেই সাবিত্রী তার মার সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করত—সাবিত্রীর মার সঙ্গে আমার মার ছিল বিশেষ বন্ধুত্ব। এবং বরাবরই সাবিত্রী আমার মাকে "সইমা" বলে ডেকে এসেছে তাও আমার অবিদিত ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি সাবিত্রীদের অবস্থা ভাল নয়।—সাবিত্রীর যখন তিন বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যান বিদেশে। বিদেশে তিনি নাকি কোন গ্রামে গ্রাম্য স্কুলে হেডমাষ্টারী করতেন, হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সেই খানেই তার শেষ হয়। তারপর, সামান্য কিছু জমি জমা ছিল, তারই ধান চালের আয় থেকে এদিক ওদিক করে কোনও রকমে সাবিত্রী ও তার মার চলে যেত এবং এই জমি জমা দেখা শুনা করবার ভার বাবাই নিয়েছিলেন।

এইসব নানান কারণে ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে কেমন একটা বিশ্বাস হয়েছিল—সাবিত্রী ও তার মা আমাদেরই আশ্রিত, নিতান্ত আমাদেরই অনুগ্রহে তাদের দিন চলে! তাই বোধহয় ছেলেবেলা থেকে কোনও দিন তাদের বিশেষ লক্ষ্য করে দেখা বা তাদের জীবনের প্রতি কোনও রকম শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি—তার যেন কোনও প্রয়োজনই ছিলনা। তারা ছিল যেন আমাদেরই সংসারের আশ্রিত পাঁচজনার মধ্যে,—পরাশ্রিতের সুখ দুঃখের ভার আর পাঁচজনার সঙ্গে সাধারণ নিয়মে তারা মাথায় বয়ে নিয়ে যাবে—এইটেই ছিল যেন স্বাভাবিক। এর মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবার আর বিশেষ কিই বা ছিল!

কিন্তু এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে, কিছু-দিনের মধ্যেই, সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম যে এই সাবিত্রী মেয়েটাকে আর যেন অবহেলা করা চলে না। পাঁচ-জনার একজন বলে তাকে দূরে ঠেলে রাখা এখন যেন আর অসম্ভব। সমস্ত জগতের মধ্যে তারও যেন একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং তার আশে-পাশের সকলেই তার স্থানটুকু ছেড়ে দিতে বাধ্য—বারো বছরের এই শান্ত মৌন মেয়েটি সকলকেই যেন সেই কথাটি বুঝিয়ে দিলে তার রূপে, তার সমস্ত ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে।

সেই বয়সের সাবিত্রীকে আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আজ এই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, সেই ছবি—কৈ একটুকুও ত মলিন হয়নি! আজ ভাবি আর মনে হয়, আমাদের মাধবপুর গ্রামখানি, তার মাঠ, বন, গাছ পালা, ঝোপ, ঝাড়, আমাদের বেগবতী নদী, তার চঞ্চল জল-কল্লোল, তার এপার-ওপার—এ সমস্তই হঠাৎ সজাগ হয়ে নূতন রসে মূর্ত্তিমতী হয়ে ফুটে উঠেছিল, আমারই যৌবনের প্রথম উন্মেষে, আমারই চোখের সামনে, আমাদেরই গ্রামের সাবিত্রীর রূপে।

সাবিত্রীর দিকে চাইলেই সকলের আগে চোখে পড়ত তার নয়ন দুটো। বড় বড় দুটো কালো চোখ তার মধ্যে যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরা দিয়েছে—অনাদি অনন্তকাল ধরে চলে হঠাৎ যেন আশ্রয় নিয়েছে সাবিত্রীর নয়ন দুটোর মধ্যে গভীর বিশ্রামে। এত গভীর এত অতলস্পর্শী দুটো চোখ, একবার চাইলে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না, খানিকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে যেন তলিয়ে যেতে হয়—থৈ মেলা ভার। এত বেশী মাধুর্য্য আর চোখ দুটোর মধ্যে যে তার দিকে চাইলেই মনে হয়, চোখের লাবণ্য সব সময় ঢেউয়ে ঢেউয়ে গড়িয়ে পড়ছে—তার সারা মুখে, তার সারা অঙ্গে, সমস্ত ভঙ্গিমায়।

"সাবির মুখখানি বড় সুন্দর"—এই কথাটা অনেকবার অনেকের মুখে শুনেছি, কিন্তু এইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে এসে প্রথম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলাম কতখানি গভীর সত্য ঐ কথাটার মধ্যে এতদিন লুকিয়েছিল, আমার কাছে ধরা দেয়নি। সাবিত্রীর মুখের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটার বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা অসম্ভব কেননা চোখদুটো ছাড়া কোনটারও নিজস্ব কোনও বিশেষত্ব ছিলনা। কিন্তু নাক পাতলা ঠোঁট

কপাল ভুরু—যেটার দিকেই তাকান যায় সেইটাই মনে হয় সার্থক হয়েছে ঐ মুখখানির মধ্যে, তাকে ভাল করা গেলেও ভাল করা চলে না। সমস্ত মিলিয়ে মুখের নিটোল গড়নের মধ্যে এমন একটা মধুর সমাবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে তার কোনটাকে এতটুকু নড়ান অসম্ভব। এক চোখ ছাড়া মুখের কোনও একটা বিশেষ অঙ্গের গড়ন বা রূপ হয়ত কারও কারও সাবিত্রীর চাইতেও ছিল ভাল, তবুও সাবিত্রীর মুখ সাবিত্রীর, সে যেন সকলের চেয়ে ভাল, সকলের চেয়ে বিভিন্ন, সে যেন আর কারও হওয়া অসম্ভব।

সাবিত্রীর গায়ের রং অবশ্য "গৌর" ছিল না। তবে সাধারণ চলতি কথায় থাকে বলে "ফর্সা"—সাবিত্রী তাই। 'কালো' কেউ তাকে কখনও বলেনি, কেউ তাকে কখনও ভাবেনি। বাঙালীর গায়ের রং যদি চার বর্ণে ভাগ করা যায় —গৌর, উজ্জ্বলশ্যাম, শ্যাম, কালো—তবে সাবিত্রীর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু এখানেও এমন একটা বিশেষত্ব ছিল তার রূপে, যে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যেন সার্থক হয়েছিল সাবিত্রীর মধ্যে। গৌরবর্ণ যেন সাবিত্রীর রূপে শোভা পায়নি। তাই সাবিত্রী ছিল উজ্জ্বল শ্যামলা।

সাবিত্রী বয়সে তখন ছিল কিশোরী কিন্তু এই বয়সেই যৌবনের মাধুর্য্য সাবিত্রীর সারা অঙ্গে-অঙ্গে নিত্যই নব-নব রূপে নিজের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল—লক্ষ্য করেছিলাম। লম্বা রোগা গোছের চেহারা সাবিত্রীর মোটেই ছিলনা, বেশ সুগোল, নিটোল ছিল তার সারা অঙ্গের গড়নের ভঙ্গী—চারিদিকে একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। সমস্ত অঙ্গের মধ্যেই যৌবন ও স্বাস্থ্যের একটা মধুর সমাবেশ বিকশিত হয়ে উঠেছিল তনুতে তনুতে অপরূপ রূপ-লাবণ্য। যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে "মেয়েটী সুন্দরী।" নিন্দাও যারা করেছে তারাও বলেছে "মেয়েটী বড় বাড়ন্ত এই বয়সেই এই—" এর বেশী নয়।

কিন্তু যে সময়ের কথা বলছিলাম সে সময় সাবিত্রীর স্বভাব ছিল বড় শান্ত—অন্ততঃ বাইরের অভিব্যক্তির দিক দিয়ে। চঞ্চল সে এতটুকুও ছিল না। ধীর স্থির সমাহিত ছিল তার গতি তার ভঙ্গিমা। সলজ্জ নম্র ছিল তার ধরণ-ধারণ কথা-বার্ত্তা। এবং যদিও মাঝে মাঝে একটা দুটা ছাড়া তার মুখের কথা খুব কমই শুনেছি, তবুও সাবিত্রী যেখানেই থাকত, সে অলস আনন্দেই হোক বা কর্ম্মকঠিন কর্ত্তব্যেই হোক, সাবিত্রীর উপস্থিতিতেই সবই যেন কেমন সরস হয়ে উঠ্‌ত, তাকে ছাড়া যেত না। যেখানেই সে থাকত, সেখানেই বেশীর ভাগটা ভরিয়ে রাখত সে। সে চলে গেলে, সে কাজ ভরিয়ে দেওয়ার শক্তি—কৈ কারও মধ্যে ত দেখিনি।

বুদ্ধির দিক দিয়ে, আজ আমার মনে হয় সাবিত্রীর তুলনা মেলা ভার। সেই বয়সেই সাবিত্রী যেন জীবনটাকে ষোল আনা দেখেছিল, ষোল আনা বুঝেছিল। যেন সবই জেনে শুনে বুঝে নিজের আসনখানি পেতেছিল জীবনের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে তার মত মেয়ের চরিত্র আশ্রয় পায়, নিজের ভারে নিজে অস্থির হয়ে না ওঠে। মণ্টী বোঠান বুদ্ধিমতী ছিলেন, —এমনকি সময় সময় মনে হয় অসাধারণ বুদ্ধিমতী,—তবুও তাঁর বুদ্ধির কিনারা পাওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু সাবিত্রীর বুদ্ধির কূল-কিনারা পাওয়া ভার। মণ্টী বোঠানের বুদ্ধি ভিতরে যতখানি ছিল, বাইরে প্রকাশও ছিল ঠিক ততখানি। তাই মণ্টী বোঠানের চোখে মুখে, কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে একটা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সব সময়ই ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ত—উজ্জ্বল ছিল তার রূপ, প্রবল ছিল তার গতি। কিন্তু সাবিত্রীর বুদ্ধির জাতই ছিল স্বতন্ত্র। ভিতরে ছিল তার যতখানি, বাইরে প্রকাশ হ'ত তার সামান্য একটু ইঙ্গিত মাত্র; কিন্তু বুঝিয়ে দিত—যার সামান্য ইঙ্গিতেরই এতখানি মূল্য, তার আসল রূপটার মূল্য যাচাই করার বাজার আমাদের মানুষের সমাজে মেলে না।

দুঃখে কষ্টে, জীবনের কঠোর ঘাত প্রতিঘাতে মণ্টী বোঠানের কাছে পাওয়া যেত সহানুভূতি, পাওয়া যেত সান্ত্বনা, কিন্তু সাবিত্রীর কাছে পাওয়া যেত আশ্রয়, পাওয়া যেত বিশ্রাম। জীবনযুদ্ধে কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যে মণ্টী বোঠান হয়ত পথ দেখিয়ে দিতেন, কিন্তু সাবিত্রী দিত শক্তি, সাবিত্রী দিত প্রাণে উৎসাহ, উদ্যম।

চরিত্রের দিক দিয়ে সাবিত্রীকে বর্ণনা করা অসম্ভব কেন না আজ পর্য্যন্ত ভেবে ভেবে সাবিত্রীর চরিত্রের কোনও দিকের কোনই কূল কিনারা আমি এতটুকু পাইনি। জীবনে অনেক ব্যাপারে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বারে বারে সাবিত্রীর

সঙ্গে আমার অনেক সংঘর্ষ হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই স্তম্ভিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি।

তবুও মণ্টী বোঠানের সঙ্গে তুলনা করলে, সাবিত্রীর চরিত্রের একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। মণ্টী বোঠানের প্রাণে ছিল মমতা সহানুভূতি, সেটা সকলের জন্যই, দরদ ছিল তার সকলেরই দুঃখে, সকলেরই ব্যথায়। ঘৃণা জিনিষটার বিশেষ কোনও স্থানই ছিলনা মণ্টী বোঠানের প্রাণে।

কিন্তু সাবিত্রী! এদিক দিয়েও তার প্রাণের ধর্ম্ম ছিল একেবারে বিভিন্ন। দয়া, মমতা, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণগুলীর প্রাচুর্য্য ছিল তার প্রাণে—অনেক প্রমাণ পেয়েছি,—কিন্তু সবই ছিল তীক্ষ্ণ বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু সে বিচারের কি যে নিয়ম কি যে কানুন, আমি কোনও দিন বুঝি নি আজও জানিনা।—

সাবিত্রীর বিচারে যে অপাত্র তার প্রতি দয়া সাবিত্রীর প্রাণে ছিল না, সেখানে ছিল তীব্র কঠোরতা। সময় সময় নিষ্ঠুরতায় সাবিত্রীর প্রাণ উষ্ণ পাষাণ হয়ে উঠত, হাজার চোখের জলেও তাকে এতটুকু শীতল করে কার সাধ্য! সাবিত্রী একবার ঘৃণায় চোখ ফেরালে, সেদিকে আর জীবনে চাইত না,—মর্ম্মে মর্ম্মে এতখানি তীব্র ছিল তার অনুভূতি। এবং একটা জিনিষ চিরকালই লক্ষ্য করেছি, জীবনে দুর্ব্বলতার প্রতি মণ্টী বোঠানের ছিল করুণা, সাবিত্রীর ছিল ঘৃণা।

* * *

সাবিত্রীর বিষয় এত যে বললাম, তবুও মনে হচ্ছে, সাবিত্রীর সত্য রূপটী কিছুই যেন প্রকাশ হলনা। আজ সে কোথায় আছে জানি না, যেখানেই থাকুক, সেকি শপথ করেছে, আমার লেখনীতে সে ধরা দেবে না? ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে সে আমার প্রতি—আর কি চাইবে?

সাবিত্রী! মিথ্যা তুমি জীবনে কোনও দিনই সইতে পারনি—আমি জানি। তুমি কোথায় আছ জানি না। যেখানেই থাক আজ আমার জীবনের মৌন সন্ধ্যায় তোমার ধ্যানে, মিথ্যা অলঙ্কারে সাজিয়ে তোমার অবমাননা করব না। যদি তুমি আমার লেখনীতে ধরা নাই দেও, আমার দুর্ব্বল লেখনীই বিসর্জ্জন দেব—তোমাকে নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত

আমার নিজ কাজ

শ্রীসুখরঞ্জন রায়

আমার নিজ কাজ পাইনি খুঁজি',
তাইতো হেথা হোথা মরিগো যুঝি',
তাইতো দ্বারে দ্বারে
লুটাই আপনারে,
তাইতো ঘুরি ফিরি কত কি পূজি';
সে ভুল পূজা শেষ নেই গো বুঝি।
আপন কোষে অসি
যেমতি রয় পশি,'
পাখীটি নিজ নীড়ে নয়ন বুজি,'
তেমতি নিজ ঠাঁই পাইনি খুঁজি'।
ফেনায় ফুলি' ফুলি'
কাঁদিয়া পথ ভুলি'
সাগরে পড়ে নদী মাথাটি গুঁজি',
তেমতি নিজ শেষে পাইনি খুঁজি॥

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY

আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

বিশ্বপ্রকৃতি নিত্য নিরন্তর তাহার শোভা সুষমা, বর্ণ গন্ধ গান ও আলো ছায়া লইয়া নরনারীর হৃদয়ের দ্বারে অঘাত করিতেছে। যাহার কানে সেই ডাক পৌছায়, যাহার প্রাণে বিশ্বপ্রকৃতির সেই আহ্বান এক মধুর সুর বাজাইয়া দেয় এবং সহজেই যাঁহার কাব্যবীণায় বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-ঝঙ্কার অনুরণন জাগায় তিনি কবি।

বাংলা সাহিত্যে খুব আধুনিককালে প্রকৃতির স্বানুভাবত্মক বা Subjective বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য একেবারে অকুণ্ঠিতভাবে ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের form, technique ও ভাবকে আত্মসাৎ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের উপর এইরূপে ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব সূচিত হওয়ার পর হইতে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যসম্ভারকে কেন্দ্র করিয়া প্রকৃত কবিত্বের রসধারা উৎসারিত হইয়াছে। ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের রোমান্টিক যুগের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্‌ প্রভৃতি কবিগণ প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের উপর প্রকৃতির একটা নিগূঢ় প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তারপর, কবির ভাবের সহিত প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠ-সংযুক্ত-রূপে দেখা অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত একাত্মতা বোধ (Interpenetrative affinity between the nature and the poet)—যাহা শেলিঙের (Schelling) রোমান্টিক দার্শনিকতা হইতে উদ্ভূত—ইংরেজি রোমান্টিসিজ্‌মের একটি প্রধান লক্ষণ। বাস্তবিক, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এইরূপ একাত্মতা-বোধই ইউরোপীয় রোমান্টিসিজ্‌মকে একটি অভিনব রূপ দান করিয়াছে এবং কাব্যকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছে। রোমান্টিক যুগের ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের এই বিশেষ আদর্শটি বাঙালী কবির কল্পনাকে কাব্য-সৃষ্টির নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। ইহাতে বাংলা গীতিকাব্যে কল্পনার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। কেবলমাত্র ইংরেজি সাহিত্যই যে বাংলা সাহিত্যের কবিদের ভিতর নূতনভাবে প্রকৃতির অন্তররহস্য অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছে তাহা নহে। যুগধর্ম্ম বা Time spirit ও সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি ও নূতন অনুভূতির পথ-নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং কবিরা এই যুগ-ধর্ম্মের সহিত নিজেদের কাব্যবীণার সুর বাঁধিয়া লইয়া থাকেন। তবে মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে বাঙালী কবিগণের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে কল্পনার মূল সূত্র ধরাইয়া দিতে ইংরেজি কাব্যসাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কারণ আধুনিক যুগের কাব্যানুশীলন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঠিক ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের মতো বাঙালী কবি-গণ প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়া প্রকৃতির সহিত একাত্মতা বোধ করিয়াছেন।

ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে আসিবার পূর্ব্বেকার কবিদের ভিতর প্রকৃতির যে-সব বর্ণনা আছে তাহাতে প্রকৃতির প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। কারণ ঐ সব কবিতাতে প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের অখণ্ড আনন্দের যোগ নাই এবং সে যুগের কবিগণ স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতিবর্ণনা না করিয়া প্রসঙ্গক্রমে উহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ, সেই সব কবিদের কাছে প্রকৃতি ছিল জড়জগতেরই বৈচিত্র্য মাত্র। বিখ্যাত সমালোচক Stopford Brooke অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"Nature has no sentiment of its own" ইহা উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় সকল বাঙালী কবি সম্বন্ধে খাটে। কারণ, ঐ সব কবিগণ প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতির একটি বিশেষ রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়া প্রকৃতির সহিত নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য হইতে একটি বর্ণনা দেখা

যাক। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচর ও জীবনীলেখক গোবিন্দদাস নীলগিরি পাহাড় দেখিয়া তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

"কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে।
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার মিয়ে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥
বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥

* * * *

কত শত লতা বৃক্ষ বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন।
আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন॥
ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে।
নানাবিধ পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥
রজনীতে কত লতা ধগধগি জলে।
গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে॥
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে।
তার ধারে বসি' প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে॥"

ইহার সমুদ্র এবং বনশোভার বর্ণনাও ঠিক এইরূপ। কেবলমাত্র এইরূপে প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার মধ্যে যেখানে সমুদ্র-বর্ণনা আছে সেখানেও এই রীতি দেখিতে পাই। তাহার পর, নবীনচন্দ্রের

"নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়।
মিশাইয়া পরস্পরে,—মহা আলিঙ্গন।
মহাদৃশ্য! অনন্তের অনন্ত মিলন!"

এইরূপ বর্ণনায় চমৎকার সুরলালিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও কোনও নূতন ধরণের কল্পনা মাধুর্য্য প্রকাশ পায় নাই। এই বর্ণনায় সেই পুরাতন রীতিরই অবতারণা করা হইয়াছে।

এই ধরণের বর্ণনায় কবিগণ কেবল মাত্র প্রকৃতির বহিঃ-সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। প্রকৃতির অন্তরে যে আনন্দের গতি আবেগ ও নৃত্যচ্ছন্দ নিত্য প্রবাহিত হইতেছে তাহা ঐ সব কবিগণের অনুভূতিতে আসে নাই। মানব-মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব—যাহা প্রকৃতির অমর পূজারী রুশো ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—অথবা মানবের আনন্দ-বেদনার সহিত প্রকৃতির যে একটি যোগসম্বন্ধ আছে তাহা বাঙ্গালী কবিগণ বহুদিন পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

কবি হেমচন্দ্রই বোধ হয় প্রকৃতির ছন্দের সহিত মানুষের হৃদয়চ্ছন্দের যে একটি যোগ আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্ব-প্রথম লিখেন,—

"হায় রে, প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি ডোরে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ?"

কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার বহু কাব্যে ও "ছিন্নপত্রের" বহু চিঠিতেই ঠিক এইরূপ অনুভূতি অভিব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"এই পৃথিবীর উপর আমার একটি আন্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে।"—"ছিন্নপত্র"

কবি বিহারীলালের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কবিকেই বিশ্বপ্রকৃতি কেবলমাত্র কল্পনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় যথেষ্ট প্রকৃতি বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের সাড়া নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের দু চারটি চতুর্দ্দশপদী কবিতাতে ছাড়া প্রকৃতির স্বতন্ত্র বর্ণনা নাই। হেমচন্দ্র প্রকৃতির প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হইলেও তাঁহার কাব্যে স্বতন্ত্র উচ্চাঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যরচনাতেও ইহাই লক্ষিত হয়। বাঙালী কবিগণ প্রকৃতির হুবহু বর্ণনা করিতে গিয়াছেন বলিয়া কেহ নিসর্গ কবিতার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্র যোজন করাতে চমৎকার দেখিবার শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে উচ্চাঙ্গের কবিতা জন্মায় না। সেইজন্য প্রকৃতি বর্ণনার সহিত কবির রসানুভূতি, কবির অন্তরের অনুরাগ এবং প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের বিনিময়ের নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে।

বিহারীলালের কবিতায় আমরা প্রথমে মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির আদান প্রদানের পরিচয় পাই।

"পবন তোমার চামর ঢুলায়,
কানন যোগায় কুসুমভার ;
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায়,
ধরায় আমোদ ধরে না আর।"

মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির আনন্দের কিরূপ নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এখানে তাহারই পরিচয় পাইলাম। আবার—

"তুমি সারদার বীণা খেলা কর করলে
আধ বিজড়িত বাণী শোনে প্রাণী সকলে।"—"শরৎকঞ্জ"।

এখানে ধরণীর গোপন আহ্বানের ইঙ্গিত কবির কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণস্পন্দনের বাণীটি বিহারীলালের নিকটে যেভাবে ধরা পড়িয়াছে তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কবির দৃষ্টিতে পড়ে নাই। বিহারীলাল তো তাঁহার "সারদামঙ্গলই কাব্যের প্রথমেই Spirit of nature কে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিয়াছেন।—

"ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে!
চরণকমলে লেখা
আধ আধ রবি রেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি
সদয়া করুণামূর্ত্তি,
বিতরেন হাসি হাসি শান্তিসুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর
ভাঙো ভাঙো ঘুমঘোর,
সুখস্বরূপিণী উনি, ঊষারাণী সবে বলে।"

কবি বিহারীলাল স্বানুভাবাত্মক বা subjective প্রকৃতি বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে সবপ্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। subjective idealism-এর দ্বারা কবি তাঁহার নিজের অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করিয়া জগৎ দেখিয়া থাকেন। এই অনুভূতির উপর সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে স্থাপিত করিয়া কবি বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিহারীলালের প্রবর্ত্তিত এই ধরণটি পরবর্ত্তী যুগের কাব্যে চলিয়া আসিয়া বাংলা কাব্যের অপূর্ব্ব বিচিত্রতা সাধন করিয়াছে। বিহারীলালের শিষ্য কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলিতেছেন—

"আমি মনের মোহের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা"

অথবা— "নব তৃণদলে ঘন বনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে।"

তখন আমরা দেখিতে পাই যে কবি তাঁহার মনের আনন্দ প্রকৃতির উপর আরোপ করিয়া আত্মবিভোর হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই যে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানস দৃষ্টিতে রসমণ্ডিত করিয়া নূতন ও সুন্দরতর রূপে দেখা, ইহা প্রথম ফুটিয়াছে বিহারীলালের কাব্যে। এই ভাবে যেখানেই কবিরা বিশ্বপ্রকৃতিকে কবি মনের মাধুরী মিশাইয়া নূতন ও সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন সেখানেই তো আধুনিকতা।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবান্বিত আরও দুইজন কবির প্রতিভা আলোচনা করা প্রয়োজন। কবি বিহারীলাল যে কয়জন পরবর্ত্তী কবিকে তাঁহার কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল একজন। বিহারীলালের কবিতার মতো, অক্ষয় কুমারের কবিতার ভাববস্তু প্রেম ও সৌন্দর্য্য। অক্ষয়কুমারের উপর বিশ্বপ্রকৃতি বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে দেখিতে পাই এবং তিনিও আধুনিক ভাবানুযায়ী প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত এই কবির আত্মীয়তাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। একান্ত কল্পনাপ্রবণ কবি অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন—

"ফুটো না ফুটো না কবি থাক ঘোর ঘোর ছবি,
ধরা যেন কবি-স্বপ্ন—মোহন মধুর।
নাহি শোক নাহি তাপ নাহি মোহ নাহি পাপ,
কেটো না এ আবছা জাল,—প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর।"
—"প্রদীপ"।

নিষ্ঠুর এবং প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছেন—

"জগতের দূরে তোর মেঘপুরে নিয়ে যা আমায়!
তোর ছায়া-মত স্বপ্ন-মায়া মত ক'রে দে আমায়!"
—"কনকাঞ্জলি"।

কবি বিহারীলালের সহিত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবি-কল্পনার সাদৃশ্য আছে এবং ইনিও আধুনিক কল্পনাভঙ্গী অনুসারে প্রকৃতিকে নানা ভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলি

অপূর্ব্ব কাব্যশিল্পের উদাহরণ। বাস্তবিক দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইঁহার কাব্যে কীট্‌সের কাব্যের মতো একটা প্রবল Sensuousness বা ভোগসর্ব্বস্ব সৌন্দর্য্যবোধ আছে। তবে কীট্‌সের সৌন্দর্য্যপিপাসা অতি প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুসকলের রূপ রং রেখা গতি ও স্থিতির ভঙ্গী, এ সকলই আশ্চর্য্যরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার ক্ষমতা কীট্‌সের ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় কেবলই ভাবের স্বপ্ন অভিব্যক্ত হইয়াছে—তাঁহার সৌন্দর্য্য-চেতনা ভাবাবেগ-বিহ্বল, বস্তুজ্ঞান-বিমুখ। তবু বলিতে হয় যে দেবেন্দ্রনাথের ভোগসর্ব্বস্ব সৌন্দর্য্যবোধের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাব্যরসের উৎস উৎসারিত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে তাঁহার অশোক-ফুল, অশোক-তরু—("অশোকগুচ্ছ") বর্ষার আনন্দ—("শেফালিগুচ্ছ") শিরীষ ফুল (পারিজাতগুচ্ছ) প্রভৃতি কবিতার নাম করা যাইতে পারে। কবির "অশোক তরু" কবিতাটি এই ধরণের কবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ—

"হে অশোক, কোন্ রাঙা চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল ?
কোন্ দোল পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি দুলাল ?
কোন্ চিরসধবার ব্রত উদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দুর বরণ ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া হাসি করিলি চয়ন ?"—ইত্যাদি—

কীট্‌স্ এবং সুইনবার্ণের কবিতায় যে Mythopoeic element পরিলক্ষিত হয়, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের বিশ্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় অনেক কবিতাতেই সেইরূপ কল্পনা-বিলাস বর্ত্তমান। তাঁহার কল্পনা চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রমদিরা পানে বিভোর আর আকাশের রঙে ও চম্পকের শোকে মাতিয়া উঠে। তাঁহার 'শেফালিগুচ্ছ' কাব্যে "বর্ষশেষ ও নববর্ষ" বিষয়ক যে-সব কবিতা আছে তাহার সবগুলিতেই ঐ ধরণের কল্পনাবিলাস লক্ষিত হয়। "শেফালিগুচ্ছে"র বৈশাখ শীর্ষক কবিতাটিতে এই ধরণের কল্পনা খুবই সুন্দরভাবে অভিব্যক্তি-লাভ করিয়াছে—

"কপালে কঙ্কণ হানি' মুক্ত করি' চুল
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল।
স্বামী তার চৈত্রমাস অনঙ্গের মত
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি' জানু করি নত,
কার তপ ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস ?

রুদ্রের মুরতি ও যে!—একি সর্ব্বনাশ!
ললাটে অনল হের ধক্ ধক্ জ্বলে!
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম মাখি কুতূহলে,
তপে মগ্ন,—চিনিলে না বৈশাখ-দেবেরে ?
হে চৈত্র! এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ আহা!—নাশিতে জীবন,
খোলাক্ষ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন!

দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে—"কি কর কি কর!"
নব-উষা বলে—"ক্রোধ-সম্বর সম্বর!"
কোকিল ডাকিল মৃদু করিয়া মিনতি,
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি।
বৃথা! বৃথা! বৈশাখের চুচক্ষু হইতে
নিঃসরিল অগ্নিকণা, বেগে আচম্বিতে।
ভস্ম হ'ল চৈত্রমাস। হ'বে অনাথিনী
মুছিল সিন্দুরবিন্দু, বাসন্তী যামিনী।
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল খসিয়া,
পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইয়া।
প্রজাপতি লুকাইল কবরীর শিরে,
ভিজিল শিরীষ পুষ্প নয়নের নীরে!
আম্রের বাহুনীদের সু-হরিত দেহ
ভরিয়ে গেল রক্ত-পীতে খসি' গেল কেহ!
কঠিন উপলে বসি' সারস সারসী
বিহগ-ভাষায় ডাকে—"কোথায় সরসী ?'
গহন অরণ্যে ছায়া পলাল তরাসে,
ক্লান্ত পান্থ ভ্রান্ত হয়ে আতপে সন্ত্রাসে!
লতিকা পড়িল লুটি' তরুর চরণে;
বনস্থলী পতিহীনা নবীন যৌবনে!
দিন বলে, "এবে আমি খেটে হব সারা,
রাত্রি বলে, "হায় আমি এবে আয়ুহারা।
দম্পতি, যুকতি করি, "বিরহে" ডাকিল,
"কল্পনা—কবির বধূ—বিদায় মাগিল!"

কবি রবীন্দ্রনাথের—

"শরতে সে শিউলি বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালা খানি
পবাল মোর শিবে।"

এই কবিতায় আমরা ঠিক এই জাতীয় কল্পনার পরিচয় পাই।

বহিঃ প্রকৃতির সহিত কবির মনের আদান-প্রদান দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়—

"প্রকৃতির সাথে হয় কবিচিত্ত বিনিময়
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন।"

এখানে বিশ্বপ্রকৃতির ব্যক্তিত্বের ধারাণাটিও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে।

কবি বিহারীলালের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার ও বিশ্বপ্রকৃতি বর্ণনার যে অভিনব ধরণ ফুটিয়াছিল তাহা চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য জীবনে প্রকৃতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বহু কবিতায় প্রকৃতির মধ্যে যে আনন্দের লীলা চলিতেছে তাহার সহিত মানব-মনের আনন্দের যোগের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির যে প্রাণস্পন্দন শুনিতে পাইয়াছেন তাহা খুবই স্বাভাবিকভাবে তাঁহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আরও দেখাইয়াছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবের পরিচয় কেবল ইহ জগতের নয়—কবি ইহা উপলব্ধি করেন যে উদ্ভিদ জগতে ও প্রাণীজগতে আজিকার মানবের এই প্রাণই বিকাশের স্তরে স্তরে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সেই জন্যেই তো কবির কাছে তৃণের শিহরণ, কুসুম মুকুলের ফুটিবার আনন্দ, সমুদ্রের কলরোল এত পরিচিত ও এত অর্থভরা। প্রকৃতি-পরিচয়ের এই গভীরতা রবীন্দ্রনাথের—বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি ("সোনার তরী"), সমুদ্র ("পূরবী"); অহল্যার প্রতি ("মানসী") প্রভৃতি কবিতাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতির গোপন বাণী ও সুরতরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নূতন করিয়া বাজিয়াছে। যে প্রকৃতিকে আমরা নিত্য-নিরন্তর আমাদের চোখের সম্মুখে দেখিতেছি তাহার সহিত তিনি আমাদের নূতন করিয়া পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবি-কল্পনা যেন বিশ্বপ্রকৃতিকে পুনঃসৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনের একেবারে প্রথম ভাগ হইতেই তাঁহার উপর প্রকৃতির প্রভাব অসাধারণ। মাত্র চৌদ্দ বৎসরের লেখা রবীন্দ্রনাথের "বনফুল" (অধুনা লুপ্ত) কাব্যখানির মধ্যেও স্থানে স্থানে যে রকম চমৎকার প্রকৃতি বর্ণনা আছে তাহা কবির ভবিষ্যৎ সূচিত করিয়াছিল। তথাপি বনফুল রচনার সময় হইতে সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার সময় পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন প্রধানতঃ মানবের কবি। তখন মানব-সম্বন্ধীয় কল্পনা তাঁহার কাব্যে যেটুকু রূপ পাইয়াছে প্রকৃতি সেটুকুও পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন প্রকৃতির সার্থকতা যেন মানবকে পাইয়াই।—মানবহীন প্রকৃতি যেন তাঁহার কাছে ব্যর্থ ও মাধুর্য্যহীন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতির মাধুর্য্যময় রূপটি খুঁজিয়াছেন—মাঝে মাঝে তাহাকে পাইয়াছেন, মাঝে মাঝে হারাইয়াছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবির সহিত প্রকৃতির প্রথম প্রণয় জন্মিতেছে—সেই জন্য সেখানে প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীতের সংশয়-পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তেও কবির মনে হইয়াছে—

"সজীব কোমল মন
আসে হেথা অনুক্ষণ,
যখনি সে পায় অবকাশ;
যখনি প্রভাত ফুটে
যখনি সে জেগে উঠে
ছুটিয়া সে আসে মোর পাশ
দুই বাহু প্রকাশিয়া
আমারে বুকেতে নিয়া
কত শত বারতা শুধায়,
সখা মোর প্রভাতের বায়।"

তবে প্রকৃতির সহিত পরিচয়সূত্র স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও কবি বলিয়াছেন—

"শুধু মনে জাগে এই ভয়,—
আবার হারাতে পাছে হয়।"

"প্রভাত সঙ্গীত" হইতে দেখি যে প্রকৃতির সহিত মিলন-

ব্যাকুল কবি প্রকৃতির অন্তঃপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। "প্রভাত উৎসব" নামক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

এখান হইতে কবি আপন ক্ষুদ্র অন্ধকারময় জগৎ ছাড়িয়া প্রকৃতির আলোকময় জগতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। "প্রভাত সঙ্গীত" এবং তাহার পরবর্ত্তীকালের সকল কাব্যেই যে-সব প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতা আছে তাহাতে প্রকৃতির সহিত যোগের আনন্দ অভিব্যক্ত হইয়াছে। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" কবির কুঞ্চিত হৃদয় প্রকৃতির প্রসার ও স্নিগ্ধতা লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে এবং কবির অন্তর প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া অপূর্ব্ব ছন্দে ও গানে স্রোতস্বিনীর মতো গলিয়া ছুটিয়াছে।

বহু কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সহিত একাত্মতা বোধ করিয়াছেন এবং নিজেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিলাইয়া দিবার তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতার বিশিষ্টতা এই যে তাঁহার কাছে মানবীয় অনুভূতির মাঝে প্রকৃতির সার্থকতা। সেই জন্য কবি মানবীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা দিয়া প্রকৃতিকে অনুভব করেন। কাব্যের এই বিশিষ্টতা যে আধুনিকতার লক্ষণ ইহা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সন্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রভাত সঙ্গীত" "ছবি ও গান", "মানসী", "সোনার তরী", "চৈতালী", "কল্পনা", "ক্ষণিকা", নৈবেদ্য", "বলাকা", "বনবাণী" প্রভৃতি কাব্যে বিবিধ রূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বিশ্বপ্রকৃতিকে এইরূপ বিচিত্র ও অভিনব রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের উপর প্রকৃতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিচিত্র ও অপরূপ বিশ্বপ্রকৃতি নানা ভাবে এই কবিকে কত কি ইঙ্গিত করিয়াছে—

সাঁঝে আজ কিসের আলো,
ভুলালো মন ভুলালো।
মরি কার পরশমণি
গগনে ফলায় সোনা!
হৃদয়ে নূপুর ধ্বনি
অজানার আনাগোনায়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টি লইয়া প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং বিচিত্র মধুর ছন্দে প্রকৃতির প্রাণের সাড়া, রূপবৈচিত্র্য ও লাস্য লীলা তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন—

"পরাণ আমার শুনেছে সে মধু বাণী
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী দেবী, হে মোর রাগিণী-রাণী।
সে কি ফুটিবেনা বেণু ও বীনার তানে?"

বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বানে কবির ঘরে থাকাই দায় হইয়াছে—

"পারব না আজ ঘরে একলাটি বইতে
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।
* * *
খিল খোলা পর্দাতে যাব চল্ সাধ জেগেছে!
রইবে কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে।"

কবি রবীন্দ্রনাথও এই রকম বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন এবং তিনিই সত্যেন্দ্রনাথের মতো কবি-প্রাণকে ঘর ছাড়িয়া বিশ্বশোভায় নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য ডাক দিয়া বলিয়াছেন—"ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।"

এবং—

"ওগো মা মৃন্ময়ী
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই'
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো............"—'বসুন্ধরা।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও নৃত্যচ্ছন্দ গভীর ভাবে অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল বলিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনার মধ্যে তাঁহার দেওয়া চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "আবির্ভাব," "নববর্ষা" প্রভৃতি কবিতার মতো একটি অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি অনুভব করি। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার অন্তরের পরিচয় খুব গভীর। সেইজন্য তাঁহার কাব্যে ও ছন্দে প্রকৃতির অন্তরতম বাণীর অনুরণন জাগিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে মানবীয় অনুভূতির মাঝেই প্রকৃতি সার্থক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি

কবিগণও ঐরূপে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানবীয় ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়াই দেখিয়াছেন এবং তাহাতে এই সব কবিদের কল্পনার প্রসারতা ও আধুনিক কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি করুণানিধান রূপদক্ষ শিল্পীর মতো কাব্যের মার্জ্জিত ভাষায় বিশ্বপ্রকৃতির যে কোনও চিত্রকে অপূর্ব্ব রূপে ও রঙে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহার বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতাতে ভাব অনুযায়ী ভাষার ভঙ্গীর জন্য চমৎকার কাব্য-রসের উৎপত্তি হইয়াছে।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের "কন্যা শরৎ," "শিউলির বিয়ে," "শ্রাবণ রজনী", "বসন্ত আগমনী", "বাদলরাতের গান", "ঘুঘুর ডাক" প্রভৃতি কবিতার ভাব, ভাষার দীপ্তি ও ছন্দমাধুর্য্য লক্ষ্য কবিবার বিষয়। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতাতেও বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দধারা বেশ রসমণ্ডিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথ সেনের কবিকল্পনা ভিন্ন ধরণের ও অভিনব ধরণের। বাংলা সাহিত্যে ইনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি প্রকৃতি হইতে একটি নূতন পরিচয় ও নূতন অর্থ পাইয়াছেন। অন্যান্য কবিগণ প্রকৃতিব অন্তরে যে আনন্দ রসধারা অহর্নিশি প্রবাহিত দেখিতে পাইয়াছেন ইঁহার কল্পনা সে দিকেই যায় নাই—যাহা কিছু আনন্দের তাহা ইঁহার কাব্যের উৎস নয়—তাহার প্রতি এই কবির পক্ষপাত কিছুমাত্র নাই। তিনি প্রকৃতির মধ্যে দুঃখ বিরোধ ও আঘাতকেই দেখিয়াছেন। প্রকৃতির অনি-র্ব্বচনীয় ও রহস্যময় রূপের মধ্যে তিনি দুঃখই দেখিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি হইতে তাঁহার কল্পনার বিশিষ্টতটুকু বোঝা যাইবে।

"তারই পরে কোপ গো বন্ধু, তারই পরে তব কোপ,
যে জন কিছুতে গিলিতে চায়না এই প্রকৃতির টোপ।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল।
ছবি ও ছন্দে তোমার দালালি করিছে স্বভাব কবি,
সমস্যুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্য্যে ভবি ভুলিবার নয়:
সুখদুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।

*   *   *   *

ফাল্গুনে হেরি নব কিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা শীর্ণ পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি 'আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী।"

যতীন্দ্রনাথ সেনের এই সব বিশিষ্ট ধরণের কল্পনাপ্রসূত প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলি হইতে চমৎকার কাব্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়, যেমন—

"কাল এসেছিল ফাগুন সন্ধ্যা,
ফুটেছিল তাই রজনীগন্ধা;
রূঢ় বিদ্রূপে বাদল বাতাস
দিয়ে যায় তারে ঠেলা—
কে দেখে রে তার বুক ছেপে ছেপে
নীরবে অশ্রু ফেলা।—"অকাল বর্ষায় (মরীচিকা)

তাঁহার অনেক কবিতাতেই এইরূপ দুঃখের ছবিটি ভেদ করিয়া চমৎকার কবিত্বরস উৎসারিত হইয়াছে। কবির সকল কবিতাতেই দেখা যায় যে ইনি প্রকৃতির উপর একটি সকরুণ বিষাদময় ভাব আরোপ করিয়াছেন এবং সেই সব কবিতা হইতে একটি অভিমানরঞ্জিত ও বেদনাসিক্ত অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে ইনি বিশ্ব-প্রকৃতির দুঃখের দিকটি দেখিতে ভোলেন নাই। দুঃখ ও আঘাতের চিত্রকে তিনি অপূর্ব্ব কাব্যকুশলতার দ্বারা রসমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাকেও একপ্রকার idealistic কল্পনা বলা যায়।

বিশ্বপ্রকৃতি অতি পুরাতন এবং মানুষের সৌন্দর্য্যসম্ভোগ করিবার প্রবৃত্তিও তাহার আদিমতম প্রবৃত্তি। এইজন্য নূতন ভাবে সেই সৌন্দর্য্যবোধের আনন্দ ব্যক্ত করা কবিদের একটি কঠিন সাধনার বিষয় হইয়া আছে। সেইজন্য কবি রবীন্দ্রনাথ সকল কবির হইয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী,
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপর আঁচল দিয়াছে টানি।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি প্রকৃতির পিছু পিছু
কোন দিন কোন গোপন খবর নূতন মেলেনা কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে।
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভরা,
হায় কবি, হায়! হাতে হাতে তাহ কিছুই পড়ে না ধরা।"

এই বিশ্বপ্রকৃতিকে বিচিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করিবার ও পরিপূর্ণরূপে ও রঙে অনুভব করিবার সহজাত ক্ষমতা যে কবির যত বেশী আছে তিনি তত বড় কবি ও স্রষ্টা। আধুনিক কবিদের হাতে—বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র প্রতিভার রশ্মিপাতে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতায় বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাসন্তী মলয়

সুখময় দাস

তৃতীয় বার পরীক্ষা দিয়ে এসে মলয় যোগাড় করল খানিক আফিং ; এবং প্রথানুযায়ী একখানি চিঠিও লিখে রাখল যে সে সেচ্ছায়, সজ্ঞানে এবং নিজ দায়িত্বে দেহটার দাবী ছেড়ে যাচ্ছে।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার ছিদ্র পথে বছরে দু' একটি ক'রে মৌলিক সদগুণগুলি পর্য্যন্ত তার খসে পড়ছে। বর্ষ-শেষে যখন গেজেটে নাম উঠে না, তখন মৌখিক গেজেট তৈরী হয় বন্ধু ও গুরুজন মহলে ; তাতে মলয় উপাধি পায় অপদার্থ, বেহায়া, গোরু এবং—অসৎ ইত্যাদি ব্যাকরণসম্মত ও অসম্মত নানা বিশেষণে।

এক একটি আত্মধিক্কারে আহত প্রাণের কাছে শরীরটা হয়ে পড়ল দুর্ব্বহ বোঝা। যাই হোক্ মন-স্থির করায় তার এক উদাস প্রশান্তি এল, স্বচ্ছন্দ হ'ল গতিবিধি, মলয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। সঙ্কল্পিত মৃত্যু দিয়েছে তাকে এক প্রাণহীন উল্লাস। খাঁটী নৈরাশ্যের অন্ধকার ঢের বাঞ্ছনীয়, ভেজাল আর আলেয়ার চেয়ে।

ফল বেরোবার মাস খানেক বাকী। মলয়ের চেহারা স্ফূর্ত্তিতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে লাগল, প্রদীপ নিভবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের মত হয় ত! থিয়েটার সিনেমা তার গানের মজলিশ —তার তিন বছরের নিষিদ্ধ আহার্য্যের চলল আকণ্ঠ ভোজন।

তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী যেন এবার আর মরছে না—এ আশ্বাস তারই মৃত্যুর মাঝে! তার আত্মীয় স্বজন—মলয়ের ভাষায়—আহম্মকের হাসি হাসছেন। তার প্রতিটি আনন্দ অভিব্যক্তির ইট তাদের আশার প্রাসাদ গড়ে তুলছে। তারপর ঈশ্বরের অট্টহাসি—একটা ভূমিকম্প—সব চুরমার!

সে-দিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ রাত্রি। তার উপর আকাশে দিগন্তবিস্তৃত মেঘের নিশ্ছিদ্র আস্তরণ। মিউনিসিপ্যাল ল্যাম্প-পোষ্টগুলির ব্যবধান ও আলোর পরিধি এতদূর যে তাদের এক একটির নীচে দাঁড়িয়ে থাকলেই মাত্র পথচলার সাহায্য করে। মলয় টর্চ্চ ফেলতে ফেলতে চলল। প্রাণ ভয়ে সে ভীত নয়, গুণ্ডহস্তে লাঞ্ছিত হতেই যা একটু নারাজ। রাস্তার মোড়ে পুলিশ প্রহরী পরিচিত ভদ্রলোককে সেলাম জানাল, মলয় চলন্ত অবস্থাতেই বাতিশুদ্ধ ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে নিল। প্রহরী চেয়ে রইল উর্দ্ধের দিকে, অন্ধকারের বুকে প্রায় দেড় শ' ফিট দীর্ঘ আলোর এক গর্ত্ত। মলয়ের ওষ্ঠকোণে ফুটে উঠল হাসির আভাস। আহা বেচারী জানে না, আইনের চোখে কত বড় অপরাধী তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলছে। মলয়ের ভাবী হত্যাকারী তার মাঝে আছে গা-ঢাকা দিয়ে।

বৃষ্টির একটি ফোঁটা কানে পড়তেই মলয় আরও দ্রুত হাঁটতে লাগল। একটি শিলা পড়ল নাসাগ্রে। এই নোটিশ অমান্য করলে দুর্ভোগ অনিবার্য্য। উহা জারী হচ্ছে আবার প্রলয়ঙ্কর অশনি গর্জ্জন সহ।

জোর বর্ষণ সুরু হ'ল ঝরঝর। মলয়ের গতি হ'ল কশাহত অশ্বের মত প্রচণ্ড।

মাথায় চাদর জড়িয়ে ছুটল মলয় ধাবমান জলপ্রপাতের মত—হস্তস্থ বাতি-বিচ্ছুরিত আলোর রেখা বেয়ে নৈসর্গিক শিলারাজি ঠেলে বুক চিরে ঝঞ্ঝা পাহাড়ের। কপাল ফেটে রক্ত বেরোল ; লাল রংয়ের পাগড়ী করা চাদর অর্দ্ধেক খুলে গিয়ে কতক্ষণ পত পত করে উড়ল গৈরিক নিশান ; তারপর বাকী অর্দ্ধেকের শিকড় উপড়ে গেল।

মজলিশে তখন সে ছাড়া সবাই উপস্থিত। ঘরে ঢুকেই মলয় দিল ভিজা কুকুরের মত এক গা-ঝাড়া। চার পাঁচটি শিলা শজারুর কাঁটা হেন বিঁধল বন্ধুদের গায়ে—এগুলি ছিল এলোমেলো বাবরীর গোলক ধাঁধায় আটকা।

নির্ম্মল একখানি ধুতি ও গেঞ্জি এনে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল —কপালে কিসের আঘাত মলয়? রক্ত পড়ছে।

মলয় বলল—এ বছরের সেরা শিল্পটি ভগবান ঠুকে দিয়েছেন আমার কপালে, নির্ম্মল। তোমরা যত দুঃখ কষ্ট পাও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে তার সবটি ভগবান আমাতে পরখ করে নেন আগে—মানুষ সইতে পারবে কি না। আমি তাঁর কষ্টিপাথর।

ক্ষতস্থানে তুলা এঁটে দিয়ে নির্ম্মল বলল—তুমি ভাগ্যবান মলয়।

—তবু আমার ভাগ্যকে তোমরা হিংসে করবে না।

নির্ম্মল আবার তার চেয়ারে ফিরে গিয়ে বলল—সুবোধ স্ত্রীর অসুখ বলে যেতে চাইছিল; কিন্তু প্রকৃতির ধমকে পুরুষ ঘাবড়ে গেছেন। যে-কোনো রুগ্না স্ত্রী তোমার স্ত্রীর হিংসে করবে। আড্ডার জন্যই যার এত।

—কিন্তু আমার মূল্যে ভাগ্যটা কার হ'ল?

সুবোধ উভয়কে বাধা দিয়ে বলল—আমাকে নিয়ে টানা-টানি না করলে বুঝি চল্‌ত না? ও বিয়ে করুক, ভগবান না করুন ওর স্ত্রীর অসুখও হোক, তখন দেখা যাবে প্রাণটাকে লটারীতে ধরা কত সহজ। অমন বেওয়ারিস প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে যে-কেউ।

মলয় হাই তুলল মোটরের হর্ণের মত, তুড়ি কাটল ব্রাম-করতালের ঠুংকার ন্যায়। ওরা চা-টা খেয়ে স্নায়ুকে সতেজ করেছে, মনের কারখানায় তৈয়ার করছে কাজের এবং অকাজের নানা কথা; সে কাঁপছে শীতে, মরছে তৃষ্ণায়।

বলল—নির্ম্মল···

হঠাৎ ভিতরের দিকস্থ দরজার পরদা দুলে উঠল, তার মাঝ থেকে বেরোল একখানি হাত—সুগোল, শুভ্র। তাতে পেয়ালা, তার মাঝে ধূমায়মান দ্রবীভূত স্বর্ণ। সবটা মিলে—মৃণাল বিকশিত শতদলে। ঘণ্টা বেজে উঠল বামহস্তিকৃত অর্গলাকর্ষণে।

মলয় কুণ্ঠালেশহীন কণ্ঠে বলল—না, দেখছি তোমরাই দুনিয়ায় টিঁকে থাকবে। হার্ব্বার্ট স্পেনসার যেন বলেছেন—জীবনটা হচ্ছে বাইরের সঙ্গে অন্তরটার খাপ খাওয়ানো। সুবোধ খাপ খাওয়ালো তুফানের সঙ্গে বধূর বৈধব্য আশঙ্কা জুড়ে, এবং বাঁচল। তুমি নির্ম্মলচন্দ্র কলকাতায় গেলে অসংকোচে গড়ের মাঠে বেড়াও বউ নিয়ে, অথচ এখানকার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেও বেশ সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারছ। রক্ষণ-শীল—কি বলে—একেবারে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত।

নির্ম্মল উঠবার উপক্রম করছিল, অভিযোগ শুনে আবার বসে পড়ল। হেসে হাঁকল—নিয়ে এস বাসন্তী—। আমার শালী।

সুবোধ অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করল না, বলল—এ কি রকম আবদার মলয়? একটু লজ্জা থাকা উচিত সকলেরই। তা তোমার থাকবেই বা কি করে। লজ্জারও একটা সীমা আছে, তিন বছরে ফুরিয়ে গেছে বই কি।

এত নির্ম্মম আঘাত তাকে সাক্ষাৎ ভাবে কেউ করে নি। যুক্তি-তর্কের অবতারণা করলে মলয় তার জবাব দিতে চেষ্টা করত, কিন্তু সুবোধ তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েছে। কোমরের নীচে গদাঘাত করেছে। অবনত মস্তকে, চুপ করে সে বসে রইল।

নির্ম্মল বলল—কাপ্ নাও মলয়।

কাপ্ হাতে বাসন্তী দাঁড়িয়ে। তার দিকে চাইতে মলয়ের মাথা কাটা যাচ্ছিল। কাপ্‌টি গ্রহণ করে আবার সে তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করে ফেলল।

নির্ম্মল বলল—তোমার দিদিকে বল পান নিয়ে আসতে বাসন্তী। তার আগে হাট পরীক্ষা করিয়ে নাও মলয়—

ভর্ৎসনা করে বাসন্তী বলে গেল—ছিঃ জামাই বাবু।

নিঃশব্দে চা'র পেয়ালা খালি করে মলয় উঠল; বলল—তোমার স্ত্রী দেখতে কেমন সে আগ্রহ আমার হয়েছিল, এ ধারণা তোমারও হ'ল, আর সে-কথা শোনাতে গিয়ে তাঁর সম্ভ্রমটুকুও রাখলে না নির্ম্মল। ভাল। হয় ত সোজা কথাটা বলতে পারি নে বলে পরীক্ষায়ও ফেল করে আসছি। তা হলে আমার দুঃখ একটুও নেই।

গমনোদ্যত মলয়কে লক্ষ্য করে নির্ম্মল ব্যস্ত ভাবে বলল না না, তুমি অনর্থক—

ঈষৎ থেমে মলয় বলল—জানি তুমি সরল মনেই বলেছ। কিন্তু আমাকে যেতে হচ্ছে নির্ম্মল—কাজ আছে।

প্রসারিত হস্তে পানের ডিবেটি ধরে কতক্ষণ বাসন্তী

প্রতীক্ষায় ছিল মলয়ের খেয়াল ছিল না; ফিরতে গিয়ে একেবারে সম্মুখীন হয়ে পড়ল।

—পান নিন।

অসভ্য আখ্যা পেয়েছে, দুশ্চরিত্র বলে ইঙ্গিত হয়েছে, প্রতিবাদকে কার্য্যকরী গ্রাহ্য করে তুলবার মত প্রতিপত্তির জোর তার নেই, মাথা উন্নত করে চলবার এতটুকু অধিকার পর্য্যন্ত মলয় হারিয়ে ফেলেছে। বাসন্তীর অনুরোধের উত্তরে মাত্র একবার অলস দৃষ্টি ন্যস্ত করল তার মুখের উপর। কিন্তু সে দৃষ্টি ক্ষনেক বাঁধা হয়ে রইল বাসন্তীর গভীর শান্ত চোখে।

লক্ষ্যহারা উচ্ছৃঙ্খল জলরাশি পেয়েছে নদীর ইসারা, জেনেছে সাগরের সন্ধান। বাসন্তীর নয়নে মলয় পাঠ করল তার জীবনের আর এক নবতন অধ্যায়ের সূচিপত্র। পৃথিবী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বৃহত্তর বলে মনে হল।

সুবোধ চেয়ে আছে। তড়িৎস্পৃষ্টের মত মলয় চমকে উঠল, সম্বিৎ ফিরে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে আবার তাদের দিকে ফিরে বলল—সুবোধ, বি-এ পরীক্ষার নীলামে আমার দর যাচাই করলে, আমার একটা বড় ভুল ভাঙল। তার জন্য ধন্যবাদ।

মলয়কে যেতে দেখে বাসন্তী এগিয়ে এল। মৃদুস্বরে বলল, পানটা নিন। আমার অপমান করা আপনার উদ্দেশ্য না-ও হতে পারে।

সে পান নিতে এগোল। তাতে সময় লাগে বড় জোর দুই নিমেষ। কিন্তু মলয় কাটিযে দিতে পারে এ-কাজে যুগ যুগান্তর। সর্ব্ববিধ তিক্ততার মাঝে বাসন্তীর সান্নিধ্য কমনীয়। দিকজোড়া হাহাকারের মধ্যে বাসন্তী-মণ্ডলের আবহাওয়া স্নিগ্ধ, মনোরম।

মলয় রাস্তায় বেরোল।

প্রকৃতি তখন শান্ত, সে উন্মত্ত। অসম্ভব! অসম্ভব বাসন্তীকে ভালবাসা। তার সামনে মলয় অপমানিত হয়েছে; সে অপদার্থ। বাসন্তী তাকে কৃপা করে তার জন্য সমবেদনা বোধ করে। এ ছাড়া কি হতে পারে! কি জোরে দাবী করবে সে শ্রদ্ধা, ভালবাসা!

বাড়ী পৌঁছে তখনই সে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ভাবনার হাত হতে রেহাই পেল না। মাথার আগুন ছড়িয়ে পড়ল, সারা শরীরে। প্রত্যূষের দিকে জ্বর একটু কম বোধ হল।

ডাক্তারের কর্ত্তব্য সেরে নির্ম্মল বলল—আমাকে মাপ কর মলয়। আমি ঠাট্টা করেছিলাম মাত্র, অতটা তালায় দেখিনি। বাসন্তীর গালাগাল খেয়ে কাল ভারী অশান্তিতে কেটেছে। ভাল কথা, বাসন্তী রোগী দেখতে আসছে বিকেলে।

মলয় নীরবে হাসল; বলল—সাময়িক আঘাত পেলেও ওতে আমার খুবই লাভ হয়ে গেছে। বুঝবে না,—না বুঝলে ক্ষতি নেই।

নির্ম্মল বোকার মত খুসী হয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যার পরে এল বাসন্তী, নির্ম্মল।

তাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবার উপক্রম করতেই বাসন্তী অন্য খাটখানিতে বসে পড়ল, বলল—আপনি অসুস্থ মলয় বাবু, শুয়ে পড়ুন। এ-ভাবে নড়া চড়া করতে পারেন জানলে রোগী দেখতে আসার পরিশ্রমটা যে মিথ্যা হয়ে যায়।

—আমি এ ভাবে পড়ে থাকি এই আপনি চান—খুসী হন এতে?

বাসন্তী হেসে বলল—বড় আশা করে রোগী দেখতে এলাম, দেখলাম না, এ দুঃখ রাখব কোথায় সে কথাও ভেবে দেখুন। আমরা চাই আপনারা রোগে পড়ুন, শেষ ভাল করে তুলবার ভার আমাদের ওপর—সেবা শুশ্রূষা করে।

কৌতুক-দুষ্ট চোখে চেয়ে মলয় বলল—আর আমরা কি চাই?

বাসন্তী দীপ্ত কটাক্ষের সহিত বলল—আপনারা চান আমরা যাতে মোটেই রোগে না পড়ি। পড়লে ভেগে ভেগে থাকেন। সুখের দিনের সাথী।

নির্ম্মল একখানি হাত তুলে উভয়কে থামতে ইঙ্গিত করল। ইতস্ততঃ করে বলল—চাকরী করবে মলয়?

—নেভার।

—কেন?

—মেজাজটা চাকরীর ভর সইবে না—। হঠাৎ তার নজরে পড়ল বাসন্তী বই ঘাঁটতে লেগে গেছে। আশঙ্কায় তার অন্তর কেঁপে উঠল। কোন্ বইয়ের ভিতর রেখেছে সে তার আয়ো-

জিত মৃত্যুর দলিল। অতীব উৎকণ্ঠায় সে চেয়ে রইল বাসন্তীর প্রতি।

কাগজখানি পড়ল বাসন্তীর হাতে। উহা খোলা থাকায় একটি শব্দও টান্‌ল তার চোখকে, এবং সেই শব্দের রন্ধ্রপথে ঢুকল নিবিষ্ট হয়ে বাসন্তীর অখণ্ড মনোযোগ।

হতাস হয়ে মলয় পাশ ফিরল।

বাসন্তী দৃঢ়ভাব সহিত বলল—ছিড়ে ফেলছি।

বাসন্তীর উক্তি জানানো মাত্র, উহা অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে না। মলয় এত জোরালো আত্মীয়তার মূল্য হিসাবে দিল অনেকখানি পরুষ-গর্ব্ব। ক্ষয় পেয়ে আসতে আসতে যে ক্ষীনতম মরণ-কামনা তখনও মনের কোণে গোপন ছিল, তাকে গলা টিপে মারল আবিষ্কারজনিত লজ্জা।

নির্ম্মল হঠাৎ উঠে পড়ে বলল—চল বাসন্তী, বাবা আসবার কথা। কাল আসব মলয়।

তারা চলল।

মলয়ের শরীরটা গ্লানিতে ঘুলিয়ে গেল। মরার দুষ্প্রবৃত্তি প্রায় মারা গেছিল আগেই। লাভের মধ্যে বাসন্তী জেনে গেল, মনে করে গেল মলয় যদি এর পরে না মরে ত সে তাকে বাঁচিয়ে গেছে। নিষ্ফল ক্ষোভে সে ছটফট করতে লাগল।

দুই মিনিট যেতে না যেতেই নির্ম্মল রাস্তা হতে ঘুরে এসে বলল—একটা কথা রাখবে মলয়?

—সাদা কাগজে নাম দস্তখৎ করব, ততখানি বিশ্বাস মানুষকে করি না। আগে কথাটা শুনি।

—তুমি আমার ওখানে চলে এস। একলা যে কি করে দিন কাটে তোমার!

মলয় বলল—ভেবে দেখি।

নির্ম্মল ব্যগ্রভাবে বলল—না না এতে ভাববার কি আছে? হয়ত পারও একটা মনগড়া কৈফিয়ৎ বের করতে, তুমি কি না বড় ভাবপ্রবণ!

মলয় বিস্মিত হয়ে বলল—আমি ভাবপ্রবণ? কোথায় দেখলে নির্ম্মল?

নির্ম্মল বিব্রতভাবে বলল—তবে অমত করছ কেন? একলা পড়ে পড়ে কুচিন্তা করবে—

মলয় উঠে বসল, গম্ভীর ভাবে বলল—যাও নির্ম্মল, রাস্তায় ওকে একলা রেখে এসেছ, আমি সে-সম্বন্ধে কুচিন্তা করছি। কাল বলব যাব কি না।

মলয় গুম হয়ে বসে রইল—সে ভাবপ্রবণ!

সহকার শাখায় বসে কোকিল ডাকল—কুহু; গৃহকক্ষ-মধ্য থেকে নির্ম্মল সাড়া দিল—উহু। সন্নিহিত কক্ষ হ'তে মলয় ডেকে বলল—কোকিলের মাংস খেতে কেমন হবে নির্ম্মল?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে নির্ম্মল বলল—তুমি যদি কোনোদিন খুনের দায়ে পড় ও চমকে উঠব না মলয়।

এবং যদি কোনোদিন প্রেমের দায়ে পড়ি ত বিশ্বাস করবে না নির্ম্মল?

বাসন্তী ইতিমধ্যে দরজা খুলে দিয়ে অবসান ঘটাল দুজনের নেপথ্য অবস্থার। মৃদু হেসে মলয়কে বলল—কেউ কারও কান্না দেখছেন না, কাজেই কারও জন্য মায়াও নেই। তর্কটা শেষে ঝগড়ায় পরিণত হ'ত।

মলয় এখন পবিদৃশ্যমান নির্ম্মলের প্রতি একটা ক্রুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করে সকৌতুকে বলল—আর ঝগড়া পরিণত হ'ত খুনে…

কিন্তু এত বড় অভদ্র রূঢ়তাকে পরিহাসের উত্তাপে সিদ্ধ করেও উপাদেয় করা গেল না, তার মুখের কথা বজ্র হয়ে বাজল মলয়ের নিজেরই কানে—All vulgarity is comic। বাসন্তী মাত্র খানিক শুষ্ক হেসে সরে গেল।

নির্ম্মল কিন্তু ঠাট্টাটাকে সহজ ভাবে নিয়ে একটি উত্তর তৈয়ার করল; বলল—পার তুমি, আরও বেশী করে। মহিলার সামনে যখন খুন খুন্ করতে পারছ—

মলয় বাধা দিল। বলল,—আমার অন্যায় হয়েছে নির্ম্মল।

নির্ম্মল তার কারণ অবশ্য জানে, কিন্তু তা' গুরুতর ও আন্তরিক হ'তে যাবে কেন। জিজ্ঞাসা করতে চাইতেই দেখল মলয় মুখের সামনে খবরের কাগজের যবনিকা টেনে এনেছে।

আবার কোকিল ডেকে উঠল।

কোকিলের সুর বাদ্‌লা হাওয়ার তন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার তুলে তা'তে মুগ্ধ হওয়ার বিলাস মলয়ের নেই। কোকিল তাকে, কষ্ট-কল্পনার কৃচ্ছ্র-সাধনা করে সে বাঁধতে পারে না

হৃদয়কে ঐক্যতানে কোকিলের কুহুধ্বনির সঙ্গে। তবু কান আর প্রাণের গোজামিল সম্পর্ক থেকে কি জন্ম নিতে পারে একটি সত্যিকার অনুভূতি? যা'তে বেদনাতুর হয়েছে যুগ-যুগান্তরের মনুষ্য-হৃদয়! যুগ-যুগান্তরের কবি যা' লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তারই কোথায় গলদ।

বাগজ পার্শ্বে রেখে মলয় বলল—কোকিলের চীৎকার আমার সম্পর্কে সৃষ্টির অপচয় নির্ম্মল।

—তুমি নপুংসক।

মলয় এবার চটল।

—তোমার এক কোকিলের জন্য আমাকে আর কত বিশেষণ বইতে হবে নির্ম্মল? খুনে, নপুংসক। তবু আমিও রাত্রে ঘুমোতে পারিনে।

নির্ম্মল প্রশ্ন করল—কার জন্য হে?

—তার সন্ধান বাইরের জগতে আজও পাইনি। এবার কার ফাগুন দেহে মনে আগুন ধরিয়েছে। মর্ম্মান্তিক ভাবে বোধ করছি আমার কাউকে ভালবাসার দরকার।

বন্ধুর এই পরিবর্ত্তনে নির্ম্মল অত্যন্ত খুশী হল। মনে মনে বলল—বসন্ত তোমাকে শত নমস্কার! ফাল্গুনে পা দিয়েছে পৃথিবী, ব্যোমময় ভ্রমনকক্ষের এমন কোন স্থান উহা যেখানে প্রকৃতি ঋতুস্নান করে মাতাল হয়ে ওঠে। পঞ্চভূতে গড়া মানুষ সে প্রভাব অতিক্রম করতে পারে না।

নির্ম্মল প্রফুল্ল স্বরে বলল—বিয়ে কর মলয়। লগ্ন এসেছে।

—অসম্ভব।

—অসম্ভব কেন?

তুমি জান নির্ম্মল একটি বিশেষ সাথী পেতে চায় মানুষ কোনো বিশেষ বয়সের পর থেকেই। আমিও তা চাই, কায়মনে চাই নির্ম্মল—এক এক সময় অসহ্য বোধ হয়। জেগে স্বপ্ন দেখি বুকের সামনে চুল মাত্র তফাতে একটা শরীরী গড়ে উঠেছে, তাকে ধরতে গিয়ে হাত নিজের বুকে এসে ঠেকে, এ বঞ্চনায় বুক ভেঙ্গে যায়। তবু এখন আমি বিয়ে করতে অক্ষম।

বাসন্তী এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল অলক্ষ্যে।

বলল—আপনার কথার প্রথম দিকে বেশ কমেডির আমেজ থাকে মলয় বাবু, কিন্তু শেষ এক শব্দে করে তুলেন ট্র্যাজেডি।

নির্ম্মল সুযোগ ছাড়ে না। বলল—এ আলোচনায় তৃতীয় পক্ষের মুখ এবং কান দুইই অবাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ নারী তুমি, অধিকন্তু হিন্দু কুলোদ্ভবা—

দু'জনেই হেসে উঠল, বাসন্তী বলল—সাধে! আপনার ভাষা পতিত জমি, ওতে আগাছাই জন্মাবে খালি—ফসল ফলবে না। দেখুন আমার ভাষা কি রকম উর্ব্বর—আলোচনার গাছটা শীগগীরই ফলে ফুলে দাঁড়াবে।

নির্ম্মল উঠতে উঠতে বলল—চললাম মলয়। দেখ, অন্ততঃ আমার খাতিরেও ওকে বিমুখ করো।

বাসন্তী পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে বলল—এ কি হিংস্র জয়াশা!

মলয় কিন্তু তখন গম্ভীর, অন্যমনস্ক। নির্ম্মলকে যেতে দেখে বলল—দুনিয়ার সভায় আমার স্থান কোথায় নির্ম্মল। একটা নগণ্য অলগর্দ্দ আমি—

—তার সঙ্গে তোমার বিয়ের কি সম্পর্ক?

—বিয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। আমি এখন আমাকে ভালবাসি না, ঘৃণা করি; একটা বিশেষত্বহীনকে কে ভাল বাসতে পারে নির্ম্মল? নিজেই পারি না, আমি কি সুখী হব আর কেউ ভালবাসলে? যে বাসবে আমি তাকে শুদ্ধ ঘৃণা করব।

বাসন্তী শিউরে উঠল, যেন ব্যক্তিগত আঘাত এসে বাজল। স্বরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ এনে নির্ম্মল বলল—সে বিশেষত্বটা কি রকম হবে?

মলয় বলল—বিদ্রূপ কর আর যাই কর নির্ম্মল, তুমি পাত্রী দেখবে আমার বর্ত্তমান সংকীর্ণ জীবনযাপনের প্রতি লক্ষ্য করে। কিন্তু বর্ত্তমান আমি ত সত্যিকার আমি নই। আমি আরও উপরের স্তরে ঘর বেঁধেছি—তার জন্য আমি প্রেরণা পাচ্ছি। তাই এখনকার আমাকে আমি অস্বীকার করি।

নির্ম্মল ভাবল সে প্রলাপ শুনছে।

কিন্তু বাসন্তীর প্রশ্ন বেরিয়ে এল স্বতঃ।

—বিচার কি আপনার অপক্ষপাত মলয়বাবু? আমরা নারী, নিরঞ্জন চোখে বাস্তবকে দেখি তার স্বরূপে, আপনারা দেখেন রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে। প্রেরণা আপনার খাঁটি স্বীকার করি কিন্তু সেটি আসছে মিথ্যা থেকে। ওটা আমরা বড় সহজে ধরতে পারি বলেই,—

ইতিমধ্যে বিরক্ত নির্ম্মল বেরিয়ে গেল।

মলয় বলল—নতুন শুন্‌লাম মিথ্যা থেকে সত্যের জন্ম হয়!

বাসন্তী উত্তর করল—ছায়াতে মিথ্যা ভূত দেখার জন্য ভয় পাওয়ার মত সত্য ব্যাপারও ঘটে।

—কিন্তু ভয় পাওয়াটাই যখন জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে—তখন? পঙ্ক হতে পদ্ম জন্মে, তাই বলে পদ্মের নিজস্ব সত্তা আপত্তিজনক হবে কেন!

কিয়ৎক্ষণ অন্যমনা থেকে মলয় আবার বলল—এখন ছুনিয়ার গোটা মেয়েসমাজ যৌথভাবে আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে, —আচ্ছা, এর কি কোনো মানে হয়? টানছে আমাকে বাইরে যেখানে যে যত উচ্চে আছে তার পানে; স্ত্রী কিন্তু টান্‌বে ঘরে তার চিরকালের গড়পড়তার মাঝে, তখন জীবনে থাকবে না ভবিষ্যতের স্বপ্নময় সম্ভাবনা, থাকবে চির বর্ত্তমানের রূঢ় বাস্তবতা—

অসহিষ্ণু বাসন্তী উঠে এসে আচ্ছন্ন মলয়কে ধাক্কা দিয়ে বলল, ভুল ভুল মলয় বাবু—

মলয় মৃদু হেসে বাসন্তীর প্রতি চাইল।

বলল—বাস্তবকে অত খোলা চোখে দেখা ভাল নয়, ভগবানের চালাকি ধরা পড়ে যাবে। শাস্তি হবে নির্ব্বাসন—বনং ব্রজেৎ।

বাসন্তী আবার বসে পড়ে বলল—সে সৌভাগ্য হয় নি মলয় বাবু। চাইও নে।—

কি চান?

দুঃসাহসী স্থির দৃষ্টি মলয়ের চোখে ন্যস্ত করে বাসন্তী বলল—চাই জড়িয়ে পড়তে। চমকাবেন না, আমি প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছি, দেখেছি ভালবাসা একটা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়। চাই এখন ভালবাসার আগামী সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে দিতে।

মলয় জিজ্ঞাসা করল—পারবেন?

এতক্ষণে বাধল বাসন্তীর। সঙ্কোচ এসে তাকে বাধা দিল বলতে যে বাঁচতে গেলে স্রষ্টার সর্ত্তপালন করে চলতে হবে। কাম্য আনন্দ, কিন্তু আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে যে! সৃষ্টি যে আনন্দের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সে সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে নিছক আনন্দ-উপভোক্তার দৃষ্টান্ত মূক কবি, কাটা আঙুল শিল্পী, ব্যর্থ প্রেমিক যুগল—তাদের আছে দীপাধার, নেই ওতে আলোর শিখা।

আনন্দের দাম তাকে দিতেই হবে, নইলে সে ঋণ—সুদে আসলে পরিশোধ করে কবে সে ক্রমে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। কি ক'রে বুঝাবে সে ইতিমধ্যেই শ্রান্ত।

মলয় আবার বলল—পারবেন?

এ প্রশ্নে বাসন্তী এবার ক্রোধ মিশ্রিত কৌতুক বোধ করল, বলল—ভালবাসা আর কিছু নয়, সুস্থ শরীরের একটা ব্যাধি, সুস্থ মনের একটা বিলাস। চিকিৎসা তার অহিফেন।

মলয় গম্ভীর ভাবে বলল—ফাজলেমী সুরু করলেন। শুনুন, আপনি আমাকে দিচ্ছিলেন প্রেরণা, কিন্তু উচ্চাশার আগুন আপনাকে শুদ্ধ পুড়ে ফেলেছে।

প্রথমটা বাসন্তী বিধ্বস্তের মত বোধ করল, পরমুহূর্ত্তে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলল—মানুষের সসীমতা আপনাকে এর শাস্তি দেবে মলয় বাবু। বড় শোচনীয় ভাঙা একদিন ভাঙবেনই।

মলয় নির্ব্বিকার ভাবে চেয়ে রইল।

বাসন্তী বাহির হয়ে গেল, আবার মিনিট পাঁচেক পরে পুন এসে বলল—বড় কড়া কথা বলেছি, মাপ করুন।

মলয় বাসন্তীকে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণে লেগে গেল, দেখল তার ঠোঁট দু'খানি বেশী পাতলা, আরও একটু ভারী হলে মানাত ভাল—ওই কমিশনার মিঃ রায়ের মেয়ের মতন...

সুখময় দাস

অভিবাদন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-এ

বাগবাজারের গুলির আড্ডার কথা আবাল্য শুনে আস্‌ছি বটে কিন্তু সেটা দেখবার সৌভাগ্য আমার এ পর্য্যন্ত হয়নি।

যাকে 'চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি' তার একটা ছবি স্বতঃই মনে ফুটে ওঠে।

আমার ভিতর আশৈশব একটা নেশাখোর্ বাস করে।

পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে, ইহজন্মে তাকে যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ কর্‌তে হচ্চে, এই মাদকনিবারণী সভার Life memberএর অন্তর্লোকে।

ফ্রয়েড্ সাহেবের কল্যাণে আপনাদের অবিদিত নাই যে আমাদের মগ্নচৈতন্যে যে সব ভুড়ভুড়ি নিয়তই বুদ্বুদিত হচ্চে, তারা কেবল আমাদের স্বপ্ন-কল্পনায় হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে। আমার অভিন্ন-হৃদয় গুলিখোরটি এতকাল তার নিঃসঙ্গ কোণটিতে ব'সে আপনার নেশার তাগিদ্ মেটাতে কাল্পনিক ছিলিমে এবং গবাক্ষের ফাঁকে সে পথের লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করত যদি দৈবাতে সমধর্ম্মীর সাক্ষাৎ মেলে। দেখা মিল্‌ল, এবং শাপা-বসান হল।

ফরিদপুরের হাটে উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি এই জন্মকয়েদীর উদ্ধারের ব্যবস্থা করে নেশাতুরকে তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছেন।

সৃষ্টি চলে নীহারিকার ধূম্রলোকে। সাহিত্য সেই লোক। স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের একটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কার্য্য সৃজন, কারণ আত্মপ্রকাশের বেদনা। এই জন্যই ত মানুষ সঙ্গী খোঁজে। বক্তা চায় শ্রোতা, রূপ চায় মুগ্ধদৃষ্টি। আমাদের কবি গাইলেন—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি!
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

স্বয়ং বিধাতারও বুঝি এই অভাব ও অপেক্ষা আছে!

এই যে পরস্পরের উপর একান্ত নির্ভর, আত্মপ্রসাদ ও আত্মোন্মেষের জন্য, ইহার ভিতরই ত সৃষ্টির রহস্য!

"ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধবস্য মানুষস্য সর্ব্বানি ভুতানি মধু।"

এই মনুষ্যজাতি সর্ব্বভূতের মধু; সর্ব্বভূতও তেমনি এই মনুষ্যজাতির মধু।

'যশ্চায়মস্মিন মানুষে তেজময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয় মেব, স যোঽয়মাত্মেদমমৃতামিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।"

যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ মানব জাতির মনুষ্যত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, আর এই দেহের মধ্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ মনুষ্যত্বরূপে অবস্থিত আছেন, ইহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। ইনিই সেই আত্মা। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম। ইনিই সব।

এই পরস্পরের চাহিদাইত আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ সমাজবদ্ধ করে তুলেছে। এক এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা দলবদ্ধ হই। মণ্ডলী গঠন করি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসচর্চ্চা। সাধারণতঃ লেখক-পাঠকের এই দান-প্রতিগ্রহণেই আমরা সাহিত্যের ক্ষুদ্র স্বরূপ দেখি। কিন্তু যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শে ভাব-বিনিময় ঘটে, প্রাণে প্রাণে যাতায়াত হয়, সেইখানেই ত সাহিত্যের ব্যাপক রূপ। রবিবাসর সেই বৈঠক যেখানে সমভাবাপন্ন যাঁরা, সমপন্থী যাঁরা, সতীর্থ যাঁরা, তাঁরা পরস্পরকে কাছে পাবেন। এই যে সংগতি, ইহা যদি যথার্থ আন্তরিক হয় তবে এইখানেই একটি নব সৃষ্টির অভ্যুদয় হ'বে।

কবিতা কেবল ছন্দোবদ্ধ বাক্যেই রচিত হয় না। সৌহার্দ্দে, শ্রদ্ধায়, সমপ্রাণতায়, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ান্তরকে গ্রথিত ক'রে প্রাণময়, ভাবময়, বাণীময় মহাকাব্যের সূচনা হয় এইরূপ সুহৃদ-সম্মিলনে।

দুয়ে দুয়ে চার হয়, আঙুল গুণে বলি। কিন্তু দুচারটি তাজা প্রাণের সহযোগে কি বিপুল সমষ্টি হ'তে পাবে তা গণিত শাস্ত্রের ধারণার অতীত।

আপনারা আজ আমার গৃহে পদধূলি দিয়ে আমাকে ধন্য করলেন। সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ। আজ ক্ষণিকের আতিথ্য গ্রহণ করে আনন্দময়কে আপনারা সশরীরে আমার গৃহে আনুলেন।

আপনারা আমার আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন। *

* রবিবাসরের অধিবেশনে পঠিত।

চব্বিশ বৎসর

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

চব্বিশ বৎসর
আমার জীবন পাতে আরো এক নূতন স্বাক্ষর
রাখিল প্রভাতে ; কত আশা ভয়ে
বিপুল বিস্ময়ে
চাহিলাম মেলি' আঁখি
যখনো আকাশ 'পরে রহিয়াছে বাকী
একটু আঁধার লেখা।
আধো ঘুমে জাগরণে দেখা
যৌবন আমার
বিজয়ী বীরের মত বাজাইল তুর্য্যধ্বনি তার।

চব্বিশ বৎসর
হরিল আমার ঘুম স্বপ্ন শান্তি কল্পনা-নির্ঝর,
পাঠাল আহ্বান ;
দিনের প্রচণ্ড দাহ দীপ্ত জয়গান
ছাপি' যায় কৈশোরের সুখে,—
যার মাঝে লীলারঙ্গে অনন্ত কৌতুকে
প্রথম জীবনে
হেরিনু সম্মুখে মোর মধুপূর্ণ দ্বিধাহীন ক্ষণে,

সব ভুলি এ ধরায় রচিনু আমরা
অসীমের শেষ সীমাভরা
কোলাহল প্রশ্নেরে এড়ায়ে
স্নিগ্ধ শান্তি রহিল ছড়ায়ে,
সেইত প্রথম
জীবনে প্রবেশ মোর—বক্ষে দোলে সাধ প্রিয়তম।

তার পরে আর
ভাবিনি হবে যে নব কালের সঞ্চার,
লুপ্ত হবে পুরাতন দিন,
নিষ্ঠুর নবীন
আনিবে দারুণ দীপ্তি, মধ্যাহ্ন তপন
প্রভাতের আনন্দ বপন
রাখিবে আচ্ছন্ন করি',
মাধবীর মধুর মঞ্জরী
ম্লান হয়ে লুটাবে কোথায়।
হায়
আজ তাই বারে বারে
সে দিনের অমলিন পারিজাত হারে

শতবার বক্ষে স্পর্শ করি,
অতীতেরে স্মরি'
পশ্চাতে তাকায়ে হেরি মোর পূর্ণ কৈশোরের ঘর ;
এনেছ বাহিরে মোরে তাহা হ'তে, চব্বিশ বৎসর।

চব্বিশ বৎসর,
লুঠে নিতে চাও গত জীবনের আনন্দ নির্ঝর,
ছায়া হ'তে নিষ্ঠুর বাহিরে
টেনে আনো পথিকের ভীড়ে—
যে পথেতে কত আগমন
পথিক চরণ
চলিয়াছে শ্রান্তিহীন বিস্মরণ লোকে
প্রখর আলোকে।
জানি জানি এ যৌবন
রাখেনা কাহারো তরে অবিচ্ছিন্ন শান্তি-সিংহাসন,
জ্বালায় না গন্ধতৈলে বাতি,
কারো রাতি
পূর্ণিমার মধুস্রোতে ভরি'
রাখেনা অক্ষয় করি',
বাঁশীর নিঃশ্বাস
দেয় না কাহারে হেথা চিরতরে সুখের আশ্বাস।
জানি জানি এ যৌবন মোর
রেখেছে আমার পথে পরীক্ষা কঠোর ;
সম্মুখে দুঃসহ গতি
সে পথেতে দিতে হবে হৃদিরক্তে ব্যথার আরতি।

কৈশোর পড়িয়া রবে সুদূর পিছনে
যেতে হবে শুধু মোরে সম্মুখের মায়া-অন্বেষণে ;
কতবার আঁধারে জাগিয়া
শুধাবে নিজেরে ক্লান্ত প্রতীক্ষায় হিয়া,
কতবার গুণিবে তারকা
দূরেও নিকটতম অনুভূতি মাখা ;
অশ্রুজলে মৌন উপহার
কত নিদ্রাহীন চিন্তা দিতে হবে রাত্রিরে আমার
ছিন্ন করি মথিত অন্তর,
হে যৌবন চব্বিশ বৎসর।

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বিচিত্রা প্রত্যাগত শ্রীঅনঙ্গকুমার বসু

ফাল্গুন, ১৩৪২

শিল্প-প্রদর্শনী

(একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টস্)

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম্ম তাহারই নাম যাহা সমস্ত মনুষ্য সমাজকে ধারণ করিয়া থাকে। জীবনের প্রাকৃতিক বন্ধুরতায় মানুষ বহুদিন ধরিয়া তাল রাখিতে না পারিয়া অন্ধ ও খঞ্জের ন্যায় জীবনের সম্বল হিসাবে ধর্ম্মকে ধারণ করিয়াছে। বস্তু হিসাবে ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে না পারা যাইলেও,জন্ম মৃত্যুর নিগড়ে বদ্ধ মনুষ্য-সমাজ ভাবরূপী ধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। তাই সৃষ্টির প্রথম হইতেই দেখিতে পাই শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য ও কাব্যের মধ্য দিয়াই মনুষ্য-সমাজ ধর্ম্মকে প্রকাশ করিতেছে।

কোন দেশের বা সভ্যতার অন্তরের আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিতে হইলে সে দেশের কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকে বুঝিতে হয়। বর্ত্তমান লইয়া, যাহা আছে তাহা লইয়া, কেহই সন্তুষ্ট নহে। যাহা নাই, যাহা হইতে চাই তাহাকেই যখন সুরে ছন্দে প্রকাশ করিলাম, রঙে রেখায় মূর্ত্ত করিলাম —বলা হইল কবিতা বা চিত্রশিল্প। আমরা জন্মাইতেছি ও মরিতেছি। এই জন্মমৃত্যুর ও জীবনের নানা বিক্ষেপ ও বিচ্যুতির হাত হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা হইতেই আমাদের অমরত্ব বা অন্তরের কল্পনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—কাব্যে, সঙ্গীতে, রূপ-বিদ্যায়।

গোষ্ঠবিহার

শ্রীবিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ভাষায় নিজেদের এই আত্ম-পরিণতির ইচ্ছা বা শ্রেষ্ঠ বাসনাকে রূপ দান করিতেছে। ইংরাজী

সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে ভাষার ভিন্নতা আছে বলিয়া এই দুইটীর যে কোনও একটী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এই দুই জাতীয় সাহিত্য হইতে যেমন একই প্রকার আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন না, তেমনি ইউরোপীয় চিত্রের ভাষায় অভিজ্ঞ চক্ষু ও মন হয়তো ভারতীয় চিত্রের প্রকাশ-ক্ষমতাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি ও স্বীকার করিতে পারিবে না।

চিত্র-শিল্পের এই আত্মপ্রকাশ প্রকৃতির জন্ম মৃত্যুর লীলাকে অবজ্ঞা করিলেও বিভিন্ন দেশের রূপ-শিল্পের ভাষা স্বতঃই মনে উদিত হইবে। একজন বহুল বিচিত্রত'র আদর্শ-রূপ, আর জন স্বল্প বিচিত্রতায় মহীয়ান।

চিত্রশিল্প ধর্ম্মের বাহন জাতীয় আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ বাসনাকে রূপ দান করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান বাঙলা দেশে চিত্র-শিল্পের সমাদর দেখিলে সত্যই আশান্বিত হইবার কথা। জাতি হিসাবে বাঙ্গালী জীবনকে ভাল বাসিলে জাতীয় রূপ-শিল্পকেও ভালবাসা স্বাভাবিক। তাই প্রতি বৎসরেই বাংলার রাজধানী কলিকাতায় দুইটী করিয়া রূপ-শিল্পের প্রদর্শনী

দোললীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র

তাহার পারিপার্শ্বিকের প্রকৃতি হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাচীন মিশর ও ভারতবর্ষের রূপশিল্পের আকারগত ভেদ উল্লেখযোগ্য। মিশরের পিরামিড ও স্ফিংফ্‌স্ জাতীয় শিল্প পারিপার্শ্বিকের নিরাভরণ ও বিস্তৃত মরু দেশের সহিত তাল ও ছন্দ মিলাইয়াই জীবনের অলংকার-হীন ধূসরতার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অপর পক্ষে ভারতের কোনও প্রাচীন শিল্প দেখিলেই বঙ্কিমচন্দ্রের "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্" গান হইতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পীগণ মুখ্যতঃ রঙ ও রেখার অথবা আলো ও ছায়ার দুইটী বিভিন্ন ভাষায় রূপ সৃজন করিতেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় ইউরোপের প্রবলতম জাতি ইংরাজগণ এই দেশে রাজত্ব স্থাপন করেন। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া নানা অনিবার্য্য কারণে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীগণ ইউরোপের আত্মপ্রকাশের ভাষাগুলি আয়ত্ত করিতে আরম্ভ

করিল। ইংরাজী ভাষায় কথা বলা, লেখা পড়া, ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া, গৃহনির্ম্মাণ সবই চলিতে লাগিল। কিন্তু হরবোলা কবি নয়, অনুকরণ শিল্প নয় এবং পরের ভাষায় কাব্যসৃজন সম্ভব নয়; তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ আপনার সংস্কৃতিকে পুনরায়

বর্ত্তমানের শিল্প-আন্দোলনকে সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শিল্পসৃজনের পশ্চাতে যে মনোভাব রহিয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে,—বাঙ্গালী জাতির অন্তরের উচ্চাভিলাষের স্বরূপ জানিতে হইবে, এবং তাহার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ও বিশেষ করিয়া সাহিত্যিকদিগকে (যাঁহারা আত্মপ্রকাশের

সিংহ

শ্রীযামিনী রায়

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

সঞ্জীবিত করিল। ধর্ম্মভ্রষ্ট আচারসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী সমাজে আবির্ভূত হইলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস;—বাঙ্গালী সমাজ আপনার আদর্শ বুঝিল। বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন। সাহিত্য, কাব্য, চিত্রশিল্প বাহন হইয়া অবহেলিত ও পরিত্যক্ত ধর্ম্মকে, জাতীয় আদর্শকে পুনরায় লোক সমাজে আনয়ন করিল।

কথিত ভাষাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন) রূপ-শিল্পের বিভিন্ন দিক লইয়া রীতিমত আলোচনা করিতে হইবে। ছবি আঁকা হইল, মূর্ত্তি গড়া হইল, গান গাওয়া হইল, কিন্তু তাহাদিগকে উপভোগ করিবার কেহই রহিল না, কিম্বা ছবি মূর্ত্তির গড়ন, বা গান কবিতার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া যে যাহার মনগড়া কার্য্যে তাহাদের ব্যবহার করিল, তাহা হইলে

তাহাদের সৃজনের সার্থকতাই নষ্ট হইয়া যায়। ছেলের হাতে ছুরি দেওয়া হইয়াছে আম কাটিয়া খাইতে, সে তাহা না করিয়া আপনার গলা কাটিয়া বসিল! পৃথিবীর চারিধারে বিশেষ

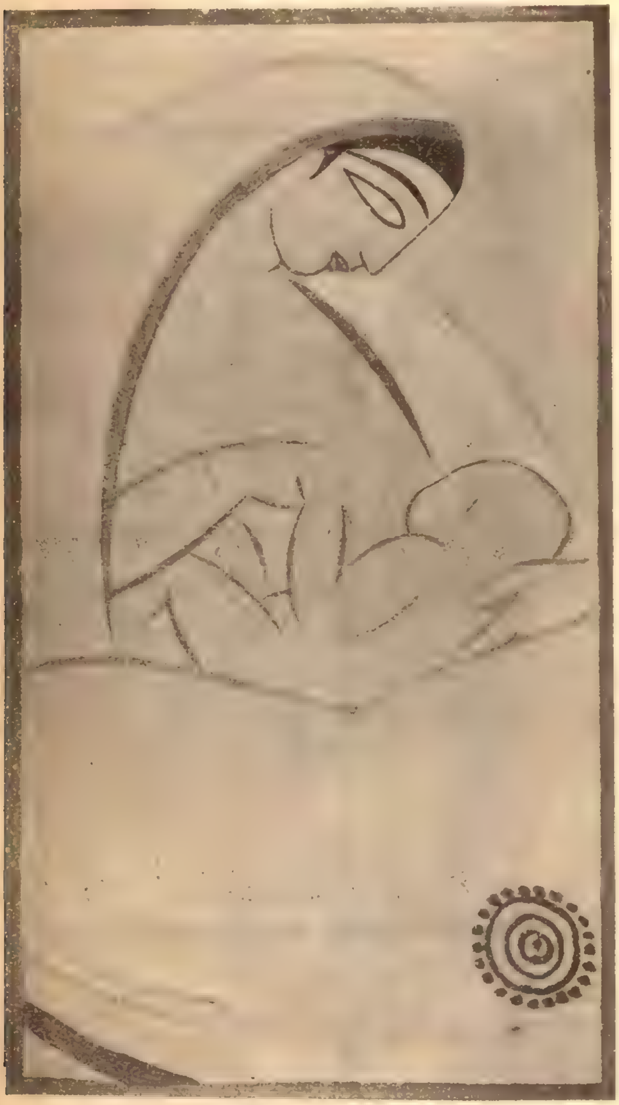

করিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাসে ইহা নিত্য ঘটনা।

স্বভাবের নিয়মেই মানুষ সৌন্দর্য্যের পূজারী। শ্রী স্বাস্থ্য ও সমতার নামই সৌন্দর্য্য এবং এইগুলির সমন্বয় প্রকৃতির আসল স্বরূপ এবং আদর্শ জীবনের উপাদান বলিয়া ইহাদের সত্য এবং মঙ্গলও বলা হইয়াছে। প্রকৃতির ব্যক্তরূপে বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। রঙ ও রেখা

মা ও ছেলে

শ্রীযামিনী রায়

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

আলো ও ছায়ার উপাদানে তাবৎ দৃষ্ট বস্তু লোক-চক্ষে প্রকট হইয়া রহিয়াছে। তাই সমতা, সৌন্দর্য্য বা পূর্ণতার পূজারী শিল্পীবৃন্দ প্রকৃতির অসম্পূর্ণ রূপকে হুবহু নকল না করিয়া ধ্যান ও অনুভূতির সাহায্যে

বস্তুর সত্য ও সুন্দর রূপ সৃজন করিয়া থাকেন। এবং সেই কারণেই ক্যামেরায় তোলা ছবি শিল্প বা আর্ট নয়।

কলিকাতায় যে দুইটী বাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনীর কথা বলিতেছিলাম বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটিকে লইয়া আলোচনা করিব। গত বড় দিনের ছুটিতে কলিকাতার যাদুঘরে একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের উদ্যোগে একটি বিরাট চিত্র-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। যে সকল শিল্পী ও রসিক ভদ্রমণ্ডলী আপনাদের সামর্থ্য ও সদুদ্দেশ্য লইয়া এইরূপ প্রদর্শনী খুলিতেছেন তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়।

বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পীগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন প্রকরণে অঙ্কিত ন্যূনকল্পে এক হাজার চিত্র ও বহু মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। তন্মধ্যে চিত্র হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায় চৌধুরী 'গোষ্ঠবিহার' ও 'দোললীলা'। চিত্র দুইখানি ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত। বর্ণের স্নিগ্ধ সুষমায়

সাঁওতাল নৃত্য

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

আবেগময় ও ছন্দোবদ্ধ রেখার ভাবভঙ্গিতে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অন্তরের সংযত উল্লাস অপূর্ব্ব মহিমায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। খুব মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেও ছবি দুইখানি আঁকা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত লিপিচাতুর্য্য ও অঙ্কন-রীতির পশ্চাতে শিল্পী সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রগুলি যেন জোর করিয়া আর সকলকে হটাইয়া দিতেই ব্যস্ত, বক্তব্যের অপেক্ষা বক্তা স্পষ্ট। কালীঘাটের মরা পট ভূত হইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে মোটা রেখার গুল ফুলাইয়া চড়া রঙের সাজ পরিয়া চিৎকার করিয়া যেন বলিতেছে—দেখ স্বদেশী চিত্র কাহাকে বলে। তাঁহার বহু ছবির মধ্যে 'সিংহ' এবং 'মা ও ছেলে' ছবি দুইখানি উল্লেখযোগ্য। এককথায় যামিনী বাবুর ছবিগুলি রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট বা বিজ্ঞাপনের ছবির কথাই মনে করাইয়া দেয়। অপরাপর বহু চিত্রের মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত যে চিত্রগুলির স্বার্থকতার কথা উল্লেখ করিতে হয় তাহা হইতেছে শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'সাঁওতাল নৃত্য' ও মণি গুপ্তের

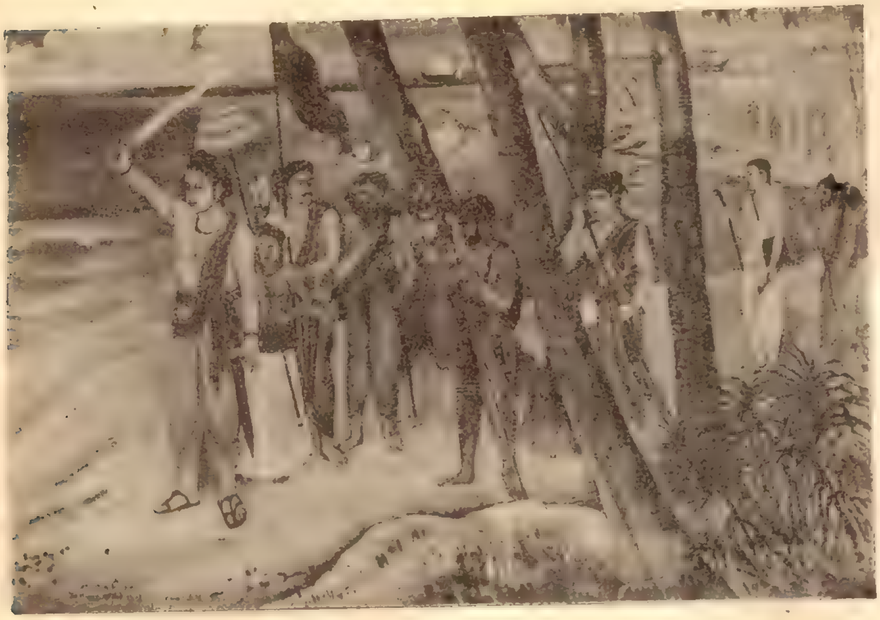

সিংহল বিজয়

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র

সূর্য্যালোক

শ্রীললিতমোহন সেন

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

দুয়ারে

শ্রীললিতমোহন সেন

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

'সিংহল বিজয়'। আর একজন প্রতিভাবান শিল্পী হইতেছেন শিল্পী শ্রীমধুসূদন সরকার। চিত্র রচনার প্রকরণ সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব।

ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তেলরঙে যাঁহারা চিত্র রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনের নাম সকলের পূর্ব্বেই মনে পড়িতেছে। বিদেশীয় অঙ্কন পদ্ধতির ভাষাকে এমন সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করিয়া তিনি যথার্থ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ছবির মধ্য দিয়া তিনি প্রায় সমগ্র ব্রহ্মদেশকে আমাদের চোখ ও মনের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অপরাপর চিত্রের মধ্যে তাঁহার 'সূর্য্যালোক' ও 'তুষার' ছবি দুইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার পর শ্রীযুক্ত অতুল বসুর অঙ্কিত প্রতিকৃতি। শিল্পী একখানি নিজের ছবি নিজেই আঁকিয়াছেন আর একখানি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের। তেলরঙের প্রতিকৃতির রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। এই

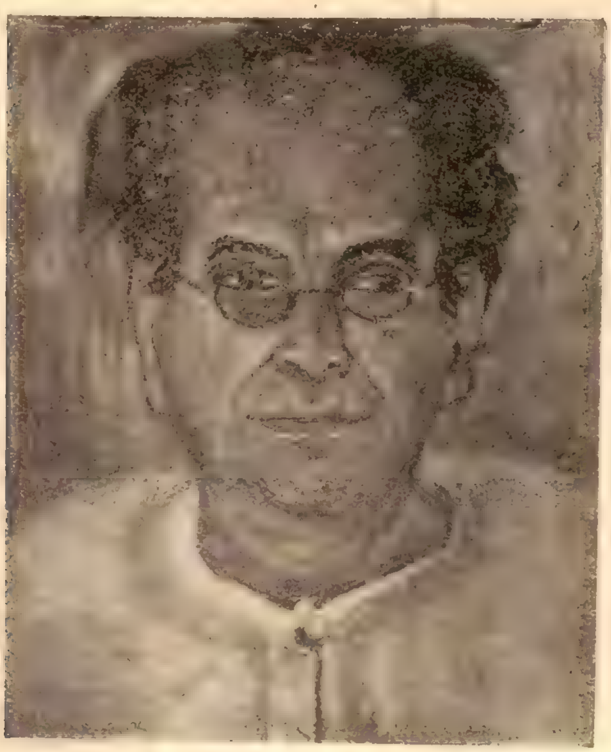

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র

বিভাগে উল্লেখযোগ্য আর একজন শিল্পী হইতেছেন মূক ও বধির শিল্পী শ্রীযুক্ত বি, বি, রায়চৌধুরী এ,আর.সি,এ। তাঁহার ছবি দেখিলে ঠিক বিলাতি ছবি দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়। অন্ধকার ঘরের একটি বাতায়নের নিকটে একটি গোলাকৃতি টেবিলকে পরিবেষ্টন করিয়া নীল রঙের পোষাক পরিহিত কতিপয় ব্যক্তি ধূমপান ও গল্পগুজবে রত,—এই চিত্রখানি সত্যই বিলাতের আবহাওয়া ও তাম্রকূটের গন্ধ বহন করিতেছে।

উদীয়মান শিল্পীগণের মধ্যে আর একজন বিশেষ শক্তিশালী শিল্পীকে অভিনন্দন না করিয়া পারিতেছি না। ইনি শিল্পী শ্রীপ্রবোধেন্দ্র ঠাকুর। রঙ্গিন খড়ি দিয়া শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র ইনি আঁকিয়াছেন। সমস্ত প্রদর্শনীর মধ্যে প্রতিকৃতি চিত্রের ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সমস্ত সত্তা দিয়া শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে অনুভব করিয়া এই চিত্র রচনা করিয়াছেন। ইহা শিল্পাচার্য্যের ব্যক্তিত্বের সঠিক প্রতিচ্ছবি।

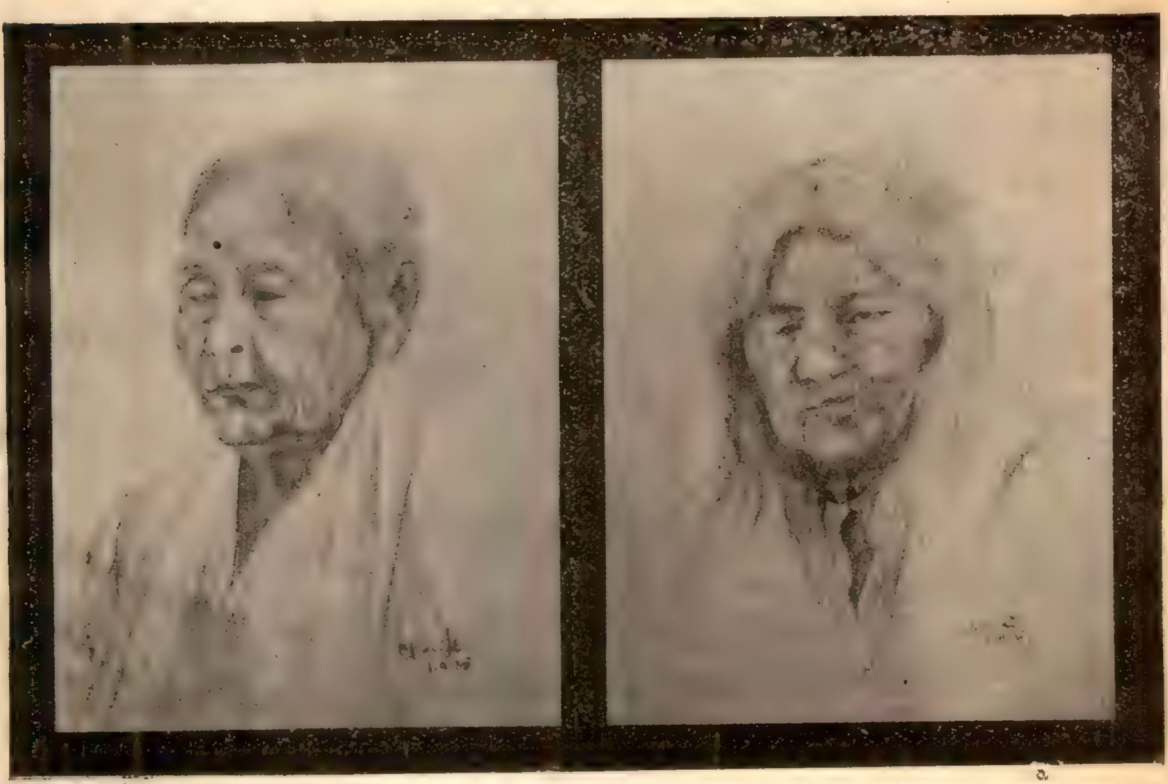

বার্দ্ধক্য

শ্রীঅবনী সেন

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র

সৌন্দর্য্যের প্রচলিত মাপকাটি হাতে লইয়া শিল্পীগণ রূপস্রজন করেন না। যাহাকে কদর্য্য বলিয়া, বীভৎস বলিয়া সাধারণে হয়তো মুখ ঢাকিবেন তাহাকেই সহানুভূতির উপকরণে যখন কোনও যথার্থ শিল্পী সেই বিভৎসতার সমস্ত খুঁটি-

মহিষ শাবক

শ্রীঅবনী সেন

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

নাটি লইয়া পটে আঁকিবেন তখন আর তাহা আমাদের পীড়া দিবে না বরং উপভোগেরই হইবে। শিল্পী অবনী সেনের— কাষ্ঠকয়লায় অঙ্কিত দুই বৃদ্ধা ভিখারিণীর মুখচ্ছবি দেখিয়া ইহাই মনে হয়। এই শিল্পীর 'মহিষ শাবক' ছবিখানিও ভাল। গোবর্দ্ধন আশের 'সমুদ্র-তীরে' ছবিখানি তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনামাত্র।

উপসংহারে বোধ হয় এই প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তাগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও শিল্পীগণকে প্রতিযোগীতায় আহ্বান করিয়া শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য তাঁহারা ব্যর্থ করিতেছেন।

সম-সাময়িক কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভদ্রলোকের বিচারের মানদণ্ডই শ্রেষ্ঠ শিল্পী নির্ব্বাচনের সঠিক উপায় না হইতেও পারে। চিত্র-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকাতায় নাম করিয়া বিত্তার অপকারই বেশী হইবে, তাহা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ না বুঝিলেও চিন্তাশীল শিল্পরসিকগণ কি ভাবিয়া দেখিবেন না?

গঙ্গা প্রণাম

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

উৎসাহদানকল্পে প্রতিযোগীতায় প্রবর্ত্তন করিলে বিত্তার ও বিদ্বানগণের শিল্পের ও শিল্পীগণের উপকারের অপেক্ষা

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

মহামান্য সম্রাট অষ্টম এড্ওয়ার্ড্

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

যে-কোন মানুষের মৃত্যুর পর তার সম্বন্ধে প্রিয় বাক্য উচ্চারণই হ'ল চিরাচরিত প্রথা,—মৃতের সম্বন্ধে জীবিতদের উক্তি স্বাভাবিক সৌজন্যের দ্বারা মধুর ও সশ্রদ্ধ। এটাই হ'ল সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভদ্ররীতি। কিন্তু এই প্রচলিত রীতির জন্য একটা গুরুতর অসুবিধারও সৃষ্টি হয়েছে,—প্রকৃতপক্ষেই যে ব্যক্তি বৃহৎ তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকারে অতিরঞ্জনযুক্ত সত্য উক্তিকেও আমরা সহজ সৌজন্য বলে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছি। বলা বাহুল্য এতে একটা অবিচারের উদ্ভব হয়েছে। এই ভূমিকাটুকুর এখানে প্রয়োজন হ'ল এই জন্য যে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যুর পরে যে বিশ্বব্যাপী শোক প্রকাশের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি এবং তাঁর সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য শুনতে পাচ্ছি, তাকে যেন আমরা সৌজন্যমাত্র মনে করে সেই সর্ব্বপ্রকারে বৃহৎ মানুষটির অমর্য্যাদা না করি। তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। যে সাম্রাজ্যের আয়তন ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের কাছে সীজার, এ্যালেকজাণ্ডারের কল্পনা ম্লান হ'য়ে যায়, তেমনইতর সাম্রাজ্যের তিনি ছিলেন অধিপতি, —বিশ্বের বৃহত্তম সম্মান তাঁর, একথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে মানুষ হিসেবেও তিনি কারও চেয়ে কোনও অংশে খাটো ছিলেন না—এবং এ উক্তি তাঁর জীবদ্দশায় যে-কোনও সময়েই করা যেতে পারত,—মৃত সম্রাটের প্রতি কেবলমাত্র সহজ সৌজন্যের উক্তি এ নয়।

স্বর্গীয় সম্রাট

বর্ত্তমান যুগে নানা কারণে আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের মন প্রসন্ন নয়; অনেক বিশ্বাস আমাদের নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, আমাদের মনে প্রবেশ করেছে বহু সংশয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের চরম অসময়েও একটি মানুষ অবস্থিত ছিলেন সকল নিন্দার বহু উর্দ্ধে —যাঁর সম্বন্ধে অতি নিন্দুকের রসনাও ছিল শ্রদ্ধাশীল, যাঁর ন্যায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিষয়ে আইরিশ সিনফিনার অথবা বাংলার বিপ্লবীদের মনেও কোনদিন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। এর কারণ এ নয় যে তাঁর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ,—রাজ্যের নীতি পরিচালনা বিষয়ে তাঁর কোনই হাত ছিল না। কারণ এ উক্তি সত্য নয়। ইংলণ্ডের রাজা স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা না করলেও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর 'পরে যে প্রভাব বিস্তার করেন তার মূল্য সরাসরি

শাসনকার্য্যের চেয়ে কোনও অংশে কম ত নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশী। পঞ্চম জর্জ্জ যে যুগে অম্লান খ্যাতি নিয়ে রাজত্ব করে গেলেন সে যুগের ইতিহাস বাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ, অরাজকতা এবং বহুবিধ আন্দোলনের দ্বারা কণ্টকিত। লুপ্ত গৌরব, অপহৃত সাম্রাজ্য এবং সাধারণতন্ত্রের অভ্যুত্থানে মহাপরাক্রান্ত সম্রাট ও নৃপতিমণ্ডলীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কাহিনী বহু সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছে, যে অন্ধকারতম সময়ে মানুষের নিম্নতম প্রবৃত্তিসকল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সেই কালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ নিজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছেন বুদ্ধির দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, আপন মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশের মাধুর্য্যের দ্বারা। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের গোষ্টিপতি ছিলেন কেবল মুখের কথায় নয়, মনে প্রাণে, এবং সেই জন্যই

১৯১১ সালে কলিকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ লর্ড হার্ডিংএর সহিত
অশ্বারোহণে সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন

এ-যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। কিন্তু তারই মধ্যে এই মানুষটি—যিনি ছিলেন অন্তরে বাহিরে প্রকৃত সম্রাট—তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধাররূপে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেলেন তার আর তুলনা হয় না। যে যুগে তাসের ঘরের মত তাঁর জন্য জগদ্ব্যাপী এরূপ শোক উত্থিত হ'য়েছে। প্রজাবৃন্দের অন্তরের এত সন্নিকটে আসার ইতিহাস সুলভ ইতিহাস নয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের কর্ম্মবহুল গৌরবোজ্জল জীবনের এ-ই হল শ্রেষ্ঠ গৌরব। একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে এত বড় একজন

মানুষের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়—কিন্তু সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জীবন-কাহিনী আলোচনা করতে গিয়ে এক মহীয়সী নারীর কথা উল্লেখ না করলে গুরুতর অন্যায় করা হবে। এই নারী হচ্ছেন বর্ত্তমান রাজমাতা মেরী। সর্ব্বপ্রকারে ছিলেন তিনি স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিনী। এক নিশ্বাসে ভক্তিপ্রীতির সহিত সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দ উল্লেখ

নারীর মর্য্যাদায় সুসম্পন্ন করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র পিতার পদাঙ্কানুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যুবরাজরূপে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন তাতে তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করা চলে। তিনি দীর্ঘায়ু হ'ন এবং পিতার ন্যায় অম্লান খ্যাতি অর্জ্জন করুন, এই আমাদের কামনা।

উইম্বল্‌ডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী মিসেস গডফ্রেকে তাঁহার বিজয় লাভে অভিনন্দিত করিতেছেন

করেছে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত সম্রাজ্ঞী মেরীর নাম—এর ব্যতিক্রম হয়নি কোন ক্ষেত্রে। তাঁর দুঃসহ শোকে শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা আজ এই যে সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির নরনারী তাঁর শোকে আন্তরিকতার সহিত অংশ গ্রহন করেছে। তিনিও সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁর জীবনের কর্ত্তব্য মহীয়সী

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও সম্রাজ্ঞী এ্যালেকজ্যাণ্ড্রার দ্বিতীয় পুত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ লণ্ডনের মালবরো হাউসে ১৮৬৫ সালের ৩রা জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে স্যাণ্ড্রিংহামের যাজক রেভারেণ্ড জন নীল ড্যাল্টনের তত্ত্বাবধানে

তাঁর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি শৈশবেই তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন; বহু বিষয় অধ্যয়নের আগ্রহ শৈশব হ'তে আরম্ভ করে তাঁর শেষ জীবন অবধি বর্ত্তমান ছিল। অজানা দেশে ভ্রমণের অথবা সৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনীতে তাঁর কল্পনাশক্তি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত। তাঁর অন্যতম শিক্ষক বিখ্যাত পণ্ডিত প্রোফেসর ডাঁবেরি বলেছেন যে তাঁর প্রতি কথাটি প্রিন্স জর্জ্জ গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনতেন এবং কাকুতি মিনতি করতে থাকতেন আর একটা গল্প বলার জন্য।

বারো বৎসর বয়সে 'ব্রিট্যানিয়া' জাহাজে মিঃ ললেসের তত্ত্বাবধানে তাঁর নৌবিদ্যা শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তাঁর প্রখর কল্পনাশক্তির সহিত নাবিক জীবনের ভারী চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান হ'য়েছিল। সমুদ্রকে তিনি সত্যই ভালবাসতেন। সেই জন্যই তাঁর আর এক নাম ছিল "দ্য সেলার কিং"। ব্রিট্যানিয়া জাহাজে তাঁকে সাধারণ নাবিকের সমস্ত কাজই করতে হ'ত; তদানীন্তন যুবরাজ এডওয়ার্ডের পুত্র বলে কোনও অতিরিক্ত সুবিধা তাঁকে দেওয়া হ'ত না। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি 'ব্যাকাঁৎ' জাহাজে মিড্‌শিপম্যান হ'ন এবং দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি, জাপান, চীন, সিংহল, মিশর ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করেন। ভবিষ্যৎ জীবনে এই দেশভ্রমণ যে তাঁর কত কাজে লেগেছিল তার আর ইয়ত্তা নেই। যে সাম্রাজ্য শাসনের গুরুভার তাঁর 'পরে উত্তরকালে ন্যস্ত হ'য়েছিল, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ এমনই করে তিনি লাভ করলেন বাল্যকালেই,—এতে তাঁর মনের পরিধি হ'ল বর্দ্ধিত। তারপর তিনি 'ক্যানাডা' জাহাজের মিড্‌শিপম্যান হ'ন। নৌবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য উনিশ বৎসর বয়সে তিনি সাব-লেফটন্যান্ট পদে উন্নীত হন। নিজের কৃতিত্বে তিনি ক্রমে লেফটন্যান্ট, কম্যাণ্ডর, রিয়ার, এ্যাডমিরাল এবং অবশেষে ১৯০৩ সালে ভাইস এ্যাডমিরাল হ'ন। এ্যাডমিরাল ফিশারের মতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ছিলেন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নাবিকদের অন্যতম। বস্তুত তিনি সামুদ্রিক জীবন যাপন করতে এত অধিক পরিমাণে আগ্রহশীল ছিলেন যে সাধারণ নাগরিকের পুত্র হ'য়ে জন্মগ্রহণ করলে তিনি যে নাবিকের জীবন অবলম্বন করতেন তাতে আর কোনও সংশয় নেই। ১৮৯৩ সালে টেক্-এর রাজকুমারী মেরীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০১ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ডিউক এবং ডাচেস অভ ইয়র্করূপে নবগঠিত শাসনতন্ত্রের উদ্বোধনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় যান। তাঁহাদের মধুর এবং উদার ব্যবহারে অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা মুগ্ধ হ'ন এবং সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ দৃঢ়তর হয়। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি ওয়েলসের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'ন্ এবং একজন প্রথম শ্রেণীর বক্তারূপে নিজের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১০ সালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তিনি রাজা হ'ন। তিনি দু'বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। একবার যুবরাজ অবস্থায় ১৯০৫ সালে এবং অন্যবার ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে ১৯১১ সালে। দ্বিতীয় বারের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা। ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি দেশের জন্য জাতির জন্য অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর অনুনয় বিনয় এবং নিষেধ সত্বেও তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য দলের সহিত যোগ দেন এবং সমানভাবে তাদের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর অপূর্ব্ব চরিত্রের সকল গুণরাশির শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। যুদ্ধের পরবর্ত্তী একান্ত দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও তিনি সাম্রাজ্যকে যেরূপ কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত করেছিলেন তার কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তাঁর রাজত্বের পঞ্চবিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ায় ১৯৩৫ সালে সাম্রাজ্যব্যাপী আনন্দের মধ্যে রজত জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়। তিনি যে তাঁর প্রজাবৃন্দের অন্তরে কিরূপ শ্রদ্ধা প্রীতির আসন অধিকার করেছিলেন এই জয়ন্তী উৎসবে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরের ২০এ জানুয়ারী তারিখে স্যাণ্ড্রিংহামে তাঁর মৃত্যু হয়। পারিবারিক জীবনে তিনি একজন আদর্শ ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর মধ্যে ব্রিটিশজাতির শ্রেষ্ঠ গুণরাজির সমন্বয় হ'য়েছিল। স্বভাবতই অধ্যয়নশীল এবং ভাবুকপ্রকৃতির বলে তিনি কথা কম বলতেন এবং কাজ বেশী করতেন। তাঁর মনকে সুধী ব্যক্তিরা এনসাইক্লোপিডিয়ার সহিত তুলনা করেছেন এবং শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন।

একটী সকাল

মৌলভী মবারক আলী বি-এ

আজমীরে উরুস।

হজরত খাজা মইন উদ্দীন চিশতি সাহেবের মৃত্যুবাসরের মহা উৎসব। দেশ বিদেশের অসংখ্য লোক এই উপলক্ষে আজমীরের দিকে ছুটে।

যাত্রাপথের সহস্র অসুবিধা—ট্রেনের ভিড়, থাকবার অসুবিধা, জলের কষ্ট সবকে তুচ্ছ ক'রে লোক ছুটে মৃত্যু-বাসরের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা অর্ঘ নিবেদন করতে।

উরসের শেষদিকে যে শুক্রবার পড়ে সেই শুক্রবারে জুম্মার নামাজ পড়বার জন্যে এখানে লোক আসে হাজারে হাজারে। তখন ভিড় হয় সব চেয়ে বেশী। এইদিনের নামাজকে "হজ্জে হিন্দুস্থান" বলে।

হজ্জে হিন্দুস্থানের পবিত্র ও বিরাট সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আমাদের ভেতরও একটা অদমনীয় আগ্রহ এলো। দু'দিন পিছিয়ে গেলেও চলতো। কিন্তু একটা বিশাল সম্মেলনের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে আমাদের অস্থির ক'রে তুললো।

দিল্লী ষ্টেশন হ'তে আজমীর এক্সপ্রেস ছাড়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে। ছ'টায় অসম্ভব ভিড় আশঙ্কা ক'রে টিকেট ক্রয় করেছিলাম সকালেই এবং বিছানাপত্র বেঁধে বেলা প্রায় চারটায় রওনা হলাম ষ্টেশনের দিকে।

প্লাটফরমে ঢুকবার বেলা গেটে বাধা দিল রেলের জনৈক কর্ম্মচারী। সে গেটে পাহারা দিচ্ছিল। বললে ট্রেন প্লাটফরমে লাগবার এখনও অনেক দেরী। কাজেই এখন আপনাকে যেতে দিবো না। আমরা অনুরোধ করলাম। কিন্তু সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপও করলো না। যে কুলী আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো তাকে বাইরে আসতে বাধ্য করলো। আমাকেও বাইরে আসতে বললো। অনেকক্ষণ ধরে কথা কাটাকাটি হলো। ইতিমধ্যে অন্য এক রেলওয়ে কর্ম্মচারী এলেন। তিনি আমাদের বাঙ্গালী বলে চিনে ফেলেছেন। আমরা যাতে জিনিস পত্র নিয়ে অবাধে ভেতরে থাকতে পারি তার জন্যে তিনি উক্ত কর্ম্মচারীকে বার বার অনুরোধ করলেন। শেষটা বললেন, আমার দেশ ভাই, ওদের ছেড়ে দিতেই হবে। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারীর দৃঢ় পণ সে আমাদের কিছুতেই গাড়ী লাগবার এতো আগে ভেতরে প্রবেশ করবার অনুমতি দিবে না। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীকে আমরা বললাম যে কিছু বখশিশ দিলেই ও হয়ত রাজি হ'বে। তিনি বললেন, এই জন্যে ত এম্নি পীড়াপীড়ি কচ্ছে। এই বলে তিনি আমাদের স্যুটকেস ইত্যাদি নিজ হাতেই টেনে আনতে লাগলেন। এরপর উক্ত কর্ম্মচারী আর আপত্তি উত্থাপন করতে পারলো না।

ভদ্রলোকটীর বাড়ী চন্দননগরে। তাঁকে আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেম।

এরপর গাড়ী ছুটলো দিনের পর্দ্দাকে ঢাকবার জন্যে অশেষ ছেয়ে যে আঁধারের যবনিকা পড়েছিলো তার ভেতর দিয়ে।

প্রত্যেক ষ্টেশনেই অসম্ভব ভিড়। যাত্রীদের ভয় এ গাড়ী ছেড়ে দিলে হজ্জে হিন্দুস্থানের সম্মেলনে যোগ দিতে পারবে না, বছরের একটা সেরা দিনের পুণ্য সঞ্চয় হবে না।

মেয়েপুরুষে দলে দলে চলেছে। যাদের মানত আছে তারা সাথে নিয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের।

দিনের পর রাত্রি আসে, আবার রাতের পর দিন আসে। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম।

দিনের উজ্জ্বল আলোর অভিসার নিয়ে সকাল আবার এলো।

আমরা বাইরে চেয়ে দেখি চারিদিকে শস্যহীন অনুর্ব্বর মরু-প্রান্তর। কোথাও বা উঁচু, কোথাও বা নীচু—কোথাও বা

ছোট ছোট গাছের সমষ্টি। এর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রাতঃ-কালীন শীতল হাওয়া গাড়ীর ভেতর এসে আমাদের অসীম স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

গাড়ী আজমীরের যত নিকটবর্ত্তী হচ্ছিল ততই ছোট ছোট পাহাড়ের সারি দৃষ্টিপথে পড়ছিল। আঁকা বাঁকা পাহাড়ের কোল ব'য়ে কোথাও বা একটি স্বল্পতোয়া নির্ঝরিণী তর তর করে বয়ে যাচ্ছে রুক্ষ মাঠের ভেতর দিয়ে মরুভূমির বুকে ওয়েসিসের সৃষ্টি করে। আবার কোথাও বা অত্যুচ্চ পাহাড়ের বুকে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে, আর তার আকর্ষণে মনের আনন্দে এসে জমেছে কতো পশুপক্ষী।

দেখতে দেখতে গাড়ী পাহাড়ের পাশ দিয়ে সর্পিল পথে আজমীরের উপকণ্ঠে পৌঁছলো। অদূরে তারাগড় কতদিনের জমাট ব্যথা বুকে নিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীর ভেতর হতে পাহাড়ের মাথায় দেখতে পেলাম কতকগুলি সমাধিসৌধ, কতকগুলি বা বাংলো। দূর হতে ঐ সব অতি ক্ষুদ্র ব'লে বোধ হচ্ছিল, এরোপ্লেনে চড়ে নীচে তাকালে যেমন ক্ষুদ্র বোধ হয় গাছ পালা, ঘর বাড়ী জীব জন্তু প্রভৃতি।

বেলা প্রায় আটটায় গাড়ী এসে থামলো আজমীর ষ্টেশনে। গাড়ী দাঁড়াবার সাথে সাথে পঙ্গপালের মতো ভিড় ক'রে গাড়ীর দরজার সামনে এলো কতকগুলি লোক যাদের দেখলে পোষাক পরিচ্ছদে, কথাবার্ত্তায় বেশ শরিফজাদা ব'লে বোধ হয়। এদের সাদর অভ্যর্থনায়, মিষ্ট-প্রশ্নে ও আগন্তুকের দেশের বড় বড় লোকের পরিচয় প্রদানের বহরে একেবারে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। কাশী, বৃন্দাবন, গয়া, পাণ্ডুয়া, ও ত্রিবেণী ঘাটে যাঁরা গেছেন তাঁদের অবশ্য এ বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞতা আছে। পাণ্ডাদের কবলে একবার পড়লে টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ না হয়ে যায় না। তবে এই সব তীর্থস্থানের এম্নি আইন কানুন যে এদের সাহায্য গ্রহণ না করলে তীর্থস্থান দর্শন করা একরূপ অসম্ভব হয়ে উঠে।

গাড়ী হতে নেমে আমরা ভাবতে লাগলাম কোথায় উঠবো। আর আমাদের চারিদিক ঘিরে মুসলমান পাণ্ডারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো আমরা কারো পরিচয় পত্র নিয়ে এসেছি কিনা।

এখানে পাণ্ডারা দরগাহ শরিফের খাদেম বলে পরিচিত। শুনলাম এরা একশ চুয়াল্লিশ ঘর। এরাই উত্তরাধিকারসূত্রে খাদেমগিরি করবার সনদ পেয়ে আসছে। এদের প্রধান জীবিকা ইহাই।

যাহ'ক এখানে থাকবার বন্দোবস্তের ভার ছিলো আমার অন্যতম সঙ্গী তরুণ উকিল মিঃ এ, ইস্লামের উপর। এখান-কার কোনও খাদেমের নামে পরিচয় পত্রও তার কাছে ছিলো। পাণ্ডাদের লম্বাচওড়া বক্তৃতা শুনে সে ঠিক করলো এদের আশ্রয়ে সে কিছুতেই উঠবে না।

অবশ্য অন্য পাণ্ডারা আমাদের নিকট হতে ক্ষুণ্ণমনে চলে গেলেও একটী যুবক পাণ্ডা আমাদের কাছে কাছে ঘুরতে লাগলো এবং তার বাসায় উঠবার জন্যে বিষম জেদ করতে লাগলো।

মিঃ ইসলামের সঙ্কল্প বুঝে আমি একবার প্লাটফরম হ'তে ষ্টেশনের দিকে চল্লাম। উদ্দেশ্য কোন ভালো হোটেলের খোঁজ করতে পারি কিনা। ষ্টেশনে একটি ভদ্রলোক আমাকে দয়া ক'রে বললেন যে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল রেষ্ট হাউসে (Edward Memorial Rest House) আমরা চেষ্টা করতে পারি। প্রত্যেক কামরার ভাড়া দৈনিক দু'টাকা। বিজলী আলো ও বাথরুমের বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু মুসলমান সবাই থাকতে পারে। তবে খাওয়ার ব্যবস্থা আলাদা। ভদ্র লোকটীকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি সঙ্গীদ্বয়ের কাছে ফিরে এলাম এবং পরামর্শ করে ওখানে যাওয়াই ঠিক হলো।

কুলীর মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে আমরা চল্লাম এডওয়ার্ড মেমোরিয়ালের দিকে। ষ্টেশনের নিকটেই ইহা অবস্থিত। দেখলাম আমাদের আগে আগে যুবক পাণ্ডাটী চললো। গেটের সামনে প্রবেশ করে সোজা অফিসের দরজায় গিয়ে উঠলাম। দেখি ভিতরে একজন মারওয়াড়ী অফিসার। পাণ্ডা যুবকও ঢুকলো। সে উক্ত কর্ম্মচারীকে কি যেন বললো। আমরা এখানে থাকতে চাই এই অনুরোধ জানালেম। কথা ইংরেজীতে বল্লাম। কিন্তু সে জবাব দিলো হিন্দীতে। বললো জায়গা নেই। আমরা নিরুপায় হ'য়ে ভাড়া ডবল দিতে চাইলেম। কর্ম্মচারী বললে কোনও কামরা খালি নেই।

অগত্যা আমরা ফিরে আবার ষ্টেশনে এলাম। যুবক পাণ্ডাটিও আমাদের সাথে ফিরে এলো।

জিনিসপত্র সঙ্গীদ্বয়ের হেফাজতে রেখে আমি বেরিয়ে পড়লাম। একান্ত অপরিচিত স্থান হ'লেও ভেবে দেখ্‌লাম চেষ্টার অসাধ্য কোনও কাজ নেই।

এড্‌ওয়ার্ড মেমরিয়ালে আবার এলাম। কর্মচারীটিকে সব কথা বুঝিয়ে বললাম। সে দুঃখিত হ'য়ে বললো যাত্রীর এতো ভিড় যে কোথাও একটু স্থান নেই যে আপনাদের তথায় রাখতে পারি।

গেটের সামনে দক্ষিণদিকে একটু পার্কের মতো জায়গা। দেখি তথায় বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট হ'য়ে একটী যুবক বই পড়ছে। আমি সোজা তার নিকটে গেলাম। বইখানি হিন্দী নভেল। আলাপ করতে করতে বইখানির দুএক পাতা উলটিয়ে দুএক স্থান পড়তে লাগলাম। আমি নিজের পরিচয়ও দিলাম। হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা, উর্দু প্রভৃতি অনেক ভাষা জানি; সে আমার প্রতি কি জানি অল্প সময়ের আলাপের মধ্যে শ্রদ্ধাবান হ'যে উঠলো। আমি ভাবলেম এর দ্বারা আমার কাজ হাসিল করতে হবে।

এর নাম রামগোপাল। আজমীরের বাসিন্দা। পূর্ব্বে কংগ্রেসের পাণ্ডাগিরি করতো, এখন প্রাইভেট টিউসনি করে দিন কাটায়। সেও এখানকার পাণ্ডাদের জুলুমের কথা বল্লে। যা-হ'ক সে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। মুসলমান হোটেল নাই বললেই চলে। সে ক'টী মাড়ওয়ারী হোটেলে নিয়ে গেল। দেখি প্রত্যেক হোটেলেই যাত্রীর ভিড়। যে কামরাগুলি খালি তার ভাড়া অত্যধিক এবং বাসেরও তেমন উপযোগী নয়।

হোটেলওয়ালার প্রতি সে যেমন বিরক্ত হ'লো তেমি আমার প্রতি আরো সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠলো। সে যেন অপরাধীরই মতো বললো আপনাকে অনর্থক হয়রান করলাম। যাহ'ক আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি যেখানে টিউসনি করি সেখানে আপনাকে নিয়ে যাই, দেখি একটা উপায় করতে পারি কিনা।

আমরা যেখানে গেলাম সেটা একটা মস্ত বড় দোকান। মালিক মুসলমান। রামগোপাল এখানেই টিউসনি করে। তার বড় আশা ছিল আমরা মুসলমান এরাও মুসলমান, সুতরাং আমাদের একটা উপায় নিশ্চয় ক'রে দেবে। কিন্তু মালিকের সাথে আলাপ ক'রে বুঝলাম, তার মত অন্যরূপ। বাঙ্গালী বাঙ্গালীই—সে মুসলমান হ'ক বা হিন্দু হ'ব। আমাদের কুলশীল অজ্ঞাত; তদুপরি বাঙ্গালী বোমাপিস্তলের জাত, এদের এক কথায় কি বিশ্বাস করা যায়। নিজের পরিচয়ও এদের কাছে দিতে ঘৃণা হলো। আমি উঠে পড়লাম। বিপদ হলো রামগোপালের। সে যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো। শেষটায় মালিক আমার কাছে ক্ষমা চাইলে এবং একটী ছোকরা—নাম আবদুর রেজাক—রামগোপালের বোধ হয় ছাত্র—আমাদের সাথে দিলো। উদ্দেশ্য তাদের আশ্রিত একটী সাহেবের হোটেল আছে, সেখানে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দেবে। রাগ হলেও তাদের সাথে রওনা হলাম।

পাহাড়ের পাদমূলে একটী ছোট হোটেল। সেখানেও মাত্র একটী কামরা খালি আছে। রামগোপাল ও তার ছাত্রের চেষ্টায় এখানে থাকবার ঠিক হলো। একটী মেম—বোধ-হয় পরিচারিকা—যৌবনের জৌলসের সূর্য্য তখনও অস্তমিত হয়নি—হেসে বল্লে, 'এ কামরাটী আগে হ'তে ভাড়া হয়েছিলো। সে ভাড়াটিয়া এখনই এসে পড়বে এইমাত্র জানিয়ে দিয়েছে। তবে আমাদের আর একটী নতুন হোটেল আছে, সেখানে আপনারা যেতে পারেন এবং আমি সব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে দেবো। তবে ভাড় কিছু বেশী লাগবে।'

বাহক সেখানে আমরা গেলাম। দেখি ভাল কামরাগুলি নিজামের কোন দেওয়ান অধিকার ক'রে আছে। এখানে একটী কামরা ঠিক করে বাথরুমের জল ইত্যাদি বন্দোবস্ত করতে বলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার সঙ্গিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ত্বরিতপদে ষ্টেশনের দিকে চল্‌লাম।

আমার সঙ্গিদ্বয় যে আমার এই দেরীর জন্য বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না। আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। এই অপরিচিত স্থানে একাকী বেরিয়ে পড়েছি এবং দেড় ঘণ্টার উপরও যখন আমি ফিরে এলাম না তখন এদের আশঙ্কা হয়েছে আমি নিশ্চয় কোন গুণ্ডার হাতে পড়েছি। আমাকে দেখে এরা খুশী হয়ে উঠলো, এবং আমার কথা শুনে বললো হোটেলে আর তাদের যাবার ইচ্ছে নেই।

তাঁরা এখানে সেই পাণ্ডা যুবকের আশ্রয়ে উঠবে ইহাই ঠিক করেছে। যুবকটি তখনও এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। এদের হাত করবার জন্যে নোয়াখালীর একটি যুবককে এনে হাজির করেছে। নোয়াখালীর যুবকটি এখানে মাদ্রাসায় পড়ে। কাজেই এই বাঙ্গালি ছাত্রটির সুপারিস উপেক্ষা ক'রে অন্যত্র যাবার ইচ্ছা আর কারো হলো না।

প্রত্যেক বৎসর মুসলমানী মাসের ১লা হইতে ৬ই রজ্জব পর্য্যন্ত খাজা হজরত মইন উদ্দীন চিশতি সাহেবের পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে উরস হয়ে থাকে। শুক্রবারেই লোক সমাগম হয় সব চেয়ে বেশী।

খাজা মইন উদ্দীন ৫৬১ হিঃ ১০ই মহরম আজমীরে পদার্পণ করেন। কথিত আছে তিনি প্রথমতঃ আজমীর সহরের বাইরে এক বটগাছের তলে এসে বসেন। এখানে রাজা পৃথ্বীরাজের উষ্ট্রশালা ছিল। উষ্ট্রচালকেরা খাজা সাহেবকে এখান হ'তে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাঁর চলে যাওয়ার পর উট সকল যেমন বসে ছিল তেমি রসে থাকলো, কিছুতেই উঠলো না। এ সংবাদ অল্পক্ষণেই সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হয়ে এক বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। তারপর খাজা সাহেবের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কাছে কি ক'রে তৎকালে হিন্দু শক্তির পরাজয় ঘটেছিল তা ঐতিহাসিক মাত্র জ্ঞাত আছেন। সে সবের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ফলতঃ খাজা মইন উদ্দীন সাহেবের সাধনা সিদ্ধি ও তপঃপ্রভাবের অসীম ক্ষমতার কথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছিল। কত সাধক ও বিদ্বান তাঁর পবিত্র পাদমূলে ব'সে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতেন, কত রাজা বাদশাহ তাঁর কণামাত্র অনুগ্রহলাভের প্রয়াস পেতেন, কত লোক নিজের জীবনের সফলতার জন্যে তাঁর কাছে অনবরত যুরাফেরা করতেন।

৬৩৩ হিজরীর ৬ই রজব সোমবার তাপসশ্রেষ্ঠ খাজা সাহেবের পুণ্যময় জীবনের অবসান হয়। এই সময় দিল্লির সম্রাট ছিলেন সামস্ উদ্দীন আলতামাস।

তিরোধানের পরও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব লুপ্ত হয়নি। কত লোক কত প্রকারের মানত নিয়ে 'খাজা বাবার' দরগাহ শরিফে হাজির হয়। এখানে সবাই 'খাজা বাবা' ব'লে হজরত মইন উদ্দিনকে অভিহিত করে। যাহক এই খাজা বাবার আধ্যাত্মিক শক্তির স্মৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন বড় বড় সম্রাটগণও।

খাজা বাবার সমাধিসৌধের তোরণদ্বার নির্ম্মিত আওরংজীব বাদশাহ কর্ত্তৃক। তোরণদ্বারের পরেই নহবতখানা। নহবতখানাব প্রকাণ্ড দুটী নাকারা বাদসাহ আকবর উপহার দিয়েছেন। এর পর 'বলন্দ দরওয়াজা' বা উচ্চ দ্বারপথ। এখানে পিতলের পেটা ঘড়ি আছে। ইহাও আকবর বাদসাহ দিয়েছেন। দরগাহ শরীফের শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত মসজিদ সম্রাট সাহজাহানের কীর্ত্তি।

সমাধিসৌধের গম্বুজের ছোট ও বড় কলসগুলি স্বর্ণ-নির্ম্মিত। রামপুরের নবাব সাহেব একশ পঁচিশ মন সোনা দিয়ে গম্বুজ মুড়ে দিয়েছেন। সৌধের দেওয়াল সবুজ বর্ণে রঞ্জিত। চারিদিকে সোনার রেলিং।

মুসলমানের মতো হিন্দুগণও এই সমাধিসৌধকে সম্মান ক'রে থাকেন। জয়পুর, যোধপুর, বরোদা, গাইকওয়াড় প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গ বহুমূল্য উপহার দিয়ে এই সমাধিসৌধকে ভূষিত করেছেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর পুস্তকে লিখেছেন যে, ১০২৫ হিঃ তে হজরত খাজা সাহেবের কৃপায় তাঁর কতক মনোরথ সিদ্ধ হয়। এর প্রতিদানে তিনি সমাধির জন্যে স্বর্ণ গোল্ক প্রস্তুত করিয়ে দেন। এর দাম এক লাখ দশ হাজার টাকা।

যা হক এই পুণ্যময় স্থানে এসে থাকবার বিড়ম্বনাতে আমরা সত্যি সত্যিই বিব্রত হয়ে পড়লাম।

পাণ্ডা যুবকটির গৃহের তেতালার একটি ছোট অপরিচ্ছন্ন কুঠরীতে আমাদের স্থান হলো। জায়গাটি কারো মনঃপূত হলো না। কিন্তু সামনে তাকিয়ে স্ত্রীলোকদের যে দৃশ্য দেখলাম তাতে সবার মনে কেবল অপরিসীম ধিক্কার এলো না, ভয়ও হলো। শুনলাম ওরা নর্ত্তকী, বারবনিতা শ্রেণী—রাত্রে কাওয়ালী গাবে।

আমাদের গৃহের পাশেই ওদের আশ্রয়। মনটা অসন্তোবিক্ষেপে দমে গেলো।

নামাজের আর বেশি দেরী নেই। এই পবিত্র 'হজ্বে হিন্দুস্থানে' যোগ দিতেই হবে, এই মনে করে তাড়াতাড়ি

স্নান ও আহার শেষ করে খাদেম সাহেবের সাথে চল্লাম দরগাহ সরিফের দিকে।

অপরিসর গলি দিয়ে পথ। তদুপরি ভিড়। আবার গলির দু'ধারে ফুলের দোকান। যাহক কোন প্রকারে ভিড় ঠেলে গেটে জুতা খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতবে যে দৃশ্য দেখলাম তা' বর্ণনাতীত।

লোকে লোকারণ্য। তিলার্দ্ধ স্থান নেই। দেওয়ালে, প্রাচীরে, ছাদে, পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য লোক। তীব্র রোদে সবাই বসে আছে। একধারে মেয়েদেরও জায়গা ক'রে দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের সাথে তারাও নামাজ পড়বে।

একটী বারান্দার এক কোণে আমরা অতিকষ্টে স্থান ক'রে নিলাম। নামাজ আরম্ভের পূর্ব্বে স্থললিত কণ্ঠে গজল গেয়ে দু'এক দল স্কুল মাদ্রাসার সাহায্যের জন্যে চাঁদা আদায় করে নিলো। পুরুষদের কাছে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে এরা মেয়ে মহলেই বেশী ঘোরাফেরা করতে লাগলো। এরপব খোতবা পড়া অন্তে ঘন্টা ধ্বনির সাথে যথারীতি নমাজ শুরু হলো।

নামাজের পূর্ব্বে গরম হয়েছিলো একেবারে অসহনীয়। দু'চার জন ফিটও হয়েছিলো এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের শুশ্রূষার ভার নিয়েছিলো। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের ভেতর উপযুক্ত শিক্ষা, কার্য্যতৎপরতা ও এক জোটের অভাব লক্ষ্য করলাম।

নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব দৃশ্য দেখলাম। ভিড় ঠেলে বাইরে আসা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে উঠলো। কিন্তু এই অসম্ভব ভিড়ের ভিতর দিয়ে দলে দলে লোক আবার প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকতে লাগলো। কারো হাতে করতাল, কারো হাতে ঢোল, কারো হাতে হারমনিয়ম। এরা বাদ্যযন্ত্র সংযোগে মধুরস্বরে গান গাইবে খাজাবাবার সমাধিসৌধে। সমাধি বা মসজিদের কাছে এরূপ সঙ্গীত হ'বে আমরা শুনে আশ্চর্য্য হলেম এবং কৌতুহলী হ'য়ে সমাধির দিকে অগ্রসর হলাম।

খাজা সাহেব নাকি সবাদ্য সামৌ অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন। এইজন্যই হয়ত এই 'কাওয়ালীর' আয়োজন। নামাজের সময় ব্যতীত রাত্রিদিন এখানে এরূপ সঙ্গীত হয়ে থাকে। এই সঙ্গীত কীর্ত্তনের মতো বোধ হলো। গায়ক এতো বিভোর ও ভাবাক্রান্ত হয়ে পড়েন যে বাহ্য জগৎ যেন তাঁর কাছে বিলুপ্ত হয়।

যাহক আমাদের কানে যেন অমৃত ঢেলে দিচ্ছিলো এই কাওয়ালী। কিন্তু এরূপ সঙ্গীত শুনতে অনভ্যস্ত আমরা—আমাদের কাছে এই পবিত্র সমাধিসৌধে ও মসজিদের কাছে ইহা যেন মনের ভেতর একটা তুমুল বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে দিচ্ছিলো।

কবর জেয়ারৎ (দর্শন) করবার পূর্ব্বে মোলাকাৎ করতে হলো প্রধান খাদেমের সাথে। তিন টাকা নজরানা দিলেও তিনি খুসী হ'লেন না বরং রুষ্ট হয়ে বললেন—বাঙ্গালী আদমীরা এমনি ক'রে থাকে, অর্থাৎ অল্প দিয়ে থাকে। আমি বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম। সঙ্গীদ্বয়কেও আমার পিছনে আসতে বল্লাম।

কবর জেয়ারৎ ক'রে আমি বাইরে এসে দেখি সঙ্গিদ্বয় কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়েছে। কিছুক্ষণ ধরে এদিক ওদিক ঘুরে কাওয়ালী শুনে আবার ওদের খোঁজ করতে লাগলাম। এবার দেখি ওরা অন্য এক খাদেমের কাছে উপবিষ্ট।

কতকক্ষণ পরে বাইরে এলে শুনলাম আরো দুটাকা দিয়ে মোট পাঁচ টাকা দর্শনীতে রক্ষা করতে হয়েছে।

এই পবিত্র স্থানের মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে মনপ্রাণ ভরে গিয়েছিলো। খাজা সাহেবের আধ্যাত্মিকতার কাছে হিন্দু মুসলমান সবার মস্তক আপনা হ'তে অবনত হয়ে পড়ে। আমাদের হৃদয়ও অসীম শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

কিন্তু এসব রীতি ও আচারের বহর আমাদের মনকে খুব পীড়া দিলো।

আমরা তাড়াতাড়ি বাসায় এসে পড়লাম।

আবার সেই দৃশ্য। বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটী যুবতী। এরা কাওয়ালী গাবে রাত্রে—বিজলী আলোয় প্লাবিত প্রাঙ্গণে। মিষ্টার ইসলাম উত্তেজিত হয়ে নীচে ছুটলো গাড়ী ও কুলী ডাকতে।

অসীম আকাশের বুকে রৌদ্রস্নাত পাহাড়ের চূড়ার যে ক্ষুদ্র অংশ জানালার ফাঁক দিয়ে নয়নপথে পড়ে, তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভাবলাম আজকার সকাল এখানকার পুণ্যময় স্মৃতির ভেতর কতো বিড়ম্বনাই না মিশিয়ে দিলো।

মোবারক আলি

অলক

শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী

ভরিল বৃদ্ধ তরুর
শুকনো ডালে ফুল কলিতে!
কে এলে হাস্যমধুর
আস্যে মম মন ছলিতে?
অলকার ঝরকা খুলে
কে এলে মর্ত্যে ভুলে,
যে মুরজ রাখনু তুলে
আবার তাহে বোল বলিতে?
আকাশে শ্যাম অলকে
গোলাপী রং ঝলকে,
কে রবি এক পলকে
ফাগ উড়ালে মোর বাগানে?
লালে লাল লাগল দিশা,
চোখেতে লাগল নেশা,
না-মেটা অনেক তৃষা
মিলালো আজ কোন্ বা গানে?
অলকানন্দা বেয়ে
একি বান্ এলো ধেয়ে,
আলোকের পরশ পেয়ে
লাগল প্রাণে বেগ চলিতে!
ভরিল বৃদ্ধ তরুর
শুকনো ডালে ফুল কলিতে!
অরুণের জাগান্-ডাকে
তরুণের তড়িৎ লাগে,
করুণের ঘূর্ণিপাকে
উঠলো বনে কোন্ কাকলী!

হারানো কোন সে বাণী
কুড়ানো রতন খানি
কে আবার দিল আনি
ইন্দ্রথের স্থুর মাতলি?

এখনো গানের লয়ে
যাব কি দিগ্বিজয়ে?
এখনো ছন্দ হয়ে
নাচবে রুধির ধমনীতে?
ভরিল বৃদ্ধ তরুর
শুকনো ডালে ফুল কলিতে!

অলকাপুরীর মণি,
আমাদের কাঙাল গণি,
নামিলে করি' ধনী
মানব হিয়ার পূর্ণতাতে!

মিটে যাক ক্ষুদ্রতা-সে
তোমার ও বিমল হাসে,
বিকাশের ধীর বাতাসে
লাগুক পুরা দোল্ লতাতে!

নীলিমার অলক তুমি
এসেছ গোলোক চুমি,
এ সাধের আশার ভূমি
তৃপ্ত কর স্বর ললিতে!
ভরিল বৃদ্ধ তরুর
শুকনো ডালে ফুল কলিতে।

গল্প

শ্রীমতী রমলা দেবী

১

বেহারের একটা যায়গা। সেদিন বেহুলা পূজায় সেখানে বেজায় ধূম লেগে গেছে।

মঞ্জরীর বাড়ীর চাকর-বাকররা ছুটী নিয়ে গিয়েছিল মেলা দেখতে। তিনটের সময় মঞ্জরী বাড়ীর ভেতরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলে কোন চাকরই মেলা হ'তে ফেরেনি।

সাড়ে চারটার গাড়ীতে তার স্বামীর টুর থেকে ফেরার সম্ভাবনা আছে, অথচ খাবার ইত্যাদি কিছুই তৈরী নেই—; মঞ্জরীর মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল……।

ষ্টোভ জেলে কয়েকটা আলু সিদ্ধ করতে দিয়ে এসে সে দেখলো মালী তখনকার ডাক রেখে গেছে।…ডাক দেখতে গেলে ওধারে কাজের দেরী হয়ে যায়…অথচ ডাক না দেখেই বা যায় কি করে।

তার বিরক্তির মাত্রা বেড়েই গেল। এমন সময় দেখা গেল তার চাকররাই সন্তর্পণে বাড়ীর ভিতর ঢুকছে। মঞ্জরী বাইরে এসে তাদের যথাযোগ্য বকুনী ও কাজের উপদেশ দিয়ে চলে এলো ডাক দেখতে।

দুটো মাত্র চিঠি—আর একটা পার্শেল।…পার্শেলটা বইএর—পাশে লেখা—ফ্রম সুমিতা রায়, ভিলে পার্লে—

বই এসেছে দেখে অবশ্য তার আনন্দই হল এবং আগে সেইটা খুলে ফেললো। রবিবারের টাইম্‌সের একটা ছবিওয়ালা পাতায় বইটা মোড়া…। মোড়াটা একটু খুলেই দেখতে পেলো বইটার নাম "অমিতার প্রেম"।

নাম দেখে তো সে রেগেই অস্থির…। পড়া বইটা কি বলে সুমিতা পাঠালো! তার বইটার প্রতি যদি এতই প্রীতি জন্মে থাকে যে, মঞ্জরীকে না পড়িয়ে তৃপ্তি পাচ্ছিল না—তাহলে একবার লিখে জানলেই তো হোত যে, বইটা তার পড়া কি না।

বিরক্তির ওপর বিরক্তি জমে মনটা তার গেলো খিঁচ্‌ড়ে।…

ছবিওয়ালা মলাটশুদ্ধ বইটা টেবলের ওপর ধপ্‌ করে ফেলে দিতেই একটা চিঠি ঠিক্‌রে বেরিয়ে এলো। মঞ্জরী তখন চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়বার জন্য একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

২

অনেক কথাই সুমিতা লিখেছে…প্রশ্নও করেছে অনেক। মঞ্জরীর নতুন বিবাহিত জীবনের কাল্পনিক ছবি এঁকে সুমিতা যে কত আনন্দ পাচ্ছে তারই বর্ণনা—আবার মঞ্জরীর স্বামী এই সময়েই টুর করতে গিয়েছে জেনে দুঃখও করেছে অনেক: 'বস্‌'এর একটুও বুদ্ধি বিবেচনা নেই—আর কটা মাস পরেই না হয় টুর-প্রোগ্রাম করত। তারপর তাদের ভিলে পার্লে যাবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছে যে, তারা ওখানে পৌঁছলেই সবাই মিলে বম্বে প্রেসিডেন্সীটা চ'ষে বেড়াবে; কোন যায়গা বাকী রাখবে না…অজন্তা ইলোরা সব ..।—শেষে লিখেছে—

"অমিতার প্রেম" বইটা পড়ে আর একটু হলে সে মাথা ঘুরে পড়েই যেতো…হাতের কাছে জল ও মাথার ওপর পাখা ছিল তাই কোন রকমে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছে…মঞ্জরী যেন সাবধানে পড়ে; এবং যদি শেষ পর্য্যন্ত পড়ার ধৈর্য্য তার থাকে তো মতামতটা যেন সুমিতাকে জানায়।…সুমিতার মতে অমিতার মনোভাবের তুলনা হয় না…লিখেছে 'ভাই আমার বিদ্যে বুদ্ধিতে তো পনেরো বছরের অমিতার মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হল না, তুমি যদি সাহায্য করতে পার তাই বইটা পাঠালাম।…তারপর নিজের কথা একটু আধটু লিখে মঙ্গল কামনা জানিয়ে ইতি করেছে।

৩

চিঠি পড়তে পড়তেই মঞ্জরীর মন থেকে বিরক্তির ভাবটা আপনা হতে খসে পড়ছিল—চিঠিটা শেষ করে সে দেখলো বিরক্তির বদলে মনটা তার খুসীতেই ভরে গেছে।…কারই বা বিরক্তি থাকে এমন চিঠি পড়ে।…তারই কি কম রাগ হয় 'বস্'এর তার এখনই যত রাজ্যের টুর ফেলায়! আর সেই রাগের সহানুভূতি পেলে কার না ভাল লাগে।

* * *

চিঠি শেষ করে মঞ্জরী দেখলো চারটে বেজে গেছে।… সে তখন তাড়াতাড়ি উঠে গেল দেখতে চাকরদের কীর্ত্তি কলাপ।…তাদের কাজ দেখে মঞ্জরী নিজে কয়েকটা ডিম নিয়ে ফেঁটাতে সুরু করল—ইচ্ছে স্বামী এলে গরম গরম ভেজে নেবে।

৪

মঞ্জরীর জীবন সম্বন্ধে বা সুমিতার জীবন সম্বন্ধে আলাদা করে আরও কিছু না বললেও চলে,…সুমিতার চিঠিতে যেটুকু জানা গেল এবং মঞ্জরী যে তার উত্তর দিবে তাতে যেটুকু জানা যাবে—তা-ই যথেষ্ট। বিশেষ করে সুমিতা যখন "অমিতার প্রেম" সম্বন্ধেই জানতে চেয়েছে, তখন সেটুকু বলেই বরং এ কাহিনী শেষ করা ভাল।—কাজেই ডিম ফেঁটাতে ফেঁটাতে সুমিতার চিঠির উত্তর সম্বন্ধে মঞ্জরী কি ভাবছিল সেটাই বলা যাক—

মঞ্জরী ভাবলো—"অমিতার প্রেম"-এর তো কত সমালোচনাই বেরোল' তারপরেও এতদিন পরে সুমিতা কেন যে এত মাথা ঘামাচ্ছে কে জানে…তার থেকে বরং আর একটা সত্যিকারের ভাল বই পড়তে পারতো।

অবশ্য সে-ও একবার মাথা ঘামিয়েছিল, এবং একদিন তাদের বন্ধু-বান্ধবদের চা-এ ডেকে "অমিতার প্রেম" সম্বন্ধে কথাও উঠেওছিল। তাতে কয়েকজন বিশেষ পড়াশোনাওয়ালা বন্ধু বান্ধবদের টুকরো সমালোচনায় চাচক্রটা খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

মঞ্জরী ভাবলো সেদিনকার চা-চক্রে যে দুচার কথার সমালোচনা হয়েছিল সুমিতাকে তার খানিকটা জানালেই যথেষ্ট হবে।

৫

সাড়ে চারটার গাড়ীতে মঞ্জরীর স্বামী তার এক চাপরাশীর হাতে লিখে জানালে যে, সে যা ভয় করেছিল তাই হয়েছে; কাজ কোনমতেই শেষ হলনা…আর দুঃখও করেছে এই বলে যে কাজ তার ৬ টার মধ্যে নিশ্চয়ই শেষ হবে… কিন্তু তারপর ফেরার কোন ট্রেণ নেই বলেই পরদিন সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য হবে—অথচ কতই বা দূর।

মঞ্জরী বেচারী কি আর করে—খানিকটা এধার ওধার ঘুরে সুমিতাকে চিঠি লিখতে বসলো।

লিখলো—সুমি, তোমার বই তার বিচিত্র চিত্রে ভরা আবরণের মধ্যে তোমার চিঠিখানি লুকিয়ে নিয়ে আমার কাছে যথা সময়ে উপস্থিত হয়েছে।

পার্শেল দেখে,—বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে আসছে দেখে—আমার খুব আনন্দই হয়েছিল সত্যি, কিন্তু বইটিকে তার ঘোমটামুক্ত করে নামটা জানার পর তোমার ওপর আমার মনোভাব যে কি রকম হল—তা আর সবিশেষ বর্ণনা করে কাজ নেই।

আচ্ছা, তুমি এত অধৈর্য্য হয়েছ কবে থেকে? বলা নেই কওয়া নেই একেবারে সোজা বইটা পাঠিয়ে বসলে? একবার লিখে জানলেই তো হোত…বইটা আমার পড়া কিনা?…যাক যখন পাঠিয়ে দিয়েইছ তখন আর কিছু বলে লাভ নেই।

বইটা আমি আগেই পড়েছিলাম এবং আমিও অমিতার অতুলনীয় প্রেমের দিশে খুঁজে না পেয়ে আমাদের এক চা-চক্রে এ বিষয়ে কথাও উঠিয়েছিলাম।

তাতে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবদের মতামত সত্যি খুব উপভোগ্য হয়েছিল—তোমায় তারই কিছু জানাব মনে করেছি।

চা-চক্রের আমরা সবাই লেখিকার ভাষার দখল সম্বন্ধে একমত হয়েছিলাম এবং তাঁর লেখার ষ্টাইলেরও তারিফই করেছিলাম…। শুধু গোল বাধালো ঐ বিষয় বস্তুটা—

অত জ্ঞানীগুণী মেয়ে অমিতা—যে না কি মনস্তত্ব নিয়ে মাথা ঘামায়—সে যে কি করে নিজের মনোভাব সম্বন্ধে অতটা অজ্ঞ হতে পারে তা আমাদের কারুর বোধগম্য হয়নি।—তা

ছাড়া পঞ্চদশী, সুন্দরী, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী মেয়েটার দেহ সম্বন্ধে খুব বেশী চেতনা দেখা যায়—(১৮-১৯ পাতা) অথচ মন সম্বন্ধে অতটা অচেতন থাকা আবার তারই পক্ষে যে কি করে সম্ভব হতে পারে তাও তো ধাঁধার মতই লাগে—···তাও যদি বা তিনি অন্তঃসারশূন্যা বা অগভীর-চিন্তা হতেন···তাহলেও চুপ করে মেনে নেওয়া যেতে পারতো কিন্তু অমিতার মনোভাব বই-এ যতদূর বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে তো এরকম কিছু মনে হতেই পারেনা।—

তারপর কি হল শোন—একজন বন্ধু পাশের ঘর থেকে "অমিতার প্রেম" বইটা আনিয়ে নিয়ে একটা পাতা খুলে পড়লেন—অমিতা, আমার গোঁফ গজায়না কেন? কী মুস্কিল। এবার আমি একটা সালসা খাব। তুমি বাৎলিয়ে দাওনা কী করা উচিৎ।"···তারই শেষে—"দিনে দুবার আর রাত্রি বেলায় একবার করে পানামা ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামাই—তাড়াতাড়ি গজাবে বলে। আচ্ছা সত্যি করে বল জুলপি রেখে আমায় কেমন দেখায়?" বন্ধুবর পড়তে পড়তে একটু যেন উত্তেজিতই হয়ে উঠলেন—বললেন, "এরকম কথা কোন ছেলে তার প্রিয়া বা কোন মেয়ের কাছে বলতে পারে—ভেবেছেন? আমি জোর নিয়েই বলছি যত অন্তরঙ্গতাই থাকুক না কেন কেউ ওভাবে বলতে পারে না—।"

একজন বান্ধবী বললেন—"কেন, এত কি দোষ দেখলেন এতে?"···তার উত্তরে তিনি বললেন—"দোষ কিছু বিশেষ না থাকতে পারে—কিন্তু ওভাবে বলতে ডিসেন্সিতে নিশ্চয়ই বাধে।"

আর একজন বন্ধুবর বললেন তাঁর প্রিয় লেখকদের মধ্যে ব্রাউনিং মেরিডিথকে উঁচু স্থান দেন। হেনরী জেম্‌স্‌এও আপত্তি নেই। মালার্মে'ও ঠুকরেছেন। কিন্তু এই পঞ্চদশ-বর্ষীয়া অমিতা—যিনি ওয়ার্লড্‌ অব উইলিয়াম ক্লিসোল্ড পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট, আইন্‌ষ্টেন ও রাসেল সম্বন্ধে থার্ডইয়ার বি এস সির এক ছাত্র প্রণয়ীকে তথ্যপূর্ণ চিঠি লেখেন; ক্লাসিকাল সঙ্গীতের গমকে ওস্তাদদেরও ধমক দেন; ফ্রেঞ্চ-এ অ্যামেচার টিউসনী দান করেন এবং সময়মত ইন্‌টেলেক্ট ভুলে কচুরীর পুরও ঠাসেন; আবার বৃষ্টিতে অযথা ভিজে, চুলে জড়িয়ে প্রণয়ীর চশমার সর্বনাশ করেন ও ভীষণ রেগে লোক বিশেষের কাঁধে মুখ লুকিয়ে হাপুস নয়নে অশ্রু বর্ষণ করেন—এ হেন অমিতা—তাঁকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।···তিনি শেষে আরও বলেছিলেন গ্রন্থকর্ত্রী এক যায়গায় লিখেছেন "সুবার্ট" সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সাথে নেচে দেহের উত্তাপ বজায় রাখতেন।—আমি এই 'সুবার্টটিকে' অবশ্য বুঝতে পারছি না; তবে তিনি যদি সঙ্গীতকার Schubert (যাকে সুবেয়ার সাধারণতঃ বলা হয়) হন, তা হলে বলছি যে তাঁর প্রধান জীবনী-লেখক Heinrich Von Hellborn Kreisle (Translated by Arthur Duke Coleridge M. A. Longmans 1969) বলছেন যে সুবেয়ার কখনও বিয়েই করেননি।"

আমরা সবাই একসাথে বলে উঠলাম "কিন্তু আপনি কি বেশ সিওর হয়েই বলছেন?"

তিনি বললেন···"আপনাদের বিশ্বাস না হয় আমি বইটা বাড়ী গিয়ে পাঠিয়ে দেব—পড়ে দেখবেন।"

বইটা এখনও আমার কাছে আছে, তোমায় খানিকটা তার থেকে উঠিয়ে দিলাম—

"Schubert very often made himself merry at the expense of any friends of his who fell in love. He too was by no means proof against the tender passion, but never seriously compromised himself.

Nothing is known of any lasting passion and he seems never to have thought seriously about matrimony; but he certainly coquetted with love, and was no stranger to the deeper and better affection."

···আর বেশী কিছু এ বই সম্বন্ধে না লিখলে, আশা করি তুমি ক্ষুণ্ন হবে না। আর, ভবিষ্যতে এরকম ধপ করে বই পাঠিয়ে বোসনা যেন। তুমি অনেক দূরে থাকো বাংলা বই টই চট্‌ করে পাও না—তাই বলে আমাকেও সেই দলে ফেলছ কেন? জান না বোধ হয়—এই লেখিকার আরও অনেক বই বেরিয়েছে এবং এই বইএর সমালোচনাও অনেক

বেরিয়েছে—এখন নতুন করে 'অমিতার প্রেম' এর সমালোচনা না করে বরং অন্য বই গুলোরই করার কথা—···তবে অন্য বইগুলো পড়লেও প্রায় এই একই রকম অসোয়াস্তি হয়—বিষয়বস্তুই গোলমাল বাধায়—আর কিছু না।—

যাক- এবার একটা সুখবর দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করি—

খবরটা কি জান:···তোমার নিমন্ত্রন রক্ষা করতে ও তোমাদের সাথে দেশ পর্য্যটনে যোগ দিতে আমরা শীঘ্রই যাত্রা করছি:··সে যাত্রার দিনক্ষণ পরের ডাকে পাবে। আজ আপাততঃ ইতি

মঞ্জরী

৬

চিঠি শেষ করে মঞ্জরী একটা বড় দেখে খাম নিয়ে তাতে ঠিকানা লেখা শেষ করেছে...এমন সময় বাইরে একটা মোটর বাইকের আওয়াজ পেলে।

সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখল- তার স্বামী কাকে জানি বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌ছে।

···মঞ্জরী দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই তার স্বামী বলে উঠলো, "জান কি হল···কাজ শেষ করে বসে ভাবছি যে রেল-কোম্পানী যদি আর একটা গাড়ী রাত্রেও দিত তাহলে তার এমনই কি ক্ষতি হোত—।

···এমন সময় আকাশ বাতাস মাতিয়ে ফ্যাট ফ্যাট করে গর্জ্জন করতে করতে মিঃ রাও এসে হাজির।

তারপর আমার অবস্থা সবিশেষ অবগত হয়ে আমায় সোজা পিলিয়নটা দেখিয়ে দিলে—আর আমিও দ্বিরুক্তি মাত্র না করে তাতে উঠে বসলাম···এবং তারপর এই তোমার কাছে এসে হাজির হলাম···।"

···মঞ্জরী তখন ভাবছিল···যাক আমার দিনটাও তাহলে মধুরেণ সমাপয়েৎ হল···।

রমলা দেবী

আজকে তুমি এলে এ কি বেশে ?

শ্রীহিরন্ময় দত্ত

আজকে তুমি এলে একি বেশে ?
যুগল পায়ে আলতা আঁকা কই ?
নয়ন কোণে সুর্ম্মা আঁকা নেই—
মালতী ফুল পরনিতো কেশে ?
এলে তুমি, আজকে একি বেশে ?
ওড়না কেন আজকে পরনি ?
কানে কেন অলক দোলেনি ?
ঠোঁঠের কোণে স্নিগ্ধ হাসি উঠছে না তো ভেসে,
একি তোমার নয়ন-কোণে জলে,
ব্যথার ছায়া উঠছে কেন ছলে ?
রঙীন ও ঠোঁট উঠছে ফুলে ফুলে
কোমল হিয়ায় কিসের ব্যথা ভাসে ?—

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাংলাভাষা ও বাঙ্গালী মুসলমান

বাংলাভাষা কতটা ঊর্দ্দুমুখী হইলে তাহা বাঙ্গালী মুসলমানদের গ্রহণীয় হইতে পারে এই প্রকার একটা প্রশ্ন আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্যের আসরে কতকটা সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। বাংলাভাষা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ গ্রহণীয় হইবে কি না প্রশ্নটা এই আকারেই কিছু দিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু, ব্যাপারটির অসম্ভবতা সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই সম্ভবতঃ নিশ্চিত হওয়ায় প্রশ্নটির রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

ব্যাপারটি প্রথম দৃষ্টিতে হাস্যকর ও অদ্ভুত বোধ হইলেও, ইহা আকস্মিক ও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাসের মধ্যেই ইহার মূল নিহিত আছে এবং সকল দিক দিয়া সমস্যাটিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব ও মূল্য দিয়া বিবেচনা করিবার উপরই ইহার ভবিষ্যৎ সুসমাধান নির্ভর করিতেছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালীর সৃষ্টি। বাঙ্গালী হিন্দুরাই প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছেন এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা এই শিক্ষা হইতে দূরে থাকিয়াছেন। ফলে ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দুরাই প্রধানতঃ ইহার স্রষ্টা হইয়াছেন এবং তাঁহাদের চিন্তা ও ভাবধারাতেই এই সাহিত্যের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহাদের জাগ্রত চিত্তের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী ইহাকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

মুসলমানেরা প্রথমত শিক্ষা হইতে দূরে ছিলেন। তাঁহারা যখন শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন তখন, হিন্দুরা অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। যে আত্মাভিমান তাঁহাদিগকে প্রথমে শিক্ষাবিমুখ করিয়াছিল, শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদিগকে অগ্রবর্ত্তী ও উন্নত দেখিয়া স্বভাবতঃ তাহা আরও দৃঢ় হইল এবং আত্মসঙ্কোচের সহায়তা করিল।

কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া সচ্ছন্দ চিত্তে নিজে নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকা মানবপ্রকৃতি বিরুদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে হিন্দুদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া মুসলমানেরা অনেকটা এইজন্য প্রথমে বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করিলেন এবং বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী মুসলমান লেখকের অভাব কোন সময় না ঘটিলেও, প্রথম পদক্ষেপে এই বাধা দ্বারা প্রতিহত না হইলে, বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান নিঃসন্দেহ আরও উচ্চ হইত।

বাংলাসাহিত্যের প্রতি মুসলমানের ঔদাসীন্যের অন্য একটী প্রধান কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে। বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ লেখক ও পাঠক ঘটনাচক্রে যদি হিন্দুই হইয়া থাকেন তবুও এই সাহিত্যের মুসলমান সম্পর্ক বর্জ্জিত হিন্দুসাহিত্য হইয়া উঠিবার কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত না। কিন্তু, আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিলেও পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য বিস্ময়কর। এই উভয় সমাজের মধ্যে সংযোগ এতটা ক্ষীণ যে, প্রত্যক্ষভাবে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হন না বলিলেও চলে। এইজন্য হিন্দুদের লিখিত সাহিত্য যেখানে মুসলমানবিরোধী হয় নাই, সেখানেও তাহা যে মুসলমান সমাজকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছে তাহা সত্যের খাতিরে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হুমায়ুন প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন :—"প্রায় হাজার বছর হ'ল হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি থেকেও আজও যেন পৃথিবীর দূরতম জাতির মত পরস্পরের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।...বাংলা সাহিত্যের কথা আমরা বলি, বাংলায় যে কথাসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল্য বা পরিমানও ত কম নয়, তবু একখানি বইয়ের নাম করতে পাবা যায় না যেখানে হিন্দু মুসলমানের জীবনের ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠেছে।...বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যপ্রতিভা স্বীকার ক'রেও মুসলমান কোন দিন 'আনন্দ-মঠ'কে আদর করতে পারবে না...। রবীন্দ্রনাথই হো'ন, শরৎচন্দ্রই হো'ন, সমস্ত বাংলাসাহিত্য প'ড়ে ফেলেও একবারও কি মনে হয় যে বাংলাদেশে মুসলমান ব'লে একটা সম্প্রদায় আছে এবং তারা সংখ্যায় প্রায় আড়াই কোটি? মুসলমান খানসামা আরদালী জোলা বা নৌকোর মাঝি সাহিত্যে পেতে পারো, কিন্তু বাংলাদেশে কি তাছাড়া মুসলমান নেই? বাংলাদেশের ভদ্রমুসলমান কি সাহিত্যিকদের চোখে পড়ে না?"

[কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত]

এ অভিযোগ হয় ত সত্য; কিন্তু ইহাতে হিন্দু সাহিত্যিকদের দোষ নাই। দোষ সেই সমাজব্যবস্থার, যাহার ফলে, হিন্দু সাহিত্যিকদের সহিত মুসলমান সমাজের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু, দোষ যাহারই হউক এই ঘটনার ফলে, বাঙ্গালী মুসলমানের মন বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিমুখ হইয়াছে—এবং সাহিত্যের প্রতি এই বিমুখতা ভাষা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ ভাষা ও সাহিত্য যে এক নহে এবং মুসলমান সাহিত্যিকেরা বাংলাভাষার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইলেই যে মাত্র সাহিত্যের এই ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারে, একথাটাও তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন।

বাংলাভাষার প্রতি মুসমানদের অনুরাগের অভাবের আরও একটা কারণ আছে। সাধারণ অবস্থায় ভাষা ভৌগলিক সীমার অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু, আমাদেব দেশ বহুবার বিদেশীর দ্বারা বিজিত হইয়াছে; বিভিন্ন ভাষাভাষী নানা জাতির লোক বহুবার বহু সংখ্যায় বিদেশ হইতে এখানে আসিয়াছে এবং প্রায় কেহই স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয় নাই। কাজেই, একই স্থানে একাধিক ভাষার প্রচলন এ দেশে আছে; পাশাপাশি বাস করিয়াও হিন্দু মুসলমান একভাষা ব্যবহার করেননা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এবং বলিতে গেলে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রায় সকলেরই ভাষা এখানে বাংলা। যদিও একথাটাকে পুরাপুরি স্বীকার করিয়া লইতে বাঙ্গালী মুসলমানের এক কারণে বাধিয়াছে। মুসলমানেরা এদেশে বিজেতারূপে আসেন, এজন্য তাঁহাদের দেশ শাসন করিবার ও এদেশবাসীর সংস্পর্শে আসিবার প্রয়োজন হয় এবং এদেশেরও বহুলোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এজন্য নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিলেও, ভাষা সম্বন্ধে এদেশবাসীর সঙ্গে তাঁহাদের সন্ধি করিতে হয়। এই সন্ধির ফল হইতেছে উর্দ্দূভাষা। মুসলমানেরা বিজেতা ছিলেন বলিয়া এদেশবাসী হইতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠতর, এ ধারণা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এদেশের যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন তাঁহারাও শ্রেষ্ঠতর, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং এদেশীয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক যে তাঁহারা নহেন একথা প্রমাণ করিবার জন্য এদেশীয়ত্বের সকল প্রকার ছাপ তাঁহারা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও হিন্দীভাষার সহিত সংস্পর্শের ফলেই উর্দ্দুর সৃষ্টি হইয়াছিল তবু উপরি উক্ত কারণে ভারতবর্ষের সকল স্থানের মুসলমানেরাই নিজেদের মাতৃভাষা অপেক্ষা উর্দ্দুকেই বেশী আপনার মনে করিতে লাগিলেন। এই ঢেউ বাংলায়ও আসিয়াছিল এবং নিজেদের মাতৃভাষা বর্জ্জন করিতে সমর্থ না হইলেও, বাঙ্গালী মুসলমানেরা উর্দ্দুর জন্য মনে মনে মমতা বরাবর পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

আমাদের রাষ্ট্রিক চেতনার উন্মেষ আজও ভালভাবে না হওয়ায় দেশ ও দেশবাসী অপেক্ষা আমরা ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মীকেই অধিকতর আপন মনে করিয়া থাকি এবং মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাবটা অপেক্ষাকৃত অধিক তীব্র। এই মনোভাবের ফলে হিন্দুদের সহিত যাহা একত্রে তাঁহাদেরও সম্পত্তি সেই বাংলাভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালী মুসলমানেরা যাহা আদৌ তাঁহাদের নহে অথচ যাহা কোন কোন স্থানের একমাত্র মুসলমানদেরই সম্পত্তি, সেই উর্দ্দুভাষাকে অধিকতর আপনার মনে করিয়াছেন এবং বাংলাকে কতকটা অপরিহার্য্য অবাঞ্ছনীয় জিনিসের মত দেখিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু, যখনই লোকের মধ্যে নূতন জাগরণ আসে নূতন

করিয়া উন্নতি ও অগ্রগতির ইচ্ছা জাগে তখন লোকে পুরাতন বিশ্বাস ও ধারণাকে নূতন করিয়া যাচাই করিয়া লইতে চায়। বাঙ্গালী মুসলমানও আজ বুঝিয়াছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী না হইলে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বা তাঁহাদের উন্নতি সম্ভব হইবে না। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত ধারণা এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের চাপ সহসা অপসৃত হইবার নহে। ইঁহাদের একদল লোকের কথা এই যে, বাংলাভাষাকে যদি গ্রহণই করিতে হয়, তবে তাহাকে কিছু পরিমানে অন্ততঃ ইস্‌লামী রূপ দিতে হইবে। ইস্‌লামীয় বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তা ও ভাবধারার দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য বলিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক দল লেখক যথেষ্ট পরিমাণে আরবী ও ফরাসী শব্দ আমদানী করিতেছেন। ইঁহারা এই কার্য্য অপ্রতিহত গতিতে চালাইতে থাকিলে, ভাষা নিতান্তই কৃত্রিম হইয়া উঠিবে এবং হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শাখায় ইহার বিভক্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। ইহার যে ক্ষতি ও কুফল তাহা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীকেই ভোগ করিতে হইবে।

কিন্তু এ সম্পর্কে অন্যদিকের কথাও ভাবিয়া দেখিবার আছে। বাংলাভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বলিয়া এবং হিন্দু লেখকদের সংস্কৃতানুরাগের জন্য বাংলাভাষা অতিমাত্রায় সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ইহা এইরূপে আরবী ফারসীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। এই পরকীয় প্রভাব হইতে বাংলাভাষাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা ও আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে এপর্য্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের কথা বিশেষভাবে কাহারও মনে হয় নাই। হিন্দুরা ব্যবহার করেন না এবং বাংলাসাহিত্যে প্রচলন নাই এমন বহু শব্দ বাঙ্গালী মুসলমানেরা নিত্য ব্যবহার করেন। এ সকল শব্দ যদি সাহিত্যে স্থান না পায় এবং তাহার দায়িত্ব যদি শুধুমাত্র মুসলনান সাহিত্যিকদের উপর থাকে তবে তাঁহাদের মনে ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক এবং অন্যায় জেদের আকারে তাহার দেখা দেওয়াও অস্বাভাবিক নহে।

এই প্রসঙ্গে যেমন হিন্দু সাহিত্যিকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীই দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় ও কাজকর্ম্মে সাহিত্যে অপ্রচলিত বহু আরবী ও ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেন, ইহাদের অনেকগুলি সাহিত্যিক মর্য্যাদা পাইতে পারে এবং নূতন বিদেশী শব্দ আমদানী করিবার সময় আরবী ফারসী এবং হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাগুলির কথা মনে করিবার প্রয়োজন আছে; তেমনই মুসলমান লেখক ও সাহিত্যিকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, আরবী বা ফার্সী শব্দ বর্ত্তমান বাংলাভাষার মধ্যে কিছু চালাইতে হইবে এই মতলব লইয়া লেখনী ধারণ করা বিজ্ঞান সম্মত নহে এবং তাহাতে ভাষা অকারণে পীড়িত হইবে, বিরক্ততা জাগিবে এবং ভাষা খণ্ডিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে; তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুসাহিত্যিকদের দ্বারা অবিরত ব্যবহারের ফলে বহু আরবী ও ফারসী শব্দ বাংলার কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে এবং ভাষার উপর ইসলামী প্রভাবের প্রমাণ হিসাবে যদি আরবী ও ফারসী শব্দের সংখ্যা দেখিতে হয় তবে, বাংলায় মুসলিম প্রভাব বর্ত্তমানেও ক্ষীণ নহে। বাংলা আসাম প্রভৃতি প্রদেশের প্রায় তিন কোটি মুসলমান যে ভাষা নিত্য ব্যবহার করেন সে ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামী রূপ দিবার জন্য অন্য কোন মুস্‌লীম ভাষা হইতে শব্দ আমদানীর প্রয়োজন নাই এবং এই সাহিত্যে মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস লিখিত হইলে, এবং বাঙ্গালী মুসলমানের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের জীবনের বিশেষ রূপটি ইহাতে পরিস্ফুট হইলেই প্রকৃতপক্ষে ইহাতে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন বাহিরের শব্দ ব্যবহারের সময় সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সেই শব্দ আমদানী করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি না, ভাষার তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে কি না, ভাষার তাহাতে সৌন্দর্য্যহানি হইবে কিনা, এবং সর্ব্বোপরি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের যে সকল বাঙ্গালী এই ভাষা ব্যবহার করেন তাঁহাদের সকলের পক্ষে তাহা সমভাবে গ্রহণীয় হইবে কি না।

যথেচ্ছভাবে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা অনেক মুসলমান সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা দিলেও, তাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যে অন্যায় জেদ বা গোঁড়ামি যে, সুবিবেচনা, সঙ্গতি ও পরিমাণ সামঞ্জস্যবোধের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহা প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলমান

সাহিত্যিকের * এ সম্বন্ধীয় একটি স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি হইতে ভালভাবে বুঝা গিয়াছে। এই বিবৃতির কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বিদেশী ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি বিদেশী শব্দ সুপ্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছে।

'বাঙ্গলার মত জীবন্ত ভাষার পক্ষে এই শ্রেণীর শব্দের প্রয়োজন এখনো শেষ হইয়া যায় নাই। ভবিষ্যতে মুসলিম চিন্তাধারার সহিত বাঙ্গালী সাহিত্যিক সমাজের পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠতর হইবে তখন নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই বাঙ্গলায় আরও অধিক সংখ্যক আরবী, ফারসী শব্দের প্রচলন হইবে। ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য এই যে নূতন শব্দ ও ভাবধারার আমদানী, যাঁহারা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা করিব না। চারিদিকের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বৈশিষ্ট্যবাদীরা অচলায়তন সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু আলোকপন্থী যাঁরা, তাঁরা আলোকরশ্মিকে বরণ করিয়া লইবেনই।

"বাঙ্গলায় মুসলিম ভাবধারা প্রকাশ করিবার জন্য এবং কাব্য ও কথা-সাহিত্যে মুসলিম আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন মত আরবী, ফারসী শব্দ আমরা ব্যবহার করিব। তবে বিনা প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ আমদানী করিয়া খিচুড়ী ভাষা সৃষ্টির আমরা পক্ষপাতী নহি।

"আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহারের ব্যাপারে প্রয়োজন ছাড়া অন্য একটি বিষয়ও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। নূতন ভাবধারার দোহাই দিয়া আমরা অসুন্দর কিছু চালাইতে যেন চেষ্টা না করি। এবিষয়ে প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য্যবোধই হইবে আমাদের মাপকাঠি।

"রাষ্ট্রনৈতিক কারণে উত্তর ভারতে উর্দ্দু ও হিন্দী দুইটি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলায় হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভাব সৃষ্টির আমরা পক্ষপাতী নহি। হিন্দুমুসলমান ভাবধারার সমন্বয়ে ভবিষ্যতের বঙ্গসাহিত্য গড়িয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কামনা।"

একদিকে যখন বাংলাসাহিত্যে আরবী ও ফারসী শব্দ চালাইবার সংকল্প প্রসূত প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে তাহার বিরুদ্ধতা বাংলা সাহিত্যে একটা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে তখন প্রতিনিধিস্থানীয় মুসলমান সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের মত ও মনোভাব প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দ সমূহের প্রচলনের প্রয়োজনীয়তার এবং দরকার মত আরবী ও ফারসী ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহের উপযোগীতার কথা আমরা বলিয়াছি। তবে বাঙ্গলায় মুসলিম ভাবধারা প্রকাশ করিবার জন্য এবং কাব্য ও কথা-সাহিত্যে মুসলিম আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহারের অবশ্য প্রয়োজনীয়তায় আমরা বিশ্বাসী নহি। বিবৃতির অন্য সকল যুক্তি ও মত আমরা সমর্থন করি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা অর্দ্ধলক্ষেরও উপর গিয়াছে, ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। বিদেশী ভাষায় বিদেশীর দ্বারা প্রকাশিত দৈনিকের কাটতি এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল, সে খুব বেশী দিনের কথা নহে। আত্মশক্তি ও মাতৃভাষার প্রতি আমরা যে কতটা আস্থাহীন, ইহাদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইত। বাংলা দৈনিক পত্রের ইতিহাস অত্যন্ত স্বল্পকালের ; এই অত্যল্প কালের মধ্যে এই প্রকারের উন্নতি একদিকে যেমন অপ্রত্যাশিত অন্যদিকে ইহা তেমনই আমাদের কৃতিত্ব, বাঙ্গালী পাঠকের মাতৃভাষার প্রতি বর্দ্ধমান শ্রদ্ধা এবং বাংলা সংবাদপত্রের সম্ভাব্যতার নিদর্শন।

শুধুমাত্র আকার ও কাটতিতে নহে, সম্পাদন নৈপুণ্যে, সংবাদ সংগ্রহে এবং সুচিন্তিত নির্ভীক মতামত প্রদানে পত্রিকাখানি যে বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে তাহা ইহার পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বৈদেশিক সংবাদ সম্পাদনে (ইটালী আবিসিনিয়ার যুদ্ধ ব্যাপারেই ইহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে) এই পত্রিকাখানিতে যে সুশৃঙ্খল ধারা-

* এই বিবৃতিতে কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন (মাসিক মোহাম্মদী) আবুল মনসুর আহমদ (দি মুসলমান ও খাদেম); মুহম্মদ হবিবুল্লাহ্ (বুলবুল); আবদুল কাদির (জয়তী); মুজিবুর রহমান খাঁ (সাপ্তাহিক মোহাম্মদী); শামসুন নাহার (সর্ব্ববঙ্গ মহিলা সমিতি); মোহাম্মদ মোদাব্বের (সাহিত্য-মজলিস)।

বাহিকতা, যে পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা এবং যে রুচিহীন যত্ন পরিলক্ষিত হয় অন্যত্র তাহা দুর্লভ। ইহার ব নিজ্য সম্পাদকের লেখাগুলিও তথ্যপূর্ণ এবং সুচিন্তিত।

যাঁহারা শুধুমাত্র ইংরাজী দৈনিকের পাঠক, তাঁহাদের যদি ইংরাজীর প্রতি অযথা শ্রদ্ধা এবং বাংলার প্রতি অনুচিত অশ্রদ্ধা না থাকে তবে, ইংরেজী যে কোনও পত্রিকার সহিত তুলনা করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

সাম্রাজ্যবাদীর দম্ভ

ইওরোপবাসীদের অসহিষ্ণু জাত্যভিমান, অশ্বেত জাতিদের প্রতি নির্মম অবজ্ঞা, বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্য ও বানিজ্যের ক্ষুধা, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিলর্জ্জ সঙ্কোচহীনতা এবং পশু শক্তির অশোভন দম্ভ, পৃথিবীর অশ্বেত দুর্ব্বলজাতিগুলির ন্যায়বিচারের, মনুষ্যত্বের, আত্মসম্মানের এবং অস্তিত্ব রক্ষার দাবী চাপিয়া রাখিয়াছে। ইহা সবসময়ে এবং সর্ব্বত্র সত্য হইলেও মৌখিক ভদ্রতার একটা সাধারণ মান আছে। বুদ্ধিমান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রবিদগণ এই মান অতিক্রম করিয়া, উপেক্ষিত ও পদদলিত জাতিগুলি নিজেদের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে যাহাতে সচেতন হইয়া উঠিতে পারেন, এমন কোন কথা সাধারণতঃ বলেন না। কিন্তু, বর্ত্তমান জার্ম্মানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হিটলার সৈনিকের ন্যায় সোজা কথা ও সোজা কাজের মানুষ। শুধু অশ্বেত জাতিদের সম্বন্ধে নহে, তাঁহার অত্যুগ্র জাত্যভিমান নূতন 'আর্য্য' মতবাদের মধ্যেই সুপরিস্ফুট হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার মূল্যবান মত মতও আমরা একাধিকবার শুনিয়াছি। সম্প্রতি মিউনিকে, জার্ম্মানীর সকল অংশ হইতে আহূত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় হাজার নাৎসী ছাত্রের সম্মুখে বলিয়াছেন যে, উপনিবেশসমূহ শক্তির দ্বারা লব্ধ হইয়াছে। ইওরোপের কাঁচামাল ও উপনিবেশের প্রয়োজন ছিল এবং জীবনের বীরোচিত আদর্শের ফলে তাঁহারা শাসন করিবার জন্য বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু, যদি শাসক জাতিসমূহ শান্তিবাদীদের আদর্শানুযায়ী উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসন দিতে চাহেন তবে, উপনিবেশগুলি বলিবে "ইওরোপকে আমাদের আর প্রয়োজন নাই।"

হিটলার বলিয়াছেন, ইংরাজেরা ভারতবাসীদের হাঁটিতে শিখাইবার জন্যই ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন, এই শিক্ষা পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া ভারতবাসীরা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই। বীরোচিত আদর্শের জন্য শ্বেত জাতির শাসন করিতে বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে যাইবার পর এক শতাব্দী ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল, কিন্তু, অবশেষে এই শক্তিমান জাতি ভারতবাসীদিগকে হাঁটিতে শিখাইয়াছেন।

হিটলার এই প্রকার সরল ধারণা ও সরল কথাবার্ত্তার লোক বলিয়া ইওরোপের যে সকল জাতি তাঁহাদের রাজ্যলিপ্সার নগ্নতা ঢাকিবার জন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিদিগকে সভ্যকরণ, তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি ধর্ম্মবুলি মুখে আওড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের দুর্ব্বলতার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইওরোপীয় জাতিগুলি যদি এই প্রকার দুর্ব্বল উদারনীতির অনুসরণ করেন তবে, তাঁহাদের অধীনস্থ দেশসমূহ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিবে।

নব্য জার্ম্মানীর বাইবেলস্বরূপ হিটলারের Mein kampf নামক পুস্তকে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর কয়েকটি মন্তব্যের প্রতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। হিটলারের ক্ষমতা লাভের পর পাঠক সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবাসীরা এই আপত্তিকর মন্তব্যগুলির প্রতিবাদ বরাবর করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই প্রতিবাদের পশ্চাতে সরকারের সমর্থন না থাকায় ইহা যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই।

চীনাদের সম্বন্ধে এই পুস্তকে একটা আপত্তিকর কথা ছিল, কিন্তু ওখানকার চীনামন্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করা মাত্র মন্তব্যটি প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন।

জার্ম্মান সরকারের আপত্তিমাত্রে একখানি ইংরাজী নাটকে ব্যবহৃত হিটলার নামটিকে কিভাবে গান্ধী নামে রূপান্তরিত করিয়া একই সঙ্গে জার্ম্মানীকে সন্তুষ্ট ও ভারতবর্ষকে অপমানিত করা হইল, সংবাদপত্রের পাঠকের কাছে তাহা অবিদিত নাই।

বাংলায় যক্ষ্মারোগের ভয়াবহ ব্যাপকতা

বাংলায়, বিশেষ করিয়া সহর অঞ্চলে যক্ষ্মারোগ ভয়াবহ রূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, খাদ্যাভাব, উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব, অন্য নানা দুর্ব্বলকারী রোগের আক্রমণ এবং স্বাস্থ্যের নিয়মসমূহ পালনে উদাসীনতা এই ব্যাধির বিস্তারের জন্য দায়ী। দারিদ্র্য ও তাহার আনুসঙ্গিক কুফল সমূহের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ বা আমাদের সাধ্যেরও নহে, কিন্তু, ইহার প্রতিরোধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে এবং আমাদের সাবধান হইয়া থাকিবার অভ্যাস বৃদ্ধি পাইলে, ইহার বিস্তার নিঃসন্দেহ হ্রাস পাইবে। এই ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ দিক হইতেছে যে, সাধারণঃ অল্পবয়স্কেরাই ইহার কবলে পতিত হন, ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ও সংক্রামক, ইহার চিকিৎসা বহুব্যয়সাধ্য এবং যাঁহারা সারিয়া উঠেন তাঁহারাও সারাজীবন প্রায় পঙ্গু হইয়া থাকেন। আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি যে পল্লী অঞ্চলে এই ব্যাধি নাই বলিলেই হয়, কিন্তু এখানে ইহার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, এই রোগে মৃত্যু-সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। এখানে এই রোগ অনেক সময়ই ধরা পড়ে না এবং এখানে ইহার মৃত্যু-সংখ্যা নির্ণীত হইবার উপায় নাই বলিয়াই, ইহার প্রকোপের ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা নাই।

টিউবার কিউলসিস এসোসিয়েসনের উদ্যোগে ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সভাতে ডাঃ বি, সি, রায় বলিয়াছেন যে, যক্ষ্মারোগ গুপ্তভাবে মানবশরীরে অবস্থান করে এবং ইহা সমাজে বহুব্যাপক। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে; সহর অঞ্চলে শতকরা ৬০ হইতে ৮০ জন লোক এই রোগে ভুগিয়া থাকেন। 'টিউবারকিউলসিস এসোসিয়েসন'কে সাহায্য করিবার জন্য ডাঃ রায় ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। এসোসিয়েসন এ পর্য্যন্ত ছয়টি ক্লিনিক্‌স্ খুলিয়াছেন, ইহার প্রত্যেকটিতে বার্ষিক তিন হাজার হইতে চারি হাজার টাকা খরচা হয়। গত বৎসর ইহাতে ষাট হাজার লোক নানাভাবের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইহা ছাত্রদের সবিশেষ উপকারে আসিয়াছিল এবং তাঁহারা ভালভাবে পরীক্ষা করাইবার প্রচুর অবসর পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় ৩৬ হাজার ছাত্র থাকেন। তাঁহারা প্রত্যেকে ৮ আনা করিয়া দিলেও এসোসিয়েসন ভবিষ্যতে আরও ৬।৭ টি ক্লিনিকস্ খুলিতে পারেন। কলিকাতায় শীঘ্রই যক্ষ্মা দিবস প্রতিপালিত হইবে।

আশুতোষ কলেজে অনুষ্ঠিত অন্য একটি অনুরূপ ছাত্র সভায়ও ডাঃ উকিল বিশেষভাবে ছাত্রদের সাহায্য চাহিয়াছেন। তিনি ছাত্রদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলেন যে যেখানে সেখানে থু থু ফেলিবার এবং রোগগ্রস্তের সহিত একত্রে ঘুমাইবার বিপদের কথা আমরা অনেকেই জানি না। যাঁহারা যক্ষ্মা-রোগগ্রস্তের সংস্পর্শে আসেন সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে মৃত্যুহার অনেক অধিক।

আমরা আশা করি ছাত্রগণ এসোসিয়েসনকে অধিক সাহায্য করিয়া এবং তাঁহাদের উপদেশানুসারে নিজেরা সাবধানে থাকিয়া যক্ষ্মারোগকে আয়ত্বের মধ্যে আনিতে সহায়তা করিবেন।

অটোয়াচুক্তি ও ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য

অটোয়াতে বাণিজ্য ও চুক্তি সম্পাদিত হওয়া অবধি, অটোয়া-চুক্তির ফলাফল সম্বন্ধে সরকারী ও বেসরকারী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। সরকারপক্ষ বলিতেছেন, ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার শক্তি যখন অন্যান্য দেশে কমিয়া আসিতেছে, তখন অটোয়া চুক্তিই ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যকে রক্ষা করিতেছে। অন্য পক্ষ বলিতেছেন, অটোয়াচুক্তির অবসান ঘটিলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইত। জগতের ব্যবসা বানিজ্য সংক্রান্ত হিসাব পত্র সাধারণ লোকের পক্ষে অগম্য জটীল ও দুষ্প্রবেশ্য হওয়ায়, এবং প্রতি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির মূলে দেশের বহুতর সমস্যা জড়িত থাকায়; এই দুই বিরোধী অভিমতের কোনটির মূলে কতটা সত্য রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা করা আমাদের মত ব্যক্তির পক্ষে সুকঠিন এমন কি অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। এবিষয়ে ভারত সরকার যে বিবরণ ও তথ্যাদি প্রকাশ করেন তাহা পূর্ণাঙ্গ ও পর্য্যাপ্ত নহে। সম্প্রতি ভারত সরকারের "ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ফরমেশন" 'ভারতবর্ষ ও অটোয়া'

নামক যে 'প্রেস-নোট' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, সরকার পক্ষ গোঁজামিল দিয়া স্বপক্ষের কথা বলিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের বিবরণ আরও বিশদ ও তথ্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল।

'প্রেস-নোট' হইতে দেখা যায়: যে সমস্ত দ্রব্য অটোয়া চুক্তি অনুসারে সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহাদের রপ্তানী মূল্য ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৪-৩৫ এর মধ্যে ১৬,৫২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে, যদিও ঐসময়ের মধ্যে গ্রেটবৃটেনে শতকরা ১০·২ টাকা অর্থাৎ ৩৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল দ্রব্য অটোয়া চুক্তির সুবিধা ভোগ করেনা তাহাদের রপ্তানীমূল্য ১৯৩১-৩২ অপেক্ষা ১৯৩৪-৩৫এ ১২·৩৫ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯৩১-৩২ অপেক্ষা ১৯৩৪-৩৫এ গ্রেটবৃটেনে শতকরা ২৪·৩ টাকার ও অন্যান্য দেশে শতকরা ২৫·৮ টাকা মূল্যের দ্রব্য অধিক রপ্তানী হইয়াছে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, ১৯৩৪-৩৫ এ ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ১৫২·৪ কোটি টাকা। তন্মধ্যে শতকরা ৩২ টাকা মূল্যের দ্রব্য অটোয়া চুক্তির সুবিধা ভোগ করিয়াছে।

অটোয়া চুক্তি ও ভারতবর্ষ

বেসরকারী বিশেষজ্ঞেরা অটোয়াচুক্তির পরিকল্পনা উত্থাপিত হওয়া অবধি বলিতেছেন, এই চুক্তি ভারতের বাজারে গ্রেটবৃটেনের মালকে যে সুবিধা প্রদান করিবে (এখন করিতেছে) তাহার ফলে ভারতীয় মালের বৈদেশিক ক্রেতারা ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্যের উপর প্রতিহিংসামূলক (retaliatory) শুল্ক ধার্য্য করিবে। ফলে ভারতীয় রপ্তানী-বাণিজ্যের সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই হইবে। এখনও তাঁহারা বলিতেছেন ১৯৩২ সাল অপেক্ষা ১৯৩৫ সালে পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা ভাল—প্রায় সকল দেশেরই ব্যবসাবাণিজ্য ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯৩১-৩২ অপেক্ষা ১৯৩৪-৩৫এর ভারতীয় রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি ত পায় নাই পরন্তু হ্রাস পাইয়াছে। বিশেষতঃ যে সকল দ্রব্য অটোয়াচুক্তির সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহাদের রপ্তানী শতকরা প্রায় ১৫ (১৪·৯) টাকার হ্রাস পাইয়াছে: গ্রেটবৃটেন ব্যতীত অন্যান্য দেশে তাহাদের রপ্তানী শতকরা ২৮·৯ টাকার হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে লাভের আশায় অটোয়া চুক্তি করা হইয়াছিল তাহা অলীক।

সরকার পক্ষ বলিতেছেন, যদি বাস্তবিকই কোন দেশ ভারতীয় মালের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক শুল্ক ধার্য্য করিত তাহা হইলে যে সকল দ্রব্য অটোয়া চুক্তির সুবিধা ভোগ করিতেছেনা, অন্যান্য দেশে তাহাদের রপ্তানীও হ্রাস পাইত; কিন্তু অন্যান্য দেশে উহা হ্রাস না পাইয়া শতকরা ২৫·৮ টাকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল দ্রব্য অটোয়া চুক্তির সুবিধা ভোগ করিতেছে গ্রেটবৃটেন ব্যতীত অন্যান্য দেশে যে তাহাদের রপ্তানীর হ্রাস ঘটিয়াছে তাহার প্রকৃত কারণ হইতেছে ঐ সকল দেশে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে বা ঐ সকল দেশ পারস্পরিক বাণিজ্য-চুক্তিবদ্ধ হইয়া অন্যান্য দেশ হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। অটোয়া চুক্তি যদি নাও থাকিত তাহা হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইত না; পরন্তু গ্রেটবৃটেনের কোন বাধ্য বাধকতা না থাকায় গ্রেটবৃটেনও ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত। ফলে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের আরও ক্ষতি হইতে পারিত। সরকার পক্ষের কথা পর্য্যাপ্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, যে নামেই হউক—পারস্পরিক বাণিজ্য-চুক্তি বা প্রতিহিংসামূলক শুল্ক—উহাদের ফলাফল ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে সমান। অটোয়া চুক্তির দ্বারা বদ্ধ না হইলে হয়ত ভারতের সহিতও অন্যান্য দেশের পারস্পরিক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হইতে পারিত। ফলে হয়ত ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইত। সুতরাং, যতক্ষণ না সরকার পক্ষ প্রমাণ করিতে পারিতেছেন যে, ভারত অপেক্ষা অন্যান্য দেশের সহিত ঐ সকল দেশের পক্ষে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তিতে বদ্ধ হওয়া লাভজনক বা ঐ সকল চুক্তি কোন স্বাভাবিক অনুকূল কারণ বশতঃ সম্পাদিত হইয়াছে, ততক্ষণ সরকার পক্ষের যুক্তি গ্রহনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য দেশে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা কমিয়াছে একথা সরকার পক্ষ বলিলে তাঁহাদের দেখাইতে হইবে যে সকল ভারতীয় দ্রব্যের

চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে তাঁহারা বলিতেছেন, তাহাদের মোট (সকল দেশ হইতে) আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। জার্ম্মানী ও অন্যান্য কতিপয় দেশ সম্বন্ধে এরূপ কতকটা কৈফিয়ৎ সরকার পক্ষ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। শুধু ঐ সকল দেশ সম্বন্ধে নহে ভারতীয় মালের সকল ক্রেতা সম্বন্ধেই বাণিজ্যের প্রতিটি দ্রব্যের ভিন্ন আলোচনা করিয়া তাঁহাদের যুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করিতে হইবে।

যে সকল দ্রব্য অটোয়া চুক্তির সুবিধা ভোগ করিতেছে উহাদের মধ্যে এমন অনেক দ্রব্য আছে তাহা চুক্তির অন্তর্গত দ্রব্যের তালিকাভুক্ত না হইলে তাহাদের কাট্‌তি অন্যান্য দেশে সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ঐ সকল দ্রব্যকে যখন তালিকাভুক্ত করা হয় তখনই ভারতে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভারতীয় রপ্তানী দ্রব্যের মূল্যের যে হিসাব উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় অটোয়া চুক্তির তালিকাভুক্ত দ্রব্যের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় বেসরকারী ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্‌ বাণীই সমর্থিত হইতেছে বলা যায়। সরকার পক্ষ যদি স্বপক্ষের কথায়—অর্থাৎ অটোয়া চুক্তির দ্বারা ভারত লাভবান হইতেছে—ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশে প্রতিটি দ্রব্যের রপ্তানীর হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ভিন্ন ভাবে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখাইতে হইবে যে অটোয়া চুক্তির তালিকাভুক্ত দ্রব্যের চাহিদা স্বাভাবিক কারণেই হ্রাস পাইয়াছে; এবং যে সকল দ্রব্য চুক্তির তালিকার বহির্ভূত তাহাদের রপ্তানীর পরিমাণ যে পরিমাণ রপ্তানী হইয়াছে স্বাভাবিক কারণেই তদপেক্ষা অধিক রপ্তানী হইবার উপায় ছিল না।

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই অন্যান্য দেশের সহিত পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি করিতেছে। কিন্তু ভারত পূর্ব্ব হইতেই অটোয়া চুক্তিতে বদ্ধ থাকায় অন্যান্য দেশের সহিত কোন পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। এরূপ বদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটিয়া ভারত যাহাতে নিজের স্বার্থের জন্য অন্যান্য দেশের সহিত বানিজ্য সম্বন্ধে বোঝা পড়া করিতে পারে তাহা হওয়া উচিত।

সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদের একত্র ভোজন বাংলায় কি প্রচলিত হইয়াছে

অসবর্ণ বিবাহ ও সর্ব্বশ্রেণীর একত্র ভোজনের প্রস্তাব হিন্দু মহাসভায় গৃহীত না হওয়া যে অন্যায় হইয়াছে (আমরাও তাহাই মনে করি) এই কথা বলিতে গিয়া ফেব্রুয়ারী মাসের Modern Review বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে শিক্ষিত শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন এত প্রচলিত হইয়াছে যে ইহার আলোচনার আর প্রয়োজন নাই, বিশেষ করিয়া বংলায় ত নাইই।

সহরের কথা বাদ দিলে (এবং সমাজ এখনও পল্লীতেই পড়িয়া আছে) সামাজিকভাবে বা প্রকাশ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর একত্র ভোজন শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও কোনস্থানে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। এই প্রকারের চেষ্টা যে সকল স্থানে হইতেছে, সে সকল স্থানে কর্ম্মীদিগকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। যশোহরের পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদের এই প্রকার একটা চেষ্টার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদিগকে যে সকল লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে, বর্ত্তমান লেখকের সে সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

শিক্ষিতদের মধ্যে একত্র ভোজন প্রচলিত থাকিলে, অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরাও সাধারণ মেসে বোর্ডিংএ স্থান পান না কেন। সাধারণ আনন্দ উৎসবে, পূজা পার্ব্বণেও এই কারণে তাঁহাদিগকে হীনতা সহ্য করিতে হয় কেন?

সহরে এক শ্রেণীর লোক আহারের বাধা যেমন মানে না, এক দল লোকের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহও তেমনই হইতেছে। কিন্তু, সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলন করিতে গেলে এই উভয় ব্যাপারের জন্যই দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ সৃষ্টির এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন হইবে।

ভারতীয় ছাত্রদের জন্য জার্ম্মান বৃত্তি

জার্ম্মান দেশের 'India Institute of the Deutsche Akademie' প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও যাহাতে উপযুক্ত ভারতীয় ছাত্র জার্ম্মাণ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা

করিয়া কৃতী হইতে পারে এবং যাহাতে জার্ম্মাণী ও ভারতবর্ষের মধ্যে কৃষ্টিগত সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয় সেই জন্য যোলটী স্কলারসিপ দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এ বৎসর শ্রেষ্ঠ জার্ম্মাণ ও ভারতীয় ব্যক্তিদের নামে স্কলারসিপগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। যখন হের হিটলার ও নাজী গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য চাঁইদের ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দায়ীত্বহীন ও নির্ব্বোধ উক্তি ভারতীয় চিত্তকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে তখন এই প্রকার নামকরণ কৃষ্টিগত মৈত্রীর বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবে বলিয়া আশা করা যায়।

স্কলারসিপগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত স্কলারসিপগুলির নামকরণ শ্রেষ্ঠ ভারতীয়দিগের নামে হইয়াছে। বাকীগুলির নামকরণ শ্রেষ্ঠ জার্ম্মাণবাসীদিগের নামে হইয়াছে।

১। চিকিৎসা বিদ্যা (Medicine)
'মেরী, কে, দাশ ও তারকনাথ দাস'-স্কলারসিপ।

২। গণিত শাস্ত্র (Mathematics)
'আশুতোষ মুখার্জ্জী'-স্কলারসিপ।

৩। ইণ্ডোলজী (Indology)
'সার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর'-স্কলারসিপ।

৪। জড় বিজ্ঞান (Physics)
'সার জে, সি. বোস'-স্কলারসিপ।

বাঙ্গালীদের কাজের ব্যবস্থা

বাঙ্গালীদের মধ্যে কাজের অভাবের তীব্রতার কথা আমরা সকলেই জানি। অবাঙ্গালীরা যাহাতে বাংলায় ব্যবসার জন্য মোটর চালাইবার লাইসেন্স না পান এবং বাংলায় কন্ট্রেক্ট সংগ্রহের সময় যাহাতে বাঙ্গালীরাই প্রথম সুবিধা পান, সরকার কর্ত্তৃক এইপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে বাংলা কাউন্সিলের বাজেট অধিবেশনে আলোচনা হইবে।

বাংলায় সশস্ত্র ও সাধারণ পুলিশ যাহাতে একমাত্র বাঙ্গালী-দের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হয় এবং বাঙ্গালীরা যাহাতে এদিকে ঝোঁকেন তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালীদের সৈন্যদলে ঢুকিবার সুবিধা নাই, পুলিশবাহিনীর লোকও ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে, কাজেই, নিজেদের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে যে সন্দেহ জাগিবে এবং অন্য প্রদেশের লোকেরা যে বাঙ্গালীদের দুর্ব্বল ও কাপুরুষ মনে করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে। নিজ প্রদেশের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিবার শক্তি ও যোগ্যতা আমাদের আছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। তবে অনেকদিন ধরিয়া না করিবার জন্য যেসকল কাজে আমরা অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি সে সকল কাজে আমাদের আগ্রহ জাগাইবার জন্য অনেক সময় যথোচিত চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। বাঙ্গালীদের মধ্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল না বা তাঁহারা অধিক সংখ্যায় কোন দিকে ঝুঁকিলেন না প্রভৃতি কথা অনেকটা অর্থহীন।

তবে, মোটর চালাইবার ব্যবসার ন্যায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য যদি বাঙ্গালীদের বিশেষ আইনের (অন্য প্রদেশে অবশ্য এরূপ হইয়াছে) আশ্রয় লইতে হয়, তাহা নিঃসন্দেহ আমাদের লজ্জার বিষয় হইবে। ইহাতে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিদ্বেষের ভাবও বর্দ্ধিত হইবে।

স্কুলের বালকদিগের দৈহিক উচ্চতা ও ওজন

ভারতীয় 'ন্যাশানাল কাউন্সিল অব উইমেন' হইতে প্রকাশিত দ্বি-মাসিক বিজ্ঞপ্তি পত্রের ডিসেম্বর সংখ্যায় ডাক্তার নবজীবন ব্যানার্জ্জি লিখিয়াছেন :—"পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের বালক ও বালিকাদের গড় উচ্চতা ইউরোপীয় দৈহিক উচ্চতার খুব কাছাকাছি, কিন্তু ওজনের বেলায় বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়। বালিকা-দের অপেক্ষা বালকদের মধ্যে এই পার্থক্য অধিকতর পরি-স্ফুট। বাল্যকাল অপেক্ষা বয়ঃ সন্ধিকালে এই পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ১১ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদেরও গড় ওজন হইতে দেখা যায় যে তাহা ইউরোপীয়দের ওজনের খুব নিকটবর্ত্তী। এই বয়সের বালকদের অপেক্ষা স্কুলগামী বালিকারা সমাজের উচ্চতর স্তরের লোক বলিয়া এরূপ ঘটে, ইহাই আমার অনুমাণ। ১২ বৎসর বয়সের পর বালিকাদের ওজনে দ্রুত হ্রাস লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ শিক্ষার ত্রুটি এবং এই বয়সের বালিকাদের কর্ম্মতালিকা ইহার জন্য অংশত দায়ী। বর্ত্তমান বালিকাদের শারীরিক অবস্থার উপর খাদ্য, কর্ম্মতালিকা এবং কার্য্যের ফল বিচার করিবার সময়ে

তাঁহাদের শরীরের এই সময় যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

মডার্ণ রিভিয়ু হইতে উদ্ধৃত।

অনুন্নতদের ধর্ম্মত্যাগের আন্দোলন

ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের একদলের মধ্যে ধর্ম্মত্যাগের আন্দোলন কতকটা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। নিখিল-ভারত অনুন্নতসম্প্রদায় সংঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তিনি ও উক্ত সংঘের সম্পাদক বাবু যোগজীবন রায় ডক্টর আম্বেদকরের সহিত দুইবার দেখা করিয়া ধর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে তাঁহার সংকল্পকে সুদৃঢ় ও শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিয়াছেন। বর্ণহিন্দুরা যদি তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে না পারেন তবে, তিনি একটা অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারেন।

রসিকবাবু আরও বলিয়াছেন, "আমার মতে হিন্দুদের বিশেষ পরীক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহারা যদি অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্তলোকদের স্বধর্ম্মে রাখিবার জন্য এখনই যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ না করেন তবে, আমার আশঙ্কা হয় যে, তাঁহাদের রাজনীতিক ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য নষ্ট হইবে। আমি ডক্টর আম্বেদকরের তীব্র মনোভাবের জন্য দুঃখিত কিন্তু, হিন্দুদের সংকীর্ণতা ও উদ্যমহীনতার জন্য ততোধিক দুঃখিত।" বর্ণ হিন্দুদের মনোভাব যে নিতান্ত নিন্দনীয় ও নৈরাশ্যজনক তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। রাওসাহেব শিবরাজ মহারাষ্ট্র হরিজন যুব সম্মিলনের সভাপতিরূপে বলিয়াছেন যে, অস্পৃশ্যতা সমস্যার কখনও সমাধান হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের অস্পৃশ্যতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র পথ হইতেছে, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করা। অবশ্য ইনি অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন।

বর্ত্তমান অবস্থায়, ক্ষোভ ও নৈরাশ্য প্রসূত এই প্রকারের ইচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু, এই পন্থার অনুসরণের দ্বারা এই সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা আছে, এমন কথাও আমরা মনে করিনা। কারণ, যতই চেষ্টা করা যাক, অনুন্নত সম্প্রদায়ের খুব অধিক সংখ্যক লোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে কখনই পারিবেন না। ২১৪ লক্ষ লোক যদি ধর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হনও, তবু সমগ্র ভারতের বিরাট অনুন্নত সমাজের দুঃখদুর্দ্দশার তাহাতে অবসান হইবে না। বরং যাঁহারা সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাঁহাদের সংগ্রামের ফলে সমস্ত সমাজের দুর্দ্দশার অবসানের আশা ছিল, তাঁহারা এই সমাজের বাহিরে গিয়া পড়িলে অনুন্নত সম্প্রদায় অধিকতর বিপন্ন এবং অসহায় হইয়া পড়িবেন। আরও একটা কথা আছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কথিত আন্দোলনের নেতাদের এমন শক্তি আছে যাহাতে তাঁহারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমগ্র বা অধিকাংশ লোককে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বা নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টিতে অনুগামী করিতে পারিবেন তবে সেই শক্তি অন্যভাবে নিজেদের প্রয়োগ করিলেও বর্ত্তমান অবস্থার অবসান হইতে পারে। কারণ সাংখ্যাধিক অনুন্নত সম্প্রদায়কে (মাত্র কয়েকটি জাতি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সকলেই অনুন্নত) যে সামাজিক মর্য্যাদায় হীন করিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে, তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, লোকাচার প্রভৃতির দ্বারা অনুন্নতদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কয়েকটী জাতি ব্যতীত আর সকলেই কোন না কোনভাবে (কেহ অন্নে, কেহ জলে কেহ বা স্পর্শে) অস্পৃশ্য। ইঁহাদেরও বহু জাতির মধ্যে সমানই বিভাগ, বৈষম্য ও পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান। ইঁহাদের সকলের স্বার্থ এবং অবস্থা এক বলিয়া সকলকে সাধারণ ও নিতান্ত শিথিল ভাবে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা ভেদ ও বৈষম্যহীন এক বিশেষ শ্রেণী হইয়া উঠেন নাই, বা উঠিবার পথেও দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন না। ইঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অবশ্য নিজেদের উন্নতি এবং সর্ব্বোচ্চদের সহিত সমান অধিকার চাহিতেছেন, কিন্তু, কেহই অন্যান্য সকলেরই সেই সকল অধিকার প্রদান করিতে অথবা পরস্পরের মধ্যের সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য ও বিভেদ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইতেছেন না। ইঁহারা যদি তাহা হইতেন, অনুন্নত শ্রেণীগুলি মিলিত হইয়া যদি এক হইতে পারিতেন তবে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয় হিন্দুর সাধ্য ছিল না যে, বহু কোটি লোককে তাঁহারা এইরূপে ছোট, নীচ, হেয় ও অমানুষ করিয়া রাখেন। কাজেই, আম্বেদকর প্রমুখ নেতাদের যদি

অনুন্নত হিন্দুদের উপর এমন প্রভাব থাকে যাহাতে তাঁহারা সকলকে নিজেদের অনুগামী করিতে পারেন তবে স্বাধিকার অর্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে ধর্ম্মত্যাগ বা নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবেনা। হিন্দু সমাজের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্প্রদায় হইবেন; তাঁহাদিগকে কেহ উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে, তাঁহারাই উপেক্ষিত হইবেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশা এই যে একই করণের জন্য কোন আন্দোলন কতকটা সাফল্যের সহিত আরম্ভ হইলে তাহা সমগ্র হিন্দু সমাজকে স্পর্শ করিবে, হয়ত বা একদিন গ্রাস করিবে।

কাভিত্তার হরিজনদিগকে মহাত্মা গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া মহারাষ্ট্র যুব সম্মিলনের সভাপতি তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে তাঁহার দুর্ব্বলতার কথা বলিয়াছেন। ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে বা কোন অধিকার অনর্জ্জিত থাকিলে যদি কেহ উৎপীড়নের ভয়ে অধিকার রক্ষার বা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হয় তবে, তাহার চেয়ে কাপুরুষতা আর কি হইতে পারে। মহাত্মাজী আমাদিগকে এত দিন অধিকার অর্জ্জনের ও অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন এবং নিজে সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সকলের শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন।

হিন্দুসভার পুনা অধিবেশন

সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর ঐক্য ও মিলনের জন্য অসবর্ণ বিবাহ ও সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর অন্নজল সর্ব্বশ্রেণীর গ্রহণীয় হইবার প্রস্তাব হিন্দুসভার গত অধিবেশনে গৃহীত হইবে, নানা কারণে অনেকে এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ডক্টর আম্বেদকরের সিদ্ধান্ত এবং সেজন্য হিন্দুদের একশ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্য এই আশাকে কতকটা দৃঢ় করিয়াছিল। কিন্তু, এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা অর্থহীন ও অকেজো হইয়াছে। তবে, এই প্রকারের একটা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে প্রস্তাবে এই সকল কথা না থাকিলেও লোকের এই সকল কাজ করিবার পক্ষে বাধা হইবেনা। মতবিরোধ ও দলাদলি এড়াইবার জন্যই প্রস্তাবটিকে নিতান্ত মৃদুভাবে উপস্থিত করিতে হইয়াছে।

কিন্তু যাঁহারা প্রগতিপন্থী ও আমূলসংস্কারকামী, তাঁহারা কার্য্য-কৌশলের দিক দিয়া ভুল করিলেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ সংস্কারবিরোধী যে সকল লোকের জন্য এই সন্ধি করিতে হইল, সংস্কারকার্য্য কেহ আরম্ভ করিলে তাঁহারা তাহাতে বাধা প্রদান করিবেনই। কাজেই ইহাতে দলাদলির আশঙ্কা কিছু মাত্র কমিল না; শুধু সংস্কারপন্থীরা যতদিন নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহা ততদিনের জন্যই মাত্র নিবারিত হইল। প্রগতিবাদীরা নিজেদের মত জোরে ও অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করিবার, দেশকে তাঁহাদের কথা শুনাইবার, নিজেরা সংঘবদ্ধ ও সচেষ্ট হইবার এবং উদারচিত্ত সাহসী লোকেরা যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রকার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন তাহার প্রেরণা যোগাইবার একটা বড় সুযোগ হারাইলেন। মতবিরোধের ক্ষতি অপেক্ষা নীতিকে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে খর্ব্ব হইতে দিবার ক্ষতি অনেক অধিক।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন দলাদলি ও মতবিরোধকে চাপা দিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়াই সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে, তবে তিনি ঠকিয়াছেন, বলিতে হইবে।

শিক্ষা সপ্তাহ

আমাদের শিক্ষকদের জ্ঞানের ও মনের পরিধি বাড়াইবার ও শিক্ষা সম্পর্কীয় নূতন তথ্যসমূহের সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করাইবার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কলিকাতায় যে শিক্ষা সপ্তাহের অনুষ্ঠান হইল ইহা এই উদ্দেশ্য সাধনে কতকটা সহায়তা করিবে। কিন্তু, পল্লীর দরিদ্র স্কুলসমূহের শিক্ষকেরা তাঁহাদের নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইবেন, এমন মনে হয় না।

আন্তর্জাতিক নারী সম্মিলনী

কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সংঘের ও ভারতের জাতীয় নারীসংঘের যুক্ত অধিবেশন এমাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্নদেশ হইতে বিশিষ্ট মহিলা প্রতিনিধিগণ এই সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রয়োজনীয় বিষয় এখানে আলোচিত হইয়াছিল। মাননীয়া বরোদার মহারাণী এবং লেডি এব্রা যথাক্রমে ইহার সভানেত্রী ও অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী হইয়াছিলেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

গল্প লেখকের বিপদ

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী

সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা মনে পোষণ করা এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয় এবং বাংলা দেশের নরনারীর মধ্যে জীবনের একদিন না একদিন সাহিত্যযশের প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হন নাই এমন কেহ আছেন বলিয়া আমি স্বীকার করি না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ইহা যে এরূপ দোষাবহ এবং মারাত্মক হইয়া উঠিবে ইহাকে ললাটের লিখন ছাড়া আর কিই বা বলিব!

আমার প্রথম কবিতা রচনার স্মৃতি পাঠশালা যুগের, সে কাহিনী নিরতিশয় লজ্জা এবং দুঃখের। কবিতার উপলক্ষ্য ছিলেন গুরুমহাশয়, অতএব, রচনাকৌশল নয়, কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর মাধুর্য্যে পুলকিত হইয়াই সহপাঠিবর্গ বাহবা দিল, এবং গুরুমহাশয়ের কানে তাঁহার বন্দনা বাণী প্রবেশ করা-মাত্র তিনি বেত্রাস্বরূপে মুক্ত কচ্ছ, সঘন তরঙ্গায়িত ভুঁড়ি ও দোদুল্যমান টিকি লইয়া আমাদের ক্লাসে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পর আমি দৌড়াইলাম ও তিনি দৌড়াইলেন এবং বিস্ময়ের বিষয় এই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী হইলেন, অতএব এ করুণ দৃশ্যের পরে আমি যবনিকা ফেলিয়া দিলাম!

কলেজের জীবনে যে সহসা বন্ধনমুক্তির মাদকতা আছে সেই মাদকতার অনুকূল পবনে আমার কাব্যলক্ষ্মী একেবারে সপ্তডিঙ্গা ভাসাইয়া দেখা দিলেন। লিখিলাম—

কোকিলের কুহু পরাণেতে উহু
বহিছে মলয় বায়,
দারুণ গরমে মরি গো মরমে
প্রাণ বুঝি বাহিরায়!

লিখিয়া আত্মপ্রসাদে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু শ্রোতা ছাড়া কাব্যরচনা বৃথা। প্রকৃত রসিকের প্রশংসাবাক্য ব্যতীত কাব্যসৃষ্টি অর্থহীন। অতএব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া স্বরচিত কবিতা শুনাইতাম। যাহারা মূর্খ তাহারা উপহাস করিত, যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা আমার কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া উৎসাহ দান করিতেন। সংসারে মূর্খের সংখ্যা যে কত অধিক এবং প্রকৃত বুদ্ধিমানের সংখ্যা যে কি পরিমাণ মুষ্টিমেয় ইহার পূর্ব্বে সে ধারণা আমার ছিল না। যাঁহারা আমার কাব্যের প্রশংসা করিতেন তাঁহাদিগকে রেস্তরাঁতে খাওয়াইতাম এবং যাঁহারা আমাকে উপহাস করিতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে সাধু ভাষা প্রয়োগ করিতাম না।

রেস্তরাঁর গুণগ্রাহী বন্ধুবর্গ পরামর্শ দিলেন "মাসিক পত্রে কবিতা পাঠাও দেশে বিদেশে তোমার যশোদুন্দুভি নিনাদিত হক—"

শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম, মনে মনে বলিলাম, রবীন্দ্রনাথ, এইবার তোমাকে দেখিয়া লইব, এতদিন বড় একাধিপত্য করিয়া লইয়াছ, ভজহরি ভট্টাচার্য্যের পাল্লায় ত একবারও পড় নাই!—হায় তখনও বাংলা দেশের দুরাচার সম্পাদকবর্গের পাল্লায় আমি নিজেই পড়ি নাই—ভজহরি ভট্টাচার্য্যকেই দেখিয়া লইবার জন্য যে মাসিক পত্রিকা আফিসের আনাচে কানাচে সেই বেরসিক সম্পাদকসজ্ঘ অপেক্ষা করিতেছে তাহা তখনও জানিতাম না।

অর্থাৎ শত শত কবিতা পাঠাইলাম এবং ত্বরিতগতিতে সম্পাদকসজ্ঘের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। রেস্তরাঁতে যাঁহারা আমার পয়সায় চা, চপ, কাট্‌লেট, কারি কোর্ম্মা খাইতেন তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে করিতে প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিলেন এবং এতকাল পরে আমি বুঝিতে পারিলাম যে মূর্খামিতে এই ক্ষুদ্র দলটিও কাহারও অপেক্ষা কম যান্ না। সুতরাং এই হাসির পর হইতেই রেস্তরাঁর ভোজ বন্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে কয়েকটি বাছা বাছা কবিতা বগলে করিয়া

আমিই একদিন "কলরব" পত্রের আফিসে উপস্থিত হইলাম। —এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করার পর সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইল। আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম, "আমি কবি—"

শুনিয়া ভদ্রলোক মোহাবিষ্টের ন্যায় আমার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন, মনে হইল এমন অদ্ভুত কথা যেন তিনি কখনও শোনেন নাই এবং আমার ন্যায় এমন অপূর্ব্ব জীবও যেন আর কখনও দেখেন নাই!

কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসংবরণের ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া ভীতি-বিহ্বল মুখে তিনি বলিলেন, "দেখুন কবিতা—"

বাধা দিয়া বলিলাম "শুনুন না একটা পড়ি—

'যে জন পথের বাঁকে গেল চলি নত আঁখে
দুলিয়ে নোলক নাকে
—তরুণী!'

সম্পাদক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কাতর মুখে কহিলেন, "দেখুন, কিছু যদি না মনে করেন তাহ'লে—আমার সময়ের অত্যন্ত অভাব—"

উত্তেজিত স্বরে কহিলাম "রাখুন মশায় সময়ের অভাব, আগে কবিতা শুনুন পরে অন্য কথা—'কালো রূপে জলে আলো,

কটা চোখও লাগে ভালো,
এত মধু প্রণয়ের দরুণই॥'

"আর কিছুতেই নয়" বলিয়া সম্পাদক মহাশয় ঘর হইতে বাহির হওয়ার উপক্রম করিতেই গভীর উত্তেজনায় আমি সজোরে টেবিলের উপর এক চপেটাঘাত করিলাম।—চমকিয়া উঠিয়া সম্পাদক ডাকিলেন, "দরোয়ান—"

দেখিলাম ব্যাপার গোলমেলে হইয়া উঠিতেছে।—অতএব একটু দ্রুতগতিতেই কাগজপত্র গুছাইয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলাম। এতক্ষণে সম্পাদককে একটু প্রসন্ন বোধ হইল,—তিনি কহিলেন, "দেখুন, কবির অত্যাচারে আমাদের জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে, কবিতা আমাদের চাইনে—যদি ভাল ছোট গল্প লিখতে পারেন ত পাঠিয়ে দেবেন, আনন্দের সঙ্গে ছাপব—"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম এবং মনে মনে স্থির করিলাম অদৃষ্টে যাহাই থাকুক এইবার ছোট গল্প লিখিব।

কিন্তু হায়! ত্রিভুবন তোলপাড় করিয়াও একটা ছোট প্লট মিলিল না। বালজাক ও মোপাসা কিনিয়া পড়িতে লাগিলাম—পড়িতে পড়িতে কাব্যের জন্য আমায় কবিচিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিত। মনকে প্রবোধ দিতাম ক্ষুধা পাইলে বাঘও ঘাস খায়। কিন্তু শত চেষ্টাতেও মোপাসা-বালজাককে দেশী ছাঁচে ফেলিতে পারিলাম না। তবে কি শেষ অবধি গল্প লেখক হওয়ার আশাও পরিত্যাগ করিতে হইবে!—এহেন সঙ্কটকালে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহোপলক্ষে এক সুদূর পল্লীভবনে আমাকে উপস্থিত হইতে হইল।

বিবাহের মাত্র দুইদিন বাকী। আত্মীয় স্বজনের সমাগমে গৃহে আর তিলধারণের স্থান নাই। হতাশ হইয়া আমি দাদার বৈঠকখানা ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। রাত্রি প্রায় বারোটা, ঘুম কিছুতেই আসিতেছে না। উঠিয়া বসিলাম, মাথার দিকের একটা জানালা খুলিয়া দিতেই বাহিরের জ্যোৎস্নায় সমস্ত ঘরখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অদূরে ধুতরা ফুলের গাছগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ছোট একটা ঝোপের সৃষ্টি করিয়াছে। আর ওই গাছগুলির উপরে তুষার-শুভ্র ধুতরা ফুলগুলি জ্যোৎস্নার অমিয়ধারায় স্নান করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। নির্জ্জন জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে আমার কবি-প্রাণ নাচিয়া উঠিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া ধুতরা ফুলের উৎসব দেখিবার জন্য তাহাদের কাছে গিয়া বসিলাম। আত্মহারা হইয়া কতক্ষণ সেখানে বসিয়া ছিলাম জানিনা। হঠাৎ চাপা গলার শব্দ কানে আসিল, পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবড়ীকাটা চুলওয়ালা যমদূতসদৃশ তিন মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এরূপ নির্জ্জন রাত্রিতে এই অপূর্ব্ব ত্রিমূর্ত্তির সমাবেশে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বেই তাহাদের মধ্যে একজন বলিল 'বাঁধ শালাকে—'

বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিলাম আমাকে শক্ত করিয়া বাঁধা হইয়াছে।

তারপর বজ্রনির্ঘোষে প্রশ্ন হইল, 'বল শালা তুই কে!'

এই অবাঞ্ছিত কুটুম্বিতায় চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল না, কিন্তু তবুও প্রাণের ভয়ে বলিয়া ফেলিলাম 'আমিও তোমাদেরই মত একজন।'

শুনিয়া বিস্মিত হইয়া তাহারা চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল, 'তবে তুইও কি আমাদের মত চোর?'

হায় মা বঙ্গভারতী তোমার দীন ভক্তের ললাটে এত অপমানও লিখিয়াছিলে! বঙ্গের উদীয়মান তরুণ কবির চেহারা অবশেষে চোরের সহিত সাদৃশ্য লাভ করিল! যাহা হউক এতক্ষণে ইহাদের পরিচয় পাওয়া গেল। সহসা মনে হইল এই ত সুবর্ণ সুযোগ, গল্প লিখিবার এই ত প্রকৃষ্ট উপকরণ, চোরের কাহিনী। আশ্চর্য্য ঘটনা, অদ্ভুত বর্ণনা! "কলরব" সম্পাদক! এইবার সুযোগ পাইয়াছি। গল্প লিখিব, কবিতা লিখিব। দেখিব তুমি কি করিয়া সে সকল না ছাপাইয়া অব্যাহতি লাভ কর। দ্বিধা না করিয়া বলিলাম 'হ্যাঁ আমিও তোমাদেরই মতন একজন চোর, সঙ্গীহীন অবস্থায় উপায় চিন্তা করিতেছিলাম।'

উহাদের একজন বলিল, 'তবে তুইও আমাদের সঙ্গে চল।' আমাদের বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'এই বাড়ীতে আজ সিঁদ কাটব, তুইই প্রথম সিঁদের ভিতর ঢুকবি।'

রাজী হইলাম।

যে জায়গায় সিঁদ কাটা হইল তাহা আমাদের রান্নাঘরের মাটির ভিত্তি। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। কি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ধীশক্তি তাহাদের। চোরদের একজন আমার অতি নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'এইবার তুই ঢোক্, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি।'

"আচ্ছা—"বলিয়া যেই সিঁদের ভিতর মাথা দিয়াছি অমনই একজন আমার কান ধরিয়া টানিয়া পুনরায় বাহিরে আনিয়া বলিল, 'তবে রে পাজি, তুই নাকি আমাদের মত চোর?'

হায়রে, ব্যাটারা বুঝি বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত টের পাইয়া যায়। গল্পলেখক ও তৎপরবর্ত্তী কবি হইবার পথে ইহারাই বুঝি বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন কি হ'য়েছে?'

যে কান ধরিয়াছিল সে বলিল, 'এই রকম করে' বুঝি সিঁদের মধ্যে ঢোকে!'

মনে মনে বলিলাম, ভদ্র গৃহস্থের সন্তান চুরি করা পেশা নয়, কোন দিন ছিলও না—গল্প লিখিবার দুঃসাধ্য অপচেষ্টায় চোর বনিয়াছি—সিঁদে প্রবেশ করিবার রীতি জানা থাকিবার আমার কথা নয়। প্রকাশ্যে বলিলাম, 'রাগ কোরো না ভাই, পেটের দায়ে চোর হয়েছি,—এখনও তোমাদের মত পাকা ওস্তাদ হতে পারিনি,—তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে সব শিখে ফেলব।'

শুনিয়া আমার কর্ণধার প্রসন্ন হইল, কহিল 'তবে শোন্, আগে পাদুটো ভিতরে ঢুকিয়ে দে, তারপর আস্তে আস্তে পিছন দিক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভিতরে যা। কিন্তু সাবধান কোনও শব্দ করিসনি।'

গুরুদেবের উপদেশানুযায়ী আমি পিছন ফিরিয়া হামাগুড়ি দিয়া আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকিতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় মনে হইল যেন আমার পা কাহার মাথায় ঠেকিল। তাড়াতাড়ি গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া পড়াতে সঙ্গীদের প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, 'ঘরে লোক আছে।'

'শব্দ পেয়েছিস্ কি?'

'না—'

'তবে আবার যা—'

তাহাদের কথামত পুনরায় প্রবেশ করিলাম। পিছন দিকে হামাগুড়ি দিয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হওয়ার পর কে যেন আমার পদদ্বয় সজোরে চাপিয়া ধরিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'উঃ' বলিয়া উঠিতেই একজন চোর বলিল, 'কি রে?'

'কে যেন আমার পা চেপে ধরেছে!'

অমনই আমার সঙ্গীদের একজন গর্ত্তের ভিতরে ঢুকিয়া আমার হাত দুইটা সবলে আকর্ষণ করিল। ক্রমশঃ দুইদিক হইতে আকর্ষণের বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঘরের ভিতরে কোন এক অদৃশ্য ব্যক্তি আমার পা দুইটা

টানিয়া ধরিয়া "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে আমার সঙ্গীরা শেষ চেষ্টা করিবার জন্য তিন জনে প্রাণপণে বাহিরের দিকে টানিতে লাগিল। আমার পক্ষে সে কি ভীষণ ব্যাপার!

বিপদের সময় মানুষ ভগবানের নাম স্মরণ করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঠিক এই সময়ে আমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রবর্গের কথা মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল তাঁহারা কি অদ্ভুত ভুজবিক্রমে বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার টাগ-অভ্-ওয়ারের শীল্ড পাইয়াছিলেন। আমাকে লইয়া ইহারাও টাগ্-অভ-ওয়ার আরম্ভ করিল।—গাবুদা! তুমি যদি এখানে উপস্থিত থাকিতে তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে তোমাদের আইন কলেজের শীল্ড্ উইনারস্দের অপেক্ষা ইহাদের কোন পক্ষই ভুজবিক্রমে ন্যূন নহেন।—যাহা হউক কয়েক মিনিট ধরিয়া এই গজ-কচ্ছপের লড়াই চলিল। ভিতর হইতে অদৃশ্য আকর্ষণকারীর পরিচিত স্বরে বাড়ীর ভিতর যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমার সাময়িক সহ-ব্যবসায়ীরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে "যঃ পলায়তি স জীবতি" পন্থার অনুসরণ করিল। সুতরাং এদিককার প্রবল আকর্ষণে বোঁ করিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া আসিলাম। কিন্তু তখনও ঘরের ভিতর অন্ধকার। মুহূর্ত্তমধ্যে পিঠের উপর অজস্র মুষ্ট্যাঘাত আরম্ভ হইল। অনুমানে বুঝিলাম ঘরের ভিতর লোকসংখ্যা কম নহে, কারণ তখন চাঁদা করিয়া মুষ্ট্যাঘাত চলিতেছিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী এতক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন,—অল্পক্ষণ মধ্যে দাদা তিন চার জন লোক লইয়া লাঠি ও লণ্ঠন হস্তে ঘরে প্রবেশ করিলেন। উৎসাহ ভরে আমি মুখ বাড়াইলাম। দাদাও প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "ভজা না?"

অবনত মস্তকে আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, দাদা!"

ইহার পরবর্ত্তী করুণ কাহিনী আর আপনাদিগের নিকট বিবৃত করিব না। প্রায় পনরো দিন জ্বরে ভুগিয়াছিলাম; বিবাহের নিমন্ত্রণে শুধু বার্লি খাইয়াছি ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ লেপন করাইয়াছি।

কিন্তু বৌদি বড় করুণাময়ী। তিনি নিজে খরচ করিয়া আমার কবিতার বই ছাপাইয়া দিয়াছেন। আমি একখানা বই বৌদির জামাইকে নিজ হস্তে উপহার দিয়াছি।

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী

নবাগতা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

অবেলায় নবাগতা—
আনাচে আঁধারে ফুলে উঠিলে কি
সন্ধ্যামালতী লতা ?
ছন্দ যে তব স্পন্দিত করে
শুকতারকার ব্যথা !
জেগে যারে দেখে মিলাল আঁধার,
দেখিতে দেখিতে দেখা নাই আর,
তবু মন-কোণে আশা ছিল তার
আবার আসিবে বলি',
তুমি কোথা হতে অলখিতে এসে
হিয়া দিলে চঞ্চলি' ॥

ঘরে-ফেরা পথে দেখা সে প্রথম,
দেখেছি দাঁড়ায়ে থেকে,
চমকি' উঠেছি—"লাগে চেনা-চেনা,
তবু চিনিনে তো !—এ কে ?"
মুখখানি যবে ক'রে থাকো নত,
অথবা সুদূরে নিরখিতে রত,
অপরূপ তুমি যেন তারি মতো
মধু কিছু নহে কম,—
তোমার মাঝারে তুমি আর সেই
দুয়ে মিলে নিরুপম ॥

তাহারে দেখিয়া সে-ই শুধু সবে
চাওয়ার বেদনা জেনেছিনু ভবে,
তোমারে দেখেই ভাবিলাম তবে
পেলে বুঝি পেতে পারি,
সে ছিল অধরা আকাশকুসুম,
তুমি যে ধরারি নারী ॥

চ'লে যাহা যায় ঠিক আর তা-ই
ফিরে না, সত্যি বটে ;
—মানি সব, তবু এ কথাও আজ
বলিব নিষ্কপটে :—
এল যাহা তা-ও এল হেন ভাবে
ভুলেও যেন তা ভোলা নাহি যাবে,
কোনো তুলনায় তাহারে হারাবে
নাই নাই হেন কিছু,—
যেথা যার ঠাঁই তারে সেথা চাই
কেহ নয় কারো নীচু ॥

পলকে পলকে অলকে লুকায়
কোমল কপোলতল,
তারি ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলে
আঁখি দুটি চঞ্চল ।
চিকণ দেহের বাঁকা চলনিতে
ঝরনা ঝরে যে কল সঙ্গীতে,
হাসি পরিহাসে হে অকুণ্ঠিতে,
বিজুলি-ঝলকে ঝলো,
জীবন তোমার যৌবন মুখে
বিক্ষোভে টলোমলো ॥

ভিতরে ভিতরে ভরিয়া উঠেছে প্রাণ,
জানো না তবুও, কেন কোথা কী যে টান !
—সে কি অভাবেরই দুখ, না, সে কোনো
ভাবেরই আসিছে বান !
এমনি তো বেশ ফিরো নানা কাজে
সবারে ভুলায়ে রাখো তব সাজে,
কোথা হতে ঝড় উঠে মাঝে মাঝে
কেন যে অকস্মাৎ—
সব এলোমেলো হয়ে পড়ে,—তরী
অকূলেতে হয় কাৎ ॥

কিছুতে না মানে বাধা,
সান্ত্বনা সব চৌচির,—তবু
প্রাণ যাচে কার সাধা।
মনে আসে আধা-আধা—
যেন কোন্ দেশে আছে দুর্লভ
তারে না পাইলে বৃথা,—বৃথা সব !
তারে লভিবার জয়-গৌরব
দুর্গমে দেয় ডাক,
স্বপনে স্বপনে খুঁজে ফিরো দিশা
অভিমানে নির্ব্বাক ॥

শান্তগভীর অচপল সেই ছবি ;—
—গোধূলিবেলায় রূপ ধরো কি পূরবী !
তব সেই রূপ যার চোখে লাগে
মরা মনও তার অনুরাগে জাগে,
দাঁড়ায়ে সে তব সম্মুখভাগে
আপন গভীরে চায়,
চমকিয়া দেখে কী যেন কী নাই
না পাইলে নয় তায় ॥

তোমারে আগুলি' অভিসার-পথে
সেও অভিলাষী হয় সাথী হোতে,
দূরে দূরে থাকি' যদি কোনোমতে
কোনোকাজে তব আসে,
দুঃখের মাঝে এটুকু সুখের
আশ্বাসে ফিরে পাশে ॥

তারি মাঝে জাগে কী দুঃসাহস —
তোমার সুখের দিনে
নিজ পৌরুষে তোমারে লইবে জিনে'।
যত দেখে তায় বাধা দুস্তর
আপনাতে বাড়ে তত নির্ভর,
তোমার মাঝারে বিধাতার বর
ফুটে উঠে মহাতেজে,—
এমনি করেই ক্ষুদ্র যে থাকে
মহীয়ান হয় সে যে ॥

কী আশ্চর্য্য তুমি !
তোমার পায়ের পরশ লভিল
আমার কল্পভূমি।
আরো বিস্ময় লাগে, যবে সখি,—
পায়ের কিনারে লালিমা নিরখি,
ভাবি মোর নয়নের ভুল ও কি ?
—কুঙ্কুম যেন নয়,
যে দরদে ধরে তোমায় ধরণী
তারি আভা লেগে রয় ॥

আজো মাঝে মাঝে মনে পড়ে ফিরে ফিরে—
অতীতের সেই দেখা না-দেখার
ছোটো শুকতারাটিরে !

মনে পড়ে তার আলাভোলা মন,
সরল চাহনি, বেণীর দোলন,
তোমার মতোই মূক আবেদন,
ভাসিত সে মুখ'পরে,
বলি-বলি করি' পারেনি বলিতে
কী উঠিত মন ভরে ॥

ঐ যে তোমার ছু-অধরকূল
কী কথা বলিতে তেমনি ব্যাকুল,
হয়তো বা আমি বুঝিয়াছি ভুল
সে নহে আমারে স্মরি',
তবু ক্ষতি নাই, তুমি যা-ই ভাবো
ভাবো তুমি সুন্দরী ॥

সখি, থাকিয়ো নির্ব্বিবাদে
আমি শুধাব না কারো লাগি কারো
প্রাণ কাঁদে কি না-কাঁদে।
ভালো লাগে যারে তারে ভালোবাসি
—প্রাণ মোর শুধু এটুকু পিয়াসী,—
এ নিয়ে যা-কিছু রস উচ্ছাসি'
কথা-জাল যাই বুনে'
এ তো সবি তারি ভালো-লাগা-টানে,
নহে তো আমার গুণে ॥

পাই বা না পাই দেখিতেই যারে সুখ,
—যার মধুমাখা মুখ
দেখি না-ই দেখি, বসিয়া বসিয়া
ভাবিতেও ভরে পুলকেতে হিয়া,—
মিলন বিরহ সবেই অমিয়া
তারে ঘিরে' ঘিরে' ঝরে,
জানো কি তোমার ভ্রুকুটিও সখি
কেমন পাগল করে ?
আমি শুধু গান গাই
যা-কিছুই দেখি সুরে এঁকে ছবি
সবারে দেখাতে চাই।
জানি না এ তব মনোমতো কি না,
যা-হোক্ তা-হোক্ তুমি তো নবীনা,
তব ভাবরসে বাজিছে যে-বীণা
হোক্ তাহা পুরাতন,
—গত আগামীর অনাহত সুর
খুঁজে পেল তাহে মন ॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ব্যথার স্মৃতি

শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

(ক)

দার্জ্জিলিং। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হ'য়ে দ্বিতীয় সপ্তাহ চ'ল্‌ছে। ক'দিন ধ'রে অবিরাম বৃষ্টি হ'চ্ছিল। আজ দুপুর থেকেই আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে। বিকালের চা খাওয়া শেষ হ'তেই সুধীর বাইরের দিকে চেয়ে বলে উঠ্‌ল—"বাঃ, বেশ fine weather হ'য়েছে ত' আজ। এই দিনে কি আর দার্জ্জিলিঙে কেউ বাড়ীতে ব'সে থাকে! চল না, সুমনাদি, খানিকটা ঘুরে আসা যাক্‌।"

"না, ভাই, আজ আমার বেরুবার যো নেই। খোকনটার একটু জ্বর হ'য়েছে। আর উনিও এখন কোর্ট থেকে ফেরেননি। তুমি আর উৎপলা বরং বেড়িয়ে এস গিয়ে। আজ আর আমি বেরুতে পারব না। আর আমরা ত' এখন এখানকার একরকম বাসিন্দাই হয়ে গেলাম। উনি যখন এখানে বদলী হ'য়ে এসেছেন তখন আশা করা যায় অন্ততঃ বছর তিনেকের আগে হয় ত আমাদের এখান থেকে ন'ড়তে হবে না। তোমরা দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ, তোমরা বেড়াবে না ত বেড়াবে কে?...যাও উৎপলা, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও গে—সুধীরের সঙ্গে একটু ঘুরে এস।"

উৎপলা অমনি ব'লে উঠল—"না, না, তুমি না গেলে আমিও যাব না। আমি বরং খোকনের কাছে থাক্‌ছি। তুমি একটু বেড়িয়ে এস। তোমার ভাবনা নেই। দাদা ফিরলে আমিই খেতে টেতে দেব।"

"বাঃ সে বুঝি একটা কথা হল! তুমি 'দাদা বৌদি'র কাছে দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ। তুমি ঘরে ব'সে থাক্‌বে আর 'বৌদি' বেড়িয়ে বেড়াবে! না, না, সে হবে না। যাও তুমি সুধীরের সঙ্গে একটু ঘুরে এস গিয়ে। এ ক'দিন ত বাড়ী থেকে বেরুবার যোটি ছিল না—বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে একেবারে পচিয়ে মেরেছে!"

উৎপলা একটু ইতস্ততঃ করে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে গেল।

সুধীর ও উৎপলা যখন বেড়িয়ে ফিরছিল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাইন গাছের অন্তরাল-বর্ত্তী বাড়ীগুলির মাঝে মাঝে আলোর মালা জ্ব'লে উঠল—সান্ধ্য আকাশের গায়ে তারার মত। চৌরাস্তার কাছে এসে উৎপলা সুধীরকে ব'ল্‌ল—"চল না, আমরা একটা বেঞ্চ দখল করি গে। এখন লোকের ভিড় ক'মে গিয়েছে। তুমি এখনই বাড়ী ফির্‌তে চাও নাকি? এখন বাড়ীতে গিয়ে কি ক'র্‌বে? আজই ত শেষ দিন। তুমি ত কালই চলে যাবে ব'ল্‌ছ।"

সুধীর ব'লল—"বেশ ত' চল না। বাড়ী ফিরবার আমার এমন কিছু তাড়া নেই। সুমনাদি'রা ত' সাড়ে আটটার আগে খান না। এখন সাতটা বাজতেও মিনিট কয়েক দেরী আছে।" বলে সে সেই স্বল্পালোকে নিজের হাত-ঘড়িটায় সময় দেখল।

তারা কিছুক্ষণ সেখানে নীরবেই বসে রইল—কেউ যেন ব'লবার মত কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের আসন্ন বিদায়-ব্যথাতুর হৃদয় দু'টির উপরও যেন সেই পার্ব্বত্য সন্ধ্যার একটা বিষাদমাখা কালো ছায়া পড়েছে। খানিক পরে উৎপলা সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করে বলল—"এবারে দার্জ্জিলিঙে দিনগুলো বেশ কাটল! কিন্তু সময়টা যেন বড্ডই শীগগীর শীগগীর ফুরিয়ে গেল!" ব'লে সে ছোট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে একটু থেমে বলল—"তুমি আর ক'দিন থেকে যেতে পার না? আমার ছুটীর এখনও ত' দিন দশেক বাকী আছে। দাদা বৌদি'রা তাই আমাকে কাল তোমার সঙ্গে কিছুতেই যেতে দিতে চাচ্ছেন না—ব'লছেন এর পরেও ত কত চেনা শোনা লোক নাম্‌বেন, তাঁদের কারও সঙ্গে গেলেই হবে। তুমি যদি ক'দিন থাক ত' আমিও ক'দিন থেকে যাই। নইলে কাল তোমার সঙ্গেই চ'লে যাব। তবু ত' পথটা একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

সুবীর আনমনাভাবে উৎপলার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে করতে ব'লল—"কাল আমার যেতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু কাল না গেলেই নয়। কলকাতায় ক'জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হবে। তা ছাড়া বম্বেতে শীগগিরই একটা 'আর্ট একজিভিশান' হবে—তাতে আমার কয়েকটা ছবি পাঠাতে চাই। তারও সব বন্দোবস্ত করতে হবে ফিরে গিয়ে।" তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার বলতে লাগল—"কাল বেশ তুমিও চল না আমার সঙ্গে? তবু ত' কলকাতা পর্য্যন্ত একসঙ্গে যাওয়া যাবে।...সত্যি এখানে আসবার আগে কে জানত যে এখানে তোমার সঙ্গে এমন ক'রে দেখা হবে—আমাদের দু'জনে এত বন্ধুত্ব হবে! মানুষ কখন যে কি রকম ক'রে কোথায় কোন্ বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে তা বুঝি সে নিজেই জানে না! দু'দিন আগে ভাবিওনি যে দার্জ্জিলিং ছাড়তে—তোমায় ছাড়তে—এমনি মন কেমন করবে!—"

এমন সময়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ল তাদের গায়ে। গায়ে জল পড়তেই তারা আকাশের দিকে চেয়ে দেখল আকাশ মেঘে ছাওয়া। তারা এতক্ষণ নিজেদের নিয়েই তন্ময় হয়ে ছিল—টেরই পায়নি কখন আকাশের তারাগুলি কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট দু' চারটি লোক—যারা তখনও সেখানে ব'সে ছিল—বৃষ্টি আরম্ভ হ'তে তারাও যাবার জন্যে উঠে পড়ল। উৎপলা তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"চল, আমরাও এবারে বাড়ি চলি। বৌদিরা হয়ত ভাববেন। বৃষ্টি এসে পড়ল। যাওয়া-যাওয়ার সময় আর বৃষ্টিতে ভিজে কাজ নেই।"

সুবীর বল্ল—"চল।" ব'লে সে উৎপলার সঙ্গে সঙ্গে চলল বাড়ীর দিকে।

উৎপলা ও সুবীর বাড়ী পৌছাতে পৌছাতেই প্রায় বৃষ্টি থেমে গেল। বাড়ীর কাছাকাছি এসে উৎপলা বলল—"দেখলে আমাদের ভিজাবার জন্যেই যেন বৃষ্টিটা এল! আমরাও বাড়ী পৌছালাম, আর অমনি বৃষ্টিও থেমে গেল। ভাগ্যিস, 'ওয়াটার প্রুফ' সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম! তুমি ত' বইতে পারবে না ব'লে ওটা নিতেই চাচ্ছিলে না! তবু ত' খানিকটা বাঁচা গেল বৃষ্টির থেকে!"

তারা বাড়ী ফিরে দেখল সুমনা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে তাদের প্রতীক্ষা করছেন—তাদের দেখেই তিনি ব'লে উঠলেন—"বাঃ রে! তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? এত দেরী যে! আমি নিজেই তোমাদের ঠেলে ঠুলে পাঠিয়ে দিলাম, আবার বৃষ্টি আসতেই আমি ভেবে মরি! তোমরা ভিজেছ নিশ্চয়ই? যাও, শীগগির কাপড় চোপড় ছেড়ে ফ্যালো গিয়ে।"

উৎপলা অমনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—"না, না, আমরা বিশেষ ভিজি নি। আমাদের দু'জনের সঙ্গেই 'ওয়াটার প্রুফ' ছিল। আমরা ঘুরে টুরে এসে চৌরাস্তাতেই বসেছিলাম। সুবীরদা' সঙ্গে ছিলেন, তাই ভাবলাম একটু দেরী করেই ফেরা যাবে। অনেকদিন পরে আজ 'ওয়েদার'টা ভালো হয়েছিল!"

"যাও, আর ভিজে কাপড়ে থেকো না। শীগগির কাপড় ছেড়ে ফ্যালো গিয়ে।"

উৎপলা কাপড় ছাড়তে গেল। সুবীরও তার নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল। সুমনা তাকে ডাকলেন। সুবীর যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল—ব'ল্ল—"কি? আমায় ডাকলে যে আবার?"

"বলছিলাম কাল কি তোমার না গেলেই নয়? আর দু'দিন থেকেই যাও না? আসা ত' হয়ই না! কতকাল পরে দেখা হল এবারে! তাও কত লিখে লিখে আনিয়েছিলাম। এত যাবারই বা তাড়া কিসের তোমার? তোমার কলেজ খুলতে এখনও ত' দেরী আছে কিছুদিন। ওঁরও খুব ইচ্ছে তুমি আরও কয়েকদিন থেকে যাও আমাদের এখানে। এখানে ভালো লাগছে না বুঝি? তা ভালো না লাগবার ত' কথা নয়।" ব'লে তিনি মৃদু হেসে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন। পরে গলার স্বর একটু নামিয়ে কৌতুক ক'রে ব'ললেন—"কি, আমার ননদটিকে পছন্দ হয়েছে ত? আমায় চুপি চুপি ব'লেই দাও না মনের ইচ্ছাটা? উৎপলারও তোমাকে খুব মনে ধরেছে বলে মনে হয়। উনিও তাই বলছিলেন। শুভকাজে দেরী করতে নেই। আমি মাসিমাকে লিখে তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেলি, কি বল?"

"কি যে বলছ তার ঠিক নেই। তুমি দেখছি ঠিক আগেকার মতই আছ। একটুও বদলাও নি!"

"বাঃ, আমি কি খারাপ কথাটা বললাম শুনি? দু'জনেরই যখন দু'জনকে পছন্দ হ'য়েছে তখন আর মিছিমিছি দেরী করে লাভ কী? এখন দু'হাত এক করে দিলেই হয়, কি বল? এখন ত ভালো চাকরীও করছ। এখন আর বিয়েতে আপত্তিই বা কী থাকতে পারে—ক'নে যখন পছন্দ হয়েছে? আর মাসিমাদেরও উৎপলাকে পছন্দ।"

একটু চুপ করে থেকে একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সুবীর বলল—"না, না, সে হবার নয়।"

"হবার নয় কেন? আমি ঘটকালি সুরু করে দি'ত। ঘটকী বিদায়টা দিও কিন্তু আমায়। শেষকালে ফাঁকি দিওনা যেন আবার।"

"না, না, কি যে বলছ! সে হবার নয়।—"

এমন সময়ে উৎপলার গলার স্বর শোনা গেল। "বৌদি, তোমার মেয়ের ভয় হয়েছে আমি বুঝি আজ এখনই চলে যাচ্ছি—তাই কিছুতেই ছাড়ছে না আমায়"—ব'লতে ব'লতে উৎপলা সুমনার চার বছরের মেয়ে সুনন্দা ওরফে "নুনু"কে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকল। তারা আসতেই সুমনা ও সুবীরের মধ্যে কথাটা চাপা পড়ে গেল।

(খ)

তার পরের দিনের কথা। দার্জ্জিলিং মেলের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কুপে। তারই নীচেকার বার্থটির উপরে নাম লেখা ছিল—"Mr. S. C. Bose"। উপরের বার্থটি খালি। সুবীর বলল—"উৎপলা, তুমি এখানেই উঠে পড় না? রাত্রে আবার একলা একলা কোথায় যাবে? তোমার যখন ঘুম পাবে ব'লো, আমি আপার বার্থে চ'লে যাব।"

উৎপলা বলল, "আচ্ছা"।

দার্জ্জিলিং মেল শিলিগুড়ি ছেড়ে দিল। উৎপলা ও সুবীর ব'সে গল্প করতে লাগল। তাদের কথা যেন আর ফুরায়ই না। মাঝে মাঝে সুবীর বলছিল—"উৎপলা, তোমার ঘুম পাচ্ছে না ত?"

"না, না, আমার একটুও ঘুম পায়নি। আর ঘুমোবার সময় ত পড়েই আছে। কাল বাড়ীতে গিয়ে যত খুশী ঘুমানো যাবে। কাল ত আর তোমায় পাব না।" বলে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

সুবীর একটু চুপ ক'রে থেকে উৎপলার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—"সত্যি, এবারে দার্জ্জিলিঙে তোমায় পেয়ে দিনগুলো যে কী আনন্দেই কেটেছে বলতে পারি না! আজ এই আসন্ন বিদায়ের মুহূর্ত্তে অতীতের স্মৃতিগুলো যেন আরও মধুর ব'লে মনে হ'চ্ছে।···উৎপলা, আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে? আর যদি কখনও তোমার সঙ্গে দেখা না-ই হয় আমায় তুমি ভুলে যাবে না ত? ···উৎপলা, বল, বল, আমায় তুমি মনে রাখবে—চিরদিন।" ব'লে সে অধীর আগ্রহে তার হাত দু'খানি চেপে ধরল—উৎসুক ব্যগ্র নয়নে তাকাল তার মুখের দিকে। উৎপলার চোখ দু'টি উদ্গত অশ্রুতে সজল হ'য়ে উঠল। কিছুক্ষণ তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না। এক ব্যথাপুলকময় অপূর্ব্ব মধুর অনুভূতি জেগে উঠল তার হৃদয়ের প্রতি আকুল স্পন্দনে। সমস্ত শরীর তার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। সে আবেগরুদ্ধ গাঢ় স্বরে আস্তে আস্তে ডাকল—"সুবীরদা—"। তারপর একটু শান্ত হ'য়ে বলল—"সুবীরদা,—তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবনা।"—বলেই সে লুটিয়ে পড়ল সুবীরের কোলের উপরে—তার কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সুবীর প্রথমটা একটু স্তম্ভিত হ'য়ে গেল—কি বলবে কিছুই ভেবে পেল না। তারপর আস্তে আস্তে গভীর স্নেহে তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ব'লতে লাগল—"উৎপলা, আমায় তুমি ক্ষমা কর। এখন বুঝছি তোমার জীবনের সঙ্গে এমনি করে নিজেকে জড়িয়ে আমি মোটেই ভালো করি নি। তোমার মনে অনর্থক শুধু আঘাত দিলাম। এর জন্যে আমি নিজেকেও কোন দিনও হয়ত ক্ষমা করতে পারবনা।—আমি জড়াতে চাইনি। কিন্তু, কেমন করে জানিনা তবু জড়িয়ে পড়লাম। প্রথম থেকেই তোমায় বড় ভালো লেগে গেল!···যাক, সে সব কথা আর এখন বলে কি হবে! উৎপলা, আমায় তুমি ক্ষমা করো।—না, না, আমায় ক্ষমা ক'রতে ব'লব না, আমায় তুমি ঘৃণা ক'রো। আমার অপরাধের যে শাস্তি তুমি দেবে আমি তাই মাথা পেতে নেব। তোমায় আজ যে আমি গ্রহণ করতে পারলাম না এ যে আমার কত বড় দুর্ভাগ্য তা আমি তোমায় কেমন করে বুঝাব? আমার জীবনটা যে কত বড় 'ট্র্যাজেডী' তা' যদি

তুমি জানতে ত' তুমি নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করতে। তোমায় আমি অনেক দিনই বলতে চেয়েছি আমার বিগত জীবনের কথা, কিন্তু পারি নি। কেমন যেন সঙ্কোচ হয়েছে—মনে হয়েছে, অযাচিত এসব কথা, তোমায় বললে তুমি হয়ত' কি মনে করবে। তাছাড়া, আগে আমি নিজেও এতটা তলিয়ে দেখিনি। নইলে আগে থেকেই সাবধান হ'তাম।"

উৎপলা ত্রস্তে উঠে ব'স্‌ল—অভিমানক্ষুব্ধ অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—"দরকার নেই আর তোমার সাবধান হ'য়ে। আমি আর তোমার পথের কাঁটা হ'তে যাব না।" ব'লে সে স'রে ব'স্‌ল সুবীরের কাছ থেকে যতটা দূরে পারে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে অশ্রু-আবিল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাইরের সেই গভীর রহস্যময় বিরাট অন্ধকারের দিকে। গাড়ী তখন পূর্ণবেগে চ'লেছে। সুবীর খানিকক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে ব'সে রইল—তারপর আস্তে আস্তে উঠে উপরের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ট্রেন যখন রাণাঘাটে পৌঁছাল তখন বেশ ফরসা হ'য়ে গিয়েছে। সুবীর উপর থেকে নেমে এল। সহজ ভাবেই উৎপলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"উৎপলা, চা খাবে?"

উৎপলা সারারাত সেইভাবেই ব'সে কাটিয়েছে। সুবীরকে নামতে দেখেই সে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সুবীরের প্রশ্নের উত্তরে তার দিকে না তাকিয়েই ব'ল্‌ল—"না, একবারে বাড়ী গিয়ে খাব।"

সকালে যথা সময়ে শিয়ালদা ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌ল। উৎপলা সুবীরের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে নিজের জিনিষ-পত্র গোছগাছ করে নামাতে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ল। তারপর কুলীদের ব'ল্‌ল একটা ট্যাক্সিতে তার জিনিষগুলো উঠাতে। অপরাধীর মত সুবীর এসে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল—"তোমার বাড়ী পৌঁছে দেব কি? ট্যাক্সিতে তোমার একবারে একলা যাওয়াটা ঠিক নয় কিন্তু। বল ত' আমি তোমার সঙ্গে যাই।"

"না, কোনও দরকার নেই।" বলে উৎপলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ট্যাক্সিতে জিনিষ উঠানো হ'লে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল—"কাঁহা যানা হ্যায়, হুজুর?"

"ভবানীপুর— *নং ল্যান্সডাউন রোড।"

ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতেই—"আচ্ছা, আমি তাহলে আসি"—বলে সুবীর একটা নমস্কার ক'রে চ'লে গেল।

(গ)

তারপর প্রায় তিন মাস কেটে গিয়েছে। এলাহাবাদে একটি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়—তার সংলগ্ন শিক্ষয়িত্রী-দের থাকবার ঘরগুলি। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী উৎপলা মিত্র টিফিনের সময় তাঁর নিজের ঘরের দিকে আস্‌ছিলেন। বাইরে 'লেটার বক্সটার' উপর চোখ পড়তেই তিনি সেটা খুলে দেখতে গেলেন তাঁর কোনও চিঠি আছে কিনা। 'লেটার বক্স' খুলতেই দেখতে পেলেন তাঁর নাম লেখা একখানা খাম। সেটা হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই লেখাটা চিন্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লেন—ঠিক বুঝতে পার্‌লেন না লেখাটা কার হতে পারে। তারপর চিঠিখানা নিয়ে নিজের ঘরে ঢুক্‌লেন—উৎসুক হয়ে ব্যগ্রহস্তে খামটা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেললেন। দেখলেন মস্তো বড় এক চিঠি—ধৈর্য্য রাখতে না পেরে তাড়াতাড়ি চিঠির শেষে নামটা দেখেই চ'মকে উঠলেন। এর কাছ থেকে চিঠি তিনি মোটেই আশা করেন নি। তিনি ভেবেই পেলেন না হঠাৎ এ চিঠি লিখবার কি কারণই বা ঘটতে পারে। মনের আবেগে হাতটা কাঁপতে লাগল। একটু স্থির হয়ে তিনি আস্তে আস্তে চিঠিখানা পড়্‌তে লাগলেন :—

স্নেহের উৎপলা,

আমার এ চিঠিখানা পেয়ে তুমি খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবে জানি। এতদিন পরে তোমায় আবার চিঠি লিখে বিরক্ত ক'রতে এলাম বলে হয় ত' বা তুমি আরও রেগে যাবে আমার উপরে। আমি তোমার কাছে যে অপরাধ করেছি তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিজের অপরাধের গ্লানি আরও বাড়িয়ে তুলতে চাই না। কিন্তু বিদায়বেলায় তোমার সঙ্গে আমার যে মনো-মালিন্যটা হ'য়ে গেল—আমার ভাগ্যদোষে সেটা আমার মনে সেই অবধি অহরহ কাঁটার মত বিঁধছে। তুমি যে আমায় ভুল বুঝবে—আমায় হীন মনে করবে তা আমার কিছুতেই সহ্য হ'চ্ছে না। তোমায় আমি সেদিন কয়েকটি কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি বলবার সুযোগ দিলে না। আমার উপরে তুমি যেরকম চটে গিয়েছিলে তখন, যে বললেও বোধহয়

তুমি কোনও কথা বুঝতে না সে সময়। যাক্। তোমাকে সেই কথা ক'টি বলবা'র জন্যেই আজ এই চিঠি লিখ্ছি। আশা করি, তুমি এজন্যে আমায় ক্ষমা করবে। আর বেশী ভূমিকা না ক'রে আসল কথাটা আরম্ভ করি এবারে।

আমার বিগত জীবনের এই কাহিনীটি শুনে তুমি আমায় যে ভাবে ইচ্ছা বিচার ক'রো। একে চাও ত' রোম্যান্স আখ্যাও দিতে পার। কিন্তু আমার কাছে এটা নিছক রোম্যান্স নয়, তার চেয়েও ঢের বেশী—একটা জীবন মরণের সমস্যা। ...সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন কলকাতাতেই থাকতাম—তখনও এ-কাজ পাইনি। আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকত একটি তরুণী। নামটা তার নাই বা বললাম নাম বললে তুমি হয়ত তাকে চিনতেও পার। মেয়েটির বয়স তখন আঠারো উনিশের বেশী নয়। তাকে ঠিক রূপসী বলা চলে না। তবে কুৎসিতও বলা যায় না। সুঠাম তনু দেহখানি তার—স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি—ঠিক যেন "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব"। মুখখানি লাবণ্যে ঢল ঢল, রং যদিও শ্যাম বর্ণ। তার চেহারার মধ্যে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে ভাষা ভাষা আয়ত চোখ দু'টি তার—স্বপ্নমাখা। যাক্, তার রূপের বর্ণনাটা বড় বেশী রকম করা হল। তোমার হয়ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে।...তার সঙ্গে প্রথমে আমার মৌখিক আলাপের বা মেলামেশার সুযোগ তেমন করে ঘটেনি কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করতাম—আভাসে ইঙ্গিতে। আমি যে-ঘরে ব'সে ছবি আঁকতাম তারই ঠিক সামনের ঘরটিতে থাকত আমার তরুণী বন্ধুটি। সে প'ড়ত 'ডাওশেসান' কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। রোজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখতাম কলেজের 'বাস'টি এসে দাঁড়াত আমাদের বাড়ীর সামনেই, কারণ তাদের বাড়ীটার ঢুকবার রাস্তা ছিল একটু গলির মধ্যে দিয়ে। সে যখন রোজ গিয়ে বাসে উঠত আমি তখন আমার ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। সেও একবার চকিতে উপরে আমার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে নিত। দু'জনে চোখাচোখি হলেই সে একটু মিষ্টি হাসি হেসে চলে যেত। এই রকমে আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। কখনও কখনও আমার পাঠনিরতা বন্ধুটি পড়ার মাঝেই গেয়ে উঠত একটি গানের অসমাপ্ত পদ। তার সেই মিষ্টি গলার সুরটি সান্ধ্য বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসত আমার ঘরে—ভুল করে দিত আমার কাজ। জ্যোৎস্না রাতে আমি যখন ছাদে গিয়ে বাঁশী বাজাতাম অনেক সময় দেখতাম পাশের বাড়ীর ছাদের আলসের কাছে স্বপ্নময় দুটি মুগ্ধ ব্যাকুল চোখ।...তারপর হঠাৎ কিছুদিন থেকে আমার বন্ধুটিকে আর দেখতে পাওয়া যায় না; কলেজের বাসও আর এসে দাঁড়ায় না; ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারলাম না। বন্ধুর খবর জানবার জন্যে একটু ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম; কিন্তু কি করে তার খবরটা পাওয়া যায় ভেবে পেলাম না। জানতাম বৌদি ও-বাড়ীতে যাওয়া আসা করেন; কিন্তু তাঁর ঠাট্টার ভয়ে তাঁকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হ'ল না। এইখানে আমার বন্ধুটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সে মাতৃপিতৃহীনা—কলকাতায়, তার দিদির বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা ক'রত। দিদিই ছিলেন তার একমাত্র অভিভাবিকা। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে বোন বি-এ পাশ ক'রলেই আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেন। বৌদি'কে দিয়ে প্রস্তাবটা আমার কাছে করেও ছিলেন। কিন্তু আমি তখন কথাটা কোনও মতে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। যাক্—আমার বন্ধুটির খবর আমার ছোট বোন তপতীর কাছে জিজ্ঞেস করব মনে করছিলাম; কিন্তু ভয় হচ্ছিল, সে ছেলে মানুষ—না জানি সে কথাটা সকলের কাছে ফাঁস করে দেয়। এমন সময়ে তপতী নিজে থেকেই খবর দিল একদিন—'অমুকদিদির খুব অসুখ, রোজ জ্বর হ'চ্চে, ডাক্তারেরা ব'লছেন যত শীগগির সম্ভব চেঞ্জে নিয়ে যেতে। রাঁচিতে ওর এক মাসী আছেন সেখানে গিয়েই ও কিছুদিন থাকবে চেঞ্জের জন্যে। ওর দিদি ত আর তাঁর নিজের ঘর সংসার ফেলে বোনকে নিয়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন না ইত্যাদি।' খবরটা শুনে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্ল। তাকে দেখবার জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ল। একবার ভাবলাম একদিন তাদের বাড়ী গেলে হয়। তার ভগ্নীপতি আলীপুরের উকিল। তাঁর সঙ্গে আমার অল্প-স্বল্প পরিচয় ছিল। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম সেই পরিচয়-সূত্রে ওবাড়ীতে গেলেও ভগ্নীপতির শ্যালিকাটির সাক্ষাৎ নাও মিলতে পারে।...তারপর একদিন সে সুযোগ এল। মেয়েটির দিদি একদিন আমায় ডেকে পাঠালেন। আমায়

একান্তে সব কথা খুলে বললেন—আর বল্‌লেন যে আমারই উপর নির্ভর করছে এখন তাঁর বোনের জীবন। আমি যদি তাকে বিয়ে করতে নাই পারি—আর এখন তার বিয়ের কথা উঠতেই পারে না—তাকে একটু ভালোবাসতে, সহানুভূতি দেখাতে পারি ত। তার সেই প্রাণঢালা ভালোবাসার সামান্ত প্রতিদানও কি আমার দ্বারা সম্ভব নয়? আমি যে একটু ভাবপ্রবণ তা' বোধ হয় তুমি দার্জ্জিলিঙে আমার সঙ্গে ক'দিন মিশেই বুঝতে পেরেছ। আর তাছাড়া, আমার বয়সটাও ছিল তখন অল্প—কুড়ি একুশের বেশী নয়।...তখন আমার হৃদয়ও অপরিসীম করুণা ও সহানুভূতিতে ভরে গেল। মনে জেগে উঠল একটা মহান্ আত্মত্যাগের গরিমা ও গবের জন্যে নিজ সুখ বিসর্জ্জনের দুর্জ্জয় লোভ। ভাবলাম আমার নিজের জীবন দিয়েও যদি তাকে বাঁচাতে পারি ত বাঁচাব—নাই বা পেলাম তাকে এজীবনে। তাকে বাঁচিয়ে তুল্‌ব আমার ভালোবাসা দিয়ে—এই হল আমার পণ। মনে হল এজীবনে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে না বাঁচলে জীবন আমার একবারে মরুভূমির মত শূন্য হয়ে যাবে। ঠিক হ'য়েছিল তাকে রাঁচী নিয়ে যাবার আগে কিছুদিন কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে রাখা হবে। আমি যখনই সময় পেতাম তার কাছে যেতাম—তাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শুনাতাম, তার কাছে ব'সে একটার পর একটা গান গেয়ে যেতাম—তাকে বাঁশী বাজিয়ে শুনাতাম। এমনি করে আমাদের দু'টি তরুণ হৃদয়ের অদল বদল হয়ে গেল। আমি তার কাছে বাগ্দত্ত হ'লাম—বলা বাহুল্য, বাড়ীর কাউকে না জানিয়েই। কাউকে জানান আবশ্যকও মনে করি নি। ক্রমেই আমাদের ঘনিষ্টতা বেড়ে চল্‌ল। কথাটা দাদার কাণে যেতে তিনি আমায় এবিষয়ে সাবধান করে দিতে চেষ্টা ক'র্‌লেন একবার—বললেন—'মেয়েটি সুস্থ থাক্‌লে ত কোন কথাই ছিল না। অমন মেয়ে আমরা লুফে নিতাম। কিন্তু এ বিয়ে যখন হবার নয় তখন আমার মনে হয় অতটা ঘনিষ্টতা না করাই ভালো। তাছাড়া অসুখটাও ত ছোঁয়াচে।' আমি খানিকটা চুপ করে থেকে ব'ললাম—'বিয়ের ত কোন কথাই উঠছে না এখানে, ও যখন এত অসুস্থ। আমি যদি গিয়ে তাকে একটু আনন্দ দিতে পারি, বন্ধু বা প্রতিবেশী হিসাবেও কি আমার সেটা কর্ত্তব্য নয়? আর ডাক্তারেরা এখনও ত ঠিক ধরতে পারেন নি কি হয়েছে।' এর উত্তরে 'তুমি যা' ভালো বোঝ কর। আমি আর কি বল্‌ব ব'লে দাদা, থেমে গেলেন। কিছুদিন পরে মেয়েটিকে রাঁচী নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমিও দেশ ভ্রমণের ছুতো ক'রে বেশ মাস তিনেক থেকে এলাম রাঁচীতে আমার একটি বন্ধুর বাড়ীতে। রাঁচীতে গিয়ে প্রথম দিকটায় মেয়েটির অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। পরে সকলের পরামর্শমত ও আমার একান্ত জেদে তাকে ইটকীতে 'স্যানাটোরিয়ামে' দেওয়া হ'ল। সেখানে গিয়ে সে ক্রমেই ভালো হ'য়ে উঠতে লাগল। এখন সে বেশ ভালোই আছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তার স্বাস্থ্য আগেকার চেয়েও ঢের ভালো হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারেরা তাকে বিয়ে ক'রতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেন ওর বিয়ে করাটা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়—সেটা আমাদের কারোও পক্ষেই ভালো হবে না। যাক্...আজও সে বেঁচে আছে এবং আমি তার কাছে বাগ্দত্ত। এ ক্ষেত্রে আমি আর কাউকে বিয়ে করলে 'তার' কাছে আমায় অপরাধী হ'তে হবে, আর তাকেও মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়া হবে অনেকটা। তুমি হয় ত একথা শুনে বলবে যে আমার একক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে অতটা মেলামেশা করাটাই উচিত হয়নি। তা' হয় ত কতকটা সত্যি। আমার বিরুদ্ধে তোমার এ অভিযোগটা কিছুমাত্র অন্যায় ব'লে মনে হয় না। কিন্তু আমাকে বিচার করবার সময় মনে রেখো যে আমি শিল্পী। মনে আছে দার্জ্জিলিঙে একদিন তুমি আমায় ব'লেছিলে—"শিল্পীরা বড় চঞ্চলমতি হয়—তারা একজনকে বেশীদিন ভালোবাস্‌তে পারে না।" তোমার কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। আমি অনেক সময় নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছি। আমার বাস্তবিকই মনে হয় জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তগুলিই আমাদের শিল্পীদের কাছে চরম সত্য হ'য়ে ওঠে—তাই আমাদের কাছে কোন ভাবের স্থায়িত্বই সবচেয়ে বড় কথা নয়। মনে ক'রো না এসব কথা লিখে আমি সাফাই গাইছি কিংবা নিজ অপরাধের গুরুত্ব লাঘব ক'রতে চাচ্ছি। তা যদি মনে কর, ত আমায়

তুমি খুবই ভুল বুঝবে। আমি আর যাই হই, আমি ভণ্ড বা প্রবঞ্চক নই। আমি তোমার মন নিয়ে খেলা ক'রতে যাই নি—এটুকু অন্ততঃ বিশ্বাস করতে পার। তোমায় আমি যথার্থ-ই ভালোবেসেছিলাম। আমার সেই প্রথম প্রেমের জন্যে আত্মাহুতিও যতখানি সত্যি, তোমার ভালোবাসাটাও ঠিক ততখানি সত্যি। জানি না তুমি আমার একথাটা বিশ্বাস করতে পারবে কি না। আমার এক এক সময় মনে হয় বিধাতার বোধ হয় অভিপ্রেত নয় যে যাকে আমি ভালোবাসব তাকে আমি পাব। হয় ত বা তোমায় জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলে সংসারের প্রতিদিনের দীনতা পঙ্কিলতার মাঝে তোমায় ছোট করে—মলিন করে ফেলতাম ব্যথার অশ্রুজলে ধোয়া স্মৃতিখানি তোমার অম্লান সুন্দর হ'য়ে ফুটে থাকুক আমার অন্তরে ভোরবেলাকার শিশিরসিক্ত সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলটির মত—নির্ম্মলতায় টল্ টল্।......উৎপলা তুমি যে আমায় কোন দিন ভুলে যাবে এ কল্পনাও আজ আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। কিন্তু আমায় মনে রেখো এ অনুরোধ করবারও ত কোন অধিকার আমার নেই। তোমার সরল বিশ্বাসপূর্ণ আত্মনিবেদনের বদলে তোমায় যে আমি অতখানি ব্যথা দিলাম তারই নির্ম্মমতা আমায় আজ সব চেয়ে বেশী পীড়া দিচ্ছে। তার কাছে নিজের জীবনের ক্ষতিটাও সামান্য ব'লে মনে হচ্ছে।

যাক্ গে। অনেক অবান্তর কথা লিখে ফেললাম। কিছু মনে ক'রো না। ইতি

হতভাগ্য সুবীর বসু।

চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়া শেষ করে উৎপলা সেখানি হাতে নিয়েই বসে ছিল। কী যে ভাবছিল সে হয় ত' নিজেই জানে না। "উৎপলা, তুমি এ বেলা আর ক্লাসে যাবে না? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?—বলে তার একটি বন্ধু একজন সহ-শিক্ষয়িত্রী এসে ঘরে ঢুকল। উৎপলা অমনি চমকে উঠে চিঠিখানা তাড়াতাড়ি একটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিল। ছোট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে বলল—"ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে নাকি? কই, আমি শুনি নি ত। চল যাচ্ছি।"

শ্রীঊষা বিশ্বাস

মহাশক্তি

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, পি-এইচ-ডি

মা—শ্রীঅরবিন্দের প্রণীত The Mother পুস্তক 'মা' নামে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। প্রকাশক—আর্য্য পাব্লিশিং হাউস, ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগে শক্তিসাধনার স্থান কোথায় এই পুস্তকে প্রধাণতঃ তাহাই দেখান হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের যোগের সূত্র হইতেছে মানবহৃদয়-কন্দরে সত্য ও সুন্দরকে প্রাপ্তির জন্য একটি আস্পৃহা। এই আস্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত সত্তাটি একটি পুষ্পের ন্যায়, সমস্ত স্তরে স্তরে, প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং ভগবৎ অভিমুখী হয়। যখন মানুষ তাহার সমস্ত সত্তার ভিতরে এই ভগবৎ অভিমুখী বৃত্তিকে অনুভব করে তখন তাহার সাথে সাথে অতিমানস-স্তর হইতে নাবিয়া আসে একটি দিব্য করুণা। এই দিব্য করুণা এবং ভাগবৎ প্রসাদ ভগবৎ প্রাপ্তির পথের সমস্ত বাধা ও বিঘ্নকে অপসারিত করিয়া দিব্য আলোকের স্নিগ্ধ প্রভায় তাহাকে পূর্ণ করে। শ্রীঅরবিন্দের যোগের ভিত্তি হইল এই সত্তার

সর্ব্বতোমুখী সমর্পণ এবং সে সমর্পণের ভিতর থাকে ভগবৎ প্রাপ্তির পূর্ণ সংবেগ। এই সংবেগপূর্ণ শরণাপত্তি শ্রীঅরবিন্দের যোগের প্রথম স্তর।

এই যোগের দ্বিতীয় স্তর হইতেছে ভগবৎশক্তির অবতরণ। শরণাপত্তির সাথে সাথে দিব্যলোক হইতে নামিয়া আসে মহাশক্তির স্পন্দন যাহা আমাদের সত্তাকে পবিত্র করিয়া দিব্য বিভূতিতে মণ্ডিত করে। মহাশক্তি সাধকের অন্তরে তাহার সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করে। মানুষ এখানে সাধক নয়। মহাশক্তির অবতরণ এই সাধনার প্রধান কথা। দিব্য সৃষ্টি, দিব্য স্থিতি ও দিব্য স্ফূর্ত্তি হইল সাধনার সিদ্ধি।

এইজন্যেই পুস্তকে এই মহাশক্তির রূপ ও ক্রিয়া প্রধাণতঃ অঙ্কিত হইয়াছে। মহাশক্তি এক হইলেও সৃষ্টি, স্থিতি, জ্ঞান ও সংহার শক্তিরূপে তাহার চারিটী রূপ আছে। সৃষ্টিরূপে তিনি সরস্বতী, স্থিতিরূপে তিনি লক্ষ্মী, সংহার রূপে তিনি কালী, জ্ঞানের প্রশান্তিরূপে তিনি মহেশ্বরী। সরস্বতী সৃষ্টির কৌশলে পূর্ণ। সৃষ্টির সংগতি বোধই তাঁহার প্রধান কার্য্য। মহাকালীর ভিতর আছে বল, বীর্য্য, দুর্ব্বার তীব্রতা, এবং যাহা কিছু দিব্য-জীবনের বিরোধী তাহার প্রতি তীব্র বিরক্তি এবং অব্যর্থ বিনাশ। সাধকের ভিতর যাহা কিছু ম্লান যথা,—মিথ্যাচার, ব্যভিচার, দীর্ঘসূত্রতা ও জড়তা—তাহাকে তিনি নিমেষেই ভস্মসাৎ করিয়া আমাদের প্রকৃতিকে ভাগবৎ-সৌন্দর্য্যের সুষমায় পূর্ণ করিবার অবকাশ করিয়া দেন। তিনি জ্ঞানে আনিয়া দেন বিশ্ববিজয়িনী শক্তি। সৌন্দর্য্যে সুষমায় আনিয়া দেন উর্দ্ধায়িত গতি এবং সিদ্ধিকে সহজলভ্য করিয়া তোলেন। কিন্তু শক্তির জ্ঞান এবং বলই মহাশক্তির পরিপূর্ণ রূপ নয়। তাহার আর একটি সূক্ষ্মতর রূপ আছে যাহার দিব্য সৌন্দর্য্য, দিব্য সুষমা, দিব্য শ্রীকে আমাদের নিকট প্রকাশিত করেন। ইহার স্পর্শে জীবনের ছন্দ আনন্দে লীলায়িত হইয়া ওঠে এবং দিব্য স্ফূর্ত্তির সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছনা আমাদের জীবনের সত্তাকে পূর্ণ করে। মহালক্ষ্মীর প্রকাশ হয় তখনই যখন জীবনের কোনও স্থানে রুক্ষতা, ক্লিষ্টতা রুদ্ধ হইয়া থাকেনা, যখন আমাদের জীবনটী স্বচ্ছতায় পূর্ণ ও নবীনতায় স্ফূর্ত হইয়া ওঠে। শক্তির আর একটী রূপ আছে—মাহেশ্বরী। জীবনের অনন্ত প্রশারতা, সীমাহীন ব্যাপ্তি, পরিপূর্ণ জ্ঞানের স্থিতি ও প্রজ্ঞালোকের শান্তি এই শক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। মাহেশ্বরী-শক্তি জীবনের সৃষ্টির ছন্দ ও স্থিতির সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানবৈভবে সাধককে পরিপূর্ণ করে। এই শক্তি দেয় সমাধির নিবিড়তা এবং অচঞ্চল প্রাণের স্তব্ধতা। এই মহান স্তব্ধতার ভিতরে প্রকাশিত হয় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান সৃষ্টিস্থিতির উপরে মুক্তলোকে উদ্ভাশিত। মহাশক্তি সাধককে প্রতিষ্ঠিত করে এই সীমাহীন জ্ঞানময় বিশ্বে। শক্তির অপার্থিব আরো অনেক রূপ আছে যাহা বিশ্বপ্রাণের ছন্দে কোথাও ধরা পড়েনা।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় এই মহাশক্তির প্রসাদ ও করুণা প্রধান অবলম্বন। এই করুণাকে অনুশরণ করিয়া আমরা শক্তির ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত হই এবং জন্ম-মরণ-পূর্ণ সংসারের মধ্যে আছে যে মহাশক্তির অনন্ত নৃত্য তাহার সহিত পরিচিত হইয়া বিশ্ববিবর্ত্তনের আনন্দ অনুভব করিতে পারি। শুধু এই নয়, এই মহাশক্তির হাতের ক্রীড়নক হইয়া বিশ্বব্যাপার সংঘটনের কারণ হইতে পারি। ধ্যান, জ্ঞান, যোগৈশ্বর্য্য, বল, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা সকলই হয় আমাদের করতলগত কেননা এর প্রত্যেকটির দ্বারা মহাশক্তি আমাদের সত্তাকে সুসম্পন্ন করিয়া তোলেন তাহার বিশ্বলীলা সম্পাদন করিবার জন্য।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

আলো

শ্রীশান্তি পাল

দূরে, অতি দূরে,—
কৃষ্ণমেঘ প্রকম্পিত অরুণের অশ্বপদখুরে
অন্ধকার পাষাণ-গহ্বরে
স্তর হ'তে স্তরে
সহসা জাগিয়া ওঠ রজনী প্রভাতে
জ্যোতির সংঘাতে
সঞ্জীবনী সুধাধারা ঢালো,—
আলো, ওগো আলো,
তোমারে কি বাসিয়াছি ভালো!

উদয় অচল শিরে
ধীরে ধীরে
অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে
প্রভাত সঙ্গীতে
বিছাইয়া দাও যবে—উষসীর মরণ-শয়ন,
অমনি তখন
অমৃতের সুধাধারা ঢালো,—
আলো, ওগো আলো,
তোমারে কি বাসিয়াছি ভালো!

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড উত্তাপে
নারিকেল কুঞ্জ যবে থর থর কাঁপে,
পরিপূর্ণ হও তুমি আকারের সম্পূর্ণ প্রকাশে
স্ফটিক আকাশে;
তিলে তিলে পলে পলে যাও দূরে সরি'
মৃত্যুরে বিস্মরি'
পশ্চিম গগনতলে।
নির্নিমেষ, চাহি কুতূহলে,—
তব উষ্ণশ্বাসটুকু ঢালো,—
আলো, ওগো আলো,
তোমারে কি বাসিয়াছি ভালো!

বিদায়ের শেষক্ষণে
প্রশান্ত লগনে
কি যে ভাবি মনে
দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তের তরে
দূর দিগন্তরে
অস্তাচল পারে
সহসা মুইয়া পড় আপনার ভারে;
পশ্চাতে আঁকিয়া রক্তলিখা,—
গোধূলীর সমুজ্জ্বল শিখা।
অপূর্ব্ব সে সৌন্দর্য্যের ছবি
আমি কবি
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকি আকাশের পানে,
শঙ্খ ঘণ্টা মুখরিত সন্ধ্যার বন্দনা গানে
নক্ষত্রের দীপগুলি জ্বালো,—
আলো, ওগো আলো,
তোমারে কি বাসিয়াছি ভালো!

মিলন-দূতী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌-এ

এক বছরের বেশী বিবাহ হইলেও প্রতুল স্ত্রীকে লইয়া এক মাসের বেশী ঘর করিতে পায় নাই। বি, এ পাশ করিয়া বর্ত্তমানের যুবক সম্প্রদায় যেমন বাস্তব জগতের ধাক্কায় দিশেহারা হয়, প্রতুল ঠিক তেমনি সময়ে কপালক্রমে সদাগরি অফিসে ১০০্ টাকা বেতনের একটা চাকুরী পাইয়াছে। সুপুরুষ বলিয়াই হউক বা আভিজাত্য থাকার দরুণই হউক, তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ অনেকই আসিতেছিল। সহপাঠি বন্ধু বলিয়াই সম্ভবতঃ অনিমেষ তাহার ভগ্নির সহিত প্রতুলের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যখন তাহার বিধবা জননীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি এক কথায় রাজি হইয়া গেলেন। উষার সহিত প্রতুলের বিবাহ হইল। অর্থ-সঙ্কটের সংঘাতে তখনও প্রতুলের কবি-হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় নাই। উষার সলজ্জ প্রেম তাহার বুভুক্ষু হৃদয়ে স্বপ্নের আবেশ সৃষ্টি করিল। উষার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, সুললিত সঙ্গীত তাহার প্রাণ মাতাইয়া তুলিল।

দাম্পত্য-জীবনে প্রতুলের সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের সম্পত্তি হইল তাহার পত্নীর সঙ্গীত-নৈপুণ্য। বন্ধু বান্ধবেরা তাহার মুখর স্তুতিবাদে চমৎকৃত হইল। কেহ কেহ অবিশ্বাসের ইঙ্গিতে প্রতুলকে উৎপীড়িত করিতেও ছাড়িল না। প্রতুলের সহিত গত রাত্রিতে পরেশের তো হাতাহাতি হয় আর কি! অবশেষে মেসের পুরাতন মেম্বার সরকারী দাদা মতিবাবু আপোষ করিয়া দিলেন। সর্ত্ত রহিল প্রতুল পরেশকে স্ত্রীর গান শুনাইয়া দিবে। আজ সারা সকালটা সুযোগের চিন্তাতেই কাটিতেছে। দশটার সময় যথারীতি অফিসে যাইবার পথে রান্নাঘরের পাশে ভাঙ্গা বিস্কুটের টীনের ভিতর প্রতুল অভ্যাসমত হাত দিতেই তাহার নাম লেখা একখানি খাম ও একখানি পোষ্ট কার্ড পাইল। পোষ্টকার্ড খানি তাহার শ্বশুর লিখিয়াছেন। হঠাৎ তিনি সহরতলীতে দুইদিনের জন্য সপরিবারে আসিয়াছেন। তাঁহার বড়মেয়ে ও জামাইকেও তিনি আসিতে চিঠি দিয়াছেন। অনিমেষ উষাকে আনিবার জন্য প্রতুলের বাড়ীতে গিয়াছে। সে যেন কিছু মনে না করিয়া অতি অবশ্য সন্ধ্যায় তাঁহার ওখানে যায়। চিঠির শেষে চতুর্দ্দশী শ্যালিকাও কি একটা দিব্য দিয়া যাইতে লিখিয়াছে। অপর খানি প্রতুল লেখা দেখিয়াই অনুমান করিল কাহার।

হাত ঘড়ির দিকে চাহিতেই সে চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি হাঁকিল "পরেশ, বিকেলে বেরুস্ নি কোথাও, ভারী দরকারী কথা আছে।" পরেশের উত্তর শুনিবার আগেই সে বাহির হইয়া পড়িল।

চারিটা বাজিতেই প্রতুল চঞ্চল হইয়া উঠিল। টিফিনের সময় সে খাতা ফেলিয়া উঠে নাই, কারণ একটু সকালে বাহির হইতে হইবে। কোনও রকমে সে নিজেকে আরও এক ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিল। পাঁচটার সময় বড় বাবুর কাছে গিয়া অতি সন্তর্পণে দাঁড়াইল। তাহার মুখে তখন আশা নৈরাশ্যের স্পষ্ট ছাপ। গজানন ধাড়া বড়বাবু হইলেও যৌবনের স্মৃতি ভুলিয়া যান নাই, অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে মাত্র। প্রতুলের দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন "আজ তো শনিবার নয়, তবে—"প্রতুল কি সব যেন বলিতে যাইতেছিল, তিনি বাধা দিলেন-"বুঝেছি, যাও কাল ফিরছো তো?" প্রতুল কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল। চেয়ার টেবিলের বাধা না থাকিলে হয়তো পায়ের ধূলা লইয়া ফেলিত। শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহিরে আসিল।

যথারীতি প্রসাধন শেষ করিয়া আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া নিজেকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে চোখের কোণ একটু জ্বালা করিল। সে ডাকিল—"পরেশ, যাবে তো শীগগীর বেরোও।" কলেজের ছাত্র হইলেও অজয়কে প্রতুল সঙ্গে

লইল। প্রতুলের চোখে তখন কলিকাতার রঙ্ বদ্লাইয়া গিয়াছে। কলিকাতার আকাশ বাতাস যেন বড় সুন্দর, রূপময় বোধ হইল। একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তিনজনে তাহাতে উঠিয়া পড়িল।

* * * গাড়ী হইতে নামিতেই প্রতুলের শ্বশুর সস্নেহে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। বাহিরের ঘরে সকলে উপস্থিত হইতেই অনিমেষ আসিয়া হাজির হইল। যথারীতি পরিচিত হইতে বিলম্ব হইল না। সে আলাপী লোক গল্প জুড়িয়া দিল পরেশের সহিত। জামাইবাবুর আগমনে আনন্দের আতিশয্যে মায়া বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই সসম্ভ্রমে পিছাইয়া গেল; ভিতর হইতে বলিল "দিদির ভয়ানক মাথা ধরেছে, সারা গা ময় অসহ্য ব্যথা, আর গা বমি বমি কর্‌ছে, দেখবেন আসুন।"

* * * উষা মাথাব্যাথায় ছটফট করিতেছিল, যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে এতদিন বাদে স্বামী যখন তাহার কাছে আসিবেন তখন তিনি কি ভাবিবেন; তাহার চোখের জল বাধা মানিতেছিল না। "খুব নাকি মাথা ধ'রেছে?" প্রতুল তাহার পাশে আসিয়া বসিল। উষা একটীও কথা কহিতে পারিল না। তাহার নিরবতাকে প্রতুল ভুল বুঝিল। পরেশের কাছে তাহার কান বাঁচান দায় হইবে। সে বলিল—"পরেশ এসেছে তোমার গান শুনতে। সে নাছোড়বান্দা, এদিকে তোমার—। সব মানুষের কপালে করে।" বিব্রত অশান্ত মনে উঠিয়া দাঁড়াইতে তাহার কাণে গেল—"মাথার জ্বালায় অস্থির, তার গান করবে। আমার তো ভয়ই হচ্ছে, এ ইনফ্লুয়েঞ্জার পূর্ব্বলক্ষণ। আর তারিতো গাই, তাই লোক ডেকে শোনানো।" উষা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, কিন্তু প্রতুল তখন চলিয়া গিয়াছে।

বাহিরের ঘরে তখন রাজনীতি, নারীপ্রগতির ধারা প্রভৃতি জটিল সমস্যার তর্ক চলিতেছিল, নিঃশব্দে সে শ্বশুরের প্রশ্নের অস্পষ্ট জবাব দিয়া বাহির হইয়া গেল।

গঙ্গার ধারে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল উষার কথা। সে নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিল। স্বামীর সম্মান রক্ষার কাছে মাথা ধরা বড় হইল। ভালমন্দ অনেক ধারায় চিন্তা করিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ওপারের ঘড়িতে ৮॥ বাজিতেই তাহার চমক ভাঙিল। অলসমন্থর গমনে প্রতুল বাসায় ফিরিল। নারী কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতালাপে সে অবাক্ হইয়া গেল। যখন সে বাহিরের ঘরে ঢুকিল, পরেশচন্দ্র ভোজনান্তে মহা আরামে তখন পান চিবাইতেছিল। পাশের ঘরে গানের মজলিশ, অজ্ঞাতেই তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

* * * * ফিরিবার সময় পরেশ নিজের ক্রটী স্বীকার করিয়া অজস্র প্রশংসা করিল উষাদেবীর গানে, কিন্তু প্রতুলের মন তখন কিসে এতই আঁধার যে হাসিয়া তাহার তৃপ্তি জানাইতে পারিল না।

* * * * ডাক্তার যদুনাথ প্রতুলের বড় ভায়রা। খাইতে বসিয়া নাম মাত্র মুখে দিয়া প্রতুল যখন হাত গুটাইল, তখন যদুনাথের স্ত্রী বলিলেন—"হ্যাঁ ভাই, তোমার মন মেজাজ এবার বদলে গেছে দেখছি, একদিনের জন্য তো দেখা, তা মুখ অমন করে থাকার মানে কেউ কথা বলে সময় নষ্ট করো না, এই তো? আচ্ছা আমরা না হয় কথা নাই বল্লুম।"

প্রতুল চেয়ারে বসিয়া অন্যমনে সিগারেট টানিতেছিল। উষা আসিয়া প্রণাম করিয়া কিসের আশায় স্বামীর একান্ত কাছটীতে দাঁড়াইল। প্রতুল গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিল, অধীর হইয়া উষা বলিয়া ফেলিল—"মাথাধরায় যে এত কষ্ট তা জানতুম না, ভাগ্যি জামাইবাবু ওষুধ দিলেন। হ্যাঁগা, পরেশ বাবু কি বল্লেন?"''কি কথা বলবে না?" মন তরল হইয়া আসিতেছিল কিনা কে জানে। প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, "কি ওষুধ তিনি দিলেন?" উষা জবাব দিবার আগেই বাহির হইতে আসিল "রচি কোম্পানীর সেরিডন, ভয় নেই, এতে এস্‌পিরিন্ নেই, বুক খারাপ হবে না। রাত্তির অনেক হয়েছে, সন্ধ্যাটিতো অনর্থক নষ্ট ক'রেছ, এখন সেরিডনের তত্ত্ব নিয়ে বাত্তিরটি খুইয়ে ফেলোনা। শুয়ে পড়ো।" মুখের দিকে চাহিতেই প্রতুল দেখিল, অভিমানিনীর চোখের কোলে জলের রেখা। গভীর আবেগে উষাকে সে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

মেসে অবিবাহিত পরেশ হয়তো তখন মতিদা'র ঘুম ভাঙাইয়া নিজের দোষ স্বীকার করিতেছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

আমি একা বাতায়নে

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্রির দিগন্ত-পারে আঁখি মোর দিনু প্রসারিয়া,—
চঞ্চল-পূবালি বায়ে দুলিতেছে নারিকেল বন,
কোথা হ'তে শোনা যায় কপোতের অশ্রান্ত কূজন,
অরণ্যের আবেদন নভোপানে চলে প্রবাহিয়া।
নক্ষত্র চাহিয়া আছে অনির্ব্বাণ অগ্নিময় চোখে
পশ্চিমে পাণ্ডুর শশী ধীরে ধীরে মাগিছে বিদায়,
বর্ষণ-নিঃশেষ মেঘ সুপ্তিমগ্ন অনন্ত-সীমায়,
ধরিত্রী স্পন্দন-হারা তমিস্রার ঘন-ছায়ালোকে।

তিমির-গুণ্ঠনতলে অকস্মাৎ ওঠে সচকিয়া
নিভৃত অন্তর হ'তে ব্যথাতুর দিনের সঞ্চয়,
কুণ্ঠিতা-বধূর মতো বাণী তার ব্রীড়াবন্ধময়,
ভীরু অনুরাগ যেনো ভাষা তার পেয়েছে খুঁজিয়া।
সে তো নহে বিজয়িনী, নাহি জানে দাবী-অধিকার,
কী যেনো বলিতে চায় ক্ষীণ কণ্ঠে, সঙ্কোচের ভারে,
কিশোর-প্রেমের মতো বিকশিতে চাহে আপনারে,
গোপন-গন্ধের মতো বহি' আনে অর্ঘ্য-উপচার।

প্রভাত-শিখর হ'তে সায়াহ্নের অস্ত-সিন্ধু পানে,
উত্তাল তরঙ্গ তুলি' মানুষের চলে অভিযান,
যন্ত্রের আবর্ত্ত মুখে জীবনেরে দিয়া বলিদান,
আপন সমাধি-শয্যা বিরচিয়া ইস্পাতে-পাষাণে!

বিষাক্ত নিঃশ্বাস-ধূম আকাশেরে করিয়া জর্জ্জর,
মৃত্যুর অলক্ষ্য-বীজ বায়ুস্তরে করে সঞ্চারিত,
কালের উদ্যত খর-তরবারি হাসে সুশাণিত,
বসুধার স্তনে হেথা প্রাণ-ধারা বিশুস্ক, মন্থর!

মানব ছুটিয়া চলে কোন দিকে নাহি লক্ষ্য তার,
নির্ম্মল নিষ্ঠুর করে বনশ্রীরে দেয় নির্ব্বাসন,
স্বহস্তে গড়িয়া তোলে অপনার দুশ্ছেদ্য বন্ধন,
বিষপাত্র লভিয়া সে অমৃতের করে অহঙ্কার।
চক্র-পিষ্ট ধূলিতলে,—জনাকীর্ণ পথের মাঝারে,
আমিও করেছি পান উগ্রতার সুরাপাত্রখানি,
গতির তরঙ্গ-স্পর্দ্ধা মুহূর্ত্তে আমারে নিলো টানি'—
সহস্রের স্রোতোবেগে ভাসিলাম উন্মত্ত-জোয়ারে!

কর্ম্মব্যস্ত নগরীর সীমা হ'তে বহু ব্যবধানে,
সুন্দর-প্রশান্তি সাথে এখন নেমেছে অন্ধকার,
পল্লব-বল্লরীদলে সমাচ্ছন্ন কুটিরে আমার,—
আমি একা বাতায়নে চেয়ে আছি দিগন্তের পানে।
বিষাদ ঘনায় মোর তন্দ্রাহীন নিষ্প্রভ নয়নে,
সশঙ্ক তারকাদল পৃথিবীর শয়ন-শিয়রে,
মৃত্যুর লেখন হেরে ভবিষ্যের শিলালিপি 'পরে,
বেদনা বিথারি' ওঠে মর্ম্মরিত নারিকেল-বনে।

বিশ্ব-প্রকৃতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নীল নদীবক্ষে ইজিপ্ট হইতে সুদান

জনৈক আমেরিকান ও তাঁর স্ত্রী কায়রো হইতে কেপটাউন ভ্রমণ করিয়া আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৩৫ দিনে ইঁহারা ভ্রমণ সম্পূর্ণ করেন, এবং এই দীর্ঘ পথের অধিকাংশই তাঁহাদিগকে পদব্রজে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল কারণ মধ্য আফ্রিকায় কোনো যানবাহনের বিশেষ সুবিধা নাই।

স্বামী স্ত্রী পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। আণ্ডিজ পর্ব্বতমালা হইতে মঙ্গোলিয়ার সমতল ভূমি, সাউথ সি হইতে ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান কিছু বাদ রাখেন নাই। ভারতবর্ষে প্লেগ আরম্ভ হইবার খবর শুনিয়া তাঁহারা বম্বে বন্দরে পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে চড়িয়া ইউরোপের দিকে রওনা হন। সে সময় টুটেনখামানের সমাধি প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সমস্ত সংবাদপত্র লর্ড কারনারভন্ ও টুটেনখামানের সংক্রান্ত নানা চমকপ্রদ সংবাদে পরিপূর্ণ।

তাঁহারা প্যারিসে ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহাদের খেয়াল হইল কায়রো হইতে সুরু করিয়া গোটা আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া তবে প্যারিসে ফিরিবেন। প্যারিসের প্রশস্ত বুলভার গুলির অপেক্ষা আফ্রিকার জনবিরল মরু ও অরণ্যের ডাক প্রবল হইয়া উঠিল।

জাহাজে কথাটা তুলিতেই বন্ধুবান্ধবে বারণ করিল। চিরকালই করিয়া থাকে। বন্ধুবান্ধবে কখনো কোনো ভাল কাজ করিতে দেয় না।

"আফ্রিকার মধ্যে এ সময় যায়? কী সর্ব্বনেশে কথা! কায়রো থেকে কেপ পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটে! তা ছাড়া এখন এই গ্রীষ্মকালে! সাম্‌নে বর্ষা আস্‌চে। মরুভূমিতে ঝড় বইবে, সুদান ও ইউগাণ্ডাতে বন্যা নামবার সময় এখন, জিজি মাছির উপদ্রবে মধ্য আফ্রিকায় অনেক স্থান জনশূন্য হয়ে পড়েচে, যাবে কি করে সে সব জায়গা দিয়ে এখন? বিশেষ করে তোমার স্ত্রী সাথে রয়েচেন। যেওনা, মারা পড়বে। এসো, বরং একগ্লাস বরফ লেমনেড খাও।"

আমেরিকার মোরগ সদর্পে এক্রিকার পোর্ট সৈয়দ নগর পরিদর্শন করিতেছে

আমেরিকান্ ভদ্রলোকটির নাম পেটার শে। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পোর্ট সৈয়দে দুজনে নামিয়া পড়িলেন। সেখান হইতে কায়রো ও খার্টুম পর্য্যন্ত রেলের টিকেট কিনিলেন।

কায়রো আজকাল আর প্রাচ্যদেশীয় সহর নয়। কায়রো

সহরে পৃথিবীর সর্ব্ব জাতিই মিলিয়াছে। কিন্তু স্থাপত্যে, আদব কায়দায়, ভাষায়, সভ্যতায় ফরাসী প্রভাব বড় বেশি। ইজিপ্ট ফরাসী প্রতিভার ও সভ্যতার দীপ্তিতে মুগ্ধ, তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে, ভাল লোক মরিলে প্যারিসে যায়।

কায়রো হইতে রাত্রি সাড়ে আটটায় ট্রেণ ছাড়িল লুকসরের অভিমুখে। লুকসরে নীলনদী পার হইয়া মরুভূমির মধ্যে কিছুদূর যাইলে প্রাচীন ফ্যারাওদের সমাধিস্থান, প্রসিদ্ধ "ভ্যালি অফ্ দি কিংস" অনুচ্চ ও অনাদৃত শৈলমালা পরিবেষ্টিত একটি নির্জ্জন মরুপ্রান্তর।

আকাশ হইতে নীল নদের একটি বারেজের দৃশ্য
'ড্যামে'র দ্বারা নদীর জল আটক করা হয়; 'বারেজে'র দ্বারা জলের গতিপথ নির্দ্ধারিত হয়

পথে আরব বালকবালিকা হাসিমুখে বখশিশ চাহিয়া ফিরিতেছে। ফেলাহিন কৃষক মাঠে লাঙ্গল চষিতেছে। মাঝে মাঝে দু একজন শ্মশ্রুযুক্ত প্রবীণ লোক গাধার পিঠে চড়িয়া গম্ভীর মুখে নিজের কাজে চলিয়াছে। ইজিপ্টের যে অংশ দিয়া নীলনদী প্রবাহিত, সে অংশ শস্যশ্যামল, যে অংশ নীলনদী হইতে যতদূরে, তাহা ততই রুক্ষ ও বৃক্ষলতাশূন্য, ঠিক মরুভূমি যদিও নয়, মরুভূমির ভূমিকা বটে।

সম্রাট ষষ্ঠ রামেসিসের কবরের নীচে টুটেনখামেনের কবর এতদিন লুকানো ছিল। এত কাল ধরিয়া ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিণ সকল জাতি 'ভ্যালি অফদি কিংস্' খুঁড়িয়া তন্ন তন্ন করিয়াছিল, কোনো কবর বাদ দেয় নাই, অধিকাংশ রাজার কবর বহু প্রাচীন যুগেই দস্যুতস্করে লুণ্ঠন করিয়াছিল—কিন্তু ফ্যারাও টুটেনখামেনের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই কেহই এতকাল।

মিঃ শে ও তাঁহার পত্নী এখান হইতে ট্রেণে খার্টুমের দিকে রওয়ানা হইলেন। লুকসর ছাড়াইয়া কিছুদূর যাইলেই মরুভূমি সুরু হইল গাড়ীতে বেজায় গরম, দরজায় হাতল ইত্যাদি তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিল, হাত দিলে মনে হয় ফোস্কা পড়িবে। গাড়ীর জানালার বাহিরে শুধু বালি আর রৌদ্র আর উত্তাপ—মরুভূমি ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিল, গাড়ীর মধ্যে শুধু বালি আর উত্তাপ; অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালি আর উত্তাপ দুই বাড়ীতে লাগিল।

সন্ধ্যায় তাঁরা একটা ছোট ষ্টেশনে নামিয়া নীল নদীতে নৌকায় আরোহণ করিলেন। হালফা পর্য্যন্ত নৌকাপথে যাইয়া পুনরায় রেলপথ, খার্টুম পর্য্যন্ত। হালফা পর্য্যন্ত গোটা পথের অন্ততঃ অর্দ্ধেক শুধু মরুভূমি, সে মরুভূমির রং জাফরানের মত—দুপুরের খর রৌদ্রে তাহা দেখাইতেছিল সোনালী রংয়ের।

অনেকে ভাবেন সাহারা মরুভূমি সাদা ও ধূসরবর্ণের বালি রাশির সমষ্টি। আসলে সাহারার বর্ণ-বৈচিত্র্য অপূর্ব্ব। আর কোথাও সমতল নয়, বালির পাহাড় চারিদিকেই, জমি সর্ব্বত্র উঁচুনীচু।

মরুভূমির আরবেরা অত্যন্ত অপরিষ্কার ভাবে থাকে। নিকটেই নীলনদী, কিন্তু জীবনে কেহ কোনোদিন নদীতে স্নান করে কিনা সন্দেহ, দেশ কিরূপ উত্তপ্ত তাহা ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বিস্ময়কর দাঁড়ায়। অধিকাংশ আরব

চক্ষুরোগে ভুগিতেছে, অন্ধের সংখ্যাও খুব বেশী। ইহার কারণ দুইটী, তাহাদের অপরিষ্কারভাবে বাস করিবার অভ্যাস, আর মরুভূমির প্রখর রৌদ্রদগ্ধ বালুরাশির দিকে সর্ব্বদা চাহিয়া থাকা। চক্ষুর বিশ্রামদায়ক শ্যামলতা এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

এ্যান্টনি যখন ক্লিওপেট্রার প্রেমে মত্ত, তখন রোমান্ সৈন্যবাহিনী যে দুর্গপ্রাচীর হইতে শত্রুবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করিত, ফিলি নগরীর সেই দুর্গ আজ আসোয়ান বাঁধ বাঁধিবার দরুণ অর্দ্ধেক বৎসর জলমগ্ন থাকে। ফিলির সুবিখ্যাত আইসিস্ দেবীর মন্দিরেরও ঐ অবস্থা।

'চেয়প'-এর পিরামিড

আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এখন যেখানে ভেড়ার-দল চরিয়া বেড়াইতেছে একদা তথায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইজিপ্ট-এর রাজধানী বর্ত্তমান ছিল।

নীলনদীর ধারে গাছপালা নাই, এখানে ওখানে দু দশটা তালগাছ ছাড়া। তাও জলের নিতান্ত কিনারায়, নদী হইতে একশো হাতের পরে শুধু জাফরান রংয়ের বালিয়াড়ি দিগন্ত-রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে মাঝে নদীর ধারে আরবগ্রাম কতকগুলি মৃৎকুটীরের সমষ্টি।

সুদান বাস করিবার উপযুক্ত দেশ নয়। কোনো না কোনো দৈবদুর্ব্বিপাক লাগিয়াই আছে। কোনো বছর ঘোর অনাবৃষ্টি। পরের বছরেই নীলনদীতে প্রবল বন্যা নামিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। তৃতীয় বৎসরে হয়তো বেজায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কোনো বছর ম্যালেরিয়াতে দেশ উজাড় হইল, পরের বৎসর স্লিপিং সিকনেসে মাছির মত লোক মরিতে লাগিল।

খার্টুম সহর সুদানের রাজধানী, সেখানে দিন দুই কাটাই-বার পরে তাঁহারা পুনরায় ষ্টীমারে করিয়া রেজাফ্ অভিমুখে চলিলেন। নীলনদীর এই অংশ 'শ্বেত নীলনদী' বলিয়া অভিহিত। জাহাজে অনেকগুলি আরোহী ছিল, তন্মধ্যে দুজন মিসনারী ডাক্তার সুদানের স্লিপিং সিক্নেসগ্রস্ত অঞ্চলে লোকের রোগ সারাইতে যাইতেছেন। একজন সুইডিশ্ ব্যবসায়ী, দুজন ভবঘুরে ইংরেজ, একজন সিরিয়া দেশীয় খর্জ্জুর ব্যবসায়ী, একজন জার্ম্মান এঞ্জিনিয়ার।

খার্টুম সহর ছাড়াইলেই মরুভূমি প্রায় শেষ হইল।

নদীর ধারে মাঝে মাঝে শ্যামল ক্ষেত্র, গৃহপালিত পশু চরিয়া বেড়াইতেছে। এ অঞ্চলে আরব অপেক্ষা নিগ্রো-আরব বর্ণসঙ্কর ও খাঁটি নিগ্রো জাতীয় লোকের সংখ্যা বেশী।

পাঁচ দিন নদী পথে যাইবার পর বন্য জন্তুর দেশ আরম্ভ হইল। জলে হিপোর দল মনের আনন্দে সাঁতার কাটিতেছে, নদীর দুধারে প্রান্তরে দলে দলে হরিণ। নদীর ধারের পাঁকে বড় বড় কুমীর নিশ্চিন্তে শুইয়া ঘুমাইতেছে।

জলচর পাখী যে কতরকমের তার সংখ্যা নাই।

কিন্তু আফ্রিকার এই অঞ্চলে সভ্যতার আলোক এখনও প্রবেশ করে নাই। সুইডিশ্ ব্যবসায়ী একটা গল্প আরম্ভ করিল। এক সময়ে তার একটী নিগ্রো বালক ভৃত্য ছিল। বালকের গলায় ব্যথা হওয়ায় সুইডিশ্ ভদ্রলোকটি তাহাকে ডাক্তারের কাছে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ডাক্তারের ঘর হইতে ছেলেটী ছুটিয়া জঙ্গলের দিকে পালাইতেছে। তাহার প্রভু ডাক্তারের ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। সে অবাক হইয়া বলিল—কি হয়েচেরে, পালাস কেন? বালক ছুটিতে ছুটিতে বলিল—আরে বাপ্, ডাক্তার আমার সমস্ত গা টিপে টিপে দেখ্‌চে আমি নরম কি না।

আফ্রিকার এ অঞ্চলে কীট পতঙ্গের মেলা। মশা দু তিন রকমের; উই, কালো পিঁপড়ে, লাল পিপড়ে, উড়ন্ত পিপড়ে; নানা শ্রেণীর মাকড়সা, মাছি যে কত বিভিন্ন ধরণের তার লেখা জোখা নাই। রাত্রে নিগ্রো খালাসীরা একটা মশাল জ্বালাইয়া রাখিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত পিপড়ে আসিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া ঝলসাইয়া মাটীতে পড়িতে লাগিল। নিগ্রোর দল মহা আনন্দে সেই ঝলসা-পোড়া পিপড়ের রাশ খাইতে সুরু করিয়া দিল।

এই বার ষ্টীমার যে অঞ্চল দিয়া চলিল, সেখানে নদীর দুই তীরে দীর্ঘ তৃণভূমি। মাঝে মাঝে বড় বড় জলা—এই সব

দ্রুতগামী বাহন!—লাক্সার

জলাভূমিতে প্যাপিরাসের বন। প্যাপিরাস নল-খাকড়া জাতীয় গাছ, প্রাচীন মিসরে প্যাপিরাস হইতে লিখিবার পুঁথি তৈরী হইত। নীল নদীর এই অংশে পূর্ব্বে এত ঘন প্যাপিরাসের বন ছিল যে, নৌকা যাতায়াত করিতে পারিত না। আস্যুয়ান বাঁধ নির্ম্মিত হইবার পরে নদীপথ অনেক সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

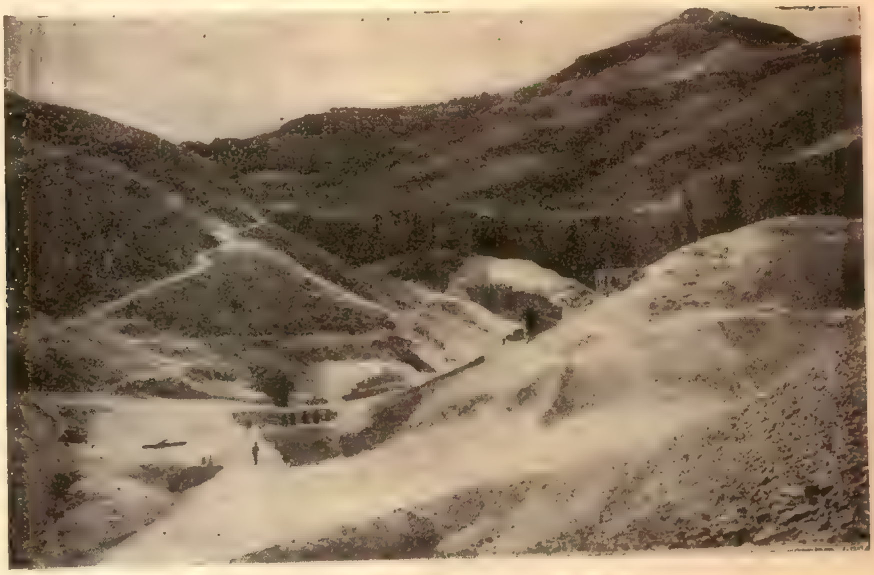

টুটন্খামেন-এর সমাধির অন্তর্গত উপত্যকা

ষ্টীমারের ত্রিশগজের মধ্যে তীরের লম্বা ঘাসের বনে বন্য হস্তী দাঁড়াইয়া অলস কৌতূহলের দৃষ্টিতে ষ্টীমারের দিকে

লাক্সার-এ নীলনদের উপর মালবাহী নৌকা

চাহিয়া আছে। হঠাৎ ষ্টীমারের বাঁশী শুনিয়া ভয় পাইয়া আপন মনে এক দিকে চলিতে সুরু করিল, কিন্তু হাতি কি দ্রুতই যাইতে পারে! দশ বার মিনিটের মধ্যে তার বৃহৎ শরীরটা দূর চক্রবালে একটা কৃষ্ণ বিন্দুতে পর্য্যবসিত হইল।

অসোয়ানের নিকট নীল-নদের উপর একটি 'ড্যাম'

সাড়ে ছ'ফিট চওড়া এবং আটাশ ফিট উচ্চ সুড়ঙ্গ-শ্রেণীর মধ্য দিয়া সবেগে জল নির্গত হইতেছে। শীত-কালের জলাভাবের সময় এই 'ড্যামে'র সাহায্যে প্রয়োজ-নীয় জল সরবরাহ করা হয়।

যাঁহারা মনে ভাবেন মশা জিনিসটা তাঁরা ভালই দেখিয়া-ছেন, তাঁরা নীল নদীর এই জলাভূমি অঞ্চলে যেন একবার বেড়াইতে আসেন, মশা কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবেন। ষ্টীমারে যে ইংরেজ ভদ্রলোকটী ছিলেন, তিনি এই অঞ্চলের একটা ছোট্ট ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে অসুখ বিসুখ কেমন? মশা তো এদিকে খুব বেশী বলেই মনে হয়।

তিনি উত্তর দিলেন, আমি সম্প্রতি আছি একটা ছোট নিগ্রো গ্রামে। সেখানে নেই এমন রোগ তো দেখি না। ম্যালেরিয়া আছে, প্লেগ আছে, বসন্ত আছে, স্লিপিং সিক্‌নেস আছে। কিন্তু কি করব, ব্যবসায় উপলক্ষে সেখানে থাকি। বাঁচি তো ভালই, দেশে ধনী হয়ে ফিরতে পারবো, না বাঁচি অদৃষ্ট।

আফ্রিকার লোকে শীঘ্রই অদৃষ্টবাদী হইয়া দাঁড়ায়। না হইয়া উপায় নাই।

নীল নদীতে ঝড়ে মাঝে মাঝে ষ্টীমার ডুবিয়া যায়, সুতরাং ঝড় আসিবার সম্ভাবনা বুঝিলেই ষ্টীমারের কাপ্তেন ডাঙ্গার ধারে জাহাজ ভিড়াইয়া নোঙ্গর ফেলিত। ঝড় শেষ হইয়া যাইবার পরে আকাশের রং ও চেহারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইত, চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত একটা অসীমতার মধ্যে সরু সাদা রেশমের ফিতার মত হোয়াইট্ লাইন সবুজ প্যাপিরাসের বনের ধার দিয়া বহিয়া যাইতেছে, দূরে দূরে বেগুনী রংয়ের অনাবৃত শৈলমালা, মাথার উপরে ইন্দ্রনীল আকাশ—ষ্টীমারের ডেকে সকলে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত।

এখান হইতে প্রত্যেক আরোহী দৈনিক পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের ডেকে এক জন মিসনারী ডাক্তার বেশ মজার গল্প করিতেন। একদিন গল্পের সময় তীরবর্ত্তী ঘাসের বনে চোদ্দটী বন্য হস্তী আসিয়া দাঁড়াইতে গল্প শোনা বন্ধ করিয়া সকলে সেদিকে চাহিয়া রহিল। হাতীর ঘ্রাণশক্তি প্রবল, অনেক সময় দুই মাইল দূর হইতেও শিকারীর অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এত কম যে একশো ফুট দূরের লোক স্পষ্ট দেখিতে পায় না।

অসভ্য নিগ্রোদের ডোঙা প্রায়ই দেখা যাইত। ষ্টীমারের

ঢেউ লাগিবার ভয়ে তারা ডাঙ্গার কাছে ঘেঁসিয়া থাকিত ষ্টীমারের বাঁশি শুনিলেই। ষ্টীমারের ঢেউকে তারা বড় ভয় করে।

নিগ্রোদের গ্রাম ছোট ছোট পর্ণকুটীরের সমষ্টি। কুটীরের চালা ছাতার মত গোল। গ্রামগুলির চারি ধারে নল-খাগড়ার বেড়া। ছেলে মেয়ে এবং স্ত্রী অনেক জায়গায় এখনও কেনা বেচা হয়। কঙ্গোর মধ্যে এমন সব স্থান আছে, যেখানে একটী তরুণী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীর মূল্য দশ খানা কোদাল।

রেজাফ্ হইতে মিঃ ও মিসেস্ শে পদব্রজে উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া তাঁহারা দস্তুরমত বিস্মিত হইলেন ও অঞ্চলের দৃশ্য দেখিয়া। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন জনমানবহীন বনানী বা মরুভূমি দেখিবেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দেখিলেন ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম বা আমেরিকার নিউ জার্সি অঞ্চলের পরিচিত দৃশ্যাবলী।

উগান্ডা-গোপ দুগ্ধ বহন করিতেছে

গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট লোকের বাস। চাষারা চাষ বাস করিতেছে। মিসনারীগণ গ্রাম্য লোকদিগকে মৌমাছি পালন করিতে শিখাইয়াছে, অনেক গ্রামেই মৌমাছির চাষ দেখা গেল। গভর্মেণ্টের ট্যাক্স দিবার একটী সুন্দর নিয়ম এ অঞ্চলে প্রচলিত। যাতায়াতের রাজপথ বৎসরে কয়েকবার মেরামত করার ভার প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসিগণের

উপর। কোন গ্রামের লোকে পথের ধারের আগাছা কাটিয়া পরিষ্কার করিতেছে, কোন দল বা রাস্তায় মাটী দিতেছে। এই উপায়ে তাহারা গভর্মেণ্টকে ট্যাক্স দেয়।

পথিকদের বিশ্রামের সুবিধার জন্য পথের ধারে মাঝে মাঝে গভর্মেণ্টের তৈরী বাংলো আছে। এই সব বাংলো নির্ম্মিত হইয়াছে জলাশয়ের সান্নিধ্যে। আফ্রিকার এ অঞ্চলে জল

সোয়াহিলী জাতীর ভারবাহিনী নারী

অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, পাওয়া গেলেও সবস্থানের জল সভ্য মানুষের ব্যবহার করিবার উপযুক্তও নয়। বাংলোগুলি সাধারণতঃ মাটির দেওয়াল ঘেরা খড়ের ছাউনি। মেজেও মাটির। বন্য জন্তুর উপদ্রব নিবারণের জন্য বাংলোর চারি ধারে শক্ত করিয়া কাঠের খুঁটির বেড়া। আফ্রিকার এই রকমের বেড়াকে 'বোমা' বলে।

মাঝে মাঝে ছোট বড় পাহাড়। বড় বড় গাছ চারি ধারেই। আফ্রিকার সূর্য্য এখানে তত উত্তপ্ত নয়, কেবল মাত্র দুপুর বেলাটা ছাড়া। সন্ধ্যার পর হইতে বিষম শীত পড়ে।

এক জায়গায় বনের মধ্যে অসংখ্য বেবুন দেখা গেল। বেবুন মানুষকে বড় একটা ভয় করে না। অনেক সময় দাঁত মুখ খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসে। ধাড়ী বেবুনগুলি অত্যন্ত হিংস্র-প্রকৃতি, বন্দুক হাতে না থাকিলে বেবুনের সান্নিধ্যে একটু সাবধান হইয়া চলাফেরা করা বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষ দেখিলে ধাড়ী বেবুন কুকুরের ডাকের মত একপ্রকার ঘেউ ঘেউ চীৎকার করে। এক এক দলে শতাধিক বেবুন থাকে।

সুদানের মধ্য দিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করার মত কষ্ট দুনিয়ায় আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। একেতো মশার উৎপাতে বাংলোগুলিতে রাত্রে তিষ্ঠিবার উপায় নাই, তাহার উপর দারুণ জলকষ্ট আছে, ম্যালেরিয়া আছে, খাদ্যাভাব আছে—সকলের উপরে আছে বন্যজন্তু বিশেষতঃ সিংহের উপদ্রব।

এক বিষয়ে মিঃ শে ও তাঁহার পত্নী একেবারেই নিরাশ হইয়াছিলেন। আফ্রিকায় বনে বন্যপুষ্পের একান্ত অভাব। অন্ততঃ বৎসরের যে সময়ে তাঁহারা ঐ অঞ্চল দিয়া গিয়াছিলেন তখন কিছু দেখেন নাই। হয়তো সেটা বন্যপুষ্প ফুটিবার সময় নয়।

কেনিয়াতে কমলালেবুর বাগানের মালিকেরা নিজেদের চারিপাশে রঙের মেলা বসাইয়াছে বটে। কিন্তু তাদের আনীত বেণীর ভাগ ফুলই বিলাতী মরশুমী ফুল। যুঁই লতা ছাড়া অন্য কোনো ট্রপিক্যাল ফুলের আদর তাহাদের মধ্যে নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যূথভ্রষ্ট

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

গোঁসাই পাড়ার প্রথম বাড়ীখানার সামনে আসিয়া বিনয় ডাকিল, সুরেশ,—সুরেশ বাড়ী আছ ?

বাড়ীর ভিতর হইতে সুরেশের গলার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। বাড়ী সে নিশ্চয়ই আছে তবু কোন জবাব আসিল না। বিনয় গলা আর একটু চড়াইয়া ডাকিল সুরেশ,—সুরেশ !

তাহার ডাক বাড়ীর মধ্যে পৌছিয়াছে বলিয়া মনে হইল কারণ, বাড়ীর অন্তঃপুরে যাহারা ঝগড়া করিতেছিল, তাহারা যেন ডাক শুনিয়া চুপ করিয়া গেল। বিনয় আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছে—এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে বাহিরে আসিয়া বলিল, বাবা বাড়ী নেই।

বিনয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে বল্লেন তোমাকে ?

মেয়েটি জবাব দিল, বাবা বল্লে।

বিনয় হো-হো করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল বাবাকে বলগে যাও আমি বাঘ ভাল্লুক নই। আমি বিনয় যাও ত' খুকী, লক্ষী মেয়ে, তোমার বাবাকে—

কথা তাহার শেষ হইল না। ভিতর হইতে সুরেশের গলা শোনা গেল, আরে বিনয় ? এসো, এসো।

—কিহে, এই যে শুনলুম তুমি বাড়ী নেই।

—আর বল কেন ভাই ? খুকীর ছাগলদুধের জন সাড়ে সাত টাকা পাওনা হয়েচে। দুমাস টাকা দিতে পারিনি। আজ তাগাদার দিন। এ-মাসে যা পেলুম, তা ত অন্য দেনা দিতে দিতেই ফুরিয়ে গেচে। দুধের টাকা এখনই দিই কি করে ? তাই ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে রেখেচি, কেউ খুঁজলেই বলবি, বাবা বাড়ী নেই। কি করি ভাই, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে বার বার পাওনাদারের মুখ নাড়া সহ্যও হয় না !

—পাওনাদারের মুখ নাড়া সহ্য হয় না বলে তাই বুঝি অন্তঃপুরে গলা ফাটিয়ে বৌদিকে মুখনাড়া দিচ্ছিলে ?

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, কি আর বলব ভাই ? সংসারে ত' ঢুকলেনা ! বাঙালীর মেয়ে নিয়ে সংসার পাতা যে কি হাঙ্গাম তা তুমি বুঝবে না। আজ পশ্চিমা দুধওলাকে দেবার জন্যে যোগাড় সোগাড় করে তিনটে টাকা বাক্সের মধ্যে রেখে গেলুম,—বৌদি তোমার ইতিমধ্যেই সে টাকায় মেয়ের পুজোর কাপড় কিনেচেন। তাই এতক্ষণ চলছিল দাম্পত্য-কলহ। এত বোঝাই, তবু সংসার করার বুদ্ধি আর ওঁর হলনা। জোর করিয়া একটু হাসিয়া কথাটাকে ঘুরাইবার জন্য পুনরায় বলিল, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন বিনয়, এস, ভেতরে এস। রবিবারের বিকেলবেলা একটু চা খেয়ে যাও। সন্ন্যেসী মানুষ তোমরা। জীবনে মেয়েদের যেমন হাঙ্গামও পোহালে না, যত্নও তেমি পেলে না। আর কিছু না-হোক, তোমার বৌদির হাতের তৈরী চায়ে একটু মিষ্টিমুখ করে যাও।

বসিবার ইচ্ছা বিনয়ের ছিল না। সূত্রপাতেই যেখানে দাম্পত্য-কলহ, সেখানে কিছুক্ষণ বসিলেই না জানি আরও কত কি শুনিতে হইবে। সে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া বলিল, না-থাক, আমি চা খেয়েই বেরিয়েচি। একবার আবার আড্ডায় যেতে হবে ত। সুরেশকে অন্য কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই সে চলিতে সুরু করিয়া দিল।

বিনয়ের বয়স ছত্রিশ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আজিও সে অবিবাহিত। দাম্পত্যকলহের মধ্যে কি যে মিষ্টতার আস্বাদ আছে—তাহা তাহার অজ্ঞাত। অথচ সে লক্ষ্য করিয়াছে, দাম্পত্যকলহের কথা—সংসারের কথা একবার সুরু হইলে বিবাহিতেরা আর থামিতে চায় না। পাহাড়ের বুকে কয়েকটা নুড়িকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ক্ষীণ নির্ঝরিনী যেমন মাতিয়া উঠে, ইহাদেরও সেই অবস্থা। একই কথাকে বিনাইয়া বিনাইয়া এত গল্পও মানুষ করিতে পারে ! মাত্র তিনমাস হইল দেশে

ফিরিয়াছে, ইহারই মধ্যে স্নরেশের সংসারের নিত্য অনটনের কিছুই আর বিনয়ের অবিদিত নাই। আজকের বিকালটায় আর সেই একঘেয়ে চিরপুরাতনের পুনরুক্তির প্রয়োজন কি? সে চায়—অন্য আবেষ্টন। বিবাহিত সংসারীর সাধারণ জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে রহিয়াছে যে বিস্তৃত জগৎ—তাহারই মুক্ত বাতাসে এই পুরাতন সঙ্গীদের সহিত বিনয় দুইটি নিঃশ্বাস লইতে চায়,—যেমন তাহারা একদিন লইতছাত্র-জীবনে এবং কর্ম্মজীবনের সুত্রপাতে। এইত' ছয় বছর আগে যখন সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখনও পান্নামুখুজ্জেদের বাড়ীতে রীতিমত তাহাদের আড্ডা বসিত। একদিন আধদিনের আড্ডা নয়—প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইতে অন্ততঃ বারটি বৎসর তাহাদের এই গুটিদশেক বন্ধুর মজলিস চলিয়া আসিয়াছে। বিনয় নিজেই ইহার নামকরণ করিয়াছিল—"মধুচক্র"। পাড়ার লোকেরা মধুচক্র নাম হইতেই টানিয়া সভ্যদের নাম দিয়াছিল "দশচক্রী"। এই অর্ব্বাচীন দশচক্রীর কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির কথা তখন এই ছোট্ট সহরের প্রাচীনদের মুখে মুখে ফিরিত। এমনই তাহাদের আড্ডা জমিয়া গিয়াছিল। আড্ডায় তাহাদের হইত না কি? লয়েড জর্জ্জ হইতে স্নরেন বাঁড়ুজ্জে, শেলী হইতে রবীন্দ্রনাথ, টুর্গেনিভ হইতে শরৎচন্দ্রের আলোচনা, নরনারীর সম-অধিকার হইতে ব্রহ্মচর্য্যের সমস্যা লইয়া মারামারি কতদিন পাড়ার আকাশ বাতাস মুখর করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ণিমার রাতে হীরের টুক্‌রা বিছানো ভাগীরথীর বুকে যে নৌকা-পার্টি হইত, তাহার নায়ক ত ছিল এই স্নরেশ। গতিশীল নদীর বুকে মুক্তির আস্বাদ পাইয়া তখন তাহারা কি মাতিয়াই না উঠিত! আর পালেদের বাগানে চড়িভাতি ত নিয়মিত লাগিয়াই ছিল। সঙ্গীতের মজলিসের কথা মনে পড়িলে দীনবন্ধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠে। আহা, তাহার গলার মধ্যে কি অপরিমেয় মিষ্টতাই না ছিল! ভাল ওস্তাদের হাতে সে পড়ে নাই। তা না হউক। প্রতিভা শিক্ষকের অপেক্ষা রাখেন না। ঐ বয়সে তাহার মত তাল-লয়ের জ্ঞান কাছাকাছি গ্রামের মধ্যে আর কাহার ছিল? দীনবন্ধুর কথা মনে পড়িলেই বিনয়ের চোখের পাতা ভিজিয়া আসে। সে দীর্ঘ আয়ু লইয়া জন্ম লয় নাই। আজ প্রায় দশ বছর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তখনও বিনয় দেশেই ছিল। এই দীনবন্ধুর স্মৃতির জন্যই তাহাদের মজলিসে স্থির হইয়াছিল, টাকা তুলিয়া একটা টাউন হল করিতে হইবে। টাউন হল না থাকিলে নাগরিক জীবন মোটেই সুষ্ঠভাবে যাপন করা যায় না। এই প্রস্তাবে অসিত বিনয়ের প্রধান সহচর ছিল। সেদিন তাহার কি উৎসাহ! শুধু তাহার কেন? সেদিন এই দশচক্রীর মধ্যে পান্না, বিনয়, অসিত,—যে তিনজন চক্রী অবিবাহিত ছিল, তাহারা তিন জনেই মাতিয়া উঠিয়াছিল। শুধু বক্তৃতাঘর নয়—আরো অনেক কিছু কীর্ত্তির দুরাশা সেদিন বাংলাদেশের এক কোণে এই তিনটি উৎসাহী কুমারের অন্তর চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের নানা সঙ্কল্পের মধ্যে প্রধান ছিল—আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া টাকা জমানো, এবং সেই টাকা দিয়া দেশের গঠনমূলক কাজে জীবন উৎসর্গ করা। টাকা জমানো এবং গঠনমূলক কাজের সহিত বিবাহ করার বিশেষ শত্রুতা নাই। বিবাহ করিয়াও বহুকর্ম্মী নানাভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কিন্তু এই তিনটী বন্ধু সেদিন আজীবন বিবাহ না করার ব্রতই সবচেয়ে বড় বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল।

জীবনের ব্রতকে সফল করিবার জন্য, সেদিন তাহাদের কি উদ্বেগ—কতই না আয়োজন। উচ্চশিক্ষা শেষ করিয়া বিনয় পাইয়াছিল সরকারের মিলিটারী একাউণ্টস্ বিভাগে ভাল চাকরী। আর অসিত ঢুকিয়াছিল বাবার লোহের কারবারে। কবি পান্না নিজেই শুরু করিয়াছিল পুস্তক প্রকাশের ব্যবসা।...।

ভাবিতে ভাবিতে বিনয় হাসিয়া ফেলিল। এইত ছয় বছর আগে যখন তাহাকে লাহোরে বদলি করিয়া দেয়, তখনও ত সবই ছিল। কিন্তু আজ কতই না পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বছর তিন হইল অসিত বিবাহ করিয়াছে। হয়ত তাহারই অনুসরণ করিয়া দুই বছর আগে পান্নাও বিবাহ করিয়াছে। পাছে দুঃখিত হয় বলিয়া ইহারা বিবাহের খবর যথাসময়ে বিনয়কে পাঠায় নাই। বিনয়ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা চাকরী-জীবনে সর্ব্বোচ্চ পদ পাইবার আশায় এই ছয় বৎসর দেশে আসে নাই। সর্ব্বোচ্চ পদ অবশ্য সে পায় নাই। কিন্তু বিশেষ উচ্চপদ পাইয়াছে। কিছু টাকাও জমাইয়াছে।

কিন্তু শেষে দেশে ফিরিয়া বিনয় দেখিল, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা জীবনের গতি অন্যপথে ফিরাইয়া দিয়াছে। বিনয় ভাবিল, দূর ছাই, উহারা অন্যায় কিছু করে নাই। তাহার নিজেরও মনে আর আগেকার মত সঙ্কল্পের দৃঢ়তা নাই। টাকা জমাইয়াছি, জমাইতে হয় বলিয়াই। তবে উহারা বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়াছে, সে তাহা করিবে না। না, এ কেলে-ঙ্কারি তাহার দ্বারা সম্ভবে না। যাহারা পূর্ব্বে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছিল,—কত কৌশলে তাহাকে সাংসারিক জীবনের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আজ তাহারা হাসাহাসি করিবে। অবিবাহিত বলিয়া গ্রামের ছেলে-ছোকরা মহলে তাহার খ্যাতি আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে! সুরেশ, ভুবন, হরি, ইহারা অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিল ইহাদের লইয়া সেদিন মধুচক্রের অবিবাহিতদের মজলিসে কতই না হাসি তামাসা হইত। আজ ইহারা সুযোগ পাইবে বিনয়কে বুড়া বয়সে বিবাহের জন্য টিটকিরি দিতে ছাড়িবে না। নাঃ, বিবাহের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনয় স্থির করিয়াছিল, বন্ধুরা সকলে বিবাহ করিয়াছে ত তাহার কি ক্ষতি হইয়াছে। ইহাদের লইয়া আগেকার মতই তাহার নিঃসঙ্গ জীবন দিব্যি আনন্দে কলহাস্যে কাটাইয়া দিবে। বিবাহিতের মাঝে কি অবিবাহিতের স্থান নেই যে তাহাকে আবার দেশত্যাগী হইতে হইবে!

বিনয় নূতন উদ্যমে ভেঙে-যাওয়া মধুচক্র আবার বসাইল। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া বন্ধুদের আকর্ষণ করিল। নিজের বাড়ীতে কয়েকদিন প্রীতিভোজন দিল। রাতভোর গল্প করিয়া এই কয় বছরে যাহার জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল বারবার শুনিল। নিজে যত আনন্দ পাইল তাহার চেয়ে অপরকে আনন্দ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। মাস দুই গেল বেশ! মনে হইল আবার যেন আগেকার দিন ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তারপর আবার যে-কে-সে।

বড় রাস্তার মোড়ে আসিতেই বিনয়ের মনে পড়িল, একটু ঘুরিয়া অসিতকে ডাকিয়া লইয়া যাওয়াই ভাল। ও যেরূপ ঘোর সংসারী হইয়া পড়িয়াছে—হয়ত না ডাকিলে আড্ডায় যাইতেই পারিবেনা। অসিতের কথা মনে পড়িতেই তাহার বিদুষী স্ত্রী রেখার কথাও মনে হইল। তাহার সহিতও দুইটি কথা কহিয়া যাইতে বাধা কি? অবিবাহিত হউক, আর বিবাহিত হউক পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। পরস্পরকে জানিবার জন্য তাহাদের মনের ঔৎসুক্য কিছুতেই যেন তৃপ্ত হইতে চাহে না। সভ্যতার বয়স ত' সহস্র সহস্র বৎসর হইয়া গেল তথাপি কতটুকু তাহারা পরস্পরকে জানিতে পারিয়াছে!

অসিতের দরজায় হাঁক পাড়িতে হইল না। অসিত ও রেখা দুজনেই বৈঠকখানায় ছিল। বিনয় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এ ভালই হইয়াছে। দুই বন্ধুতে একলা থাকিলে আজকাল কাহারও মুখে আর তেমন কথা যোগায় না। গল্পের শেষে নটে শাকটি মুড়ানোর মত যেন তিন মাসেই তাহাদের যাহা কিছু বলিবার ছিল সব ফুরাইয়াছে। বিনয় লক্ষ্য করিয়াছে, একলা থাকিলে অসিত আর আগেকার মত বিনয়ের কাছে মন খুলিতে পারে না—যেন অস্বস্তি বোধ করে।

রেখাই প্রথম বিনয়কে দেখিতে পাইল। আনন্দে ডাকিয়া উঠিল, আসুন, আসুন। তবু ভাল, গরীব দুঃখীদের কথা মনে পড়েচে। সেই দিন-পনর আগে একবার এসেছিলেন। তারপর আপনার বন্ধুটি মরে গেচে কি বেঁচে আছে, সে খবরটা পর্য্যন্ত একবার নেন নি।

বিনয় হাসিয়া বলিল, বালাই, ষাট, মরবে কেন? খবর নিতে এসে মরা দেখার চেয়ে খবর না নিয়ে বাহালতবিয়তে জ্যান্ত দেখতে পাওয়া ঢের ভাল।

বিনয়কে দেখিয়া অসিতের মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। হাজার হোক, বহুদিনের অভ্যাস—তাহা কি সহজে যায়! নিজের বিরুদ্ধে অনুযোগের সুরে বলিল, গত রোববার আড্ডায় যেতে পারিনি। রোজ অনেক রাতে বাড়ী ফিরচি, অন্যদিন ত যাওয়া একেবারে অসম্ভব। ভাগ্যিস তুমি এলে! আজও হয়ত বেরোতে পারব না।

—কেন, আজ আবার কি বাধা ঘটল? বিনয় জিজ্ঞাসা করিল।

অসিত গম্ভীরতার ভাণ করিয়া বলিল, বাধা বলে বাধা! সদলবলে অতিথির আক্রমণের আশঙ্কাতেই ত আমার যথা-সর্ব্বস্ব সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানায় বসে আছি।

—সেটা ভাল করনি অসু। এমন ভাবে যথাসর্ব্বস্ব সঙ্গে নিয়ে যারা থাকে, তাদের মালই আগে লুঠ হয়।

—কি করব বল? এ মাল যে ব্যাঙ্কে রাখার নয়। ব্যাঙ্কের বোকারা এ অমূল্য রত্নের হিসেব রাখবে কি করে? সত্যি ভাই বিনু, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, দেশে ত গুণ্ডার অভাব নেই। খবরের কাগজের পাতা খুললেই ত একটা না একটা নারী-হরণ চোখে পড়ে। আমার বাড়ীতে এ রত্নের সন্ধান পেয়ে লুঠেরা যদি আসে সেই ভয়ে—

রেখা সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, আহা, ভয়ে ত তোমার রাত্তিরে ঘুম হয় না।

অসিত তাহার কথাটাকে লুফিয়া নিয়া বলিল, ঠিক ধরেচ। যেদিন থেকে তুমি আমার বাড়ীতে পা দিয়েচ, সেদিন থেকে রাত্তিরে আর ঘুম নেই। পরশু মা জিজ্ঞেসা করছিলেন, হ্যাঁরে তোর চেহারা অত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? মাকে কি আর একথা খুলে বলতে পারলুম! রাত্তিরে মানুষের ঘুম না হলে শরীর কখন থাকে?

রেখা কপট রাগের ভাণ করিয়া বলিল, ঠাকুরপোকে নিয়ে তাহলে হাসির ফোয়ারা তোল, আমি চললুম। বলিতে বলিতে রেখা বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

অসিত চিৎকার করিয়া বলিল, আহা, রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন? তুমি চলে গেলে কি আর হাসির ফোয়ারা উঠবে? তুমি আছ বলেই ত মনে এত হাসি জমা হয়ে উঠে।

—আমি কারো লাফিং গ্যাস নই।

—কে বললে তুমি লাফিং গ্যাস? এত বড় নরাধম, অরসিক কে সে? শুখনো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্যে খুঁজতে যাব তোমার বিশেষণ? আরে রামচন্দ্র! তুমি হচ্চ আমার—আমার,—দুর ছাই, হাতের কাছে একটা তেমন কবিতাও খুজে পাইনা!

রেখা সজোরে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বিনয়ের বুক হইতে উঠিয়া বুকের মধ্যেই মিলাইয়া গেল। সে ভাবিল, ইহারা দুটিতে বেশ আছে। ইহাদের সুখ দেখিয়া সুখী হইবে না—এমন কে জগতে আছে!

আজ রেখার দিদির আসার কথা ছিল। তাই বৈঠকখানায় দুজনে অপেক্ষা করিতেছিল। ঘণ্টাখানেক গল্প করিবার পর বাহিরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল। অতিথিরা আসিয়া হাজির হইয়াছেন। অসিত ও রেখা দুজনেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাহিরে গেল।

একলা বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ বিনয় দেখিতে পাইল দক্ষিণের দেওয়ালে একখানা নূতন ফটো ঝুলিতেছে। ইতিমধ্যে অসিতদের বাড়ীতে বিনয় কয়েকবার আসিয়াছে, কিন্তু এই ফটোখানা চোখে পড়ে নাই। বিনয় সতৃষ্ণ চোখদুটি একবার ভাল করিয়া ছবিটির উপর বুলাইয়া লইল। ছবিটা অসিতের বোন মায়ার না? তাহার শরীরের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেদিনের মায়াকে যেন চেনাই যায় না! একটু নড়িয়া চড়িয়া চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া বিনয় স্থির হইয়া বসিল। মায়ার কথা তাহার এতদিন মনেই ছিল না। একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল বটে—কিন্তু, সে কি আজকে! আপনার অজ্ঞাতেই বিনয়ের বুক হইতে একটা চাপা নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

অসিত ঘরে ঢুকিতেই বিনয় উঠিয়া পড়িল, আজ যাই হে। আড্ডায় খানিকক্ষণ আবার না বসলে চলবে না। অসিত বসিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিল; কিন্তু, বিনয় উহাদের আর বিব্রত করিতে চাহে না।

রাস্তায় বাহির হইয়া তাহার মনে পড়িল অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। আড্ডায় হয়ত লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। কিন্তু অসিত আর রেখা আছে বেশ। পরস্পরের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে উহাদের দিনগুলি বড় সুখেই কাটিতেছে। ইচ্ছা করিলে বিনয়েরও এম্নি সুখের জীবন হইতে পারিত। সে অবশ্য ছেলেবয়সের কথা। তবু ঘটনাচক্রে মায়ার সঙ্গে তাহার একটা যোগাযোগ হইয়াছিল বই কি!

ব্যাপারটা মামুলী। বয়স হইবার পর হইতে বিনয় নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দিত। সবেমাত্র কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, মায়াকে না হইলে তাহার চলিবে না। সে ভাল বাসিয়াছে। অসিতরা পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্ম। একে অসিতের পরম বন্ধু, তাহার উপর রূপ গুণ বিদ্যা সকল দিক হইতেই ছেলেটি মনোমত। তাই মায়া ও বিনয়ের

অবাধ মেলামেশায় কেহই আপত্তি করেন নাই। বিনয়ের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিধবা মা ছাড়া আর কেহ ছিলেন না। বিবাহের কথা উঠিতেই তিনি আপত্তি করিলেন। চাটুজ্যে হয়ে চাটুজ্যেদের ঘরে বিয়ে করবি কিরে হতভাগা? ওরা আর আমরা যে একই গোত্র। বিনয়ের তখন প্রথম যৌবন। তাছাড়া, সচ্ছল সংসারে বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ার জন্য চিরদিন আদরে আদরেই তাহার কাটিয়াছে। যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছে, হাতের কাছে পাইয়াছে। কখন কোন অভাব অনুভব করিবার অবসর মা তাহাকে দেন নাই। জীবনে মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার যে পরিপূরণ হয় না—এই দুঃসহ সত্য তখনও সে উপলব্ধি করে নাই। তাই জোর করিয়া বলিল, হ্যাঁ, করব। গোত্র টোত্র ওসব আমি মানিনা। মানুষের কাছে মানুষই সবচেয়ে বড়। তার বড় আর কোন সত্য নেই।

মার মুখের উপর সেই সব ধৃষ্টতার কথা পরিণত বয়সে মনে পড়িলে বিনয় লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিত। কিন্তু প্রথম যৌবনে প্রজাপতি যখন মানুষের মনে জাগিয়া উঠে, সেই অভুতপূর্ব্ব চেতনার মধ্যে এরূপ দুঃসাহস অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য নানাকারণে এ বিবাহ ঘটে নাই। তাহার জন্য পরবর্ত্তী জীবনে বিনয়ের মনে কোন দুঃখ ছিল না। সে ভাবিত, সেদিন যাহাকে একমাত্র সত্য ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম—সে সাধারণ মোহের ঘোরমাত্র। ইহাকে গভীর কিছুই বলা যায় না। প্রেমের বিপুল অনুভূতি ইহার মধ্যে ছিল না।

রাস্তা চলিতে চলিতে আজ হঠাৎ বিনয়ের মনে পড়িল, মায়াকে হয়ত সে সেদিন সত্যই ভালবাসিয়াছিল। হয়ত তাহার এই কৌমার্য্যের মূলে রহিয়াছে সে। মানুষের মনের মত জটিল বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু নাই। হয়ত, তাহার অবচেতন মনের অন্ধকার বুকে সঞ্চিত এই ভালবাসাই পরিণত বয়সে দেশহিতব্রতের অছিলায় তাহাকে লইয়া আসিয়াছে এই নিঃসঙ্গ জীবনের পথে। তাহার মনে পড়ে, মা'র প্রবল অমত দেখিয়া যেদিন মায়ার বাবা তাহাকে কাছে ডাকিয়া জীবন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন এবং যাহা ঘটিয়া গেল তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, সেদিনও মায়ার সঙ্গে গোপনে দেখা হইয়াছিল। সেদিন মায়ার রক্তাভ গালের উপর শেষ চুম্বন আঁকিয়া দিয়াও বলিয়াছিল, এই যেন আমাদের শেষ না হয়। তুমি দেখে নিও—সমাজের মিথ্যে বিধি আমায় কখন রুখে রাখতে পারবে না। এস্পার না হয় ওস্পার, আমি একটা কিছু করবই করব।

তারপর আর মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ট সাক্ষাৎ কখনও ঘটে নাই। হয়ত, উহাদের বাড়ীর বারণ ছিল। অবশেষে বছর দুই পরে তাহারই চোখের উপর দিয়া একদিন মায়া আর একজনের জন্য সংসার পাতিতে চলিয়া গেল। বিবাহ-সভায় বিনয় শুধু উপস্থিত ছিল তাহা নয়,—উদ্যোগ আয়োজনের সবকিছু দায়িত্বের অংশ অসিতের মত তাহারও মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কই সেদিন ত তাহার অন্তরে কোন চাঞ্চল্য জাগে নাই। তখন সে দস্তুরমত জীবনের আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। অসিত এবং অন্যান্য সঙ্গীর সহিত ইতিপূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছিল নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের ব্রত।

মায়ার বিবাহের পর আর কখন তাহাদের দেখা হইয়াছিল কিনা আজ আর বিনয় মনে করিতে পারে না। ইহার জন্য সে কখন ব্যাকুলতা অনুভব করে নাই। তবে বিবাহের বছরখানেক বাদে একদিন একখানা চিঠি সে পাইয়াছিল বটে। মায়া লিখিয়াছিল, এ জীবনে আমাদের মিলন হইল না তবু জীবনে-মরণে আমি তোমারই। জীবনে আর উৎসাহ নাই—তবু বাঁচিয়া থাকিব। আগের জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই এ জন্মে তোমায় পাইয়াও পাইলাম না। এ জন্মে আর আত্মহত্যা করিয়া সেই পাপের বোঝা বাড়াইতে চাহিনা। সংসারের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রতিনিয়ত মনে মনে ভাবি, যাহা কিছু করি, সব তোমারই সম্মুখে তোমারই জন্য করিতেছি। স্বামীর স্পর্শের মধ্যে তোমাকেই অনুভব করি—ছিঃ ছিঃ! ব্রতচারী বিনয় সেদিন ইহার বেশী পড়িতে পারে নাই। টুকরা টুকরা করিয়া চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। অবশ্য সেদিন তাহার মনে একটুও দরদ জাগে নাই তাহা নয়, কিন্তু দরদের চেয়ে বেশী জাগিয়াছিল লজ্জা আর কর্ত্তব্যভ্রষ্টার জন্য ঘৃণা।

আজ হঠাৎ বিনয়ের মনে হইল, বাঃ তাহার জীবনকে লইয়া ত বেশ একটি উপন্যাস গড়িয়া তুলিতে পারা যায়! একটি মেয়েকে সে ভালবাসিল। নানাকারণে তাহাদের মিলন হইল না। নায়িকার অপর জায়গায় বিবাহ হইল। আর নায়ক নিদারুণ বেদনায় আজীবন কুমার হইয়া রহিল। তাহার বন্ধু-বান্ধব পরিচিত-অপরিচিত যাহারা তাহার জীবনের কথা জানে হয়ত তাহারা ইতিমধ্যে এই অলিখিত উপন্যাস আপন আপন কল্পনায় রচনা করিয়া লইয়াছে। হয়ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এমনই কোন কাহিনী তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়'ছে। তাহার সম্মুখে না বলিলেও হয়ত তাহারা মনে মনে বিশ্বাস করে—তাহার কৌমার্য্যের মূলে আছে এই মায়া।

আড্ডায় আসিয়া বিনয় দেখিল ভুবন ছাড়া আর কেহ আসে নাই। সে একটু বিষন্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আর কেউ এসেছিল নাকি?

—আর ভাই, আসবে কে বল? ভুবন কোন সওদাগর অফিসে সামান্য মাইনের কেরাণী। জীবনে আশার উৎসে তাহার ভাঁটা লাগিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তার মধ্যে সদাই একটা অবসন্নতার সুর লাগিয়া থাকে।

বিনয় বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন বিমলেন্দু, রমেন, হরি, পান্না,—ওরা সব গেল কোথা?

—পান্না গেছে শ্বশুর বাড়ী। কাল ওর একটি পুত্র-সন্তান লাভ হয়েচে। ও আর এখানে থাকতে পারে? প্রথম সন্তান!—বুঝলে না ত ভায়া, এর কি আনন্দ! একা একাই জীবনটা কাটিয়ে দিলে। বলিয়া ভুবন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, তা' বটে। বিনয় একটু হাসিয়া জবাব দিল।

—আবার তাও বলি ভায়া, ওই প্রথম প্রথমই যা কিছু আলেয়ার আলো। কিন্তু দু'দিনেই শেষ। তারপর পচা গ্যাসের গন্ধে প্রাণ যায়। কোন কথা বলিতে গেলেই সকলের আগে জীবনের অন্ধকার দিকটা ভুবনের চোখে ছম্-ছম্ করিয়া উঠে। ও আপন খেয়ালে বলিয়া চলে, এই আমারই কথা ধরনা! বিয়ে করে প্রথম প্রথম আমিও ভেবেছিলুম যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। তারপর দেখলুম—ও বাবা! আজ একপাল ছেলেপুলে হয়েচে। সেকালের রাজাদের দোরে যেমন নিয়ত হাতি বাঁধা থাকত, আমার স্ত্রী তেমনি শরীরে পুষে রেখেচেন হরেক রকম ব্যাধি। তোমাদের কাছে দেখা-শোণা করতে পারিনা আর সাধেরে ভাই? রান্নাবান্না, ছেলেপুলেকে মানুষ করা ত আছেই—আধোকদিন স্ত্রীর সেবা করতে করতেই রাতভোর হয়ে যায়। কত ডাক্তার বদ্যি দেখালুম। বড় বড় বিলিতী ওষুধ সপ্তায় সপ্তায় কিনে আনচি। কিন্তু যে ব্যাধি-মন্দির সেই ব্যাধি মন্দির। আজকাল আশা ছেড়েই দিয়েচি।

কোথা হইতে কি আসিয়া পড়িল। পান্নার প্রথম সন্তানের জন্ম হইতে ভুবনের স্ত্রীর চিররুগ্নতা! বিনয় প্রসঙ্গটাকে ঘুরাইবার জন্য মাঝখানেই বলিয়া বসিল, বিমলেন্দুর কি হল?

—তার সঙ্গে ত দুপুরে দেখা হয়েছিল ষ্টেশনের পথে। বললে আজ সকালে তুমি ওদের বাড়ীতে গেছলে। তা ভায়া, তোমার সঙ্গে বসে নিশ্চিন্তে যে দুটো কথা বলবে তার কি সময় আছে? দুদিন আগে ওর স্ত্রী ঝগড়া করে বাপের বাড়ী চলে গেছল। আজ সকালে তাঁরই মান ভাঙাবার জন্যে যাবার কথা ছিল। তা আর ঘটেনি। তুমি বাড়ীতে গেছ বন্ধুলোক। কেমন করে আর তাড়ায় বল? তাই দুপুরেই গেছে। আজ আর আড্ডায় আসা হবে না।

বিনয়ের মনে পড়িল, সকালে যতক্ষণ সে বিমলেন্দুর বাড়ীতে বসিয়াছিল, বিমলেন্দু উসখুস করিতেছিল বটে। যেন উঠি উঠি ভাব। বিনয় তখনই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। তবে উহাতে বেশী মনোযোগ দেয় নাই। বিনয় মনে মনে একটু লজ্জিত হইল। নিজের সময় কাটাইবার জন্য বিমলেন্দুর প্রয়োজনীয় কাজে বাধা দিয়াছে!

রমেন আসিয়া পড়িল। অনুযোগ করিতেই জবাব দিল, দেরী হবে না? যে দায়িত্ব ঘাড়ে পড়েচে। সময় সময় মনে হয়, বিবাহবিচ্ছেদ আইন যদি আমাদের থাকত, এখুনি শুধু স্ত্রীর সঙ্গে নয় সংসারের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতুম। তুই বেশ আছিস ভাই। তখন মনে করতুম, তোর মতন বোকা আর দুনিয়ায় নেই। কবে কোন ছেলেবয়সে অসিতদের

সঙ্গে কি একটা ছেলে মানষি হয়ে গেছল, তার জন্যে সারা জীবনটা নষ্ট করার এমন ধনুর্ভাঙ্গাপণ নিতান্ত পাগল ছাড়া আর কে করবে। কাকিমাকে কতদিন বলেচি তোমার ছেলে 'না' বললেই হবে! জোর করে বিয়ে দাও। ও পাগল হয়েচে বলে কি তোমারাও মাথা খারাপ করে বসে থাকবে? আজ ভাবি, সেদিন অজান্তে তোর কতবড় শত্রুতাই না করতুম।

বিনয় চমকাইয়া উঠিল। তবে ত সে যাহা ভাবিয়াছে ঠিক তাহাই। ইহারা মায়ার সহিত তাহার এই কৌমার্য্যের দিব্যি মিল ঘটাইয়া দিয়াছে। মনের মধ্যে একটু বিরক্তি জাগিল। এত সহজে ইহারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধস্থাপন করিতেও পারে! কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিল না। হাসিবার ভাণ করিয়া বলিল, সেদিন শত্রুতা ত খুব সেধেছিলে। কিন্তু এখানে আজ বন্ধুত্ব করতে আমার সময় কি বাধা হল?

—সেই কথাই ত বলছিলুম। মধুচক্রে আসবার জন্যে যেই পা বাড়িয়েচি অম্নি স্ত্রীর জরুরী তলব এল। ছোট ছেলেটার ভয়ানক জর এসেছিল। আবার পিছু হটলুম। ডাক্তার বাবুকে ডেকে তার ব্যবস্থা করে তবে ছুটী পেলুম। আর পারিওনা। আড়াই বছরের ছেলে, বাড় মোটে নেই। ভুগে ভুগেই হয়ত শেষ হবে। মাঝখান থেকে আমার এই ভোগ!

আবার সেই সংসারের মামুলী কথা। বিনয় অন্য প্রসঙ্গ পাড়িল। ক্রমে হরি আর অনিল আসিয়া পৌঁছিল। অনিল আগে ভাল টেনিস খেলোয়াড় ছিল। বিনয় একবার ভাবিল, তাহার সহিত দুই হাত খেলিয়া নেয়। কিন্তু খেলিয়া আর আনন্দ নাই। কয়েকদিন খেলিয়া দেখিয়াছে, অভ্যাসের অভাবে এই ছয় বৎসরে অনিল খেলার অনেক কিছু কৌশল ভুলিয়া গিয়াছে। আনন্দ না পাইলে খেলিয়া লাভ কি? যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য খেলিতে নামে বিনয় তাহাদের দলে নহে। তাহার বলিষ্ঠ সতেজ শরীরে ক্ষুধার অভাব নাই।—সে চায় আনন্দ। খেলা-ধুলা, গল্প গুজব, গানবাজনা, তর্ক মারামারি করিয়া তাহার নিঃসঙ্গ জীবনটিকে আনন্দমুখর করিয়া রাখিতে চায় সে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিনয় ক্ষুব্ধচিত্তে আড্ডা ত্যাগ করিল। মাসখানেক ধরিয়া যে কথাটা তাহার মনের আনাচে কানাচে দিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল—আজ তাহা স্পষ্ট রূপে ধরা পড়িয়াছে। গত ছয় বৎসরে বিনয়ের এই পরিচিত জগৎটা ভীষণ বদলাইয়া গিয়াছে। নাঃ, বন্ধুদের সহিত তাহার আর পূর্ব্বেকার যোগ নাই। ইহাদের সংস্পর্শ দুঃসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগে যে কেন্দ্রের চারিদিকে ইহাদের জীবন ঘুরিয়া বেড়াইত—আজ তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার নিজের কেন্দ্রের সঙ্গে ইহাদের কেন্দ্রের কোন মিল নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহারা সেই সংসারের সুখ দুঃখের কথায় আসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র দায়িত্বের মধ্যে ইহাদের জগৎ আজ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অবিবাহিত জীবনের সেই বিস্তৃত আকাশ,—বিশাল পৃথিবী আর তাহাদের আকর্ষণ করিতে পারে না। ইহাদের অন্তরে অসময়ে জরা আসিয়া পড়িয়াছে। অনিলের আজকের একটা কথা বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বিনয় যখন ইহাদের সংসারের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে অতিষ্ট হইয়া প্রস্তাব করিয়াছিল, আসচে শনিবার একটা নৌকা-পার্টি করা যাক্। কি বল অনিল? মনে পড়ে আগেকার সেই সব কথা? অনিল জবাব দিয়াছিল, মনে সবই পড়ে বিনু, কিন্তু সে প্রাণ আর নেই। তুমি এখনও দিব্যি ছেলেমানুষটি আছ। তুমি যেতে পারবে, কিন্তু আমরা এখন ঘোর সংসারী। আমাদের মনে আর সে রঙ নেই।

খাঁটি সত্য কথা। উহাদের অন্তরে ইতিমধ্যেই মৃত্যুর ঘনছায়া নামিয়াছে। আজিও বিনয় দেহমনে তরুণ। উচ্ছল প্রাণশক্তি তাহার শিরায় শিরায়। আজিও তাহার পৃথিবী বিস্তীর্ণ। কল্পনায় সে ইংলণ্ডের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসে। হিটলারের ডানপাশে যাইয়া দাঁড়ায়। আবিসিনিয়ার পক্ষ লইয়া মুসোলিনীর সহিত বাক্‌যুদ্ধ করে। কিন্তু শুধু নিছক কল্পনায় মানুষ বাঁচিতে পারে না। এই বাস্তব বন্ধুদের সংসর্গও ত চাই। অথচ বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে, ইহাদের আর সে পূর্ব্বের মত পাইবে না। ভুবন ও হরির কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাক। ইহাদের সংসর্গে বিনয় আর মোটেই আনন্দ পায় না। কিন্তু যাহাদের সঙ্গ এখনও সে প্রতিদিন কামনা করে—তাহারা কোথায়! অসিত স্ত্রী

লইয়া ব্যস্ত। পান্না তাহার সংসার আর কারবার লইয়াই পাগল। কিছুক্ষণ আড্ডা দিবার পর যেন উঠি উঠি করিতে থাকে। বিমলেন্দুর বাড়ী গিয়া দেখে সে ছেলে পড়াইতেছে। কিংবা ঝি আসে নাই বলিয়া সংসারের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করিতেছে। অনিল মেয়ের বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন। তাহার বাড়ীতে ডাকাডাকি করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। সুরেশ স্ত্রীর সহিত দিনরাত খিটিমিটি করিতেছে। সকলেই আপন আপন ক্ষুদ্র দায়িত্ব লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু বিনয়ের দিন কাটিবে কি করিয়া! ও যাইবে কোথায়! অবিবাহিত জীবনের দীর্ঘ অবসর কি দিয়া ও ভরিয়া রাখিবে! বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। অনেকদিন হইল মার মৃত্যু হইয়াছে। ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত দায়িত্ব দাস-দাসীর উপর। সংসারের খুঁটিনাটি কাজ লইয়া ব্যাপৃত থাকিবার মত তাহার স্পৃহাও নাই—অভিজ্ঞতাও নাই। তাহার মত মজলিসী লোক ঘরের নির্জ্জন শূণ্যতার মধ্যে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। শুধু ছুটীর দিনে না—অন্যান্য দিনেও তাহার হাতে থাকে প্রচুর সময়।

জীবনে আজ প্রথম বিনয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এখন হইতে তাহার দিন কাটিবে কি করিয়া? সংসারের দায়িত্ব এখনও যাহাদের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই,—সেই তরুণদল হইতে নূতন বন্ধু খুঁজিয়া লইবে? তাহা আর হয় না। আজকের তরুণেরা তাহাদের নিজস্ব মত ও রুচি লইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে—যেমন একদিন তরুণ বিনয়রা উঠিয়াছিল। তাহারও আগে যেমন একদিন বিনয়দের পূর্ব্ববর্ত্তীয়েরা উঠিয়াছিলেন। এম্নি করিয়া ঢেউএর পরে ঢেউ সভ্যতাকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। ভিত্তিভূমি এক হইলেও একদলের সহিত আর একদলের কোন মিল নাই।

বিনয়ের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। তাহার মনে হইল,—সে আজ একা,—নিতান্ত একা। এতদিন তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গীহীনতা ধরা পড়ে নাই। আজ সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল ভবিষ্যতের পাটে পাটে বিস্তীর্ণ ফাঁক, যাহা পূরণ করিবার উপায় তাহার হাতে নাই। তাহার মনে হইল, তাহার মত দুঃখী জগতে আর কেহ নাই। অথচ সমাজের সকলেই দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামে কাল কাটাইতেছে। সংসারের সুখ দুঃখ লইয়াই তাহারা মহা সুখী। তাহাদের জীবনে দুঃখের হয়ত অভাব নাই, কিন্তু বিনয়ের মত আজীবনের দুঃসহ দুঃখ তাহাদের ভোগ করিতে হইবে না। বিনয়ের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন ভূকম্পের মত চারিদিক নড়িতেছে। অসিত সুখী, পান্না সুখী, বিমলেন্দু সুখী!—ইচ্ছা করিলে সেও উহাদের মত সুখী হইতে পারিত। অথচ কেন সে এই জীবনভোর দুঃখকে ডাকিয়া আনিল। একটা ক্ষীণ আশার কথা তাহার অবচেতন মনের তল হইতে ক্ষণিকের জন্য ভাসিয়া উঠিল। এখনও ত সে বিবাহ করিতে পারে। তাহার পথে দাঁড়াইবার মত বাধা কি আছে? বিনয়ের মনে হইল কিছুই নাই। বিবাহই সে করিবে। একটু বয়স হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার যৌবন এখনও ফুরায় নাই। বয়স জীবনের মাপকাঠি নহে। যৌবনই জীবন। যৌবনের কথা স্মরণ হইতেই আর একটি কথা স্মৃতির আকাশে বিদ্যুৎগতিতে খেলিয়া গেল,—মায়ার কথা। আজ বার বার মায়ার কথা শুনিয়া শুনিয়া এবং ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার যেন একটু নেশার আমেজ লাগিয়াছে। সে যেন আজ বিশ্বাস করিতে সুরু করিয়াছে, সত্যই একদিন মায়াকে সে ভাল বাসিয়াছিল। শুধু সে বাসিয়াছিল নয়, মায়াও তাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল। বিবাহের পর চিঠিতে ত স্পষ্টই লিখিয়াছিল। আমি তোমারই, জীবনে-মরণে আমি তোমারই। একথা ভাবিতেই গর্ব্বে তাহার বুকটা একটু ফুলিয়া উঠিল। একজন দুর্ব্বলা রমণী তাহাকেই জীবনের সর্ব্বস্থান করিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে—একথা ভাবিতে মানুষমাত্রেরই পৌরুষ জাগিয়া উঠে।

বিনয় একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, না, মায়ার স্মৃতিকে এতদিন অকারণে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। আর করিবে না। এতদিন বারবার মনকে সে বুঝাইয়া আসিত, মায়া ও তাহার মধ্যে প্রণয় কখন জাগে নাই। ইহা শুধু ছেলে-বয়সের বাতুলতা মাত্র। শুধু বুঝাইয়া আসে নাই, ইহা ভাবিয়া রীতিমত গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছে। আজ সে স্থির করিল, ভালবাসিয়া যে রমণীর জীবন সে ব্যর্থ করিয়াছে তাহারই জন্য আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে। সেই নারীর অশরীরী সঙ্গ দিয়াই নিজের জীবনের সঙ্গহীনতাকে ভরিয়া তুলিবে।

বাড়ী আসিতে হইলে বিনয়কে সহরের ছোট রাস্তা দিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক সড়কে পড়িতে হয়। ঠিক মোড়ের মাথায় আসিয়াই বিনয় নামিয়া পড়িল। একখানা নূতন মোটর গাড়ী মোড় ফিরিয়া গলির মুখে ঢুকিতেছিল। বিনয় রাস্তার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। আরে, একে? মায়া না? বিনয় চিনিতে পারিল মায়া তাহার স্বামীর সহিত গাড়ীতে রহিয়াছে। এ-পাশে বসিয়া রহিয়াছে একটি ফুটফুটে, সুশ্রী ছেলে। মায়ার শরীর কি চমৎকার না হইয়াছে! বিনয়ের মনে হইল, মায়া নিশ্চয়ই কথা বলিবে।—আজ কতদিন পরে দেখা! অবশ্য তাহার স্বামী বিনয়কে আর চিনিতে পারিবে না। বিবাহের পর তাহাদের আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। রাস্তাটা সোজাসুজি আসিয়া সড়কে মিলিয়াছে। তাই মোড় ফিরাইবার জন্য সকলকেই একটু বেগ পাইতে হয়। হয়ত মিনিট দেড়েক সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু মায়া কথা বলিল না। বিনয়ের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া স্বামীর সহিত এমনভাবে গল্প করিতে লাগিল যেন বিনয়কে কখনও সে জীবনে দেখে নাই!

গাড়ীখানা চলিয়া যাইতেই একটা বিজাতীয় ক্রোধে বিনয়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এত অবহেলা! ভাগ্যিস্ সে আগে কথা কহে নাই। আর একটু হইলেই ত সে মায়াকে ডাকিয়া ফেলিত। তখন আর অপমানের সীমা থাকিত না। মায়ার প্রতি ঘৃণায় বিনয়ের অন্তর ভরিয়া গেল। বিবাহের পরও যে এমন ভ্রষ্টার মত চিঠি লিখিতে পারে তাহার সহিত বাক্যালাপ! বিনয়ের মনে হইল, সে যেন জগতের চক্ষে ছোট হইয়া গিয়াছে। এই দ্বিচারিণীর স্মৃতি আদর্শ করিয়া এতক্ষণ সে জীবন কাটাইয়া দিবে ভাবিতেছিল। ছিঃ, ছিঃ! এমন দুর্ব্বলতাও তাহার হয়!

কিন্তু মায়ার স্মৃতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেই তাহার জীবনটা আবার যেন ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই কথাই আসিয়া হাজির হয়—অসিত সুখী, পান্না সুখী, বিমলেন্দু সুখী।—এই মায়াও সুখী। সুখী না হইলে তাহার রূপ এমন মনোরম হইয়া উঠিতে পারে! ছেলেটীকে দেখিয়া, গাড়ী দেখিয়া, তাহাদের বেশ ভূষা দেখিয়া মনে হয়, অর্থের অভাব নাই। তাছাড়া, বিনয় ত স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মায়া স্বামীর অত্যন্ত সান্নিধ্যে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছে। তাহাকে দেখাইবার জন্যই যেন ছেলেটিকে কোলে লইয়া দুই দুইবার চুমো খাইল। সে নিশ্চয়ই স্বামীকে ভালবাসিয়াছে। হয়ত সেই চিঠির কথা মায়ার আজ আর মনে নাই। কেনই বা থাকিবে? মেয়েদের মন এমনই হাল্কা, —তাহাদের প্রণয় এমনই ক্ষণভঙ্গুর! বিনয় নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিল, ও হইল সুখী আর জীবনভোর আমি দুঃখ সহ্য করিয়া মরিব? তাহার উত্তেজনা বাড়িয়া যায়—প্রতিদ্বন্দ্বিতার বোধ যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহার মনে হইল, মায়া নিশ্চয়ই বিনয়ের সব খবর রাখে। রমেনের মত হয়ত সেও ভাবিয়া রাখিয়াছে, বিনয়ের কৌমারের মূলে আছে সে নিজে। কথাটা ভাবিতেই বিনয় আত্মহারা হইয়া যায়। বটে, তোমার অহঙ্কারের দিব্যি উপকরণ পাইয়াছ ত। আজই ইহার একটা কিছু মীমাংসা করিতে হইবে। কাপুরুষের মত নয়—সকলকে জানাইয়াই সে এই মিথ্যা অভিনয়ের শেষ করিবে।

আমারা ভাবিয়াছিলাম, বিনয় নিশ্চয়ই ফিরিয়া অসিতদের বাড়ী গিয়া আজ একটা কিছু কেলেঙ্কারী করিয়া বসিবে। বলিতে কি, আমাদের মনে মনে বেশ একটু ভয় হইয়াছিল। কিন্তু সে সোজা আসিয়া ঢুকিল তাহার নিজের বাড়ীতেই। চাকরে দরজা খুলিয়া দিল। বিনয় কোন কথা না বলিয়া তাহার উপরের কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। উত্তর দিকের কেদারাখানায় বসিয়া টেবিল হইতে ঝরণা কলম লইয়া এক টুকরা কাগজের উপর কি লিখিল। তাহার মুখখানা সঙ্কল্পে দৃঢ়। একমুহূর্ত্তের জন্য ঘড়িটার দিকে চাহিয়া সময় দেখিয়া লইল। তার পর চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরিতে পুরিতে দ্রুতপদে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

একদিন পরে কাগজে কাগজে তাহার বন্ধুবান্ধবেরা দেখিল, বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে, পাত্রী চাই। পাত্র চট্টোপাধ্যায়, কাশ্যপ গোত্র। অবস্থা স্বচ্ছল। বয়স ত্রিশের উপর। চিঠি লিখুন, শ্রীবিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। পোঃ বালী।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

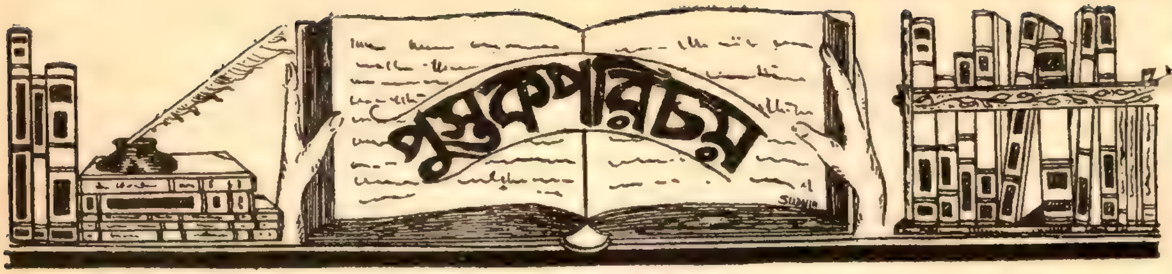

প্রসন্ন রাঘব নাটক—শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক ১১৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ১৫৭ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

প্রসন্ন রাঘব নাটক—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনূদিত। কবি জয়দেব প্রণীত 'প্রসন্ন রাঘব' নাটকের বঙ্গানুবাদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। অনেকে অনেক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু এই কবিত্বপূর্ণ সুন্দর নাটকখানির দিকে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি কেন যে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, সুকবি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগত হইয়াছে, অথচ কোন স্থানে কোন প্রকার অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় নাই; সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষ অধিকার থাকায় এবং নিজেও একজন সুকবি হওয়াতেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। আমি এই অনুবাদ গ্রন্থখানি বড়ই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি এবং অনেক স্থানে অতুলবাবুর কৃতিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থখানি জনাদর লাভ করিবে।

শ্রীজলধর সেন

আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য—ডক্টর্ এনামুল হক এম-এ, পি, এচ, ডি.; ও সাহিত্যসাগর আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা) মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। ১৯১৫ সাল।

বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য চর্চ্চার এখন দিয়ালী উৎসব চলিতেছে। জাতির নব জাগরণের মঙ্গলধ্বনি দিকে দিকে উচ্চারিত হইতেছে। জাতির এই যুগসন্ধিক্ষণে জাতির অতীত ইতিহাসের বড়ই প্রয়োজন,—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আধুনিক যুগোপযোগী এবং সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস জাতির হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার করিবে। ঠিক এই সময়ে আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য পাইয়া, পাঠ করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। চট্টগ্রামের মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার সাহিত্য সাধনা অধ্যবসায় এবং প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ বাঙ্গালী জাতির গৌরব সামগ্রী। ডকটর মুহম্মদ এনামুল হকের নাম 'বিচিত্রা' পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। এই মনস্বী যুবক আপন তপস্যা বলে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিলেন। তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধনার অন্যতম ফল এই বর্ত্তমান গ্রন্থ। আচার্য্য দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থের তথ্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে' আমরা আরও কয়েক জন শক্তিশালী লেখকের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিতেছি। বর্ত্তমান গ্রন্থে পূর্ব্বাচার্য্যদের অনাবিষ্কৃত এবং অভ্যাগত বহু তথ্যের সাক্ষাৎ মিলিবে। মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপি Manuscript গ্রন্থাগারের সাহায্যে বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থ পুষ্ট। বাঙ্গালা দেশে এই সুযোগ অন্যত্র পাওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সম্বন্ধে।

এই গ্রন্থে 'আরাকান রাজসভা', 'কবি কাজী দৌলত', 'কবি ফেরদৌসী মালেন' 'কবি আলাওল', 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিকা-

শের ধারা', 'বোসাদ রাজসভার আশু প্রভাব 'সপ্তদশ শতাব্দির মুসলমান সমাজ' নামক কয়েকটী বিষয় গবেষণা নিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিকতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সত্য কথাটি বলিয়াছেন, 'গ্রন্থকারদ্বয় এই পুস্তকে এদেশের এই সময়কার বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার যে অমূল্য ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের একটী অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়কে আশ্চর্য্যরূপে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে।'

এই গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ও স্বজাতি-বৎসল ব্যক্তির অবশ্য পাঠ করা উচিত। আমরা গ্রন্থকার-দ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছে।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

যুক্তবেণী—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস। মূল্য, দেড় টাকা।

উপন্যাসখানির প্রথমেই প্রকাশকের নিবেদন পড়ে মনে ভয় হয়েছিল হয়ত বইখানার মধ্যে শুধু 'সত্যশিবসুন্দরে'র চিরপুরাতন তর্কের একটা কিছু প্রমাণ চেষ্টা করা হয়েচে। কিন্তু কিছুদূর পড়বার পরেই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগল, লেখক এমন একজন লিখিয়ে নন, লিখতে বসলে যাঁর মনের মধ্যে কেবল ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সত্যশিবসুন্দরের দ্বন্দ্ব। লেখক একজন জীবনের উপাসক শিল্পী। আমাদের দেশে শিল্পের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে 'সত্যশিবসুন্দরে'র কলহের কথা উঠে পড়ে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, শিল্পী নিছক সত্যেরও উপাসক নয়, শিবেরও উপাসক নয়—সুন্দরেরও উপাসক নয়। কারণ, সত্য কি তার চরম মীমাংসা এখনও মানুষ পায়নি, সমাজের মঙ্গল দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন, এবং সুন্দর কি—তার মাপকাঠি আজও নির্দ্দিষ্ট হয়নি। শিল্পী মূলতঃ জীবনের দ্রষ্টা এবং কার্য্যতঃ জীবনের স্রষ্টা। উপাসনা যদি তিনি একান্তই করেন ত' তাঁর উপাস্য দেবতা হচ্চে, দিকে দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং জীবনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে যে পরম রহস্য রয়েচে তাই। সাধক এবং কর্ম্মীরূপে মতিবাবু প্রসিদ্ধ। কিন্তু যুক্তবেণীর মধ্যে তাঁর শুধু একটি পরিচয়ই মূর্ত্ত হয়ে উঠেচে—তিনি শিল্পী। প্রেমকাহিনী নিয়ে উপন্যাস খানির রচনা। বইখানার মধ্যে কিছুই প্রমাণ করার চেষ্টা নেই—না অতি আধুনিকদের আধুনিকত্ব, না-বা প্রাচীনদের অভ্যাগতিক প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব। বরং 'illusion of reality' এমনই আছে যে মনে হয় আমাদের পরিচিত ঘর সংসারের কথা। উপন্যাসখানা সাহিত্যরসিক মাত্রেরই পক্ষে সুখপাঠ্য। অন্ততঃ যাঁরা অধুনিক শক্তিশালী লেখকদের বিরুদ্ধে নিষ্ফল যুদ্ধ করে শেষে আত্মতুষ্টির জন্যে গর্ব্ব করে বলেন, বাংলা বই পড়া ছেড়ে দিয়েচি, তাঁরাও বই-খানা পড়ে দেখতে পারেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে অতি আধুনিকও আছেন নাতি আধুনিকও আছেন।

ইষ্ট—শ্রীমতিলাল রায় মূল্য। আট আনা।

কথানাট্য। সুদৃশ্য মলাট। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথায় কথন প্রকাশ করার দিক থেকে মতিবাবুর হাত মন্দ নয়। শিল্পরসিকদের সমাজে মতিবাবুর সাহিত্যের বহুল প্রচার হোক—এই আমাদের কামনা।

—কা—

প্রকৃতির পরিহাস—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

অন্নদাশঙ্কর বাঙ্গালী সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত। প্রকৃতির পরিহাস তাঁর প্রথম গল্প বই,—"নজর বন্দী" "গাধা পিঠে ঘোড়া," "উপযাচিকা", "স্ত্রীর দিদি" "বিভীষিকা" এবং "চুপি চুপি" নামক গল্পের সমষ্টি।

গল্পগুলোর পাঠে পাঠকের মনে ভাবনার উদয় হয়; লেখকের সূক্ষ্ম রসবোধ এবং শিল্পীর মহার্ঘতা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, এক বিচিত্র কল্প-রাজ্যে নিয়ে যায়। লেখকের শাণিত বুদ্ধি এবং সুমার্জ্জিত রচনারীতি এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্ববিষয়ে নিরাসক্তভাবে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করবার স্বাস্থ্যপূর্ণ সাহস ও ক্ষমতা পাঠকের অজস্র প্রশংসার যোগ্য।

এ গল্পগুলোতে আদি রসের প্রাচুর্য্য আছে। আদি রস সকল রসের উৎস, এবং সে রসকে লেখক এমন সুকৌশলে এমন অকু-

তোভয়ে এমন সুমার্জ্জিতভাবে এবং সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে গল্পের অন্তর অঙ্গে মিশিয়েছেন যে গল্পের, রসের, ভাষার এবং ভঙ্গীর কোন ক্ষতি হয়নি।

প্রকৃতির পরিহাস সত্যই নিষ্ঠুর, তার নিয়ম অমোঘ। আমরা লোকাচারের, সমাজের, এবং সামাজিক ভাবালুতার দ্বারা প্রকৃতির নিয়মের বিঘ্ন উৎপাদন করে সে নিয়ম ব্যর্থ করতে পারি না। আগুনের কাছে মোম রাখলে তা জলবেই, স্ত্রীর চেয়ে স্ত্রীর দিদির দিকে নজর দিলে গোল বাধবেই, স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী যুবতীকে ব্রহ্মচারিণী হতে বল্লে সমাজ তাকে হারাবেই, ছোটবেলাকার যৌন অভ্যাস ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিবেই এবং তার কানে কানমলা খেতে হবেই, স্ত্রীলোকের যৌনবোধ পুরুষেরই মত স্বাভাবিক এবং তাকে বাৎসল্যের ভস্ম দিয়ে চাপতে গেলে বিপদ ঘটবেই, পুরুষ এবং স্ত্রীর বিবাহ হলে সন্তান হবেই এবং সকলকে লালন পালন করতে অপারগ হলে স্বামীজী হওয়া বিচিত্র নয় -এইগুলো হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম এবং এই নিয়মের ব্যত্যয়ে প্রকৃতির পরিহাস মর্ম্মান্তিক।

জরীনকলম

হিন্দু কোন পথে? শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল প্রণীত। ১০ নং কলেজ স্কোয়ার থেকে মডার্ণ বুক এজেন্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৯৯ পৃষ্ঠা। দাম ১।০ মাত্র।

এ বইখানিতে কয়েকটি প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সমস্যা হিন্দুর সমক্ষে উত্থাপিত হ'য়েছে—তারই আলোচনা করেছেন। আলোচনার ছত্রে ছত্রে লেখকের যে প্রগাঢ় জ্ঞান এবং স্বাধীন স্বচ্ছ ও গভীর চিন্তা-শক্তির পরিচয় আছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। বিগত পনেরো বৎসর ধরে যে তুমুল রাষ্ট্রিয় আন্দোলন ভারতবর্ষের চিত্তকে মথিত করেছে, লেখক তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন, আমরা তদ্দ্বারা কতখানি অগ্রসর হ'তে পেরেছি। এ প্রসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতাদের কার্য্যাবলীর সূক্ষ্ম এবং সময়ে সময়ে তীব্র সমালোচনার প্রয়োজন হ'য়েছে, এবং লেখক তা' করতে পশ্চাৎপদ হ'ন নি। বাঙ্গালী আবেগ-প্রবণ জাতি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে আর আবেগের বন্যায় গা ভাসিয়ে দিলে চলবে না। ধীর চিন্তার দ্বারা আমাদের পথ নির্ণয় করে চলতে হবে। আলোচ্য বইখানি সেই চিন্তার খোরাক দিতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর বই খানি পড়ে দেখা আমরা অবশ্যকর্ত্তব্য বলে মনে করি।

শ্রীসুশীলকুমার মিত্র

মহাপুরুষ চরিত—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। চক্রবর্ত্তী সাহিত্য ভবন বজবজ হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

এই বইখানি পাঠ করে সুখী হয়েছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী এবং শ্রীশ্রীতৈলঙ্গ স্বামী—এই চারজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী এবং পরিশিষ্ট অংশে এঁদের প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ এই বইখানির মধ্যে সন্নিবদ্ধ হয়েছে। বিস্তৃত প্রচারের অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার পুস্তকখানির মূল্য যথাসম্ভব সুলভ করেছেন। তদনুগত স্বল্প পরিসরের মধ্যে এই পুস্তকটি চিত্তগ্রাহী ভাবে রচিত করে গ্রন্থকার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা প্রাঞ্জল, বিবৃতি সুসম্বদ্ধ—সুতরাং পাঠকের কৌতূহল এবং আগ্রহ শেষ পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকে। কিশোর হ'তে বয়স্ক, সকল বয়সের পাঠককে পুস্তকখানি আনন্দ প্রদান করতে সমর্থ হবে বলে আমরা মনে করি।

এই শ্রেণীর মূল্যবান অথচ সুলভ পুস্তকাবলী প্রকাশের দ্বারা চক্রবর্ত্তী সাহিত্য ভবন দেশের উপকার সাধন করছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

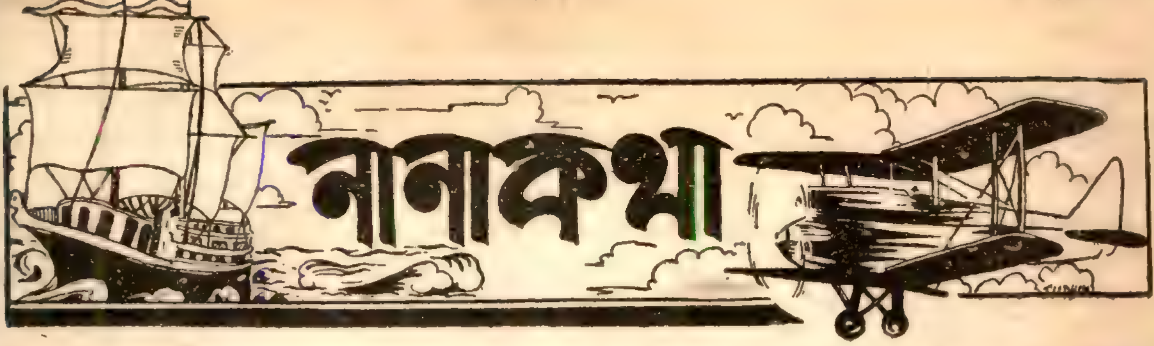

পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

গত ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৬ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুতে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই ক্ষতি হয়নি, পরন্তু সমস্ত পৃথিবীর ক্ষতি হয়েছে। সম্রাট জর্জ্জের মধ্যে রাজোচিত এবং রাজ-দুর্লভ এত গুণ ছিল যে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় শুধু তাঁর নিজ প্রজাবর্গেরই হৃদয় জয় করেননি, সমস্ত বিশ্বমানবের মধ্যেও তিনি একজন অত্যন্ত লোকপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মধ্যে রাজদুর্লভ (অরাজোচিত বললেও অন্যায় হয় না) বহুগুণ আশ্রয় নেবার প্রধান কারণ এই ছিল যে তাঁর জীবনের প্রথম ভাগে তিনি তাঁর পিতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ব'লে ইংলণ্ডের ভাবী সম্রাট গ'ড়ে তোলবার উপযুক্ত বিশেষ শিক্ষা তাঁকে দেওয়া হয়নি, রণপোতের একজন দক্ষ নাবিক করবার জন্য কঠোর পরিশ্রমসাপেক্ষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এই শিক্ষালাভের কালে সম্রাট জর্জ্জকে অচিন্তিত ভাবে তাঁর ভবিষ্য প্রজাবর্গের মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে একত্রে কায়িক কার্য্য করতে হয়েছিল; একত্রে পান আহার শয়ন এবং অবসরযাপনের মধ্য দিয়ে তাদের সুখ দুঃখ আশা উদ্দীপনার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের তাঁর সুযোগ ঘটেছিল; তাঁর অগ্রজকে যখন প্রজাবর্গের সংস্পর্শ থেকে সযত্নে স্বতন্ত্র রেখে প্রজাশাসনের মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল, তখন জর্জ্জ তাঁর নাবিক-বন্ধুদের সঙ্গে পাশাপাশি ব'সে কথোপকথন করতে করতে মহাসমুদ্রের বক্ষে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। ফলে প্রজাবর্গের প্রতি তাঁর এমন একটা সাক্ষাৎ সহানুভূতি এবং অনুরাগ সঞ্জাত হয়েছিল যা রাজসিংহাসন লাভের পরও নষ্ট হয়নি অথবা হ্রাস পায়নি। এ সহানুভূতি শুধু তাঁর ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষে আগমন করে ভারতীয় প্রজাদিগের প্রতিও এই সহানুভূতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই ১৯০৬ সালে ভারতবর্ষ হ'তে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন ক'রে গিল্ড-হলে বক্তৃতা প্রদান কালে তিনি ব'লেছিলেন—

পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

"I cannot help thinking, from all I have

heard and seen, that the task of governnig India will be made all the easier if, on our part we infuse into it a wider element of sympathy. I predict that to such sympathy there will be an ever-abundant and genuine response."

কূট রাজনীতির কঠিন আবরণ ভেদ করে সহানুভূতি-মন্ত্রের এই নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক প্রচার তৎকালীন ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করেছিল। আর কিছুদিন জীবিত থাকলে সম্রাট জর্জ্জ হয়ত ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু কল্যাণ সাধন করতে পারতেন। বর্ত্তমান সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড আশ্বাস দিয়েছেন যে রাজ্যশাসন বিষয়ে তিনি তাঁর পরলোকগত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। আমরা আশা করি এ প্রতিশ্রুতি পালিত হবে। প্রার্থনা করি কালে তিনি যেন তাঁর পিতার মত প্রজারঞ্জন খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হন।

আমরা সম্রাজ্ঞী মেরী, মহামান্য অষ্টম এডওয়ার্ড ও শোকসন্তপ্ত রাজপরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সাহসিকতার মর্য্যাদা

স্বীয় জীবনকে গুরুতর ভাবে বিপন্ন ক'রে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে বুলেট-বর্ষিত স্থলে উপনীত হওয়ার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্যাপ্টেন পতিতপাবন চৌধুরী আই, এম্, এস্ কে মিলিটারী ক্রশ (M.C.) প্রদান করে সম্মানিত করেছেন। মর্য্যাদার ক্রমে মিলিটারী ক্রস্ ভিক্টোরিয়া ক্রসের অব্যবহিত নিম্নে পরিগণিত।

এই ঘটনা গত বৎসরে এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আগ্রা সংঘর্ষকালে সংঘটিত হয়। আলী-নগরের ফকীরের নেতৃত্বে একটি লস্কর-বাহিনী মালাকন্দ প্রদেশ আক্রমণ করে। এই বাহিনীকে সোয়াত নদীর পর-পারে বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজের নওশেরা সৈন্য অগ্রসর হয়। সেই যুদ্ধকালে মালাকন্দের পোলিটিকাল এজেণ্ট মিঃ এল, ডবলু, এইচ, ডি, বেষ্ট আই-সি-এস্ সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে ধরাশায়ী হন। বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল থেকে এই ব্যাপার দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন চৌধুরী এক দৌড়ে মুক্ত স্থলে মিঃ বেষ্টের নিকট উপনীত হন। তখন সেখানে ভীষণ ভাবে বুলেট বর্ষিত হচ্ছিল।

এ পর্য্যন্ত কোনো বাঙ্গালী অথবা কোনো আই-এম-এস কর্ম্মচারী সাহসিকতার দাবীতে মিলিটারী ক্রস লাভ করতে সমর্থ হননি। অন্য কোনো ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত এ সম্মান পেয়েছেন কিনা আমরা ঠিক জানি না। যদি একান্ত পেয়ে থাকেন ত' দুই একজন পাঞ্জাবী পাঠান। ক্যাপ্টেন চৌধুরী বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন।

ক্যাপ্টেন পতিতপাবন চৌধুরী এম্ সি, আই-এম্-এস্

সাহিত্যিকের মর্য্যাদা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডক্টর অফ্ লিটারেচার উপাধির দ্বারা সম্মানিত করবেন স্থির করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বৎসর শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীকে জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই দুজন

বরেণ্য সাহিত্যিকের সম্মানলাভে আমরা সবিশেষ আনন্দিত হয়েছি। উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের পরিতৃপ্তি লাভ করলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী

১২৪২ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান বৎসরের ফাল্গুন মাস হ'তে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব ভারতবর্ষে এবং বিদেশে অনুষ্ঠিত হবে।

যদিচ রামকৃষ্ণ শক্তির উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মাভিব্যক্তির প্রধান স্বরূপ ছিল সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নববিধান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন।

রামকৃষ্ণ শাস্ত্রাধ্যয়ন, এমন কি সাধারণ লেখ পড়াও, বিশেষ কিছুই করেন নি; কিন্তু নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির বলে তিনি অধ্যাত্ম জ্ঞানের এমন উন্নত স্তরে উপনীত হয়েছিলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতির ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁর উপদেশ লাভের জন্য আগ্রহ সহকারে তাঁর কাছে ব'সে থাকতেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক পরিকর্ষে (Culture) রামকৃষ্ণের ধর্ম্মভাব একটা পরিবর্ত্তিত নূতন ভঙ্গী প্রদান করছিল। শুধু ভারতবর্ষই নয়, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশও রামকৃষ্ণের ধর্ম্মমতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

আজ আমরা ভারতবর্ষের এই যুগমানবের শতবর্ষ পূর্ব্বেকার আবির্ভাবের শুভ মুহূর্ত্ত স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করি।

হিন্দুস্থান সঙ্ঘ—শিল্প প্রদর্শনী

শিবপুর সাধারণ গ্রন্থাকারের সুপ্রশস্ত হলে হিন্দুস্থান সঙ্ঘের ব্যবস্থায় গত ২৩শে জানুয়ারী একটি শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনীর এটি দ্বিতীয় বর্ষ। প্রদর্শনীতে বহু সংখ্যক চিত্র এবং অন্যান্য শিল্প-সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর সামগ্রী সংগ্রহ এবং সাজাবার ব্যবস্থা দেখে আমরা আনন্দ লাভ করেছিলাম। ভবিষ্যতে আমরা প্রদর্শনীর কিছু বিস্তৃততর বিবৃতি ও কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করব স্থির করেছি।

প্রদর্শনীর সম্পাদক শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনী সেন এবং তাঁর শিল্পীবন্ধু শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশ এবারকার প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার এই উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ, গত বৎসর হ'তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেছেন। উৎসবের দিন, সকালে কলিকাতার কলেজগুলির ছাত্র ছাত্রীগণ দলবদ্ধ হয়ে গড়ের মাঠে গিয়ে সমবেত হয়ে ছিল, এবং তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার এবং ভাইস-চান্সেলার তাদের বক্তৃতার দ্বারা উপদেশ দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে গড়ের মাঠে ছেলেদের নানা প্রকার ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়।

আমরা আশা করি এই উৎসব অনুষ্ঠানটি ক্রমশঃ আরও ব্যাপক এবং বিচিত্ররূপ ধারণ করবে।

পরলোকে অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

বিগত ১১শে মাঘ অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত পরলোক গমন করেছেন। তিনি রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু একজন চিন্তাশীল সাহিত্যিক বলেই তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রভৃতি পুস্তকগুলি পাঠকসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের অধ্যাপক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বিপিন বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর।

পরলোকগত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর অকস্মাৎ হৃদরোগে পরলোকগমন করেছেন। তিনি একজন চিন্তাশীল সাহিত্যিক ছিলেন এবং ভারতবর্ষের পুরাতন রীতিনীতি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। 'জয়ন্তী' নামক পুস্তকের তিনি রচয়িতা।

পরলোকে কামিনীকুমার চন্দ

কংগ্রেস-কর্ম্মী এবং শিলচরের সুবিখ্যাত উকিল কামিনী মার চন্দ মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। কংগ্রেসে এবং

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় কামিনীকুমার নির্ভীকতার সহিত দেশের অনেক উপকার সাধন করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ বাঙ্গলার প্রথম ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্।

বাঙালী বৈজ্ঞানিকের সমাদর

হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর বসন্তকুমার দাস ডি-এস্‌সি (লণ্ডন) মহাশয় নিজাম সরকারের পক্ষ থেকে লিসবনে সর্ব্বজাতীয় প্রাণীবিদ্যা মহাসভার দ্বাদশ অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তথায় হায়দ্রাবাদের কয়েক জাতীয় মৎস সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য-পূর্ণ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়মেও তিনি তাঁহার মৎস্যগুলি সম্বন্ধে অনুশীলন করেন।

প্রাণীবিষয়ক এই মূল্যবান গবেষণার জন্য তিনি লিসবনের প্রাণীবিদ্যা মহাসভার সভাপতি ডক্টর আর্থার রিকার্ডো জর্জ্জ এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মের অ্যাসিষ্টাণ্ট কীপার জে, আর, নর্ম্মানের নিকট হ'তে উচ্চ প্রশংসালিপি অর্জ্জন করেন। ডক্টর জর্জ্জ (Jorge) তাঁর প্রশংসালিপিতে বলেছেন।—* * The experience you realised in our laboratories before and during the Congress were of the highest interest and worthy of the attention they received. * * * We feel that your contribution towards the success of the Congress was of the highest order. * * *

ডক্টর দাসের পক্ষে এই সকল গৌরব অর্জ্জন সম্ভব হয়েছে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং মহামান্য নিজাম বাহাদুরের সরকারের বদান্যতা এবং গুণগ্রাহিতার জন্য। তাঁরা দেশের এই উপকার সাধনের জন্য ধন্যবাদার্হ।

বাঙালী যুবকের নূতন গৌরব

টেম্‌স্ নটিকাল ট্রেনিং কলেজ থেকে সীম্যানশিপ (Seamanship) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি একস্ট্রা ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট লাভ করেছেন। শুধু বাঙলার পক্ষে নয়, ভারতবর্ষের পক্ষেও এ কৃতিত্ব অর্জ্জন এই প্রথম। শ্রীমান কালীকৃষ্ণের বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। ইনি ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের মিলিটারী ফাইনেন্স বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বাঙলার কন্যামেধ যজ্ঞ

কলিকাতা গড়পার রোডের শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মজুমদার মহাশয়ের চারটি কন্যা পারুলবালা (২৪ বৎসর), দেবী (২১ বৎসর), গঙ্গা (১৯ বৎসর) ও যমুনা (১৭ বৎসর) তাদের পিতাকে বিবাহপণ সংগ্রহের দুশ্চিন্তা ও সঙ্কট হ'তে মুক্তি দান করবার অভিপ্রায়ে একযোগে আফিং সেবন করে ও পারুলবালা ভিন্ন অপর তিন জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এ সংবাদ সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কন্যাদায়-গ্রস্ত অসহায় কিশোরী বাবুর প্রতি প্রতিবেশীদের নির্দ্দয় বিদ্রূপ এবং টিটকারী বর্ষণও উক্ত চারটি কন্যার মনে আত্ম-হত্যার প্রবৃত্তি জাগ্রত করবার পক্ষে অংশতঃ দায়ী ব'লে শোনা যাচ্ছে।

কিশোরী বাবু সম্ভ্রান্ত বংশীয়। তিনি নিজে একজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, এখন পেন্সেনপ্রাপ্ত; অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁর বেতন ছিল মাসিক ৫৫০৲ টাকা; ভূতপূর্ব্ব হাই-কোর্টের জজ রামচন্দ্র মজুমদার ছিলেন তাঁর সহোদর; তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর রাখালচন্দ্র মজুমদার ছিলেন ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। এই কিশোরী বাবুর বংশ পরিচয়। এমন একটি পরিবারেও যদি এরূপ মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা সম্ভব হয় তা হ'লে বাঙলার শত শত দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং বিবাহপণপীড়িত পরিবারের আর কথা কি? আমরা জিজ্ঞাসা করি—বাঙলার পশুপ্রকৃতি বরপক্ষগণের এই নির্দ্দয় এবং বর্ব্বর কন্যামেধ যজ্ঞ আর কত দিন চলবে? এর কি কোনো প্রতিকার নেই। বহুকাল পূর্ব্বে স্নেহলতার আত্মহত্যার কালে আমাদের মনে হয়েছিল বাঙলার যুবকসম্প্রদায় হয়ত এ বিষয়ে অগ্রসর হ'য়ে প্রতিকার বিধান করবেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় সে আশা আমরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছি। বিবাহ বিষয়ে বাঙলা দেশের যুবক সম্প্রদায় অতিশয় পিতৃভক্ত, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে একটা মোটা রকম অর্থাগমের সম্ভাবনা দেখা যায়। এ বিষয়ে তাঁরা পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ—পিতা প্রসন্ন হ'লেই তাঁরা প্রসন্ন হন। তাঁরা আবার সময়ে সময়ে এমন সপ্রতিভ যে, অভিভাবকের অবর্ত্তমানে নিজেই সংবাদপত্রের স্তম্ভে বিজ্ঞাপন দেন যে, নগদ চার হাজার টাকা বিবাহ পণ পেলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার ক'রে বিলাত গিয়ে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করবেন!

সুতরাং এ অবস্থায় বাঙলার ভাগ্যবিধাতাকেই জিজ্ঞাসা করি, আর কত প্রায়শ্চিত্তের পর হতভাগ্য বাঙলা দেশকে এই দুঃসহ লজ্জার গ্লানি থেকে মুক্ত করবে?

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya-Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and Published by the same from 27-1, Fariapooker St. Calcutta.

বিচিত্রা — হর-পার্ব্বতী — শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

চৈত্র, ১৩৪২

বিচিত্রা

নবম বর্ষ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৪২ | ৩য় সংখ্যা

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ঔঁ

আশিস সন্দেশ

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশকুসুম চয়নে,
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে
মোদের মিলিত নয়নে।।
বাহির আকাশে মেঘ ঘিরে আসে
এল সব তারা ঢাকিতে,
হারানো সে আলো আসন বিছালো
শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন-রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চির জীবনের বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহার আঁখিতে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঘ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্তা রেণুকা দেবীকে তাঁহাদের শুভ-পরিণয় উপলক্ষে কবিগুরুর আশীর্বাদ।

খাটুনীর মাহাত্ম্য

(পত্র)

দার্জ্জিলিং, আসানটুলি
১০-৬-৩১

কল্যাণীয়েষু,

ডিগ্‌নিটি অফ্‌ লেবার কথাটা ফাঁকি। কোনো কাজে ডিগনিটি আছে, কোনো কাজে নেই। সকল বিষয়েই এই কথা খাটে—যদি বলি ডিগনিটি অফ্‌ আর্টস্‌, তবে এ বোঝায় না যে তোমার আঁকা ছবিতেও ডিগনিটি আছে। সেই কর্ম্মই উচ্চ শ্রেণীর যাতে বুদ্ধি খাটে বা প্রীতিভক্তির দাবী আছে। লোকসেবার অনুরোধে নীচকর্ম্মও উঁচুদরের, যেমন রোগীর শুশ্রূষায় মলিন কর্ম্মেও মহত্ত্ব আছে, বরং তাতে মহত্ত্ব বেশি আছে। তাই ব'লে রাস্তার লোক ধ'রে ধ'রে গায়ে প'ড়ে যেচে যেচে তাদের জুতো সাফ ক'রে দেওয়ায় ডিগনিটি আছে এ কথার মানে নেই। নিতান্ত দায়ে ঠেকলে উচ্চতরো বুদ্ধিজীবির কাজ যদি না পাওয়া যায় তা হোলে প্রাণরক্ষার জন্যে অন্য কাজও করা চলে, মর্য্যাদা না থাকলেও তার জরুরী থাকতে পারে। সকালবেলায় দাঁতন করি, সেটার ডিগনিটি বা শোভা না থাকলেও তবু করতে হয়—কাব্য লেখা বা ছবি আঁকার সমান মূল্য তাকে দেওয়া মূঢ়তা। যদি কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে দাঁতন না করলেও চলত নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতুম কিন্তু কাব্য রচনা সম্বন্ধে সে কথা বললে চলবে না। মুটে মোট বয় বটে কিন্তু তার এতটুকু বুদ্ধি আছে যে সম্ভব হোলে সে মোট বওয়া ছেড়ে দিয়ে ইস্কুলের মাষ্টারি করত—তার মানে মোট বওয়াব দায় আছে, ডিগনিটি নেই, মাষ্টারিতে কুলিগিরির চেয়ে ডিগনিটি আছে। অভাব পক্ষে যে-কোনো কাজ হাতে পাও স্বীকার করো, কিন্তু বাজে বুলির সাহায্যে নিজেকে বা অন্যকে ফাঁকি দেবার দরকার কী ? ইতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী কাল

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বদেশ-কল্যাণ-সঙ্ঘের মাসিক অধিবেশন বসবে সন্ধ্যা সাতটায়, এখন ঘড়িতে বাজলো চারটে। অনেক দেরি। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট এককড়ি। প্রদীপে আলো জ্বালাবার লোকের অভাব হয় নি, কিন্তু তেল যোগাতে হয় একাকী তাকেই। তার গৃহেই সঙ্ঘের অফিস, তার বসবার ঘরেই বসে সঙ্ঘের বৈঠক। মেঝেয় আগাগোড়া সতরঞ্চি পাতা, তার উপর ফর্সা চাদর এবং দেয়ালের ধারে ধারে রাখা অনেকগুলি তাকিয়া। এরই একটা অধিকার ক'রে এককড়ি গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে চোখ বুজে বোধকরি বা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল এমন সময়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করলে জলধি। আসন গ্রহণ ক'রে ডাকলে, এককড়ি দাদা কি ঘুমিয়ে পড়লেন?

এককড়ি চোখ মেলে উঠে বসলো। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে গম্ভীর মুখে বললে, গভীর চিন্তামগ্ন ছিলাম। তার পরেই একটুখানি হেসে ফেলে বললে, ঘুমিয়ে পড়লেও দোষ নেই রে জলধি, বয়স তো হ'লো। এখন এইটেই স্বধর্ম্ম।

জলধিও হাসলে, বললে ইস্! ভারি ত বয়েস।

যৌবনের প্রথম দিকটা এককড়ির শেষ হয়-হয়। রগের কাছটায় চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু সুগঠিত দেহে শক্তি ও উদ্যমের অবধি নেই। এককড়ি বিপত্নীক। প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে আছে শুধু তার

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সরকার মহাশয়ের রচিত 'অনাগত' নামে একখানি উপন্যাস ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে এ কথা আমার মনে ছিল না। গল্পের পরিবর্ত্তন না করেও নামের পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে। 'আগামী কাল' নামটি বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের দেওয়া।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গত শ্রাবণ মাসে "অনাগত" নামে এই উপন্যাসটি আরম্ভ হয়। তারপর দুর্ভাগ্যবশতঃ শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সুদীর্ঘ সাত মাস এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হ'তে পারে নি। ঈশ্বরেচ্ছায় শরৎচন্দ্র কতকটা সুস্থ হওয়ায় এখন হ'তে আবার এটি প্রকাশিত হ'বে। বহুদিন পূর্ব্বে মাত্র প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হয়েছিল, পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা সেটুকুও পুনর্মুদ্রিত করলাম। নাম পরিবর্ত্তনের কৈফিয়ৎ শরৎচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন। বিঃ সঃ

বছর দশেকের মেয়ে আর এক বিধবা পিসি। পাটের ও তিসির ব্যবসায়ে পিতা এত অর্থ-সম্পদ রেখে গেছেন যে তাকে প্রভূত বলাও চলে। পরে পরে অনেকগুলি ভাই-বোন মরার পরে এককড়ির জন্ম, তাই ছেলেবেলায় এত সাবধানে তাকে রক্ষা করা হয় যে, সে প্রায় একপ্রকার পাগলামির অন্তর্গত। পিতা স্কুলে পর্য্যন্ত কখনো ছেলেকে পাঠান নি,—বাড়ীতেই নিযুক্ত ছিল মাষ্টার ও পণ্ডিত। নাম-জাদা ও উচ্চ বেতনের। ছাত্রের সম্বন্ধে তাঁদের সার্টিফিকেটের ভাষা ছিল উদার, কিন্তু বিদ্যার পরীক্ষা যাকে দিতে হয়নি তার বাজার দর কতো-এবং বাগ্দেবী সত্যই তাকে বর দিলেন কি পরিমাণ, এ তথ্য নিরূপণ করা আজ কঠিন। পাঠ সাঙ্গ হলো, শিক্ষকগণ বিদায় নিলেন, তবু লাইব্রেরী ঘরেই দিন কাটলো তার এতদিন। পিসিমার বহু অশ্রুপাত অগ্রাহ্য করেও সে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি বইয়ের শেল্‌ফগুলো ছাড়া এ রহস্য আর কেউ জানে না। এমনি করেই তার দিন কাটতে পারতো কিন্তু পারলো না। হঠাৎ বন্দে-মাতরমের বিরাট কঠিন ধ্বনি কোটর থেকে টেনে তাকে বার করলে। তারপরে জেলে গেলো, দলা-দলির আবর্ত্তে পড়ে নাকে-মুখে পাঁক ঢুকলো, দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রদত্ত নানা বিচিত্র বিশেষণের মালা শিরোপা পেলে, শেষে একদিন যাদের সংসার চালিয়েছিল তারাই চোর বলে যখন কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে তখন সে আর সইলো না, পলিটিক্সে জলাঞ্জলি দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আবার তার লাইব্রেরী ঘরে এসে আশ্রয় নিলে। কিন্তু দেশোদ্ধারের নেশা তখন পাকা করে ধরেছে, তাই পুরনো বইয়ের মধ্যে আর তার মৌতাতের খোরাক মিললো না, আবার তাকে অস্থির করে তুললে। এবার কতকগুলি ছেলেমেয়ে জুটলো—তারাও তখন পলিটিক্সে তোবা ক'রে বেকার হয়ে পড়েছে—বল্‌লে, এককড়ি দা, রাজনীতি আর না, কিন্তু জীবনটাকে কি নিতান্তই ব্যর্থ করে আনবো, দেশের একটা কাজেও লাগবে না? এ দুর্গতি থেকে বাঁচাও—যাতে হোক লাগিয়ে আমাদের দিয়ে তুমি কাজ করিয়ে নাও।

এককড়ি রাজি হলো। স্থির হলো এবারের প্রোগ্রাম সোসেল সার্ভিস। গ্রামে, নগরে, পল্লীতে—সর্ব্বত্র কেন্দ্র সংস্থাপন করা। জলধি বললে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, চরিত্রে, অর্জ্জনে, সঞ্চয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে সচেতন করতে না পারলে ঘরে-পরে কেবল বিদ্বেষ আর কলহ দিয়েই সঙ্কট মোচন হবে না। যোগ্য না হলে যোগ্যতার পুরস্কার পাবে কার কাছে? পেলেই বা থাকবে কেন? ধনীর কুপুত্রের মতো, বিত্ত-সম্পদ যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোপ পাবে—চক্ষের পলক সইবে না,—কমলা অন্তর্হিত হবেন। এসব যুক্তি শাশ্বত সত্য—অকাট্য। এর বিরুদ্ধে তর্ক চলে না।

অতএব প্রতিষ্ঠিত হলো কল্যাণ-সঙ্ঘ। গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হলো শাখা প্রশাখা। অধ্যক্ষ এককড়ি, সচিব জলধি। নানা শাখার সদস্য-সংখ্যা দুশোর বেশি। আজকের দিনে মাসিক অধিবেশনের বৈঠকে সাধারণতঃ হাজির যারা হয় সে-ও জন পঞ্চাশের কম নয়। দূরের সদস্যদের ট্রেণ ভাড়া দেবার ব্যবস্থা আছে।

নীচের যে-ঘরটায় সঙ্ঘের অফিস সেখানে বসে যে-মেয়েটী অবিশ্রাম কেরাণীর কাজ করে তার নাম মণিমালা। মাসিক ত্রিশ টাকায় সে ভর্ত্তি হয়, সম্প্রতি খুসি হয়ে এককড়ি মাইনে বাড়িয়েছে পঞ্চাশ টাকায়। গোড়ায় এককড়ি তাকে বাড়িতে থাকতেই বলেছিল, কারণ ঘরের অভাব নেই, কিন্তু সে রাজি

হয় নি। কাছেই কোথায় তার বাসা—সেখানে নিজে রেঁধে খায়। একলা থাকে। একটা দিনের জন্যে তার কামাই নেই, একটা কাজে তার শৈথিল্য প্রকাশ পায় না। একদা অসহযোগের প্রবল বন্যায় ভাসতে ভাসতে ঠেকতে ঠেকতে সে এ অঞ্চলে এসে পড়ে। সঙ্গে বাবা ছিলেন, কিন্তু বুড়োবয়সে জেলের দুঃখ তাঁর সইলো না—বাইরে এসে যশোর না কোথায় উদরাময়ে মারা গেলেন। মণিমালার প্রাক্তন ইতিবৃত্ত এর বেশি কেউ জানে না। স্বল্পভাষী মেয়ে,—নিজের মুখে প্রায়ই কিছু বলে না। দেখতে সে সুন্দরী নয়, মুখের পরে একটা পুরুষালি ভাব, কাউকে টানে, কাউকে দূরে ঠেলে। বর্ণ কালোর দিকে কিন্তু মেদ মাংসর বাহুল্যবর্জ্জিত দীর্ঘচ্ছন্দের দেহ কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু তা দেখামাত্রই বুঝা যায়। এবং জন্মভূমি যে পূর্ব্ব-বাঙলার কোন এক স্থলে সে পরিচয়ও ধরা পড়ে তার উচ্চারণে। মনে হয় একদিন কলেজে পড়েছিল সে নিশ্চিত, হয়ত বা কিছু কিছু পরীক্ষা পাশও করেছে, কিন্তু জিজ্ঞেসা করলে বলেনা, শুধু হাসে। তার ইংরাজি ও বাঙলা লেখার শুদ্ধতা ও ক্ষিপ্রতা দেখে এককড়ি অবাক হয়ে যায়। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে প্যাম্‌ফ্লেট ছেপে প্রচার করার বিধি আছে। আগে রচনার ভার ছিল জলধির, এখন পড়েছে মণিমালার পরে। পূর্ব্বে এই লেখাটা আদায় করতে এককড়ি গলদঘর্ম্ম হতো, এখন বলামাত্র লেখা আপনি আসে। জলধি সেক্রেটারি, কাটকুট না ক'রে, কলম না চালিয়ে তার মান বাঁচেনা। এককড়ি বিরক্ত হয়ে মণিমালাকে আড়ালে ডেকে বলে ফুলের ক্ষেতে ফাল চালাবার যদি ওর সখ, কিন্তু উলুবনের' তো অভাব নেই,—আমাকে বললে একটা দেখিয়ে দিতেও পারতাম,—তাতে কাজ না হোক অকাজ ঘটতোনা। কিন্তু এ লেখাটা যে দশজনে পড়বে মণি, একে নাম সই করে ছাপতে দেবো কি ক'রে? ওকে বোলো এবার থেকে ও-ই যেন দস্তখত করে।

মণিমালা জলধির হয়ে সলজ্জে বলে, কিছু খারাপ হয়নি এককড়ি দা, প্রেসে পাঠিয়ে দিন। সংশোধনগুলো আমার ভালোই লেগেছে।

সেই ভালো, বলে এককড়ি ছাপতে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্ঘের বাইরের চেহারার একটু নমুনা দিলাম, ভিতরের মূর্ত্তিটা ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।

জলধি হাত ঘড়িটা মিলিয়ে দেখে বললে, চারটে পনেরো—ভিড় জমতে ঘণ্টা তিনেক দেরী। কিন্তু সঙ্ঘের সেক্রেটারি আমি, সকাল-সকাল আসাই আমার উচিত। খেয়ে দেয়েই আসবো ভেবেছিলাম কিন্তু ঘটে উঠলোনা। পথের মধ্যে ভাবলাম সুরেন আর তারিণীকে ডেকে নিই, কিন্তু পরের কাছে আপনি পাছে মন না খোলেন সেই ভয়ে বিরত হলুম।

এককড়ি বললে, সুরেন, তারিণী পর হলো? তবে আপনার বলো কাকে?

বলি শুধু আমার নিজেকে। ওদের সামনে মন খুললেও আমি মুখ খুলতে পারতামনা। ইতিমধ্যে গোটা দুই অনুরোধ আছে দাদা।

কিসের অনুরোধ?

একটা এই যে সঙ্ঘের আপনিই দেহ, আপনিই প্রাণ। আত্মার আলোচনা করবোনা, অচিন্তনীয় পদার্থ হয়ে তিনি চিন্তার অনধিগম্যই থাকুন। আমরা শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তিনটে বছর ত এই দেহ-যন্ত্রটা

টেনে টেনে বেড়ালাম, এবার অনুমতি করুন পরের হাতে ঠেলে ফেলবার আগেই এর গঙ্গা-যাত্রাটা সমাধা করে যাই। দোহাই দাদা, অমত করবেন না, হুকুমটি দিন।

প্রার্থনার রসটা এককড়ি বুঝলেনা, সবিস্ময়ে জিজ্ঞেসা করলে, কার গঙ্গা-যাত্রা করতে চাও, আমাদের সঙ্ঘের?

জলধি বললে, ঠিক তাই। মরবেই ত, শুধু নিশ্বাসটুকু বেরোবার পূর্ব্বে একটু সমারোহে ঘাটে নিয়ে যাওয়া।

এককড়ি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো

জলধি বলতে লাগলো, আফিস-ঘরে খাতাপত্রগুলো আছে। সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। তা' হোক, ওগুলো শুধু মুমূর্ষুর গায়ের নোঙরা কাপড়-চোপড়। দাম কাণাকড়িও নয়, বরঞ্চ রোগের বীজাণু ছড়াবার আশঙ্কা আছে। চলুন, সদস্য-বৃন্দ সমাগত হবার পূর্ব্বে দেশলাই জ্বালিয়ে সৎকার করে ফেলা যাক।

এককড়ি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, আজ তোমার হলো কি জলধি?

জলধি বললে, কি হয়েছে সে বিবরণ আপনাকে সবিস্তারে দেবার নয়। মণিমালা উপস্থিত থাকলে সে হয়ত আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারতো।

এককড়ি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলো, বোধহয় মনে মনে কারণ বোঝবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হলোনা। প্রশ্ন করলে তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

জলধি বললে, এটা আরো বেশি দরকারি দাদা। আপনার মামা মস্ত লোক, তাঁকে ধরে করপোরেশনে হোক, মিউনিসিপ্যালিটিতে হোক, জেলা বোর্ডে হোক, ইন্‌সিওর কোম্পানীতে হোক,—অর্থাৎ আপনাদের স্বরাজ-পাওয়ারা যেখানে বেশ একটু আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে পেরেছেন আমার চাকরী একটা করে দিন। যেন দুমুঠো খেতে পরতে পাই।

এককড়ি ক্ষুব্ধ মুখে, কাতর স্বরে বললে, দুমুঠো খেতে পরতে কি পাওনা জলধি?

পাই বই কি দাদা, নইলে বেঁচে আছি কি করে? দেশের সেবা করি, একেবারে নিঃস্বার্থ। গোলামি করিনে বলে লোক ঠকিয়ে ইজ্জত বজায় করি,—ডান হাতটা ত রেখেছি দিনরাত বক্তার ঘুষিতে পাকিয়ে। তবু অলক্ষ্যে অগোচরে বাঁ-হাতের তেলোর পরে আপনার ছিটে-ফোঁটা মুষ্টি-ভিক্ষে যা এসে পড়ে তাতেই শোধ করি মেসের দেনা, খদ্দরের বিল। কুকুর বেরালে যে ভাবে বাঁচে প্রায় তেমনি। আপনি বড়লোক, বিশ-পঁচিশ পঞ্চাশ আপনার হিসেবের মধ্যেই নয়। কিন্তু আর নয় দাদা, এর থেকে ছুটি দিন।

এককড়ি চুপ করে রইলো, কথা কইলে না। দেয়ালের ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। যে চাকরটা তামাক বদ্‌লে দিতে ঢুকেছিল তাকে বললে, গোপাল, নীচে থেকে মণিদিদিকে ডেকে দিয়ে যাতো। জলধি, পরের কাছে লজ্জাই যদি বোধ করো—

না না দাদা, পর কোথায়? যে সব মহাত্মাদের মাঝে ঘোরা-ফেরা করি তাঁরা সবাই অন্তরঙ্গ, সবাই আত্মীয়। তাঁদের অজানা কিছুই নেই। বছর দশেক স্বদেশ-সেবা ব্রতে লেগে আছি, লজ্জা থাকলে বাঁচবো কেন?

চাকরটা গুড়গুড়ির মাথায় কল্‌কে রেখে নীচে যাচ্ছিলো জলধি তাকে বারণ করে বল্‌লে, গোপাল, তোর কাজে যা। একটু হেসে বললে, মণিমালা আসেনি এককড়ি দা, মিছে সিঁড়ি ভাঙিয়ে ওকে লাভ কি?

আসেনি? এমন ধারা ত কখনো হয় না।

হয় না বলেই হতে নেই দাদা? আজ তার দেহটা একটু বে-এক্তার—আমিই আসতে বারণ করে দিয়েছি।

কিন্তু অধিবেশনের কাগজ-পত্র?

কাগজ-পত্র আজ থাক্‌গে।

এককড়ি চিন্তিত স্বরে বললে, যাদের কখনো কিছু হয় না তাদের একটা কিছু হলে সহজে সারতে চায় না। ভয় হয় পাছে ওকে ভোগায়।

জলধি চুপ করে রইলো। এককড়ি বল্‌তে লাগলো, চমৎকার মেয়ে। যেমন বিদ্যে বুদ্ধি, তেমনি চরিত্রের নির্ম্মলতা সাহসও তেমনি,—ভয় কাকে বলে জানে না।

জলধি সায় দিয়ে বললে, সাহস আছে তা' মানি।

আমাদের গোপাল ওর বাসা চেনে। সন্ধ্যের পরে তাকে পাঠাবো। যদি ডাক্তারের দরকার হয় দত্ত সাহেবকে ডেকে নিয়ে যাবে।

ডাক্তার বদ্যির দরকার হবে না এককড়ি দা, বরঞ্চ গোপালকে দিয়ে বলে পাঠাবেন আর বেশি অত্যাচার না করে।

কিন্তু অত্যাচার ত সে করে না জলধি।

আপনি বড় সে-কেলে দাদা। সব তাতেই পূর্ব্বকালের দোহাই পাড়েন, পরিবর্ত্তন মানতে চান না। সে যা হোকগে, মণিমালা এখন যা সুরু করছেন সাধারণ মানুষে তাকে অত্যাচার না বলে পারে না। ওঁর বাসায় গিয়ে দেখলাম বিছানায় শুয়ে, আর সেই বন্ধুটি শিয়রে বসে দিচ্চে মাথা টিপে।

এককড়ি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধু আবার কে? একথা ত কখনো শুনিনি।

আবার সেই পূর্ব্বকালের নজির! কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ—বন্ধু কিছুদিন হলো এসেছেন। কোথায় নাকি আগে আলাপ হয়েছিল। চোখ রাঙা, গলা ভেঙেছে, জিজ্ঞেসা করলাম ঠাণ্ডা লাগালে কি করে মণি? মণি লোকটিকে দেখিয়ে বললে, কাল রমেনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম বজ-বজে। বাস্ ছেড়ে গাঁয়ের পথ ধরে দুজনে হাঁটলাম অনেক দূর। গঙ্গার ধারে একটা পুরনো বটগাছ, তার তলায় গিয়ে দুজনে বসে পড়লাম। আকাশে চাঁদ উঠলো, পাতার ফাঁকে ফাঁকে নাম্‌লো জ্যোৎস্নার আলো, সুমুখে নদীর জলে দিলে স্বপ্ন মাখিয়ে,—ভুলে গেলাম ওঠবার কথা। হঠাৎ খেয়াল যখন হলো তখন ঘড়িতে দেখি বারোটা বেজে গেছে। অত রাতে ফেরবার বাস্ পাওয়া যাবে কোথায়, কাজেই রাতটা কাটাতে হলো সেই গাছ-তলায়। জলের ধারে, খোলা যায়গায় একটু ঠাণ্ডা লাগলো বটে, কিন্তু সময় কাটলো যে কি করে দুজনের কেউ টেরই পেলাম না। কাব্যের চরম।

এককড়ি হতবুদ্ধি হয়ে বল্‌লে, বলো কি জলধি, এ কি সত্যি ঘটনা, না সে তামাসা করলে?

খামোকা তামাসার ত কোন হেতু ছিল না দাদা। সে সত্যি কথাই বলেছে।

বলতে লজ্জা পেলেনা ?

না। বরঞ্চ শুনে আমিই লজ্জা পেলাম ঢের বেশি। আসবার সময়ে বললাম, এ বয়সে এ্যাডভেঞ্চারে রস আছে মানি, কিন্তু এককড়ি দা শুনে এ্যাপ্রিসিয়েট করবেন বলে ভরসা করিনে। হয়ত বা অখুসিই হবেন। সে বললে, তাঁর অ-খুসি হবার কারণ তো নেই। আমি ছেলেমানুষ নই, এ তাঁর বোঝা উচিত।

এককড়ি আস্তে আস্তে বললে, বিলিতি গল্পের বয়ে এ-রকম ঘটনা পড়েচি, কিন্তু দেশটাকে কি ওরা বিদেশ বানিয়ে তুলতে চায় না কি ?

জলধি ক্রুর হাসি হেসে বললে, ওরা মানে মণিমালা আর তার নতুন বন্ধু। কিন্তু দেশে ওরা ছাড়াও অন্য লোক আছে তারা এ-সব পছন্দ করে না। অন্ততঃ, আমি ত না। এর পরেও যদি আমাদের মধ্যে ওকে রাখতে হয় আমাদের কল্যাণ সঙ্ঘের নামটা একটুখানি পালটে নিতে হবে।

এককড়ি নিরুত্তরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

জলধি বলতে লাগলো, এতাবৎ সঙ্ঘের বাবদে আপনার টাকা কম যায়নি। আমাদের টাকা নেই বটে, কিন্তু তবু যা গেছে তার হিসেব নেই। হিসেব করতেও চাইনে। শুধু আবেদন, এবার এই বেকার যুবকটির একটা চাকরি করে দিন।

এককড়ি তেমনি নীরবেই বসে রইলো, জলধির কথাগুলো তার কানে গেল কিনা সন্দেহ। দেয়ালের ঘড়িতে সাতটা বাজলো। গোপাল এসে খবর দিলে বাবুরা আসছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমেন বললে, আমার এক কাকা ছিলেন তাঁর দুপাটি দাঁতই বাঁধানো। খুড়ো দামী টুথ-পেষ্ট ঘষতেন, বিশ্বাস ছিল ওতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। তোমার জলধিরও বুদ্ধি দেখি তেমনি। ও জানে পাহারা জিনিসটা দরকারী, অতএব তোমাকে ঘিরে বসে পাহারা লাগিয়েছে। শুনি ওই নাকি তোমার আধা মনিব। তাই মনিব আনার দুরমুশ ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে নিতে চায় মণি-মালার নৈতিকতার বনেদে কোথাও আলগা মাটি আছে কি-না। ওকে খামোকা বজবজের গল্প করতে গেলে কেন ?

সত্যি কথা বলায় দোষটা হলো কি ?

হায়রে কপাল। সত্যি বোঝার শক্তি থাকলে বজবজের ব্যাপার শুনে ও হাসতো, বেরালের মতো মুখ ফোলাতোনা। ভাবি, তোমাকে ভালবাসতে গেছে ও কোন বুদ্ধিতে ? ইডিয়ট।

মণি হেসে ফেললে। বললে, তোমার বুদ্ধিই বা এমন-কি ধারালো। তোমার বিদ্যের বিস্তৃতি দেখে অবাক হই, শুনতে শুনতে হুঁস থাকেনা, গঙ্গার ঘাটে বারোটা বেজে যায়,—কিন্তু বুদ্ধির বেলায় সব পুরুষই সমান। তবু, জলধি বাবুর প্রশংসা করি, আমাকে সে আর যা-ই ভাবুক, অন্ততঃ রূপসী ভাবেনা, কিন্তু তুমি আরও বেহায়া, আরও বড় ইডিয়ট।

ওগো আমি যে কালী ভক্ত। বলিনে তুমি রূপসী, বলি তুমি ভীমা, ভয়ঙ্করী,—তোমার মুখের হাঁ কুমীরের মতো, গায়ের রঙ অমাবস্যা রাত্রির চেয়ে গাঢ়তর, তুমি আশ্চর্য্য! দেবতারা বোঝেন না তা নয়, কিন্তু, ভক্তের মুখে বাড়িয়ে শুনতে ভালোবাসেন। যদি আমি বাঙ্গালী না হয়ে হিন্দুস্থানী হতাম, উপাস্য দেবতা হতেন হনুমানজি, তাহলে তাঁরও পোড়া-মুখে তেল-সিঁদুরের ঘন প্রলেপ লাগিয়ে হাত জোড় ক'রে বলতাম, হে জবাকুসুমসঙ্কাশ, তুমি তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, বজ্রনখ, তোমার গায়ের রোঁয়ায় ইন্দ্রধনুর দ্যুতি, তোমার ল্যাজ গিয়ে ঠেকেছে আকাশে, তোমার মতো বীর দ্বিতীয় নেই, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করো। হনুমানজির অজ্ঞাত থাকতোনা ভক্ত খোসামোদ করচে, কিন্তু বর দিয়েও ফেলতেন। অভীষ্ট লাভ হতো।

মণি হেসে বললে, হনুমানজি তোমার গলায় ল্যাজ জড়িয়ে সাত সমুদ্দুর পারে রেখে আসতেন,—যেখান থেকে এসেছো সেইখানে।

আহা, সে-ই কি কম লাভ মণি। ফিরে যাবার ভাড়া লাগতোনা, এরোপ্লেনের চেয়েও শীগগির গিয়ে পৌঁছতাম। তাতে অন্ততঃ এই লাভ হতো ওই বর্ব্বরটাকে হিংসে করে বেড়ানোর দুর্গতি থেকে রক্ষে পেতাম।

সে দুর্গতি থেকে আমিই তোমাকে বাঁচাবো। এ বাসায় আর ঢুকতে দেবোনা।

ঢুকতে দেবেনা? কাকে? আমাকে না তাকে?

তোমাকে। আমার রঙটা কালো মানি, মুখের হাঁও একটু বড়ো, কিন্তু তাই বলে কুমীরের মতো?

না না অত বড় নয়, একটু ছোট। কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছো, অতিশয়োক্তি শুনতে যে তোমরা ভালবাস মণি। তাইত বাড়িয়ে বলি।

আর কাউকে শোনাওগে, আমার দরকার নেই।

কে বললে নেই? সবচেয়ে দরকার তোমারই। যে মেয়ের দেহের রূপ আছে, বাপের টাকা আছে তাকে বাইরে থেকে যাচাই করে নেবার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু সম্পদ যার অন্তরে লুকনো তার আমার মতো একজন অকপট ভক্ত নইলে চলেইনা। কিন্তু সে কি ও-ই জলধি? বুঝেছি ওর তোমাকে ভাল লেগেছে। কেন জানো? ও ভেবেছে ও যে তোমাকে পছন্দ করে সে ওর নিজেরই মহত্ত্ব। তোমার নিজের গুণে নয়, ওর স্বকীয় ঔদার্য্যে!

কিন্তু তুমি পছন্দ করেছো কার গুণে শুনি?

রমেন গম্ভীর হয়ে বললে, নেহাৎ মিথ্যে বলনি মণি। খুব সম্ভব তাই বটে। ওটা আমার নিজেরই বৃহত্ত্ব। নইলে তোমাকে হয়ত চিনতেই পারতামনা। কিম্বা কি জান মণি, নদীর স্রোত যেখানটায় ঘূর্ণীপাকে ঘোরে কুটো-কাটা না বুঝেও সেই দিকে ছোটে। ঘুরে ঘুরে আবর্ত্তে ডুব মারে, তার পরে কোথায় যায় কে জানে। ছিলাম ইউরোপে, ছেলেবেলার সেইটুকু পরিচয়, কতকাল পরে কি ভেবে হঠাৎ চিঠি লিখে খোঁজ নিলে, মন অমনি চঞ্চল হয়ে উঠল। চাকরি ছেড়ে দিলাম, যা-কিছু সম্বল ছিল বিক্রী করে ভাড়া যোগাড় করে তোমার কাছে ছুটে এসে উপস্থিত হলাম। এর কি নিগূঢ় অর্থ নেই ভাবো? ঘূর্ণাবর্ত্তের

উপমাটা একটু চিন্তা করে দেখো। আর, রূপের কথা যদি তোল একটু চেয়ে দেখলেই টের পাবে তুমি আমার পায়ের কড়ে আঙ্গুলেও লাগনা। ইউরোপের গল্প নিজের মুখে আর করতে চাইনে কিন্তু তোমাদের এই খাঁদা-বোঁচা বেঁটের দেশেও কত রূপসী মেয়ের মাথা ঘুরে যায় এমন চেহারা কি আমার নয়? সত্যি বলো?

মণি হেসে ফেলে বললে, কি বিনয়! প্রভুপাদ গোস্বামীরা পর্য্যন্ত হার মানে। আচ্ছা রমেন, তোমার প্রণয়-নিবেদনের ভাষাটা কি তুমি মুখস্ত করে রেখেছো? রোজই ঠিক একই রকম বলো কি করে? কোথাও একটা কমা সেমিকোলন পর্য্যন্ত বাদ পড়েনা, হুবহু একই কথা প্রত্যহ বলতে তোমার লজ্জা করে না?

নিশ্চয় করে।

তবে বল কেন?

বলার হেতু আছে মণি। দেবতাদের প্রসন্ন করার দুটো ধারা আছে। এক স্তব, আর এক মন্ত্র। স্তব মনের আবেগে যথা-ইচ্ছা বানানো যায়, তার একদিনের বাক্য আর একদিনের সঙ্গে মেলার দরকার নেই। শুনে দেবতা খুসি হয়ে বর দিতেও পারেন, না-ও পারেন। তাঁর অনুগ্রহ, ভক্তের জোর নেই। কিন্তু মন্ত্র তা নয়, ইচ্ছা মতো বানানো যায়না, মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হয়। উচ্চারণ নির্ভুল হলে দেবতার না বলার জো নেই, চুলের ঝুঁটি ধরে বর আদায় হয়। একেই বলে সিদ্ধমন্ত্র। সাহেবরা বলে ম্যাজিক। বুনোদের মধ্যে এই মন্ত্রে যারা সিদ্ধিলাভ করেছে সমাজের ভিতর তাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপের অবধি নেই—লোকে থর থর করে কাঁপে।

মণি বললে, বুনোদের মন্ত্র তুমিও জাননা আমিও না। নিশ্চয় তার গভীর অর্থ আছে, কিন্তু তুমি যা আমার কাছে আবৃত্তি করো তার বারো আনার মানে হয় না।

রমেন বললে, শুনে আহ্লাদে তোমার পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। আশা হচ্চে হাতড়ে হাতড়ে এতদিনে ঠিক জিনিসটিতে হাত লেগেচে। মণি ও বস্তু যত অর্থহীন হয় ততই হয় খাঁটি। একদম অবোধ্য হলে তার আর মার নেই—সেই হল একেবারে সিদ্ধমন্ত্র। তখন দেবতার গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে অভীষ্ট আদায় করা যায়।

মণি গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেললে। বললে, বুনোদের অনেক দেবতা, তাদের মন্ত্র-সিদ্ধ ওস্তাদদের ভাবনা নেই—যাকে হোক একটা ধরতে পারলেই হলো, কিন্তু তুমি কোন্ দেবতার ঝুঁটি ধরে বর আদায় করবে শুনি?

এখন শুনে কি হবে? শুধু এইটুকু জেনে রাখো ঝুঁটি খুললে তার চুল পা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, সেইটি বাগিয়ে যখন ধরবো তখন দেবতা আপনিই টের পাবেন। কথাটি কবেননা শুড় শুড় করে পিছনে পিছনে আসবেন। শুধু বাঙলা মুলুক নয়, হয়ত ইউরোপ পর্য্যন্ত!

তোমার ভারি আস্পর্দ্ধা রমেন।

আস্পর্দ্ধাই ত। নইলে সব ছেড়ে এতদূরে আসতাম কোন সাহসে?

তোমার ভুল। তুমি জানো দেশের কাজে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি।

দিলেই বা গো। মন্ত্রের জোর যে তারও উপরে। দেশ-টেশ কোথায় ভেসে যায়।

মণি রাগ করে বললে, দেখো মন্ত্র মন্ত্র করে চালাকি করোনা। আমার কুমীরের মতো হাঁ, অমাবস্যার মতো রঙ,—আমার আশা তুমি ছাড়ো। সত্যি ভালবাসলে কেউ অমন বলেনা। তা আবার প্রিয়ার মুখের উপর। তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি যেখান থেকে এসেছ সেইখানেই ফিরে যাও।

ফেরবার জো নেই মণি, ভাড়ার টাকা পাবো কোথায়?

আমি যোগাড় করে দেব।

তাহলে সে-ই ভালো। দুজনের ভাড়া যোগাড় করো।

দুজনের নয় একজনের। কিম্বা আর একটা কাজ করনা রমেন? নানাদেশের নানা ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করার যে লম্বা ফর্দ তোমার নামের পিছনে আছে তাতে বিদেশে ফিরে যাবার দরকার কি? চেষ্টা করলে এখানেই যে একটা বড় চাকরি পাবে। অনেক সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ আছে, কেউ তাদের সম্বন্ধে এতটুকু কলঙ্কের আভাস পর্য্যন্ত দিতে পারেনা তারা এমনি মেয়ে। চিরদিন সাধ্বী পতিব্রতা হয়ে তোমার ঘর আলো করবে আমি লিখে দেবো। এমনকি জামিন পর্য্যন্ত হবো। কথা দিচ্চি তুমি সত্যিই সুখী হবে রমেন। শুধু একটি প্রার্থনা যখন-তখন এসে এক কথা নিয়ে আমাকে আর জ্বালাতন কোরোনা। বলতে বলতে তার চোখ মুখের ভাব গম্ভীর হয়ে এলো, বললে, তাছাড়া নিজেকেও ত চিনি। আমার মতো একটা দজ্জাল দুর্দ্দান্ত কুশ্রী মেয়ে নিয়ে তোমার হবে কি? আমি কি কোন অংশেই তোমার যোগ্য?

রমেন উত্তর দিলে, কোনদিন কি বলেছি তুমি আমার যোগ্য? নিজেকে কি আমিই চিনিনে? তোমার ঐ ভালো-ভালো সতীলক্ষ্মী বান্ধবীদের যথাকালে যথাযোগ্য পাত্রে অর্পণ কোরো আমি তিলার্দ্ধ আপত্তি করবোনা, কিন্তু জাত-সাপুড়ের কল্যাণ কামনায় যদি উপদেশ করো তাকে গোখরো কেউটে ছেড়ে হেলে আর ঢোঁড়া সাপ নিয়ে খেলাতে, তবে বরঞ্চ পেশা ছেড়ে দেব কিন্তু আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করবোনা। মরণ আছে জেনেও।

আমি বুঝি গোখরো কেউটে আর তুমি জাত সাপুড়ে?

আমি নয়ত কি ঐ জলধিটা? যে কেবল তোমার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করচে আর নানাছলে পাহারা দিয়ে ফিরচে—সে?

তাই সে ফিরুক, কিন্তু তুমি আর আমাকে জ্বালাতন করতে পাবেনা তোমাকে বলে দিলাম।

ওগো মণি, কাঁদবে তুমি কাঁদবে। এখন মস্ত বাহাদুরি হচ্ছে, কিন্তু একদিন বুঝবে জ্বালাতন করবার যার কেউ নেই তার চেয়ে দুর্ভাগা মেয়েও আর জগতে নেই।

তোমার চিন্তা নেই রমেন, সম্প্রতি জলধি বাবু আছেন তিনি একাই যথেষ্ট। যখন তিনিও থাকবেন না তোমাকে চিঠি লিখে জানাব।

তাই জানিও। কিন্তু আমার যে বিশ্বাস হতে চায়না, তুমি সত্যিই আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাও।

এতক্ষণে তার পরিহাসের হাল্‌কা কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো, দেখে মণির মুখের পরেও একটা ব্যথার ছায়া পড়লো। হয়ত ভাবলে কি জবাব দেবে, কিন্তু দেবার পূর্ব্বেই নীচে সদর রাস্তায় একটা মোটর এসে দাঁড়ালো এবং পরক্ষণেই এককড়ির গলা শোনা গেল—মণি মণি, তুমি কোন ঘরটায় থাকো?

কে-একজন বলে দিলে তে-তালায় উঠে বাঁদিকের ফ্ল্যাটটা।

মণি ব্যস্ত হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সাড়া দিলে—আসুন এককড়িদা, এই আমার ঘর।

মিনিট খানেক পরে এককড়ি এসে ঢুকলো, যে-চাকরটা চিনিয়ে দিতে তাঁর সঙ্গে এসেছিল সে বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে রইল।

এককড়ি আসন গ্রহণ করে চারিদিকটা একবার চেয়ে নিয়ে বললে, বাঃ—দিব্যি সাজানো-গোছানো ঘরটি ত।

মণি শুধু একটু হাসলে। কিন্তু পিছনের থেকে রমেন এ কথার জবাব দিয়ে বললে, তার কারণ আছে এককড়ি দা। এ হলো লক্ষ্মীর বাসস্থল, গাছতলা হলেও এর পারিপাট্যটুকু আপনার চখে পড়তই। আপনার বাড়ী কখনো দেখিনি, কিন্তু জোর করে বলতে পারি সে-ও এত সুন্দর নয়। আপনি ভাবচেন না দেখেই লোকটা বলে কি করে? বলি এই জন্যে যে জানি বৌ-ঠাকরুণ স্বর্গীয় হয়েছেন, বেঁচে থাকলে এমন কথা মুখে আনতেও পারতামনা।

কথাগুলো এককড়ির ভালই লাগলো, তথাপি এই অপরিচিত যুবকের গায়ে-পড়া আলাপ ও আত্মীয় সম্বোধনে সে বিরক্ত মুখে ফিরে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে আপনি?

আমি রমেন দাদা। মণির ছেলেবেলোর বন্ধু। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না। কেবল বয়সে নয়, সকল দিকেই আপনার ঢের ছোট। আমাকে 'তুমি' বলতে হবে।

যাকে চিনিনে, কোনদিন আলাপ পরিচয় নেই, তাকে কি হঠাৎ 'তুমি' বলা সাজে?

সাজে দাদা, সাজে। কিন্তু হঠাৎ ত নয়। আপনি চেনেননা বটে, কিন্তু মণির মুখ থেকে আপনাকে যে আমি খুব চিনি। সন্দেহ হচ্চে জলধিবাবু আমার প্রতি মন আপনার বিষিয়ে না দিলে তুমি বলতে আপনি একটুও দ্বিধা করতেননা। তিনি ঠিক কি-কি বলেছেন জানিনে কিন্তু মণিকে আড়ালে জিজ্ঞেসা করলে টের পাবেন আমি দুর্জন, দুর্বৃত্ত মোটেই নয়। নিরীহ মানুষ বিদেশে ছেলে পড়িয়ে খেতাম, বহুদিন পরে অকস্মাৎ মণির একটা পত্র পেয়ে মন কেমন করে উঠলো, কোন মতে ভাড়াটা যোগাড় করে চলে এলাম। মোটামুটি এই আমার পরিচয়, এর মধ্যে মিথ্যে একটুও নেই।

কথাগুলি বলার এমন একটি সরল আবেদন যে, যে-ক্রোধ মনের মধ্যে নিয়ে এককড়ি এখানে এসেছিল তার অনেকখানিই শান্ত হয়ে গেল। ইচ্ছে হলো এই প্রসঙ্গে সদয়-কণ্ঠে একটু আলাপ করে, কিন্তু তাও পারলেনা, জলধির অভিযোগ বাধা দিলে। তাই বলি-বলি করেও শেষে চুপ করেই বসে রইল।

মণি প্রশ্ন করলে, আজকের অধিবেশনের কি হলো এককড়ি দা?

অধিবেশন হয়নি। স্থগিত রইল।

কেন? আমি না যাবার জন্যে নয় ত?

কতকটা তাই বটে। আজ কি তুমি খুব অসুস্থ ?

না, ঠাণ্ডা লেগে সামান্য একটু জ্বরের মতো হয়েছে, অনায়াসে যেতে পারতাম জলধিবাবু বারণ না করলে। বললেন, আটকাবেনা, আজকের দিনটা তিনি বেশ চালিয়ে নিতে পারবেন। তাই যাইনি এককড়িদা।

শুনে এককড়ি ভারি বিস্মিত হলো, জিজ্ঞাসা করলে, জলধি কি তোমাকে যেতে বারণ করেছিল ?

হাঁ, বারণই ত করলেন। একটু থেমে মণি বললে, অথচ এমন দিন গেছে যখন সত্যিই বড় অসুস্থ হয়ে ছুটি চেয়েও পাইনি।

আমাকে জানাওনি কেন ?

মণি চুপ করে রইল, কিন্তু তার হয়ে জবাব দিলে রমেন। বললে, একটা কারণ বোধ করি এই যে, উপরি-ওয়ালার বিরুদ্ধে নালিশ করা ওঁর স্বভাব নয়।

ওঁর স্বভাবের খবর আপনি জানলেন কি করে ?

আবার 'আপনি' দাদা। বরঞ্চ আর কোথাও উঠে যাবো তবু বসে বসে আপনার মুখ থেকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' শুনতে পারবনা।

এককড়ি হেসে বললে, বেশ 'তুমি'ই সই। বলোত রমেন, ওর স্বভাবের পরিচয় তুমি পেলে কি করে ? শুনচি থাকতে ইউরোপে, বহুদিন কেউ কারও খবর রাখোনি—এইত সেদিন মাত্র দেশে ফিরেছো।

সবই সত্যি দাদা। তবু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি সহসা কেন যে মণি আমার সম্বাদ নিতে গেল, আর আমিই বা কেন তেমনি হঠাৎ সব-কিছু পিছনে ফেলে চলে এলাম। কিন্তু সে কথা থাক, আপনার প্রশ্নের জবাব দিই। ছেলেবেলায় ওর আমি মাষ্টার ছিলাম। ম্যাটিক ক্লাসে পড়ি, মণি পড়ে আমার দু ক্লাস নীচে। যে ভদ্রলোকটি আমার ইস্কুলের মাইনে বইয়ের দাম যোগাতেন হঠাৎ একদিন তিনি মারা গেলেন। মণির বাপ আমাকে ডেকে বললেন, সে জন্যে ভাবনা নেই রমেন, তুমি আমার মেয়েটিকে ঘণ্টা খানেক করে পড়িয়ে যেয়ো। দুশ্চিন্তা ঘুচলো কিন্তু দিন দুই তিন পড়ানোর পরেই বুঝলাম ওকে আমি পড়াবো বটে, কিন্তু আমাকেও ও পড়াতে পারে। কামাই করতে সুরু করলাম, যদি বা যাই গল্প করে কাটাই, তবু দেখা গেল পরীক্ষায় মণি প্রথম হয়েছে। মণির বাপের ছিল দেশোদ্ধারের ব্যাধি, বাড়ীর কোন খবরই রাখতেননা, অত্যন্ত খুসি হয়ে আমাকে ডেকে পিঠ ঠুকে দিলেন, বললেন, আমার মতো কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক আর নেই এবং আমার কলেজের অর্দ্ধেক খরচ তিনিই দেবেন। আমার কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিবরণ বাপের কাছে মণি কোনদিন বলেনি। এমন কি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ও যখন জলপাণি পেলে তারও অর্দ্ধেক কৃতিত্ব আমার ভাগেই জুটলো। জানিনে কি কারণে বাপের বিশ্বাস ছিল মেয়ের লেখাপড়ার বনেদ আমিই পাকা করে দিয়ে গেছি।

তারপরে ?

কার পরে দাদা ?

ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাবার পরে মণি কি করলে ?

মণি একটা আঙুল তুলে নিঃশব্দে তর্জ্জন করে শেষে মাথা নেড়ে বললে, ও হবেনা রমেন। নিজের সম্বন্ধে বলতে চাও বলো, কিন্তু আমার সম্বন্ধে না।

কিন্তু উনি যে মনিব। জানতে চাইলে কি না বলা সাজে ?

মনিব আমার, তোমার নয়। আমার কাছে যখন জানতে চাইবেন আমি তার উত্তর দেব।

এককড়ি প্রশ্ন করলে, বেশ তুমিই বলো। তোমার কাছেই জানতে চাইচি কি করলে তারপরে ? কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হলে ?

এ কৌতূহলে লাভ কি এককড়িদা। আপনার কাজ ত চালিয়ে দিচ্চি।

সে অস্বীকার করিনে মণি, বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি আমাদের সঙ্ঘের কাজ অনেক বড় করেই এতদিন চালিয়ে এসেছ। কিন্তু আমাদের সেই সঙ্ঘের প্রয়োজন যদি তোমাতে শেষ হয়ে থাকে আর কোন একটা উপায় করে ত দিতে পারি। কিছু একটা তোমার ত করা চাই।

জীবিকার জন্যে বলছেন ?

ধরো তাই।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলো। শেষে মণি জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি আপনি আর চাননা !

জলধি চায় না। সে বলে তুমি থাকলে কল্যাণ-সঙ্ঘের নাম পালটে দিতে হবে।

বুঝেছি। কিন্তু আপনি নিজে কি বলেন ?

এখনও বলিনি কিছুই। জানি, জলধির অনেক দোষ, তবু জানি স্বদেশ-সেবার জমা-খরচের খাতায় তার খরচ বাদেও বাকি যেটা আছে সেও অনেক। তার মতো স্বার্থত্যাগ করেছে ক'জন ? কত লোকে তার মতো দুঃখ ভোগ করেছে ? তাকে বাদ দিলে সঙ্ঘ আমার টিকবেনা।

তাঁকে বাদ না দিয়েও সঙ্ঘ আপনার টিকবেনা এককড়ি দা।

এককড়ি মুখ ফিরে রমেনের প্রতি খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, তুমি কি করে জানলে রমেন ?

জানিনে, শুধু আমার অনুমান। জলধি বাবু যাই হোন কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা আপনি। কিন্তু একটা কথা বলি এককড়িদা, পারা-আঁচড়ানো আর্শিতে মুখ দেখে যে মুখের বিচার করে সে সুবিচার করেনা। ভাবে, মুখের ঐ ক্ষতচিহ্ন গুলোই সত্যি। আপনারও হয়েছে সেই দশা। সঙ্ঘের অশুভ কামনা করিনে, কিন্তু উদ্দেশ্য যত মহৎ হোক, মনে হচ্ছে এ টিকবেনা। কিন্তু মণি, তুমি বিষণ্ণ হয়ে উঠলে কেন, এতো তোমাকে মানাচ্চেনা।

মণি একটুখানি ম্লান হেসে বললে, আমার প্ল্যানটা যে ফেঁসে গেল।

এককড়ি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিসের প্ল্যান মণি ?

মণি একবার দ্বিধা করলে, হয়ত ভাবলে বলা উচিত কিনা, কিন্তু এককড়ি তেমনি আগ্রহে চেয়ে আছে দেখে আস্তে আস্তে বললে, একটু পূর্ব্বেই ভাবছিলাম আপনার কাছে হাজার খানেক টাকা ধার চেয়ে নেবো।

শুনে এককড়ি ক্ষণমাত্রও দ্বিধা না করে বললে, বেশ ত, তাই নিও।

রমেন জিজ্ঞাসা করলে, চাকরি ত গেল শোধ দেবে কি করে ?

এককড়ি বললে, সে ও-ই জানে। আমি জানি ও যেখানেই থাক, বেঁচে থাকলে শোধ দেবেই। আর মরে যদি যায় সে এতবড় ক্ষতি যে হাজার টাকার শোক আমার মনেও পড়বেনা। টাকাটা তোমাকে আমি কালই পাঠিয়ে দেব।

রমেন বললে, কিসের প্রয়োজন তা-ও জিজ্ঞেসা করবেননা ?

না। আমি জানি ও অপব্যয় করে না। কিন্তু এখন উঠি। সঙ্ঘের তরফ থেকে তোমাকে সাধুবাদ দেওয়া চলেনা কিন্তু আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ রইল। যদি কখনও তোমার উপকারে আসতে পারি আন্তরিক খুসী হব। এই বলে এককড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, রমেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় শুধু ঘণ্টা খানেকের, আর কখনও আলাপ করবার সুযোগ হবে কিনা জানিনে, কিন্তু এ-টুকু জেনে গেলাম যে আমার সম্বন্ধে ধারণা তোমার খুব খারাপ হয়েই রইল।

রমেন হেসে বললে, তাতে আপনার ক্ষতি হবেনা দাদা। কিন্তু এ কথটা বলাই ভালো যে রুগী যখন মরে তখন আড়ালে ডাক্তারের বাপান্ত করা ছাড়া গৃহস্থের আর কোন সান্ত্বনাই থাকে না।

এককড়িও হাসলে এবং উভয়কেই নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। মণিমালাকে আজ সে প্রথম নমস্কার করলে। আর কোন দিন করেনি।

মিনিট পাঁচ ছয় ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে রইল।

মণি বললে, কি রমেন, এবার বাপান্ত সুরু করবে নাকি ?

রমেন বললে, সে নেপথ্যে। তবে প্রত্যক্ষে বলার আজ এইটে পেলাম যে এতকাল রমেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল তাঁর চেয়ে মহাশয় ব্যক্তি ভূভারতে নেই। এতদিনে সেই অহঙ্কারটা চূর্ণ হলো।

হলো ত ?

হ্যাঁ। আর একটা কথা বলব ? ভয়ে না নির্ভয়ে ?

নির্ভয়েই বলো।

দাদার একটু বয়স হয়েছে,—বেশ মানাবেনা—কিন্তু সংসারে মণিমালার বর যদি কেউ থাকেত এই ব্যক্তি।

মণি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, আহা রমেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

পড়তেও পারে গো বন্ধু, পড়তেও পারে। কিন্তু আর না উঠি। রাস্তায় একলা ঘুরে ফিরে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে নিইগে। নইলে সারারাত ঘুম হবে না। এই বলে সে ধীরে ধীরে উঠে পড়লো। দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে ফিরে চেয়ে বললে, তোমার সতী-লক্ষ্মী বিদুষী বান্ধবীদের একবার দেখাতে পারোনা মণি ?

পারি, কিন্তু কি হবে।

একটু বাজিয়ে দেখবো।

সর্ব্বনাশ! তুমি তাদের বিদ্যের পরীক্ষা নেবে নাকি!

ওগো না না। তোমাদের ও-দিকটা আমার জানা আছে, তুমি নিঃশঙ্ক হও। দীর্ঘদিন দেশ ছাড়া, ইতিমধ্যে দেশের মেয়েদের বহু পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ বহু উন্নতি ঘটেছে এমনি একটা জনশ্রুতি বিদেশ থেকেই কানে পৌঁচেছে। সানে আছড়ালে তাঁরা কি রকম আওয়াজ দেন, অর্থাৎ খাদটা কি পরিমাণে মিশেছে দেখতে একটু সাধ হয় মণি।

তাঁরা তোমাকেও ত আছড়াতে পারেন?

তা-ও পারেন। বিচিত্র নয়। এই বলে রমেন হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩০

পরদিন সকালে চা পানান্তে প্রমথ বললে, 'উষা, চল বা'র হ'য়ে কতকগুলো দরকারি জিনিষ কিনে নিয়ে আসি।"

দুই হাত যুক্ত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "রক্ষে কর, আর দরকারী জিনিষ কিনে কাজ নেই। লক্ষ্ণৌ যাবার জন্যে যে সব জিনিষপত্র সত্যিই দরকারি, তা তিন দিন হ'ল কেনা হয়ে গেছে। তারপর যে রাশখানেক জিনিষ কিনেছ সবই অদরকারি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "একটিও না। 'বিনা প্রয়োজনে কেনো যাহাকে, প্রয়োজন কালে কাছে সে থাকে'—রবীন্দ্রনাথের পদে ভরা এই সারগর্ভ উপদেশটি সর্ব্বদা মনে রেখো। তুমি ছেলেমানুষ,—দশ বছরের প'ড়ে-থাকা অদরকারি জিনিষ হঠাৎ একদিন কি ভীষণ দরকারি হয়ে ওঠে,—সে রহস্য কিছুমাত্র জাননা।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হাসতে লাগল; বললে, "তাই ব'লে বেলা চারটে পর্য্যন্ত না খেয়ে শরীর নষ্ট ক'রে রাজ্যের অদরকারি জিনিষ কিনতে হবে?"

এ কথায় প্রমথর মনোযোগ হঠাৎ বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হ'ল; বললে, "কিন্তু আমি ত' চুনীলাল মোতিলালের দোকান থেকে তোমাকে খেয়ে নেবার জন্যে একটার সময়ে ফোন ক'রেছিলাম উষা। তুমি খেলেনা কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি একটার সময়ে খেলে তোমার চারটে পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকার অত্যাচার কাটে কি রকম ক'রে সে কথাটা বল?"

প্রমথ হাসতে হাসতে বললে, "না, কোনো রকমেই কাটে না। যুক্তি অকাট্য,—হার স্বীকার করছি।"

এমন সময়ে দেখা গেল অদূরে ধীর পদক্ষেপে সাধুচরণ অগ্রসর হচ্ছে। মনের মধ্যে যে একটা-কিছু বিশেষ মতলব প্রবল হয়েছে, তা তার গতিভঙ্গী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। প্রমথ সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আন্দাজ করতে পারছ কিছু উষা?"

সন্ধ্যা বললে, "কতকটা পারছি বই কি।"

"কি?"

"এসে ত' পড়েছে। ওর মুখেই শোননা।"

সাধুচরণ নিকটে এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালে, তারপর একটু ইতস্তত সহকারে বললে, "কিছু নিবেদন আছে বাবা।"

সাধুচরণের দিকে মুখ তুলে প্রমথ বললে, "কি নিবেদন সাধু?"

নিঃশব্দ হাস্যে সাধুচরণের মুখমণ্ডল ভ'রে গেল; বললে, "এবার আমি মার সঙ্গে লখ্‌নৌ যাব।"

"কেন? কি দরকার?"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে সাধুচরণ বললে, "মাকে একটু দেখা শোনা দরকার। মার শরীরে একটুও যত্ন নেই।"

প্রমথ বললে, "সে ত' ভাল কথা; কিন্তু আমার শরীরে এমন কি যত্ন দেখেছিলি সাধু, যাতে এতদিনের মধ্যে একবারও আমার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাবার কথা মনে হয়নি?"

প্রমথর কথায় সাধুচরণ অপ্রতিভ হল; একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "আজ্ঞে, তুমি হলে বেটাছেলে—"

সাধুচরণকে কথা শেষ করতে না' দিয়ে প্রমথ বললে, "আর মা হলেন মেয়েমানুষ। এই ত? এ কথা আমার কতকটা জানা আছে সাধু। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুই লক্ষ্ণৌ গেলে এখানকার বাড়ীর হেপাজতে থাকবে কে?"

প্রমথর মন্তব্যে সাধুচরণের মনে ক্রোধ সঞ্চারিত হ'ল; ঈষৎ উষ্মার সহিত বললে, "শোন কথা! সারাটা জীবন আমি তোমার বাড়ীর হেপাজতে থাকব নাকি? এখন থেকে আমি মার সাথে সাথে থাকব।"

কপট বিদ্রূপের সুরে প্রমথ বললে, "কেন? এখন থেকে তুমি মার খাস চাকর হ'লে নাকি?"

ঊর্দ্ধে দৃষ্টি প্রসারিত করে ঔদাস্যের সুরে সাধুচরণ বললে, "তা তুমি যাই বল বাবা!"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "তুমি কি বল উষা? সাধু আমাদের সঙ্গে যাবে না কি?"

স্মিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "ইচ্ছে যখন হয়েছে চলুক। রামভজন সিংকে বাড়ীর চার্জ্জে থাকবার জন্যে ও রাজি করিয়েছে। এখন না গিয়ে সে পূজোর পর বাড়ী যাবে।"

সাধুচরণের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রমথ বললে, "গয়লা হলে কি হয়, পেটে পেটে কম বুদ্ধি নয় ত! সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে তারপরে আমার কাছে এসেছ অনুমতি নেবার জন্যে?"

সাধুচরণের মুখমণ্ডলে পুনরায় নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠ্‌ল, বললে, "তা বাবা, তুমি হলে মনিব, তোমাকে একবার না বলা ভাল দেখায় কি?"

কষ্টে হাস্য রোধ করে কপট বিদ্রূপের সুরে প্রমথ বললে, "উঃ! কর্ত্তব্যজ্ঞান একেবারে টন্‌টন্‌ করছে! আমি হলাম মনিব, আর মা তোমার মনিব নয়?—তিনি তোমার গুরুঠাকরুণ,—না?"

প্রমথর কথা শুনে সাধুচরণ হেসে ফেল্‌লে। বললে, "এক হিসেবে মিথ্যে বলনি বাবা! এই বয়সে এটুকু মেয়ের কাছে কম শিক্ষে হ'ল না!" বলে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান করলে।

প্রমথ বললে, "আশ্চর্য্য! অথচ এই লোকটি প্রথমে দিন পাঁচেক ঘৃণায় বিদ্বেষে তোমার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেনি। মানুষ বশীকরণের এমন অদ্ভুত যন্ত্র বিধাতাপুরুষ তোমার দেহের কোন জায়গায় বসিয়েছেন বলতে পার উষা, যাতে ক'রে কোন লোকই তোমার কাছে রক্ষে পায় না?"

সন্ধ্যা বললে, "কোথায় বসিয়েছেন তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু বসিয়ে যদি থাকেন ত' একেবারে অকেজো যন্ত্র বসিয়েছেন, তা বল্‌তে পারি।"

সবিস্ময়ে প্রথম বললে, "অকেজো কেন?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "যন্ত্রটি আমার শ্বশুরবাড়ীতে কি চমৎকার পরিচয় দিয়েছিল সে কথা ত আমার মুখে শুনেছ। যার কাছে যাই সেই করে দূর দূর!"

প্রমথ বললে, "তার দ্বারা যন্ত্রটি এই প্রমাণ করেছিল যে তারা মানুষ নয়, অমানুষ। আমি মানুষ-বশীকরণের যন্ত্রের কথাই বলছিলাম উষা, অমানুষ-বশীকরণের কথা বলিনি। তারপর কিছুদিন পরে একজন সত্যিকার মানুষ যখন সেই যন্ত্রটির সম্মুখে প'ড়ে গেল তার কি অবস্থা হল ভেবে দেখ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্তটা বেমালুম হজম হয়ে গেল, কিছুই বাকি রইল না। সাধে কি তোমাকে মাঝে মাঝে রাক্ষুসী বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "ইচ্ছে যদি হয় ত' ডাকনা কেন?"

প্রমথ বললে, "কেন ডাকিনে জান? অমন আদরের ডাকটি হঠাৎ খরচ করে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে না। ডাক্‌তে গিয়ে ভাবি আজ থাক্ আর একদিন ডাকব।"

শুনে সন্ধ্যার মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল; মনে মনে বললে, "ভারি ত' বাকি রইল ডাকতে! এর চেয়ে মুখ ফুটে ডাকা অনেক সহজ ছিল।"

"উষা?"

"কি বল?"

"একটা কথা বলি, যদি কিছু মনে না কর।"

"কি কথা?"

"ডক্টরেট লাভ করে প্রিয়লাল দেশে ফিরে এসেছে, আর তোমার শ্বশুর জহরলাল চৌধুরী মারা গেছেন, এ সংবাদ তোমার জানা আছে?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, তুমি ত খবরের কাগজে এ দুটো খবরই আমাকে দেখিয়েছিলে।"

একটু ইতস্তত ক'রে প্রমথ বললে, "যদি অনুমতি দাও ত লক্ষ্ণৌ যাওয়া উপস্থিত বন্ধ রেখে দু-চার দিন একটু দৌত্য করি।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা বললে, "দৌত্য? কার কাছে দৌত্য?"

"প্রিয়লালের কাছে।"

"কিসের জন্যে ?"

প্রমথ বললে, "অবশ্য তোমাদের দুজনের পুনর্মিলনের জন্যে।"

সন্ধ্যা বললে, "ও!" তারপর একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "এ কথা কি তুমি আমার মন পরীক্ষা করবার জন্যে বলছ ?"

প্রমথ বললে, "না, তা কেন ?"

"তবে কি তোমার দায়িত্ব কাটাবার জন্যে বলছ ?"

"না, তাই বা কেন ভাবছ ?"

"তবে পরিহাস করছ ?"

প্রমথ মাথা নেড়ে বললে, "না, না, পরিহাসও করছিনে।"

"পরিহাসও নয় ?—তবে আজই আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এখন ত' আমাকে খুব বড়লোক ক'রে দিয়েছ। এখন বোধ হয় সেখানে স্থান পাওয়া খুব কঠিন হবেনা।"

সবিস্ময়ে প্রমথ বললে, "হঠাৎ বাপের বাড়ি যাওয়ার কি দরকার পড়ল ?"

সন্ধ্যা বললে, "একজন অনাত্মীয় পুরুষের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা ক'রে কোনো ফল আছে কি ? এখান থেকে তারা আমাকে তাদের ঘরে নিতে চাইবে কেন ?"

একমুহূর্ত সন্ধ্যার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রমথ বললে, "তুমি আমার উপর রাগ করছ উষা।"

সন্ধ্যা বললে, "রাগ আমি করছিনে, কারণ আমি জানি যে-কথা তুমি বলছ তোমার নিজের কাছেও সে কথার কোনো-মানে নেই। কিন্তু রাগ আমি করলে এমন-কিছু অন্যায় করা হ'ত কি ? আমি তোমাকে ভদ্রলোক বলেছিলাম ব'লে কাল তুমি আমাকে মারতে উঠেছিলে, অথচ আজ তোমার মুখ দিয়ে এসব কথা অনায়াসে বেরুচ্ছে।"

ঈষৎ ব্যথিতস্বরে প্রমথ বললে, "তোমার মনে কষ্ট দিয়ে অন্যায় করেছি উষা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হেসে ফেললে; বললে, "ক্ষমা তা হ'লেই করব বাজে কথায় যদি আর সময় নষ্ট না ক'রে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নেবার বিষয়ে মন দাও। আজ ও-বেলা আশ্রম থেকে ফিরতে রাত হ'য়ে যাবে, কাল সকালে খাওয়া-দাওয়া রাঁধা-ছাঁদা করতেই সময় পাওয়া যাবে না, আজ এখন সমস্ত একেবারে ঠিক ক'রে গুছিয়ে না ফেললে অসুবিধেয় পড়তে হবে।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু গোছাবার এমনই বা কি আছে উষা ? জিনিসপত্রগুলো তাড়াতাড়ি প্যাক ক'রে নিলেই ত হ'ল।"

সন্ধ্যা বললে, "সেইখানেই ত গোলযোগ। প্রত্যেকটি জিনিষ বিবেচনা ক'রে তবে প্যাক্ করতে হবে। লক্ষ্ণৌ আর কলকাতা দুই সংসারের জিনিষপত্র আমি এমন স্বতন্ত্র ক'রে ফেলতে চাই যে ভবিষ্যতে যাতায়াতের সময় শুধু পথের মতো সামান্য জিনিস সঙ্গে নিলেই চলবে।"

প্রমথ বললে, "সেই ভাবে গুছিয়ে নেবার জন্যে এবার-কার কেনা সমস্ত জিনিস লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া দরকার।"

সন্ধ্যা বললে, "মোটেই নয়। লক্ষ্ণৌ-এ বোধ হয় খান পনের ষোল তোয়ালে আছে, তারপর পছন্দ হ'ল ব'লে পরশু একেবার দু ডজন তোয়ালে কিনে ফেললে। আচ্ছা, দুজন লোকের অতগুলো তোয়ালে কি হবে বল দেখি ?"

"সময়ে কাজে লাগবে।"

"সে কাজে কলকাতায় লাগবে। ওর আমি একটিও লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাব না।"

"আচ্ছা, সে তুমি যেমন ভাল বোঝ কোরো,—কিন্তু বাজারে একবার কখন বেরুচ্ছ ?"

"লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসে তারপর।"

"তার আগে আর নয় ?"

হেসে ফেলে সন্ধ্যা বললে, "না।"

একটু চুপ করে থেকে ক্ষুণ্ণমনে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, তথাস্তু!"

৩১

কলিকাতা হ'তে মাইল আষ্টেক দূরে সুদূরগামী কোনও রাজপথের উপরে ভারতী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আলয়। দুই শতাধিক বিঘা পরিচ্ছন্ন সমতল ভূমির উপর আশ্রম অবস্থিত। চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ প্রধান সৌধ, এবং সুরকি ঢালা পথের পাশে পাশে দূরে দূরে কাঁচা পাকা

ছোট বড় কয়েকটি গৃহ। তোরণ অতিক্রম করে আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই দক্ষিণে বামে দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী, একটিতে শ্বেত এবং অপরটিতে রক্ত পদ্মের লতা। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি,—আশ্রমের প্রবেশ পথ হ'তে তার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

একজন আশ্রম-সদস্যের সমভিব্যাহারে প্রমথ ও সন্ধ্যা যখন তোরণ-সম্মুখে উপনীত হ'ল তখন ছয়টা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকী। বরণ্যে অতিথিযুগলের সাদর অভ্যর্থনার জন্য স্বামী অচলানন্দ এগিয়ে এসে তোরণ-পথে অপেক্ষা করছিলেন। তোরণের শীর্ষ দেশে পুষ্প-স্তবকে রচিত "স্বাগত"; তোরণের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ এবং কদলী বৃক্ষের পাশে নারিকেল ফল-সমন্বিত পূর্ণ কলস।

অচলানন্দকে দেখতে পেয়ে পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী মোটর থেকে তাড়াতাড়ি নেবে পড়লেন। অচলানন্দ সহাস্যমুখে সন্ধ্যা এবং প্রমথকে যুক্ত করে নমস্কার করে স্নিগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে ক্ষুদ্র একটি অভ্যর্থনা শ্লোক পাঠ করলেন, তারপর মোটরে আরোহণ ক'রে ধীরে ধীরে প্রধান সৌধের অলিন্দ প্রান্তে এসে উপনীত হলেন।

সেখানে আশ্রম বালিকারা প্রস্তুত হ'য়ে ছিল। মোটর স্থির হ'য়ে দাঁড়াতেই শঙ্খধ্বনি উত্থিত হ'ল, সন্ধ্যা এবং প্রমথ গাড়ি থেকে অবতরণ করবামাত্র কয়েকটি বালিকা তাদের মাথার উপর পুষ্প-বর্ষণ করলে, তারপর জলপূর্ণ ঝারি হস্তে দুটি বালিকা জল ফেলতে ফেলতে পুষ্পবিকীর্ণ পথে অভ্যাগতদ্বয়কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, অলিন্দ অতিক্রম করে, হল ঘরের মধ্যস্থল দিয়ে সভাবেদী পর্য্যন্ত লাল শালু-ঢাকা পথ। পত্রে পুষ্পে মাল্যে স্তবকে সাজানো হল ঘরের শেষ প্রান্তে সভাবেদী, তদুপরি একটি সুদৃশ্য আস্তরণ-আচ্ছাদিত টেবিল,—টেবিলের উপরে দুটি মূল্যবান চিনামাটির ফুলদানীতে পদ্মগুচ্ছ। টেবিলের সম্মুখে পাশাপাশি রাখা দুটি কারুকার্য্য-খচিত চেয়ার। তার আশে-পাশে কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার।

প্রমথ ও সন্ধ্যা হল ঘরে প্রবেশ করতেই সমাগত ব্যক্তিগণ উঠে দাঁড়াল, এবং চতুর্দ্দিকে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন উত্থিত হ'ল। প্রমথ সহাস্যমুখে যুক্ত করে সকলকে অভিবাদন করলে, তারপর হস্তসঙ্কেতে সকলকে উপবেশন করতে অনুরোধ ক'রে সন্ধ্যাসহ বেদীর উপর উপস্থিত হ'ল।

প্রমথ ও সন্ধ্যা দুটি সাধারণ চেয়ার অধিকার করতে উদ্যত হ'লে অচলানন্দ বাধা দিয়ে বললেন, "এ আমাদের সাধারণ সভা নয়, সুতরাং এ ক্ষেত্রে সভার সাধারণ নিয়ম মেনে চলবার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে একেবারে আপনাদের নিজ আসনে উপবেশন করুন। তার জন্যে প্রস্তাব এবং সমর্থন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে প্রস্তাব কয়েকদিন থেকেই আমাদের সকলের মনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রয়েছে।"

প্রমথ এবং সন্ধ্যা আসন গ্রহণ করার পর সভাগৃহে একটা আনন্দধ্বনি উদ্বেল হ'য়ে উঠল। তারপর এল দুটি বালিকা বরণের বিবিধ উপচার নিয়ে। ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প চন্দন গন্ধদ্রব্য দিয়ে ঘন ঘন শঙ্খ-ধ্বনির মধ্যে তারা তাদের মান্য অতিথিদ্বয়কে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত বরণ করলে, তারপর একটি পাত্র থেকে দুটি মালা তুলে উভয়ের কণ্ঠে বিলম্বিত ক'রে দিলে; বাজারে কেনা তারের কঠিন মালা নয়, সুদৃঢ় রেশমী সুতায় সযত্নে আশ্রমে গাঁথা কমনীয় মালা।

দেখা গেল ইতাবসরে কখন অলক্ষিতে সভাবেদীর এক দিকে একটি ক্যামেরা উদ্যত হয়েছে। ফটো গ্রহণের সুবিধার জন্য টেবিল চেয়ারগুলিকে ঈষৎ সরিয়ে ফিরিয়ে নিতে হল। প্রমথ ও সন্ধ্যা পুনরায় আসন গ্রহণ করলে অচলানন্দ নিকটে এসে স্মিতমুখে যুক্তকরে বললেন, "একটু ভুল হয়েছে। অনুগ্রহ ক'রে পাল্টে বসুন।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"স্বামীকে নিজের দক্ষিণ দিকে পাবার স্ত্রীর অধিকার অলঙ্ঘনীয়—ফটোগ্রাফে ত কথাই নেই।"

এ কথাটা সন্ধ্যার পূর্ব্বে খেয়াল হয়নি। মৃদুস্বরে বললে "ও!" তারপর দাঁড়িয়ে উঠে প্রমথর আসবার জন্য স্থান ক'রে দিয়ে একটু স'রে দাঁড়াল।

উভয়ে আসন পরিবর্ত্তিত করে বসলে পর-পর দুটি ফটো তোলা হল,—প্রথমটি শুধু প্রমথ এবং সন্ধ্যার; দ্বিতীয়টি আশ্রমের আচার্য্যগণের সহিত একত্রে।

এর পর সভার কার্য্যাবলী আরম্ভ হল। পরদিন সকালের গাড়িতে প্রমথ এবং সন্ধ্যার লক্ষ্ণৌ যাত্রার কথা, সুতরাং তাদের যথাসম্ভব শীঘ্র মুক্তি দিতে হবে, এ কথা স্মরণ রেখে সভার কার্য্যসূচী সংক্ষিপ্তই করা হয়েছিল। দু চারটি গান, দুতিনটি কবিতা-আবৃত্তি, অচলানন্দর অভিভাষণ, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে অভিনন্দন-লিপি প্রদান, প্রমথর প্রতিভাষণ, অচলানন্দর ধন্যবাদ জ্ঞাপন, এই কার্য্য সূচী। কিন্তু নির্ব্বিরোধ ঐকান্তিকতা এবং হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যসূচী দেখতে দেখতে অভিব্যক্তির এমন একটা স্তরে উপনীত হল যে সমস্ত সভা একটা সুসম্বদ্ধ সঙ্গীত-যন্ত্রের মতো সুরের ঐক্যে অনুরণিত হ'তে লাগল।

কবিতায় কবিতায়, গানে গানে, অভিনন্দন-লিপিতে সন্ধ্যা এবং প্রমথর প্রতি একই উচ্ছ্বাস, একই নিবেদন। অচলানন্দ তাঁর অভিভাষণে বললেন, "যে মিলনের ভিত্তিতে রুচি এবং সহৃদয়তার ঐক্য বর্ত্তমান সেই মিলনই যথার্থ মিলন। সহানুভূতি এবং সমবেদনার অভিন্ন বন্ধনে যে স্বামী-স্ত্রী আবদ্ধ সেই স্বামী-স্ত্রীই যথার্থ দম্পতি। সেই হিসাবে আমাদের আজ সন্ধ্যার এই বরেণ্য অতিথিদ্বয়কে আমি আদর্শ দম্পতি বলতে পারি। এঁদের রুচি এক, প্রবৃত্তি এক, মত এবং পথ এক—সুতরাং ধর্ম্মও এক। সেই জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ শাস্ত্রের অনুশাসন—সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ—এত সহজে এবং সুন্দর ভাবে পালন করতে সক্ষম হন। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে উজ্জ্বল করেছেন এবং এঁদের সংযুক্ত জীবন উভয়ের দ্বারা উজ্জ্বল হয়েছে। এই সম্পর্কে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের একটি পদ আমার মনে পড়ল, যেটি এঁদের বিষয়ে সুন্দর ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সে পদটি এই—শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী, শশিনা নিশয়া বিভাতি নভঃ; অর্থাৎ শশীর দ্বারা নিশা শোভা পাচ্ছে, এবং নিশার দ্বারা শশী শোভা পাচ্ছে, এবং শশী এবং নিশা উভয়ের দ্বারা নভ শোভা পাচ্ছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শশী এবং নিশা কারা এবং নভ কি, আশা করি সে কথা প্রকাশ ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই।"

অভিভাষণের শেষ ভাগে প্রমথ এবং সন্ধ্যার সহৃদয় দানশীলতার পুনরুল্লেখ করে অচলানন্দ বললেন, "এঁরা দুজনে চিরদিনের জন্য আমাদের এই আশ্রমের পরমাত্মীয় হ'য়ে রইলেন। এঁদের দুজনের দানশীলতা সত্যই আমাদের মুগ্ধ করেছে। যে বিপুল অর্থ এঁরা আশ্রমকে দান করেছেন শুধু তার পরিমাণ মনে করেই এ কথা বলছিনে, এঁদের দুজনের মনে দান করবার প্রবৃত্তির যে বিস্ময়জনক অবলীলা আছে প্রধানতঃ সেই কথা মনে করেই বলছি। এঁদের কাছে চাওয়া এবং পাওয়া এমন অভেদ্যভাবে এক যে আমাদের পক্ষে পাওয়ার চেয়ে চাওয়াটাই ক্রমশঃ অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে গাছকে নাড়া দিলেই ফল পাওয়া যায় সে গাছকে যখন-তখন নাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনা এমন নির্লজ্জ লোভী মন খুব বেশি নেই।"

অচলানন্দের অভিভাষণ শেষ হলে উত্তরে প্রমথ বললে, "আপনারা আমাদের দুজনকে দানশীল ব'লে প্রশংসা করেছেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়াই যায় যে, আমরা আমাদের দানশীল ব'লে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি, তা হলে আপনারাই আমাদের নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ, কারণ আপনারা আমাদের সে খ্যাতি অর্জ্জন করবার সুযোগ দিয়েছেন। দানের উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন দাতার চেয়ে গ্রহীতার আসন কম উচ্চে নয়। সঞ্চয়ের সার্থকতা সদ্ব্যয়ে। সুখেদুঃখে ধর্ম্মেকর্ম্মে যিনি আমার অংশভাগিনী তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্ব্বে আমার ব্যয় ছিল না সে কথা বলিনে, কিন্তু সে ব্যয় ছিল অপব্যয়। ইনি এঁর অনতিবর্ত্তনীয় প্রভাবের দ্বারা সে ব্যয়ের গতি পরিবর্ত্তিত করেছেন সদ্ব্যয়ে, সুতরাং এই প্রসঙ্গে ইনিও আমার ধন্যবাদার্হ।"

সন্ধ্যার প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "এঁর মুখের পরিবর্ত্তিত আকৃতি দেখে আমি বুঝতে পারছি যে এঁর সম্পর্কে এই সকল কথা আমি বলতে উদ্যত হয়েছি ব'লে ইনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কথা বলবার লোভ সম্বরণ করবার ক্ষমতা আমার নেই, সুতরাং এঁর বিষয়ে আর একটি মাত্র কথা ব'লে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। দুর্ভাগা, বিপন্না, সমাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা নারীদের কল্যাণসাধনের জন্য এঁর মনের তীব্র আগ্রহ দেখে আমি এঁকে একটি নারীকল্যাণ মন্দির স্থাপন করবার পরামর্শ দিই। ইনি কিন্তু, পাছে

যথোপযুক্ত শক্তি এবং সামর্থ্যের অভাবে সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয় সেই আশঙ্কায়, নিজে তার না গ্রহণ করে কোনো চলতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্কল্প করেন। তারপর কি প্রকারে আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে এবং নারী-কল্যাণ মন্দিরের পরিকল্পনা গড়ে ওঠে সে সকল কথা আপনাদের সম্পূর্ণ জানা আছে। আপনাদের পরিকল্পিত নারীকল্যাণ মন্দিরের সাহায্যে গতকল্য ইনি কিছু টাকা দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় কিস্তি স্বরূপ আজও একটি চেক্ এনেছেন। আপনাদের নারীকল্যাণ মন্দিরের কার্য্যের অগ্রগতি দেখে ইনি যদি উৎসাহিত হন তা হ'লে এঁর সাহায্যের সমষ্টি কালে লক্ষ টাকা অতিক্রম করতে পাবে, এঁর মনের এই সিদ্ধান্তটুকু আমি আপনাদের কাছে আজ প্রকাশ করলাম।"

সভাস্থলে আনন্দসূচক ঘন ঘন করতালি এবং 'সাধু সাধু' রব উত্থিত হ'ল। প্রমথ বললে, "আপনারা আজকে আমাদের দুজনকে এমন সুস্পষ্ট আন্তরিকতা এবং অনুরাগের সঙ্গে অভিনন্দিত করে আমাদের মনে যে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়ে তুলেছেন তা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষার আমার অভাব। যে বস্তু অনির্ব্বচনীয় তাকে বচনের দ্বারা প্রকাশ করবার চেষ্টাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি। সুতরাং আমি সে চেষ্টায় বিরত থেকে শুধু আমাদের দুজনের চিত্তের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম। যে গভীর অনুভূতি নিয়ে আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নোব, আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তা আমার চিত্তের অমূল্য সম্পদ হ'য়ে রইল। আপনারা সাধু, সজ্জন, মানবসমাজের কল্যাণসাধনের জন্য সংসারত্যাগী,—আপনাদের শুভ প্রতিষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক এই প্রার্থনা করে আমি বিদায় গ্রহণ করলাম।"

একটু নত হ'য়ে প্রমথ সন্ধ্যার কাছ থেকে চেকটা চেয়ে নিলে, তারপর সেটা অচলানন্দর হাতে দিয়ে আসন গ্রহণ করলে।

অচলানন্দ দণ্ডায়মান হ'য়ে বললেন, "যে মহীয়সী নারী আজ আমাদের আশ্রমে পদার্পণ ক'রে আমাদের ধন্য করেছেন; তিনি কাল আমাদের নারীকল্যাণ মন্দিরের সাহায্যকল্পে এক হাজার টাকা দান করেছেন তা আপনারা জানেন, আজ তিনি চার হাজার টাকা দিলেন। তা ছাড়া যে বিপুল অর্থ দান করবার তাঁর অভিপ্রায় আছে, তার কথাও আপনারা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথের মুখে শুনেছেন। এই মহীয়সী নারী এবং তাঁর মহাপ্রাণ স্বামীকে আমি কি বলে অভিনন্দিত করব তা ভেবে পাচ্ছিনে। প্রমথনাথেরই ভাষা ব্যবহার ক'রে আমি বলি অনির্ব্বচনীয়কে ভাষায় ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে কাজ নেই, যা অনুভূতির বস্তু তা আমাদের অনুভবের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকুক। প্রচলিত প্রথায় এঁদের ধন্যবাদ দিতে আমার মন পরিতৃপ্তি মানবে ব'লে মনে হচ্ছেনা। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ এই শুভক্ষণে এ-দুটী তরুণ-তরুণীকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। আমার বলতে ইচ্ছে করছে,—তোমরা বেঁচে থাক, তোমরা সুখী হও। তোমাদের মিলন দৃঢ়তর মধুরতর হোক। আর-কোনো অধিকার আমার না থাকলেও আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, সেই অধিকারে আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের দ্বারা এই পুণ্যচরিত্র দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলি,

সমানি ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

তোমাদের ইচ্ছা একরূপ হোক, তোমাদের হৃদয় একরূপ হোক, তোমরা যাতে পরস্পর সুন্দরভাবে একত্র থাকতে পার তজ্জন্য তোমাদের মন একরূপ হোক।"

অচলানন্দ আসন গ্রহণ করলে প্রমথ সন্ধ্যার কানে কানে কি বলতে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল, তারপর উভয়ে অচলানন্দর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে যুক্তকরে প্রণাম করলে।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করে অচলানন্দ বললেন, "দীর্ঘায়ু-রস্তু।"

সভা শেষ হ'ল।

প্রমথ বললে, "মহারাজ, এবার আমাদের বিদায় দিন্।"

অচলানন্দ বললেন, "কিন্তু একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ত' ছাড়তে পারিনে।"

"একান্তই যদি না ছাড়েন ত' যত শীঘ্র এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে হয়, অনুগ্রহ ক'রে তার ব্যবস্থা করুন।"

অচলানন্দ বললে, "ব্যবস্থা নিতান্তই সামান্য,—আর তা প্রস্তুতই আছে। আসুন আমার সঙ্গে।" ব'লে অগ্রসর হলেন।

বিদায়কালে প্রমথ ও সন্ধ্যা মোটরে ওঠার পর অচলানন্দ বললেন, "ফিরে যাবার সময়ে মালা খুলে যাওয়া যদিও সাধারণ আচরণ, কিন্তু এ আমার ঠিক ভাল লাগছেনা। আশ্রম ত্যাগ ক'রে যাবার সময়ে আমাদের আদরের চিহ্ন দুটি আপনাদের গলায় ঝুললে আমরা ভারি খুসী হব। আসুন, পরিয়ে দিই।" ব'লে অচলানন্দ সম্মুখের সীট্ থেকে মালা দুটি তুলে নিয়ে তার মধ্যে একটি প্রমথর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

প্রমথ নিজের গলার মালা এবং অচলানন্দর হাতের মালা বার দুই তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করে বললে, "মহারাজ, আপনার হাতের মালাটাই কিন্তু আমার।"

অচলানন্দ সহাস্যমুখে বললেন, "তাই না-কি? কেমন ক'রে বুঝলেন।"

"ওঁর মালার মধ্যিখানের ফুল লাল গোলাপ, আর আমার হলদে।"

"এতটা লক্ষ্য ক'রে রেখেছেন?—তা হোক্,—স্বামী-স্ত্রীর মালা যত বদল হয় ততই মঙ্গল।" ব'লে অচলানন্দ হাসতে হাসতে হাতের মালাখানা সন্ধ্যার গলায় পরিয়ে দিলেন।

ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি এবং জয়ধ্বনির মধ্যে প্রমথ ও সন্ধ্যার মোটর চলতে আরম্ভ করলে এবং দেখতে দেখতে আশ্রম-প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে রাজপথে এসে পড়ল।

যদিও শ্রাবণ মাস, আকাশে তেমন মেঘ ছিলনা। কৃষ্ণপক্ষের তিথির অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে দুই পাশের অস্পষ্ট দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে মোটর দ্রুতবেগে কলিকাতার অভিমুখে ছুটে চলেছে। প্রমথ ও সন্ধ্যা তাদের হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতির নির্ম্মম আলস্যে নির্ব্বাক হয়ে পাশাপাশি ব'সে। মুখে কথা নেই, কিন্তু তাই ব'লে মনের মধ্যে এমন-কিছু চিন্তার তরঙ্গ যে আলোড়িত হচ্ছিল, তাও নয়। হিম-শীতল সমুদ্রতটে বিস্তৃত বালুকারাশিকে আচ্ছন্ন ক'রে স্তিমিত জ্যোৎস্না যেমন প'ড়ে থাকে তেমনি একটা অলস মন্থর চিন্তা তাদের মনকে ব্যাপ্ত করে ছিল। অভিনন্দন-উৎসবের আকারে যে ব্যাপারটা আজ সহসা ঘ'টে গেল তা যেন তাদের পক্ষে একটা পুরোদস্তুর বিবাহ অনুষ্ঠানই শঙ্খধ্বনি, পুষ্পবর্ষণ, বরণ, মাল্য-বদল, এমন কি বিবাহ পদ্ধতির অন্তর্গত আশীর্ব্বাদের শ্লোক পর্য্যন্ত! কি-ই যে নয়!

কলিকাতার এলাকায় প্রবেশ করবার কিছু পরে প্রমথদের মোটরের পাশ দিয়ে বর এবং বরযাত্রীদের একটা শোভা-যাত্রা চ'লে গেল।

সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে প্রমথ বললে, "ঊষা, আজ দেখচি বিয়ের লগ্নও আছে।"

সন্ধ্যা শুধু একবার প্রমথর মুখের উপর চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলে,—কোনো কথা বললে না।

গৃহে যখন তারা পৌঁছল তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ছাদে গিয়ে পাশাপাশি রাখা দুটো ইজিচেয়ারের উপর দুজনে আশ্রয় গ্রহণ করলে। এখনো কোনো কথাবার্ত্তা হ'লনা, উভয়ে নিঃশব্দে পাশাপাশি ব'সে রইল।

ক্ষণকাল পরে প্রমথ বললে, "ঊষা, আজ এখন তোমার কোনো কাজ সারবার বাকী থাকে ত চল।"

সন্ধ্যা বললে, "যা বাকি আছে কাল সকালে সেরে নেবো। আজ থাক্।"

আর কোনো কথা হলনা। তারপরও বহুক্ষণ তারা স্তব্ধ হ'য়ে পাশাপাশি ব'সে রইল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাসুকী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

নহি ভীরু, নহিক দুর্ব্বল,
চরণে প্রকোষ্ঠে মোর ছিল যে শৃঙ্খল
বজ্রাদপি সুকঠিন ; নিয়তির অমোঘ নিগড়ে
ছিনু বাঁধা শতপাকে ; পরিণত হয়েছি যে জড়ে,
পাষাণ শিকড়ে
প্রাণবন্যা। হিমঘন সম্মোহনে যেন গঙ্গোত্তরী
হয়েছিল শিলীভূত, ইন্দ্রজালে রেখেছিল ধরি
আমার সহস্র ধারা। তুষার উষ্ণীষে
জীবন জাহ্নবী মোর বহুকুণ্ডলিত আশীবিষে
রেখেছিল বন্দী করি, দেয়নি ছুটিতে
প্রাণের আবেগভরে সিন্ধুতটে সানন্দে লুটিতে।

তুমি এলে মোর উষারাণী,
হিমানী সত্তার পরে তপ্ত হেমপাণি
রেখেছিলে স্নেহভরে। বিগলিল স্তম্ভিত তুষার,
ছুটিল উদ্দাম বন্দী লক্ষ্য পানে আবেগে দুর্ব্বার
তুলিয়া হুঙ্কার।
নিয়তির অভিশাপ অপনীত হ'ল এ জীবনে,
সহস্র প্রপাতে ধারা উৎসারিল উদ্বেল প্লাবনে,
দশশত ফণা মেলি প্রবুদ্ধ বাসুকী
ছুটেছে কুটিলগতি প্রবাহিনী পাতালপ্রমুখী।
সে অতল রসাতলে ঊর্দ্ধে তুলি ফণা
ধরিব জীবন ভার, করিব তোমারি আরাধনা।

বেদান্ত জ্ঞানের প্রণালী

শ্রীঅনিলবরণ রায়

[প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, এই প্রবন্ধে মন ও বুদ্ধির মধ্যে যে প্রভেদ করা হইয়াছে, ইংরাজীতে সেরূপ কোনও প্রভেদ নাই। ইংরাজীতে মন (mind) ও বুদ্ধি (reason) দুইটি পৃথক তত্ত্ব নহে। বুদ্ধি মনেরই একটি প্রক্রিয়া। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া হইতেছে সংবেদন (Sensation), প্রত্যক্ষ (perception), চিন্তা (thinking), অনুভব feeling), সঙ্কল্প (will) ইত্যাদি। চিন্তার মধ্যে আবার আছে—অনুস্মরণ (memory), কল্পনা (imagination), বুদ্ধি (reason) ইত্যাদি। এই সমুদয়কেই ইংরাজীতে সাধারণভাবে মন (mind) বলা হয়, এবং বাংলাতেও মন এই অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে মন ও বুদ্ধি পৃথক তত্ত্ব। গীতা প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছে,

ভূমিরাপোঽনলো বায়ু খংমনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৭।৪

সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টধা করিয়াছে, কারণ সাংখ্যের ন্যায় গীতা ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রগণকে বিভিন্ন তত্ত্ব না বলিয়া মনেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছে। বস্তুতঃ মনই প্রধান ও একমাত্র ইন্দ্রিয়। বাহ্যজগতের সহিত বিভিন্ন ভাবে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য মনই চক্ষুকর্ণাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যন্ত্রের বিকাশ করিয়াছে।

যন্ত্রী যন্ত্রের অধীন নহে, যন্ত্রই যন্ত্রীর অধীন। অজ্ঞানের বশে আমরা মনে করি যে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত মন বাহ্যজগতের কোন তথ্যই জানিতে পারে না। মনের এই ভুল ভাঙ্গিতে পারিলে, মন যে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীতও বাহ্যজগতকে জানিতে পারে শুধু তাহাই নহে। বর্ত্তমানে আমাদের যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় রহিয়াছে ইহা ব্যতীত নূতন নূতন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করিতে পারে। এই যে মন বুদ্ধি হইতে বিভিন্ন এইটিকে বুঝাইতে শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজীতে Sense-mind কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলাতে Sense mind এর প্রতিশব্দ রূপে "মানসেন্দ্রিয়" কিম্বা স্থানবিশেষে শুধু "মন" ব্যবহার করিলেই বোধ হয় চলিতে পারে]

একটা ভাগবত অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা ও জ্ঞানলাভ করি, সে জন্য আমাদিগকে ইন্দ্রিয়গণের প্রমাণ অতিক্রম করিয়া এবং জড়ানুগত মনের প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে হয়। যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ইহা করি তাহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছে শুদ্ধ বুদ্ধি; pure reason। মানবীয় বুদ্ধির দুই প্রকার ক্রিয়া আছে—মিশ্র বা পরাশ্রিত, শুদ্ধ বা স্বাধীন। বুদ্ধি মিশ্র ক্রিয়ায় ব্রতী হয় তখন যখন সে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির গণ্ডীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, ইহার বিধানকেই চরম বলিয়া মানিয়া লয় এবং কেবল প্রতিভাস লইয়াই কারবার করে অর্থাৎ বস্তুসকলের পরস্পরিক সম্বন্ধ তাঁহাদের বাহ্যিক প্রক্রিয়া এবং উপযোগিতা আমাদের সম্মুখে যেমন প্রতিভাত হয়, শুদ্ধ তাহাই লক্ষ্য করে। অন্য পক্ষে বুদ্ধি তাহার শুদ্ধ ক্রিয়ায় ব্রতী হয় যখন সে আমাদের ইন্দ্রিয়োপলব্ধি সকলকে কেবল আরম্ভ স্বরূপ গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া তাহাদের পশ্চাতে যায়, বিচার করে, নিজের স্বাধিকারে কাজ করে এবং এমন সব ব্যাপক ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রত্যয়ে (concepts) উপস্থিত হইতে চেষ্টা করে যাহাদের সম্বন্ধ বস্তুসকলের বাহ্যদৃশ্যের সহিত নহে। পরন্তু বাহ্যদৃশ্যের পশ্চাতে যাহা রহিয়াছে তাহারই সহিত।—সে অপরোক্ষ বিচারের দ্বারা বাহ্যদৃশ্য হইতে তাহার পশ্চাতে যাহা রহিয়াছে সোজাসুজি সেইখানে গিয়াই নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত

* শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine হইতে সঙ্কলিত

হইতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়াও বুদ্ধি প্রারম্ভিক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে কেবল নামমাত্র উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে বহুদূরে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে—এত দূরে যে মনে হইতে পারে সিদ্ধান্তটি আমাদের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যাহা বলিতেছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; এবং এইটিই বুদ্ধির স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া। বুদ্ধির এই যে গতি ইহা বৈধ এবং অপরিহার্য্য, কারণ আমাদের যে সাধারণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ তাহা বিশ্বব্যাপারের অতি অল্পটুকুরই নাগাল পায়। শুধু তাহাই নহে, পরন্তু ইহার নিজের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেই এমন সব যন্ত্র ব্যবহার করে যাহারা দোষযুক্ত এবং আমাদিগকে মিথ্যা মাপ ও ওজন প্রদান করে। মানুষ যে-সকল মূল্যবান শক্তির বিকাশ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি সর্ব্বোত্তম হইতেছে বুদ্ধির সাহায্যে মানসেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তিসকলকে সংশোধন করা, এবং প্রধানতঃ ইহারই কল্যাণে মানুষ পার্থিব অন্যান্য জীবের উপর প্রাধান্য করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শুদ্ধ বুদ্ধির পৃথক ব্যবহারই আমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞান হইতে তত্ত্ববিজ্ঞানে লইয়া যায়। দার্শনিক জ্ঞানের প্রত্যয় সকল আমাদের শুদ্ধ বুদ্ধিকে তৃপ্ত করে, কারণ সে সব হইতেছে তাহারই সহিত এক ধাতুতে গড়া। কিন্তু আমাদের প্রকৃতি বস্তুসকলকে সর্ব্বদা দুইটি চক্ষু দিয়া অবলোকন করে, কারণ সে তাহাদিগকে দুইভাবে দেখে, ভাবনা (idea) রূপে আবার বাস্তব জগতের তথ্য (fact) রূপে। এবং সেই জন্য প্রত্যেক প্রত্যয়ই আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং আমাদের প্রকৃতির একটা অংশের নিকট প্রায় অবাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, যতক্ষণ না উহা প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে পরিণত হয়। কিন্তু যে শ্রেণীর সত্য এখানে আলোচ্য, তাহা আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির গোচর নহে, বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। অতএব অনুভূতির অন্য এমন কোন বৃত্তি (faculty) থাকা প্রয়োজন যাহার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির দাবী পূর্ণ হইতে পারে, এবং যেহেতু আমরা এখানে অতিভৌতিক (supraphysical) সত্য লইয়া আলোচনা করিতেছি, সে বৃত্তি আসিতে পারে কেবল আমাদের মানসিক অনুভূতির (psychological experience) সম্প্রসারণের দ্বারা।

বুদ্ধির জ্ঞানার্জ্জনী ক্রিয়ার ন্যায়, মানুষের মধ্যে মানসিক অনুভূতির ক্রিয়াও দুই রকম হইতে পারে—মিশ্র বা পরাশ্রিত, শুদ্ধ বা স্বাধীন। ইহার মিশ্র ক্রিয়া সাধারণতঃ তখনই হয় যখন মন বাহ্য জগতকে, বিষয়কে (object) জানিতে চায়, আর শুদ্ধ ক্রিয়া হয় যখন সে নিজেকে বিষয়ীকে (subject) জানিতে চায়। প্রথমোক্ত ক্রিয়ায় সে ইন্দ্রিয়গণের অধীন, এবং তাহাদের প্রমাণ অনুসারেই নিজের প্রত্যক্ষ সকল গঠন করে; শেষোক্ত ক্রিয়ায় সে নিজে নিজেই কার্য্য করে, এবং বাস্তব সকলকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারে তাহাদের সহিত একপ্রকার ঐক্যবোধের দ্বারা। এই ভাবেই আমরা আমাদের ভাবাবেশসকল (emotions) অবগত হই; আমরা ক্রোধকে জানিতে পারি, কারণ আমরাই ক্রোধ হইয়া উঠি। বাস্তবিক পক্ষে সকল অনুভূতিই নিগূঢ় স্বরূপে হইতেছে ঐক্যবোধের দ্বারা জ্ঞান লাভ; কিন্তু আমাদের নিকটে এই প্রকৃত স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে কারণ আমরা নিজেরা বিষয়ী (subject) এবং আর সবই বিষয় (object) এই পার্থক্যের দ্বারা আর সবকে বহিষ্কার করিয়া আমরা জগতের অবশিষ্ট অংশ হইতে নিজেদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি, এবং সেইজন্যই আমরা বাধ্য হইতেছি এমন সব ইন্দ্রিয় ও প্রক্রিয়ার বিকাশ করিতে যাহাদের দ্বারা আমরা যাহাদের বহিষ্কার করিয়া দিয়াছি তাহাদের সহিত পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারি।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানে আমাদের যে সব অক্ষমতা সে সব অনিবার্য্য বা অবশ্যম্ভাবী নহে। চক্ষু আদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা না লইয়াই ইন্দ্রিয়বিষয়সকল সাক্ষাৎ-ভাবে অবগত হওয়া মনের পক্ষে সম্ভব, এবং ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিকই হইতে পারে যদি সে যে জড়ের আনুগত্য মানিয়া লইয়াছে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে তাহাকে রাজী করান যায়। হিপ্‌নটিজম, মেস্‌মিরিজিম প্রভৃতি অবস্থাতে ইহাই ঘটিয়া থাকে। প্রাণশক্তি নিজের ক্রমবিকাশে মন ও জড়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে, আমাদের জাগ্রত চৈতন্য তাহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ; এই জন্যই এইরূপ সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভ করা আমাদের জাগ্রত চৈতন্যে সাধারণতঃ সম্ভব হয় না; জাগ্রত মনকে একটা সুষুপ্তির

অবস্থার মধ্যে প্রেরণ করিতে হয়, তাহাই প্রকৃত বা প্রচ্ছন্ন মনকে (the true or subliminal mind) মুক্ত করিয়া দেয়। তখন মন যে একমাত্র ইন্দ্রিয় এবং একাই যথেষ্ট তাহার সেই প্রকৃত স্বরূপে মন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এবং অবাধে ইন্দ্রিয়বিষয়সকলের উপর মিশ্র বা পরাশ্রিত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে নিজের শুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে পারে। আর জাগ্রত অবস্থাতেও যে এইরূপ শক্তির সম্প্রসারণ একেবারে অসম্ভব তাহা নহে, কেবল তাহা অধিকতর দুরূহ।

মনের যে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া তাহার প্রয়োগ করিয়া আমরা সাধারণতঃ যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় ব্যবহার করি তাহা ছাড়াও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বথা, আমরা হাতে করিয়া যে বস্তুটি ধরিয়া রহিয়াছি, কোনও জড় বস্তুর সাহায্য ব্যতীত ঠিক তাহার কত ওজন তাহা বলিয়া দিবার শক্তি বিকাশ করা সম্ভব। এখানে কেবল আরম্ভ হিসাবেই ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মন নিজস্ব উপলব্ধির দ্বারাই ওজন নির্দ্ধারণ করে, কেবল জিনিষটির সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্যই স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে। আর শুদ্ধ বুদ্ধির ন্যায় মানসেন্দ্রিয়ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কেবল সূচনারূপে ব্যবহার করিয়া এমন জ্ঞানে উপনীত হইতে পারে যাহার সহিত বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের কোনই সম্বন্ধ নাই, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রমাণের বিরোধী। আর এই যে বৃত্তির সম্প্রসারণ, ইহা শুধুই বাহিরের ও উপরের জিনিষেই সীমাবদ্ধ নহে। যে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে একবার কোন বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে মানসেন্দ্রিয়কে এমন ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব যাহাতে আমরা বস্তুটির অভ্যন্তরীন বিষয় সকল অবগত হইতে পারি; যথা, অন্য ব্যক্তির মধ্যে কি চিন্তা হইতেছে বা অনুভব হইতেছে তাহা গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সে-জন্য তাহার কথা, অঙ্গভেদী, কর্ম্ম বা মুখমণ্ডলের ভাব কোন কিছুরই সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন হয় না, এমন কি ইহাদের বিরুদ্ধেও যাওয়া যায়; বস্তুতঃ ইহার যে পরিচয় দেয় তাহা সকল সময়েই আংশিক ও ভ্রান্তিপ্রদ। অবশেষে অন্তরতর ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের যে স্বভাবসিদ্ধ নিজস্ব শক্তি তাহাদের যে শুদ্ধ মানসিক ও সূক্ষ্ম ক্রিয়া তাহার সাহায্যে আমরা এমন সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করিতে পারি, জিনিষ সকলের এমন সব রূপ দেখিতে পারি যাহা আমাদের জড়জগতের দৃশ্যরূপ হইতে বিভিন্ন; অন্য পক্ষে ইন্দ্রিয়গণের যে স্থূল ক্রিয়া তাহা কেবল তাহাদের সমগ্র ও সাধারণ ক্রিয়ার কথঞ্চিৎ অংশ মাত্র, কেবল বাহ্য জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই নির্ব্বাচিত।

কিন্তু এই সব বৃত্তি সম্প্রসারণের কোনটির দ্বারাই আমাদের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হয় না, যে সব সত্য "ইন্দ্রিয়ের অতীত কিন্তু বুদ্ধির গ্রাহ্য" তাহাদের আন্তরিক অনুভূতি লাভ করা যায় না। তাহারা কেবল আমাদের সম্মুখে দৃশ্যজগতের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেয় এবং ঘটনাপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিবার অধিকতর কার্য্যকরী ব্যবস্থা দেয়। কিন্তু বস্তুর যে অন্তর্নিহীত সত্য, ইন্দ্রিয় কখনই তাহার নাগাল পায় না। অথচ বিশ্ববিধানের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট নীতি রহিয়াছে, বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারে এমন সত্য যদি কোথাও থাকে তাহা হইলে সেই সব সত্যকে অনুভূতির দ্বারা লাভ করিবার বা প্রমাণ করিবার কোন উপায়ও ঐ বুদ্ধির অধিকারীর মধ্যে কোথাও না কোথাও থাকিবেই। আমাদের অন্তর্জগতে একটি মাত্র উপায় আছে, যে ঐক্যবোধাত্মক জ্ঞানের দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব অবগত হই তাহারই সম্প্রসারণ। বস্তুতঃ আমাদের সত্তার মধ্যে কি কি জিনিষ বর্ত্তমান রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আত্ম-সম্বিতের (Self-awareness) উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অথবা আরও সাধারণ সূত্ররূপে বলা যাইতে পারে যে, আধারের জ্ঞানের মধ্যেই আধারের জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। অতএব যদি আমরা আমাদের মানসিক আত্ম-সম্বিতের বৃত্তিটিকে সম্প্রসারিত করিয়া আমাদের উর্দ্ধে ও বাহিরে যে সত্তা বিরাজ করিতেছে, উপনিষদের আত্মা বা ব্রহ্ম, তাহার জ্ঞানে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বজগতে ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে যে সকল সত্য রহিয়াছে আমরা অনুভূতিতে সে সকলের অধিকারী হইতে পারি। এই সম্ভাবনার উপরেই ভারতের বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত। সে চাহিয়াছে আত্মার জ্ঞানের ভিতর দিয়াই বিশ্বের জ্ঞান লাভ করিতে।

কিন্তু মানসিক অনুভূতি এবং বুদ্ধির প্রত্যয়সকল যতই

উচ্চ হউক না কেন, বেদান্ত সে সকলকে কখনই পরম স্বপ্রতিষ্ঠ ঐক্যবোধ বলিয়া স্বীকার করে নাই; তাহাদিগকে মানসিক ঐক্যবোধে তাহার প্রতিভাস মাত্র বলিয়াই দেখিয়াছে। আমাদিগকে মনের উর্দ্ধে, বুদ্ধির উর্দ্ধে যাইতে হইবে। আমাদের জাগ্রত চেতনায় সক্রিয় যে বুদ্ধি তাহা দুইটি স্তরের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতেছে—আমাদের উর্দ্ধবিকাশে আমরা যে অবচেতন সর্ব্ব (Subconscient All) হইতে আসিয়াছি, এবং যে অতিচেতন সর্ব্বের (superconscient All) দিকে ঐ ক্রমবিকাশের দ্বারাই চালিত হইতেছি। অবচেতন এবং অতিচেতন এই দুইটি হইতেছে একই সর্ব্বময় বা বস্তুর দুইটি বিভিন্ন-রূপায়ণ। অবচেতনের প্রধান কথা হইতেছে প্রাণ, Life ; অতিচেতনের প্রধান কথা হইতেছে জ্যোতি, Light। অবচেতন স্তরে চৈতন্য কর্ম্মের মধ্যে বন্দী, কারণ কর্ম্মই হইতেছে প্রাণের মূল তত্ত্ব। অতিচেতন স্তরে কর্ম্ম আবার জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, সেখানে আর জ্ঞান তাহার মধ্যে বন্দী নহে, সে নিজেই এক পরম চৈতন্যের অন্তর্ভূত। সাধারণভাবে এই দুই স্তরের মধ্যেই রহিয়াছে অন্তর্বোধাত্মক জ্ঞান (Intuitional knowledge), এবং অন্তর্বোধাত্মক জ্ঞানের ভিত্তি হইতেছে যে জানিতেছে এবং যাহা জানা হইতেছে এই দুইয়ের সচেতন বা সুসিদ্ধ ঐক্য ; ইহা হইতেছে সেই আত্মাবস্থিতি যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় জ্ঞানের ভিতর দিয়া এক। কিন্তু অবচেতন স্তরে অন্তর্বোধ (intuition) কর্ম্মের মধ্যে, কার্য্যকারিতার মধ্যে প্রকটিত হয় এবং জ্ঞান বা সচেতন ঐক্যবোধ কর্ম্মের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অথবা অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্ন থাকে। অন্যপক্ষে অতিচেতন স্তরে, যেখানে জ্যোতিই হইতেছে তত্ত্ব ও বিধান, অন্তর্বোধ সচেতন ঐক্য হইতে উদ্ভূত জ্ঞানরূপে নিজের প্রকৃত স্বরূপে প্রকটিত হয় এবং সেখানে কর্ম্ম আনুষঙ্গিক মাত্র অথবা অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, পরন্তু প্রধান বা মূল তথ্য নহে। এই দুই স্তরের মধ্যে মন ও বুদ্ধি মধ্যস্থস্বরূপ কাজ করে, তাহাদের সহায়তায় জীব জ্ঞানকে কর্ম্মের মধ্যে বন্দীঅবস্থা হইতে মুক্ত করিতে এবং তাহার স্বভাবসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়। মানসিক আত্ম-সম্বিৎ যখন আধার ও আধেয়, আপন ও পর উভয়েতেই প্রযুক্ত হইয়া নিজেকে জ্যোতির্ম্ময় স্ব-প্রকাশ ঐক্যবোধে উন্নীত করে, তখন বুদ্ধিও নিজেকে স্ব-প্রকাশ অন্তর্বোধাত্মক জ্ঞানের রূপে পরিণত করে। এইটিই হইতেছে আমাদের জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা, তখন মন নিজেকে অতিমানসের মধ্যে সংসিদ্ধ করিয়া তোলে।

মানবীয় বোধশক্তির এই যে পরিকল্পনা, ইহারই উপর প্রাচীন বেদান্তের সিদ্ধান্তসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ধারণা করিতে বৈদান্তিক বিশ্লেষণ যে চরম প্রত্যয়ে উপনীত হইয়াছে তাহা হইতেছে সদ্ ব্রহ্ম শুদ্ধ, অনির্দ্দেশ্য, অনন্ত, কৈবল্যাত্মক সত্তা বাস্তব জগৎ বলিয়া আমরা যাহাকে দেখিতেছি, তাহার উপাদানস্বরূপ সকল গতি ও রূপের পশ্চাতে বেদান্ত এই মূল বাস্তব সত্তার সন্ধান পাইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, যখন আমরা এই প্রত্যয়কে ধরি, তখন আমাদের সাধারণ চৈতন্য, আমাদের সাধারণ অনুভূতি, যাহা দেয় বা সমর্থন করে, আমরা সে সবকেই সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিয়া যাই। মানসেন্দ্রিয় বা বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ শুদ্ধ কৈবল্যাত্মক সত্তা বলিয়া কিছুই জানে না। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি কেবল রূপ এবং গতিরই পরিচয় দেয়। রূপের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে অস্তিত্ব শুদ্ধ নহে, সর্ব্বদাই মিশ্র, সংযুক্ত, সমষ্টিবদ্ধ, আপেক্ষিক। যখন আমরা নিজেদের অন্তরের মধ্যে যাই, তখন হয়ত আমরা সুনির্দ্দিষ্ট রূপকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি, কিন্তু গতিকে, পরিবর্ত্তনকে ছাড়াইতে পারি না। দেশের (space) মধ্যে জড়ের গতি, কালের (time) মধ্যে পরিবর্ত্তনের গতি ইহা যেন অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয়। আমরা বলিলেও বলিতে পারি যে, এইটাই হইতেছে প্রকৃত অস্তিত্ব, আর যে স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার পরিকল্পনা করা হয় বস্তুতঃ তাহার অনুরূপ সত্য বস্তুর সন্ধান কোথাও মিলে না। বড় জোর আত্মসম্বিতের মধ্যে কিম্বা তাহার পশ্চাতে কখনও কখনও আমরা এক অচল, অক্ষর একটা কিছুর ইঙ্গিত পাই, সকল জীবন ও মৃত্যুর উর্দ্ধে,সকল পরিবর্ত্তন,ও রূপায়ণ ও কর্ম্মের উর্দ্ধে আমরা নিজেরা তাহাই, অস্পষ্টভাবে এইরূপ উপলব্ধি করি বা কল্পনা করি। এইখানেই আমাদের মধ্যে একটি দ্বার রহিয়াছে যাহা কখনও কখনও এক উর্দ্ধের সত্যের দীপ্তির দিকে খুলিয়া

যায়, এবং আবার তাহা রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে হয়ত একটা কিরণ আমাদিগকে স্পর্শ করে—এক জ্যোতির্ম্ময় সন্ধান; যদি আমাদের শক্তি ও দৃঢ়তা থাকে, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাসের সহিত সেইটিকে ধরিতে পারি এবং সেইটিকেই সূচনা করিয়া মানসেন্দ্রিয়ের চৈতন্য হইতে বিভিন্ন আর এক চৈতন্যের ক্রিয়ার দিকে, অন্তর্বোধের ক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

কারণ যদি আমরা সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, অন্তর্বোধই (Intuition) আমাদের প্রথম শিক্ষক। আমাদের মানসিকক্রিয়াসকলের পশ্চাতে অন্তর্বোধ সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অন্তর্বোধ পরম অজ্ঞাতের নিকট হইতে মানুষের কাছে সেই সব উজ্জ্বল বাণী বহন করিয়া আনে, যাহা হইতে তাহার উচ্চতর জ্ঞানের সূত্রপাত হয়। বুদ্ধি আসে পরে, সেই আলোর ফসল হইতে যদি সে কোনও লাভ উঠাইতে পারে সেই চেষ্টায়। অন্তর্বোধ আমরা যাহা কিছু জানি বা যাহা কিছু বলিয়া নিজেদিগকে মনে করি সে-সবের পশ্চাতে ও উর্দ্ধে এমন একটা কিছুর সন্ধান আমাদিগকে দেয় যাহা মানুষের নীচের বুদ্ধি এবং সাধারণ অনুভূতির বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহাকে নিত্য অনুসরণ করিতেছে এবং সেই রূপহীন প্রত্যক্ষকে ভগবান, অমৃতত্ব, স্বর্গ প্রভৃতির স্পষ্টতর পরিকল্পনায় রূপ দিতে অনুপ্রাণিত করিতেছে, এই সবের দ্বারাই আমরা সেইটিকে মনের কাছে, প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। কারণ অন্তর্বোধ প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত, প্রকৃতির ন্যায়ই শক্তিশালী; বুদ্ধি বিরোধিতা করিলে কিম্বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ উল্টা কথা বলিলে অন্তর্বোধ সে-সবকে আমলই দেয় না। কি আছে তাহা সে জানে কারণ সে নিজে আছে, সে সত্যের এবং সত্য হইতেই আসিয়াছে; বাহ্য বস্তু বা দৃশ্যের প্রমাণের নিকট সে মাথা নত করিবে না। অন্তর্বোধ আমাদিগকে যাহা বলে সেটা ততই অস্তিত্ব সম্বন্ধে নহে, যতটা সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে, কারণ আমাদের মধ্যে একটি যে জ্যোতির কেন্দ্র রহিয়াছে, আমাদের আত্ম-সম্বিতে কখনও কখনও যে দ্বার খুলিয়া যায়, অন্তর্বোধ আসে সেইখান হইতেই এবং এইজন্যই তাহার শ্রেষ্ঠতা। প্রাচীন বেদান্ত অন্তর্বোধের এই বারতাটিকেই ধরিয়াছিল এবং উপনিষদের তিনটি মহান বাণীতে ব্যক্ত করিয়াছিল—

"সোঽহং", "তত্ত্বমসি"
"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এষ ম আত্মা।"

কিন্তু মানুষের মধ্যে অন্তর্বোধকে যে সব বাধার ভিতর দিয়া কাজ করিতে হয়, তাহাদের জন্য সে সত্যকে আমাদের প্রকৃতি যেরূপ চায় সেরূপ সুসম্বদ্ধ ও সুস্পষ্টভাবে দিতে পারে না। আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ জ্ঞানকে এইরূপ কোন পূর্ণতা দিবার পূর্ব্বে তাহাকে আমাদের বহিস্থ সত্তায় (surface being) সুব্যবস্থিত (organised) হইতে হইবে এবং সেখানে নেতৃত্ব অধিকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমাদের বহিস্থ সত্তায় অন্তর্বোধ নহে, বুদ্ধিই সুব্যবস্থিত এবং আমাদের প্রত্যক্ষ, চিন্তা ও কর্ম্ম সকলকে সুশৃঙ্খল করিতে সাহায্য করে। এই জন্যই উপনিষদের প্রাচীন বৈদান্তিক চিন্তাধারায় প্রকটিত যে অন্তর্বোধমূলক জ্ঞানের যুগ তাহাকে বুদ্ধিমূলক জ্ঞানের যুগের জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল; অনুপ্রেরণামূলক শ্রুতিশাস্ত্রের স্থানে আসিল যুক্তিতর্কমূলক দর্শনশাস্ত্র (metaphysical philosophy) ঠিক যেমন পরে দর্শন শাস্ত্রকে আবার পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। আর এই যে যুগপর্য্যায়, ইহা অবনতি বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ প্রগতিরই চক্র। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিম্নতন বৃত্তিকে উর্দ্ধতন বৃত্তিটি ইতিপূর্ব্বে যাহা দিয়াছে তাহার যতটা সে পারে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং নিজের বিশিষ্ট পদ্ধতির দ্বারা তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। এই প্রয়াসের দ্বারা সে নিজেই সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত উচ্চতর বৃত্তিগুলির সহিত আরও প্রশস্ত ও সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যে উপনীত হইয়াছে।

আমরা এই পর্য্যায়ক্রম দেখিতে পাই উপনিষদ ও পরবর্ত্তী ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলিতে। বেদ ও বেদান্তের ঋষিগণ সম্পূর্ণভাবেই অন্তর্বোধ ও অধ্যাত্ম অনুভূতির উপরেই নির্ভর করিতেন। উপনিষদের মধ্যে আমরা একটুও কোথাও দেখিতে পাই না যে, যুক্তি তর্কের দ্বারা বৈদান্তিক সত্য সমর্থনের চেষ্টা হইতেছে। অন্তর্বোধের যদি ভুল হয়, পূর্ণতর অন্তর্বোধের দ্বারাই তাহার সংশোধন করিতে হইবে, মানসিক যুক্তিতর্ক কখনও তাহার বিচার করিতে পারে না—ইহাই ঋষিগণের মত ছিল বলিয়া মনে হয়।

অথচ মানুষের বুদ্ধিনিজস্ব পদ্ধতির দ্বারাই তৃপ্তি দাবী করে। সেই জন্য যখন বুদ্ধিবিচারের যুগ আরম্ভ হইল, ভারতীয় দার্শনিকগণ অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও, সত্যের অনুসন্ধানে দ্বিধাভাব অবলম্বন করিলেন। অন্তর্বোধের প্রাচীন ফল শ্রুতিকে তাঁহারা বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু আবার সেই সঙ্গেই তাঁহারা বুদ্ধি হইতেই আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সিদ্ধান্তগুলিকে শ্রুতির সহিত মিলাইয়া লইতে লাগিলেন, যে গুলি শ্রুতির অনুকূল কেবল সেইগুলিকেই সত্য বলিয়া গ্রহন করিলেন। তৎসত্বেও বুদ্ধির যে স্বাভাবিক গতি নিজে বড় হইয়া উঠা তাহারই কার্য্যতঃ জয় হইল, শ্রুতি কেবল কথাতেই শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য হইয়া রহিল। এইভাবেই বিভিন্ন বিরোধী দার্শনিকসম্প্রদায়সকলের উদ্ভব হইল, তাহারা প্রত্যেকেই বেদকে নিজের মূল বলিল এবং বেদের বাক্যসকলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিতে লাগিল।

তৎসত্বেও প্রাচীন বেদান্তের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি আংশিকভাবে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে তাহাদিগকে পুনরায় একত্রিত করিয়া অন্তর্বোধমূলক চিন্তাধারার সেই প্রাচীন উদারতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। আর সকলের চিন্তাধারার পশ্চাতে, নানাভাবে, মূল প্রত্যয়রূপে থাকিয়া গিয়াছে পুরুষ, আত্মা বা সদ্ ব্রহ্ম, উপনিষদের শুদ্ধ সদ্বস্তু; কখনও বুদ্ধিবিচারের দ্বারা ইহাকে একটি ভাব বা মানসিক অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে, তথাপি তাহার মধ্যে অনির্ব্বচনীয় সত্যের প্রাচীন তত্ত্ব কতটুকু রহিয়া গিয়াছে। যে পরিবর্ত্তনলীলাকে আমরা জগৎ বলি তাহার সহিত এই পরম ঐক্যসত্তার সম্বন্ধ কি, অহং এই জাগতিকলীলার দ্বারা সৃষ্টই হউক বা ইহার কারণই হউক, কেমন করিয়া এই অহং বেদান্ত কথিত সেই সত্য আত্মায় ফিরিয়া যাইতে পারে, আলোচনার প্রয়োজনে আবার ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনেও, এই সকল প্রশ্নের সমাধান লইয়া ভারতের চিন্তা বরাবরই ব্যাপৃত আছে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের
ত্রয়োদশ অধিবেশনে পঠিত

শ্রীঅনিলবরণ রায়

দেবদারু

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

চারিদিকে লতা-গুল্ম দৈন্যভরে মাথা নত করি,
মিশে আছে ধরণীতে আপনার মহিমা বিস্মরি'
এরি মাঝে পূর্ণতার গরবে গৌরবে শির তুলি
সারি সারি দেব-দারু জেগে ওঠে তুচ্ছতায় ভুলি।
দৈন্য রহে পদতলে, দুর্ব্বলতা চলি গেছে দূরে,
ক্ষুদ্রতায় দলি পদে দেবতরু স্থির গর্ব্ব ভরে।
প্রাণের প্রবাহ দেয় সে তরুর তনুতে প্রেরণা
শাখে শাখে কে দিলরে এ সুন্দর ভাবের ব্যঞ্জনা।
পত্রে পত্রে লীলায়িত রসভরা প্রাণের হিল্লোল
কঠিন মৃত্তিকা তলে কে আনিল সাগরের দোল ?
স্নিগ্ধ-শ্যাম অঙ্গ শোভা, গান গায় পাতার মর্ম্মর
আরক্ত বালার্কচ্ছটা অঙ্গে ধরি শোভে দিগন্তর।
এত গুণ সুদুর্ল্লভ তাই বুঝি দেবদারু নাম !
দেবদারু—দেবতরু ! লহ তুমি প্রাণের প্রণাম।

৮

প্রথম যেদিন সাবিত্রীর প্রতি প্রাণভরে চেয়ে দেখেছিলাম, সেদিন ছিল শুক্লা ত্রয়োদশী। শুধু তিথিটাই মনে আছে, তারিখও মনে নাই, বারও মনে নাই। শুক্লা ত্রয়োদশীতে সন্ধ্যার কিছু পরেই আমাদেরই বাড়ীর অন্দর মহলের ছাতের উপরে সাবিত্রী প্রথম এসে দাঁড়িয়ে ছিল আমার জীবন পথে —যেন অবরোধ করে দাঁড়াল আমার জীবনের সরল পথ, আমার জীবনের সহজ গতি।

পূর্ণ ষোলটী বৎসর জীবনের গতি আমার মোটের উপর সহজই ছিল। কেবল ষোল বৎসরের শেষের দিকে এবং ১৭ বৎসরের প্রারম্ভে জীবনের গতিতে একটা চাঞ্চল্য, একটা শিহরণ মাঝে মাঝে উপলব্ধি করতাম। একটা যেন অজানা রহস্যে ভরিয়ে দিত সমস্ত প্রাণখানা। "রমণী"—এই কথাটীর মধ্যেই যেন ভেসে উঠত কি একটা অপূর্ব্ব পুলক, একটা অপরিচিত মায়া—আমার সমস্ত প্রাণখানা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠত একটা সুমধুর আবেগে। রমণীর সংস্পর্শ এতদিন জীবনে পাইনি, চাইওনি। কিন্তু বেশ মনে আছে, যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার পড়ার মধ্যে আমার সমস্ত প্রাণ মন একেবারে ভরপুর, সামনেই প্রবেশিকা পরীক্ষার রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট, রক্তশোষী দৈত্য,—ছুটে চলেছি তারই পানে—হয় তাকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করতে হবে নৈলে তারই হাতে মৃত্যু. তখনও সময় সময়, কিছুক্ষণের জন্য, পড়াশুনার কঠোর কর্ত্তব্য ও দুশ্চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে মন হঠাৎ কেমন যেন উদাসী হয়ে যেত, প্রাণভরা একটা আকাঙ্খার আকুল আবেগে।

রমণীর সহবাস, রমণীর সংস্পর্শ—না জানি কী তার সুখ, কী তার পুলক। যুবতীর অঙ্গে অঙ্গে যে গোপন রহস্য, যে লীলা, তার উন্মোচন, তার পরশ—উঃ—শিউরে উঠতাম, পাগল হয়ে যেতাম কিছুক্ষণের জন্য। তারি মাদকতায়, নিজের মনের হাল ছেড়ে দিয়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণ ভেসে চলে যেতাম কোন এক অজানা পুলকের আকুল সন্ধানে।

একদিন সকালবেলা, প্রবেশিকা পরীক্ষার তখন বোধহয় আর দিন-দশ বারো বাকি, গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে পড়তে হঠাৎ একবার মুখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই চির পুরাতন ছবিটি, সেই আমাদের বাগান, সেই বেগবতী নদীর ওপার, সেই দিগন্তের সীমানা—সকালবেলার রৌদ্রে যেন ঝলমল করছে। এমন সময় হঠাৎ কেন মনে নাই, মনে পড়ল—"বদসী যদি কিঞ্চিদপী দন্তরুচি কৌমুদী।" জয়দেবের এই শ্লোকটী কোথায় কবে কার কাছে শুনেছিলাম স্মরণ নাই। কিন্তু সেইদিন হঠাৎ এই শ্লোকটী মনে পড়াতে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করেছিলাম প্রাণে। মনের মধ্যে ভেসে উঠল সুন্দরী শ্রীমতী রাধা, অভিমানিনী,—মান করে নত মুখে বসে আছে কদম্বের মূলে,—আর তারই কোমল শুভ্র, আলতা পরা পা দুখানি দুহাত দিয়ে চেপে ধরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখের দিকে আকুলভাবে চেয়ে আছেন, কখন ঐ পাতলা ঠোঁট দুখানিতে একটুখানি মৃদুহাসি ফুটে উঠবে।

আহা! কী মধুর মনে হয়েছিল,—কী মধুর এই ছবিখানি। এই মিষ্টি অভিমানটুকু, ঐ শুভ্র কোমল আলতা পরা পা দুখানি, তারই পরশের অপূর্ব্ব পুলক, ঐ মান ভাঙ্গান সরস কথাগুলি, একটুখানি পাতলা ঠোঁটের এতটুকু একটু হাসি, তারই জন্য কাকুতি, মিনতি, সোহাগ আদর,—তুলনা নাই, এর মাধুর্য্যের তুলনা নাই। মনে ভেবেছিলাম অমন দুখানি পা যদি পেতাম, বুকের মধ্যে চেপে ধরে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতাম—আর কিছুরই যেন প্রয়োজন হত না।

এইসব ভাবতে ভাবতে খানিকক্ষণ বোধহয় একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখি মুকুন্দ বই খাতা বগলে নিয়ে, আমাদের পুকুরের পাড় দিয়ে স্কুলের দিকে চলেচে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বই, খাতা, স্কুল,—সামনে ১০ দিন পরেই প্রবেশিকা পরীক্ষা। মনকে চাবুক মেরে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, দন্তরুচী কৌমুদী থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদীর মধ্যে—

অয়ম্, ইমৌ, ইমে
ইমম্, ইমৌ, ইমান্।

প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল। মনে এখন আমার প্রচুর অবসর। ধীরে ধীরে সেই মাদকতা, রমণীর সংস্পর্শের মোহ, কল্পনার মধ্যে আমার সমস্ত প্রাণ মন যেন ছেয়ে গেল। বেশ মনে আছে এক একদিন এক এক রূপ নিত আমার মনের এই প্রবৃত্তি—কল্পনার মধ্যে। কোনও দিন প্রাণের রঙ্গে রঙ্গিন করে ফুটিয়ে তুলতাম মনের মধ্যে আমার মানসী প্রিয়া—একদিন ধরা দেবে আমাদেরই বাড়ীর অঙ্গনে মণ্টী বোঠানের ছোট "জা" এর রূপে। তাকে নিয়ে হয়ত সমস্ত দিনই মশগুল হয়ে থাকৃতাম, কত ছবি গড়তাম, ভাঙ্গতাম আমার মানস পটে। শুব্ধ দুপুরে হয়ত সে নাইতে নেমেছে আমাদের পুকুরের ঘাটে, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ জনহীন, গৌর উজ্জ্বল তার অঙ্গশ্রী আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়েছে পুকুরের জলে একটা অলস ভঙ্গিমায়; আর আমি, আমাদের পুকুরের পশ্চিম পাড়েব তেঁতুল গাছটার উপরে চুপটী করে লুকিয়ে বসে আছি, প্রাণভরে উপভোগ করছি ঐ ছবিখানি—সে জানেও না কিছু। হয়ত বা সন্ধ্যেবেলা, একখানি নীলাম্বরী সাড়ী তার পরিধানে, আমাদেরই অন্দর মহলের একতালায় বারান্দায় আলোর সামনে ঝুঁকে পড়ে পান সাজছে সে, আলতা পরা তার কোমল শুভ্র পাদুখানি হাসিভরা মধুর তার আননখানি, নীলাম্বরীর ফাঁকে ফাঁকে আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে; আমি আমাদের উঠানের এক কোণে, অন্ধকারের আড়ালে চুপটী করে দাঁড়িয়ে দেখছি—সে জানেও না কিছু। তারপর চুপি চুপি পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে, হঠাৎ একেবারে তার সম্মুখীন হয়ে—"ছোট বউ দুটো পান দেওনা খাই" বলে তাকে একেবারে চমকে দিলাম, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সে, হঠাৎ মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে ত্বরিতপদে চলে গেল ঘরের ভিতরে। তারপর রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে বিছানায় অভিমান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল সে; অনেক সাধ্য সাধনার পর কইলে কথা—"ছিঃ তুমি বড় দুষ্টু, অমন করে আমায় লজ্জা দিলে কেন?" আমি হয়ত বললাম "তা ওখানে ত ছিলনা কেউ, লজ্জা কিসের?" হয়ত আবার তেমনি অভিমানের সুরে বললে "ছিলনা বৈকি! পাশের ভাঁড়ার ঘরেই ত দিদি ছিলেন। ছিঃ—কি ভাবলেন বলত।" এইরকম সব কথায় কথায় নানান রকম দুষ্টু আদর আবদারের মধ্য দিয়ে অভিমান হয়ত দিলাম ভাঙ্গিয়ে। তারপর এসে লুটিয়ে পড়ল সেই গৌর সুন্দর তনুখানি আমারই বুকের মধ্যে, আমারই প্রাণের কিনারায়।

কোনও কোনও দিন আমার মন হয়ে উঠত বিশ্ব প্রেমিক। কোনও ব্যক্তিগত সাধনার স্থান থাকৃতই না সেখানে। মণ্টী বোঠানের ছোট 'জা'-এর ছবি, সেদিন একেবারে মন থেকে দূরে চলে যেত। হয়ত কল্পনায়, চলেছি আমি, বেড়াতে বেড়াতে চলেছি, আমাদের গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর ধারে ধারে, গভীর বনের পথে পথে। এমন সময় একখানি নৌকা কোনও দূর বিদেশ হতে ঠিক সন্ধ্যার প্রারম্ভে বেয়ে এল নদীর জলে, হয়ত যাবে কোন্ সুদূরে কোন্ অজানা দেশে। নৌকার দিকে চেয়ে দেখলাম, ছৈকাটা ছোট্ট জানালা দিয়ে আমারই পায়ের দিকে চেয়ে আছে একখানি মুখ—কপালে তার ছোট্ট একটী সিঁদুরের টিপ, মাথায় তার একটুখানি ঘোমটা। হঠাৎ তার চোখ ঘুরে এসে পড়ল আমারই চোখের উপরে, চেয়ে রইল ঠিক সহজ সরল ভাবে, লজ্জায় ফিরিয়ে নিলে না তার নয়ন' দুটো। আমিও চলেছি নৌকার সাথে সাথে,

একদৃষ্টে চেয়ে আছি সেই মুখখানির প্রতি—এখুনই হয়ত নদীর বাঁক ফিরে আড়ালে চলে যাবে। এমন সময় কোথায় ছিল জানি না, ছুটে এল বৈশাখী ঝড়—কাল-বৈশাখীর রুদ্র-রূপে। দাঁড়ি মাঝি নৌকাখানি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল, সামলাতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল নৌকার ছৈ, ঘুরিয়ে উল্টে ফেলে দিল নৌকাখানি। তার-স্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠল রমণীকণ্ঠে একটা নিদারুণ মর্ম্মবাণী।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলাম না, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়লাম জলে, সাঁতরে গিয়ে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম সেই তনুখানি—ভরা যৌবনে পূর্ণ প্রস্ফুটিত—আর এক হাত দিয়ে লড়াই করতে লাগলাম ঝড় ও ঢেউয়ের প্রচণ্ড সংঘাতের সঙ্গে। আকুল হয়ে যুবতী জড়িয়ে ধরল আমার গলা, আঁকড়ে ধরল আমার সারা অঙ্গ। দারুণ বিক্রমে সাঁতার কেটে নিয়ে এলাম তাকে কূলে। চলল সমস্ত রাত দারুণ ঝড় ও বৃষ্টি, কাটিয়ে দিলাম দুজনে সেই প্রলয়রাত্রি বনে এক বিরাট বনস্পতির নীচে।

ভোর হল। ঝড় বৃষ্টি গেছে থেমে। কোথায় ছিল তার আপনার জন, নতুন নৌকায় তারি খোঁজে খুঁজে-খুঁজে এল আমাদেরই কিনারায়। নিয়ে গেল তাকে আবার কোন দূর অজানা বিদেশে। হয়ত আর জীবনে কোনও দিনই হবে না দেখা।

এই রকম ভাবে নিত্য নিত্য নব নব রূপে আমার মন রমণীর সংস্পর্শের জন্য আকুল হয়ে কল্পনার রাজত্বে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু পাশেই সাবিত্রী তার দিকে একদিনও ফিরে চাইনি। তাই প্রথম যেদিন চাইলাম, সেদিন অবাক হয়ে ভেবেছিলাম—আমার বদ্ধ প্রাণখানির একটী একটী করে বাতায়নই এতদিন খুলেছি, দ্বার খুলিনি; তাইত প্রাণের মধ্যে এতদিন সত্য হয়ে, সজীব হয়ে কেউই আসেনি, কেউই বাঁধেনি বাসা।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর, কিছুদিনের মধ্যেই, এক তাসের আড্ডা জমে উঠল আমাদের বাড়ীর অন্দরে। আড্ডাটী জমিয়ে তুললেন মণ্টী বোঠান। তাঁরি উদ্যোগে, দেখতে দেখতে আমিও তাসের নেশায় মসগুল হয়ে উঠলাম।

খেলোয়াড় ছিলাম আমরা চারজন। আমি, মুকুন্দ, মণ্টী বোঠান ও সাবিত্রী। প্রথম প্রথম খেলাটা শনিবার রবিবার দুপুরবেলায় বসত এবং তারপর মুকুন্দর স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটী হওয়ার পর রোজই দুপুরে আড্ডাটী বেশ পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়াল, একদিনও যেন বাদ দেওয়া চলে না। দুপুর ফিরে বিকেল হলে মা যখন ডাকাডাকি করতেন, পরম মনঃকষ্টে আমরা তাসখেলা বন্ধ করতে বাধ্য হতাম এবং মণ্টী বোঠান সবাইকে হলপ করিয়ে নিতেন যে কাল দুপুরে সবাই সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে নেবে।

যেদিনের কথা বলছিলাম, সেই শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে একটা প্রকাণ্ড সুযোগ হল। সেদিন সকালবেলা বাবা জমিদারীর কি কাজে সহরে গিয়েছিলেন—দুই এক দিন থাকবেন সেখানে। সঙ্গে গিয়েছিলেন দাদা। ইদানীং লক্ষ করছিলাম বাবা জমিদারীর কাজকর্ম্মে দাদাকে প্রায়ই সঙ্গে নিচ্ছিলেন, বোধ হয় কাজ কর্ম্ম শেখবার জন্য। রোজই সকালবেলা প্রায় দুঘণ্টা দাদা বাবার সঙ্গে বাবার ঘরে বসে জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখতেন, এবং বাবা আজকাল জমিদারীর কাজে মফস্বল গেলেই দাদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

সকালবেলাই মণ্টী বোঠান ঠিক করেছিলেন যে আজ সন্ধ্যের পরেও একটা লম্বা তাসের আড্ডা বসাবেন। আমি আর মণ্টী বোঠান ত বাড়ীরই লোক। আমাকে দিয়ে মুকুন্দকে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করালেন। এবং যাকে বলে বন্দোবস্ত করলেন, দাদা বাড়ী নেই সাবিত্রী রাত্রে মণ্টী বোঠানের কাছেই শোবে এবং শৈলী ঝি গিয়ে শোবে সাবিত্রীদের বাড়ীতে সাবিত্রীর মার কাছে।

মণ্টী বোঠান আমাদের বাড়ীতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই সাবিত্রী মণ্টী বোঠানের বিশেষ অনুগত হয়ে উঠল। দিনের বেলায় বেশীর ভাগ সময়টাই সাবিত্রী আমাদের বাড়ীতেই থাকত এবং ছায়ার মত নীরবে মণ্টীবোঠানের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত।

এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে এসে কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম সাবিত্রীর সঙ্গে মণ্টী বোঠানের ভাবটা যেন একটু বিশেষ রকমে জমে উঠেছে।

যেদিনের কথা বলছি, দুপুরবেলায় সেদিন যে তাসের

আড্ডা বসেনি, এমন নয়। এবং বিকেল বেলা আড্ডা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঠিক করেছিলাম, সন্ধ্যের পরেই সবাই এসে আবার জড় হব এবং অনেক রাত পর্য্যন্ত তাস খেলা হবে।

সেদিন বিকেলটা আর বাড়ী থেকে বেরুলাম না। মুকুন্দ বাড়ী চলে গেল, সন্ধ্যের পরেই আবার ফিরে আসবে। আমি আমাদের পুকুরপাড়ের ঘাটের উপর খানিকটা বসে ঘোর সন্ধ্যায় যখন আকাশ ছেয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল, ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতরে গেলাম। দেখলাম মন্টী বোঠান মার পুজোর ঘরে মাকে কি সব পুজোর যোগাড় দিচ্ছেন। হঠাৎ বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। ভাবলাম আজ পূর্ণিমা নয় ত? তাহলেই ত সব মাটি! আজ যদি সত্যনারায়ণের সিন্নি হয় ত সন্ধ্যেটাত পুজো করতে আর পুঁথি পড়তেই কেটে যাবে। তাহলে আর খেলা হবে কখন। মন্টী বোঠানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ কি সত্যনারায়ণ?" বোঠান বললেন "না, আজ ত পূর্ণিমা নয়, আজ ত ত্রয়োদশী।" বললাম "তবে এত সব পুজোর আয়োজন?"

বল্লেন "আজ মার একটা ব্রত ছিল কি না।"

"ও:"—বলে একটা স্বস্তির নিঃশাস ছেড়ে ধীরে ধীরে উপরে গেলাম। যাওয়ার সময় মন্টী বোঠান জিজ্ঞেস করলেন "বেড়াতে যাচ্ছেন ঠাকুরপো?"

বল্লাম—"না, ছাদের উপর যাচ্ছি।"

ছাদের উপর গিয়েই মনটা আমার হু হু করে উঠল, কেমন যেন একটা উদাস উদাস ভাব। প্রকাণ্ড ফাঁকা আমার চারিদিকে। মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশে ভেসে উঠেছে ত্রয়োদশীর চাঁদখানি, নিজের রূপে ছড়িয়ে গিয়ে, লুটিয়ে পড়েছে আমার চারিদিকে, আমার সারা অঙ্গে, আমাদেরই ছাদের উপরে, আমাদেরই বাড়ীর আশে পাশে গাছে গাছে মাঠে মাঠে, দূরে বেগবতী নদীর জলে, তার ওপারে আরও দূরে, আরও দূরে, আরও দূরে—একটা গভীর মায়ায় নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলছে দূর দিগন্তের রহস্যের গায়ে গায়ে। হঠাৎ মনে পড়ল মুকুন্দর একটা গানের দু চরণ—

"এমনও রজনী, এমনও জোছনা
নীরালা নদীর তীরে,
যদি আসে যদি বা এসে যদি চলে যায়
কোন্ প্রাণে যাব ঘরে ফিরে—"

কোথায়, কার কাছে মুকুন্দ এই গানখানি শিখেছিল জানি না। অনেকবার তার কাছ থেকে ঐ গানখানি শুনেছি, কিন্তু এখন যেন হঠাৎ আমার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজতে লাগল ঐ সুর, ঐ চরণ দুটী। মনে হচ্ছিল বৃথা, সবই বৃথা; সে যদি না আসে তবে "এমনও রজনী" "এমনও জোছনা" সবই যেন মিথ্যা হয়ে যাবে। ভাবলাম—কে সে কবি, এমন গান লিখেছে, নিজের প্রাণের দরদ দিয়ে প্রাণের চিরন্তন আকুলতাটী এমন করে ফুটিয়ে তুলেছে জোৎস্না রাত্রে নিরালা নদীর তীরে।

কল্পনাস্রোতে প্রাণখানি ভাসিয়ে দিয়ে একটা উদাসী মন নিয়ে চুপ করে গিয়ে বসলাম ছাদের এক কোণে "আলসের" উপরে। কতক্ষণ এইভাবে চুপ করে বসেছিলাম মনে নাই, হঠাৎ দেখি সাবিত্রী উঠে এল আমাদের ছাদে একাকিনী। সাবিত্রীর পরিধানে ছিল একখানি নীলাম্বরী সাড়ী, উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একমাথা চুলে খোঁপা বাঁধা, তাতে জড়িয়েছে সাদা সাদা কি একটা ফুলের মালা। কপালে পরেছে একটী টিপ, কালো না লাল চাঁদের আলোয় ঠিক বুঝতে পারিনি।

সাবিত্রীকে ঠিক এইরকম পরিপাটী হয়ে সাজতে এর আগে খুব কমই দেখেছি—অন্ততঃ দেখেছি বলে ত আমার মনে হয় না। যদিও একথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে সাবিত্রী তার সাজগোজে সব সময়েই ছিল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ ফিটফাট। সাজের একটা এলোমেলো ধরণ সাবিত্রীর মধ্যে বোধ হয় কখনই দেখিনি।

সাবিত্রী বোধ হয় আমাকে দেখতে পায়নি। সে ছাদে এসেই শান্ত ধীর পদক্ষেপে, আমি যেদিকটায় বসেছিলাম ঠিক তার উল্টো দিকে কিনারায় গিয়ে ছাদের রেলিংয়ের উপর ভর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আমিও কোনও কথা কইলাম না। খানিকক্ষণ তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটা চেয়ে চেয়ে দেখলাম। সে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখখানি ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটার মধ্যেই যেন সজাগ হয়ে উঠেছিল তার অসাধারণ অঙ্গশ্রী—সদ্য বিকশিত যৌবনের লাবণ্যটুকু।

আমি চেয়ে চেয়ে হঠাৎ কেমন শিউরে উঠলাম। কেমন যেন একটা পুলক অনুভব করলাম সারা প্রাণে সারা অঙ্গে অঙ্গে। সাবিত্রী ঠিক সেই ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ পরে কি আকর্ষণে জানিনা চুপি চুপি পা টিপে টিপে সাবিত্রীর ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম—ধীরে হাত রাখলাম সাবিত্রীর কাঁধে।

ভেবেছিলাম সাবিত্রী হঠাৎ চম্‌কে উঠবে। "বাপরে" বলে দুহাত লাফিয়ে সরে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য্য সাবিত্রী কিছুই করলে না। ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। শুধু একটুখানি খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে বললে "আমি অনেকক্ষণ টের পেয়েছি।" আমি সাবিত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু কৈ হাতখানি ত সরিয়ে নিলাম না সাবিত্রীর কাঁধ থেকে।

বললাম "কি টের পেয়েছিলে?"

সাবিত্রী বল্‌লে "কেন—তুমি আমার ঠিক পেছনে এসে একটুখানি চুপ করে দাঁড়ালে। তখুনই বুঝেছিলাম যে রকম পা টিপে টিপে এলে তুমি শান্তদা! হয় এইবার আমার চোখ টিপে ধরবে, না হয় আমাকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে চম্‌কে দেবে।"

বললাম "তা কৈ তুমি ত কিছু বল্লে না আমাকে।"

সাবিত্রী বল্‌লে "ভাবলাম দেখিনা তোমার দৌড়টা কতদূর।" জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি জান্‌তে যে আমি ছাদের উপর আছি?"

সাবিত্রী। "হুঁ।"

জিজ্ঞেস করলাম "আমাকে দেখতে পেয়েছিলে?"

সাবিত্রী। "না, তবে আন্দাজ করেছিলাম তুমি কোন দিকটাতে আছ।"

জিজ্ঞেস করলাম "তবে সে দিকটায় গেলেনা কেন?"

সাবিত্রী চুপ করে রইল। উত্তর দিলনা।

আবার জিজ্ঞেস করলাম "তবে সে দিকটায় গেলেনা কেন?"

সাবিত্রী। "খুসী"।

'ভারি দুষ্টু মেয়ে" এই বলে সাবিত্রীর কাঁধ একটু টিপে বোধ হয় একটু নিজের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে-ছিলাম। সাবিত্রী একটুও নড়ল না। ফলে আমিই আরও একটু কাছে এগিয়ে গেলাম।

একটুক্ষণ দুজনেই চুপ চাপ। বুকের গতি আমার তখন ঠিক সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। তাই বোধ হয় কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ বল্‌লাম "তুমি আজ এত সেজেছ কেন সাবি? কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।"

সাবিত্রী হঠাৎ যেন কেমন একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। বড় বড় চোখ দুটো তুলে নিমেষের জন্য চাইল আমার দিকে, আবার তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নিলে। ক্ষণিকের সে চাহনিতে শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে সে চোখ দুটীর গভীর তলদেশে যাই থাক্‌ ওপরে ভেসে উঠেছিল শুধু একটুখানি সলজ্জ হাসি।

তাড়াতাড়ি বল্‌লে "ঐ বৌঠান। কিছুতেই ছাড়লে না। এ সাড়ীত আমার নয়, জোর করে আমায় পরিয়ে দিলে।"

বললাম "বৌঠানই বুঝি খোঁপায় মালা পরিয়ে দিয়েছে?"

সাবিত্রীর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। ক্ষিপ্র হস্তে খোঁপা থেকে মালা খুলতে খুলতে বললে "ঐ বৌঠানই ত"।

আমি সাবিত্রীর হাত দুখানি চেপে ধরে বললাম "থাক্‌ থাক্‌, মালাটী থাক্‌ খোঁপায়।"

সাবিত্রীর হাত দুখানি মাথায় খোঁপার উপরে রয়েছে—ধরা দিয়েছে আমার হাতের মধ্যে। ঘাড়টী বাঁকিয়ে মুখখানি একটু উঁচু দিকে তুলে আমার মুখের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে সহজ সুরে জিজ্ঞেস করলে "কেন?"

বল্‌লাম "রইলই বা।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে "নাই বা রইল।"

বল্‌লাম "মালাটী তোমার খোঁপায় চমৎকার মানিয়েছে সাবি—থাক্‌ না।"

সহজ সুরে বললে—"আচ্ছা থাক।"

এই বলে ধীরে হাত দুখানি আমার হাতের মধ্য থেকে সরিয়ে নিলে। রইল চেয়ে বাইরের দিকে। আমার হাত খানি নেমে গিয়ে আবার ভর দিলে সাবিত্রীর কাঁধে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিন্তু এ আজ আমার কি হোল। সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় যেন তড়িৎ খেলে যাচ্ছিল। একটু আদর মাখান সুরে বল্‌লাম "সাবি বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"

মুখ না ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে "কেন? সেজেছি বলে?"

একটু অবাক হলাম। ভাবলাম বেশ কথা কইতে জানেত সাবিত্রী। পাঁচজনার মধ্যে সাবিত্রীর মুখের কথা ত একরকম শোনাই যায় না। যা দু-একটা বলে তাও অত্যন্ত আস্তে—নিতান্ত যেন পাশের লোকটীর জন্য।

বললাম "শুধু কি একটা, অনেক কারণে।

জিজ্ঞেস করলে "কি কি, শুনি?"

আমি বললাম "প্রথমতঃ, এমন চমৎকার সেজেছ।"

সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লে "সে ত আমার গুণে নয়, বোঠান জোর করে সাজিয়ে দিলে।"

বল্‌লাম "দ্বিতীয়তঃ, আমি ছাদে একলাটী আছি জেনে আমার সঙ্গে গল্প করবার জন্য ছাদে উঠে এলে।"

বললে "উহুঁ—মোটেই নয়: সেও ঐ বোঠান। জোর করে আমায় ছাদে পাঠিয়ে দিলে।"

সত্যি অভিমান হয়েছিল কি না জানি না, একটু অভিমানের সুরে বল্‌লাম "ও, জোর করে, তোমার বুঝি আসার ইচ্ছে ছিল না ছাদে?"

একটুও ইতস্তত না করে বল্‌লে "না।"

বল্‌লাম "কেন? আমি ছাদে ছিলাম বলে বুঝি?"

বল্‌লে "ভাবিইনি সে কথা।"

বল্‌লাম "তবে ইচ্ছে ছিল্‌না কেন?"

বল্‌লে "সইমা ত উপোস করে আছেন, বোঠান একলাটী সব কাজ করছেন। ভেবেছিলাম বোঠানের সঙ্গে সঙ্গে থাকব। যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।"

এ কথার জবাব নাই। চুপ করে রইলাম। হঠাৎ সাবিত্রী জিজ্ঞেস করলে "এই দুটো কারণ ত?"

আমি বললাম "তারপর আমার কথা রাখলে, মালা নামালে না খোঁপা থেকে।"

বললে "কি করব। তোমার সঙ্গে কি আমি জোরে পারি শান্ত দা।"

বোধ হয় একটু অভিমানের সুরেই বললাম "বেশ। আমি আর জোর করবনা কথা দিচ্ছি। নাও, নামিয়ে নাও মালা।"

সাবিত্রী যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি রইল। কিছুই করলে না।

বললাম "কৈ নিলে না মালা নামিয়ে?"

বললে "এখন আর ইচ্ছে করছে না।"

আবার আমায় চুপ করিয়ে দিলে। আমি বোধহয় কেমন করে কোনও একটা ফন্দীতে সাবিত্রীকে আরও একটু কাছে টেনে নেওয়া যায় এই ভাবছিলাম। এমন সময় সাবিত্রী বললে "দেখলে ত শান্ত দা। তুমি যে সব কারণ দেখালে তার একটাও সত্যি নয়।"

আমার হাতখানা তখন সাবিত্রীর কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে গলার কাছে নেমেছে। আর একখানা হাত ঘুরিয়ে নিয়ে সেই হাতখানির সঙ্গে মিলিয়ে দিলাম। মুখ আমার একটু নীচু করে বোধ হয় বেশ একটু আদরের সুরে বললাম "তা তুমি কি লক্ষীটী নও সাবি?" টুক্ করে একটু নীচু হয়ে নিজের মাথাটা আমার বাহু দুখানির মধ্য দিয়ে গলিয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে সোজা চাইল আমার মুখের দিকে। মৃদু মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বল্‌লে "উহুঁ—হাড় দুষ্টু।"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ছুটে ছাত থেকে নীচে নেমে গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশ গুপ্ত

নৃত্য ও নৃত্যনাট্য

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ

নৃত্যের উপাদান সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একতান লাস্য; প্রাণময়, স্বচ্ছন্দ, চঞ্চল অথচ সঙ্গত গতি। নৃত্যের বাহন মানুষের সৃষ্ট ভাষা নয়, বা পাষাণ, মৃত্তিকার মত জড় আর একটা বিজাতীয় কিছু নয়; যাকে আয়ত্ত করবার মধ্যেই স্বাধীনতার বাধা থাকবে, প্রকাশের ব্যর্থতা থাকবে, অন্তরের কুণ্ঠা থাকবে। সেখানে জড়ের সঙ্গে চেতন মনের ছন্দের মিল পেতেই যেন একযুগ কেটে যায়; হঠাৎ কখনও প্রতিভার বিদ্যুৎ শিহরণের নাড়া খেয়ে যেন জড়ের মধ্যে একটা শক্তির সঞ্চার হয়, জড়তার ভার যায় কেটে, সে অতি অনায়াস চাঞ্চল্যে আত্মসমর্পণ করে। নৃত্যের বাহন কিন্তু প্রাণবান্ দেহ, যেন মনের একখানি নিখুঁত সুন্দর আদর্শ, যাতে মনের সামান্য একটি ভাবও তার চিহ্ন প্রতিফলিত না করে' গোপন থাকতে পারে না। আর মানুষ নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে সচেতন হয় দেহের অনুভূতি দিয়ে, কারণ সে নিজের সত্তাকে মান্ধাতারও অতীত যুগ থেকে দেহের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িয়ে দেখতেই অভ্যস্ত। দেহের সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তিই তাহার নিজের পরিচয়ের প্রথম সূত্র ধরিয়ে দেয় এবং সভ্যতার অতি আদিম অবস্থায় তার বেশী কোন পরিচয়ের জন্য সে আদবেই সন্ধানী নয়। জীবনের গোলোকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়ানেই তার আনন্দ, জীবনের পরিপূর্ণ, উচ্ছল, ক্ষুব্ধ আবর্ত্তের আবিলতায় ভেসে যাওয়াই তার প্রকৃতি। 'দিগন্তে বিলীন' মরুপথের সে যাত্রী গভীর অরণ্যানীর কোলে সে দুরন্ত শিশু, অনন্ত চলার আনন্দে সে চঞ্চল। কিন্তু শুধু তখন কেন, তারও পূর্ব্বে যখন মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করবার মত ভাষা ছিল না, তখনও তার সহায় ছিল ইঙ্গিতের সঙ্কেত। দেহকে ভাবপ্রকাশের একমাত্র কারণ বলে' মেনে নেওয়া ছাড়া তখন তার উপায় ছিলনা। আর তাতে তার কোন অস্বস্তিও ছিল না। কারণ, তার অভাব ছিল স্থূল, তার আনন্দ ছিল স্থূল, যদিও আনন্দের উপলব্ধি ছিল ব্যাপক (pervasive)। তার অনুভূতিময় জীবনের কেন্দ্রচ্যুতির কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, তার বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টি বা পরিপূর্ণতা ছিল না। তাই নৃত্যের আনন্দই ছিল তার সর্ব্বস্ব; এবং তাতেই তার ছিল পরিতৃপ্তি।

ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল, ততই যেন মানুষের মস্তিষ্কের বুদ্ধিস্তরটা বায়ুস্তরের মত rarefied অর্থাৎ লঘু হ'তে লাগল; অনুভূতির মধ্যে, প্রতিক্ষণের আনন্দের মধ্যে সে ডুবে থাকতে পারলে না। ভবিষ্যতের নানা সমস্যা এসে পড়ল; আর সেই সঙ্গে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে একটা বিক্ষেপ (reaction) অনুভূতির দিকটাকেও সংস্কৃত এবং মার্জ্জিত করে' তুলল। ফলে সে নৃত্য ছাড়াও আরও অনেক কলা-বিলাসের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দের সন্ধান পেল, যেন আনন্দের পাঁচালী ভেঙ্গে কাব্য, মহাকাব্য গড়ে' নিতে চায়। ভাষার সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠব, ধ্বনি তাকে মাতিয়ে তোলে একটা নাড়ীর টানে।

তবুও ভাবপ্রকাশের উপযোগিতা চলে' গেলেও ইঙ্গিতের মধ্যে যে গতির আনন্দ ছিল, নৃত্যের মধ্যে যে নিবিড় আনন্দের উৎস ছিল, তাকেও সে মার্জ্জিত রূপান্তরিত করে' আর্টের পর্য্যায়ে এনে ফেলল। ফলে অনেক ক্ষেত্রে লোক-নৃত্যগুলির মধ্যে যে সজীব স্বচ্ছন্দতা ছিল, তাতে একটা জ্ঞানতঃ আড়ষ্টভাব এসে গেল; আনন্দের অভিব্যক্তিই তার চরম কাম্য হ'লনা; হ'ল পায়ের অঙ্গুষ্ঠের ওপরমাত্র ভর দিয়ে কেমন ক'রে ভারসমতার (balance) কসরৎ দেখান যায়; মুখে চোখে কেমন expression দিলে দেহের অভি-ব্যক্তি সুন্দর হয়।

কিন্তু ভাষার মধ্যে মানুষের ভাবের কতটুকু ধরা পড়ে। কোন দুঃসহ বেদনা, কোন অপরিসীম সুখ বা দুঃখ, কোন

গভীর আকুল অনুভূতি যখন আমাদের অভিভূত করে, তখন ভাষায় তাকে প্রকাশের জন্য ব্যগ্রতা থাকে না; কারণ, আমাদের দেহাবয়বের কুঞ্চনে প্রসারণে, মুখ চোখের কাতর বা আনন্দোজ্জ্বল ব্যঞ্জনায় তাহা অতি দুর্ব্বার আবেগে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। এখানে ভাষা যত সুন্দর, সাবলীল হোক না, তা যেন অতি দুর্ব্বল, পঙ্গু। আর তা ছাড়া আমাদের সাধারণ অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশ করবার সময়ে ভাষার অক্ষমতায় পদে পদে ঠেকতে হয়। কিন্তু দেহাবয়বের ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায় ভাবগুলি যেন আপন সহজ, স্বাভাবিক রূপ পায়।

তাই নৃত্যের আকর্ষণ আমাদের কখনও ঘুচবে বলে' মনে হয় না। আমাদের চিন্তা বা ভাবগুলির মধ্যে যে কম্পন, যে ছন্দ, সুর এবং দোলা আছে, চিন্তার পর চিন্তা এসে ক্ষণে ক্ষণে হাসিতে অশ্রুতে, ঝঞ্ঝার ক্ষোভে, কুসুমের পেলব দোলনে আমাদের যখন আচ্ছন্ন করে, তখন সেই মূর্ত্ত, সচল ভাব-রাশির ছন্দ ও সুরকে আমাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবোধের প্রেরণায় দেহের গতির তরঙ্গে রূপায়িত দেখবার আনন্দ, শুধু শিল্পীর কেন, প্রায় সাধারণের মধ্যেই থাকবে।

আর এইখানেই নৃত্যের সঙ্গে ইঙ্গিতের (Gesture) বিশেষত্ব। নৃত্যে যখন কোন একটা মনের ভাবকে রূপ দেওয়া হয়, তখন তা সমগ্র ব্যক্তির সত্তাকে প্রকাশ করে; ছড়ান, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বটা সেই অভিনয়ের রূপে (action এ) কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু ইঙ্গিত শুধু ব্যক্তির কোন একটা দিক দেখিয়েই সন্তুষ্ট, সমগ্র সত্তার (Personality) অপেক্ষা রাখে না, আর সে জন্য তাহাতে নৃত্যের মত চিন্তার গভীরতা থাকে না।

এই ভাবে নৃত্য ও নাট্যের সম্বন্ধ অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ, কারণ ভাষাহীন, ব্যক্তিত্বপ্রধান অভিনয়ই হ'ল নৃত্য। উচ্চ-অঙ্গের নৃত্য কেবল কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুন্দর সহজ, এলোমেলো বিক্ষেপমাত্র নয়; তা কতকগুলি ব্যক্তিত্ব-বিকাশক ভাবপরম্পরার সঙ্গত গতির বা স্থিতির লীলায়িত রূপ। এই ভাব-পরম্পরাগুলি নাট্যে অনুভূতিমূলকও (emotional) হ'তে পারে, আবার সমস্যামূলকও (intellectual) হ'তে পারে কিন্তু নৃত্যে সমস্যার মোটেই স্থান নেই; স্থান আছে শুধু অনুভূতির। তবে এই অনুভূতিগুলি আবার স্থূল অর্থাৎ আদিম (primal বা primitive) হ'তে পারে, আবার সূক্ষ্মও হতে পারে এবং লোকনৃত্যের সঙ্গে অধুনাতন নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্যই এই যে, অনুভূতিগুলি ব্যাপক হলেও সূক্ষ্ম ও রসগর্ভ (Subtle emotions)।

আমরা উদয়শঙ্কর ও তাঁহার দলের নৃত্যকে দৃষ্টান্তরূপে নিয়ে অনুভূতির স্থূলতা, সূক্ষ্মতা বলতে এবং সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ নৃত্য বলতে কি বোঝায় তা পরিষ্কার করব। প্রথমেই উদয়শঙ্করের দলের নৃত্যগুলির মধ্যে একটা প্রকার ভেদ বেশ চোখে পড়ে; 'ব্যাধনৃত্য' যে পর্য্যায়ের 'গঙ্গাপূজা' বা 'রাধাকৃষ্ণ' নৃত্য সে পর্য্যায়ের যে নয় তা অতি সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এই পর্য্যায়ভেদের অন্তরালে সমাজের স্তরভেদে অনুভূতির যে একটা বিবর্ত্তন আছে, সেই কথাটাই একটু সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করা দরকার।

পূর্ব্বেই বলেছি, নৃত্য ছিল মানবের আদিম আনন্দের উপাদান; সেই আদিম আনন্দকে প্রকাশ করবার ভাষা তার ছিল না; কিন্তু সেই আদিম বন্য জীবনের যে চঞ্চল একটানা স্রোতের আবর্ত্তে তাকে ভাসতে হয়েছে, সেই বন্য পশুপাখী সরীসৃপের সঙ্গে সংগ্রামের, বশীকরণের যে জীবন তার গতির ছন্দকে ধরা যায় কিরাত-নৃত্যে, সাপুড়ের নৃত্যে। ইহা নৃত্যের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় স্তরে মানব নিজের দিক ছেড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দিকটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করে; সে চায় ফুলের যে প্রকাশের ব্যগ্রতা তাকে প্রকাশ করতে, ঝড়ের ব্যঞ্জনা ফোটাতে; ঢেউয়ের ভঙ্গীতে নিজের অঙ্গ-বিলাসকে ছড়াতে চায়। এই স্তরটি ফুটে উঠেছে 'ফুল কুড়ান'র নৃত্যে, গঙ্গার ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার নৃত্যে।

তৃতীয় স্তরে মানব যখন অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলির সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন তাদের নৃত্যের রসে রসায়িত করে' অনুভব করতে চায়। এই স্তরটী ফুটে উঠেছে 'রাধাকৃষ্ণ', 'গঙ্গাপূজা', প্রভৃতি নৃত্যে-যেখানে প্রেমের, ভক্তির গভীর অনুভূতি প্রাণকে উদ্বেল করেছে। এই ভাবে অনুভূতিগুলি ক্রমশঃ অন্তর্মুখীন হ'য়ে সূক্ষ্ম রসাস্বাদের ব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে।

এই সকল ভাবস্তরের মধ্যেই নৃত্যের আনন্দ পেতে হ'লে চাই ভাষার নীরবতা। আমরা আমাদের অঙ্গভঙ্গীকে

ভাষার বাহন করতেই অভ্যস্ত। তাছাড়া আমাদের প্রকাশ করবার ব্যথার সে আদিম অনুভূতি নেই। শিশুর যেমন জগতের সঙ্গে পরিচয় করবার মধ্যে ভাষার দিক দিয়ে একটা ব্যর্থতা ও ব্যগ্রতা আছে, আমরা তা হারিয়েছি। আর্টিষ্টের কাছে, বিশেষতঃ নৃত্যশিল্পীর কাছে এই প্রকাশের ব্যগ্রতা নূতন করে জাগে। তাই নৃত্যের আদিম স্থূল অনুভূতিগুলিও যেমন তাঁর আয়ত্বে, সভ্যতার বিবর্তনে পাওয়া সুকুমার ভাবগুলিও তেমনি তাঁর আর্টের সামগ্রী; সেগুলিরও প্রকাশের দাবী তাঁর কাছে কিছু কম নয়। আর বস্তুতই যখন আমরা আমাদের সেই আদিম অনুভূতিগুলিকে আর সেই দেশকালের সন্নিবেশে পাব না, তখন কল্পনায় সেই সমস্ত অনুভূতির idea গুলিকে রুদ্র, করুণ, ভয়ানক প্রভৃতি রসের আকারে আকারিত করাই হবে শিল্পীর কাজ।

কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের কাছে ideaগুলোর যেন বিশেষ কোন সত্তা নেই; তারা যেন কতকটা বাষ্পময়, ধোঁয়াটে পদার্থের মত আমাদের অন্তরাকাশে ভেসে বেড়ায়। হয়ত জগতের সঙ্গে মনের ব্যবহারের উপযোগী করবার তারা সহায়মাত্র। বাহিরের বস্তুটাই আমাদের সর্বস্ব; আমরা একান্তই বহির্মুখ। কিন্তু যখন কল্পনার সম্মোহন স্পর্শে ideaগুলো জীবন্ত, মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তখন যেন তারা পাক খায়, নাচতে থাকে, চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারাই যেন এক একটা concrete image। উদয়শঙ্করের বৈশিষ্ট্যই এই যে তিনি এই concretised ideaকে (মূর্ত্তভাবকে) প্রধান করেছেন; আর দেহের গতিচ্ছন্দকে শুধু তাঁর medium অর্থাৎ বাহন হিসাবে রেখেই ক্ষান্ত। এক একটা সমগ্র ঘটনা-সংস্থানের (situation) ভাববৈচিত্র্য, আমরা যদি একটু কল্পনাপ্রবণ হই, তাহলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট ও মূর্ত্ত হয়ে ওঠে এবং তখন ভাব মূর্ত্তিগুলিকে দেহের ভাষায় প্রকাশ করবার প্রেরণা যে শিল্পীর কতটা দুর্নিবার হয়ে পড়ে তার উপলব্ধি করিতে পারি। উদয়শঙ্করের এবং যে কোন শ্রেষ্ঠ নৃত্য-শিল্পীর নৃত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অর্থই আমাদের অন্তরের ভাবমূর্ত্তিগুলির গতি, শ্রান্তি, চঞ্চলতা, উচ্ছলতার প্রত্যক্ষ করা। ভারতীয় নৃত্যকলার ইহাই বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণেই ইহার রসানুভূতি আমাদের এমন সমগ্রভাবে আচ্ছন্ন করে।

তাহলেই শ্রেষ্ঠ নৃত্যের অর্থই হচ্ছে ভাবের দিক দিয়ে দেহের ভাষায় একটা সমগ্র ঘটনা-সংস্থানের ঘাতপ্রতিঘাত বা দ্বন্দ্ববৈচিত্র্য, ফুটিয়ে তোলা। আর যখন বহু ঘটনা-সংস্থানের বৈচিত্র্য বহু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হবে, তখন তা' নৃত্যের পর্য্যায় থেকে নৃত্যনাট্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হবে ইহাই স্বাভাবিক—যদিও এই পরিণতি নাট্য-কলার দিক থেকে কতদূর সঙ্গত তা' বিচারসাপেক্ষ এবং পরে আমরা এ বিষয়ে বিবেচনা করব।

পূর্ব্বে বলেছি—ভাষাহীন ব্যক্তিস্বতন্ত্র অভিনয় হ'ল নৃত্য। বিখ্যাত আইরিশ কবি ও নাট্যকার ইটস (Yeats) কিন্তু ভাষার লালিত্য ও ব্যঞ্জনাসৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার সঙ্গে নৃত্যকে মেলাতে চান। ইটস্ তাঁর নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা এইভাবে করতে ইচ্ছা করেন—আমি চাই এমন একটা মায়াময় রূপপরিণতি যা, যারা তাকে বুঝবে, তাদের সর্ব্বদাই অতিশয় প্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেবে—সাক্ষাৎ অভিধার সামর্থ্য দ্বারা নয়, ব্যঞ্জনার দ্বারা—সেই রূপপরিণতি গতি, বর্ণ ইঙ্গিতের সমাবেশ, তা' বুদ্ধিবৃত্তির মত দেশব্যাপক নয়, কিন্তু একটা স্মৃতির সুর ভবিষ্যতের বাণী। [১] এখানে নৃত্যকে তিনি কি ভাবে এবং কতটুকু মেশাতে চান তা বুঝতে হ'লে তাঁর "Four plays for Dancers" বলে যে চারিটি নৃত্যনাট্য আছে তাদের কলারীতির বিচার করতে হয়। যা করবার স্থান এখানে হবে না। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, নৃত্যকে তিনি ব্যঞ্জনারূপ শব্দবৃত্তির অন্যতম উপকরণরূপে ব্যবহার করতে' চান—যেখানে নৃত্য

(১) "I desire a mysterious art, always reminding and half-reminding those who understand it of dearly loved things, doing its work by suggestion, not by direct statement, a complexity of rhythm, colour, gesture, not space pervading like the intellect, but a memory and a prophecy."

Plays & Controversies পৃঃ ২১৩

অতীতের প্রতীকাময়র সৌন্দর্য্যকে পুত্তলিকার মত অঙ্গচালনায় একটা নিরুদ্দেশের আভাস দিয়েই ক্ষান্ত, যেখানে নৃত্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য নেই। আছে আবহাওয়ার একটা স্বপ্নসুন্দর অনুভূতি। কিন্তু এ রকম যে নৃত্য তা' ইঙ্গিত অভিনয়েরই নামান্তর মাত্র। বস্তুতঃ তিনি ঠিক কি ধরণের নৃত্যকে নৃত্যনাট্যের অঙ্গীভূত করতে' চান, তা স্পষ্ট করে' বোঝা যায় না। "Four plays for Dancers" এর ভূমিকায় তিনি এই নৃত্য সম্বন্ধে বলেছেন—"আমি যদি অভিনয়গুলির প্রযোজনা ও পরিদর্শনের জন্য সম্যক্ চেষ্টা করি তাহলে নৃত্য অংশ নিয়েই আমাকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে বেশী, কারণ আমি মাত্র অস্পষ্টভাবেই জানি ঠিক আমি কি চাই। বর্ত্তমানে প্রচলিত রঙ্গমঞ্চের নৃত্যধরণ আমি চাই না—এমন কিছু চাই যাতে প্রকাশবৈচিত্র্যের পর্দ্দা থাকবে কম, যা আরও সংযত ও আত্মসংহত হবে—দর্শকদের বা সামাজিকদের কাছ থেকে হস্তমাত্র ব্যবধানে থেকে অভিনেতাদের পক্ষে তাই হবে শোভন। (১) তাঁর মতে এ নৃত্যের সঙ্গে মানুষের ভাষার কোন বিরোধ নেই। তিনি আয়র্লণ্ডের গ্রাম্য ভাষার রীতিতে যে ভাব প্রকাশের ব্যঞ্জনার শক্তি দেখেছেন, তাতে ভাষার একটা ব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে বিশেষ করেই আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি ভাষার অবিরোধী যে নৃত্যকে ধরতে চান তা একটু উন্নত ধরণের ইঙ্গিতাভিনয়। আমরা যে ভাবে শ্রেষ্ঠ নৃত্য ও ইঙ্গিতাভিনয়ের পার্থক্য দেখিয়েছি তাতে নৃত্যমাত্রই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সমগ্র, সহজ স্ফূর্ত্তি; আর এ রকম নৃত্যের সঙ্গে ভাষার, নৃত্যকলার দিক দিয়ে কোন আন্তরিক যোগ নেই।

এই কারণেই যেখানে যেখানে ভাবের গভীরতা ভাষার অতীত সেই সব স্থলে বিখ্যাত প্রযোজক ও শিল্পী টেরেন্স্ গ্রে (Terence Gray) নৃত্যকে আনতে চান। তিনি বলেন—নৃত্যনাট্যের সীমানা আরম্ভ হয় যখন কোন নাটকে শব্দের পরিবর্ত্তে গতি দ্বারা নাটকের প্রকাশের পরিধিকে বিস্তৃত করবার চেষ্টা করা হয় বিশেষ কোন কোন মুহূর্ত্তে যেখানে অনুভূতিগর্ভিত কোন ঘটনাসংস্থান পর্য্যাপ্তভাবে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, এবং রসানুভূতিগুলির প্রকাশের বাহনরূপে ভাষা কুলিয়ে ওঠেনা, তার ফলে এই সমস্ত ঘটনাসন্ধির স্থলে আদিম অনাড়ম্বরতার দিকে ফিরে যাওয়াই স্থির করতে হয় এবং সেই ভাবানুভূতিগুলিকে শুধু দেহের গতিশীলতার দ্বারা প্রকাশ অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে।.. (২) আর একেবারে বাক্যহীন আলাপবিমুক্ত নাটককেই তিনি নৃত্যনাট্যের চরম কৃতিত্ব ও পরিচয় 'The purest form of this branch of the art of the theatre" বলে' অভিনন্দিত করতে চান। কিন্তু এই রকম নৃত্যমাত্র সম্বল নৃত্যনাট্যে প্রত্যেক অভিনয়ের মুহূর্ত্তটিই কি চরম গভীরতম হ'য়ে ফুটেছে? যদি তাই হয়, তাহ'লে নৃত্য অর্থেই যে ব্যক্তির অর্থাৎ চরিত্রের সমগ্রসত্তার বিকাশ (যা আমরা বলতে চাই) তাকেই মেনে নেওয়া হ'ল—অর্থাৎ জীবনের সব মুহূর্ত্তগুলিই সমান intense এবং deep না হ'লেও নৃত্যরসের দিক দিয়ে দেহের গতিলাস্যে সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশের দিক্ দিয়ে একটা অনুভূতির

(১) "Should I make a serious attempt to arrange and supervise performances, the dancing will give me most trouble, for I know but vaguely what I want. I do not want any existing form of stage dancing; but something with a smaller gamut of expression something more reserved, more self-controlled. as befits performers within arm's reach of their audience."

(২) "The limits of Dance-Drama commence with a play in which an attempt may be made to widen the scope of dramatic expression by substituting movement for words at certain moments, when an emotional situation becomes sufficiently intense and words cease to be an adequate medium wherewith to express the feelings and there is suggested instead a reversion to primitive simplicity at such crises and that the emotions in question should be expressed by movement of the body alone.

Dance Drama পৃঃ ৫৬

পৃথক সার্থকতাকেই মেনে নেওয়া হ'ল, যার সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক বিশেষ আছে বলেই মনে হয় না।

আর তাহ'লেই নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে স্পষ্ট কোন রেখা টানা অস্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ, ঘটনা সংস্থানের (situation) একত্ব বা বহুত্বের উপর নৃত্যনাট্যের সঙ্গে নৃত্যের বিশেষত্ব তেমন নির্ভর করে না। নিদর্শনরূপে উদয়শঙ্করের সুপরিচিত 'রাধাকৃষ্ণ' নৃত্যটি ধরা যাক্। এখানে পূর্ব্বরাগ বিরহ মিলনের যে ভাববৈচিত্র্য ও রসমাধুর্য্য আমাদের অনুভবে আসে, তার সঙ্গে নানা ঘটনা-সংস্থান বিভিন্ন "dramatic action"এর এক ভাষা ছাড়া কোন অংশেই পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় না। মনে হয় তাঁর নৃত্যকে নৃত্যনাট্য বলাই বেশী সঙ্গত হবে। কিন্তু এই ভাবে নৃত্যনাট্য কথাটির নাটকীয় রীতিহিসাবে এমন কোনবিশেষ মর্য্যাদা থাকে না যার জন্য তাকে নৃত্যকলার বিকাশ বলে' না দেখে নাট্যকলার আর একটা বিস্তৃতি বলে' দেখা যায়। তাই মনে হয় আইরিশ কবি ইটস্ যে ভাবে নৃত্যনাট্যকে আকারিত করতে' চান, তার ভিতর নাট্যরসের দিক হ'তে এমন একটা আরও উন্নত সঙ্গতি কল্পনা করা যায়, যাকে বস্তুতই নাট্যকলার অঙ্গরূপে মেনে নেওয়া যায়। আর তাঁর মার্জ্জিতরুচি ইঙ্গিতপ্রধান যে নৃত্যকে তিনি ব্যঞ্জনার সহায়ক বলে' মানতে চেয়েছেন, তাতে আমাদের মতে নৃত্যকলার নৃত্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য না থাকলেও, তার সঙ্গে যে ভাবের সঙ্গতি কত সুন্দর ও প্রাণবান হ'তে পারে তা তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি পড়লেই অনুভব করা যায়। আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাঁর ইদানীং প্রযোজিত 'নবীন' প্রভৃতি নাটকে আবৃত্তি, গান ও নৃত্যকে নাট্যকলার সঙ্গতিতে আনতে চেয়েছেন; তবে তিনি নৃত্যের নৃত্যকলানুসারী স্বাধীনতা অব্যাহত রাখারই পক্ষপাতী বলে' মনে হয়।

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়

নিষ্কলুষ আত্মারে প্রণাম

শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায় এম-এ

চলার পথের পরে দেখেছিনু ভীরু এক মেয়ে,
ধরণীর শোক যার হাসিটুকু ফেলেনিক ছেয়ে,
দম্ভ যারে করেনি পরশ,—
যৌবনের মিছে মান ভাঙে নাই মনের হরষ!

এমনই চলার পথে দেখেছিত কত শত আঁখি,
প্রাণের উচ্ছ্বাসে তারা সযতনে রেখেছেরে ঢাকি,
গাম্ভীর্য্যেরে করেছে বরণ,—
বয়সের সাথে সাথে সারল্যের হয়েছে মরণ!

ভাল তারে বাসি নাই, ভাল তবু লেগেছিল তারে;
তার স্মৃতি মনে মোর জাগে আজও জাগে বারে বারে,
কালো আঁখি ভীরু এক বালা,—
নীরবে গোপনে তাই তারই গলে দিনু' মোর মালা।

এ মালা প্রেমের নয়—কামাতুর হৃদয়ের দান,
ভাল তারে বেসে ভাই, করি ন'ই কভু অপমান;
নিষ্কলুষ আত্মারে প্রণাম—
এ মালার বিনিময়ে চাহিনাগো তাই কোন দাম!

প্রেতপুরী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—এক—

(কয়লার গুঁড়া বিছানো কয়লাকুঠির পথ। পথের উপর দিয়া মোটাসোটা বেঁটেগোছের এক ভদ্রলোক বাইক হাতে লইয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিতেছিলেন, আর এক ভদ্রলোক তাঁহার কাছে আসিয়া নমস্কার করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। দূরে সাঁওতালী কুলি-ধাওড়া হইতে মাদল ও বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাইতেছিল।)

—নমস্কার। ম্যানেজার বাবুর বাসা কি এইটে?

—নমস্কার। আজ্ঞা না। এডা আমাদের কর্ম্মচারীদের মেছ্। আপনি বুঝি এহানে—এই কলিয়ারীতে নতুন ডাক্তার হইয়া আলেন, না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! কাল এসেছি।

—কিসের লাগ্যা এলেন মশাই? ভূতে যেদিন দেবে ঘাড়ডা মটকাইয়া সেদিন বুঝবেন ঠ্যালা।

—আজ্ঞে না, ভূত টুত আমি মানি না।

—ভালো! আইছেন ত আইছেন. কিন্তু সাবধানে থাকবেন দাদা। ভূতের ভয়ে রাত্তিরে এহানে থাকতে পারি না মশাই। সাইকেল কইরা সেই সকালে আইছি আর এই চললাম। অন্ধকার হয়্যা এলো দ্যাহেন না!—এইডা এইডা ম্যানেজারের বাংলা। কড়া নাড়েন। আমি চললাম। নমস্কার।

(বাইকের ঘন্টার শব্দ)

(কড়া নাড়ার শব্দ)

(বাড়ীর ভিতর হইতে)—কে?

—দরজা খুলুন।

—ডাক্তারবাবু! আসুন, আসুন, রাত্তিরে এলেন যে? বসুন।

—না আর বসবো না ম্যানেজারবাবু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা কথা জিজ্ঞেস করে যাই। আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, শুনছি এখানে সবাই বলছে—ভূতের দৌরাত্ম্যে টিঁকতে পারবেন না। ব্যাপারটা কি বলুন ত মশাই?

ম্যানেজার—(হাসিয়া) ভূত! হুঁ, সবাই সেকথা বলে বটে! বসুন তাহলে বলি।

ডাক্তার—বলুন। বসেছি।

ম্যানেজার—শুনুন। সে আজ অনেকদিনের কথা। বছর চার পাঁচ আগে। ভীষণ বর্ষা মশাই। চার পাঁচদিন ধরে সমানে বৃষ্টি। সিঙ্গারণ নদীতে বান এলো। হড়পা বান! ভাবলাম এমন কী আর হবে। এমন ত প্রতি বছরই আসে। আমার আবার কাছেই সিঙ্গারণ কিনা! দু'নম্বর পিট-খাউথের পাশেই। সকালে একবার খাদের দিকে গেলেই দেখতে পাবেন।

ডাক্তার—দেখেছি। আপনি বলুন।

ম্যানেজার—দেখেছেন? বেশ, বেশ। ওই সিঙ্গারণই আমার সর্ব্বনাশ করেছিল। দুপুরে খেয়ে দেয়ে চাপাচুপি দিয়ে একটু খানি শুয়েছিলুম। একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে—নদীর বাঁধ গেছে ভেঙে। সর্ব্বনাশ! বাঁধ ভাঙলে আর রক্ষা আছে! তৎক্ষণাৎ ছুটতে ছুটতে খাদের মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। উঃ, নদীর সে কী মূর্ত্তি মশাই! সিঙ্গারণের সেরকম ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমি কখনও দেখিনি। দেখলুম—হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্ করে খাদের মুখে জল ঢুকছে। সমস্ত নদীটা যেন খাদের ভেতর ঢুকে পড়তে চায়। বললাম—চালাও পাম্প! কিন্তু একটা পাম্পের আর কতটুকু ক্ষমতা। এদিকে খাদের নীচে তখন জন-ত্রিশেক লোক। দু'নম্বরের মুখ দিয়ে লোকগুলো যদি তাড়াতাড়ি উঠে আসতে পারে তবে মঙ্গল। লিফট-কেজ নীচে নামিয়ে রাখলাম। কিন্তু না, আধঘণ্টা পার হয়ে গেল, এক ঘণ্টা গেল, দু'ঘণ্টা গেল,

কেউ আর উঠলো না। চালু 'সিমে' কাজ হচ্ছিল। জল গিয়ে সেইখানেই জমেছে। বুঝলাম—কেউ আর বেঁচে নেই। প্রাণপণ চেষ্টায় নদীর বাঁধ বেঁধে পাম্প করে জল মারতে দু'দিন লাগলো। নীচে গিয়ে দেখলাম—সব শেষ। স্বামী স্ত্রীতে জড়াজড়ি করে উঠে আসছিল, তেমনি জড়াজড়ি করেই ডুবে মরেছে। বাপ ধরেছে ছেলেকে জড়িয়ে; মা ধরেছে মেয়েকে। বাস্ সেই থেকে লোকের বিশ্বাস এতগুলো লোক যেখানে মরেছে সেখানে ভূত নিশ্চয়ই আছে। বুঝলেন? এই জন্যেই লোকে ভূতের কথা বলে, আর কিছু না।

ডাক্তার—(হাসিয়া) ও, এই।

ম্যানেজার—(হাসিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, এই।

ডাক্তার—যাক্, এইটুকুই জানতে চেয়েছিলুম। চলি। কাল দেখা হবে।

ম্যানেজার—লণ্ঠন নিয়ে যান। বাইরে অন্ধকার যে।

ডাক্তার—না, আর লণ্ঠনের দরকার নেই। এই ত' আম-বাগানটা পেরিয়েই বাসায় গিয়ে পৌঁছোবো। আসি। নমস্কার। ভূতের ভয় আমার নেই। তবু একবার জেনে গেলাম। জেনে রাখা ভাল। (হাসি) কি বলেন?

ম্যানেজার—(হাসি)

[দরজা বন্ধের শব্দ)

(মচ মচ করিয়া জুতার শব্দ। দূরে মাদল ও বাঁশী বাজিতে-ছিল। কোথায় যেন একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। দূরের মাঠে শেয়াল ডাকিতেছে। বাগানের পথে শুকনো ঝরা পাতার উপর ডাক্তার বাবুর জুতার শব্দ। বাগানের ভিতর একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।)

ডাক্তার—(হঠাৎ ভয় পাইয়া) কে?

—ডাক্তারবাবু। তুই একবার আয় আমার সঙ্গে।

ডাক্তার—কেন? কে তুই?

—আমি যেই হই না কেনে, তুর কি? তুই আয় আমার সঙ্গে।

ডাক্তার—কেন? কি দরকার?

—আয় বাবু, তুই না এলে আমার ছেলেটা মরে' যাবেক।

ডাক্তার—কি, হয়েছে কি তোর ছেলের?

—তা জানি না বাবু। তুই দেখবি চল্।

ডাক্তার—চল্।

(আবার শুকনো পাতার উপর দিয়া পায়ে চলার শব্দ। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে।)

ডাক্তার—তোর নাম কি রে?

—টুইলা মাঝি।

ডাক্তার—কত দূর যেতে হবে?

—হোই ত'। ওইখানে।

ডাক্তার—খাদে বুঝি তুই কয়লা কাটিস্?

—হঁ বাবু। উ-সব জেনে তুর কি হবেক, চল।

ডাক্তার—ক'টি ছেলে তোর?

—ওই একটি। আরও ছিল, তারা কেউ নাই।

ডাক্তার—ছেলেটি কত বড়?

—তা এনেক বড় বেটে।

ডাক্তার—তবু ক' বছরের?

—কে জানে ত'। অত-সব জানি না।

ডাক্তার—এ কি রে টুইলা? কাছে বলছিলি যে? পথ যে আর ফুরোতেই চায় না।

—হঁ বাবু, কাছে লয় ত কি। চল্ বাবু, অমনি আমাকেও একটো ওষুধ দিবি।

ডাক্তার—তোর আবার কি হয়েছে?

—তাই যদি বলতে পারব তাহ'লে ত' আমিও তুর মতন ডাক্তর হ'তম।

ডাক্তার—তাহলেও বল্ না কি হয়েছে? জ্বর?

—না বাবু না। জ্বর-টর কিছু লয়। খাদে বান ঢুকেছিল। সেই থেকে—

ডাক্তার—বান ঢুকেছিল? কখন রে? সে ত' চার পাঁচ বছর আগে। অনেকদিনের কথা।

—হঁ বাবু হঁ, এনেক দিন এগুতে।

ডাক্তার—তারপর?

—তারপর আমরা তেখন এনেক মালকাটা ছিলম খাদের নামুতে। হোই দিককার হোই নামু সুঁদটোতে কয়লা কাট-ছিলম। হুড়মুড় করে' শালা বানের জল একবারে—। লম্ফ গলা হাতে নিয়ে ভাবলম ছুটে পালাই। পিথমেই লম্ফগলা গেল নিমেই। ঘুটঘুটে আঁধার হঁয়ে গেল। লে—ইবারে কুন্‌দিকে যাবি—যা। পিথমে জল উঠলো এক কুমোর, তাবাদে এক-বুক, তাবাদে বাস্—

ডাক্তার—সেখান থেকে কেউত' বাঁচেনি শুনলাম। তুই বাঁচলি কেমন করে?...চুপ ক'রে রইলি যে? হাঁরে, এখানে নাকি খুব ভূতের ভয়?

—কে জানে ত।

ডাক্তার—আচ্ছা তুই সেই বান থেকে বাঁচলি কেমন করে' কই বললি না ত?

—হঁ, বাঁচলম আবার কুথা! আমি ত' মরেই গেইছি।

ডাক্তার—সে কি রে! তু—তু—তুই টুইলা!, টু—ইলা! কোথায় তুই? বাবে, কোথায় গেলি?

(জুতা পায়ে দিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পালাইবার শব্দ পাওয়া গেল। দূরে একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল।)

—দুই—

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী—হ্যাগা, কাল রাত্তিরে ত' ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী ফিরে' এলে, আজ আবার এই রাত্রি একটা বাজলো, এখনও পর্য্যন্ত চোখে তোমার ঘুম নেই, শুয়ে শুয়ে ছটফট করছো, কি, ভাবছো কি বল দেখি?

ডাক্তারবাবু—ভাবিনি কিছু। হেড্ আপিসে একটা দরখাস্ত করে' দিলাম। এখান থেকে বদলি হয়ে যাব।

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী—কেন, ভূতের ভয়ে?

ডাক্তার বাবু—না না ভূত কোথায়। ভূত কিসের? ভূত টুত নেই, তোমরা আবার যেন ভয় পেয়ো না। ও-সব কিছু না। বুঝলে?

(দরজার বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ)

—ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু!

ডাক্তারবাবু—এত রাত্তিরে কে ডাকে রে বাবা! বলে দাও আমি ঘুমিয়েছি। এ সময় কোথাও আমি যেতে পারব না। দরজা খুলো না, এইখান থেকে বলোদাও।

—ডাক্তারবাবু! আমি ম্যানেজার। দরজা খুলুন।

ডাক্তারবাবু—আরে, ম্যানেজার বাবু! এত রাত্তিরে আপনি আবার কি জন্যে এলেন?

(দরজা খোলার শব্দ)

ম্যানেজারবাবু—আরে মশাই আর বলেন কেন? বিপদের ওপর বিপদ! খাদের নীচে খুন হয়েছে।

ডাক্তার—খুন! সে কি? রাত্রে খাদ ত' বন্ধ থাকে। খুন কেমন করে' হলো?

ম্যানেজার—সে সব অনেক কথা ডাক্তারবাবু। জরুরী একটা অর্ডার পেয়েছিলাম, তাই ডবল-হাজরীর লোভ দেখিয়ে মদ খাইয়ে নামিয়েছিলাম জনকতক লোক। বাস, শুনছি নাকি এক ব্যাটা খতম্! চলুন, আর দেরি ক'রে লাভ নেই। থানা থেকে ইন্সপেক্টর এসেছেন। চলুন।

ডাক্তার—চলুন।

(অনেকগুলা পায়ের শব্দ)

(বয়লারের সোঁ সোঁ শব্দ। দূরে কুকুর ডাকিতেছে। মনে হইল, একটি মেয়ে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে আগাইয়া আসিতেছে।)

—বাবু গো! খাদে আমার সব গেইছে বাবু। (কান্না)

ম্যানেজার—(চলিতে চলিতে) চুপ চুপ, গাংটুর মা, চুপ কর। কি আর করবি বল্।

গাংটুর মা—আমি একবার ছেলেটাকে দেখব বাবু, আমাকে নিয়ে চ'।

ম্যানেজার—আমরা নিয়ে আসছি তাকে। তুই থাক্ এইখানে।

গাংটুর মা—গাংটু যে আমার জর গায়ে খাটতে নেমেছিল বাবু—। আমি তাকে বারণ করেছিলাম।

—আরে এই ব্যাকস্‌ম্যান্, ঘন্টি মারো। এ—ইঞ্জিন-খালাসী, চালাও। চালাও। মারো ঘন্টি।

(তিনবার ঘন্টা বাজিল। নীচে হইতে অন্‌সেটার ঘন্টার জবাব দিল। লিফ্‌ট্‌কেজ ঝড়াং করিয়া উপরে আসিয়া লাগিল। লোহার চেন আটকানোর শব্দ হইল। গাংটুর মা তখনও কাঁদিতেছিল। সর্ সর্ করিয়া কেজ নীচের দিকে নামিতে লাগিল। সোঁ সোঁ শব্দ করিতে করিতে লিফ্‌ট-কেজ নীচে গিয়া থামিল। চানকের মুখে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে। ঝড়াং করিয়া চেন খুলিবার শব্দ)

ম্যানেজার—এইদিকে আসুন ইন্সপেক্টর বাবু। চল্‌রে মুনিয়া, তুই আগে আগে চল্। ইন্সপেক্টর বাবু, আপনার হাতের টর্চটা জ্বালুন।

(জল-সপসপে পথের উপর ট্রাম লাইনে হোঁচট খাইয়া খাইয়া সকলে আগাইতে লাগিল। ঝিঁঝিঁ পোকার চিরিক্ চিরিক্ শব্দ। কোথায় যেন একটা কোলা ব্যাং ডাকিতেছে।)

ডাক্তার—ওরে বাবারে! (লাফাইয়া উঠিল)

ম্যানেজার—কি, কি, কি হ'লো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার —এই দেখুন না মশাই, পায়ের উপর দিয়ে—

ম্যানেজার—ইঁদুর। (হাসিয়া) সর্ব্বনাশ। একটা ইঁদুর দেখে ভয় পেয়ে গেলেন? আসুন। আপনি আমাদের মাঝখানে আসুন।

ইন্সপেক্টর—সেই ভালো। আসুন মাঝখানে আসুন।

ডাক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ভালো। (পায়ের শব্দ)

ইন্সপেক্টর—লোকটা কখন্ মরেছে?

ম্যানেজার— বিকেলবেলা। কাজ শেষ করে' উঠবার সময়। ব্যাটা চুরি করে' Hanging Coal এ চোট্ মেরেছিল আরকি!

ইন্সপেক্টর—বয়েস কত?

ম্যানেজার —বেশি বয়েস নয়। Young man.

ইন্সপেক্টর—সাঁওতাল?

ম্যানেজার—আজ্ঞে হ্যাঁ। সাঁওতাল।

ইন্সপেক্টর—মা ত' দেখলাম ওপরে কাঁদছে। বাপ নেই?

ম্যানেজার—না, বাপটা সেই ত্রিশ সালের বান যখন ঢুকেছিল খাদে, তখন মরেছে।

ডাক্তার—বাপের নাম কি ছিল বলতে পারেন?

ম্যানেজার—বাপের নামটা···আমার ঠিক···হাঁরে মুনিয়া, তুই জানিস?

মুনিয়া—কার? গাংটুর বাপের নাম? টুইলা মাঝি।

ডাক্তার—কি বললি? টুইলা মাঝি? আঃ আরসুল গুলো কিরকম জ্বালাতন করছে দেখেছেন? ও মশাই, আপনি আবার আমাকে পেছনে ফেলে দিলেন কেন? আমি মাঝখানে যাব। আমার ভয় করছে।

—ভয়? (সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

মুনিয়া—বাবু! লাশ ত' এখানে ছিল। কই নাই ত?

ম্যানেজার—সে কি রে? নেই কি রকম? লাশ যাবে কোথায়? ভাখ ভাল করে।

মুনিয়া—না বাবু, এই ত' এই কাঁথির কাছে দেখে গেলাম, এই ত' রক্তের দাগ। আচ্ছা, দাঁড়ান বাবু, আমি একবার ওই দিকটা দেখে আসি।

ডাক্তার—ব্যাটার সাহস ত' খুব।

ম্যানেজার—কেন, আপনার কি ভয় করছে নাকি?

ডাক্তার—না মশাই, ভয়-ডর আমার ছিল না, কিন্তু কাল থেকে—

[হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার।]

মুনিয়া—বাবু, বাবু, বাবু, বাবু—বা-বা-বা পেয়েছি।

সকলে—(ছুটিয়া তাহার কাছে গিয়া) এই ত' লাশ!

মুনিয়া—লাশটার পেটেই পা দিয়ে ফেলেছিলাম বাবু। মড়াটা চেঁচিয়ে উঠলো। আপনারা শুনতে পেলেন না?

ম্যানেজার—দূর ব্যাটা! মড়া আবার চেঁচায় নাকি? তুই নিজেই চেঁচিয়েছিস্ ভয়ে।

মুনিয়া—কিন্তু এ কি বাবু, আলোটা যে নিবে গেল।

ম্যানেজার—আলা! আলা! এই নে দেশলাই। ইন্সপেক্টার বাবু আপনার টর্চটা···

ইন্সপেক্টর—আমি ঠিক আছি।

[দিয়াশালাই জ্বালানোর শব্দ। দুটো তিনটে, চারটে]

মুনিয়া—না বাবু, এ আলো জ্বলবে না।

ইন্সপেক্টার—সে কিরে? বাঃ, এ কি রকম? আমার টর্চটাও যে নিবে গেল।

ডাক্তার—বাস্! নে এইবার মর্ এইখানে। তাহলে কি হবে? চলুন হাতড়ে হাতড়ে কোনোরকমে খাদের মুখে ফিরে যাই। আমার মশাই ভয় করছে।

মুনিয়া—আসুন বাবু, তাহ'লে আমার পিছু পিছু আসুন।

—যাবি কুথা? আমার ছেলেকে বাঁচা এগুতে, তাবাদে যাবি।

ম্যানেজার—কে তুই?

ডাক্তার—সর্ব্বনাশ! এ যে সেই টুইলার গলার আওয়াজ!

ম্যানেজার—আপনার কাছে রিভল্ভার ছিল না ইন্সপেক্টরবাবু?

ইন্সপেক্টর—হ্যাঁ—(রিভল্ভারের আওয়াজ)

—বটে! আমাকে গুলি করবি? (হো হো করিয়া হাসির শব্দ)

ইন্সপেক্টর—বাবারে, বাবারে! গেলাম, গেলাম! ছেড়ে দে বাবা, ছেড়ে দে। আর আমি গুলি ছুঁড়বো না, ছেড়ে দে আমি পালাচ্ছি।

(মনে হইল তাহাকে যেন দূরে কেহ টানিয়া লইয়া যাই-তেছে।)

—গুলি চালাবি আর? চালা। দেখি কেমন মরদ!

ইন্সপেক্টর—না বাবা, আর না—আর না—

—থাক্ তুই এইখানে। আমাকে মেরেছিস বানে ডুবোই—জলের ভিতর ইঁদুর মারা করে'। বড় ছেলেটো সেই সঙ্গে গেইছে, তাবাদে এই ছুটু ছেলেটো ছিল তাখেও দিলি মেরে'। কই তুদের ম্যানেজার কই?

ম্যানেজার—এই যে বাবা, আমি বাবা, দোহাই বাবা—

—আচ্ছা, তুখেও নাহয় ছেড়ে দিলম। কই, সেই ডাক্তারটো কই?

ডাক্তার—আঁ:! এই যে বাবা আমি।

—আয় ত্যাখ যদি উঁই বাঁচাতে পারিস! কাল ছেলেটোর জর হঁয়েছিল—সেই যে তুখে বললম আম-বাগানে। জরে জরেই পয়সার লোভে এসেছিল কঁয়লা কাটতে। আয় দেখবি আয়।

ডাক্তার—ও আর কি দেখব টুইলা? মরা মানুষ বাঁচাতে ত'আমরা পারি না!

—ও। আচ্ছা, যা তবে তুরা পালা ইখান্ থেকে। আমি একাই রইলাম এইখানে গাংটুকে আগুলে।

ডাক্তার—কিন্তু ওর মা যে ওকে একবার দেখতে চাচ্ছে রে! খাদের ওপরে দেখে এলাম কাঁদছে।

—কাঁদছে! হঁ তা কাঁদবেক্ আমি জানি। ত্যাখ—হেই ম্যানেজার, আমাদের সবাইকেই ত' সাবাড় করেছিস্ তুই। এবার ওই বুড়ীকে যদি না মারিস ত' তুখে দিব্যি রইলো। বুঝলি? (গলার আওয়াজ তাহার ভারি হইয়া আসিল।) কই, কথার যে আমার জবাব দিছিস্ নাই। বল্ কি বলছিস! গাংটু! গাংটু!

[কান্নাকাতর কণ্ঠ তাহার দূরে মিলাইয়া গেল]

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সিনিক্ (CYNIC)

শ্রীকালিপ্রসাদ বিশ্বাস এম-এ

হে বন্ধু আমরা পথের পাশে বাঁধি নাই ঘর।
ধুলায় আছিল ভরা, কণ্টকিত ছিল যেই পথ,
আরণ্যক পথ যেই, চন্দ্রালোক পশে নাই কভু,
বহে নাই কভু যেথা গন্ধ সমীরণ—
হে বন্ধু আমরা পথের পাশে বাঁধি নাই ঘর।

হে বন্ধু আমরা পথের পাশে বাঁধি নাই ঘর।
আকাশের ছায়া ছিল, তন্দ্রাহীন নিশি,
অতন্দ্রিত ধরণীর ছিল না আহ্বান,
আমাদের ডাকে নাই সাগরকল্লোল—
হে বন্ধু আমরা পথের পাশে বাঁধি নাই ঘর।

হে বন্ধু আমরা পথের পাশে বাঁধি নাই ঘর।
প্রিয়া কভু চাহি নাই, চাহি নাই তারে,
ভুল করি চাহি যাহা তাহা ভুলিয়াছি,
ছায়ালোক মাঝে শুধু আলো যাচিলাম,
তন্দ্রাহীন যেই আলো দুঃখজ্যোতির্ম্ময়—
হে বন্ধু পথের পাশে বাঁধি নাই ঘর।

———

হাইনের প্রেম কাব্য

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস, আই-সি-এস

কবিকে না জানিলে তাঁহার কাব্য বুঝা চলে না একথা সকল কবির সম্বন্ধে সমান ভাবে খাটে না। কালিদাসের সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা জানিনা, তবু তাঁহার সাহিত্যের রসবোধে কোন ব্যাঘাত জন্মায় না। আরো বেশী সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব-পূর্ণ সেক্সপীয়রের জীবনের কোন কথা না জানিলেও তাঁহার কাব্যের ও মনের পরিণতির ইতিহাস আমাদের কাছে অগোচর থাকে না। প্রাচীন কালের কোন কবিরই জীবনী আমরা জানি না, কিন্তু মনে হয় যে বাল্মিকী বা হোমার যে কোন ব্যক্তি হইতে পারিতেন তবু তাঁহাদের কাব্যপ্রতিভার কোন মূল পরিবর্ত্তন হইত না। তাঁহাদের জীবনের কোন কথা না জানিলেও আমরা ধরিয়া নিতে পারি যে তাঁহাদের কাব্য যে শুধু নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি তাহা নয়। একথা মানি যে সাহিত্যে জীবন ছায়াপাত করে, সাহিত্য কোন অবলম্বনহীন শূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এমন হইতে পারে যে সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্য বিভিন্ন, অথবা একে অন্যকে কোন বিশেষরূপে চিত্রিত করে নাই। জার্মাণ কবি হাইনে এই শ্রেণীর সাহিত্যিক নহেন। হুইটম্যানের জীবনের মত তাঁহারও জীবনকে বিশেষভাবে জানিয়া তাঁহার কাব্যের আস্বাদের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

হাইনে জাতিতে ইহুদি, জাতীয়তায় জার্মান; তাঁহার জীবনযাপন নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের রাজ্যে। জাতি তাঁহাকে দিয়াছিল ইহুদির রক্তচঞ্চলতা, দেশ দিয়াছিল ইহুদির প্রতি জার্মানের ঘৃণা ও আদর্শবাদীর জার্মানীর প্রতি প্রীতি। বাকী জিনিষটা তাঁহাকে প্যারিসে বাস করাইয়াছিল, রুচি মধুরতা ও রোমান্টিক আদর্শের সন্ধান দিয়াছিল। সর্ব্বোপরি জন্ম দিয়াছিল বাল্যাবধি অসুস্থতা ও শেষ বয়সে সাংঘাতিক মেরুদণ্ডের রোগ। এই রোগ দেহ অপেক্ষা মনকে অধিক দুঃখ দিয়াছিল, তীব্রতা, তিক্ততা, অসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া। এই কয়টী জিনিষ তাঁহার সকল সাহিত্য প্রচেষ্টাকে বিশেষ রূপ দিয়াছে। এগুলি না বুঝিলে তাঁহার সাহিত্যকে বুঝা যায় না।

নিজের সম্বন্ধে হাইনের স্বপ্ন ছিল যে তিনি গ্রীক ইহুদি। গ্রীক বা হেলেনিক কথাটী তাঁহার কাছে একটা অননুভবনীয় আনন্দলোক আনিয়া দিত। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহার শৈশব ও কৈশোর কাটিয়াছিল ফ্রাঙ্কফোর্টে যেখানে ইহুদিরা কোন বাগানে বেড়াইতে পারিত না, রবিবারের বৈকালে নিজ গৃহে বন্দী থাকিতে হইত, সংবৎসরে চব্বিশ (২৪) জনের বেশী বিবাহ করিতে পারিত না। সারা জার্মানীতে ইহুদিদের প্রতি নাৎসী মনোভাবের আভাস বিদ্যমান ছিল; দক্ষিণ ভারতের পারিয়াদের প্রতি ব্যবহারের জার্মাণ সংস্করণ আমাদের কবি ভাল করিয়াই পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার জীবনে হেলেনিক স্বপ্ন যদি কোন শান্তি আনিয়া থাকে তাহা মার্জ্জনীয় এবং তাহা যদি কোন নূতন আনন্দসৃষ্টি জার্মান সাহিত্যকে দিয়া থাকে তাহা জার্মানীর সৌভাগ্য।

কিন্তু গ্রীকের আনন্দচঞ্চলতা হাইনের মধ্যে ছিল না। গ্রীকের আদর্শ ছিল শিল্পের জন্যই শিল্প; কিন্তু হাইনের বা তাঁহার জাতির দৃষ্টিতে এই নিয়ম শুধু সীমাবদ্ধ নহে, সঙ্কীর্ণ, শুধু আভিজাত্যময় নহে, আধিপত্যময়। সেজন্য হাইনের নিয়মে জীবনের জন্যই শিল্প। যে রূপ তাঁহার চক্ষুতে অঞ্জন মাখাইয়া দিবে তাহাকে নিজের গৃহকোণে, বাতায়ন পার্শ্বে, অলিন্দে আনিয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রমাণ হইবে অনুভবের মধ্য দিয়া নয়, স্পর্শ দিয়া; তাঁহার নিকট যাহা সার্থক তাহা কল্পনা নহে, কামনা; প্রেরণা নহে, প্রাপ্তি। তিনি লিখেন

কবিতাগুলির ইংরাজী হইতে অনুবাদ লেখকের।

তোমার নয়ন পানে চাহিয়াছি আমি
ব্যথা অবসান হয়ে দুখ গেছে দূরে,
মধুর সরম মাখা অধরেতে চুমি
পূর্ণ হইয়াছি আমি সর্ব্বসুখ পুরে।

তোমার বুকের মাঝে বক্ষোভার রাখি
অমরাবিরাম সুখ অলকার পাই,
বলো যবে 'আমি শুধু তোমা ভালবাসি'
আমি যে আঁখির জলে কাঁদিয়া ভাসাই।

আর একটী কবিতা।

সৃজন করেছি ফুল
আমার আঁখির জলে,
ফুটে নাই এত কভু
গিরিব সানুর তলে।

কত না দীরঘশ্বাস
আমার হৃদয়ে বাজে;
সকলি পেয়েছে রূপ
পাপিয়ার তান মাঝে।

ভাল যদি বেসে থাক
আমায়, পরাণ প্রিয়ে,
আমার সকল ফুল
দিব গো তোমায় দিয়ে।

গাইবে কেবলি গান
তোমার জানালা পাশে
(হৃদয় রাগেতে রচা)
পাপিয়া সহাসে এসে।

গ্রীক মহিলা-কবি স্যাফো (Sappho) হাইনের নিকটতম গ্রীক। তিনি এই প্রণয়ী ফাওনের (Phaon) নিকট এই কবিতার সবটুকু লিখিতেন, কিন্তু আঁখির জলে ফুল রচনা না করিয়া লবণসাগরের সৃষ্টি করিতেন। তাঁহাতে ও হাইনেতে এই প্রভেদ; স্যাফো আনন্দসৃষ্টিকে ব্যথার জলে অভিষিক্ত করিতেন না। হাইনে শুধু যে গ্রীক নহেন তাহা নহে; তিনি ফরাসী ইহুদিও নহেন; তিনি ইহুদির শ্রেষ্ঠ ইহুদি।

বাহিরে হাইনে গ্রীক,—গ্রীকের সৌন্দর্য্য বোধ, দেবদেবীর সম্বর্দ্ধনা, জীবনে আনন্দের মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, নদীপল্লব আকাশে স্বর্গের ছায়া ও প্রকাশ কল্পনা এসব তাঁহার কবিতায় আছে। কবিতা 'উত্তর সাগরে'র মধ্যে অনাদি অনন্ত সাগরের মহাভাষার আভাস, জলপ্রবাহের ধ্বনির মধ্যে শৈশবস্বপ্নের স্মৃতি গ্রীক মুর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু হাইনে কীটস নহেন, এমন কি স্যাভেজ ল্যাণ্ডোরও নহেন। তাঁহার মধ্যে গ্রীক অনুভবের বিস্তার পাই কিন্তু বিকাশ পাই না। তাঁহার চঞ্চলতা প্রাণবত্তা ও ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে গ্রীক ছায়া আমরা পাইনা। একটী কবিতার অংশবিশেষ লওয়া যাক।

নিরাশায় ভরে রয়েছি এখানে
ক্ষুদ্র আমার এ ঘর দীনে;
নিশীথিনী হের ওই আসে চলে,
সকলি আসে বঁধুয়া বিনে।
মন্দির পথে অতি ধীরে ধীরে
কাঁপন আনি বাতাস বহে,
দেখেছ কি কেহ নবীনা বধূরে?
তাহার বিনা হৃদয় দহে।
শূন্যতা হতে নীরব নিথর
রঙহীন কত উঠিছে ছবি
হাসিয়া আসিয়া মাথা দুলাইয়া
'দেখেছি' যেন কহিছে সবি।

মন্দিরপথ হইতে বাতাস আসে, শূন্যতা হইতে ছবি ভাসিয়া উঠে কিন্তু গ্রীক দেউলের কোন চূড়া মনে জাগে না, কোন আকাশ বাণী বা আশ্বাস পাঠক পায় না। সত্য কথা বলিতে কি গ্রীকের গভীর প্রশান্তি ও সূক্ষ্ম রুচি হাইনের কাব্যলক্ষ্মীর পায়ে শৃঙ্খল টানিয়া দিত, শৃঙ্খলা আনিয়া দিত না; নিরন্তর মৌন বা মিতভাষী মার্জ্জিত ভাব কাব্যসৌন্দর্য্যের পক্ষে বন্ধন হইত, বন্ধু হইত না।

মানুষ হাইনে তাঁহার প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার ভার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু কবি হাইনে করেন নাই। বার বার একই বিষয়ে এই ভাবে মনের বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন; সে অন্তর্জ্বালা একবারও একটী প্রেমের কবিতা হইতেও লুপ্ত হয় নাই। এ যেন নিজেকে যাচিয়া যন্ত্রণা দেওয়া;

স্বাভাবিক নির্ঝরিণীধারার মত ভাসিয়া চলিয়া যাওয়া নয়, রুদ্ধগতি জলধারার পাষাণ কারার দ্বারে বার বার বিফলে মাথা ঘুরিয়া মরা। তাঁহার কবিহৃদয় নূতন সৃষ্টি সন্ধানে নূতন অভিযানে বাহির হয় না; পদে পদে বেদনার কাঁটাকে ক্ষয় করিয়া দেয় না, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনই থাকে।

হৃদয় ভাঙ্গে প্রেমের ভারে
কইনা তোমারে,
হারিয়ে তুমি গিয়েছ, প্রিয়ে,
কইব কি কারে?
তোমার পাশে যদিও জ্বলে
হিরামণির জ্যোতি,
তোমার হিয়ে পড়েনি আলো,
আঁধার সেথা অতি।
জানি গো তাহা; দেখেছি তোমা
স্বপন যোগে চাহি,
তোমার হিয়ে দেখেছি রাত্রি
কিরণ সেথা নাহি।
পিয়েছে গরল কেবল ওগো
এ হিয়া তোমার;
এ কি দশা হল গো হায়,
হে প্রিয়ে, আমার।

তাঁহার কবিতায় পাই বিষের যন্ত্রণা; নিজেও সেকথা তিনি বলেন:

সবে কয়—বিষে মাখা মোর
গান যত; তা ছাড়া কি হবে?
তুমি দেছ মোহ যাদু মোর
ঢালি' বিষ আমাতে নীরবে।
সবে কয় মোর বিষে মাখা
গানগুলি; তা ছাড়া কি হবে?
শত সর্প মোর হিয়ে রাখা;
তার মাঝে, তুমি, প্রিয়ে, রবে।

আর একটি কবিতা:

কোথায় রহিল তব রূপসী প্রেয়সী
মধুরে গাহিলে গান যাহারে ঘিরে?
যাহার প্রেমের যাদু অগ্নিশিখাময়ী
রহিল এমনি করে তোমার অন্তরে?
কখন নিভিল হায় সে সব শিখা
আলো বা তাপ নাহি মোর হৃদয়ে;
এই সে পাত্রের 'পরে রহিয়াছে ছাই,
ভরা যে এ পুঁথিখানি মোর প্রণয়ে।

সত্যই তাঁহার Buch der Leider কেবল প্রেমের কবিতায় ভরা; এবং শুধু একজনেরই প্রেম। New Poems নামক বইখানিতে অন্যান্য প্রিয়া সম্বন্ধে কবিতা আছে বটে কিন্তু এই বইটাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতার বই।

সুদূর আকাশে নিচল হয়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে তারা—
শতেক বছর করে চাওয়া চাহি নিরাশ প্রণয়ে হারা;
কি জানি কিভাবে মধুর বিশাল কহিছে তাহারা কথা
বড় বড় যত পণ্ডিতজনা বুঝিলনা তার ব্যথা।
বুঝিয়াছি আমি, প্রতিটী আখর এড়িয়ে গিয়াছে পাখি';
পড়েছি আমার প্রিয়ার মু'খানি করিয়া যে পাতি পাতি।

আমরাও বইখানি পাতিপাতি করিয়া এই প্রিয়ার কথাই শুধু পাই।

কিন্তু হঠাৎ আমরা একটী সুন্দর কবিতা পাই যাহা তাঁহার প্রিয়ার উদ্দেশে নয়, একটী সুকুমারী বালিকার উদ্দেশে—

মধুর ফুলের মত তুমি যে বুঝি
এমনি পূত বুঝি এমনি অম্লান;
তব পরে মম আঁখি ফিরে কি খুঁজি,
সুধীরে বিষাদে মম পুরে যে প্রাণ।
তোমার কপাল পরে মম হাত রাখি
মনে মনে এ প্রার্থনা করিলাম দান,—
এমন মধুর পূত শোভনা বালাবে
পরমায়ু যেন তুমি দিও ভগবান।

কবির জীবনের ব্যর্থতার রঙ যেন এই বালিকার জীবনে স্পর্শ না করে।

এই নিরন্তর প্রেম নিবেদন ও বেদনা সন্ধানের মধ্যে মাঝে মাঝে চতুরতাপূর্ণ ব্যতিক্রম পাই। কবিতা প্রিয়ার উপর আসন পায় এবং কবিতা ভাল না লাগিলে কবিচিত্ত বিমুখ হইয়া উঠে।

তুমি যদি হবে মোর বিবাহিতা প্রিয়া
তব সম কেহ না রহিবে,
কৌতুক আনন্দ রসে রাখিব ভরিয়া,
সর্ব্বসুখে জীবন বহিবে।

ভর্ৎসনার তব বাঁকা কথা কহিব না,
মানি লব সকলি সমান ;
কিন্তু এ কবিতা পেলে অপমানকণা
বাচি লব বিচ্ছেদের বাণ।

কবি একবার কল্পনা করিতেছেন

কয়েছি যবে দুখের কথা
আলসে অবহেলে গিয়েছ সখি ;
বাণীর ছাঁদে গাহিনু ব্যথা,
"বড় ভাল হয়েছে" বলিছ এ কি !

সাধারণ লোকের গানের (folk song) একটা রূপ কবির কাছে আমরা পাই। এ বিষয়ে বার্ণস ও হাইনেকে একসঙ্গে পড়িলে দুজনের চিত্তগত সাদৃশ্য অনেক পাওয়া যায়। আর একজন পঞ্চদশ শতাব্দীর ফরাসী কবির কথা মনে পড়ে। ফ্রাঁসোয়া ভিলঁর (Francois Villon—Roudel) রন্দেল নামক কবিতা।

বিদায়! আঁখিতে থাক জল.
যাই তবে, প্রেয়সী আমার,
নরনারী, রহিল সকল
বিদারের বিষাদ আঁধার।
শপথ ও কত দীর্ঘশ্বাস
লবে যাই, তুমি রহ হেথা
চোখে আসে জলের আভাস।
তোমা চেয়ে মোর দুঃখ বেশী
বুঝিতে পারিনু হতাশায়
ভুলি' ব্যথা আর শত হাসি
সর্ব্বশেষ লইনু বিদায়।

হাইনের বিদায়ও দুঃখও প্রেম সম্বন্ধীয় দুটি কবিতা।

প্রণয়ী জনে যবে বিদায় লয়
হাতে ধরে তারা দাঁড়ায় ঠায়,
পড়ে মুহু আঁখি জল শ্বাস
বিফলে সময় বহে যে যায়।
পড়েনি আঁখি জল বিদায় কালে
উঠেনি ছোটশ্বাস হৃদয় ভেদি'
সকলি জমা হবে কত যে পরে
আসিল, ওগো, তারা আসিল যদি।

এবং

ভুলে গেছ একেবারে তুমি
কত সুখে লভেছিনু তোমার ও হিয়া
এত ছোট, এত মিছে, মধু
এর চেয়ে মিঠে মিছে ওঠেনি কাঁপিয়া।
ভুলে গেছ কত প্রেম দুখ
ঝরা পাতা সম হৃদে গিয়াছে দলিয়া;
দুখ চেয়ে প্রেম বেশী হবে
জানি নাই, জানি দুয়ে অসীম বলিয়া।

শ্রেষ্ঠ কবিতার স্পর্শ এই শেষ পংক্তি দুটীতে আছে। হাইনে এইরূপ আকস্মিক প্রকাশের জন্যই অমর থাকিবেন। এ হিসাবে তিনি বৈষ্ণব কবিগণ ও ফরাসী Trbadowr গণ একই শ্রেণীর।

পল্লী গীতিকার ছোট ছোট কথা, সরল ভাব, সহজ অনুভূতি হাইনের হাতে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। পৃথিবীর সব সভ্য ভাষাতেই তাহার প্রতিলিপি আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস

এই যে উজল কাঞ্চন প্রাতে
বেড়াই গোপনে,
পাষাণ সম আমায় দেখে
পুষ্প কি কয় মনে ?
মলিন আমার বয়ান হেরে
কইছে দুখস্বরে,
ওগো দুখী, সখীরে মোদের
স্মরো না রাগ করে।

কীটসের "নিঠুরা রূপসী বালা"র (La Belle Dame Sans Merci) নায়ক হাইনের এই কবিতায় নিজেরই একটা স্বপ্নরূপ দেখিতে পাইবে।

"মোহন মধুর ফাগুন মাসে
ফুটিল সকল কলি"

তাহার পরের বক্তব্যটুকু অতি সাধারণ; কিন্তু সেই বিকচোন্মুখ কলিকার মধ্যে প্রিয়ার গান তাঁহার পল্লীগীতিকার একেবারে মর্ম্মকথা।

একথা বলা যায় যে হাইনের প্রেমের কবিতা আভিজাত্যের চিহ্ন বহন করে। প্রিয়া তাহার রাজকুমারী, 'লিনডেন' তলে তাহার সহিত দৃষ্টি বিনিময়, তাহার কমল আনন, অমৃত স্পর্শ তাহার।

স্বপনে দেখিনু তাবে
রাজকুমারী।

সিক্ত শিশির তার ম্লান কপোলে,
বসিনু তারি সাথে কদম তলে,
তাহার বাহুর সাথে
বাঁধা আমারি।
তোমার পিতার পাটে
লোভ ত নাহি;
যত চাহিনা আমি সোনামণিভরা,
চাহিনা মুকুট তার বাহে আছে হীরা,
কুমারী, তোমারে আমি
তোমারে চাহি।

প্রেমের আভিজাত্যে কবি লিখেন

বছর গুলি যাওয়া আসা করে,
মানুষ যায় মরণসাগরতীরে;
আমার প্রাণে যে প্রেমখানি আছে
তাহাই শুধু যায় না কভু ফিরে।
তবু ওগো বারেক খালি যদি
সামনে তোমার জানু পাতি আসি
মরি, তোমার দেখে মুগ্ধভাবে
বলে, "বালা, তোমায় ভালবাসি।"

হাইনে জনসাধারণকে ও তাহাদের মতিগতিকে বিশ্বাস করিতেন না। তাহারা শিল্পের বিচিত্র লীলাকমলকে ধ্বংস করিবে; সমাজের যে কুসুম গুলির অস্তিত্বের সার্থকতা শুধু আনন্দময় বিকাশের মধ্যেই সে গুলিকে পরুষ হস্তে অনুচিত উৎপাটিত করিবে।

যে প্রেমের অনুভূতি কবিকে লিখায়

যবে ঢাকা থাকি প্রিয় বাহুর বন্ধনে
পরাণ আকাশে চাহে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে,

এবং সময়ের সর্বধ্বংসী ক্ষমতাকে সগর্বে উপেক্ষা করে যথা—

তোমারে বেসেছি ভাল, এখনো বাসি
যাক্‌ না এ ধরা চুরমার হয়ে
আমার প্রেমের শিখা নিভেনা কভু
আকাশে উঠে তাহা ত্যজিয়া এভূয়ে।

সেই সাধারণের পক্ষে অননুভূত আত্মার বিকাশের কথা মুদীর দোকানের সম্পত্তি হইবে ইহা কবির পক্ষে অসহ্য বোধ হইত। জার্মানীর জাতীয়তার নেতা, পল্লীগীতিকার গায়কের পক্ষে ইহা বিসদৃশ বৈ কি।

হাইনের জীবন এইরূপ বহু বৈসাদৃশ্যে পূর্ণ। বিষের আস্বাদপূর্ণ অথচ মধুর কবিতা, নিজের প্রতি বিদ্রূপময় অথচ আন্তরিক হৃদয়াবেগ হাইনের বিশেষত্ব। জার্মানি তাহাকে স্মরণ রাখে বিশেষ করিয়া এই জন্য যে তিনি রোমানটিসিজমের একজন শ্রেষ্ঠ কবি এবং রোমান্টি-সিজম ধ্বংস করিবার পথটী তিনিই মুক্ত করিয়া দেন। কোন একটী কথায় বা সরল বর্ণনায় এই ভাবটীর সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তাঁহার কবিতায় অনাস্বাদিতকে আস্বাদ করিবার, অতীতের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের কল্পনা রচনা করিবার, আশা ও নিরাশা, কিশোর প্রেম ও মৃত প্রণয়ীযুগল সমান ক্ষমতায় বর্ণনা করিবার পরিচয় পাই। কিন্তু তিনিই এইরূপ ভাববিলাসকে বিদ্রূপের কশাঘাত কম করেন নাই। তাঁহার গদ্য সাহিত্য জার্মানীতে একটী নবযুগ আনিয়াছিল। কিন্তু এ কথাও বলা চলে যে তাঁহার কাব্যসাহিত্য একটী যুগের শেষ সন্ধ্যা।

সর্ববাদিসম্মতিক্রমে হাইনে গ্যেটের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রধান। বহু ভাবে একথা সত্য। গ্যেটের সাহিত্যের মূল মন্ত্র এই যে মানুষের প্রকাশ অন্তর হইতে বাহিরের দিকে; শিল্পীর ভাবজগতের প্রকাশও সেই রকম। কবি আপনার চিত্তসম্পদে কবিতাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিবেন। হাইনে যতটুকু করিয়াছেন ততটুকুই তাঁহার কৈশোরের অপরিণত প্রেমের সার্থকতা।

বাঙ্গালী কাব্যরসপিপাসুর নিকট হাইনে কোন অসম্ভব অপ্রত্যাশিত নূতন জগৎ খুলিতে পারিবেন না। তাহার কারণ হাইনের প্রাণের সুর বাঙ্গালীর ঘরের কাছেই বাজে। ইহুদি বলিয়াই হোক বা রোমান্টিক বলিয়াই হোক হাইনে তাঁহার প্রেমকাব্যে বাঙ্গালীর পরিচিত ধারাটাই বহাইয়াছেন।

আকাশ এমন নীল, ধরণী সুন্দর,
মদির পবন বহে মৃদুল মন্থর,
কুসুম নাচিছে হেরি সবুজ প্রান্তর,
প্রভাত শিশির শোভে তাহার উপর
তবুও পরাণ চাহে কবর শয়নে
বদ্ধ হয়ে রহি মৃত প্রিয়া-আলিঙ্গনে।

অথবা

অপরাজিতার নীল ও মধু নয়নে
গোলাপ দলের লাল তোমার বয়ানে

ধবলিমা নলিনীর ও পাণি মোহনে
অনন্ত বসন্তে তাহা শোভে বিকশিয়া,
এক মাত্র ঝরে গেছে শুধু তব হিয়া।

তাঁহার হৃদয়ের উত্তাপ বাঙ্গালীর কাছে অপরিচিত নহে, যদিও তুহিনশীতল দেশে যেখানে কবিতা শীতলমর্ম্মরশুভ্র সুন্দরীদের উদ্দেশে লিখিত হয়, সে দেশের পক্ষে তাহা অপূর্ব্ব। Monche'র প্রতি যে রহস্যময়, ভাববিলাসময় প্রেমনিবেদন পাই, তাহা Buch der Leider-এর নায়িকা Amalia'র প্রতি প্রেম নিবেদন হইতে বিভিন্ন; তবু তাহাও আমাদের অপরিচিত নহে।

হাইনের কবিতা পড়িতে পড়িতে বায়রণকে মনে হইবেই। দুজনের মধ্যেই প্রভূত শক্তির সম্ভাবনা আছে অথচ পরিণতি নাই। দুজনেই আপন অন্তরানলে দগ্ধ হইয়া কবিতায় যাহা ফুটাইয়াছেন তাহা দীপ্তি নহে, তাহা দাহ। তাহা আলোকিত করে না, অনলসাৎ করে। দুজনেই বিদ্রূপ ও স্পষ্টভাষিতায় কবিতাকে লঘু করিয়া ফেলিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু হাইনের সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে তাঁহার কৃষ্টির ঐশ্বর্য্যে ও গ্যেটের উত্তরাধিকারী হিসাবে জার্ম্মাণ জাতিকে নূতন পথের সন্ধান দানে।

হাইনের মধ্যে জার্ম্মানীর ও ইয়োরোপের গীতি-কবিতা একটা নূতন বিকাশ লাভ করিয়াছিল, প্রকাশশক্তির প্রাচুর্য্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্যে এবং ভাব ও ভাষার সাহসিকতায়। তবু আমরা মনে করি যে

চুমিয়া আহত কর আমার অধর

প্রভৃতি পংক্তিগুলির মধ্যে সাহস অপেক্ষা স্পর্দ্ধাই বেশী আছে। তবু ইহা সমসাময়িক ইয়োরোপে সমাদৃত হইয়াছিল দেশ অপেক্ষা বিদেশে বেশী। বিদেশী ইয়োরোপ হাইনেকে বেশী উপভোগ করিয়াছে কারণ জার্ম্মানীর গীতিকবিতার ধারা তাহার উপযোগী ছিল না।

হাইনেকে শ্রেষ্ঠ কবির দলে আসন দিতে পারি না। আমরা কবির আনন্দবেদনার অনুভব চাই কাব্যরূপের মধ্য দিয়া, তাঁহার জীবনকে নিজেদের সত্তার সহিত মিশাইতে চাই শিল্পের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া।

বড় ব্যথা পারিনা বুঝাতে
তাই দিতে রচি ছোট গান

এই বেদনাকে আমরা রসহিসাবে উপভোগ করিতে চাই, যন্ত্রণা হিসাবে নয়।

কোমল কপোল তব মম গালে রাখো,
একধারে অশ্রুজল পড়ুক ঝরিয়া;
নিবিড়ে তোমার বুক মম বুকে রাখো,
অগ্নিশিখা এক হয়ে জ্বলুক গলিয়া।
সে মহা অতনু মাঝে আসে বহি যবে
মোদের অশ্রুর স্রোত জ্বলিয়া,
তোমারে বাহুর পাশে ধরি দৃঢ় ভাবে
নিথাদ প্রেমের দাহে যাই মরিয়া।

শ্রেষ্ঠ কাব্যের পরীক্ষা এইখানেই; জড় হইতে প্রাণময়ে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অলক্ষিত পরিণতিতে। হাইনের মধ্যে কখনো কখনো সেই পরিণতির ব্যাঘাত পাই বলিয়া মনে হয়।

আরো মনে হয় যে, যে আনন্দবেদনাময় ঐশ্বর্য্যের অবদান তাঁহার কাব্যে আছে তাহার মধ্যে করুণ অশ্রুজলের সহিত ক্রন্দনও জড়িত আছে। রূপকথার কোকিল কণ্টকবৃক্ষে বক্ষবিদ্ধ করিয়া গান গাহিয়া গোলাপ ফুটাইয়াছিল। তাহার জয় ও সার্থকতা কুসুমের বিকাশে, পরাজয় ও ব্যর্থতা করুণতার মধ্যে আর্ত্তনাদের আভাসে। হাইনে, মেরুদণ্ডের রোগপীড়িত হাইনে, এই পরাজয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই।*

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গৌহাটী শাখায় পঠিত।

কাম-রূপ

শ্রীচরণদাস ঘোষ

নয়

অতিথি আসিবে। রাজসভার আজ এক বিশেষ উৎসব। রত্নবেদীর উপর সিংহাসন, তাহার উপর বসিয়া চিত্ররথ, পার্শ্বে রাজ-পুরোহিত। নীচে দুই পার্শ্বে সারি দিয়া বসিয়া—সভার অলঙ্কার। সকলেই নিঃশব্দ, কাহারো মুখে কথা নাই। সকলেরই চেতনা যেন ছুটিয়া গিয়া বাহিরে আসিয়া কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে—কে এখনি আসিবে, আসিলেই সাগ্রহে ধরিয়া তুলিয়া আনিবে।

অবিলম্বেই বহির্দ্দেশে বাদ্যভাণ্ড উঠিল। সভায় বিলোড়ন উত্থিত হইল। পরক্ষণেই দেখা দিল—চন্দন, আর শক্তি।

সভাস্থ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, মাথা নত করিয়া—অতিথি আসিয়াছে। চিত্ররথ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন এবং সসম্ভ্রমে উভয়কে লইয়া গিয়া পার্শ্বেই বসাইলেন—পূর্ব্ব-রচিত আর দুইটি রত্নাসনে।

অতঃপর সুরু হইল উৎসব—রাজনটির চঞ্চল নৃত্য। তারপর—অতিথির পরিচয়ের পালা। চিত্ররথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সভায় এক দুর্ব্বোধ্য উল্লাসধ্বনি উঠিল। উত্তরীয় বস্ত্রে রাজ-পুরোহিতের পদধূলি গ্রহণ করিয়া চন্দন ও শক্তির মাথায় স্পর্শ দিয়া সভার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, "আজ আমাদের গর্ব্বের দিন! আমাদের মাঝে আবির্ভাব হয়েছেন—বাঙ্গালার এক সাত্বিক তরুণ! রাজ-নিয়মে শক্তি রাজকন্যা—জাতির অগ্রদূত! তারই 'আমন্ত্রণ'—জাতির আশ্বাস সার্থক হয়েছে।" চন্দনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি আজ থেকে রাজ-জামাতা, আর আপনাদেরই একজন!" বলিয়াই আসন গ্রহন করিলেন।

এরপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন—রাজ-পুরোহিত। তাঁর দীর্ঘ দেহ, লম্বিত শ্মশ্রু, সংযত আবভাব সকলেরই মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করিল। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এ-সবের প্রয়োজন তোমরা জান। জাতির দরবার অহমিয়াকে একপাশ করে রেখেছে। এর প্রতিবিধান চাই। তাই, আজ আমন্ত্রণ বাঙ্গালার অতিথির, যাঁর বিশ্বে জাতির চূড়োয় দাঁড়িয়ে আছেন। এই বাঙ্গালীর রক্ত অহমিয়ার রক্তে মিশবে, মিশে তোমরা পাবে—তাঁর সন্তান, যা অহমিয়াকে একদিন উঁচুতে তুলে ধরবে।" বলিয়াই বসিয়া পড়িলেন।

পুনশ্চ চিত্ররথ উঠিলেন। উঠিয়া অত্যধিক হর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "রাজ-উক্তি আর কিছুই নেই। এইবার অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ—"

বাহিরে শঙ্খধ্বনি হইল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল সারি দিয়া শ্রেণীবদ্ধ তরুণী—তাদের এক হাতে শাঁক, অপর হাতে পাত্র ভরিয়া ধান-দূর্ব্বা। স্বর্গের দেবকন্যারা কিরূপ জানিনা, কিন্তু এদের মর্ত্তের নারীও বলা চলে না—এম্‌নিই তাদের রূপ, দেহের আকৃতি, মুখের গঠনে এম্‌নিই এক বিস্ময়! উহারা শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া বেদীমূলে পৌঁছিতেই অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে এক তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের নিষেধ পড়িল—"থামো! অহমিয়ার মেয়ে অত সস্তা নয়—"

সকলেই চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল—রাণী!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নত করিল।

রাণীর মুখে এক অলৌকিক দীপ্তি, চোখে স্থির-বিদ্যুৎ। একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইয়া কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া কহিলেন, "মেয়ের কল্যাণ দেখবে মা—রাজাও নয় রাজ-দরবারও নয়!" চন্দনকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ঠিক প্রশ্ন এখনও করা হয়নি—অহমিয়ার দান গ্রহণ উনি করলেন কিনা! এ প্রশ্নের জবাব অন্ততঃ আমি চাই!"

সভায় এক বিপুল আলোড়ন উঠিল সভাসদ্‌গণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ঠিক, ঠিক!"

অতঃপর সবাই নিস্তব্ধ। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। চন্দন একটিবার মাত্র রাণীর দিকে

তাকাইয়াই মুখ নীচু করিল, যেন প্রশ্নটার জবাব রাণীর নিকটই আছে, সে শুধু হাত পাতিয়া চাহিয়া লইবে।

এইবার রাণী চন্দনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, সে-দৃষ্টিতে নিছক অভয়ের বার্ত্তা ছাড়া আর কিছুই নাই। স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "ভয় খেয়ো না। স্মরণ রেখো, তুমি বাঙ্গালী—সত্যের উপর তোমার আসন।"

চন্দনের মুখখানা চকচক্ করিয়া উঠিল, যেন আচম্কায় কে এক ঝলক আলো ফেলিয়াছে। কহিল, "অহমিয়ার এ দান নয়, মা। বাঙ্গালীর জপের বস্তু।"

"হলো না। স্পষ্ট করে বল—শক্তি তোমার কে?"

"গুরু—নারীমন্ত্রে আমায় দিক্ষা দিয়েছে।"

রাণী এইবার একটু হাসিলেন। বলিলেন, "সবাই দেয়। পুরুষের খবর কেউ রাখতো না, যদি না নারীর কোলে পুরুষ বেড়ে উঠ্‌তো। পুরুষের পরিচয় কেউ পেতো না, যদিনা নারীর হৃদ্‌পিণ্ডে পুরুষ বেঁচে থাকতো। রসাতলে যেতো পুরুষ, যদিনা পুরুষের বিসর্জ্জনে নারীই ঝাঁপ দিত। কিন্তু আমার প্রশ্ন ও ত নয়।"

চোখের উপর ওই প্রতীমা, আর তাঁরই মুখে নারী-মহিমার অত্যাশ্চর্য্য বিশ্লেষণ—উভয়ে মিলিয়া চন্দনকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। মূঢ়ের ন্যায় মিনিট খানেক তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "উনি কায়া, আমি ছায়া।"

"তা কি হয়? নারীর স্বপ্নে—তোমরা শিব।

চন্দন বিপদে পড়িল। ছাইভস্ম আর কতকগুলা প্রশ্নোত্তর মনের ভিতর কাটাকাটি করিয়া একান্ত আনাড়ির ন্যায় বলিয়া ফেলিল, "উনি স্বর্গের দেবী, আমি মর্ত্তের নর।"

রাণী যেন এবার হাসি সাম্‌লাইতে পারিলেন না। সহাস্তে বলিলেন, "ও আবার এক খাঁটি মিথ্যে।"

"তবে এঁকেই জিজ্ঞেস্ করুন—"

"তোমার অপমান হবে। মন্ত্র পড়ে পুরুষ, মেয়ে নয়। তুমিই বল—"

"তা' পারেন না!"—বলিতে বলিতে সুমিত্রা প্রবেশ করিল। তার এক অভিনব বেশ—এলাইত কেশপাশ, বাহুতে পুষ্পবলয়, পরিধানে পট্টবস্ত্র, কণ্ঠে তুলসীর মালা। ধীরপদে সরিয়া আসিয়া বলিল, "বুকের বস্তুর পরিচয় দিতে কেউ কোনোদিন পারেনি, উনিও পারেন না।" একটা ঢোঁক গিলিয়াই আবার বলিল, "তা যদি পারতেন, তাহলে, পৃথিবীতে প্রেমিক থাকতো না—ঘরে ঘরে সয়তানের জয়গান উঠতো একথা তুমি জান, জান বলেই—আমাদের তুমি মা।"

রাণী যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া সুমিত্রার দিকে তাকাইলেন।

কিন্তু সুমিত্রা ঠকিবার পাত্রী নয়। একমুখ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "তা জানি! নইলে, মেয়ের মহিমা লোকালয়ে প্রচার হয় না।" একটু নিরব থাকিয়াই আবার সুরু করিল, "মা, আমাদের চোখে পড়ে—এই পৃথিবী, এই মানুষ, এই গাছ পালা, প্রকৃতির এই সব ঘরকন্না। কিন্তু স্রষ্টার রূপ থাকে চোখের আড়ালে। যেদিন স্রষ্টার রূপ চোখে পড়বে, সেদিন সৃষ্টির রূপ মিলিয়ে যাবে। মা, মানুষের বুকে জন্ম যে-সুখের, তার পরিচয় মেলে না। যেদিন মিল্‌বে, সেদিন পৃথিবীর বুকে মানুষ থাকবে না।" চন্দনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঁর বুকে জন্ম নিয়েছে শক্তি—বাইরে তার মূর্ত্তি নেই।"

রাণী তেম্‌নি নির্ব্বাক্ হইয়াই রহিলেন, যেন তাঁর অন্তর হইতে সমস্ত কাহিনী লক্ষ যোজন দূরে সরিয়া গিয়া পথ হারাইয়াছে—সহস্র ডাকেও আর ফিরিয়া আসিবে না।

সুমিত্রাও আর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিল না, সটান বেদীর উপর উঠিয়া গেল এবং চন্দন ও শক্তিকে হাত ধরিয়া তুলিয়া উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া উভয়ের হাত একত্র করিয়া বলিয়া উঠিল—"এদের পরিচয়—এই।"

অতঃপর যেমন নামিয়া পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবে, চিত্ররথ ডাকিলেন, "দাঁড়াও—

সুমিত্রা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

চিত্ররথ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি—অয়ন?"

সুমিত্রা মাথা নোয়াইল।

চিত্ররথ স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "হেতু যাই হোক্—ও-বেশ তোমার নয়! অভিষেক এইবার তোমার।"

রাজ-পুরোহিত কহিলেন, "রাজকুমারী এইবার তুমি।"

চিত্ররথ বলিলেন, "অতিথি-আমন্ত্রণের গৌরব এইবার তোমার।"

রাজপুরোহিত কহিলেন, "রাজ-নিয়ম।"

সুমিত্রা তেম্‌নিই নির্বাক্‌, তেম্‌নিই নতশির, যেন ধরিত্রীর এক অংশ হইতে অপর অংশে এখনিই অতিক্রম করিয়া পার হইয়া যাইবে—যেখানে অনন্তপ্রবাহী মুক্ত-সমীরণ মানবের খালি বুক ভরিয়া দেয়। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল, "যদি না মানি।"

জবাব দিলেন রাজ-পুরোহিত। বলিলেন, "না মান—রাজার শাস্তি—নির্বাসন।"

সুমিত্রা আর খানিক নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দশ

পুরাতন চন্দন নিঃশেষ হইয়াছে।

জ্ঞানের উন্মেষ যখন হয়-হয়, তখনই তার চন্দন জীবনযাত্রা সুরু করিয়াছিল এক অতি রুক্ষপথে। সেই পথই সে সচ্ছন্দে ঠেলিয়া দুর্বোধ্য এক আনন্দে অঙ্গ ভাসাইয়া এতদিন দিন কাটাইয়া আসিয়াছিল—অনুযোগ ছিল না, নালিশ ছিল না, অস্বস্তি ছিল না, যেন সেই পথই তার সত্য, সেই পথেই সে শিব-সুন্দরের মন্দিরে যাত্রা শেষ করিবে। অতঃপর সেই যে সেদিন খাম্‌কা এক রহস্যময়ী তার সম্মুখে পড়িয়া দুর্দান্ত নারী-মহিমায় তার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিল, সেইদিন—সেইক্ষণ হইতেই তার চলিবার ছকা-পথটা একটু একটু করিয়া সরিয়া গিয়া কখন নিশ্চিহ্ন হইয়াই মিলাইয়া গিয়াছে।

পরদিন ঘুম ভাঙিতেই সে দেখিল, শক্তি তার পদতলে একখানি কুশাসনে বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তার পরনে রাঙাপেড়ে গরদের সাড়ি, মাথার চুল এলো, কপালে সিঁদুরের টিপ। আসনের একধারে কোসা-কুশি।

চন্দন সবিস্ময়ে কহিল, "ওকি।"

শক্তি হাত নাড়িয়া উঠিতে নিষেধ করিয়া গলায় আঁচল ফেলিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আর একটু—একটু থাকো।" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল ও দ্রুতপদে একটি তাম্রপাত্র করিয়া জল আনিয়া চন্দনের পায়ে ঠেকাইয়া আলগোছে আঁচলে ফেলিয়া সহাস্যে কহিল "এইবার তোমার ছুটি।"

কিন্তু চন্দন ছুটি গ্রহণ করিল না। বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "একি হলো শক্তি?"

শক্তি বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "আমাকে কিছু বলছ?"

"বলছি—সেদিন তোমার জপে বসাকে আমাকে। আজ, আমার জপে তুমি?"

"আ-মি?—গরজ পড়েছে।" বলিয়াই শক্তি একমুখ হাসিয়া উঠিল। মুহূর্তপরে আবার গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল, "জপে আমি বসিনি। আমার ত যে মূর্ত্তি দেখছ সে আমার নয়। বিয়ের পর মেয়েমানুষ স্বামীর ঘর করে—তাঁর বুকের ভেতর। বাইরে যা দেখতে পাও, সে তার ওই ভেতরকার মূর্ত্তির ছায়া।" বলিয়াই আসন ও কোশাকুশি উঠাইয়া লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নয়, যে তর্ক চলিবে। কাজেই চন্দন চুপ করিয়াই রহিল।

ও ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই শক্তি মনে মনে এক খামখেয়ালি ছল তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার ত জাত গেল—আমাকে বিয়ে করলে?"

"আমার, না, তোমার?"

"তোমার। জাতে, অহমিয়া যে ছোট।"

"হতে পারে। কিন্তু, অহমিয়া তোমরা নও। মেয়ে-মানুষের জাত—মেয়েমানুষ।"

শক্তি যেন এক মারাত্মক ভুল ধরিয়া বলিল, "কি বলছ? সামাজিক কল্যাণে জাতের সৃষ্টি। নারীকে বাদ দিয়ে জাত হয় না।"

চন্দন যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, "আমিও তা অস্বীকার করছিনে। লক্ষ্মীপুজো চণ্ডালেও করে, কিন্তু তাই বলে, লক্ষ্মীঠাকরুণ 'চণ্ডাল' নয়। তেম্‌নিই জাতির প্রতিষ্ঠায়, জাতির কল্যাণে, জাতির স্বাস্থ্যে নারীর প্রয়োজন। আসলে তোমরা একটি—প্রয়োজন-মত পৃথিবীর কোটি কোটি জাতির ভেতর, কোটি কোটি মূর্ত্তি ধরে বিরাজ কর। শক্তি, তুমি নারী।"

চন্দনের চোখের উপর শক্তির চোখ ছিল, ধীরে ধীরে চোখ নামাইয়া লইয়া বলিল, "না। তোমার স্ত্রী—"

বলিয়াই শক্তি যেমন পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবার নিমিত্ত পা বাড়াইবে, চন্দন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও—"

শক্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

চন্দন একটিবার শক্তির দিকে তাকাইল, তাকাইয়াই মাথা নীচু করিল। পরক্ষণেই আবার মাথা তুলিয়া বলিল, "তোমাকে যদি না পেতাম!"

শক্তি স্থির কণ্ঠে জবাব দিল, "আমি পেতামই। আর কিছু?"

চন্দন কোন প্রশ্ন খুঁজিয়া পাইল না। অপিচ, এই মেয়েটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্য তার রাশি রাশি প্রশ্নের প্রয়োজন। কেন যে, তাহা সে জানে না, কেনবা তার অহেতুক সপ্রশ্ন অন্তর কবেকার কত বিস্মৃত কাহিনীর সূত্র হারাইয়া হঠাৎ আজ ব্যাকুল হইয়াছে! বার কয়েক মেয়েটির দিকে চোখ তুলিয়া, চোখ নামাইয়া—আবার চোখ তুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "তুমি রাজার মেয়ে—তুমিও?"

শক্তি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, "রাজসভার জের টান্‌ছ?"

চন্দন জানাইল—'হুঁ'।

"শুনেছ ত?"

"কিন্তু, বুঝিনি।"

"ওঁদের চোখে যে-মেয়েটি বকুবকে—'রাজার মেয়ে' হয় সেই-ই।" বলিয়াই শক্তি হাসিয়া মুখে কাপড় চাপা দিল।

সেই হাসির আভা চন্দনেরও মুখময় পড়িল। বিহ্বল নেত্রে তাকাইয়া বলিল, "তারপর?"

"সবই জান তুমি। জান বর খুঁজতে বেরুই।"

"তোমাদের দেশে মেলে না?"

"অজস্র। কিন্তু—" শক্তি কি বলিতে যাইতেছিল, চাপিয়া গেল।

কিন্তু, চন্দন রেহাই দিল না। জেদ ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "কিন্তু, কি?"

"তুমি ঘরবাসী হতে?"—বলিয়াই শক্তি হাসিয়া উঠিল।

চন্দনের সরল, নিষ্পাপ অন্তর জবাবটায় কি অর্থ গ্রহণ করিল, জানি না কিন্তু তার মুখখানা ঈষৎ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। একটু পরে, ধীরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ঠিক তাই-ই। তোমার জন্ম পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকতে, সহস্র মূর্ত্তি নিয়ে! তুমিই আজ বুঝিয়ে দিয়েছ, মানুষের জীবন মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় কত, আর সৃষ্টির কাছে ঋণ এর কতটা। শক্তি, তুমিই হয়েই মানুষ পায় সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশ—তোমাদের স্নেহে বড় হয়ে বেড়ে ওঠবার। একান্তভাবে যে নিজেকে তোমাদের সঁপে দেয়,সেই-ই সৃষ্টির মুখ রাখে,যে দেয় না—সে নিষ্ফল হয়।" সহসা কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া বলিয়া উঠিল, "শক্তি, আজ আমি মানুষ—তোমার 'আশীর্ব্বাদ!'

শক্তি জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিল "বল্‌তে নেই। আমি ছোট—তুমি স্বামী।"

"স্বীকার করি। কিন্তু, শিব উমার কাছে হাত পাতিয়াছিলেন—কেন বল্‌তে পার?"

"উমাকে পরখ করবার জন্যে—তিনি কত ছোট।"

চন্দন হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই বুঝি শিবকে অন্ন দিয়েছিলেন তিনি?"

"নইলে, নিজেকে ছোট করা হয় না। যদি পেছিয়ে যেতেন তা হলে, তাঁর নারী-মহিমায় অহঙ্কারের কলঙ্ক পড়তো।"

চন্দন শক্তির মুখপানে তাকাতেই, শক্তি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "অবাক হয়ো না। উমার আর-এক ও চমৎকার আত্মহত্যা।" পরক্ষণেই কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া কহিল, "অমনিধারা পুরুষের হাতের চেষ্টায় নারী তুলে দেয়—দেহের রক্ত, বুকে উঠিয়ে দেয়—বুকের আত্মা।

"না। তুলে দেয় নারী—মুখের ওপর মুখ, বুকের ওপর বুক।"—বলিতে বলিতে সুমিত্রা প্রবেশ করিল; তার মুখে একমুখ হাসি, হাতে একগাছি পুষ্প মালিকা। সটান শক্তির কাছে আসিয়া বলিল, "মেয়েমানুষের এই এতবড় দেখা-সাক্ষাৎ উপহারটা এক নিছক মিথ্যায় ঢেকে মাটি করে দিচ্ছ?—হাতে রক্ত তুলে সত্যি কেউ দেয় না, কাযেই ও কথার মূল্যই নেই। বাকি—আত্মা। কিন্তু, মানুষ জন্মেছে দেহ নিয়ে। আমরা জানি, চিনি দেহকেই—দেহেরই সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয়। কাজেই সত্যকার বস্তু হচ্ছে দেহ—আত্মা নয়। আমাদের দেবার যা কিছু—এই দেহেরই-

ছোঁয়াচ। ভেতরে যদিই বা কিছু থাকে, সে ওই স্পর্শের ভেতর দিয়ে আপনিই যাবে—দেহের রাস্তা ছেড়ে তুমি তাকে নিয়ে যেতে পার না।"

সুমিত্রার এই আকস্মিক আবির্ভাব উভয়কেই বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এইবার উহাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইল, উহারা একটু সহজ মাত্রায় নামিয়াছে। কিন্তু তার বেশভূষার চাক্ষুষ বিবরণ সেদিন অপেক্ষা শক্তিকে আজ বেশি করিয়াই বিব্রত করিয়া তুলিল। বলিল, "তা হোক্। কিন্তু, হঠাৎ তোমার একি সখ, সুমিত্রা ?"

সুমিত্রা মুচকিয়া হাসিয়া জবাব দিল, "হাত বাড়িয়ে আত্মাকে মেলে না, মুখ বাড়িয়েও মুখের কাছে কাউকে পাইনে।—তাই।" বলিয়াই চন্দনের দিকে ফিরিয়া তার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "কিন্তু আমার এই উপহার—" বলিয়াই চন্দনের হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া তার গলায় হাতের মালা গাছটা পরাইয়া দিয়াই শক্তির দিকে আড় চোখে চাহিয়া কহিল, "বেশ মানিয়েছে। এইবার বুকে বুক, মুখে মুখ।" বলিয়াই মুখের একমুখ আলো ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

শক্তির মুখটিও সঙ্গে সঙ্গে এক দুঃসহ সরমে রাঙা হইয়া অবনত হইল। আর চন্দন। সে চাহিয়া দেখিল—তার মুখের কাছাকাছি দাঁড়াইয়া একখানি ছবি, সে নারী। তার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুখ নামাইয়া লইল, দেখিল, নিয়ে—বিষম অন্ধকার। আবার চোখ তুলিল, আবার—সেই। চন্দন আর স্থির থাকিতে পারিল না, অবশ কণ্ঠে ডাকিল—'শক্তি।'

শক্তি একবার আড়চোখে তাকাইয়াই ঠোঁটে দাঁতে চাপিয়া হাসিয়া মুখ নামাইল।

আবার সেই চমক। আবার ডাকিল, "শক্তি—"

শক্তির সাড়া নাই, শব্দ নাই।

"শক্তি, শক্তি—"

"বল—'বউ'।"

"বউ—"

"আবার—"

চন্দনের এইবার পা উঠিল। এক পা—আর এক প বাড়াইয়াই জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বউ, বউ—"

বলিয়াই দুহাত ছড়াইয়া যেমন সম্মুখে ভাঙিয়া পড়িবে, শক্তি খানিকটা পিছাইয়া গিয়া বলিল, "ছিঃ—ও নয়।

চন্দন থতমত খাইয়া গেল।

শক্তি তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া তার হাত দুটি ধরিয়া ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "আমার অপরাধ নিয়ো না।" হাত ছাড়িয়া বলিল, "চোখ বেঁধে দিয়ো না। তোমার ধর্ম—সন্ন্যাস, ব্রত—গৃহত্যাগ, কামনা—সংযম। অতুল সম্পত্তি—কোন্ সহধর্ম্মিনী এর ভাগ ছাড়তে পারে, বলত ?"

চন্দনের পা দুখানা যেন ভাঙিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া শক্তির দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তুমিই না বলেছিলে, ও-পথের পথিক—পৃথিবীর সকল লোক ?"

"সে তুমি নও। আমি যে তোমার বুকে জড়িয়ে রয়েছি।" বলিতে বলিতে শক্তির চোখদুটি সজল হইয়া উঠিল। আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তুমি স্বামী—তোমাকে ভাঙবার আমার অধিকার নেই।"

ওই চোখ, ওই মুখ—নারীর বুকের গোপন অর্থ সুস্পষ্ট করিয়াই দিয়াছে। তত্রাপি চন্দনের মুখ চোখ যেন একান্ত অবুঝ হইয়াই শক্তির মুখের উপর এক একরোখা দীপ্তি ফেলিল। অস্থির কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু মাতৃত্বের গৌরব,—সৃষ্টির দায়িত্ব ?"

শক্তির মুখে ঈষৎ ম্লান হাসির আভা দেখা দিল। চন্দনের পাশে বসিয়া তার হাত দুটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যি, এ লোভকে ঠেলতে আমরা পারিনে। কিন্তু—" হঠাৎ তার হাতের জোর কমিয়া গেল, মুষ্টি খুলিয়া গেল। তারপর—তারপর নিজেকে যেন কোনওরূপে হিঁচড়িয়া টানিয়া তুলিয়া একপাশে দাঁড় করাইয়া মুখটি নীচু করিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

অপর পক্ষ বলিয়া উঠিল, "চুপ কোরে রইলে ?"

শক্তি মুখ উঠাইল চন্দনের দিকে, কিন্তু মুহূর্ত্তেই মুখটি আবার ঝুলিয়া পড়িল। আবার উঠাইল—আবার দেখিল, সেই মূর্ত্তি। তার নেত্র কাঁপিয়া উঠিল, মুখও নামিয়া পড়িল—আবার। তারপর তেমনিই নতমুখী হইয়া পিছন ফিরিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর চন্দন ?

সেত নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! যেন, নিঃশেষ হইয়াছে তার কাহিনী, থামিয়াছে তার গান, নিবিয়াছে তার আলো! শুধুই মূঢ়ের ন্যায় সেইদিকে নেত্রপাত করিয়া রহিল। কতক্ষণ রহিল—তাহা সে টের পাইল না। এক সময়ে আচমকায় বুঝিতে পারিল—তার বুকটা মেয়েটি চলিবার পথে ছড়াইয়া রহিয়াছে!

এগারো

আজ সুমারের বিচার হইবে। বিচারক—রাণী। অভিযোগ আনিয়াছেন—চিত্ররথ। বিচারকক্ষ লোকে লোকারণ্য—অপরাধীর শাস্তি হইবে!

সুউচ্চ আসনে বসিয়া রাণী। নিম্নে এক পার্শ্বে বসিয়া চিত্ররথ আর রাজ-পুরোহিত, অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান সুমার —হস্তে শৃঙ্খল, বেশ রুক্ষ। তৎপার্শ্বে—কারারক্ষী।

রাণী সুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমার পরিচয় ?"

"অহমিয়া।"

"বর্ত্তমান পরিচয় ?"

"অহমিয়ার অতীত নেই!"

রাণী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন—তাঁর দৃষ্টি সুমারের দিকে, সুমারের দৃষ্টি মাটির উপর। অতঃপর কহিলেন, "অহমিয়া তুমি এখন নও—এখন বন্দী!"

সুমার মুখ তুলিয়া নির্ভিককণ্ঠে কহিল, "অহমিয়া বন্দী হয় না, বন্দীও অহমিয়া হয়না!"

"কারণ ?"

সুমার একটিবার মুখ নামাইল। পরক্ষণেই মুখ তুলিয়া জবাব দিল, "কারণ—অপরাধ অহমিয়া কোনদিন করেনি!"

রাণী ভ্রূ কুঁচকিয়া কহিলেন, "কোনদিন করবে না—তার প্রমাণ ?"

"প্রমাণ—করে না।"

"মিথ্যা কথা—" রাজ-পুরোহিত ঈষৎ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর তীব্র দৃষ্টি সেইদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, যেন আগুনের আঁচ পড়িয়াছে! পরমুহূর্ত্তেই বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিলেন, "আপনি ?—আপনি!"

রাজ-পুরোহিত সসম্ভ্রমে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ মা!"

"কিন্তু এত মন্দির নয়!"

"রাজার কল্যাণে সর্ব্বত্রই আমার স্থিতি প্রয়োজন!"

রাণী এইবার একটু হাসিলেন। হাসিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, "হতে পারে! কিন্তু, এখানে কল্যাণ রাজ্যের, রাজার নয়! সুতরাং—"

চিত্ররথ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাণী—"

"না! আমি—বিচারক!" স্থির গম্ভীরকণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়াই রাণী রাজ-পুরোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বিচারকের আদেশ—আপনি মন্দিরে যান।"

বিচারকক্ষে এক বিপুল আলোড়ন উঠিল! সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, যেন এক কঠিন আতঙ্ক মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য সুরু করিয়াছে! চিত্ররথ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, যেন তাঁর পদতল হইতে ধরিত্রী সরিয়া যাইতেছে! ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "রাণি! রাজ-পুরোহিত—"

রাণী তৎক্ষণাৎ স্মিতমুখে জবাব দিলেন, "জানি। কিন্তু, আমি রাজ্যের পুরোহিত!"

"চমৎকার!"—এক প্রবল উচ্ছ্বাস রাজ-পুরোহিতের কণ্ঠ দিয়া নির্গত হইল। অতঃপর রাণীর সম্মুখে সরিয়া আসিয়া এক-একটি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! আমি, তোমার অক্ষম সন্তান! পুরোহিত তুমি শুধু রাজ্যের নও—আমারও! জীবনের অন্তিমপ্রান্তে এসে পৌঁছিছি, কিন্তু সঞ্চয় ছিল না। আজ তুমি আমাকে গর্ব্বহীন এক আত্মা অর্পণ করেছ! বুঝতে পেরেছি মা, আজ যে-দেশে তোমার মত রাণী থাকে, সে দেশে প্রয়োজন থাকে না—রাজারও, মন্ত্রীরও!" বলিয়াই নতশির হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

একটু পরেই রাণী সুমারের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সুমার, ও ছাড়া ?"

"আর কিছুই নেই!"

"তোমার ওপর অভিযোগ—রাজ-নিষেধ মাননি! অস্বীকার কর ?"

সুমার বিনীত কণ্ঠে জবাব দিল, "না।"

"এর অর্থ কি হয়—জান ?"

"জানি !—রাজ-শাস্ত্রের অভিধানে—'অপরাধ' অহমিয়া শাস্ত্রের অভিধানে—অনপরাধ !"

রাণী সুমারের প্রতি স্থিরচোখে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তার মানে ?"

"নিজেই নিজের রাজা—অহমিয়া ! পরের আদেশ নিয়ে সে জন্মায়নি, পরের নিষেধ দিয়েও জন্মকে সে ছোট করে না ! অন্তরের আদেশ আর প্রান্তরের নিষেধ একনয়, মা ! একটার সৃষ্টি—আর্ত্তনাদে, আর একটার—উৎসবে ! উৎসবের আনন্দ মাড়িয়ে আর্ত্তনাদকে পথ দেওয়া—অপরাধ নয় !"

"আর্ত্তনাদ ? কি, সে ?"

সুমার মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাণী অধিকতর গলার জোর দিয়া বলিলেন, "বল—"

এইবার সুমার আস্তে আস্তে মুখ তুলিল। ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমার অন্তরের নিষেধ !"

রাণী বিস্মিত নেত্রে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন ?"

কিন্তু সুমার তেমনই নিরুত্তর হইয়া রহিল।

"বল্‌তে পার না ?"

"না ! তাহ'লে, আমার কলঙ্ক হবে !"—বলিতে বলিতে এক ম্লান উল্কার ন্যায় সুমিত্রা প্রবেশ করিল। যেন এক রুদ্ধ রোদন হঠাৎ লোকালয়ে মূর্ত্তি ধরিয়াছে ! কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই পুনশ্চ কহিল, "মা, মেয়েমানুষের বুক খালি থাকে না, রাখতে নেই—তাই, আমিও রাখিনি ! আমার বুকের ভেতর—উনি !"

চিত্ররথের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। বিভ্রান্ত চক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সুমিত্রা, রাজদরবারের নির্ব্বাসিতা তুমি—'বাইরের নিবেদন' !"

সুমিত্রা আনতমুখে জবাব দিল, "তা জানি ! জানি বোলেই—ওঁর জন্যে রাজার শাসন চেয়ে নিয়েছি—কারাগার !"

রাণী এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "যদিও, নিষেধের দিন ওকে টান দিয়েছিলে—তুমিই !"

সুমিত্রা রাণীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তৎক্ষনাৎ জবাব দিল, "না মা ! আমার বুকের ভেতর—ওঁর আর্ত্তনাদ !" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "ওই দিনই ছিল, ওঁর সবচেয়ে সুযোগের দিন—সন্ধ্যা নেমেছিল অন্ধকার নিয়ে, রাত্রি নেমেছে—দুঃস্বপ্ন নিয়ে, বাড়ী বাড়ী শব্দ ছিল না, মানুষে মানুষ ছিল না, রাস্তায়-রাস্তায়—শ্মশান !"

রাণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "রাজ-নিয়মে তুমি অপরের—ওকে প্রশ্রয় দিয়েছ কেন ?"

সুমিত্রা নির্ভীককণ্ঠে কহিল, "জানিনে ! এইমাত্র জানি, আচমকায় একদিন উনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন—আমি বুকে উঠিয়ে রেখেছি ! আর, এ-ও জানি মা, আমার নিয়মে—আমি ওঁরই !"

"তুমি রাজ বিদ্রোহী—" চিত্ররথ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

রাণী হাত তুলিয়া শাসন ফেলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "বিচারক আমি !" মুহূর্ত্তেই সুমারের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "বন্দি, তুমি মুক্ত !" বলিয়াই কারারক্ষীকে শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর সুমিত্রার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আর তুমি—সুমিত্রা, রাজ-আইনে তুমি অপরাধী। দণ্ড—নির্ব্বাসন !"

সকলেই চমকিয়া উঠিল, যেন বাজ পড়িয়াছে ! এক দুঃসহ নিস্তব্ধতা সকলকেই নতমুখ করিয়া দিল।

স্থির চক্ষের জ্যোতিঃ ফেলিয়া সুমিত্রা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। একটিবার সুমারের দিকে তাকাইল, চোখোচোখী হইতেই চোখ নামাইয়া লইল। অতঃপর তেমনিই নতনেত্রে পিছন ফিরিয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, রাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিলেন "দাঁড়াও—"

সুমিত্রা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাণী তেমনি করিয়াই কহিলেন, "ঋণ রেখে গেলে যাওয়া হয় না !" বলিয়াই নীচে নামিয়া আসিলেন। তারপর সুমারের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া সুমিত্রার হাতে যেমন গুঁজিয়া দিবেন সুমিত্রা পিছাইয়া গেল। অকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "এ হয় না মা ! তা হলে, রাজ-নিয়মে কলঙ্ক পড়ে ! অন্তরের ওপর না থাক, আমাদের দেহের ওপর রাজার অধিকার আছেই আছে। রাজ-নিয়মে, আমার দেহটা—ওঁর নয় !"

"সুমিত্রা—"

"না মা। এ হবার নয়।"

এদিকে আচমকায় যেন এক ঝড় আসিয়া চিত্ররথকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। চোখদুটো বড় করিয়া সুমিত্রার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুমিত্রা! রাজার তুমি মুকুট—অহমিয়ার সরস্বতী! তুমিই আজ বুঝিয়ে দিয়েছ এনিয়ম—অনাচার। আজ থেকে এই অনাচার—অচল। অতঃপর তাহার দিকে সরিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া ব্যগ্রব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা, অন্তরের অধিকারই বড়—"

সুমিত্রা অবিচল কণ্ঠে জবাব দিল, "তার চেয়েও বড় —রাজ-নিয়ম।"

"তাও এখন অচল।"

সুমিত্রার মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল, বলিল, "সে আজ! কিন্তু, আমি যে আগেকার।" একটা ঢোক গিলিয়াই পুনশ্চ কহিল, "রাজা, এ দেহ ওঁর কোন কাজেই আসচে না। নির্ব্বাসনের যাত্রী আমি—একাই।"

"আর একজন—আমি!"—বলিতে বলিতে শক্তি ফুঁড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল, যেন জলে ভেজা এক মাটির প্রতিমা হঠাৎ সচল হইয়াছে। কখন যে সে আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই, এই তার অতি আকস্মিক আবির্ভাবে বিচারকক্ষে জড়পদার্থ পর্য্যন্ত যেন সজীব হইয়া বিস্ময়ের বিলোড়ন তুলিল।

চিত্ররথ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় তাহার দিকে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি—"

"হ্যাঁ রাজা! আমি—আমিও। বল্‌তে এসেছি—এ রাজ্যের রত্ন আমি আর নই।" বলিয়াই শক্তি মুখ নামাইল। মুহূর্ত্তেই আবার মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিল, "রাজ-নিয়মে সব করেছি, কিন্তু, আমার নিয়মে কিছুই পারলাম না। গৃহত্যাগী আমার স্বামী—তাঁকে অপবিত্র করবার অধিকার আমার নেই।"

রাণীর মুখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, তাঁর কাছে এই 'রামায়ণ' পূর্ব্ব হইতেই রচনা হইয়া আছে। প্রশ্ন করিলেন, "তুমি একা—চন্দন?"

"তাঁকে মুক্তি দিয়েছি।"

"তুমি?"

"নইলে কে দেবে, মা?"

রাণী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিলেন, "তিনি রাজার সম্পত্তি।"

এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় হইল না। শক্তি অবিলম্বেই জবাব দিল, "না! রাজার সম্পত্তি—আমি।"

"আর, তিনি?"

শক্তি মুখ নামাইয়া সলজ্জকণ্ঠে কহিল, "আমার।" পর-ক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "মা! ঠকিয়ে সব নেওয়া চলে, কিন্তু কোলে ছেলে নেওয়া চলে না।"

রাণীর মুখটি চকচক করিয়া উঠিল, যেন কোথা হইতে এক অলৌকিক জ্যোতি আসিয়া পড়িয়াছে। সেই মুখটি সুমিত্রার দিকে ফিরাইয়া একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "সুমিত্রা, ঠকিয়ে স্বামী ছাড়তে পার, কিন্তু দেহের শক্তি—বোন্ ছাড়তে পার না।" বলিয়াই শক্তির হাতটা সুমিত্রার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রাণী মেয়ে দুটির মাথার উপর হাত তুলিয়া—অশ্রুনিরোধ কণ্ঠে বলিলেন, "যাও! এ রাজ্যের বাইরে যে দেশ, সেখানে গিয়ে প্রচার কর—শুধুই নিজেদের তোমরা জয় করনি! জয় করে গেছ, মা, অহমিয়ার রাজাকে, আর রাণীকে!" বলিয়াই তাড়াতাড়ি চোখে হাত চাপিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীচরণদাস ঘোষ

সেদিন আর আজ!

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আকাশে জেগেছে প্রসন্নতার হাসি। মনের বিষণ্ণতা গিয়েছে উড়ে। নীলাকাশে দেখা যায় সারা সাদা চপল মেঘের চঞ্চল নৃত্য। মনের কোণেতে কে যেন বাজিয়ে ওঠে বাঁশি—প্রকৃতির প্রসন্নতাব মতই তা যেন সুন্দর,—হৃদয় তার ডাকে দেয় সাড়া,—মনে মনে যা হোক একটা কিছু করবার বাসনা হয়ে ওঠে দুর্ব্বার।

শরৎ এলো।

আকাশে এলো শরৎ—মনের গোপন গুহায় অনুভব করা গেল তার সোনালি আলোর শিখা, প্রাণে পরশ পাওয়া গেল এক স্বপ্নময় সুন্দরের আবির্ভাব!

পুজোর ছুটি হ'য়ে গেল। ধুঁয়ো আর কয়লা, কোলাহল আর চাঞ্চল্য দেহে-মনে বুলিয়ে দিয়েছে অবসন্নতার একটা পুরু প্রলেপ। কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। তাই পুজোর ছুটীর সঙ্গে আরও কিছু ছুটী নিয়ে বেশ কিছু দিনের জন্যে বিশ্রাম নেব ঠিক করেছি।

ঠিক করেছি মধুপুরে যাবো।

এই যাওয়ার পেছনে আছে একটা ছোট্ট ইতিহাস।

প্রায় বছর পনের আগেকার কথা।

'ফাইনাল্স পরীক্ষা দেব ঠিক করেছি। তাই কোলকাতার কর্ম্মকোলাহলের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বেশ একটু নিরিবিলি জায়গায় লেখাপড়া কর্‌ব বলে মধুপুরে চলে এলাম। সঙ্গে এলেন মা, বাবা ও আমার ছোট বোন।

জায়গাটা আমার বেশ ভালো লাগ্‌ল। এই আকাশ ছোঁয়া বিশাল মাঠ, এই উন্মুক্ত নীলাকাশ আমার মনের ভেতর যেন বুনে তুল্‌ল এক অপূর্ব্ব কবিতা-যার ছন্দের তালে তালে রক্তের ভেতর জেগে ওঠে এক অপূর্ব্ব রিনিঝিনি।

অঙ্কের বই থেকে মুখ তুলে চেয়ে থাকি এই প্রকৃতির দিকে আর হারিয়ে ফেলি নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির এই প্রাচুর্য্যের মাঝে!

সঙ্গীহীন দিনগুলো। কিন্তু তার জন্যে বিশেষ অসুবিধে হয় না। চিরকালই আমি একটু নির্জ্জনতাপ্রিয়।—আর এখন নির্জ্জনতা আমার পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য্য যে!

সেদিন জোরে জোরে পা ফেলে খুব খানিকটা বেড়িয়ে বাড়ী ফির্‌ছি। ফটকের ভেতর থেকেই শুনতে পেলাম মেয়েলি গলার এক টুক্‌রো মিষ্টি হাসি···ড্রয়িং-রুম থেকে ভেসে-আসা। কণ্ঠস্বর অপরিচিতার!

কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক—আর সে কারণেই ড্রয়িং-রুমে খোঁজ পড়ল একটা বইএর। দেখি আমার বোনের সঙ্গে এক অপরিচিতা তরুণী গল্পে মেতে উঠেছে। কাল ভেলভেটের জাপানী স্লিপারের ভেতর থেকে তার সাদা আঙুলগুলোকে আরও আশ্চর্য্য রকমের সাদা লাগল। মাথার চুল থেকে তার নেবে এসেছে একটা লম্বা বিনুনি···সেখান থেকে ঝরে পড়ছে এক হাল্‌কা মিষ্টি সুগন্ধ। বেশভূষা তার নিতান্ত স্বল্প—মনে হ'ল এই স্বল্পতাই তাকে বুঝি এনে ফেলেছে এক কল্পলোকে। চকিতে একবার তার দিকে চেয়েই মুখ নাবালাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না সে কতটা সুন্দর।

বোন্ বল্‌ল, এসো দাদা। এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি সুমিতা সেন—আর ভাই ইনি আমার দাদা।

তার পরের দিন। বিকেলে স্নান সেরে বেড়াতে বেরিয়েছি। সারা দুপুর অঙ্ক কষায় মাথার ভেতর সমস্তটা যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে। মাঠের ভেতর নেবে পড়লাম। পথ নেই...কিন্তু পথ করে নিতে কতক্ষণ

হঠাৎ দেখি দূরে মাঠের কোণে কে একটি মহিলা আস-

ছেন। সঙ্গে তাঁর কেউ নেই। আর একটু এগুতেই চিন্‌লাম, এ সুমিতা; আর বুঝলাম এদিকে ও যখন চলেছে নিশ্চয়ই তখন আমাদের বাড়ীতে ও যাবে—কারণ এদিকে আমাদের বাড়ী ছাড়া আর কারও বাড়ী নেই।

আমার গতি মন্দীভূত করে আন্‌লাম। সাম্‌নে একটা ছোট স্রোত—নদী বল্‌লে তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখান হয়। দুপুর বেলায় বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। তাই সেটার স্রোত বেশ পুষ্ট।—কয়েক জায়গায় হাঁটুর ওপর পর্য্যন্তও গভীর জল হবে। কিন্তু এই স্রোতের নাড়ীনক্ষত্র আমার বেশ ভাল করেই জানা। কোন্ পাথরের ওপর পা দিয়ে কোথা থেকে কতটুকু লাফিয়ে কোন্ পাথরটির ওপর পড়লে নির্ব্বিঘ্নে পার হওয়া যায় তা আমি বেশ জানি।

কিন্তু কৌতূহল হ'ল—দেখি সুমিতা পার হয় কি করে। ধীরে ধীরে এমন ভাবে স্রোতটির দিকে এলাম যে সুমিতাও সে সময়ে এসে পড়্‌ল ওপারে।

আমাকে দেখে সে বল্‌ল, কি করে' পার হই বলুন দিকিনি?

নিতান্ত সহজ সুরেই উত্তর দিলাম, এই পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে এটার ওপর আস্তে লাফিয়ে পড়ুন। তারপর এখান থেকে এটার ওপর পা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে আসুন।

আয়ত আঁখিতে বিস্ময়ের বন্যা এনে সে বল্‌ল, তা হ'লেই হয়েছে আর কী! পা-টা একবার ফস্‌কাক্...আর পপাত ধরণীতলে।

বল্‌লাম, ধরণীতলে নয়...জল তলে!

সে হেসে উঠল।

বল্‌লাম, তা হ'লে এক কাজ করুন না। আমার এই ছড়িটা নিয়ে পার হ'য়ে আসুন।

সে বল্‌ল, ছড়ি দিয়ে জল তাড়িয়ে ত আর আসা যায় না।

বল্‌লাম, তা হ'লে কাপড় ভিজিয়ে আসা ছাড়া আমি ত আর উপায় দেখছি না!

খানিক চুপচাপ।

হঠাৎ সুমিতা কথা বলে উঠল, আপনি একটা পা ঐ পাথরের ওপর দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিন। আমিও এখান থেকে নেবে ঐ পাথরটার ওপর থেকে হাত বাড়ালে আপনার হাতটা ধরতে পারব। তারপর চোখ বুজে এক মস্ত লাফ। ব্যাস্—তাহ'লেই ওপারে।—কি বলেন?

...কিন্তু, আপনি যদি পড়ে যান্?

...আপনাকেই তা হ'লে আমাকে কাঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে।

তার কথার ভেতরকার ছেলেমানুষির মিষ্টি সুরটুকু বেশ ভালো লাগল। বল্লাম, আচ্ছা...আসুন তাই।

সেই নির্দ্দিষ্ট পাথরটার ওপর থেকে যথাসম্ভব হাতটা বাড়ালাম। সে তার শাড়ীটাকে বেশ ভাল করে' গুছিয়ে নিয়ে ওপার থেকে আমার হাতটা চেপে ধর্‌ল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন কি রকম অবশ হয়ে গেলাম।

সে লাফাল। কিন্তু বেশ বুঝলাম্ তার লাফানটা এপারে এসে পৌঁছবার পক্ষে একটুও উপযুক্ত হয় নি। উপায়ান্তর না দেখে তার পিঠের ওপর আর একটি হাত দিয়ে একরকম করে এপারে নিয়ে এলুম।

বল্লুম, Simply hopeless...এটুকুও লাফিয়ে আস্‌তে পারেন না?

একটু হেসে সে উত্তর দিল, কি করে পার্‌ব, বলুন? আপনাদের মত আম্‌রা ত আর গেছো হই না।

শরীরটা একটু খারাপ। বিকেলের ট্রেনে বাড়ীর সবাই দেওঘর চলে গেছে। তাই বাড়ীতে আছি একা। বাড়ীর বাইরে একটা ডেক-চেয়ারের ওপর আধশোয়া অবস্থায় হাতে ইতিহাসের বইটা নিয়ে পড়ছি। ক্রমশঃ আলো মিলিয়ে এলো। বইয়ের অক্ষরগুলো একে একে চোখের ওপর থেকে মিশিয়ে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শরৎকাল...আকাশটা কি রকম সুন্দর গাঢ় নীল!—কার আয়ত আঁখির মতই যেন তার গভীরতা!

সমস্ত আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আকাশটায় একটি দু'টি করে তারার ঝিকিমিকি জেগে উঠল। পায়ের তলার লম্বা ঘাসগুলো চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগল। বইয়ের পাতাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল।

হঠাৎ পরিচিত স্লিপারের শব্দ শুনলাম। শুনেই বুঝলাম সুমিতা আসছে। কপালে হাত রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে

যেন দেখতে লাগলাম তারার স্পন্দন। ইচ্ছে করে অপ্রয়োজনীয় শব্দে গেট্‌টা বন্ধ করে দিয়ে সে ভেতরে এলো। আমাকে যেন সে দেখতেই পায় নি। চটির এলোমেলো শব্দ করে সে নিঃসঙ্কোচে ভেতরে চলে গেল। গেটের কাছে দেখি তাদের চাকরটা দাঁড়িয়ে। তাকে বললাম, ভজুয়া...শ্রেমার দিদিমণি এখন যাবে না—তুমি যেতে পার।

সে চলে গেল।

আবার আমি আকাশের দিকে মন দিলাম...যেন শুনছি কটা তারা ফুটল। সমস্ত বাড়ীময় ঘুরে কাউকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে আমাদের পুরোনো চাকর রামচরণকে সুমিতা জিজ্ঞেস করল, হাঁরে...তোর দিদিমণি কোথায় গেল? আজ বিকেলে ত তাদের কোথাও যাবার কথা ছিল না।

সে উত্তর দিল, হঠাৎ দিদিমণির দেওঘর যাবার সখ হ'ল, তাই বাবু মার সঙ্গে সে চলে গিয়েছে। রাত সাড়ে এগারটায় তারা ফিরবে।

আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সুমিতা বলে যেতে লাগল, তা হ'লে আর কি করি বল্। বাড়ীই ফিরি।...বিকেলটা মিছিমিছি কাটল।—আমি যেন একটা মূর্ত্তিমান্ উপেক্ষার জিনিষ।

রামচরণের "গিন্নিপনা" হঠাৎ বেড়ে উঠল। সে বল্‌ল, সে কি দিদিমণি—তুমি এখুনি যাবে কেন? দাদাবাবু ত বসে রয়েছে—তাঁর সঙ্গে গল্প-স্বল্প কর। আমি ততক্ষণ তোমাদের চা-টা দিয়ে যাই।

খানিক এগিয়ে এসে সুমিতা রামচরণকে যেন উদ্দেশ করে বলে চল্‌ল, ওঃ বাবা—তোমার দাদাবাবু আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে—তাহ'লেই হ'য়েছে। কাজ কি বাপু এখানে থেকে, বাড়ী চলে যাই।

কিন্তু বেশ বুঝলাম তার কথা আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক শুনতে পায় নি। তবুও আমি নির্ব্বাক্...আকাশের মাঝে যেন হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে।

খানিক চুপচাপ।

হঠাৎ পিঠের ওপর একটা সাঙ্ঘাতিক চিমটি অনুভব করলাম। চম্‌কে উঠে চেয়ে বল্‌লাম, চিমটি কাটছ কেন?

...আজকাল তুমি কানে কিছু কম শুনছ কি না!

...তোমার চোখের দৃষ্টিও যথেষ্ট ক্ষীণ হ'য়ে গেছে। আমাকে যেন তুমি দেখতেই পাও নি।

...জানিনে বাপু। তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করে' লাভ নেই। বাড়ী চল্‌লুম।

...আচ্ছা তবে Good-night.

...Good-night.

কিন্তু ফটকের কাছে ভজুয়ার দেখা না পেয়ে সে বল্‌লে, ভজুয়া কোথায় জান?

...তা জানি বৈ কি। সে বোধহয় এতক্ষণে বাড়ী পৌঁছে গেছে।

...বাড়ী?—সুমিতা যেন আকাশ থেকে পড়ল।...আমি এখন বাড়ী যাই কি করে?

...কেন? যেমন করে এসেছিলে ঠিক তেম্‌নি করেই।

...একলা?

...ক্ষতি কি?

...না বাপু—তা আমি পারব না।

...কেন?

...তা জানিনে। তুমি চল আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। লক্ষ্মীটি...

একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বল্‌লুম, নিজের এখন গরজ কিনা—তাই লক্ষ্মীটি, না? তা অবলা জাত তোমরা... আচ্ছা পৌঁছেই না হয় দেব।

অন্য সময় হ'লে সে নিশ্চয়ই তর্ক করত। কিন্তু আমাকে রাগালে নিজের অসুবিধা হবে ভেবেই বোধহয় সে বিশেষ কিছু বলল না।

মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এলো। বললাম, কিন্তু একটা সর্ত্তে..

কৌতূহলী হ'য়ে সে বল্‌ল, কি, শুনি?

চাঁদের আলোয় ভরা মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লাম, ঐ মাঠের ভেতর দিয়ে যেতে হ'বে।

অন্য উপায় না দেখে সে রাজী হ'ল।

কি তিথি মনে নেই...তবে আকাশে খানিকটা চাঁদ উঠেছে। হাওয়া বইছে...গা-টা শির্ শির্ করে উঠ্‌ল। সেই স্রোতটার কাছে এসে পৌঁছুলাম। সুমিতা বল্‌ল, পার হই কি করে?

...কেন, সেদিনকার মত লাফিয়ে।

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে সে বল্‌ল, হ্যাঁ, তারপর এই সন্ধ্যেবেলায় পাথরের ওপর পড়ে হাত পা ভাঙি আর কি?

...তাহ'লে চল, বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাক্। এই জন্যেই ত বলি একটুখানি গেছো হওয়া দরকার।

...হুঁ, তা ত' বলবেই—নেহাত এখন সুবিধে পেয়েছ কিনা।—তার পরেই কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, পাগল আর কি—আবার অতটা ঘুরে বাড়ী যাবো?

...এ ত আচ্ছা বিপদে পড়লুম দেখছি। লাফিয়েও পার হ'তে পারবে না, অথচ রাস্তা দিয়ে যাবার কথা বললে 'পাগল'ও বলবে।

...কেন? সোজা বুদ্ধি মাথার ভেতর একটুও যদি থাকে। তুমিই ত আমাকে পার করে দিতে পার?

...কেন? আমি কি মুটে?

...আর আমিই একটা মোট না কি?

হতাশ হ'য়ে বললাম, নাঃ—কথায় পারব না।

একটু হেসে সুমিতা বলল, সুবুদ্ধি হ'য়েছে দেখছি।

কাপড়টাকে শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে বললুম, হুঁ...নাও, প্রস্তুত ত?

...অপ্রস্তুত হবার কারণ দেখছি না।

তাকে পাঁজাকোলা করে' তুলে নিলাম। হঠাৎ আমার শিরায় শিরায় যেন বেজে উঠল হাজার তারার রিনি ঝিনি, বক্ষ স্পন্দন হ'তে লাগল দ্রুত তালে। স্রোতের ওপর দু'টো পাথরে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আলো ও আঁধারের চুম্বনে পায়ের তলার জলটা জল জল করছে। কতকগুলো এলোমেলো চুলের ভেতর দিয়ে সুমিতার মুখের ওপর চাঁদের আলো ছলে উঠছে। হঠাৎ নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললুম। কি যে করছি সেদিকে কোন খেয়ালই রইল না। তাকে বুকের ভেতর নিবিড় করে চেপে ধরলুম...সমস্ত যেন কি রকম গোলমাল হ'য়ে গেল।

তারপর থেকে দীর্ঘ পনেরটি বছর কেটে গিয়েছে। ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে চাকরিও পেয়েছি...কেমন করে ঠিক মনে নেই সুমিতার সঙ্গে আমার বিয়েও হ'য়ে গেছে।

আজ আবার মধুপুরে এসে পৌছুলুম। কত পরিবর্তনই চোখে পড়ল। আমাদের পুরোনো মধুপুর এটা যেন নয়।... এ যেন হারিয়ে ফেলেছে তার আকাশের প্রাচুর্য্য, সেখানকার তারার স্পন্দন যেন এসেছে মন্দীভূত হ'য়ে। আলো রয়েছে প্রচুর...কিন্তু বড় তীব্র সে আলো, কোন রূপই যেন নেই তার ভেতর। সবই আছে অথচ যেন বড্ড ফাঁকা ফাঁকা।

একদিন বিকেলে আমি আর সুমিতা বেরিয়ে পড়লুম। ইচ্ছে ছিল আমাদের সেই আগেকার বাড়ীতে যাবার। সেখানে পৌছুলাম। বাড়ীর মালিক মারা গিয়েছে। জীর্ণ শীর্ণ সংস্কারহীন অবস্থায় সেটা যেন ধুঁকছে পৃথিবীর ওপর। কি রকম একটু ব্যথা বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। যেন কোনও প্রিয়জনের হ'য়েছে অপমৃত্যু। বাড়ীটার বাগানে খানিক ঘুরে বেড়ালাম। সদর দরজায় তালা লাগান—তাই ভেতরে যেতে পারলাম না।

সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। সেই মাঠটার দিকে এগিয়ে চললুম। গা-টা কেন জানিনা কি রকম ছম্ ছম্ করে উঠল।—নির্জ্জন জায়গা, সঙ্গে সুমিতা, গায়ে তার দামী গয়না।

আজও চাঁদ উঠেছে, কিন্তু তার আলোটা যেন কি রকম প্রাণহীন...পাণ্ডুর। গল্প করতে গেলাম, কিন্তু নিজের কানেই সে স্বর কি রকম বিশ্রী লাগল। সেই স্রোতটার কাছে পৌছুলাম। মনে হ'ল তার জীবনেও পরিসমাপ্তি হয়ে এসেছে। তার আগেকার প্রাণের উচ্ছলতা যেন নিবে গেছে...মিলিয়ে গেছে। সেটা যেন চলেছে শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে—সেটা যেন আর পারেনা নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে।

স্রোতের ধার দিয়ে এগিয়ে চললাম। সেই জায়গাটা আন্দাজে ঠিক করলাম...সুমিতাকে যেখানে পাঁজাকোলা করে' পার করেছিলাম পনের বছর আগে। সে কথা মনে আসায় আজ যেন কি রকম হাসি পেতে লাগল...মনে হ'ল এ যেন নেহাত ছেলেমানুষী।

সুমিতাকে বললাম, একটু বসবে নাকি?

তাড়াতাড়ি সে উত্তর দিল, পাগল আর কি? সাপে একটা ছোবল দিলেই ফর্সা।—কবিত্ব করা তখন বেরুবে। খুকিটার গা আজ একটু গরম দেখে বেরিয়েছি, ছোট খোকাটার টনুসিল বেড়েছে। হিম লাগলে তোমার শরীর খারাপ হয়...তার ওপর এ আবার আশ্বিন মাসের হিম।

বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। মনের একটা কোণ যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা বলে মনে হতে লাগল। সে দিনের সেই আমি, সেই 'সুমিতার' সঙ্গে আজ পনের বছর পরের এই 'আমি'র এই 'সুমিতার' যেন মিল নেই একটুও। তারা যেন 'তারা' হয়ে ফুটেছে আকাশে।

ফিরে যেতে চাই তাদের কাছে...যাদের চোখে প্রভাতের আলো জাগায় নেশা, রাত্রির অন্ধকার বুনে তোলে এক অপূর্ব্ব মায়াজাল। কিন্তু সেই যোগসূত্র আজ ছিন্ন হয়ে গেছে...মাঝে রয়েছে পনেরটি বছরের সুদীর্ঘ ব্যবধান।

সুদীর্ঘ পনেরটি বছর। এর ভেতর কত হ'য়েছে মিলন, কত হ'য়েছে বিচ্ছেদ...কত অশ্রু গিয়েছে বাষ্প হয়ে, কত হাসি গিয়েছে মিলিয়ে... জীবনের সুর গিয়েছে কেটে... দৃষ্টিশক্তি হয়েছে অদ্ভুত অন্য রকম।

ভাবি কেন এমন হয়?

কোনও উত্তর পাই না...দীর্ঘ পনেরটী বছরের ব্যবধান হেসে ওঠে হাহা করে।

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কাপ্তেন কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস্

একটী ক্ষুদ্র আনাড়ি গ্রাম্য বালক পথ হেঁটে হুইট্‌বি বন্দরে আসচে।

তার চেহারা দেখে মনে হবার কথা নয় যে সে জগতে কোনদিন কিছু করতে পারবে।

বহুকাল আগের-হুইটবি। সরু সরু রাস্তা, দুধারে পুরোনো বাড়ী। নোংরা ড্রেণ পথের ধারে। মাঝে মাঝে জাহাজী জিনিষপত্রের দোকান—নোঙর, পাল, দড়াদড়ি, কপিকল, শেকল।

ফুঙ্কল, মদিরা দ্বীপ—যেখানে কুক তাঁর জাহাজগুলিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। নাবিকগণকে স্কার্ভি রোগ হ'তে মুক্ত রাখবার জন্যে তিনি বহুল পরিমাণে পেঁয়াজ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছলেন।

আগে যেখানে কাজ করতো, সেখান থেকে চাকরী ছেড়ে পালিয়ে আসচে সে। তার উদ্দেশ্য, সমুদ্রে নাবিকের কাজ নেওয়া এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করা।

সবাই ভাবছে, ছোকরার মাথা খারাপ আছে।

জলের ধারে ছোট বড় পালের জাহাজ, তিমি মাছধরা বোট—অমুক জাহাজখানা লোহা ও পাথর বোঝাই করে ব্রিমেন যাবে, ওখানা ড্যান্‌জিগ, আর একখানা ফটকিরি বোঝাই দিয়ে যাচ্চে সেন্ট্ পিটার্সবুর্গ।

৯

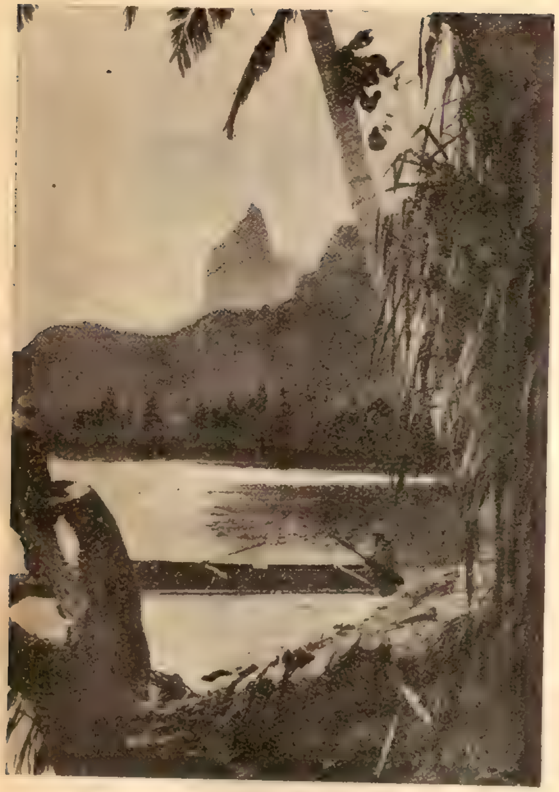

পপেটোয়াই বে এবং গীর্জ্জা পাহাড়। মুরিয়া, সোসাইটি দ্বীপ।

জেলেরা বন্দরে রোদ পোয়াচ্চে, মুখে লম্বা লম্বা পাইপ।

সারাদিন এরা গল্প করে কাটায়, দেখে মনে হয় এদের বুঝি কোনো কাজ নেই করবার। কিন্তু এদের কাজ আরম্ভ হবে দুপুর রাতের পরে; তার পর থেকে জার্ম্মান সমুদ্রের ঢেউ ও তুষার-শীতল বায়ুর সঙ্গে এদের সংগ্রাম হবে সুরু।

গ্রাম্য বালকটীর পিঠে একটা বোঁচ্‌কা, নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ তার পরণে, যা দেখচে তাতেই অবাক হয়ে সেদিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

দু-একজন জেলে তার রকম-সকম দেখে কৌতুকপূর্ণ স্বরে জিগ্যেস করলে—নাম কি ছোকরা?

ছেলেটী বল্লে—জেম্‌স্ কুক্।

তারপর ছেলেটী ভয়ে ভয়ে বল্লে সে কোনো জাহাজে নাবিকের কাজ খুঁজচে। আছে তাদের সন্ধানে এমন কোনো চাকুরী খালি?

কেউ কেউ তার বাড়ী, বাপ-মার কথা, বয়েস জিগ্যেস্ করলে। সবাই তাকে বোঝালে, জাহাজের কাজে বড় কষ্ট। কুকুর বিড়ালের মত জীবন নাবিকদের, জাহাজ যখন সমুদ্রের ওপর থাকে, খাটতে খাটতে প্রাণ যায়, খাওয়া অনেক জাহাজে এত খারাপ যে আধ-পেটা খেয়ে থাকতে হয়। এত অল্প বয়সে জাহাজে কাজ কেন খুঁজচে সে?

ছেলেটী বল্লে তার বয়েস আঠারো। তার বাবা মাটি-কাটা কাজে দিনমজুরী করে। তাদের গ্রামে একটী দয়ালু মহিলার কাছে ছেলেটী সামান্য লেখাপড়া শিখেচে। তারপর সে মাঠে মজুরের কাজ করেচে; দিন কতক একটা মুদীর দোকানে খাতা লিখত। কিন্তু এসব তার ভাল লাগেনা। সে সমুদ্রে নাবিকের কাজ করবে।

দৈত্যের বৃদ্ধাঙ্গুলি (Giants' Thumb), কেপ ফাউলউইণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড।
কুক তাঁর গতিপথে এখানকার বায়ুর দ্বারা অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে 'ফাউলউইণ্ড' নামকরণ করেন।

সবাই অবিশ্যি হেসে উঠল। জাহাজের চাকুরী জোগাড় করা অত সোজা নয়। বহুদিন জলের ধারে ঘোরাঘুরি করতে হবে তবে যদি কিছু হয়।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেউ জানতো না, সে ছেলেটী যে সাধারণ ছেলে নয়, ভবিষ্যতে সে হবে কাপ্তেন জেম্‌স্ কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস্।

কোন বিবরণ জানা যায় না। তবে উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অতি অপকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে, সামান্য একটু জায়গার মধ্যে জড়সড় হয়ে শুয়ে থেকে এবং উত্তর সমুদ্রের ভীষণ শীতবাত্যা সহ্য করে তিনি এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রাহ্য করতেন না।

কুক ষ্ট্রেট, নিউজিল্যাণ্ড। আবিষ্কারকের নাম চিরস্মরণীয় করবার জন্য এই স্থানের এবং আরও ১৪।১৫টি স্থানের নামকরণ কুকের নাম দিয়ে করা হয়েছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সে সময়ের কোনো নির্ভরযোগ্য ম্যাপ ছিল না। ১৭৬৮ সালের একখানা ঐ অঞ্চলের ম্যাপের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের একখানা ম্যাপের তুলনা করলে এসকল বোঝা যাবে। দু-চারটা দ্বীপের নাম পুরোনো ম্যাপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাদের অবস্থিতি স্থান সম্বন্ধে মানচিত্রকারের কোনো ধারণা ছিল না। কাপ্তেন কুক প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ আবিষ্কার করেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

সেক্সপিয়রের জীবনের অনেকখানিই যেমন অজ্ঞাত, কুকেরও তাই। কিছুদিন হুইট্‌বিতে আসার পর কুক একখানা ছোট জাহাজে চাকুরী পেয়ে সমুদ্রে বার হয়েছিলেন। কিন্তু সে জাহাজের দৌড় ছিল ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের বন্দরগুলো পর্য্যন্ত। এই জাহাজে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি তেরো বছর কাটিয়ে দিলেন। এই তেরো বছরের

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী পরস্পরের খুব নিকটে এসেছিল। তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে এই ব্যাপার নিয়ে খুব একটা সাড়া পড়ে যায়। শুক্রগ্রহ যখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আসবে পৃথিবীর, সেই সময় পৃথিবীর নানা-স্থানে ঘাটি স্থাপিত হয়েছিল শুক্রগ্রহ ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে।

ঐ সালের ৩রা জুন ঐ ঘটনার দিন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। গ্লাসগো ও আরও দু-একটা বড় সহরে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহরবাসীদের সন্ধ্যার পরে আগুন জ্বালতে নিষেধ করা হোল। কারণ অতিরিক্ত ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে শুক্রগ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধে হবে না।

একখানা জাহাজ পাঠালেন প্রশান্ত মহাসমুদ্রের টাহিটি দ্বীপে, সেখান থেকে এই বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের বেশী সুবিধে হবে বলে। কাপ্তেন কুকের ওপর এই জাহাজ চালানোর ভার পড়ল।

জাহাজে সে-কালের দুজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ছিল। সার জোসেফ ব্যাঙ্কস্ ও প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ লিনিয়াসের ছাত্র ডাঃ সোলানডার।

কুকের জাহাজে ৪১ জন সাধারণ মাল্লা ও ১২ জন জাহাজের কর্ম্মচারী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাবিকেরা পশুত্বের জন্যে প্রসিদ্ধ, কুকের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগল যে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন, মূর্খ লোকগুলো এত দীর্ঘ দিন সমুদ্রে শান্তভাবে থাকবে কি না।

জাহাজ প্লিমথ সাউণ্ড ছাড়ল আগষ্ট মাসের শেষে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ম্যাডিরা দ্বীপে নোঙর করলে। ম্যাডিরাতে লোকে শুনলে জাহাজে দুজন বড় বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁরা প্রকৃতির সব রহস্য অবগত আছেন। বেজায় লোকের ভিড় হোল তাঁদের দেখবার জন্যে। ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ের একটী মঠ এখানে ছিল। মঠের কয়েকটী সন্ন্যাসিনী এসে তাঁদের বল্লেন—একটা উপকার করবেন আমাদের? ভাল জলের ঝরণা কোথায় আছে খুঁজে পাচ্ছি নে। ভালো জলের বড় অভাব হয়েচে। বলে দিন না কোথায় খুঁড়লে ভাল জল পাবো?

বহু বৎসর পরে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা বুঝেছিলেন যে পানামা খাল কাটানোর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বর ও পীত জ্বরের দমন আবশ্যক, নয়তো মজুর ও কর্ম্মচারীর দল জ্বরে মরে গেলে খাল কাটবে কে? কুক্‌ও তেমনি বুঝেছিলেন শত সমুদ্র পার হয়ে যদি সুদূর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে তাঁকে পৌছতে হয়, তবে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে জাহাজে স্কার্ভি রোগ না দেখা দেয়। টাট্‌কা শাকসব্জি বা ফলমূল দীর্ঘকাল না পাওয়ার দরুণ এই রোগ হয় বলে কুক যখন যে বন্দরে জাহাজ থামাতেন, সেখান থেকে প্রচুর পরিমান ফল ও তরিতরকারী কিনে নিতেন। কিন্তু জাহাজের মাল্লারা এ-সব খেতে রাজি হোল না। তারা লবণাক্ত গোমাংসের বড় বড় টুক্‌রা খেতে অভ্যস্ত এবং খোসা-লাগা ওট মিলের

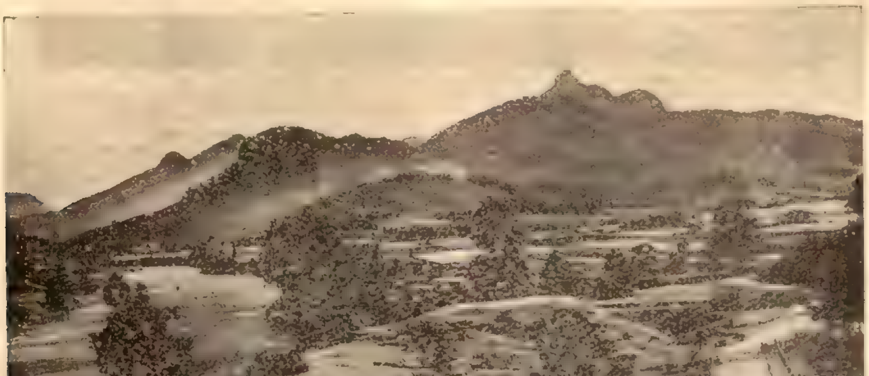

অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি দৃশ্য।

এই দ্বীপ-মহাদেশকে কুক ব্রিটেনের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বামদিকে টুইড্ নদী। পশ্চাতে সর্ব্বোচ্চ শিখরটি কুক নামকরণ করেছিলেন মাউন্ট ওয়ার্ণীং (Mount Warning)। প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপ অথবা অভিযানের ঘটনালক্ষণ নিয়ে কুক তাঁর আবিস্কৃত স্থানগুলির নামকরণ করতে ভালবাসতেন, যথা Cape Tribulation, Lizard Island, Botany Bay, Providential Channel, Mount Warning ইত্যাদি।

বিস্কুট। কাপ্তেন কুক কড়া হুকুম জারি করলেন, প্রত্যেক মাল্লাকে সপ্তাহে দশ সের পিঁয়াজ খেতেই হবে। একজন মাল্লা আদেশ মানে নি, তাকে বারো ঘা বেত মারবার হুকুম হোল।

কেপ হর্ণ পার হবার পরে আর কোথাও টাটকা শাক সব্জি পাওয়া গেল না। কাপ্তেন কুক জাহাজে রাশীকৃত নারিকেল নিয়েছিলেন বাহামা দ্বীপপুঞ্জ থেকে, এবার সমুদ্রের ধার থেকে বোঝা বোঝা সবুজ ঘাস উঠিয়ে জাহাজের খোল ভর্ত্তি করলেন। হর্ণ পার হবার পরে সবাইকে কাঁচা নারিকেল ও সেই ঘাস একত্রে সিদ্ধ করে তাই খেতে বাধ্য করলেন। জাহাজে হৈ চৈ পড়ে গেল।

নিউ হেব্রাইডস অধিবাসিগণের আনুষ্ঠানিক ঘন্টা। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে নৃত্যভূমি আছে। জ্যোৎস্নারাত্রে অধিবাসিগণ সেই সকল ভূমিতে উপস্থিত হয়ে উৎসবাদি করে। ঘন্টাধ্বনির শব্দ কর্ণবধিরকারী।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাহাজ টাহিটি দ্বীপে পৌঁছে গেল। নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করে কুক তাদের বিবরণ লিখলেন এবং রয়েল সোসাইটীর সম্মানার্থ এদের নামকরণ করলেন 'সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ'।

পলিনেসিয়ার এই সব দ্বীপবাসীদের সরল আচার ব্যবহার ফিল্মের কল্যাণে আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। কুক ও জাহাজের লোকেরা অধিবাসীদের এই প্রথম দেখে তো অবাক। একটা ছোট দ্বীপের রাণীকে ডাঃ সোলানডার একটা পুতুল উপহার দিলেন, তাতে সেই দ্বীপের বাহান্ন বছর বয়সের লম্বাচওড়া জোয়ান রাজা সেই পুতুলটা দেখে এত মুগ্ধ হোল যে উক্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে দূত পাঠিয়ে প্রস্তাব করলে এ দেশের একটী ভাল মেয়ের সঙ্গে সে ডাঃ সোলানডারের বিবাহ দিতে রাজি, ঐ রকম আর একটা পুতুলের পরিবর্ত্তে।

টাহিটি পরিত্যাগ করবার পূর্ব্বে কুক সে-দ্বীপে কমলালেবু, তরমুজ, লেবু ও আরও অনেক রকম ফলমূলের বীজ বপন করেন। বনে কয়েকটী মুরগী ও কুকুর ছেড়ে দিয়েছিলেন। যে যে দ্বীপে তিনি গিয়েছিলেন প্রায় সব স্থানেই সর্ব্বাগ্রে তিনি কিছু ফলের বীজ ছড়িয়ে দিতেন। এ থেকে পরবর্ত্তী কালে অনেক দ্বীপের উদ্ভিজ্জ সংস্থানের প্রকৃতি বদলে যায়। টাহিটি দ্বীপে দুজন মাল্লা জাহাজ ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেল।

কুক তাদের ছেড়ে যেতে রাজি হোলেন না, দ্বীপের সর্দ্দারদের সাহায্যে অনেক অনুসন্ধানের পরে উপকূল থেকে বহুদূরে এক নিভৃত পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাদের পাওয়া যায়। তারা এর মধ্যে সেদেশের দুটী মেয়ে বিয়ে করে দিব্যি সংসার পাতিয়ে বসেচে।

তারা বল্লে কি হবে জাহাজে চাকুরী করে? বেশ আছি।

মেয়ে দুটী দেখা গেল বেশ গৃহকর্ম্মনিপুণা। রুটীফলের গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে সেঁকতে পারে, বেশী কথাবার্ত্তা বলে না, গাছের ছাল থেকে কাপড় তৈরী করতে ও নারকেলের ছোবড়া থেকে মাছ ধরবার সুতো পাকাতে তারা একেবারে

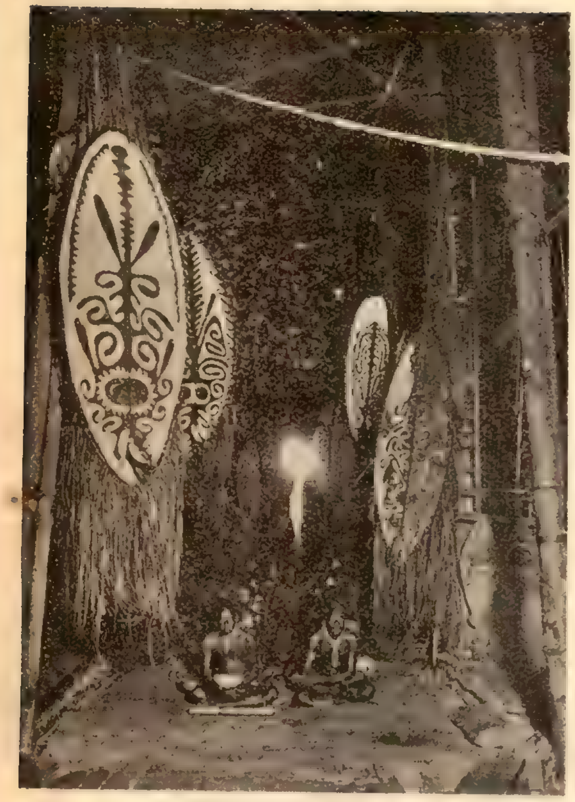

ডুবু অর্থাৎ ক্লাবগৃহের ভিতরকার দৃশ্য।
এই সব ক্লাবগৃহে বহু সংখ্যক বড় বড় মুখস চাল তরোয়ার এবং অন্যান্য অস্ত্রাদি রক্ষিত থাকে। দুদিকে মাচার উপর বহু সংখ্যক মাথার খুলিও সঞ্চয় করে রাখা হয়।

ওস্তাদ। সুতরাং মাল্লা দুটী সুখেই আছে, কেবল অভাব অনুভব করে তামাকের জন্যে। তামাক জিনিসটা এ-সব দেশে একেবারে অজ্ঞাত। এমন সুখের ঘরকন্না তাদের, কাপ্তেন কুক ভেঙে দিয়ে তাদের ধরে আনলেন জাহাজে। পালাবার শাস্তি বারো ঘা করে বেত। হায় নিষ্ঠুর সংসার!

একদিন একটা লোক ছুটে এসে জানালে দ্বীপের সর্দ্দার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েচে হঠাৎ—বোধ হয় আর বাঁচবে না। ডাঃ সোলেনডার রোগী দেখতে গেলেন। সর্দ্দার টুবুরাই খুবই অসুস্থ বটে, রোগ যে কি কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল জাহাজের এক নাবিকের কাছে খানিকটা তামাকের পাতা চেয়ে নিয়ে সর্দ্দার সেটা গিলে খেয়ে ফেলেছিল—তারপরই এই অবস্থা। ডাঃ ব্যাঙ্ক রোগীকে খুব বেশী করে ডাবের জল খাওয়াতে বলে চলে এলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠল।

সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে কুক পশ্চিমমুখে রওনা হয়ে ১৫০০ মাইল সমুদ্র পার হয়ে নিউজিল্যাণ্ডে এসে পৌছুলেন। কুক নিউজিল্যাণ্ডে যাবার পূর্ব্বে ইউরোপের ভূগোল-বেত্তাগণের নিকটও ও অঞ্চলের ভূমিসংস্থান সম্বন্ধে ধারণা খুব সুস্পষ্ট ছিল না, অনেকে বিশ্বাস করতো ইউরোপ বা এসিয়ার মত দক্ষিণ দিকেও একটা মহাদেশ আছে। এই সব ধারণার সত্যতা পরীক্ষা করবার আগ্রহে কুক অনুকূল বাতাস পরিত্যাগ করে দূর অজানা মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি দেন।

প্রথমে তাঁরা নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী মাওরীদের নরমাংসপ্রিয়তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এখন যেখানে পিকবর্ণ সহর, নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর পূর্ব্ব উপকূলে ওই স্থানে কাপ্তেন কুক জাহাজ নোঙর করেন। কিন্তু কোনো মাওরী জাহাজের কাছে আসতে রাজী হয় না। তারা বলে পাঠালে—শ্বেতকায় মানুষেরা যে নরখাদক নয় তার প্রমাণ কি?

ক্রমে মাওরীদের ভয় দূর হল, জাহাজের নাবিকেরা মাওরীদের গ্রামে গিয়ে দেখলে তারা অপ্রত্যাশিত রূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের বড় বড় নৌকা আছে, দূর সমুদ্র পথে এই সব নৌকায় যাওয়া যায়। মাওরীদের গ্রাম অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং তাদের স্বাস্থ্যবিধি এত ভাল যে স্পেনের রাজার প্রাসাদেও তা দুর্লভ।

কুকের বিবরণ পড়লে জানা যায় মাওরীদের তিনি খুব অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। একবার জাহাজের এক নাবিক কি একটা জিনিষ চুরি করে এনেছিল মাওরীদের গ্রাম থেকে। কুক অপরাধীর উপর বারো ঘা বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

শুধু অজ্ঞাত অঞ্চলের ভৌগলিক সংস্থান নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কাপ্তেন কুককে কেউ দোষ দিতে পারতো না, কারণ প্রকৃতপক্ষে কুকের প্রধান উদ্দেশ্য তাই ছিল বটে।

কিন্তু কুকের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কুক মাওরীদের সামাজিক ভোজের বর্ণনা করেচেন, পাখীর গানের বিবরণ লিখেচেন, তার মধ্যে এক ধরণের পাখীকে তিনি বলেচেন, 'ঘণ্টা পাখী'—বনের মধ্যে ঠিক যেন রূপোর ঘণ্টা বাজচে মনে হয়, পাখীটি যখন ডাকে। একটা পাহাড়ের ছবি এঁকেচেন

এবং নিউজিল্যাণ্ডের সমুদ্র উপকূলের বালিতে কতভাগ লোহা কত ভাগ সিলিকন মিশ্রিত আছে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেচেন। পৃথিবীর সাহিত্যে কুক্ একজন শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-লেখক, নতুন দেশের অত খুঁটিনাটি বর্ণনা খুব কম বইয়ে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি ৪০০ শত প্রকারের গাছপালা ও নানা রকমের সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহ করেন।

কুকের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ নাবিক আবেল টাসম্যান এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন কিন্তু জগতের চোখের সামনে তাকে এমন ভাবে তিনি ধরেন নি।

কুক সাড়ে ছমাস ধরে সমস্ত নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলভাগে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে প্রত্যেক স্থানের সমুদ্রজলের গভীরতা, চড়া বা প্রবাল-বাঁধের অবস্থান ইত্যাদি সহ তাদের চার্ট তৈরি করেন। তবুও তো সে-সময় আধুনিক কালের অনেক উন্নততর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব ছিল।

বোয়া নাই

এইখানে ভাষা নিয়ে মিশনারীগণকে ভারী বিপদে পড়তে হয়। :পাপুয়ানদের প্রত্যেক গ্রামের ভাষা আলাদা। এমন বহু কথা আছে যার উচ্চারণ এক কিন্তু অর্থ বিভিন্ন। একটি মিশনারী—যিনি নিয়মিত কাছাকাছি দুটি গ্রামে প্রচারকার্য্য করতেন—সর্ব্বদা একটি কথাকে ভ্রমাত্মক অর্থে ব্যবহার করতেন। এক গ্রামে সে কথাটির অর্থ স্বর্গদূত কিন্তু অন্য গ্রামে লাল আলু!

উনবিংশ শতাব্দীতে একদল ফরাসী ভৌগলিক এই সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করে কাপ্তেন কুকের প্রস্তুত চার্ট ও ম্যাপের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং তাঁদের দলপতি পত্রে বলেছিলেন—কাপ্তেন কুকের চার্ট এত নিখুঁত যে আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয়েচে সেকালে এত নিখুঁতভাবে চার্ট তৈরী করা কিরূপে সম্ভব হয়েছিল।

কুক দেশে ফিরিবার সময়ে সোসাইটী দ্বীপের একজন অধিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। লোকটার নাম ওমাই। বিলেতে হৈ চৈ পড়ে গেল। তার আগে বিলেতের লোকে এমন ধরণের মানুষ দেখেনি। কাউপার তার উদ্দেশে কবিতা লিখলেন, সার জোশুয়া রেনল্ডস তার ছবি আঁকলেন, ডাঃ জনসন্ তাকে একদিন নিজের বাড়ী নিমন্ত্রণ করে তার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের খুব কম অধিবাসীর অদৃষ্টে এমন সম্মান জুটেছে।

বড় বড় লোকের ড্রইংরুমে লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের বড় বড় বাটিতে ওমাই নিমন্ত্রিত হয়ে যেতে লাগল। এমন সম্মান ও সুযোগ পেয়েও ওমাই কিন্তু একটুও বদলালোনা। শেখার মধ্যে ওমাই খুব ভালো দাবা খেলতে শিখলে। সে সময়ের অনেক ওস্তাদ দাবা-খেলোয়াড়কে ওমাই খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল।

পুনরায় সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হয়ে কুক ওমাইকে তার নিজের দেশে পৌছে দিলেন। তাকে বেশ ভালো একখানা বাড়ী তৈরী করে দেওয়া হল, নাবিক-বন্ধুরা তাকে সভ্য মানুষের ব্যবহার্য্য বাসন পত্র দিলে—কুক তাকে একখানা বাগান করে দিলেন এবং নানারকম ফলমূলের বীজ উপহার দিলেন। লোকটা কিন্তু ঘর-গৃহস্থালীর কাজে আদৌ মন না দিয়ে বাড়ার সামনে লোক জড় করতো ও দিন রাত তাদের বিশেষতঃ গ্রামের তরুণীদের প্রশংসমান দৃষ্টির সামনে মহা আনন্দে বিলেত থেকে আনা একটা হার্ম্মোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইত।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হাওয়াই দ্বীপবাসীদের হাতে কাপ্তেন কুক নিহত হন্।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সয়দাবাদ

শান্তি পাল

সয়দাবাদের ঘাটে,—
গঙ্গা যেথায় ছল ছল চোখে চ'লেছে গাঁয়ের বাটে।
একদিকে চর ধূ ধূ—ওড়ে বালি, আর দিকে শুধু খাড়ি,
তারি দুই পারে, সারসের দল ব'সে আছে সারি সারি।
রাজহাঁস যত আশে পাশে তার করিতেছে জলকেলি,
মনে হেন লয়, শ্বেত উৎপল পাপ্‌ড়ি দিয়াছে মেলি।
পাছে ভেঙ্গে পড়ে পাড়—
মাঝে মাঝে তাই বাঁধ দিয়ে তা'র ঘিরিয়াছে চারিধার।
বাধা নাহি আর মানে,—

ভাঙ্গে আর গড়ে, ধূলামাটি মাখি উন্মদ অভিমানে।
বড় ব্যথা পেয়ে ধরণীর বুকে তিলে তিলে পলে পলে
পতিতপাবনী সুরধুনী ধনী চলেছে সাগর জলে।
পথের দুঃখ উথলিয়া উঠে—চ'লিতে চ'লিতে তার,
মাঝে মাঝে তাই উপছিয়া দেয় ভাসাইয়া দুই পাড়!

সয়দাবাদের ঘাটে,—
আজিকে হেথায় বসিয়া বসিয়া প্রভাত বেলাটি কাটে।
ঘাটে ঘাটে দেখি সারি সারি নাও—মাঝি হাঁকে বারে বারে
গোয়ালপাড়ায় হাট জমে এলো—কে যাবিরে ওই পারে!
ব্যাপারির দল সারে সারে যায় আনাজের বোঝা নিয়া,
পারাইয়া নদী পাটনীর হাতে পারাণীর কড়ি দিয়া!
বাসনের ডাঁই রাখি,—
গাঁয়ের বধূরা পাটেতে বসিয়া মাজিতেছে বালি মাখি।
কেহ দেখি তীরে জটলা করিছে, কেহ পায় ঘসে মাটি,
কেহ বা চ'লেছে নদীর মাঝারে, পা দুটি টিপিয়া হাঁটি!
কেহ দেখি সেথা কাপড় ছাড়িছে, ভিজা চুলগুলি ঝাড়ে,
কেহবা বাহুর কাঁকনের শোভা দেখাইছে বারে বারে।
কেহ দেখি ব'সে এলাইয়া কেশ, বসন আঁটিছে গায়,
কেহবা সেথায় গ্রীবা হেলাইয়া অবাক নয়নে চায়।
সরিষা মটর ক্ষেতে,—
কে যেন সেথায় বিছায় আসন, হলুদ শাড়ীটি পেতে।
সোণালি রোদের কাঁচা রঙ মাখি, ফুলে ফুলে কথা কয়,
ভিনগাঁর যত পথিকেরে দেয় জীবনের পরিচয়।
বেড়ার গায়েতে তারি,—
সিমফুলগুলো জড়ায়ে জড়ায়ে পরেছে গোলাপী শাড়ী।
লাউলতা দেখি মাচান বাহিয়া তাহারে বাঁধিতে যায়,
নিরাশায় শুধু জলিয়া পুড়িয়া মাটিতে লুটিছে হায়!
সয়দাবাদের ঘাটে,—
এমনি করিয়া বসিয়া বসিয়া বিকাল বেলাটি কাটে।
গাঁয়ের বধূরা দলে দলে আসে ঘোমটা টানিয়া মাথে,
বালুর চরেতে কলসী রাখিয়া জল-উৎসবে মাতে।
তাদের চরণ-কমল পরশে উঠিল জলের ঢেউ,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিল সে সুর, শুনেছে কি তাহা কেউ?
এ-পারের ঢেউ ও-পারে লাগিয়া কূলে আছাড়িয়া ভাঙে,
ও-পারের ঢেউ এ-পারে লুটিয়া চরণ চুমিতে মাঙে।
বাতাস উঠিল জোরে,—
তাদের কেশের সুবাস মাখিয়া চারিদিক গেল ভরে।
এ-পারের বায় ও-পারে যাইয়া উলসি কাঁপায় বন,
ও-পারের বায় এ-পারে আসিয়া চাহে কারে অনুখন।
দেখা শোনা হ'ল কত,—
এ-পারে ও-পারে চিঠি বিনিময় চলিল যে অবিরত।
এ-পারের মেয়ে ও-পারে দেখিল শুধু খাড়ি আর চর,
ও-পারের ছেলে দেখিল এ-পারে ছায়াখানি মনোহর।
সয়দাবাদের ঘাটে,—
পশ্চিমে শ্যাম বনানীর পারে সূর্য্য ডুবিল পাটে।

পত্নী-শিকার

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১

ডেপুটি নন্দলাল বাবুর গুণ ছিল অনেক। তিনি ছিলেন শান্তপুর মহকুমার দোর্দণ্ডপ্রতাপ হাকিম—একচ্ছত্র সম্রাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদিকে আড়েহাতে ছিলেন 'দশাশয়ী' পুরুষ—খাড়া পৌনে চার হাত; বহরে দুই জনে হাতাহাতি করিয়া তাঁহার বেড় মাপিয়া পায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার ঘনসন্নিবিষ্ট গুম্ফকুঞ্জ মধ্যে ইচ্ছা করিলে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রও অনায়াসে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিত—এবং তাঁহার ভাঁটার মত গোলাকার রক্তাভ চক্ষু দুইটি হইতে যখন হাউটজার কামানের অনলবর্ষী গোলার মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নির্গত হইত, তখন শত্রুপক্ষ যত বড় প্রবলই হউক না, বিনা যুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্তত পলায়নের পথ অন্বেষণ করিত।

নন্দলালের গুণও যেমন ছিল অনন্ত, ডাক নামও তেমনই ছিল সংখ্যাতীত। তবে তন্মধ্যে দুইটি নামই শান্তপুরে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল,—একটি 'ডিব্রুগড়' অপরটি 'কুম্ভকর্ণ।' অবশ্য এ প্রসিদ্ধি ছিল অন্তরালে কানাঘুষায়। ডিব্রুগড় নামটি কে দিয়াছিল এবং কেন দিয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বোধ হয় নামটির উচ্চারণে একটা গুরু-গম্ভীর অভিব্যক্তি ছিল বলিয়াই ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। কুম্ভকর্ণ নামের একটা বিশেষ সার্থকতা ছিল। আহার নিদ্রায় শান্তপুরে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল বলিয়া শোনা যায় না। এমন কি, হাকিম সাহেব কাছারীর সময়েও মাঝে মাঝে যেরূপ নাসিকা গর্জ্জন করিতেন তাঁহার কোয়ার্টার্সের সম্মুখস্থ নদীতটের পথের যাত্রী সময়ে অসময়ে অনুরূপ গর্জ্জন শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিত।

হাকিম সাহেবের একটি গুণ ছিল সকলের সেরা। তিনি নাকি ছিলেন মস্ত বড় শিকারী। শুধু শিকারী বলিলে তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের অবমাননা করা হয়। কারণ, তিনি নাকি ছিলেন 'বিগ গেম' শিকারী অর্থাৎ সোজা কথায় গভীর জঙ্গলের ব্যাঘ্র হস্তী শূকর মহিষ প্রভৃতি হিংস্র বন্য পশুর শিকারী। দুষ্ট লোকে কাণাঘুষায় তাঁহার এই 'বিগ গেম' শিকারের সঙ্গে আর একটা 'বিগ গেম' শিকারের নাম জুড়িয়া দিত। একদিন নাকি এইরূপ একটি 'বিগ গেম' শিকারের চেষ্টায় গিয়া প্রতিবেশী কপালীদের দাজোয়ান ছোকরাদলের বাঁকপেটা হইতে অতি কষ্টে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

তাঁহার অপার সৌভাগ্য, তাঁহার খবরদারী করিবার ভার যাঁর ছিল তিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে একটি মাত্র কন্যা সন্তান রাখিয়া এই আধাবয়সী নাবালক স্বামীটির খবরদারীর ভার ভৃত্য পরিজনের উপর অর্পণ করিয়া পরপারের যাত্রী হইয়াছিলেন। কন্যা অপর্ণা তখন সাত বৎসরের বালিকা। দেড় বৎসরের অধিককাল নন্দলাল শান্তপুরে বদলী হইয়াছেন, কিন্তু এ যাবৎ তাঁহার কন্যাটিকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য এতদঞ্চলের লোকের ঘটিয়া উঠে নাই। কলিকাতায় বালিকা-হোষ্টেলে থাকিয়া মেয়েটি কোনো কলেজে পড়িতেন। ছুটিছাটা হইলে শান্তপুরের ছয় আনির বাবুদের কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া উঠিতেন। কারণ, ছয় আনির বাবুদের মেয়ে অলকার সহিত তাঁহার বড় ভাব ছিল। উহারা একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত।

আরণ্য 'বিগ গেম' শিকারে তাঁহার খ্যাতির কথা ছিল অফুরন্ত। অন্য কেহ না হইলেও তিনি নিজ গুণগানে একাই ছিলেন একশত। একবার শান্তপুরের দশআনির বাবুদের নলকুঠির বিলে পক্ষী শিকারে গিয়া তিনি কেমন করিয়া একটি হরিণ শিকার করিয়া ফেলেন এবং সেই হরিণচর্ম্ম কেমন সুন্দর করিয়া কলিকাতা হইতে ট্যান করাইয়া আনিয়াছিলেন, সেই কাহিনী যখন তিনি সালঙ্কারে বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন

শ্রোতাদের মুখে চোখে চাপা হাসির রেখা দেখিয়া তাঁহার গোলাকার চক্ষুদুটি অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়া ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রোতাদের হাসির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, মৃগচর্ম্মের কোণে সংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র টিকিটের উপর কলিকাতার লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের পরশুরাম ভকতরাম কোম্পানীর নাম ধাম ও হরিণ-চর্ম্মের মূল্যের কথা ছাপার অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তখন তাঁহার মূর্ত্তি অনেকটা গোবিন্দলালের কাছে ধরা পড়িয়া রোহিণীর মূর্ত্তি যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপই আকার ধারণ করিয়াছিল।

অবশ্য শান্তপুরের রুই কাতলা হইতে আরম্ভ করিয়া চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত কেহ ডেপুটি বাবুর সাক্ষাতে এই গূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সাহসী না হইলেও দশ আনির তরুণ জমিদার অমরেশপ্রসাদ একদিন পাঁচজন মাতব্বর পৌরজনের সমক্ষে বিশুদ্ধ রসিকতার অবতারণার উদ্দেশ্যে এই গল্পটি করিয়াছিলেন। জমিদার সদানন্দ পুরুষ, এই ব্যাপারে যে গর্ত্তের সাপকে ঘাঁটাইয়া রাখিলেন তাহা মনেও করিতে পারেন নাই। এ জন্য তাঁহাকে ভবিষ্যতে অবশ্য অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জমিদারীতে সদ্য-আগত এই ডেপুটি বাবুকে তাঁহার ভয় করিবার বিশেষ কিছুই ছিল না। কারণ তিনিও শান্তপুরের সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী জমিদার। তাঁহার পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুল চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী, পাবলিক লাইব্রেরী,—এসকলের তিনি পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদক। তাহার উপর স্বয়ং তিনি শান্তপুরে একটি টাউন হল ও ক্লক টাওয়ার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাঁহার দ্বারা টিউব-ওয়েল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়টি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং ভাগীরথী তটবর্ত্তী দীর্ঘ প্রশস্ত ঝাউবীথিটি তাঁহার পিতৃপিতামহের দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও তিনি সেটিকে পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। এতদঞ্চলে শান্তপুরের রায় চৌধুরী বাবুদের কীর্ত্তি অনেক আছে,—দান; সদাব্রত; অতিথিশালী; জলসত্র; অন্নসত্র,—কতকি! সুতরাং রায় চৌধুরী বাবুদের সুনাম সরকারী খাতাপত্রে স্বীকৃত ছিল। তাঁহাদিগকে বিনা অপরাধে জব্দ করা অতি বড় জবরদস্ত হাকিমেরও সাধ্যাতীত, তাহার উপর তরুণ জমিদার অমরেশপ্রসাদ পিতৃবিয়োগের পর বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতার প্রাসাদেই অবস্থান করিতেন, শান্তপুরের সহিত সম্পর্ক ছিল তাঁহার অল্পই। মাঝে মাঝে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে চকিতে দর্শন দিয়াই চলিয়া যাইতেন। তিনি আজিও অবিবাহিত এবং শান্তপুরে আপনার জন বলিতে তাঁহার কেহ ছিল না, তাই তিনি প্রবাস জীবনই ভাল বাসিতেন।

ডেপুটি বাবুরা ছিলেন তাঁহাদেরই সমশ্রেণীর বঙ্গজ কায়স্থবংশীয়। তাঁহারা ছিলেন ঘোষবংশীয়, আর রায় চৌধুরী বাবুরা গুহবংশীয়। ডেপুটি বাবুর মনে বিজাতীয় ক্রোধ হইল এই জন্য যে একজন ঘোষ কায়স্থকে গুহ কায়স্থ অপমান করিল, আর হাকিম হইয়াও ঐ এক ফোঁটা ছেলেটাকে জব্দ করিতে পারা গেল না! শান্তপুরে প্রথম পদার্পণের সময় যখন অমরেশের বাপ বাঁচিয়া ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত নন্দলালের খুবই ঘনিষ্ঠতা এবং হৃদ্যতা হইয়াছিল। কিন্তু সে অতি অল্প দিনের জন্য। দুই একমাসের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করিলেন, আর এই তরুণ উদ্ধত উত্তরাধিকারী পাটে বসিয়াই তাঁহাকে পাঁচ জনের সম্মুখে অপমান করিল! এই জ্বালা কুলকাঠের আগুনের মত নন্দলালের হৃদয়ে অনুক্ষণ জ্বলিতে লাগিল।

কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক রহিত হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক ত অন্তর্হিত হইবার নহে। মহকুমার হাকিম এবং স্থানীয় জমিদার,—জমিদারকে জমিদারীর দায়িত্ব বহন করিতে হইবে ত! অবস্থা যখন এইরূপ, তখন জমিদার এক জরুরী চিঠি পাইয়া কলিকাতা হইতে হঠাৎ অসময়ে শান্তপুরে আগমন করিতে বাধ্য হইলেন। পত্র দিয়াছেন ম্যানেজার বাবু,—ডেপুটি বাবুর হুকুম, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শিকারে আসিতেছেন, জমিদারকে সে জন্য পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। বজরা ভাউলিয়া দাঁড়ীমাঝি, হাতী ঘোড়া লোকলস্কর, রসদপত্র,—ব্যাপার ত সামান্য নহে!

এদিকে আর এক কারণেও হয়'ত আর দুই চারিদিন পরে জমিদারকে শান্তপুরে আসিতেই হইত। ছোট তরফের জমিদার কন্যা অলকার বিবাহের দিন স্থির হইতেছে;

তাহাকে বড় তরফের জমিদার সহোদরাধিক স্নেহ করিয়া থাকেন।

২

অপর্ণা ও অলকার মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই ঘনিষ্ঠ। অপর্ণা হোষ্টেলে থাকিয়া পড়িত, আর অলকা তাহার পিতা শান্ত-পুর ছয়-আনির জমিদারের কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া পড়িত। অপর্ণার পিতা ডেপুটি নন্দলাল বাবুকে নানাস্থানে বদলি হইয়া বেড়াইতে হইত, এই জন্য পড়াশুনার ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় তাহাকে বেথুন কলেজের হোষ্টেলে থাকিয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্ততঃ বাহিরে এই কথাটাই প্রচার ছিল। আসল কারণ কিন্তু নন্দলাল বাবু কন্যাকে দূরে রাখাই পছন্দ করিতেন। যতদিন সে নিতান্ত শিশু ছিল ততদিন কোনো অসুবিধা ছিলনা, কিন্তু কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পর নিষ্কণ্টক হইবার জন্য তাহাকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

বন্ধুর বিবাহে অপর্ণা নিমন্ত্রিত হইয়া শান্তপুরে আসিল। তাহার পিতাও ইহাতে অমত করিতে পারিলেন না। কারণ, তিনি জানিতেন ছোট তরফের জমিদার কন্যার গৃহে তাঁহার কন্যার অবাধ গতিবিধি. বৎসরের অনেক সময় সে বরং তাহাদের নিকটে বাস করে তাহাদের আতিথ্য স্বীকার করে তথাপি তাঁহার কাছে স্থান পায় না। চক্ষুলজ্জা বলিয়াত একটা জিনিষ আছে। আরও একটা কারণে তিনি অলকার সহিত নিজ কন্যার বন্ধুত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। দশআনিদের সহিত ছয়-আনিদের যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, একথা শান্ত-পুরে সকলেই জানিত। এই হেতু তিনি শান্তপুরে বাস করিয়া ছয়-আনিদের সহিত সন্ধি করাটা যুক্তি সঙ্গত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহা কূট মন্ত্রণা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরো বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা এ-ক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছিল।

ব্যাপারটা এইরূপ। প্রথমে কলেজে ভর্ত্তি হইয়া অপর্ণা যখন অলকার সহিত বন্ধুত্ব পাতায়, তখন একদিন সে অল-কাদের ওখানে গিয়া একখানা তৈলচিত্র দেখিয়া নির্ব্বাক প্রশংসমান দৃষ্টিতে সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, "এখানা কার ভাই? ঠিক এই রকম মুখ কোথায় দেখেছি বলে মনে পড়ছে যেন, অথচ ঠিক ধরতে পারছি না কোথায়।"

অলকা মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, বলিল, "চিন্‌বি কি করে? কালেভদ্রে এখানে আসে সে। এবার এলে দেখিয়ে দেবো। হয়ত শান্তপুরে দেখে থাকবি তাকে কখনও।"

অপর্ণা বলিল, "না ভাই, সত্যি বল না ছবিখানি কার।"

অলকা হর্ষ ও গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আমার অমরদাদার। আমার জেঠাইমা দশআনিদের মধ্যে ছিলেন সৃষ্টিছাড়া, আর তাঁর ছেলেটিও—আমার অমর দাদাটিও—হয়েছে তাঁরই মত সৃষ্টিছাড়া। নইলে কর্ত্তাদের মধ্যে ত মুখ-দেখদেখি ছিল না। জেঠাইমা কারু কথা শুনতেন না। মা ছিলেন অসুলে রুগী, তাই জেঠাইমা আমাকে নিজের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছিলেন, আর দাদাতে আমাতে তাঁর কাছে এক সঙ্গেই মানুষ হয়েছিলুম—ওমা! মেঘ না চাইতেই জল। এস, এস, অমরদা—কে এসেছে দেখ।"

অমরেশপ্রসাদ অলকার সহিত সেদিন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এমন তিনি প্রায়ই আসিতেন। সেদিন কিন্তু অপর্ণাকে দেখিয়া বিষম অপ্রভিত হইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। এই তুলিতে আঁকা মুখখানি তিনি না একদিন শান্তপুরে ভাগীরথীর তটবর্ত্তী ঝাউবীথিতে দেখিয়াছিলেন? কে না সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গী সান্ধ্যভ্রমণকারী বন্ধুকে বলিয়া-ছিল,—তোমার কৃপায় রাং রূপো হয়, পাঁকে পঙ্কজিনী ফোটে? হাঁা, সেইত! অমন পিতার এমন সন্তান! বিধাতার খামখেয়ালীর কি অন্ত আছে?

অলকা তাহার দাদাকে অপ্রস্তুত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "অবাক! এ যেন সাপে নেউলে দেখা হোলো আর কি? বলি, তোরই বা হোল কি? আ মরণ! মুখে যে এক বাণ্ডিল সিঁদুর গুলে দিলিরে!"

সত্যই অপর্ণার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখের দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইল।

কিন্তু এ কেবল একটি দিনের জন্য। ইহার পর অলকার কৌশলে তাহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় বহুদিনই হইয়াছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই তাহারা যে

পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা অলকার জানিতে বাকি ছিল না। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই নারীজাতি! বাল্যের পুতুলখেলা হইতেই তাহারা সংসারের খেলা আরম্ভ করে, আর অতি সুকুমার বয়স হইতেই তাহারা অভ্যস্ত হয় বিবাহের ঘটকালীতে!

কিন্তু অলকার কল্যাণে এই যোগাযোগ হইল বটে, তথাপি বিধাতাপুরুষ এই দুটি তরুণ হৃদয়ের মিলনপথে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিলেন। অলকা বড় দুঃখেই বলিত, এই মণিকাঞ্চন যোগে বিধাতার অভিসম্পাত আছে। কারণ, তৃতীয় পক্ষের দ্বারা নন্দলাল বাবুর সকাশে বিবাহের প্রস্তাব নিবেদিত হইবামাত্র তিনি একেবারে ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মেয়েকে বরং গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারবো, তবু ঐ হতচ্ছাড়ার হাতে কখনও দোবো না।' সে তাঁহাকে মৃগয়ার হরিণ-চর্ম্ম লইয়া পাঁচজনের সাক্ষাতে বিদ্রূপ করিয়াছিল, একথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। নতুবা রূপেগুণে ধনে মানে এই হতচ্ছাড়ার মত পাত্র কয়জনার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? আগে যদি অমরেশ অর্পণাকে দেখিত, তাহা হইলে এই বিদ্রূপ সে করিত না ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। তুচ্ছ ব্যাপার হইতে কত অঘটন ঘটিয়া যায়। গোবিন্দলাল যদি একটিক্ষণের জন্য প্রমোদোদ্যানে গিয়া রোহিণীকে সলিল-সমাধি হইতে উদ্ধার না করিত, তাহা হইলে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পাকা চুলে সিঁদুর পরিয়া ভ্রমর যে হাসিমুখে স্বর্গে যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

৩

অমরেশপ্রসাদ পূর্ব্বে কালেভদ্রে শান্তপুরে আসিত। কিন্তু অপর্ণাদের শান্তপুরে আসার পর সে শিকারের হুকুম-নামার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শান্তপুরে আসিয়া একেবারে কায়েমমোকাম হইয়া বসিল।

জমিদার স্বয়ং আসিয়াছেন। সুতরাং সেরেস্তায় মুহুরীদের হু-হু কলম চলিতে লাগিল, সদর-নায়েব ও ম্যানেজার মহাশয়রা কাণে কলম গুঁজিয়া সেরেস্তা ও বাবুর ঘরের মধ্যে টানা-পোড়েন করিতে লাগিলেন। হাতে কাজ না থাকিলেও জমিদার বাড়ীর অগণিত ভৃত্য পরিজন স্বেচ্ছায় কাজ আবিষ্কার করিয়া লইয়া কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতে লাগিল এবং বাগানের মালী বাগানের আগাছা তুলিতে তুলিতে কত ফুলগাছই যে তুলিয়া ফেলিল তাহার সংখ্যা নাই। রায়-চৌধুরী বাবুদের বাড়ীতে এতদিনের নিৰ্জ্জীবতার পরিবর্ত্তে একটা নবজীবনের বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসাহ উত্তেজনা, তাঁহার মুখে চোখে অথবা অঙ্গচেষ্টায় কোন উৎসাহ উত্তেজনার লক্ষণ নাই! একদিন এই তরুণ উৎসাহী জমিদারই স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবে একঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা দিয়াছেন; একদিন তিনি স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের ক্যাপ্টেন রূপে ক্রিকেটে সেঞ্চুরী এবং ফুটবলে গোলের উপর গোল করিয়াছেন। অথচ আজ তিনি ঘরের কোণ হইতে বাহির হন না! বৈঠকখানা বাড়ীর সুবিস্তীর্ণ 'লন' ও ফুলবাগানের পশ্চাদস্থ দ্বিতল প্রাসাদের প্রাইভেট লাইব্রেরীতে অথবা তৎসম্মুখস্থ গাড়ীবারান্দার অলিন্দে আরাম কেদারায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় পুস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া সিগারেটের পর সিগারেট টানিয়া আকাশ পানে শূন্য নয়নে চাহিয়া থাকিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে চমকিত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিতে বলিতেন।

তরুণ জমিদারের শিকারী বলিয়া বড় রকমের একটা খ্যাতি ছিল। অশ্ব বা হস্তিপৃষ্ঠে অথবা নৌকাযোগে শিকার করিতে যাওয়া তাঁহার একটা সখ ছিল। এতদঞ্চলে তাঁহাকে অভিজ্ঞ শিকারীরা 'ক্র্যাক সট' বা 'ডেড সট' বলিত। তিনি যেমন ছিলেন সুকৌশলী অশ্বারোহী, তেমনি ছিলেন ফাল্গুনীর মত অব্যর্থ-সন্ধানী। এ হেন শিকারী তরুণ জমিদারের শিকারের আহ্বানে পূর্ব্বের উৎসাহ কোথায় গেল? কর্ম্মচারীদের উপর সকল ভার ন্যস্ত করিয়াই তিনি যেন দায়ে খালাস!

অমরেশপ্রসাদ ডেপুটি বাবুর আপত্তির কথা শুনিয়াছিলেন। অপর্ণাও তাহা শুনিয়াছিল। কন্যার পিতার অনুমোদন ব্যতীত উভয়ের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একদিন অমরেশপ্রসাদ অপর্ণাকে জানাইলেন যে ডেপুটি বাবুর অনুমোদন লইয়া তিনি অপর্ণাকে যেমন করিয়া পারেন জীবন-সঙ্গিনী করিবেন। যদি তাঁহার অনুমোদন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি অপর্ণাকে গৃহ-লক্ষ্মী করিবেন। কিন্তু অপর্ণা সখীকে দিয়া জানাইয়াছিল,

পিতার বিনা অনুমতিতে সে বিবাহ করিতে পারিবেনা। ইহাতে যদি চিরজীবন তাহাকে কৌমার্য্য বরণ করিয়াই থাকিতে হয় উপায় নাই।

অমরেশপ্রসাদ অপর্ণার দৃঢ়তা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। একজনের খেয়ালে তাঁহাদের তরুণ জীবন কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? যদি অপর্ণার পিতা তাহাকে পাত্রান্তর গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন তাহা হইলে সে কি করিবে? এ প্রশ্নের উত্তরে অপর্ণা জানাইয়াছিল যে, সে কখনও দ্বিচারিণী হইবে না—তাহার মরণ বাঁচন তাহার নিজের হাতে।

এই অদ্ভুত যুক্তির পর আর তর্ক চলে না। তথাপি অমরেশ বলিল,—মানুষের মনই হইল সব, পুরোহিত অগ্নি সাক্ষ্য রাখিয়া দুই চারিটা মন্ত্র আওড়াইয়া হাতে হাত দিয়া দেহের যোগাযোগ করিয়া দিলেই যে পুরুষ ও নারীর ইহজন্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য হইল, এমন ত কোন কথা নাই। এ যুক্তি এযুগে অচল। আসলে পুরুষ ও নারীর মনের মিলনই হইল বিবাহ, তা উহা গাঁটছড়া বাঁধিয়াই হউক বা অন্য যে প্রকারেই হউক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ব্যবহারিক জগতের বিবাহের ঠাট বজায় রাখাই কি সব?

এ সব অদ্ভুত যুক্তিতে অপর্ণা অভ্যস্ত ছিল না। অমরেশ বুঝিলেন কলেজে শিক্ষিতা হইলেও অপর্ণা বাঙ্গালী হিন্দুগৃহস্থ ঘরের কন্যা। সে তাহার আজন্মের সংস্কার ত্যাগ করিয়া আধুনিক প্রগতিবাদিনীদিগের ন্যায় স্বয়ম্বরা হইবার বাসনা পোষণ করেনা। পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। ইহা তাহার স্থির সংকল্প।

নিরুপায় হইয়া অমরেশপ্রসাদ কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে এই দারুণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। অপর্ণাকে না পাইলে তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইবে কাজেই ইহাই এখন তাঁহার জীবন-মরণের সমস্যা। আহার নিদ্রা ভুলিয়া তিনি এই সমস্যা সমাধানের জন্য তন্ময় হইয়া রহিলেন।

আচ্ছা, আগামী শিকারের সময়ে এ বিষয়ে সুযোগ পাওয়া যাইবে না কি? নন্দলালও ত বুনোশুয়রের মতো গোঁ ধরিয়াছেন; সুতরাং বুনোশুয়রের দেহের সহিত নন্দলালের মনও যদি শিকার করা যায় তাহা হইলে ত সকল সমস্যার সমাধান হয়! কিন্তু বিধাতা কি সে সুযোগ দিবেন?

৪

যে দিন শান্তপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পদার্পণের কথা, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে অতর্কিতভাবে তিনি আসিয়া হাজির। অবশ্য শিকারের আয়োজন সমস্তই সম্পূর্ণ। আট দাঁড়ের নূতন রংকরা সুন্দর দুইখানা বজরা ভাগীরথীর ঝাউ-তলার ঘাটে বাঁধা। সাহেবের বাস বজরাখানি য়ুরোপীয় আসবাবে সুসজ্জিত, কামরা দুইখানি ঝকঝকে তকতকে। জলের উপর বাস করিবার পক্ষে যতটা আরাম ও বিলাস উপভোগ করা সম্ভবপর তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। শিকারী ও লোকলস্করদের জন্য পানসী ভাউলিয়াও প্রস্তুত। তাহারই দুই একখানিতে উদ্ভিজ্জ ও জান্তব আহার্য্য পানীয় সংরক্ষিত এবং অন্য একখানিতে বাবুর্চ্চিখানা। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যাইতেছেন সুতরাং পুলিসের পানসীও যে সঙ্গে যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রস্তুত সবই, কেবল একটি ব্যাপারের জন্য যাত্রায় বিলম্ব ঘটিতেছে এবং সেই বিলম্বের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট অগ্নিমূর্ত্তি হইয়াছেন। ব্যাপার বড় সোজা নহে, শিকার যজ্ঞের যিনি যজ্ঞেশ্বর, সেই ডেপুটি বাবু এ যাবৎ প্রস্তুত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সকাশে হাজিরা দিতে পারেন নাই। অপরের পক্ষে হয় ত ইহা তুচ্ছ ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া চাপরাশি আরদালি বরকন্দাজ পুলিস পর্য্যন্ত সকলের কাছে ইহা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। স্বয়ং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এবং ডেপুটি বাবুর বিধাতা-পুরুষ সশরীরে হাজির, আর তাঁহার তাঁবেদার ডেপুটি তাঁহাকে সেলাম দিতে গরহাজির, এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর শান্তপুরে কখনও কেহ দেখে নাই!

এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারের অবশ্যই একটা বড় রকমের কারণ ছিল, নতুবা ডেপুটি বাবু শান্তপুরে যত প্রবলই হউন, তিনি যে স্বেচ্ছায় স্বয়ং এত বড় বে-আদবি করিতে পারেন, সে প্রমাণত তাঁহার চাকুরী জীবনের সুদীর্ঘ রেকর্ডের সার্টিফিকেটনামা হাতড়াইয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং স্বয়ং 'ইওর অনার' শান্তপুরে পদার্পণ করাতেও যখন এহেন 'মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট সার্ভ্যাণ্ট' হুজুরে সেলাম দিতে আসিলেন না, তখন তাহার নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ ছিল।

কারণটি হইতেছে ছোট তরফের বাড়ীর বিবাহ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণ। জমিদার বাড়ীর বিবাহ—এত বড় মহোৎসবে দীয়তাং ভুজ্যতাং একদিনে আরম্ভ হইয়া একদিনেই নিবৃত্ত হইবার নহে। একদিন এতদঞ্চলের মাতব্বর কয়জন নিমন্ত্রিত অতিথির জন্য জমিদার বাড়ীতে বাইনাচের আয়োজন হইল। কলিকাতা হইতে তিনটি স্বনামপ্রসিদ্ধ বাইজির সঙ্গে সাত আট কেশ লালপাণিও আসিল। অবশ্য সেগুলি যে ফিরপো কোম্পানীর পেষ্ট্রি, কেক, প্যাটিস, স্যাণ্ডউইচ, ফ্রুট সিরাপ, আইসক্রীম প্রভৃতি গলাধঃকরণে সহায়তা করিবে বলিয়া আমদানি করা হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বড় তরফের তরুণ জমিদার অমরেশপ্রসাদ। কয়েক দিনের অবসাদ আলস্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাকে পরম স্নেহ-পাত্রী খুল্লতাত পুত্রীর বিবাহে কোমর বাঁধিতে হইয়াছিল।

রাত্রি দশটায় নাচের মজলিস বসিল, সে মজলিস সারা রজনী ব্যাপিয়া চলিল। স্ফূর্ত্তি, হররা এবং বোতলসুন্দরীর উপাসনায় দ্রুততালে রাত্রি ক্ষয় হইয়া চলিল। শেষ রাত্রিতে ভাঙ্গা আসরে ডেপুটি বাবুই একাই আসর মাৎ করিলেন। প্রথম মহলায় তিনি হরবোলার মত নানা পশুপক্ষীর স্বর অনুকরণ করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে শৃগাল, সারমেয়, মার্জ্জার, রাসভ কোনটিই বাদ পড়িল না। তদুপরি তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্য সন্দর্শন করিয়া বাইজিরা মুখের উপর ওড়না আচ্ছাদন দিয়া হাস্য সংবরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে অবস্থা এরূপ চরমে উপনীত হইল যে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিভৃত কক্ষে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার মস্তকে কলসী কলসী জল ঢালিতে হইল। কিন্তু তখনও তাঁহার সঙ্গীতের সুরের রেশ চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সরোদন বক্তৃতা,—"দোহাই তোমাদের—গঙ্গাজলে চান করিও না বাবা, নেশা ছুটে যাবে! চোবাও যদি বি-হাইভেই চোবাও, না হয় গ্রীনসীলে। না, না, জল না, মরে যাবো। মরিই যদি—প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, চুবিও না গঙ্গাসলিলে—চিতায় চড়িয়ে আগুন দেবার সময় বোতল পাঁচ ছয় ঢেলে দিও, ব্যাস!" বহুকষ্টে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইল, নতুবা তিনি এমন এক একটি ঝাঁকি দিতে লাগিলেন যে, পাঁচ সাত জন ছিটকাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। যুদ্ধান্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কান্নার সুরে তিনি পুনরায় বলিলেন, "দোহাই বাবারা সব, মেরো না বাবা, একেবারে মরে যাবো। মেরেই ফেলো যদি, ত আমার শ্রাদ্ধে দোহাই বাবা ব্রাহ্মণ-ভোজন করিও না—ওরা সব গাঁটকাটা, জোচ্চোর! তার চেয়ে বেচে বেচে দ্বাদশটি পাঁড় মাতাল ভোজন করিও, আমার আত্মার সদ্গতি হবে। ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়েছ কি মরে ভাগাড়ে ভূত হয়ে যাব!"

পরদিন অপরাহ্ণে তাঁহার যৎসামান্য চৈতন্যোদয় হইল—অপর্ণার আপ্রাণ সুশ্রূষায়। প্রত্যূষে সাহেব আসিয়াছেন, আসিয়া তাঁহাকে তলব দিয়াও না পাইয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার আত্মারাম পিঞ্জরমুক্ত হইবার উপক্রম করিল, যেটুকু নেশা ছিল, একদমে কাটিয়া গেল। নন্দলাল বালকের মত ভয়ার্ত্ত হইয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। একজন পরিণত বয়সের মানুষ সাহেবের ভয়ে যে এতটা আপনা-আপনি করতে পারে তাহা দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না!

অলকা তাঁহাকে বুঝাইল, এ বিপদে ভরসা একমাত্র তাহার দাদা, বড় তরফের জমিদার অমরেশপ্রসাদ। অন্যথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আসিলেও সাহেবের কোপানলে রক্ষা নাই। বড় তরফের নাম হইতেই নন্দলাল জ্বলিয়া উঠিলেন! মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অমরেশের সাহায্য আমি কিছুতেই নোব না!" অলকা বলিল তাহা হইলে সে একান্তই নিরুপায় কারণ সাহেব আসিয়া ডাকবাংলোয় না উঠিয়া তাহার দাদার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন; একেই তিনি পূর্ব্ব হইতে দাদার শিকার নৈপুণ্যে তাহার গুণমুগ্ধ, তাহার উপর এই একদিনের আদর-অভ্যর্থনায় একেবারে গলিয়া গিয়াছেন; এখন তিনি দাদার কথায় ওঠেন বসেন; সুতরাং অমরেশ ভিন্ন এ বিপদে গত্যন্তর নাই।

অগত্যা নন্দলাল ভাবিয়া দেখিলেন, মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তাঁহার লতাগৃহের দ্বারী নন্দীকেশ্বরকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া উপায় নাই।

৫

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসার পূর্ব্বে এক বিস্তীর্ণ জলার পার্শ্বে বজরা নঙ্গর করিল। বাবুদের জমিদারীর কাছারী-বাড়ী হইতে নায়েব গোমস্তা বেলদার বরকন্দাজরা পূর্ব্বাহ্ণেই

নৌকাযোগে তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষেই শিকারে যাত্রা। জলার শিকার সাঙ্গ হইবার পর কাছারী-বাড়ী যাত্রার কথা, সেখানে 'বিগগেম' শিকারের আয়োজন প্রস্তুত।

যেখানে বজরা নঙ্গর করিল, সাহেব গোধূলির আলো-আঁধারে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল জলা ও জঙ্গল। সেই জলার অনন্ত আবিল পঙ্কিল জলরাশিতে বিন্দুমাত্র তরঙ্গভঙ্গ নাই, সে জল স্থির ও অচঞ্চল, মাঝে মাঝে ঝোপ ও কাঁটা গাছের জঙ্গল, কোথাও বা সামান্য কিছু জমি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার উপর দুই একটা খড় গাছ সঙ্গিহারা পথিকের মত উদ্বেগ আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে যেন সঙ্গীর সন্ধান করিতেছে।

এতবড় জলা সাহেব আর কখনও দেখেন নাই। বিপুল আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। পরন্তু যখন দেখিলেন, জলার অগভীর জলের উপর অসংখ্য জলচর পক্ষী মনের আনন্দে বিহার করিতেছে, তখন হর্ষ বিস্ময়ে এবং শিকারের উত্তেজনায় উৎফুল্ল হইয়া অমরেশপ্রসাদের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমায় রায় চৌধুরী—তোমার এমন সুন্দর শিকারের রিজার্ভ আছে জানতাম না ত!"

ডেপুটি বাবুর মুখখানি কিন্তু বিভিন্ন ভাবাবেশে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সাহেবের কাছে তাঁহার কদর না হইয়া জমিদারের আদর, তাহার উপর ভাবী শিকারের দুর্ভাবনা। একবার মনে করিতেছেন, বড় তরফের মধ্যস্থতায় সাহেবের অপ্রসন্নতা দূর হইয়াছে, তাহার উপর জলা দেখিয়া সাহেবের খুবই আনন্দ হইয়াছে, হয়ত তিনি গোলামের গোস্তাকি একেবারেই মাপ করিতেও পারেন। পরমুহূর্ত্তেই বন্দুক ঘাড় করিয়া জল কাদা হাঁটিয়া, কাঁটার খোঁচা ভোগ করিয়া শিকার করার কথাটা মনে পড়িতেই শান্তপুরের নিশ্চিন্ত আরামের জীবনের স্মৃতি বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছে। তাহার পর জঙ্গলের 'বিগ গেম' শিকার ?—ওরে বাপরে ! মনে পড়িলেই যে হাতের বন্দুক পায়ের ওপর খসিয়া পড়ে! শেষে কি বাঘের কামড়ে বা সাপের ছোবলে প্রাণটা যাইবে!

কিন্তু যাই বল, অমরেশকে নিতান্ত মন্দ ছোকরা বলা চলে না। ভাগ্যে সে মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল, না হইলে সাহেবের সুনজর ফস্‌কাইয়াছিল আর কি! আর আমায় যে আদর যত্ন করিত নিজের জনেও এমন কেহ করে কি না সন্দেহ। ওর সবই ভাল, কেবল এক দোষ—অপর্ণাকে চায়। মেয়েটাও জমিদারের ঘরে পড়িলে সুখে থাকিবে। কিন্তু আমায় হরিণ শিকার লইয়া তামাসা বিদ্রূপ করিল কেন? দেখি, কতদূর কি করতে পারি!

সাহেব অমরেশপ্রসাদের সহিত রাত্রিতে শিকারের যে প্ল্যান করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই প্ল্যান অনুযায়ী পরদিন প্রত্যুষে শিকারে যাত্রা করা হইল। রাঙ্গা উষার রক্ত-রাগ তখন সবেমাত্র বিস্তীর্ণ জলাভূমির ঘন কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুহেলির যবনিকা ভেদ করিয়া নানা জাতীয় জলচর পক্ষীর পক্ষবিধূনন ও অস্পষ্ট কূজনের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। কোথাও তৃণাচ্ছাদিত অপ্রশস্ত প্রান্তর, কোথাও বা সঙ্কীর্ণ আইলের পর আইলের শ্রেণী, আবার কোথাও বা নলখাগড়া ও হোগলাবনের মধ্য দিয়া জলসিক্ত কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ। কোন কোনও আইলে দুই একটা সরীসৃপ মানুষের পদশব্দে চমকিত হইয়া সর সর করিয়া ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল। ডেপুটি বাবু সভয়ে অমরেশপ্রসাদকে আঁকড়িয়া ধরিতে লাগিলেন।

সাহেব ও অমরেশপ্রসাদের মহা আনন্দ, কেবল বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট চিত্তে ঔষধ গলাধঃকরণের মত পথাতিক্রম করিতে-ছিলেন ডেপুটি নন্দলাল বাবু। কি কর্ম্মভোগ! তোফা আরামে নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রা যাওয়ার পরিবর্ত্তে এ কি বিড়ম্বনা! একটা বন্যবরাহ হঠাৎ ঝোপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাহেব বা অমরেশকে তাড়া করে না? না, না, সাহেব চাকুরীর দেবতা, তার যেন কোন অমঙ্গল না হয়! আর অমরেশ? না, না, এ কয়দিনে উহার উপর কেমন একটা যেন মায়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে!

হঠাৎ ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডস্পর্শে যেন সেই বিস্তীর্ণ জলার উপরিস্থিত কুহেলিকার আবরণ দীপ্ত সূর্য্যকরে অপসারিত হইল। অমনই সেই সুবর্ণকিরণজালে স্নাত হইয়া অসংখ্য জলচর পক্ষী স্থান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া বসিতে লাগিল। কোথাও বা তাহারা দলবদ্ধ হইয়া জলে ডুবিতে ও উঠিতে লাগিল, কোথাও বা শত শত পক্ষী পক্ষ কম্পিত করিয়া পক্ষের জল ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

শিকারীরা তখন একেবারে জলার মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন।

"ঐ, ঐ, দ্বীপের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী,—এসো আমরা তিন জনে তিন দিক দিয়া উহাদের বেড় দিয়া ফেলি—ঘোষ, তুমি বাঁ দিকে ছোটো, রায়চৌধুরী থাকো মাঝখানে, আমি চললুম ডান দিকে,"—সাহেব বন্দুক হস্তে ছুটিয়া চলিলেন, অমরেশও বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইলেন। কেবল নন্দলাল বিশাল বপুখানিকে লইয়া কোন মতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভেকের মত লাফাইয়া লাফাইয়া দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন।

টিল, কাঁদাখোচা, বটের, ডাহুক, মাছরাঙ্গা, বক, সারস, বিবিধ বর্ণের অসংখ্য রকমের পাখী,—কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্য্যকরে স্নান করিতেছে, কোথায় বা জলে ডুবিতেছে, উঠিতেছে—আবার কোথাও বা উড়িতেছে অথবা সাঁতার কাটিতেছে। কি বিচিত্র শোভা!

গুড়ুম, গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ গর্জ্জিয়া উঠিল। কতক পাখী ঘুরিয়া ঝটপট করিয়া ডানা ঝাড়িয়া জলে পড়িল, জল রাঙ্গা হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট সন্ত্রস্ত হইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যত্র উড়িয়া বসিল। সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"রায়চৌধুরী, ফ্লাই সট!"

আবার দুড়ুম দুড়ুম বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। অব্যর্থ-সন্ধানী অমরেশের ফ্লাই সট ব্যর্থ হইল না। শিকারের আমোদে সাহেবের ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত চন্ চন্ করিয়া উঠিল, তিনি 'অন, অন,' বলিয়া অমরেশকে উৎসাহিত করিয়া অন্যত্র শিকারের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলেন।

কিন্তু অমরেশ আর একপদও অগ্রসর হইলেননা। তিনি ডেপুটি বাবুর সাড়াশব্দ না পাইয়া চিন্তিত মনে তাঁহার অন্বেষণে চলিলেন। লোকলস্করেরা তখন কেহ কোমর জলে নামিয়া, কেহ বা আবক্ষ জলে নিমজ্জিত নামিয়া আঁকসী দিয়া শিকার টানিয়া টানিয়া আনিয়া একত্র সংগ্রহ করিতেছে। অমরেশ তাহাদের অতিক্রম করিয়া আরও বামদিকে জলকাদা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইলেন। দূর হইতেই তাঁহার কর্ণে যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্পষ্ট আর্ত্তস্বর প্রবেশ করিল। স্বর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেই তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠা দূরে থাকুক, তিনি অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিলেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

হোগলা বনে আচ্ছাদিতপ্রায় জলার সেই অংশটুকু বিষকুম্ভ পয়োমুখ বন্ধুর ন্যায় সাদরে শিকারীদের আহ্বান করিয়া শিকারের প্রলোভনে আকৃষ্ট করিতেছিল। বস্তুতঃ সেইটি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের বক্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী বিহার করিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। ডেপুটি নন্দলাল বাবু সেই দিকেই যাইতেছিলেন, কিন্তু অরসিক বিধাতা তাঁহাকে সে সুযোগ না দিয়া হঠাৎ অতর্কিত ভাবে পঙ্ক মধ্যে আজানু নিমজ্জিত করিয়াছেন! ভয়ে উত্তেজিত হইয়া তিনি পঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্য যতই আঁকুপাঁকু করিতেছেন, ততই তাঁহার বিরাট বপু তাঁহার পদদ্বয়কে পঙ্কের আরও নিম্নে লইয়া যাইতেছে। তাঁহার মুখে চোখে হোগলার কুচি ও বিলের কাদা, দুই হাতে মুঠা মুঠা হোগলা।

অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া অমরেশপ্রসাদ দূর হইতেই তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া লোকলস্করদের আহ্বান করিলেন। আশ্বাসবাণী শুনিয়া আর্ত্তনাদ আরও উচ্চ হইল। তন্মধ্যে এই কথাটা ক্রন্দনের মধ্য হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, তিনি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলে উদ্ধারকর্ত্তার কামনা সহজে অপূর্ণ রাখিবেন না।

দুই চারি জনের সাহায্যে অমরেশপ্রসাদ বহুকষ্টে সেই বিপুল বপুখানির উদ্ধার সাধন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িল। ডেপুটি বাবু উচ্চভূমির ঘাসের উপর চৌদ্দ পোয়া হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

"Pshaw! pshaw! Mr. Ghosh, you seem to be absolutely useless!"

—ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কখন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। ভয়ে কাঠ হইয়া ডেপুটি বাবু বিশাল বপু আন্দোলন করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সামর্থ্যে কুলাইল না। অমরেশ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মিষ্টার ঘোষ আজ অসাধ্যসাধন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার আজ যে 'ব্যাগ' হইয়াছে, তাহার জন্য

বিচিত্রা

স্বর্গীয়া শান্তি ঘোষাল

যে-কোন নামজাদা শিকারী গৌরব অনুভব করিতে পারে। ঐ যে শিকারীরা ঝাঁক ঝাঁক পাখী জল হইতে টানিয়া আনিতেছে, ওর বারো আনাই মিঃ ঘোষের শিকার।

সাহেব তখন প্রশংসমান দৃষ্টিতে ডেপুটি বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? ওঃ সরি, মিঃ ঘোষ"—বলিয়াই প্রীতিভরে তাঁহার কর মর্দ্দন করিলেন। এদিকে অমরেশ তাঁহাকে চিন্তার অবসর মাত্র না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "দেখুন, দেখুন,—ঐ, ঐ ঝোপের ফাঁকদিয়ে—ঐ যে জুজোড়া চখাচখী—মারুন, মারুন,—যাঃ ঐ উড়ে গেল!"

সাহেব ততক্ষণ উন্মত্তের মত চক্রবাকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। ডেপুটি বাবুকে পুনরায় আশ্বস্ত করিয়া দ্রুতপদে সাহেবের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। সাহেবের ফ্লাই সট গর্জ্জন করিল বটে, কিন্তু এযাত্রায় বিফল হইল। পক্ষীরাও কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু ক্ষণিকের নিশ্চিন্ততাকে উপহাস করিয়া অমরেশের ফ্লাই শট উপর্য্যুপরি গর্জ্জিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পাখী দুইটি ঝটপট ডানার আওয়াজ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। গুণগ্রাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ বন্দুক ফেলিয়া সানন্দে অমরেশের করমর্দ্দন করিলেন এবং পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ব্র্যাভো, রায় চৌধুরী! এক্‌সেলেন্ট সট্! তুমি সত্যই ক্র্যাক্ শট্!"

সেইদিন এবং তৎপরদিনও ঐ জলাভূমিতেই পক্ষীশিকার চলিল। সাহেবের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা, কেন না, তাঁহার 'ব্যাগ' ভরপুর। ডেপুটি বাবু কি করিলেন না করিলেন, সেদিকে নজর দিবার তাঁহার অবসরই ছিল না। বিশেষতঃ অমরেশ তাঁহাকে শিকারের গল্পে ও শিকারের নেশায় মসগুল করিয়া রাখিয়াছিলেন। অমরেশের কৌশল নন্দলালের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

কাছারী বাড়ীতে আসিয়া খানাপিনার আয়োজনেই প্রথম দিনটা কাটিয়া গেল। জমিদার অমরেশপ্রসাদ কলিকাতা হইতে প্রথম শ্রেণীর মগ বাবুর্চ্চি আনাইয়াছিলেন, কাজেই আহার্য্য পানীয়ও যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং গুরুতর রকমেরই হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। জলার জলকাদা ও দৈর্ঘ্য আহারের পর সাহেবের উহা অমৃতোপম বলিয়াই মনে হইল। রাত্রিকালে পান ভোজনের সময় তিনি গেলাসের পর গেলাস চড়াইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বিলাতের এক খুড়ার গল্প করিলেন। তিনি নাকি অনেক পয়সা ঘুস কবলাইয়া প্রতিবেশী বড়লোক সকলের বাবুর্চ্চি ভাগাইয়া আনিতেন, আর বলিতেন, —"যার ভাল রাঁধুনি নাই তার মরা বাঁচা দুই-ই সমান।"

ভোজের রাত্রিটা বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটিতেছিল। কিন্তু যখন মাতব্বর মোড়ল প্রজারা জমিদারীর বাঘের ও কুমীরের উৎপাতের গল্প জুড়িয়া দিল, তখনই ডেপুটি বাবুর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ গল্পের মাঝখানে গুরুগম্ভীর বজ্রনাদের মত জঙ্গলের দিক হইতে বাঘের ডাক বাতাসে ভাসিয়া আসিল, মনে হইল যেন কাছারী বাড়ী হইতে দুই রশি তফাতে বাঘ ডাকিল। তখন নন্দলাল বাবুর অবস্থা বর্ণনাতীত। কোনমতে তিনি আসনচ্যুত হইতে হইতে বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদকম্পন পাঁচ মিনিটেও বন্ধ হইল না। সোনা মোড়ল বলিল, ঐ ঢেকনা-বাড়ীর আইলের উপর দিয়া বাঘ পার হইতেছে, ঐখানেই গত বৎসর সে চাঁদনি রাতে ঢেকনা-বাড়ী কুটুমের ওখানে যাইবার সময় দেখিয়াছিল, বাঘ থাবা গাড়িয়া বসিয়া পথ রোধ করিয়াছে—ওঃ কি বিপদ এড়াইয়া সে যে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহা মা বনবিবিই জানেন। হারু সর্দ্দার বলিল, গত ভাদ্র মাসে তাহার সম্বন্ধী আসিলে সে তাহাকে দাওয়ায় মশারি খাটাইয়া শুইতে দিয়াছিল। গভীর রাত্রিতে সম্বন্ধীর ভীষণ চীৎকারে তাহারা সকলে লণ্ঠন ও লাঠি সোঁটা লইয়া দাওয়ায় গিয়া দেখে, সে পায়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছে, আর একটা প্রকাণ্ড কুমীর দাওয়ার পৈঠাগুলা এক লম্ফে পার হইয়া সম্মুখের খুঁড়ি খালের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কুমিরটা দাওয়ায় উঠিয়া মশারি তুলিয়া তাহার সম্বন্ধীর পা কামড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। এমনও হয় যে বাঘ সাঁতরাইয়া নদীর মাঝখানে নোঙ্গর-করা পানসী হইতে মানুষ টানিয়া লইয়া যায়, আর কুমীর লেজের ঝাপটা মারিয়া ডিঙ্গি কাত করিয়া দিয়া মানুষ ধরিয়া গভীর জলে ডুব মারে। আর সাপের ত কুলকিনারা নাই—এখানে-সেখানে বিছানার নীচে খাবার ঘরে পাতা পীঁড়ির পাশে গোক্ষুরা কেউটিয়া শুইয়া থাকে, আনাগোনা করে।

ডেপুটি বাবুর মুখের গ্রাস মুখেই রহিয়া গেল, উদরে নামিল না। শরীরে স্বেদ, অশ্রু, কম্প,মূর্চ্ছার উপক্রম,—একে একে অনেক কিছু দেখা গেল, কুল কুল করিয়া পেট ডাকিতেও লাগিল! বেগতিক দেখিয়া অমরেশ কথার মোড় ফিরাইয়া দিয়া সাহসের গল্প করিতে লাগিলেন, আর নানারূপ হাস্য-পরিহাসে সকলেব চিত্ত প্রফুল্ল করিয়া তুলিলেন।

বিশ্রামের জন্য সাহেব তামুতে চলিয়া গেলেন এবং যাইবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ নন্দলালকে বলিয়া গেলেন যে পরদিন প্রত্যুষে শিকারের সমস্ত ব্যবস্থা যেন একেবারে ঠিক হইয়া থাকে—মিষ্টার ঘোষ যখন মহকুমার শান্তি সুখের জন্য দায়ী তখন যে বাঘটা সেই শান্তি ভঙ্গ করিতে আসিয়াছে মিষ্টার ঘোষেব গুলিতে সেটা নিহত হইলে তিনি সবিশেষ খুসী হইবেন।

সাহেব প্রস্থান করিলে নন্দলাল অমরেশকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, অমরেশ!"

অমরেশ বলিলেন, "কি বলছেন?"

"বাবা, কালকে তুমি না রক্ষে করলে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবেনা বাবা। তিন হাত দূর দিয়ে আমার গুলি চলে যাবে—আর ঐ সর্ব্বনেশে বাঘ লাফিয়ে এসে আমার ঘাড়ের ওপর পড়বে! চাকরিতে সাহেব, আর বনে বাঘ!—আমি কোনদিকে যাই বলত বাবা!"

অমরেশ বললে, "কিন্তু সাহেবের মনোভাবটা দেখলেন ত? তাঁর ইচ্ছে, মাচায় আপনিই স্বয়ং মোতায়েন থাকেন আর গুলিটা আপনিই করেন।"

আর্ত্ত কণ্ঠে নন্দলাল বললেন, "সেই জন্যেইত' বলছি বাবা, তুমি ভিন্ন কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবেনা! দোহাই বাবা, তুমি আমার ছেলের মত। দয়া কর!"

অতিকষ্টে হাস্য দমন ক'রে মনে মনে একটু চিন্তার ভাণ ক'রে অমরেশ বললেন, "আচ্ছা শিকারে যাতে আপনার না যাওয়া হয় তার ব্যবস্থা আমি করে নেব। কিন্তু কাল সকালবেলা আপনি নিজে শিকারে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ দেখাবেন।"

"সাহেব চটবেন না ত বাবা?"

"আমি যা করব তাতে সাহেব আপনার ওপর একটুও চটবেন না।"

অমরেশের মাথায় হাত রেখে নন্দলাল বললে, "আশীর্ব্বাদ করছি দীর্ঘজীবী হও বাবা! তুমি আমার পরমাত্মীয়!"

পরদিন প্রত্যুষে 'বিগগেম' শিকারের আয়োজন সম্পূর্ণ। সকলে শিকারীর সাজে সুসজ্জিত। নন্দলালের বিশাল বপুখানি যোধপুর ব্রিচেসেব মধ্যে আঁটিতেছিল না। যাহা হউক যথাসম্ভব ফিটফাট হইয়া তিনি ইতস্ততঃ তদ্বির করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে মস্ত একটি উদ্যোগী শিকারী পুরুষ বলিয়া মনে হইতেছিল। তিনি কখনও একটি বন্দুক তুলিয়া ধরিতেছেন, পর মুহূর্ত্তে আর একটি বন্দুকের চেম্বারগুলি পরীক্ষা করিতেছেন, মাঝে মাঝে মাহুতের কাছে গিয়া হাতীকে অশ্বত্থপত্র খাওয়াইতেছেন, অশ্বগুলির পিট চাপড়াইতেছেন। সে কার্য্যতৎপরতা দেখিলে মনে হয় আজকের বাঘ তিনি নিজে না মারিয়া ছাড়িবেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্ত ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া এবং নন্দলালের উৎসাহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "Good! Mr. Ghosh, this is realey good!"

এমন সময়ে হঠাৎ একজন গোমস্তা আসিয়া অমরেশপ্রসাদের কানের কাছে চুপি চুপি কি বলিল। শুনিয়াই অমরেশের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। অতিমাত্র উৎকণ্ঠাব্যাকুল কণ্ঠে তিনি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার মেডিসিন, চেষ্টে ক্লোরোডিন আছে?"

সাহেবের মুখের হাসি এবং উৎসাহ উত্তেজনা নিমিষে অন্তর্হিত হইল। ভীতিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "ক্লোরোডিন? হাঁ আছে, কেন?"

অমরেশ বলিলেন, "না, এমন কিছু না। তবে মায়েব মশাইএর শেষ রাত থেকে বার পাঁচ ছয় ভেদ বমি হয়েছে—হাতে পায়ে একটু ক্র্যাম্প ধরছে—ষুরিনও পাস করেন নি কিছুক্ষণ"—

শেষ কথাগুলি সাহেবের কর্ণকুহরে পশিয়াছিল কি না সন্দেহ—তাঁহার চোখে মুখে ভীষণ আতঙ্কের চিহ্ন দেখা গেল, হস্তপদ কম্পিত হইতেছিল বলিয়া মনে হইল। ভীতিব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দি ডেভিল! সকালে হাত মুখ ধোয়া হোলো কোন জলে—কাছারীর পুকুরের?"

অমরেশ বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, তা ছাড়া পানীয় জলত নেই। আর—চায়ের জলও—"

সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ড্যাম ইট! চাপবাশী, আভি নাও পর চলো, আভি।" কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তিন লম্ফে কাছারীর গণ্ডী পার হইয়া সাহেব ক্ষিপ্তবৎ নদীতটের অভিমুখে ধাবিত হইলেন—নৌকাঘাটা কাছারীর পার্শ্বেই অবস্থিত। কোথায় পড়িয়া রহিল হাতী ঘোড়া, কোথায় রহিল শিকারের উদ্যোগ। কাছারী পার হইয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া অমরেশকে বলিয়া গেলেন, নৌকা-ঘাটায় গিয়া ঔষধ আনিতে, সাহেব নৌকা হইতে ঔষধ তাহার হস্তে ফেলিয়া দিবেন।

অমরেশ হাসিতে হাসিতে কাছারীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ডেপুটি বাবু তাঁহার বিশাল বপুর উপযোগী দ্রুত পাদবিক্ষেপে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আনন্দের আতিশয্যে তাঁহাকে একেবারে বিরাট বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর? তাহার পর মস্তকাঘ্রাণ, শিরশ্চুম্বন—বাকী কিছুই রহিল না। এক গাল হাসিয়া আনন্দ গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন,—"বাহাদুর ছেলে! এ কয়দিনে সকলের চেয়ে বড় শিকার তুমি কি করেছ বলত অমরেশ?"

মৃদুস্মিতমুখে অমরেশ বলিলেন, "কি, তা ত ঠিক জানিনে।"

নন্দলাল নিজেকে দেখাইয়া বলিলেন, 'আমাকে!'

শুনিয়া অমরেশ মৃদু হাস্য করিলেন; মনে মনে বলিলেন, "আজ্ঞে না, আসলে আপনার কন্যাকে।"

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রভাতী

—কে এম শমৃশের আলী

আজিকার প্রভাতের মেঘমুক্ত মেদুর আকাশ
দেয় মোরে হাতছানি, রক্ত ফাগ ছড়া'য়ে কৌতুকে,
কল্পনার রঙীন উদ্দাম শত স্নিগ্ধ মূক বুকে
মুঞ্জরিত যেন তার। মন্দারের ভোরালী বাতাস—
বিধাতার আশীর্ব্বাণী ছন্দে গানে নিখিল ভুবনে
ফিরিছে উল্লাসে গেয়ে। ধূলিম্লান ধরিত্রীর 'পরে
নামিল পীযুষ ধারা অমরার ক্ষণিকের তরে
আজি এ প্রদোষ কালে,—সৌম্য হাসি তাইতে
আননে।

স্বপ্ন-রাঙা বিহগের কলকণ্ঠে জাগে হারা বাণী,
—তন্দ্রাতুর আঁখি মেলে কুঞ্জোদ্যানে কুসুম-বালিকা,
জাগন-চপল দূত আনিয়াছে আলোর বারতা,—
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটে বাণী, শৈল-স্তূপ ভাঙ্গি নীরবতা
জাগে বুঝি কলোচ্ছ্বাসে, তরু-গুল্মে নবীনের লিখা;
সৌন্দর্য্যের তরল লাবণী-ধৌত সারা বিশ্বখানি।

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বিদেশী চলচ্চিত্রে ভারতবর্ষ

গত কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয়দের সম্বন্ধে কুৎসাপূর্ণ পুস্তক লেখা চলিতেছে ও চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। এসকল পুস্তক ও চলচ্চিত্রের পিছনে গভীর রাজনীতিক চাল রহিয়াছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু, রাজনীতিক চাল ব্যতীত, অপরের সম্বন্ধে কুৎসা করিয়া বা অপরের দুর্ব্বলতা, অসহায়তা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি বড় করিয়া দেখিয়া ও দেখাইয়া একাধারে আমোদ-প্রমোদ উপভোগের ; ও যে হতভাগাদের জীবনকে মসীলিপ্ত করিয়া বিড়ম্বিত করা হইতেছে তাহাদের তুলনায় দর্শকগণ যে সভ্যতা ও সুরুচিতে উন্নততর, দর্শকগণকে এ আত্মপ্রসাদ লাভে সুযোগ প্রদান করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের, সুলভ বণিক্ ও বর্ব্বর মনোবৃত্তি এ সকল প্রচেষ্টার পশ্চাতে রহিয়াছে। যে সকল দেশ সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকা সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে, পরাধীনতার সুযোগে ও অন্য নানাবিধ কারণে, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক ও চলচ্চিত্রের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এরূপ কুৎসাপূর্ণ পুস্তক প্রচার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিদেশে আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সুনামের যে হানি করিতেছে, বিদেশে ভারতীয় ছাত্র, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে পদে পদে যে লাঞ্ছনা ভোগ করাইতেছে তাহার কথা ভারত সরকার যদি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নাও গণনা করেন, তাহা হইলেও, ভারতে অগণিত ভারতবাসীর চিত্ত যে এরূপ পুস্তক প্রচার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন দ্বারা ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও কতটা উত্তেজিত হইতেছে, শুধু এই জন্যই এই সকল মিথ্যা ও কুৎসা, পুস্তকও ও চলচ্চিত্র সাহায্যে যাহাতে বিদেশে প্রচারিত হইতে না পারে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া, এবং যে সকল কোম্পানী এই সকল ছবি তুলিতেছে তাহারা যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ ছবি তুলিতে আর সাহসী না হয় সেজন্য প্রতিবাদ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, ভারত সরকারের উচিত ছিল। কিন্তু, ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে ও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য ডাঃ পি,এন, ব্যানার্জ্জির অনুসন্ধানের উত্তরে হোম-মেম্বর স্যর হেনরী ক্রেক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এ বিষয়ে ভারত সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দূরে থাকুক, শোচনীয় ঔদাসীন্যই সূচিত হয়। অনুসন্ধানের উত্তরে স্যর হেনরী ক্রেক ডাঃ ব্যানার্জ্জীকে লিখিয়াছেন :

“ইণ্ডিয়া স্পীক্স্ ছবি কাহারা তুলিয়াছে সে সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই ; এবং ছবিখানি কোনো বোর্ড অব্ সেন্সরের নিকট (অনুমোদনের জন্য) আসে নাই— (সুতরাং) ছবিখানি প্রকাশ্যে ভারতবর্ষের কোথাও প্রদর্শিত হয় নাই। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ছবিখানি ভারতবর্ষে আসে নাই।

“... আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে পরিষদগৃহে বলিয়াছিলাম, মান্দ্রাজ ও বোম্বে বোর্ড অব সেন্সর ছবিখানির (বেঙ্গলী বা লাইভ্স্ অব এ বেঙ্গলী ল্যান্সার) কতকাংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন।

“যে ছবিখানির নাম আপনি Every body loves

Music বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে সে ছবিখানির নাম Every body likes Music। ছবিখানি আমেরিকার R. K. O. রেডিও পিক্‌চার কর্পোরেশন তুলিয়াছিলেন এবং উহা ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে বেঙ্গল বোর্ড অব সেন্সরের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। যে ছবিখানি বোর্ড অনুমোদন করিয়াছেন তাঁহাতে মিঃ গান্ধী জনৈক ইউরোপীয় মহিলার সহিত নৃত্য করিতেছেন এরূপ কোন দৃশ্য নাই।

"ইণ্ডিয়া স্পীক্‌স্ ছবিখানি ভারতবর্ষে প্রদর্শিত হয় নাই এবং কোন কোম্পানী ছবিখানি তুলিয়াছিল তাহাও জানা যায় নাই: অপর ছবি দুইখানি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী তুলিয়াছে এবং এদেশের সেন্সর বোর্ড কর্তৃক ছবি দুইখানি অনুমোদিত হইয়াছে ;—সুতরাং কোন বিশেষ কোম্পানী কর্তৃক তোলা-ছবির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কোন প্রশ্নই উঠে না।"

ভারত সরকার যে চেষ্টা করিয়াও ইণ্ডিয়া স্পীক্‌স্ ছবিখানির প্রস্তুতকারক কাহারা তাহা জানিতে পারিলেন না, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা ; এই অকৃতকার্য্যতায় ভারত সরকারের কর্ম্মকুশলতার অভাবই সূচিত হইতেছে। অথচ কত অল্প পরিশ্রমেই যে হোমমেম্বর ছবিখানির প্রস্তুতকারকের নাম জানিতে পারিতেন তাহা ইউনাইটেড প্রেসের নিকট প্রদত্ত মিঃ গণ্ডিলের বিবৃতির নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে। মিঃ গণ্ডিল ইণ্ডিয়া জার্নালিষ্ট এসোসিয়েসনের ফরেন প্রোপাগাণ্ডা কমিটির সেক্রেটারী ও নিউইয়র্কস্থিত ইণ্ডিয়া সোসাইটি অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা। বিবৃতির প্রথমাংশেই আছে :—

"ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে স্যর হেনরী ক্রেক যে বলিয়াছেন, ইণ্ডিয়া স্পীক্‌স্ ছবিখানির প্রস্তুতকারককে তাহা চেষ্টা করিয়াও তাঁহার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই—তাহা বাস্তবিকই কৌতুকাবহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে-কোন চলচ্চিত্র ভাড়া দিবার অফিস্ বা যে-কোন চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকা উক্ত ছবিখানির প্রস্তুতকারকের নাম জানে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্যর হেনরী ক্রেক উপযুক্ত স্থানে খোঁজ লইলেই প্রস্তুতকারকের নাম সহজেই জানিতে পারিতেন। বিশেষত ভারতবাসী যাহাতে ছবিখানির প্রস্তুতকারকের নাম না জানিতে পারে, এবিষয়ে প্রস্তুতকারক সতর্কতা ত অবলম্বন করেই নাই, পক্ষান্তরে ভারতবাসীরা যাহাতে ছবিখানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে প্রস্তুতকারক তাহাই করিতে চাহিয়াছিল। মিঃ গণ্ডিলের বিবৃতিতে প্রকাশ :

"১৯৩৩ সালে নিউইয়র্কে আমি যখন ইণ্ডিয়া সোসাইটী অব্ আমেরিকার কার্য্যপরিচালনা করিতেছিলাম, তখন একদিন ইণ্ডিয়া স্পীক্‌স্ ছবিখানির প্রাইভেট শো'তে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

"R. K. O. রেডিও পিক্‌চার কর্পোরেশন উক্ত ছবিখানির প্রচারক এবং উহারাই উক্ত ছবিখানি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।...এবং ছবিখানির প্রযোজক মিঃ ওয়ালটার কাটার নিজে এবং R. K. O. কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

"ছবিখানি দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম।...আমরা মিঃ কাটারকে বলিলাম ছবিখানি সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত না হইলে এবং কতকাংশ ছাঁটিয়া না ফেলিলে, ইণ্ডিয়া সোসাইটী ছবিখানি অনুমোদন করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

"প্রকৃত পক্ষে (তাঁহাদের সহিত) কথাবার্ত্তায় আমাদের মনে হইল, ছবিখানির বিরুদ্ধে আমরা যাহাতে উত্তেজিত হই এবং প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করি এই জন্যই তাঁহারা আমাদের অনুমোদন লাভের ভান করিয়াছিলেন।......

"......আমরা প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে ছবিখানির বহুল প্রচার হইত ; এবং ইহাই (আমাদের বিক্ষোভ দ্বারা ছবির প্রচার) ছবিখানির প্রস্তুতকারক আমাদের নিকট হইতে আশা করিতেছিলেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ছবিখানির প্রস্তুতকারক বা প্রযোজক তাহাদের নাম যাহাতে ভারতবাসীর নিকট প্রকাশ না হইয়া পড়ে, এচেষ্টা মোটেই করেন নাই।

ডাঃ ব্যানার্জ্জির প্রশ্নের উত্তরে স্যর হেনরী ক্রেক বলিয়াছেন যে, যে সকল চলচ্চিত্র ভারতবর্ষকে কুচিত্রিত করিয়া হেয় করিতেছে তাহা বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত হওয়ায় এবং

ইতিপূর্ব্বেই তাহা বিভিন্ন বোর্ড অব সেন্সরের অনুমোদন লাভ করায়, ঐ সকল ছবি যে-সকল কোম্পানী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাদের তোলা অন্যান্য ছবির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। স্যর হেনরীর একথার কোন সারবত্তা খুঁজিয়া প্যাওয়া যায় না।

স্যর হেনরী সাধারণভাবে বলিয়াছেন, অনুমোদনকালে বোর্ড অব সেন্সর ছবিগুলির কতকাংশ ছাঁটিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে-সকল অংশ ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসীর মন ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইতে পারিত এমন কিছু ছিল কি না, কিম্বা ছাঁটিয়া না দিলে ছবিগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী বিক্ষোভ উপস্থিত হইবার মত ছবিগুলিতে কিছু ছিল কি না তাহা স্যর হেনরী বলেন নাই। হয়ত, ডাঃ ব্যানার্জ্জী ও সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করেন নাই; কিন্তু স্যর হেনরী জানিতেন ডাঃ ব্যানার্জ্জী যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার বিশদ উত্তর সমগ্র ভারতবাসীই জানিতে সমুৎসুক।

এই সকল চলচ্চিত্র যখন ভারতবর্ষের বোর্ড অব সেন্সরগুলির অনুমোদন লাভ করিয়াছিল তখন উহারাই যে বিদেশে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা প্রচার করিয়াছে বা করিতেছে তাহা জানা যায়নাই। সুতরাং তখন ঐ ছবিগুলির বিরুদ্ধে ভারতসরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়াথাকিলেও, এখন,—যখন চিত্রগুলি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বিদেশে কুৎসা প্রচার করিতেছে, তাহা ভারত সরকার জানিতে পারিয়াছেন—কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় নহে, এরূপ কথা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হইতেছে না···বিশেষতঃ ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর ছবি তোলা হইতে ঐ সকল কোম্পানী বিরত থাকিবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি যখন পাওয়া যায় নাই। যদি একাধিক কোম্পানী ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইয়া থাকে—তাহাদের সংখ্যা যতই হউক না কেন—তবে একাধিক কোম্পানীর বিরুদ্ধেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

পুনশ্চ স্যর হেনরী ক্রেক বোধ হয় ইউনাইটেড প্রেসের নিকট প্রদত্ত মিঃ গভিলের বিবৃতি হইতে ইণ্ডিয়া স্পীক্‌স্ ছবিখানির প্রস্তুতকারকের নাম জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণে স্যর হেনরী কি করিবেন?

কুৎসা পূর্ণ ছবি গুলি কি সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত?

অনেকের হয়ত ধারণা, এবং বিদেশে ইহাই বিজ্ঞাপিত হয় যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কুৎসাপূর্ণ ছবিগুলি সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার অনেক সময় ছবিগুলির প্রস্তুতকারকেরা এবং প্রচারকরা বলিয়া থাকে, ছবিগুলির দৃশ্য সমূহ ভারতবর্ষেই তোলা। মার্কিনী সভ্যতাও যে অর্থের লোভে কতদূর হীন হইতে পারে, সে বিষয়ে মিঃ গভিলের প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বিশেষ আলোকপাত করিবে:

মিঃ হ্যালিবার্টন, (ইণ্ডিয়া স্পীক্‌স্ ছবিখানির দৃশ্যসমূহের পরিচায়ক) যিনি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়া এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দৃশ্য সমূহের পরিচয়সূচক নাম করণ করিয়াছেন বলিয়া লোককে বিশ্বাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল (who was supposed to have travelled in India and to be speaking from personal experience) স্বীকার করিয়াছেন (মিঃ গভিলের নিকট) যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে কখনও পদার্পণ করেন নাই এবং কোন একজন ইংরেজ দৃশ্যসমূহের পরিচয়সূচক নাম তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। মিঃ গভিল আরও বলেন:

> "আমার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ কার্টার বলিয়াছিলেন, ছবিখানির সমস্ত দৃশ্য ভারতবর্ষে তোলা হইয়াছে, তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই।..."

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মিঃ গভিলের কথা পক্ষপাতদুষ্ট। সুতরাং বিখ্যাত মার্কিনী সাংবাদিক ও কবি মিঃ ভারনন এলবার্ট ওয়ার্ড ইউনাইটেড প্রেসের নিকট ভারতবাসী সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত বিবৃতি দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

> "ভারতীয়দের সংস্কৃতি এবং আচার ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের দেশের ইতিহাসগুলি আমাদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা এই দেশ সম্পর্কে ছায়াচিত্রে যাহা দেখিয়াছি উহা একেবারেই মিথ্যা। এই দেশ সম্পর্কে ছায়াচিত্রে যাহা দেখান হয়, সে রকম জঘন্য কিছুতো আমি এদেশে দেখিতে পাইলাম না।

কোথা হইতে ষ্টুডিওগুলি ভারতীয় আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এমন জঘন্য চিত্র সংগ্রহ করে উহা আমার নিকট বিস্ময়জনক ও রহস্যময় বলিয়া মনে হয়।"

বিদেশে ভারতের স্বপক্ষে প্রচারকার্য্য ও কংগ্রেস

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসাপূর্ণ রটনা বন্ধ করিতে হইলে, দেশবাসী ও সরকার উভয়েরই তৎপর হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা পরাধীন জাতি—সরকারকে দিয়া আমাদের মতানুযায়ী কার্য্য করাইয়া লই এমন শক্তি আমাদের নাই। সরকার যদি সুবুদ্ধি বশতঃ এরূপ কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা সুখের কথা। কিন্তু, আমাদিগকে দেখিতে হইবে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ও নিজেদের সাহায্যে আমরা কতটা করিতে পারি।

ভারতবর্ষের মধ্যে কংগ্রেস সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য, সুতরাং বিদেশে ভারতীয় জাতিক ও সাংস্কৃতিক সুনাম পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা লাভের সহায় হইবে বলিয়া,এরূপ কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে এবং যাহাতে দেশের সুনাম বিদেশে বৃদ্ধি পায় সে জন্য কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য চালান উচিত। এ বিষয়ে সুভাষ বাবু সংবাদপত্রের মারফত অনেকবার দেশবাসীর ও কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এমনকি, কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকেও পত্র লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রচার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও উপযুক্ত লোক ও অর্থাভাবের অজুহাতে প্রচার কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। সুভাষ বাবু বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে অর্থের প্রয়োজন নাই—তাঁহার উপর ভার দিলে তিনি একার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষ বাবুকে উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। বর্ত্তমান কংগ্রেসের কর্ণধারদের মতের সহিত সুভাষ বাবুর মতের পার্থক্যই সম্ভবতঃ ইহার কারণ। সুভাষ বাবু কি জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেন না, তাহা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দেশবাসীকে বিশদভাবে জানান উচিত ছিল। সম্প্রতি পণ্ডিত জহরলাল এরূপ প্রচার কর্য্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যাইতে পারে, আগামী লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে বিদেশে প্রচার-কার্য্য চালাইবার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এবিষয়ে সমগ্র দেশবাসীরই অবহিত হওয়া উচিত।

প্রকৃত প্রতিকার কোথায়

গড়পারে চারিটি কন্যার অহিফেন সেবন ও তন্মধ্যে তিন জনের মৃত্যু, সমাজে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সমাজের অভ্যন্তরভাগ যে কতটা পচিয়া উঠিয়াছে, আকস্মিক রূঢ় আঘাতের দ্বারা তাহা আমাদের সকলকে দেখাইয়া দিয়াছে।

মাঝে মাঝে এই প্রকার আঘাতে আমরা সচকিত হইয়া উঠি বটে, এবং বরপণ প্রভৃতি নিবারণের জন্য প্রধানতঃ মৌখিক এবং কার্য্যত সামান্য চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রকারের চেষ্টা বিফল হইবার প্রধান কারণ এই যে, ইহা ঠিক পথে পরিচালিত না হইয়া অনেকটা জোড়াতালি দিবার কার্য্যেই শেষ হইয়াছে। সমস্যাটিকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ না করিয়া এবং ব্যাধির মূল অনুসন্ধান না করিয়া উপরের দুই একটি লক্ষণকে আমরা রোগ বলিয়া ভুল করি এবং ফলে অনেক চেষ্টা ও উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়।

সমাজের পুরাতন ব্যবস্থার মূল শিথিল হইয়াছে ; পুরাতন আর্থিক ভিত্তি নড়িয়া গিয়াছে, নূতন চিন্তা ও নূতন ভাবধারা জীবনযাত্রার নূতন রূপ ও নূতন আদর্শের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অথচ, এই নূতন অবস্থাকে আমরা পুরাতন ব্যবস্থার ছাঁচে আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছি। ইহাতে নানা অসঙ্গতি ও অন্তর্বিরোধে সমাজ ভরিয়া গিয়াছে, সংখ্যাতীত লোক নানাভাবে নিত্য ইহার বলি যোগাইতেছে, দুই একটি চরম ঘটনা মাঝে মাঝে বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র। পূর্ব্বের ন্যায় ছেলেদের আর বর্ত্তমানে পিতামাতারা প্রায় একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিবাহ দিতে পারিতেছেন না ; অথচ মেয়েদের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিবাহ দিতে না পারাটা এখনও সমাজে বিশেষ নিন্দার কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতেছে।

বিবাহের আনুষঙ্গিক আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকায় ছেলেদের বিবাহের বয়স স্বভাবতঃই বাড়িয়া

চলিয়াছে এবং অনেকে বিবাহ করিতে পারিতেছেন না, অথচ মেয়েদের সাধারণ স্বাধীনতার ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক স্বাবলম্বনের কোন সুযোগ গড়িয়া উঠিতে পারিতেছেনা, ফলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই।

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ছেলেদের পছন্দমত পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইবার সুবিধা আছে, অথচ, মেয়েদের এই প্রকার সুবিধা সামান্য পরিমানেও নাই। কাজেই বিবাহ ব্যাপারে ছেলেদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রতিযোগিতা নাই, কিন্তু মেয়েদের তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

আমাদের সমাজ যদি হাজার সংকীর্ণভাগে বিভক্ত না হইত, বৈবাহিক মণ্ডলীগুলি অধিকতর প্রশস্ত হইত, তবে, এ সকল কারণের ফল এত তীব্রভাবে দেখা যাইত না।

কিন্তু প্রতিকারের পথ এ সকল দিকে না খুঁজিয়া আমরা শুধুমাত্র ছেলেদের উদার হইতে ও পণ গ্রহণ না করিতে বলিতেছি। এ চেষ্টায় কখনও পুরাপুরি ফল পাওয়া যাইবে না। যেখানে সাফল্যের জন্য বহুলোকের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রলোভন আছে, সেখানে শুধুমাত্র মানুষের মহত্বের উপর নির্ভর করিয়া যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাইবে না;—যদিও অতন্দ্রভাবে ইহার নির্ম্মম পাশবিকতা সম্বন্ধে লোককে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রকৃত প্রতিকারের জন্য, মেয়েরা বর্ত্তমানে সমাজে যে নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেই অবস্থার অবসান করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অধিকার-সাম্য দিতে হইবে। সমাজের মধ্যে এই ধারণা গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে ছেলেদের বিবাহ না হইলে যেমন, তাঁহাদের বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদের লজ্জিত হইবার কারণ ঘটে না, সেইরূপ মেয়েদের সময়মত বিবাহ না হইলেও কাহারও লজ্জিত হইবার কারণ নাই—ইচ্ছা করিলে কেহ চিরকুমারীও থাকিতে পারেন। কিন্তু ইহাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্রে মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং তাহা দিতে হইলে, তাঁহাদিগকে পুরুষের ন্যায় গতিবিধির স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মন হইতে এই মিথ্যা ধারণা দূর করিতে হইবে। বরপণ প্রচার জন্য দায়ী বলিয়া যে সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি মেয়েদের আর্থিক ও অন্যবিধ পরাধীনতার সহিত জড়িত, কাজেই, মেয়েরা আর্থিক স্বাধীনতা পাইলে, বিবাহ সম্বন্ধীয় অসুবিধার অনেকখানিরই অবসান হইবে।

অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হইলে এই সমস্যা অনেকখানি লঘু হইয়া যাইবে। সমগুণ বিশিষ্ট পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিবাহের সময় যদি জাতি বর্ণের বিচার সর্ব্বপ্রধান বিবেচনার বিষয় না হইয়া পড়ে, যে কোন জাতির মধ্যে উপযুক্ত পাত্র পাইলে যদি কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে, বরপক্ষের পণ গ্রহণ করিবার সুযোগ অনেক কমিয়া যাইবে।

একই শ্রেণীর বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যে বিবাহের প্রচলনের জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহার বিশেষ ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ মনের অভ্যাস ও ব্যবহারের জড়ত্ব ভাঙ্গিয়া কোন নূতন কাজে ব্রতী হইতে যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের প্রয়োজন এত অপব্যাপারের জন্য তাহার সৃষ্টি হয় না। বিদ্রোহাত্মক কোন বড় কাজের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাহাতে একদিকে যেমন বিরুদ্ধতা জাগে অন্যদিকে তেমনই কতক লোক এই কার্য্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তাঁহার নৈতিক শক্তি উপলব্ধি করিয়া তাহার সমর্থন করে। বড় আঘাত ব্যতীত লোকের মনকে এইভাবে জাগাইয়া তুলা সম্ভব হয় না।

এই চেষ্টা বিফল হইবার দ্বিতীয় কারণ, দেশের একই অংশে নানা শ্রেণীর লোকের বাস থাকিলেও একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপশ্রেণীর বাস সাধারণতঃ একস্থানে অধিক নাই। চেষ্টা করিয়া খুব দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা লোকের পক্ষে স্বাভাবিক নহে; গতিবিমুখ দরিদ্র পল্লীবাসীদের পক্ষে তাহা প্রায় অসম্ভব। এই জন্যই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপ দলের মধ্যে বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইলেও আজও তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

বিবাহ ব্যাপারে বাঙ্গালী হিন্দু কন্যাদের লাঞ্ছনা ঘুচাইতে

হইলে অন্যান্য চেষ্টার সহিত, মূল কারণ দূরীভূত করিবার জন্য মেয়েদের স্বাধীনতা দানের ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের জন্য চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে।

ছাত্রসংখ্যা প্রকৃতই কি বেশী

দেশের সব কিছু অমঙ্গলের জন্য উচ্চ শিক্ষাকে দায়ী করা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এমন একটা বিশ্বাস আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে উচ্চশিক্ষারত ছাত্রের সংখ্যা দেশের প্রয়োজনকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছে। উচ্চশিক্ষালাভকে লোকে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রশংসার চক্ষে দেখে না অথবা তেমন মূল্যবান মনে করে না। শিক্ষার আর্থিক মূল্য কমিয়া যাওয়াই সম্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় ইহার তরুণ অধিনায়ক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্যান্য দেশের সহিত এ দেশের উচ্চশিক্ষার তুলনামূলক হিসাবের দ্বারা, এই ধারণা যে কত ভুল তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রথম আমাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। ঢাকার এলাকাধীন অল্প স্থান ব্যতীত আমরা বাংলা ও আসামের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকি। কার্য্যতঃ তাহা হইলে বাংলার প্রায় পাঁচ কোটি ও আসামের নব্বই লক্ষ লোকের জন্য আমাদের একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৩১ হাজার এবং উচ্চশিক্ষার জন্য মোট ব্যয় ৮৬ লক্ষ টাকা। ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত সমগ্র ব্রিটীসভারতের কথা ধরা যাক। ভারতে মাত্র ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং তাহাদের ছাত্র সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার হইবে। ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার জন্য মোট ব্যয় চারি কোটি টাকারও কম।

"এখন অন্যান্য দেশের দিকে তাকান যাক। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি কোটি; কাজেই, জনসংখ্যার দিক দিয়া তুলনামূলক বিচারের জন্য ইহার উদাহরণ বিশেষ উপযোগী হইবে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখানে ১৬টি—ইহা সমগ্র ভারতের সংখ্যার সমান—এবং ৫৫ হাজার ছাত্র এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। শুধু ইংলণ্ড ও ওয়েলসেই উচ্চ শিক্ষার জন্য ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। শুধু এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই ৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়।

"ইংরেজদের একটী উপনিবেশের হিসাবের অঙ্ক দেখা যাক। কানাডার জনসংখ্যা এক কোটি। এখানে ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং ৮৫ হাজার ছাত্র উচ্চশিক্ষায় রত আছে। জার্ম্মানীর জনসংখ্যা ৬ কোটি ৬৬ লক্ষ; এখানে ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এগুলির ছাত্রসংখ্যা ৮৮ হাজার। ইটালির জনসংখ্যা ৪ কোটি ১০ লক্ষ; এখানে ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং ৫০ হাজার ছাত্র উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয়। জাপানের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয়টি এবং ছাত্রসংখ্যা সত্তর হাজার।

"এখন মাধ্যমিক শিক্ষার কিছু হিসাব দেওয়া যাক। বাংলার বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমিক স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ৬০ হাজার। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারভুক্ত হাইস্কুলের ছাত্র। এতদতিরিক্ত আসামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ৭৭ হাজার। যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহাদের প্রতি ১৭জনের মধ্যে একজন উচ্চস্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ধরিলে দেখা যাইবে স্কুলগুলিতে প্রায় ২৪ লক্ষ ছাত্র আছে এবং প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু, অন্যান্য দেশের অবস্থা কি? ব্রিটীস দ্বীপপুঞ্জে ৭ লক্ষ ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়ন করে এবং প্রতি ১২ জনের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষার জন্য যায়। কানাডায় প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে। জার্ম্মানীতে এই অনুপাত প্রতি নয়জনে একজন; ইটালী ও জাপানে দশজনে একজন।

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক সময়ই আমাদের সমালোচকদের মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। আমি কি একথা তাঁহাদের গোচরে আনিতে পারি যে, এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায় ২৫ হাজার পরীক্ষার্থী উপস্থিত

হইবে বটে, কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বে শুধু ইংলণ্ড ও ওয়েলসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে অনুমোদিত প্রাথমিক পরীক্ষায় ৫৭ হাজার পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭৩ জন কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এই পরীক্ষাটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কর্ত্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষারূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যান্য সভ্যদেশে শিক্ষার যে সকল সুযোগ বর্ত্তমান আছে তাহা হইতেও অনুরূপ দৃষ্টান্তসমূহ দেওয়া যাইত। এই সকল দেশের স্কুলে, কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাদের সংখ্যা কোন দিক দিয়া অত্যন্ত বেশী হইয়া গিয়াছে বা ইহা এই সকল দেশের লোকদের মনোবৃত্তির অস্বাস্থ্যকর বিকাশের পরিচয় প্রদান করিতেছে, এইরূপ কথা বলা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।"

শিক্ষা প্রসারের বাধা

ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার স্যর জন্ এণ্ডারসন শিক্ষাসপ্তাহে সেনেট হাউসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের পথে যে সকল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ;—

"প্রথমত নানাবিধ দারিদ্র্যের বাধা আছে ; সরকার এবং স্থানীয় আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দারিদ্র্য আছে ; জনসাধারণেরও নিষ্পেষণকারী দারিদ্র্য আছে, অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় পর্য্যন্ত নাই। এই নিদারুণ সঙ্কট অবস্থায় যদি মাতা পিতা তাঁহাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠাইয়া তাহাদের শ্রমশক্তিকে নিজেদের কাজে লাগান তবে তাহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। ইহার পর, নানাপ্রকার রোগের, বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা আছে ; তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে স্কুলগৃহগুলি শূন্য হইয়া যায় এবং উপস্থিতির সংখ্যা নিতান্ত কমিয়া যায়। যাতায়াতের অসুবিধা আর একটি বাধা ; তাহার জন্য প্রচেষ্টা বিভক্ত হইয়া যায় এবং স্কুলের সংখ্যা অনাবশ্যক ভাবে বাড়িয়া যায়।

"আরও একটি বাধা হইতেছে সামাজিক আচার সমূহ—বিশেষ করিয়া যাহা স্ত্রীলোক ও বালিকাদের প্রতি মনোভাবের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে—কিছুতেই দূর না হওয়া। বলিকাদের শিক্ষার ধীর অগ্রগতিতে অনেকেই নিরাশ হইয়া পড়েন এবং ভারতবর্ষের এই অগ্রগতির হারকে অন্যান্য দেশের অগ্রগতির সহিত তুলনা করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি যদি ইংল্যাণ্ডে এই প্রকার সামাজিক অনুশাসন প্রচলিত থাকিত বলিয়া ধরা যায় যে,ছোট ছোট বালিকাদের তাহাদের ছোট ছোট ভ্রাতাদের হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র স্কুলে পড়িতে হইবে এবং স্ত্রীলোকেরা বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে পারিবেন না তবে, তাহার ফল কি হইত ? ভারতে কিন্তু, ছোট ছোট বালিকাদের স্বতন্ত্র স্কুলে শিক্ষাদানই সাধারণ নিয়ম এবং বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোক শিক্ষক দেখিতে পাওয়া নিতান্ত বিরল ঘটনা।"

স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার

বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার সন্তোষজনক প্রসার এবং এ-সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতা সম্বন্ধে—স্যর জন্ বলিয়াছেন :

"বিশেষ করিয়া সম্প্রতি বালিকাদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়া শিক্ষার অনেক প্রসার ঘটিয়াছে। ইহাপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ কথা হইতেছে যে, বালিকাদের অধিকদিন স্কুলে থাকিবার ঝোঁক বাড়িয়াছে এবং ইহার ফলে তাঁহারা স্কুল শিক্ষার উপকার অধিক পরিমানে পাইতেছেন। হিসাবের অঙ্কগুলি প্রকৃত পক্ষেই উল্লেখযোগ্য। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীর সংখ্যা ১৯২৭ সালে ১,০০২ হয়,—১৯৩২ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া ২,১৩৮ হয় ; তারপর ১৯৩৩ সালে এই সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া ২,৭৭০ এবং ১৯৩৪ সালে ৩,৩২৫ হয়।—বাংলার অঙ্কগুলি বিশেষভাবে উৎসাহবর্দ্ধক ; ১৯২৭ সালের সংখ্যা ছিল ১৫৭। ১৯৩১ সনে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৩৯৪ হয় এবং তৎপরে ১৯৩৪ সালে এই সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া ৬০৯ এ দাঁড়ায়।

"এই অগ্রগতির কথা বিবেচনা করিলে বলা যায় যে, সম্ভবতঃ পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ ব্যতীত বালক ও বালিকা-

দের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের অসামঞ্জস্য দূর করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির নিশ্চেষ্টতা নিতান্তই পীড়াদায়ক। অর্থসঙ্কটের সময় সর্ব্বপ্রথম যে বরাদ্দকে ছাটিয়া ফেলা হয় তাহা যে, স্ত্রীশিক্ষা বাবদ ব্যয়ই হইয়া থাকে, এই অস্বাস্থ্যকর ধারণাকে বাধা দেওয়া কঠিন। অথচ বালকদের শিক্ষাকে যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহাকে যদি এড়াইয়া চলিতে হয় তবে বালিকাদের শিক্ষাকে দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সময়।"

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভাগ

সাম্প্রদায়িক ও উপসাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের অপকারিতা সম্বন্ধে স্টুব ক্লন্ বলিয়াছেন :—

> বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর জন্য পৃথকভাবে নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে সমান সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারিলে আমি বিশেষ সুখী হইতাম। অকারণ সংখ্যাবৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার বিপদ ব্যতীতও এই সকল স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সুখী ও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ সৃষ্টির কার্য্যে সহায়তা করিবে না। মন যখন সহজেই সকল জিনিষের মুদ্রণ গ্রহণ করে সেই বাল্যে ও কৈশোরে সংকীর্ণ ও বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে বালক বালিকাদের শিক্ষালাভ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বালক বালিকাদের সহিত বরং তাহাদের ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করা এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের বালক বালিকাদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সদিচ্ছা পোষণ করিবার শিক্ষা পাওয়া উচিত।"

অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালক বালিকাদের সম্বন্ধে যে লোকের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে স্যার জর্জ্জ তাহা আনন্দের সহিত লক্ষ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোকে ইহাদের জন্য পৃথক স্কুল সৃষ্টির কথার অধিক আর কিছু ভাবিতে পারিত না,—ইহাতে হীনতার ছাপকেই স্থায়ী করা হইত। কিন্তু, বর্ত্তমানে অন্যান্য বালক বালিকাদের সহিত সমান অধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ স্কুলে ইহাদিগকে পড়িতে দিবার ঝোঁক বেশী দেখা যাইতেছে। এই স্বাস্থ্যকর, প্রথা যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে এবং জাতিভেদের কুসংস্কার যে দ্রুত অন্তর্হিত হইতেছে তাহা সকল প্রদেশের বিবরণ হইতেই জানা যাইতেছে।

বঙ্গীয় বেত্রদণ্ড আইন

স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে অপরাধীকে বেত্রদণ্ড দিবার আইন বাংলা কাউন্সিলে গৃহীত হইল। কয়েকটি বিশেষ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য স্ত্রীলোক সম্পর্কিত অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার সাধারন উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির দলের অন্তর্ভুক্ত যে কেহ এই প্রকার কোন অপরাধ করিবে বা করিবার চেষ্টা বা সহায়তা করিবে সে-ই এই সকল বিধান অনুযায়ী বর্ত্তমান শাস্তির সহিত বা তাহার পরিবর্ত্তে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া ইহার পল্লী অঞ্চলে নারী নির্য্যাতন এমন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে যে তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য আইনের কঠোরতা ইহা নিবারণে কতকটা সহায়তা করিবে এরূপ আশা করা যাইতেছে।

আইনের কঠোরতা বা অপরাধীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের দ্বারা অপরাধ নিবারণের চেষ্টা যে আশানুরূপ ফলবতী হয় না এবং তাহা সভ্যতাসম্মত নহে তাহা নিশ্চয়ই সত্য। অপরাধীদের কাজের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের নহে। তাহারা যে সমাজে ও যে রাষ্ট্রের অধীনে বাস করে, যেরূপ শিক্ষা, সংসর্গ ও আদর্শের মধ্যে মানুষ হয়, জীবনে যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা ও আর্থিক সচ্ছলতা ভোগ করিবার সুযোগ পায় অথবা যে দুঃখ কষ্ট অভাব ও দারিদ্র্য ভোগ করে তাহাই, এক কথায় তাহার সমগ্র আবেষ্টনই তাহার অধোগতির জন্য দায়ী। কাজেই, যে অধোগতির জন্য অপরাধীর সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সঙ্গত হইত, তাহার জন্য দণ্ড ভোগ করিয়া অপরাধীকে সমাজ ও রাষ্ট্র রক্ষা করিতে হয়। আমাদের প্রদেশে নারী হরণ ও নির্য্যাতন যে এমন ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে তাহার কারণও, আমাদের সমাজের নানা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা, অশিক্ষা, অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা মনুষ্যত্ব ও নৈতিক বুদ্ধিনাশকারী দারিদ্র্য, এই সকল অবস্থার ফলে উৎপাদিত

শোচনীয় কাপুরুষতা, সকল সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে সমান অধিকার ও শিক্ষা এবং স্বাধীনতার অভাব, পরিবারস্থ পুরুষদিগকে দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার মত শক্তি, চেতনা, স্বাস্থ্য ও মর্য্যাদাবোধের অভাব প্রভৃতির মধ্যেই নিহিত। এই সকল কারণ দূর করিতে পারিলেই তবে প্রকৃতপক্ষে এই পাপ দেশ হইতে দূর হইবে এবং শাস্তিদানের পরিবর্ত্তে অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই তাহা ন্যায়ানুমোদিত ব্যবস্থা হইল বলিয়া ধরা যাইবে।

কিন্তু, যতদিন পর্য্যন্ত এই বাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি না হইতেছে এবং আমাদের দৈনন্দিন নিরাপদ জীবন যাত্রার জন্য বর্ত্তমান অবস্থার উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে, ততদিন কোন বিশেষ দিক হইতে সাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে কঠোর আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর কি? ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ প্রভৃতি সভ্য দেশে যে অনুরূপ কঠোর আইন সমূহ আছে কাউন্সিলের আইনজ্ঞ সদস্যগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছেন। আমাদের দেশেও প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর, নির্জ্জন কারাবাস, বেত্রদণ্ড ও অন্য নানাবিধ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কাজেই, কথা হইতেছে যেসকল অপরাধের জন্য এই সকল দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, এই অপরাধগুলিকে সেই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইবে কি না। কোন কোন প্রামান্য লোক এই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। একদিক দিয়া ইহাকে হত্যাপরাধের সমশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। অত্যাচারিতাকে অনেক ক্ষেত্রেই (দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ও লাঞ্ছনা ব্যতীত) সমগ্র অতীতের সহিত বিচ্ছিন্নসম্পর্ক হইতে হয়। অতীতের গৃহ, সম্পত্তি, সম্মান এবং স্নেহ ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এক কথায় ইহার ফলে সমস্ত অতীত জীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং সম্মুখে যে জীবন থাকে তাহাও দুঃখ কষ্ট ও গ্লানিময়। তবু হত্যার সমকক্ষ যদি নাও হয়, তবু ভীষণতা ও বর্ব্বরতায় ইহা অন্য কোন অপরাধ অপেক্ষা লঘু নহে। কাজেই, এই প্রকার আইন অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যদি সমর্থনযোগ্য হয় এবং বর্ব্বরতার নিদর্শন বলিয়া গন্য না হয়, তবে আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাহা হইবার নহে। যাঁহারা এই অজুহাতে এই বিশেষ ক্ষেত্রে আইনটি প্রবর্ত্তনের বাধা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মনোভাব নানাকারণে আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। রাজনীতিক বন্দী বা অপরাধীরা সাধারণ অপরাধীশ্রেণীভুক্ত নহেন। বেত্রদণ্ড দান যদি সমর্থনযোগ্য না হয় তবে ইঁহাদের বেলায় তাহা অনেক বেশী সমর্থনের অযোগ্য। কিন্তু রাজনীতিক বন্দীদিগকে বেত্রাঘাত করা আমাদের দেশে সাধারণ ঘটনা হইলেও প্রবর্ত্তিত আইনের প্রতিবাদকারীরা সেক্ষেত্রে কখনও কোনও প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। পণ্ডিত জহরলাল তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত 'The mind of a judge' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "কার্য্যতঃ ইহার (বেত্রাঘাতের) ক্ষেত্র অনেক অধিক প্রসারিত এবং ১৯৩২ সালে (ব্রিটিস-হাউস-অব-কমন্সে কৃত উক্তি অনুসারে) পাঁচশত আইন অমান্যকারী বন্দীকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। ইহা সরকারী হিসাব, জেলের বেসরকারী মার ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। জেলের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য অথবা শুধু রাজনীতিক অপরাধের জন্য এই রাজনীতিক বন্দীদিগকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল।" সম্ভবতঃ বেত্রদণ্ডের এত ব্যাপক প্রয়োগ আর কোন ক্ষেত্রে হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে সার বি, এল, মিত্র এদেশে বেত্রদণ্ড আইনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখান যে, ইহা ১৮৬৪ সালে কোন অপরাধের জন্য প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এবং ১৯০৯ সালেই স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে কোন কোন অপরাধ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেখানে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকিবেন, সেখানেই মাত্র আইনটির প্রয়োগ হইতে পারিবে বলিয়া, পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত অপরাধ ব্যতীত, আকস্মিক দুর্ব্বলতা-উদ্ভূত অপরাধগুলির ইহার আমলে আসিবার সম্ভাবনা কম থাকিবে। ইহা ভালই হইয়াছে।

সমাজের সর্ব্বপ্রধান ব্যাধি দারিদ্র্য দূর না হইলে এই সকল এবং অন্যান্য পাপ সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, দারিদ্র্যই আমাদের নৈতিক বুদ্ধিকে সর্ব্বাপেক্ষা শিথিল করে, শিক্ষা, মনুষ্যত্ব ও দায়িত্ববোধের বিকাশের পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন উৎপাদন করে। কাজেই কঠোর আইনের সাহায্যে চাপিয়া রাখা ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ হইতে পাপপ্রবণতা দূর হইবে, এমন আশা আমরা করি না। কিন্তু আমাদের সম-অবস্থাপন্ন অন্যান্য দেশ ও প্রদেশ অপেক্ষা যখন

এখানে এই পাপের প্রসার অধিক তখন বর্ত্তমান অবস্থায়ও ইহা কিছু পরিমাণে হ্রাস করা যাইবে। বর্ত্তমান অবস্থা মূলতঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্যান্য দেশে ও প্রদেশেও এই পাপ হ্রাসের জন্য চেষ্টা করিবার ক্ষেত্র আছে। যে সকল দিকে চেষ্টা চালাইয়াও আমরা আদর্শ স্থাপনের ও কলঙ্কমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে পারি।

অন্য নানাপ্রকার চেষ্টার মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং সকল সম্প্রদায়ের নারীদের স্বাধীনতাদানের চেষ্টার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। নারীরা স্বাধীনতা ও বাহিরে গতিবিধির অধিকার পাইলে একদিকে যেমন তাঁহারা আত্মরক্ষার অধিকতর পটু হইবেন অন্যদিকে সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, নারীর প্রতি শ্রদ্ধার সামাজিক মান বাড়িয়া যাইবে এবং স্বাধীনতার ফলে, নারীদের মধ্যে স্বার্থ ও মর্য্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাইবে ও তাহা রক্ষা করিবারও শক্তি হইবে। প্রত্যেক পরিবারের পুরুষই ইহার দ্বারা অল্পাধিক প্রভাবিত হইবেন।

শ্রীমতী কমলা নেহেরুর পরলোকগমন

আমরা গভীর দুঃখের সহিত শ্রীমতী কমলা নেহেরুর পরলোকগমনের সংবাদ পাঠ করিলাম। তাঁহার শক্তি, যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার কথা, তাঁহার অকপট দেশপ্রেম ও অনন্য সাধারণ ত্যাগের কথা দেশের লোকের অবিদিত নাই। কিন্তু জওহরলালের সংগ্রাম ও দুঃখ বরণের যে অংশ তাঁহাকে রোগশয্যায় থাকিয়াও নীরবে বহন করিতে হইয়াছে তাহারই শোকাবহ কারুণ্য, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমাদিগকে বিশেষভাবে পীড়া দিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর হইয়াছিল।

পণ্ডিতজীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। আদর্শ ও অধিকারের জন্য যাঁহাকে সারা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে, পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের অবিচ্ছিন্ন সুখ শান্তি ভোগ যাঁহার জীবনে কদাচিৎ ঘটিয়াছে, এই আঘাত যে তাঁহার পক্ষে কতটা সাংঘাতিক হইয়াছে, তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তবুও পণ্ডিতজীকে আমরা এই বলিয়া সান্ত্বনা দিই যে, সমস্ত দেশের লোক তাঁহার নিদারুণ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছে; যাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি নিজের সুখৈশ্বর্য্য উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাদের সকৃতজ্ঞ স্মৃতির মাঝে কমলা আজও বাঁচিয়া আছেন; আশা-করি ইহা তাঁহার দুঃখভারকে লঘু করবে।

নারীহরণ ও সাম্প্রদায়িকতা

বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ এতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে সামাজিক, রাজনীতিক, শিক্ষাবিষয়ক, নীতিবিষয়ক প্রভৃতি যে কোন সমস্যার আলোচনার উদ্ভব হউক না কেন এক শ্রেণীর লোক তাহার ভিতর সাম্প্রদায়িকতার হলাহল প্রবিষ্ট করাইবেন-ই। ইঁহারা হয় বিশ্বাস করেন, নয় লোককে বিশ্বাস করাইতে চান, যে বঙ্গদেশের প্রত্যেক হিন্দু প্রত্যেক মুসলমানের ও প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনেই তৎপর। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, দুর্ব্বৃত্ত ও চরিত্রহীনের পাপের প্রবৃত্তিতে যখন শত শত মাতা-ভগ্নীকে আত্মাহুতি দিতে হইতেছে, যখন প্রতিদিন শত শত সুখ-শান্তির নীড় পাশবিকতার অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তখন একশ্রেণীর লোক নারীরক্ষা প্রশ্নের ভিতরও সাম্প্রদায়িকতাকে টানিয়া আনিতেছেন। নারীঘটিত অপরাধ-সম্পর্কে বেত্রদণ্ড বিধি প্রবর্ত্তনের আলোচনাকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ সুরাবর্দ্দী যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার আগা-গোড়া তীব্র সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণ। বক্তৃতায় তিনি, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করিয়া, হিন্দু-প্রতিষ্ঠান হিন্দু জুরি এমন কি পরোক্ষভাবে হিন্দু জনসাধারণকে পর্য্যন্ত হীনভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। পরে অবশ্য সংবাদ-পত্র সমূহে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি হিন্দু জনসাধারণকে আক্রমন করেন নাই কয়েকটি হিন্দু প্রতিষ্ঠানের কার্য্য কলাপের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন মাত্র। সাধারণতঃ যেরূপ করা হইয়া থাকে, তাঁহার বক্তৃতা হইতে দু-চার ছত্র উদ্ধৃত করিয়া তিনি যে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু জনসাধারণকে আক্রমণ করিয়াছেন ইহা দেখান সম্ভব নহে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, বক্তৃতার উদ্দেশ্য সমগ্রভাবে হিন্দুজনসাধারণকে আক্রমণ করা। নারীর সতীত্ব বা গৃহের পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্নের ভিতর সাম্প্রদায়িকতা

আসিয়া পড়ে, বা এই প্রশ্ন বিচারকালে আমরা সাম্প্রদায়িকতার আলোচনা করি ইহা আমরা চাহিনা। সুতরাং, মিঃ সুরাবর্দ্দীর বক্তৃতার আলোচনা করিতে না হইলেই আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু সুরাবর্দ্দী সাহেবের বক্তৃতার প্রতিবাদ কোন মুসলমান সদস্য ত করেন নাই-ই, পরন্তু কোন কোন মুসলমান সদস্য বক্তৃতায় মিঃ সুরবর্দ্দীকে সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, নারী-ঘটিত অপরাধ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভাষী শুধু সুরাবর্দ্দী-সাহেবেরই বৈশিষ্ট্য নয়, এবং সুরাবর্দ্দী সাহেবের বক্তৃতার দ্বারা আরো অনেকে প্রভাবিত হইতে পারেন। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সুরাবর্দ্দী সাহেবের বক্তৃতার আলোচনা করিতে হইতেছে।

প্রথমতঃ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন. মুসলমানদের হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য ও নিরপরাধ মুসলমানদের হয়রান করিবার জন্য, এক শ্রেণীর হিন্দুর প্রতিষ্ঠান মুসলমানকে অযথা এই প্রকার অপরাধে জড়িত করিয়া থাকে, এবং হিন্দু জুরীগণ পর্য্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকেই এই সকল আসামীকে অপরাধী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এখানে হিন্দু-জুরী বলিয়া, সুরাবর্দ্দী সাহেব পরোক্ষভাবে হিন্দু জনসাধারণকেই আক্রমণ করিয়াছেন। জুরীরা দেশের বিশেষ কোন চিহ্নিত লোক-শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হন না; এবং হিন্দু সমাজের জুরী হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই হিন্দু সভা, হিন্দু মিসন বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের লোক নহেন। অথচ এমন অবস্থায় যদি জুরীমাত্রেই বা অধিকাংশ জুরীরা (নগণ্য মুষ্টিমেয় বাদে) সাক্ষ্য প্রমানাদির ধারণা ধারিয়াই হিন্দু-নারী সম্পর্কে অভিযুক্ত প্রত্যেক মুসলমান আসামীকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সুরাবর্দ্দী সাহেব হিন্দুজুরীকে যে দোষে দোষী মনে করিতেছেন, তাহা শুধু জুরীদেরই দোষ নয়—হিন্দুসমাজের বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই সেই দোষে দোষী। অর্থাৎ সুরাবর্দ্দী সাহেব শুধুমাত্র হিন্দুজুরীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেন নাই, তিনি বৃহৎ হিন্দুসমাজের জ্ঞানে, শিক্ষায় বুদ্ধিতে অগ্রণী অংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। অথচ সুরাবর্দ্দী সাহেবের অভিযোগ যে কতদূর ভিত্তিহীন তাহা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যর বি, এল মিত্রের দীর্ঘ বক্তৃতায় সু-পরিস্ফুট হইয়াছে। দেশে যেমন, হিন্দু ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতি উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারী আছেন, তেমনি মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতিও আছেন। অথচ বেত্রদণ্ড-বিধি প্রবর্ত্তন সম্পর্কে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কমিশনার ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফত সরকারী ও বে-সরকারী দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের অভিমত চাহিয়া যে লিপি প্রেরণ করেন তাহার উত্তরে কোথা হইতে এমন কিছু পাওয়া যায় নাই যাহা হইতে, সুরাবর্দ্দী সাহেবের অভিযোগ সমর্থিত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ অভিযোগের বিষয় সত্য বলিয়া সামান্যতম সন্দেহও হইতে পারে। এমন কি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ঐ লিপির উত্তরে মুর্শিদাবাদের একটী বে-সরকারী মুসলমান প্রতিষ্ঠান বেত্রদণ্ড-বিধি প্রবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আরও, বিভিন্ন বার লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠান বেত্রদণ্ড-বিধি প্রবর্ত্তন হওয়া বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন সে সংবাদও অনেক আগে ও বহুদিন ধরিয়া সংবাদ-পত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং যদি সুরাবর্দ্দী সাহেবের অভিযোগই সত্য হইত তাহা হইলে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত লিপির উত্তরেও সংবাদ-পত্র সমূহে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বেত্রদণ্ডবিধি-প্রবর্ত্তন সমর্থন করিতেছেন, এ সংবাদ দৃষ্টে, সরকারী ও বে-সরকারী মুসলমানগণ সুরাবর্দ্দী সাহেবের অভিযোগের অনুরূপ অভিযোগ করিতেন।

সুরাবর্দ্দী সাহেব হিন্দু-নারী-রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়াছেন; প্রথমে অনেক অপহৃতা ও ধর্ষিতা হিন্দু নারী আসামীকে অভিযুক্ত করা চলে এমন কিছু বলে না কিন্তু পরে কিছুদিন হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলির আওতায় থাকিয়া মুসলমান আসামীর বিরুদ্ধে হরণ ধর্ষণ প্রভৃতি নানারূপ অভিযোগ করে। এ স্থলেও, বক্তৃতায়, সুরাবর্দ্দী সাহেব বিচারকদিগকে অন্যায় ও হীনভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। আমরা আপাততঃ তাহার আলোচনা হইতে বিরত থাকিলাম। যদি কোন কোন ঘটনা এইরূপই হইয়া থাকে তাহাতে আমরা কিছু অস্বাভাবিকতা দেখিতে পাইতেছি না। ধর্ষিতা ও অপহৃতা হিন্দুনারী কিরূপ নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন

ব্যবহার পাইয়া থাকেন, কিরূপ অসহায়ভাবে পিতা, মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-দেবর-প্রভৃতি আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এবং তাহারা যে সমাজে বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হইবে না তাহা নিগৃহীতা নারীরাও বেশ বুঝে। এতদ্ উপরি দুর্বৃত্তেরা বুঝায়, নিগৃহীতা নারীরা ত সমাজে সসম্মানে পুনরায় গৃহীত হইবে-ই না, পরন্তু যদি আসামীদের কারবাস হয় তাহা হইলে তাহারা সর্ব্ব-আশ্রয়চ্যুত হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে। এমত অবস্থায়, নিগৃহীতা নারীরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে সঙ্কুচিত হইলে তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। এবং পরে যখন তাহারা হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলির আওতায় আসিয়া সৎভাবে জীবন-যাপন করিবার জন্য আশ্রয়ের নিমিত্ত তাহাদের ভাবিতে হইবে না বুঝিতে পারে, তখন যদি আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাহা হইলে তাহাতে অস্বাভাবিকতাও কিছু নাই। এবং তাহাদের প্রথম উক্তিই যে সত্য এবং শেষোক্ত উক্তি মিথ্যা হইবে-ই, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং, এ দিক দিয়াও হিন্দু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুরাবর্দ্দী সাহেব অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। সুরাবর্দ্দী সাহেব মানবতার দোহাই পাড়িয়াছেন। কিন্তু যখন আইন-অমান্য-আন্দোলন সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত বন্দিদের বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, অনশনকারীদের বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় তখন সুরাবর্দ্দী সাহেব টু-শব্দটী পর্য্যন্ত করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে মানবতার দোহাই ভুয়া মাত্র।

নারীঘটিত অপরাধে অপরাধীর সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যে অধিক না মুসলমানদের অধিক, তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই; কারণ তাহাতে সাম্প্রদায়িকতাকেই অযথা প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। তবে আমাদের বিশ্বাস নারী রক্ষণ-সমস্যা কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা নহে—এবং যাহারা সমস্যাটিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা দেশের শত্রুতাই করেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

ভারতবর্ষের অবস্থা সব দিক দিয়া শান্ত আছে এবং সংস্কৃত শাসনতন্ত্র পাইয়া ভারতবাসীরা খুব সুখী হইয়াছেন, এরূপ কথা যখন লোককে বিশ্বাস করান হইতেছে তখন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আয়র্লণ্ড ও পণ্ডিত জওহর লালের ইংলণ্ড গমনের ফলে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা এবং ভারতবাসীদের প্রকৃত ইচ্ছা ও মনোভাব বহুলোকে জানিতে পারিয়াছেন। ইহাতে কোন আশু ফল লাভের আশা অবশ্য আমরা করি না।

কিন্তু স্বার্থের খাতিরে কোন দেশের সকল বা বহু লোক (এমন কি বিলাতেরও) একটা বিরাট অন্যায়ের সমর্থন চিরদিন না করিতে পারেন এই আশঙ্কায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোককে অন্ধকারে রাখিবার জন্য এত চেষ্টা চলে। ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা লোককে জানাইবার জন্য আমাদিগেরও সেই আশায় সচেষ্ট হইবার প্রয়োজন আছে।

ইওরোপে অবস্থানকালে, শ্রীযুক্ত বসু কয়েকটি প্রধান দেশের সহিত ভারতের কৃষ্টিগত সংযোগ স্থাপনের জন্য, এবং সে সকল স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান ও কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য অসুস্থ অবস্থায়ও বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিবস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইহার তরুণ কর্ণধার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে, চেষ্টায় ও নেতৃত্বে একটি প্রকৃত জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া গতিশীল বৃহৎ জগতের অংশ হইয়াছে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন পরীক্ষার কেন্দ্র এবং খুব বেশী বলিলে জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। ক্রীড়ায় উৎসব আমোদে জ্ঞানচর্চ্চায় এবং সংঘবদ্ধ জীবনের ও কার্য্যের শিক্ষায় ছাত্রদের চরিত্রের সর্ব্বতোমুখী বিকাশের, তাঁহাদের দেহমন বুদ্ধির বর্দ্ধনের ও পুষ্টির সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র এতদিন এখানে ছিল না। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্রদের এই সকল সুযোগ সুবিধার কথা পড়িতাম, জ্ঞানার্জ্জনের পশ্চাতে ছাত্রদের যে প্রাণের স্পন্দন ছিল দুর

হইতে তাহার ধ্বনি শুনিতাম এবং আমাদের আনন্দহীন, প্রাণহীন শিক্ষার কথা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতাম। কিন্তু, বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা বাংলার অন্যতম প্রধান গৌরবের বস্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র জ্ঞানদানের সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার এই নূতন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইলেও শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ও উৎসাহেই ইহা পরিণতি ও সফলতা লাভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মতিথির উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে এই নূতন প্রাণের পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

এই উপলক্ষে ভাইস-চ্যানসেলর ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ করিয়া যে ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।

"বিশ্ববিদ্যালয় বহির্জ্জগতের সংস্রবশূন্য বিদ্যাসংসদ বা কর্ম্মমুখর পরীক্ষার কেন্দ্রমাত্র নহে; ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠন এবং প্রদেশ ও জাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে সেবা করিতে সক্ষম ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যের কথাই আজ আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে বলিতে চাই। মনের ও কার্য্যের কতকগুলি অভ্যাস অর্জ্জনের কথা যদি আজ আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলি, তাহা হইলে এই দৃঢ় প্রত্যয় হইতেই বলিব যে এই প্রদেশের সমগ্র ভবিষ্যত ইহার তরুণ তরুণীদের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহাকে গভীর অর্থবিরহিত সাধারণ অসার উক্তি বলিয়া মনে করিও না। আমরা যে-যুগের মধ্য দিয়া চলিয়াছি তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের বিরুদ্ধে আজ এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, তোমরা এমন শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি যাহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করিয়া ফেলে, তোমাদের জীবনীশক্তি শোষন করে এবং তোমাদিগকে কোন শ্রমসাধ্য ও প্রয়োজনীয় কাজের অনুপযুক্ত করে।

"এই অভিযোগ কি তোমরা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিবে? তোমরা কি ঘটনাস্রোতকে বর্ত্তমানের ন্যায় বাহিত হইতে দিয়া লজ্জার ও কষ্টের দিনকে চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছুক হইবে? তোমাদিগকেই বাস্তব আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, যে-হীনতাবোধ তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে এবং যাহা ন্যায় ও সঙ্গত তাহাকে লাভ করিবার জন্য নির্ভিকচিত্তে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমরা যেন শ্রমসাধ্য ন্যায় কাজ করিবার এবং জীবনকে উপভোগ করিবার অভ্যাস অর্জ্জন করি এবং শ্রমের মর্য্যাদাকে মূল্যবান করিতে শিক্ষা করি।

"তোমরা যে কিছুতেই পরাজিত হইবে না এই ভাব তোমাদের কার্য্যকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলুক। বাধা যাহাদিগকে দমাইতে পারে না, বিফলতা যাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না, কোন কার্য্যই যাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। অসম্ভবই যাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করে, তোমাদিগকে সেই অপরাজেয়দের দলভুক্ত হইতেই হইবে। দুঃসাহসিক কার্য্যের ইচ্ছা যে দিন আমার দেশের যুবকদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে, আমি সেই দিনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছি। আমি জানি, সেই ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে; কিন্তু বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহাকে সযত্নে লালন করিতে হইবে।"

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি ও কংগ্রেসের নীতি

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকদের সহিত পণ্ডিতজীর রাষ্ট্রিক চিন্তা ও আদর্শের মূলগত পার্থক্য আছে বলিয়া আমাদেব মনে হয়। তিনি কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতিকে কোন পথে পরিচালনা করেন তাহা দেখিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইয়া আছেন। তিনি কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির নিকট আত্মসমর্পন করিবেন অথবা নিজের আদর্শ ও চিন্তার পথে কংগ্রেসকে পরিচালিত করিবেন, তাহার উপর আমাদের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের গতি অনেক পরিমানে নির্ভর করিতেছে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বর আসিতেছে

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নেবু ফুলের গন্ধে বাতাস মন্থর।

বারান্দার উপর পা ঝুলাইয়া সুনন্দা বসিয়াছিল। সন্ধ্যা-তারাটি তখন সবে মাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইটির দিকে তাকাইয়া তাহার মনে হইতেছিল, সমস্ত পৃথিবীটাই কী রকম বিস্ময়কর ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে। অন্ধকার চারিদিকে একটা রহস্যময় মায়া ঘনাইয়া তুলিয়াছে, তাহা যেমনই অননুভূতপূর্ব্ব তেমনই বিচিত্র।

তুলসীতলায় প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটি রহিয়া রহিয়া কাঁপে। সুনন্দার সমস্ত মন স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ওই দীপ-শিখার মতোই তাহার সমস্ত অন্তর একটা নবতম সম্ভাবনায় থাকিয়া থাকিয়া দুলিয়া ওঠে।

—বর আসিবে তা'র!

ছেলেবেলায় যখন গল্প শুনিত ঠাকুরমার মুখে, সেদিনের কল্পনা আজ আর নাই। সেদিন বর আসিত রাজপুত্র,দুধ-বরণ টগবগে তেজী ঘোড়ায় চড়িয়া, তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া। মাথায় তাহার সোনার মুকুট, গলায় মোতির মালা, কাণে হীরার কুণ্ডল। ঘোড়ার খুরে খুরে বিজন-প্রান্তরের লক্ষ ধুলো উড়িয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। অস্তসূর্য্যের শেষ রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে রাজকুমারের সোনার মুকুটে, হীরার কুণ্ডলে, শ্বেত-পাথরের মতো সুঠাম সুন্দর ললাটে। চলার তালে তালে কোমরের খাপে-আঁটা তলোয়ার দুলিতেছে, বাজিতেছে ঝন-ঝন—

তারপর শৈশবস্বপ্ন পশ্চাতে ফেলিয়া বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে সাধারণ আর দশ জন পল্লীমেয়ের মতো, বার-ব্রত পূজা-অর্চ্চনার মধ্য দিয়া কুমারী-জীবনের চিরন্তন বাঞ্ছিত কামনা করিয়াই। সেই কামনা এতোদিনে সফল হইতে বসিয়াছে। বর আসিবে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া, রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়া রাশি রাশি মসালের রাঙা আলোক জ্বালাইয়া, বাদ্য-বাজনায় আকাশ উন্মুখর করিয়া আসিবে বরযাত্রীর দল, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া বরযাত্রা তাহাদের দুয়ারে আসিয়া থামিবে।

আনন্দ, একটা অসহ্য আনন্দে সুনন্দার মন ভরিয়া উঠিয়াছে। তারপর, ঠাকুর দাদা, মা প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া তুলসীতলা ও গৃহ-নারায়ণকে প্রণাম করিয়া একান্ত আপনার, অথচ একান্ত অপরিচিতের সহিত সে আবার এক সন্ধ্যায় উঠিয়া বসিবে সেরপুরের জমিদার বাড়ীর পাল্কীতে, জীবনের গতি ফিরিয়া যাইবে পরমতম পরি-বর্ত্তনের অভিমুখে। আবার রাত্রি আসিয়াছে, তেমনি করিয়া শিবিকার চারিদিকে অসংখ্য মশাল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বাহকদের গতির ছন্দে সুনন্দার দেহ নির্ম্মলকে অল্প অল্প স্পর্শ করিতেছে, বাইরের আলোর এক টুক্রো আভা আসিয়া পড়িয়াছে নির্ম্মলের মুখে, চেলী-চন্দনের একটা মিশ্রিত সুন্দর গন্ধে নেশা ধরিয়া গেছে সুনন্দার......

দুধারের গ্রামগুলির নির্জ্জিব নিরানন্দতা মাঝখানে চেতনার সাড়া পড়িয়া যায়, অসংখ্য কৌতূহল-ভরা চোখ দরজা জানলার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসে, ছোটো ছেলে মেয়েরা সার বাঁধিয়া পথের পাশে আসিয়া দাঁড়ায় কৌতূহলী প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে বহু কণ্ঠে,—

—কোথাকার বর গো, কোথাকার বর?—

বন ভাঙিয়া নদী পার হইয়া শোভাযাত্রা শেরপুরের জমিদার বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া থামে। ফুলে-পল্লবে, আলোয় কোলাহলে প্রকাণ্ড অট্টালিকাটা ইন্দ্রপুরীর রূপ ধরিয়াছে, বাজিতেছে নহবং। বর-কনে ধীরে ধীরে পাল্কী হইতে নামে, চারিদিক শঙ্খ ও হুলুধ্বনি তাহাদের অভ্যর্থনা করে, বরন-ডালা লইয়া উজ্জ্বলমুখী পুরাঙ্গনার দল সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসে। সুনন্দার সঙ্কোচ-জড়িত ভীরু দৃষ্টির

সামনে মর্ত্তের মৃত্তিকা অমর্ত্ত্যের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে—

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় অকস্মাৎ।—

এক ঝলক বাতাস একটু অসংযত হইয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গে লুটাইয়া পড়ে, সে সচকিত হইয়া ওঠে, রাত্রি হইয়াছে অনেক, বাতাসে তুলসীমূলে প্রদীপ কখন নিবিয়া গেছে।

সদর দরজায় কড়া নাড়িবার শব্দ হয়।

রান্নাঘর হইতে মনিমালা ডাকিয়া বলেন, "নন্দা, নন্দা, দোর খুলে দে, তোর দাদু এসেছে।"

সাড়া দিয়া সুনন্দা বলে, "যাই দাদু—"

লীলায়িত ভঙ্গীতে সে উঠিয়া দাঁড়ায়; তারপর লণ্ঠনটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হয় দরজা খুলিয়া দিতে। ক্লান্তভাবে বিশ্বনাথ প্রবেশ করেন।

বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়া গেছে, মাথায় চুলে পাক ধরিয়াছে; কিন্তু দুশ্চিন্তার ভারে শরীর নুইয়া পড়িয়াছে বয়সের চাইতে অনেক বেশী। দৃষ্টি পরিশ্রান্ত, কপালের বলী রেখাগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়া আছে। বোধ হয় অনেকখানি পথ পার হইয়াই তিনি আসিয়াছেন, ছেঁড়া জুতোজোড়াকে ছাপাইয়া ধুলো হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিয়াছে।

সুনন্দা বলে, "জল দিয়েছি দাদু।"

হাত পা ধুইয়া একখানা জলচৌকিতে আসিয়া তিনি বসেন। নন্দা তামাক সাজিয়া আনিয়া দেয়। অন্যমনস্কভাবে তিনি তামাক টানিতে থাকেন, কলকের আগুন আপনা হইতে নিবিয়া যায়।

রান্নাঘরে মণিমালার হাতের কাজ শেষ হইয়াই গেল বোধ হয়। ধীরে ধীরে আসিয়া তিনি শ্বশুরের পায়ের কাছে বসিয়া পড়েন। তারপর প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

হুকাটা নামাইয়া রাখিয়া ক্লান্তভাবে বিশ্বনাথ বলেন, "নন্দার বিয়েব সব ঠিক হ'য়ে গেল বৌমা।"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নন্দা সেখান হইতে সরিয়া যায়, কিন্তু একেবারে চলিয়া যাইতে পারে না। ঘরের মধ্যে সে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

উত্তেজিতা মণিমালা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, "কী হ'ল।"

নিরুৎসাহভাবে বিশ্বনাথ উত্তর দেন, "মেয়ে তাঁরা নিতে রাজী হ'য়েছেন, শুধু শাঁখা-সিঁদুরে সম্পদান ক'রলেই চ'লবে। দু'-একদিনের ভেতরেই আশীর্ব্বাদ ক'রতে আসছেন তাঁরা।"

মণিমালা আনন্দে অধীর হইয়া ওঠেন, "সত্যি?— তাঁদের দিক থেকে কোনো রকম আপত্তি আর কিছু নেই তো?"

বিশ্বনাথ হাসেন, বিষণ্ণ সে হাসি। বলেন, "না আর কিছু নেই। আর থাকবেই বা কেন, বলো? আমার নন্দা মা যে কোহিনূর, রাজার মুকুটেই তো ওকে মানায়।"

মণিমালার উল্লাস বাঁধ মানিতে চায় না। মেয়ের কপাল বলিতে হইবে বটে। জন্মিয়াছে গরীবের ঘরে, যেখানে মেয়ে হইয়া জন্মানোটা নিতান্ত অভিশাপ বই আর কিছুই নয়, এবং জন্মের এক বছর পূর্ণ না হইতেই বাপ বিদায় লইয়াছেন ইহলোক হইতে। বিধবা মা এবং শোকজীর্ণ বৃদ্ধ দাদামশায়ের বুকের আশ্রয়েই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে সে। সম্প্রতি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে সুপাত্রে সমর্পণ করা লইয়া।

সে সমস্যা যে এমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই সমাধান হইয়া যাইবে, এ কথা কে ভাবিতে পারিয়াছিল? সুনন্দার শিবপূজার ফল এবার হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ হইয়া ফলিয়া গেল।

শেরপুরের প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার শিকার করিতে বাহির হইয়া এই গ্রামে তাঁবু ফেলিয়াছিলেন। কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে সুনন্দা পড়িল তাঁহার দৃষ্টি পথে. প্রশংসায় বিস্ময়ে সে দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতুলেশ্বর সুনন্দা সম্পর্কে বিস্তারিত সমস্ত জানিয়া লইলেন। তাঁহার বিশাল প্রাসাদের পাষাণে পাষাণে এই মেয়েটি আলতা-আঁকা চঞ্চল পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইবে, এমনি একটা সম্ভাবনা তাঁহাকে খুশী করিয়া তুলিল।

তাঁহার একমাত্র পুত্র নির্ম্মলেশ্বর, সংক্ষেপে নির্ম্মল, তখন সদ্য এম-এ পাশ করিয়া ঘরে বসিয়া ইংরাজী সাহিত্যের রসগ্রহণ করিতেছিল। হার্ডি, শ, রাসেল এবং গলস-ওয়ার্দ্দির আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কাণে ডাক

আসিল অতুলেশ্বরের, "তোকে বিয়ে ক'রতে হ'বে নির্মল!"

নির্মল ভয়ানকভাবে চমকাইয়া উঠিল। বিবাহের জন্য সে এতটুকু প্রস্তুত নয়, কোনোদিন করিবে কি-না, সে কথা ভাববার অবকাশ পায় নাই। অতএব ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করিল,—"কিন্তু সেটা কী এখন ভালো হ'বে? আরো কিছুদিন না গেলে—"

বাপের মুখের চেহারা দেখিয়া বারকতক মাথা চুলকাইয়া সে থামিয়া যায়। বাপ চসমার মোটা কাঁচের ভিতর দিয়া ছেলের মুখে তীক্ষ্ণ সন্ধানী-দৃষ্টি ফেলিয়া বলেন, "নিশ্চয় ভালো হ'বে। আর, কেন হ'বে না সেইটে শুনি?"

—"পড়াশুনো—"

কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি বলেন, "পড়াশুনো ঢের হ'য়েছে, আর না হ'লেও চ'লবে। আর বিয়েটাও পড়াশুনোর এমন কিছু প্রতিবন্ধক নয়। এখন আমি যা বলি, তাই শোনো। দু'-এক মাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে করতে হ'বে, বুঝলে!

মুখচোরা গো-বেচারী নির্মল মাথা নাড়িয়া জানায় যে সে বুঝিয়াছে, কিন্তু মনের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়া থাকে। অতুলেশ্বর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও করেন না।

বিশ্বনাথ দু' বেলা যাতায়াত করেন, এবং নির্মল মনে মনে গর্জ্জিতে থাকে।

গল্প আসিয়াছে এই পর্য্যন্ত।

মণিমালা বলেন, "মেয়ে আমার লক্ষ্মী, তাই এমন কপাল নিয়ে এসেছে। এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা হ'য়ে গেলেই—"

"হুঁ।"

বিশ্বনাথ কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন। দূরে চাঁদ উঠিতেছে সুপারী বনের ওপার হইতে, ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে দাওয়ায়। তিনি কী ভাবিতেছেন কে জানে, কিন্তু এত বড়ো শুভ-সূচনাও তাহাকে চঞ্চল তো করিতে পারেই নাই, অধিকন্তু কেমন চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে!

মণিমালা লক্ষ্য করেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কিন্তু কী ভাবছেন এত? গোলমাল তো কিছু নেই এর ভেতরে?"

—"না তা নেই, কিন্তু কী জানো বৌমা, ছেলের ভাবটা আমার ভালো লাগলো না।"

উদ্বেগে মণিমালার মুখ বিবর্ণ হইয়া ওঠে, "সে কী?"

"বিশেষ কিছু নয়, তবু মনে হ'ল কী জানো? ছেলের ভাবখানা কেমন উদাস, হয়তো বিয়েতে ওর সম্মতি ছিলো না,—তবে মনের ভুলও হ'তে পারে আমার—" ধীরে ধীরে বিশ্বনাথ বলেন।

মণিমালা তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠেন,"ও কিছু নয় বাবা! বিদ্বান ছেলে, অতগুলো পাশ দিয়েছে, ওদের ধরণ-ধারণই ওই রকম। ওর জন্য ভাববার কিছু নেই।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বনাথ বলেন, "তাই হ'বে হয়তো—"

কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় একটা অদৃশ্য কাঁটা থাকিয়াই যায়।

সেদিন বিছানায় শুইয়া নন্দার ঘুম আসিতে চায়না।

মাথার জানালাটি খুলিয়া দিয়া পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় সে বাহিরে চাহিয়া থাকে। দূরে মাঠে অজস্র কাশফুল দুলিতে থাকে,—আরো দূরে দুধারে বালুকা-বন্ধনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাগরের সংকীর্ণ জলস্রোত একটা রূপালি রেখার মতো। এক জোড়া ঘুঘুর প্রশ্নোত্তরের আদান-প্রদান চলে, করুণ, অথচ মধুর—

সঙ্গিনীদের মধ্যে যাহাদের বিবাহ হইয়া গেছে, তাহাদের নিকট হইতে এই বিবাহদিনের, ফুলশয্যার কত বর্ণনাই সে শুনিয়াছে।...নন্দার মনে হইতেছে, ফুলের পাঁপড়ী ছড়ানো বিছানায়, উজ্জল দীপালোকে তাহারা মুখোমুখী হইয়া বসিয়াছে, গলায় মালা দুলিতেছে দু'জনার, যুঁই, মল্লিকা, গোলাপের গন্ধে সমস্ত ঘরখানা পরিপূর্ণ হইয়া গেছে। সুনন্দা ঘোমটার আড়াল হইতে সতর্ক অপাঙ্গদৃষ্টি হানিয়া এক একবার বরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

সহাস্য মুখ, চোখ দুটি আনন্দে কৌতুকে টলমল করিতেছে। ফস করিয়া সুনন্দার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বর জিজ্ঞাসা করিবে, "নাম কী তোমার?"

কী উত্তর দিবে সে?—আনন্দে, লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ তার অসাড় হইয়া আসিবে, গলা যাইবে জড়াইয়া, তবু অস্ফুট কণ্ঠে নামটা বলিয়া দিবে।

—"সুনন্দা?—ও নাম তোমায় মানায় না। তুমি আমার রাণী, তাই তোমার নামও দিলুম রাণী। কেমন রাজী তো?......"

হাতের উপর মাথা রাখিয়া নন্দা ঘুমাইয়া পড়ে।

শুভদিন দেখিয়া অতুলেশ্বর আসেন আশীর্ব্বাদ করিতে।

বিশ্বনাথের ভাঙ্গা কোঠাবাড়ীর সাম্‌নে যখন তাঁহার হাতী আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া বিরাট আন্দোলন সুরু হইয়া যায়।

সমাজপতি রতন বাঁড়ুয্যে হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম গোপী জেলে পর্য্যন্ত কেউ আর আসিতে বাকী রাখে না। এ যে আরব্য উপন্যাসের গল্পের চাইতেও বিস্ময়কর! এমন অসম্ভব ব্যাপারটা যে কি করিয়াই ঘটিতে পারিল, বামীপিসি, ক্ষ্যামার মা প্রভৃতি মিলিয়া তাহারই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে বসেন। মেয়ের কি ই বা এমন চোখ-ভোলান রূপ, সাধারণ আর দশ জনের মতোই পাঁচা পাঁচি চেহারা, তবু তাহাকে অতুলেশ্বরের এতোখানি মনে ধরিল কি করিয়া? মেয়েটা কি যাদু জানে?—হইবেও বা!

কিন্তু না, ব্যাপারখানা সহজ নয়, ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু গলদ আছে, না থাকিয়াই যায় না! আচ্ছা, ছেলের স্বভাব-চরিত্রে কি কোনো?—

হ্যাঁ,—এতক্ষনে প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে, বৈকি! ক্ষান্তর খুড়ী, হারাণের মাসী প্রভৃতির ঈর্ষ্যাতুর মন খানিকটা সান্ত্বনা পায়।

বিশ্বনাথ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছেন, বন্দোবস্ত করিয়াছেন তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত, তবু কোথায় বসাইবেন, কি করিবেন কিছুই তিনি ভাবিয়া পান না।

একখানা গিনি দিয়া অতুলেশ্বর সুনন্দাকে আশীর্ব্বাদ করেন, সঙ্গের পুরোহিতঠাকুর দিন স্থির করিয়া বলেন, "আসচে মাসের পনেরোই খুব ভালো দিন আছে। রাত আড়াইটেয়, সুতহিবুক যোগে—"

বর-কনের ঠিকুজী মিলিয়া গেছে চমৎকার! উচ্ছ্বসিত হইয়া অতুলেশ্বর বলিলেন, "এ যে রাজযোটক বাচস্পতি মশাই! মা আমার সাক্ষাৎ কমলা হ'য়ে আমার ঘরে যাচ্ছেন, তাতে আর সন্দেহ কি!"

ভিতর হইতে মেয়েরা সমস্বরে হুলুধ্বনি করে।

বর আসিতেছে সুনন্দার!

সত্যিই রাজপুত্র! রূপকথায় নয়, বাস্তবে, সেবপুরের চৌধুরী জমিদারের ঐশ্বর্য্যের কথা না শুনিয়াছে কে! সুনন্দা ভাবিতেছে বেশী নয়, আর একমাস, তার পরেই সেই বহুশ্রুত ঐশ্বর্য্যপুরীর মাঝখানে তাব আসন কায়েমী হইয়া যাইবে। মাথার উপর একশো ডালওয়ালা সুন্দর ঝাড় লণ্ঠন, মেঝেতে কাশ্মিরী গাল্‌চে বিস্তৃত। মেহগিনীর পালঙ্কে গা এলাইয়া দিয়া দোতলার জান্‌লা খুলিলেই দেখা যাইবে নীচে মস্ত ফুলের বাগান, সেখানে বড়ো বড়ো পাথরের মূর্ত্তি, কুঞ্জ, মার্ব্বেল-পাথরের ঘাট্‌লা বাঁধানো দীঘি। সাদা রাজ হাঁসের দল সে দীঘির পদ্মবনে খেলা করিয়া বেড়ায়। আরো একটু দূরে প্রকাণ্ড কাছারী বাড়ী, কাছারী পার হইয়া দেউড়ী, দেউড়ীর মাথায় দু'পাশে দু'টি নকল সিংহ বসিয়া আছে গর্জ্জন করিবার ভঙ্গীতে। হিন্দুস্থানী দরোয়ানেরা সেখানে বন্দুক লইয়া পাহারা দেয়।—

হয়তো ভিক্ষুক আসিয়া ডাকে, "রাণী মা, দয়া করো—"

একটা টাকা লইয়া সুনন্দা ভিক্ষুকের দিকে ছুঁড়িয়া দেয়, দুহাত তুলিয়া সে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যায়, "জয় হোক্ রাণী মার!"

চোখের সাম্‌নে অলস মধ্যাহ্ন মায়াময় হইয়া ওঠে।

গায়ে-হলুদের তত্ত্ব বহিয়া আনিতে সাতজন চাকর হিমসিম খাইয়া যায়। হ্যাঁ,—তত্ত্ব হইয়াছে বটে একখানা! সমস্ত গ্রাম তাহা দেখিবার জন্য জড় হইয়া যায়। এমন না হইলে আর জমিদার!

মালতী ঘরের কোণ হইতে নন্দাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনে।

—"ওলো দেখে যা, তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে তত্ত্ব পাঠিয়েছে।"

লজ্জারুণমুখে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া নন্দা বলে, "দূর!"

মালতী হাসিয়া তার মুখে ঠোনা মারে। বলে, "অত লজ্জা কিসের? তোদের জিনিষ তুই দেখবিনে? চললি তো ভাই জমিদার-গিন্নি হতে, কিন্তু গরিবদের ভুলিসনে যেন। কালে-ভদ্রে আমাদের একটু একটু মনে করিস, কেমন?"

সুনন্দা মুখ নীচু করিয়া হাসে।

মালতী বলে, "তোর বরের নাম কি, জানিস ভাই ?"

চটিয়া নন্দা বলে, "যাঃ, জানিনে। তুই আমাকে জ্বালাসনি পোড়ারমুখী!"

—"নাঃ, জানিসনে বৈকি! বরের নাম করতে নেই, তাই বুঝি বলবিনে? বাবাঃ, বিয়ে না হতেই এত, হ'লে না জানি—"

দুম করিয়া ছোট্ট একটি কিল পড়ে মালতীর পিঠে.

মালতীর রঙ্গ তাহাতে চড়িয়া যায়, বলে, "আমাকে মারলে কি হ'বে, সত্যি কথা ব'লব না নাকি? আর নাই বা বললি তুই বরের নাম, আমরা বুঝি তা জানিনে? ভয় নেই গো, তোব হাত থেকে আমরা নির্ম্মল বাবুকে কেড়ে নিতে যাচ্ছিনে, তোর ধন, তোরই থাকবে।"

মালতীর চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি জ্বলিয়া ওঠে। হিংসার?

বিচিত্র নয়। বিবাহ হইয়াছে তার, কিন্তু স্বামী তাকে গ্রহণ করে না,—সে কুৎসিত বলিয়া তাহার স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। নারীজীবনের চরম ব্যর্থতা বহিয়া বাপ মা'র গলগ্রহ হইয়া দিন কাটাইতেছে মালতী।

সংসারের ঘূর্ণচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে একবারও তাহার দুঃখ করিবার অবকাশ নাই।

বিয়ের দিন আসিয়া পড়ে।

শেরপুরে অতুলেশ্বরের বিরাট প্রাসাদ আলোকে এবং বাদ্যে মুখর হইয়া ওঠে। হাতী সাজানো হয়, সন্ধ্যা হইতেই জমিদার বাড়ীতে বাজী পোড়ানো, হাউই ওড়ানো চলিতে থাকে

রাত্রি দশটায় বাহির হইবে বরযাত্রীর দল।

নটাব সময় ধরা পড়িয়া যায়, নির্ম্মলের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না!

নির্ম্মলকে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু একখানা চিঠি আবিষ্কার হয় তার টেবিল হইতে। মুখচোরা ভীরু নির্ম্মল অতুলেশ্বরের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে, লিখিয়াছে—

"বাবা অকৃতজ্ঞ দুর্বিনীত সন্তানকে ক্ষমা করিবেন। আমার মনে হয়, আমি এখন বিবাহ করিবার উপযুক্ত নই এবং সংকল্প করিয়াছি, যতদিন পর্য্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করিব না। একথা পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছিলাম। আপনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই বলিয়াই এতটুকু দুঃখ আপনাকে দিতে হইল, কি করিব, নিরুপায়।

একটা কথা আপনার নিকট গোপন করিয়াছিলাম, সম্প্রতি সেটা বলিতেছি। জানিয়া সুখী হইবেন, ইউনিভার্সিটি হইতে আমি একটা তিন বছরের স্কলারশিপ পাইয়াছি, ইউরোপে গিয়া শিক্ষালাভ করবার জন্য। এই সংবাদ পাইয়া আমি ইতিপূর্ব্বেই পাশপোর্ট এবং অপরাপর বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। দু'এক দিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজ বোম্বে হইতে ছাড়িবে, তাই আজ রাত্রের এক্সপ্রেসেই রওনা হইতে হইল। আশা করি আমাকে ফিরাইবার ব্যর্থ চেষ্টা আপনি করিবেন না।

বুঝিতেছি, আমার এই ব্যবহার আপনাকে অনেকখানিই আঘাত দিবে। মার্জ্জনা আমাকে না করিতে পারেন, যে শাস্তি দিবেন, মাথা পাতিয়া তাহাই গ্রহণ করিব, শুধু আশীর্ব্বাদ করিবেন, বিদেশ হইতেও যেন সরস্বতীর প্রসাদ লাভ করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারি। শ্রীচরণে শত কোটি প্রণাম। সেবকাধম

নির্ম্মল।"

অতুলেশ্বর চিঠিখানা হ'তে করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়েন।

বাহিরে অকস্মাৎ সানাই থামিয়া যায়।

ওদিকেও আয়োজনের ত্রুটি নাই।

অতুলেশ্বর বলিয়াছেন বটে, শুধু শাঁখা-সিন্দুর দিয়াই সম্প্রদান করিলে চলিবে, কিন্তু বিশ্বনাথ প্রাণ ধরিয়া তাহা কেমন করিয়া পারিবেন? সাত নয়, পাঁচ নয়, ওই এক সুনন্দা, যথাসাধ্য ঘটা তাঁহাকে করিতেই হইবে যে!

বাড়ীখানা বন্দক দিতে হইল। তা' হোক, ভালো ঘান হইলে......

কাজেই বিশ্বনাথের ভাঙ্গা বাড়ী ঘিরিয়া মহোৎসব। অপর্য্যাপ্ত টাকাই তিনি ছড়াইয়াছেন।

মণিমালার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

বরযাত্রীদের পৌঁছিবার সময় প্রায় হইয়া আসিল, বিশ্বনাথ একবার ভিতর, একবার বাহির করিতেছেন। পাড়ার মুরুব্বিরা আসিয়াছেন কোমর বাঁধিয়া, কোন্ কাজ কিভাবে করিতে হইবে তাঁহারা তাহারই তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

সকলে উদ্গ্রীব নয়নে চাহিয়া আছে, কতক্ষণে পথের বাঁকে বরযাত্রীর মশালের আলো দেখিতে পাওয়া যাইবে—

কনে-চন্দনে সজ্জিতা সুনন্দা প্রতীক্ষা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে সে,—তাহার রাজপুত্র বর আসিতেছে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া, মাথায় সোণার মুকুট পরিয়া, গলায় মুক্তার মালা দোলাইয়া। কালো অন্ধকার আলোয় আলোময় হইয়া গেছে, নিস্তব্ধ রাত্রি আনন্দ-কলরবে মুখর।...

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কথিকা

শ্রীপ্রসাদ বসু

নব বসন্তে শুনাই বন্ধু একটি গোপন গাথা
প্রকাশি' তোমার কাছে ;—
অরুণ-আলোক-বসনা-শোভনা-নীহারিকা-নিরুপমা
মন মোর হরিয়াছে।
আমার প্রাণের নিকষেতে তার হেম-অঙ্গের রাগ
চিত্রিত চিরতরে,
আমার হৃদয়-বীণার-তন্ত্রে তারি কণ্ঠের তান
অনুখন গুঞ্জরে।
ভাবনার-মেঘভার-অবনত চিত্ত-গগনে মম
সে যেন বিজুরী-রেখা,
আমার তমসামাখানো মর্ম্মে তমোযবনিকা পরে
সে যেন জোছনা-লেখা।
সে মোর হৃদয়মরু-সাহারায় পান্থ-পাদপ-তরু
রচিয়া শ্যাম-কানন,
তাপস মনের অঙ্গভূষা সে স্নিগ্ধ-শীতলকারি
শুচি শ্বেত-চন্দন।
নিঃস্ব আমার ধ্যানের বিশ্বে সে যেন পরশমণি
করিছে সকলই সোণা,
শোনিতের মাঝে সঞ্চরি' ফেরে কর্ম্মের পুরোভাগে
দিয়ে যায় প্রবোচনা।
এমনি করিয়া সে আমার সাথে যুগে যুগে কালে কালে
জড়িত রহে সদাই,
অবিনশ্বর আত্মার মোর অমর কালের ভালে
ত্রয়োদশী-শশী, ভাই।
ধরায় তখনো হয়নি প্রভাত আমি ঘুমে অচেতন
সে মোর নয়নে এসে
দিয়েছিল চুম, নয়ন মেলিয়া তারে লয়েছিনু বুকে
সমাদরে ভালোবেসে।

সেই দিন হ'তে রয়েছে আমার তপস্যা-ফল সম
বক্ষ দেউল মাঝে
তিলেকের তরে হয়নি আড়াল, যায়নি আমারে ত্যজি'
অবসরে, কিবা কাজে।
জীবনের সনে এসেছে জীবনে মরণে হ'য়েছে সাথী
জন্ম-মৃত্যু পথে,
দূর দুর্গম প্রদেশে ভ্রমেছে ছায়া সম পাছে পাছে
মরুভূমে পর্ব্বতে।
আত্মার মোর চিরসহচরী ভাবরাজ্যের রাণী,
কল্পনা-সঙ্গিনী,
হৃদয়ের সে যে অতীব গোপন পরাণ হ'তেও প্রিয়
সোহাগের সোহাগিনী।

শুধু একদিন মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ায় সমুখে এসে
নিখিল ভুবন জিনি'
যেদিন প্রথম দখিনা-বাতাস ভুবনেতে পায় ছাড়া
কাননে ফোটে কামিনী।
আম্রমুকুল মাথে উপবন, ঋতুমতী বনবালা,
কোকিল কুহরে গান,
ভ্রমর তুলিয়া গুঞ্জনগীতি কুসুমের সনে করে
প্রণয়ের অভিমান।
আলোছায়া-মাখা কুঞ্জবীথিকা, মোর সনে সেথা একা
সারাদিন করি খেলা,
জোছনা মাখানো নীল সায়রের নিশীথশীতল বুকে
মোরে ল'য়ে বাহে ভেলা।
ঢলে পড়ে চাঁদ গগনের গায় আমি পড়ি ঘুমে ঢলি'
জানিনা কখন শেষে,
প্রভাত পাখীর প্রভাতীর তানে নয়ন মেলিয়া দেখি
সে পুনঃ হৃদয়-দেশে।

সহজিয়া-সাধনা ও চণ্ডীদাস

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।
সব রস সার শৃঙ্গার এ॥"

—চণ্ডীদাস।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যত প্রকার সম্বন্ধে আমরা আবদ্ধ তন্মধ্যে পতি-পত্নী ভাবই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও মধুরতম। এই পতি-পত্নী ভাবই সখ্যের শেষ সীমা। এই প্রেম যখন স্বার্থসংস্কার দ্বারা ভোগবাসনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে করিতে জীব-নির্বিশেষে ছড়াইয়া পড়ে তখনই ভগবৎ প্রেমে ইহার পরিণতি লাভ ঘটে। বস্তুতঃ বিশ্বপ্রেম ও ভগবৎ প্রেমে প্রকাশগত ভেদ থাকিলেও—উভয়ে স্বরূপতঃ এক। পতি-পত্নী প্রেমের এই একটা দিক,—যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধ হয় একদিন সহজিয়া সাধনার উদ্ভব হইয়াছিল, এবং এক শ্রেণীর সাধকের নিকট এই প্রেমের অনুশীলন উচ্চতর সাধনার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সহজিয়া প্রেমের সাধকগণ মনে করিতেন যে প্রেম সাধনার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তি লাভ হওয়া সম্ভব, এবং তদুদ্দেশ্যে কোনও সুন্দরী যুবতীকে গভীর অনুরাগের সহিত প্রেম-অর্ঘ্যে পূজা করিলেই সহজিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল। তাঁহাদের মতে সমাজ নীতির অনুমোদিত যে বিবাহিত জীবন তাহাতে এই প্রেমের সম্পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি লাভ ঘটা সম্ভব হয়না, সুতরাং ইহার চরিতার্থতা সাধনের নিমিত্ত এমন কি কোনও নীচ বংশীয়া সুন্দরী যুবতীর প্রতি অবৈধ আসক্তি তাঁহারা দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন না। "গুপ্ত সাধন তন্ত্র' এই মতাবলম্বীগণের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সমাজের বিভিন্ন স্তরের রমণীগণকে সহজিয়া প্রেমের বিষয়ীভূত করা হইয়াছে।

"নটী কপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যাচ তথা গোপালকন্যকা॥
মালাকরস্য কন্যাচ নব কন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশেষ বৈদগ্ধ্যযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্নাঃ শীলসৌভাগ্যশালিন্যাঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধঃ ভবেন্নরঃ॥"

(নর্ত্তকী, কপালী জাতীয়া, বেশ্যা, রজকী, নাপিতানী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রানী, গোয়ালিনী ও মালাকার জাতীয়া—এই নয় প্রকার যুবতী ধর্ম্মসাধনের পক্ষে প্রশস্ত। ইহাদের মধ্যে আবার যাহারা বিশেষ চতুরা তাহারা অধিকতর উপযুক্তা। রূপ-যৌবনসম্পন্না, মধুরপ্রকৃতি সৌভাগ্যশালিনী যুবতীগণকে যত্নের সহিত পূজা করা উচিত। এইরূপ করিলে মানবের সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী), বিভিন্ন জাতীয়া রমণীকে লইয়া উল্লিখিত সাধন-প্রণালী হিন্দুগণের সমাজ নীতির বহির্ভূত। হিন্দুসমাজে পতিতা নারীর স্থান নাই। দুষ্টক্ষত যেমন শরীরে রক্তকে বিষাক্ত করে,—তেমনি পতিতা নারীর সংস্পর্শে সমাজের নির্ম্মলতা কলুষিত হইয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া হিন্দুগণ নারীকে পবিত্র ও সুমহান আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া কঠোর নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা দাম্পত্য প্রেম ছাড়া অন্য কোন প্রকার প্রেমকেই স্বীকার করেন নাই। বিবাহিতা জীবনের আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাই তাঁহারা নানা প্রকার নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই দাম্পত্য বন্ধন যখনই রস ও বৈচিত্র্য হারাইয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে তখনই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কিংবা পরকালের ভয় দেখাইয়া তাঁহারা সেই বন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজের এই প্রকার বাঁধাধরা নিয়মের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়া সহজিয়া প্রেম কেমন করিয়া একশ্রেণীর

সাধকমণ্ডলীর ধর্ম্ম সাধনার অঙ্গীভূত হইল তাহা আলোচনার বিষয়। সহজিয়া মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন আরম্ভ হইয়াছে, এবং লোকের নীতিধর্ম্মের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের নবারুণালোক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের নীহারিকা ভেদ করিয়া সবে মাত্র জাতীয় জীবনে নব চেতনার সূচনা আনিয়া দিতেছে,—সেই আঁধার ও আলোর যুগসন্ধিক্ষণে বামাচারী তান্ত্রিকগণ বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের উপর প্রবলভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা তন্ত্রশাস্ত্রের দোহাই দিয়া ধর্ম্মের নামে যত প্রকার কু-ক্রিয়া ও পাপাচারে লিপ্ত থাকিত। তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে "নরোত্তম বিলাস" "গ্রন্থে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘরে ঘরে॥
কেহ কেহ মানুষের কাটামুণ্ড লইয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে কেহ যদি সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়॥
সঙে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্যমাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥

বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ শুধু নানা প্রকার কুকর্ম্মে আসক্ত থাকিয়াই ক্ষান্ত ছিলনা। তাহারা নীতি ধর্ম্মের অনুশাসনকে উড়াইয়া দিয়া এক অদ্ভুত মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং তাহার প্রচারের ফলে সমাজের ভিত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীচিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য কৃত "বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে বামাচারী বৌদ্ধগণের যথেচ্ছাচার মতবাদের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।

"ন স্বর্গো নৈব জন্মান্যদপি ন নরকো নাপ্যধর্ম্মো ন ধর্ম্মঃ,
কর্ত্তা নৈবাস্য কশ্চিৎ প্রভবতি জগতো নৈব ভর্ত্তা ন হর্ত্তা।
প্রত্যাক্ষান্যন্নমানং ন সকল ফলভুগ দেহ ভিন্নোঽস্তি,
কশ্চিন্মিথ্যাভূতে সমস্তেঽপ্যনুভবতি জনঃ সর্ব্বমেতদ্বিমোহৎ"।
'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপীড়নম্।
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্॥
কা সৃষ্টৌ পরিদেবনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোস্তবঃ।
কুম্ভাদ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্ত্বৎ কুলালাদিতঃ॥"

(ভাবার্থ:—স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য বলিয়া কিছু নাই। এ জগৎ কেহ সৃষ্টি করে নাই, কেহ ইহা ধ্বংসও করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই। আত্মা বলিয়া কিছু নাই, আমাদের দেহই সদসৎ কর্ম্মজনিত সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কুম্ভকার যেমন কর্দ্দম হইতে মৃৎপাত্র গঠন করে, চিত্রকর যেমন তুলিকা দ্বারা চিত্র অঙ্কিত করে,—তেমনি পিতামাতার কর্ত্তৃত্বে সন্তান সন্ততির জন্ম হয়। অতএব একজন কাল্পনিক সৃষ্টিকর্ত্তার উপর সৃষ্টির কারণ আরোপ করিবার প্রয়োজন কি? আত্মপীড়ন করা কিংবা অন্যকে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে। অপরাধীনতাই মুক্তি। উৎকৃষ্ট ভোগ্য ও ভোজ্য সামগ্রীর ব্যবহারেই স্বর্গ।)

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলয়োন্মুখ অবস্থায় একে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর সেই সকল বামাচারী তান্ত্রিকগণের যথেচ্ছাচার মতবাদ প্রচারের ফলে সমাজে ব্যভিচারের কলুষ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া নীতি ধর্ম্মকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ভাঁটার পর যেমন ধীরে ধীরে জোয়ার আসে, ধ্বংসাবসানে যেমন আবার নূতনের সৃষ্টি হয়,—তেমনি সেই প্রবল অনাচারের বন্যা হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান সংঘটিত হইয়াছিল। খৃষ্টিয় নবম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই সেই গৌরবোজ্জ্বল নব যুগের সূচনা আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ যুগের অবসানে দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটিতে যখন আরও কিছু বিলম্ব আছে—সেই তমসাবৃত যুগে উন্মার্গগামী বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ বন্ধনশিথিল সমাজের বক্ষে চাপিয়া বসিয়া সহজিয়া মত প্রবর্ত্তন করেন। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে কাহ্নুভট্ট নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম সহজিয়া ধর্ম্মের সঙ্গীত রচনা করেন। সেই সকল সঙ্গীতের কোনটী অশ্লীল, এবং কোনটী এমন দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালীতে পূর্ণ যে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু সেগুলির এরূপ ব্যাখ্যা করা হইত যাহা কোন এক নিগূঢ় সাধন-তত্ত্বের নির্দ্দেশক। তিনি "চর্য্যা-চর্য্য বিনিশ্চয়" নামক বঙ্গভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে বামাচার-মত নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

বামাচারী বৌদ্ধগণ যে মত-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন বৌদ্ধ যুগের অবসানে তাহা অন্তর্হিত হয় নাই। হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হইলে সহজিয়ামত বৈষ্ণবগণের পোষকতা লাভ করিয়াছিল এবং বহুল প্রচারের ফলে এই মত জনসাধারণের ভিতরেও অনেক পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহার ফল স্বরূপ চণ্ডীদাসের ভিতরে আমরা এই মতের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। তাঁহার রচিত পদাবলীর উপর সহজিয়া প্রেমের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কাম শতাব্দীতে কানুভট্ট সহজিয়া প্রেম বিষয়ক যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিচ্ছায়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বৌদ্ধযুগের রচনায় যাহা অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ছিল তাহা চণ্ডীদাসের প্রেম ও ভাবুকতার নির্ম্মল স্পর্শে পরিশুদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করে। চণ্ডীদাসের রচনার ভিতর দিয়া সহজিয়া মত কিরূপ সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহার আভাষ আমরা নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পাইতে পারি। চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—

"সহজ সহজ, সবাই কহয়
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হৈয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥"

সহজিয়া প্রেম সম্বন্ধীয় অন্যান্য রচনার ন্যায় চণ্ডীদাস-রচিত এই ধরণের কবিতাও হেঁয়ালীপূর্ণ। কিন্তু যদিও সাধারণের পক্ষে এই সকল পদ-নিহিত নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য তাহা হইলেও এই সকল রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের শুচিতা ও নিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন,—

"পিরীতি যা সনে আদর সে ধনে
সতত না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ বাঁধিয়া দেওবি
বাহিরে বাসিবি পর॥"
"হইবি সতী না হবি অসতী
না হইবি কাহার বস।"
"কলঙ্ক সাগরে সিনান করিবি
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি
সম দুঃখ সম ক্লেশ॥"

—সতীত্বকে বর্জ্জন করিয়া এ প্রেমের সাধনা হয় না। যে ব্যক্তি প্রেমের পাত্র তাহার নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেও বাহিরে তাহার কিছুই স্ফুরণ হইবে না। এই প্রেমের জন্য কলঙ্কের ভার লোক-লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া ভোগলালসার পঙ্কিল স্রোতে অবগাহন করিবার প্রবৃত্তি যেন কখনও না হয়। সুখ দুঃখের তরঙ্গ যেন হৃদয়কে কখনও অভিভূত করিতে না পারে।

দুর্ব্বার প্রবৃত্তিকে লইয়া খেলা করা আগুন লইয়া খেলা করারই সমান;—কোন্ অতর্ক মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত করিতে পারে তাহা বলা যায় না। দুরারোহ পর্ব্বতের পিচ্ছিল পথে ইচ্ছা-মত ছুটাছুটি করিব, অথচ পদস্খলন হইবেনা,—ইহা কম সাধনার কথা নহে। কবি তাহা জানেন, এবং তাই বলিতেছেন,—

"গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে তো রসিকরাজ॥"
"যে জন চতুর সুমেরু শেখর
সুতায় বাঁধিতে পারে।
মাকড়সার জালে মাতঙ্গ বাঁধিসে
এ রস মিলয়ে তারে।"

—এ প্রেম রত্নের ন্যায় গোপন করিয়া রাখিবার জিনিষ। শত উন্মুখ দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ পাইলেই ইহার গভীরতা ও মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। তাই কবি বলিতেছেন, এই প্রেম সার্থক করিতে হইলে অন্তরের অন্তস্থলে সঙ্গোপনে ইহার সাধন করিতে হইবে, বাহিরের কেহ যেন না জানিতে পারে।

ভেকের সহিত সর্পের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। ক্ষুধার্ত্ত সর্প যেমন ভেককে সম্মুখে পাইলে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়,—তেমনি দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হইয়া মানুষ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার

জন্য বিষয়ের প্রতি লালায়িত হয়। কিন্তু কবি বলিতেছেন, এ প্রেমের প্রেমিক যাহারা তাঁহাদিগকে বুভুক্ষিত প্রবৃত্তিরূপী সর্পের মুখের কাছে বিষয়রূপী ভেককে নাচাইতে হইবে,—কিন্তু সাবধান, সর্প যেন ভেককে গ্রাস করিতে না পারে। সার কথা এই,—অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রেমের সাধনা করা সম্ভবপর নহে। সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয় সংযম একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সাধনা কত সুকঠিন এবং কিরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ তাহা বুঝাইবার জন্য কবি বলিতেছেন,—এই প্রেমে সেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে যে ব্যক্তি সুমেরু পর্ব্বতের চূড়াকে সুতা দিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে পারে, কিংবা একটা ঐরাবতকে মাকড়সার জাল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে।

চণ্ডীদাসের মতে, সহজিয়া সাধকগণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রেমের পাত্র নির্ব্বাচিত করিবেন। শুধু প্রেমিক হইলেই হইল না,—প্রেমাস্পদের অন্তর পরিশুদ্ধ ও নিষ্ঠাসম্পন্ন হওয়া চাই। নীতিপরায়ণ না হইলে এ প্রেমের রাজ্যে কাহারও প্রবেশ লাভ হয় না। তাই কবি বলিতেছেন,—

যে জাতি যুবতী সাধিতে সে রতি
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যেমত পুষ্প হয় ক্ষত
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥
পুরুষ তেমতি নারী হীন জাতি
রতির আশ্রয় লয়।
ভূতে ধরে তারে মরে ঘুরে ফিরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥"

"সতের সঙ্গে পিরীতি করিলে
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায়॥"

"সুজনের সনে আনের পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত দন্তের পিরীতি
সময় হইলে কাটে॥
সখী হে কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত করিয়া পিরীতি
গরলে ভরিল দেহা॥"

কণ্টকের সংস্পর্শে আসিলে যেমন কুসুম-কোরক বিদীর্ণ হয়,—তেমনি কোনও নিকৃষ্ট বৃত্তিধারী পুরুষকে যদি সুশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা কোন যুবতী প্রেম অর্পণ করে, তাহা হইলে তাহার সে প্রেম কেবল মর্ম্মপীড়ারই কারণ হয়। পুরুষের পক্ষেও সেই একই কথা খাটে। গুণহীনা নারীর প্রতি উৎকৃষ্ট গুণ-যুক্ত কোন পুরুষ প্রেমে আকৃষ্ট হইলে পরিণামে পুরুষের ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মত অশান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ানোই সার হয়। বস্তুতঃ বিপরীত ধর্ম্ম ও প্রকৃতিবিশিষ্ট দুইটী নরনারীর মধ্যে এই প্রেমের অনুশীলন কেবল দুঃখেরই কারণ হয়। সর্ব্বদা একত্র বাস করিলেও দন্ত যেমন সুবিধা পাইলেই জিহ্বাকে দংশন করিতে ছাড়ে না,—তেমনি বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে আকর্ষণ তাহা কেবল নৈরাশ্যই উৎপাদন করে এবং পরিণামে ধ্বংসেরই কারণ হইয়া থাকে।

সহজিয়া প্রথানুসারে চণ্ডীদাস এক রজকিনীকে ভাল বাসিতেন। "গুপ্ত সাধন তন্ত্র" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত একটী শ্লোকে আমরা দেখিয়াছি যে বামাচারী তান্ত্রিকগণ যে সকল নায়িকাকে সহজিয়া সাধনার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন তন্মধ্যে রজক-কন্যা অন্যতমা। কথিত আছে, চণ্ডীদাস নান্নুর গ্রামে বাশুলী দেবীর প্রত্যাদেশ পাইয়া সহজিয়া সাধনায় প্রবর্ত্তিত হন। রজককন্যা রামীকে যে তিনি সাধনার সহায়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও সেই প্রত্যাদেশ বলেই। চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে সে কথা প্রকাশ করিয়াছেন,—

"বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥"

"রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারী
রামিণী নাম যাহার॥"

রজকিনী রামীর প্রতি চণ্ডীদাসের গভীর প্রেমের ভিতর দিয়া যে পবিত্র ও উদার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা একমাত্র সাধক ভক্তেরই উপযুক্ত। শুধু কল্পনার সূতায় গানের মালা গাঁথিয়া সেই মালা প্রণয়িনীর গলায় পরাইয়া কবি সন্তুষ্ট হন নাই,—বিরুদ্ধ সমাজের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের মধ্যে বাস্তবভাবে চণ্ডীদাস সে প্রেমের সাধনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া একজন ব্রাহ্মণ কুমার, এক রজকিনীর প্রেমে বিভোর হইয়া থাকিবে, তাহাকে পূজা করিবে, তাহার পদধূলি হইবে,—ইহা কি কখনও সমাজ সহ্য করিতে পারে? চণ্ডীদাসের সেই অবৈধ আচরণ সমাজ ক্ষমা করে নাই,—তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চণ্ডীদাস সমাজ-চ্যুত হইলেন। দুঃখের নিকষেই প্রেমের হয় পরীক্ষা, বেদনার মধ্যেই ফুটে তার রূপ। চণ্ডীদাসের হৃদয়-দেউলে যে প্রেমের প্রদীপ ঊর্দ্ধশিখ হইয়া জ্বলিতেছিল, ঘাত-প্রতিঘাতের প্রবল ঝঞ্ঝা তাহাকে কম্পিত করিতে পারে নাই। রামীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া চণ্ডীদাস সংসার ভুলিয়া গেলেন;—লোকাচার, ক্রিয়াকর্ম্ম রামীর প্রেমের অতলপাথারে ডুবিয়া গেল। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, তাঁহার এই প্রেমে কাম-লালসার গন্ধ নাই। ভক্ত যেমন আরাধ্যা দেবীকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়, চণ্ডীদাসও তেমনি কখনও রামীকে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে জগন্মাতার অংশ জ্ঞানে আহ্বান করিতেছেন, আবার কখনও বিশ্ব-চৈতন্যস্বরূপিনী তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেছেন। সংসারের নানারূপ সম্বন্ধের ভিতর দিয়া লোকে যতপ্রকার রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি পায়, চণ্ডীদাস এক রামীকে পাইয়া তাহা লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের প্রেমের স্বরূপ কি, তাহা তিনি রাজকিনী রামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়নের তারা॥
তোমা বিনে মোর সকল আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি।
ও রূপ মাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা রস॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকসিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥"

এই প্রেমের ভিতর দিয়াই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় ইহা চণ্ডীদাস অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন। কিরূপে এই প্রেমের সাধনা করিতে হয় কবি তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া বলিতেছেন,—

"নায়িকা সাধন শুনহ লক্ষণ
যে রূপে করিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়॥"

কাষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেলে যেমন তাহাকে সহজে ছেদন করা যায় না, তেমনি দেহকে এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন রিপুগণের প্রবল আক্রমণে তাহা বিচলিত না হইয়া পড়ে। এইরূপভাবে প্রস্তুত হইলে তবেই সহজিয়া সাধনার উপযুক্ত হওয়া যায়। সাধনার বলে এই প্রেমই একদিন ভগবৎ-সান্নিধ্যে পৌছাইয়া দিবে,—কবি তাহারই ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না দেখয়ে তাবে।
প্রেমের পীরিতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে॥"

যে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া চণ্ডীদাস সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণের পক্ষে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে। সুন্দরী যুবতীগণের সাহায্যে প্রেম-সাধনায় কত যুবক যে পদস্খলিত হইয়া দুর্নীতির পথে পতিত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এই পথ কত বিপদসঙ্কুল, কত দুর্গম, এবং এই পথে কত অল্প-সংখ্যক লোকের সিদ্ধি লাভ হয় চণ্ডীদাস তাহা জানিতেন। এবং তাহারই ইঙ্গিত করিয়া কবি বলিয়াছেন,—

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥"

ভগবৎ সাধনার জন্য যত প্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে বোধ হয় প্রেম-পথই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুগম। উর্দ্ধদিকে পরিচালিত করিলে এই প্রেম যেমন মানুষকে উর্দ্ধ-গামী করে, আবার নিম্নদিকে ধাবিত করিলে ভোগলালসার পঙ্কে মলিন হইয়া এই প্রেমই তেমনি মানুষকে অধঃপতিত করে। চিত্তবৃত্তি সংযত ও পরিমার্জ্জিত না হইলে চিত্তবিভ্রম-কারী কাম-লিপ্সার প্রবল আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং অধিকারীভেদ না করিয়া জনসাধা-রণ ধর্ম্মের নামে সহজিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে সমাজে যে ব্যাভিচারের কলুষ স্রোত প্রবাহিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে বৈষ্ণবগণ সহজিয়া ধর্ম্মকে যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, চণ্ডীদাস তাহা সুমার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত করিয়া তাহাকে এক অভিনব রূপ প্রদান করেন। কিন্তু ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খল সাধনার ফলে দুর্নীতি সংক্রামিত হইয়া বৈষ্ণব সমাজকে কলুষিত করিল, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমাজে "নেড়া-নেড়ী" দলের সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধগণের পতন সময়ে দশম শতাব্দীতে সহজিয়া ধর্ম্ম যে সকল গ্লানি ও অশ্লীলতাপূর্ণ আচার ব্যবহারে কলুষিত ছিল তাহাই আবার পরবর্ত্তী সহজিয়া বৈষ্ণবগণের সাধনায় দেখা দিল। সহজিয়া বৈষ্ণব-সমাজের "নেড়া-নেড়ীর" দল বৌদ্ধ মঠের মুণ্ডিত মস্তক পতিত ভিক্ষু ভিক্ষুনী সম্প্রদায়েরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সহজিয়া সাধনায় উত্থিত গরল সমাজ-দেহে যে অনিষ্টকর বিষক্রিয়া প্রকাশ করিল তাহাতে সমাজের পরবর্ত্তী হিন্দু আচার্য্যগণ শঙ্কান্বিত হইলেন। তাঁহারা সহজিয়া সাধনার ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন, সমাজে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তাহার ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার "অষ্টবিং-শতি তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণের মত উদ্ধৃত করিয়া সামাজিক আচার নিয়মের কঠোর বিধি প্রণয়ন করিলেন, এবং শিথিল বিবাহ নীতির আমূল সংস্কার করিলেন। সেই সঙ্কট সময়ে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন একজন আচার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছিল।

একদিকে আচার নিয়ম সম্বন্ধে কঠোর নীতি সকল বিধিবদ্ধ হইয়া যেমন সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল, অপরদিকে শ্রীচৈতন্য দেব অবতীর্ণ হইয়া এক অভিনব প্রেম-ধর্ম্মে জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করিলেন। মরা গঙ্গায় হঠাৎ বান ডাকিলে যেরূপ অবস্থা হয় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সমাজের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। তাঁহার নয়নে ছিল মুক্তাবলী সদৃশ সমুজ্জ্বল অশ্রু, তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তিতে ছিল ধ্রুব, প্রহ্লাদের প্রতিচ্ছায়া। সমাজের গ্লানি দূর করিয়া লোককে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্ষদ ছিলেন তাঁহারাও কেহ সন্ন্যাসী; কেহ বা চির কৌমারব্রতধারী। স্ত্রীজাতির সংস্পর্শে আসা তো দূরের কথা, তাঁহাদের তদ্দর্শনও নিষিদ্ধ ছিল। আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতি-সম্ভাষণ করিবার অপরাধের জন্য প্রিয় ভক্ত ছোট হরিদাসের প্রতি তিনি নির্ম্মম শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব, এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ন্যায় প্রতিভা-শালী আচার্য্যগণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের এক নব যুগের সূচনা আরম্ভ হইল। তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বন্ধন-শিথিল জীর্ণ সমাজদেহে এক নব শক্তির সঞ্চার করিল। শুষ্ক বিশীর্ণ প্রাণে প্রেম ভক্তির প্রবাহ ছুটিল,—পুঞ্জীভূত জড়তা কাটিয়া গিয়া জাতীয় জীবনে আবার এক নূতন আশার প্রেরণা জাগিল। সহজিয়া সাধনার কুফল

হইতে সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম্মের এই নব জাগরণ তাহারই প্রতিক্রিয়া।

এই প্রতিক্রিয়ার ফলে সহজিয়া-প্রভাব খর্ব্ব হইল বটে, কিন্তু তাহা দেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল না। তাহার পর কত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও দেশের প্রায় সর্ব্বত্র সহজিয়া মতের নরনারীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাহারা যখন পল্লী পথে একতারা বাজাইয়া বিচিত্র সুরে তাহাদের রহস্য-পূর্ণ গান গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন মনে হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও তাহারা তাহাদের বৈশিষ্ট্য হারায় নাই;—বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের সহিত তাহারাও দেশ-মাতৃকার বক্ষে স্থান লাভ করিয়া এক বিশিষ্ট ধর্ম্ম সাধনার প্রতীকরূপে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ কথা

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আজ জীবনের গোধূলি বেলায়
শুধু বলে যেতে চাই—
পৃথিবীর মত এত ভাল বুঝি
আর কারে বাসি নাই!
এই পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা,
প্রতি পাতা ফুলদল,
কঠিন বাঁধনে ঘেরিয়াছে মোর
নিভৃত মরমতল।
কর্ম্মমুখর গতিভরা এই
পৃথিবীর কলরব
প্রতি নিঃশ্বাসে হৃদয়ের মাঝে
করিয়াছি অনুভব।

আলোছায়াভরা ধরণীর এই
মধুমাখা শ্যামলিমা
নয়নে আমার অঞ্জন সম
লাগিয়াছে নিরুপমা।
এই পৃথিবীর রূপ রস আর
সুখ দুখ কলরোল
বিভল আজিকে পরাণে আমার
দিয়েছে সঘন দোল।
তাই শুধু আজ বিদায়ের দিনে
এই কথা বলে যাই—
আর কারে বুঝি পৃথিবীর মত
এত ভালবাসি নাই।

জীবনের কবিতা

শ্রীসুশীলকুমার দেব

নারী—হাঁ, একদিন তোমায় ভালোবেসেছিলুম, বিজয়!

পুরুষ—সে কি আর আমি জানিনে, অশেষা?

নারী—এখন আমি বদ্‌লে গেছি। আমার মনে পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

পুরুষ—পরিবর্ত্তন? সে কি?

নারী—অমন আসক্তিমাখানো চোখে চেয়ো না তুমি আমার দিকে। তুমি বুঝবে না!

পুরুষ—আমি বুঝিনে তোমায় অশেষা? আমি ছাড়া তোমায় কখনো কেউ ভালো বুঝতে পেরেছে?—বলো!

নারী—ভগবান আমায় দেখিয়েছেন পথ। ভোগের রাস্তা আমার বন্ধ হয়েছে।...আমি সন্ন্যাসিনী হবো।......তোমার আসক্তিময় সংস্পর্শ মঙ্গলময় নয়। তুমি যাও!

পুরুষ—একদিন—

নারী—শুন্‌তে চাইনে ওকথা, তুমি যাও!

পুরুষ—তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাবো, অশেষা?

নারী—আমি জানিনে।

এম্‌নি দু'চার কথায় ছিঁড়ে গেলো মধুর বন্ধন, নিবে গেলো বুঝি প্রেমের প্রদীপ!

অশেষা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেললে না, হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলো। সে হবে নাকি সন্ন্যাসিনী। বিজয় নিশ্‌পিশ্ কর্‌তে কর্‌তে অব্যক্ত শত কথার চাপ বুকে করে এগিয়ে চল্‌ল কাজে—নিষ্ঠুর সংসারের কাজে।

* * *

অশেষা—তাকে বলেছি।

বান্ধবী—বল্‌তে তুই ঢলে পড়লিনে? এখনো বেঁচে আছিস্, পাষাণময়ী? সে কি বললে?

অশেষা—হয়তো এর পরে তাকে আর বাঁচতে হবে না! বিজয় বড়ো দুর্ব্বল।

বান্ধবী—কেন বল্ দেখি, তুই এতো চঞ্চলা?

অশেষা—কেউ তোরা আমায় বুঝবিনে। পুরুষের ভোগ, নারীর আত্ম-মর্য্যাদার সর্ব্বনাশ করে। এ তো তবু ছোটো কথা। যে নারী ভগবানকে চায়, পুরুষের কাছে সে আত্ম-বলি দিতে পারে না, পারে না!

* * *

একটি দিন যেন একটি বছর—এমনিধারা বিজয়ের অফুরান সময় কাজে কিছুতেই ভরে ওঠে না। অশেষার নিত্য অদর্শনের অসম্ভব অনুভূতি অতিশয় দুঃসহ।..শূন্য মরুপথে বিজয় একাকী যাত্রী—আলেয়ার আলো তাকে দিশেহারা করেছে।......অশেষা কি সত্যই তার প্রেম প্রত্যাহার করতে পারবে?—বিশ্বাস হয়না। একটু আশা বিজয়ের মনে উঁকি দেয়।...

ঐশ্বর্য্যপ্রিয়া অশেষা বিজয়কে ধনোপার্জ্জনে উত্তেজিত করতে চাইত। তখন বিজয়ের বয়স পঁচিশ। আজ সে তিরিশ বছরের মধ্যেই ভাগ্যের বরে অর্থশালী। কিন্তু অশেষা-বিহনে—? সহসা অশেষা বৈরাগিণী হলো কেন? এ কীরকম ভাগ্য!

* * *

পরহিতপরায়ণা অশেষা ইস্কুল খুলেছে দীন-দরিদ্রের জন্যে। তাতেই তার নারায়ণ সেবার উদ্‌যাপন। কিন্তু ভুল্‌তে পারেনি বিজয়কে।

অপ্রত্যাশিত দেখা হয়ে গেলো দু'জনার—সে কোন্ কর্ম্মের ফেরে! নিরাসক্তির আবরণ না টেনে অশেষা কথা কইলে যাহোক্।

বল্লে, বিজয়, একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছি। ভেবেছিলুম জগতে কাউকে ভালোবাস্ব না, শুধু একজন ছাড়া—ভগবান। এখন দেখি, ভগবান তাঁর সত্তার দ্বারা জগৎ পূর্ণ করে আছেন। তাই আমি আমার ভালোবাসাকে আবার ফিরে পেয়েছি।

বিজয় ভাব্লে, ভগবানতো আছেন! তাহলে নারী তার স্বধর্ম্ম আবিষ্কার করলে কি-করে?

বল্লে, বিয়ে আমাদের—?

অশেষা সুধোলে, ভালোবাসায় কি তুমি বিশ্বাস করো না বিজয়? মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখ্লে—আর তুমি কি চাও? তুমি আমি দু'জনে কি এদ্দিন নীরবে এই আকাঙ্ক্ষা করিনি?...নচেৎ কামের জন্যে বা ভোগের জন্যে ভালোবাসার তো কিছু দরকার হয়না?

বিজয় বুঝতে পারলে।

নারী বল্লে পুরুষকে—ভালোবাসায় যদি এমনিতরো অনাবিল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েই হোক।...নিরবচ্ছিন্ন সাথীত্বের অবকাশে ভগবানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অটল হবে।

বিজয় ভাব্লে, ভগবান যখন আছেন মানুষকে তিনি নিশ্চয়ই পর করে রাখেন্নি। দেখ্‌ছি মানুষকে তিনি সাত্য বরদান করেন!

* *

*

অশেষা ও বিজয়ের বিয়েতে পুরোহিত হলেন স্বয়ং ভগবান।

অবশেষে অশেষার বান্ধবী প্রশ্ন করলে অশেষাকে বল্ দেখি অশু, তুই অতো চঞ্চলা কেন?

সুশীলকুমার দে

শেষ-সুরু

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বিরহে বিধুর নহে বিচ্ছেদে কঠিন
—এর পরে শুধু কি আসিবে হেন দিন!
যতদূর যায় দেখা
জীবনের পথে একা,
ঘটনার মরীচিকা এসে বাঁকে বাঁকে
স্তিমিত তৃষ্ণারে আরো তীব্র করি' রাখে।—

—এমনি কি যাবে দিন, যাবে কি এমনি;
সেদিনের সুরু তবে হবে কি এখনি!
সে-সব ভাবনা পরে
এ মুহূর্ত্তে কী ও করে!
দূরে তার মিলে ছায়া; হেথায় নীরবে
মনে বাজে এক কথা—"চ'লে গেল তবে!"

কেন জানি তারে যেন ফিরাবে কাহারা,—
সে আশ্বাসও গেল উবে';—স্থির আঁখিতারা;
দেহ-মন-স্থান-কাল
সব হয়ে একতাল
চোখের চাওয়াটি হয়ে চলে তার পিছে;
তারে পাওয়া-না-পাওয়া সে হয়ে গেছে মিছে।

বক্ষে আর দ্বিধা নেই, নেই দুরু দুরু,
যেথা শেষ, ও দেখিছে সেখানেই সুরু।
জানাবে মনের কথা
মিটেছে সে-আকুলতা;
আজ হতে এই সত্য চাই বুঝে পাওয়া—
তাহারে যে চেয়েছিল, ক-দিনের চাওয়া॥

শরতের শিউলী

শ্রীমতী মৃণালিণী বসু

এক

শনিবার—বেলা প্রায় একটা। শরতের সোনালি রোদ স্বচ্ছ নীল আকাশ ভেদ করে এসে ঠিকরে পড়েছিল পৃথিবীর বুকে। প্রচণ্ড না হলেও তার উত্তাপকে উপেক্ষা করা চলে না। তাই জনবহুল পথগুলি প্রাণহীনের মত নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিল। কদাচিৎ একাকী কোনও পথিকের পদশব্দ দূর থেকে ভেসে আসছিল অস্পষ্টভাবে—কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরেই আবার অখণ্ড নীরবতার রাজত্ব।

সরকারী রাস্তার ওপর মাঝারিগোছের একটি দোতলা বাড়ী। সামনে তদনুরূপ একটুকরো শ্যামল তৃণ-ভূমি গিয়ে শেষ হয়েছে সাদা গেটটার কাছে। প্ল্যাষ্টারবিহীন ইঁটগুলি আগাগোড়া লাল রং-করা। নীচে এবং উপরে সবশুদ্ধ চার পাঁচটি ঘর—বড় নয়, কিন্তু গৃহস্বামীর সুরুচির পরিচয় দেয়। জানালাগুলিতে হালফ্যাসানের পর্দা দেওয়া। মাঝে মাঝে দুষ্টু হাওয়া এসে তাদের মৃদু দোলা দিয়ে যাচ্ছিল।

ওপরের বড় ঘরটার একজন মহিলা মেঝেয় মাদুর পেতে সেলাই করছিলেন। পূজোর আর বেশী দেরী নেই, তাই তাঁর নিপুণ হাত দুটি অপ্রতিহত গতিতে কাজ করে চলেছিল।

হঠাৎ ভাঙ্‌ল তাঁর একাগ্রতা—তিনি থামলেন; তারপর যেন কিছু শুনতে চেষ্টা করলেন। চারিদিকে অস্বস্তিকর নীরবতা; তবু যেন একটা অস্পষ্ট ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল নীচে থেকে। পরমুহূর্ত্তেই তাঁর অনুচ্চ অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অনুরণিত হয়ে উঠেলো। "বাসু, ও বাসব! তুই আবার বাথ-রুমে কি কর্‌ছিস্ রে জল নিয়ে? কালই না হিম লাগিয়ে শরীর খারাপ করেছিলি?

কিন্তু উত্তর শুনবার অবকাশ আর হোল না। মেয়েদের স্কুলের হলদে-রংয়ের পেট-মোটা 'বাস'টা এসে থামলো গেট্‌টার সামনে। আর ভাল করে থামতে না থামতেই ভায়োলেট রঙের সাড়ী-পরা একটি শ্যামবর্ণের মেয়ে মূর্ত্তিমতী চঞ্চলতার মত বাঁহাতে একতাড়া বই ধরে হুড়মুড়্ করে নেমে পড়লো। চমৎকার স্বাস্থ্য; প্রত্যেকটি পেশী সমুন্নত, যা বাঙালী মেয়েদের মধ্যে, সাধারণত দেখা যায় না। বাস থেকে নেমেই আর কোনও দিকে না তাকিয়ে গেট খুলে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লো বাড়ীর মধ্যে, তাড়াতাড়িতে গেট বন্ধ করা হলো না। বাস ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে।

পরমুহূর্ত্তে সুপ্ত সিঁড়ি জেগে উঠ্‌ল চঞ্চল চরণের লঘু আঘাতে; স্যাণ্ডেলের তীক্ষ্ণ চীৎকারে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল ওপরে উঠে মেয়েটি এসে থামলো একটি ছোট কুঠরীর সামনে, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল "মা..."

সাড়ার অপেক্ষা না রেখেই সেই কণ্ঠস্বর বলে চললো, "আমার সাবানটা কে সাবাড় করলে, দাদা তো? আমি ওকে এত করে বলে গিয়েছিলুম, তবু শুনলে না......আচ্ছা দেখাচ্ছি ওঁর জামা সাফ করার মজা..."

মা কি বললেন বোঝা গেল না। মেয়েটি ততক্ষণে দুপ্‌দাপ্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে সুরু করেছে। তখনও ওর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, "এই সেদিন আমার খাতাটা নিয়ে দিব্যি সরে পড়লো কলেজে, আর আমি ইস্কুলে যাওয়ার সময় ওটাকে খুঁজে হয়রাণ, আজকে আবার......। তুমি তো কিছু বলবে না ওকে..."

বাকীটা আর শোনা গেল না। মা শুধু মুখ নীচু করে একটু হাসলেন। তাঁর কর্ম্মনিরত হাতের তাড়নায় 'মেসিন'টা ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌লো।

বাসু ওরফে বাসব তখন নিশ্চিন্ত-মনে তার পাঞ্জাবীটার সুসংস্কারে নিবিষ্ট। বয়স তার আঠারোর মধ্যেই হবে।

ফরসা রং, সুন্দর দেখতে। ছোটবোনের প্রতি কথাটি সে শুনছিল মন দিয়ে। তারপর যখন দেখলো যে, স্কুলের জামা-কাপড় ছাড়বার অপেক্ষা না করেই ওর বোন ছুটে আসছে বাথ-রুমের দিকে, তখন বেশ বুঝতে পারলে যে, ব্যাপার সুবিধের নয়। তবু বাসব চুপ করে রইলো—যেন কোথাও কিছু হয় নি। এমন কি মুখ তুলে একবারটি তাকাবারও কোন উপলক্ষ যেন ঘটে নি।

বাসবের এই ঔদাসীন্যে জ্বলে উঠে মেয়েটি সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কিন্তু বাসব ততক্ষণে ক্ষিপ্রগতিতে তার জামাটা নিরাপদ স্থানে সরিয়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। হাসতে হাসতে বোনের হাতদুটিকে প্রতিহত করে বললে:

" কি রে কম্‌লি, তোর হোল কি?

কমল-লতাকে আদর করে ও "কম্‌লি" বলেই ডাকতো বরাবর।

একে ব্যর্থ প্রয়াস তার ওপর বাসবের হাসি কমলকে বিদ্যুৎতের মত তীক্ষ্ণ করে তুললো। ক্ষিপ্তের মত বাসবের প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে ও চীৎকার করে উঠ্‌লো

"কেন—আমার সাবানটায় আবার হাত দিলে কেন শুনি? তোমাকে না বারবার করে বলে দিয়েছিলুম ওটা খরচ না করতে?"

বাসবের সহাস্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

"বা রে! আমার জামাটা বুঝি সাফ হ'তে নেই? আমাদের ক্লাবে আজ মিটিং আছে জানিস......"

বলতে বলতে কমলের দিকে চেয়ে ও কিছুতেই হাসি সামলাতে পারলে না।

কমলও ততক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সংযত করে তুলেছে। ভ্রুকুটি করে চড়া গলায় বলে উঠ্‌লো, "দেখ দাদা, অমন দাঁত বের করে হেসো না বলছি। বাড়ীতেই তো ছিলে, একখানা সাবান কিনে আনলে না কেন শুনি..."

"আমার অতখানি বুদ্ধি আসে নি মাথায়, বিশেষতঃ হাতের কাছেই যখন তোর সাবানটা পেলুম—"

বাসবের কলকণ্ঠকে বাধা দিয়ে কমল ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো "হয়েছে, আর বাহাদুরি করতে হবে না......"

পরক্ষণেই কিন্তু ওর গলা ভারী হয়ে উঠ্‌লো। গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে বললে: "আমার যাওয়াটা বন্ধ করে এখন খুব খুশী হয়েছ তো? সেদিন অমনি আমার স্যাণ্ডেলটা পরে সরে পড়লে, আর মা আমায় রাতে খালি পায়ে কিছুতেই ছাড়লে না লালুদের বাড়ী। আজ আবার...। আমি কোন্ জামাটা গায়ে দিয়ে যাব শুনি মীনা-দির বাড়ী?"

বাসবকে প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়েই সে আবার বলে চল্‌লো: "নিজের পাঞ্জাবীটা বেশ তো ধুলে, সেই সঙ্গে আমার জামাটায় একটু সাবান দিলে কি তোমার দাদাগিরি বজায় থাকতো না? আমিই না হয় ধুয়ে—" আবেগে ও আর কথা বলতে পারলো না। বাসবের হাত দুটোকে একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা থামের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর একটু হলে চোখে জল এসে পড়তো বোধ হয়। হঠাৎ উঠোনের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল ওর জামাটা সজ্জ সুসংস্কৃত হয়ে ফুর ফুরে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে তারে ঝুলতে ঝুলতে।

বাসব তখনো ওর দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ও ভারী অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো সত্যি, তবু ওর মনটা ভরে উঠলো খুসীতে। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে বলে উঠলো—"সেই তো বল্লেই পারতে—তা না..."

এবার বাসবের পালা। কমলের কথায় বাধা দিয়ে বাসব হৈ হৈ করে উঠলো: "যা, যা! আর বক্তিমে করতে হবে না। কাণে হাত দিয়ে না দেখেই মেয়ে ছুটলেন 'কাকে নিয়ে গেল' বলে। আবার তর্ক করতে আসা হয় মেয়েদের কি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা......"

কমল বেশ অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল; ঝাড়া গলায় বললে "যে আজ্ঞে পুরুষ মশাই! এইবার নিজের প্রতি একটু অবহিত হতে আজ্ঞা হোক।" তারপর ওর স্বাভাবিক কোমল স্বরে বললে: "আচ্ছা দাদা, কাল না তোমার মাথা ধরে জ্বরের মত হয়েছিল? কলেজ ফাঁকি দিলে আজ সেইটেকে উপলক্ষ্য করে। কিন্তু কি বলে আবার জল ঘাঁটছো শুনি?" পর মুহূর্ত্তে ওর কথায় বিরক্তি স্পষ্টতর হয়ে উঠলো:

"আবার ক্লাবে যাবে বলছো যে? তোমার যাওয়া বার করছি যাকে বলে। এখন উঠে এস তো লক্ষ্মী ছেলেটির মত।"

কিন্তু বাসব যেন শুনতে পায়নি ওর কথা। সে নিবিষ্ট-মনে পাঞ্জাবীটায় আর এক ঘটি জল ঢেলে নিলে; তার পর সেটাকে সশব্দে আছাড় মারলে মেজেয়।"

কমল-লতা শেষবারের মত মিনতি করে বললে: "উঠে এস দাদা, লক্ষ্মীটি! আমি ধুয়ে দিচ্ছি তোমার জামা। নইলে আবার সেবারকার মত জ্বরে পড়ে ভোগাবে তো..." কিন্তু তবু বাসব কোন সাড়া দিল না ওর কথায়।

এবার সত্যি সত্যিই কমলের ধৈর্য্য ভাঙলো। ওর কণ্ঠ-স্বর বেজে উঠলো ঝন্‌ঝন্ করে—"মা—"

ওপর থেকে মার গলা শোনা গেল: কি হোলোরে তোদের? এই দিন দুপুরে এত চেঁচামেচি কেন? ওরে অ বামু! কেন ওর সঙ্গে লাগছিস, আমাকে না উঠিয়ে কি ছাড়বি নে!"

কিন্তু মাকে আর উঠতে হোল না। বাসব একলাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। তারপর কমলের ফাঁপানো খোঁপাটায় একটা মোচড় দিয়ে ভেংচি কাটলে: "ম্যাঁ—! মেয়ের গলা তো নয়, গলি। ম্যাথরাণীর মত চেঁচাচ্ছিস কেনরে পোড়ামুখি—" বলেই ওর খোঁপায় আর একটা মোচড় দিয়ে বাসব অদৃশ্য হয়ে গেল সিঁড়ির ওপর। পেছনে পেছনে কমলের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল:

"আচ্ছা, চল না মার কাছে; কলেজে বুঝি এই সব শেখান হয় তোমাদের? যত সব—" বাকীটা আর শোনা গেল না।

দুই

ঘণ্টা তিনেক পরে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আকাশের এখানে ওখানে দুএকটা তারা চিকচিক করে উঠেছে। এদিকে সারাদিনের দীর্ঘ বিশ্রামের পর সামনের রাস্তাটা আবার সচেতন হয়ে উঠেছে। পথচারিদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না; তাদের কলকণ্ঠেরও বিরাম নেই। এমনি সময় দুই ভাই-বোনে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। দেখলে কেউ বুঝতে পারত না যে, এরাই কয়েক ঘণ্টা আগে ঘরের ভেতর কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার সুরু করেছিল।

বাসব গেট খুলে রাস্তায় পা দিলে। কমলি গেটটা বন্ধ করে এসে বাসবের হাত ধরলো। এটা ওর অভ্যেস। কবে কোন ছোটবেলায় ও ধরেছিল ওর দাদার হাত। তারপর এত বড়টি হয়েছে, তবু ছাড়বার কথা আর মনে পড়েনি। বড় হয়ে ওরা এই রকম হাত ধরাধরি করে কত বেড়িয়েছে—গিয়েছে স্কুলকলেজের ছোট বড় সম্মিলনীতে; আবার কোনও দিন পার্কে কিংবা সিনেমাযও সেজে-গুজে গিয়েছে গল্প করতে করতে, স্বচ্ছন্দে হাত দুলিয়ে। আজও ওরা চললো ওদের চিরাভ্যস্ত পদ্ধতিতে—যেন এমনি করেই ওদের চলতে হবে সারা জীবন আপন আপন খেয়ালে।

বাসব তার মোটা কাপড়ের ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবীটা চাপিয়ে বুক ফুলিয়ে চলেছিল। কমলের পরণে ছিল হালকা সবুজ রঙের সাড়ী, আর একটা বেগ্‌নে রঙের জামা; পায়ে সেই স্যাণ্ডেলটা। তবু ওকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে বলবার নয়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছলো মীনাদের বাড়ী। স্কুল ছুটি হয়েছে আজ। তাই কমলেরা মীনা-দির বাড়ীতে একটা ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করেছিল। কমলকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে বাসবের ক্লাবে যাওয়ার কথা। কমল বাসবের হাতে একটা টান মেরে বললে—"একটু শিগগির এস, দাদা; বেশী রাত কোর না যেন। মার শরীব ভাল নেই; আর তোমার সময়টাও যে বিশেষ ভাল যাচ্ছে না তা তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আজ বরং ক্লাবে না গেলেই ছিল ভাল—"

বাসব একটা হালকা ধমক দিয়ে উঠলো—"যা, যা! আর জ্যাঠামি করতে হবে না তোকে। নিজের চরকায় তেল দে গিয়ে। পেটুকের মত আজ গিলবি তো একরাশ, আর বাড়ী গিয়ে পেট ছাড়বি। আমি বেচারা—"

"আঃ—তুমি কি 'ভালগার' দাদা—" বলেই কমল-লতা তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো মীনাদের কম্পাউণ্ডে। বাসব একটুখানি হেসে শিষ দিতে দিতে প্রস্থান করলে ওর ক্লাবের খোঁজে।

তিন

আজ বাসব কিন্তু খুব শিগগিরই ফিরলো—অপ্রত্যাশিত-ভাবে বল্লেও হয়। কমলদের খাওয়ার ব্যাপার সবে শেষ হয়ে

ওদের আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে পিয়ানোর গুরুগম্ভীর আওয়াজে। এমন সময় মীনাদির চাকর লখিয়া এসে কমলকে জানিয়ে দিল বাসবের আগমন। কিন্তু এই খবরটায় খুসী না হয়েও ব্যস্তই হয়ে পড়লো বেশী। দাদাকে ও চেনে খুব ভাল করেই। ছোট বোনের কথায় সুবোধ বালকের মত শনিবারের সন্ধ্যের আড্ডাটা ছেড়ে এত শিগগির ফিরবার ছেলে বাসব নয়। সুতরাং জিনিষটা ওকে ভাবিয়ে তুললে।

যাহোক শেষে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে কমল পা বাড়ালে দরজার দিকে। বন্ধুরা ওর আকস্মিক প্রস্থানে একটুখানি দুঃখ প্রকাশ করলে, কিন্তু তা শুনবার মত অবকাশ তার ছিল না। ও ততক্ষণে বারান্দা পেরিয়ে সুড়কীর রাস্তায় পা দিয়েছে।

বাসব দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল গেটের সামনে, ভেতরে ঢোকে নি। কারণ কমলের সঙ্গটুকু ওর যতই কাম্য হোক না কেন তার বন্ধুদের ও একটু অতিরিক্ত সমীহ করেই চলতো।

কাছে এসে কমললতা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাসবের ওপর। নিজের পাঁচটা আঙুল বাসবের উষ্ণ কপালে চেপে ধরেই ও চমকে উঠলো। পরক্ষণেই ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলো—"দাদা—! আচ্ছা তোমাকে আমি না কাল থেকে সাবধান করে দিচ্ছি? কি দরকার ছিল তোমার হিম লাগিয়ে ক্লাবে যাওয়ার? যত সব..." বেদনায় ওর মুখে আর কথা ফুটলো না। বাসব তখন বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিয়েছে একটি কথাও না বলে।

বাড়ী পৌঁছে নীচে জুতো রেখে ওরা নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলো। মার শরীর খারাপ। একটু গোলমাল হলেই ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে, আর উনি ছটফট করবেন সারা রাত। নটা বেজে গেছে অনেক্ষণ। ঠিকে ঝিটা কাজ সেরে কখন চলে গেছে। মা তাঁর নিজের খাটে শুয়ে পড়েছেন যেন একটি ঘুমন্ত প্রতিমা। পাশে কমললতার বিছানা পাতা।

ওরা আর বাক্যব্যয় না করে নিজের নিজের জায়গায় চলে গেল। বাসব এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু নিজের ঘরে এসেই ও এলিয়ে পড়লো খাটের ওপর। পাঞ্জাবীটা খুলে ছুঁড়ে ফেললো আলনার দিকে; তারপর বালিসটায় মুখ গুঁজে অস্ফুটস্বরে ডাকলে—"কমল! ভাই, আমায় অডি-কোলনের শিশিটা দিয়ে যাও—মাথাটা কেমন করছে।"

কমলের শান্ত সুর ভেসে এল ওঘর থেকে—"সে আমি জানি; কাপড়টা ছেড়েই আসছি—" বলতে বলতে ও এসে ঢুকলো বাসবের ঘরে।

বাসব তখন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সাধারণতঃ একটু কিছু হলেই ওর মাথায় অসহ যন্ত্রণা হয়। এই জিনিষটা ও পেয়েছে ওর মা'র কাছ থেকে। আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি, বরং মাত্রাটা একটু বেশী বলেই কমলের মনে হ'ল।

কমল আর দেরী করলে না। বাসবের পাশে বসে ওর কপালে অডিকোলনের পট্টিটা চড়িয়ে দিল। তারপর ছোট্ট হাতপাখাটা নিয়ে বাসবের মাথার ওপর ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগলো।

বাসব খানিকক্ষণ খুব ছটফট করলো। তার যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট চীৎকার কমলকেও মাঝে মাঝে বিচলিত করে তুললো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যন্ত্রণাটা যেন কমলো। আস্তে আস্তে বাসবের চঞ্চলতা স্থির হয়ে এল। তারপর ও শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

এতক্ষণে লতারও চোখে ঘুম এসে গেছে। সারাদিন এবং সন্ধ্যের পর থেকে সমস্তক্ষণটাই ওর কেটেছে হৈ হৈ করে। তার ওপর বাসবের এই অত্যাচার। বেচারা সত্যি সত্যিই ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এইবার বাসবকে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দেখে হাতপাখাটা একপাশে রাখলে। তারপর ঘুমজড়িত চখে একবার বাসবের দিকে তাকালো।

শেড দেওয়া আলোটার সবুজ আভা এসে পড়েছিল বাসবের মুখে, বড্ড করুণ দেখাচ্ছিল ওকে। দেখে কমলের ভারী মায়া হোল বাসবের ওপর। বয়সেই না হয় বড় দু'বছরের, তবু ওর দাদা কি ছেলেমানুষ! যখন ভাল থাকবে তখন কি ফুর্ত্তি—ধমক, উপদেশের ছড়াছড়ি। কিন্তু একটু-খানি শরীর খারাপ হলেই আর দেখতে হবে না। ছোট্ট ছেলেটির মত কোল ঘেঁসে শুয়ে ডাকবে—"কমুলি ভাই! ও কমল লতা—"

কমল আর ভাবতে পারলে না। বাসবের প্রতি এক অপরিসীম স্নেহ-মমতায় ওর অন্তর ভরে উঠলো। আস্তে

পাশ বালিসটার ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজের নরম আঙুলগুলি চালিয়ে দিল বাসবের ঘন কেশরাশির মধ্যে। তার উষ্ণ আঙুলের স্পর্শে যেন সমস্ত ভালবাসা নিঃসৃত হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো বাসবের মাথায়, মুখে এবং চোখে। আর সে শান্ত হয়ে ঘুমুতে লাগলো ছোট্ট ছেলেটির মত।

* * *

রাতের কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেল নিত্যকার মত। উষশীর নির্ম্মল নীল আলো এসে লুকোচুরি খেলতে লাগলো ঘরের ভেতর। হঠাৎ শীতল হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে শিহরণ তুললো ঘুমন্ত অধিবাসীদের শরীরে। মার ঘুম গেল ভেঙ্গে; তিনি গা-মোড়া দিয়ে একটা হাই তুলে উঠে পড়লেন। উঠে কিন্তু কমলকে দেখতে পেলেন না তার স্থানটিতে। সারা রাতের মধ্যে ও যে একবারও বিছানায় ওঠে নি তার প্রমাণ রয়েছিল ওর বিছানায়। মা ব্যস্তভাবে এসে দাঁড়ালেন বাসবের ঘরের দরজায়। ঘরে আলোটা তখনো 'শেডের মধ্যে পুরোদমে জ্বলছিল। মাথার উপরকার্থ জানালায় শার্শি দেওয়া। বাকিগুলির শুধু পর্দ্দা টেনে দেওয়া হয়েছিল হিমের গতিকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে। খাটের পাশে টুলটায় অডি-কলনের শিশি—ছিপিটা মাটিতে পড়ে গাড়গড়ি দিচ্ছিল। পাশেই কাঁচের গেলাস; তার মধ্যে খানিকটা জল তখনো নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করছিলো। হাতপাখাটা কখন নিচে পড়ে গেছে, ভাগ্যিস শিশি কিংবা গেলাসটাকে নিজের সাথী করে নি।

বাসব ঘুমোচ্ছে। ঘুমে অচেতন বল্লেই হয়। ওর চোখে মুখে গভীর অবসাদের ছায়া! রাতের যন্ত্রণা-ভোগের পর ওর সুন্দর মুখখানি ক্ষীণ-পাণ্ডুর হয়ে দেখাচ্ছে ভারী করুণ। আর কমললতা? বাসবের চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে সেও যে কখন ঢুলে পড়েছে ঘুমে তা ও নিজেই জানে না। ঠিক ঘুমোনো নয়—যেন আধো-বসা আধো-শোওয়া অবস্থায় চোখ বুজে ভাবছে কি একটা কথা। বালিসের ওপরে ওর বাঁহাত চাপা পড়েছে ওর বুকের নীচে; ডান হাতের আঙুলগুলি কিন্তু এখনো স্পর্শ করে রয়েছে বাসবের কেশরাশি।

কমললতা লুটিয়ে পড়েছে সান্ধ্য-কমলের মত। ওর চোখে-মুখে রাত্রি-জাগরণের সমস্ত চিহ্ন বর্ত্তমান। তবু ওর মুখে ফুটে উঠেছে আন্তরিক স্নেহ-মমতার একটি অনবদ্য সুষমা যা সমস্ত অবসাদ এবং ক্লান্তিকে ছাপিয়ে উঠে ওর মুখে এনে দিয়েছে এক অপরূপ শ্রী।

মা বেশ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর বাসু গত রাত্রিতে একটা কাণ্ড বাধিয়েছিল, আর লতাকেও সেই ঝড়-ঝাপটার অনেকখানি সহ্য করতে হয়েছে। বেদনামিশ্রিত করুণায় ওর অন্তর আর্দ্র হয়ে উঠলো এই পাগল ছেলে-মেয়ে দু'টির জন্যে। এদের নিয়ে উনি কি যে করবেন!

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন ওদের কাছে—আরও কাছে, একেবারে খাটের পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। তারপর নিঃশব্দে মেজের ওপর বসে পড়লেন। কয়েকটা মুহূর্ত্ত কেটে গেল এক অখণ্ড নিরবতার ভেতর দিয়ে; শুধু তাঁর সজল চোখে ভরে উঠলো যুগ-যুগান্তরের মমতাময়ীর স্নেহ-সলিল। হঠাৎ কখন তাঁর সুকোমল কর আপনা হতে গিয়ে স্পর্শ করলে বাসু এবং কমললতাকে।

তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে গলে একবাশ সাদা আলো এসে পড়েছিল বাসব এবং কমলের ওপর শরতের শিউলির মত। এক হাতে বাসবের মুখ-চোখ স্পর্শ করতে করতে অপর হাতটি কমল-লতার চূর্ণ অলকগুচ্ছের ওপর রেখে মা তাঁর স্বভাব-মধুর সুরে ডাক দিলেন—

"বাসু! ওরে অ কমলি! আজ কি তোরা উঠবিনে!

শ্রীমতী মৃণালিনী বসু

স্বর্গীয়া কমলা নেহেরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক,
জয় হোক্ জয় হোক্ তারি জয় হোক্
তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক,
জয় হোক্ জয় হোক্ তারি জয় হোক্
তোমাদের স্মরি।

আজ কমলা নেহেরুর মৃত্যুদিনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করবার জন্য আমরা আশ্রমবাসীরা মন্দিরে সমবেত। একদিন তাঁর স্বামী যখন কারাগারে, যখন তাঁর দেহের উপরে মরণান্তিক রোগের ছায়া ঘনায়িত, সেই সময় তিনি তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, সেই দুঃসময়ে তাঁর কন্যাকে আশ্রমে গ্রহণ ক'রে কিছুদিনের জন্যে তাঁদের নিরুদ্বিগ্ন করতে পেরেছিলাম। সেই দিনের কথা আজ মনে পড়ছে—সেই তাঁর প্রশান্ত-গম্ভীর অবিচলিত ধৈর্য্যের মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ছে চোখের সামনে।

সাধারণতঃ শোক প্রকাশের জন্য যে সব সভা আহূত হয়ে থাকে, সেখানে অধিকাংশ সময় অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপেই অত্যুক্তি দ্বারা বাক্যকে অলঙ্কৃত করতে হয়। আজ যাঁর কথা স্মরণ করার জন্যে আমরা সবাই মিলেছি, তাঁকে শোকের মায়া বা মৃত্যুর ছায়া দিয়ে গোড়ে তোলবার দরকার নেই। তাঁর চরিত্রের দীপ্তি সহজেই আত্মপ্রকাশ করেছে, কারো কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। বস্তুতঃ এই যে নারী, যিনি চিরজীবন আপন স্তব্ধতার মধ্যে সমাহিত থেকে পরম দুঃখ নীরবে বহন করেছেন, তাঁর পরিচয়ের দীপ্তি কেমন ক'রে যে আজ স্বতঃই সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হোলো সে কথা চিন্তা ক'রে মন বিস্মিত হয়। আধুনিককালে কোনো রমণীকে জানিনে, যিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করে অনতিকালের মধ্যে সমস্ত দেশের সম্মুখে এমন অমৃত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হতে পেরেছেন।

কমলা নেহেরু যাঁর সহধর্ম্মিণী, সেই জহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট—কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্সের সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্ত্তের মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেননি। সত্য যেখানে বিপদজনক সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধা-জনক সেখানে তিনি সহায় করেননি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে অর্ঘে অসঙ্কোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্ম্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তি সাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড়ো দান।

কমলা ছিলেন জহরলালের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। তাঁর মধ্যে ছিল সেই অপ্রমত্ত শান্তি, সেই অবিচলিত স্থৈর্য্য, যা বীর্য্যের সর্ব্বোত্তম লক্ষণ। তাঁদের দু'জনের কারো মধ্যে দেখিনি অতি ভাবালুতার চঞ্চল উত্তেজনা। তাঁদের এমন পরিপূর্ণ মিলনে,

কি জীবনে কি মৃত্যুতে, বিচ্ছেদের স্থান নেই নিশ্চয়ই। আজ তাঁর স্বামী মরণের মধ্যে দিয়ে কমলাকে দ্বিগুণ করে লাভ করেছেন। যিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, আজও তিনি জীবনসঙ্গিনীই রইলেন।

দূর অতীতের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষণিকায় আমরা পুরাণবিখ্যাত সাধ্বী ও বীরাঙ্গণাদেরকে তাঁদের বিরাট স্বরূপে দেখতে পাই। কমলা নেহেরু আজও কালের সেই পরিপ্রেক্ষণিকায় উত্তীর্ণ হননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ গোচর; এখানে বড়োর সঙ্গে ছোটো, মূল্যবানের সঙ্গে অকিঞ্চিৎকর জড়িত হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও আমরা তাঁর মধ্যে দেখছি যেন একটি পৌরাণিক মহিমা; তিনি তাঁর আপন মহত্ত্বের পরিপ্রেক্ষণিকায় নিত্যরূপে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান।

আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারিদিকে শুষ্কপত্র ঝ'রে পড়েছে তার মধ্যে নবকিশলয়ের অভিনন্দন। আজ জরাবিজয়ী নূতন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নবজীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব যুগসঞ্চিত নির্ম্মম শীতের দিন শেষ হোলো, এল নবযুগের সর্ব্বব্যাপী আশ্বাস। আজ এই নবযুগের ঋতুরাজ জওহরলাল। আর আছেন বসন্তলক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্যসত্তায় সম্মিলিত। তাঁদের সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতে যে বসন্ত সমাগম তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সে তো অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেননি। সাঙ্ঘাতিক বিরুদ্ধতা প্রতিবাদের ভিতর দিয়েই তাঁরা দেশের শুভ সূচনা করেছেন। এই জন্যে আমাদের আশ্রমে এই বসন্তোৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিনরূপে গ্রহণ করেছি। তাঁরা আপন নির্ভীক বীর্য্যের দ্বারা ভারতে নবজীবনের বসন্তের প্রতীক।

এই নারীর জীবনে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে প্রতিদিন যে দুঃসহ সংগ্রাম চলেছিল, যে সংগ্রামে তিনি কোনোদিন পরাভব স্বীকার করেননি, সে আমাদের গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়। স্বামীর সঙ্গে সুদীর্ঘ কঠিন বিচ্ছেদ তিনি অচঞ্চল-চিত্তে বহন করেছেন স্বামীর মহৎ ব্রতের প্রতি লক্ষ্য করে। দুর্ব্বিষহ দুঃখের দিনেও স্বামীকে তিনি পিছনের দিকে ডাকেন-নি, নিজের কথা ভুলে সঙ্কটের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁকে বেদনা জানাননি। স্বামীর ব্রত রক্ষা তিনি আপন প্রাণরক্ষার চেয়ে বড়ো করে জেনেছিলেন। এই দুষ্কর সাধনার জোরে তিনি আজও, মৃত্যুর পরেও দুর্গম পথে স্বামীর নিত্যসঙ্গিনী হয়ে রইলেন।

আজ এই আমাদের বলবার কথা যে, আমরা লাভ করলুম এই বীরাঙ্গণাকে আমাদের ইতিহাসের বেদীতে। আধুনিক কালের চলমান পটের উপর তিনি নিত্যকালের চিত্র রেখে গেলেন। তাঁকে হারিয়েছি এমন অশুভ কথা আজ কোনোমতেই সত্য হোতে পারে না।

(আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

পাইওরিয়া-এলভিওলারিস্

ডাঃ ডি, এস, দাসগুপ্ত ডি, ই, ডি, এফ্

জগতের প্রত্যেক জীবকে বোধ হয় ভূমিষ্ঠ হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ক্রমাগত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইতেছে। এই প্রকার শত্রু মানুষের যথেষ্ট পরিমাণে চারিদিকেই বিদ্যমান। মানুষের শরীরের বাহিরের শত্রুকে যেমন যুদ্ধ করিয়া মারিয়া শেষ করিতে হইতেছে, তেমনি শরীরের ভিতরের শত্রুকেও যুদ্ধ করিয়া শেষ করিতে হইতেছে। শরীর মধ্যে সর্ব্বদাই এই প্রকার ব্যাধি-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতেছে, ব্যাধি-শত্রু ভয়ানক শত্রু। উহাদের সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সকল মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত করে।

রোগ-শত্রু সাধারণতঃ বাহির হইতেই মানুষের মুখ, চোখ কান, নাক, ইত্যাদি দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিতেছে এবং মুখ উহাদের প্রধান প্রবেশ দ্বার। বীজাণুদোষিত বায়ু খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে নানা প্রকার ব্যাধি-শত্রু মুখে প্রবেশ করিয়া মুখকে Septic cavityতে পরিণত করিয়াছে। এই স্বাভাবিক অবস্থায় মুখে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার বীজাণু থুথুর সহিত বহুসংখ্যক ভাসিয়া আছে এবং উহারা সাধারণতঃ নিরীহ অবস্থায় থাকে। এমন কি উহাদের কাহার দ্বারা কখনও কখনও শরীরের উপকারক হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কখনও সুযোগ সুবিধা উপস্থিত হয় তখন উহারা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে ও নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে।

মুখে যে সমস্ত রোগ হয় তাহাদের মধ্যে পাইওরিয়া এল্‌ভিওলারিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রোগের গুরুত্ব একটু আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে। পাইওরিয়া সাধারণতঃ খুব ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া দাঁত আক্রমণ করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দাঁতের চারিপাশের মাড়ি সুর সুর করিয়া চুলকায় এবং ক্রমান্বয়ে দাঁতের চারি-পাশের মাড়ি ধ্বস হইয়া দাঁত নড়িতে থাকে। এই সময় শরীরের সাধারণ প্রণালী; যেমন Rheumatism Arthritis, Stomach trouble ইত্যাদি নানাপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে তেমনি দাঁতের নানাপ্রকার রোগ হইয়া থাকে। দাঁতের চারিপাশে ফেনের ন্যায় পদার্থ হইয়া Tartar জমিতে থাকে। মাড়ি রক্তবর্ণ spongy হইয়া ফুলিয়া অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং সামান্য টিপিলেই মাড়ি থেকে রক্ত বাহির হয়। দাঁতের চারিপাশের মাড়ি এই প্রকারে ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া পকেটের মত সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে পুঁজ জমিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ হইতে থাকে। এই দুর্গন্ধময় পুঁজ সর্ব্বদাই মাড়ি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইতে দেখা যায়।

এই প্রকারে পুঁজভর্ত্তি পকেট সৃষ্টি হওয়ার দরুণ দাঁতের চারি পাশের Tissue····· সর্ব্বপ্রকার পুষ্টি (nourishment) হইতে বঞ্চিত হইয়া দাঁতের সুকঠিন এনামেল্ ধ্বংশ করিয়া দেয় এবং দাঁতের গায়ে খাদ মত (Cony burrows) সৃষ্টি হয়। পরিশেষে এই দাঁতের খাদগুলি যথেষ্ট পুঁজ জমাইবার বিশেষ উপযুক্ত স্থানে পরিণত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত বীজাণুর আশ্রয় স্থল হয়। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে বিষাক্ত বীজাণুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া স্বভাবতই উহারা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং দাঁতের আশে পাশে চারিদিকে Abcess তৈরী করিয়া অতীব শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করে। ও ক্রমশঃ দাঁতগুলিকে উহাদের স্বভাবজাত অবলম্বন মাড়ির বাধন থেকে মুক্ত করিয়া দেয়। মুখের এই অবস্থা শুধু যে দাঁতের জন্যই শোচনীয় তাহা নহে—ইহা সমস্ত শরীরের পক্ষেই মারাত্মক।

পাইওরিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয় না, খুব ধীরে ধীরে উক্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে। বৎসরাধিক কাল ধরিয়া বিষাক্ত পুঁজের সৃষ্টি হয় এবং বীজাণু মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। গলা, নাক ফুস্ ফুসের ভিতর যাইতে থাকে

এবং খাদ্যের সহিত মিশিয়া রক্ত দূষিত করিয়া দেয়। এই প্রকারে সকল মারাত্মক ব্যাধির জন্ম দ্বার উন্মুক্ত করিয়া শুধু যে রোগীকে আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হয় তাহাই নহে, অপর সকলকেও infection দিতে আরম্ভ করে। একজন থেকে আর একজনে সংক্রামিত হইতে থাকে এবং সকল লোকেরই সংক্রমণের সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু ইহা বংশানুক্রমিক হইতে দেখা যায়। সে জন্য শিশু পেটে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল মা'য়েরই দাঁত বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করাইয়া দন্তরোগ শূন্য করা বিশেষ দরকার।

Pyorrhoea রোগীর নিশ্বাস, প্রশ্বাসের সঙ্গে ও কথা বলিবার সময় খুব দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে ও উহা নিকটস্থ ব্যক্তির পক্ষে অসহ্য হয়। পাইওরিয়ার রোগী অতি শীঘ্রই মুখে নানা প্রকার কঠিন ব্যাধির হাতে পড়িতে থাকে। উদরাময়, মাথাধরা, পেটের পীড়া, গা বমি বমি, ইত্যাদি ছাড়া Rheumatism, Diptheria, Dyspepsia, Tuberculosis, প্রভৃতি কঠিন পীড়াও হইয়া থাকে।

মুখের মধ্যে যে সমস্ত নানাজাতীয় বীজাণু আছে পাইওরিয়ার পুঁজের সঙ্গেও প্রায় সেই সমস্ত বীজাণুই পাওয়া যায় বিশেষতঃ Spirochites। এই সমস্ত অনেক বীজাণুই Pyorrhoea কারণ মনে করিয়া অনেক প্রকার Vaccineও আধুনিক প্রণালীতে তৈরি হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। পাইওরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও অনেক মতভেদ আছে। একটী মতবাদ আছে যে কোন জাতীয় বীজাণু কোন বিশেষ শরীরের অংশ আক্রমণ করিয়া থাকে যেমন Anthrax ও বসন্তের বীজাণু চর্ম্মের উপর আক্রমণ করে এবং Typhoid করে Intestine এবং mucous membrane এর উপর। এই যুক্তির দ্বারা শরীরের সেই সকল অংশ Immune করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। বসন্তের বীজাণু দ্বারা শরীরের চামড়ার উপর Injection করিয়া Immune করিতে হইতেছে—উহা মাংসপেশী বা অন্যত্র কোথায়ও দেওয়া হয় না। তেমনি Pyorrhoeaর vaccine তৈরী করিয়া উহাও মাড়িতে Inject করিয়া ওই স্থানের Local resistance বাড়াইয়া রোগ মুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে এবং ইহাতে অনেক ভাল ফলও পাওয়া গিয়াছে।

Pyorrhoea র প্রথমাবস্থাতেই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। প্রথমাবস্থায় Acid Chromic—Tint Iodine, Hydrogen peroxide প্রভৃতি ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের উপদেশ বিশেষ দরকার।

মুখে যাহাতে বীজাণুসকল বিষাক্ত হইয়া বীজ ছড়াইতে না পারে সে জন্য নানাপ্রকার Antiseptic tooth paste-powder, mouth wash ব্যবহার করা খুব দরকার। ভাল করিয়া সংশোধিত দাঁতের ব্রুস্ দিয়ে সমস্ত দাঁত পরিষ্কার করিলে দাঁতের চারিপাশে নানাপ্রকার Food particles, Tartar, পুঁজ ইত্যাদি জমিতে পারে না এবং কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকেনা।

দাঁতন করা আমাদের দেশের অতি প্রাচীন প্রথা এবং এখনও প্রচলিত আছে। নিম, আম, বাবলা প্রভৃতি দ্বারা দাঁতন করিলে দাত খুব দৃঢ় হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং Pyorrhoea প্রভৃতি রোগ জন্মাইতে পারেনা।

রক্তচন্দন ও খয়ের মিশাইয়া mouth wash প্রস্তুত করিয়া কুলি করায় Pyorrhoeaর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ফিটকিরির জল আমাদের দেশের একটী উৎকৃষ্ট দন্তপ্রক্ষালনী (mouth wash)।

প্রত্যেকবার আহারের পর কুলি করিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে এবং উহা খুব ভাল প্রথা। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন প্রথা বর্জ্জন করিয়া নানাপ্রকার নূতন প্রথা ও নূতন খাদ্যের চলন করিয়া আমরা অনেক প্রকার নূতন রোগ সৃষ্টি করিতেছি। দন্তরোগও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই যে বেশী হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। Alcohol meat, sweets (chocolate Biscuits) ইত্যাদি খাদ্য দাঁত শীঘ্রই ধ্বংস করিয়া দেয় ও নানারোগ সৃষ্টি করে।

শরীরের নানাপ্রকার ব্যাধি থেকে যেমন দাঁতের রোগ সৃষ্টি হইতে পারে তেমনি দাঁতের রোগ থেকে অনেক মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং মানুষের মুখ অনেক রোগের প্রধান প্রবেশ দ্বার।

ডি, এস, দাসগুপ্ত

মুসাফিরের ডায়েরী

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম-এ

আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীরাধাভূষণ বসু বি-এস-সি, বি-কম্

চিত্র পরিশিষ্ট

গৌহাটী শিলং রোডের ধারে দুটি জল প্রপাত

একটি পাইন বন

একটি খাসিয়া পসারিণী—মাটির জিনিষ পত্র নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায়

এই খাসিয়া মেয়েটি পীঠে কাঠের বোঝা নিয়ে যাচ্ছে বাজারের দিকে—বিক্রীর জন্য

সেণ্ট্ এড্মণ্ড্ কলেজ—লাইমুখ্রা শিলং

মিস্ ব্যানার্জ্জি

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস—চেরাপুঞ্জী

দুটি খাসিয়া যুবতী—এরা সহোদরা এবং শিলং বড়বাজারে এদের ফলের দোকান আছে—অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে হ'য়েও এরা ব্যবসাক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত করেছে

পট ও মঞ্চ

আনন্দ

চিত্রব্যবসায়ে বাঙালীর ভবিষ্যৎ

নূতন চিত্রপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের সংবাদ সংবাদপত্রে সর্ব্বদাই দেখা যায়। বাজারে নূতন নাম বেরিয়েছে এমন দু ডজন ফিল্ম প্রোডিউসিং কোম্পানীর কথা আমি আপনাদের বলতে পারি এবং আরও বলতে পারি অতীতে কত ফিল্ম কোম্পানী ছবি শেষ না ক'রে, সামান্য ক'রে, অর্দ্ধেক ক'রে, একখানা দুখানা বা তিনখানা ছবি ক'রে উঠে গেছে—কিন্তু তা হলে আমাকে অনেকগুলি পৃষ্ঠা অনর্থক ব্যয় করতে হবে। নূতনের আগমনে উল্লসিত না হয়ে আমরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছি, ভাবীকালের কথা ভাবছি এবং বুঝতে পাচ্ছি না এতগুলি ছবি তৈরি হলে কোথায় মুক্তি লাভ করবে—চৌরঙ্গী পাড়ায় নিশ্চয়ই নয়। Quantity বাড়বে, এটা আনন্দের কথা; কিন্তু Quality উন্নততর হবে ত, এতগুলি ছবির accomodation হবে ত, শিল্পে বাঙালীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু সে শিল্প ব্যবসায়ে পরিণত হয়ে দেশের ও দশের অধিকতর কল্যাণকর হবে ত? চিত্রব্যবসায়ে বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি। শিল্পের দিক থেকে প্রথমে কোম্পানীর পত্তন নিয়ে আরম্ভ করা যাক্।

নানা কারণে দেশের যৌথ চিত্রপ্রতিষ্ঠানের ওপর লোকের বিশ্বাস নেই। অবশ্য কেবল ফিল্ম কোম্পানীই নয়, যৌথ কারবারের প্রতি বাঙালী আস্থা হারিয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অকারণে নয়! বাস্তবিক, বহু বার আমরা লাভের আশায় যৌথ কারবারের শেয়ার কিনে অনেক টাকা জলে দিয়েছি। এরূপ যৌথ কারবারের উদ্যোক্তা যাঁরা তাঁরা অনেকেই বিশেষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নন—টাকা উঠলেও পরিচালকের অক্ষমতার দরুণ অনেক কারবার নষ্ট হয়ে গেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মন্দ লোক অনেক লাভের লোভ দেখিয়ে জনসাধারণের কিছু পয়সা হস্তগত করেছে—মন্দ লোক কারবারের নাম ক'রে স্বার্থসিদ্ধি করেছে। ফিল্ম একে এদেশে নূতন জিনিষ, তায় যৌথ কারবারের ওপর লোকের আস্থা নেই, সুতরাং যৌথ চিত্রপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কঠিন কথা। ছায়া ছবিরও গঠনরত অনেক যৌথ কারবার উঠে গেছে—হয়ত সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবে। আমরা এক ভদ্রলোকের কথা জানি; তাঁর নিজের কিছু টাকা ছিল। সেই টাকায় তিনি অফিস অঞ্চলে এক চিত্রপ্রতিষ্ঠানের অফিস খোলেন। কাগজে কাগজে সে খবর প্রচারিত হয় এবং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীও ছাপা হয়। এই ভদ্রলোক ভেবেছিলেন নিজের টাকায় কাজ আরম্ভ ক'রে পরে জনসাধারণের অর্থে কার্য্য নিষ্পন্ন করবেন। কোম্পানী নট-নটী চায় দেখে কত লোক এল কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা জানালেন যে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রী করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং যিনি যত বেশি শেয়ার বিক্রী করতে পারবেন তিনি যথাযথ কমিশন ত পাবেনই উপরন্তু ছবিতে অভিনয় করার চান্স তাঁর সব চেয়ে বেশি। কত উৎসাহী লোক শেয়ার বিক্রি করবার জন্য প্রস্‌পেক্টাস ও অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে গেল, তবে অধিকাংশ 'ভাবী তারকা' মুখ ফেরালে। কাগজে কাগজে তত দিনে প্রকাশিত হয়েছে যে অমুক কোম্পানীর আগামী ছবির মহলা বসেছে—এমন সময় একদিন কোম্পানীর অফিস স্থানান্তরিত হল, কোথায় তা' কেউ জানে না! এই ভদ্রলোক তবু অফিস অঞ্চলে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, তাঁর ঘরে বিভিন্ন কামরার দরজায় পর্দা ছিল, ঘরে টেবল চেয়ার ছিল, দু'তিন জন ফিরিঙ্গি মেয়ে-টাইপিষ্ট আর বাঙালী কেরাণী ছিল, নেপালী দ্বারবান ছিল। কিন্তু অনেক স্বপ্নবিলাসী যুবক বৈঠকখানার ঘরে

গায়ের আলোয়ানের পর্দ্দা টাঙিয়ে টুলে বসে কেরোসিন কাঠের খোঁড়া টেবলে পা তুলে দিয়ে Paramount Publix Corporationএর মত কিছু গড়ে তোলবার কথা ভাবে—পোড়ো বাড়ীতে ভাঙা হার্ম্মোনিয়ম বাজিয়ে কেউ

সম্প্রতি ৩৬০ রীল ছবি তোলার পর Irene Dunneএর The Magnificient Obsession এর কাজ শেষ হয়েছে, John Stahl (Seed, Only Yesterday, Imitation of Life এবং আইরিনেরই Back Street প্রভৃতি ছবির প্রযোজক) এই ছবির প্রয়োগশিল্পী। ইউনিভার্সালের ওখানেই আইরিন্ ডান্ এড্‌না ফার্বার প্রণীত বিখ্যাত Show Boat-এ নামবে, James whale এই ছবির প্রযোজনা করবেন এবং Paul Robeson এই ছবির অন্যতম প্রধান ভূমিকায় দেখা দেবে। Cimmaron, Sweet Adeline, Roberta প্রতিভাবতী আইরিনের কয়েকটী ছবি। কলম্বিয়াতেও আইরিন্ একটি বিরাট ছবি করবে।

কাগজে রটায় ষ্টুডিয়োয় তাদের নূতন ছবির মহলা চলছে!

ফিল্ম কোম্পানী যদি কিছু কাজ দেখাতে পারে তবে তার goodwill হয়ে যায় অসামান্য। এ অবস্থায় কোম্পানী public limited ক'রে বেশী টাকা নিয়ে কাজ ক'রে চিত্র-শিল্পে ও ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি করা যায়। কিন্তু তাতে কোম্পানীর একক বা তিন চার জন সত্ত্বাধিকারীর আপত্তি থাকাই সম্ভব—নগদ লাভ সামান্য হলেও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না! কল্পনা করুন, আজ যদি নিউ থিয়েটার্সের মত কোন এক অসামান্য goodwill সম্পন্ন কোম্পানী public limited হতে যায় তবে লোকে অর্দ্ধাশনে থেকেও কোম্পানীর শেয়ার কিনবে এবং তার ফলে ভারতবর্ষেও Metro বা Universalএর মত এক বিরাট কোম্পানী গড়ে উঠতে পারে। তবে এখানে লোকে ছবি বাঁধা দিয়েও indifferent কোম্পানী চালাবে তবু public limited করবে না। এ দেশে goodwill অর্জ্জন করা সহজ এবং goodwill স্বপ্নাতীত কার্য্যকর। সম্প্রতি হুমায়ুন প্রপার্টিজের শেয়ার কেনা নিয়ে কি ভীষণ কাড়াকাড়ি পড়ে গেছলো তা অনেকেই জানেন। আর একটি কথা, Promoter ব'লে একশ্রেণীর লোক কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে পরিচালকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যায়—আমাদের ফিল্ম কোম্পানীগুলি এই Promoterদের সাহায্য পায় না।

চিত্রপ্রতিষ্ঠানের অস্থায়িত্বের অনেক কারণই হয়ত আছে কিন্তু সে সবের মধ্যে প্রধান ধন ও জনবলের অপ্রতুলতা। যাঁরা কোম্পানীর পত্তন করেন তাঁরা সকলে সমান দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন না। দ্বিধাগ্রস্ত ধনীর অর্থে অনেক অনভিজ্ঞ বা অল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক ছবি তুলতে নামেন কিন্তু এঁরা সুফল লাভ করতে পারেন না; হয় ধনীর মন ও অর্থ কাজকর্ম্ম দেখে অর্দ্ধপথে বিমুখ হয়, না হয় সমাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর ছবিটির অসাফল্য বিত্তবান ব্যক্তিটিকে চিত্রব্যবসায় সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত আস্থাহীন ক'রে তোলে—যে সব ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নেই বা সামান্য আছে তারা অবশ্যই দর্শনীয় ছবি তুলতে পারে না। আবার এমনও ব্যক্তি আছেন যিনি অজস্র ছবির প্রযোজনা করেছেন কিন্তু অভিজ্ঞতার বা মস্তিষ্কের পরিচয় দিতে পারেন নি; বলা বাহুল্য, এরূপ লোকের বাজারে নাম আছে এবং এঁর পক্ষে ধাপ্পা দিয়ে অর্থবান ব্যক্তি সংগ্রহ ক'রে ছবি তুলতে আরম্ভ করা বিশেষ শক্ত কাজ নয়—অবশ্য এমন লোকের ছবি

শেষ পর্য্যন্ত সকলকে হতাশ ক'রে থাকে। আর এক দল লোক আছে যারা উপস্থিত প্রয়োজনের অনুপাতে অর্থ সংগ্রহ করে ছবি তোলে ; এদের প্রথম ছবি আর্থিক সাফল্য লাভ না করলে কোম্পানী উঠে যায়, কিন্তু প্রথম চিত্র অর্থপ্রদ হলে এরা উৎসাহিত হয়ে উত্তরোত্তর উন্নতি করে। আর যাঁরা রইলেন তাঁরা ব্যবসায় করবার জন্ত যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ ক'রে চিত্রজগতে আসেন ; প্রথম প্রথম উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হলেও এঁরা উৎসাহের সঙ্গে উন্নতির চেষ্টা করেন ও শেষ পর্য্যন্ত উন্নতি করেন। বাংলা দেশের Capitalist যে shy তার কারণ Capitalistরা যাঁরা নিজেরা ব্যবসায়ে নামেন না এবং অপরের দ্বারা exploited হন তাঁরা শেষে লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে থলের মুখ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ধনিক-সম্প্রদায় যদি খেয়াল ও খুশীর বশে অপরের প্ররোচনায় চিত্রব্যবসায়ে টাকা না ঢেলে নিজে হতে কেবলমাত্র ব্যবসায়ার্থ ছায়াছবির ক্ষেত্রে অর্থ নিয়োগ করেন তবে তাঁদের শেষ পর্য্যন্ত মনস্তাপের কারণ থাকবে না। যাই হোক, অযোগ্য লোক দিয়ে সামান্ত অর্থ নিয়ে ছবি তোলার ন্তায় বুদ্ধিহীনতা আর নেই।

ছায়াছবির ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার এই-ই প্রশস্ত কাল। চিত্রব্যবসায়ে দেশের লোকের দৃষ্টি যে আকৃষ্ট হয়েছে, নিত্য নূতন চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলিই তার প্রমাণ ; তবে এ সৃষ্টি শুভ বা অশুভ তা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু এ-কথা অবধারিত যে দেশের লোকের দেশী ছবি দেখা নেশার মত হয়ে পড়েছে। প্রমাণ স্বরূপ অজস্র উল্লেখের অযোগ্য বাংলা ছবির আর্থিক সাফল্যের ও তাদের নির্ম্মাতাদের তজ্জনিত উৎসাহের কথা বলা যেতে পারে। দেশী ছবি আমরা প্রথমে দেখি তারপর তার ভালমন্দ বিচার করি, পরের মুখে বাংলা ছবির অজস্র নিন্দা শুনেও আমরা বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে থাকি। দেশের লোকের দেশী ছবি-প্রীতির এই সুযোগ গ্রহণ ক'রে আজে-বাজে ছবি তুলেও অনেক কোম্পানী আজ দাঁড়িয়ে গেছে এবং আজও নিকৃষ্ট ছবি তুলে লাভবান হচ্ছে। যে-দেশে নির্দ্দোষ শব্দগ্রহণ ও সুস্পষ্ট চিত্র-গ্রহণ আজও ছবির বিশেষ সুখ্যাতির বিষয় ব'লে বিবেচিত হয় সে দেশের ছায়াছবি মোটের ওপর খুব বেশি উন্নত নয়। অথচ, যে ছবি শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয় সে ছবি সাধারণে প্রদর্শিত হবার যোগ্য নয়। অন্য সব দেশে নির্দ্দোষ শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ ছবির অপরিহার্য্য অঙ্গ—ঐ দুই বিভাগের কাজে গলদ থাকলে ছবিই হয় না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মাত্র কয়েকখানা ছবি শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণে বিচ্যুতিহীনতার দাবী করতে পারে !

Academy Award পাবার পরেও গত বছর যে সব অভিনেতা উত্তরোত্তর সুন্দর অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে Charles Laughton তাদের অন্যতম। Ruggles of Red Gap, Les Miserables (আমেরিকান) ও Mutiny on the Bounty চার্লসকে এদেশে অধিকতর জনপ্রিয় ক'রে তুলবেই। Good-bye, Mr. Chips ও Marie Antoinette (সঙ্গে নর্ম্মা শিয়ারার হার্বার্ট মার্শাল) নামে দু'খানি ছবিতে চার্লসকে দেখতে পাবেন।

বাংলা দেশ আজ শিল্পের দিকে ঝুঁকেছে—ব্যবসায়ের দিকে নয়। কিন্তু এ কথা, আশা করি, কাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না যে অর্থকরতার দিক থেকে শিল্পের চেয়ে ব্যবসায় অনেক বড় ; আমরা নিশ্চয়ই art for art's sake মেনে নিয়ে

ছবি তুলতে নামিনি, নেমেছি দুপয়সা লাভ করতে। এবং লাভ ছবি তোলার থেকে ছবির ব্যবসায়ে অনেক বেশি। ধরুন, পনের হাজার টাকায় আমরা একখানা ছবি তুললাম, আর তারপর ত্রিশ হাজার দর পেয়ে ছবিটী বেচে দিলাম।

Robert Montgomeryর মত কেউ নেই—একাধারে romantic appeal, boyish charm and swell comedy sense. কিন্তু ববের কি হয়েছে আপনারা বলতে পারেন? Mutiny on the Bounty তে ফ্রানশট্ টোনকে ওর ভূমিকা দেওয়া হ'ল এবং আরও দু একটী ছবিতে ওর ভূমিকা অগত্যা অপরাপর লোককে দেওয়া হয়েছে। বব মেট্রোর অন্যতম প্রধান নায়ক। জেসি ম্যাথুজ ও ক্লিফ্টন ওয়েবের সঙ্গে বব নাকি একটা মিউজিকালে নামবে।

যারা ছবিটী কিনলে তারা ছবি দেখিয়ে ও অন্যত্র দেখাবার জন্য ছবিটী সরবরাহ ক'রে এক বছরের মধ্যে দামের অধিকও লাভ করবে। তারপর দেখুন, আমরা ছবি তুলে প্রথম প্রদর্শনের পরেই এক দলকে ছবিটী অন্যত্র দেখাবার ভার দিলাম; এই ছবির আয়েতে মাঝ থেকে প্রদর্শক ও নির্ম্মাতা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি পরিবেশকও মোটা ভাগ বসাচ্ছে। অতএব দেখা যাচ্ছে খরচখরচা ও পরিশ্রম ক'রে ছবি তোলার থেকে একটী প্রেক্ষাগৃহের মালিক হয়ে ছবি দেখানো বেশি লাভজনক এবং তদধিক লাভদায়ক হচ্ছে ছবি পরিবেশন করা। পরিবেশক ও প্রদর্শক নানা কোম্পানীর ছবি থেকে সামান্য সামান্য নিয়ে সিন্দুক ভরে তোলে সবার আগে। অথচ পরিবেশকের হাতে না গিয়েও উপায় নেই—কে অত হাঙ্গামা ক'রে ছবি জোগাড় ক'রে ডিষ্ট্রিবিউশনের কারবার খোলে। হলিউডের কোম্পানীরা আজ জগৎ জুড়ে রাজত্ব করতে পারতো না যদি না তাদের ছবির সর্ব্বত্র পরিবেশন হোত এবং যদি না তারা সুযোগ পেলেই বিভিন্ন দেশে নিজস্ব ছবির পরিবেশনের জন্য শাখা-আফিস খুলতো।

বাংলা দেশ বাণিজ্যলক্ষ্মীর সেবা ছেড়ে কলাসরস্বতীর সেবায় মত্ত হয়েছে। কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীরা এদেশের বাণিজ্য হস্তগত ও শিল্পকে কোণঠাসা করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। যাঁরা নিয়মিত ছবি দেখে থাকেন তাঁরা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার ভারতবর্ষের খবর বিদেশী নিউজ-রীলে দেখে থাকবেন; বিদেশীরা বুঝেছে এদেশে ছবির ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক হবে। তাই তারা ছবিঘর গড়েছে ও হাত করেছে এবং ছবি পরিবেশন ও নির্ম্মান করছে। সম্প্রতি বরোদার গাইকোয়াড়ের জুবিলি, আগা খাঁর জুবিলি, ভাইসরয়ের রাজ্যপরিদর্শন, অর্দ্ধ-কুম্ভ মেলা, চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মেলা প্রভৃতি অনেক স্বদেশের খবরই বিদেশের সংবাদ চিত্রে পেয়েছি; বিদেশীরা আমাদের মন্দ দিকটা তুলে তার যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করেছে—এর চেয়ে আর দুর্ভাগ্য কি থাকতে পারে! কর্ডা ফিল্মস মহীশূরে "Elephant Boy" তুলছে, মেট্রোর travel talkএর কর্ত্তা James Fitzpatirck এখানে এসে 'All the World is a stage'এর এক অধ্যায় তুলছে, এক জন জার্ম্মাণও সেদিন অন্যত্র প্রদর্শনার্থ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ছবি তুলে নিয়ে গেল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের সহযোগিতায় ফ্রাঙ্কলিন্—গ্র্যান্‌ভিল্ এক্সপিডিশনারি ইউনিট 'ফিল নশীন' ও অন্যান্য ছবি তুলবে, আর-কে-ও রেডিও 'আকবর দি গ্রেট' ও অপর একখানা ছবি তুলবে জানিয়েছে,

হুমায়ুন প্রপার্টিজ নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের পাশে 'দি লাইট হাউস' নামে ছবিঘর নির্ম্মাণ করছে এবং নিউ এম্পায়ার থিয়েটার থেকে দক্ষিণ দিকে লিণ্ডসে ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত সমস্ত জমি কিনে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের ওপর আর একটি ছবিঘর নির্ম্মাণ করবে ঠিক করেছে—নিজেদের বিলাতি ছবি ছাড়া আর কে ও রেডিও ও ইউনাইটেড আর্টিষ্টের সমস্ত ভাল ছবি এরা দেখাবার ব্যবস্থা করেছে এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় ছবি পরিবেশন ও নির্ম্মাণ করতে পারে। অর্থাৎ বিদেশীদের গ্রাস ক্রমশঃ করাল হয়ে উঠছে এবং সরকারি সাহায্য না পেলে দেশের চিত্রশিল্প ও ব্যবসায় এদের কবলিত হবে। তারা জানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু জগতের কাছে ভারতের ছবি দেখিয়ে অতুল অর্থ পাবে অথচ চিত্র নির্ম্মাণের ব্যয় পড়বে সামান্য। ভারতবর্ষ বিদেশীদের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সব বিদেশী কোম্পানীর পিছনে আছে জগতের কয়েকটী বৃহত্তম ধনভাণ্ডার। ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকার চিত্রশিল্প ও ব্যবসায়কে এতটুকু সাহায্য করেন না, বরং করভার গুরুতরই করছেন কিন্তু ভাবিকালের ভয়াবহ রূপ দেখেও কি তাঁরা উদাসীন থাকবেন ?

আমেরিকা, বৃটেন, বম্বে ও বাংলা দেশের তৈরি ছবি আমাদের এখানে প্রদর্শিত হয়; বাংলা ছবি সংখ্যালঘিষ্ঠ। ভারতের চিত্রজগতে বৃটেন বা আমেরিকার প্রসার্য্যমান প্রভাবের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে কে, বাংলা না বোম্বে ? বাংলা, কারণ বাংলার চিত্রব্যবসায়ের সাফল্য একটি প্রদেশের ওপর নির্ভর করে এবং সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য হিন্দি ভাষায় ছবি করলেও বাংলার তৈরি ছবি দেখে থাকে কলারসিক ও সুস্থ মনোবিশিষ্ট লোক, অর্থাৎ বাংলার তৈরি ছবি যারা দেখে তাদের অর্দ্ধেক লোক মূলতঃ বিদেশী উপভোগ্য ছবির ভক্ত; সুতরাং বিদেশীর প্রভাব বৃদ্ধি পেলে বাংলা ছবি elite middle class দর্শক কিছু হারাবে। বাংলা ছবি যারা দেখে তারা চিত্তবিনোদানর্থ ছবি দেখে, উত্তেজনার খোরাক সংগ্রহ করতে নয়। এবং আনন্দ আহরণ করবার জন্য বিবিধ রসের নানাপ্রকার গল্পের ছবি দেখতে হয়; বাংলা ছবিতে বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব নেই অথচ বিদেশী ছবিতে তা আছে। বিদেশীরা যত ভাল ছবি করবে, যত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ছবি তুলবে বাংলা ছবির দর্শক তারা তত টেনে নেবে—আর যা হোক, প্রমোদার্থ লোকের ব্যয়ক্ষমতার একটা সীমা আছে। বম্বের ছবি যারা দেখে তারা উন্নত শ্রেণীর দর্শক নয়, বাঙালীর মত কলারসিক হলে তারা বম্বের ছবি দেখতে পারতো না। বম্বের যে কোনও

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে Sally Eillers (Bad Girl) বুঝি হিপোমুখো কমিডিয়ান জো ই ব্রাউনকে বিয়ে করেছে। কিন্তু তা নয়। স্যালি এবার (দ্বিতীয়বার) বিয়ে করেছে Hary Joe Brown নামে পরিচালককে এবং তার দুটি ফুটফুটে খোকাও হয়েছে। যাক্, ও সব পারিবারিক খবর। স্যালি সুন্দরী ও সু-অভিনেত্রী; হালফিল ছবি Carnival এবং আগামী ছবি Pursuit ও Remember last Night.

একখানি ছবি তিন চারটী বিদেশী ছবির গল্প নিয়ে তৈরি এবং তাতে এমন অদ্ভুত অকল্পনীয় সব ঘটনার জটিল সমাবেশ থাকে যে একখানি বম্বের ছবি দেখলে পাঁচ দশটী গল্প শোনার কাজ হয়। বম্বের ছবি যারা দেখে তাদের শতকরা নব্বই ভাগ লোক আমেরিকার ও বৃটেনের ছবি বুঝতে পারে না এবং

বিদেশী ও বাংলা ছবির রস গ্রহণ করতে অক্ষম। বিদেশী সিরিয়াল বা মারপিটের ছবিগুলি তারা দেখে কিন্তু উত্তেজনার খোরাক যদি তারা ঘর থেকে পায় তবে তাদের বাইরে যাবার দরকার কোথায়? দেখুন, বাংলা দেশের অবাঙালীর কারখানা

Frank Morgan এর মত মনোজ্ঞ অভিনেতা খুব কমই আছে। Affairs of Collini, Escapade, Sisters under the skin, Naughty Marietta, I live my life প্রভৃতি অদূর অতীতের কয়েকটি ছবিতে ফ্রাঙ্কের অভিনয় আমরা পরম উপভোগ করেছি এবং Cicely Courtneidge এর সঙ্গে The Imperfect Lady তে ফ্রাঙ্ক অধিকতর আনন্দ দেবে।

থেকে যে সব হিন্দি ছবি বের হয় তা বাঙালী দর্শক দশ মিনিট মুখ বন্ধ ক'রে দেখতে পারে না, অবশ্য তাদের বাংলা ছবিগুলিও প্রায় সমশ্রেণীর।

ছবির উৎকর্ষাপকর্ষের কথা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসার কথা ধরা যাক্।

আমরা দেখেছি বিদেশী ছবি অধিকতর প্রসার লাভ করলে যারা ভাল ছবি দেখতে চায় তাদের অনেক লোককে বাংলা ছবি হারাবে কিন্তু বম্বের কোন ক্ষতি হবে না। বম্বেও বুঝেছে ব্যবসায়কে। সমস্ত অখাদ্য ছবি তুলে পরিবেশনের জোরে তাই সর্ব্বত্র চালিয়ে বেশ পয়সা লুটছে। ডিষ্ট্রিবিউশনের কাজে ব্যস্ত বাঙালীর সংখ্যা দুচারজন এবং বাঙালীর ছবি সর্ব্বত্র পরিবেশিত হয় না। আমাদেরই এই সহরে অন্যূন এক ডজন অবাঙালী কোম্পানী বম্বের ও সমশ্রেণীর বিদেশী ছবি পরিবেশনের জোরে ব্যবসা চালাচ্ছে। ছবির ennobling ও educative value প্রায় সব বম্বের ছবির মধ্যে নেই—বম্বের অধিকাংশ ছবি মানুষকে degrade করে। ব্যবসায়ে বম্বে বাংলার বিশেষ প্রতিদ্বন্দী। আমরা কি artistic excellenc নিয়ে ধুয়ে খাবো? শুধু বম্বে ব'লে নয় অবাঙালীরা বাংলা দেশে চিত্রশিল্পে ও ব্যবসায়ে বাঙালীর প্রতিযোগিতা করছে। উল্লেখযোগ্য ছবি, দেখে খুশী হবার মত ছবি একটাও তারা করতে পারেনি এবং অযোগ্য লোক নিয়ে করতেও পারবে না, কিন্তু তারা আর্থিক সাফল্য লাভ করেছে—তারা শিল্পের সেবা করতে বসেনি।

বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে এ দেশে প্রতিযোগিতা রীতিমত আরম্ভ হলে, আমরা অনুমান করছি, বৃটিশ রাজত্বে আমেরিকা চিত্রজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারবে না। বৃটেন ছবিকে শিল্প ও ব্যবসায় হিসাবে এখন ভালই চিনেছে এবং তাই নিজেদের রাজত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছে এবং ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠাবান হচ্ছে। বিটিশাররা আমেরিকান ছবি দেখতে চায় না, ওরা স্বাদেশিকতার ভীষণ ভক্ত এবং হাজার মন্দ হলেও নিজেদের ছবি প্রথমতঃ দেখে। এই স্বাদেশিকতার জলসেচনে শিল্পে ও ব্যবসায়ে ব্রিটিশাররা দ্রুত উন্নতি করছে। তবে, আমেরিকার পক্ষে আশার কথা এই যে বৃটেন এখনও শিল্পচাতুর্য্যে আমেরিকার অনেক নীচে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি বাঙালী যদি চিত্রব্যবসায়ে লিপ্ত না হয় তবে ঘরে বাইরে প্রতিযোগী ও শক্রর আক্রমণে তার টিকে থাকা শক্ত হবে। আমাদের শিল্পচাতুর্য্য আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা আমেরিকার মত ছবি তুলতে পারবো

কিন্তু ছবি তুলে যদি বেচে দিতে হয় বা পরিবেশকের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় তবে অপরে অধিকতর লাভবান হবে এবং আমাদের শিল্পেরও অস্তিত্ব বজায় রাখা শক্ত হবে।

মাতুলহীন হওয়ার থেকে অন্ধ মাতুল থাকাও নাকি ভাল। বাংলার shy capital যে চিত্রশিল্পে নিয়োজিত হচ্ছে এই যথেষ্ট আশার কথা। একথা আমরা অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য যে আমাদের দেশে ছবির ব্যবসায় অধিকতর পুরাণো হলে সামান্য পুঁজি নিয়ে ছবির ব্যবসা করতে নামা হবে বাতুলতার রূপান্তর। সত্যই, যখন এদেশের চিত্রপ্রতিষ্ঠান সব মেট্রো, প্যারামাউণ্ট, ইউনিভার্সাল, আর কে ও, টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুর, ফক্স প্রভৃতির মত শক্তিশালী হবে তখন অল্প অর্থ নিয়ে ছোট কোম্পানী খুলে বড় হওয়া যাবে না। হলিউডের নবতম কোম্পানী টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি বিপুল অর্থ নিয়ে কাজে নেমেছিল ব'লে আজ প্রতিষ্টাপন্ন হতে পেরেছে। ইংলণ্ডের চিত্র ব্যবসায় এখনও গঠনের মুখে; সেখানে লণ্ডন ফিল্মস অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রে আজ দাঁড়াতে পেরেছে। টোপ্লিজ প্রডাকসন্স, ক্যাপিটল ফিল্ম কর্পোরেশন, গ্যারেট ক্লিমেণ্ট পিকচার্স প্রভৃতি যে সব কোম্পানী বিলাতে হালফিল গড়ে উঠেছে তাদের অর্থবলের কথা শুনলে বিস্ময় লাগে—মরিস শেভালিয়ে, য়্যানা ষ্টেন, ক্যারি গ্র্যাণ্ট, হেনরি উইলককসন প্রভৃতি তারকাকে তারা হলিউডের অনেক অধিক বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছে। তবু ইংলণ্ডের চিত্রব্যবসায় এখনও গঠনের মুখে। অতএব দেখা যাচ্ছে এদেশে ছোট থেকে বড় হবার এই প্রশস্ত সময়—পরে ছোট থেকে বড় হওয়া যাবে না। তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেতে হবে।

চিত্রব্যবসায়ের আলোচনা এখানে শেষ করলাম। বারান্তরে বাঙালীর চিত্রশিল্পের কথা বলা যাবে।

চিত্রপরিচয়

ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত যতগুলি ছবি মুক্তি লাভ করেছে এখানে তাদের শ্রেণী বিভাগ ক'রে দেওয়া হোল। আমাদের মতে (ক) শ্রেণীর ছবি অসাধারণ, (খ) সুন্দর, (গ) উপভোগ্য এবং (ঘ) শ্রেণীর ছবি সাধারণ। (ছ) চিহ্নিত ছবি ছেলেরাও দেখতে পারে।

(ক) শ্রেণীর ছবি :—

দি ডার্ক এনজেল্স্, আনা ক্যারেণিনা, সি ম্যারেড্ হার বস্, সিপ্মেট্স্ ফরেভার, মেট্রোপলিটান্ ও মিউটিনি অন্ দি বাউন্টি।

Jack Buchanan কে বিলাতের মরিশ শেভালিয়ে বলা যেতে পারে—নাচে, গানে, হাস্যরসাভিনয়ে বিশেষ পারদর্শী। জ্যাক্ হলিউডে বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি, Brewster's Millions তার হালের ছবি এবং The Man from Mayfair, Yes, Mr.Brown! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছবি। এখানে জ্যাক বুকানন্ ও Fay Wrayকে (একগাদা 'sories' ও thrillers এর নায়িকা) Come out of the Pantry ছবির একটি দৃশ্যে দেখতে পাচ্ছি।

(খ) শ্রেণীর ছবি :—

ক্রুজ্ (ছ), দি গাভ্নর (ছ), য়্যান্ অব্ গ্রীন্ গেব্ল্স্ (ছ) চায়না সীজ, বার্ব্বারি কোস্ট, থ্যাঙ্কস্ এ মিলিয়ন, দি টেষ্টামেণ্ট অব উক্টর মাবুসে, টপ হ্যাট, ইনভিটেশন টু দি ওয়ালজ ও হিয়ার ইজ টু রোমান্স।

(গ) শ্রেণীর ছবি :—

দি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স (ছ), দি লিট্‌ল্ বিগ সট (ছ) ব্রডওয়ে গণ্ডোলিয়ার, টু ফর টু-নাইট, দি গার্ল ফ্রেণ্ড, ইমি ওয়েদার, আই লিভ ফর লাভ, আই লিভ মাই লাইফ, ব্রড্‌ওয়ে মেলডি অব ১৯৩৬, দি বিগ ব্রড্‌কাস্ট অব ১৯৩৬, সাংহাই, স্পেশাল এজেন্ট, দি পাসিং অব দি থার্ড ফ্লোর ব্যাক্, ডক্টর সক্রেটিস, ওয়ে ডাউন ইষ্ট, দি লাষ্ট আউটপোষ্ট, দি কেস অব দি লাকি লেগস্, সিষ্টার্স আণ্ডার দি স্কিন, ফার্ষ্ট এ গার্ল, ভিয়েনিজ নাইটস, আণ্ডার দি প্যাম্পাস মুন ও আলিস আডাম্‌স্।

(ঘ) শ্রেণীর ছবি :—

ইষ্ট অব জাভা (ছ), দি লাষ্ট ডেজ অব পম্পিয়াই (ছ), লোর্ণা ডুন (ছ), লুক্ আপ এণ্ড লাফ (ছ), দি নিট্‌উইট্‌স্ (ছ), মিল্‌স্ অব দি গড্‌স্ (ছ) এয়ার হক্‌স (ছ), দি বিশপ মিসবিহেভ্‌স (ছ), রেডহেড্‌স অন্ প্যারেড, থাণ্ডার ইন্ দি নাইট, সেণ্ট লুই কিড, ড্রেস্‌ড টু থ্রিল, লেট আস লিভ টু-নাইট, সারেণ্ডার ও হাই গ্যাচো।

নিম্নলিখিত ছবিগুলি (ঘ) শ্রেণীরও নীচে :—ম্যানি লিভ দি রুম্ (ছ), জয়-রাইড (ছ), ভিন্টেজ ওয়াইন্ ও কুইন্ অব দি জাঙ্গল্।

তরুবালা—পায়োনীয়ার ফিল্মসের ষ্টুডিয়োয় তোলা রীতেন কোম্পানীর ছবি। রসরাজ অমৃতলালের যুগে যা humour ব'লে বিবেচিত হোত এখন তা অল্পবিস্তর vulgarity, এ কারণে সেকেলে gags হাসির না হয়ে বিরক্তির কারণ হয়েছে; এ-জন্যই 'বিরহ' বা 'খাসদখল' ভাল ছবি হয় নি। সংলাপের যেমন পরিবর্ত্তন সাধন করা উচিৎ ছিল তেমনি উচিৎ ছিল মূল নাটকের কয়েকটী চরিত্র বাদ দিয়ে চিত্রনাট্য লেখা কিন্তু এক্ষেত্রে ছবির ভিত্তি হয়েছে রসরাজের নাটকের abridged সংস্করণ; শেষের দিকে চিত্রনাট্য অত্যন্ত জটিল ও অসম্ভব দুর্ব্বল হয়েছে এবং সম্পাদকের কাঁচি নিষ্ক্রিয় থাকায় ছবির শেষাংশের দুর্ব্বিষহতা ঘোচে নি। প্রযোজক উক্ত সব দোষের জন্য নিন্দার পাত্র হলেও সুশীল মজুমদার মস্তিস্কের পরিচয় দিয়েছেন এবং একারণে আমরা তাঁর প্রশংসা করি। চিত্রগ্রহণ আদৌ সন্তোষজনক নয়; শব্দগ্রহণ চলনসই এবং সুরসংযোজনা মোটের ওপর ভাল। অভিনয় অধিকাংশ মঞ্চঘেঁষা। কেবল শৈলেন চৌধুরী ভাল অভিনয় করেছেন; তাঁর পরে যথাক্রমে কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, শ্রীমতী প্রভা ও জ্যোৎস্নার অভিনয় চলনসই বলা যায়। অহীন্দ্র চৌধুরী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত নট-নটী এই ছবিতে নেমেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করতে পারেননি। ছবিটীর সব চেয়ে বড় কলঙ্ক হচ্ছে পারুলের ভূমিকায় বীণার অভিনয়।

প্রফুল্ল—কালী ফিল্মসের ছবি। এই ছবির ভিত্তি ৺গিরিশচন্দ্রের মূল নাটক এবং মহাকবির নাটকের dramatic elements তেমন exploited না হলেও sobstuffএর সম্পূর্ণ advantage নেওয়া হয়েছে। ছবিটী কতকটা মঞ্চাভিনয়েরই চিত্ররূপ এবং ছবির গতি অত্যন্ত ও অযথা মন্থর। প্রযোজনীয় কৃতিত্বের পরিচয় নেই, তেমনি নেই সুরসংযোজনায়। শব্দগ্রহণ ভাল ও চিত্র গ্রহণ চলনসই। এই ছবিতেও অনেক নামজাদা নট-নটী অভিনয় করেছেন। জীবন গাঙ্গুলী ও অহীন্দ্র চৌধুরী ভাল অভিনয় করেছেন। শ্রীমতী প্রভা, নরেশ মিত্র ও শৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ও ভাল হয়েছে। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও নগেন্দ্রবালার অভিনয়ে অল্পবিস্তর মঞ্চের প্রভাব এসে পড়েছে এবং তাঁদের অভিনয়কে চলনসই বলা যায়। নাম ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালার অভিনয় কোনও রকমে চলনসই হয়েছে। অপরাপর অনুল্লেখযোগ্য।

কণ্ঠহার—রাধা ফিল্মসের ছবি। প্রযোজক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ঢাক ঢোল পিটে অসাধারণ প্রচারকার্য্যের সহায়তা পেয়েও আসল কাজে আবার পূর্ব্ববৎ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। Serial ছবির মত মোটর-বাইক, মোটর, ট্রেণ, এরোপ্লেন মোটর-বোট (এবং what not ?) দিয়ে প্রযোজক যত পেরেছেন thrills, stunts, sensational adventures চালিয়েছেন কিন্তু সে সবই হয়েছে scoffable failures। চিত্রনাট্যের মাথামুণ্ড নেই; সংলাপ দুর্ব্বল, গতি মন্থর ও পারম্পর্য্য অসমঞ্জস। চিত্রগ্রহণ ভাল,

শব্দগ্রহণ ও সুর-সংযোজনা অচল। অভিনয় হয় মঞ্চোপ-যোগী, নয় অচল। সুতরাং 'কণ্ঠহার' নিয়ে নাড়াচাড়া করবার লোভ এখানেই ত্যাগ করতে হোল।

হরিশ্চন্দ্র—পায়োনীয়ার ষ্টুডিয়োর তোলা শ্রীযুক্ত হরিপ্রিয় পালের ছবি। প্রযোজক প্রফুল্ল ঘোষ রসরাজ অমৃত লালের নাটককে চিত্ররূপ দিয়েছেন; সংলাপ অনেক স্থলে অযথা দীর্ঘ এবং চিত্রনাট্য ছায়াছবির পক্ষে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত নয়। কয়েকটী প্যাচ হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে। চিত্রগ্রহণ ভাল এবং শব্দগ্রহণ প্রথম শ্রেণীর। সুরসংযোজনা মন্দ নয়; ছবির গতি মাঝে মাঝে অসমঞ্জসরকম ধীর। অভিনয়ে শ্রীমতী শান্তি আমাদের আশান্বিত করেছেন, অপরাপর অভিনয় মোটের ওপর চলনসই নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ ভাস্বর দেবের সম্বন্ধে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে তাঁর আকার প্রকার ও কণ্ঠস্বর কমিক ছবির পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত; তিনি অতঃপর হাস্যরসের ভূমিকায় নামলেই আমরা সুখী হবো। ভাস্বর দেব এক্ষেত্রে ভাল অভিনয় করবার যথেষ্ঠ চেষ্টা করেছেন কিন্তু গলদ যে গোড়ায়।

খাসদখল—রসরাজের নাটিকা অবলম্বনে স্টারে পিকচার্সের ছবি। অভিনয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ ভিন্ন ছবিটীর সব বিভাগেরই কাজ অচল।

স্বয়ম্বরা—এভারগ্রীণ পিকচার্সের ছবি। 'স্বয়ম্বরা' সম্বন্ধে অভিমত এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে এঁরা কোন বিখ্যাত সাহিত্যসেবীর স্বর্গত আত্মাকে পীড়ন করবার চেষ্টা করেননি। গল্প অস্বাভাবিকতায় পূর্ণ হলেও কিছু হাসির খোরাক আছে।

মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ অবধি যতগুলি ছবি মুক্তিলাভ করেছে এখানে তাদের শ্রেণী বিভাগ ক'রে দেওয়া হ'ল।

(ক) শ্রেণীর ছবি:—এ টেল্ অব টু সিটিজ্ (ছ)।

(খ) শ্রেণীর ছবি:—ল্যাডি (ছ) ও রেণ্ডেভো।

(গ) শ্রেণীর ছবি:—দি ট্যানেল্ (ছ), দি গে ডিসেপ্সন্, হাণ্ডস্ এ্যাক্রস্ দি টেব্ল্, কার অব্ ড্রিম্স্, আই ড্রিম্ টু মাচ্ ও দি লাষ্ট জার্নি।

(ঘ) শ্রেণীর ছবি:—দি ম্যান্ হু ব্রোক দি ব্যাঙ্ক এট্ মন্টি কার্লো, সো রেড দি রোজ (ছ), দি ব্লাক রুম, ম্যারি দি গার্ল, হনিমুন্ ফর থ্রি, মিউজিক্ ইজ্ ম্যাজিক্ ও ম্যাড্ লাভ্।

ইট হ্যাপন্ড ইন স্পেন ছবিটি (ঘ) শ্রেণীরও নীচে।

কৃষ্ণ-সুদামা—রাধা ফিল্মসের বাংলা ছবি। বাংলা দেশের ছবিতে পতিতালয়ের অভ্যস্থতা, করুণ রস এবং শেষতঃ ভক্তিরস exploit করতে পারলেই ছবি ভাল চলে এবং 'কৃষ্ণ-সুদামায়' ভক্তিরস exploit করা হয়েছে। চিত্রনাট্য, শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ চলনসই। প্রযোজক ব'লে যে ছবির পিছনে একজন আছেন ছবি দেখে তা মনে হয় না; ছবির প্রযোজক না থাকলেই ছবির এমন দুরবস্থা হয় জানি। অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী উৎরে গেছেন এবং শ্রীমতী পূর্ণিমাকে আমাদের ভাল লেগেছে। কাননবালার হাসি মিষ্ট, গান ভাল; রাধারাণীর অভিনয় এক রকম মন্দ নয়, গান ভাল; কিন্তু এদের দুজনের অভিনয় monotonous ও intonation sickening হয়ে পড়েছে। ধীরাজ ভট্টাচার্য্য কেবল স্ত্রীলোকের মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে 'পোজ' দিয়েছেন, রঙ্গমঞ্চে থেকে তিনি বাচনটা ভাল করে শিখে নিন। অপরাপর অভিনয়ের কথা না বলাই ভাল। চিত্রশিল্পী বীরেন দের trick shots বড় clumsy। সুর সংযোজনা একঘেয়ে boring। ঝিনঝিনিয়ার জের' রাধা ফিল্মস তুললেন এবং দেখাবার ব্যবস্থা করলেন কেন বুঝে পাই না!

একটী কথা—শ্রীভারতলক্ষ্মীর বাংলা ছবি। কোন দিক দিয়েই ছবিটী উল্লেখযোগ্য নয়। গল্পলেখক, গীতিকার, প্রযোজক ও অন্যতম মুখ্য অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী 'ভাগ্য-চক্রে'র টেলিফোন বিপর্য্যয় অবলম্বনে গল্প ফেঁদেছেন কি? Comical touch একটু আধটু আছে, গ্রামের দৃশ্যসম্পদ মনোহর এবং শ্রীমতী কমলার (ঝরিয়া) কয়েকটী গান সুখশ্রাব্য।

কুমারী বাণী ঘোষ

উত্তর কলিকাতার সুপরিচিত কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা সুপ্রসিদ্ধা বালিকা সাঁতারু কুমারী বাণী ঘোষ এ বৎসর ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক্ এসো-

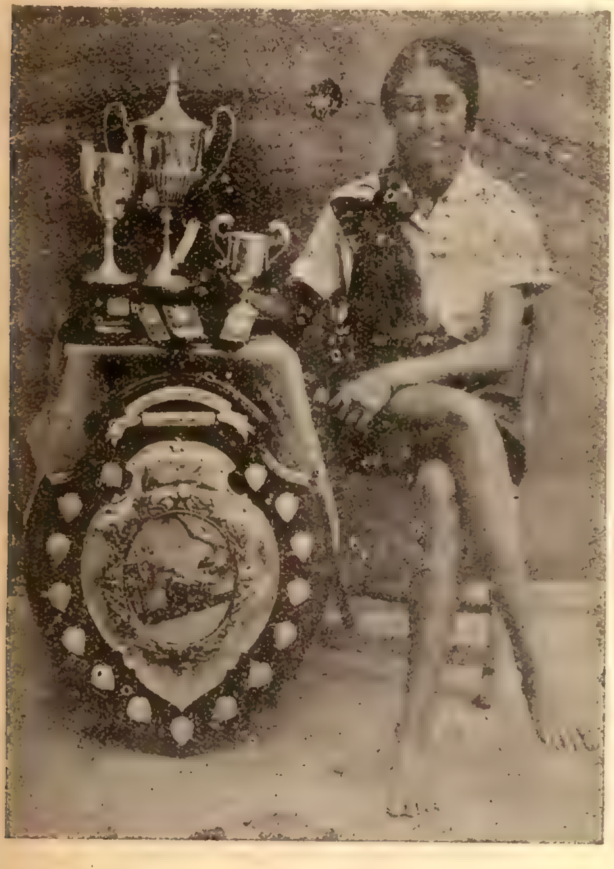

কুমারী বাণী ঘোষ

সিয়েশন্ হতে লেডিস্ চ্যাম্পিয়ানশিপ অধিকার করে জার্ম্মানীর বার্লিন নগরে আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় নিখিল ভারত মহিলা সমাজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছেন, এ সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন। এই সম্পর্কে এ-কথা শুনে সকলেই বিস্মিত অবং আনন্দিত হবেন যে উক্ত প্রতিযোগিতায় একমাত্র বাণী ভিন্ন বাংলাদেশের অন্য কোন প্রতিযোগী, পুরুষ কিংবা মহিলা, তিনটি বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করতে সমর্থ হন নাই। শুধু সন্তরণেই নয়, লাঠি ছোরা তরবারি প্রভৃতি খেলাতেও বাণী অসাধারণ পারদর্শিতা অধিকার করেছেন।

আমাদের শক্তিহীনা বাংলা মায়ের এই নিরতিশয় শক্তিসম্পন্না মেয়েটিকে দেখে মনের মধ্যে অনেক আশা ভরসার উদয় হয়। মনে হয়, ভবিষ্যতে যেদিন বাংলাদেশের পথেঘাটে সদাসর্ব্বদা এমন সব মেয়ে দেখা যাবে, আজ যে-সকল দুর্ব্বৃত্তের জন্যে পথঘাট কোন সময়ই নিরাপদ নয়, সেদিন সে সকল দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার হতে পথঘাট সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারবে। শক্তিসাধনায় এই আদর্শরূপিণী বালিকাটিকে গঠিত করবার জন্যে পিতা দেবেশচন্দ্র বাংলাদেশের নিকট সত্যই ধন্যবাদার্হ। আগামী বর্ষে কোন সময়ে কুমারী বাণী সাঁতার দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হবেন, সেজন্য দেবেশচন্দ্র তাঁর কন্যাকে এখন থেকে প্রস্তুত করছেন।

কুমারী বাণীর প্রতিভা বহুমুখী। শুধু ব্যায়ামই নয়, স্কুলের পাঠে এবং সঙ্গীত ও শিল্পকার্য্যে তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মেয়েটির কল্যাণ কামনা করি।

বিঃ সঃ

প্রাইমারী স্কুল

শ্রীসুরবালা গুপ্ত

আমি নিজে পল্লী অঞ্চলের কোন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী নই, কিন্তু নারী শিক্ষা সমিতির অনুগ্রহে সমিতির গ্রামস্থ অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি। এই কার্য্যে আমাকে মাসের অধিকাংশ সময় গ্রামে থাকিতে হয়। সেখানে গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীতে বসবাস করিতে হয়, তথায় হাটে যে তরি-তরকারী পাওয়া যায় তাহা খাইয়াই বাঁচিতে হয়। বৃদ্ধা ও মেয়েদের মায়েদের সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার কথা এবং মেয়েদের সুখ দুঃখের কথা, আপদ বিপদ আশা ভরসা সব বিষয়ে আলোচনা করিতে হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহে যখন কলিকাতায় শিক্ষা-সপ্তাহের অনুষ্ঠান হয় তখন মনে হইয়াছিল সব রকমের শিক্ষার ভিত্তিস্থান প্রাইমারী স্কুলের উপর সকলের নজর পড়িবে। আরো মনে হইয়াছিল মায়ের জাতকে শিশুপালনে লাগাইতে হইলে মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার কথার আলোচনা হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় শিক্ষা সপ্তাহের বক্তৃতা ইত্যাদি ইংরাজিতে হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে যাহা দেখান হইয়াছিল তাহার নাম ধাম সাজ গোজ ইংরাজি ধরণে হইয়াছিল। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্য ও পরিমাণ, শিক্ষাদান প্রণালী, অভাব অভিযোগ, সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে আমরা তাহা শুনিবার ও বুঝিবার তেমন সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

যাঁহারা শিক্ষা লইয়া অত মাথা ঘামাইয়াছেন, তাঁহারা প্রাইমারী স্কুলের কথা নিশ্চয় ভাবিয়াছেন; কিন্তু প্রাইমারী স্কুল লইয়া যে-সব শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী জীবন কাটান তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা সপ্তাহের কার্য্য বিবরণীর সারাংশ জানাইবার কি ব্যবস্থা হইয়াছিল জানিনা। রবিবাবু তাঁহার শিক্ষার সাঙ্গীকরণ প্রবন্ধে যে দোতালা বাড়ীর উপমা দিয়াছেন তাহারই বার বার মনে হইতেছে। আমরা ইংরাজিনবিশ নই। আমাদের কোন মূল্যই নাই। দুই তালার মধ্যে সিঁড়ি নাই, কাজেই আমরা যে অন্ধকারে আছি সেখানেই থাকিয়া গেলাম। সহরে আমরা অতি নগণ্য, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নাই। তবুও আমরা মনে করি এই বাঙলা দেশের শিক্ষায়তনের মধ্যে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আমাদের একটা স্থান আছে। সে স্থান গৌরবের। বিশেষতঃ শিক্ষাদান কার্য্য যে সব মেয়েরা পেটের দায়ে সম্মানজনক কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মাথা উঁচু করিয়া কথা বলিবার কিছু আছে। জানি বঙ্গদেশের আঠার হাজার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আট হাজার শিক্ষয়িত্রীও নাই। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের মধ্যে এক হাজারও জুনিয়ার ট্রেনিং পাশ শিক্ষয়িত্রী নাই। অতি অল্প বেতনে অধিকাংশ স্থলে লাউটা কুমড়াটা বেগুনটা চারাটা চাল বা শাক সবজী নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে লইতে হয়। নিজের হাতে ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চাল করিতে হয়। এই সব করিয়া যথা-সময়ে স্কুলে গিয়া ৪।৫ ঘণ্টা মেয়েদের সঙ্গে পড়া, লেখা, আঁকা কথা সেলাই করা লইয়া যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে হয়।

আজ সহরে স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচার দেখিয়া পল্লীর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি ভুলিলে চলিবে না। যাঁহারা কলেজে ও হাইস্কুলে পড়িয়াছেন বা পড়িতেছেন তাঁহারা আশা করি গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয়ের কথা ভুলিয়া যাইবেন না। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শুনিলাম প্রাইমারী স্কুলসমূহের পাঠ্যের বিষয় পরিমাণ ইত্যাদি গিয়া বিচার করিবার জন্য একটী কমিটি শীঘ্র নিয়োগ করিবেন। আশা করি কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে মেয়েরা অধিকাংশ গ্রামে বাস করেন মনে রাখিয়া তিনি পল্লী অঞ্চলের শিক্ষার রূপ, বিষয় ইত্যাদির উপর জোর দিতে ভুলিবেন না।

এখন প্রাইমারী শিক্ষা দ্বারা কি কাজ—খাঁটি কাজ, বক্তৃতা না, এ যাবত হইয়াছে—একবার দেখিলে মন্দ হয় না। সকলেই জানেন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী মানে একেবারে নিরক্ষর ছেলে মেয়ে, যাহারা কাপড় পরিতে ভাল করিয়া জানে না, কোঁচরে চারটী মুড়ি লইয়া পাঠশালায় বা স্কুলে যায়, অতি সামান্য কারণে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে। গুরু-মহাশয় শাসন করিলে স্কুল হইতে পলাইয়া যায়, বা ৫।৭ দিন আসে না। বাড়ীতে বাপ মা দিদিমা ঠাকুরমা কিছু বলিলে না খাইয়া অনেকক্ষণ থাকে অথবা কোথায়ও চলিয়া যায়। আবার ক্ষিদা পাইলে গাছের ফল পাড়িয়া বা চুরি করিয়া খাইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে মা ঠাকুরমাদের অশেষ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় দিন কাটাইতে হয়। বাপ খুড়ারা যথা-সময়ে খাইয়া বা না খাইয়া মাঠে বা চাকুরীতে যায়। মা বোন দিদিমা ঠাকুরমাদেরই যত রাজ্যের জালা যন্ত্রণা ভুগিতে হয়। এই যে অসংযত বেপরোয়া ক্ষণিক রাগ অভিমানের দাস ছেলে মেয়েরা, কাহাদের দিনের পর দিনের তপস্যার ফলে ঘর কন্নার কাজে মায়েদের সাহায্য করিতে ও উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের হুকুম মানিয়া চলিতে শিখে; শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকমণ্ডলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সব ইনস্পেক্টর ও পণ্ডিত মহাশয়গণ প্রাইমারী স্কুল দেখিয়া যখন ছাত্র ছাত্রীদের শান্তশিষ্ট ব্যবহারে পাঠ ও অঙ্ক কষা দেখিয়া আবৃত্তি ও ছড়া আওড়ান শুনিয়া সন্তুষ্ট হয়েন, দেশের লোক বিশেষতঃ শিক্ষার কাজ যাহারা নিয়ন্ত্রন করেন, তাঁহারা কি মনে করেন এই দরিদ্র, একমুঠা ভাত খাইয়া সন্তুষ্ট, সামান্য কাপড় চোপড় পরা শিক্ষক শিক্ষায়িত্রীদের আন্তরিক চেষ্টা ও তপস্যার ফলেই খামখেয়ালির দাস নিরক্ষরপ্রায় নগ্ন ছেলে মেয়েরাই আজ প্রাইমারী স্কুলের সম্মান রক্ষা করিয়াছে? ইহারাই না পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সভ্য ভব্য হইয়া বইয়ের বোঝা লইয়া প্রাইমারী স্কুলের ৩য় ৪র্থ শ্রেণীতে এবং উচ্চশ্রেণীগুলির (secondary বিশেষতঃ মধ্য শ্রেণীর স্কুল) ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা জুটাইতেছে। হাই স্কুল বা ইউনিভারসিটির কথা আমরা নাই বা তুলিলাম। যাঁহারা সহরে বাস করেন তাঁহারা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী তাঁহাদের তপস্যার কোন খোঁজ রাখেন না বা রাখিবার সুযোগ পান না। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষার সমস্ত অঙ্গ ভাবিয়া দেখেন তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান এই প্রকাণ্ড শিক্ষায়তনের ভিত্তি কাঁহারা স্থাপন করেন বা করিয়াছেন। এই ভিত্তিমূলে আছেন অতি অল্প-শিক্ষিত গ্রাসাচ্ছাদনকারী সামান্য কাপড় জামা পরিহিত তথাকথিত নগণ্য পাড়া গাঁয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী। আমি আশা করি আমার কাতর ক্রন্দন অরণ্যে রোদন হইবে না।

শ্রীসুরবালা গুপ্ত

নারী শিক্ষা সমিতি

হেমন্ত

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শরতের সাজি ছিল যবে ধরণীতে
বরণীয় এলে আপনার তরণীতে,
শেফালি ফুলের সিক্ত আঁচলখানি
পরশ করিতে পলায়ে গেল সে কোথা
লুকাল সরমে শেফালিকা সচকিতা।
লুব্ধ চিত্ত ক্ষুব্ধ হ'ল গো বুঝি,
পেলেনা তাহারে যাহারে ফিরিল খুঁজি,
শরতের সাথী তোমারে দিলনা ধরা ;
পুঞ্জিত প্রেম নাহি হ'ল নিবেদন।
আকাশে বাতাসে স্পন্দিল সে বেদন।
মল্লিকা মালা রহিল যে হার গাঁথা,
মর্ম্মরি ওঠে কত না অগীত গাথা,
উত্তর বায়ু শিহরিয়া গেল ধরা
তোমারে বাঁধিয়া নিল সে সকৌতুকে
ধরণী নীরব ক্রন্দন ভরা বুকে।
কুসুমের ঘ্রাণে অঘ্রাণ গেল চলি'
ঘন কুয়াশায় গোপন চরণ ফেলি',
শিশির-সিক্ত আজিকে বসুন্ধরা
বসুন্ধরার বুঝি বা সে আঁখিজল,
শীতল প্রভাত স্তব্ধ অচঞ্চল।

জন্মতিথি

শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গান

[C. G. Rossettir 'A Birth-day' কবিতার অনুবাদ]

আমার হিয়া যেন গানের পাখী
জলের রেখা-আঁকা তরুণ শাখী,
আমার হিয়া-তরু আপেল ঢাকা
ঘন ফলের ভারে দোলে নমিত শাখা।
আমার হিয়া মরি ইন্দ্র ধনু !
খেলে ডুবায়ে তনু স্থির জলধি-নীরে,
আমার হিয়া খুসী সবারো চেয়ে
আমার প্রিয়া আজি এসেছে ফিরে।

রচো রেশমে বেদী রচো কাপাসে টানা,
দিও ঝুলায়ে তাহে রঙে পশমে আঁকি,
এঁকো পায়রা ছানা, এঁকো ডালিম দানা,
এঁকো ময়ূর শত-আঁখি-ভুলানো পাখী ;
এঁকো রজত রঙে এঁকো সোনালী ঢঙে
আঙুর-গোছা ফুলে পাতায় ঘিরে,
হের জনম-তিথি আজি আগত মম—
দয়িতা আজি মম এসেছে ফিরে।

ভারতীয় পুরাণ-মহাকোষ *

মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন এম-এ

বাংলার মন্ জমীন উর্ব্বর, এখন তাহাতে শ্রমসহকারে আবাদ চলিতেছে এবং সোনা ফলিতেছে। পতিত জমীনে বহু আগাছা জন্মিয়া ছিল দেখিয়া অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন। বাংলার মনন শক্তির অভাব চিরন্তন, এই ধারণা তাঁহাদের মনে বদ্ধ ভাবে জন্মিয়াছিল। তবে একথা ঠিক বিশ্বকোষ ব্যতিরেকে প্রভূত পরিশ্রম এবং অপরিসীম অধ্যবসায় উদ্ভূত কোন বৃহৎ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সূচনা করে নাই। অন্যপক্ষে আবার ইহা সত্য যে বৃক্ষ যখন ফলবান হয় তাহার পূর্ব্ব হইতেই রস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে, একদিনে হঠাৎ ফল প্রসব করে না। বর্ত্তমানে যে কয়েকখানি গুরু শ্রমসাপেক্ষ দূরবিস্তৃত কর্ম্মিষ্ঠতাপ্রসূত গ্রন্থ আমাদের আনন্দের হেতু হইয়াছে তাহাদের আরম্ভ বর্ত্তমান যুগের বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে পণ্ডিত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার প্রণীত জীবনকোষ গ্রন্থখানা আমাদের আলোচ্য।

এই স্থানে আমি একটী অবান্তর কথার অবতারণা করিতে চাই। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর আরবের মুসলমানেরা যে শুধু রাজ্যজয় এবং রাজ্যবিস্তারে জাতীয় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ও ব্যয়িত করিয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু উত্তরকালের ঐশ্বর্য্যবান সার্থক এবং জীবন্ত সংস্কৃতির বনিয়াদের জন্য তাঁহাদের মধ্যে একদল অসহনীয় কষ্ট অদম্য সাহস ও সীমাহীন ধৈর্য্য এবং শাণিতক্ষুরধার মেধা একান্তভাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের আরব দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত নিরন্তরভাবে চল্লিশ বৎসর সংগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া হজরত ইমাম বোখারী সাহেব 'বোখারী শরীফ' নামক মুহম্মদ কথামৃত সংগ্রহ করিয়াছেন। ইবনে খাল্লিকানের জীবনীকোষ বা ইবনে খালদুনের সভ্যতার ইতিহাস বা আবুল কাবাজ ইস্পাহানীর কিতাবুল আথানীর বা সঙ্গীত কোষ প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও সেই ভাবধারার সাক্ষাৎ পাইয়া জাতীয় জীবনধারার শক্তির সাক্ষ্য পাইয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কেহ যে একজীবনে ধৈর্য্য ধরিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন বিরল, রচনা করা ত দূরের কথা। কী অসাধারণ মনের বল, অফুরন্ত কর্ম্মোৎসাহ এবং অবিচলিত একাগ্রতা থাকিলে এতাদৃশ দুরূহ, নীরস এবং exacting ব্রত উদ্‌যাপন করা যায় তাহা ভাবিতেই হৃদকম্প উপস্থিত হয়। এক ব্যক্তির একার পরিশ্রমে রয়াল আট পেজী ছোট পাইকা হরফে দুই হাজার পৃষ্ঠার জীবন-কোষ রচনা করা আর হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করা একই প্রকার অসম্ভব কার্য্য। কিন্তু বিপত্নীক বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করিয়াছেন, এবং তাঁহার কার্য্য দ্বারা আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে বাঙ্গালীর কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, 'এবং সুন্দর চমৎকার যথার্থভাবে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার।'

ভারতবর্ষ Mythologyর মহাদেশ। দেব দেবী ঋষি প্রভৃতির সংখ্যা অসংখ্য এবং ইহার উপাদান বহুবিস্তৃত। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্র পর্য্যন্ত এক মহারাজ্য পড়িয়া রহিয়াছে। চুনাপুঁটী হইতে তিমি মৎস্য এই রাজ্যে অবাধে বিচরণ করিতেছে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের জাল দিয়া এবং অধ্যবসায়ের দণ্ড দিয়া সকলগুলিকেই তাঁহার রাম্-খালুইতে ভরিয়াছেন। এই জীবন-কোষে কাহারও নাম পরিত্যক্ত হয় নাই এবং যতগুলি source পাওয়া সম্ভব তাহার কিছু অবহেলা করা হয় নাই।

বিগত এক যুগ অবধি আমি বিভিন্ন দেশের এই Mythology এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছি। যতদূর মনে পড়িতেছে এই গ্রন্থের ন্যায় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ আমার হাতে আসে নাই। কোন কোন ইয়োরোপবাসী বৈদিক দেব দেবতার সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, রামায়ণ মহাভারতেরও সম্বন্ধে বই পাওয়া যায় কিন্তু সবগুলি মিলাইয়া সুবিন্যস্ত করিয়া বিস্তৃত করিয়া কেহই রচনা করেন নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ায় আমি ব্যক্তিগত ভাবে মহা উপকৃত হইয়াছি। বাংলা দেশের এবং ভাষার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ আছে এবং স্বজাতীয় গৌরব-বোধ যাঁহাদের আছে তাঁহারা গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিবেন।

আল্লাতায়ালার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি তিনি বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের আয়ু বর্দ্ধিত করুন।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন

*শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার প্রণীত জীবনী-কোষ (ভারতীয়-পৌরাণিক) ২২ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা। ২১এ।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

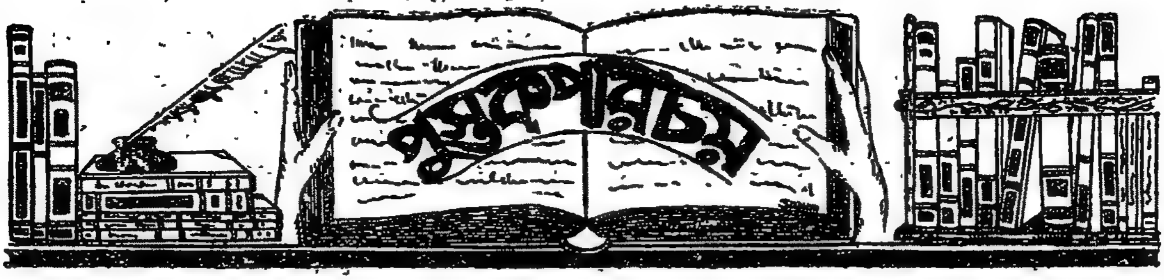

সঙ্গীত মঞ্জরী (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ৭৭৩ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ টাকা।

এই সঙ্গীত গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ স্বনামধন্য সঙ্গীতাচার্য্য ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থকার মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষে শেষ হয়ে যাওয়ায় স্বর্গীয় গ্রন্থকারের অনুজ দেশবিখ্যাত সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানিকে সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত করে বহু অর্থব্যয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানির আদ্যন্ত উত্তমরূপে পরীক্ষা করে আমার ধারণা হয়েছে যে এমন একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থের প্রকাশ সঙ্গীত-জগতের পক্ষে শুভ ঘটনা এবং তজ্জন্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা দেশের সমস্ত সঙ্গীত-রসিক সমাজের ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থের ভূমিকায় বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয় লিখিয়াছেন —"সঙ্গীত মঞ্জরীর যথার্থ নাম হওয়া উচিত ছিল গীতরত্নাকর। কারণ এ গ্রন্থে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌পা, ও ঠুংরি, এই চারি শ্রেণীর এত সুন্দর ও চমৎকার গীত সংগৃহীত হয়েছে যে, সেগুলিকে রত্ন বলা অত্যুক্তি নয়।" গ্রন্থখানি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের এ মন্তব্য যে সম্পূর্ণভাবে সমীচীন হয়েছে সে কথা আমি নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি।

গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে সপ্তস্বর, শ্রুতি, মূর্চ্ছনা, গ্রাম, বাদী বিবাদী, গ্রহস্বর ও ন্যাসস্বর, রাগের প্রকার ও জাতি, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, ধ্রুপদ খ্যাল টপ্‌পার লক্ষণ, মাত্রা লয় তাল, তাল সমূহের ঠেকা, তাম্বুরা মিলন, হিন্দি উচ্চারণ, স্বরলিপি সঙ্কেত, স্বরসাধন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা। ইহার পরে আছে ৩৪টি বিভিন্ন রাগরাগিণীর সরগম্। তৎপরে ধ্রুপদ, খ্যাল আলাপ, তিলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ ঠুংরী, ঝুলন, হোরী, ভজন, গজল, বাঙলা গান প্রভৃতি বিষয়ে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি অনুসারে বহুসংখ্যক স্বরলিপি। তৎপরে পরিশিষ্ট ভাগে আছে বাদী সংবাদী সম্বন্ধে বিচার এবং রাগরাগিণীর সময় জাতি ঠাট ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রন্থখানি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক, ওস্তাদ এবং শিষ্য সকলেরই পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বইখানি পুরু মূল্যবান কাগজে মুদ্রিত, স্বরলিপির অক্ষর নির্ব্বাচনও সুন্দর।

বাঙলা দেশে উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতের সমাদর ও সাধনা প্রবল বেগে ফিরে এসেছে। সুতরাং এ গ্রন্থের যে বহুল প্রচার হবে তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একাঙ্কিকা—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্ প্রণীত; কলিকাতা ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, এম, সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ হইতে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মেদিনীপুর মাধবী প্রেস হইতে শ্রীনলিনীনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা।

'একযাত্রায় পৃথক ফল,' 'একাঙ্কিকা', ও 'হীরেনের রোমান্স' এই তিনখানি হাসির নাটিকা এই বইখানিতে সন্নিবদ্ধ হয়েছে। এই তিনটি নাটিকাই "বিচিত্রায় প্রকাশিত

হয়েছিল, সুতরাং বিচিত্রায় পাঠকের নিকট এগুলি অপরিচিত নয়।

হাস্য এবং কৌতুক রসের অবতারণায় শ্রীযুক্ত সুধাংশু-কুমার হালদার যে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, এ বই-খানির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তার প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ 'একযাত্রায় পৃথক ফল' ও 'একাঙ্কিকা'—এই দুখানি নাটিকায়।

হাস্যরসের অবতারণা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়, কত সামান্য ত্রুটিতে রসিকতা যে ষোল আনাই নষ্ট হ'য়ে যায় সে দুঃখের কথা রসিক ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। হাসির কথা শুনে মুখে যদি হাসি না আসে, তারবাড়া দুর্ভাগ্য লেখকেরও নেই পাঠকেরও নেই। সুধাংশুকুমারের হাস্যরসাত্মক রচনাগুলি পড়তে পড়তে কিন্তু আমাদের মন কৌতুকের একটানা স্রোতে ভেসে চলে—কোথাও একটু বাধেনা। 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' নাটিকায় বেচারা হরি সিং শিখ 'ইলেক্-ট্রিসিটি' শব্দের উচ্চারণ করেছিল 'আলকাট্রি'। এই উচ্চারণ-প্রমাদে পুলকিত হ'য়ে হেসে গড়িয়ে প'ড়ে বাড়ির বিরদা ঝি বলেছিল, "ওমা, আলকাট্রি কি রে মুখপোড়া শিখ, এলেক্‌টিরি জানিস না। কি মুখ্‌খুরে তুই।" এইটুকুর মধ্যে কৌতুক-রসিক ব্যক্তির পক্ষে অফুরন্ত কৌতুকের ভাণ্ডার আছে। সুধাংশুকুমারের রচনা সর্ব্বত্র এইরূপ কৌতুক-কণিকায় উজ্জ্বল।

যে রচনা দুঃখ-দুশ্চিন্তা-অবসাদগ্রস্ত মনকে পুলকিত ক'রে ক্ষণকালের জন্যও চাঙ্গা করে তুলতে পারে তার মূল্য কম নয়। 'একাঙ্কিকা' বইখানি সে হিসাবে মূল্যবান। বাঙলার রসিক পাঠকসমাজে এ বইখানি বিশেষ ভাবে আদৃত হবে তা নিঃসন্দেহ।

যক্ষ্মা-চিকিৎসা— শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকালয়, রাঁচি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

যক্ষ্মা রোগ বাঙলা দেশে এবং ভারতবর্ষে ক্রমশঃ যেরূপ বিস্তার লাভ করছে তা অবগত হ'লে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ভারতবর্ষে প্রায় এককোটী ব্যক্তি এই কালান্তক ব্যাধির কবলে রয়েছে। বর্ত্তমান পুস্তকের লেখকও এক সময় এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, পরে সুদীর্ঘ বার বৎসর নানাপ্রকার চিকিৎসা প্রণালীর অধীন থেকে অবশেষে রোগ-মুক্ত হন। তাঁর এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার কাহিনী এই পুস্তকে বিবৃত হয়েছে। বইখানি পাঠ করলে পাঠক হাঁস-পাতাল, স্যানাটোরিয়ম, এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী এবং সাধু সন্ন্যাসী ফকিরদের চিকিৎসার অনেক কথা জানতে পারবেন।

যে সকল ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে এই কাল ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা, এবং যে সকল সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থ এই রোগকে সর্ব্বদা দূরে রাখতে চান তাঁরা এই পুস্তক পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এই রোগের বীজাণু যাতে সুস্থ দেহে প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তেমন বহু ইঙ্গিত এবং উপদেশ এই পুস্তকে আছে।

প্রথমতঃ উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। তদ্ভিন্ন, লেখক ভুক্তভোগীর সমবেদনাবশতঃ দুস্থ রোগীদের জন্য একটি যক্ষ্মাবাস স্থাপন করবার উদ্দেশে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এই গ্রন্থের বহুল বিক্রয় হ'লে তাঁর উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের কিঞ্চিৎ সুবিধা হবে। আমরা আশা করি, যে-বাঙলা দেশে দশ লক্ষ যক্ষ্মারোগী বর্ত্তমান, তার অধিবাসীরা আর কিছুর জন্য না হ'লেও হতভাগ্য যক্ষ্মা রোগীদের প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে এ পুস্তক ক্রয় করবেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিবাহ-কল্যাণ—দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্র-বর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা ২৬ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, সাহিত্যভবন প্রেসে মুদ্রিত এবং শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বঙ্গ্ বঙ্গ্ চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন হ'তে প্রকাশিত। মূল্য উৎকৃষ্ট সংস্করণ ছয় আনা, সাধারণ সংস্করণ চার আনা।

এই পুস্তিকাখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে বোঝা যাচ্ছে পুস্তকটি জনপ্রিয় হয়েছে। পুস্তকটি বিবাহ-পদ্ধতির আলো-চনা অথবা বিবৃতি নয়, নরনারীর জীবনে বিবাহ যে একসঙ্গের কাব্য (romance) এবং দায়িত্ব, ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ হতে আহৃত এবং শ্রেণীবিভক্ত কয়েকটি বিবাহের মন্ত্রের দ্বারা সেটি সুপরিস্ফুট করা হয়েছে। মূলের সহিত মন্ত্রগুলি সরল বাঙলা ভাষায় অনূদিত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যও হয়েছে।

বিবাহকালে এ পুস্তকখানি বর ও বধূর হস্তে উপহার দেওয়ার উপযুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয় বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাত্র-পাত্রীর হস্তে এ পুস্তক পড়লে আরও ভাল হয়—বিবাহ অনুষ্ঠানের কল্যাণ-মূর্ত্তিটি তাদের চোখে পড়ে। সাধারণের পক্ষেও পুস্তিকাটি উপভোগ্য।

এর উৎকৃষ্ট সংস্করণটি আর্ট পেপারে ছাপা এবং সুদৃশ্য রেশমী ফিতায় বাঁধা, সুতরাং উপহারের বিশেষ উপযোগী।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ামুক্তি। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২৭নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

সুখপাঠ্য উপন্যাস। গ্রন্থকারের ক্ষমতা আছে। চর্চ্চা করলে সে ক্ষমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হবে, আশা করা যায়।

যমুনা-বিলাস (মূল্য ছয় আনা) **নদীয়া-বিলাস** (মূল্য আট আনা) শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর সেন শাস্ত্রী প্রণীত। আঁখর সমেত পালাকীর্ত্তন গ্রন্থকারে রচিত। যাঁরা কীর্ত্তন গান করেন, তাঁদের উপকারে লাগতে পারে।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার ধর্ম্মমত। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকার নিবেদন বলেছেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক নিম্বার্কাচার্য্যই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের অন্যতম মূল, এবং তাঁহার মতবাদই সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; এমন কি বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দুদের নিত্য-অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের বহুলাংশ নিম্বার্কপ্রবর্ত্তিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সাময়িক উল্লেখ ব্যতীত নিম্বার্ক সম্বন্ধে বঙ্গসাহিত্যে কোন গ্রন্থ নাই, কাজেই বাঙ্গালী হিন্দুরাও নিম্বার্ক সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যের একটা অভাব দূর ক'রেছেন। আমরা গ্রন্থখানির সাফল্য কামনা করি।

—সু—

সস্তাগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রমোহন মজুমদার প্রণীত, ৪।১ গোসাইপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

গল্পপ্রিয়া এবং শ্রীমঙ্গল। শ্রীযুক্ত পদ্মেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত অজিতহরি শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থে একটী গল্প এবং কয়েকটী কবিতা আছে।

গোলাপী রেউড়ি। শ্রীযুক্তা সারদাসুন্দরী দাসী প্রণীত, গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক ৭নং উল্টাডিঙ্গী রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

ছেলেদের জন্য লিখিত গল্প পুস্তক।

অভিমানিনী। শ্রীযুক্ত যদুনাথ খাস্তগীর প্রণীত। ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ইহা একখানি নাটক। নাট্যমন্দির সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল।

গোধূলি। শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রণীত। হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ছয় আনা।

ইহাও একখানি নাটক।

কুঙ্কুমিকা। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশকের নাম নাই। মূল্য দশ আনা।

ইহা একখানি কবিতা পুস্তক।

—বিম্বিসার—

ইংল্যাণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের শত বার্ষিকী

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির উদ্যোগে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ হ'তে ৭ই এপ্রিল ১৯৩৬ পর্য্যন্ত লণ্ডনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের বন্ধু বিচিত্রার লেখক কবি শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত বিলাতে অবস্থান করছেন। উৎসবের কার্য্য-সূচীতে দেখলাম যে তিনি এই উপলক্ষে "Ramkrisna and the Spirit of Service" বিষয়ে অভিভাষণ দেবেন।

স্যার দীনশা এডুলজী ওয়াচা

সম্প্রতি স্যার দীনশা ওয়াচা পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ২রা আগষ্ট ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৯২ বৎসর হয়েছিল।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্মী এবং স্বদেশ-সেবকদের উদ্যোগে কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল স্যার দীনশা তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধীনতায় দেশসেবা করেও পরে স্যার দীনশা পরিবর্ত্তিত মতের জন্য কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে ন্যাশানাল ফেডারেশন লীগে যোগদান করেন।

ব্যবসাবাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্যার দীনশা অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কাপড়ের কলের রহস্য তিনি এমন বিশিষ্টতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন যে, স্বদেশী যুগের প্রবর্ত্তনের সময় বাঙলা দেশে যখন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার কর্ত্তৃপক্ষ স্যার দীনশা ওয়াচাকে পারিশ্রমিক দিয়ে পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন।

নিজে একজন ধনী ব্যক্তি হ'লেও চালচলনে স্যার দীনশা একজন অতিশয় সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। পরহিতব্রত এবং দানশীলতার জন্যেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

কমলা নেহেরু

দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর জেনিভা নগরে কমলা নেহেরু দেহত্যাগ করেছেন। ইয়োরোপে তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হ'লে মুমূর্ষু স্ত্রীর রোগশয্যা পার্শ্বে যাতে উপস্থিত হ'তে পারেন সেজন্য ভারত সরকার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে কারামুক্ত করেন। পণ্ডিতজী তাঁর স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হওয়ার পরও কিছু দিন কমলা বেঁচে ছিলেন। মধ্যে অবস্থা অতিশয় গুরুতর হওয়ার পর একটু উন্নতি দেখা দেয় কিন্তু সে বোধ হয় নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ শিখাবিস্তার। সহসা একদিন ভারতবর্ষে কমলার মৃত্যুসংবাদ এসে উপস্থিত হ'ল।

স্বদেশসেবায় পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ, স্বামীর পশ্চাতে অবিচল অনুসরণ, স্বভাবের সুস্পষ্ট অমায়িকতা প্রভৃতি নানাবিধ গুণে কমলা ভারতবাসীর চিত্ত যতখানি অধিকার করেছিলেন, মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সের অকালমৃত্যুতে ঠিক ততখানি আঘাত দিয়ে গেলেন। অমন গুণবতী এবং শক্তিশালিনী স্ত্রীর কাছ থেকে জওহরলাল তাঁর কর্ম্মজীবনে যে প্রেরণা লাভ করতেন আমরা আশা করি কমলার মৃত্যু তা অপহরণ করবে না, কারণ মৃত্যু সব সময়ে বিচ্ছেদের কারণ নয়। দেহাতীত আত্মা দেহবিনির্গত হয়েও প্রিয়জনের আত্মার অনুপ্রাণনা সাধন করতে পারে, এ হয়ত নিছক কবি-কল্পনা নয়।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত অ্যাটর্নি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়েছে। একজন বিচক্ষণ অ্যাটর্নি ব'লে মোহিনী বাবুর যে খ্যাতি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ব'লে। ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। এক সময়ে তিনি একজন থিয়সফিষ্ট ছিলেন এবং তৎকালে কর্ণেল অলকটের সহিত আমেরিকা গিয়েছিলেন। বিলাতে অবস্থান কালে কবি ইয়েট্‌সের সহিত তাঁর আলাপ হয়। ইয়েট্‌স মোহিনীমোহনের পাণ্ডিত্য এবং বিতর্ক শক্তি দেখে এত মুগ্ধ হন যে, তিনি মোহিনীমোহন সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখে তাঁর The Winding Stair নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করেন।

মোহিনীমোহন ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা ছিলেন।

দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী

বাগবাজারের জনপ্রিয় প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। গভর্ণমেণ্টের পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে এঁর খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। এঁর জীবনচরিত্র অতি অদ্ভুত। আপন অধ্যবসায়ের গুণে ইনি অতি দরিদ্র অবস্থা হতে খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠেছিলেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন ও কপর্দ্দকহীন হয়ে হুগলি জেলার সোমড়া নামক সুদূর পল্লীগ্রামে থেকে ইনি প্রতিবেশীদের অনুগ্রহে জীবনধারণ করতেন এবং ভিক্ষা করে বিদ্যাভ্যাস করতেন। এইরূপে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইনি স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন এবং এণ্ট্রেন্স পরীক্ষাতেও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর কলিকাতায় আগমন করে শিক্ষকতার দ্বারা আপন ভরণপোষণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ৫০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করে সরকারী ইঞ্জিনিয়ার রূপে বিহারে নিযুক্ত হন। কর্ম্মস্থলেও ইনি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন এবং শোন কেন্যালের ইরিগেশন সম্পর্কে সুবন্দোবস্ত করার ফলে রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হন। বিহার হ'তে ইনি বঙ্গদেশে বদলি হন ও দামোদর নদীর বাঁধের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। এখানেও ইরিগেশন সম্পর্কে ইনি নানারূপ উন্নতির কার্য্য করেন ও পরে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররূপে নিযুক্ত হন। ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে ইনি সরল বাংলাভাষায় কয়েকখানি পুস্তক লিখেছেন, বঙ্গভাষায় যা অমূল্য সম্পদ। একখানি পুস্তকের নাম "স্থপতি বিজ্ঞান" অপর খানির নাম "জরিপ শিক্ষা"। কেবল তাই নয় দর্শন শাস্ত্র এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি অনেক চর্চ্চা করেন এবং "গীতা ও তাহার যৌগিক ব্যাখ্যা"—"ষষ্ঠেন্দ্রিয়", "সপ্তমেন্দ্রিয়"—প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেছেন। ইনি নবদ্বীপ হ'তে "বিদ্যাভূষণ" ও ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হ'তে "ধর্ম্ম রত্ন" উপাধি লাভ করেছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাদানের স্পৃহা এঁর বাল্যকাল হ'তে শেষ বয়স পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। এককালীন দশ সহস্র মুদ্রা দান ক'রে ইনি নিজগ্রামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (সোমড়া দুর্গাচরণ হাই ইংলিশ স্কুল) এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সাহায্য দ্বারা এই বিদ্যালয়টিকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন

ইনি অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু পাঁচটি দৌহিত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ক'রে সকলকেই সুশিক্ষিত করেছেন। এঁর প্রথম দৌহিত্র ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি, টি, এম্—যিনি চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকটও তিনি অপরিচিত নন, তাঁর রচিত কয়েকটি গল্প বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৌহিত্র গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য এম্ এস্ সি,—বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং এডোয়ার্ দত্ত কোংর ম্যানেজার। তৃতীয় দৌহিত্র ডাক্তার ভবানীপতি ভট্টাচার্য্য এম্ বি, ডি পি এইচ্,—বাঁকুড়ার হেল্থ অফিসার। চতুর্থ দৌহিত্র বিমলাপতি ভট্টাচার্য্য, হাইকোর্টের এটর্ণি। পঞ্চম দৌহিত্র সতিপতি ভট্টাচার্য্য, বি, ই, মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি সুরসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর উপহাস্যে ও সদালাপে সকলেই মুগ্ধ হ'ত। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আমরা তাঁর দৌহিত্রগণকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এম, সি উপাধি সম্বন্ধে প্রতিবাদ

গত ফাল্গুনের নানাকথার ২৮০ পৃষ্ঠায় আমরা লিখেছিলাম ক্যাপ্টেন পতিতপাবন চৌধুরী আই-এম্-এস্ ভিন্ন এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও বাঙালী এম্-সি উপাধি লাভ করতে সমর্থ হন নি। এ বিষয়ে আমরা দুটী প্রতিবাদ পেয়েছি।

কলিকাতা হতে শ্রীযুক্তা কৃষ্ণা সেন লিখেছেন, "আমার পিতা Col. J. L. Sen I. M. S, বিগত মহাযুদ্ধে M. C. লাভ করেছেন, এবং যতদূর জানা গিয়াছে তিনিই বাঙালিদের মধ্যে প্রথম ঐ সম্মান লাভ করেন। তাঁর পরে আরও দুই তিন জন আমাদের জানা (Col. M. N. Das I. M. S. ইত্যাদি) পেয়েছেন। M. C. সাহসিকতার জন্যই দেওয়া হয়।"

দেরাদুন হতে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সোমও প্রতিবাদ ক'রে উল্লিখিত দুইজন বাঙালী I. M. S. কর্ম্মচারীর নাম দিয়েছেন, তাছাড়া Army list থেকে আরও কয়েক জন ভারতবর্ষীয়ের নাম দিয়েছেন—তাঁরা কিন্তু সকলেই অবাঙালী। বিমলবাবু উক্ত দুইজন M C উপাধি অধিকারীর পুরা নাম ইত্যাদি দিয়েছেন।

১। Lt. Col Jyoti Lal Sen M.C, M.B, D.M.R. E. (Cantab.) I.M. S., Civil Surgeon, Dibrugar Assam.

২। Lt. Col. Manindra Nath Das M. C. M.B., M. R. C. S. D. P. H. (Lord.), D. T. M. and B. (Eng.), I. M. S, Superintedent Central Jail. Alipur, Calcutta.

ক্যাপ্টেন পতিতপাবন চৌধুরী ছাড়া আরও বাঙালী M. C আছেন, এ সংবাদে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধিত হ'ল। শ্রীযুক্তা কৃষ্ণা সেন এবং শ্রীযুক্ত বিমলা চরণ সোম কষ্ট ক'রে এ সংবাদ আমাদের পাঠিয়েছেন তজ্জন্য তাঁরা বিশেষভাবে আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পুস্তকাগারে অর্থ সাহায্য

লক্ষ্ণৌএর Bengali Club & Youngmens Association এর সম্পাদক আমাদের জানিয়েছেন যে বর্ম্মা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বীয় জননীর স্মৃতি রক্ষার্থে উক্ত সমিতির বিদ্যাসাগর পুস্তকাগারে দুই শত টাকা দান করে তাঁদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya-Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and Published by the same from 27-1, Fariapooker St. Calcutta.

বিচিত্রা

নবম বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৪৩ | ৪র্থ সংখ্যা

শেষের মৌন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

THE
CALCUTTA REVIEW OFFICE.
Calcutta University.

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিন রাতি,
এইবার থামো তুমি। বাক্যের মন্দির চূড়া গাঁথি'
যত ঊর্দ্ধে তোলো তারে, তার চেয়ে আরো ঊর্দ্ধে ধায়
অন্তহীন গাঁথনির উন্মত্ততা। থামিতে না চায়
রচনার স্পর্দ্ধা তব। ভুলে গেছ, শেষের পূর্ণতা
দেবে এরে পরিত্রাণ; ভুলে গেছ, নির্ব্বাক দেবতা
বেদীতে বসিবে আসি যবে, কথার দেউলখানি
কথার অতীত মৌনে লভিবে চরমতম বাণী।
মহানিস্তব্ধের লাগি অবকাশ রেখে দিয়ো বাকি,
উপকরণের স্তূপে রচিয়ো না অভ্রভেদী ফাঁকি
অমৃতের স্থান রোধি'। নির্ম্মাণ-নেশায় যদি মাতো,
সৃষ্টি হবে গুরুভার, তার মাঝে লীলা রবে না তো;
থামিবার দিন এলে থামিতে না যদি থাকে জানা
নীড় গেঁথে গেঁথে পাখী আকাশেতে উড়িবার ডানা
ব্যর্থ করি' দিবে। থামো তুমি থামো। সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শান্তির ইঙ্গিত নামে দিবসের প্রগল্‌ভ প্রকাশে।
ছায়াহীন আলোকের সভায় দিনের যত কথা
আপনারে রিক্ত করি' রাত্রির গভীর সার্থকতা
এসেছে ভরিয়া নিতে। তোমার বীণার শত তারে
মত্ততার নৃত্য ছিল এতক্ষণ ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
বিরাম বিশ্রামহীন,—প্রত্যক্ষের জনতা তেয়াগি'
নেপথ্যে যাক সে চলে স্মরণের নির্জ্জনের লাগি
ল'য়ে তার গীত-অবশেষ, কথিত বাণীর ধারা
অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে হোক্ সারা॥

শান্তি নিকেতন
৭ বৈশাখ, ১৩৪৩

আগামী কাল

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে এককড়ি একমনে লিখে যাচ্ছে। একপাশে গুড়গুড়ির কলকেটা বৃথা পুড়চে, হাতের কাছে নলটা অনাদরে পড়ে, টেনে নেবার সময় হয়নি, চায়ের বাটিটা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল মুখে তোলবার ফুরসৎ পায়নি, এমনি সময়ে জলধি এসে উপস্থিত। মিনিট পাঁচ-ছয় চুপ চাপ বসে থেকে বললে, এককড়ি দা, আপনার অভিনিবেশটা একটু বিচলিত করতে চাই। বড় দরকার। এককড়ি মুখ না তুলেই বললে, বলো।

কি এত লিখছেন ?

আমাদের কল্যাণ-সঙ্ঘের আইন কানুন গুলোর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তারই একটা খসড়া করচি।

করুন। পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়েছে নিশ্চিত। Rather over due :

হুঁ বলে এককড়ি পুনরায় লেখায় মন দিলে।

আবার মিনিট পাঁচ-ছয় নীরবে কাটলো। জলধি বললে, অন্য সব কিছু তাচ্ছীল্য করা যেতেও পারে, কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্রটা নয়। কারণ, সুনাম যদি ঘোচে হাজার চেষ্টাতেও সঙ্ঘকে আমরা খাড়া রাখতে পারবোনা, কাত হয়ে পড়বেই। এখানে আমাদের শক্ত হতে হবে।

নিশ্চয়।

এই দুটো দিন আমি অনেক ভেবেছি এককড়িদা। কষ্ট খুবই হয়, কারণ, এ-ই ওর জীবিকা। শুনেছি কে একজন অন্ধ আত্মীয়কেও মণি প্রতিপালন করে। তবু মণিকে রাখা চলবে না, বিদায় দিতেই হবে। জানি আপনার মন ভারি নরম, কিন্তু এ এতবড় serious matter যে আপনাকে দুর্ব্বল হতে আমি কিছুতেই দিতে পারব না।

এককড়ি কলম রেখে উঠে বসলো। চামড়ার কাল পোর্টফোলিওটা কোলে তুলে নিয়ে খুঁজে খুঁজে

একখানা কাগজ বার করে জলধির দিকে ছুড়ে দিয়ে গুড়গুড়ির নলটা মুখে নিয়ে নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগলো।

কাগজখানা পড়তে পড়তে জলধির মুখ পাংশু হয়ে গেল। শেষ করে বললে, মণিকে জবাব দেবার পূর্ব্বে একবার আমাকে জানালেন না কেন?

এককড়ি মুখের নলটা সরিয়ে রেখে বল্‌লে, এই মাত্র ত তুমি নিজেই বলচো আমাদের শক্ত হতে হবে, মণিকে রাখা চলবে না। তা ছাড়া কোথায় তুমি ছিলে হে? তিন দিন এলে না, এলে কথাটা নিশ্চয়ই শুনতে পেতে। আর যাকে সরাতেই হবে তাকে শীঘ্র সরানোই ভাল। অবিচার করিনি, তিন মাসের মাইনে বেশি দিয়ে দিয়েছি। এই দেখ রসিদ। এই বলে এক টুকরো টিকিট-মারা কাগজ জলধির সামনে এগিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, শুনলাম সেও বাড়ী-আলাকে নোটিশ দিয়েছে। লোকটা ভাল, পনেরো দিনের কড়ারেই রাজি হয়েছে, এক মাসের নোটিশ দাবী করেনি।

জলধি তিক্তকণ্ঠে বললে, হাঁ, মহাশয় ব্যক্তি। মণি কোথায় যাবে কিছু জানিয়েছে?

না। বলেছে চিঠি লিখে পরে জানাবে।

তাকে জবাব দিলেন আপনি, কিন্তু আমার নাম করতে গেলেন কেন?

বেশ কথা। তুমি সেক্রেটারি, তোমার ঘোরতর আপত্তি তারে না জানিয়ে চলে?

শুধু আমারই আপত্তি, আপনার নয়?

নিশ্চয়।

জানিয়েছেন তাকে?

নিশ্চয় জানিয়েছি।

জলধির মুখে আর কথা যোগালনা, শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

এককড়ি খসড়ার কাগজগুলো একে একে গুছিয়ে নিয়ে জলধির পানে এগিয়ে দিলে, বললে পড়ে দেখো।

লেখা শেষ হোকনা দাদা, ঢের সময় আছে।

তার ঔদাসীন্যে এককড়ি বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললে, কোথায় ঢের সময়? ছাপতে হবে, যেখানে যত মেম্বার আছে সারকুলেট করতে হবে,—গড়িমষির ত কাজ নয়। এই দিকটায় আমার চোখ খুলে দিয়ে তুমি মস্ত কাজ করেছো, জলধি। সত্যিই ত। চরিত্রই যদি না রইল ত রইলো কি। সঙ্ঘ দাঁড়াবে কিসের পরে? এখন থেকে এই সুনামই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় asset—সত্যিকার মূলধন! সঙ্ঘ সংক্রান্ত যে-যেখানে আছে—পেড বা অনপেড—সকলেই বুঝবে এদিকে সেক্রেটারির লেশমাত্র গাফ্‌লতি নেই। সে মণির মতো কাজের লোককেও বিদায় দিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করেনি। আমি তোমাকে congratulate করি জলধি।

জলধি অন্তরে জ্বলে গিয়ে বললে, আপনার ইচ্ছাটা কি মণির ব্যাপার আমরা ঢাক পিটে সর্ব্বত্র প্রচার করি?

তা' নাহোক, কিন্তু দলের লোকে ত জানবেই, চাপা দেবে কি করে, আর দিয়েই বা লাভ হবে কি ?

অর্থাৎ, কল্যাণ-সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মণিমালার এই হবে বিদায় অভিনন্দন ! না দাদা, মাপ করুন, রাজি হতে পারলাম না। আর কিছু না মনে করি, সঙ্ঘের কল্যাণে এই তিনটে বছর তার অবিশ্রান্ত খাটুনি ভুলতে পারবনা।

ভোলার কথা নয় হে জলধি, কিন্তু উপায় কি ? আমাদের কাগজ-পত্রে মণির বদলে অজয়ের দস্তখত দেখলে দলের লোকে কারণটা জানতে চাইবেই। তখন ঢাকবে কি করে ?

জলধি কথাটা ভাল বুঝতে পারলেনা,—অজয় আবার কে এলো দাদা ?

এককড়ি বললে, সেই ত মণির যায়গায় কাজ করবে। Economicsএ এম-এ, একটুর জন্যে first class টা গেছে, নইলে যে-কোন কলেজে দেড়শ টাকা তার ঘোচায় কে ? মাইনে বাড়াতে হয়নি,—পঞ্চাশ টাকাতেই রাজি হলো। কুড়িয়ে পাওয়া বললেই হয়।

জলধির রাগের সীমা রইলনা, কিন্তু যথাসাধ্য চেপে রেখে প্রশ্ন করলে—রত্নটি কুড়িয়ে পেলেন কখন ?

আজ সকালেই। অজয়ের বাপের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল, বছর খানেক ধরে সে ছেলের জন্যে একটা সুপারিশ চিঠি চাইছিলো মামার ওপরে। নানা কারণে দিতে পারিনি, তাই—

তাই মামার দায় আমার কাঁধে চাপালেন ?

না হে না। সে কাল থেকে যখন আফিসের ভার নেবে তার কাজ দেখে তুমি খুসি হবে। মণির চেয়ে অযোগ্য হবেনা বলে দিলাম।

জলধি আর তর্ক করলেনা। ক্ষণঃকাল চুপ করে থেকে বললে, আসলে আপনার প্রকৃতিটা বড় নির্ম্মম, এককড়ি দা। আমি নিজে যদি কখনো বিদায় নিই কেবল এই জন্যেই নেবো। ইতিমধ্যে আপনার গণেশের কলম চলতে থাক, আমি উঠলাম। এই বলে সে ক্ষুদ্র একটা নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ; এককড়ি ডেকে বললে কোথায় যাচ্চো জলধি ?

যাবার মুখ নেই তবু যেতে হবে। পুরুষত্ব বলুন, মনুষ্যত্ব বলুন দেশের পায়ে আজো একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারিনি। মায়া-মমতা আজও যেন বুকের মধ্যে কোথায় বেঁধে, এককড়ি দা।

অর্থাৎ মণির বাসায় গিয়ে তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চাও ?

সান্ত্বনা দেবার দরকার হবেনা, এটুকু অন্ততঃ তারে জানি। সে যাই হোক, আমি হলে কিন্তু এমন সরাসরি জবাব দিতামনা,—এবারের মতো শুধু একটা warning দিয়েই পালা শেষ করতাম।

শুনে এককড়ি প্রথমটা গম্ভীর হলো, তারপরে হঠাৎ হেসে ফেলে বললে, দূর গাধা ! তোর পালা আরম্ভ করার বুদ্ধিটাও যেমন অসাধারণ পালা শেষ করার ফন্দিটাও তেমনি চমৎকার। এই warning দেবার মৎলব কে যোগালেন ? এই বুঝি তারে চিনেছিস্ এতদিন একসঙ্গে কাজ করে ?

জলধি এ তিরস্কারের উত্তর খুঁজে না পেয়ে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইলো।

এককড়ি বলতে লাগলো, তার আচরণ আমরা অনুমোদন করিনে, এই ধরণের স্বেচ্ছাচার আমাদের ভালো লাগে না; অতএব বিদায় দেওয়া হলো এ কথাটা মণি অনায়াসে বুঝবে কিন্তু তোর চোখ রাঙিয়ে ধমক দেওয়া বুঝবেনা। বরঞ্চ, এই জন্যে সে কৃতজ্ঞ থাকবে যে আমরা তার সংস্রব ত্যাগ করেছি, কিন্তু অসম্মান করিনি। বলিনি, প্রভুর রুচির সঙ্গে ভৃত্যের রুচি মেলেনি বলে এবার শুধু তার কান মলে দেওয়া হলো, ভবিষ্যতে নাক কেটে দেওয়া হবে।

জলধি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে জবাবটা একেবারে settled? এর নড়চড় হতে পারবেনা?

না। কল্যাণ-সঙ্ঘের নামটা তার জন্যে পালটাতে পারবোনা।

জবাব শুনে জলধি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে নতমুখে বসে রইলো; তারপরে মুখ তুলে অনুতপ্ত স্বরে ধীরে ধীরে বললে এবারের মতো আমার অভিযোগটা আমি প্রত্যাহার করচি এককড়ি দা। এবার তাকে আমি ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

এককড়ি ঘাড় নেড়ে বললে, আমি প্রস্তুত নয় জলধি।

কিন্তু সত্যিই সে কোন অপরাধ করেছে কিনা তাও বিচার করবেন না?

সত্যিকার অপরাধ তুই কারে বলিস জলধি? যা ইঙ্গিত করেচিস তা-ই?—না সে-দোষ সে কখনো করেনি, কখনো করবেনা।

তবু বিদায় করে দেবেন?

হাঁ তবুও। আমাদের মধ্যে ওকে রাখতে পারবোনা।

কতখানি বিপদের মধ্যে তাকে ঠেলে দিচ্চেন একবার তাও চিন্তা করবেননা?

সে চিন্তায় লাভ? বিপদকে সে ভয় করে নাকি? তোরা হলে চিন্তা করতাম। এই বলে এককড়ি একটু হেসে গুড়গুড়ির নলটা তুলে নিয়ে মুখে দিলে।

জলধি গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল্‌লাম।

এককড়ি তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে আবার একটু হেসে বললে, কাল একবার আসিস। বুঝেচি, তোর আসল মৎলব ছিল মণিকে ধমকানো,—জবাব দেওয়া নয়। যখন সেখানে যাচ্ছিস, তখন কথা উঠলে বলিস্ জবাব তাকে আমিই দিয়েছি,—তুই নয়, তুই বরঞ্চ তারে রাখতেই চেয়েছিলি।

জলধি ভেবে পেলেনা কথাটা তামাসা না আর কিছু। অন্তরে মর্ম্মান্তিক জ্বলে গেল, কিন্তু প্রকাশ না করে শুধু বললে, অত্যন্ত বাহুল্য কথা, এককড়ি দা। জবাব দেবার সত্যিকার মালিক যে তুমি, আমি নয়, একথা সে জানে। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ দোরের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, তবু সেই বাহুল্য কথাটাই বলার জন্যে একবার তার বাসায় যেতে হবে। আমার সম্বন্ধে মণি আর যাই মনে করুক, এ না মনে করে এক অভাগা আর এক অভাগার অন্ন মেরে দিলে। এই বলেই দ্রুতবেগে চলে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ওদিকে মণিমালার ঘর থেকে এই মাত্র গুটি চারেক মেয়ে নেবে গেল। তারা মণির বন্ধু। এসেছিল নারী-সমিতির পক্ষ থেকে। আগামী সপ্তাহে বসবে অধিবেশন, ডেলিগেট আসছেন নানা

জেলা থেকে প্রায় শতাধিক, প্রস্তাব এই যে উক্ত সভায় মণিমালাকে মুভ করতে হবে একটা omnibus resolution—তাহাতে বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে চাকরিতে নর নারীর সমান মাইনে পর্য্যন্ত নানা দাবীই বেশ কড়া করে থাকবে। মণি কিন্তু রাজী হলো না, হেসে বললে, যে চেহারা ভাই আমার—কেউ বিয়ে করলেই বেঁচে যাই, তা আবার বিবাহ বিচ্ছেদ। এনা হেনা দুই বোন, তাদের ঝাঁঝই সব চেয়ে প্রখর, রেগে বললে, বিয়ে কি আমাদেরই হয়েছে নাকি? আমরা নিজেদের কথাও ভাবচিনে, ভাবচি সমস্ত নারী জাতির হয়ে। তুমি বলতে পারো চমৎকার, ডিবেট করতে তোমার জোড়া নেই, তাই সুকল্যাণী মিটারের ইচ্ছে এ resolution তোমাকে দিয়েই প্রস্তাবিত করা। আমরা ফিরে আসচি তাঁর চিঠি নিয়ে, দেখি কি করে তখন অস্বীকার করো।

মণি বললে, আমাকে মাপ করো ভাই।

এনা বললে, জানো এতে তাঁকে অপমান করা হবে?

অপমান ত করচিনে ভাই, আমি হাত জোড় করচি।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। আসচি চিঠি নিয়ে। হয়ত বা তিনি নিজেই এসে হাজির হবেন। এই বলে মেয়েরা চলে গেল। তাদের কাপড়ের এসেন্সের গন্ধে তখনও ঘরের বাতাস ভারী, উত্তেজিত কণ্ঠের ঝাঁঝালো তর্ক তখনও চারটে দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে বেড়াচ্চে। মণি ডাকলে, রমেন কি ঘুমচ্চো?

ঘরের অপর প্রান্তে একটি কেম্বিশের ইজি চেয়ারে রমেন চোখ বুজে শুয়ে ছিল, সাড়া দিয়ে বললে, না, আমার ট্রেণের শব্দেই ঘুম হয় না, এ তো চার চারটে এরোপ্লেনের সার্কাস চলছিল।

তুমি ভারি অসভ্য, রমেন। মেয়েদের সম্বন্ধে কখনো কি শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা কইতে পারো না?

রমেন চুপ করে রইলো। মণি বলতে লাগলো আমি আশা করেছিলাম আমাদের আলোচনায় তুমি যোগ দেবে, কিন্তু একটি কথা কইলে না, ওধারে গিয়ে শুয়ে রইলে। তোমার সম্বন্ধে ওঁরা কি ভেবে গেলেন কল্পনা করতে পারো?

না।

ভেবে গেলেন একটি আস্ত জানোয়ার। ভেবে গেলেন এ পশুটাকে মণি যখন-তখন তার ঘরের মধ্যে সহ্য করে কি কোরে।

উঃ—

কিসের উঃ—?

ধরো, এই মেয়ে চারটির যদি কোনদিন বিয়ে হয়! উঃ—

মণি রেগে বললে বিয়েত হবেই একদিন। ওঁরা কি চিরকাল আইবুড়ো থাকবেন নাকি?

রমেন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলে, সে মৎলব এঁদের নেই তাহলে? ঠিক জানো?

মণি হেসে বললে, না নেই। ঠিক জানি।

উঃ—

তোমার বুকে কি শেল বিঁধচে নাকি?

হাঁ বিঁধচে। মানস-চক্ষে আমি সেই দুর্ভাগাগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি। এই বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলো। বললে, জানো মণিমালা, পরম জ্ঞানী Aristotle সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। কোথায় যেতে পথের ধারে একটা গাছের ডালে দেখতে পান একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, আহা, এমনি ফল যদি পৃথিবীর সমস্ত গাছের ডালে ফলতো, জগৎ স্বর্গ হয়ে যেতো। ত্রিবিধ দুঃখ নাশের মীমাংসা বুদ্ধদেব দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু দুনিয়াকে স্বর্গ করবার থিওরি একমাত্র তিনিই আবিষ্কার করে গেছেন। হাঁ জ্ঞানী বটে।

রমেন ভেবেছিল মণি খুব এক চোট হাসবে, কিন্তু হলো উল্টো। দেখতে দেখতে তার মুখের চেহারা কঠোর হয়ে এলো, শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে রমেন, তোমার এই কথাটা আমি চিরদিন মনে রাখবো।

রমেন অপ্রতিভ হয়ে বললে, কথা ত আমার নয় মণি, এরিষ্টটলের। তা-ও সত্যি কি বানানো তা-ই বা কে জানে।

না, সত্যি। তাও শুধু তাঁরই নয়, সমস্ত পুরুষের মুখেরই এই এক কথা। সেই বুড়ো Aristotle আজও আড়াই হাজার বছর পরে তোমার মধ্যে বেঁচে আছে। সে আছে জলধির মধ্যে, সে আছে এককড়ি দা'র ভিতরে। তাইতো গেল আমার চাকরি। তিন বছরের রাত্রি দিনের সেবা এক মুহূর্ত্তের ভর সইল না। তুমি নিজে মনিব হলেও আমার চাকরি ঠিক এমনি করেই যেতো, রমেন।

রমেন ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, আমি মনিব যখন নয়, তখন সে প্রমাণ দিতে পারলাম না। কিন্তু তুমি মিথ্যে তিলকে তাল করচো, মণি। বুড়োর তামাসাটা সত্যি হলে কি মানুষ আজও বেঁচে থাকতো! কোন কালে নিঃশেষ হয়ে যেতো।

নিঃশেস না হবার অন্য হেতু আছে, রমেন। কারণ, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার ভার পুরুষের পরে নেই, সে আছে আর একজনের পরে। তাইতো দেখি নর-নারী এতকাল একসঙ্গে থেকেও আজও সন্ধির একটা ফরমুলা খুঁজে পেলে না, কোন পথে দুঃখের নিরাসন সে দিকটাই তাদের চোখে পড়লো না, চিরদিন কানা হয়ে রইলো।

রমেন আস্তে আস্তে বললে, মণি, কেন জানিনে, কিন্তু মনে হচ্ছে আজ তোমার মনটা অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে।

উদ্‌ভ্রান্ত? হতেও পারে। কিন্তু একটা প্রশ্নের হঠাৎ জবাব পেয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম ওদের অনুরোধ শুনবো না, বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব আমার মুখ দিয়ে বার হবে না, কিন্তু এখন স্থির করলাম এ প্রস্তাব আমি নিজেই আনবো।

রমেন একটু হেসে বললে, সে না হয় করলে, কিন্তু জিনিষটা ভাল কি মন্দ, মানুষের অভিজ্ঞতায় এর দাম কি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তার কি জ্ঞান তোমার আছে, মণি?

মণি বললে কোন জ্ঞানই নেই,—ইতিহাস ত জানিনে,—আর যেটুকু আছে সে-ও তুমি ইচ্ছে করলে খণ্ড খণ্ড করে দিতে পারো, কিন্তু তোমার কথা আমি শুনবো না। বরঞ্চ এই কথাই জোর করে

বলবো, আমার অন্তরের সত্য অনুভূতি আমাকে সত্য পথ দেখিয়ে দেবে। দেবেই দেবে।

সত্য অনুভূতি পেলে কখন ?

এইমাত্র। তুমি পরিহাসের ছলে যা বললে তার মধ্যে।

সে কি কখনো হয় ?

হয় রমেন হয়। গল্প শোননি আমাদের লালাবাবু মেছুনির মুখের একটা উড়ো কথা শুনে সংসার ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। অথচ কত লোক ত দিন রাত শোনে, তারা কি ঘর দোর ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায় ? কিন্তু যে শুনতে পায় সে-ই শুনতে পায়।

মণি, তুমি যে এত বড় পাগল আমার ধারণা ছিল না।

মণি হেসে বললে, পাগলই ত। নইলে কি দেশের জন্যে জেল খাটতে যেতে পারতাম ? প্রাণ দিতেও রাজি ছিলাম ; তুমি পারো ?

সে পরীক্ষা ত আমাকে দিতে হয়নি, মণি।

পরীক্ষা দেবার দিন যদি আসে পারবে দিতে ?

রমেন হঠাৎ এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলে না। এমনি সময়ে দোরের বাইরে থেকে ডাক এলো মণি, আসতে পারি কি ?

মণি খুসী হয়ে সাড়া দিলে, আসুন আসুন, জলধি বাবু।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

বসন্ত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম. এ

হে বসন্ত, এলে তুমি বৎসরান্তে ফিরিয়া আবার,
এখনো রয়েছি হেথা টুটেনি বন্ধন এ ধরার।
তবু জানি বিদায়ের দিন
আমার ঘনায়ে আসে হে চিরনবীন,
আমি চলে যাব
সেই সাথে চির তরে তোমারে হারাব।
তাই এ মাটিরে আমি প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরি,
তোমার সমীর স্পর্শে কিশলয়ে আপনারে ভরি।
মোর ডালে ডালে
কোকিল আজিও বসি কুহুধ্বনি ঢালে।
সমাসন্ন বিরহ সন্ত্রাসে
বহু স্মৃতি ঘনীভূত সুরব নির্য্যাসে
তার মধুকণ্ঠ স্বর হয়েছে মধুরতর আজি,
ইন্দ্রিয়ের তারে তারে সুরকম্প্র স্মৃতি ওঠে বাজি।

এই চৈত্র নিশি
বহু চৈত্র রাত্রি সনে গেছে আজি মিশি,
স্মৃতি ভরা দর্পণে দর্পণে
একা সে বিচিত্রা হয়ে দেখা দিল এ মুগ্ধ নয়নে।
একাকার হয়ে আজি ঘুচায়েছে সব ব্যবধান,
সর্ব্ব দেশকাল
আমার চৌদিক ঘেরি রচিয়াছে চারু চক্রবাল।
এই সান্দ্র অন্তিম যৌবনে
আবার ভরিলে মোরে হে বসন্ত, নব মুঞ্জরণে।

রামায়ণের এক অধ্যায়

শ্রীমতী প্রীতি গুপ্ত এম-এ

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণখানা পড়িতেছিলাম। সমগ্র রামায়ণখানি যেন একটী রসের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্ঝরিণী। ইহাতে দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, বিদ্বেষের বহ্নিজ্বালা আছে, নীচতার হীন কলুষতা আছে; তাহারা আঘাত করে, দুঃখও দেয় তথাপি কোথাও যেন কখনও চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখেনা। ক্রৌঞ্চের বিরহে ক্রৌঞ্চীর মর্ম্মমূলে যে চিরন্তন বিরহের বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, সমগ্র রামায়ণের পটভূমি যেন তাহারই অশ্রুশিশিরে সুধাসিক্ত। যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস আছে, কৈকেয়ীর গৃহবিচ্ছেদের গ্লানি আছে, মন্থরার কুমন্ত্রণা আছে তথাপি এই অন্তঃশীলা স্রোতস্বতীর সরসতার কোথাও যেন কখনও ব্যত্যয় ঘটে নাই। সমস্ত ছাপাইয়া, কূল প্লাবিয়া রসের মন্দাকিনী নিত্যকাল ধরিয়া কুলু কুলু করিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

অরণ্যকাণ্ড শেষ হইয়া গিয়াছে। কৌণাজী বিদেহতনয়াকে দুষ্ট দশানন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে;—শোকাকুল বৈদেহী-কান্ত আকুল হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে'র প্রথমভাগে রমণীয় পম্পাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নববসন্ত সমাগমে সমগ্র পম্পাভূমি তখন বিকসিত রূপমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ।—এই উদ্ভাসিত রূপশ্রী বিরহাতুর রামভদ্রের উত্তপ্ত চিত্তদাহে কি সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দিল জানিনা, শ্যাম-কান্তি রঘুপতি একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু ভরিয়া তাহা পান করিয়া লইলেন, তাহার পর উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রাণসম প্রিয় সহোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'সৌমিত্রে, পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনম্। যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রুমাঃ সশিখরা ইব।'—দেখ লক্ষ্মণ, পম্পার তীরবর্ত্তী কুঞ্জবনের কি বিচিত্র শোভা। উন্নত তরুশ্রেণী যেন উচ্চশির শৈলমালার মত বিরাজিত রহিয়াছে।—'পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে, বনানাং পুষ্পশালিনাম্। সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব।'—সৌমিত্রে, দেখ, দেখ, পুষ্প-প্রচুর তরুরাজির কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বরষার ধারাবর্ষী মেঘমালার ন্যায় ইহারা যেন ধারাসারে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।

আধুনিক কালের কোনও উপন্যাসকার যদি এমনি করিয়া নায়কের গৃহলক্ষ্মীকে দুর্দ্দান্ত অরাতির হস্তে সমর্পণ করিয়া অনন্যগতপ্রাণ নায়ককে দিয়া এমনই অলস বিলাসে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যোপভোগ করাইতে বসিতেন তাহা হইলে তীব্র আলোচনা করিয়া বলিয়া উঠিতাম যে বিচ্ছেদের এই অবিচ্ছিন্ন দুঃখের মুহূর্ত্তে এমন অনন্যগতপ্রাণ নায়কের পক্ষে এমনিভাবে প্রকৃতির রস সম্ভোগ করা যে কেবল অশোভন এবং অসঙ্গত তাহাই নহে, মনস্তত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিক দিয়াও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। নায়কের স্বভাবগত একনিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও বিরত হইতাম না, আরও বলিতাম যে আমরাও এতক্ষণ ম্লানকান্তি রঘুপতির সহিত বনে বনে বিচরণ করিয়া পদে পদে পদ্মপলাশাক্ষীকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছি।—পম্পাতীরে আসিয়া সমস্ত পাঠকবর্গ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছে।—লেখকের এ দায়িত্ববোধ থাকা উচিত ছিল।

কিন্তু পুণ্যশ্লোক বাল্মীকি এ সকল কোনও বিষয়ের জন্যই বিন্দুমাত্র বিচলিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া, কুঞ্জে কুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া, ধীরে ধীরে, নিতান্ত অনুদ্বিগ্নচিত্তে পম্পার এই উচ্ছ্বসিত রসমাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়াছেন—বিন্দুমাত্র কালসংক্ষেপের প্রয়াস মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। তথাপি বর্ণনাটি পড়িতে পড়িতে যেন রসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাই, কোথাও কোনও অসঙ্গতি ঘটিল অথবা অহেতুক ভাবাতিশয্য রহিয়া গেল বলিয়া মনে হয় না। এই উন্মুক্ত প্রকৃতির

অন্তরালে শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজির শ্যামচ্ছায়ে কবি আপনাকে এমনই সুষ্ঠুভাবে সংগুপ্ত রাখিয়াছেন, মনে হয় যেন এই সুন্দর বনভূমি আপনা আপনি আসিয়া চিত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ;—কেহ আবাহন করিয়া আনে নাই, কেহ নিরীক্ষণ করাইয়া দিবার নাই।—শতবর্ণের কুসুমসম্ভারে ক্ষীণ তনুখানিকে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।—ইহাকে প্রত্যাখ্যান করা চলেনা, এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই—নয়ন উন্মীলন করিলেই যেন আপনার স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীতে সমস্ত মনপ্রাণ জুড়াইয়া দিয়া যাইবে। জীবন্ত প্রকৃতির এই উৎসারিত রসধারার সহজ উৎসের নিকট ঘটনাস্রোতের মন্থরতা নিতান্ত বহিরঙ্গ হইয়াই দাঁড়ায় ; আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সতর্ক পাঠক এই মুক্তপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত লাবণ্যস্রোতে অভিষিক্ত হইয়া যান।—নিদাঘের উত্তপ্ত নভস্তল শ্যামায়মান তরুশ্রেণীর ঘনচ্ছায়ে স্নিগ্ধ ও সজল হইয়া উঠে।

'অরণ্যকাণ্ডে'র মধ্যভাগ হইতে ঘটনাস্রোত এক অত্যুগ্র উত্তেজনার অসহ্য আবেগে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া কোন দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির অভিমুখে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল —তাহার পর দ্রুত-পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর নিরন্তর সংক্ষোভ বিক্ষোভের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে উগ্র হইতে উগ্রতররূপে অরণ্যকাণ্ডের শেষ প্রান্তে আসিয়া, অন্তর্বাত্রী জানকীহরণের শেষ অধ্যায়ে উন্মত্ত রঘুনাথের মর্মভেদ হাহাকারের বহ্নিবাষ্পে আপনার চরম পরিণতি গ্রহণ করিল। অরণ্যকাণ্ডের এই ঘটনাবহুল দৃশ্যাবলীর অত্যুগ্র চিত্তসংক্ষোভের পরেই 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে'র অবসরপ্রচুর ভাববিলাসের সুমধুর প্রারম্ভ। এই দুই বিরুদ্ধ ভাবধারার বিচিত্র সৌসামঞ্জস্যে কবি যে কাব্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, সাহিত্যরসিকের নিকট তাহা চিরকাল আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবে। কাহারও স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদাহানি করা হয় নাই, তথাপি কোথাও যেন কোনও ছেদ ঘটে নাই, ক্রম-ভঙ্গ হয় নাই, অসঙ্গতি থাকিয়া যায় নাই।—যে অন্তর্গূঢ় বেদনার দুঃসহ বহ্নিদাহে প্রস্তরও বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল প্রসন্নাম্বু পম্পা সরসীর সুস্নিগ্ধ সজলতায়, তীরবর্ত্তী তরুরাজির সুনিবিড় পত্রচ্ছায়ে, পুষ্পিত বনস্থলীর মৃদু সৌরভে, মন্দগামী প্রভাত বায়ুর সুশীতল স্পর্শে তাহাই যেন আপনাকে পুঞ্জ পুঞ্জ জলদকান্তিতে জলভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষরিত হইয়া বিরহী রাজপুত্রের দগ্ধপ্রায় চিত্তভূমি সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

অদূরে ঋষ্যমূকের কৃষ্ণচ্ছায়া মেঘের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পুষ্পপ্রচুর দ্রুমরাজির অজস্র সম্ভারে, কোবিদার, মতুলুঙ্গ, সিন্ধুবারের অপূর্ব্ব বর্ণসুষমায়, শিখী-শিখিনীর নৃত্যচপল লাস্যে, তাম্রবর্ণ পল্লবের আভ্যন্তরীণ রাগরক্ত মধুকরের অস্ফুট গুঞ্জনে সমগ্র পম্পাভূমি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে টলমল করিতেছে। শব্দের কী বিচিত্র বিন্যাসে, রচনাভঙ্গীর কী অপূর্ব্ব কৌশলে, বর্ণপাতের কী সংযত মাত্রাবোধে যে কবিগুরু এই রসঘন আনন্দোজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলেখ্যখানি ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন পড়িতে পড়িতে চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়। মধুমাসের মাধুরী আছে অথচ মদিরতা নাই। যে বেদনামধুর স্নিগ্ধ সুরের ধ্বনি সমগ্র রামায়ণের মর্ম্মমূলে বাজিয়া উঠিয়াছে, সে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের কোথাও যেন ব্যত্যয় ঘটে নাই। সুদৃশ্য কর্ণিকা, করবী, মুচুকুন্দ ও লোধ্রপুষ্পের বর্ণোচ্ছ্বাসে সমস্ত গিরিসানুদেশ উদ্ভাসিত অথচ যে পটভূমিকে আশ্রয় করিয়া এই রূপচ্ছবি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল তাহাতে বর্ণের আভাস মাত্র নাই—তাহা অদূরে বিলীয়মান অভ্রংলেহী ঋষ্যমূকের ঘনচ্ছায়ে ধূসর। সমস্ত বনপ্রকৃতি যেন অঙ্কোল, কুরণ্ট ও চূর্ণক প্রভৃতি তীরতরুর শ্যামচ্ছায়ে সুশীতল।

মনে হয় এক সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষার কাব্যে বোধ হয় এরূপ অপরূপ ভাববিলাসের সুসঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। এই ভাষার অন্তর্নিহিত স্বভাবগতই এমন একটী রসগাম্ভীর্য্য আছে যাহা আপনার রসভারে আপনা আপনিই সমস্ত চপলতাকে সুগম্ভীর করিয়া তোলে। বর্ণনাটী বার বার মুগ্ধচিত্তে পড়িয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু পড়িতে পড়িতে মন যাহাতে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া উঠে তাহা এই রচনাভঙ্গীর সুকোমল মাধুর্য্য অথবা আখ্যানবস্তুর ক্রমভঙ্গ না করিয়া ঘটনাবলী বিন্যাসের অপূর্ব্ব কৌশল নহে ; তাহা এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের অননুভূতপূর্ব্ব আস্বাদন। সমাগত বসন্তের উচ্ছ্বসিত রূপমাধুর্য্যে সমস্ত পম্পাভূমি পরিপূর্ণ। এমনি সময় একান্ত বিরহকাতর চিত্ত লইয়া শোকাতুর বৈদেহীকান্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিকে পরিপূর্ণ

মাজল্যের লাবণ্যোচ্ছ্বাস অপরদিকে বিরহী রাজপুত্রের বিচ্ছেদাহত চিত্তের নিতান্ত নিঃসঙ্গতা। স্থান, কাল ও পাত্রের একত্র সমাবেশটী রীতিমত শাস্ত্রসঙ্গতভাবেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল; রঞ্জিত পুষ্পের স্তবকে স্তবকে, শিখী শিখিনীর যুগল নৃত্যের মিলনোৎসবে, কারণ্ডব-বধূর কান্তাসম্ভাষণের অস্ফুট গুঞ্জনে, রসশাস্ত্রসম্মত আলম্বন-উদ্দীপনের সহযোগও নিতান্ত কম ছিল না; কলিদাসের রচনারীতির সহিত অভ্যস্ত মন যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, ইহার পর নবীন পল্লবপুটের রাগরক্তিমায় সীতার বিম্বাধরের শোভা অনুকরণ করিয়া, সহকারাশ্রিতা মাধবীলতার সুকোমল লাবণ্যোচ্ছ্বাসে সঞ্চারিণী পল্লবিনী ক্ষীণা তন্বীর পেলবশ্রী ধারণ করিয়া, বিকসিত পদ্মবনের স্মিতহাস্যে সেই পদ্মমুখী বরাঙ্গনার স্মিত দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া, সমগ্র বনভূমি অঙ্গে অঙ্গে জনকসুতার পরিচয় লইয়া জানকীবল্লভের নিকট স্মিতাননা জনকতনয়াকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়া ধরিবে। শোকাকুল বৈদেহীকান্ত অধীরোন্মাদনায় দুই ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে সেই প্রাণতুল্য প্রিয়দর্শনাকে বন্দী করিতে দিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে বিগতচেতন হইবেন,—তাহার পর, ভবভূতির করুণাময়ী প্রকৃতি সহসা আবির্ভূত হইয়া, ঘনপত্র সংচ্ছাদিত তরুশাখার ঈষৎ আন্দোলনে মৃদুমন্দ ব্যজন করিতে করিতে কোনও প্রকারে চৈতন্য সম্পাদন করিবেন।

কিন্তু এই প্রত্যাশিত রসবেগকে প্রশমিত করিয়া সহসা এক অন্তঃশীলা ভোগবতী ধারার উৎসারিত সুধা-উৎসে সমস্ত অন্তর আপ্লুত হইয়া গেল;—কালিদাসের ভাবাবেগের সহিত পরিচিত মন এইখানে বাল্মীকির সংস্পর্শে আসিয়া যে রসের সন্ধান পাইল তাহার আস্বাদন সংস্কৃত সাহিত্যে বহুবার পাওয়া যায় না। রসশাস্ত্রসম্মত যোগাযোগের অবকাশ অফুরন্ত তথাপি বাল্মীকির স্বভাববর্ণনায় এই প্রেমোন্মাদনার পরিসর অতি অল্প। সুন্দরী বনভূমি তাহার অজস্র সম্ভার লইয়া নিতান্ত পরিপূর্ণ ভাবেই কবিচিত্তে আপনার ছায়াপাত করিয়া গিয়াছে। সেই ছায়াস্নিবিড় নির্জ্জন বনপ্রদেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শোকাকুল রামচন্দ্রের সকরুণ বিরহগীতি একমাত্র বীণাধ্বনির ন্যায় রহিয়া রহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু কখনও চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে নাই। রমণীয় গিরি-সানুদেশের পুষ্পিত বনপথে বিচরণ করিতে করিতে আকুল বৈদেহীকান্তের নয়নের সম্মুখে ঈষদ্-ভীতা লজ্জারুণা প্রিয়তমার সুমধুর রূপচ্ছবিখানি বহুবারই ভাসিয়া উঠিয়াছে, বিকসিত পদ্মবনের প্রফুল্ল হাস্যে কাহার দুইটী পদ্মতুল্য অক্ষির স্মিত-দৃষ্টির মধুর সম্ভাষণের প্রত্যাশায় বিরহী রাজপুত্র ক্ষণে ক্ষণে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহার পরই সুগভীর পরিবেদনার সহিত হাহাকার করিয়া উঠিয়াছেন—'পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং সততং প্রিয়পঙ্কজাম্। অপশ্যতো মে বৈদেহীং জীবিতং নাভিরোচতে।'—সেই পদ্মপত্র-বিশালাক্ষী পঙ্কজপ্রিয়া বিদেহতনয়ার অদর্শনে আমার আর বাঁচিয়া থাকিতে কিছুমাত্র আসক্তি বোধ হইতেছে না।—তথাপি বৈদেহী এখানে স্মৃতিমাত্র। একজন আর একজনকে স্মরণ করাইয়া দেয়, একজনকে অবলম্বন করিয়া আর একজন আসিয়া উপস্থিত হয়। রহিয়া রহিয়া থাকিয়া থাকিয়া বিরহাতুর রামভদ্রের সকল চিত্ত মথিত করিয়া মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সত্য তথাপি তাহার পরিব্যাপ্তি এত প্রশস্ত নহে যাহা বিশ্ব সংসারের অপর সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব অনায়াসে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া বিরহী-চিত্তের সম্মুখে একমাত্র বিরহিণীকেই প্রত্যক্ষীকৃত করিয়া রাখিতে পারে। তাই পদ্মবনের গন্ধবহ সুমন্দ সমীরণের স্পর্শও শোকক্লিষ্ট রঘুপতির নিকট —'নিঃশ্বাস ইব সীতায়াঃ বাতি বায়ু মনোহরঃ।' প্রিয়তমা সীতার মৃদু নিঃশ্বাসের মতই সুখকর ও মনোহর বলিয়াই বোধ হইয়াছে, বিচ্ছেদের বিবদাহে তাহা উত্তপ্ত হইয়া যায় নাই; প্রচণ্ড শোকের বাষ্পাকুল মুহূর্ত্তেও সম্মুগ্ধ দৃষ্টি পুষ্পিত কিংশুকের শাখায় শাখায়, রক্ত কুরবকের গুচ্ছে গুচ্ছে, পদ্মকাশ ও নীলাশোকের স্তবকে স্তবকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবার অবকাশ পাইয়াছে, প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে দৃষ্টিপথ সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে নাই। সম্মুগ্ধ রাঘবেন্দ্র অধীর আবেগে বারংবার প্রাণতুল্য সহোদরকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—'সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়া দক্ষিণে গিরিসানুষু। পুষ্পিতাং কর্ণিকারস্য যষ্টিং তু পরিশোভিতাম্'।—লক্ষ্মণ, দেখ পম্পার দক্ষিণপার্শ্বী শৈলভূমিতে পুষ্পিত কর্ণিকারের কি অপরূপ রূপমাধুর্য্য।

বাহিরের প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া একান্ত সত্য ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াই কবির নয়নের সম্মুখে আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছে, কবি এই সহজ সৌন্দর্য্যরসের উচ্ছ্বলিত ধারাকে কোনও প্রয়োজনবোধের সীমারেখায় আবদ্ধ রাখিয়া, কোনও রস-বিশেষের আলম্বন বা উদ্দীপন বিভাবনের প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইহাকে গৌণীভূত করিয়া রাখেন নাই। ধীরে ধীরে পুষ্পিত কুঞ্জবনের মধ্য দিয়া পদচারণা করিয়া চলিয়াছেন। দেখিতে ভাল লাগে, না দেখিয়া থাকা যায় না, কেবল মাত্র দেখিয়া লইবার এই নিষ্প্রয়োজন আনন্দবোধের আবেগেই দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র মালতীর মৃদু নিঃশ্বাস, কমলের স্মিত বিকাশ ও কেতকীর সুখস্পর্শের অতিরিক্ত প্রয়োজনবোধের মাত্রায়ই তাহার পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া হইয়া যায় নাই, শত বর্ণের কুসুম সম্ভারে পুষ্পের ডালি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে,—চিরবিল্ব, হিন্তাল ও শিংশপার সারিও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়া দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে,—কাহারও স্থানাভাব ঘটে নাই।

কাব্যের মধ্য দিয়াই কবিচিত্তের পরিচিতি। দৃশ্যমান বিষয়বস্তুকে আলম্বন করিয়া আপন লৌকিক স্বার্থ সংক্ষোভের বাহিরে যে রস কবিচিত্তে উপচিত হইয়া উঠে তাহাই সমগ্র কাব্যভূমিকে অভিষিঞ্চিত করিয়া নানারূপ সংঘাত বিঘাতের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ঘটনা-সমাবেশের ছোট বড় উপলখণ্ডকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ছল ছল ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলে। পণ্ডিত-প্রবর ক্রোচে ইহাকেই বলিয়াছেন spontaneous and ideal personality—লৌকিক স্বার্থসংস্পর্শকে অতিক্রম করিয়া কবির আপন রসানুস্যন্দী ব্যক্তিত্ব। বিদগ্ধ সমাজ সমস্ত কাব্য মহাকাব্য নাটক ও উপন্যাসের রসাভিনিঞ্চনের উৎসমূলে কবিচিত্তের এমনি একটা ভাবপ্রবণতাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ক্রৌঞ্চ-শোকার্ত্ত বিরহী কবির মর্ম্মের স্পর্শ আমরা রামায়ণের অধ্যায়ে অধ্যায়ে পাইয়াছি—তাহার পর নববসন্তের প্রারম্ভে রমণীয় পম্পাতীরে আসিয়া কবিচিত্তের যে আর একটা বিশিষ্ট ধারার সহিত পরিচিত হইলাম, তাহা কবি-হৃদয়ের অপর আর একটা ভাব-বিভ্রান্তির স্বতন্ত্র রসস্ফূর্ত্তি। দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, আঘাত আছে, গ্লানিমা আছে, তথাপি তাহাদের লইয়াই যেন চিত্তের সমগ্র পরিব্যাপ্তি রেখাবদ্ধ নহে।—এই নিরন্তর সংক্ষোভ বিক্ষোভের মধ্য দিয়াও চিত্তের আর একটা বাতায়নপথ বাহিরের প্রকৃতির অভিমুখে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত হইয়া থাকে,—সম্মুখীন হইলেই বাহিরের প্রকৃতি সেই মুক্তদ্বার প্রবেশপথ দিয়া নিঃশব্দে আসিয়া কবির চিত্ত-মুকুরে আপনার ছায়াপাত করিয়া যায়, সংসারের কোনও মসীপাতই ইহাকে অবলিপ্ত করিতে পারে না। স্পষ্টতঃ ভাষায় প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পম্পাতীরের স্বভাব-বর্ণনায় প্রকৃতির প্রতি কবি-চিত্তের এই সহজ ও স্বভাবগত অনুরক্তির ব্যঞ্জনাই যেন অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কেন যে স্ফটিক মণিহারের ন্যায় ছিন্ন অশ্রুমালায় পরিশোভিত হইয়াও রাজীবলোচন রামচন্দ্রের পম্পার শোভা নিরীক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি থাকিয়া যায় নাই বুঝিতে পারি ;—বুঝিতে পারি কবি আপন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহারই উৎসারিত রসধারায় সমস্ত কাব্যভূমি প্লাবিত করিয়া দিতেছেন।

বাহিরের জগৎ, নদ, নদী, গিরি, কান্তার, তাহার সমস্ত রূপ ও আলো লইয়া নিতান্ত objective ভাবে নিতান্ত বাহিরের বস্তু হিসাবেই কবির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ঈষদ্‌ভীতা হরিণীর শঙ্কিত আঁখিতারকায়, রঞ্জিত কুসুমের রাগরক্তিমায়, কুটিলা গিরিনদীর বঙ্কিম গতিভঙ্গে পলে পলে অনুক্ষণ সেই মৃগনয়না বিম্বাধরা শুভ্র প্রিয়তমার প্রতিচ্ছায়া কল্পনা করিয়া কবি কখনও স্বভাবের মর্য্যাদাকে অতিক্রম করেন নাই। চূত কুসুমের কেসরপরাগে বনপথ গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে, কারণ্ডব-বধূ প্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া কল-কূজনে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, পুষ্পভারনম্র সুন্দরী মাধবীলতা সহকারশাখাকে বেষ্টন করিয়া ঈষদ্ সমীরণে বারে বারে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে—চকিতে একবার বিরহার্ত্ত রঘুপতির কাতর নয়নের সম্মুখে সেই সুকুমারী তন্বীর ক্ষীণা দেহবল্লরীর অপরূপ রূপলাবণ্যের সুকোমল ছবিখানি ভাসিয়া উঠিয়াছে—আবার পর মুহূর্ত্তেই মত্ত ময়ূর-ময়ূরীর যুগল নৃত্যোৎসবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাকেই আলম্বন করিয়া বিগতদিনের সুখস্মৃতির বিবরণ দিতে দিতে অথবা বর্ত্তমান বিরহকাতর চিত্তের একান্ত নিঃসঙ্গতার করুণ বিলপনের মর্ম্মন্তুদ হাহা-

কারের মধ্যে কবি কোথাও প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন নাই। কবিগুরুর সহজ সৌন্দর্য্যোপভোগে এই Pragmatism অথবা ব্যবহারিকতার ছায়া অত্যন্ত ক্ষীণ।

প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণে ঘনপত্রসংচ্ছাদিত তীরবর্ত্তী তরুরাজি ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে, সুকোমল লোধ্রপুষ্পগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে, পম্পার স্বচ্ছ জলরাশি চঞ্চল বীচিমালায় ঈষদ্‌বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে—বিরহাতুর রামচন্দ্র চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কখনও অধীরোন্মাদনায় পার্শ্বচর ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়া কহেন নাই,—"দেখ লক্ষ্মণ, সমস্ত বনপ্রকৃতিও পুষ্পচ্ছলে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, মন্দ মন্দ সমীরণের ঈষৎ ব্যজনে যেন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আপনার দক্ষিণ হস্তের সুশীতল স্পর্শ দিয়া সমস্ত সন্তাপ জুড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন।"—বাল্মীকির প্রকৃতি 'কালিদাসের' 'প্রকৃতি'র ন্যায় 'চেতনবদ্‌ব্যবহারিণী' নহেন,—প্রকৃতিতে মানুষের ধর্ম্ম আরোপিত করিয়া পুণ্যশ্লোক বাল্মীকি তাহার সহিত কালিদাসের ন্যায় বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে প্রয়াস পান নাই। প্রকৃতিকে তাহার আপন জড়ত্বের সীমায়, আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াই কবি তাঁহাকে উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার সহজ রসোপভোগের ধারা কালিদাসের ন্যায় স্বভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া কোনও রূপ ব্যবহারিকতার সংশ্লেষে আবিল হইয়া উঠে নাই; অথবা যে idealism বা পরিকল্পনাবাদের প্রবাহ একদিকে কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, অপর দিকে প্রাচীন Anglo-saxon যুগ হইতে উৎসারিত হইয়া Wordsworth, Keats, Shelley, Swinbern এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া অতি আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত—যুগ যুগ ধরিয়া জগতের কাব্যসাহিত্যকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহারও ধারাচিহ্ন বাল্মীকির স্বভাববর্ণনায় একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রকৃতির নানা মনোহারিত্বের সুনিপুণ ছবি কালিদাসও বহুবার বহুভঙ্গীতে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া একদিকে যেমন প্রকৃতির নানা চমৎকারিত্বের মাধুর্য্য নানাভাবে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে তেমনই এক রসস্বরূপের বিচিত্র রসলীলাও ইহারই স্তরে স্তরে আপনাকে অত্যন্ত পরিস্ফুটভাবেই অভিব্যক্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। যে অব্যয়, অনাদি, চেতনাময় পুরুষ জলস্থল পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে— চন্দ্র-সূর্য্য, জল-অগ্নি, আকাশ-বায়ু—সমস্ত প্রকৃতি জুড়িয়াই তাঁহার লীলা। 'প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ'—যিনি দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহেন এই রূপায়মান বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া তাঁহারই নিরন্তর প্রকাশ চলিয়াছে। কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির নানা সম্ভোগলীলার মধ্য দিয়া এই Idealismএর প্রভাবই অতি সুমধুরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে;—কিন্তু বাল্মীকির স্বভাববর্ণনায় ব্যঞ্জনায়ও ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই রূপে-রসে-গন্ধে ভরা প্রকৃতিকে আদিকবি নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই ইহার সহিত তাঁহার বারংবার রসযোগ ঘটিয়াছে—এতদ্ব্যতীত অপর কোনও mystic communication অথবা ইন্দ্রিয়াতীত যোগাযোগ, প্রকৃতির সহিত কবির অন্তরধাতুর বিরহ-মিলনের কোনও রসচিত্র বাল্মীকির রসসাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া আপন অন্তঃপ্রকৃতির কি পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিরূপ আদান প্রদান চলিল, এই বহিঃপ্রকৃতির মনোহারিত্বে চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস কেমন করিয়া সমস্ত দেহ-মনকে বিবশ করিয়া তুলিল অথবা এই রূপময় জগতের অন্তরালে কোন্ অরূপের অস্পষ্ট ইসারা আসিয়া চিত্তের দুয়ারে আঘাত করিয়া গেল, Wordsworth, Keats অথবা Shelleyর কাব্যের ন্যায় বাল্মীকির স্বভাব-বর্ণনায় এই সকলের হিসাব-নিকাশ, আলাপ-আলোচনা, কখনও স্থান পায় নাই। কেতকী ফুটিয়াছে বকুল ঝরিয়াছে, অশোক কিংশুকের রচিত স্তবকে সমস্ত বনস্থলী রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—মুগ্ধ শিল্পী আপনার বিহ্বল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কেবলই চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন—ইহারই মধ্য দিয়া অন্তরের অন্তর্লোকে অপর কোনও সুন্দরতরের স্পর্শ আসিয়া পৌঁছায় নাই—যে, দৃষ্টির মধ্য দিয়াও কেবল 'দৃষ্টি এড়াইয়া' বেড়াইতেছে—বাতাসে যাহার অঙ্গের সুবাস ভাসিয়া আসিয়াছে, 'কুসুমে কুসুমে যাহার চরণের চিহ্ন'

দেখা দিয়াছে, পলাশের শাখায় শাখায় যাহার উত্তরীয় দুলিয়া উঠিয়াছে—সেই চির অ-ধরা—

'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে
সে কি আজ দিলো ধরা গন্ধে ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে ॥
ওকি তার উত্তরীয় শাখায় শাখায় উঠলো দুলি,
আজি কি পলাশ বনে ঐ সে বুলায় রঙের তুলি,
ওকি তার চরণ পড়ে তালে তালে
মল্লিকার ঐ ভঙ্গীতে।' (রবীন্দ্রনাথ)

এমনি করিয়া বাহির হইতে অন্তরে, রূপ হইতে অরূপে সঞ্চরণ করিবার লীলাভঙ্গী, বাহিরের হৃদয়ে চক্ষু রাখিয়া অন্তরের অন্তরতমকে সাক্ষাৎ করিবার দৃষ্টি, বাল্মীকির রস-সাহিত্যকে কোথাও অলৌকিক স্পর্শে (mystic tiage) অনুরঞ্জিত করিয়া রাখে নাই। দেখিতে ভাল লাগে, না দেখিয়া থাকিতে পারা যায় না, কেবলমাত্র দেখিবার এই আনন্দের আবেগেই কবি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া গিয়াছেন এবং যাহা যেমন ভাবে দেখিয়াছেন আপনার হৃদয়ের আনন্দের রসে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে ঠিক তেমনই ভাবে অপরের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন কবির স্বভাব কবিত্বকে এইখানে আমরা একান্ত ভাবেই naturalistic realism বলিয়াই অভিহিত করিতে পারি। বিদগ্ধ গোষ্ঠি ইহাকেই বলিয়াছেন—স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ।

পরবর্ত্তীকালে একমাত্র ভবভূতি ও অভিনন্দই বোধ হয় এইভাবে আদিকবির পদাঙ্কানুসরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি কবিগুরুর বর্ণনার প্রতি স্তরে স্তরে যে হর্ষের ঝঙ্কার প্রাণের রসের যে সহজ ও সাবলীলস্পর্শ জাগিয়া উঠিয়াছে, পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোনও কবির কাব্যেই তাহা তেমনভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে নাই। এমন কি কালিদাসের প্রকৃতির বর্ণনায়ও সে স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী, প্রকৃতির সংস্পর্শের সেই সাবলীল সুখস্পর্শ তেমন ভাবে পরিস্ফুট নহে।

শ্রীমতী প্রীতি গুপ্ত

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩২

পরদিন সকালে যখন প্রমথর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। প্রায় এক ঘণ্টা হ'ল সূর্যোদয় হয়েছে, বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে লক্ষ্ণৌ যেতে হবে, এত দেরি পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকার জন্য লজ্জিত হ'য়ে সে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ ক'রে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যা তখন পথে ব্যবহারের উপযোগী বিছানা-পত্র একটা হোল্ড-অলে বাঁধিয়ে নিচ্ছে। বাঁধা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, শেষ বক্‌লসটি লাগিয়ে মোটটার উপর দু-চারটা চড় মেরে ভৃত্য বললে, "কোথায় রাখব মা-জী ?"

সন্ধ্যা বললে, "কোথায় আবার রাখবে ?—নিচে যেখানে সমস্ত জিনিস পত্র রাখা হয়েছে সেইখানে রাখগে। সরকার মশাইকে লিখিয়ে দিয়ো।"

ভৃত্য মোট নিয়ে চ'লে গেল।

প্রমথ বললে, "আশা করি আমার অভাবে কোনো অসুবিধে হয়নি উষা ?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "নিজেকে হঠাৎ এত খাট ক'রে মনে করছ কেন যে তোমার অভাবে কোনো অসুবিধে হবে না ?"

একটা নিবিড় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন ক'রে প্রমথ বললে, "বিশেষ একটা সাধু উদ্দেশ্যে।"

হাস্যাবরুদ্ধ মুখে সন্ধ্যা বললে, "সাধু উদ্দেশ্যটা কি শুনতে পাইনে ?"

"বিনয় প্রকাশ।"

শুনে সন্ধ্যা হাসতে লাগল; বললে, "বুঝতে পারিনি! কিন্তু আপাততঃ বিনয় প্রকাশ বন্ধ রেখে একটু কাজের লোক হও দেখি।"

উচ্ছ্বাসের সহিত প্রমথ বললে, "অতি অবশ্য! কি করতে হবে বল ?"

"মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে নাও।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ ক্ষণকাল তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল; তারপর কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে বললে, "বিদ্রূপ! আচ্ছা, এ অপমানের প্রতিশোধ নোব রেল-গাড়ীতে উঠে,—তখন করব একেবারে পুরোপুরি ননকো-অপারেশন। দেখি তুমি কেমন ক'রে লক্ষ্ণৌ পৌঁছও!"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তা কোরো,—শুধু খাওয়ার সময় খেয়ো, আর—" কথা শেষ না ক'রে সে হাসতে লাগল।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "আর কি ?"

"তুমিই বল না, কি।"

"ঘুমোবার সময়ে ঘুমিয়ো ?"

সন্ধ্যা খিলখিল করে হেসে উঠল; বললে, "ঠিক তাই! কি করে বুঝলে ?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বললে, "তা বলব না। আমার যদি আরব দেশের একটা বেগবান শাদা ঘোড়া থাকৃত তা হ'লে এ অপমানের প্রতিকারে কি করতাম জান ?"

সপুলকে সন্ধ্যা বললে, "কি করতে ?"

"তাইতে সওয়ার হ'য়ে বায়ুবেগে বালীগঞ্জের মাঠ পেরিয়ে গড়ের মাঠ ছাড়িয়ে ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে হাওড়া ব্রিজ পার হ'য়ে দেশান্তরে চ'লে যেতাম! তা যখন নেই, তখন কি করব জান ?"

"কি করবে ?"

"কক্ষান্তরে গিয়ে চা-পান করব।"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "সেই কথাই ভাল। আমি ততক্ষণে গাড়ির খাবারগুলো কতদূর এগোলো দেখে আসি।"

সন্ধ্যার তাগাদার দাপটে বেলা নয়টার মধ্যে সকল ব্যবস্থা ঠিক হ'য়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই সকলে হাওড়া ষ্টেশনের

দিকে রওনা হ'ল। সঙ্গে চলল সাধুচরণ, পাচক মাধব এবং পরিচারিকা সারদা।

যে-সকল দাস-দাসী-দরোয়ান-মালী কলিকাতার বাড়িতে রইল, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে প্রণাম করবার জন্য তারা বিদায়-কালে গাড়ির কাছে এসে জটলা বাঁধল। বিচ্ছেদের করুণতায় রামভজন সিং-এর চক্ষু সজল হ'য়ে এল,— বললে, মা-জীর অভাবে সমস্ত বাড়ি 'শূন' হয়ে যাবে, মন লাগবে 'উদাস',—সুতরাং মা-জী যেন অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করেন।

অর্থে এবং মিষ্টবাক্যে সন্ধ্যা সকলকে পুরস্কৃত করার পর মোটর রওনা হ'ল।

ষ্টেশনে যখন তারা পৌঁছল তখন গাড়ি ছাড়তে মিনিট কুড়িক বিলম্ব আছে। ইতিপূর্বে বাড়ির পুরাতন সরকার যোগীন দত্ত জিনিস-পত্র ও বামুন-চাকরদের নিয়ে এসে হাজির ছিল।

একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের তলার দুটো বার্থ প্রমথ এবং সন্ধ্যার জন্য রিজার্ভ করা ছিল, এবং উপরের দুটো বার্থের মধ্যে একটা রিজার্ভ করা ছিল কোনো ইংরাজ ভদ্রলোকের নামে। রিজার্ভ কার্ডে নাম প'ড়ে সন্ধ্যা বললে, "ই, এ, বেণ্টলী।"

প্রমথ বললে, "তা হ'লে ভালই হয়েছে। আপাততঃ আমরা দুজনে প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চটা অধিকার ক'রে বসি, আর দিনের বেলা বসবার জন্যে বেণ্টলীকে ও-দিকের বেঞ্চটা ছেড়ে দেওয়া যাক্।"

প্রমথর কথার ধরণে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা বললে, "বেণ্টলীকে তুমি চেনো না-কি?"

মৃদু হেসে প্রমথ বললে, "এ পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ নেই। তবে কি জান?—উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্। মনে মনে একটা কুটুম্বিতে পাতিয়ে নিলেই হ'ল।"

সন্ধ্যা হাসতে লাগল; বললে, "তাই বল! আমি ভাবছিলাম, তোমার কার-কারবারের চেনাশোনা কোন সাহেব হয়ত! সারাপথ ভজোর-ভজোর করে গল্প করতে করতে যাবে।"

প্রমথ হেসে উঠে বললে, "ও! সেই দার্জ্জিলিং যাবার সময়কার কথা মনে পড়ল বুঝি? না, এবার আর ভজোন-ভজোনের কোনো ভয় নেই। সারাপথ গুঞ্জন করতে করতেই যাওয়া যাবে।"

প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হাস্য করলে।

মাধব তৎপর লোক। প্রমথর সঙ্গে সে কয়েকবার রেলপথে যাতায়াত করেছে। গাড়িতে উঠে তাড়াতাড়ি হোল্ডল খুলে বেঞ্চের উপর বিছানা পেতে দিলে। অপর বেঞ্চে সন্ধ্যার শয্যা পাততে যাচ্ছিল, প্রমথ মানা করলে, "এখন ওটা থাক্, রাত্রে পেতো।"

কামরার সম্মুখে প্ল্যাটফর্মে সরকার যোগীন দত্ত অপেক্ষা করছিল, তাকে সম্বোধন ক'রে প্রমথ বললে, "সরকার মশায়, সাধু আর সারদাকে ঠিক করে বসিয়ে দিয়েছেন ত?"

যোগীন দত্ত বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সার্ভেণ্টস কম্পার্টমেণ্টে সাধু বসেছে, আর সারদা বসেছে ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে।"

"আচ্ছা, আপনি তা হ'লে এখন যেতে পারেন।"

"আজ্ঞে গাড়িটা ছেড়ে যাক্, তারপরে যাব। যদি কোনো দরকার পড়ে।"

প্রমথ বললে, "আচ্ছা।"

সন্ধ্যা বললে, "সরকার মশায়, মাঝে মাঝে চিঠি-পত্র দিয়ে খবরাখবর জানাবেন।"

"জানাব মা।"

"আর দেখুন, একটু কাছে আসুন ত'।"

নিকটে এগিয়ে এসে যোগীন দত্ত বললে, "মা?"

একখানা দশ টাকার নোট যোগীন দত্তর হাতে দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "জোড়া দুই শাড়ি সাতুকে কিনে দেবেন।" সাতু যোগীন দত্তর কনিষ্ঠা কন্যা, সম্প্রতি পিত্রালয়ে এসেছে।

উৎফুল্ল মুখে যোগীন দত্ত বললে, "এই সেদিন ত' তাকে অমন একটা ভাল শাড়ি দিলেন, আবার শাড়ি কেন মা?"

সন্ধ্যা বললে, "তা হোক, জোড়া দুই সাধারণ শাড়ি তাকে কিনে দেবেন।"

"কিন্তু তা'তে এত পয়সা লাগ্‌বে না ত মা।"

"যদি কিছু বাঁচে, সাতুর ছেলেকে খেলনা কিনে দেবেন।"

নত হ'য়ে যুক্তকরে প্রণাম করে যোগীন দত্ত বললে "যে আজ্ঞে মা।"

গাড়ি ছাড়তে মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি এমন সময়ে বেন্টলী এসে উপস্থিত হ'ল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মাথার আধখানা জুড়ে টাক। বয়স বৎসর পঞ্চাশের কাছাকাছি। আরদালীর পালিশ করা তকমা থেকে বোঝা গেল তার প্রভু সারভেয়ার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া অফিসের কোনো বড় কর্ম্মচারী।

কামরায় প্রবেশ করবার পূর্ব্বে বেন্টলী গাড়ির হাতলে লটকানো রিজার্ভ কার্ড থেকে তার সীটের সংস্থান বুঝে নিলে, তারপর ভিতরে প্রবেশ করে একটা বেঞ্চ একেবারে খালি রয়েছে দেখে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "আমি যদি উপস্থিত এ বেঞ্চে একটা সীট্ অধিকার করি তা হলে বোধকরি আপনাদের তেমন অসুবিধা হবে না।"

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া আপনি নিশ্চয় জানেন যে দিনের বেলা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বার্থের উপর রিজার্ভের কোনো দাবী থাকে না।"

বেন্টলী স্মিতমুখে বললে, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আপনার সঙ্গিনী মহিলা যদি এদিকের বেঞ্চটাই বেশি পছন্দ করেন ত তিনি এর সবটাই অধিকার করতে পাবেন, আমি আপনার সঙ্গে ও বেঞ্চে বসতে পারি।"

প্রমথ বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না, আমরা দুজনেই এ বেঞ্চে থাকব। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ুন।"

ধন্যবাদ জানিয়ে বেন্টলী অপর বেঞ্চটা অধিকার করে বসল।

একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দিলে এবং দেখতে দেখতে হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ডে এসে পড়ল।

গাড়ি হু-হু করে ডানকুণির বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করছিল, প্রমথ বললে, "ঐ যে দেখছ উষা, একটা পথ সোজা ওদিকে চলে গেছে, ওটা দিয়ে গেলে কৃষ্ণপুর নামে একটি গ্রামে যাওয়া যায়। সেখানে একবার জষ্ঠি মাসে আমার এক বন্ধুর বাড়ি এমন আলো চিঁড়ে আর আমের ফলার করা গিয়েছিল যে কোথায় লাগে তার কাছে তোমার চপ কাটলেট।"

কৌতূহলী হয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ ষ্টেশনে নেমে কৃষ্ণপুর যেতে হয়?"

প্রমথ বললে "ডানকুণি। এই যে এখনি ডানকুণি পাস্ ক'রে এলাম। ডানকুণি নামের একটা বেশ গল্প আছে, সে একসময়ে তোমাকে বলব অখন। কিন্তু এ রকম করে সুবিধে হবে না, এস দস্তুরমতো বাঙলা ভাবে পা তুলে তৃতীয় ব্যক্তির দিকে পিছন ফিরে বসে দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতে যাওয়া যাক্।"

প্রস্তাবটা সন্ধ্যার কাছে এত উৎকৃষ্ট বোধ হ'ল যে কোনো প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করে অবিলম্বে সে পা তুলে পিছন ফিরে বসল। প্রমথও তার পাশে সেইভাবে উপবেশন করল।

প্রমথ বললে, "এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা কথার বিচার করা যাক উষা।"

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা বললে "কি কথা?"

প্রমথ বললে, "এই ত আমি কত বার কত জায়গায় যাতায়াত করেছি, কিন্তু কৈ কখনো ত আজকের মতো এমন করে চাকর-বামুন-দারওয়ানরা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে নি। কখনো ত দারোয়ান আমাকে বলেনি যে বাবু, আপনার অভাবে বাড়ি 'শূন্' আর মন 'উদাস' হয়ে যাবে। অথচ তুমি আসবার আগে আমি ত এ বাড়ির একাধিপতি অধীশ্বর ছিলাম। তোমার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে ওদের ব্যবহারের এতটা ভেদ কিসের জন্যে হয় তার একটা বিচার হওয়া উচিৎ উষা।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা সহাস্যমুখে বললে, "এখনো সে কথা তোমার মনে আছে না-কি?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বললে, "থাকবে না? যে কথা মনের মধ্যে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল সে কথা এরই মধ্যে ভুলে যাব?"

হাসিমুখে সন্ধ্যা বললে, "কিসের রেখাপাত? ঈর্ষার?"

প্রমথ বললে, "ঈর্ষার নয়ত আবার কিসের? দিব্যি ছিলাম, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলনা। কোথা থেকে তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসে এমন করলে যে, মহলের সর্ব্বত্র—অন্দর, বার—বেদখল হয়ে গেলাম।"

সন্ধ্যা বললে "নিজে ডেকে এনে এখন আমার দোষ দিলে কি হবে বল।"

প্রমথ বললে, "না, তা কিছুই হবে না; কিন্তু সদা-সর্বদা মনে মনে কি ভাবি, জান উষা?"

"কি ভাব?"

"ভাবি, ভাগ্যিস ডেকে এনেছিলাম! নইলে ত ভূতপূর্ব প্রমথনাথ, অর্থাৎ প্রমথনাথ ভূতই, থেকে যেতাম। তুমি এসে অজানা শক্তির এমন চাপ দিলে যে দেখতে দেখতে বহুকালের কয়লা হীরে হয়ে গেল। যে তোমাকে মলিন করতে পারত, তাকে তুমি দিলে চকচকিয়ে। তোমার এ ঋণ কি শোধ করতে পারা যায় উষা! আমার সম্পত্তি তোমার সঙ্গে আধা-আধি ভাগ করে নিয়েছি বলে তুমি কত সময়ে কত কথা বল। কিন্তু সে ঋণ ত ইচ্ছে করলে ফেলে দেওয়া যায়, ফিরিয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু এ ত যায় না,—এর শেষ নেই, শোধ নেই।"

বেগমপুরের মাঠ বিদীর্ণ করে ট্রেন বায়ুবেগে এগিয়ে চলছিল। প্রমথর রসগভীর কথার উত্তরে কোনো কথা না বলে সন্ধ্যা সুদূর দিকচক্রবালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ব'সে রইল। মনে মনে বললে, তুমি শুধু তোমার টাকাটাই দেখ, কিন্তু টাকা ছাড়া আর যে জিনিসে আমার সমস্ত প্রাণ-মন ভরিয়ে দিয়েছ তার কাছে টাকাটা যে কিছুই নয়, সে কথা ত' বোঝ না।

"উষা!"

সন্ধ্যা ফিরে চেয়ে মৃদুস্বরে বললে, "কি?"

"তুমি অদৃষ্ট মান?"

"মানি।"

"আমি সেই অদৃষ্টে তোমাকে পেয়েছি। আশ্চর্য দেখ, কোথাকার ধন কোথায় এসে আটকালো! কাদের গৃহলক্ষ্মী হবার কথা তোমার, হলে আমার গৃহলক্ষ্মী! কার হৃদয় আলোকিত করবার কথা, করলে আমার হৃদয় আলোকিত! তাদেরও পক্ষে এ সেই অদৃষ্টেরই কথা! যে জিনিসের অংশ মাত্র পেয়ে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়েছে, তার সবটা পেয়েও তারা তা হারালে! এর চেয়ে দুরদৃষ্ট আর কি হতে পারে তা জানিনে!"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না, বাহিরের দ্রুত-অপসৃয়মান দৃশ্যাবলীর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। প্রমথও ক্ষণকাল নীরবে ব'সে থেকে পুনরায় কথা আরম্ভ করলে।

"একদিক থেকে দেখলে আমারও কম দুরদৃষ্টের কথা নয়! আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখ। আজকের দুর্বলতা আমার ক্ষমা কোরো উষা, কথাটা একটু পরিষ্কার করেই বলি। তুমি এলে আমার গৃহের মধ্যে, আমার মনের মধ্যে, আমার প্রাণের মধ্যে—কিন্তু তবু তোমার অনেক-খানিই রইল সমাজের অনড় খোঁটায় বাঁধা! সমাজের সঙ্গে বিদ্রোহ করে দুজনে বাসা বাঁধলাম সমাজের এলাকার বাইরে, তবু রইল সমাজের অনুশাসন দুজনের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান হ'য়ে। আমি জানি উষা, আমার এই অন্তরের মধ্যে তোমার প্রতি যে ভালবাসা বাস করে তা এত বৃহৎ এত বিরাট যে, কোনো প্রিয়লাল তার কাছে সামান্য একটা বিন্দুর মতও বড় নয়। সেই বিরাট প্রেমের উন্মাদনায় তোমাকে আদর করবার জন্যে সোহাগ করবার জন্যে আমার দুই হাত উদ্যত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু দূর থেকে সমাজ তার রক্ত চোখের শাসনে তাদের অবশ করে দেয়! সমস্ত বিশ্ব-সংসার জানে তুমি আমার স্ত্রী, কিন্তু আমি জানি তুমি আমার স্ত্রী নও। এ কি কম দুঃখের, কম দুরদৃষ্টের কথা!"

ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "ঈশ্বর বিশ্বাস কর উষা? পরজন্ম মানো?"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললেনা, শুধু প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করলে। সে দৃষ্টি পরিবেদনায় বিহ্বল, সহানুভূতিতে আর্দ্র।

"ঈশ্বর যদি থাকেন আর পরজন্ম যদি সত্যি হয়, তা হ'লে কোনো রকমে কোনোদিন যদি ঈশ্বর ব'লে কাউকে খুঁজে বার করতে পারি ত' বলি, এ জন্মে যত মিথ্যা অভিনয় করালে পরজন্মে সমস্ত সত্যি কোরো, মায় কাল রাত্রের ভারতী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ঘটনা পর্য্যন্ত! কাঙ্গালকে শুধু লুব্ধ ক'রেই রেখোনা, তৃপ্ত কোরো তাকে!"

প্রমথর অন্তরের এই আকুল কামনার অভিব্যক্তি শুনে দুঃখে, বেদনায়, আনন্দে সন্ধ্যার চোখ থেকে অশ্রু ঝ'রে পড়ল। বহুকাল প্রমথর সহিত তার একপে প্রণয়-সমৃদ্ধ কথোপকথন

হয়নি। প্রাত্যহিক সংসারিক জীবনের দীর্ঘকাল একত্র যাপনের ফলে এ কথা অনেক সময়েই তারা ভুলে থাকৃত যে তাদের মিলনের মধ্যে কোনো ব্যত্যয় অথবা অপূর্ণতা আছে ; সুতরাং অধিকাংশ সময়েই তারা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততায় দিনাতিপাত করত। কিন্তু গত রাত্রের ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমের ঘটনার অচিন্তিত আঘাত তাদের দুঃখ-গ্লানির ক্ষতস্থানকে পুনরুন্মোচিত ক'রে তাদের যেন প্রথম মিলনের তরুণতায় টেনে নিয়ে গেছে। তাই আমার নূতন ক'রে তাদের হৃদয়ে দুঃখ-সুখের বান ডেকেছিল, যার অধীরোন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস কথোপকথনের মধ্যেও উদ্বেল হয়ে উঠছিল।

নির্ব্বাত বর্ষাদিনের আর্দ্র উত্তাপের পরিশ্রান্তিতে বেণ্টলীর নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল, দ্রুত-চালিত ইলেকৃট্রিক পাখার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন অতিক্রম করে মাঝে মাঝে তার নাসিকা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ট্রেন চলেছিল বন-জঙ্গল-পথ-প্রান্তর ভেদ ক'রে উন্মত্ত বেগে বর্দ্ধমানের অভিমুখে, যেখানে না পৌঁছতে পারলে তার এই একটানা অবিশ্রান্ত গতির বিরাম নেই। বাহিরে নিসর্গ তার গাছপালা, নদীনালা, বন-বাদাড় নিয়ে দিক্‌চক্রবালের মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষিপ্র বেগে আলোড়িত হচ্ছিল। প্রমথ ও সন্ধ্যা বহুক্ষণ ধরে তাদের চিন্তা-বিলাসে মগ্ন হ'য়ে পাশাপাশি নিঃশব্দে ব'সে রইল। বাক্য যেখানে নীরবতার নিকট পরাস্ত হয় সেই অবস্থায় তারা উপনীত হয়েছিল।

হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা-বিমুক্ত হ'য়ে ব্যস্তভাবে হাতের রিষ্টওয়াচ দেখে সন্ধ্যা বললে, "যাঃ! তোমার খাওয়ার দেরী হ'য়ে গেল। সাড়ে এগারটা বাজে।"

প্রমথ নিজের ঘড়ি দেখে বললে, "এমন কিছু দেরি হয়নি, এখন সওয়া এগারটা, তোমার ঘড়ি কিছু ফাষ্ট আছে। বর্দ্ধমান পৌঁছতে এখনো অনেক দেরি।"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি একটা বড় প্লেটে নানাবিধ আহার্য্য সাজিয়ে ফেললে, তারপর বাথরুম থেকে প্রমথ হাতমুখ ধুয়ে এসে বস্‌লে সেই প্লেট ও কাঁচের গ্লাসে ক'রে এক গ্লাস জল তার সম্মুখে স্থাপিত ক'রে বললে, "খাও, পরে আরও দোবো।"

"কিন্তু তোমার ?"

"আমি পরে খাব অখন।"

"কেন ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "প্লেটের অভাব। বড় টিফিন-বাক্সটা মাধব ভুল ক'রে নিজের কাছে রেখেছে।"

প্রমথ বললে, "তা হলে পরে কোন্ প্লেটে খাবে ?"

"কেন, তোমার প্লেটে।"

"এঁটো পাতে ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "দোষ কি তাতে ? জাত যাবে না-কি ?"

প্রমথ বললে, "জাতের চেয়েও যে তোমাদের এমন একটা জিনিস্ আছে যা কথায়-বার্ত্তায় নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যায়।"

একটু ইতস্ততঃ করে, প্রমথর মুখের উপর একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু তোমার কাছে ত' সে জিনিস যাবার নয়।"

"নয় ?" প্রমথর মুখ উল্লাসে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল ; বললে, "এমন ক'রে প্রশ্রয় দিয়োনা উষা, এতটা মর্য্যাদা দিয়োনা। খাবার দাবার সব মাথায় উঠবে, পাগল হ'য়ে যাব।"

আর একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তবে এসব কথা এখন থাক,—তুমি খাও।"

প্রমথ বললে, "তুমিও এস না উষা, দুজনে এক প্লেটেই খাওয়া যাক্। টিফিন-কেরিয়ারটা কাছে রাখ; তুলে তুলে নিলেই হবে।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "না, তুমিই খাও, আমি পরে খাব অখন।"

প্রমথ বললে, "কেন, এক সঙ্গে খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে ? তুমি পরে খেলে আমাকে তাড়াতাড়ি ক'রে খাওয়া সারতে হবে। কারণ বর্দ্ধমান পৌঁছতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। এস, লক্ষ্মীটি।"

সন্ধ্যা একবার বেণ্টলীর দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে, তারপর মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা আসছি।" ব'লে টিফিন-কেরিয়ারটা নিকটে এনে রাখলে। বেণ্টলী তখন পাশ ফিরে নিদ্রা দিচ্ছিল।

৩৩

বেলা সাড়ে তিনটার সময়ে গাড়ি কর্ম্মাটারে পৌঁছল। এ ষ্টেশনে গাড়ি অতি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে। গার্ড হুইস্‌ল্

দিয়েছে, এমন সময়ে বিলাতী স্যুটপরা একজন বাঙালী যুবক ব্যস্ত হয়ে জিনিস-পত্র নিয়ে প্রমথদের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। কামরার ভিতর স্ত্রীলোক দেখে একটু কুণ্ঠার সহিত প্রমথকে উদ্দেশ করে বললে, "উঠতে পারি? কোনো অসুবিধা হবে না ত?"

প্রমথ তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে দিয়ে বললে,—"কিছু না। আসুন, আসুন।"

যুবকটি ক্ষিপ্রগতিতে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলে তার-পর জিনিস-পত্র তুলতে তুলতেই গাড়ি দিলে ছেড়ে। কুলীরা পয়সার জন্য চলন্ত গাড়ির সঙ্গে দৌড়চ্ছিল, যুবকটি তাড়াতাড়ি একটা টাকা বার করে তাদের মধ্যে একজনের হাতে গুঁজে দিলে। তারপর কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ির ভিতর চেয়ে দেখতেই চোখোচোখী হ'য়ে গেল সন্ধ্যার সঙ্গে। আরক্ত মুখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রমথরা যে বেঞ্চে বসেছিল তার প্রান্তদেশে একটা গদী-মোড়া চেয়ার ছিল, চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে যুবকটী ধীরে ধীরে তার উপর ব'সে পড়ল। কে এ সুন্দরী রমণী যাকে দেখে মনে হ'ল সে যেন কত দিনকার পরিচিত জন, যেন কোনো এক সময়ে তার সহিত যথেষ্ট জানা-শোনা ছিল। কে এ হ'তে পারে। তার কোনো বহুদূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া নয় ত, যার সহিত দীর্ঘকাল দেখা শুনা নেই। কিম্বা কোনো বন্ধু-বান্ধবের আত্মীয়া যার সহিত কোনো কালে অল্পদিনের জন্য আলাপ পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল। মুখখানা আর একবার ভাল করে দেখবার জন্য যুবকটী সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কিন্তু সন্ধ্যা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল বলে দেখা গেল না। যথা-সম্ভব মুখখানা মানসচক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত ক'রে নিবিষ্ট চিত্তে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল বছর চারেক আগেকার দেখা একখানা বিস্মৃতপ্রায় মুখ। কিন্তু ইহলোকের সহিত সকলপ্রকার দেনা-পাওনা মিটিয়ে যে চিরদিনের জন্য মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত করে কোনো লাভ নেই। কত লোকের সহিত কত লোকের আকৃতির সাদৃশ্য থাকে,—এও নিশ্চয় তাই-ই।

কিন্তু কি অদ্ভুত সুন্দর এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মুখ। আয়তগভীর দুটী স্নিগ্ধ চক্ষের কি অতলস্পর্শী দৃষ্টি। সমস্ত মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত ক'রে কি অপার্থিব সুষমা। মুহূর্তের জন্য মুখখানি দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হয়েছিল, কিন্তু এখনো যেন সুস্পষ্ট রেখায় জ্বলজ্বল্ করছে। সে যদি আজ বেঁচে থাকত তা হ'লে হয়ত এই রকমই দেখতে হ'ত। একটা তপ্ত শ্বাস যুবকটীর অন্তর ভেদ করে বাহিরের বায়ুমণ্ডলে মুক্তিলাভ করলে।

আগন্তুকের জিনিসপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গাড়ির মেঝের উপর প'ড়ে ছিল। প্রমথ বললে, "এর পরের ষ্টেশন মধুপুর। সেখানে সময় পাবেন। একটা কুলি ডেকে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেবেন।"

আগন্তুক প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব।"

"কতদূর যাবেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"আপাততঃ ফয়জাবাদ। পরে লাহোর হ'য়ে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাবার ইচ্ছে আছে।"

প্রমথ বললে, "ফায়জাবাদ যখন যাবেন তখন সমস্ত রাত ত' গাড়িতে কাটাতে হবে। উপরের একটা বার্থ খালি আছে। কিছু কিছু জিনিসপত্র রেখে আগে থাকতেই অধিকার করে রাখবেন।"

"ধন্যবাদ। তাই রাখব।"

আগন্তুকের বড় স্যুট-কেসটার উপর লিখিত নামের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রমথ চমকে উঠল,—ডক্টার পি, এল, চৌধুরী। স্যুটকেসের ধারের দিকে পি এ্যাণ্ড ও ষ্টীমার কোম্পানীর সবুজ আর বাদামি রঙের লেবেল আঁটা। মনে মনে অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু মনে করবেন না, আপনিই কি ডক্টার পি, এল, চৌধুরী?"

স্যুটকেসের উপর নামের পরিচয় পেয়ে প্রমথ যে এ কথা বলছে তা বুঝতে পেরে আগন্তুক বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই।"

এ ডক্টার পি, এল, চৌধুরী যে প্রিয়লাল চৌধুরী সে বিষয়ে প্রমথর মনে বিশেষ কিছু সন্দেহ না থাকলেও যেটুকু ছিল তা সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই মুহূর্তের মধ্যে অপসৃত হ'ল। সন্ধ্যার মুখ জবাফুলের মত আরক্ত এবং চক্ষের মধ্যে সুতীব্র দৃষ্টির দ্বারা নিষেধের শাসন,—খবরদার কোনো রকম চপলতা কোরো না।

এ নিষেধের খুব যে বেশি-কিছু প্রয়োজন ছিল তা নয়, কারণ প্রমথ সহসা কখনই আত্মপরিচয় প্রদান করতনা, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে নিষেধ না ক'রেও সন্ধ্যার নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার উপায় ছিল না।

ঘটনার অপরূপত্বে এবং আকস্মিকত্বে প্রমথ ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হয়ে রইল। যে ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার হ'তে বিচিত্র ঘটনাবলীর দ্বারা বিচ্যুত ক'রে নিয়ে নিয়তি সন্ধ্যাকে তার জীবনের পরম বস্তু ক'রে দিয়েছে, এবং যে অদেখা অজানা ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তার পক্ষে পরম কৌতূহলের, এবং অবচেতন মনের মধ্যে কতকটা উৎকণ্ঠার, বস্তু হয়ে বিরাজ করছে, সেই প্রিয়লালের সহসা বিনা নোটিশে তাদের একান্ত সান্নিধ্যে প্রবেশ এবং দীর্ঘ পথ একত্রে যাত্রার বিজ্ঞপ্তি প্রমথর মত শক্ত লোককেও প্রথমটা বিহ্বল করে দিলে। কিন্তু সে নিতান্তই অল্পক্ষণের জন্য, অবিলম্বে তার প্রকৃতির সহজ অবিচলতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা প্রত্যাবর্ত্তন করলে।

প্রিয়লালের দিকে একটু ফিরে বসে প্রমথ বল্লে, "দেখুন ডক্টার চৌধুরী, আপনি যাবেন ফায়জাবাদে, আমরা যাচ্ছি লক্ষ্ণৌ, দীর্ঘ পথ একত্র যেতে হবে। সুতরাং আপনার সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হবার জন্যে আমার মধ্যে যদি কৌতূহলের কিছু পরিচয় পান তা হ'লে সেটা আমার ভারতবর্ষীয় মনের দুর্ব্বলতা মনে করে ক্ষমা করবেন।"

প্রিয়লাল হাসিমুখে বল্লে, "সেই ভারতবর্ষীয় মন আমারও ত' আছে। সুতরাং আমার দিক থেকেও যদি সে রকম দুর্ব্বলতার পরিচয় পান তাহলে আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন।"

প্রমথ বল্লে, "শুধু ক্ষমা করবনা, সুখী হব। আমাদের বিষয়ে আপনার কোনোরকম কৌতূহল হ'লে তা নিবৃত্ত করতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। ডক্টার চৌধুরী, আমরা সংক্ষেপের পক্ষপাতী নই, বিস্তারের পক্ষপাতী। সুতরাং ধরুন যদি জানতে পারি যে আপনার নামের পি, এল ইংরাজি অক্ষর দুটি আদতে বাঙলা প্রদ্যুম্নলাল নামের সংক্ষিপ্তসার তাহ'লে নিশ্চয়ই দুঃখিত হব না, যদিও প্রদ্যুম্নলাল নামটির ব্যবহার বাঙলা দেশের চেয়ে বাঙলা দেশের বাইরে, মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চলেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। ও-নামের সঙ্গে মাছ-ভাতের চেয়ে ডাল রুটির যোগটাই বেশী।"

প্রমথর কৌতুকরসাত্মক কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বল্লে, "কিন্তু আমার নাম প্রদ্যুম্নলাল নয়; আমার নাম প্রিয়লাল।"

প্রমথ বল্লে, "প্রিয়লাল? তাই পি, এল। কিন্তু আমার মতে পি, কে হ'লে আরও ভাল হ'ত।"

সকৌতূহলে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? পি, কে কেন?"

প্রমথ বল্লে, "পি, কে অর্থাৎ প্রিয়কান্তি। সত্যি, নাম যদি আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে হয় তা-হ'লে আপনার নাম প্রিয়কান্তিই হওয়া উচিত ছিল। ভারি সুন্দর আপনি দেখতে।"

কথাটা সত্য তাতে সন্দেহ নেই। আকৃতির বিষয়ে এরূপ প্রশংসা প্রিয়লাল অনেক সময়ে অনেকের কাছে পেয়েছে। মৃদু হেসে সে বললে, "আপনি ত কিছু কিছু পরিচয় আমার পেলেন, এবার নিজের দিন। প্রথমে আপনার নামটি জানতে পারলে সুখী হব।"

প্রমথ বল্লে, "আমার নাম প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অর্থাৎ পি-এন্। আপনি পি, এল আর আমি পি, এন্।"

যে ব্যক্তি পোষ্টকার্ডে সন্ধ্যার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল তারও নাম যে প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সে কথা প্রিয়লালের আদৌ মনে পড়ল না। যে ভীষণ দুঃসংবাদ সে পোষ্টকার্ড বহন করে এনেছিল তার কাছে লেখকের নাম তুচ্ছ বস্তু; হয়ত ভাল করে প্রিয়লাল সে নাম লক্ষ্যই করেনি, করলেও হয়ত দুদিনেই ভুলে গিয়েছিল। আজ ত' সে প্রায় চার-বৎসরের কথা হল। মৃদু হেসে সে বললে, "মন্দ হয়নি ত। আমি পি, এল্ আর আপনি পি, এন্। মধ্যে একজন পি, এম্-এর অভাব। মধুপুরে পেয়ারীমোহন ব'লে কোন লোক যদি আমাদের কামরায় এসে ওঠে তা হলে আপনার আর আমার মধ্যে যোগটা সম্পূর্ণ হতে পারে।"

প্রমথ সহাস্যমুখে বললে, "আপনার আর আমার মধ্যে যে যোগ নিয়তি ঘটিয়ে দিয়েছে তাই যথেষ্ট। আর পেয়ারী-মোহনকে কামনা করে অকারণ ভীড় বাড়াবেন না।"

প্রমথর এ কথার মধ্যে যে কোনো-প্রকার দ্ব্যর্থ থাকতে পারে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করে প্রিয়লাল বললে,

"ঠিক বলেছেন, স্থানাভাব। আর যোগ বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই।"

প্রমথ বললে, "লাভ নেই শুধু নয়, ক্ষতি আছে। তাতে কেবল গোলযোগই বাড়বে।"

বাক্যের সহজ অর্থের বাইরে না গিয়ে প্রিয়লাল হাসতে হাসতে বললে, "তা সত্যি।"

ট্রেন মধুপুরের নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল; সহরের উপকণ্ঠের দুই একটি বাড়ি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যা জানালার ভিতর দিয়ে বাহিরের দৃশ্যাবলীর উপর তার অন্যমনস্ক মনের অন্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল। প্রমথ এবং প্রিয়লালের কথোপকথনের কিছু কিছু অংশ তার কানে আসছিল, কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। মনের মধ্যে তার এই দুশ্চিন্তা তীব্রভাবে দংশন করছিল যে, মর্মান্তিক হীনতা এবং গ্লানির মধ্য দিয়ে যে-ব্যক্তির সহিত চিরদিনের মতো সকল সম্পর্ক সকল বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে তার এই অনীপ্সিত এবং অপরিজ্ঞাত পুনঃপ্রবেশ ভবিষ্যতের বিধান না হয়, এবং নূতন ক'রে নিকৃষ্টতর দুঃখ গ্লানি এবং সমস্যার সৃষ্টি না করে। মনে মনে সন্ধ্যা একান্তভাবে এই প্রার্থনাই করছিল যে প্রিয়লালকে নিয়ে তার এই তৃতীয় বারের কাহিনী যেন কায়জাবাদেই নিরুপদ্রবে শেষ হয়, এবং তার মধ্যে কোনো প্রকার অসঙ্গত কামনা অথবা অন্যায় প্রত্যাশা তার মনকে প্রলুব্ধ না করে।

দেখতে দেখতে ট্রেন মধুপুরের ষ্টেশনে এসে স্তব্ধ হ'ল। জিনিষ-পত্রগুলো গুছিয়ে নেবার জন্য প্রিয়লাল একজন কুলি ডাকবার জন্য উদ্যত হতে প্রমথ বাধা দিয়ে বললে, 'আর কুলির দরকার নেই। মাধব এসে পড়েছে, ও-ই সব করে দিচ্ছে।" তখন মাধব বড় টিফিন-বাস্কেটটা নিয়ে তার ঠেলে কামরায় প্রবেশ করছে।

প্রিয়লাল বললে, "মাধব ত আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করবে।"

প্রমথ বললে, "খাবারের ব্যবস্থাও করবে, জিনিসের ব্যবস্থাও করবে। সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।" তারপর মাধবের দিকে চেয়ে বললে, "মাধব, টিফিন-বাস্কেটটা মার জিম্মা করে দিয়ে তুমি সায়েবের জিনিসপত্রগুলো ঠিক করে গুছিয়ে রেখে দাও।"

টিফিন-বাস্কেটটা সন্ধ্যার কাছে রেখে মাধব এগিয়ে আসতেই প্রিয়লাল উঠে দাঁড়িয়ে মাধবকে সাহায্য করতে উদ্যত হল।

প্রমথ বাধা দিয়ে বললে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না ডক্টার চৌধুরী, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বসে দেখুন আমি মাধবকে দিয়ে আপনার সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে দেওয়া'চ্ছি। যদি পছন্দ না হয় পাল্টে নেবেন।"

প্রিয়লাল কুণ্ঠিত স্বরে বললে, "না, না, পছন্দ না হবে কেন। কিন্তু আপনি কেন অনর্থক—"

প্রমথ বললে, "অনর্থক কিছু-ই নয় ডক্টার চৌধুরী, সব জিনিষেরই অর্থ আছে—ব্যক্ত কিম্বা গূঢ়—আমরা সব সময়ে ধরতে পারিনে।"

প্রিয়লাল বললে, "এখানে কিন্তু কিছু কিছু ধরতে পারা যাচ্ছে।"

প্রমথর দৃষ্টি ছিল মাধবের প্রতি এবং কান ছিল প্রিয়লালের প্রতি; বললে, "না, না, ও হোল না মাধব, হোল্ডল্ থেকে বিছানা বার করে একেবারে পেতে দাও। অধিকার বিস্তার করে রাখা ভাল।" তারপর প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে, "কি ধরতে পারা যাচ্ছে ডক্টার চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বললে, "ধরতে পারা যাচ্ছে যে আপনি যে রকম করেই হোক বুঝেছেন যে, আমি একটি মহা অপটু লোক, আর তাই বুঝে আপনার করুণার উদ্রেক হয়েছে।"

প্রমথ একটু হেসে বললে, "ঠিক তা নয় ডক্টার চৌধুরী, আপনি হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক ভগবান যাঁদের বোঝা বহন করেন। এমন ত কত লোক নিয়ত ট্রেন ফেল করছে, কিন্তু প্রিয়লাল-শ্রেণীর লোকদের জন্যে প্রমথনাথ-শ্রেণীর লোকেরা সর্ব্বদা হাজির থাকে এবং ট্রেন ছাড়বার হুইস্‌ল্ দিলে প্রিয়লাল-শ্রেণীর লোকেরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যখন অবান্তর কথা তোলে তখন প্রমথনাথ-শ্রেণীর লোকেরা তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে তাদের পথ করে দেয়।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল, বললে, "এ কথা ঠিক বলেছেন।"

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছিল। মাধব বললে, "মা খাবার ত দেওয়া হল না।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমি দোবো অখন, তুমি যাও।"

গার্ডের হুইস্‌ল্ শুনে মাধব তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিলে।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "দেখুন মিষ্টার মুখার্জ্জি, মাধবকে দিয়ে আমার জিনিষপত্র গোছানোতে আপনাদের অসুবিধেয় পড়তে হল।"

প্রমথ বল্‌লে, "কিছু অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। যিনি ভার নিলেন, দেখবেন, তিনি সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা করবেন।"

"মিষ্টার মুখার্জ্জি ?"

"আজ্ঞে ?"

ঈষৎ নিম্নস্বরে প্রিয়লাল বল্‌লে, "উনি নিশ্চয়ই মিসেস্ মুখার্জ্জি,—অর্থাৎ আপনার স্ত্রী ?"

একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে একটু চিন্তা ক'রে মৃদু হেসে প্রমথ বল্‌লে, "কেন ? আপনার কি অন্য রকম মনে করবার কোনো কারণ ঘটেছে ?"

ব্যস্ত হয়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "না, না। নিশ্চয় নয়। আমিও তাই অনুমান করেছিলাম।" প্রমথর উক্তি যে 'ইতি গজ' জাতীয়, সে কথা মনে করবার কোনো কারণই তার ছিল না।

প্রমথ বল্‌লে, "আসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বল্‌লে, "উষা, আপাততঃ আমাদের ক্ষণিকের অতিথি—ডক্টর প্রিয়লাল চৌধুরী।"

সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্ত কর উত্তোলন করে বল্‌লে, "নমস্কার।"

সাগ্রহে প্রিয়লাল বল্‌লে, "নমস্কার মিসেস্ মুখার্জ্জি, নমস্কার !"

কিন্তু দ্বিতীয়বার পরিপূর্ণ ভাবে সন্ধ্যার মুখ নিরীক্ষণ করে প্রিয়লাল পুনরায় গভীরভাবে চমকিত হোল। ক্ষুদ্রচ্ছিদ্র যবনিকার অন্তরাল ভেদ করে মনে পড়ল পরলোকবাসিনী অভাগিনী সন্ধ্যার মুখ।

তারপর বারম্বার মিসেস্ মুখার্জ্জির মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল সন্ধ্যার মুখের স্তিমিত স্মৃতি। অবশেষে এমন হোল যে, মনে মনে সন্ধ্যার মুখ মনে করতে গেলে তৎস্থলে ভেসে ওঠে মিসেস্ মুখার্জ্জির মুখ। প্রদীপ্ত সূর্য্যকরে নিমজ্জিত হয়ে গেল দুর্ব্বল দীপশিখা,—হয়ত চিরদিনেরই জন্য।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জনসেবা না দেবসেবা

অধ্যাপক শ্রীঅনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম-এ

বাংলার কোনো একস্থানে বহুলক্ষ টাকা খরচ করিয়া এক বিরাট মন্দির তৈয়ারি হইতেছে এ সংবাদ শুনিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিলাম। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির মত, দিনাজপুরে কান্তজীর মন্দিরের ন্যায় সুন্দর মন্দির বাংলায় বহুকাল স্থাপিত হয় নাই। এ মন্দিরটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে আশা করিয়া আমার এক বন্ধুকে এ শুভ সংবাদ দিলাম। সংবাদ দিয়াই কিন্তু বড় মুস্কিলে পড়িলাম, মনে বিশেষ সংশয় আসিল। এ সংবাদে তিনি আনন্দ ত পাইলেনই না, উপরন্তু ভাবভঙ্গী ও কথার দ্বারা স্পষ্টই বলিলেন ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় ব্যাপার হইতে পারে না। এই দুর্দ্দিনে যখন দেশের লোক অন্নাভাবে, জলাভাবে, বস্ত্রাভাবে হাহাকার করিতেছে, তখন এতগুলি টাকার অপব্যয় তিনি সহ্য করিতে পারেন না। এই অর্থের দ্বারা হাঁসপাতাল, ধর্ম্মশালা, গ্রামে গ্রামে নলকূপ, কলকারখানা করিলে লোকের কত উপকার হইত। এই সব জনহিতকর কার্য্য না করিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর জন্য প্রস্তুত হইতেছে এক প্রাণহীন অনাবশ্যক বিরাট পাষাণ স্তূপ!

কথাটা কি সত্য? স্বীকার করিতেই হইবে আজিকাল আমাদের দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠার যুগ চলিয়া গিয়াছে। জাতির মন অন্যদিকে চলিয়াছে। তাহার মুখ্য কারণ তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের পূর্ব্ববর্ণিত মনোভাব। অথচ এমন একদিন ছিল যখন আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রতি গ্রামে, নগরে, রাজবর্ত্মে, পর্ব্বতগাত্রে, সমুদ্র-সৈকতে মন্দির, বিহার, চৈত্যে, স্তূপে পূর্ণ ছিল। কোনো এক বিশিষ্ট যুগে হঠাৎ তাহাদের আবির্ভাব হয় নাই, শতাব্দী পর শতাব্দী ধরিয়া রাজা, শ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণ, শ্রমণ নিজেদের ধন্য মনে করিয়া এই সকল দেবায়তন স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, অশোকের সময় হইতে ধরিলেও দেখিতে পাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতের সর্ব্বস্থানে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রচারার্থে স্থাপিত দেবানাং প্রিয়দর্শী অশোকের বিহার, স্তূপ ও গুম্ফাদির কথা আপনারা সকলেই জানেন। মহারাজ অশোকের পৌত্র দশরথ নাগার্জ্জুনি পর্ব্বতে আজিবিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে গুম্ফদান করিয়াছিলেন এ কথা ইতিহাস স্বীকার করে। তাঁহার অপর এক পৌত্র সম্প্রতি বহু জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এরূপ কিম্বদন্তী অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে। মৌর্য্যবংশের পর শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে বেদপন্থী সমাজের নবশক্তি লাভ হয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরাদি স্থাপনের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী কণ্ববংশ ও অন্ধ্রবংশের দীর্ঘ রাজত্বকাল সম্বন্ধে এখনও আমাদের জ্ঞান এত অল্প যে তখন কি হইয়াছিল, কি হয় নাই সে সম্বন্ধে কোনো কথাই জোর করিয়া বলা চলে না। তবে অন্ধ্রদের সময়ই কলিঙ্গের রাজা খারবেল উদয়গিরিতে হাতী গুম্ফায় নিজ কীর্ত্তি-গাথা রাখিয়া গিয়াছেন। তারপর আসিল বিজাতির দল। ভারতীয় সমাজ তাঁহাদের একে একে কোলে স্থান দিল। শক হইল বৌদ্ধ, শৈব; হুন্নের, যুক্কের বংশধরগণের নাম হইল বসুদেব। আর তাঁহারাই করিলেন কাশ্মীরের বিহার, চৈত্য, মঠ সংস্থাপন। দেবায়তন সংস্থাপনের ধারা তাঁরাও পাইলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যে মন্দির স্থাপনের একটা ধারাবাহিক সংবাদ পাওয়া যায়। চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিংহলরাজ মেঘবর্ণের গয়ায় ত্রিতল বিহার সংস্থাপিত হয়। মথুরায় গুপ্ত সম্রাট নির্ম্মিত বহু বিহার ফাহিয়েন দেখিয়াছিলেন। স্কন্দ-গুপ্তের বিরাট বিষ্ণুমন্দির ও কুমারগুপ্তের সারনাথে অর্ঘ্যের কথা আমরা জানি। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্দ্ধন প্রতিষ্ঠিত গঙ্গার তীরে বহু বিহার ও মন্দিরের সংবাদও পাই। এ উত্তম

শুধু আর্য্যাবর্ত্তে সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমন সুদূর উত্তরে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্যের সময় মার্ত্তণ্ড মন্দির স্থাপিত হয়, তেমনি পূর্ব্বপ্রান্তে পালরাজাদের সময় বাংলায় অনেক মন্দির ও বিহারের প্রতিষ্ঠার খবর পাই। এক বিক্রমশিলাতেই ছিল একশ সাত মন্দির।

মন্দির স্থাপনের রীতি শুধু যে উত্তরাপথে বদ্ধ ছিল এমন নহে, দাক্ষিণাত্যে বিরাট বিরাট মন্দিরের কথা শুনিতে পাই। পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্ম্মণ স্থাপিত বিশালকায় মামল্লপুরমের রথগুলি যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময়ে মন পূর্ণ করিয়া দেয়। উত্তর ও দক্ষিণের মন্দির প্রথা প্রণালী এ স্থানে পাশাপাশি দেখা যায়। নগরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাঞ্চিনগরে বৌদ্ধ বিহার ছাড়া আশীটি বড় বড় হিন্দু ও জৈন মন্দির হিউয়েনসাং দেখিয়া গিয়াছেন। এইস্থানেই আছে বিরাট কৈলাসনাথের মন্দির। চালুক্যদের সময় স্থাপিত বিরাট বিষ্ণু ও শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া এখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তিন শতাব্দী ধরিয়া শুধু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, বৌদ্ধরীতি অনুসরণ করিয়া মঙ্গলেশ চালুক্য ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁহার রাজধানী বাদামিতে বিষ্ণুর নামে এক গুম্ফ খনন করাইয়াছিলেন। অষ্ট শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটরাজ এক পর্ব্বত কাটিয়া অনুপমেয় ইলোড়ায় কৈলাস মন্দির স্থাপন করেন। দেখাদেখি উঠিল চোলরাজা রাজরাজের তঞ্জুভুরের (তানজোর) বিখ্যাত মন্দির ও হয়শালাদের দ্বার সমুদ্র ও বেলুড়ে জৈন বিষ্ণুর মন্দির। দশম শতাব্দীতে চাণ্ডেল্যরাজগণ মন্দিরে সুশোভিত করিলেন তাঁহাদের প্রধান সহরগুলি, মহোবা, কালাঞ্জর, খুজরাও। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পুরী, ভুবনেশ্বর, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, বারাণসী, কামাখ্যা, আবুপর্ব্বত প্রভৃতি নানাস্থানে অসংখ্য মন্দির গঠিত হইল। এই ধারা চলিল অল্পবিস্তরভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। গজনীর মামুদ এক সোমনাথ লুট করিয়া তাহার ঐশ্বর্য্যে বিস্মিত হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তিনি জানিতেন না যে মন্দিরমেখলা এই ভারতবর্ষে বহু সোমনাথ ছিল। কালের ও কালাপাহাড়ের হস্তে ধ্বংস পাইয়াছে অনেক, যাহা আছে তাহাও এখন পর্য্যন্ত জগতের স্থির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতকালের সাধনা, এই সব মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা তবে কি ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছে? বন্ধু বলিবেন 'নিশ্চয়ই'। ইহা অপেক্ষা হাঁসপাতাল স্থাপন, নলকূপ খনন, কলকারখানার অন্ধকূপ গঠন শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কথাটা কি নিছক সত্য? এই সকল মন্দিরের স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য ও ভাস্কর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাদের উপকারিতার সপক্ষে যুক্তি অনেক আছে।

শরীর ও মন লইয়া মানুষ। শরীরের ব্যাধি ও ক্লান্তি দূরের জন্য আরোগ্যশালা, নলকূপ, ধর্ম্মশালা প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু যদি মনের অসুখ করে তবে মানুষ যাইবে কোথায়? যে ব্যাধি ঔষধে প্রশমিত হয় না, যে ক্লান্তি জলে নিবারিত হয়না, সেই ব্যাধি ও ক্লান্তির জন্যই মন্দির প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক। পাপতাপক্লিষ্ট মানব সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, জ্ঞানে অজ্ঞানে যে শক্তি মন্দিররূপে মূর্ত্ত হয়, তাঁহার কাছে হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়াছে। তাহার এই শক্তির এতই প্রয়োজন যে একজন বলিয়াছেন যদি ঈশ্বর না থাকিতেন তবে মানুষকে ঈশ্বর তৈয়ারি করিয়া লইতে হইত। এবং যে কারণে দেহ অপেক্ষা মনকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে, ঠিক সেই কারণেই হাঁসপাতালের উপর মন্দিরের স্থান পাইয়াছে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা ভারতের জীবন-ধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতবাসী মনুষ্যজীবনকে কতকগুলি স্বত্বের বা দাবীর সমষ্টি বলিয়া কখনও মনে করে নাই, সে দেখিয়াছে জীবন কতকগুলি ঋণের সাকল্য। স্বত্বের পথে বাধা অনেক, কলহ নিয়ত। যদি আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মানুষের চরম কাম্য হয়, তবে স্বত্বের বোঝা লইয়া চলিলে সে পথ সুগম হইবে না। একথা আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন বারে বারে বলিয়া গিয়াছেন। কৌপীনের জন্য মুনির পতন, সূচ্যগ্রভূমির উপর স্বামিত্ব না ছাড়ায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এইসব কারণে জীবনকে ঋণের সমষ্টি বলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন তোমার দাবী করিবার কিছু নাই, দিবার আছে অনেক। পাইবার জন্য ব্যাকুল, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব বর্ত্তমান জগৎ এ কথা বিশ্বাস করেনা, এবং যদিও করে তবে অতি সঙ্কীর্ণভাবে। সে মনে করে যদি ঋণ থাকে তবে সে অল্প, শুধু তার চতুঃপার্শ্বে ছোট সমাজের কাছে—যে সমাজ তাহার ভাত কাপড় যোগায়, যাহা তাহাকে লালন পালন করে, যাহার পরিবেশনে তার জীবনযাত্রা নিত্য নির্ব্বাহ হয়। এই সমাজের কাছে সে ঋণ মুখে স্বীকার করে,

মনে ভাবে, না দিতে পারিলেই ভাল হয়। অনেক সময় বাধ্য হইয়া দিতে হয়, বাধ্য হইয়া Poor Law-এর পীড়নে দাতা হইতে হয়, ধার্ম্মিক হইতে হয়। ভারতে কিন্তু ভিখারী দেবতা, অনুকম্পার পাত্র নয়, পূজার সামগ্রী। সে যদি ফিরিয়া যায় তার কিছু হইবে না, গৃহস্থের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। গৃহী তার দেনা শোধ করে। সামাজিক ঋণ ছাড়া আরও অনেক ঋণ আছে, দেবঋণ পিতৃঋণ, ঋষিঋণ। এই সব ঋণ পরিশোধে উপায়ও আছে অনেক—"ইজ্যাধ্যয়ন দানানি যজ্ঞদানতপঃ ইষ্টাপূর্ত্তসংতানাধ্যাপনানি।" দেবতার কাছে আমাদের অসীম ঋণের বোঝা সামান্য মাত্রায় লঘু করিবার জন্য এক উপায় হইতেছে মন্দির প্রতিষ্ঠা। আত্মার শান্তি বা কল্যাণ ছাড়া সামাজিক সেবা হইত এই মন্দিরের ভিতর দিয়া।

কিন্তু যদি আমরা মনে করি যে ভারতবাসী শুধু মন্দির স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল, তাহা হইলে এ দেশের জীবনের পরিকল্পনা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবনা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে সে মানব জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছে, সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া লইয়া তার এক বিরাট কল্পনা করিয়াছে। উহা মানুষকে দেবতা করে নাই, নরকের কীটও মনে করে নাই। মানুষকে মানুষ ধরিয়া, তাহার মধ্যে উচ্চ নীচ সব জিনিষ আছে এই কথা মানিয়া লইয়া, কি ভাবে তাহার পরিচালনা ও পরিপুষ্টি হয় তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে বলিয়াছে,

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ।

সেই জন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবই তাহার আলোচ্য। আলোচনা করিয়াছে তাহাদের শোধন করিয়া লইবার জন্য। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রত্যেক মানুষকে তাহার প্রবৃত্তি ও গুণানুসারে সমাজের মধ্যে স্থান ও কর্ম্ম দিয়াছে এবং এই কথাই সে বারে বারে বলিয়াছে যে এই সব কর্ম্মের মধ্যে দিয়া সে নিজের ও পরিবারিক কল্যাণ সাধন করিয়া সমাজের উন্নতি করুক, নিজের আত্মার মুক্তি হোক। নরসিংহ প্রহলাদকে এই কথায় বলিয়াছিলেন,

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্ত্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোক গীতাং বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধ॥

জীবনের যে সর্ব্বতোমুখী পরিকল্পনার জন্য আজ চীন মনীষী কনফিউসিয়াসের প্রতীচ্যে এত আদর, সেই realistic grasp of the social nature of the individual problem," প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের সহিত সামাজিক জীবনের যথার্থ পরিকল্পনা অতীতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উচ্চভাবে করিয়াছিল; আর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল মধ্যযুগে ইউরোপ ভূখণ্ডে ক্যাথলিক খৃষ্ট-ধর্ম্ম। তবে যে জিনিষ কনফিউসিয়াস রাখিয়াছিলেন শুধু মানবত্বের উপর নৈসর্গিক গণ্ডীর মধ্যে, বর্ণাশ্রম ও ক্যাথলিক ধর্ম্ম তাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল ধর্ম্মের বেদীর উপর, অনন্ত অপ্রাকৃত আকাশের তলে। সেই জন্য ভারতবাসী শুধু মন্দির নয় স্বাভাবিক মানুষের প্রয়োজনীয় সর্ব্বহিতকর প্রতিষ্ঠানই এইভাবে করিয়াছিলেন। পুরাকাল হইতে যাহা আরম্ভ হইয়াছে তাহারই ক্ষীণ স্রোত এখনও চলিতেছে।

অশোকের গির্ণার পর্ব্বতে খোদিত দ্বিতীয় শিলালিপি হইতে মনুষ্য চিকিৎসা, পশুচিকিৎসা, ক্লান্ত পথিকের জন্য পথের ধারে কূপ-খনন, ফলচ্ছায়া সমন্বিত মহাবৃক্ষ রোপণের কথা জানিতে পারি। দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে ফাহিয়েন বহু ধর্ম্মশালা ও চিকিৎসাশালা দেখিয়া গিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সময়েও রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মশালাদি জনহিতকর অনুষ্ঠান ছিল। পাল রাজাদের সময় নানাবিধ পূর্ত্তকার্য্যের খবর পাই, দিনাজপুরের মহীপালের দীঘির কথা অনেকেই জানেন। এইরূপে বহু শতাব্দী ধরিয়া শুধু রাজন্যবর্গ নয় দেশের আপামর জনসাধারণ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন প্রভৃতি নানা সৎকার্য্য করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন। সে অনুপ্রেরণার ফল আজ পর্য্যন্ত শত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াও মারোয়াড়ীদের ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র, জলসত্র প্রভৃতি কার্য্যে দেখা যায়। ভারতে জীবন ধারার পরিকল্পনা এতই বিশাল ছিল যে তাহা শুধু মানবের কল্যাণব্রতে সমাপ্ত হয় নাই, সর্ব্বপ্রাণীর হিত সাধনের নিয়োজিত হইত। বৌদ্ধ অশোক, জৈন তীর্থঙ্কর, হিন্দু বৈষ্ণব কর্ত্তৃক প্রচারিত জীবহিংসা নিরোধ-বাণী এই ধর্ম্মক্ষেত্রে যুগে যুগে অনুসৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সুরাটের এক পশুচিকিৎসাশালার বর্ণনা কালে

হ্যামিলটন সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

The most remarkable institution in Surat is the Banyan hospital for the accomodation of animals. In sickness they were attended with great care and here found a peaceful asylum for the infirmities of old age. In 1772 the hospital contained horses, mules, oxen, sheep, goats, monkeys, poultry, pigeons and a variety of birds, also an aged tortoise. The most extraordinary ward was that appointed for rats, mice, bugs and other noxious vermin, for whom suitable food was provided.

জনহিতকার্য্য তাহা হইলে এখানেও হইত এবং বাঁদর ছুঁচা, ছারপোকা পর্য্যন্ত তাহার আস্বাদ পাইত; শুধু মন্দির স্থাপন করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেননা। কিন্তু মন্দির স্থাপনই হউক বা হাঁসপাতাল বা ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণই হউক, তাহা করিবার প্রথা ছিল অন্যরূপ। মানুষকে দয়া করিবার জন্য নয়, বাধিত করিবার জন্য নয়, মানুষের পূজা করিবার জন্য, নিজ আত্মার মোক্ষের জন্য এই সব পূর্ত্তকার্য্য হইত। সেই জন্য তাহা উৎসৃষ্ট হইত ঈশ্বরের নামে। যাত্রীর ক্লান্তি দূরের জন্য তাহারা Guest-house, inn বা hotel করিতেন না, করিতেন ধর্ম্ম-শালা। কি মনোভাব ইহার পিছনে ছিল তাহা জলাশয় প্রতিষ্ঠা, মঠ প্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানের পদ্ধতি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। এই সব পূর্ত্তকার্য্য করিতে হইলে দেবপূজার আবশ্যক—নবগ্রহ পূজা ও ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পূজা—গুরু বরণ, পুরোহিত বরণ, হোতৃ ও আচার্য্য বরণ করিতে হয়। তুমি পূজা করিবে বিনীত পবিত্র হৃদয়ে, কারণ তুমি ঋণী, ঋণ পরিশোধের জন্য উত্তমর্ণকে যোড়হস্তে আহ্বান করিতেছ। এই ছিল এখানকার প্রথা। এই সব কার্য্য করিবার শক্তির উৎস ছিল সেইখানে যে-স্থান হইতে মন্দির করিবার বাসনা উঠিয়াছিল। এই শক্তি বা ভক্তির সাহায্যে তাহারা হীন ধাতুকে সোণা করিত, নরের মধ্যে নরোত্তমের সন্ধান পাইত। তখনকার লোকেরা রাস্তার ধারে পুষ্করিণী খনন করিয়া লিখিয়া দিতনা Trespassers shall be prosecuted। হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সিংহদ্বারের প্রকাণ্ড মর্ম্মর ফলকে লেখা থাকিতনা

স্যর ঝুনঝুনওয়ালা—১০,০০০৲
স্যর দুধওয়ালা—২০,০০০৲
স্যর এব্রহাম এজরা—৫,০০০৲
মহারাজা অব বেজরা—১৫,০০০৲

তাম্র শাসনাদিতে দানের কথা লেখা থাকিত সত্য, কিন্তু তাহা গ্রহীতার স্বত্ব রক্ষার জন্য এবং সে লেখা আরম্ভ হইত দেয়ধর্ম্মোয়ং" বলিয়া।

এই প্রকারে দেবতার নামে দান, দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষেরই সুবিধাজনক। ইহাতে দাতার অহঙ্কার থাকে না, গ্রহীতার আত্মসম্মান নষ্ট হয় না। Victor Hugo একস্থানে বলিয়াছেন 'the giver and the taker never look with the same eye.' দাতার কৃপাদৃষ্টি ও গ্রহীতার সসম্ভ্রম লজ্জাবনত চক্ষু তখনই দেখিতে পাওয়া যায় যখন দাতা মনে করেন আমি অমুক লোককে দিতেছি আর গ্রহীতা মনে করেন আমি অমুক লোকের কাছে অনুকম্পা ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু এইরূপ না করিয়া যদি একজন ভাবেন আমি নিজ ঋণ কিছু পরিমাণে শোধ করিবার বাসনায় দেবতার নামে উৎসর্গ করিতেছি, আর অপর জন ভাবেন যাহা ঈশ্বরের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে সেই প্রসাদ পাইবার অধিকার সকলের আছে, তাহা হইলে দাতা ও গ্রাহকের মধ্যে আড়ষ্টভাব আর থাকেনা।

ইহা ছাড়া এই আদর্শের আর একটু সুবিধা আছে। যাহা প্রাকৃত তাহা সীমাবদ্ধ, দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধ বিজড়িত, যাহা অপ্রাকৃত তাই অসীম, সর্ব্ববন্ধন হীন। সেই জন্য দেবতার নামে অর্পণ ও উৎসর্গের সীমা নাই, কাল ও দেশ ভেদে তাহার মধ্যে ম্লানিমা বা কার্পণ্য আসেনা, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কালপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অধিকতর জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে, অধিকতর বিস্তার লাভ করে। একটী বিশেষ লোকের তাহা নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া উঠেনা, তাহা সর্ব্ব-

সাধারণের শ্রদ্ধার জিনিষ হইয়া পড়ে। সেইজন্যই এ দেশে মন্দিরাদি দেবানুষ্ঠানে দাতার পর দাতা, নৃপতির পর নৃপতি, শ্রেষ্ঠীর পর শ্রেষ্ঠী অকাতরে, মুক্তহস্তে অঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন। সারনাথ, নালন্দার কথা স্মরণ করিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। মানুষ সীমাবদ্ধ জীব, সে দিতে পারেও কম, নিতে পারেও কম; তাই কেবল মাত্র তার উদ্দেশে দান কালক্রমে শুষ্ক, সঙ্কীর্ণ ও মলিন হইয়া পড়ে। ইউরোপও এক সময়ে এই কথা বিশ্বাস করিত। তাই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাষ্টিনিয়ান Noscomia বা হাঁসপাতালকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে (ecclesiastical institution) গণ্য করিয়াছিলেন এবং চতুর্থ শতাব্দীতে Calsarca নগরে বেসিল্ যে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও এই শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার বিরাট আকাশচুম্বী হাঁসপাতালের পশ্চাতে এ মনোভাব কোথায়?

দেবতার নামে উৎসৃষ্ট পূর্ত্তকার্য্যে শুধু যে দাতার ও গ্রহীতার মঙ্গল হয় তাহা নহে, অপর যাহারা সেই কার্য্য পরিচালনে ব্রতী হন, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা সহায়ক। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে জনহিতকর কার্য্যে যে সব কর্ম্মী আছেন তাঁহারা কিছু দিনের পর শুষ্ক, নিরস ও হৃদয়হীন হইয়া পড়েন। সার্জ্জন হইয়া পড়েন কসাই, ধর্ম্মশালারক্ষক পরিণত হন জবরদস্ত জমিদারে। যে স্থানে মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ থাকা দরকার, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের আদান প্রদান হওয়া আবশ্যক সেই স্থান জুড়িয়া বসে লেফাফা দুরস্ত আদব কায়দায়, চিঠি পত্র, শিশি বোতল, টিকিট চার্ট থার্ম্মোমিটার বকসিস। এমন কেন হয়? শুধু মানবকে কেন্দ্র করিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহাই পরিণামে ম্লান ও শুষ্ক হইয়া উঠে। অথচ মানুষ মানুষকে চায়; মানুষ ভিন্ন তার গতি নাই। কেন এমন হয়? এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? বোধ হয় যেন মানুষ মানুষকে ভালবাসে না, ভালবাসে তার কাল্পনিক রূপকে—idea of man কে। সে মনুষ্যকে দেখে কল্পনার চক্ষু দিয়া তার কথা শুনে কল্পনার কর্ণ দিয়া। সুন্দর সুগোল মাংসপেশী যেমন কঙ্কালের বীভৎসতা কিছুদিনের জন্য ঢাকিয়া রাখে, সেইরূপে ভাবের পোষাক মানুষের প্রাকৃত নগ্নতা, কদর্য্যতা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দেয়। ভাবের খোলস পড়িয়া গেলে আর আমার চক্ষে মানুষ সুন্দর থাকে না। লোক-হিতকর অনুষ্ঠানে ব্রতী কর্ম্মীদের বোধ হয় এমনি একটা কিছু হয়, না হলে এত শুষ্কতা কোথা হতে আসে? রোগ শোক বেদনা দারিদ্র্য দহনে বহির্বাস সহজেই পড়িয়া যায়, মানুষের রুদ্র নগ্নতা কর্ম্মীদের চক্ষে শূল বিদ্ধ করে, তাই তাহারা হয়ে পড়েন নিরস, কঠোর, হৃদয়হীন।

কিন্তু যদি এমন কোনো ভাবের দ্বারা মানুষকে অনুপ্রাণিত করা যায়, যাহা বাহ্যবস্তুর ক্ষয়বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, যাহা সীমাবদ্ধ নয়, দেশ, কাল পাত্রাতীত, যাহা মানুষের অন্তরতম ইচ্ছার অনুগামী, তাহা হইলে বোধ হয় জনহিতকর কার্য্যে রত কর্ম্মীদের ইচ্ছা ও শক্তির শৈথিল্য সহজে আসে না। সে ভাব এত বিশ্বজনীন, সে ভাবের ভাবুক এখনও এত আছে যে প্রাণের সহিত সৎকার্য্য করিবার লোকের অভাব সহজে হয় না। আমি বিরক্ত হইলে তুমি আসিবে, তোমার আর ভাল না লাগিলে অপর একজন সোৎসাহে তোমার স্থান অধিকার করিবে। বেতনের লোভে নয়, নাম খ্যাতির জন্য নয়, হৃদয়ের আবেগে তাহারা আসিবে।

জনসেবায় এই ভাব জাগাইয়া দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় এক মাত্র উপায়ে। তাহাদের লইয়া যাইতে হইবে মানবদ্ধ সীমার বাহিরে, তাহাদের উৎসৃষ্ট করিতে হইবে অসীম দেবতার নামে। দেবতার উদ্দেশে মন্দির স্থাপন করিয়া, সেই দেবসেবার মধ্য দিয়া সমাজের হিতসাধন করা ইহার এক পন্থা, আর মানুষের সেবাকে দেবসেবা বলিয়া মনে করা ইহার অপর এক পন্থা। গণ্ডীর বাহিরে যাইবার জন্য মানুষের মন সদাই ব্যাকুল। তাই সে তার চিত্রে ভাস্কর্য্যে, শিল্পে জীবনধারায় সসীমকে অসীম করিয়া দেখে, মানুষের চোখ আঁকিয়া বন্ধন বিহীন মেঘের কাজল পরাইয়া দেয়, মানুষের মুখে ঊষার হাসি ফুটাইয়া তোলে, মানুষের চঞ্চল ভঙ্গীতে হিমাচলের শান্তি, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য আনিয়া দেয়। যে আর্টে যত এই জিনিষ রহিয়াছে সেই আর্ট তত গভীর; যে সভ্যতায়, যে জীবনে এই আদর্শের আহ্বান যত রহিয়াছে, সেই সভ্যতা, সে জীবন তত মূল্যবান। সসীমকে ঠেলিয়া অসীমের দিকে লইয়া যাওয়ার অনুরাগ ও যাহা অনন্ত তাহাকে শান্ত করিয়া উপলব্ধি করিবার

প্রয়াস ধর্ম্ম। এই জন্য এই দেশে মানুষের সেবাকে অসীমের পূজা করিয়া তোলা হইয়াছে, আর বিশ্বের দেবতার পাথরের মন্দিরের মধ্যে আসন পাতা হইয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক সমাজ কতকগুলি সাধারণ তথ্য ও আদর্শের উপর স্থাপিত। দেশ-ভেদে কালভেদে ইহাদের রূপ পৃথক। সমাজ চেষ্টা করে সমাজস্থ লোকদিগকে ঐ সব তথ্য ও আদর্শের প্রতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শ্রদ্ধাবান করিতে। যে সমাজ যত বেশী ইহা করিতে পারে, সে তত কল্যাণ করে, যে ইহা করিতে পারে না তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য সমাজকে ধর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ করা। বস্তুতঃ অতীতে সর্ব্ব উন্নত সমাজ এই ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ ছিল। এই বন্ধন, এই সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস, এতই প্রয়োজনীয় মনে হইয়াছিল যে যখন রোমক-সাম্রাজ্যে এরূপ একটি বিশ্বাসের অভাব হইল, তখন সমাজ ও রাজ্য রাখিবার জন্য Caiser-পূজারূপ এক অভিনব সাধারণ বিশ্বাস স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইল। যে সমাজ ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়াছে তাহাকে বাঁচিতে হইলে নূতন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে হইবে, নচেৎ ধ্বংস নিশ্চিত। ইউরোপে এই প্রকার নূতন-বিশ্বাস গড়া কিছুকাল হইতে চলিতেছে। ঈশ্বরে আস্থাহীন মানব State কে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়াছে, তাহার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখাইতেছে। পঞ্চমকারে তাহার বিকৃত পূজা, তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ নরবলি হইতেছে। নরকপালে রুধির পানে উন্মত্ত তথাকার মানব তাণ্ডব নর্ত্তন করিতেছে, ধ্বংস করিতেছে, কামনার অক্ষমালা তার গলায় দুলিতেছে। এ নৃত্য যাহাই হৌক, নটরাজের, শিবের নিত্য নয়। নৃত্যের তালে তালে মানুষের সহিত মানুষের বন্ধন, ধর্ম্মের বন্ধন খসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তথাপি তাহাদের একপ্রকার ধর্ম্ম আছে, এবং ইহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই গীর্জ্জা করা বন্ধ করিয়াও জনহিতকর কার্য্য করিতেছে। বস্তুতঃ নিজের কথা ভুলিয়া স্থায়ীভাবে অপরের উপকার করিতে হইলে তাহা শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা করা চলেনা—সেখানে হৃদয়ের আবেগ চাই, এবং এই আবেগ আনে ধর্ম্মবিশ্বাস। ইউরোপে এখনও ইহা আছে—এমন কি সোভিয়েট রাশিয়াতেও। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে রাশিয়া ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়াছে; কথাটা কিন্তু নিছক সত্য নয়। তাহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম তুলিয়া দিয়াছে সত্য, সেই স্থান কিন্তু পূর্ণ করিয়াছে অপর এক বিশ্বাসে—কমিউনিষ্ট-ধর্ম্মে। রাশিয়ার মত ভাবপ্রবণ জাতির একটা ধর্ম্ম চাই, না হইলে সে থাকিতে পারেনা। সেইজন্য Marx যে জিনিষ শুধু বুদ্ধির উপর, যুক্তির উপর গড়িয়াছিলেন, রাশিয়া তাহা এক নব-মানব ধর্ম্মের অনুরাগে রঞ্জিত করিয়া লইয়াছে। এখন শুধু তাহারা মানব লইয়াই ব্যস্ত আছে, মানবের মাঝে অমানবের সন্ধান এখনও পায় নাই। এই ধর্ম্মের জন্য ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লোকেরা পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে (Five Year Plan) ত্যাগ করিতেছে, অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছে, জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। শুধু বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া জনসাধরণ এ কার্য্য করিতেছে না, কারণ বুদ্ধি স্বার্থান্বেষী। এক উন্মত্ত আত্মবিস্মৃত ভাববন্যায় তাহারা গা' ঢালিয়া দিয়াছে। এ ঠিক ধর্ম্মভাব না হইলেও তাহারই নিকটপ্রতিবেশী। তবে এ ভাবে চলা তাহাদের পক্ষে খুব বেশী দিন সম্ভব হইবে না, মানব-আত্মা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

ধর্ম্মের এই ভাবপ্রবণতা বা যাদুশক্তি আছে বলিয়াই সর্ব্বদেশে মনীষিগণ জনহিতকর কার্য্য ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ভাব সামাজিক জীবনের রস সংগ্রহ করে। শুদ্ধ নৈতীক ক্ষেত্রে প্রথিত হইলে তাহারা কালে মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলছায়ায় মানবের আত্মা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হয় না। নীতির পথ শুষ্ক কঠিন—তাহা সাধারণের নয়। তাহাতে আত্মজয়ের ক্ষণিক হর্ষ থাকিতে পারে, আত্মসমর্পণের ভাবুকতা নাই। সাধারণ মানব সে পথে বহুদিন চলিতে পারে না, ক্লান্ত হইয়া পথধারে পড়িয়া যায়, কিম্বা কোনো ধর্ম্ম-শালার আশ্রয় গ্রহণ করে। বুদ্ধ বলিলেন আত্মদীপা, আত্মশরণা হও কিন্তু কিছু পরেই সঙ্ঘা-রাম অন্য গানে পূর্ণ হইল—বুদ্ধং মে শরণং, সঙ্ঘং মে শরণং, ধর্ম্মং মে শরণং। হীনযানের আত্মোৎকর্ষের ধারা পরবর্ত্তী যুগে মহাযানের অসংখ্য দেবদেবীর পূজার অবসান হইল। মানব অন্তরে ভাবের প্রাবণ্যের কাহিনী সর্ব্বদেশের ইতিহাস ব্যক্ত করে। এইজন্য প্রাচীন গ্রীসে stoicism সাধারণ মানবের কাম্য হইয়া উঠিলনা। নীতি, বুদ্ধি, বিবেক or

higher will দ্বারা পরিচালিত হইয়া বলে 'সৎপথে থাক' মানুষের প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করে কেন? কিসের জন্য? সাধারণ মানুষের পক্ষে এই তর্কের পরিণাম কি হয় তাহা অনেকেরই প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে। সেইজন্য যদি কোনো সভ্যতা বা অনুষ্ঠান শুধু নীতির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করে তাহার অপূর্ণতা পরিণামে প্রমাণ হয়। ব্যাবিটের Humanism বা মানবতার অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে এইখানে। Christopher Dawson এই কথাই বলিয়াছেন: "The civilisation that finds no place for religion is a maimed culture that has lost its spiritual roots and is condemned to sterdity and decadence (যে সভ্যতায় ধর্ম্মের স্থান নাই, তাহা বিকলাঙ্গ, এবং আধ্যাত্মিকতা মূলে না থাকায় তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী)।

এই সব কারণে যে সমস্ত অনুষ্ঠান মানুষের মনে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া রাখে, যাহা মানুষকে মানবতার গণ্ডির বাহিরে লইয়া যাইয়া আকাশগামী করে, যাহার দ্বারা শুষ্ক কর্ত্তব্যজ্ঞানের মধ্যে রস সৃষ্টি হয়, দাতার অহঙ্কার ও গ্রহীতার আত্মগ্লানি যুগবৎ নষ্ট করে, সে সব অনুষ্ঠান কখনই বৃথা নয়। অন্নবস্ত্রের সংস্থান হাতে হাতে তাহারা না করিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহা দেয় তাহা অনুপম। মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মন্দির স্থাপনে যে-শক্তি সঞ্চয় হয় উহাই পরবর্ত্তীকালে বিশালকায় হইয়া জনসাধারণকে জলদান ফলদান করে। আর্ত্তনিনাদে, ব্যথিতের ক্রন্দনে সেই আত্মাই স্থায়ীভাবে বিচলিত হয়, যাহার মধ্যে এই ধর্ম্মভাব জাগরূক হইয়াছে, তাহার সর্ব্বচেষ্টা এই ভাবপ্রণোদিত। মঠ প্রতিষ্ঠার কালে যে আদর্শ তাহার মনের সম্মুখে রহিয়াছে, জলাশয় খনন, আরোগ্য-শালা নির্ম্মাণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পূর্ত্তকার্য্যকলে তাহার মনে ঠিক সেই ভাবই থাকে।

সেইজন্য যতদিন ভারতে মন্দির মসজিদাদি প্রতিষ্ঠার যুগ ছিল, ততদিন নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্য হইয়া গিয়াছে। কারণ ইহারা একই সত্তার বিভিন্ন আভাসমাত্র। আর যে দিন আমরা নূতন মোহে অপরদিকে মুখ ফিরাইয়াছি সেই দিন হইতে শুধু যে মন্দির প্রতিষ্ঠান ভুলিয়া গিয়াছি এমন নয়, সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছি। যাঁহারা মনে করেন মন্দির হইতেছে বলিয়া অন্যপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে আমাদের ঢিল পড়িয়াছে, তাঁহারা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করেন। যে কারণে মন্দির প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইয়াছে ঠিক সেই কারণেই জনসেবার ইচ্ছা মন হইতে চলিয়া গিয়াছে। বলিতে পারেন ইউরোপে ত এখনও জনসেবা চলিতেছে—অবশ্য বিকৃত ভাবে; তাহার কারণ দেবতাকে ছাড়িয়া দিলেও তাঁহারা Stateকে ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছেন। মানুষকে Stater অংশ ধরিয়া তাহার সেবা চলিতেছে। কিন্তু তাহা হইতে প্রাণের আবেগ ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। কারণ State সসীম, সেইজন্য তার অংশ মানুষকে সসীম ধরিয়া সেবা করা হয়। কিন্তু আমাদের ত State নাই, দেবতা ছাড়িলে উপায় কি? শুধু মানবকে কেন্দ্র করিয়া শুষ্ক নীতির ও কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজ গঠনের চেষ্টা কি ফলবতী হইবে? যাহা প্রতীচ্যের গুরু পারেন নাই, প্রাচ্যের শিষ্য কি তাহা পারিবে?

এই সব কারণে দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে জনহিতকর কার্য্য এখনও পর্য্যন্ত যথার্থভাবে তাঁহারাই করেন যাঁহাদের হৃদয় শুষ্ক হয় নাই, যাঁহাদের চক্ষু পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোকে অন্ধ হয় নাই, বড় বড় আশ্রম, ধর্ম্মশালা, পান্থশালা তাঁহাদের চেষ্টায় চলিতেছে। স্বর্গদ্বারে বাবা কালী কম্বলীওয়ালার কথা স্মরণ করুন। এই সব লোক জনহিতকর কার্য্য করিয়া খ্যাতি, নাম চান না, মানুষের উপকার করবার শক্তি আছে একথাও তাঁহারা মনে করেন না—তাঁহারা চান শুধু ঋণ পরিশোধ। সেইজন্য 'সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব' স্মরণ করিয়া অগ্রসর হন। যে ভক্তি লইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ঠিক সেই ভক্তি জনহিত কার্য্যে নিয়োজিত হয়। দুইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখেন নাই। ব্রজ পরিক্রমার সময় জঙ্গলের মধ্যে যাত্রিদের সেবা করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখিলে একথা সহজে বোধগম্য হইবে। তাঁহারা মনে করেন মানুষের ও দেবতার সেবার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সেই জন্য যখন মাড়োয়ারীরা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক আরোগ্যশালা স্থাপন করিলেন তখন তাহার মধ্যে একটী মন্দিরও স্থাপিত হইল। আবার অবু পাহাড়ের মন্দিরে যখন তাঁহারা পূজা করিতে যান, তখন পর্ব্বতমূলে অকাতরে মুক্ত হস্তে জনসেবা করিয়া মন্দিরে দেবপূজা করিতে উঠেন।

এই ভাব হৃদয়ে না থাকিলে জনসেবাকালে শুষ্ক, রসহীন হইয়া পড়ে। তাই মনে হয় যে-ভাব মন্দির স্থাপনের যুগের পশ্চাতে ছিল তাহা যদি আবার ফিরিয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে জনসেবারও যুগ ফিরিয়া আসিবে। হৃদয়ের আবেগে স্বার্থবুদ্ধি নষ্ট হইবে। তখন জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে মানুষকে মানুষ ভাবিয়া নয়, তাহার প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য বশতঃ নয়, তখন মানুষের মধ্যে দেবতা আবির্ভাব হইবে, 'দেহঃ দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ' এ কথার মর্ম্ম বুঝা যাইবে, তখন জন সেবা হইবে দেব-সেবা, কারণ

তনবো বহবো মহ্যং মানুষী তু তনুপ্রিয়া।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ

৯

দুঃখের বিষয় সেদিন রাত্রে খেলা হলো না। সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যের পরে মাব বড্ড মাথা ধরেছিল। কাজেই মন্টি বোঠানকে মার কাছেই থাকতে হলো—মার মাথা টিপে দিচ্ছিলেন। সাবিত্রীও সেইখানে ছিল। আমি আর মুকুন্দ ছাদে বসে বসে গল্প করে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিলাম।

রাত ৯টা আন্দাজ নীচে আমাদের খাওয়ার ডাক পড়ল। আমি আর মুকুন্দ নীচে খেতে নেমে এলাম। নীচের এক-তালার বারান্দায় পাশাপাশি দুখানি আসন পাতা হয়েছে—আমার আর মুকুন্দর জন্য। আমরা দুজনে খেতে বসলাম। রান্নার ঠাকুর দুখানা থালায় আমাদের খাবার দিয়ে গেল। আমাদের খাবারের সামনে একটা জলচৌকির উপর একটা আলো বসান ছিল। মন্টী বোঠান সেই আলোটার পাশেই এসে মাটিতে বসলেন।

ইতিমধ্যে নীচে নামবার সময়ই আমার যেন কেমন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হচ্ছিল। কেমন যেন একটু সঙ্কোচ ভাব। সাবিত্রী কি বুঝতে পেরেছিল আমার মনের ভাব? ছিঃ ছিঃ কি ভাবলে সাবিত্রী। মনকে বোঝালাম—সাবিত্রী ছেলেমানুষ, কি আর বুঝবে। কিন্তু মন যেন সে কথায় সায় দিল না। যদি নাই কিছু বুঝে থাকে ত হঠাৎ অমন করে পালিয়ে গেল কেন? ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা!

খেতে বসতে বসতে মন্টী বোঠানকে দেখে হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল। হঠাৎ মনে হ'ল তাই ত সাবিত্রী মন্টী বোঠানকে কিছু বলে দেয়নি ত? তাহলে—! আমি কিছুক্ষণ কোনও কথা কইতে পারলাম না, মন্টি বোঠানের মুখের দিকে চাইবার পর্য্যন্ত ভরসা ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, খেতে বসেই আমার চোখ একবার চারিদিকে ঘুরে এল—কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বোধ হয় আশা করেছিলাম, মন্টী বোঠানের পাশেই সাবিত্রীকে দেখতে পাব। কিন্তু সাবিত্রী মন্টী বোঠানের পাশে ত ছিল না। ছেলেমানুষ, এত রাত হয়েছে, বোধহয় ঘরের মধ্যে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে। এত যে একটা লজ্জা অনুভব করছিলাম, তবুও সাবিত্রীকে না দেখে, কৈ, স্বস্তি ত হলো না—একটা যেন হতাশার মতনই বোধ হচ্ছিল প্রাণে।

একবার মন্টী বোঠানকে জিজ্ঞেস করলে হ'ত "সাবি কোথায়।" কিন্তু আমার পক্ষে তখন 'সাবি' এই নামটী মুখে আনাও যেন অসম্ভব। মুকুন্দটাও ত অনায়াসেই শুধাতে পারে। কিন্তু করে কৈ?

মন্টী বোঠানই প্রথম কথা কইলেন। বললেন "সন্ধ্যেটা একেবারেই মাটী হল।"

মুকুন্দ বললে, "তা জ্যাঠাইমা এখন ঘুমিয়েছেন বুঝি?"

বোঠান বললেন "হ্যাঁ। এই একটু আগে।"

মুকুন্দ বলল, "তা খেয়ে উঠে খানিকক্ষন বসলে হয়না।"

বোঠান বললেন, "সে বড্ড রাত হয়ে যাবে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হলে আমরা খাব—আজ আর হয় না।"

মুকুন্দ বলল, "তা কটা বেজেছে শান্তদা?"

আমি বললাম, "সাড়ে নটা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঘড়িতে দেখলাম।"

মুকুন্দ বল্‌লে "তোদের খেতে আর কতক্ষণ লাগ্‌বে মণ্টী? আমরা ত এখুনি খেয়ে উঠ্‌ব। দশটার সময়ও যদি খেল্‌তে বসা যায় ত অন্ততঃ একঘণ্টা খেলা যাবে।"

এ প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ মত ছিল। খেলা মানেই সাবিত্রী। সেইখানেই আমার আগ্রহ। খেলার নিজস্ব কোনও প্রলোভন তখন যেন আমার একেবারেই নাই।

বৌঠান বল্‌লেন "না। খেয়ে উঠে দু-একটা কাজও আছে। আজ আর হয়না।"

ভাব্‌লাম একবার বলি "সাবি ছেলেমানুষ হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছে।" কিন্তু বলা হলনা।

বল্‌লাম "বৌঠান! হাজার হলেও তুমি ছেলেমানুষ। অত রাত জাগা কি তোমার পক্ষে সম্ভব—কি বল?"

বৌঠান একটু হেসে বল্‌লেন "তা সত্যি কথা। রাত জাগ্‌তে পারি আর না পারি, খেলায় ত প্রায় রোজই হারিয়ে দিচ্ছেন। ছেলেমানুষ বলেই ত সম্ভব হচ্ছে।"

মুকুন্দ হি হি করে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে "তা হলে বুঝতে পাচ্ছিস,—বুদ্ধির জোরে আমরা জিতি। জুচ্চুরি-টুচ্চুরী নয়।"

বৌঠান বল্‌লেন "খুব বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা জিনিষ কিছুতেই বুঝতে পারছিনা। তোমরা দুজনেই খালি একসঙ্গে বস্‌বে কেন? খেঁড়ী বদ্‌লাতেই বা তোমাদের এত আপত্তি কেন?"

মুকুন্দ বল্‌লে "সে আমরা যদি মেয়েমানুষের সঙ্গে না বসি।"

বৌঠান বল্‌লেন "মেয়েদের সঙ্গে খেল্‌তে পার আর মেয়েদের খেঁড়ী নিতেই যত আপত্তি?"

মুকুন্দ বল্‌লে "তা হলে কি বল্‌তে চাস্‌—আমরা জচ্চুরি করে জিতি?"

বৌঠান বল্‌লেন "দোহাই তোমার, আবার ঝগড় সুরু করোনা ছোড়দা। আমি কি কখনও বলেছি তোমর জচ্চুরী কর।"

মুকুন্দ বল্‌লে "না, ঐ সাবিটা খালি চেঁচায় কিনা হেরে যাবে আর বল্‌বে জচ্চুরী করেছে, জচ্চুরী করছে।"

বৌঠান বল্‌লেন "সে তুমি কাল সাবির সঙ্গে বোঝাপড়া কর—। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে—আজ আর নয়।"

মুকুন্দ উত্তেজিত স্বরে বললে "বোঝাপড়া আবার কি! ফের যদি সাবি ওরকম বলে আমি খেল্‌ব না সাবির সঙ্গে বলে দিচ্ছি। জচ্চুরী করছে জচ্চুরী করছে মুখের কথা বল্‌লেই অমনি হল।"

"বেশ! আমি কাল হাতে হাতে ধরিয়ে দেব।" হঠাৎ আমাদের দীর্ঘ বারান্দার এক কোণ থেকে সাবিত্রীর গলা পাওয়া গেল। আমরা তিনজনেই চম্‌কে উঠ্‌লাম। তিনজনেই একসঙ্গে চেয়ে দেখি বারান্দার এক পাশটাতে যেখানে কতকগুলি কাঠের বাক্স, কেরোসিনের টিন, কতগুলি ধামা, কুলো, এটা ওটা সেটা পাঁচ রকম জড় করা আছে সেইখানে, একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সর উপর, সাবিত্রী চুপ করে বসে আছে। আমাদের খাওয়ার সামনের আলোটার রশ্মি ঠিক অতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে উজ্জ্বলভাবে পৌঁছায়নি তাই সেই কোণটা ছিল কতকটা অন্ধকারে। আমার বুকের ভিতরটায় হঠাৎ কেমন যেন দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হল।

বৌঠান বল্‌লেন "আরে তুই কখন থেকে ওখানে চুপ করে বসে আছিস সাবি?"

সাবিত্রী বল্‌লে "গোড়া থেকে তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি বৌঠান।"

মুকুন্দ বল্‌লে "বেশ, দিও ধরিয়ে, রইল কথা।"

সাবিত্রী বল্‌লে "আমিও বলছি, শুধু একবার কেন, পর পর তিনবার ধরিয়ে দেব তারপর আমিও আর জোচ্চর-দের সঙ্গে খেল্‌ব না।"

* * *

সেদিন রাত্রে কেমন যেন ভাল ঘুম হল না। রাতটাও ছিল ভীষণ গরম এতটুকুও হাওয়া ছিল না কোথাও, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না। তার উপর আমার প্রাণে প্রাণে কিসের যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম—কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য সমস্ত প্রাণে প্রাণে অঙ্গে অঙ্গে। একটু আধটু ঘুমিয়ে যদিও বা পড়ি, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়,—এপাশ, ওপাশ, ছটফট্‌ ঘুম আর আসে না।

কোনও রকমে রাতটা কাটিয়ে ভোর হতে না হতে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখি

খনও অন্ধকার রয়েছে, তবে ভোরের আলোর পূর্ব্বাভাস অন্ধকারের মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে—বেশ বোঝা যাচ্ছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। ক্রমেই আমার চোখের সামনে অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। মাঠ, বন, গাছ, পালা, আকাশ, সবই সদ্য জাগরণের তন্দ্রাচ্ছন্ন কুয়াসায়, একটা অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে ধীরে ধীরে ধরা দিল আমার নয়নে নয়নে।

ছেলেবেলা থেকে এত ভোরে কখনও বোধহয় বিছানা ছেড়ে উঠিনি। প্রকৃতির এই রূপ, এর আগে কখনও দেখেছি বলেত মনে হয় না। একটা অভূতপূর্ব্ব আবেগে আমার প্রাণখানা কেঁপে উঠল। সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে জগৎখানিকে আজ যেন এক নূতন রসে উপলব্ধি করলাম। এই নূতন রসের মধ্যে সরস মূর্ত্তিমতী হয়ে, এই আদি উষার সদ্য জাগরণে ভেসে উঠল আমার সমস্ত প্রাণে—সাবিত্রী।

সাবিত্রী—এই সুন্দর পৃথিবীতেই সে আছে, বেঁচে আছে, আমারই পাশে পাশে সে আছে, হাত বাড়ালেই তাকে স্পর্শ করা যায়। সে মিথ্যা নয়, মায়া নয়, সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য, আমারই পাশের ঘরের বিছানায় সে অঘোষে ঘুমিয়ে আছে। কেমন যেন একটা বিস্ময়ে ভরে গেল সমস্ত প্রাণ মন। ঘরের দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভোরের একটা অস্পষ্ট অন্ধকারে তখনও চারিদিক ঢাকা। ভাবলাম নীচে নেমে অঙ্গন পেরিয়ে বাইরে পুকুরের ঘাটে গিয়ে একটু বসি।

নীচে নেমে, বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, কে যেন একজন বারান্দা দিয়ে প্রাঙ্গণে নামবার ধাপের উপরে চুপ করে বসে আছে। আমার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌ল। সাবিত্রী নয়? একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম সাবিত্রীই ত বটে।

বললাম "একি! তুমি এত ভোরে উঠে এসে বাইরে চুপ করে বসে আছ সাবি?"

বল্‌লে "তুমিও যে এত ভোরে উঠেছ শান্ত দা?"

বল্‌লাম "যে গরম, সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। তাই ভোর হতে না হতে উঠে পড়েছি।"

বল্‌লে "আমারও তাই। সারারাত ঘুমুতে পারিনি।"

আমি গিয়ে সাবিত্রীর পাশে ধাপের উপর বসে পড়লাম। বল্‌লাম "বোঠান এখনও ঘুমুচ্ছে বোধ হয়?"

সাবিত্রী বল্‌লে "মড়ার মতন।"

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে রইলাম। কারও মুখে কোনও কথা নেই। হঠাৎ সাবিত্রী বল্‌লে "শান্তদা, চলনা আমায় বাড়ী পৌছে দেবে?"

বল্‌লাম "তুমি এত ভোরেই যাবে সাবি?"

বল্‌লে "হ্যাঁ, মা কাল রাতে কিরকম ছিলেন কে জানে।"

বল্‌লাম "তোমার মা ত আজকাল ভালই আছেন। আজকাল ত আর জর হয় না।"

সাবিত্রী বল্‌লে "হ্যাঁ—কিন্তু কিছুই বিশ্বাস নেই। হঠাৎ জর এসে যেতে পারে।"

এই বলে সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল। আমিও আর কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ালাম। এই ভোরে নির্জ্জন গ্রামের পথে সাবিত্রী ও আমি দুজনে বেড়াতে বেড়াতে যাব—ভাবতে প্রাণে প্রাণে একটা অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ অনুভব করলাম। বল্‌লাম "চল"।

দুজনে চল্‌লাম। পথে যেতে যেতে বিশেষ কিছুই কথা হলনা। কেবল দু-একটা কথার মধ্যে ঠিক হল মা যদি ভাল থাকেন ত সকাল সকাল স্নান করে খেয়েই সাবিত্রী চলে আস্‌বে। আমরাও সকাল সকাল তৈরি হয়ে নেব।

নির্জ্জন গ্রাম্যপথ। দুজনে পাশাপাশি চলেছি। ভোরের অস্পষ্টতা তখন আর নাই, চারিদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মাথার উপরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম নীলাকাশের গায়ে গায়ে এখানে ওখানে পাত্‌লা পাত্‌লা সাদা সাদা মেঘ ভেসে রয়েছে। সাবিত্রীর দিকে দু-এক বার চেয়ে দেখেছিলাম। মুখখানি একটা নিদ্রালস লাবণ্যের মাধুরীতে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কপালের উপর উস্কখুস্ক রুক্ষ চুল, ইচ্ছে হচ্ছিল হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দি। কিন্তু স্পর্শ করবার ভরসা হল না।

চলেছি। চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় এলাম, যেখানে গ্রাম্যপথটি ভেঙ্গে গিয়েছে। পথের খানিকটা ধসে নেমে গিয়ে জলকাদায় এমন অবস্থা হয়েছে যে তার উপর দিয়ে সহজে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। তাই চলাচলের সুবিধার জন্য তিনখানা বাঁশ পাশাপাশি ফেলে দেওয়া আছে ভাঙ্গা জায়গাটার এপাশ

থেকে ওপাশ পর্য্যন্ত। আমি গিয়ে এগিয়ে সেই বাঁশের উপর উঠ্‌লাম, সাবিত্রীও আমার পিছন পিছন আসতে লাগ্‌ল।

"হাত ধরনা শান্তদা। না ধরলে কি পারি।" তাড়াতাড়ি সেই বাঁশের উপরে পিছন ফিরে আমি সাবিত্রীর হাত ধরলাম।

সাবিত্রী যে হাত না ধরলে পেরুতে পারে না—একথা আমার একবারও মনে হয়নি। দিনের মধ্যে পাঁচবার সে আমাদের বাড়ী যাতায়াত করে—একা। তখনত হাত ধরবার লোক কেউ সঙ্গে থাকে না। তাহলে পার হয় কি করে।

যাই হোক, আমার ডান হাত দিয়ে সাবিত্রীর বাঁ হাতখানা ধরলাম। ধীরে সযত্নে তাকে নিয়ে এলাম, বাঁশের ওপর দিয়ে রাস্তার এপারে।

এপারে এসে হাতখানি ছেড়ে দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। যে হাতখানি আমার হাতের মধ্যে ধরা দিয়েছে তাকে সেচ্ছায় ফিরিয়ে দেব। কিন্তু বাঁশ ত পেরিয়ে এসেছি। আর প্রয়োজন নেই। বৃথাই বা ধরে রাখি কোন লজ্জায়।

সাবিত্রী কি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল? নিঃশব্দে, কোন কথা না বলে নিজের হাতখানি সে আরও ভাল করে রাখলে আমার হাতের মধ্যে। সরিয়ে ত নিলেনা। হাত ধরাধরি করেই গেলাম বাকী পথটুকু।

উঃ সে কী পুলক! কী আনন্দ! এই ছোট হাতখানির মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় সাবিত্রী যেন তার প্রাণখানি ধরা দিয়েছিল আমার হাতের মধ্যে। ছড়িয়ে দিল একটা অপূর্ব্ব শিহরণ আমার সারা অঙ্গে অঙ্গে।

হাতখানি হাতে ধরা দেওয়ার পর থেকেই যেন হঠাৎ কথার বন্যা এল সাবিত্রীর মুখে। একথা, ওকথা, সেকথা, কত বাজে কথা যে অনর্গল বকে যেতে লাগ্‌ল—কতক শুনেছিলাম কতক শুনিনি। হুঁ, হাঁ, না—এইরকম জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম, এর বেশী কথা কইবার শক্তি আমার তখন লোপ পেয়েছিল। কেমন যেন একটা অভিভূতের মত চলতে লাগলাম সাবিত্রীর বাড়ীর অভিমুখে।

হঠাৎ হুঁস হল। সাবিত্রীর বাড়ীর কাছাকাছি এসে, হঠাৎ সাবিত্রী নিজের হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে, আমাকে ফেলে ছুটে চলে গেল বাড়ীর দিকে। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কেমন যেন একটা প্রচণ্ড উৎসাহ এল প্রাণে। ইচ্ছে হচ্ছিল বাড়ী ফিরবার পথে ছুটেই চলে যাই সারা পথটা। মনে হচ্ছিল আজ আমার গৌরব জগতের কারুর চেয়ে কম নয়। আমার প্রাণের আবেগে সাবিত্রী দিয়েছে সাড়—আজ আমি জয়ী।

ভাব্‌লাম আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। মনে পড়ল—সাবিত্রী।

* * *

সারা সকালটা কাট্‌ল একটা যেন স্বপ্নের মধ্যে। একটা নেশায় যেন মাতোয়ারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কোথাও একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। এবং থেকে থেকে অনবরত ঘড়ির দিকে দেখ্‌ছিলাম—কটা বেজেছে।

মনে হচ্ছিল—একটা গোপন নিবিড় রহস্য আমার আর সাবিত্রীর মধ্যে। সে ত আর কেউ জানে না। সে যে একান্ত আমাদেরই দুজনার এবং তাই নিয়ে আমরা দুজনে এক—জগতের সকলের চেয়ে বিভিন্ন। মণ্টী বোঠানের মুখের দিকে চেয়ে যেন একটা করুণা হয়েছিল—নিতান্ত বাইরের প্রাণী সে, কতটুকুই বা জানে।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা মণ্টী বোঠানের ঘরে তাসের আড্ডা বস্‌ল। বোঠান প্রথমেই বলে বস্‌লেন, "আজ খেঁড়ী বদলে বস্‌তে হবে। আমি আর ছোড়দা, ঠাকুর পো আর সাবি।"

কথাটা আমার ভালই লাগ্‌ল। এইটেই যেন স্বাভাবিক; আজকের দিনের বিশেষ সুরটীর সঙ্গে এইটেই খাপ্ খাবে।

মুকুন্দটা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "কক্ষণো না।"

বোঠান জিজ্ঞেস করলেন "আপত্তি কিসের তোমার ছোড়দা—শুনি।"

মুকুন্দ বলল "তুমিই বা কেন খেঁড়ী বদ্‌লাতে চাইচ শুনি।"

বোঠান বললেন "মাঝে মাঝে খেঁড়ি বদল হওয়া ত ভালই—আপত্তি কেন?"

মুকুন্দ বলল "আমাদের সন্দেহ কা এইজন্য কে?

তোমাদের অন্যায় সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে পারিনা।"

বোঠানের বোধহয় সেদিন একটু জিদ চেপেছিল। আমার দিকে চেয়ে বললেন "আপনি কি বলেন ঠাকুরপো?"

আমি একটা উদাসীনতার ভঙ্গীতে বললাম "আমার কিছুই যায় আসেনা।"

মুকুন্দ বলল "না—খেঁড়ী বদলে আমি খেলব না।"

সাবিত্রী বললে "থাক্ থাক বোঠান, দরকার নেই। তোমাতে আমাতেই বসব।"

বোঠান আর কোনও কথা বললেন না। খেলা চলতে লাগল। খেলছিলাম আমরা টোয়েন্টি-নাইন। সেবার বোঠান তাস দিলেন। বোঠানের ডাইনে আমি। প্রথম ডাক আমার। ডাকলাম "১৫"।

সাবি বললে "১৬"

"আছি"

"১৭"

"আছি"

"১৮"

"আছি"

"১৯"

"আছি"

"২০"

"আছি"

সাবি একটু ইতস্তত করে বলল "পাস"।

এইবার মুকুন্দের ডাকের পালা। মুকুন্দ আমার দিকে একবার চাইলে। ইতস্তত করতে লাগল আমার উপর ডাকবে কিনা।

হঠাৎ সাবিত্রী বললে "বোঠান, ছোড়দা এবার 'পাস' দেবে।"

মুকুন্দ বলল "দেবইত "পাস"। খেড়ীর উপর—শুধু শুধু ডেকে নেব না কি।"

সাবিত্রী কোনও উত্তর দিলেনা। কিন্তু সবাই বোধহয় একটু অবাক হলাম দেখে সাবিত্রী একটুকরো কাগজ ও পেন্সিল কোথা থেকে যেন হঠাৎ বার করলে এবং তাতে কি একটা লিখলে—কাউকে দেখালে না। চেপে রেখে দিল পায়ের নীচে।

সেবার বোঠানও পাস্ দিলে, খেলা চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর একবার, ডাকাডাকি শেষ হয়ে গেছে। বোঠান আর মুকুন্দতে জেদাজেদি করে ডাক অনেকটা তুলে দিয়েছে—২৬ ডাকে মুকুন্দ ডেকে নিলে। ডেকে নিয়ে মুকুন্দ একবার এদিক ওদিক চেয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বোঠান বল্লেন "রং কর ছোড়দা।"

মুকুন্দ বললে "দাঁড়া—ভেবে চিন্তে, হিসেব করে ত রং করব। অত তাড়াতাড়ি করে কি রং করা যায়।"

আমি অন্যমনস্ক ভাবে এদিক ওদিক চাইছিলাম। বিশেষ যেন খেলার দিকে লক্ষ্যই নাই।

হঠাৎ সাবিত্রী বললে "রং হবে ইস্কাবন।"

মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল "ও নিশ্চয়ই আমার হাত দেখেছে।"

বোঠানও তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন—সাবি অনেক দূরে বসে আছে, সাবির পক্ষে হাত দেখা অসম্ভব—ইত্যাদি।

আমি শান্তস্বরে বললাম "থাক থাক চেঁচামেচী করে কি হবে। রং করেই ফেলনা বাপু।"

ইস্কাবনই রং হল এবং খেলা চলতে লাগল।

এবই দু-চার বারের মধ্যে এক ব্যাপার ঘটল। সেবার আমিই ডেকে নিয়েছিলাম। বাজার থেকে রং কাবার করে নিয়ে হাতে ফ্রী বিশেষ কিছু ছিল না। কি খেলব ভাবছি। এমন সময় সাবিত্রী চট্ করে কাগজের এক টুকরো ছিঁড়ে তাতে কি একটা লিখে মণ্ডী বোঠানের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল।

সাবিত্রী বললে "বোঠান! এখন দেখনা, শান্তদার খেলা হলে দেখ, এবং সবাইকে দেখিও।"

আমি হরতনের দশ খেললাম।

সাবিত্রী বললে "বোঠান এইবার কাগজটা পড়।"

আমরা সবাই এমন কি মুকুন্দ পর্য্যন্ত বোধহয় একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। বোঠান কাগজখনি নিয়ে পড়লেন "শান্তদা হরতনের দশ খেলবে।"

মুকুন্দ চেঁচিয়ে উঠল "নিশ্চয়ই হাত দেখেছে।"

বোঠান বললেন "বোকার মত চেঁচিও না ছোড়দা। হাতে ত আরও অনেক কাগজ আছে। হরতনের দশই খেলবে জানলে কি করে।"

মুকুন্দ বোধহয় অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল। বৌঠান সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"কি করে জানলি রে?"

বৌঠান সত্যসত্যই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তঁর চোখ দুটিতে বিস্ময়ের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। আমিও বোধহয় বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

সাবিত্রীর মুখ তখন গম্ভীর। ধীরে সে হাতের তাসগুলি ফেলে দিল। শান্তভাবে বৌঠানের দিকে চেয়ে বলতে লাগ্‌ল "বৌঠান! এদের জচ্চুরীর মধ্যে বেশ নিয়ম আছে। অনেকদিন লক্ষ্য করে করে নিয়মগুলি আমি বুঝতে পেরেছি এবং আজ আমি সব নিয়ম কাগজে লিখে এনেছি।"

এই বলে সে একখানি কাগজের টুকরো পায়ের তলা থেকে বার করে নিজের হাতে নিলে। তারপর বলে যেতে লাগ্‌ল,

তাসের চারটে রংকে এরা মুখের চার জায়গায় রেখেছে। অর্থাৎ চোখে হরতন, নাকে রুহিতন, কানে ইস্কাবন এবং ঠোঁটে চিড়েতন। যখনই খেঁড়ীকে রংয়ের জোর বা ত্রী বোঝাতে হয়, তখুনই এদের হয় চোখ কিম্বা কান কিম্বা নাক কিম্বা ঠোঁট ভয়ানক চুলকবার দরকার হয়। এ ছাড়া ছোট ছোট নিয়ম আরও আছে।

এই বলে সাবিত্রী হাতের কাগজখানা সকলের মধ্যে ফেলে দিলে। তাতে অতি সংক্ষেপে লেখা ছিল

চোখ=হরতন, কান=ইস্কাবন,
নাক্=রুহিতন, ঠোঁট=চিড়েতন,
চুল=আর একটা কিছু বল।
পায়ের বুড়ো আঙুল=ডেকোনা
হাঁটু=ডেকে নাও।

মণ্টী বৌঠান কাগজখানি দু-এক বার পড়ে সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা হরতনের দশ খেল্‌বে বুঝলি কি করে?"

সাবিত্রী শান্তস্বরেই বল্‌তে লাগ্‌ল,

"সে ত অতি সোজা। হিসেবে হরতন বাজারে আর মাত্র তিনখানা আছে, গোলাম, দশ আর বিবি। ছোড়দার হাতে গোলাম, ছোড়দার চোখ চুলকানো দেখেই বোঝা গেল। আমার হাতে বিবি। তোমার হাতে হরতন নেই, কেননা তুমি আগে হরতনের চোদ্দ পাসিয়েছ। দশ থাকলে তুমি ওদের পিঠে কখনই চোদ্দ পাসাতে না। শান্তদার হাতে যে একখানা হরতন আছে এটা বুঝলাম শান্তদার চুলে হাত না দেওয়া দেখে। নইলে ছোড়দার চোখ চুলকানর পরে শান্তদা একবার চুলে হাত দিতেন। তাই হরতনের দশ ছাড়া আর কি খেলবেন।"

আমরা সকলেই চুপচাপ্। মুকুন্দ গুম হয়ে বসে আছে। সাবিত্রী ধীরে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর ভাবে বললে,

"বৌঠান! আজ থেকে তাস খেলা ইতি। জোচ্চোরদের সঙ্গে আমি আর কখনই খেল্‌ব না।"

এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

জগদীশ ভট্টাচার্য্য

আজ পাশে কেহ নাই, দুঃসহ বিরহের ঘন অমাবস্যার রাত্রি ;
পথভোলা পবনের উন্মদ বেদনায় গুমরিয়া মরিছে অরণ্য,
মিলনের অভিসারে লক্ষ্য যে ভুলিয়াছে মানস-অলকা-লোক-যাত্রী ;
এ অন্ধ রজনীতে বেদনারে ভাষা দিতে গান তব হল কবি ধন্য।

ওগো বিরহের কবি, তোমার বিরহী সুর মোর প্রাণে উঠিতেছে ছন্দি,'
অশ্রুর ঝরণায় তোমার অশ্রু ঝরে—ঝরে জল আকাশের চক্ষে ;
দিশি দিশি ক্রন্দসী অবরোধ-ক্রন্দনে থেকে থেকে উঠিতেছে ক্রন্দি'—
সে ব্যথা তোমার গানে, সে ব্যথা আমার প্রাণে, ব্যথা বাজে নিখিলের বক্ষে।

বহু দূরে বিরহিণী বেহাগের আলাপনে মগ্ন হয়েছে লয়-গমকে,
তোমার রচনা দিয়ে রচে তার সুরলোক—উদ্বেল বিরহের রাগিণী ;
মোর প্রাণ কেন তায় কাঁপে মিছে দুরাশায়, কি যে ভুল ভরসায় চমকে—
মনে হয় ওগো কবি, আমারি প্রাণের মাঝে কাঁদিছে আমারি অনুরাগিণী।

সুরের ইন্দ্রজালে একি মোহ আনো প্রাণে, একি মোহ তব গানে বলনা ?
এ বর্ষা-সন্ধ্যায় মনপ্রাণ যারে চায় শুনি তারি সুর বাজে অদূরে ;
অপরিচিতার গান সমে হলো অবসান, দূর হলো রাগিণীর ছলনা ;
প্রিয়াহীন রজনীতে পেনু তব সঙ্গীতে চির-বিরহিণী প্রাণ-বঁধুরে।

রবীন্দ্র-পরিচয়

শ্রীঅবনীনাথ রায়

পঁচিশ বছর হ'ল শান্তিনিকেতন ছেড়েচি। কিন্তু আশ্রম-জীবনের দুএকটা ছাপ এখনো—এত দীর্ঘ দিনেও এবং উত্তর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও—মুছে যায়নি। জীবনে চলার পথে শান্তিনিকেতন থেকে কি পাথেয় সংগ্রহ করেছিলুম এ কথা যখনই চিন্তা করি তখনই এই লক্ষণগুলির সাক্ষাৎ পাই। বলা বাহুল্য এগুলি সবই আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে পেয়েছি। কি ক'রে সেই কথাই বলবো।

প্রথম হচ্চে সৌজন্য-বোধ এবং সহবতের শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথকে আমরা কখনো রাগ করতে দেখিনি। কখনো কাউকে কটু বাক্য বল্‌তে শুনি নি। শান্তিনিকেতনের স্কুলের কথা সকলেই জানেন। সেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন জাতির ছাত্র এবং শিক্ষকের সমাবেশ—পুরুষও আছেন, মহিলাও আছেন, তখনো বিশ্বভারতী হয় নি কিন্তু বিদ্যালয়ের শাসনযন্ত্রের নানা সমস্যার, নানা সমাধানের তখনো এক্‌সপেরিমেণ্ট চল্‌তো। সুতরাং কখনো কখনো তার সামান্য অপগতি অসম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বিরক্তির কারণ হয়ত জুটেছে, তাঁর আদর্শকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে লোকে হয়ত ভুল ক'রে ফেলেছে কিন্তু কিছুতেই তিনি বিচলিত হ'য়ে বাদ বিসম্বাদ করেছেন ব'লে জানিনে। তাঁর ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা অপরিসীম। কিন্তু শুধু ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতাই এর একমাত্র কারণ নয়, আমার বিশ্বাস তার আরো একটা মস্ত বড় কারণ এই যে তিনি মানুষের ভুল করার অধিকারকে স্বীকার করেন। কেননা তিনি মানুষকে সত্যি করে চেনেন, ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। আমি যখন ওখানে পড়তুম তখন মাঝে মাঝে কবিতা লেখার দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল। বিশ্ব-কবির সংস্পর্শে এবং সাহচর্য্যে এসে আশ্রমের অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীরাই আমার মনে হয় ঐ দোষে বা গুণে পীড়িত হয়। নিজের কথা বল্‌তে পারি, আমি যখন-তখন কাব্যের সম্ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে চড়াও করতুম। উত্তর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এখন তুলনা ক'রে বুঝতে পারি যে আমার সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যোত্তম কবির শান্তিতে বিঘ্নোৎপাদনের পক্ষে কত লজ্জাকর ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমি যখনি যেতুম রবীন্দ্রনাথ উৎসাহের সঙ্গে ফাউণ্টেন পেন নিয়ে তখনি কবিতা শুরু ক'রে দিতে বসতেন। কখনো বলেন নি, ঘুরে এসো গে, আমি এখন বড় ব্যস্ত, আর এক সময় এসো বা এই ধরণের কথা যাতে ক'রে এই অপ্রিয় কাজটা এড়ান সহজ হয়। এ তিনি জানেনই না, এ রকম আচরণ তাঁর সৌজন্য-বিধির অন্তর্গত নয়। এর কারণ যা পূর্ব্বে বলেছি—মানুষকে তিনি মানুষ ব'লে গ্রাহ্য করেন, সামাজিক পরিস্থিতির কোন্ ঘরে তার বাসা তাই বুঝে তার সঙ্গে কথা বলেন না। মানুষকে সহজ আনন্দের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করতে পারেন। চরিত্রের এই বিশেষত্বটির উল্লেখ করার প্রধান কারণ এই যে পরবর্ত্তী জীবনে এই ব্যবহারই পেয়ে এলুম যে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সৌজন্যবোধের কোন স্থান নেই। স্পষ্ট দেখলুম এখনকার জীবনে, সমাজে, এমন কি রাষ্ট্রেও 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতি অনুসৃত। মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারলে, জোর করলে, চেঁচামেচি করলে, আঘাত করলে তবেই নাকি মানুষের কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়। এমন কি এ কথাও বলার লোকের অভাব হ'ল না যে এই সৌজন্যবোধ মেয়েলিপনা ছাড়া আর কিছুই নয়—এর মধ্যে পুরুষোচিত দার্ঢ্য কিছুই নেই। কিন্তু একটু চিন্তা ক'রে দেখলেই বোঝা যায় যে এ কথা কি সত্যি? যাঁর জীবনে কালচারের ছাপ পড়েচে তিনি কি মানুষকে শুধু শুধু অপমান করতে পারেন? চাকরের সঙ্গে চেঁচাচেচি ক'রে কুরুক্ষেত্র বাধাতে পারেন? বাজারের তরকারিওয়ালার সঙ্গে দর নিয়ে তর্ক করে হাতাহাতি করতে পারেন? যাঁরা পারেন তাঁরা ঘরে পরে অনেক সময় সাধুবাদ অর্জ্জন করেন দেখেছি, ওঁদের অতি-সতর্ক লাভের কড়ি কোন দিন লোকসানের ঘরেও পৌঁছায় না জানি কিন্তু তবু

মনে হয় যে এই কি চরিত্রের বীরত্ব, এই কি সংস্কৃতি, এই কি সভ্যতা? বীরত্ব আর আস্ফালন কি একই বস্তু? এই যে সে দিন সতের জন জাপানী নেতা হরিকারি ক'রে মৃত্যু বরণ করলেন তাঁরা কি সকলেই কটুভাষী, দুর্ব্বিনীত এবং উচ্চ-মূর্দ্ধা ছিলেন? আমার বিশ্বাস তা নয়—বরঞ্চ এর উল্টোটাই সত্যি। শুধু কথায় নয়, কাজের সময়ও যাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ত্যাগকে যাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব'লে মনে করেন, মধুই তাঁদের চরিত্রের বিশেষত্ব, বিষ নয়। এর থেকেই আমার ধারণা যে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংসা অসহযোগ যে আমাদের দেশে ফলপ্রসূ হ'ল না তার কারণ এ নয় যে তার নীতিতে কোন ভুল ছিল, তার কারণ এই যে তিনি আমাদের কাছ থেকে চরিত্রের যে পূর্ণতা দাবি করেছিলেন তা আমাদের নেই। রবীন্দ্রনাথের জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে মানুষের জীবনকে মাধুর্য্য দ্বারা সৌন্দর্য্য দ্বারা, রসানুভূতির দ্বারা নন্দিত ক'রে তোলাই চরিত্রের পূর্ণতা।

উপরে যে উদাহরণ দিলুম তার থেকে আর একটা কথাও বোঝা যাবে—সেটা এই যে রবীন্দ্রনাথ কোন বস্তুকেই ছোট করে দেখতে পারেন না। আমি যখন তাঁকে কবিতা দেখাতে যেতুম তখন তিনি নিশ্চয়ই মনে করতেন না যে এতে তাঁর সময়ের অপব্যয় হচ্চে। ভিতরের অঙ্কুরকে উৎসাহ দিয়ে পরিবর্দ্ধন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলাও আমার অভিপ্রেত নয়। আমি এই কথা বলতে চাই যে সমস্ত কিছুকেই ভগবানের হাত থেকে গ্রহণ করচেন এই তিনি মনে করেন। তাই বালকবেশী ভগবানের হাত দিয়ে যে অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য তাঁর দরজায় পৌঁছেছিল তার প্রতি তাঁর বিমুখতা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার ফলে আর একটা ছাপ যা চরিত্রে মুদ্রিত হয়ে গেছে তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সেটা হচ্ছে সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরক্তি। এমন একটা বয়স ছিল যখন মনে হ'ত যে সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ত প্রত্যেক মানুষেরই ধর্ম, তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু পরে দেখলুম যে ঠিক তার উল্টো। কলেজে পড়ার সময় অনেকে সেকস্পীয়র মিল্টন পড়েন দেখি, তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনাও করেন, অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভাল নম্বরও পান কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা উত্তীর্ণ হ'য়ে চাকরি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেই সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের চিরবিচ্ছেদ ঘটে। এতেও দুঃখ ছিল না যদি না দেখতুম যে যে-সব কবি এবং সাহিত্যিক নিয়ে তাঁরা এককালে জীবিকা সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁদের প্রতি এদের একান্ত অবহেলা এবং যদি কেউ উত্তরজীবনে সাহিত্যের সম্পর্ক রাখে তাঁদের প্রতি এদের নিষ্কারণ অবজ্ঞা। আমি দেখেছি শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে যেখানে তাঁদের সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার প্রবৃত্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে শত চেষ্টা ক'রেও তা' আর জাগানো যায় না। কাদেরও এই প্রবৃত্তি চাপা পড়ে আছে, কাদেরও একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। বলা বাহুল্য সংসারে আমাদের অধিকাংশেরই যে জীবনযাত্রা তা' এই সাহিত্যিক জীবন বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল নয়। তবু তারি মধ্যে যেটুকু আমাদের আছে তার একমাত্র কারণ একদা রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য এবং তাঁর আশীর্ব্বাদ।

আমাদের সময়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে একজন সতীর্থ ছিলেন যাঁর কথা এতকাল পরেও মনে পড়ে। তিনি বেঁচে নেই—অনেক দিন আগে তাঁর মৃত্যুর খবরটা কেমন করে যেন আমার কানে পৌঁচেছিল। তাঁর নাম ছিল অতুলেন্দু সেনগুপ্ত। আমাদের তখনকার হাতে-লেখা মাসিক "শান্তির" তিনি ছিলেন সম্পাদক। আবার তিনি আমাদের "মনিটার"ও ছিলেন। শাল গাছে ঝোলানো পেটা ঘণ্টায় তিনি নিজের হাতে ঘণ্টা বাজাতেন। মোটা সাদা কাপড়ের (খদ্দরের নাম তখন আমরা জানতুম না) পাঞ্জাবী এবং ধুতি পরা ছাড়া তাঁর পোষাকের মধ্যে কোন বিলাসিতা ছিল না। কিন্তু সেগুলি সর্ব্বদা ছিল পরিচ্ছন্নতায় শুভ্র। বেশ মনে পড়ে তাঁকে আমরা ভয়ও করতুম, আবার ভালোও বাসতুম। অথচ তিনি কোনদিন হেসে ছাড়া আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন না। ঐ বয়সে কোমল এবং কঠোরের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ আমি আর দ্বিতীয় লোকের মধ্যে দেখি নি। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে অতুলদার উল্লেখ করলুম এই বিশ্বাসে যে বেঁচে থাকলে আজ তিনি কবির আদর্শ ছাত্র বলে পরিগণিত হ'তে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম ষষ্ঠসপ্ততিবর্ষ পূর্ণ হওয়া বাঙালীর তথা ভারতবাসীর জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। এই পুণ্য-তিথি উপলক্ষ্যে ভগবানের নিকট তাঁর দীর্ঘায়ু এবং স্বাস্থ্য কামনা করা তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের সুনির্দ্দিষ্ট অধিকার। সেই অধিকার বলে ভারতের ভাগ্যবিধাতার চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা যে তিনি প্রাচ্য সংস্কৃতির এই উজ্জ্বল বিগ্রহকে শতায়ু এবং পূর্ণ স্বাস্থ্যের বর দান করুন।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

অভিসার

শ্রীমতী ইলা দেবী

বিপাশা এম. এ ক্লাশের ছাত্রী। তরবারির মত ছিপছিপে দেহ. বিদ্যুতের মত চকিত নিশ্চিত তার ভঙ্গী। গোধূলি বেলার উদ্ভাসিত আকাশের মত বুদ্ধিদীপ্ত ওর মুখের পরে চেয়ে মুগ্ধ বরুণ ভাবে এই ত সে প্রজ্ঞাপারমিতা,—কত কবির কত শিল্পীর পরিকল্পনার সে প্রজ্ঞাপারমিতা—কোনো জড়িমা, কোনো কুণ্ঠা যার প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যকে দ্বিধান্বিত করতে পারে না। বরুণের সঙ্গে বিপাশার বিয়ে হবে-এটা সকলে ধরে নিয়েছে। বিপাশার অধ্যাপক পিতা সোমনাথ অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। প্রথম জীবনে তিনি ভীষণ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণা স্ত্রীর সঙ্গে এই মতদ্বৈধ নিয়ে তিনি একদিনও শান্তি পাননি। স্ত্রীর মৃত্যুতে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে তাঁর মনের গতি সম্পূর্ণ অন্য পথ ধরল। ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য।—তার শত রকম ব্যাখ্যা, সহস্র রকম বিচার, তাতে কত রূপ দেওয়া, কত রং ফলান, ক্ষিপ্ত সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গের মত উচ্ছ্বাস উদ্বেল হয়ে ওঠে কখন, শান্ত সমুদ্রের স্তব্ধ ধ্যানলীনতার মত পরিতৃপ্তি মানুষকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিচ্ছে কখন।—এ যেন কমল হীরেকে নানাভাবে নাড়িয়ে দ্যাখা, তার কত আলো, কত দীপ্তি। সোমনাথের বিক্ষিপ্ত চিত্ত ধীরে ধীরে এই নবতর রসের মাঝে পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়ে গেল। তিনি হয়ে দাঁড়ালেন ঘোরতর বৈষ্ণব। তাঁর প্রচণ্ড নিরীশ্বরবাদিতার দিনে মেয়ের নাম দিয়েছিলেন বিপাশা—পাশকে বিমোচন করে গতি যার উচ্ছল, এখন তাকে ডাকতে আরম্ভ করলেন 'রাধা' নামে। মেয়েকে তিনি নিজের ধরণে আদর দিতেন খুব বেশী। তার সকল সুখ-সুবিধা মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার শক্তি তাঁর ছিলনা হয়ত, কিন্তু তার কোনো ইচ্ছার পারতপক্ষে প্রতিবাদ করতেন না। আদর পেয়ে নষ্ট হবার বয়স বিপাশা কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু চিরকাল অতিরিক্ত অনুমোদনে তার স্বভাবে একদিকে যেমন একটা দৃপ্ত আত্ম-নির্ভরতা জেগেছে, একটা তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণুতাও জেগেছে তেমনি। নিজের ইচ্ছাই তার সকল কাজে চরম বিধান, কোনো প্রতিবাদ সে সহ্য করতে অনভ্যস্ত। শিশুকাল হতে সে বাপ-মায়ের মতের সংঘাত দেখেছে। দুপক্ষের বাড়াবাড়িকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দ্যাখার তার যথেষ্ট অবসর মিলেছে। বাপমায়ের মতদ্বৈধকে সঙ্গতির সঙ্গে সমালোচনা করার চেষ্টা করে করে তার স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছল সংসারের সমস্ত বিষয়কে যুক্তি দিয়ে বিচার করে দ্যাখা। জীবনের প্রতি কাজকে সে সহজবুদ্ধির সঙ্গে যুক্তি দিয়ে ওজন করে নেয়,—কোনখানে কমবেশী নেই, কোনখানে মামুলি ভাবুকতার ভুলভ্রান্তি নেই। তার বাজারের হিসেব হতে কলেজের পড়া প্রত্যেক কাজটি নিখুঁত ঘড়িধরা—কোনখানে ফাঁক পাবার যো নেই। মাকে সে দেখেছে সমস্তক্ষণ পূজা অর্চ্চনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে. পালপার্ব্বণ ব্রতউপবাসে বারমাস কাটত তাঁর। বাপের নিরীশ্বরবাদিতাকে সে একটা দুরন্ত জিদ বলে ভাবত। —আর সেই ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হল শেষ পর্য্যন্ত। বাপের এ বৈষ্ণব-প্রীতিকে সে বয়সপ্রাপ্ত শিশুর একটা সহনীয় পাগলামি বলে ধরে নিয়েছে। বিপাশার চিত্তে চরিত্রে কোথাও কোনখানে কিছুমাত্র উচ্ছ্বাসের অনিয়ম নেই, দুর্ব্বলতা নেই,—সমস্ত জীবনটি তার সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্গতির একটি সরল রেখার মত। কোনো বাসন্তী সন্ধ্যায় বরুণ পাগল হাওয়ার মত বিপাশার পড়ার ঘরে ঢুকে বই খাতা ছড়িয়ে দিয়ে বলত, "ওঠ বিপাশা, বাইরে এস। এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা বদ্ধ ঘরে বসে নষ্ট কোরো না।"

ছড়ানো বইগুলো গুছোতে গুছোতে বিপাশা বলে, "এখন নয়।—আমার philosophyর তিনপাতা বাকি আছে।"

বরুণ বলে, "থাকুক গে। বইয়ের পাতা ছাড়াও interest নেবার জিনিষ আছে জগতে; চেয়ে দ্যাখো।"

তবু বিপাশা নড়ে না।

কোন শুক্লা একাদশীর রাতে বরুণ আসে, বিপাশাকে খুঁজে বার করে রান্নাঘর হতে। বলে, "এখানে এখন কি করছ, চল ছাতে।"

বিপাশা বলে, "আরো আধঘণ্টা লাগবে আমার এ জিনিষটা নাবাতে। শেষ করে তবে যাব।"

বরুণ বলে, "ও জিনিষটা না হয় আজ ঠাকুরই কবল। তুমি এস, সেই গানটা গাইবে, 'পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে'।"

বিপাশা হাসে, অতি মধুর হাসি। বলে, "ভাবনা ত আজও আমার পথ ভোলেনি, খাব থেকে রান্নাটা নষ্ট হতে দি কি করে?"

বরুণের ধৈর্য্য টুটে যায়, "বলে, তোমার ভাবনা যেদিন ভুলবে, দেখবে সেদিন এমন বিপথে যাবে যে ফেরান কঠিন হবে।"

"এ কী অভিশাপ?"

"না worning।"

বিপাশা অনিচ্ছার সঙ্গে রান্নাঘর হতে বেরিয়ে আসে। বলে, "চল বাপু চল। তুমি রাগ করেছ দেখছি। কিন্তু রান্না যখন খারাপ হবে, চাঁদের আলোয় পেট ভরিও।"

বরুণ বলে, "তুমি হলে আসল একটি বস্তুতান্ত্রিক—কোনো রসবোধ তোমার নেই।"

গম্ভীর হয়ে বিপাশা বলে, "বাজে উচ্ছ্বাস আর ভাবুকতায় ফেনিয়ে ফেনিয়ে আমরা জীবনটাকে কেবলই হাল্কা আর খেলো করে তুলি।"

"তবে তুমি কি বলতে চাও জীবনটা একটা তুলাদণ্ড আর আমরা তার নিক্তি, ক্রমাগত পাষাণ ভাঙতে ভাঙতেই জীবন কাটবে?"

"তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু এটা বিশ্বাস করি জীবনের ধারাকে ইচ্ছেমত নিয়মে বাঁধলে তবেই তা কাজে আসে। বন্যার মত একটা উচ্ছ্বাসে কেবল অপচয়।"

"অত কৃপণ হোয়োনা বিপাশা। যা সহজ তা সব থেকে সত্য। জোর করে বাঁধা ফাঁস ছিঁড়বেই একদিন। আমার মনে হয় কি জান,—নিজের মনকে আজও তুমি জানলে না। যেদিন হঠাৎ সাড়া জাগবে সেখানে, এ বাঁধাবাঁধি, নিয়ম নিয়ন্ত্রণ ধূলো হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে,—পারবে কি তা সামলাতে?"

স্বপ্নসুন্দর দুই চোখ জ্যোৎস্না-শিহরিত আকাশে নিমগ্ন রেখে বিপাশা নীরব রইল।···কোন্ মুহূর্ত্তে কার মনে টান পড়ে তা কি বলা যায়! এই যে পৃথিবী, জলন্ত রক্তচক্রের মত প্রদীপ্ত চাঁদ, চূর্ণ অভ্রের অঞ্জলির মত তারাগুলি নিজের পরিমণ্ডলে একনিষ্ঠ নিয়মে ঘুরে চলেছে, সহসা আর এক মহাসূর্য্যের প্রবলতর আকর্ষণ পৌঁছায় যদি এদের কাছে,—কোটি কোটি বর্ষপরিচিত সূর্য্যের বন্ধন বৃথা হয়ে যাবে,—মিথ্যা হয়ে যাবে যুগ-যুগান্তের গতিধারা;—অনির্দ্দিষ্ট অজানায় ছুটে চলে যাবে তারা।—তবে এই অতি-ক্ষুদ্র মানুষের কথা কী বলা যায়।

ধীরে বিপাশা বললে, "কার মনকে কে বা জানে—" শুক্লা রাতের আলোকিত নিস্তব্ধতায় সে মৃদু কথা উদাস করুণ শোনাল।······

বড়দিনের আগতপ্রায় ছুটিতে কোথায় ভ্রমণে যাওয়া হবে সোমনাথের আলাপন কক্ষে সেই আলোচনা চলছিল। সোমনাথের কয়েকটি ছাত্র এসেছে; বরুণ একটা টাইম্ টেবলের পাতা ওল্টাচ্ছে। সোমনাথ আরাম চেয়ারে শাল জড়িয়ে বসে চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়ছিলেন। বইখানা বন্ধ করে রেখে বল্লেন, "হরি বোল, হরি বোল। চল বৃন্দাবনে ঘুরে আসা যাক। অনেক দিন থেকে যাব মনে করেছি—কালোশ্যামের লীলানিকেতন দেখে জীবন ধন্য হবে।"

বিনয় বললে, "কিন্তু এবার যে আমাদের কোনো historical ruins দেখতে যাবার কথা ছিল।"

বরুণ বললে, "এদিকের ত প্রায় সব দ্যাখা হয়েছে, এবার তাহলে সাঁচি গেলে হয়।"

অমল বললে, "বেশ, পাহাড়পুর ত দ্যাখা হয় নি, ওখানে যেতে পারা যায়। কাছেও হবে।"

সোমনাথ বললেন, "হ্যাঁ, সে মন্দ হয় না, ওখানে শুনেছি বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে ধারা বয়ে গেছল তার চিহ্ন পাওয়া যায়। তবে বৃন্দাবনের কাছে কি আর কিছু আছে, গোপীপদ-রেণুকার বেশ। রাধা, তুমি কি বল?"

বিপাশা আলমারীর বই সব ঝেড়ে সাজিয়ে রাখছিল। কাছে এসে বরুণের হাত থেকে টাইম্ টেবলটা তুলে নিলে। মনে মনে দ্রুত হিসেব করে বললে, "কন্‌সেশন্ টিকেটে বৃন্দাবন যাতায়াতেই সব সময় কেটে যাবে, কদিনই বা থাকা যাবে সেখানে। খরচও ত দেখছি ঢের বেশী পড়বে। তাহলে এবারের মত পাহাড়পুরে যাওয়া যাক, অন্য কোনো ছুটিতে বৃন্দাবন গেলে হবে।"

সন্তোষ বললে, "বিপাশা দেবী যখন যা ব্যবস্থা করেন তা এমন চৌকস যে তার ওপর আর কোন কথা চলে না।"

অমল বললে, 'আমরা ত কোথাও অভিযানের অভিলাষ করেই নিশ্চিন্ত, আমাদের অভিলাষকে কার্য্যকরী করার ভার বিপাশা দেবীর ওপর।"

সোমনাথ পরিতুষ্ট হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, রাধা থাকতে কারোকে কিছু ভাবতে হবে না—আমাকে ত ওই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।"

সকলে তখন প্রচুর কোলাহল করে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাক্যব্যয় করেও কেউ বিশেষ সহায়তা করতে পারলে না, বিপাশা নিজেই সব ব্যবস্থা করলে। বরুণকে বললে গেষ্ট হাউসে জায়গার জন্যে লিখে দিতে, ষ্টেশন হতে যাবার যানের বন্দোবস্ত করতে বললে।

সোমনাথের এসব বন্দোবস্ত করার ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল না, তিনি জানেন বিপাশা থাকতে সব কাজে সেই হাল ধরবে। তিনি শুধু বিপাশাকে বারম্বার মনে করিয়ে দিলেন তাঁর খাতাপত্র ও নোট নেবার ডায়েরি নিতে যেন ভুল না হয়। বিপাশা হেসে বললে, "সে তুমি কিছু ব্যস্ত হোয়ো না বাবা, তোমার খাতাপত্র সব যাবে, আর আমি সমস্ত নোট লিখে আনতে ভুলব না।"

সোমনাথ নিশ্চিন্ত হয়ে পদাবলীতে মনোনিবেশ করলেন।

সমস্ত দিন সকলে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্রাম গৃহের বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার বিছিয়ে বসে সকলের মৃদু কথাবার্ত্তা চলছে। তখনো অন্ধকার হয়নি, পশ্চিমের রাগরক্ত আকাশপটে ভাঙা বিহারের বিশাল স্তূপ বেদনার মত কালো দেখাচ্ছে। বহুদূর হতে আসা সন্ধ্যা-শঙ্খধ্বনি ক্ষীণ হয়ে শোনা যায়, অছাড়া নীরব চারিদিক।

সোমনাথ ছেলেদের বলছিলেন এর নাম ছিল সোমপুর। কত যুগ আগে হতে কত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত এই বিহারের ভিত্তিতটে ঢেউয়ের মত এসে ভেসে গেছে, কত দেশের কত জাতের সংস্কৃতির সম্মিলন এখানে হয়েছে। তিব্বত যবদ্বীপ চীন হতে কত ভ্রমণকারী এখানে এসে বিশ্রাম নিয়েছে, নালন্দা সারনাথ রাজগৃহ হতে কত ছাত্র কত ভিক্ষু এখানে আশ্রয় পেয়েছে। আজকের এই পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপে সেদিন ভিক্ষু ও ছাত্রদের সম্মিলিত মাঙ্গলিকে, পূজায়, ধূপে দীপে, পুষ্প চন্দনে দিনার আরম্ভ হত। দিনের শেষে সন্ধ্যাপূজা সমাপনান্তে বাংলা দেশের এই বিহারে বৃহত্তর ভারতের সর্ব্বপ্রান্ত হতে আসা অতিথি একত্র হত। কত ভাবের বিনিময়ে, চিন্তার বিনিময়ে, কাব্যশিল্পধর্ম্মের তর্কে বিহারের পাষাণকক্ষ মুখর হয়ে উঠত। বোরোবুদরের বিখ্যাত সে বিপুল মন্দিরের পরিকল্পনা এই পাহাড়পুরের বিহার হতেই গেছে, চীনব্রহ্মদেশের প্যাগোডার স্থাপত্যশিল্পের মৌলিক তত্ত্ব এখান হতেই সংগৃহীত হয়েছে। আজও তিব্বতে চীনে কোনে কোনো অতি প্রাচীন পুঁথিতে প্রাচ্যভারতের সোমপুর বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সোমনাথের মাঝে শিক্ষক তখন সজাগ হয়ে উঠেছে। তিনি বলতে লাগলেন কেমন করে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম্মের আয়ুশেষে বৈষ্ণবধর্ম্ম জেগে উঠল; বন্যার মত সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মারা বিধৌত করে নিয়ে অনাদি এক প্রেমসমুদ্রে বিমিশ্রিত করে দিল। এখানে তখন বুদ্ধের সঙ্গে বিষ্ণুপূজা আরম্ভ হল, বিপুলশ্রীমিত্র প্রতিষ্ঠিত তারামূর্ত্তির সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের আরতি হতে লাগল।

আঁধার কখন ভরে উঠেছে চারিদিক,—নীলাভকৃষ্ণ আকাশে হীরের মত তারার ঝলসানি। ঘরের মধ্য হতে বাতির আলো এসে পড়ে বিপাশার তন্ময় মুখের খানিকটা আলোকিত করেছে। অতীতের কল্পনা নীরবতার মায়াজাল বুনেছে সকলের মনে।

অন্ধকার পথে চলতে কে গেয়ে উঠল, 'জয় রাধাশ্যাম রাধা রাধ রাধা—"

স্বপ্ন টুটে গেল। সকলে সচকিত হয়ে নড়ে চড়ে বসল।

সোমনাথ বললেন, "ও কার গলা শোনা গেল, দেখত যেয়ে।"

দেখতে যেতে হলনা, সে লোকটি বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াল। তার খালি পা ধুলায় ভরা, গেরুয়া বসন, গৌর চেহারা, বিপর্য্যস্ত দীর্ঘকেশ, উদাস দৃষ্টি, দীর্ঘ দেহ, কাঁধে ফেলা একটা একতারা। কবেকার সে-সব ভাস্করের পরিত্যক্ত কোন পাষাণমূর্ত্তি রাতের মায়ায় প্রাণ পেয়েছে যেন।

সোমনাথ সবিস্ময়ে তার পরিচয় চাইলেন। সে বারান্দায় উঠে এল, একতারাটা নামিয়ে রেখে বললে, "বাবুজী, আমি বৃন্দাবন থেকে এসেছি। দেশে দেশে বেড়িয়ে আমার দিন কাটে। রাধাশ্যামজীউর নামগান করে বেড়ান হল আমার কাজ, শুনবেন বাবুজী আপনি?"

বরুণ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বাংলা শিখলে কি করে?"

সে একটু হেসে বললে, "বৃন্দাবনে বাঙালীর অভাব নেই, আর তাছাড়া আমি বাংলার কোন্ দেশ না ঘুরেছি।"

সন্তোষ বললে, "বাংলা গান জান? শোনাও না একটা।"

একতারার তারে সে দু-একবার মৃদু ঝঙ্কার দিলে, তারপর গান আরম্ভ করলে, "বঁধুয়া কি আর কহিব আমি—" বহু পুরাতন গান, চিরন্তন স্বর,—কণ্ঠ-মাধুর্য্যে অপূর্ব্ব হয়ে উঠল। কালো আকাশকে প্লাবিত করে নিস্তব্ধ নিশীথিনীকে শিহরিত করে ঢেউয়ের মত সে গান মনকে দোলা দিতে লাগল,—চরম ব্যথায় পরম স্থলে সে গান সকল অনুভূতিকে যেন মূর্চ্ছিত করে দিতে চায়। গভীর শূন্যতার অতল তিমিরে তলিয়ে যেয়ে কখন কেঁদে ওঠে—"একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে আপনা বলিব কায়"—সমস্ত আনন্দবেদনা নিবেদনের পরম গৌরবে কখন গেয়ে উঠছে, "শীতল বলিয়া শরণ লইনু ওদুটী কমল পায়..."

গানের শেষে অনেকক্ষণ সকলে নীরব হয়ে রইল। তারপর সোমনাথ বলে উঠলেন, "গোবিন্দ, গোবিন্দ। কী লীলা তোমার, এই নির্ব্বান্ধব জায়গায় এমন গান শোনালে।"

একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার নামটা কি তাত বলনি।"

গায়ক বললে, "গোপীবল্লভের সেবক আমি, সেই সকলের বড় নাম। তবে লোকে আমায় মদনমোহন বলে ডাকে।"

সোমনাথ ততক্ষণে ভাবে আপ্লুত হয়ে উঠেছেন; বললেন, "তুমিত, নীলকান্ত মদনমোহন নও, তুমি বলরাম।"

অমল বললে, "তুমি এমন করে ঘুরে বেড়াও কেন? বাড়ীতে তোমার কি কেউ নেই?"

মদনমোহন বললে, "বাবুজী, আমার বুড়ো বাপ ছিলেন মৈথিলী পণ্ডিত। আমায় সমস্তক্ষণ শাস্ত্র পড়াতেন। আমার ভাল লাগত না, গান গেয়ে বেড়াতে ইচ্ছে হত। একদিন একদল বাউলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। তারপর অনেকদিন পরে যখন বাড়ী ফিরলাম বাপের খোঁজ পাইনি। সেই থেকে ঘর আমার শেষ হয়ে গেছে।"

সোমনাথ বললেন, "গোবিন্দজী তোমায় ডেকে নিয়েছেন মদনমোহন,—সংসারের খেলাঘরে তোমায় ধরে রাখবে কি করে? কিন্তু আমি যতদিন এখানে আছি তোমায় ছাড়ছি না। আর একটা গান শোনাও তুমি।"

বিপাশা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার সে উঠে বললে, "না বাবা, আর গান নয় আজ। রাত হয়েছে, খাবে চল এবার।"

সোমনাথ বললেন, "আহা খাওয়া আর শোওয়া, এত আছেই বার মাস। গোবিন্দের নাম-গানে সব খিদে মেটে তা ত তুমি আজও বুঝলে না রাধা।"

মদনমোহন এতক্ষণে বিপাশাকে দেখতে পেলে। সে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে ছিল, অন্যমনে বললে, "রাধা?"

সোমনাথ তার দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ, আমার এই মেয়েও গান জানে খুব ভাল, তোমার গোটাকতক কীর্ত্তন ওকে শিখিয়ে দিও।"

মদনমোহন পুলকিত হয়ে বললে, "বাবুজী আমি খুব ভাল ভাল গান রাধাকে শোনাব।"

বিপাশা মদনমোহনের প্রতি সুরু হইতেই অপ্রসন্ন হয়ে ছিল। ভবঘুরে অকেজো লোকদের প্রতি তার মনের কোনখানে কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। বাপের কথায় আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রূকুটি করে বললে, "আজ আর গান হবে না।"

সোমনাথ জানতেন এর পরে আর কথা চলবে না।

তার পরদিন সোমনাথ একটা মস্ত আবিষ্কার করলেন। বিহারের ভগ্নভিত্তি হতে কিছুদূরে অর্দ্ধশুষ্ক একটা কাঁটাঝোপের

তলে কাল পাথরের একটা সমগ্র কৃষ্ণমূর্ত্তি, কতকটা মাটি চাপা পড়ে রয়েছে, কতকটা কাঁটা ঝোপের আড়ালে পড়ে রয়েছে। সোমনাথ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে সকলকে ডাকা-ডাকি করতে লাগলেন। তখুনি হৈ হৈ করে কয়েকজন মজুরকে ধরে এনে মূর্ত্তির মাটি কেটে সমস্তটা বার করে তোলা হল। মানুষ প্রমাণ মূর্ত্তি, প্রায় অভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। সাধারণ যে সব বিষ্ণু কিম্বা রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি মেলে তাহতে স্বতন্ত্র ধরণের—মাথায় শিখীপাখা, হাতে বাঁশী, মুখে ঈষৎ হাসি,—রহস্যমধুর অপূর্ব্ব সে হাসি, কোন শিল্পীর কত সাধনার সৃষ্টি। দীর্ঘ সুন্দর দেহে কোনোখানে অসামঞ্জস্য নেই, প্রতি অঙ্গের রেখার সংযমে শক্তি ও লালিত্যের সুন্দর অভিব্যক্তি।

সোমনাথ বললেন, "এ একটা বিরাট আবিষ্কার বরুণ। এ হয়ত ভাস্কর্য্য ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দেবে। কৃষ্ণমূর্ত্তি হোলেও এ পুরোপুরি বৈষ্ণবশিল্প নয়, বৌদ্ধ-বৈষ্ণব শিল্পের এ একটা masterpiece, এর সঙ্গে হয়ত একটা যুগের ধর্ম্মধারার বিবর্ত্তনের ইতিহাস মিলবে।"

অমল বললে, "একে এখন কি করা যায় ?"

সোমনাথ বললেন, "কি করা যায় মানে ? একে কি একটা দায় ভেবেছ নাকি ? একে এখুনি ত rest house এ নিয়ে যেয়ে রাখা হোক, তারপর চিঠি পত্র লিখে permission আনিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

ততক্ষণ ওরকম স্থানেও বেশ ভিড় জমে উঠেছে। সোমনাথের প্রস্তাব শুনে সকলে সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। একজন বললে, "বাবু, এমন কাজটি ভুলেও করবেন না, এ সব ভাঙা দেবতায় কত অপদেবতা বাসা করে, এ সব ঘরে তুললে সর্ব্বনাশ হয়।"

আর একজন বললে, "পাগল হয়েছেন বাবু! এই সেবার আর একদল এসে একটা পুতুল তুলে নিয়ে ওই হোথা আমতলায় রাখলে, সে রাতেই গাছটা বাজ পড়ে পুড়ে গেল। যে গরুরগাড়ীগুলা ইষ্টিশানে নিয়ে গেছল, ফিরে এসেই সে সে ভির্মি লেগে মারা গেল। বলদ দুটিও বাদ যায়নি। দিন দুয়েক পরে তারা হুতাশে মারা গেল।"

সহজে সে মূর্ত্তি কেউ ছুঁতে চায় না। অনেক বেশী বখশিষের লোভ দেখিয়ে অবশেষে কয়েকজন লোককে রাজি করান গেল। অত্যন্ত গুরুভার, ধরাধরি করে অনেক কষ্টে মূর্ত্তিকে এনে বিশ্রাম গৃহের বারান্দায় দেয়ালে হেলিয়ে কোন মতে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। সোমনাথের ভৃত্যরাও এতে ঘোরতর আপত্তি করতে লাগল। সোমনাথ তাদের প্রচণ্ড তাড়া দিয়ে বললেন, "দূর হ, ব্যাটারা পাপিষ্ঠ। তোদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্য তাই এমন বংশীধারীর দ্যাখা পেলি, আবার বলছিস অপয়া, অমঙ্গল! তোদের নরকেও স্থান হবে না।"

সেদিনও সন্ধ্যায় সকলে বারান্দায় বসেছে। নব-আবিষ্কৃত মূর্ত্তি ছাড়া সেদিন অন্য কোনো কথা নেই। বিপাশা সমস্ত দিন ধরে তাকে ঘসে মেজে নির্ম্মল করে তুলেছে। কতক-গুলো বাঁশের খোঁটা কোথা থেকে জোগাড় করিয়ে আনিয়ে ঠেকো দিয়ে তাকে সোজা করিয়ে দাঁড় করে রেখেছে। অমল মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "ধন্য ভাস্কর, যে এমন পরিকল্পনা পেয়েছিল।"

সন্তোষ বললে, "তারপর যে দিন তার সৃষ্টিকে সকলে মন্দিরে এনে পূজা করলে, তার জীবনে কী সার্থকতার দিন সে!"

বিনয় বললে, "কিন্তু আরো পরে যখন পূজো আরতি শেষ হয়ে গেল, মন্দির গেল ভেঙে, নগর গেল ধ্বংস হয়ে, সে ভাস্কর যদি দেখত তার মূর্ত্তিকে এমনি কাঁটাঝোপের তলায়, কী বলত সে!"

এবার বরুণ কথা বললে, "তবু দেখত সে তারই জিৎ। যে সৃষ্টি সুন্দর, তা চিরকালের, কোনো বিশেষ অবস্থা বা আবেষ্টনে তার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই।"

সোমনাথ বললেন, "মদনমোহন, তুমি ত রাগ-রাগিণীকে বন্দি রেখেছ তোমার গলায়। আজ বংশীধারীর বন্দনা গান কর, তোমার গান মূর্ত্তিতে প্রাণ আনুক,—আমাদের সকলের মনের বন্দনা তোমার গানে বেজে উঠুক।"

বিপাশা বাপের এ রকম প্রশংসায় বিরক্ত হয়ে উঠত। কোথাকার কে একটা বাউল, তাকে এত মাথায় তোলা—তার বাপের সবতাতেই কী যে পাগলামি! কিন্তু তখনকার মত সে চুপ করে গেল।

মদনমোহন সরে এসে মূর্ত্তির সামনে বসলে। কয়েক মুহূর্ত্ত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে তারপর গান আরম্ভ করলে,—প্রথমে মৃদুগুঞ্জনে,—

"দিজিয়ে দরশন মুঝে
বংশীকে বাজানেওয়ালে—"

ধীরে সুর ক্রমে গভীর মধুর হয়ে উঠল, অন্তরের সমস্ত আগ্রহে আনন্দে উদাত্ত হয়ে শান্ত সন্ধ্যাকে শিহরিত করতে লাগল। মদনমোহনের তরুণ বেণুর মত সরল দেহ গানের উচ্ছ্বাসে কেঁপে উঠছে, অর্দ্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে যেন অন্তরের আরতি-প্রদীপ জ্বলছে—তার রুক্ষ কেশ, গেরুয়া বেশ—অতীতের কোন সাধকশিল্পী যেন সত্যই তার সৃষ্টির প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় বসেছে।

নারদকীর্ত্তনে বিষ্ণুর বিগলিত চরণপদ্মের মত কালো পাথরের মূর্ত্তি কালো সন্ধ্যায় যেন গলে মিলিয়ে গেল—জেগে রইল শুধু অধরের অনুপম সেই হাসি, আর চোখের চাহনি,—কাছের যা-কিছুকে এক ঝলকে দেখে নিয়ে সে চাহনি যেন ভেসে গেছে বহুদূরে ভাবী কালের অন্বেষণে।...

সোমনাথ অপলকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ জোড় হস্তে বলে উঠলেন, "বংশীধারী, রাধাবল্লভ, ডেকে নাও, ডেকে নাও, সব মোহ ঘুচিয়ে দাও—তোমার প্রেমে ডুবিয়ে দাও।" কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে অনুচ্চস্বরে বললেন, "রাধা এস, প্রণাম কর, তোমার মনের আড়াল সরে যাক।"

বিপাশা সচকিত হয়ে উঠে কি বলতে গেল,—মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়ায় থেমে গেল। বাপের দিকে ব্যাকুল চোখে চাইলে একবার, তারপর উঠে এসে মূর্ত্তির প্রস্তরচরণে মাথা রেখে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে রইল—তারপর ধীরে ঘরে চলে গেল। বরুণ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল।......

আরো কয়েকদিন কেটে গেছে। দ্বিপ্রহরে অমল বিনয় আর সন্তোষ তক্তপোষে গড়াগড়ি দিচ্ছে। বরুণ একটা অর্দ্ধভগ্ন আরামচেয়ারে পা তুলে বসে পুরানো খবরের কাগজের পাতাগুলো উলটে দেখছে। অমল বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে বললে, "নাঃ, কানাইটা'কে না তাড়ালে চলছে না, বিছানাটা পর্য্যন্ত সাত জন্মে ঝাড়ে না, রাজ্যের ধুলো বালি জমেছে।"

বিনয় বললে, "ওটা নেহাৎ অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে। সমস্তক্ষণ ওই বাউলের সঙ্গে আড্ডা,—সেদিন তিনটে পেয়ালা ভাঙলে।"

সন্তোষ বললে, "ও বোধ হয় ধরে নিয়েছে ভগ্নস্তূপের দেশে সব জিনিষের ভগ্নতা প্রাপ্ত হওয়া দরকার,—সব সময়ই একটা না একটা কিছু ভাঙছেই।"

অমল বললে, "যত নষ্টের মূল ওই বাউলটা। আমাদের ঠাকুরত সারাক্ষণ হাঁ করে বসে গান শুনছে, এদিকে রান্না যা হচ্ছে ভূতে খেতে পারে না।"

সন্তোষ বললে, "সত্যি, আমার ত ইচ্ছে করে বাউলটাকে ধরে কষে ঘা কতক লাগিয়ে দিই। ওটা ভারি অপয়া, ওটা আসার পর থেকে যত গোলমালের সুরু হয়েছে। অথচ প্রফেসার ত ওকে idolise করেন।"

অমল বললে, "সে হিসাবে মূর্ত্তিটাও অপয়া। আমার ত বাপু ওর expression কি রকম uncanny লাগে, তা যাই বল।"

বিনয় বললে, "প্রফেসার ত মদনমোহনের আসা আর মূর্ত্তির আবিষ্কারের মধ্যে একটা যোগাযোগ দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস মদনমোহন ওই মূর্ত্তির জাতিস্মর সাধক।"

অমল বললে, "তাঁর বিশ্বাসের ছোঁয়াচ বোধ হয় বিপাশা দেবীরও লেগেছে, তা না হলে তিনি যে কি করে ওকে এতটা সহ্য করেন—এটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের মত লাগে।"

জানালা দিয়ে দেখা যায় শীতের নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ রৌদ্রঝলসিত প্রান্তরপ্রান্তে নেমে এসেছে, মাঠের মাঝে কাঁটা-ফুলের ঝোপ গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তফুলে ভরে উঠেছে। কাগজগুলো ফেলে রেখে বরুণ সেইদিকে চেয়ে রইল, কোনো কথা বললে না। সব কাজে সকল বিষয়ে বিপাশার আগ্রহ যেন শেষ হয়ে গেছে, সমস্ত বিষয়ে তার সজাগ দৃষ্টি যেন শিথিল হয়ে গেছে।—বরুণ ভাবে এ কী সুরের নেশা? মূর্ত্তির কাছে বসে বসে মদনমোহন গান গায় বিপাশা শোনে,—তার মুখের একাগ্র তন্ময়তায় বরুণ বিস্মিত হয়ে যায়। সোমনাথের স্বাভাবিক পাগলামি আরো বেড়েছে; তিনি বলেন, "এই গান দিয়েই বংশীধারীর পূজা আরতি আমাদের।"

বিপাশার এ মনোযোগে মনে মনে তিনি পরিতুষ্ট, ভাবেন এবার সে তাঁর দলে এসেছে—গোবিন্দের লীলা, সাধ্য কি দূরে থাকার। কিন্তু বরুণ বিপাশার অন্যমনস্ক মুখের পানে চেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, প্রাত্যহিক জীবন হতে ও যেন

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পাচক রন্ধন কোনদিন লবণশূন্য কোনদিন লবণতিক্ত করে, বিপাশার আজকাল আর খেয়াল হয় না,—ভৃত্যেরা কক্ষ অপরিচ্ছন্ন রাখে, কোনদিন খাবার পাত্র ধুতে ভুলে যায়, কোনদিন স্নানের জল দিতে ভুলে যায়,—সে সব এখন আর বিপাশাকে বিচলিত করে না। সোমনাথ রোজই বিপাশাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি যে সব নোট চেয়েছিলেন লেখা হয়েছে কিনা,—বিপাশার কোনদিন লেখা হয় না। বরুণ বিপাশাকে জিজ্ঞেস করতে চায়, কিন্তু বলার মত কথা খুঁজে পায় না, কোথায় কি যেন ব্যবধান এসে দাঁড়ায়। বরুণ একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বিনয় জিজ্ঞেস করলে, "কোথাও যাচ্ছ নাকি?

অমল বললে, "ও ভগ্নস্তূপ দেখে দেখে ত অরুচি হয়ে গেল। It's getting on my nerves now!"

সন্তোষ বললে, "কিন্তু প্রফেসর এখান থেকে শিগগির নড়বেন বলে ত' বোধ হয় না।"

বিনয় বললে, "এবার ফিরতে পারলে বাঁচা যায়। এসব ভাঙ্গা ইট পাথরের মধ্যে একটা depressing ভাব আছে, বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না।"

সন্তোষ বললে, "তাইত দেখছি তোমা হেন ব্যক্তিও কবি হয়ে উঠছে।"

বরুণ বেরিয়ে এসে মেঠো পথে চলতে লাগল। সে ভাবছিল বিনয়ের কথায় অনেকটা সত্য আছে,—শুধু প্রান্তরের যে দিকে দৃষ্টি যায়, ধ্বংসের ব্যথিত ব্যর্থতা,—মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টার পরিশেষে পরাজয়ের পরিচয় যেন এরা, মানুষের যত কীর্ত্তি, যত কর্ম্ম কালসমুদ্রে আলোর বুদ্বুদ শুধু।

খানিকটা ঘুরে বরুণ ফিরে আসছিল, গানের সুর শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। একটু দূরে মরানদীর ভাঙা ঘাটের পাথর-বেদীতে বিপাশা বসে,—তার দীর্ঘ কুন্তল পিঠ বেয়ে পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। বঙ্কিম সুন্দর একটি হাত অলস ভঙ্গীতে বেদীর ওপর রাখা, অগ্নিশিখার মত আঙুলগুলি কালো পাথরের গায়ে জ্বলছে যেন। আরেক হাতে চিবুক রেখে সে উদাস দৃষ্টি দূর প্রান্তরে মেলে আছে।—একটু দূরে মাটিতে বসে মদনমোহন গাইছে একটা অংলা সুরের গান, "ম্যয় কেইসে যাও পিয়া তোরি নগরিয়া—"অলস অপরাহ্ণে সে অংলাসুর নীড়হারা পাখীর মত শূন্য আকাশে ঘুরে ফিরছে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে। সে সুরের সঙ্গে বিপাশার মনও যেন কোন অজানায় চলে গেছে কোন্ অচেনাকে খুঁজে আনতে,—সে এমন অন্যমনা হয়ে গেছল বরুণের মৃদু আহ্বান তার কানে গেল না।

যত রাগ পড়ল মদনমোহনের ওপর—ওই ভবঘুরে বাউলটার সঙ্গে নির্জ্জন প্রান্তরে এসে গান শোনা যে সঙ্গত নয় এটা বিপাশাকে কি করে বলতে হবে ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে এল। মদনমোহন তাকে দেখতে পেয়ে গান থামাল। বিপাশা মুখ ফিরিয়ে বরুণকে দেখতে পেয়ে একটু হাসল। —তার মুখের করুণ হাসি বরুণের মনকে গভীর একটা নাড়া দিলে, ওমুখ হতে যেন গোধূলির দীপ্ত আলো মিলিয়ে গেছে, জেগে আছে বিষাদের কালো ব্যথা। স্নিগ্ধ স্বরে বরুণ বললে, "এখানে কখন এলে বিপাশা?"

বিপাশার উত্তর দেবার আগেই মদনমোহন বললে, "আমি গান করছিলাম শুনতে পেয়ে বাঈ এলেন।"

বরুণ রুক্ষস্বরে বললে, "আচ্ছা তুমি যাও এখন।" সে নিরুত্তরে একতারাটি তুলে নিয়ে চলে গেল।

বরুণ পাথরের একপাশে বসে পড়ে বললে, "কি এত ভাবছিলে বিপাশা?

বিপাশা বললে, "ভাবিনি। ভাবনার উত্তর যেন পাচ্ছি।"

বরুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, "তার মানে? তোমার কোথায় কি যেন একটা দ্বন্দ্ব বেধেছে বিপাশা, কী সেটা?"

বিপাশা বরুণের দৃষ্টি এড়িয়ে বললে, "কি করে বলব? জীবনভরা জিজ্ঞাসা, কোনটারই বা উত্তর মিলেছে।"

বরুণ কতকটা কৌতুক করে বললে, "তোমার মুখে এসব sentimentality শুনতে হবে কে জানত।"

বিপাশা গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, "কাকে sentimentality বল তোমরা? আর কাকে বলতে চাও practical? আমি ভাবি এই যে বৈষ্ণবদের প্রেমধর্ম্ম, মনকে সকল রকমে মুক্তি দেওয়া, সে সহজমুক্ত মন যে পথ চিনে নেবে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করা,—এর চেয়ে rational মতবাদ আজও হয়েছে কি? কিন্তু বাইরে থেকে লোকে বলবে এ শুধু উচ্ছ্বাস, এত উচ্ছ্বাসে সমাজ

সংসার চলে না।—অথচ দেখতে গেলে কতকগুলো sentimental theory দিয়েই ত সমাজ রয়েছে বাঁধা।"

"কাকে তুমি বলছ sentimental theory?"

"কোন্‌টা নয়? জন্ম আর মৃত্যু এই হল প্রকৃতির মৌলিক সত্য,—এ ছাড়া আর সবই ত মনগড়া। বিয়ের ব্যাপারটাই ধর,—সমস্তটার ভিত্তি রয়েছে sentimentএর ওপর। যে জিনিষটা সম্পূর্ণ artificial,—শুধু একটা লোকাচার, তাকে এতখানি প্রাধান্য, এতখানি ক্ষমতা দেওয়া হল, সে ত শুধু sentimentএর খাতিরে, কিন্তু তাকে ত উচ্ছ্বাস বলে অগ্রাহ্য করে না লোকে।"

"শুধু উচ্ছ্বাস ভেবনা একে। যে লোকাচার এত ব্যাপক হয়ে দাঁড়াতে পারে তার মাঝে কিছু আবশ্যকীয় সত্য আছে এ মানতেই হবে।"

বিপাশা হঠাৎ জলে উঠে বললে, "কেন মানতেই হবে? পুরাণো প্রথার পায়ে পায়ে চলা ছাড়া আর কি গতি নেই? সেই বাঁধা নিয়মে বিয়ে করা, ধরা বাঁধা সংসার, একঘেয়ে জীবন,—এর চেয়ে বড় কি কিছু হতে পাবে না? বৃহত্তর জীবনের সাড়া কারো মাঝে জাগবে না, পথ বন্ধুর বলে নবতর পথে কোনো পথিক এগোবে না?"

এ সেই বিপাশা!—কোন্ সমুদ্রের জোয়ার জেগেছে ওর মনে, কোন্ বাঁধনহীন পথের বাণী পৌছল ওর জীবনে!—বরুণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

কালো হয়ে আসা দিগন্তের মত উদাস কালো হয়ে এল বিপাশার দৃষ্টি, নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার মত বিষাদ-বিষণ্ণ শোনাল তার স্বর,—ধীরে সে বললে, "কদিন মানুষ বাঁচে! এত ছোট জীবনের এত বেশী অপচয়, কেবল নিয়ম, কেবল বাঁধন।—যে জীবনকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করি, তাহার আছে বদ্ধ জলের পানাপুকুর।—এর চেয়ে কোনো বিপুল বন্যায় ধুয়ে চলে যাওয়া ঢের ভালো—এমন নিস্তেজ হয়ে বাঁচার চেয়ে খসে পড়ে জলে শেষ হওয়া ভাল।..."

রাত্রির কালো বন্যা পূর্ব্ব আকাশে থমকে রইল, শীত সন্ধ্যার নরম নীলাভ কুয়াশা ঘাটে ঘাটে ঘনিয়ে এল। নীড়ে ফেরা একদল বকের পাখার ধ্বনিতে স্তব্ধ সন্ধ্যা একবার শব্দময় হয়ে উঠল। কয়েকটা চামচিকে ঘূর্ণি হাওয়ায় শুখনো পাতার মত নিঃশব্দে ঘুরপাক দিয়ে উড়ে গেল। শিশির ভরা শীতের হাওয়া হঠাৎ বাঁধনহারা হয়ে ছুটে এল, ভাঙা দেউলের ভেতর দিয়ে মরা নদীর ওপর দিয়ে ভগ্ন মূর্ত্তিদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিপাশার মুক্ত কুন্তল দুলিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাসের মত বয়ে চলে গেল।...

এর পর থেকে বিপাশা বরুণকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে লাগল। তার আত্মনির্ভরতাভ্যস্ত চরিত্র কারো প্রতি নির্ভরতার সম্ভাবনায় বিমুখ হয়ে ওঠে। ওটাকে সে দুর্ব্বলতা বলে ভাবে। এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে বরুণের কাছে তার মনের ভাব কতকটা প্রকাশ করে পর্য্যন্ত সে একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেছে। মুখের হাসি তার একেবারে মিলিয়ে গেছে, ক্লান্ত সচকিত দৃষ্টি,—অযত্নে চুল হয়ে উঠেছে রুক্ষ বিপর্য্যস্ত। সকল কাজে সব বিষয়ে তার একটা স্বচ্ছ ঔদাসীন্য বরুণকে আহত করে—কিন্তু সে অভিমান করতে পারে না। বিপাশার বিশুষ্ক মুখের পানে চেয়ে সে ব্যথিত হয়ে ওঠে।

ছুটি শেষ হয়ে এল। সোমনাথের ছাত্ররা ফিরে গেল, কিন্তু সোমনাথ যেতে চাইলেন না। তাঁর মূর্ত্তিকে কলকাতায় নিয়ে যাবার অনুমতি পত্র আসে নি, তিনি সেই ওজরে আরো ছুটি নিয়ে রইলেন। মদনমোহনের গানে আর ভাঙা মূর্ত্তির সন্ধানে দিন তাঁর আনন্দে কাটছিল। বরুণকেও থাকতে হল। সে থেকে কি করবে জানে না, তবু বিপাশাকে এখানে রেখে চলে যেতে তার ইচ্ছা হল না। কিন্তু তার আর বিপাশার মাঝে বহু যোজনের ব্যবধান এসেছে,—সমস্তদিনে বিপাশার সঙ্গে কথা বলাই কঠিন। বিপাশা সারাক্ষণ বসে থাকে মূর্ত্তির কাছে, মদনমোহন গান গেয়ে যায়, তার কণ্ঠ গান দিয়ে ছবি আঁকে,—কত বিভিন্ন অনুভূতির অশ্রুহাসি দুঃখসুখে বিভাসিত সে ছবি,—বিপাশার সমস্ত সত্তা সে সুরসমুদ্রে সমাহিত হয়ে যায়। বরুণ তাকায় মূর্ত্তির দিকে। বেশীক্ষণ তাকান যায় না, কী অস্বাভাবিক তার দৃষ্টিহীন চোখ—বাক্যহীন ওষ্ঠ সেই অদ্ভুত হাসিতে নড়ে উঠল যেন।...

সেদিন অনেক রাত হয়ে গেছে। বরুণ ষ্টেশনে গেছল, ফিরতে দেরী হয়ে গেছে। ভাঙা ঘাটের বেদীর ওপর অত রাতে ভাখে বিপাশা বসে রয়েছে।

বিস্মিত বিরক্ত হয়ে সে বললে, "এখানে এখন তুমি ?"

বিপাশা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল, হঠাৎ চমকে উঠে নিভৃত নীড়ে সচকিত পাখীর মত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে চলে গেল। বরুণকে যেন চিনতেও পারেনি। নিকষ পাষাণের মত নিবিড় কালো আকাশের গায়ে তীক্ষ্ণ অগণ্য তারা, সেইদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ বরুণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর কতরাতে কতবার বিপাশা ঘরে নেই দেখে বরুণ বাইরে যেয়ে ছাখে অন্ধকারে ঘাটের পারে সে বসে আছে।—কখন সে অস্থির হয়ে ভেঙেপড়া পাথরগুলোর মাঝে ক্ষিপ্র চঞ্চল চরণে ঘুরে বেড়ায়—কখন সে মূর্ত্তির পদপ্রান্তে এসে বসে নিস্তব্ধ হয়ে। অত্যন্ত বেদনায় বরুণ ভাবে কোথায় সে বুদ্ধি-প্রদীপ্তা কর্মে, আনন্দে অনিন্দিতা বিপাশা।

বরুণ সোমনাথকে ফিরে যাবার জন্যে পেড়াপিড়ি করতে লাগল, বললে, "বিপাশার শরীর একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ও কিরকম বদলে গেছে দেখতে পাচ্ছেন না ?"

সোমনাথ বিব্রত হয়ে বললেন, "আঃ, তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে আর পারা গেল না। বড় চঞ্চল তোমাদের মন। ওর যে পরিবর্ত্তন হয়েছে বলছ, বাপুহে, ও পরিবর্ত্তন কি সকলের হয় ?"

ভাবে আনন্দে গদ গদ হয়ে তিনি বলতে থাকেন, "স্বয়ং শ্যামসুন্দর টান দিয়েছেন ওর মনে, এই টানে রাজনন্দিনী রাধারাণী যমুনার কূলে কূলে কেঁদে বেড়াতেন,—এই টানে রাজরাণী মীরাবাই সংসার ভাসিয়ে দিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সে খেয়ালী ঠাকুর কোন খেয়ালে কাকে মজাবে কেউ কি জানে তা ?"

বরুণ নীরব হয়ে রইল। এই অর্দ্ধবাতুলকে কি বোঝাবে সে ?

সোমনাথ বললেন, "আচ্ছা রাধাকে ডাক, সে যদি যেতে চায় তবে না হয় ফেরা যাবে।"

বিপাশা এলে সোমনাথ বললেন, "তোমার শরীর ভাল নেই রাধা। বরুণ ফিরে যেতে চায়, আমার কিন্তু আরো কিছুদিন না থাকলে ক্ষতি হবে, তবে তুমি যদি যেতে চাও—"

বিপাশা স্থির ভাবে বললে, "না বাবা, আমার ফিরে যেতে একটুও ইচ্ছে করে না।"

সোমনাথ পরিতুষ্ট হয়ে বরুণকে বললেন, "দেখলে আমি জানি, বিপাশার এখানে ভাল লাগছে।" তিনি উঠে চললেন আবার ভাঙা মূর্ত্তির খোঁজে।

বরুণ মুখ ফিরিয়ে ছাখে বিপাশা তার দিকে চেয়ে আছে। তার অসহায় অভিমান আবার জেগে উঠল, কোনো কথা বললে না সে।

বিপাশা তার কাছে সরে এসে কোমল স্বরে বললে, "রাগ করেছ বুঝি ?"

এতদিন পরে এই কটা সহজ কথাতেই বরুণের মন আশান্বিত হয়ে উঠল, সে বললে, "রাগ করিনি, কিন্তু কী তোমাদের পাগলামি, এখান থেকে যেতে চাইছ না কেন ? এখানে সারাজন্ম বসে থাকতে হবে নাকি ? এই পোড়ো জায়গায় এতদিন থাকলে সহজ মানুষও পাগল হয়ে ওঠে।"

বিপাশা কোনো কথা বললে না। বরুণ আবার বললে, "ওই ভাঙা ঘাটে রাতের বেলায় কি করতে যাও তুমি বিপাশা—ওখানে কী তোমার ভাল লাগে ?"

বিপাশা অতি ধীরে বললে, "ভারি ভাল লাগে। মনে হয় নিশুতি রাতে মরা নদীতে জল ছল ছল করছে,—নীল যমুনার জল।"

একটু চুপ করে থেকে তেমনি ধীরে সে বললে, "তুমি আমায় ফেরাতে পারবে না,—চেষ্টা কোরোনা মিছে।"

"কি বলছ বিপাশা !"—গভীর বিস্ময়ে বরুণ দেখলে বিপাশার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।—সঙ্গে সঙ্গে সে-রাতের মত ক্ষিপ্রগতিতে ঘরের বাহিরে চলে গেল। সারাদিন বরুণ আর তার দেখা পেলে না।

কদিন হতে বর্ষা নেমেছে,—শীতের অবাঞ্ছিত বর্ষা। ধূসর আকাশের সঙ্গে ধূসর মাঠ ঘাট ঘুলিয়ে যেয়ে চারিদিক মিলিয়ে গেছে। বাদলের বিবর্ণ বিষণ্ণতায় দিন যেন অবসন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। বরুণের শরীর ভাল ছিল না,—সে অলস ভাবে বিছানায় শুয়ে ছিল। বৃষ্টি আরো ঘনিয়ে এল, সময়ের আগে সন্ধ্যা হয়ে গেল। জলের ছাঁটে ঘর ভিজে উঠছে দেখে বরুণ দুয়ার বন্ধ করে দিতে উঠে গেল। বাহিরে সেদিন কেউ নেই, সোমনাথ ঘরে বসে লেখালেখিতে ব্যস্ত, মদনমোহন

বিরলে নিদ্রা দিচ্ছে, ভৃত্যেরা রন্ধনশালাতে আড্ডা জমিয়েছে। একা শুধু বিপাশা বসে আছে মূর্ত্তির কাছে। হাওয়ায় তার কেশ উড়ছে, বৃষ্টিতে তার বেশ ভিজে যাচ্ছে,—সেদিকে খেয়াল নাই—একটা গানকে সে গুঞ্জন করছে। বারিধারার পতনে হাওয়ার ধ্বনিতে গানের কথাগুলি ছিঁড়ে যেয়ে টুকরো টুকরো বরুণ শুনতে পেলে—

"কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারি ঘায়ে
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে—"
"তোমারি অভিসারে
যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে—"

বরুণ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা তীক্ষ্ণ সুগভীর অবসাদে হঠাৎ সারা মন তার ভরে উঠল। বিপাশার গান তার কানে বাজতে লাগল—

"পরাণে বাজে বাঁশী নয়নে বহে ধারা,
দুখের মাধুরীতে করিলে দিশেহারা;
সকলি নিবে কেড়ে
দিবে না তবু ছেড়ে,
মন সরে না যেতে ফেলিলে একি দায়ে—"

বহুসঞ্চিত বেদনা নিবেদনের মত এই গানের বিষণ্ণতা আকাশে বাতাসে ছলছলিয়ে উঠেছে। বরুণের মনে হল রিক্ত জগৎ, রিক্ত জীবন—যা কিছু প্রিয় তা হতে চিরবিরহ,—বর্ণে গন্ধে আনন্দে উদ্ভাসিত পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে আজ এ বর্ষা সন্ধ্যায়,—জেগে আছে শুধু বর্ণহীন এক বিপুল ব্যর্থতা। বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে বিপাশাকে মনে হচ্ছে ঝড়ের মুখে আলোর একটি সকম্পিত শিখার মত, কখন বুঝি নিভে যায়। কতক্ষণ বরুণ দাঁড়িয়েছিল জানে না, যখন এসে শয্যায় এলিয়ে পড়ল—নিবিড় তিমিরে ভরেছে চারিদিক, বাহিরে বায়ুর সকরুণ শব্দ ঘুরে ফিরছে।

* * *

বরুণ বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা শ্রবণ-বিদারণ শব্দে তার তন্দ্রা টুটে গেল। বাহিরে ঝড়ের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার, বারিধারার বিরামবিহীন বর্ষণ, বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশ, রুষ্ট রুদ্রের ডমরুর গুরুগুরুর মত মুহুর্মুহু মেঘের গর্জ্জন,—সকলকে ছাপিয়ে সেই প্রচণ্ড আওয়াজ,—প্রকৃতির তাণ্ডবে পৃথিবী বুঝি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। বরুণ শয্যা হতে উঠে দুয়ার খুলে বেরিয়ে এল ছুটে। সবাই উঠে পড়েছে। ভৃত্যেরা বাতি হাতে কোলাহল করে ছুটাছুটি করছে। সোমনাথ বিস্ফারিত চোখে বজ্রাহতের মত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। —ঝড়ের ধাক্কায় বাঁশের দণ্ড আলগা হয়ে তাঁর সাধের মূর্ত্তি পড়ে যেয়ে শতধা হয়ে ভেঙে গেছে—তার তলায় নিষ্পেষিত হয়ে আছে বিপাশার দেহ। ছড়ান চুলে প্রায় ঢেকে গেছে তার মুখ, তখনো তপ্ত অধরে লেগে আছে ঈষৎ হাসি,—মূর্ত্তির মুখের সে রহস্যগভীর হাসি এসে যেন লেগেছে ওর অধরে।....

শ্রীমতী ইলা দেবী।

কবিতাপাঠ—(৫)

(বর্ণনা)

১। চিত্রবিন্যাস

পূর্ব প্রবন্ধে আমরা দেখেছি অলঙ্কারের সাহায্যে, অর্থাৎ কথাকে একটা সাদৃশ্যমূলক অর্থ বা ভাব সংযোগে ব্যবহার করে, রূপকে কি ভাবে স্পষ্টতা দেওয়া যায়। এবার আমরা কয়েকটি বর্ণনাপদ্ধতির আলোচনা করবো যাতে কথাকে তার সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেই রূপকে ফুটিয়ে তোলা যায়। এই রকম একটি পদ্ধতিকে বলবো চিত্রবিন্যাস, অর্থাৎ বর্ণনার মধ্যে রঙ রেখায় আঁকা ছবির বাস্তবতা আর উজ্জ্বলতা আনা।

(১) চিত্রবিন্যাসের সব চেয়ে সহজ পরিচয় হ'ল স্থূল চোখে দেখা বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করা, যেমন দ্বিপ্রহরে গৃহকোণের এই দৃশ্যটিঃ—

দূর অকাশে ডেকে যেত চিল
সিসুগাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলমিল;
তপ্ত তৃষায় চঞ্চু করি ফাঁক
প্রাচীর পরে ক্ষণে ক্ষণে বসতো এসে কাক;
চড়ুই পাখীর আনাগোনা মুখর কলভাষা,
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা;
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায় গলির ওপার থেকে,
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে?
কখন মাঝে মাঝে
ঘড়িওয়ালা কোন বাড়ীতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।

(পরিশেষ—"বালক")

বাহ্য জগতের একটি দৃশ্য চিত্রশিল্পীর হাতে তাঁর কল্পনার সুষমায়, রঙ রেখার উজ্জ্বল্যে, যে অসাধারণ সৌন্দর্য্যলাভ করে, কাব্যের বর্ণনাতে চিত্রবিন্যাস ও পাঠকচিত্তকে সেই সৌন্দর্য্যেরই মোহিনীশক্তিতে আকর্ষণ করে। যাঁর চোখের দৃষ্টি সূক্ষ্ম, দৃষ্টজগতের খুঁটিনাটি সৌন্দর্য্যের প্রতি যাঁর ঔৎসুক্য, বাস্তব বর্ণনার কবিতা সে পাঠকের পক্ষে এক অফুরন্ত রসের উৎস। এ রসের আকর্ষণ সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরকম:—

আমি ছিলেম একদিন বালক

*　　　*　　　*

আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়
পুকুরের জলে, বটের শিকড় জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূরবাড়ীর রোদ-পোহানো ছাদে।
অশোক বনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম রামচন্দ্রের খবর;
আমার হনুমান আসতো বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে'
সজল নবনীল মেঘে।

(পুনশ্চ—"বালক")

(২) দ্বিতীয় ধরণের চিত্রবিন্যাস হ'ল পরিচিত জগতের লক্ষণগুলিকে উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করে' এমন এক কল্পনার জগত রচনা করা যেটা বর্ণনার গুণে বাস্তব জগতের মতনই স্পষ্ট করে' উপলব্ধি করা যায়। এ উপলব্ধির জন্যে অবশ্য প্রয়োজন হয় খুব স্পর্শশীল অনুভূতি আর জাগ্রত সৌন্দর্য্যদৃষ্টির।

কোন কালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী
হে অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশী?
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা
মণিদীপ দীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?

(চিত্রা-"উর্ব্বশী")

যে প্রাসাদ-কক্ষের বর্ণনা এখানে পেলুম, বাস্তব জগতে তার অস্তিত্ব নেই, অথচ বাস্তবের সম্ভার দিয়েই সে কক্ষ গড়া আর সাজানো। কেবল তার ভিত্তি কবিকল্পনায় সেই গভীর অতল তলে যেখানে অসম্ভবের পূজা সর্বক্ষণ চলেছে। নিজের মধ্যে সেই পূজা যতটা সত্য করে' তুলতে পারি ততটাই সেই মায়ালোকের প্রাসাদও গড়তে পারি। এমন অবস্থায় অন্যের গড়া দেখলেও নিজের গড়া সহজ হয় যেমন "magic casements opening on the foam of perilous seas in faery lands forlorn"। প্রাসাদের পথ জানতে হ'লে জলের মধ্যে স্ফটিকস্তম্ভের ওপর সোনার কৌটার মধ্যে ভোমরার কাছে সংবাদ নেবার কথা জানা থাকা চাই। প্রাসাদে রাজকন্যাকে চিনতে হ'লে খুঁজতে হবে কুঁচবরণ কন্যাকে যার মেঘবরণ চুল।

(৩) উপরোক্ত বর্ণনাগুলি স্থির দৃশ্যের চিত্রণ। গতিমান দৃশ্যের বর্ণনাচিত্রও হয় যেমন :—

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুর দেশে,
উত্তরের মুখে।
(পূরবী—"তপোভঙ্গ")

সন্ন্যাসীর তপস্যা মুহূর্তে মুহূর্তে কিভাবে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর হয়েছে সেটা চোখের সামনে দেখা গেল শুষ্ক পত্রের বায়ুভরে কঠিন নিস্পন্দ প্রাণহীন হিমশীতল পর্বতের দিকে অগ্রসর হওয়াতে।

(৪) শুষ্ক পত্রের সামনে দিয়ে চলে যাওয়াটা হয়ত চোখের স্নায়ুপটের ওপর একটা ঝাপসা পথ আঁকতে আঁকতে চলে, যা থেকে হয়ত ব্যর্থ তপস্যার গতিপথ কতকটা স্থূলভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে; কিন্তু যখন পথটিও সূক্ষ্ম ভাব-লোকের অন্তর্গত হয়ে পড়ে তখন সে পথের চলাকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে কত প্রবল কল্পনার প্রয়োজন হয় তার পরিচয় পাই এইরকম সব বর্ণনা থেকে :—

বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন
অভিসারের পথ
রাগিণী বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
(পুনশ্চ—"শাপমোচন")

বীণার গুঞ্জরণ রচা পথে বিচরণ করে লক্ষ্যস্থলে উত্তীর্ণ হওয়া নিতান্তই ব্যক্তিগত কল্পনা-সাপেক্ষ। পাঠককে সাহায্য করতে পারেন তিনিই।

(৫) এইবার দুটি একটি উদাহরণ দেবো যাতে একটি মাত্র কথার অর্থসঙ্কেতে সম্পূর্ণ একটি দৃশ্য গড়ে' ওঠে।

এমন সময়ে অরুণ-ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
(কল্পনা—"ভ্রষ্টলগ্ন")

"অরুণ-ধূসর" কথাটির সাহায্যে আমরা দেখতে পাই সকাল বেলাকার রৌদ্রের একাকার হরিদ্রাভা, যেন ফুলের পরাগধূলিতে আচ্ছন্ন জগৎ। তেমনি :—

আজি অন্ধতামসী নিশি
মেঘের আড়ালে গগনের তারা সবগুলি গেছে মিশি।
*   *   *
আমি কুন্তল দিব খুলে
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমার নিশীথ নিবিড় চুলে।
(মানসী-"ভাল ক'রে ব'লে যেও")

এখানে "অন্ধতামসী", "নিশীথ নিবিড়", এই শব্দগুলি রাত্রির অন্ধকারকে আরো ঘন, আর কালো করে তোলে। হাত বাড়ালে বুঝি পুঞ্জীভূত আঁধার হাতে ঠেকে।

(৬) ছবির অঙ্কনে যেমন রেখার সঙ্গে থাকে রঙ, কাব্যের বর্ণনাতেও তেমনি একটা বর্ণোজ্জলতা আনা যায়।

তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার,
মধ্যাহ্নে আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বসি
বিচিত্র বর্ণের রেখা।
(চিত্রা—"সুখ")

এ হ'ল দ্বিপ্রহরের আলোয় উজ্জল নীল রঙ। চাপা আলোয় ধূসর ঘেঁসা ঘোর রঙ এই :—

সুরু হ'ল হোলির মাতামাতি
উড়িছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে,
নব বরণ ধরলো বকুল ফুলে,
রক্ত রেণু ঝরল তরুমূলে,
ভয়ে পাখী কুজন গেল ভুলে

রাজপুতানীর উচ্চ উপহাসে
কোথাহতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
লাগলো যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে।

(কথা-"হোরি খেলা")

(৭) চিত্রশিল্পে যেমন মূল ছবিটিকে ঘিরে থাকে অঙ্কন আর বর্ণসামঞ্জস্যের একটা পরিমণ্ডল, কাব্যেও তেমনি মূল বিষয়টিকে ঘিরে ধ্বনি আর অর্থসঙ্কেতের একটা বেষ্টনী গড়ে তোলা যায়।

কবিবর কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন স্নিগ্ধ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

(মানসী—"মেঘদূত")

কবিতার মূল ভাবটিকে ঘিরে মেঘমন্থর ভরা বর্ষার দিনের একটা পুঞ্জিত আবেগ ঘনিয়ে উঠতে থাকে। "স্নিগ্ধ" কথাটির উচ্চারণে একটা ভারী পতনের শব্দ, প্রথম কথাটির লঘুতর কিন্তু উচ্চতর ধ্বনি "মেঘমন্দ্র" আর "অন্ধকার" কথা দুটির সঙ্গে "সঘন" আর "স্নিগ্ধ" কথা দুটির ধ্বনিসামঞ্জস্য "সঙ্গীত"-এর ঝঙ্কার আর মাঝে মাঝে আকাশের বুকে মেঘরাশির আলোড়নের মতন "বরষে" "আষাঢ়ের" "শ্লোক" "শোক" প্রভৃতি কথায় মীড়—এই সকল শব্দ আর ধ্বনির সমন্বয়ে একটা ঘন মন্থর প্রভাব ক্রমশঃ অনুভূতিকে ছেয়ে ফেলে যার মধ্যে কবিতার রস গাঢ় হয়ে ওঠে।

চিত্রবিন্যাসের প্রসঙ্গ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে কাব্যে চিত্ররচনা হ'ল প্রকৃতির ওপর কবির রস পিপাসু অন্তর্দৃষ্টির আলোপাত, পাশ্চাত্য কবির কথায় এমন আলো যা জলে স্থলে কখন পড়ে নি। ফলে প্রাকৃত এক অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ করে। তার প্রতি রেখায় স্পন্দিত হয় কবিচিত্তের আবেগের রেশ। সে রূপে বিকাশলাভ করে কবির রস-সিঞ্চিত কল্পনার সুন্দরতম ফুল। সে রূপের আভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পাঠকচিত্তের গূঢ়তম রস-কুহরগুলি।

শ্রীনবেন্দু বসু

আকাশ ও মৃত্তিকা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তোমার নয়নে ঘুম নাই সখী পদ্মাবতী,
ঘুম নাই সখী, আমারও নয়নে কুসুম-মাসে ;
ফুলন্ত বনে মধু-গুঞ্জনে সন্ধ্যারতি
থামেনি এখনও গভীর নিশার দীর্ঘশ্বাসে।

চোখের কাজল মুছিল তোমার অশ্রুজলে,
প্রসাধিত বেণী ভূতলে লুটায় অবহেলায়,
আপন হাতের শুভ আল্পনা দেহলীতলে
আনাগোনা করে' পায়ে পায়ে গেল মুছে ধুলায় ;

ধুলায় লুটায় মুক্তার মালা কানের দুল,
লুটায় বেসর নাগকেশরের ছিন্ন দল,
কুঞ্জদুয়ারে ফিরে ফিরে চাওয়া,—মনের ভুল
নিবু নিবু দীপ, শঙ্কায় কাঁপে বক্ষতল।

বাতায়ন তলে অমন করিয়া থেকোনা বসে
শিথিল কবরী বাঁধ সখী,—সাজ বেশভূষায়
পশ্চিম পারে তারা বুঝি ওই পড়িল খসে',
আকাশের তরে মৃত্তিকা শুধু মরে তৃষায়।

দেবতার হাসি

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

সারা রাত্রির হিমে ঠাকুর ঘরের খোলা দালানটায় বেশ একপশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঘমাসের শীত। শেষ রাত্রির দিকে প্রকোপটা আরও বেশী। এমন দুরন্ত শীতেও নীলকান্তের ছেলের ভয়-ডর বলিয়া কিছু নাই;—কোমরে কাপড় জড়াইয়া সে সমান আগ্রহে কাঁসর পিটিতেছে।

কিছুক্ষণ আগে নীলকান্ত ঘরের ভিতর ঘিয়ের প্রদীপ জালিয়া দিয়াছে। দীপের আলো দেখিয়া কয়েকটা চাম্‌চিকা দালানের কুলুঙ্গী হইতে বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। নীলকান্ত অস্ফুটকণ্ঠে কি দুই-একটি কথা উচ্চারণ করিল। নীলকান্তের ছেলে বাহির হইতে তাহা শুনিতে পাইলনা।

গৃহের মধ্যস্থলে কাষ্ঠনির্মিত সুদৃশ্য একখানি সিংহাসন। গেরুয়া রঙের কাপড়ে ইহার সম্মুখের দিক আবৃত। কাপড় সরাইয়া দিতেই গোপালজী ডান হাত বাড়াইয়া নীলকান্তের দিকে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। নীলকান্ত বলিল, রাতেও তোর ঘুম নেই, নিবি কি তুই বল্‌তরে।

নীলকান্ত ঘিয়ের দীপটি আর একটু উস্কাইয়া দিল। গোপালজীর মূর্ত্তি স্পষ্টরূপে চ'খে পড়িতেছে। নীলকান্ত আবার বলিতে লাগিল,—দিতে ত আমার আপত্তি নেই বাপু, কিন্তু তুই না দিলে,···দেখচিস ত সুখের আমার সীমে নেই।

একখানা রূপার রেকাবিতে ভোগের আয়োজন। আয়োজন যৎকিঞ্চিৎ। রেকাবিটা ডানহাতে নীলকান্ত সিংহাসনের সামনে স্থাপন করিল। রেকাবী হইতে একটি সন্দেশ তুলিয়া নীলকান্ত গোপালজীর হাতে দিল। তারপর একদৃষ্টে বিগ্রহের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আপন মনেই গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া গাহিয়া উঠিল

"যশোদা নাচাত তোরে
ব'লে নীলমনি—

নীলকান্তের ছেলে কাঁসর বাজানো বন্ধ করিয়া বাপের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীলকান্তের গুঞ্জন থামিতেই বলিল,—আমি একটা নেব, বাবা।

পুত্রের কথায় নীলকান্ত এই জগতে ফিরিয়া আসিল। সে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, এখানে এলি যে, ভাগ বেল্লিক, ভাগ—

কেন, আমি ত কাচা কাপড় পরে এসেছি···

এলেই হ'ল আর কি, বলি ও তোকে ডেকেচে যে এসেচিস্?

নীলকান্তের ছেলে এবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল, পাথরের ঠাকুর আবার ডাকে নাকি কাউকে? তোমাকে ডাকে? এতক্ষণ ধরে বাজালাম, একটা সন্দেশ তুমিত দিলেনা?

নীলকান্ত আরক্ত চক্ষে বলিল, না না তোকে দেবনা। দেখচিস্ ঠাকুরের ভোগ হয়নি এখনও। —সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিল, রোজ রোজ আমার সঙ্গে তোকে কে আসতে বলেরে? কাল থেকে ফের যদি আস্‌বি, তোব গাল আমি চড়িয়ে ভাঙব।

নীলকান্তর ছেলে কথা না বলিয়া দালানের বাহিরে ফিরিয়া আসিল। হাতের কাঁসরে ঘা দিবার আগেই বলিয়া উঠিল, না এলাম ত কি হ'ল, তুমি একাই কাঁসর বাজিও, আর ভোগ দিও ঠাকুরের।

পঞ্চ-প্রদীপ, শাঁখ, ও ধূপের ধোঁয়ায় ঠাকুরের মঙ্গল-আরতি শেষ হইয়া গেল। ঘৃতের দীপটি একটু আগে নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভোরের অস্ফুট আলোক-আভা আসিয়া ঘরের অন্ধকার ফিকা করিয়া তুলিয়াছে। নীলকান্ত চ'খ ফিরাইয়া দেখিল, বটুর বাম হস্তে পিত্তলের কাঁসর তখনও ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া বাজিতেছে।—খোলা গা, কোঁচার টেরটি অবধি গায়ে দেয় নাই।

নীলকান্ত উঠিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, হ'য়েছেরে আর না। কিন্তু বটুর থামার লক্ষণ দেখা গেল না!

রাম হাতখানা যথাসম্ভব উর্দ্ধে তুলিয়া সে জোরে জোরে পিটিতে লাগিল, ঢ্যান্না-ঢ্যান্না-ঢ্যান্-ঢ্যান্-ঢ্যান্…

নীলকান্ত হাসিতে হাসিতে বটুকে কোলে তুলিয়া লইল। শাল পাতার ঠোঙায় যে একটু ভাঙা সন্দেশ পড়িয়াছিল, সেটুকু তা'র হাতে দিয়া বলিল, খেয়ে নে দিকি, ঠাকুরের ভোগের সন্দেশ এখনই ত আর তোকে দিতে নেই।

কে বলেচে দিতে নেই? ঠাকুর তোমার খায় না কি যে দিতে নেই?

চুপ চুপ ঠাকুর শুন্‌তে পাবে বাবা, শুন্‌লে আর কোন দিন ভোগ নেবেনা। বলিয়া পূজার একটি ফুল নীলকান্ত ছেলের কপালে ছোঁয়াইয়া দিল। তারপর বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, ও ছেলেমানুষ, ওর কথায় তুমি কাণ দিও না ঠাকুর। বড় হ'লে ও তোমাকে পূজো করবে দেখো।

সন্দেশের টুকরাটুকু হাতে করিয়া বটু বাহিরে যাইতেছিল, হঠাৎ চাতালের দিকে চ'খ পড়িতেই সে আঁতকিয়া উঠিল।

কিরে, অমল করলি যে,

দেখে যাও এসে।

চাতালের একপাশে একটি অজগর সাপ কুণ্ডলি পাকাইয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ সর্পরাজের সর্বাঙ্গ ফাটা ফাটা হইয়া গিয়াছে। নীলকান্ত চ'খদুটি আয়ত করিয়া বলিল, ওরে, ও যে সোণা বুড়ো, ও কিছু বলেনা আমাদের;—তারপর একটুখানি কাছে আসিয়া সোহাগ করিয়া বলিতে লাগিল, এতদিন কোথায় ছিলিরে বুড়ো? তোর রূপো কোথায়? বুড়িকে অনেকদিন দেখিনি।

বটু বলিল, আমি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁসর বাজাচ্ছিলাম, ভাগ্যে আমাকে ছোবলায়নি।

কেন ওর কি বুদ্ধি নেই যে ছোবলাবে। সারা রাত শীত ভোগ করেছে; দেখছিসনা, থর থর করে কাঁপছে। ঠাকুরের ঘরে থাকতে বুড়ো ভালবাসে কিনা,…ও কিরে, চল্‌লি যে. ও বুড়ো, ঠাকুরের ভোগ নিয়ে যা বাবা।

সোণা কথা শুনিলনা। চাতালের উত্তর দিকে যে ইটের স্তূপটি বহু কাল ধরিয়া পড়িয়া আছে, ধীরে ধীরে সে তাহারই ভিতর অদৃশ্য হইল।

সকালের আলোয় চারিদিক স্বর্ণা হইয়াছে। নাটমন্দিরের চারিদিকে বড় বড় বাড়ীগুলি পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। একটিরও শ্রী নাই, ফাটা খিলানের গা ফুঁড়িয়া অশ্বত্থের গাছ শিকড় নামাইয়াছে। নীলকান্ত আস্তে আস্তে চাতালের উপর পায়চারি করিতে লাগিল।

অনেক কালের কথা মনে হইতেছে। সকাল বেলায় রোদ্দুর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পূজারি এই চাতালের উপর পায়চারি করিত। অনন্তর স্কন্ধবিলম্বিত ধপ্‌ধপে পৈতা-গাছটা নীলকান্তের আজও মনে পড়ে। তাঁর সুঁদরি কাঠের খড়মের খট্‌খট্ শব্দটা দেউড়ি হইতে শোনা যাইত।

ঠাকুর ঘরের পাশ দিয়া নীলকান্ত বালাখানার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সিংহ দরজাটা খাঁ খাঁ করিতেছে। ভোজ-পুরি দারোয়ান দুইটি লাঠিঘাড়ে অষ্টপ্রহর ওখানে মোতায়েন থাকিত। নীলকান্তকে দেখিলে তাদের কি যে কুর্ণিশের ঘটা। স্নানের চৌবাচ্চাটা আজও তেমনই আছে। কেবল আকন্দ আর ভেরাণ্ডা গাছে আশপাশের খানিকটা জায়গা ভরিয়া গিয়াছে। পিতা কৈলাশবাবু একদিন চৌবাচ্চার ধারে বেতের মোড়ায় সোজা হইয়া বসিতেন। পুরা একঘণ্টা ধরিয়া বাড়ীর ভিখু চাকর তাঁর মাথায় ও গায়ে তেল মাখাইয়া দিত। চৌবাচ্চার স্নিগ্ধ জলে স্নান করিয়া কোঁচান ধুতি পরিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি অন্দর মহলে প্রবেশ করিতেন।

এসব কয়দিনেরই বা কথা; কিন্তু নীলকান্তর কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

বহুদিনের ছোট একটি পরিত্যক্ত গলিপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে নীলকান্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। এত ভোরে কে এখানে দেউড়ি দিয়া ঢুকিয়াছে? লোকটা কে—ভাল করিয়া দেখার জন্য আর একটু অগ্রসর হইতেই নীলকান্তের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না!

তুই কখন এলি রাজু, তোকে যে আর চেনবার উপায় নেই রে!—কথাটা বলিয়া নীলকান্ত সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বার দুই সে হাত দিয়া চ'খ দুটি মুছিল।

নীলকান্তের কথায় সত্যই রাজীবের কোন উৎসাহ দেখা গেল না। গায়ের মূল্যবান র‍্যাগখানা সে একবার ভাল করিয়া জড়াইয়া হাতকয়েক জায়গার উপর [illegible]

করিল, তারপর নীলকান্তের দিকে গম্ভীরভাবে তাকাইয়া বলিল, দেশে থাক, অথচ ঘরবাড়ীগুলি প্রেতপুরী করে তুলেচ। আগে জানলে কে আসত?

নীলকান্ত লজ্জায় মরিয়া গেল। সত্যই প্রেতপুরীই ত।

রাজীব বলিয়া গেল, ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলাম মাস-খানেকের জন্যে। সময় ত একটা পাইনে, কিন্তু ভিটের মায়া বুঝলে,···আজই গোটা দুই মিস্ত্রী লাগিয়ে দাও দেখি। ভেতরটা ভালই আছে। ফুটো-ফাটাগুলো একটু সারিয়ে নিলে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

নীলকান্ত একটুখানি কি ভাবিয়া বলিল, তা একটা মাস আমার ওখানে থাকলে তেমন অসুবিধে হতনা। পশ্চিম দেউড়ির ঘরগুলো সবই ভাল আছে।

থাক, এদিকটা আমার ভাল লাগে। পথের ধারে, ডাকলে দুজনকে পাওয়া যাবে। শেষরাত্রে মঙ্গল-আরতি তুমি করছিলে?

নীলকান্ত উত্তর দিল, হ্যাঁ তা ছাড়া আর করবে কে?

কেন একজন পুজোরি রেখে দিলেই চুকে যায়। হাজার হ'ক জমিদারের ছেলেত, মান সম্ভ্রমটাও লোকে দেখে।

নীলকান্তের কি একটা কথা মনে হইল। চোখদুটি তার ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

দুইটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া এই সময়ে রাজীবের কাছে আসিতেছিল। বেশ সুশ্রী গঠন। নীলকান্ত শুধাইল, ছেলে মেয়ে এই দুটি, না আর আছে।

না আর নেই, ভালোয় ভালোয় এখন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। খুকুর শরীরটা বড় ভাল নেই। দিন কয়েক থেকে সর্দ্দিকাশি হয়েছে। কিরে, পায়ে মোজা দিস্‌নি যে?

ছেলেটি নীলকান্তের দিকে তাকাইয়া বলিল, ও কে বাবা?

নীলকান্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, আমাকে চিনতে পারলে না, ও খোকা। আমার কোলে এস, তারপরে বলছি। নীল-কান্ত তাহার দিকে হাত দুখানা বাড়াইয়া দিতেই ছেলেটি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

দীর্ঘ বার বছর পরে ছোট ভাইয়ের সহিত নীলকান্তের এই সাক্ষাৎ। বার বছর আগে রাজীব সোনার সংসার মাটি করিয়া গিয়াছে। বার বছর আগের একটি দিনের কথা নীলকান্তের আজ মনে পড়িয়া গেল।

বিকাল বেলায় কাছারি ঘরে বসিয়া বসিয়া নীলকান্ত জমিদারির কাগজপত্র দেখিতেছে; ঠিক এমনি সময়ে রাজীব আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইল।

নীলকান্ত মুখ তুলিয়া শুধাইল, বড় যে আজ তরস্থ দেখছি তোমাকে, কোথায় যাবে?

রাজীব মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল, কথা কহিল না।

নীলকান্তের চ'খদুটি জ্বলিয়া উঠিল। সে রুক্ষকণ্ঠে বলিল, বুঝেচি, কিন্তু একটা পয়সা তুমি পাবে না। মহাল তুমি উড়িয়ে দিয়েচ; দেনায় মাথা আমার বিক্রি হয়েছে, স্ফূর্ত্তি করার সখ থাকে, টাকা নিজে ধার করগে।

রাজীব পকেটের ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া নীলকান্তের হাতে দিল। নীলকান্ত সে চিঠি পড়িয়া রাজীবের দিকে তাকাতেই রাজীব সোচ্ছ্বাসে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কেমন বাজী মাৎ কি না। আবার কোনদিন এ বাড়ীতে পা দেব ভেবেছ,···জেনে রেখো, এ রাজিব চাটুয্যের বাক্যি ভুল হবার নয়,···বলিয়া নীলকান্তের সামনে দিয়া সে দ্রুতপায়ে ফটক পার হইয়া গেল।

নীলকান্ত পিছনে পিছনে আসিয়া দেখিল, বাহিরে চাটুয্যে বাড়ীর বিচিত্র ছই-ঢাকা গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। রাজীব গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল, নীলকান্ত ছইয়ের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, নেমে আয় রাজু, টাকা এখনই দিচ্ছি।

রাজীব হাসিতে হাসিতে বলিল, টাকা আমি কি করব দাদা, তোমার মহাল আমি উদ্ধার করে দেব।

নীলকান্ত করুণ স্বরে বলিল, ওরে না-রে, মহাল আমি চাইনে। ও সম্পত্তি তোরই ত হ'য়ে গেল, এখানে বসেই পাবি।

তা হয়না দাদা, এখনও শত্তুর আছে, আগে ব্যবস্থা করি তারপর।

ঠুন্ ঠুন্ শব্দে বলিষ্ঠ দুইটি বলদের গলায় পিতলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ছোটবাবুর নির্দ্দেশে চাটুয্যে বাড়ীর বন্ধু-গাড়োয়ান ইষ্টিশানের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল।

নীলকান্ত পিছন হইতে জোরে জোরে বলিয়া উঠিল, ওরে তা'বলে আমাকে ফেলে তুই বেশীদিন থাকিস্‌নে রাজু। কাজকর্ম্ম একলা আমি দেখতে শুনতে পার্‌বনা। শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসিস্‌, ওরে মনে থাকে যেন।

চিঠিতে ছিল শ্যালকের মৃত্যু। শ্বশুরের একমাত্র সন্তান। ঘরে বাতি দেবার কেহ নাই। বিরাট সম্পত্তির মালিক এখন রাজীবের স্ত্রী অর্থাৎ রাজীব। চিঠি পাইয়া রাজীবের বুকখানা দশহাত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। নীলকান্তের শাসন পাশ ছিন্ন করিয়া সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

ইহার পর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর নীলকান্তের মাথার উপর দিয়া ঝড়ের মত চলিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম সে রাজুর স্ত্রীকে আনার চেষ্টা করিয়াছিল। বধুমাতা ঘরে আসিলে রাজীব কি আর নাই ফিরিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। বধুমাতা আসিল না, নীলকান্তের সমস্ত আশা ব্যর্থ হইয়া গেল।

শুধু কি তাই? এই বার বৎসরে নীলকান্তের জীবন ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। জমিদারি নীলামে উঠিয়াছে। নায়েব গোমস্তরা সুযোগ বুঝিয়া ষ্টেটের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। বাগ-বাগিচাগুলি না দেখার জন্য জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ঘর বাড়ীই বা মেরামত করিবে কে? যে প্রতাপ-সম্পন্ন চাটুয্যে বাড়ীর এখানে সেখানে দিন রাত্রি নানা কণ্ঠের কলরব উঠিত তাহারই একটি কোণে নীলকান্ত মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কার কাছে সে আর মুখ দেখাইবে? কে তার অন্তরের ব্যথা উপলব্ধি করিবে? সে গোপালজীর চরণতল আশ্রয় করিল, চখের জলে বুক ভাসাইয়া বলিল, আমার সকল দুঃখ দূর ক'রে দে ঠাকুর, সংসারে আমার কামনা নেই, শুধু তোর চরণতলে ঠাঁই দে।

তারপর ধীরে ধীরে একদিন অশান্তির আগুন নিভিয়া গিয়াছে, গোপালজী তাঁকে চরণ তলে স্থান দিয়াছেন।

কাছারি ঘরের চাবির গোছাটা হাতে লইয়া রাজীব সে দিন নীলকান্তকে বলিল, কোনই দরকার ছিলনা দাদা, কিন্তু দিনরাত্রি ঘরের কোণে বসে থেকে সময় কাটছেনা, একটু বসি। তা' ছাড়া লোকজনের ত কামাই নেই। দেখে আর আশ মিট্‌চেনা ওদের।

নীলকান্ত রাজীবের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল বার বছর ত আর দেখেনি রাজু। দেখবেনা দুদিন? হ্যাঁ, এখনই খুলে দাও বেশ ক'রে। বার বছর পরে আঁধার ঘরে আজ মাণিক জ্বলুক রাজু, সবাই আশ মিটিয়ে দেখে নিক্‌।

রাজীব হাসিতে হাসিতে বলিল, বার বছর তুমি ঘর খোলনি?

নীলকান্ত একটু উদাসভাবে উত্তর দিল, হয়ত খুলেচি, কিন্তু ঘরে আঁধার ছাড়া আলো দেখিনি ভাই।

রাজীব প্রসন্ন দৃষ্টিতে নীলকান্তের দিকে তাকাইল।

কাছারি ঘরে বহু দিন পরে ফরাশ পড়িল। সতরঞ্চের উপর ধপধপে চাদর, একপাশে দুই তিনটা বড় বড় তাকিয়া। কড়িকাঠে বেলোয়াড়ি কাঁচের ঝাঁড়টা আজও টাঙানো আছে। কৈলাস বাবুর আমলে রাত্রে ওটা জ্বালানো হইত। ঘরের দুই দিকে বড় বড় দুইটি কাঠের আলমারী। উহার ভিতর জমিদারির কাগজপত্র চেক চিঠি উই ও আরশুলাকে আশ্রয় দিয়া পড়িয়া আছে।

নীলকান্ত ঘরে ঢুকিয়া খুসী হইল। রাজু না আসিলে কাছারি ঘর কে আজ এমন করিত?

নীলকান্ত বলিল সবই ত আছে রাজু।

আছে, নেই কেবল নীলকান্ত।

নীলকান্ত প্রথমে বিস্মিত হইল, তারপর সহজ কণ্ঠে উত্তর দিল, নেই কিসে বল্‌চ, নীলকান্ত বেশ আছে রাজু, তার কোন দুঃখ নেই।

তা' বটে থাকবে কেন? গোপালজী আছেন যে।

নীলকান্ত মুখ তুলিয়া রাজীবের দিকে তাকাইল। রাজীব তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। কিন্তু নীলকান্তের একটু দুঃখ হইল না। কাছারি ঘরের মুক্ত জানালা দিয়া বাহিরের আকাশ চখে পড়িতেছে,—মেঘলেশহীন শীতের নির্ম্মল আকাশ। ছেলেবেলায় নীলকান্ত একদিন এই ঘরে দাঁড়াইয়া আকাশ দেখিত। আজ নীলকান্তের বড় আনন্দ হইতেছে। জানালার ধারে বহুদিনের কামিনী গাছটি দাঁড়াইয়া আছে। গাছে ফুল নাই, কিন্তু স্নিগ্ধ সবুজ পাতাগুলি সকালের রৌদ্র-কিরণে অপরূপ শ্রীসম্পন্ন দেখাইতেছে।

নীলকান্ত জানালার দিকে অগ্রসর হইল। নীচে কতক-

গুলি আগাছা জন্মিয়া স্থানটিকে ঈষৎ অন্ধকার করিয়াছে। এখানে অনেকদিন সে আসে নাই। আর একবার তাকাইতেই গোপালজীর নাটমন্দিরটা নীলকান্তের চখে পড়িল।

নীলকান্ত সেটার দিকে বার কয়েক তাকাইয়া দেখিয়া রাজীবের কাছে আসিয়া বলিল, একটা কথা ক'দিন থেকে তোমাকে বলব ভেবেচি রাজু।

রাজীব মুখ না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা?

নীলকান্ত বলিয়া গেল, গোপালজীর ঘরখানা আর কি, তিরিশ বছরের মধ্যে ওটার মেরামত হয়নি। চুন বালি খসে গিয়েচে, তাতেও দুঃখ ছিলনা। গেলবারের ভূঁইকম্পে দু চুটো থিলেন একেবারে হাঁ হ'য়ে গিয়েচে। রাতে শুয়ে ঘুম হয়না। ভাবি কখন বুঝি ভেঙে পড়ল।

রাজীব একটু হাসিয়া বলিল আর কিছু নয়ত?

না আবার কি।

তোমার নিজের ঘর মেরামত করেচ কবে?

আমার ঘর ঠিক আছে রাজু।

রাজীব বাহিরে যাইবার জন্য ফরাশ হইতে উঠিয়া পড়িল। যাবার আগে নীলকান্তের দিকে তাকাইয়া বলিল, আচ্ছা দেব তার আর কি। আজই ত আর যাচ্ছিনে।

সেদিন সকাল বেলায় ঘরে ফিরিতে ফিরিতে জীর্ণ বাড়ীটা নীলকান্তের দৃষ্টিতে অপরূপ হইয়া উঠিল। ঘর দোর প্রাঙ্গণ দাসী চাকর ও লোকজনে গম্ গম্ করিতেছে। কাছারীঘরে নায়েব গোমস্তা, সিংদরজায় ভোজপুরি দারোয়ান নীলকান্তের মনশ্চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল।

উৎসাহের আবেগে গোপালজীর ঘরের দোরটা সে তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিল। অন্ধকার ঘর। দিনের আলো ঘরের ভিতর ভাল করিয়া প্রবেশ করেনা। একটু ঠাহর করিয়া তাকাইয়া নীলকান্ত গোপালজীকে দেখিতে পাইল। কাছে আসিয়া আঙুল ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, আর দেরি নেই, তোর ঘর এবার নূতন করে দিচ্ছি; রাজু ইচ্ছে করলে তোর সোণার ঘর বানিয়ে দিতে পারে, তা জানিস্। আস্তে আস্তে সব হবে দুদিন সবুর কর্ দেখি।

ঊর্দ্ধে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া বাহির হইতে আলো আসিতেছিল। ঈষন্মুক্ত গবাক্ষ। নীলকান্ত চোখ ফিরাইয়া দেখিল সেই গবাক্ষের একধারে ছোট একটি অশ্বত্থ চারা হাওয়ায় একটু একটু করিয়া দুলিতেছে। এ গাছটি কবে যে বীজ হইতে অঙ্কুরে পরিণত হইয়া ক্রমে শাখা প্রশাখা ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, নীলকান্ত তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া উচ্চারণ করিল, বাড়্ না তুই যত পারিস, কদিন বাড়বি আর। রাজুই তোকে সাবাড় করবে দেখিস।

তারপর দরজা বন্ধ করিয়া গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা গান করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

প্রসন্নমুখী উঠানের উপর দাঁড়াইয়াছিল। নীলকান্তকে ফিরিতে দেখিয়া আস্তে আস্তে তার কাছে আসিয়া শুধাইল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ, বাড়ী ঘর বলে একটুও কি চিন্তা নেই? গোপালজীর ঘর খুলে কি দেখছিলে? ঘরে কিছু ঢুকেচে নাকি?

নীলকান্ত ঈষৎ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, কি ঢুক্বে? ঘর বুঝি ভাঙা তাই বল্চ। দু দিন পরে দেখো, ঘরের চেহারা কেমন হয়।

কি হবে, নতুন হবে নাকি? রাজু করে দেবে?

দেবেনা? তোমার বুঝি না দিলেই ভাল হয়।

প্রসন্নমুখী ইহার উত্তর দিলনা। কি একটা কাজের ছলে সে একবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তারপর ঝাঁ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন আমাদের বাসের ঘরখানা সারিয়ে নাও না গে, দেখচত কি হয়েচে।

নীলকান্ত ঘরটার সর্ব্বাঙ্গে নিমেষের জন্য চোখ বুলাইয়া লইল। তারপর সহানুভূতিমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, আহা দু দিন বেড়াতে এসেচে রাজু, কোথায় সে একটু জিরোবে, তা না আমরাই শুধু শুধু ব্যস্ত করচি, যদি ও না আসত?

প্রসন্নমুখী বলিল, না আস্ত তাহলে তোমাকে বল্তাম না, এসেচে ব'লেই তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্চি। চলে গেলেত আর হবেনা।

আচ্ছা, গোপালজীর ঘরটা আগে সারা হ'ক।

কত দিন রাজু আছে।

চোখ দুটি নীলকান্তের শুষ্ক হইয়া আসিল, উত্তর দিল, আর একটা মাস, তারপরেই...

তা একটা মান কম নয় বাপু, এর ভেতর সবই হবে। দিন কয়েক পরে কথাটা রাজুকে বলো।

নীলকান্ত অন্যমনস্কভাবে একবার ঘাড় নাড়িল,—কিন্তু মনে মনে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাজুর মাথা খারাপ করিতে তার ইচ্ছা নাই। কটা দিনই বা সে আছে।

সন্ধ্যা হইতে দেরি নাই। নীলকান্ত ঠাকুরঘরে বসিয়া বসিয়া আরতির আয়োজন করিতেছিল। নীলকান্তের সপ্ত বর্ষীয়া কন্যা বিমলি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, এই দেখ বাবা তাকাও।

নীলকান্ত মুখ তুলিয়া দেখিল. বিমলি একটি নীলরঙের ফ্রক্ গায়ে দিয়া তা'র সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েকে এত খুসী নীলকান্ত কোন দিন দেখে নাই। এমন রঙীন জামা কখনও সে কিনিয়া দেয় নাই। নীলকান্ত শুধাইল, কে দিয়েচেরে ?

কে দিয়েচে বল দেখি বাবা ?

নীলকান্ত হাসিয়া কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কোথা হইতে বটু আসিয়া তার চমক লাগাইয়া দিল। বটুর পরণে কোট, প্যান্ট সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কাকা বাবু দিয়েচে বাবা, আর বলেচে টুপিও দেবে শীগ্‌গীর।

বিমলি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলনা। নীলকান্তের দিকে তাকাইয়া বলিল, আমাকেও দেবে বাবা।

দেবে তোকে এইটে—বলিয়া ডান হাতের বুড়া আঙুলটা দেখাইয়া বটু ঠাকুরঘরের দালানে ঠিক সাহেবের ভঙ্গীতে বার বার পায়চারি করিতে লাগিল।

বিমলির চোখ মুখ রাগে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বটুর দিকে ধাবিত হওয়ার উপক্রম করিতেছিল, নীলকান্ত তাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, না মা তোমাকেও দেবে বই কি, রাজু নিজে মুখে আমাকে বলেচে। সাহেবের টুপি হুঁ-হুঁ !

বিমলি আশ্বস্ত হইল। চাতালের উপর দিয়া প্রসন্নমুখী ঠাকুর ঘরের দিকে আসিতেছিল। নীলকান্ত হাসিয়া বলিল, তুমি কি নিয়ে এলে গো।

প্রসন্নমুখী সে কথার কোন উত্তর দিল না। নীলকান্তের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, বটুর কাজ ত গুছিয়ে এলাম, এখন থেকে ও কল্‌কাতায় পড়বে।—বলিয়া স্নিগ্ধ হাসিয়া নীলকান্তের দিকে তাকাইল।

রাজু বললে বুঝি ?

প্রসন্নমুখী উত্তর দিল, হাঁ, একেবারে তিন সত্যি করেচে। পড়ার খরচ ত কম নয়। তুমি আর কদিন যোগাবে ? ছোট থেকে কলকাতায় পড়লে বটু খুব ভাল হবে। তুমিও নিশ্চিন্ত।

নীলকান্তের মুখ দিয়া খাণিকক্ষণ কথাই ফুটিল না : আনন্দের পরিবর্ত্তে নীলকান্তের দুটী চোখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, কে তোমাকে যেতে বলেছিল রাজুর কাছে, মাথাটা ওর না খেয়ে তোমরা ছাড়বে না ? রাতদিন বায়না আর বায়না। নাঃ, তোমাদের জ্বালায় ও বাঁচবে না। না আসাই ওর একশো বার ভাল ছিল।

প্রসন্নমুখী ঝাঁ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন, বল্‌বনা কেন ? মুখ বুজে থাকলেই বুঝি তোমাদের পেট ভরবে, দুদিন পরে চলে গেলে তখন এইটে পাবে ; ভাই বলেই যেন তোমার সব অভাব জেনেচে আর কি। দুঃখের কথা বলতে হয় না ? শোনাতে হয়না মানুষকে ?

নীলকান্ত রুক্ষকণ্ঠে বলিল, না না না, কোন কথা তুমি শোনাতে পাবেনা। রাজু কোন কথা শুনবেনা।

কাণ্ড দেখিয়া প্রসন্নমুখী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

চাতালে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। নীলকান্ত রাগে দুঃখে ফুলিতে লাগিল। একটু পরে মনের অবস্থাটা তার সহজ হইয়া আসিল। তার মনে হইল, বটু কলিকাতায় পড়িবে, মন্দ কি ? এখনই সময়মত ছেলেটির মাহিনা দিতে কষ্ট হয়। রাজু যদি তার পড়াশুনার ভার লয়, কোনই ক্ষতি নাই, বরং সে একদিন মানুষ হইয়া উঠিবে, কিন্তু নীলকান্তের মনটা আবার খারাপ হইয়া গেল। বটু কলিকাতায় গেলে গোপালজির কাঁসর বাজাইবে কে ? ভোরে উঠিয়া কে রোজ রোজ ফুল তুলিয়া আনিবে ? এত কথা প্রসন্ন কেন পাড়িতে গেল ? নীলকান্তের বড় দুঃখ হইল। সে ধীরে ধীরে এইবার ঘি-এর দীপটি জ্বালিয়া দিল। তারপর বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, ওরে আরতি বাজা, ও বটু।

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। রাজীব দেশেই আছে। নীলকান্ত একটু অধীর হইয়া উঠিল। গোপালজীর ভাঙা ঘরে আজও হাত পড়ে নাই। নীলকান্ত কথাটা আর একদিন রাজীবকে মনে করাইয়া দিল।

রাজীব বলিল, শরীরটা ভাল হচ্ছে দেখে আর একমাস থেকে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমাদের জ্বালায় আর হ'ল না। আমার উপর তোমার অবিশ্বাস এসেচে, না দাদা? বেশ কালই আরম্ভ করচি।

নীলকান্ত বিস্মিত হইল। সে একদৃষ্টে রাজীবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। সে যা অনুমান করিয়াছিল তাই ঠিক। সবাই আসিয়া তার মাথাটাকে খারাপ করিয়া দিয়াছে।

নীলকান্ত দুঃখিত ভাবে বলিল, আমার কথায় রাগ করিস্‌নে রাজু! দুদিন বেড়াতে এসেচিস্‌, মাথাটা কোথায় ঠাণ্ডা হবে, তা' না আমি শুধু তোকে হয়রাণ করচি। আর যদি তোকে কোন দিন কিছু বলি তবে অন্যকথা। একটু তাড়াতাড়ি করছিলাম কেন জানিস্‌, দোলপূর্ণিমার মাত্র একটা মাস দেরি, মেরামতটা যদি আগে আগেই হ'য়ে যেত তা' হলে মন্দ হ'তনা। ভাঙা ঘ'র ঠাকুরের দোল ত ফি বারই হয় কিনা।

রাজীব একটু গম্ভীর ভাবে কহিল, দোলের আগে আমি যাচ্ছিনে। তার আগে হ'য়েও যাব জেনো।

নীলকান্ত হাসিমুখে ঘরে ফিরিল।

দিনকয়েক পরে নীলকান্ত সেদিন কাছারি ঘরের প্রাঙ্গণে আসিতেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পূর্ব্বধারের দ্বিতল একখানি গৃহে রাজমিস্ত্রীরা হল্লা করিয়া কাজ করিতেছে। ছোটবেলায় নীলকান্ত দেখিত, মাঝে মাঝে দুই একজন ভদ্রলোক আসিয়া ইহাতে আস্তানা গাড়িত। পদমর্য্যাদায় কেহ তাহাদের জমিদার, কেহ সরকারি কর্ম্মচারি। বাড়ীটা এতকাল শুধু শুধু পড়িয়াছিল। আজ ইহার সংস্কারের হেতুটা নীলকান্ত বুঝিতে পারিলনা।

বাড়ীটা শুধু শুধু মেরামত করে লাভ হবে কি রাজু? নীলকান্ত শুধাইল।

রাজীব হাসিয়া উত্তর দিল, মেরামত করচি কে বললে, একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি ওখান থেকে। দেখচনা সাপ বাঘের আড্ডা হয়ে উঠেচে। তুমি থাক চোখ বুজে, কিছু ত আর দেখনা:

নীলকান্তের চোখদুটি ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল, সে রাজীবের দিকে তাকাইয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, কিন্তু অনেক কালের ঘর যে।

জানি, কিন্তু শুধু শুধু রেখে লাভ নাই। বরং ইটগুলো বেচে যে দু-চার টাকা পাওয়া যায়, সেই আমাদের লাভ।

কথাটা নীলকান্তের ভাল লাগিল না। বাপের আমলের ঘর ভূমিসাৎ হইতে দেখিলে কার না দুঃখ হয়? কিন্তু রাজীবের কাছে বেশী কথা বলিতে নীলকান্তের সাহস হইল না।

নীলকান্তের একবার মনে হইল, গোপালজীর ভাঙা ঘরের কথাটা আজ একটুখানি তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, হয়ত রাজীব ভুলিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু তারপরেই ভাবিল, রাজীব ত সেদিন নিজ মুখে বলিয়াছে, দু দিন সবুর করিতে আর দোষ কি?

নীলকান্ত প্রস্থানের উপক্রম করিতেছিল, রাজীব তাহাকে ডাকিল, কাছারি ঘরে একবার এসত, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

নীলকান্ত রাজীবের পিছনে পিছনে কাছারি ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাজীব কোন কথা বলিল না। ফরাশের তল হইতে তাড়াতাড়ি একখানা দলিল বাহির করিয়া নীলকান্তের দিকে সরিয়া আসিয়া বলিল, নামটা সই করে দাও দেখি; দাও, কোন ভয় নেই তোমার।

কিন্তু সত্যসত্যই নীলকান্তের আজ একটু ভয় হইল। সে সবিস্ময়ে একবার দলিলের দিকে আর একবার রাজীবের দিকে চা'হিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

রাজীব বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলিল, একটা সই দিতেও ভয় হ'ল।

নীলকান্ত ক্ষীণহাস্যে বলিল, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে রাজু।

তা পারবে কেন, যাতে দু পয়সা আসে, সে দিকেত

তোমার হুঁস নেই। যা দেখতে শুনতে পার না, তা রেখে যে কি লাভ তাও বুঝিনে। বুঝতে পারলেনা তোমার বল্লীপুরের বাগান গো। বারভূতে খাচ্চে, দুশো টাকায় ঠিক করেচি।

নীলকান্তের আপাদমস্তক কম্পিত হইল। পৈতৃক পুষ্করিণী, জমিদারি একে একে সব গিয়াছে। সম্বল মাত্র সেই বাগানটা! আজ নিজের অবস্থার কথাটা নীলকান্তের মনে হইয়া গেল; জীর্ণ গৃহে অর্দ্ধাশনে তা'র দিন কাটিতেছে কিন্তু স্বেচ্ছায় সে কিছু নষ্ট করে নাই।

নীলকান্ত অস্ফুটকণ্ঠে উত্তর দিল, ওতে আমার হাত নেই রাজু, গোপালজী ওর মালিক।

রাজীব রুক্ষকণ্ঠে বলিল, না, দেবোত্তর সম্পত্তি নয়। তুমি দেখই না।

কিন্তু নীলকান্ত কিছুই দেখিলনা। সে ওষ্ঠপুটে ক্ষীণ হাসি আনিয়া বলিল, না, হ'ক কিন্তু আমি সই দেবনা রাজু। ওসম্পত্তি গোপালজীর নামে রেখেচি। আর ত কিছুই নেই। বলিতে বলিতে নীলকান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

রাজীব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক আমারও মাথা ব্যথা নেই, তোমার কষ্ট দেখেই একাজে হাত দিয়েছিলাম। ছ দুশো টাকা আজকের দিনে কম নয়। এতে তোমার গোপালজীর ভাঙা ঘর মেরামত হ'য়ে যেত।

প্রাঙ্গণ হইতে নীলকান্ত পিছন ফিরিয়া তাকাইল। স্থির দৃষ্টিতে রাজীবের মুখের দিকে সে কয়েক মুহূর্ত্ত কি নিরীক্ষণ করিল, তার পর দেউড়ি দিয়া চলিতে চলিতে হাসিতে হাসিতে বলিল, কাজ নেই, গোপালজী আমার ভাঙা ঘরেই থাক্ রাজু।

নিশুতি রাত্রি।

গোপালজীর ঘরের ভিতর নীলকান্ত একা। একধারে টিপ টিপ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। গোপালজীকে কোলে করিয়া নীলকান্ত একদৃষ্টে তা'র মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।

গোপালজীর মাথায় শিখিপুচ্ছ। কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ঝিকমিক করিতেছে। হাতের কঙ্কণ দুইটি পরিচ্ছন্ন ন্যাকড়ায় মুছিয়া নীলকান্ত সযত্নে আবার পরাইয়া দিল। কাণের কুণ্ডল দুটিতে একবার দোল দিয়া গোপালজীকে আস্তে আস্তে সিংহাসনের উপর স্থাপন করিল।

কাল গোপালজীর চাঁচর। পরদিন এই ক্ষুদ্র সিংহাসনে দেবতা মৃদু মৃদু দোল খাইবে। আনন্দের উত্তেজনায় নীলকান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এই ক্ষুদ্র কক্ষে গোপালজী কত দিন অধিষ্ঠিত আছে কে জানে। কৈলাস বাবু তাহাকে এমনি ভাবে দেখিয়েছেন। পিতামহ হরনাথের সহিত গোপালজীর প্রতি রাত্রে কথা হইত। সে দিনের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির চিত্র নীলকান্তের চোখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য উন্মুক্ত হইল। কি ছিল আর কি হইয়াছে। ভাঙা ঘরে দেবতা আজ নিজের সমাধি ডাকিয়া আনিয়াছে। চোখ দুটি নীলকান্তের হু হু করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল। সেই চোখের জলে অতীতের চিত্র ভাসিয়া গেল। সে গোপালজীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল, তুই না জাগলে কি ক'রে আমি জাগাই বল্। আমার কি ইচ্ছে তোকে ভাঙা ঘরে রাখি, কিন্তু তুই ত দেখলি সব, শুন্লিত সব কথা। এ পাপ তোর না আমার।

কিন্তু দেবতা পাষাণ! নিশীথ রাত্রের আকাশে বাতাসে সেই করুণ বিলাপ অট্টহাসির মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভোর রাত্রে নীলকান্ত নিদ্রা গিয়াছিল, ঘুম ভাঙিল বটুর ডাকে। চোখ তুলিয়া দেখিল' বেলা হইয়া গিয়াছে। এত দেরি করিয়া কোনদিন সে উঠে না।

বটু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, গোপালজী নেই বাবা।

নেই, সে কিরে?

এস দেখ্বে এস, ঘর খোলা রয়েচে, গোপালজী নেই।

নীলকান্ত নাটমন্দিরে আসিয়া দেখিল সত্যই তাই, গোপালজীর শূন্য সিংহাসন খাঁ খাঁ করিতেছে, গোপালজী নাই।

ভোরের আলো আসিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বটু দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া আশপাশের ঝোপ ঝাড় খুঁজিতে লাগিল। নীলকান্ত একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ বটুকে বলিল, আর খুঁজতে হবেনা, তুই বাড়ী যা দেখি। বলিয়াই দেউড়ি দিয়া নীলকান্ত একেবারে কাছারি ঘরের সামনে আসিয়া দাড়াইল।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিত্য অভ্যাস মত রাজীব ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছিল। নীলকান্ত তাহার দিকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ঠাকুর ফিরিয়ে দাও রাজু, নইলে ভাল হবেনা। দেবতার সঙ্গে ছেলে খেলা উচিত নয়।

কিন্তু রাজীব কিছুই বুঝিতে পারিলনা, গভীর দৃষ্টিতে নীলকান্তের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হঠাৎ তার ডান হাতখানা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া নীলকান্ত তেমনি হাসিয়া বলিল, আমার সই ত কেবল বাকি, তা দিচ্ছি, কিন্তু গোপালজীর কিছু হারায় নি ত রাজু।

রাজীবের চোখের প্রান্তে এবার হাসি ফুটিল। বলিল, পাগল, ঠাকুরের গয়না নিয়ে আমি করব কি? তুমি নিজে এসে দেখে নাও—বলিতে বলিতে নীলকান্তের সহিত সে কাছারি ঘরে প্রবেশ করিল।

* * *

গোপালজী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এবার নিজের ঘরে নয়, নীলকান্তের অন্দরে।

বটু এখনও তেমনি আগ্রহে কাঁসর বাজায়। নীলকান্ত ঠাকুরের পিঠে থাবা দিয়া শুধায়, আবারও যে হাসি রে, এবার নিবি কি তুই বল্ত?

গোপালজী ইহার উত্তর দেয়না। নীলকান্তের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া শুধু হাসে।

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

বৈশাখ

শ্রীগোপাল বটব্যাল

চৈতালেরি অন্তে তুমি দীপ্ত ঝলকে
আসলে হেথা রুদ্র-বীণা বাজিয়ে বল কে?
অঙ্গে তব ভৈরবেরি চিহ্ন যে লিখা,
অগ্নি জ্বলে ললাট মাঝে, জ্ঞানের দীপিকা।
সঙ্গী তব উষ্ণ বায়ু মরুর উদাসী
ঝঞ্ঝা তোলে হঠাৎ যেন প্রলয়-পিয়াসী।
সতীর শোকে নটরাজের রুক্ষ জটাতে,
জন্ম নিল পুরুষ যারা ধ্বংস ঘটাতে,
কাল বোশেখী তুমি তাদের মধ্যে ছিলে কী?
মর্ত্তে এসে জীবন ফাঁকে ভরিয়ে দিলে কী?
মত্ত হয়ে নৃত্য কর অসীম আকাশে,
বল্কলেরি বসনখানি উড়ছে বাতাসে।
সুন্দর হে! ছন্দে তব মনের জড়তা
চূর্ণ করি নিজের হাতে কর্ম্মে গড় তা'।
বহ্নিভরা বীণার গানে ঘুমের কালিমা
ছিন্ন করি উঠুক ফুটে জয়ের লালিমা।

ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমপরিণতি

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

ভারতবর্ষের সভ্যতা এক গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মাত্র নৈতিক বা মানসিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয় নাই। ইহার অন্তর্নিহিত উত্তম রহস্য এই যে, যতকিছু শিক্ষা দীক্ষা বা শিল্পকলা ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে বা ভারতের অভ্যন্তরস্থ নিম্নজাতি সমূহ হইতে আসিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতা তাহার সব কিছুকেই এক অসামান্য অন্তঃশক্তি বলে গ্রাস করিয়া নিজস্ব করিয়া নিতে পারিয়াছে—কোন কিছুকেই সে ভীতির চক্ষে দেখে নাই, কোন সংস্পর্শ হইতেই সে বিমুখ হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে বিকৃত ও বর্ব্বর বস্তুকেও সংস্কৃত ও সুন্দর করিয়া সে আত্মসাৎ করিয়া নিয়াছে। তার একমাত্র কারণ ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতি এক প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত—আর সে শক্তি সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বতোমুখী।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতি একই পথ অনুসরণ করিয়াছে। ভারত সঙ্গীতের স্বধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিয়াছে—সঙ্গীতের এক অন্তর্নিহিত সত্তার আবিষ্কারে। মার্গী সঙ্গীত মানে সঙ্গীতের এই উন্নত স্বরূপ। এই স্বরূপকে অতি ছুঁৎমার্গ অনুসরণে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে হয় নাই। সাহসের সহিত ভারত নানা-দেশী সঙ্গীত হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার বিপুল রাজভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। অগঠিত বা কুগঠিত নানাজাতীয় সুরকে সুগঠিত করিয়া দেশী রাগে এমনকি মার্গীরাগে পরিণত করিয়াছে। আর এই রূপান্তরের ক্ষমতাই সজীব ও সতেজ আধ্যাত্মিক শক্তির স্বধর্ম্ম।

ভারতীয় সঙ্গীত রাগ-বিভাগের উপর গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই রাগ-সঙ্গীতের বিকাশের ঐতিহাসিক ধারার দিকে সাধারণের দৃষ্টি এ যাবৎ পড়ে নাই। অনেকেই হয় তো মনে করেন যে সহসা সৃষ্টির কোন এক আদি মুহূর্ত্তে মহাদেব তাঁর পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চ রাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও পার্ব্বতীর মুখ হইতে ষষ্ঠ রাগের সৃষ্টিতে ছয় আদি রাগের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা ভারতের অন্যান্য অনেক সত্যের ন্যায় সঙ্গীত শাস্ত্রের সুরসঙ্গতির গুহাশায়ী কোন গোপন ধর্ম্মের প্রতীক বা রূপকল্পনা। সঙ্গীতরত্নাকরের ন্যায় সুপ্রাচীন ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে এই প্রতীকের ইঙ্গিত কিছু পাওয়া যায়।—উমাপতি মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে রাগের সৃষ্টি; এই সকল রাগের ছায়া অবলম্বনে অসংখ্য ছায়ালগ, ভাষা, বা রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহাদের সংমিশ্রণে সংকীর্ণ রাগপুত্র বা বিভাষা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবের সহিত এই রূপকের সম্বন্ধ কি তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রাগের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে হইবে।

রাগ-বিকাশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মহাভারত বা প্রাচীন ভারতের সম-ঐতিহাসিক গ্রন্থে রাগ রাগিণীর কোনও উল্লেখ নাই। ভরতাচার্য্যের নাট্যশাস্ত্রকে প্রাচীন সঙ্গীতের মূল প্রামাণিক গ্রন্থ বলা হইয়া থাকে। ভরতাচার্য্যের গ্রন্থে রাগের পরিবর্ত্তে জাতির উল্লেখ আছে যথা—(১) ষড়জ মধ্যমা (২) ষড়জ কৈশিকী (৩) ষড়জোদিচ্যবা ইত্যাদি। এই সকলকে জাতি রাগ বলা হইত। বিশেষ বিশেষ স্বরের প্রাধান্য অনুযায়ী জাতি রাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল জাতিরাগই ভারতীয় প্রাচীন আদি রাগ। ক্রমে ভারতের প্রাচীন নানা আদিম জাতীর মধ্যে বা বৈদেশিক জাতির মধ্যে প্রচলিত সুর অবলম্বনে নানা রাগ গঠন করা হয় ও সে সকল রাগ উচ্চ সঙ্গীতে স্থান পায় এবং এইখানেই ভারতীয় সঙ্গীতের সর্ব্বগ্রাসী বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়।

আর্য্য সঙ্গীতের নিয়মানুসারে পাঁচ সুরের কমে গঠিত

কোনও রাগকে রাগ আখ্যা দেওয়া যায় না। তদানীন্তন অনার্য্যদের মধ্যে চতুঃস্বর বিশিষ্ট অনেক রাগ ছিল। আর্য্যগণ সে সকলের মধ্যে পঞ্চম কোনও স্বর যোজনা করিয়া সে সকলকে মার্গ রাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্য মতঙ্গমুনি প্রণীত "বৃহদ্দেশী" নামক গ্রন্থে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ—শবর-পুলিন্দ-
কাম্বোজ-বঙ্গ-কিরাত-বাহ্লীক-অন্ধ্র বনাদিষু প্রযুজ্যতে॥"

অর্থাৎ চতুঃস্বর, তিনস্বর বা দুইস্বরে গঠিত রাগ মার্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত নহে। ঐ সকল রাগ শবর পুলিন্দ কাম্বোজ বঙ্গ কিরাত বাহ্লীক অন্ধ্র দ্রাবিড় ইত্যাদি বন্য জাতিদের মধ্যে প্রযুক্ত হয়।

পরে এই সকল রাগ আর্য্যমতে সংস্কৃতে রূপান্তর ও সম্পূর্ণ বা ষাড়বৌড়বিত করিয়া প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ রূপতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাগ রাগিণীর নাম রহস্যের আলোচনায় এ বিষয়ে অনেক কিছু তথ্য ও সত্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে অমার্গী রাগের মার্গী রূপান্তরের পরিচয়ে তিনি অনেক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। (১) পুলীন্দী রাগিণী (২) কাম্ভোজী রাগিণী (৩) আন্ধ্রী রাগিণী (৪) দ্রাবিড়ী রাগিণী (৫) বাঙ্গালী রাগিণী ও (৬) মালবী রাগিণীর নাম এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতীয় আর্য্যগণ এইরূপে আদিম জাতি সমূহের রাগ রাগিণী গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই—বিদেশী সুর হইতেও রাগাদি পরিপুষ্ট করিয়াছেন। "শক" রাগ যাহা হইতে বর্ত্তমান 'শাখ' রাগের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা প্রাচীন শকজাতির সঙ্গীত হইতে গৃহীত। শক রাগের উল্লেখ মতঙ্গমুনির বৃহদ্দেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আর্য্য সঙ্গীতের উদারতার এতদূর পরিচয় আমরা পাই যে তাঁরা আদিম জাতির নিকট গৃহীত রাগকে মার্গরাগের শ্রেষ্ঠ আসন দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পাঞ্জাবে এক সময় এক প্রাচীন অনার্য্য জাতির বাস ছিল—তাহাদের নাম টক্ক জাতি, তাহাদের দেশের নাম ছিল টক্ক দেশ। প্রাচীন তক্ষশিলা নগরী ও অধুনাতন Attock সহর কুকট জাতির নাম অনুসরণেই গঠিত হইয়াছে। এই প্রাচীন জাতির কিছু অবশেষ "টাঁক" নাম নিয়া অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। জয়পুরের নিকটস্থ মুসলমান নবাবের অধীনস্থ "টংক্" রাজ্যে তাহাদের বসতি। তাহাদের ভাষার স্বতন্ত্র অক্ষর আছে—তাহার নাম টাঁকড়ী অক্ষর। এই টক্ক জাতি আর্য্য সঙ্গীতকে একাধিক রাগিণী দান করিয়াছে ও তন্মধ্যে ( ) টক্ক রাগ ও (২) টক্ক কৈশিক প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী রাগমালায় টক্ক রাগ টংক নামে অভিহিত।

মতঙ্গমুনির গ্রন্থে টক্ক রাগের বিশিষ্ট স্থান আছে,—

"কশ্যপ মতে তু টক্ক রাগ এব মুখ্যঃ লক্ষ্মী প্রীতিকরত্বাৎ॥

মতঙ্গমুনি সাতটী রাগকে মুখ্যস্থান দিয়াছেন,—

টক্ক রাগশ্চ সৌবীরস্তথা মালব পঞ্চমঃ।
ষাড়বো বোট্ট রাগশ্চতথা হিন্দোলকঃ পরঃ॥
টক্ক কৈশিক ইত্যুক্ত স্তথা মালব কৈশিকঃ।
এতে রাগাঃ সমাখ্যাতা নামতো মুনি পুঙ্গবৈঃ॥

এই ভাবে সাত রাগ হইতে আরম্ভ হইয়া নানা রাগের উৎপত্তি ক্রমে হইয়াছে। পরে এই সকল রাগের রাগিণীরূপে "ভাষা" রাগিণী সকলের সৃষ্টি হয়। ভাষার অন্তর্গত বিবিধ নব নব রাগিণী "বিভাষা" শব্দে পরিগণিত হয়। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর কল্পনা পরবর্ত্তী যুগের, ও তাহা রাগসঙ্গীতের এক আধ্যাত্মিক রূপকল্পনা মাত্র।

মুসলমান যুগে ও তৎপূর্ব্বে অনেক বিদেশী রাগিণীকে আর্য্য সঙ্গীত আত্মসাৎ করিয়াছে। তন্মধ্যে তুরস্ক, গৌড়, তুরস্ক তোড়ি, যমন্, সর্ফর্দা, সাজগিরি, জিলফ ও হিজেজ রাগ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই তুরস্কগণ Chinse Turkstan-এর অধিবাসী। তুরস্ক জাতি হইতে আমরা দুটী প্রসিদ্ধ রাগ পাইয়াছি। তুরস্ক গৌড় সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে,

"বীরেচ রৌদ্রেচ তুরস্ক গৌড়ো নিষাদ ধ্বংসো রূপ
বর্জ্জিতশ্চ।"

তুরস্ক তোড়ি সম্বন্ধে আমরা দেখি ;—

তুরস্কদেশ প্রচুর প্রচারা সিতা মিতা পুষ্পবরং দধানা।
সুরক্ত বস্ত্রেণ বিভূষিতাঙ্গী তুরস্ক তোড়ি
কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ॥

যমন সর্ফর্দা প্রভৃতি রাগ পাঠান রাজত্বকালে আমীর খসরু নামক জনৈক পারসী অমাত্য পারস্য দেশের সুর হইতে রচনা করিয়াছিলেন।

হিজেজ রাগিণী তাহার কিছু পূর্ব্বের। হিজেজ রাগিণী পারস্য দেশীয়া হইলেও সংস্কৃত উদারচেতা সঙ্গীতাচার্য্যগণ তাকে আর্য্য জাতিতে সংস্কৃত করিয়া নিলেন ও তার নাম দিলেন "হিজুজ্জিকা"।

বিজয়নগরের রাজা রামরাজের সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী রামামাত্যের "স্বরমেলকলানিধি" নামক গ্রন্থে "হিজুজ্জিক" রাগকে মেলক রাগ বা জনক রাগের উচ্চাসনে বসানো হইয়াছে। যথা—

"হেজুজ্জী মেলকো ভবেৎ"।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে প্রাচীন ঝুমুর গানের আদর্শে ও বৌদ্ধ সঙ্গীতের পন্থানুসরণে কীর্ত্তন গানের সৃষ্টি হয়। কীর্ত্তন গানে নানা রাগরাগিণীর সুমধুর ও প্রাণবিমোহন বিন্যাসে সঙ্গীতের এক অপূর্ব্ব পথের বিকাশ হইয়াছে। ইহাতে নানা রাগের সমাবেশে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কীর্ত্তন সঙ্গীতও আর্য্য সঙ্গীত প্রতিভার এক বিশিষ্টরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় আর্য্য সুরসাধকগণ এইভাবে জাতি বর্ণ ও দেশের দিকে না তাকাইয়া যেখান হইতে যাহা সংগ্রহ করিলে নিজ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় তাহাতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহারা নানা বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড গীতের সংগ্রহ সংস্কার ও রূপান্তরের ফলে যে ঐক্য সূত্রের আবিষ্কার করিলেন তাহাকেই রাগ আখ্যা দিয়াছেন। শাস্ত্রে বলে স্বরযুক্ত যে ধ্বনি লোকের চিত্তকে অনুরক্ত করে তাহাই রাগ কিন্তু ইহা প্রতি সঙ্গীতেরই সাধারণ ধর্ম্ম। রসাত্মক বাক্যকে যেমন কাব্য বলা যায় তেমনি রসাত্মক অনুরাগজনক ধ্বনিকেই সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। সাধারণ সঙ্গীত হইতে রাগ সঙ্গীতের এক বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বিশিষ্টতাই ভারত সঙ্গীতের বিশেষ দান। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি যে বাহিরের বহু বিচিত্র নানা উপাদানের মধ্য হইতে নিজ গঠনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ এই যে ভারত বিচিত্রের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র সর্ব্বত্রই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। জগতের নানা সুরে নানাভাবে নানাপ্রকার চিত্তবৃত্তি ও রসের বিকাশ হয়। ভারতীয় প্রতিভা এই সকল বহু বিচ্ছিন্ন রস ও ভাবের মধ্য হইতে মৌলিক বিভিন্ন রসের বিরাট রূপ আবিষ্কার করিয়াছে—যেমন শান্তরস, মধুর রস, বীররস প্রভৃতি। সেইরূপ আনন্দ, দুঃখ, ভয়, উৎসাহ প্রভৃতি কতকগুলি ভাব মানবহৃদয়ের চিরন্তন বস্তু, এ সকলেরও কোনও দেশ কাল পাত্র নাই। জগতের আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের রস ও ভাব একই রহিয়াছে, যদিও সেগুলির প্রকাশের রূপ ও ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারত প্রতিভা এই সকল মৌলিক ভাব ও রসের বিশ্বব্যাপী রূপটী সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাই ভারতীয় চিত্রে ভাস্কর্য্যে স্থাপত্যে আমরা মানবচিত্তের যে রূপ দেখিতে পাই তাহা যেন বিশেষ কাহারও বা কোনও দেশের বা কোনও সময়ের নহে—তাহা সমগ্র মানবজাতির বিশেষ চিত্তবৃত্তিরই একটী প্রতিরূপ। ভারতীয় সঙ্গীতেও মানুষের নানা সময়ের নানা ভাবের নানা রসের প্রকাশ খণ্ড খণ্ড করিয়া নাই যত আছে বিশ্বমানের অন্তঃপ্রকৃতির নানাপ্রকার রসের অখণ্ড প্রকাশ। কোনও বিশেষ মানুষ দেশ বা জাতির আনন্দে দুঃখে হর্ষে ক্ষোভে যে সুর ধ্বনিত হয় ভারতীয় রাগে তাহা নাই। ভারতীয় রাগে আছে—মানবাত্মার নিত্যকালের নানা ভাবের অভিব্যক্তি। মানবীয় চিত্তের ও প্রকৃতির চিরন্তন ভাব যাহা তাহার প্রকাশের ছন্দ ও সুরকে কতকটা অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে। ভারতীয় মূল রাগ সকলের মধ্যে রহিয়াছে সেই সকল মৌলিক ও অন্তর্নিহিত সুরের আরোহণ অবরোহণ ও সঞ্চরণের গতিরেখা আবিষ্কারের বিপুল প্রয়াস।

রাগের অধিকার গভীর অনুভূতি সাপেক্ষ। রাগের সৃষ্টিও অন্তরের প্রতিভার বিকাশ—ইহাতে কোনও ব্যাকরণজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাগের সৃষ্টির পর পণ্ডিতগণ সে সকলের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করেন যাহার ফলে পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে রাগসম্পদ অধিগত করা সম্ভব হয় বা নূতন রাগ সৃষ্টির পথ সহজ হয়। আমাদের আর্য্য সঙ্গীতের মধ্যে রাগবিজ্ঞান সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপেই গঠিত হইয়াছিল। যদিও বৈদেশিক আক্রমণ, সভ্যতার অবনতি, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় সঙ্গীতবিজ্ঞানের অবনতি পরবর্ত্তীকালে যথেষ্ট দেখা গিয়াছে এবং তাহার ফলে পূর্ব্বকালের সঙ্গীতের সহিত পরবর্ত্তীকালের যোগসূত্র অনেকস্থলেই হারাইয়া গিয়াছে,

তথাপি গবেষণা ও অনুশীলন করিলে প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ-বিজ্ঞান হইতে তৎকালীন রাগের একটা আভাস পাওয়া যায় ও তাহা হইতে পরবর্ত্তীকালের রাগগুলি কিরূপে ক্রমবিকশিত হইয়া আসিয়াছে তাহার একটা ধারা বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন সঙ্গীতবিজ্ঞানে রাগনির্ণয়ের অতি সুন্দর পন্থা আছে। প্রথমত শুদ্ধ সপ্ত স্বর ও বিকৃতি নিয়া বারোটী স্বর পাওয়া যায়, তৎপর বাইশ শ্রুতির দ্বারা স্বরের সূক্ষ্ম প্রভেদ সকল সূচিত হয়। সপ্ত স্বরের মধ্যে প্রত্যেকটী হইতে প্রত্যেকটীর কত ব্যবধান হইবে তাহা নিয়াই সপ্তকের সৃষ্টি। এই সপ্তকের মধ্যে প্রথমত দুইটী সপ্তক আছে, যাহা খরজ গ্রাম ও মধ্যম-গ্রাম বলিয়া কথিত। ব্যবধানের পারম্পর্য্য অনুযায়ী খরজ-গ্রামে সপ্তস্বরের একরূপ অবস্থান—মধ্যমগ্রামে অপররূপ সংস্থান। এই দুইটীকে নির্দ্দিষ্ট সপ্তক ধরিয়া প্রত্যেকটী সপ্তক হইতে সাতটি সাতটি করিয়া চৌদ্দ মূর্চ্ছনার গণনা করা হইয়াছে। মূর্চ্ছনা মানে স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ; যেমন :—

স র গ ম প ধ ন
ন ধ প ম গ র স

এরূপ প্রত্যেক স্বর হইতে আরোহণ অবরোহণে এক একটা মূর্চ্ছনা বা ঠাটের গঠন হয়। এই মূর্চ্ছনাই সকল রাগের কাঠাম। তারপর রাগের গঠনের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখি প্রতি রাগে একটি বা দুইটি স্বর মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হয়; অন্যান্য স্বরের গৌণভাবে প্রয়োগ হয়। কোনও এক স্বর হইতে রাগের আরম্ভ হয়, কোথাও রাগের শেষ করিলে রাগের মূর্ত্তি উত্তমরূপে প্রকাশ হয়। তা ছাড়া প্রতি রাগেরই মৌলিক কতকগুলি স্বরবিন্যাস আছে সেই স্বরবিন্যাসই রাগের যথার্থ রূপ। এইভাবে নানা লক্ষণে রাগের পরিচয় হয়। আমরা এখানে সঙ্গীতবিজ্ঞানের ব্যাকরণ নিয়া অধিক আলোচনা করিব না। মোটামুটী বলিতে গেলে সঙ্গীতের ও রাগের ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান আমাদের এত সর্ব্বাঙ্গীন ও পরিপূর্ণরূপে রহিয়াছে, যাহাতে আমরা এক সমৃদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রের উত্তরাধিকারে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতে পারি। কিন্তু আমাদের নাই প্রাচীন যুগের সজীব সঙ্গীতাত্মা। জীবন্ত প্রাণের অভাব থাকিলে শাস্ত্রের কোনও অর্থ হয় না। তাহা শুধু বাক্যরাশির ভার মাত্রে পরিণত হয়। তখন পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত জীবনধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কতকগুলি নিয়ম ও রীতি-নীতির অন্ধ-পুনরাবৃত্তিকেই সাধন বলিয়া ভুল করেন। বর্ত্তমান পণ্ডিতেরা অন্তর বা বাহির হইতে সঙ্গীতের জীবনীশক্তি সংগ্রহ না করিয়া শুধু প্রাচীনের চর্ব্বিতচর্ব্বণকেই সঙ্গীতচর্চ্চার সার মনে করিয়াছেন। অপর দিকে প্রাচীনের যথার্থ সম্পদ ও সমৃদ্ধির দিকে বিমুখ হওয়ারও কোন সার্থকতা নাই। পুরাতন সাধনার অন্তর্নিহিত সত্য ও শক্তির অনুসরণে আমরা যথার্থই বৃহৎ ও শক্তিশালী হইব—কিন্তু অর্থহীন অনুকরণে আমাদের প্রাণ-শক্তির বিকাশ হইবে না।

আমাদের শাস্ত্র হইতে রাগ গঠনের মৌলিক নীতি আবিষ্কার করিতে হইবে—প্রাচীন কলাবিদ্‌গণের গীত ও আলাপ হইতে রাগের মর্ম্মনিহিত ভাব ও প্রেরণা গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু রাগ প্রকাশ করিতে হইবে বর্ত্তমান যুগের উপযোগীরূপে। বর্ত্তমান যুগের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখি যে দেড় শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সত্ত্বেও য়ুরোপীয় সঙ্গীত হইতে আমাদের সঙ্গীতোপযোগী বিশেষ কোনও উপকরণ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। হয় পাশ্চাত্যের অতি খেলো সঙ্গীত ও বাদ্যের অনুকরণ করিয়াই আমরা তৃপ্ত থাকিয়াছি, অথবা পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে ম্লেচ্ছ বিবেচনায় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়াছি। অথচ মুসলমান রাজত্বকালে আমাদেরই পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনায়াসে ও অতি স্বাভাবিকভাবেই পারস্য স্বর হইতে আমাদের রাগ-সকলকে সুপুষ্ট করিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে হিন্দুরাজত্বকালেও নানা বিদেশী ও এমন কি বর্ব্বর জাতির স্বর হইতেও তাঁহারা সঙ্গীতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ অন্তরে স্থির রাখিয়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আলোচনা ও শিক্ষা করিলে আমরা তাহা হইতে অনেক নূতন রাগ গঠন করিতে পারিব ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চাল হইতে হিন্দু সঙ্গীতের নূতন নূতন অনেক বিন্যাস রচনা করিতে পারিব। বর্ত্তমান-যুগে পাশ্চাত্যের দানকে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইবে না ও সঙ্গতও হইবে না। পাশ্চাত্যের বিশাল সম্পদ হইতে উদার-ভাবে অনেক জিনিষই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রাচীন ভারতের সেই সদাজাগ্রত অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরানুভূতি যাহা অভ্রান্তরূপে বাহিরের বিচিত্র বস্তুসম্ভার হইতে যথার্থ সত্য খুঁজিয়া বাহির করিবে ও নানা ভালমন্দ উপকরণ হইতে আপন প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিবে।

এইরূপ জীবন্ত সাধনার দ্বারাই ভাবী সঙ্গীতের রূপ আমরা দিতে পারিব। কাব্য, সাহিত্য, চিত্র ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ভারত সে আদর্শের অনুসরণে যে অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেই একই আদর্শ ধরিয়া চলা ছাড়া সঙ্গীতের উন্নতির অন্য পথ নাই।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

গ্রীণ্ মতবাদে ভূপৃষ্ঠ পরিকল্পনা

শ্রীজ্যোৎস্নাশঙ্কর ভাদুড়ী এম-এস-সি, বি-এল

আদিম কাল হইতে মানব নিজেকে প্রশ্ন করিয়া আসিয়াছে,—এই সুন্দর পৃথিবী কি করিয়া সৃষ্টি হইল আর তাহারাই বা কি করিয়া এই মনোহর স্থানে আসিল ?—এই প্রশ্নের উত্তরে আসিল জটিল রহস্য। দার্শনিকগণ, বৈদান্তিকগণ ও ধর্ম্মগ্রন্থ লেখকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া নানাভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণও তাঁহাদের নানা মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সব মতের অনৈক্য প্রত্যক্ষ করিলে, বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়; আর মনে হয় এই প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় ?—কাহাদের মত ঠিক ?—পৌরাণিকদের, না বৈজ্ঞানিকদের, না দার্শনিকদের ?—প্রশ্নোত্তর জটিল হইতে জটিলতর হইয়া আসে।

সৃষ্টিতত্ত্বকে রহস্যাবৃত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভূসৃষ্টির পর তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; আর তাহা হইতে ভূপৃষ্ঠাকৃতির অনুরূপ পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস।

মানব সভ্যতার আদিমতম যুগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যে ভাব এবং পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের ভার লইয়াছিল ফিনিশিয়ান (Phoenician—Asia minor) বণিকগণ; ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহাদিগকে "পেডলার্স অফ দি এন্‌সিয়েণ্ট ওয়ার্ল্ড" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে (Pedlars of the Ancient World)। ইহাদিগের উপযুক্ততম উত্তরাধিকারী পাশ্চাত্য জগতে যেমন গ্রীস, তেমনই—প্রাচ্য জগতে ভারতবর্ষ—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু নাবিক এবং বণিকগণের নাবিকতা ও বাণিজ্যে পারদর্শিতা দিগন্তবিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতীয় বণিকগণ মিডিভ্যাল যুগের (খৃঃ অঃ ৫০০—খৃঃ অঃ ১৫০০) পূর্ব্বে পোতাশ্রয়ে তাঁহাদের বাণিজ্যসম্ভার বহু দূরদেশে লইয়া গিয়াছেন ও নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ বাণিজ্যতরী লইয়া পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়াছেন (ক)। প্রাচীন ভারতীয়দের ভৌগোলিক জ্ঞান সমসাময়িক অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল (খ)। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইউরোপীয় নাবিক ও বণিকগণের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণ ইহাই উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে যে আদি কবি হোমার (Homer), 'ওসানস' (Oceanos) বা সমুদ্রকে কল্পনা করিয়াছিলেন যে তাহা নদীর মত পৃথিবীকে আবেষ্টন করিয়া আছে এবং বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভেও সে বিশ্বাস একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এ বিশ্বাসের তিরোধান নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

১। প্রাচীন যুগের টোলেমি (Ptolemy) কর্ত্তৃক বর্ণিত জিওসেন্ট্রিক-ভিউ (Geocentric view) বা পৃথিবী সৌর

(ক)

১। যুক্তিকল্পতরু—by Bhoja

২। Anonymous document "Periplus of the Erythrean Sea", attributed to Hippalus but really Apocryphal (?)

(খ)

১। এফ, ইডেন্ পারজিটার—মার্কণ্ডেয় পুরাণ—(বিবিলোথিকা ইণ্ডিকা) পৃঃ ২৭৫—১৯০৩ সন, কলিকাতা।

২। ব্যাস ভাষ্যাবাচস্পত্যসহিতানি—পাতঞ্জলসূত্রাণি, "ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ"—১৮১৮ শক বোম্বাই।

৩। বরাহ মিহির—বৃহৎ জাতকম্।

৪। ভাস্করাচার্য্য—গোলাধ্যায়।

মণ্ডলের কেন্দ্রস্থল তাহা কোপার নিকাশ বর্ণিত হেলিও-সেণ্ট্রিক-ভিউ (Helio-centric view) বা সূর্য্য সৌর মণ্ডলের কেন্দ্রস্থল এই বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা ।

২। প্রাচীন কালের থেইলস্ অফ্ মিলিটাস, রেগিওমেণ্টাস্ (Thales of Militus, Reggiomantus) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিকগণের শিষ্য জার্ম্মাণ জোহান মুলার— (Johann Muller) কর্ত্তৃক প্রণীত ইফেম্যেরাইডিস্ (Ephemcrides) নামক গ্রন্থ, ক্রিষ্টোফবো কলম্বোর (Cristophus Columbus) আমেরিকা আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছিল [গ]। ইউরোপের অবস্থা তখন অন্য প্রকার ছিল। আরবেরা ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে মধ্যযুগের বাণিজ্যের কর্ণধার ছিল, এবং এলেপ্পো, দামাস্কস, স্মার্ণা, আলেকজান্দ্রিয়া (Aleppo, Damascus, Smardna, Alexandria) নগরীর পণ্য-বিপণিতে আরব সার্থবাহ (caravan) কর্ত্তৃক আনীত ভারতীয় পণ্য ইউরোপীয় বণিকগণের নিকট বিক্রীত হইত; কিন্তু যখন তুর্কগণ (Seljuk-Turks) কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিয়া লেভাণ্ট (Levant) (ঘ) অঞ্চলে আপাতপত্র স্থাপনা করিল তখন বিজিত আরবদিগের বাণিজ্যপথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল; এবং ভারতবর্ষীয় বিলাসোপকরণে অভ্যস্ত ইউরোপ ভূখণ্ডের অভিজাতমণ্ডলী ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যের সংযোগ-পথ অন্য উপায়ে স্থাপিত করিতে একান্ত প্রয়াসী হইলেন; এবং ফার্ডিনাণ্ড-ইসাবেলা (Ferdinand-Isabella) কর্ত্তৃক কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারে নিয়োগ, বার্থালমু ডায়াজ (Bertholomew Diaz) কর্ত্তৃক কেপ্-অফ-গুড-হোপ্ (Cape of Good Hope) পর্য্যন্ত আগমন এবং পরিশেষে ভাস্কো-ডাগামার (Vasco-de-gama) সকল প্রচেষ্টা এই পূর্ব্বোক্ত প্রয়াসেরই নিদর্শন।

এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে ক্রুসেড (Crusade) অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধের ফলে এবং আরবদিগের দ্বারা নীত ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সংস্পর্শে ইউরোপের মধ্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকার কাটিয়া প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হয়। ইহাই "সিসিলিয়ান রিভাইভাল" নামে অভিহিত। আদি কবি হোমারের "ওসানস" কল্পনার (পৃঃ ৪৯৩ দ্রষ্টব্য) বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে যে মানচিত্র তৈয়ার হয় তাহা 'হুইল মানচিত্র' নামে (Wheel Map) অভিহিত [ঙ]। পোতাশ্রয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যের সংযোগ পথ স্থাপনা করিবার প্রয়াসী হওয়াতেই (পৃঃ ৪৯৪ দ্রষ্টব্য) উপরি-উক্ত হুইল ম্যাপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত ভূগোল-সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি হইয়াছে। তদ্ধেতু এক্ষণে আধুনিক মানচিত্র হইতে ভূপৃষ্ঠের যে-কোন স্থান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ গ্রহণে আমরা সমর্থ।

চিত্র নং ১। পৃথিবীর মানচিত্র (মার্কেটারস্ প্রোজেক্সান)। সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত মানচিত্র লক্ষ্য করিলে কয়েটি বৈশিষ্ট্য স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে। ইহাদিগকে আমরা "ভৌগোলিক-বৈচিত্র্য" আখ্যায় অভিহিত করিব। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) প্রথম বৈচিত্র্য—ভূপৃষ্ঠের উত্তরভাগ স্থলখণ্ড পরিবেষ্টিত আর দক্ষিণভাগ জলময়; অর্থাৎ উত্তর-স্থলের পরিমাণ জল হইতে অত্যধিক, আর দক্ষিণ প্রান্তে জলের পরিমাণ স্থল হইতে অত্যধিক।

(২) দ্বিতীয় বৈচিত্র্য—ভূপৃষ্ঠস্থ স্থল ও জলভাগের ত্রিভুজাকৃতি; স্থল ত্রিকোণ সমূহের সীমান্ত (base) উত্তর দিকে, উহাদের কোণ (taper) ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে; যথা উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ। সামুদ্রিক ত্রিভুজসমূহের সীমান্ত দক্ষিণ দিকে আর কোণ উত্তর দিকে গিয়াছে; যথা প্রশান্ত মহাসাগর, ভূমধ্য সাগরের উপসাগর সমূহ, আরব্যোপসাগর ও বঙ্গোপসাগর।

(গ) লর্ড একটন—কেম্ব্রিজ মডার্ণ হিষ্টোরী—রিনাইসান্স পিরীয়ড্-ক্রিষ্টোফবো-কলম্বো-১৪৯২।

(ঘ) Region between Greece, Egypt and Asia minor bordering the Mediterranean।

(ঙ)। ষ্ট্রেবো (Strabo) এন্সিয়েণ্ট জিওগ্রাফি ভলিউম ১ পৃঃ ১-২২,১৮৯২।

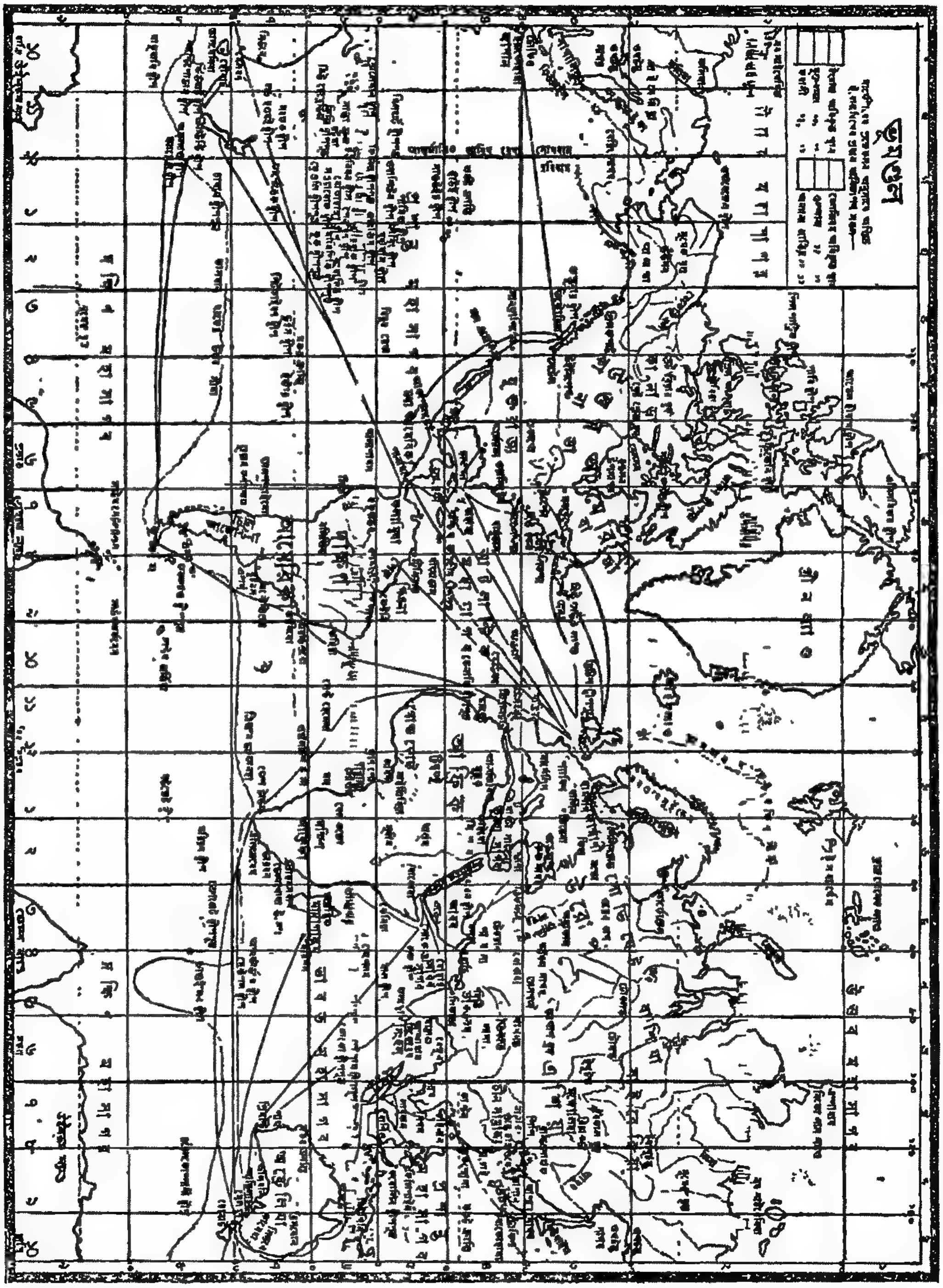

চিত্র নং ১

পৃথিবীর মানচিত্র মার্কেটর্স্ প্রোজেক্শন

(৩) তৃতীয় বৈচিত্র্য—উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয়ের সংমিশ্রণ মাত্র। ভূপৃষ্ঠস্থ স্থলভাগ উত্তর গোলার্দ্ধে চক্রাকারে বিদ্যমান; এবং দক্ষিণ দিকে তিন যুগ্ম মহাদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। বেরিং প্রণালী ও আটলান্টিক মহাসাগর উত্তর-ভূখণ্ডকে বিচ্ছেদ করিয়াছে। চিত্র নং ১ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ইহারা অগভীর, এবং কিছু নিম্নেই মহাদেশগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। ভূতত্ত্ব হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে গ্রীনল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড অতি অল্পকাল পূর্ব্বে একত্র ছিল, পরে আটলান্টিক মহাসাগর উহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে।

যে তিন যুগ্ম মহাদেশ উত্তর দিক হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে বিবৃত হইল :—

(ক) আমেরিকা উত্তর এবং দক্ষিণ।

(খ) ইউরো-আফ্রিকা (ইউরোপ ও আফ্রিকা, প্রফেসার লাপওয়ার্থ উক্ত নামকরণ করিয়াছেন)।

(গ) এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া।

দক্ষিণ গোলার্দ্ধ মহাসমুদ্র-মণ্ডিত। বিস্তীর্ণ জলভাগ বিস্তৃতাকার ক্রমশঃ স্বল্প করিয়া উত্তরস্থ বিস্ফারিত স্থলভাগের সহিত মিশিয়াছে।

(ঘ) চতুর্থ বৈচিত্র্য—জল ও স্থলসমূহের বিপরীত স্থিতি। প্রত্যেকটি মহাদেশ মহাসমুদ্রের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। এতসম্পর্কে নিম্নস্থ মানচিত্র দ্রষ্টব্য। চিত্র নং ২।

চিত্র নং ২—পৃথিবীর মানচিত্র।

ফুট চিহ্নিত মহাদেশগুলি দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অবস্থিত—উহারা উত্তর গোলার্দ্ধে যে ভাবে অবস্থিত আছে তাহা উক্ত চিত্রে দেখান হইল।

মহাদেশ সমূহ মহাসমুদ্রের বিপরীত দিকে দেখান হইল।

উদ্ধৃত মানচিত্র (চিত্র নং ২) হইতে দেখা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়ার বিপরীত দিকে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর।

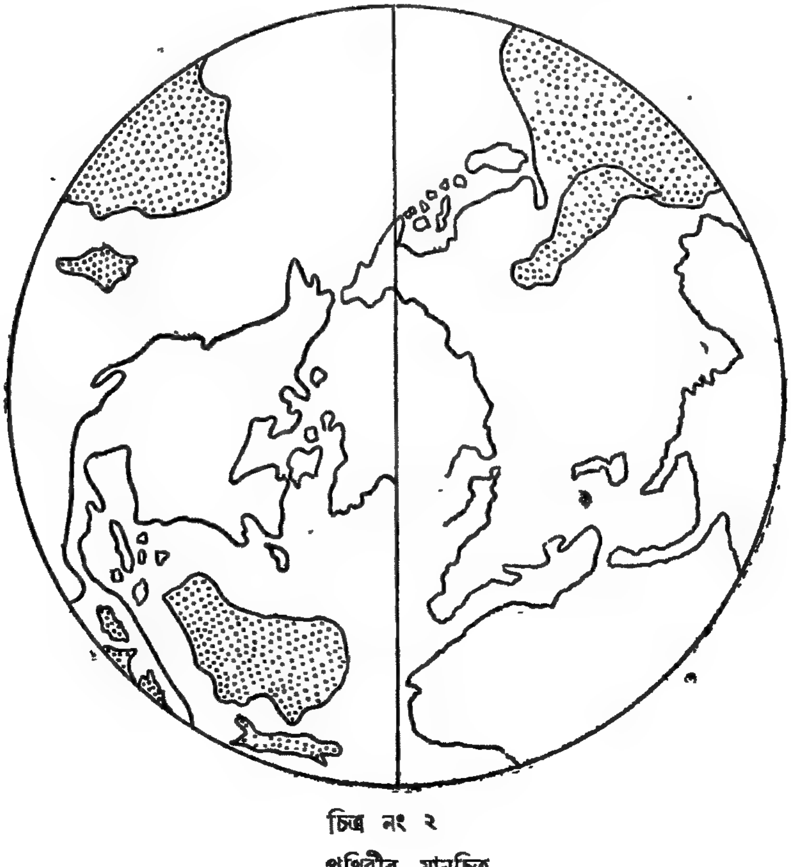

চিত্র নং ২
পৃথিবীর মানচিত্র

আফ্রিকা এবং ইয়োরোপের বিপরীত দিকে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর; কুমেরু মহাপ্রদেশ (Antarctic Continent) উত্তর আমেরিকা, সুমেরু সাগর (Acrctic Oean) ও ভারত মহাসাগরের বিপরীত দিকে অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকার বিপরীত দিকে উত্তর ভাগে চীন সমুদ্র ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর।

জল ও স্থলভাগের এই বৈচিত্র্য সমূহ সর্ব্বপ্রথমে এলি ডি বোমেঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাদিগকে তিনি ভূপৃষ্ঠস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর সম্বন্ধ হইতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বোমেঁর মতে পৃথিবী গোলাকার এবং তাহার ত্বক্ ভাগ দ্বাদশটি পঞ্চভুজাকৃতি ফাটলে (cracks) গঠিত।

উপরি-উক্ত বৈচিত্র্য চতুষ্টয় এবং জল ও স্থল ভাগের অসামঞ্জস্য হইতে লোথিয়ান গ্রীন (Lothian Green) বোমেঁর মতবাদ অস্বীকার করিয়া নিম্ন লিপিবদ্ধ মতের প্রবর্ত্তন করিলেন।

বোমেঁর মতে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থলভাগ দ্বাদশটি পঞ্চভুজের মত। গ্রীনের মতে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থলভাগ সমান সমকোণ ত্রিভুজ চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত ঘনক্ষেত্র চতুষ্ফলকের মত (Tetrahedron)। গ্রীনের সীদ্ধান্ত অনুসারে বোমেঁর ধারণা অসিদ্ধ।

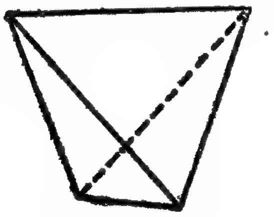

চিত্র নং ৩

(চতুষ্ফলক Tratrahedron)

চারিটি সমান ত্রিভুজ দ্বারা চতুষ্ফলক গঠিত চিত্র নং ৩ দ্রষ্টব্য। ইহার (ত্রিভুজাকৃতির) চারিটি পৃষ্ঠ (Face) ছয়টি প্রান্তে (Edge) মিশিয়াছে, এবং তাহা প্রসৃত হইয়া (Project) চারিটি কোণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদিগকে "বহির্বিলম্বিত কোণ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (Coign)।

৪ নং চিত্রানুযায়ী মডেল সাহায্যে চতুষ্ফলকের প্রকৃতি ও উহার জল ও স্থলভাগের সমাবেশ এবং "প্রতিবহি-র্বিলম্বিত কোণ"এর সমতলভাগের বিপরীত দিকে উহাদের স্থিতি দর্শিত হইয়াছে। বৃত্তচারিটি চতুষ্ফলকের আয়তনের ঽম ভাগের সমান; ভূপৃষ্ঠেরও ঽম ভাগ বারি আবদ্ধ।

সমুদ্র সমূহ "টেট্রাহেড্রনের" সমতল পৃষ্ঠ অধিকার করিয়াছে, আর স্থল প্রদেশ উহার উচ্চস্থানে কোণগুলিতে বিদ্যমান—চিত্র নং ৪ দ্রষ্টব্য।

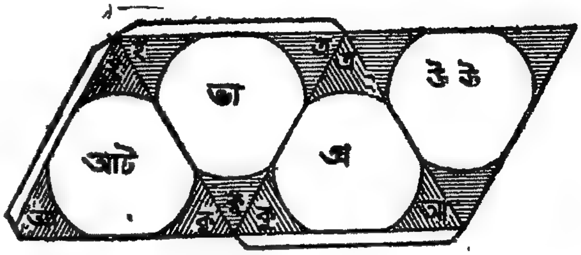

চিত্র নং ৪। মডেল

চতুষ্ফলক চতুষ্টয়

উপরি প্রদর্শিত মডেল (চিত্র নং ৪) হইতে অনুমিত হয় দক্ষিণ মেরু প্রদেশ—"কুকু" (Antarctic Continent) উত্তর মেরু সমুদ্রের "উউ" (Arctic Ocean) বিপরীত।

কোণ (Coign) আ আ (আমেরিকা) ভা (ভারত মহাসমুদ্রের) বিপরীত।

কোণ (Coign) ইই (ইউরো-আফ্রিকা) প্র (প্রশান্ত মহাসাগরের) বিপরীত।

কোণ (Coign) এ এ (এশিয়া-অষ্ট্রেলিয়া আট (আট-লান্টিক মহাসাগরের) বিপরীত।

সুমেরু সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে স্থল প্রদেশ সমূহ

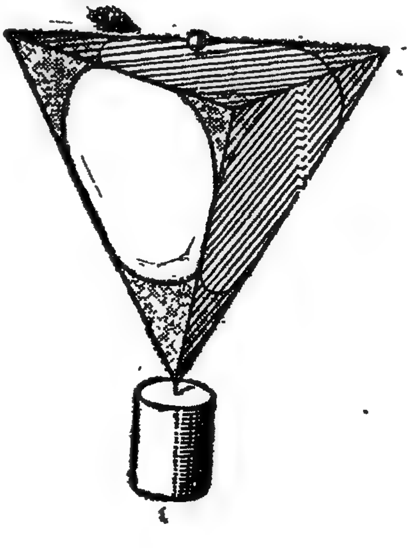

চিত্র নং ৫

বিদ্যমান এবং উহারা ত্রিভুজ অন্তরীপ আকৃতি ধারণ করিয়া দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে।

কার্য্যকারী আদর্শের (Model চিত্র নং ৪) দক্ষিণ অংশ চতুর্দ্দিকে সমুদ্রময় এবং উহা দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ বেষ্টন করিয়া আছে।

চিত্র নং ৪ এর চতুষ্ফলক (Tetrahedron) চতুষ্টয় একত্রিত করিলে যেরূপ হইবে তাহা চিত্র নং ৫ এ দেখান হইল। চিত্রে ফুটচিহ্নিত কোণ সমূহে স্থলভাগ বর্ত্তমান; অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে সমুদ্র (চিত্রে রেখাচিহ্নিত স্থান) সমূহ বিরাজমান।

একটি চতুষ্ফলকের (Tetrahedron) উপর মাধ্যাকর্ষণিক শক্তির সাহায্যে যদি জল রাখা সম্ভব হইত তাহা হইলে উহার বহির্ভাগের (Surface) ৪/৫ম ভাগ জলদ্বারা আবৃত হইত এবং উহাদের বিবচন (arrangement) বসুন্ধরার জল ও স্থল ভাগের যে প্রকার সমাবেশ আছে সেই প্রকার হইত।

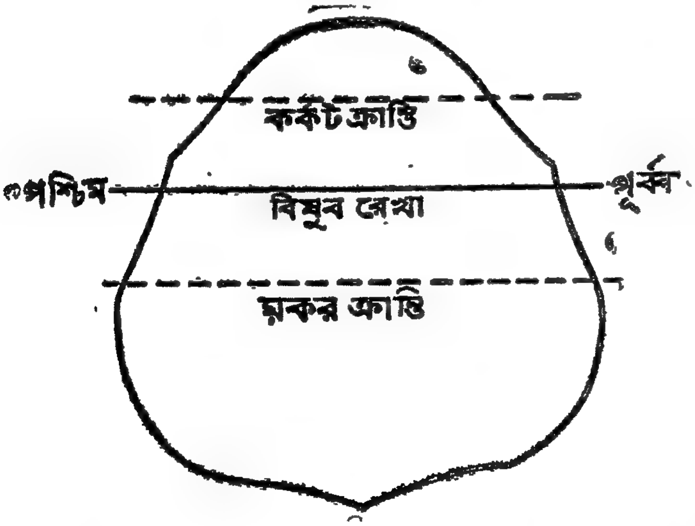

চিত্র নং ৬
অতি-প্রাচীন সমুদ্রের আকৃতি—লোথিয়ান গ্রীনের অনুকরণে

পঞ্চম চিত্রে দর্শিত চতুষ্ফলক সাহায্যে গ্রীন দেখাইয়াছেন অতি প্রাচীন কালে সমুদ্র কতকগুলি নতোদর রেখা (curved line) চিত্র নং ৬ দ্রষ্টব্য, আর প্রাচীন মহাদেশ ছয়টি উন্নতোদর (convex) রেখা সমন্বিত চিত্র নং ৭ দ্রষ্টব্য।

লোথিয়ান গ্রীন তৎমতবাদে ভূপৃষ্ঠাকৃতি ষষ্ঠাব টেট্রাহেড্রনের মতো নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার চব্বিশ পৃষ্ঠ যদি বক্র করা যায়, তাহা হইলে ইহা প্রায় গোলাক ধারণ করিবে।

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধ বিভিন্ন রকমের হইবার কারণ

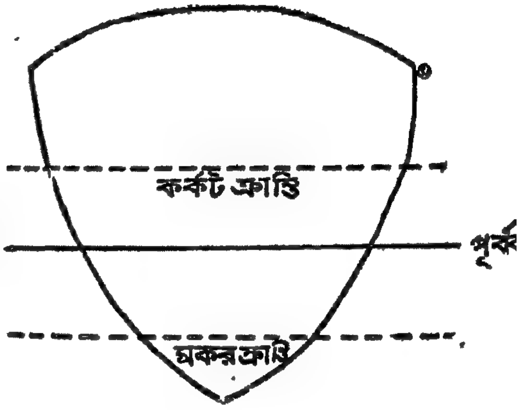

চিত্র নং ৭
অতি-প্রাচীন মহাদেশের আকৃতি—লোথিয়ান গ্রীনের অনুকরণে

টেট্রাহেড্রনের প্রকৃতি এক স্থানে উচ্চ হই তাহার বিপরীত ভাগ সমতল ও নিম্ন হইবে এক্ষণে দেখা যাউক, অধুনাতন বৈজ্ঞানিক ম সমূহের সম্মুখে গ্রীন মতবাদ স্থান পাই পারে কিনা।

উপরি-উক্ত গ্রীন মতবাদ বাউই (Bowie) পুটনাম (Putnam), হেফোর্ড (Hayford), ওল্ড হাম-(Oldham)এর তুল্যমান নীতি (Isostasy সুপ্রমাণিত করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বীয় স্ব সংরক্ষণ করিয়াছিল। আইসোষ্টেসীর (তুল্যমা নীতি) পরিকল্পনার পর আলফ্রেড ভেগনা (Alfied Wegener) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ভেগনা রিয়ান মতবাদে (Wegenreian Hypothesis বহুপ্রকার প্রমাণ যোগে দেখাইয়াছেন, বহু পূর্বে স্থলখণ্ড সমূহ একত্র ছিল; কালের অগ্রগতির সহিত উহার পরস্পর বিচ্যুত হইয়া আইসবের্গের মত ভাসিয়া গিয়াছে (চ)

(চ) এতদ সম্বন্ধে মল্লিখিত "আইসোষ্টেসী বা "তুল্যমা নীতি" প্রকৃতি—শীত ও বসন্ত সংখ্যা ১৩৩৭ সাল দ্রষ্টব্য।

বিচিত্রা

বৈশাখ, ১৩৪৩

উৎকণ্ঠিতা

সূচী-শিল্প

কুমারী শান্তি মিত্র

মাদাম কুরীর রেডিয়ম আবিষ্কারের পর হইতে ঐ সম্বন্ধে নানাপ্রকার নূতন তথ্য সংগ্রহ হইয়াছে। উক্ত রেডিয়ম তত্ত্ব সমূহ পৃথিবীর অন্তর ও বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। ভেগনার মতবাদের ভিত্তি এই সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে আরও দৃঢ় হইয়াছে। (ছ)

য়ুরেনিয়ম্ ও থোরিরম "রেডিয়ম সীসাতে" (Rad um-lead) পরিবর্ত্তিত হইতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তৎসময়ে হিলিয়ম রশ্মি বিচ্ছুরণের ফলে যে পরিমাণ উত্তাপ উদ্ভূত হয় তাহার পরিমাণ গণিত দ্বারা স্থির করিয়া অধ্যাপকে জে জলি (Professor J. Jolley) দেখাইয়াছেন যে নির্গমন পথ শূন্য হইয়া উত্তাপ তরঙ্গ বসুন্ধরার অভ্যন্তর ভাগে অবরুদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে; উপরি-উক্ত অবরোধ অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া ঘটিতে পারে না। ধীর সঞ্চিত উত্তাপ কিয়ৎপরিমাণে ভূস্তর নমনীয় করিতে ক্ষয়িত হইবে; কালের অগ্রগতির সহিত উপরি-উক্ত নীতি অবলম্বনে যে পরিমাণ উত্তাপ অবরুদ্ধ হইবে তাহার তুলনায় ক্ষয়িত অংশ অতি স্বল্প। এই প্রচণ্ড-তেজঃ শক্তিকে অভ্যন্তরে রাখিতে বসুন্ধরা অসমর্থা।

স্বীয় মদে.মত্ত উপরি-উক্ত প্রচণ্ড শক্তি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া স্বনির্গমন পথ ঠিক করিয়া লয়। তাহার ফলে ভয়ঙ্কর আগ্নেয় গিরি সমূহের সৃষ্টি হয়; ভীষণ ভূকম্প হয়; জল ও স্থলের সমাবেশের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ যত্রস্থানে অধুনা সামুদ্রিক প্রদেশ বর্ত্তমান তত্রস্থানে ভূখণ্ড আর ভূখণ্ডযুক্ত স্থান সমুদ্রমগ্ন হইবে।

এই খণ্ডপ্রলয়ে পার্থিব জীব ও বৃক্ষাদির ধ্বংস অনিবার্য্য। আর্থার হোলমস্ (Aurthr Holmes) দেখাইয়াছেন, উপরি-উক্ত খণ্ডপ্রলয় ৩,০০,০০,০০০ বৎসর পর-পর ভূকম্পের পর হইতে এতাবৎকাল ঘটিকাযন্ত্রের মত হইয়া আসিয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, যদিও টেট্রাহেড্রন মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে (apparently) ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থল ভাগের সমাবেশের সহিত চমৎকার ভাবে মিলিয়াছে,—তথাপি ক্রমশঃ উন্নততর অধুনাতন মতবাদ সমূহ বিশ্লেষণ করিলে উহার অনিশ্চয়তা সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণের নিকট প্রাঞ্জল হইয়া উঠিবে।

শ্রীজ্যোৎস্নাশঙ্কর ভাদুড়ী

(ছ) রেডিয়ম তত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লিখিত "পৃথিবীর বয়স" প্রকৃতি বসন্ত সংখ্যা ১৩৩৩ সাল দ্রষ্টব্য।

৺ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ, এফ জি এস্ মহাশয়ের অধিনায়কত্বে "ভূতত্ত্ব সমিতির" এক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল ও সমিতি ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যর্থ

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

আংটি কিনে আন্‌লাম,
পরাতে গিয়ে দেখি বড় ঢিলা,
তোমার আঙুলে রইল না।
মালাটি পরাতে যাব,
গেল ছিঁড়ে,
স্থান পেল্লনা তোমার গলায়।
চুম্‌কি-ঝলমলে মখ্‌মলের নাগরা,
পরাতে গিয়ে দেখি
—'পদপল্লব মুঁদারং'
পায়ে ঢুক্‌লনা।

জোৎস্নারাত্রি,
মাত্বর হাতে নিয়ে বল্লাম,
চল, ছাদে গিয়ে বসি,
একবার চাঁদের আলোয় ওই মুখখানি দেখব।
বল্লে, ঘুম পাচ্চে, আর সিঁড়ি ভাঙতে পারিনা।

তুমি কখনো বড়, কখনো ছোট,
কেবলই আমার মাপে হয় ভুল।
বাঁধতে গেলে ছিঁড়ে যায় ডোর,
ফুলেরই হোক আর বাহুরই হোক্‌।
কাছে থাক নাগালের বাহিরে।

তোমার বেহালার কানগুলো ঢিলে,
যতবার স্বরে বাঁধি
স্বর যায় নেমে।
আবার বাঁধি,
তার যায় ছিঁড়ে।
যে স্বরটা রইল আমার কানে,
ফুটলনা তা তোমার যন্ত্রে।

প্রতীক

শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

কচি বাঁশঝাড়টা দুল্‌ছে বাতাসে।
দেখছি, কেবল দেখছি।
সন্ধ্যাবেলা,
ফুর্‌ফুরে হাওয়া
আর বাঁশঝাড়টির পিছনে তৃতীয়ার চন্দ্রকলা।

একখানি ছবি।
কিন্তু ছবি ত নয়, ছবি কি দোলে?
ঝাপসা চোখে দৃষ্টি ফুটল।
দেখি তুমি, সেই তুমি!
সেই তন্বী দেহলতা,
স্নিগ্ধ শ্যামল সুকুমার।
সেই হাসি,
যে হাসি জমিয়ে হয়েছে ওই চাঁদের কণা।

কানামাছি খেলা

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

১

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে; অন্দরের দিকের উঠানে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কোলাহল সহকারে কানামাছি খেলিতেছিল।

পঞ্চা, শ্যামলী কেষ্টা, বুলি, হীরু এরা তো আছেই, সঙ্গে প্রতিবেশী পাঁচ ছয়টি আসিয়া জুটিয়া খেলাটা জমাইয়া তুলিয়াছে। উচ্চ হাসি চীৎকার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে বাড়ীখানা তোলপাড়; মহা সমারোহ দেখিয়া তিন বছরের খুকীটা পর্য্যন্ত আসরে নামিয়া পড়িয়াছে। তারই উৎসাহ এবং বীরত্বটা যে বেশী, সেটা দেখাইতে গিয়া সকলের সঙ্গে সমানে ছুটিবার চেষ্টায় ঢিপঢাপ পড়িতেছে। গড়াগড়ি খাইয়াও কিন্তু মুখে বলে, ভোঁ-ভোঁ।

শ্যামলী এদের মধ্যে বড়, বয়স বারো তেরো। সে প্রথমে খেলায় যোগ দেয় নাই; কিন্তু পঞ্চাটা কিনা বেজায় ডান-পিটে, ক্ষণে ক্ষণে নিজের খুসীমত খেলার আইন কানুন ভাঙ্গে গড়ে, তাই বড় দিদিকে সর্দ্দার হিসাবে নামিতে হইয়াছে।

চোখবাঁধা কানামাছি খেলাটি কিন্তু ভারি চমৎকার। বয়স্কগণের অনেকে বিভিন্ন প্রাঙ্গণে এই খেলা খেলিয়া থাকেন; —ভাল করিয়া নিজের চোখ বাঁধিয়া ভগবান পাকড়ো করিবার মানসে কানামাছি হইয়া দাঁড়ান, আর চারিদিক থেকে খোঁচা চিমটী খাইয়া নৃত্য করেন। লোকে দেখিয়া মজা পায়, হাসে আর হাততালি দেয়। কেউ বা বলে ভাব হয়েছে।

উপস্থিত দলের মধ্যে পঞ্চাটা বৈদান্তিক। তাকে প্রায়ই কানামাছি করা যায় না, ছলে বলে কৌশলে সে এড়াইয়া চলে। এবারে কিন্তু দিদির ন্যায়ানুশাসনে সে ধরা পড়িয়া গেল। বুলির ছিল চোখ বাঁধা, পঞ্চা একটিপ নস্য আনিয়া তার নাকে গুঁজিয়া দিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গেল। নস্য যথাস্থানে পৌছিয়াছিল কিন্তু বুলি ফ্যাঁচর ফ্যাঁচর করিতে করিতেও তাঁকে ছাড়িল না। পঞ্চা হইল চোর।

শ্যামলী আচ্ছা করিয়া তার চোখ বাঁধিয়া উঠানের মাঝ-খানে দাঁড় করাইয়া দিয়া সরিয়া গেল। দুর্দ্দান্ত পঞ্চুকে এবার কায়দায় পাওয়া গিয়াছে—চোরের দশ দিন আর সাধুর একদিন। সাধুর দল হল্লা করিয়া পঞ্চার চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। ডাহিনে বামে পিছনে সুমুখে চারিদিক থেকে খোঁচা চিমটি ও কিল খাইয়া কানামাছি ক্ষিপ্ত হইয়া ভালুক নাচ সুরু করিল, কিন্তু কাহারও নাগাল পাইল না। শ্যামলীর কড়া শাসন, নতুবা এতক্ষণে সে খেলার আইন কানুন উল্টাইয়া দিত।

বারান্দায় মা কাকীমার দল দর্শক হিসাবে থাকিয়া খেলায় উৎসাহ দিতেছিলেন। একধারে ঠাকুরমাও আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি, অতখানি বয়স সত্ত্বেও দিব্যি সুশ্রী, কপাল সিন্দুরসৌভাগ্যে উজ্জ্বল, পরিধানে রাঙ্গাপেড়ে মটকার সাড়ী।

পঞ্চার দুরবস্থা সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরমার মনে হইল, এই অবসরে তাকে একবার আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দিয়া আসি। এই সদিচ্ছার একটু কারণ ছিল, আজই দুপুর বেলা ঠাকুরমার পূজার ঘরে ভোগের সন্দেশ-গুলি উৎসর্গ হইবার পূর্ব্বেই আশ্চর্য্য রকমে অন্তর্ধান লাভ করিয়াছিল। এই ঘটনার সহিত নীচের ঘরে অঙ্ক কষিতে নিবিষ্টচিত্ত পঞ্চুর কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করা গেল না, "প্রমাণা-ভাবাৎ।" কিন্তু ঠাকুরমার কিনা বড় নোংরা মন, তিনি অযথা অন্যথা ভাবিলেন। বুড়ীটা বরাবরই পঞ্চুর শত্তুর।

আজ ঠাকুরমাকে দুর্গ্রহে টানিতেছিল। তিনি উঠানে নামিয়া পড়িলেন দেখিয়া খেলোয়াড় দল আরও উৎসাহে চেঁচাইতে লাগিল। পঞ্চুর সতর্ক কর্ণ, ব্যাপারটি আঁচ করিয়া নিয়া ভাবিল, রোসো বুড়ীকে মজা দেখাচ্ছি।

পঞ্চু মাথা কাত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া স্থির দাঁড়াইয়াছিল। ঠাকুরমা শ্যামলীকে ভর করিয়া হাতটি বাড়াইয়াছেন মাত্র অমর সেইক্ষণে পঞ্চা অতর্কিতে তার দিকে লাফ দিল। বুড়ী পালাইতে পারিল না, কান মলাটাও ফসকাইয়া গেল। নিমেষ মধ্যে পঞ্চা চোখের বাঁধ টানিয়া ফেলিল।

ছেলে মেয়েগুলি হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল, ঠাকুর মা এবারে কানামাছি! ক্ষুদে খুকীটা পর্য্যন্ত তার পায়ের কাছে গড়াইয়া বলিল, ভোঁ-ভোঁ।

বৃথাই তিনি রেহাই পাইবার ভরসায় মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কোনো কথা শুনিলনা। মা কাকীমার দলও কোনো ওকালতি করিলেন না।—বিপত্তিকালে ঠাকুর-মার মনে পড়িল না যে তাঁর ভাগবতখানার মধ্যেই আছে যে কর্ম্মফল নিরোধ করিবার ক্ষমতা ভগবানেরও নাই।

শ্যামলী ঠাকুরমাকে কানামাছি বানাইয়া যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া দিল, সবাইকে সাবধান করিয়া দিল, কেউ ধাক্কা দিসনে যেন।

এমনতর কানামাছি পাইয়া খেলোয়াড় দল তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল। এতক্ষণ ছিল নিত্যকার ব্যাপার তাই বাঘা এতে কোনো পার্ট নেয় নাই। এবারে অভিনব কানা-মাছি দেখিয়া সেটাও ঘেউ ঘেউ করিয়া সলম্ফে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। মা কাকীমার দল হাসিতে লাগিলেন, ঝি ছুটিয়া আসিয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক এই সময়ে কি মনে করিয়া শ্যামলী ছুটিয়া বৈঠক-খানার দিকে চলিয়া গেল, অত গোলমালের মধ্যে কেহ সেটা লক্ষ্য করিলনা। নাতি নাতিনীর দল ঠাকুর মাকে চৌকা দিয়া সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু পঞ্চা কসিয়া কসিয়া কয়েকটা চিমটি কাটিয়া গেল। ঠাকুর মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, পঞ্চার উদ্দেশে তালব্য শকার উচ্চারণ করিলেন। মা ডাকিয়া বলিলেন, ওরে পঞ্চা মারিস্ নে!

মিনিট দুইয়ের মধ্যেই দেখা গেল ভক্তি দিদি যেমন জ্ঞান দাদাকে টানিয়া আনেন তেমনি কিশোরী শ্যামলী কশ্চিৎ পক্ক কেশ বৃদ্ধ নাগরকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিতেছে। ইনি এ বাড়ীর দাদামশাই, শান্ত শিষ্ট এবং তুষ্ট, সদা চশমাধারী, সারা মুখ নিবিড় শ্বেত জঙ্গলাকীর্ণ; নাতি নাতিনীদের চাল চরিত্র দেখিয়া শুনিয়া সদাই অবাক হইয়া হাঁ করিয়া থাকেন। তাইতেই লোকে টের পায়, ঐ জঙ্গলে এক গহ্বর আছে; সেখান থেকে মাঝে মাঝে বরিশাল গান-এর মত ধ্বনি শোনা যায় এ হুঁম।

দাদামশাইকে দেখিয়া খেলোয়াড়েরা অভাবিত এবং আশু-ভাবী কৌতুক অনুমান করিয়া "গান্ধী মহারাজের জয়" কীর্ত্তন করিল। মা কাকীমার দল মুখ ফিরাইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। কানামাছি কিন্তু এর বিন্দু বিসর্গ টের পাইল না।

এক পাটি চটি পায়ে আচমকা এরূপভাবে ছুটিয়া আসিয়া দাদামশাই হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্যামলী তাঁহার কাছাটা যথা স্থানে রোপণ করিতে করিতে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। বৃদ্ধ কানামাছির দিকে দৃষ্টি দিয়া মুখ বুজিলেন, অর্থাৎ উক্তি করিলেন, এঁ হুঁম!

শ্যামলী ওষ্ঠে আঙ্গুল ঠেকাইয়া তাকে নীরব থাকিতে হুকুম করিল, এবং হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া দণ্ডায়মানা মক্ষিকার গায়ে ঠেলিয়া দিল। একটা কিছু গায়ে ঠেকিতেই ঠাকুর মা ফিরিয়া দাদাকে ধরিলেন এবং সোল্লাসে বলিলেন, এই বার ধরেছি।

পরক্ষণেই কোলের নাগরকে ছাড়িয়া দিয়া চোখের বাঁধন টানিয়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন কে রে মিনসে?—

দাদামশাই ততক্ষণে যতদূর সাধ্য জিভ বাহির করিয়া বিকট ভেংচি কাটিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া আছেন। নাতি নাতিনীগণ করতালি সহযোগে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল। ঝি টা হী হী করিতে করিতে বারান্দা থেকে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেল।

চোখ রগড়াইয়া ঠাকুর মা চাহিয়া দেখিয়া পিছুনে ফিরিলেন বলিলেন, মরণ আর কি! কিন্তু হাসি চাপিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধ দম্পতির চোখোচোখি হইল, আর সেই মুহূর্ত্তে তাঁদের উভয়ের জীবন থেকে দীর্ঘ একখণ্ড কাল প্রবাহ—যার পরিমাপ ৪৫ বৎসর,—সমগ্র ধারা পথ ও স্মৃতি তরঙ্গ সমেত বিলুপ্ত হইয়া গেল। যুগপৎ উভয়ের চোখের উপর একটা মধুরোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল, দুজনারি নবীন বয়সের খেলা,—সে অনেক দিনের কথা।

২

৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই দাদামশাই ছিলেন একটি একুশ বছরের নবীন গৌরকান্তি যুবক, এবং ঠাকুরমা ছিলেন তাঁর নব পরিণীতা কিশোরী পত্নী। অনাদিকাল থেকে নরনারী এমনি বয়সে যে খেলা খেলিয়া আসিতেছে এই সহরে তাঁহারা সেই খেলারই পত্তন করিয়াছিলেন।

সেটাও দুটীতে মিলিয়া কানামাছি খেলা। একজন চোখ বাঁধা অপরকে ধরিতে যায়, এবং সে কানামাছিকে এদিকে সেদিকে মধুর মদির পরশ দিয়া খোঁচা মারিয়া, কখনও বা আদর চুম্বন করিয়া সরিয়া সরিয়া যায়। কোথাও ধরা দেয় কোথাও দেয় না এই-ই তাদের খেলা। দুটীর মধ্যে কোন পক্ষ কানামাছি হইয়া দাঁড়ায় সেটা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নিয়তির বিভিন্ন কল্পনা। এই খেলাটি লইয়াই যত রাজ্যের মজার কথা জমিয়া ওঠে।

শ্রীমতী কিরণময়ী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী, বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী; তখনকার এই ছোটখাট সহরটির মধ্যে বিখ্যাত মেয়ে। সবাই তাহাকে চিনিত, প্রথম কারণ অমন সুন্দরী মেয়ে, তখন বড় একটা দেখা যাইত না। দ্বিতীয়ত তার প্রকৃতিটি অতীব দুর্দ্দান্ত এবং একগুঁয়ে, এই পরিচয়টি পাড়া ছাড়াইয়া দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল; ইস্কুলে তার নষ্টামি দুষ্টামির অন্ত ছিল না। অনেকদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গনস্থ গাছ থেকে তাকে নামাইয়া ক্লাসে নিতে হয়, এরূপ নালিশ বাড়ীতে পৌঁছিয়াছে; আর মারামারি ছুটোপুটি মেয়েদের গায়ে মাথায় কালী ঢালিয়া দেওয়া, এ সব তো নিত্যকার ব্যাপার। তবু এসব দৌরাত্ম্য কর্ত্তৃপক্ষ খুসী মনে সহিয়া যাইতেন কারণ এই সহজ দুরন্ত মেয়েটি লেখাপড়ায় ছিল ইস্কুলের মধ্যে সেরা। সকলের কাছে একদিনের জন্য সমাদর প্রশংসা লাভ করিতে গিয়া অপর দিকে যথোচিতটা তার অদৃষ্টে আর ঘটিয়া উঠিত না।

এই মেয়েটির বিবাহ ব্যাপারটা ঘটিল ভারি অসঙ্গত সময়ে। ঠিক বার্ষিক পরীক্ষার মুখে পরীক্ষা আরম্ভ হইবার মাত্র দুই দিন আগে বিবাহের তারিখ ঠিক হইল। বরপক্ষের নাকি এই শুভদিন নহিলে চলিবেই না, কাজেই সব আপত্তিই নিষ্ফল হইল।

মা বাবা বলিলেন, থাক্ পরীক্ষা, হক' আগে বিয়ে। কিরণময়ী জিদ করিয়া বলিল, পরীক্ষা সে দিবেই, তারপরে যা হয় হউক। অবশেষে একটা রফা হইল যে বিবাহ বাসিবিবাহ হইয়া থাক, ফুলশয্যার দিন থেকে মেয়ে গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিবে। পরীক্ষা তো চারিটি দিন মাত্র।

বর নবগোপাল হষ্টেলে থাকিয়া এখানকার কলেজে বি-এ পড়ে। ধীর শান্ত ছেলেটি, বেশ বুদ্ধিমান, কিন্তু একেবারে ভাল মানুষ। কথার আয়োজন তার বেশী নাই, হাসি দিয়া ক্ষতি-পূরণ করিয়া লয়, হাসিটুকু স্বাদু অকৃত্রিম।

বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রিতে নানা গোলমালে উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তার কোনো সুযোগ হয় নাই। শুভদৃষ্টির কালে বহু বাজে লোকের নিরর্থক উৎসুক দৃষ্টি কাটাইয়া নব-গোপাল দুষ্টামিভরা চাঁদপানা একখানি মুখ ক্ষণিকের তরে দেখিতে পাইয়াছিল। হাতে হাত রাখিবার কালে অন্যের অলক্ষ্যে সে কোমলস্পর্শ হাতখানিতে একটি চিমটি কাটিল, সেটা ফেরত পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

বাসিবিবাহের দিন তো এমনি বরকনেতে সাক্ষাৎ হয় না, সেদিনও চলিয়া গেল। ফুলশয্যার দিনে কিরণ লালচেলী ছাড়িয়া, গাঁটছড়ার কি কি আনুসঙ্গিক উপচার সাড়ীর কোণে বাঁধিয়া কপালে সিন্দুর শোভা এবং বিবাহোৎসবের আনন্দ-সৌরভ বহন করিয়া ইস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেল। অপরূপ সজ্জা দেখিয়া কিন্তু কেহ ভরসা করিয়া কোন মন্তব্য করিল না, —যে দুর্দ্দান্ত মেয়ে।

বন্ধুদের কেহ কেহ নবগোপালকে বলিল, চলনা ভাই, বালিকা ইস্কুলের সামনে বেড়িয়ে আসি। নবগোপাল বলিল ছি!

রাত্রে ফুলশয্যার উৎসব। নবগোপাল কোনোমতেই একথাটা কিন্তু কল্পনা করিতে পারিল না যে তাদের প্রথম কথাবার্ত্তা কিরূপভাবে সুরু হইবে। গল্পে এবং ভুক্ত-ভোগী বন্ধুদের মুখে নববধূকে কথা কহাইবার কতরকম ইতিহাসই সে শুনিয়াছে; যথা নাম ধাম জিজ্ঞাসা (ধামের এখানে মানে, কি পড়, কোন ইস্কুলে ইত্যাদি), বাসরঘরের মেয়েদের রূপের প্রশংসা, বধূর পিতৃকুলের কার্পণ্যের জনরব, বরপক্ষের প্রতি অভদ্রতার অভিযোগ,

তারপরে জোর করিয়া মুখ তুলিবার চেষ্টা করা। একবন্ধু বলিয়াছেন, ঠিক জোর করা লাগে না, জোরের ভাণ করিতে হয়, এটা নাকি অব্যর্থ, বধূ নিশ্চয়ই যাঃও বলিবে। একটা বুড়ো বলিয়াছিল, পায়ে ধরিতে হয়, নবগোপাল সেটা আমলে আনে নাই। তার বেলা কোন্‌টা খাটিবে ?

বাস্তব যেটা ঘটিল সেটার সঙ্গে কিন্তু সঙ্গত অসঙ্গত কোনো কল্পনারই সামঞ্জস্য রহিল না। নানাবিধ বিচিত্র পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত একটি ছোট ঘর, উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত। তার একপাশে পালঙ্কের উপর শয্যা, ফুলের আস্তরণে ঢাকা,—আর তাহার একপাশে ঘরখানি বিলকুল কৃত্রিম শোভা বিমানীকৃত করিয়া একটী কিশোরী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে নীচুদিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। নবগোপাল সেদিকে চাহিয়া পিছনে দ্বার বন্ধ করিতেই ভুলিয়া গেল। বাহিরের দিকে ঠুন্ ঠুন্ এবং চাপা-হাসির আওয়াজ পাইয়া তার চমক ভাঙ্গিল, ফিরিয়া কপাট বন্ধ করিয়া আবার দাঁড়াইল।

কিরণ অপরাপর মেয়েদের মত নয়। সে নব পরিণীতার লজ্জায় অভিনয় বেশীক্ষণ রাখিতে পারিল না, মুখ তুলিয়া চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া রাখিল।

নবগোপাল হাসির ভরসা পাইয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু কথা বলিতে গিয়াই থামিয়া গেল। কিশোরী বধূ নিজের ওষ্ঠে তর্জ্জনী তুলিয়া তাহাকে নির্ব্বাক থাকিতে ইঙ্গিত করিতেছিল, এমনি অসঙ্কোচ ভাব, যেন তাদের মধ্যে হাসি ও খেলা অনেক কাল থেকে চলিয়া আসিতেছে। বধূটীর চোখেমুখে দেখা গেল দুষ্টামির হাসি। নিমেষ মধ্যে লঘুগতিতে সে শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল, নবগোপাল ভাবিল, এ আবার কি কাণ্ড !

বধূ সেল্‌ফ্ থেকে একটা আলতার শিশি নামাইয়া লইয়া টেবিলের উপরের জলভরা গ্লাসের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকটা ঢালিয়া দিল। তারপরে গ্লাসটি লইয়া সন্তর্পিত পদে জানালার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। এতক্ষণে নবগোপাল বুঝিতে পারিল ব্যাপারখানা কি। জানালার ওপিঠে খুট্ খাট্ ফিস্ ফাস্ শব্দ সেও শুনিতে পাইল, কান তার সতর্ক হইয়া গিয়াছে।

জানালাটা অকস্মাৎ খুলিয়া গেল এবং পলকমধ্যে কিরণের হাতের আলতা গোলা জল বাহিরে বৃষ্টি হইয়া গেল। জানালা তখনি বন্ধ করিয়া নববধূ ফিরিয়া নবগোপালের দিকে চাহিয়া আবার হাসিল ; কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, কেমন জব্দ করেছি, দাঁড়াও হাতটা মুছে নিই !

এইভাবে বর বধূর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল ; নববধূকে সাধাসাধি লাগিল না। সেই বুড়োর কথাটা তো নবগোপাল আমলেই আনে নাই, তবু, কথাটা কি,—লোকে ভূতকে আমল দেয় না অথচ ভয় এড়াইতে পারে না।

বলিয়াছি নবগোপাল বক্তা মোটেই নয়, শ্রোতা হিসাবে সুদুর্লভ। সে মুগ্ধ হইয়া কিরণের অসঙ্কোচ কথাবার্ত্তা শুনিতে-ছিল। কোন্ বিষয়ে এত কথা ? তা, বিষয়টা এখানে মোটেই মুখ্য নয়, আর তার অভাবই বা কি আছে,—এই ধর, বাড়ীর সকলের কথা, পাশের বাড়ীর বৌদিদির কথা, বরের সঙ্গে তার কি কথা হয়, সেটা সঙ্গীদের যথাযথ বলিতে হইবে, মাথার দিব্যি,—সেকথা, সে যে ভয়ঙ্কর দুষ্ট মেয়ে পাড়াময় এই সুখ্যাতি, মায় ইস্কুলে পর্য্যন্ত—সে কথা, তার মোটেই লজ্জা সরম নাই, সেজন্য সে বরের কাছে পাইবে খোঁপা নাড়া, আর শাশুড়ীর হাতে খাইবে ঠোনা, ঠাকুরমা বলিয়াছেন, সেই আশঙ্কার কথা ইত্যাদি অনেক কথাই কিরণ বলিয়া গেল।

এরই মধ্যে কখন যে নবগোপাল আনমনা কিশোরী বধূকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া সম্রাট হইয়া বসিয়াছে, সেটা কিরণের খেয়ালই হয় নাই, তার কাছে এটা যেন নেহাৎ স্বাভাবিক ব্যবহার,—এরূপ হইয়াই থাকে। নবগোপাল একবার বধূর মাথার কাপড়টুকু সরাইয়া ফেলিবার দুষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ধরা পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা আপনা আপনি খসিয়া পড়িল,—কেননা এমনটী হইয়াই থাকে।

এখন, একজনের কথা শুনিতে গেলেই তার দিকে তাকা-ইতে হয়, তাই নবগোপাল কিরণের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কোনো অপরাধ করে নাই, এরূপ হইয়াই থাকে। কিন্তু হঠাৎ কিরণ মুখ ফিরাইয়া বলিল, যাঃও !—

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল কি হ'ল ?

কিরণ উত্তর করিল, লজ্জা করেনা বুঝি !

অপরাধ যে কি এবং কোথায় সেটা কোনো পক্ষই স্বীকার পরিষ্কার করিল না কিন্তু সন্ধি হইতে বিলম্ব হইল না। সমাস হইলে সন্ধিটা নিত্য (binding) হইবে তো !

কিরণ আজকের পরীক্ষার কথা বলিতেছিল, মুখ তুলিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা কানামাছি খেলাকে ইংরাজীতে কি বলে? এটা আজ আমাদের ট্রানশ্লেসনের মধ্যে ছিল। আমরা খুব কানামাছি খেলি কিনা, তাই বোধ হয় হেড মিসট্রেসের এটা মনে হয়েছে।

কিরণ কি লিখিয়া আসিয়াছে সেটা নবগোপাল আগে শুনিতে চাহিল। কিরণ বলিল, আমি তো বানিয়ে নিয়েছি playing the blind fly;—হয়েছে?—ওকি, ছি!

ইংরাজী কথাটী গোলাপের পেলবদলের উপর দিয়া কেমন ভাবে পাদচারণা করিয়া গেল দেখিয়া নবগোপাল একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল, সেটার পুনরাবৃত্তি নিষেধ করিতে কিরণ মুখের উপর হাত দিয়া রাখিল। নবগোপাল Blind man's bluff কথাটি বধূছাত্রীকে শিখাইয়া দিল সে দুঃখিত কণ্ঠে বলিল,—তাইতো একটা ভুল হয়ে গেল: তা ক্লাসের কেউই এটা লিখতে পারেনি।

এইভাবে কথা বলিতে ও শুনিতে গিয়া অনেকখানি রাত হইল। কিরণ হাই তোলা হাতে চাপিয়া শেষে বলিল, ঘুম পাচ্ছে, কাল আবার পরীক্ষা, ভাবছিলাম ব্যাকরণটা একবার দেখে রাখব,—বুড়ো পণ্ডিত মশাই যে উদ্ভট্টি প্রশ্ন দেন,—তা সেটা তো খুব হ'ল!

বিছানাময় ফুল বিছানো, হাত দিয়া সেগুলি সরাইতে সরাইতে বধূ বলিল,—ভাবছি ঠাকুরমার কথাটাই বুঝি সত্যি।

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, কি বলেছেন তিনি?

কিরণ বলিল, বলছিলেন, পূর্ব্বজন্মের পরিচয় থাকে নইলে—

নবগোপাল হাসিয়া কহিল,—নইলে—কি?

কিরণ বলিল, যাও-বল্‌ব না। একটু থামিয়া বলিল, —সত্যি, নইলে আমি তো এত কথা আর কারু সঙ্গে কোনো দিন বলিনি! এবার কিন্তু সত্যি ঘুম পাচ্ছে। বাস্তবিকই তার চোখ ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল।

৩

কিরণের পরীক্ষা আরও তিন দিন ধরিয়া হইল। এ কয়দিন নবগোপাল দিনমানে বরযাত্রীদের সহিত থাকিয়া সেখান থেকেই কলেজ করিতেছিল। বধূর পরীক্ষা হইয়া গেলে পরের দিনই তাকে লইয়া স্বকীয় গ্রামে যাত্রা করিবে এইরূপ কথা হইয়াছে।

শেষদিন কিরণময়ীর পরীক্ষা একবেলাতেই সারা হইয়া গিয়াছিল। ২টার পরে সে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও সমবয়স্কাদের কাছে বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। তাদের ভরসা জানাইয়া আসিল, শীঘ্রই সে ইস্কুলে ফিরিবে, পড়াশুনা বন্ধ কোনো মতেই হইবেনা ইত্যাদি।

বাড়ীতে সমবয়সী পাড়ার মেয়েরা তাকে ধরিয়া বসিল, কাল তো ভাই তুমি চলেই যাচ্ছ, কবে আবার দেখা হবে, আজ এই বেলা একবারটী তোমার সঙ্গে খেলব।

কিরণ স্বীকার করিল; সঙ্গিনীদের মুখে 'কবে দেখা হবে' কথটা শুনিয়া তার মনটা কেমন করিয়া উঠিয়াছিল। আজ সে-ই প্রথম বারে কানামাছি হইতে রাজি হইল। এ অনুগ্রহ এযাবৎ আর সে দেখায় নাই।

বিবাহের গোল মিটিয়া যায় নাই, আত্মীয় কুটুম্বে তখনও বাড়ীখানি ভরা, কাজেই সমবয়সী খেলার সাথী অনেক মেয়ে জুটিয়া গেল। বিস্তৃত উঠানের মধ্যে সকলে আসিয়া সমবেত হইল। বিবাহোৎসবের নিশান লইয়া কলাগাছগুলি তখনও এক পাশে সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।

রঙীন সাড়ীখানি ময়ূরকণ্ঠী গরদের জ্যাকেটের উপর দিয়া ঘুরাইয়া আঁট করিয়া লইয়া কিরণ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; তার চোখ বাঁধা হইল;—কলহাস্যমুখর সঙ্গিনীগণ তাকে ঘিরিয়া ছুটাছুটি সুরু করিল। অভ্যাগত অনেক দর্শক জুটিয়া গেল।

ঠিক এমনি সময়ে অভাবিতভাবে নবগোপাল সে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কানামাছির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। এইমাত্র কলেজ থেকে সে Midsummer Nights Dream পড়িয়া আসিয়াছে, এ কথটাই প্রথমে তার মনে খেলিয়া গেল কেন? থাকিবে, না ফিরিয়া যাইবে, সেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিল, পিছু ফিরিতে তার মন সরিতেছিলনা।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে পলায়নের চেষ্টা করিল, কারণ, দেখিতে পাইল, দুতিনটী কিশোরী কলহাস্যসহকারে ইতিমধ্যেই তাহাকে তাড়া করিয়াছে। বাহিরে বারান্দা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সে ধরা পড়িল, ভাবিল, মেয়েগুলো কি রকম ছোটে দেখ,

যেন পক্ষিরাজ ঘোড়া! হাস্য কলরবের মধ্যে বেচারা কিরণ এসব কিছুই টের পাইলনা।

দুইধারে দুই কিশোরী সিপাহী ধৃত পলাতকসহ আসিয়া ক্রীড়াঙ্গনে হাজির হইল। ব্যাপার দেখিয়া শাশুড়ী সম্পর্কান্বিত দর্শকগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছন ফিরিতে হইল।

শান্তশিষ্ট চোর বর চুপচাপ রহিল। অতগুলি মেয়ে ফৌজের মধ্যে তার লড়াই করিবার উৎসাহ ছিলনা। এমন কি কানামাছির দিকে চাহিয়া দেখিবার ভরসা'ও তার রহিল না।

মেয়ে সিপাহী দুটী তাকে কিরণের সন্মুখে আনিয়া 'কানা-মাছি ভোঁ-ভোঁ' বলিয়া একেবারে তার গায়ের উপর ঠেলিয়া দিল। কিরণ অমনি দুহাতে তাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। তরুণীদল হাসির হিল্লোলে উলট পালট খাইতে লাগিল।

আসামী ধরিবামাত্র কিরণের কেমনতর ঠেকিল, কিন্তু ছাড়িয়া দিলনা। ডান হাতে তাকে ধরিয়া রাখিয়া বাম হাতে চোখের বাঁধন নামাইয়া ফেলিল।

দুজনে দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল,—ক্ষণকালমাত্র,—চোখ বাঁধার আবেশ কাটিতে যতটুকুকাল লাগিল। এদিকে আকাশে বাতাসে একটা জমাট কৌতুক পরিহাস ভাঙ্গিয়া পড়িবার প্রতীক্ষায় নিমেষ গণিতে ছিল।

পরক্ষণেই আকস্মিক একঝলক রক্ত আসিয়া কিরণের মুখখানি আরও রাঙা করিয়া দিল আর সে ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

* * * *

ঠিক এই দুজনে, কিশোরী কিরণময়ী ও যুবক নবগোপাল আজ ঠাকুর মা এবং দাদা মশাই সাজিয়া সেই পুরাতন খেলা-টাই খেলিয়া দেখাইলেন। এরাই যে ওরা সেটা সহজে মালুম না হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। ৪৫ বৎসর ধরিয়া ঝড় বাতাসে কতধূলি বালি উড়িয়া এদের সাজ সজ্জায়, বুকে মুখে পড়িয়া এদের একেবারে ভিন্নমূর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এরা যে ওরাই সেটা বরাবরই ঠিক আছে নইলে সেই খেলাটি হইল কেমন করিয়া?

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

দেবদাস

শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী

পথেই তোমার রইল প'ড়ে
তোমার পথের ধূলো—
পুড়িয়ে দিল সব কালিমা
প্রিয়ার দেশের চুলো!
লক্ষ্মী তোমার পায়ে ঠেলা,
পঙ্কে কর সোনার ডেলা,
অবহেলার নিঠুর খেলায়
আপন ভাঙন খুলো!
জীবন তোমার মরণ শুধু—
মরণ জাগরণ—
পরাজয়ের বিজয় নিশান
তোমার আহরণ;
নিজেই নিজের আন্‌লে গালি—
নিজের মুখে মাখ্‌লে কালি—
প্রাণের দরদ,—পায়না যা কেউ,—
তাই তোমারে ছুঁলো।
প্রিয়ার মুখে ছিপের বাড়ি
নিজের বুকের দাগে—
মত্ত নেশায় রাখ্‌লে ঢাকি,
রক্ত অনুরাগে—
কিন্তু সে যে আসল সোনা,
দরদীর তাই ভুল হোলো না,—
যাত্রাপথের পাথেয় তার
তোমার পায়ের ধূলো
পথেই তোমার রইল প'ড়ে
তোমার পথের ধূলো,
কল্যাণীদের চোখের জলে
নিবুক তোমার চুলো।

বিশ্ব-প্রকৃতি

শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিজি দ্বীপের প্রাচীন রাজবংশ

গত শতাব্দীতে ফিজি দ্বীপের আদিম অধিবাসিদের মধ্যে এমন দুজন লোকের আবির্ভাব হয়েছিল যে সারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে তাদের জুড়ি কেউ আর খুঁজে পাবে না। একজন হচ্চেন টোঙ্গা দ্বীপের রাজা প্রথম জর্জ্জ টুবু এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পকালস্থায়ী ফিজি রাজ্যের রাজা থাক্‌ওম্বু। হাওয়াই দ্বীপের সোমারি জাতিদের মত ইঁহারাও বুঝেছিলেন যে খ্রীষ্টান মিশনরীদের সঙ্গে মিলে মিশে না চলতে পারলে ক্ষতি ছাড়া লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। মিশনরীদের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করবার জন্যেই এঁরা সুযোগ বুঝে খ্রীষ্ট ধর্ম্মগ্রহণ করেন। মিশনরীরাও বুঝতে পেরেছিল যে ফিজি দ্বীপে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের সাফল্য নির্ভর করচে এদের ক্ষমতাবিস্তারের ওপর। তাই এঁদের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তারাও যথেষ্ঠ সাহায্য করেছিল।

মিশনরীদের সাহায্যে এবং সম্মতিক্রমে রাজা থাক্‌-ওম্বু ১৮৭১ সালে সমগ্র ফিজি দ্বীপের রাজত্ব গ্রহণ করেন এবং সিংহাসনে আসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নামে নোট প্রচলন ও কর আদায় আরম্ভ করেছিলেন।

প্রথমতঃ থাক্‌-অম্বু ছিলেন ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মাবাউ দ্বীপের বংশানুক্রমিক মণ্ডল। তাঁর স্থানীয় উপাধি ছিল 'ভু-নি-ভালু' অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা। মাবাউ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, ফিজি দ্বীপের বর্ত্তমান প্রধান বন্দর ও রাজধানী সুভা থেকে আঠারো মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। 'ভু-নি-ভালু' উপাধিধারী রাজবংশ বহুকাল ধরে এখানে রাজত্ব করে আসছিল। এরা ছিল নরমাংসভোজী মাবাউ জাতির সর্দ্দার এবং নিকটবর্ত্তী কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপের সর্দ্দারদের কাছে চিরকাল কর গ্রহণ করে এসেচে। এই মাবাউ দ্বীপ প্রচলিত কথ্যভাষা বর্ত্তমান ফিজি ভাষার মেরুদণ্ড। নরমাংস ভোজনের সুবিধা আজকাল আর না হোলেও মাবাউ জাতি তাদের অনেক পুরাতন আচার ব্যবহার বজায় রেখেচে। মাবাউ

উত্তপ্ত পাথরের উপর রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া রাঁধিবার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র হাঙ্গরকে পাতায় মোড়া হইতেছে

দ্বীপের রাজধানী মাবাউ সহর, সহরের (কাজে ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র) পশ্চিমপ্রান্তে বড় একটা পাহাড়ের ওপর মিশনারীদের বাসস্থান এবং পাহাড়ের তলে, রারা বা সবুজ তৃণভূমিতে যেখানে পূর্ব্বে উৎসব উপলক্ষে নরমাংস ঝলসান হোত ওয়েস-

মাবাউবাসী জনৈক বৃদ্ধ ফিজিয়ান

লিয়ান মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের গির্জ্জা অবস্থিত। মিশনরীদের কড়া শাসনে এখন বাৎসরিক উৎসবের সময় অবিবাহিত যুবক যুবতীদের যে নাচ হয়, তাতে বাজনার সুর পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান স্তোত্র গানের সুরের অনুকরণে বাঁধা, মেয়েদের পোষাক পরতে হয় লম্বা গাউন যাতে গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে।

মাবাউ দ্বীপটী ছোট, সমস্ত দ্বীপের বর্গফল মাত্র বাইশ একার, তার আবার অর্দ্ধেক জুড়ে আছে পশ্চিম প্রান্তের বড় পাহাড়টা। পাহাড়ের ওপারে সমুদ্রেরযে সংকীর্ণ উপকূল, তাতে ছোট বড় নারিকেল গাছের বন, তার তলায় অধিবাসীদের খড়ে ছাওয়া কুটীর শ্রেণী।

রাজা থাকৃ-ওম্বুর রাজত্বের ইতিহাসটা একটানা সুখ-সমৃদ্ধির ইতিহাস নয়।

নোট প্রচলন করাতেই যত গোলমাল বাধল। সভ্য গভর্ণমেণ্টের নোট প্রচলনের মূলে যে অর্থবল থাকে রাজা থাকৃ-ওম্বুর তা ছিল না, ফলে নতুন নতুন অর্থ-নৈতিক সঙ্কট দেখা দিলে। বিদেশী ব্যবসায়ীরা রাজা থাকৃ-ওম্বুর নোট নিতে চায় না, তাদের দেখাদেখি দ্বীপের আদিম অধিবাসীরাও নোটের ওপর অনাস্থা প্রদর্শন করলে। একটা বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল।

১৮৭৪ সালে রাজা থাক-ওম্বু অর্থসঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে গ্রেটব্রিটেনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং উভয়ের মধ্যে একটা রফা হোল, যার ফলে থাকৃ-ওম্বু ব্যক্তিগত সকল প্রকার দাবী দাওয়া ত্যাগ করে মাবু ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ গ্রেটব্রিটেনের হাতে তুলে দিলেন।

মাবাউ দ্বীপের রাজবংশের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীর নাম রাটু পোপি সেনিলোলি। ইনিই বর্ত্তমান 'ভু-নি-ভালু' বা যুদ্ধের দেবতা। বনেদি বংশের মানুষ এ ছাড়া এঁর গৌরব করবার কিছু নেই, নিতান্তই গরীব, প্রজারা প্রথানুযায়ী যে সব উপঢৌকন নিয়ে আসে, তাতেই কায়ক্লেশে চলে। রাটু পোপির চেহারা খুব ভাল। দীর্ঘাকৃতি, মুখশ্রী গর্ব্বব্যঞ্জক, বলিষ্ঠ গঠন। ইংরাজি স্কুলে লেখাপড়া করার দরুণ রাটু পোপি চমৎকার ইংরাজি বলতে পারেন। যাঁরা একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই রাটু পোপির বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দুঃখিত। তাঁর স্ত্রী আডি টৌরিকা রাজবংশের উপযুক্ত বধূ বটে।

মাবাউ ছোট দ্বীপ হোলেও এখানে দেখবার অনেক জিনিষ আছে। প্রাচীন কালের তৈরি পাথর বাঁধানো পোতাশ্রয় এখানকার একটা প্রধান দর্শনীয় বস্তু। পোতাশ্রয়ের সম্মুখে প্রকাণ্ড বড় পাথরের বাঁধ, বাইরের সমুদ্রের উর্ম্মিমালা এই পাথরের বাঁধের গায়ে এসে আছড়ে পড়চে কতকাল ধরে, কিন্তু এখনও আশ্চর্য্যরূপ অটুট রয়েচে গোটা বাঁধটা। অবশ্য এর

কুটীর সম্মুখে উপবিষ্ট বৃদ্ধটি শেষ ফিজিয়ান যে নরমাংসের ভোজে অংশ গ্রহণ করিয়াছে

ক্ষেত হইতে নারিকেল ও চুপড়ি আলু লইয়া ফিরিয়াছে। গাত্রাবরণটি নারিকেলপত্রে রচিত

একটা ভৌগোলিক কারণ এই যে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ ভিটি লেভুর সম্মুখে বিখ্যাত প্রবালের বাঁধ বহিঃসমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত থেকে এ অঞ্চলের সব ছোট বড় দ্বীপের উপকূল ভাগকেই রক্ষা করচে। ইউরোপীয়গণের আগমনের পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের শিল্প ও সভ্যতার অবনতির যুগ আরম্ভ হয়েচে। এখন সকলেই সস্তা ধরণের ইউরোপীয় বা আমেরিকান্ শিল্পকলার অনুকরণ করতেই ব্যস্ত। মাবাউ দ্বীপের পাথরের বাঁধের মত প্রবাল ও পাথরের চাঁই দিয়ে পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করবার নিপুণতা বর্ত্তমান কালে এরা হারিয়ে ফেলেচে। এই পাথরের বাঁধের ফাঁকে ফাঁকে এ দেশীয় ডোঙা চলাচলের সরু পথ আছে। বড় একটা গাছের মোটা গুড়িতে খোল করে এই সব ডোঙা তৈরি হত, এখনও হয়। একদিকে হেলে পড়বার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করবার জন্যে বিপরীত দিকে বড় একখানা কাঠ বাঁধা থাকে ডোঙার পাশে, পাল খাটাবার মাস্তুল, মোড় ঘুরোবার সুবিধার জন্যে হাল, সবই এতে থাকে। ইংরাজিতে এ ধরণের ডোঙাকে বলে outrigger canoe—অনেক সময় দুখানা ডোঙা পাশাপাশি বাঁধা থাকে। বেশী মালপত্র বোঝাই দেবার জন্যে এই সকল জোড়া ডোঙা ব্যবহৃত হোত।

এই শ্রেণীর ডোঙা এখন আর বড় একটা তৈরি হয় না, হোলেও পূর্ব্বের মত মজবুত জিনিষ আর এখন পাওয়া যায় না। ডোঙা তৈরীর শিল্প লোকে ভুলে যাচ্ছে। জোড়া-ডোঙার ব্যবহার তো প্রায় উঠেই গিয়েচে। খুব বড় ডোঙাও গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে প্রায় অন্তর্হিত হয়েচে।

সমুদ্রের যে খাড়ির বাহিরে পাথরের বাঁধ অবস্থিত, তারই উপকূলে অনেকগুলো প্রাচীনদিনের মন্দির এখনও দেখা যায়। মাটি ও পাথরের বড় বড় বেদীর ওপরে এই সব মন্দির তৈরী। সেকালে মন্দিরের দেবতার সম্মুখে নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। তারপর সেই নিহত ব্যক্তির দেহ পুড়িয়ে সকলে মিলে মহা আনন্দে ভক্ষণ করতো।

ফিজি দেশীয় ডোঙা পাল তুলিয়া যাইতেছে

একটা মন্দিরের এখন ভগ্নাবস্থা, এরই উচ্চবেদীর এক প্রান্তে রাটু রুসি তাঁর দরবার গৃহ নির্ম্মাণ করেচেন। রাজ্য শাসন সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে তিনি এখানে দ্বীপের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। দরবার-গৃহ বলতে সাধারণতঃ আমাদের মনে যে ছবি জাগে, এ সে ধরণের কিছু হয়ে আসে। প্রতি বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাবাউ দ্বীপের মিশনরী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয় এই দরবার গৃহেই। বহুদূর থেকে গ্রাম্যলোকেরা মাবাউ সহরে এই উপলক্ষে জমা হয় ও কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রার্থনা, ভজনগীত, নৃত্য, ভোজ, বাজি পোড়ানো ইত্যাদি চলতে থাকে। খুব বড় মেলা বসে

মাবাউ-এর ডকে একটি ডোঙা

নয়। এ ঘরের দেওয়াল চেরা-বাঁশের, চাল আখের পাতায় ছাওয়া। ঘরের মেজেতে মাদুর বিছানো। এখন সেখানে সভা ভঙ্গের পরে কাভা নামক পানীয় অভ্যাগতদের মধ্যে বিতরিত হয় এবং মাঝে মাঝে গান বাজনাও হয়।

প্রাচীন দিনের অনেক প্রথা এখনও পরিবর্ত্তিত আকারে মাবাউ দ্বীপে প্রচলিত আছে, যদিও মিশনরীদের খরদৃষ্টি ও সতর্কতার ফলে ঐ সব প্রাচীন রীতিনীতির ভয়ানকত্ব সম্পূর্ণরূপেই দূর হয়েচে। রীতিনীতি বজায় আছে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পর থেকে তাদের ওপর সভ্যতার একটা প্রলেপ পড়েছে। খুব লক্ষ্য করে দেখলে প্রলেপটুকুর ক্ষীণ আবরণ ভেদ করে প্রাচীন কালের প্রথার আদিম রূপটা এখনও বার

এবং দেশীয় নানাবিধ শিল্পদ্রব্যও প্রদর্শিত হয়। সকলেই মিশনরী ফণ্ডে এই সময়ে কিছু কিছু অর্থ দান করে।

ভোজের মধ্যে বেশী কিছু আড়ম্বর নেই। গ্রাম থেকে আসবার সময়ে প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু মিষ্ট আলু, সাবু, রুটীফল ও কাভা প্রস্তুতের জন্যে ইয়ানসোনা মূল সংগ্রহ করে আনে। যাদের অবস্থা কিছু ভাল, তারা একটা ক'রে শূকর আনে। এই শূকর রন্ধনের ব্যাপারটী সম্পূর্ণ প্রাচীন প্রথানুযায়ী নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

একটা হৃষ্ট পুষ্ট শূকর বেছে নিয়ে তার মাথায় ডাণ্ডা মেরে বধ করা হয়। তারপর তার পেট চিরে পেটের মধ্যে তপ্ত পাথরের নুড়ি পুরে পেট আবার সেলাই করে দেওয়া হয়।

ঝিনুক ও প্রবালের খোলা দিয়ে তার গায়ের লোম চেঁচে ফেলা হয়।

এইবার শূকরটী উনুনে ঝলসাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হল। যুদ্ধের দেবতা রাটু রোসীর রাজকীয় রন্ধনশালা ছাড়া এই শূকর অন্য কোথাও রান্না হবার নিয়ম নেই। রাটু রোসির রন্ধনশালার উনুন একটী গোলাকার পাথর বাধানো কুণ্ড, তার ব্যাস হবে প্রায় আট ফুট, গভীরত্ব সাড়ে তিন ফুট। এই উনুনের তলায় একরাশ সরু সরু গাছের ডাল জড় করে

দিয়ে শূকরের মাংস তিনি কিছু কেটে নিয়ে মুখে তুলে দেবেন। সকলে সেই সময় জয়ধ্বনি করে উঠবে, মঙ্গলবাদ্য বাজতে থাকবে।

তিনি এইবার সমবেত প্রজাগণকে ভোজে যোগদান করবার অনুমতি দেবেন।

ইউরোপীয়গণ ফিজিদ্বীপে পদার্পণ করবার পূর্ব্বেও এই উৎসব ঠিক এই ভাবে সম্পন্ন হোত, শুধু শূকরের পরিবর্ত্তে তখন জীবন্ত মানুষকে ঠিক ঐ ভাবেই মাথায় ডাণ্ডা মেরে বধ

ফিজি দেশীয় একটি আনুষ্ঠানিক নৃত্যের মহলা

আগুন জালিয়ে দেওয়া হয়, এবং ঝুড়ি দুই ছোট ছোট পাথরের নুড়ি ঐ আগুনের মধ্যে রেখে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হয়। পাথরের নুড়িগুলি ঠিকমত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মৃত শূকরটী তার ওপর চাপিয়ে তার চারিপাশের মিষ্ট আলু, টরো মূল, সামুদ্রিক হাঙ্গরের ডানা, বড় কাঁচা ঝিনুক ইত্যাদি স্তূপীকৃত করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সবশুদ্ধ মিলে ঢিমে আঁচে সিদ্ধ হতে থাকে।

নিয়ম এই যে, রন্ধন কার্য্য শেষ হলে 'যুদ্ধের' দেবতা রাটু রোসি সর্ব্বপ্রথম এই খাদ্য আস্বাদ করবেন। একখানা বড় ছুরি

করা হোত, ঐ ভাবেই আগুনে ঝলসানো হোত এবং মহা-মহিম 'যুদ্ধের দেবতা' ঠিক ঐ ভাবেই ছুরি বার করে সর্ব্বপ্রথম সেই নরমাংস আস্বাদ করতেন। তখন অবশ্য মিশনরীদের সঙ্গে এই উৎসবের কোন সম্পর্ক ছিল না, এর নাম ছিল 'বোকোলা' অর্থাৎ নরমাংসভক্ষণের উৎসব॥

রাজকীয় উনুন থেকে মাংস খাবার ক্ষমতা নেই প্রজাদের। শূকরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে তবে তার মাংস সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। নারিকেল গাছের শিকড়ে তৈরী বড় বড় ঝুড়ি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভোজের পর মেয়েদের নাচ আরম্ভ হয়।

নাচের পোষাক বড় চমৎকার। গাছের ছালে তৈরী 'ভাপা' বা 'মাসি' বলে এক প্রকার পরিচ্ছদ এই উপলক্ষে মেয়েরা পরে। 'মাসি' যেদিন ব্যবহৃত হবে, সেদিনই তৈরী করতে হয়। তাজা না হোলে এই পরিচ্ছদ পরা চলে না।

মেয়েরা গলায় পরে রাঙা হিবিস্‌কাস্‌ ও হলুদে ফ্রাঙ্গিপিনী ফুলের মালা, কোমরে জড়ায় কচি সবুজপত্রযুক্ত বন্যলতা, মাথার চুলে গুঁজে রাখে সাদা রঙের পোনো ফুল। সাধারণতঃ ছত্রিশটী নর্ত্তকী দরকার হয় নাচের জন্যে, এরা দুদলে ভাগ হয়ে সামনে পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়ায় এবং বাজনা সুরু হবার পরে তালে তালে নাচতে আরম্ভ করে। উৎসবের পনেরো ষোলদিন আগে থেকে নাচের তালিম চলে এবং স্বয়ং রাটু রোশি তালিমের সময় উপস্থিত থেকে যাতে নাচ নির্ভুল ও ত্রুটিশূন্য হয় সে বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন।

মাবাউ-প্রধানগণের অভিষেক প্রস্তর

ফিজি দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন প্রথা ও রীতি নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে অনেকে মাবাউ দ্বীপ গিয়ে থাকেন। রাটু রোসি শিক্ষিত লোক ও উদার আতিথেয়তার জন্যে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। নিজের বাড়ীতে তিনি আগন্তুকদের স্থান দেন ও যথেষ্ট সমাদর করেন। কিন্তু কারো শুধু হাতে রাটু রোসির আতিথ্য গ্রহণ করতে যাওয়া উচিত নয়, কারণ প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত হোলেও ইনি বর্ত্তমানে দরিদ্র প্রজাদের আনীত উপঢৌকনে কোনোক্রমে দিন গুজরান করেন। অন্ততঃ কিছু সিগারেট ও তামাক সঙ্গে করে নিয়ে গেলেও রাটু রোসিকে যথেষ্ট সাহায্য করা হয়, কারণ ফিজি দ্বীপে তাম্রকূট বড়ই দুর্ম্মূল্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

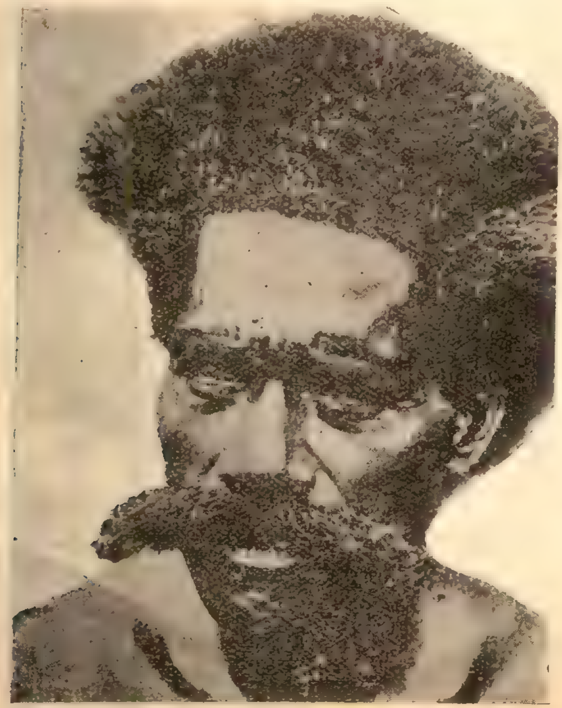

ফিজিবাসীর সাধারণ চুল ছাঁটা যাহা ঐ দেশেরই বৈশিষ্ট্য

মূক-বধির চিত্র-শিল্পী—শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী

শ্রীসুশীলকুমার দেব

সম্প্রতি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়। ইনি মূক ও বধির। চার মাস হলো লণ্ডনের রয়েল্ কলেজ অব আর্টের পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরেছেন। এঁর অসাধারণতা সম্বন্ধে Daily Mirror, Daily Mail ও Times এর মারফতে ইংলণ্ডের প্রেসে বেশ-কিছু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। সমগ্র ব্রিটিশ এম্পায়ারে নাকি ইনিই একমাত্র মূক বধির যিনি চিত্র বিদ্যায় এযাবৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সব চেয়ে ভালো ছবি—Adoration of the Sheep নিজের কলেজকে উপহার দিয়ে এসেছেন। অধিকন্তু তাঁর তিনখানি ছবি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে সুরক্ষিত রয়েছে।

তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়েছিলো কল্‌কাতার মূক ও বধিরদের স্কুলে। এই সময়ে বাঙলায় কথা বলার শিক্ষায় তাঁর হাতে খড়ি হয়। প্রথম প্রথম শুধু কাজের কথা বল্‌তে পারতেন। "গল্প করা"র মতন ভাষার শিক্ষিত-পটুত্ব তাঁর একেবারেই ছিলো না, এবং সেজন্যে সামাজিকতার আনন্দ থেকে সবিশেষ বঞ্চিত ছিলেন। এখন বিস্মিত হতে হয় তাঁর সঙ্গে কথা বলে, এই জন্যে যে, বধিরতা দোষে যাঁকে মৌন হয়ে থাক্‌বার কথা তাঁরই এমন ক্ষমতা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের, বিশেষত নিজের নানা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে, গল্পালাপ করার টেক্‌নিকটি তাঁর কাছে আর একেবারেই নতুন বা কঠিন নয়! সুতরাং তাঁকে সম্পূর্ণ মূক বলা ঠিক হবে না।

কল্‌কাতার আর্ট স্কুলে কমার্শিয়াল্ আর্টের শিক্ষা শেষ করে কিছুকাল বোম্বেতে ফাইন আর্টের পরিশীলনের পর তাঁর মনে বিলেতে যাবার ইচ্ছা জাগ্‌ল। শিক্ষক বা পরিজন কেহই মূক-বধিরের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতে তখন গররাজি। অতএব সমাজের সাহায্য বল্‌তে তাঁর প্রাপ্তব্য কিছু ছিলো না। অথচ মিঃ চৌধুরীর মনের দৃঢ়তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতো প্রবল যে কিছুতেই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পার্‌লে না।

মূক-বধির শিল্পী শ্রীযুক্ত বি, চৌধুরী

বধিরতার পিঠে ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব অথবা পরিজনের বাধার পিঠে অর্থাভাব—কিছুতেই নিরুৎসাহ না হয়ে নিজের উপার্জ্জনের ওপর নির্ভর করে তেইশ বছর বয়সে ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিলেতে রওনা দিলেন! তিন বছর প্রবাসের পর "এ-আর্-সি-এ" হয়ে এসে অধুনা তাঁর যায়। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁকে মধুর স্বভাব ও মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন বলে মনে হবে। একটু বেশী মেশার পর দেখছি, শুধু তাই নয়, তাঁর আসল স্বভাব হচ্ছে তেজস্বীতা, দৃঢ়তা, জীবনযুদ্ধে জয় লাভ করার জন্যে অদম্য উদ্যম। আশ্চর্য্য যে, বছর চারেক ধরে চৌধুরী ডান কানে কিছু কিছু শব্দ

Life's Story

আত্ম-বিশ্বাস এবং নিসর্গ ও মানুষের বিরুদ্ধতা জয় করার সাহস বহুধা বেড়ে গেছে।

যে মূক-বধিরের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় জাগেনি,—চৌধুরী বলেন—তার সঙ্গে পশুর খুব অমিল নেই; তাকে কুণো ও অনুপযোগী হয়ে বিষাদগ্রস্ত অ-সামাজিক জীবন কাটিয়ে মরতে হয়। মিঃ চৌধুরীকে দেখলে, আত্ম বিশ্বাস মানুষের আত্মপ্রকাশের পক্ষে যে কতোখানি সহায়ক সেইটে বুঝতে পারা শুনতে পাচ্ছেন! প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করার তীব্র ইচ্ছা যে কিছুটা এর জন্যে দায়ী সেটা—যেন মনে হচ্ছে—দেহ-তত্ত্ববিদেরাও স্বীকার করতে বাধ্য।

ভারতবর্ষে ফিরে এসেই তিনি কল্‌কাতার "মূক ও বধির ক্লাবের" মেম্বারগণের মধ্যে নতুন উদ্যম ও জীবন যাতে সঞ্চারিত হয় ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রূপে তারই চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। আমোদ ও আনন্দ ব্যতিরেকে চরিত্রের প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে

নারী চিত্র-শিল্পী

হতে পারে না। মূক-বধির মেম্বারগণের কাছে এই তথ্যের সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে খেলা-ধূলো, বন-ভোজন, অকারণ ভ্রমণ প্রভৃতির ব্যবস্থা ও আয়োজন করেছেন। মোট কথা, পুরুষকার বলে ভাগ্যকে অনুকূল করার প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ—মিঃ চৌধুরী।

শিক্ষা ব্যাপারে ও আত্ম-প্রকাশের উদ্যমে যাঁরা তাঁকে অল্প বিস্তর সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সার বি-এন-মিত্র, সার এন্-এন-সরকার ও সার আলেকজান্দার মারে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাছাড়া চিত্রাঙ্কন প্রসঙ্গে যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের মধ্যে লর্ড জেটল্যাণ্ড, সার ও লেডী জ্যেকসন্, সার রথেন্‌ষ্টীন্, মিঃ ল্যান্সবিউরি- মিঃ লয়েড জর্জ্জ, হিজ হাইনেস্ আগা খাঁ, গঞ্জমের মহারাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গজপতি নারায়ন দেব, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা যেমন তিনি অধরৌষ্ঠের ভাষা-পাঠ (Lip Study) করে অন্যের মনের ভাব ধরতে সক্ষম, তেম্‌নি চিত্রাঙ্কনের ব্যাপারেও রঙের প্রখরতা ও সূক্ষ্ম বস্তুনিচয়ের প্রযোজনা দ্বারা চিত্রণীয় বিষয়টিকে বাস্তব ও সুস্পষ্ট করে তোলা তাঁর প্রকৃতি। একদিকে অযথা অত্যধিক রঙ প্রয়োগ daubing, অন্যদিকে রূপকে অবহেলা করে শুধু ভাব চিত্রণ impressionism)—এই দুটি পথই তিনি বর্জ্জন করেছেন। তাঁর চিত্রের সৌন্দর্য্য হচ্ছে রূপ ও ভাবের সামঞ্জস্য নিয়ে।

"বিচিত্রা"য় যে ক'খানা চিত্র প্রকাশিত হলো তার মধ্যে তৈল চিত্রখানার একটু পরিচয় দরকার—এজন্যে যে, এতে মিঃ চৌধুরীর শুধু চিত্র-শিল্পের নয়, জীবন-শিল্পেরও মূল সূত্রটি ধরা দিয়েছে।

ছবিখানির নাম Life's Story। চিত্রের সাতজন নর-নারী পৃথিবীর অগণিত নারী-পুরুষের প্রতিনিধি মাত্র। তারা ভাবলে, জীবনের গতি তো অনিরুদ্ধ; তাহলে ভয়-ভাবনা কিসের; সমাজ যদি প্রতিরোধী হয় তাহলে না হয় চলো বাইরে কোথাও যাওয়া যাক্—যেখানে পরমানন্দে কোনো বিচার আচারের তোয়াক্কা না রেখে ব্যভিচারের মধ্য দিয়ে খুব-খানিকটা সুখাস্বাদ করা যেতে পারে! এই না ভেবে, সহর ছেড়ে সমাজ ছেড়ে তারা নিভৃত পাহাড়ের

রাম ও সীতা

কৌতূহল

র‍্যাফেলের অনুভূতি

ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ম্ লণ্ডন

অন্তরালে সুখ-সম্ভোগের সন্ধানে বেরিয়ে পড়্‌ল—ভাগ্যের মুখে, ভগবানের মুখে তুড়ি মেরে! সেখানে তারা করলে ইচ্ছামতন ব্যভিচার। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে আকাশ হয়ে এলো মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার। এলো ঝড় এলো ঝঞ্ঝা। যে শরীর যে-মন নিয়ে তারা ক্ষুদ্র প্রকৃতির খেলায় মত্ত হয়ে গেছ্‌ল, বিরাট প্রকৃতির অধীশ্বরের ইচ্ছায় সেখানে ঘট্‌ল বিপর্য্যয়। কেউ বা চিৎ, কেউ বা কাৎ হয়ে পড়্‌ল; আবার সকলেই আন্তরিক মৃত্যু-ভয়ে হয়ে উঠ্‌ল অধীর। সাতজনকার অন্যোন্য বন্ধন নিমেষে গেলো ক্ষীণ হয়ে টুটে। কে যেন বিরাট হস্ত প্রসারিত করে শাসন-দণ্ড তুলে দেখালে! কে সে! কার ইঙ্গিতে এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন?.........

পুণ্য বিশ্বাস জাগ্‌ল পরমেশ্বরের পরে; অন্তত একজন ভগবানের কাছে নীরব ব্যাকুল প্রার্থনা জানাতে লাগ্‌ল, হে ভগবান্, আশ্রয় তুমি! তোমার বিধানই সত্য হোক! পুরুষকারকে ঈশ্বরের বিধানের আবিষ্কারে নিযুক্ত করলেই তবে গঠিত হবে আদর্শ মানুষ, আদর্শ মানুষের সমাজ—মিঃ চৌধুরীর ছবির এই হচ্ছে মর‍্যাল্। প্রতিকূল ভাগ্যকে জয় করার ক্ষমতাও আবার দিচ্ছেন ভগবান—জীবন-শিল্পের

মিঃ চৌধুরীর চিত্রের ও মনের এই যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাই লিখে আমার বন্ধু-কৃত্য করা হলো। চিত্রবিদ্যার চর্চ্চায় ও মূক-বধিরদের সেবায় তাঁর জীবন নিত্য নব উৎকর্ষে ভরপূর হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

উপরে—(ক) রয়েল কলেজ অব্ আর্টের একটি ইংরাজ ছাত্র
(খ) একটি ফরাসী মেয়ে
নীচে—(ক) বঙ্গদেশীয়া কন্যা
(খ) মূক ও বধির ইংরাজ বালক

শ্রীসুশীলকুমার দেব

ব্যায়ামবীর মুলার

শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু

সত্যিকারের ব্যায়ামবীর বলিতে অধুনা সাধারণ লোক সুস্পষ্ট পেশীসমন্বিত ব্যক্তিগণকেই বুঝিয়া থাকে, এই জন্যই আজকাল সকলেই চায় তাহাদের শরীরকে একেবারে ঢেলা ঢেলা পেশীময় করিয়া তুলিতে ; অবশ্য এক হিসাবে ইহা খারাপ নহে—কারণ, গায়ে কেবলমাত্র শক্তি বাড়ানই ব্যায়ামের উদ্দেশ্য নহে—অঙ্গ-সৌষ্ঠবও প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া লোকে আজকাল বাহ্যিক শরীর-গঠনের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু প্রকৃত শরীরচর্চ্চা অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ শরীর যন্ত্রাদির সুনিয়ন্ত্রণের দিকে তাহারা বড় একটা দৃষ্টি রাখে না। এই জন্যই মনে হয়, প্রাচীন যুগের সাধারণ লোকের চাইতেও এই যুগের বিখ্যাত ব্যায়ামবীরগণ স্বল্পায়ু হইয়া থাকেন। তবে এই যুগেও যে প্রকৃত ব্যায়ামবীর একেবারেই দৃষ্ট হয় না—এমনও নহে। সেইরূপ ব্যায়ামবীর-দের মধ্যে লেফ্‌টেনাণ্ট মুলার একজন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের ডেনমার্ক রাজ্যে মুলারের জন্ম হয়। তিনি তাঁহার মাতৃগর্ভে পূর্ণ দশমাসকাল থাকিতে পারেন নাই ; অসময়ে ও শীঘ্র জন্ম হওয়ায় তাঁহার আকার হইল খুবই ক্ষুদ্র ! সেই সময় তাঁহার শরীরের ওজন ছিল মাত্র ৩½ পাউণ্ড * এবং তাঁহাকে তখন যে কোনো একটা সাধারণ চুরুটের বাক্সেও ভরিয়া রাখা যাইত। মুলারের পিতার স্বাস্থ্যও নেহাৎ মন্দই ছিল।

দুই বৎসর বয়সে মুলার দুরারোগ্য আমাশয়ে মৃতপ্রায় হন এবং ইহার পরবর্ত্তী সময়েই যখন তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন, তখন প্রথম কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া জ্বর, সর্দ্দি কাসি ও পেটের অসুখে ভুগিয়া তিনি একেবারেই কঙ্কালসার হইয়া পড়িলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার জীবনে এক বৈশিষ্ট্য দেখা দিল ; এই সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৮ বৎসর। ডাক্তার এ, কম্বের লেখা "জীবতত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা" (The Principal Teachings ef Physiology) ও ডাক্তার স্কেবার রচিত "স্বাস্থ্য ও ব্যায়ামতত্ত্ব" (Health Gymnastics) নামক ইংরেজী ও জার্ম্মানী ভাষা হইতে অনূদিত দুইখানি পুস্তক পাঠ করিয়া সহসা স্বাস্থ্য রক্ষা প্রণালীর দিকে তাঁহার ঝোঁক পড়িয়া যায়। সুতরাং অবিলম্বে একজোড়া ডাম্বেল সংগ্রহ করিয়া তিনি নিয়মিত রূপে ব্যায়াম চর্চ্চাও আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার এই ব্যায়ামে অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ায় ইহা ছাড়িয়া মুক্তহস্তের ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে "Ueber Landund Meer" নামক পুস্তক হইতে "পদব্রজে ভ্রমণ" (Pedestrianism) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি পায়ের গোড়ালী ও আঙ্গুলের উপর দৌড়াইবার নিয়ম শিক্ষা করেন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যের চিকিৎসাবিভাগীয় জেলা কর্ম্মচারী মিঃ ট্রট্‌নারের লেখা "স্বাস্থ্যের যত্নে পথ প্রদর্শক" (Guide to the Care of Health) বইখানি পড়িয়াও শরীর চর্চ্চা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে "Victor Silberer" বই খানি পড়িয়া মুলার ভ্রমণ ও দৌড় বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন।

মুলার প্রথমতঃ কতকগুলি গৃহাভ্যন্তরের ব্যায়াম (Indoor Exercise) করিয়া পরে দৌড় অভ্যাস করেন ; তারপর কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি কপি কলের সাহায্যে ভার তোলার ব্যায়ামও (Pulley-weight Exercise) করিলেন—কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মন না বসায়—অচিরকালের মধ্যে তিনি ইহাও ছাড়িয়া দিলেন।

* ডেনমার্কের ৩½ পাউণ্ড ইংলণ্ডের প্রায় ৪ পাউণ্ডের সমান ;—এ দেশের মাপে তিনি ছিলেন মাত্র ২৮ ছটাক !

মুলার বাল্যকালে স্থানীয় বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া ধর্ম্মতত্ব Theology অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াও শেষ করিয়া তিনি "Royal Engineers"এ "লেফ্‌টেনান্ট" নিযুক্ত হইয়া প্রায় ১০ বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিলেন। ইহার পর ৪।৫ বৎসরকাল অবধি তিনি জুটল্যাণ্ডের ক্ষয়কাসগ্রস্ত রোগীদের রক্ষা কল্পে ভেজ্‌লেফজর্ডে "Denish Tubercular Sanatorium"এ ইন্‌স্পেক্টর রূপে কার্য্য করেন। কিন্তু এই সকল কাজেও তাঁহার মন বসিল না—তিনি রোগীকে সুস্থ করা অপেক্ষা দুর্ব্বলকে সবল এবং সবলকে সবলতর করাই ভাল মনে করিলেন—তাই এই সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া শীঘ্রই তিনি তাঁহার স্বীয় স্বাস্থ্য ও শরীরের উন্নতির প্রতি যত্ন লইতে আরম্ভ করিলেন।

বহুকাল যাবৎ তিনি নানাপ্রকার ব্যায়াম চর্চা করিয়া সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং সর্ব্বশেষে তিনি নিজেই মুক্ত হস্তে করার উপযোগী একটি অতি সুন্দর ব্যায়াম প্রণালীর আবিষ্কার করেন এবং এই পর্য্যন্ত বহু লোককে তিনি এই ব্যায়াম দ্বারাই সবল ও সুপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

মুলারের চেহারাটি দেখিয়া একসময়ে ডেন্‌মার্কের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী কার্থ ব্লক্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই পর্য্যন্ত আমি যত ব্যায়ামবীর দেখিয়াছি, তন্মধ্যে আপনি নিখুঁত শরীর ও পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি।" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পালোয়ান জর্জ্জেজ হাকেন্স-মিড্‌টের ব্যায়ামগুরু ডাক্তার ক্রাজুস্কি মুলারকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "প্রাচীন কালের প্রস্তরনির্ম্মিত আদর্শ মূর্ত্তি-সকলের সহিত সাদৃশ্য তোমার ন্যায় এইরূপ দৃঢ়বদ্ধ এবং বীরত্বব্যঞ্জক শরীর গঠন, সৌখীন অথবা পেশাদারী ব্যায়াম-বীরদের মধ্যে বাস্তবিকই কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।" ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে সেপ্টেম্বর গ্লাসগোর এক বিরাট সভায় গ্লাসগো চিত্রশালার অধ্যক্ষ মিঃ নিউবারি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমি আমার জীবনে হাকেন্সমিড্‌ট্‌ ও স্যাণ্ডোর মত পালোয়ানও যথেষ্ট দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও হইতেই মুলারের শারীরিক গঠন ও শক্তি ন্যূন নহে।"

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "The Athletic Uuion Physical Culture Competition"এ মুলার ডেন্‌মার্কের সর্ব্বপ্রধান পূর্ণাঙ্গতার জন্য পুরস্কার লাভ করেন; এই প্রতিযোগিতায় তিনি পুরু ও ঘন শীতবস্ত্র এবং অত্যধিক ওজনের একজোড়া বুট পরিহিত হইয়া দুর্গম পার্ব্বত্য ও বরফাচ্ছন্ন রাস্তায় মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ৭ মাইল ১২০ গজ পর্য্যন্ত দৌড়াইয়াছিলেন!

মুলরের গ্রীবা শক্তি অতি অমানুষিক! গ্রীস্ ও রোমের পদ্ধতি অনুযায়ী কুস্তিতে গ্রীবার যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন—এই কুস্তিতেও তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা। ১৮½ ইঞ্চি একটি লোহার হাঁসুলী গলায় পরিয়া দাঁড়াইলে পর তাঁহার ললাট চাপিয়া ধরিয়া ২৮০ পাউণ্ড ওজনের একজন মানুষ ঝুলিয়া পড়িতে পারে এবং সেই অবস্থায় মুলার তাহাকে শুদ্ধ তাঁহার মাথা হেলাইয়া চারিদিক ঘুরাইয়া আনিতে পারেন। এই কার্য্যটি কিরূপ কঠিন, তাহা অনুমান করা মোটেই শক্ত নহে।

তিনি যখন দুইখানি চেয়ারের উপর মস্তকের পিছন ও গোড়ালী রাখিয়া উত্থান অবস্থায় সেতুর আকারে শয়ন করেন, তখন তাঁহার উদরের উপর ২০০ পাউণ্ড ওজনের একটি নেহাই রাখিয়া তদুপরি দুইজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি গুরুভার হাতুড়ী দ্বারা উপর্য্যুপরি বিষম বেগে আঘাত করিলেও তাঁহার কোনো কষ্টই হয় না।

মুলার আর একটী সুন্দর খেলা দেখাইয়া থাকেন। মাটিতে চিৎ হইয়া সেতুর আকারে থাকিবার পর তাঁহার অনাবৃত উদরের উপর পুরু তলাওয়ালা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া ২১৬ পাউণ্ড ওজনের একটি লোক ৮ ফিট দূর হইতে লম্ফ দিয়া উঠিলেও তিনি পেটের পেশীর সঙ্কোচন দ্বারাই উহা সামলাইয়া লইতে পারেন।

উক্তরূপ সেতুর আকারেই যদি ৪ ফিট উপর হইতেও ২৯০ পাউণ্ড একটি লৌহ গোলা নিক্ষেপ করা হয় তাঁহার উদরের উপর, তবেও তাঁহার কিছুই হইবে না—এমনই অসামান্য শক্তি তাঁহার উদর দেশের।

মুলার মাটিতে চিৎ হইয়া শয়ন করিলে তাঁহার উদর কিম্বা বক্ষের উপর দিয়া ৩৬০ পাউণ্ড ওজনের বোঝাসহ লৌহময়

হালযুক্ত (Iron-tyred) একটি গাড়ী অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারে! কেবল বক্ষ ও উদরের পেশী সমূহই যে তাঁহার এত দৃঢ় তাহা নহে। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই এইরূপ ক্ষমতাশালী।

একবার ইতালিতে মূলারের সহিত জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর স্যাণ্ডোর মল্লযুদ্ধ হয়। স্যাণ্ডোকে মাটিতে ফেলিবার জন্য মূলার যেই মাত্র তাঁহার হাতখানি ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিলেন, অমনি স্যাণ্ডোর হাতের মধ্যে মূলারের দুইটি আঙ্গুল প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ ঢুকিয়া গেল!

ব্যায়ামবীর মূলার

অথচ স্যাণ্ডো তাঁহার এই পেশীর সঙ্কোচন দ্বারাই মোটা মোটা লোহার তার ছিঁড়িয়াছিলেন—এই পেশীর উপরই মোটা ও দৃঢ় লৌহ শলাকা বক্র করান হইয়াছিল এবং এই পেশীতে হাত দিয়াই আমেরিকার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর আর্ল লীডার্ম্যান্ শুদ্ধ হইয়াছিলেন! যাহাই হউক ইহাতে স্যাণ্ডো ত ভয়ঙ্কর রাগিয়া গেলেন! তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মূলারকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া সবলে বক্ষে চাপিতে লাগিলেন। তাহার ফলে নাকি শেষে মূলারের পাঁজরই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! অবশ্য ইহা তেমন বেশী কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কুস্তি করিতে যাইয়া অনেক সময় ওস্তাদ লোকও খুব সাধারণ লোকের কাছে অসুবিধায় পড়িয়া এরূপ জখম হইতে পারে; যাঁহারা এই সকল বিষয় বিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট একথা সুবিদিত।

শুধু কুস্তি বলিয়াই নহে—তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্যায়ামেই সুনিপুণ ব্যক্তি। গ্রীক্ ও রোমান প্রথার কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, গুরু ভারোত্তোলন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য ব্যায়াম হইতে আরম্ভ করিয়া (৫৬ পাউণ্ড) বর্ত্তুল নিক্ষেপ, দীর্ঘপথ ধাবন, দ্রুত ভ্রমণ, উচ্চ-লম্ফ, দণ্ড-লম্ফ, দীর্ঘ-লম্ফ, ঝম্ফ প্রদান, বিঘ্ন-জনক দৌড়, সন্তরণ, দাঁড়টানা, কাছিটানা, বল্লম-নিক্ষেপ, হাতুড়ী-নিক্ষেপ, চক্র-যুক্ত পাদুকা দৌড়, প্রভৃতি যাবতীয় ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌশলে দক্ষতার জন্য তিনি ১৩৪টি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন; আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার মধ্যে ১২৫টিই প্রথম পুরস্কার এবং মাত্র ৯টি দ্বিতীয় পুরস্কার। তিনি উপরোক্ত অধিকাংশ বিষয়েই পুরাতন তালিকা নষ্ট করিয়া ডেন্‌মার্কদেশীয় নূতন তালিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পাশ্চাত্য দেশীয় সমস্ত রকম খেলা ধূলায়ও সবিশেষ পারদর্শী।

সমগ্র জগতে বহু ব্যায়ামবীর এবং পালোয়ান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে তেমন শিক্ষিত পাওয়া যায় কয়জন? মূলার যেমন সুশিক্ষিত, তেমনি শরীর-চর্চ্চা বিষয়ে অগাধ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। তিনি পুরুষ, নারী, বালক বালিকা প্রভৃতির জন্য তাঁহার স্বীয় প্রণালী বিভিন্ন পুস্তকে সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং তাঁহার সেই পুস্তকগুলি লোকের এতই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে যে, এই পর্য্যন্ত সেই বইগুলি ২৭টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে তিনি লণ্ডনে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করিয়া দেশ বিদেশের লোককে শরীর চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা বুঝাইয়া দিতেছেন। বহু লোক তাঁহার নিকট ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া বিখ্যাত শক্তিশালী হইতেছে। মধ্যে মধ্যে তিনি সর্ব্বসাধারণকে শক্তিচর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার মানসে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণেও বহির্গত হইয়া থাকেন; তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক এই আমাদের একান্ত কামনা।

লণ্ডনের বিখ্যাত "Health & Strength" পত্রিকার সহিতও তিনি একান্ত সংশ্লিষ্ট; তিনি সেই পত্রিকার সহকারী সভাপতির পদে আছেন। মূলারের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ ইব মূলারও বেশ স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছেন।

শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু

কবি হুইট্‌ম্যান

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস, আই-সি-এস

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সাহিত্যের প্রতি যুগে কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখনী যুগধর্ম্মকে রূপ দিয়া সে যুগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ এবং যেখানে তাহা নয় বলিয়া বাহিরে মনে হয় সেখানেও স্রষ্টার স্বপ্নই রচনার মধ্যে মূর্ত্তি লাভ করে। এরূপ ক্ষেত্রে এই স্বপ্নই যে জীবনের একটী অচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে তাহা কে বলিবে? জীবন, বিশেষতঃ যে জীবন শিল্পসৃষ্টিতে অমর হইয়া উঠে তাহা ত শুধু দিনযাপনের নির্ঘণ্ট নহে; চিন্তা ও কল্পনা তাহার মধ্যে কার্য্য ও সাফল্য অপেক্ষা কম গৌরবের স্থান গ্রহণ করে না।

কবি ও কবিতা বলিতে যাহা সচরাচর আমরা বুঝিয়া থাকি হুইটম্যানের যুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত তাহার ক্রমশঃ পরিণতি অব্যাহত পাওয়া যায়। তাহার পর হইতেই একটী বিশিষ্ট যুগের আরম্ভ হইয়াছে। হুইটম্যান এই যুগের প্রবর্ত্তক ও হয়ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগগুলির ধারা ও আদর্শ হইতে এত দূরে যে তাঁহাকে একটী মূর্ত্তিমান্ বিদ্রোহ বলা চলে। জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি সুচারু ভাষায় কমনীয় ছন্দে গাঁথিয়া কবি পৃথিবীকে উপহার দিতেন। ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডস্বার্থ যে সরল ভাষা হৃদয় হইতে স্বত উৎসারিত হয় তাহাকেই কাব্যের ভাষা ঘোষণা করিলেও কেহ কোন বিশেষ নূতন পথ বাহির করেন নাই। তাহার পর টেনিসন ও সুইনবার্ণের কোমল পদলালিত্যের যুগে আমেরিকা হইতে হুইটম্যানের উদয় হইল। এ যেন আবির্ভাব। সাহিত্যক্ষেত্রে এত তীব্র নূতনত্ব বোধ হয় আর আসে নাই। সেজন্য তাহাকে নবযুগের প্রবর্ত্তক বলা যায়। ভাব ও ভাষা দুইয়েতেই তিনি নিজের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লইয়া আসিলেন। প্রকৃতির বিচিত্র লীলা ও ঐশ্বর্য্য, ষড় ঋতুর আবির্ভাব ও শোভাযাত্রা, মানবহৃদয়ের চারুবৃত্তির বর্ণনা তাঁহার কবিতার বস্তু নহে। প্রাকৃতিক বা মানবীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার উপাস্য নহে; তাঁহার প্রেরণা সান্ত্বনা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যে নহে, উৎসাহ, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মক্ষমতায়। তিনি শুধু যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছেন তাহা নহে, চলিত মানদণ্ড হিসাবে তাঁহার কবিতায় ছন্দ বা আকৃতিও নাই। অবশ্য ইচ্ছা করিলে তিনি যে সাধারণ হিসাবের ছন্দোময় বা মিষ্ট কবিতা লিখিতে পারিতেন না তাহা বলা চলে না। 'ব্রুকলিন খেয়াপারের' কবিতায় শেষ মাসের সিন্ধুশকুনের অনন্ত আকাশে গতিহীন পক্ষবিস্তারে ভাসিয়া দেহসঞ্চালন, জলে বসন্ত আকাশের প্রতিবিম্বে কম্পমান আলোকরশ্মিতে চক্ষু ঝলসাইয়া যাওয়ার বর্ণনা যে কোন কবির উপযুক্ত। "আমায় জ্যোতির্ম্ময় নীরব সূর্য্য দাও" প্রভৃতি কবিতা সম্বন্ধেও সেকথা বলা চলে। তাহা ছাড়াও কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহার বা বচনবিন্যাস নাই বলিয়া তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী বিন্দুমাত্র কম শক্তিশালী নহে। 'আঁখিজল' নামক কবিতায়

> "আঁখিজল, একটী তারাও জ্বলে নাই,
> শুধুই আঁধার বিজনে"

পংক্তিটীর মূল ভাব অতি অল্প কথায় একটী সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে হুইটম্যানের বিশেষত্ব সুইনবার্ণের ন্যায় বর্ণনার লালিত্যে নহে, লীলায় নহে, সাবলীলতায়, আবেগে।

তাঁহার কাব্যের প্রথম কথা এই যে যে এই পুস্তক স্পর্শ করে সে একটী মানুষ স্পর্শ করে। এই কথার পদে পদে সার্থকতা আমরা পাই। পৃথিবীর সাহিত্যে রচনায় কবিকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করে এরূপ পুস্তক বিরল। কিন্তু 'তৃণদলের' কবি সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। এই পুস্তক—অসম্ভবরূপে ব্যক্তিগত। এবং কবিতার বিষয় প্রধানত আত্মা।

"এখন হেথায় আমি দাঁড়াইনু দৃঢ় আত্মা লয়ে"

এই আত্মাই সাহিত্যকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। তিনি বলেন

আমি বক্তৃতা বা সামান্য দান দিই না; আমি যখন দিই, নিজেকেই দিই। তিনি তুলার চাষে ব্যস্ত হতভাগ্য নিগ্রো বা মেথরকে সমভাবে আশ্বাস দেন ও শপথ করেন যে তাহাকে কখনও বিমুখ করিবেন না। এই ভাব প্রকাশ, 'তৃণাদপি সুনীচেন' নহে, তাহা হইলে আমাদের কবির আমেরিকানত্বে আঘাত পড়িবে; তাহা সবল মেরুদণ্ডশালী আমেরিকানের আত্মনির্ভর ও আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ। তিনি বলেন,

"আমি ভিতরে ও বাহিরে স্বর্গীয় এবং যাহা
স্পর্শ করি বা যাহার দ্বারা স্পৃষ্ট হই
তাহাই পবিত্র করি।"

কিন্তু নিজে উন্নত থাকিলে চলিবে না তাই আত্মাকে সম্বোধন করিতেছেন সকলকে সমানভাবে উপরে তুলিয়া নিবার জন্য। আত্মা অমর; শুধু নিজের নহে, সকলেরই। এবং কর্ম্মবাদের কবির নিকট কর্ম্মই অমরত্ব লাভের সোপান। প্রাচীন বৃদ্ধ কৃষক, ভ্রমণকারী, শ্রমিক, নাবিক, সৈনিক, ইহারা কোন দিন যুদ্ধ হইতে পরাঙ্‌মুখ হয় নাই, তাই তাহাদের বার্দ্ধক্যে বাঁচিয়া থাকা যেমন সার্থক, তাহাদের আত্মাও তেমনই সর্ব্বজয়ী এবং কবির আত্মা তাহাদের আত্মার সহিত একত্ব অনুভব করে। সমাজের মধ্যে যাহাদের স্থান সর্ব্বনিম্নে তাহারাও কবির আত্মা হইতে অভিন্ন নহে। কবি তাহাদের দোষগুলিকে গুণের পরিচ্ছদে সাজান নাই, আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, কিন্তু নিজের বল তাহাদিগকে দিয়া বলশালী সম্মানী মানুষে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অন্যান্য কবিদের মত মানব জাতির ও পৃথিবীর নাট্যশালার অভিনয়ের দর্শকমাত্র নহেন, তাহাদের মধ্যেরই একজন।

"ধূলিতে নিজেকে দিলাম, প্রিয় তৃণ হইতে জন্মলাভ করিবার জন্য;
আমাকে আবার যদি চাও তোমার পাদুকাতলায় খুঁজিও;
আমি কে বা আমার অর্থ কি তাহা তোমরা বুঝিতেই পারিবে না,
তবু আমি তোমাদের পুষ্ট করিব,
এবং তোমাদের রক্তকণা গঠন ও পরিষ্কার করিব।"

কবি যাহা বলিয়াছেন বাস্তব জীবনেও তাহা করিয়াছিলেন। তিনি শুধু কবিতায় নহে, যুদ্ধের সময় হাঁসপাতালে প্রেরণাময় সেবার দ্বারা মানুষকে মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃত্যু তাঁহার শত্রু।

"আমি জানি আমি মৃত্যুহীন।

* * *

আমি জানি আমি ভয়ঙ্কর;
আমি আমার আত্মার সাফাই গাহিবার জন্য বা তাহাকে বুঝিতে দিবার জন্য ব্যস্ত নই।
দেখিয়াছি যে প্রাথমিক নিয়মগুলি কারণ দেখায় না।

* * *

আমি যেমন-তেমন ভাবেই আছি, তাহাই প্রচুর।
পৃথিবীতে আর কেহ টের না পাইলেও আমি শান্ত—
যদি প্রত্যেকেই টের পায় তবু শান্ত থাকি।"

অন্য এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—

"একটী পৃথিবী জানে—তাহাই আমার কাছে বৃহত্তম, তাহাই আমি।
এবং আমি নিজেকে আজ বা দশ সহস্র বা দশ লক্ষ বর্ষ পরেও চিনি—
তাহা সুখের সহিত গ্রহণ করিতে পারি; অথবা সমান সুখে অপেক্ষা করিতে পারি।
আমার পদক্ষেপ প্রস্তরে সুদৃঢ়;
তোমাদের কথিত প্রলয়কে আমি উপেক্ষা করি
এবং আমি কালের প্রসার জানি।"

যেন কবি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি বলেন যে তিনি যাহা সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইবেন তাহা আমাদিগকেও মানিয়া লইতে হইবে, কারণ,

"সমস্ত মানবে আমি আপনাকে দেখি,
একটুও বেশী বা একটী যবকণাও কম নয়,
এবং আমি নিজের ভালমন্দ যাহা বলি তাহা তাহাদের সম্বন্ধেও খাটে।"

আত্মা সম্বন্ধে ও অমরত্ব সম্বন্ধে যদি আমরা আরো কিছু জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে এই রহস্যধর্ম্মী নীরবে স্মিতহাস্যে দাঁড়াইয়া থাকেন।

জীবন ও মৃত্যু কবির নিকট ভয়াবহ বা রহস্যের

অন্ধকারে লুপ্ত নহে। কৃষকের শস্য কর্ষণ ও কর্তন দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবেন যে জীবন কর্ষণ ও মৃত্যু কর্তন। প্রেসিডেণ্ট লিন্কনের শব লাইলাক ফুলে ঢাকিয়া তিনি ভাবেন যে আত্মা বিরাট ও অবগুণ্ঠিত মৃত্যুর দিকে মুখ ফিরাইয়াছে ও দেহ কৃতজ্ঞতায় তাহার কাছে সরিয়া আসিয়াছে। নির্জ্জন এক সামুদ্রদেশে যেদিন চলিয়া যাইতেছে তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হয় সেদিন চোখের সামনে প্রকাশিত হয় নাই তাহার কথা। দিন ও রাত্রি জীবন ও মরণ, বৃত্তাকারে চিরকাল ঘুরিতে থাকিবে।

"যৌবন, মহান্ উল্লাসে প্রেমে, মাধুরী শক্তি, সম্মোহন ভরা
জানকি, আসিবে জরা এমনি মাধুরী শক্তি, সম্মোহন নিয়ে?
বিকশে জ্যোতিতে দিন, মহাসূর্য্য কর্ম আশা আর হাসি নিয়ে
পিছু পিছু রাত্রি আসে নিয়ে লক্ষ সূর্য্য নিদ্রাপ্রান্ত অন্ধকার।"

তিনি অসহায়ের চক্ষুতে মৃত্যুকে দেখেন না। দিন যেরূপ সব কিছু প্রকাশ করিতে পারে না, জীবনও সেরূপ পারে না; সেজন্য মৃত্যু কি প্রকাশ করিবে তাহার জন্য তিনি অপেক্ষা করিবেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে মরণ 'শ্যাম সমান' প্রিয়; সে সুন্দর ও তাহাকে তিনি শূন্য হাতে বরণ করিবেন না। হুইটম্যান তাহাকে একেবারে দুহাতে দিয়া স্পর্শ করিবেন। ভারতীয় কবি আত্মচৈতন্য দিয়া তাহাকে অনুভব করিতে চান, আমেরিকার কবি তাহাকে দেহের প্রতি ইন্দ্রিয় দিয়া স্পর্শ করিতে চান। এই প্রভেদের বৈশিষ্ট্য আছে। শেষ জীবনে কবি মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছেন।

"অবশেষে সুকোমল ভাবে
দৃঢ় সুরক্ষিত গৃহের প্রাচীর হইতে
আমায় যেন ভাসাইয়া লইত।
আমি যেন নীরবে চলিয়া যাই
দুয়ারের তালা ধীরে উন্মুক্ত করিয়া মৃদুভাবে
দুয়ার খুলিত, হে আত্মা।
কোমল ভাবে অধীর হইও না।
হে মরদেহ, তোমার অধিকার প্রবল;
হে প্রেম, তোমার দাবী প্রবল।

ভারতীয় মহিলা কবি সরোজিনী নাইডুর "স্বর্ণ তোরণে" এমনি একটী কবিতা আছে; তাহাতেও মৃত্যুকে ধীরভাবে একটু অপেক্ষা করিতে বলা হইয়াছে; কারণ ধরনী, আকাশ বাতাস ইহাদের প্রতি আকর্ষণ এখনো শেষ হইয়া যায় নাই। হুইটম্যান, যে কবির পক্ষে বিরাট তালিকা উল্লেখের লোভ-সংবরণ প্রায় অসাধ্য, সেই কবি এখানে অন্তিম সময়ের স্বল্প-ভাষিতায় শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে ব্রাউনিং-এর পরলোক সম্বন্ধে নির্ভরশীল, আনন্দময় বিশ্বাস পাইনা। যাহাকে এই জীবনে প্রেম নিবেদন করা হয় নাই সেই মৃতা বালিকাকে সহস্র সহস্র জন্মস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোনদিন দেখিতে পাইবেন বলিয়া তাহার অসাড় হস্তে একটী পাতা রাখিয়া দেওয়া হুইটম্যানের মনে আসিবে না। ইহলোকই বলিতে গেলে তাঁহার সর্ব্বস্ব। তিনি ইহলোকের কবি।

এই ইহলোককে তিনি শান্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে চান, প্রাকৃতিক সব কিছুর সহিত এক হইয়া থাকিতে চান। ইহা তাঁহার বিশ্বাস ও আশা—যদিও জীবনে এ আশা পূর্ণ ভাবে সফল হয় নাই। সে জন্য তিনি কখনো কখনো মানুষ অপেক্ষা পশুকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন, কারণ মানুষ কতকগুলি অস্বাভাবিক অসম্ভব ও অন্যায় প্রাচীন প্রথাকে চিরকাল মানিয়া আসিয়াছে এবং তাহার মধ্যে পশুর শান্তি ও দ্বিধাহীন, প্রশ্নহীন ভাবে আপন ভাগ্যকে গ্রহণের গুণ নাই।

"মনে হয় পশু হয়ে থাকি তাহাদের সাথে। এত শান্ত
আত্মময় তারা।
দাঁড়াইয়া দেখি তাঁহাদের বহু রহক্ষণ।
আপন অবস্থা লয়ে করে নাই তাহারা ক্রন্দন;
আঁধারে রয় না জাগি, পাপভরে না করে বিলাপ—
ঈশ্বরের কর্তব্য লয়ে বিচারিয়া করে নাই আমার অস্বস্তি;
অসন্তুষ্ট নহে কেহ, সম্পত্তি উন্মাদ লয়ে হয়নি বিকল।
নতজানু হয় নাই কারো কাছে, সহস্রবর্ষের পূর্ব্বপুরুষের কাছে।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি কেহ নহে মানী বা অসুখী।

কবি কি পশুর মধ্যে শ্রেয়ঃকে পাইয়াছেন? তাহা নহে, তিনি যে শুধু চেতনাহীন শান্তিকে পছন্দ করেন তাহা মনে হয় না। মানুষকে সুখ ও দুঃখ দুইয়ের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে; জীবনের সকল অনুভূতিরই আস্বাদ লইতে হইবে।

শ্রেষ্ঠ জীবের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য মহৎ দুঃখ ও বিরাট ব্যর্থতার ভার বহন করা। সে ভার হুইটম্যানের মানব বহন করিবে। কারণ তাঁহার আত্মা কোন কাল্পনিক পারলৌকিক মঙ্গলের বস্তু নহে; তাহা সম্পূর্ণরূপে এই জগতের। আমাদের সকল আনন্দ বেদনা, বিফল স্বপ্ন ও সার্থক সাফল্য, অনিশ্চিত আশা ও ধ্রুবতারাসম অচপল আদর্শ সকলেরই জন্য আমাদের আত্মা দায়ী।

"আমরা নিজেদের কাছে ও নিজেদের মধ্যে সুন্দরতম।

"ঠিক অন্তরে আমরা আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ও সেখান হইতেই জগৎ জুড়িয়া শাখায় বাহির হই।"

"যদি হারি, কোন জেতা করে নাই মোদেরে বিজয়
চিররাতে যাই মোরা নিজেদের হাতে।"

আমরা যদি হারি তাহার জন্য শোক করিব না, কারণ কবির মতে শোক করার অর্থ ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা ও আত্মার পরিণতিকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া, এক কথায় আত্মাকে অস্বীকার করা।

এই আদর্শভয়ানক মনে হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে সব মহা আদর্শই ভয়ানক। এই সত্যের সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই সচেতন থাকি না। এবং সত্য কল্পনা হইতে অধিকতর আশ্চর্য্য মনে হয়। কারণ সত্য জীবনের কল্পনা; এবং জীবনের বানী তাহার উপযুক্ত আলোক-অক্ষরে প্রকাশিত হয়।

যে কবি আত্মার জয় ঘোষনা করেন তিনি নিশ্চয়ই স্বাধীনতার গানও গাহিবেন। "নীল ওন্টারিয়োর তীরে" নামক কবিতায় একটী বৃহৎ ছায়ামূর্ত্তি কবিকে গান গাহিতে বলিতেছে—

"যে গান আমেরিকার প্রাণ হইতে আসে সেই কবিতা সেই বিজয়-গাথা আমায় শুনাও;

স্বাধীনতার যাত্রাধ্বনি বাজাও, আরো পরাক্রমশালী যাত্রাধ্বনি বাজাও;

তুমি চলিয়া যাইবার আগে গণবাদের প্রারম্ভের গান আমায় শুনাও।"

হুইটম্যানকে সকলে যুক্তরাষ্ট্রের তথা আমেরিকার বিশেষ কবি বলিয়া জানে এবং বিরাট নগর নিউ ইয়র্কের দ্বারা প্রভাবান্বিত মনে করে। এই দুইটী কথার একটীও অতিরঞ্জিত নহে। তাঁহার গণতন্ত্রের আদর্শ একটী স্বপ্নের নগরের কবিতায় আছে—সেখানে সকলেই বন্ধু এবং আন্তরিক সবল অনুরাগ শ্রেষ্ঠ গুণ। সে গুণ নাগরিকদের প্রত্যেক প্রহরের কার্য্যে বাক্যে ও আকৃতিতে প্রতিফলিত হয়। এখানে দুইটী আদর্শের সংঘাতের কথা মনে আসে। স্বাধীনতা ও সংযোগ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণবাদ একই সময়ে কি করিয়া সম্ভব হয়? কবি বিশ্বাস করেন যে সদ্ভাব তাহা সম্ভব করিয়া তুলিবে। কাহারো ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না, অথচ দেশ বা সংঘের সীমাও কেহ অতিক্রম করিবে না। দেশ চিরবর্দ্ধমান, কাজেই প্রত্যেকের চিন্তাধারা ও কর্ম্মরাশিকে তাহা গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারিবে। ব্যষ্টির স্বাধীনতা সমষ্টির একত্বকে আঘাত করিবে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও কোন কর্ম্মহীন অলস বিলাসের সম্ভাবনা আনিবে না। এই স্বাধীনতা সার্থক যেখানে তাহা আত্মার প্রসারের সহায়তা করে। সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা কবির মতে সকলকেই উন্নত করিবে এবং কবি সে উন্নতির অংশ ভোগ করিবার জন্য প্রাচীকেও আহ্বান করেন। পাশ্চাত্য আদর্শের কবি, বিশেষভাবে আমেরিকার যন্ত্রসভ্যতার কবি নব জাগ্রত পশ্চিমের নবীন স্বাধীনতাকে পূজ্য এশিয়ার কাছে নতমস্তক হইতে বলেন। স্বাধীনতার পশ্চিমযাত্রা সফল হইয়াছে কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ হইবার জন্য পূর্ব্বাভিমুখেও এশিয়াতে ও আফ্রিকাতেও আসিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় কোন পাশ্চাত্য সমালোচক কবি এই পূর্ব্বপ্রীতির উল্লেখ করেন নাই।

হুইটম্যানের পূর্ব্বযুগে কবিতার মূল সুর ছিল বিষাদ। কবিরা বলিতেন ভাবার অর্থ দুঃখী হওয়া। শেলী এবং শিলার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বিষাদের গানই মধুরতম। শুধু রসের দিক দিয়া নহে, অনুভবের দিক দিয়াও এই তথ্যই প্রচলিত ছিল। ওবারম্যানের করুণরস শুধু মাথ্যু আর্নল্ড নয়, বহু কবিকেই আচ্ছন্ন করিয়াছিল; কবিতার অবিচ্ছিন্ন সীমাহীন দিগন্ত ক্রন্দনের আভাসে পরিপূর্ণ ছিল। এই সময় ইংলণ্ডে একজন কবি আনন্দের কবিতা লিখিয়াছিলেন; ব্রাউনিং জগৎকে শান্তভাবে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পথচারিণী বালিকা 'পিপ্পা' পৃথিবীতে সবই

ঠিক মত আছে বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু হুইটম্যান সেখানেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি পথকে আরো উগ্রতর আনন্দে পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষাদাচ্ছন্ন হন না, দুঃখের ছায়াও কাহারো উপর পড়িতে দেন না। তাঁহার 'আনন্দের গাথা,' 'খোলাপথের গান', 'অগ্রদূতদিগের গান' ইহাই প্রমাণ করে। তিনি কুঞ্জকুটীরের অভ্যন্তরে বাতায়ন হইতে আনন্দের দৃশ্য দেখেন না, বাহিরে আসিয়া ধূলির ধরণীর মৃদু গন্ধ অনুভব করেন, যে পথের অলক্ষ্য অবসান অজ্ঞাত সে পথের অনন্ত যাত্রী হন। আর মানুষের জীবনই কি একটা অনন্তের উদ্দেশ্যে সীমাহীন যাত্রা নয়?

এই প্রাণের প্রাচুর্য্যময় আনন্দই তাঁহার কবিতায় বহু দোষ আনিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি—প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা। তিনি প্রেমের বাক্যহারা বিস্ময়ে ক্ষান্ত হন না, বিপুল উৎসাহে তাহার দৈহিক পরিণতির আলোচনা করেন। তিনি দেহকে পবিত্র মনে করেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কখনো ইহার আকর্ষণ সম্বন্ধে নীরব থাকেন না।

"যদি কোন বস্তু পবিত্র হয় তবে মানবদেহ পবিত্র এবং মানুষের গৌরব ও মাধুর্য্য নিষ্কলুষ মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান, এবং নর বা নারীর পরিচ্ছন্ন সবল সুদৃঢ় দেহ সুন্দরতম মুখ হইতেও সুন্দর," কিন্তু এই সুন্দর বস্তুর শবব্যবচ্ছেদ শুধু যে নীতি-বাগীশেরই আপত্তির বিষয় তাহা বলা চলে না। স্বাভাবিক জীবনের সকল অবস্থা ও দিককে সরল, সহজ আনন্দে গ্রহণ করিয়াও কতগুলি বিষয়ে নীরব থাকা চলে। নীরবতারও নিবিড় প্রকাশ আছে। এমন কি বায়রণও তাহা বুঝিয়া মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সূক্ষ্ম মুহূর্ত্তে একটা রহস্য আবরণ টানিয়া দিতেন; কিন্তু হুইটম্যান কালিদাস নহেন, অমরুও নহেন, তিনি মধুর কবি। প্রবল প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ তাঁহার ভাবের গভীরতার তুলনায় অনুভূতির সূক্ষ্মতা কম। সেজন্য গোপনতম, একান্ত আপন অনুভবকে জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে তিনি পারেন। তাঁহার মধ্যে যাহা পাই তাহা প্রেমের লীলা নহে, কামের লোভ, যৌবন তাঁহার নিকট ফুটিয়া উঠে সৌন্দর্য্যে নহে, সৃষ্টিক্ষমতায়।

কাহারো সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে আমরা দুইভাবে বিচার করিতে পারি। সাহিত্যিক নিজের জীবন, আশা ও উদ্দেশ্যকে এরূপভাবে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে যাহাতে, তাহা পাঠকের অস্তিত্বের সহিত এক হইয়া যায়। গ্রীক মহিলা কবি স্যাফোর দুইটী পংক্তি প্রেমের আবেগে আমাদিগকে প্রেমের প্রতি জাগ্রত করিয়া দিতে যদি পারে, তবেই তাঁহার রসসৃষ্টি সার্থক অথবা সাহিত্যিককে এমন কিছু রাখিয়া যাইতে হইবে যাহা পাঠকদের নূতন জগতের বা পুরাতন জগতের নূতন রূপের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে পারে। দান্তে যখন নরকের চিত্র আঁকেন তখন আমরা সম্মুখে নরক দেখিতে পাই, মিল্টনের নরক আমাদিগকে নরকে লইয়া যায়, আর ম্যাকবেথের মধ্যেই একটী জীবন্ত নরকের চিত্র ফুটিয়া উঠে। এই সবগুলি রচনাই সার্থক। হুইটম্যান নিজেকে প্রচুরভাবে খুলিয়া দেখাইলেও তাহা সম্পূর্ণ নহে কারণ তাঁহার কবিতার বহির্ব্বাস পাঠককে অভিভূত করিবে কিন্তু বহুক্ষণের জন্য অনুভূত করাইবে না। পাঠকের মনে স্বতঃ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে না তাহার সকল বাণী গ্রহণযোগ্য বা আকর্ষনীয়ও নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা গুরু অভিযোগ ছিল তাহাই তাঁহাকে অমর করিবে। তিনি আভিজাত্যের কবিতা লিখেন নাই এবং সাহিত্যের আসরে ইতর বস্তু আনিয়াছিলেন। এই অভিযোগের কারণ এই যে আমরা ভুলিয়া যাই যে সৃষ্টি হিসাবে দেবমন্দির ও কুটীর, মহাকাব্য ও চারণগাথা একই রকম সার্থক হইতে পারে। হুইটম্যানের ভবিষ্যৎ আছে এইজন্য যে তাঁহার কবিতা মানুষকে তাহার সাধারণ অস্তিত্ব ও সামান্য সার্থকতার হাত হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে; তাহাকে আত্মশ্লাঘা ও মূল্য দিয়াছে, তাহারও যে ভাগ্য আছে ও ভবিষ্যত আছে তাহা স্বীকার করিয়াছে ও তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছে। তাঁহার "নমস্কার পৃথিবী" কবিতা একটী সুন্দর প্রমাণ। সহানুভূতির গভীরতা ও উৎসাহের নিবিড়তায় তাঁহার কবিতা যে কোন কবির কাব্য-বিলাসকে অতিক্রম করিয়া যায়। টেনিসন একটি শান্ত-রসাস্পদ জীবনে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধ্যান ছিল কথা, সৌন্দর্য্য, কৃষ্টির উপর মানবকে প্রতিষ্ঠিত করা। হুইট-ম্যান আশ্রয়হীন শান্তিহীন মানবকে আশ্রয় দিয়াছেন, বার-বনিতাকেও আশ্বাস দিয়াছেন যে সূর্য্য যতদিন না তাহাকে

ত্যাগ করে ততদিন তিনিও তাহাকে ত্যাগ করিবেন না। ওয়ার্ডস্বার্থ যে আলো পর্ব্বতে বা আকাশে নাই তাহাকে-ধরিয়া মানবের আনন্দ বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু হুইটম্যান বলেন—

"আমার আত্মা, সহানুভূতি ও সংকল্পে সমস্ত পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া গিয়াছে;

সর্ব্বদেশে আমি সমকক্ষ ও প্রেমিকের সন্ধান করিয়াছি ও তাহাদের আমার জন্য প্রস্তুত দেখিয়াছি।"

ওয়ার্ডস্বার্থ মানুষকে দয়া করেন। হুইটম্যান তাহাকে হাত ধরিয়া তুলেন। ওয়ার্ডস্বার্থ বক্ষে বেদনা অনুভব করেন কারণ তিনি কবি, হুইটম্যান সে বক্ষ পাতিয়া দাড়ান, কারণ তিনি মানব।

জীবনযুদ্ধে যাহারা অখ্যাত অথবা সংসারে যাহারা ভগ্ন-দূতের ন্যায় ম্লান মূঢ়-মূক ভাবে এককোণে দাঁড়াইয়া আছে তিনি তাহাদের কবি, তাহাদেরও যে জীবনের মূল্য ও প্রয়োজন আছে তাহা দেখাইয়া তাহাদের আত্মাকে নববেশে সাজাইয়াছেন। আমেরিকাকে লোকে ধণিকতন্ত্রের, বণিকতন্ত্রের দেশ বলিয়া জানে, তাহার সম্পদের কথা জানে, কিন্তু যাহাদের প্রথম প্রচেষ্টায় সে দেশ গঠিত ও যাহাদের অস্থিমজ্জার উপর সে সম্পদ প্রতিষ্ঠিত তাহাদিগকে ধুলির মলিনতা ও দৈন্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া কবি যে দেখাইয়াছেন তাহার জন্য সকলে তাঁহার কবিতা পড়িবে।

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস

শুকতারা

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার

আমার পরাণ কাঁদে অজন্তার অস্পষ্ট আঁধারে।
উদয় অচলে বসি' সকরুণ গাহে শুকতারা
দিনের কল্পনা-গীতি। প্রভাতের নাহি পেল সাড়া,
এলো ফিরে ব্যর্থতায়—নিরাশার নিতল পাথারে।"
তাহারে ভুলেছে আলো—ভুলে গেছে নির্দ্দয়ের মত।
সৃষ্টির উৎসব হ'তে দূরে তারে রেখেছে একাকী
অযুত খিকার মাঝে। অগ্রদ্বার কুয়াসায় ঢাকি'
রেখেছে নিরন্ধ্র করি,—রুদ্ধ করি প্রবেশের পথ।
কুহকের কালো মায়া পরাজিত যুগান্তর ধরি
প্রকাশের পদ প্রান্তে।—বালারুণ উঠে আসে ধীরে
যুগের জড়িমা নাশি'। আলোকের স্বর্ণপাত্র ভরি
'নব চেতনার' বাণী এনে দেয় ধরণীর তীরে।
কোথা সে প্রকাশ?—কোথা? কোথা সেই দীপ্ত আশাবরী?—
আঁধারের মৃত্যু বাজে আজি মোর জীবন-মন্দিরে।

শিশুদের সর্দ্দি কাশি
কখনও উপেক্ষা করিবেন না।
তাহারা কাশিলেই ইহা সেবন করিতে দিবেন
সিরোলিন
রচি
সম্পূর্ণ নির্ভর যোগ্য ও নিরাপদ।
খাইতে সুস্বাদু বলিয়া ছেলে মেয়েরা
ইহা আনন্দের সহিত খাইয়া থাকে।

সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত।

নেপথ্যে

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

মেয়ে-স্কুলে একজন মাষ্টার চাই। রমেন এসে বল্লে— দাওনা একটা দরখাস্ত ছেড়ে, ম্যান্‌ট্রিকেপ্‌টিক ত হয়েই আছ। সাদি করিনি না হয়, সাধ যে না যায় তা নয়। মাড়োয়ারীকে দেখে আঁচ করা যায় না তার কত টাকা, তোমারও তেমনি চেহারায় ধরা পড়েনা ভেতরের ভাব বুদ্ধি;—লেগে পড় হয়ে যাবে।

চুপ করে শুধু হাসি। আজ পাঁচ বৎসর, পণ্য দ্রব্য হ'য়ে চাকরির বাজারে পড়ে আছি—; দরখাস্ত একটা দিই।

কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে ডাক আসে। দু'জন উমেদার, যোগ্যতা দু'য়েরই সমান। আমাকেই পছন্দ করে, বোধ হয় চেহারার গুণে, বলে—আসবেন কাল থেকে। অপর লোকটি বিফল মনোরথ হয়ে যাবার সময় একটা খোঁচা দিয়ে যায়, বলে— বেশ ভাল ব্যাকিং ছিল, আমার দিকে তাকিয়ে ওরা ওদের মেয়েদের দিয়ে ভরসা পেলনা বোধ হয়। যাক—চাকরিটা গেল কিন্তু পুরুষত্বের গৌরবটাত বজায় রইল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে যেতে যেতে বলি—এখানে ছুটে এসেছি বজায় রাখতে অশিত্ব, পুরুষত্ব নয়।

বাড়ী ফিরে আসি। সুরমা শুনে খুসিই হয়, তবু মনে হয় তার মধ্যে যেন একটু 'তবে' আছে। স' পাঁচ আনা খরচ করে হরির লুট দেয়। চাবি শুদ্ধ আঁচলটাকে গলায় জড়িয়ে তুলসী মঞ্চের সামনে গড় হয়ে হরির উদ্দেশে প্রণাম করে;—বোধহয় প্রার্থণা করে আমার চাকরি ও মন দু'টোর উপরই একটু নজর রাখতে।

স্কুলে যাই, হেড্‌মিষ্ট্রেসের দিকে তাকিয়ে একবার একটু দেখে নিয়ে হাত তুলে নমস্কার জানাই। কিঞ্চিত স্থূল, কিন্তু তা ব'লে দেখতে নেহাৎ মন্দ নন, তবে কারুর ভালবাসার পাত্রী বলে ধারনা করা যায় না। মুখ ও স্বর দ্রুপদের মত গম্ভীর, বললেন—অঙ্কের ক্লাস নিতে হবে, বসুন ওখানে, কেরাণী বাবুকে বলে দিচ্ছি রুটিনটা করে দিতে।

ক্লাসে যাই। গণিতের ভাণ্ডার নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন পরিমাণ বিতরন করে বেড়াই। পড়াবার সময় বিশেষ করে কারো দিকে বড় একটা তাকাই না, দৃষ্টিটাকে চালিয়ে দিই সকলের মাথার উপর দিয়ে। বয়েসটা অল্প, সব রকমেই সাবধান হয়ে চলি। কি করতে কি করবো, বলে বসবে উৎসাহের আতিশয্য।

সুরমা বলে—কামিয়ে যাও মুখটাকে, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে যে ছেয়ে গেছে। তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর করি—থাক আজকে, কাল র'ব্‌বার, কালই কামাব।—শেষ পর্য্যন্ত তাঁর অনুরোধ না এড়াতে পেরেই যেন কামিয়ে যাই।

স্কুল থেকে ফিরে শ্রান্ত দেহটাকে ভাঙা ইজি-চেয়ারের উপর এলিয়ে দিই। সুরমা জলখাবার সামনে দিয়ে খুটি নাটি কত খবরই না জিজ্ঞেস করে। হটাৎ প্রশ্ন করে—আচ্ছা তোমার সব ছাত্রীই আমার চাইতে সুন্দর, না? বলি—অত খেয়াল করে ত দেখিনি; তোমার চাইতে সুন্দর হ'লে চোখে ঠেকতো হয়ত। সুরমা বিশ্বাস করে না, তবু খুসী হয়।

তৃতীয় শ্রেণীতে ক্লাশ নিতে বড় অসুবিধে হয়। পাশের ক্লাশে মিস্ দত্ত ইংরাজি পড়ান। শিক্ষয়িত্রীর অসংখ্য ভুল, ছাত্রীদের অশ্রান্ত কোলাহল কাণে এসে পৌছয়। বোর্ডে লিখতে লিখতে থেমে পড়ি; একবার মনেও হয়, যাই, অনুরোধ করে আসি গণ্ডগোলটা থামাতে। আবার ভাবি আনন্দ-লোক থেকে এসেছে যাঁর আমন্ত্রন, এ কাজে এসেছে যার শ্রান্তি, শান্ত করবার কঠোরতা সে পাবে কোথায়? আর যাচ্ছেনইতো চলে মাস দুই পরে এই ব্যর্থতার হাত এড়িয়ে জীবনটাকে স্বার্থক করে তুলতে।...এক এক দিন এসে তিনি বলেন, 'চপলাদির মত আছে,—দয়া করে যদি আমার ক্লাসটা —মাথাটা কেমন যেন করছে।' মনে মনে বলি, মাথাটা না মনটা। কিন্তু অমত করিনে। ছোট্ট একটি নমস্কার জানিয়ে দ্রুত

চলে যান গেটের দিকে। আবার ফিরে এসে বলেন, 'দেখুননা কি অন্যায় আমার, একটা ধন্যবাদ পর্য্যন্ত জানিয়ে যেতে ভুলে গেছি। সত্যিই আপনি ইয়ে না করলে—;' কৃতজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়ে ওঁর ছুটির প্রয়োজনীয়তা। কে একটি যুবক গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাই। প্রথম দিন নামের তালিকা খুলে ডাকতে ডাকতে থেমে পড়ি, নামটা বিশেষ করে নজরে পড়ে, ডাকি—বুলাকি সেন। দাঁড়িয়ে বলে—উপস্থিত। একবার তাকিয়ে দেখি, নিজের চোখও যেন বলে উঠতে চায়—'উপস্থিত'। ফুট-ফুটে রং, টানা টানা চোখ, লাবণ্য আর দুষ্টুমি যেন মাখামাখি হয়ে ছেয়ে আছে মুখখানাকে। দু পাশ দিয়ে লম্বা দু'টো বিনুনী ঝুলে পড়েছে ঠিক ইরাণীদের মত। নামের তালিকার মত এখানেও চোখ থেমে পড়তে চায়, জোর করে নাবিয়ে আনি। সমষ্টিকে লক্ষ্য করে পড়াতে সুরু করি, পেরে উঠিনে। বুলাকি বড় চঞ্চল, সকলের মধ্যে সে হারিয়ে যায় না। বাধ্য হয়ে তার সত্ত্বা আমাকে স্বীকার করতেই হয়।

অঙ্ক কষতে দিই। মীরা নাকি সুরে বলে—দেখুন না মাষ্টার মশাই, বুলাকি কি সব বলছে; বলে তোর ওপরের ঠোঁটটা সেকেও ব্র্যাকেটের মত।

জিজ্ঞেস করি—তোমার অঙ্ক হ'য়েছে বুলাকি?

মীরা ফস্ ক'রে বুলাকির হাত থেকে খাতাটা নিয়ে টেবিলের উপর এনে রেখে যায়। খোলা পাতাটার উপর তাকিয়ে দেখি লেখা রয়েছে, 'অরুণার মুখটা সিম্প্লিফাই করলে সব মিলে গিয়ে ফল হয় ডবল শূণ্য, সে দু'টো ওর চোখ। ক্লস থেকে মাষ্টার মশাই বাদ গেলে থাকে শুধু মেয়েরা—উঃ কি মজা!'—এমনিধারা কত কি ছেলেমানষি কথা। রাগ হয়না বরং হাসি পায়, তবু গম্ভীর হ'য়ে বলি—রইল খাতাটা, হেডমিষ্ট্রেসকে দেখাব। বুলাকির চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। যাবার সময় খাতাটা দিয়ে বলে যাই, ভবিষ্যতে এমন হ'লে মাপ ক'রবোনা।

পরের দিনও তেমনি। দুষ্টুমি তার লেগেই আছে। বুলাকির দিকে নজর না দিতে চেষ্টা করি, মন ও চোখ ব্যাপ্তি ঘুচিয়ে বিশেষ কোথায় যেন আশ্রয় খোঁজে। শ্রেণীর প্রথম মেয়ে সাহানা, সাহানারই মত করুণ তার মুখ, রং তার খুবই ময়লা, সুশ্রী তাকে কোন রকমেই বলা চলেনা। তারই কাছে গিয়ে দাঁড়াই, পরিচয় করি, তারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পড়িয়ে চলি। দিন যায়, সবাই বলে, সাহানা আমার প্রিয় ছাত্রী,—কেউ তা'তে অপরাধ নেয় না।

হেডমিষ্ট্রেসের কাছ থেকে ডাক আসে। তেমনি একটি ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে দাঁড়াই। আদেশের সুরে বলেন—কেরাণী বাবুর বড্ড কায পড়েছে, অবসর সময় ওঁকে এসে একটু সাহায্য করবেন।

স্নেহ ভালবাসার বাইরে মেয়েদের কাছ থেকে আদেশের সুরটা কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে। কিন্তু রাজি হ'য়ে ফিরে আসি।

টিফিনের সময় বারান্দার বেঞ্চিটার উপর বসে থাকি। সামনের খোলা যায়গাটায় কত মেয়ে ছুটো-ছুটি করে। কতক ঘুরে বেড়ায় কতক বা এখানে ওখানে দল বেঁধে বসে গল্প করে। বেশ লাগে দেখতে, যেন তুচ্ছ বুনো ফুলের এক একটা গুচ্ছ, বিশেষ করে কারুরই সত্ত্বা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেনা, তবু সবাই মিলে তারা বেশ সুন্দর হ'য়ে ওঠে। খানিকটা দূরে জামরুল গাছের নীচে বড় মেয়েরা বসে অবিশ্রাম কথা বলে চলে, ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করি এর মধ্যে শ্রোত্রী কে। ভাবি, নারী ও নীরবতার দ্বন্দ্ব আজও ঘুচল না।

বুলাকি কোথা থেকে স্যাণ্ডালটাকে চট-পট্ করতে করতে ছুটে আসে। দরোয়ানটাকে বলে দাওতো এক পয়সার কুল। কুলগুলো মুঠো মুঠো গলার কাছ দিয়ে সেমিজের মধ্যে গলিয়ে দেয়। বাঁ হাতের নুনের উপর একটা কুলকে বার দুই জোর করে টিপে টপ করে মুখে ফেলে। তার পরেই গালের কাছে হাত নিয়ে নাক কুঁচকে মুখটাকে একটু ফাঁক করে বলে—বাবাঃ কি টক! আবার খেতে থাকে; মুখের ভাবে ধরাই পড়েনা টকত্বটা কুলের দোষ না গুণ।

একটু কথা বলতে ইচ্ছে হয়। ডেকে বলি—টক কুল খেয়োনা, কাসি হবে যে।

দাঁতে দাঁত চেপে মুখে তৃপ্তি-সূচক শব্দ করে জবাব দেয়—অমন কত খাই কিচ্ছু হয়না আমার। আচ্ছা মাষ্টারমশাই, অঙ্ক কষতে আমার মোটেই ভাল লাগে না; কেন বলুন ত? দেখবেন, এবার অঙ্কে পাব আমি শূন্যি

দেখবার পূর্ব্বেই এ সত্য আমি মনে মনে স্বীকার করি। মুখে বলি—একটু মনযোগ দিয়ে চেষ্টা করলে সেরে নেবার মত ঢের সময় এখনও আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে ঝোঁকটা একটু যেন বেশি বোধ করি। মাঝে মাঝে বুলাকি স্কুলে আসেনা, বড়ই ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, পড়াতে আর যেন তেমন উৎসাহ পাইনে।

ভূগোলের টিচার বদনবাবু এসে বলেন—কি নামটাই না করেছেন স্কুলে। টিচার, ষ্টুডেণ্ট, সবাই বলে এমন লোক নাকি হয় না। নোটিশ পেয়েছেন নিশ্চয়, থাকবেন ত আজ টিচার্স মিটিং-এ?—

স্বভাব চরিত্রের প্রশংসায় আমার কায়েমী সত্ব, শুনতে শুনতে সয়ে গেছে; নূতন করে আনন্দ দেয় না।—ছুটির পর সভা বসে। স্বজাতিদের পাশে যেয়ে বসে পড়ি, অপর দিকে জুটো বেঞ্চে বসেন মেয়ে-টিচাররা। মনে মনে ভাবি, হ'তো যদি এটা সয়ম্বর-সভা, উভয় পক্ষই থাকতো চক্ষু মুদে। আমাদের বেছে নিয়েছে কমিটী, ওদের ইউনিভারসিটি। দু'একজনের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় কোন দিন কিছু একটু ছিল, বোধহয় শুষে নিয়েছে বইএর পাতায়, ফিরিয়ে যা' দিয়েছে তাই থেকে মাসে এই তিরিশ টাকা। বসে বসে সাময়িক একটা ঔদাসিন্য আসে, অন্তত তখনকায় জন্যে, মনে হয়, দুনিয়ায় এরই জন্যে এত!

বেতন বৃদ্ধির আবেদন নিয়ে এই সভা,—স্থির একটা কিছু হয়।

ক্লাশে যাই। বুলাকি এসে বলে আমার প্রাইভেট টিউটার চলে গেছেন, আপনি যদি পড়ান ত বেশ হয়। অঙ্কে তা হলে আমি নিশ্চয় পাশ করব।

বুলাকি আগ্রহের সহিত উত্তরের অপেক্ষা করে। রাজি হ'তে যেয়ে থেমে পড়ি, বলি—বলব কাল।—কত কি ভেবে নিষেধ করে দেওয়াই ঠিক করে ফেলি।

স্কুল থেকে ফিরে বাড়ীতে বসে থাকি। সুরমা এসে বলে—কই আজকে বেরুলেনা যে?

বলি—থাকনা, বরং সে সময়টা তোমার সাথে বসে গল্প করি। সুরমা চেয়ারের হাতলটার উপর বসে মাথার চুলগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে কত কথাই না বলে চলে।

একটু যেন বেশি আদর করি। কে জানে সুরমা টের পায় কিনা। কথায় কথায় বলে ফেলি—বিশ টাকা মাইনেতে একটা 'টুশনি' পাই, নিষেধ করে দেব ঠিক করেছি।

সুরমা আশ্চর্য্য হয়ে মুখের দিকে তাকায়। ঠাট্টার সুরে বলি—সুন্দরী মেয়ে—কি জানি, বলাতো যায়না!

শুনে কি একটু ভেবে নিয়ে মুখ ভার করে জবাব দেয়—বেশতো তাই যদি হয়, থাকবে সুখে, আমি তাতে বাদ সাধতে যাব কেন?

চিবুক ধরে আদর করে বলি—তাইত ভাবি, সুরুতেই এই।

মাথাটা কাঁধের উপর এলিয়ে দিয়ে উত্তর করে—তা বুঝি, এমন দেবতার মত মানুষ দিয়ে কারুর বুঝি ভয় হয় আবার! বলি—দেব চরিত্রের ইতিহাসে এমন ধারা দুর্ঘটনার নজীর কম নয় সুরমা!—সুরমাও নিজকে এক সঙ্গে ভরসা দিতেই যেন বলি—বুলাকিরা খুবই বড়লোক; আমার তরফ থেকে এ অসীম সাহস, ওর তরফ থেকে এ আজগুবি সখ—দুইই অসম্ভব।

শেষ পর্য্যন্ত মত দু'জনেরই হয়। সন্ধ্যায় বুলাকিদের বাড়ী যাই। সাগ্রহে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায় ড্রইং রুমে বসাতে। কী সুন্দর করেই না সাজান সেই ঘরখানা। দরজায় জানালায় ঝুলছে সব হালকা কাপড়ের দামি দামি পর্দা। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের পরদার মত আবর্জ্জনার আবরণ তারা নয়, তাদের কায শুধু সুন্দরকে অতি সুন্দর করা। বুলাকির দিকে তাকাই; তার মুখের দুই পাশে অসংলগ্ন কালো চুলে হাল্কা হাওয়া দোল দিয়ে যায়। বলে—বসুন এখানে। চা খেয়ে তারপর পড়ার ঘরে যাবেন।

সমস্ত মেঝেটা চক চক করছে আয়নার মত, চলতে পা ফস্কে যায়। বুলাকি চট করে একটা হাত ধরে ফেলে, অন্য হাতের ধাক্কা লেগে সেণ্টার-টেবল থেকে পেতলের ফুলদানীটা সশব্দে পড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে। বড়ই অপদস্থ হ'য়ে পড়ি। লজ্জিত হ'য়ে হাত বাড়িয়ে তুলতে যাই। বুলাকি বলে ওঠে—বারে, আপনি কেন তুলবেন, আমি তুলছি, আপনি বসুন।

একটা কৌচের উপর বসে পড়ি। বুলাকি আমার দিকে

চেয়ে ঘটনাটাকে সহজ করে তুলতে চেষ্টা করে। বলে—মাও সেদিন এমনি পড়ে গিয়েছিল। বাবা বলেন, কার্পেট পেতে দেব। আমার কিন্তু কার্পেট মোটেই পছন্দ হয়না, এক একটা যেন ধূলো খেকো রাক্ষস।

মুখে হাসি টেনে বলি—না বুলাকি এ ঘরে আর আমি আসবনা। কখন পড়ে গিয়ে হাত পা-ই না ভেঙে ফেলি।

বলে—না মাষ্টারমশাই একটু চলতে চলতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। উত্তর করি—চলতে গিয়ে চলাটাই অভ্যাস হবে কি পড়াটা অভ্যাস হবে কে জানে।—হঠাৎ-বলা সত্যের মত কথাটা নিজের কানেই বাজে, মনটা কেমন যেন খচ করে ওঠে।

বুলাকি তার মা বোন সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। একদিনের পরিচয়ে নিঃসঙ্কোচে সবাই আমার কাছে আসা-যাওয়া করে। মেয়েদের অভিভাবকরা আমাকে দেখে ভয় পায় না, মেয়েরা লজ্জা পায় না—অন্তরপুরুষ অপমান মানে। প্রতি সন্ধ্যায় পড়াতে যাই। নির্ব্বিকার শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জ্জন করে বাড়ী ফিরে আসি।

পড়াবার সময় বুলাকির ছোট বোন ছায়া এসে পাশে দাঁড়ায়। বছর দশেক বয়েস, রংটা একটু ময়লা, মনে হয় ছায়া যেন বুলাকিরই ছায়া। গলার স্বর দু'জনেরই যেমনি সরু তেমনি মিষ্টি। বুলাকিকে অঙ্ক কষতে দিয়ে ছায়ার সাথে গল্প জুড়ে দিই, কত আদর করি। হঠাৎ মনে হয় ওকে উপহাস কচ্ছি; নিজের কাছেই যেন নিজে ধরা পড়ে যাই। ছেড়ে দিয়ে বলি—'যাওতো ছায়া, চট করে এক গেলাস খাবার জল নিয়ে এস ত।'

অরুণ এসে বলে—নমস্কার মাষ্টারমশাই। কি বুলা, পড়া হলো?

বুলাকি হাতটাকে হাওয়ার উপর ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—অরুণদাকে এখান থেকে যেতে বলুন মাষ্টারমশাই, ভারি দুষ্টু ও, আমার অঙ্ক সব ভুল করিয়ে দেয়।

অরুণ বেরিয়ে যাবার মুখে উভয়ের মধ্যে হয় দৃষ্টি বিনিময়, নিমেষে আমি ওদের চোখের ভাষা পড়ে ফেলি—বুকটা কেমন করে ওঠে।

সরু টেরী—ক্রষ্ট. হ'লনা এখনো?

বুলাকি চট্ করে চোখ নাবিয়ে নিয়ে কি যেন বলে; প্রথমটা কানেই পৌছেনা। জিজ্ঞেস করি—কি বল্লে?—

বাড়ী ফিরে এসে সটান বিছানার উপর শুয়ে পড়ি। ডাকি—সুর'!

সুরমা এসে জিজ্ঞেস করে—আমাকে খুঁজছিলে?

মনটা সমস্ত বুকময় ছুটোছুটি করে কেবলই বলতে থাকে—হ্যাঁ সুর', তোমাকেই খুঁজছি, তোমাকেই খুঁজছি।

সুরমা শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করে—কথার জবাব দাওনা কেন গো, অমন চুপ করে রইলে কেন?

উত্তর করি—না, এই বলছিলাম- কি মাথাটা বড্ড ধরেছে। সুরমা বলে—ভাতটা নাবিয়ে এক্ষুনি আসছি।

পড়ার ঘরে এসে বসি। বুলাকির আসতে একটু দেরি হয়। সেল্ফ থেকে বই নিয়ে নাড়া চাড়া করতে থাকি। হঠাৎ একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে, লেখাটা অরুণের। একবার একটু দ্বিধা আসে, পরক্ষণেই পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখি।

বাড়ী ফেরবার মুখে কর্ত্তার আপিস কামরায় ঢুকি। চিঠিখানা বুলাকির বাবার হাতে দিয়ে ফেলি। পড়া শেষ হয়। মুখের চুরুটটা নাবিয়ে রাখতে রাখতে বলেন—ষ্টুপিড, কোথাকার। কদ্দিন বলেছি ওর মাকে ছোকরাকে নিষেধ করে দিতে এখানে আসতে। ...ওসব 'স্মার্টনেসে'র মানে আমরা বুঝি।

তিনি কি বোঝেন বুঝতে আমার বাকি থাকে না। তার অর্থ অরুণের অর্থাভাব, না হয় আর সব মিলিয়ে সে যা'—বোধহয় উৎসাহই পেতো।

বুলাকির বাবা বলে চলেন—অনেক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আজকালকার ছোকরাদের মত আপনি এসব পছন্দ করেন না বলেই ত সময় মত জানতে পেলাম। আপনার মত শিক্ষকই ত—এই রকম আরও কত কি। বিদায় দেবার পূর্ব্বে অনুরোধ করি নামটা আমার গোপন রাখতে।

অরুণকে আর এ বাড়ীতে দেখতে পাইনে। শুনি তার নাকি এখানে আসা বারণ হ'য়ে গেছে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে, দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে ভাবি, যাক! হঠাৎ নিজেরই অজ্ঞাতে আঙুলটাকে কামড়ে ফেলি।

অরুণ আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। কেবলই অনুরোধ করে শুধু মাত্র একটি বারের জন্যে ওদের সাক্ষাতের সুবিধে করে দিতে। বলে—আপনাকে বলতে সাহস পেতাম না; কিন্তু জানি আপনি আমাদের দুজনকেই অত্যন্ত স্নেহ করেন, সেই ভরসাতেই—

কথা তার অসমাপ্ত থেকে যায়, সবটুকু অনুনয় ফুটে ওঠে তার চোখে আর মুখে। বাছাই করা সব ভাল ভাল কথা বলে তাকে উপদেশ দিই। তবু অনুরোধ করে। শেষ পর্য্যন্ত আশা দিয়ে বলি—আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে।

অরুণ আবার আসে। আগ্রহের সহিত উত্তরের অপেক্ষা করে। তাকে বলি বুলাকি রাজি হবেনা বোধ হয়, ভাব দেখে মনে হয় ওঁর মন বদলে গেছে; তাই সাহস পাইনি জিজ্ঞেস করতে।

ঠিক বিশ্বাস করতে চায়না তবু কথাটা বিষম আঘাত করে অরুণকে। মুখ চোখ দিয়ে বেদনা যেন ফেটে পড়তে চায়। কিছু না বলে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বুলাকি স্কুলে যায়না, শুনি তার বিয়ের কথা হচ্ছে। পড়াতে বসি, বুলাকির মা গলা খাটো ক'রে বলেন—তিন দিন ধরে কিছু খাচ্চে না; আপনার কথা ও খুব শোনে, একটু যদি বুঝিয়ে বলেন...

বুলাকি টেবিলের উপর ঝুঁকে থাকে একটা বইকে উপলক্ষ্য ক'রে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, ব'লতে কোন কথাই খুঁজে পাইনে; আস্তে একটা হাত তার মাথার উপরে রাখি। মুখ তুলে একবার তাকায়। মুখখানা বড়ই শুকনো, দুষ্টুমির ভাবটুকু আর খুঁজে পাইনে, সেখানে দেখতে পাই একটা দৃঢ়তা। দু' একটা কথা বলতে যাই গলা ধ'রে আসে। হঠাৎ মাথাটাকে দুই হাতের মধ্যে গুঁজে বুলাকি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, তার দুঃখ ও দৃঢ়তা চোখের জলে গলে পড়ে।

কিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করি—ওর সাথে একবার দেখা করবে বুলাকি?

মাথা নেড়ে জানায়, না। ক্ষণ পরে তেমনি মুখ গুঁজেই প্রশ্ন করে—ও নাকি কোথায় চলে যাচ্ছে?

বলি—শুনেছি, কিন্তু কোথায় যাবে বলতে পারিনে। মাথা না তুলেই বুলাকি বলে চলে—ওকে আমার হ'য়ে বলবেন, বাড়ীর সবাই যা চেষ্টা কচ্ছে তা' হবেনা, আমি মন স্থির করে ফেলেছি—পরে সব জানাব।

বলি—যা বলবার আছে একটা চিঠিতে লিখে দাও।

চিঠিটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াই। বুলাকি একবার আমার দিকে তাকায়, কৃতজ্ঞতা যেন রূপ ধরে ফুটে উঠতে চায় সেখানে। তার সে সকরুণ দৃষ্টি চাবুকের মত আমাকে আঘাত করে।

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার একবার যেয়ে কর্ত্তার অপিস কামরায় ঢুকি। কর্ত্তা বলতে থাকেন—বুলাকির বিয়েত একরকম ঠিক, বেশ একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে। তা আপনাকে আমি ছাড়ছিনে, ছায়ার জন্যেও আপনাকেই থাকতে হবে।

পকেটে হাত দিয়ে চিঠিটাকে চেপে ধরি। দৃঢ়তার সহিত জানাই বাড়ীতে একটু কাজ পড়েছে, টিউশানি করবার মত সময় করে উঠতে পারব না।

বুলাকির বাবা একটু দুঃখিত হন। কয়েক মাসের মাইনে জমিয়েছিলাম, টাকাটা হিসেব করে দিয়ে দেন, পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়ি।

বরাবর অরুণদের বাড়ী এসে উপস্থিত হই। সমস্ত মনটা হিংসা ও বিদ্বেষে ভরে ওঠে, তার পরেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বুলাকির সেই চোখ ও তার মিনতিভরা দৃষ্টি। সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে চিঠিখানা দিয়ে দিই অরুণের হাতে। সে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরে বলতে চায়—এমন লোক কজন হয়—এত সহানুভূতি ক'জনের ভেতর থাকে?

হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে জরুরী কাজ আছে বলে বেরিয়ে আসি। একটা আংটী কিনে নিয়ে বাড়ী ফিরি।

সুরমাকে ডেকে বলি—আসছে বুধবার আমাদের বিয়ের দু'বৎসর পূর্ণ হবে, সেদিন পরবে তুমি এটা।

সুরমা আংটীটা হাতে নিয়ে পায়ের ধূলো নেয়। জিজ্ঞেস করে—আমি তোমাকে কি দেব?...

বুলাকিকে পড়িয়ে যে টাকাটা উপার্জ্জন করেছিলাম, তার বেশীর ভাগটা দিয়ে সুরমার জন্যে আংটী কিনেছিলাম। পরের দিন বাকী টাকা কটা নিয়ে স্কুলে গিয়ে প্রথমেই হেড-মিসট্রেস্-এর ঘরে ঢুকি। টাকা ক'টা টেবিলের ওপর রেখে অনুরোধ করি,—এটা যেন এবার প্রাইজের সময় অভিনয়-প্রতিযোগীতার প্রথম পুরস্কারে ব্যয় করা হয়।...

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নহে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনে মুসলমানদের মনোভাবকে উপেক্ষা করা হইয়া থাকে এই অভিযোগে শিক্ষাবিভাগের বরাদ্দ ব্যয় মঞ্জুরির সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মৌলবী আবুল কাসেম একটি ছাঁটাই প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং ইহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ ও তর্ক বিতর্ক চলে।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস আমাদের মন এতটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া কাউন্সিলে এই প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন এবং বাহিরে তাহা লইয়া আলোড়ন চলিতে পারে এবং অপর পক্ষেরও মনের ঝাঁজ ও কথার ঝাল বিষয়টিকে জিয়াইয়া রাখিয়া তাহাকে সমস্যায় পরিণত করে।

আমাদের সকল সম্প্রদায়ের অত্যন্ত বেশীরভাগ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক বলিয়াই, সম্ভব অসম্ভব সর্ব্বক্ষেত্রেই কখন ছদ্ম এবং কখন বা নিতান্ত নগ্নবেশে সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমাদের মনের উপর সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কত বেশী তাহার সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ আমরা করিয়া দেখি না বলিয়াই, ইহার পরিপূর্ণ বিরাটরূপ আমাদের চোখের সম্মুখে নাই, এবং সেই জন্যই কোন কোন স্থানে ইহার আবির্ভাবকে আমরা নিতান্ত অন্যায়, অসঙ্গত ও রূঢ় মনে করিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হই। যে শক্তি সর্ব্বদা নীরবে আমাদের মনের উপর কাজ করিতেছে, ও যাহার সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য প্রভাব প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চারিপাশে একটা সাম্প্রদায়িক আবেষ্টনের সৃষ্টি করিয়া এই মনোভাবকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতেছে তাহা যে মাঝে মাঝে সঙ্গতি, শোভনতা ও সুবিবেচনার সীমা ছাড়াইয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে।

হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন লোকের সংখ্যা বেশী নাই, যাঁহারা কোন সমস্যা বা প্রশ্ন বিচার করিবার সময় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলের কথা সমানভাবে ভাবিতে পারেন। দেশ বা দেশবাসীর যে চিত্র আমাদের মনে আছে তাহা আমাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সম্ভাবিত হিতের পরিমাণের দ্বারাই আমরা, কোন্ জিনিষ দেশের পক্ষে কতটা হিতকর তাহার পরিমাপ করিয়া থাকি। দেশের কোন এক সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রকৃত হিতকর কোনও ব্যাপার অল্পবিস্তর সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই হিতকর—এইজন্য নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া কোন জিনিসকে বুঝিলে, সেই জিনিসের প্রয়োজনীয়তার ও উপযোগিতার দৃঢ়তর প্রমাণ হিসাবেই আমরা সকল সম্প্রদায়ের কথা মনে করিয়া থাকি। অবশ্য আমরা অনেকেই যে জ্ঞাতসারে সচেষ্ট হইয়া এরূপ করিয়া থাকি তাহা নহে, বরং অনেকেই আমরা মনের এই শোচনীয় দুরবস্থার সংবাদ রাখি না। সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট আমাদের মনের পক্ষে এই অভ্যাস এত সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে আমরা ইহার অস্তিত্বের কথাই জানি না।

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়া নিতান্ত স্বতন্ত্রভাবে ও পাশাপাশি বাস করিবার জন্য যে নিম্নতম সহিষ্ণুতা আবশ্যক তাহার এবং সাধারণ ভদ্রতাবুদ্ধির জন্য এই

মনোভাবের প্রকাশ কিছুপরিমাণে সংযত থাকে এই মাত্র। প্রকাশ কতকটা সংযত ও অবরুদ্ধ থাকিলেও যাহার অন্তর্প্রবাহ এই প্রকার শক্তিশালী তাহা কখনই সংযম ও সম্প্রীতির সীমা রক্ষা করিতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা সদাবিদ্যমান প্রতিযোগিতার ভাব আছে বলিয়াই, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মনের এই অভ্যাস মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা বলিতে ইঁহারা কোন না কোন প্রকারে অপর সম্প্রদায়ের সহিত লড়িবার কথাই ভাবিয়া থাকেন।

অবস্থা যখন এইপ্রকারের হয় তখন কোন সম্প্রদায়ের কোন কার্য্য, কোন কথা, কোন চিন্তা এবং কোন কল্পনা (যাঁহারা সকল অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিয়া বিশেষ চেষ্টার দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য বাদ দিয়া) সাম্প্রদায়িকতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারে না, এবং কোন এক সম্প্রদায়ের সকল কার্য্যের পশ্চাতে সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি আছে বলিয়া অন্য সম্প্রদায়ের সন্দেহ করা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় অন্য সম্প্রদায়ের সত্য বা কল্পিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়িতে পারা এবং তাহাদের কল্পিত বা সত্য অভিসন্ধি উদ্ঘাটিত করিতে পারা নিজ সম্প্রদায়ের লোকের নিকট বীরত্বের কাজ বলিয়া গণ্য হয় (নিজেরও এই প্রকার বোধ হইতে পারে)। আমাদের সুপ্ত পারস্পরিক বিদ্বেষের ভাব এখানে একটা প্রকাশের ক্ষেত্র পায় বলিয়া এবং তাহার পশ্চাতে আপাত দৃষ্টিতে ন্যায়ের সমর্থন থাকে বলিয়া এইরূপ ব্যাপারে সকলের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়া থাকে, বাদ প্রতিবাদে মূল ব্যাপারের সমাধান জটিল হইয়া পড়ে এবং উভয় সম্প্রদায়ের জিদ বাড়িতে থাকে।

কাজেই সকল সমস্যার মূল যেখানে সেই মন হইতে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের হিতাকাঙ্ক্ষী নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নির্ভীকভাবে ও দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতে হইবে, বিসম্বাদিত সকল বিষয়েরই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাকেই উদ্ঘাটিত করিতে হইবে এবং দুর্ব্বলতা বা মমতাবশতঃ নিজ সম্প্রদায়ের কোন দোষকে কিছুমাত্র আশ্রয় না দিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কথা মনে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে যে, নিজ সম্প্রদায়ের দোষ ত্রুটি আলোচনা করিবার ও তাহার সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হইবার সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বর্ত্তমান বিক্ষোভের মধ্যে আবহাওয়া যাহাতে আরও দূষিত না হইয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকদেরই সাবধান হইতে হইবে। যে সকল কাজের ফলে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কোণ ঠাসা হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের নামে যে সকল কাজ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে আরও বাড়াইয়া দিতে পারে, কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবী পুরাইয়া যাহা সাম্প্রদায়িক ক্ষুধা আরও উগ্র করিয়া তুলিতে পারে, এমন সকল কাজকেই সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতিকর মনে করিয়া যদি সকলেই বাধা দান করে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের কাজের বা নীতির (বিশেষ করিয়া যেখানে তাহা মন্দ, দুরভিসন্ধিপ্রসূত ও অনিষ্টকর বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই) আলোচনার বা তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টার সময় সংযম বিনয় ও ভদ্রতা সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি সকলেই রাখে তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া উঠিবার আশা থাকে।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা

সংঘবদ্ধ সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িকতার অনিষ্টকারিতা আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইহা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার দায়িত্ব আমাদের থাকিলেও, ইহার কারণ অতীতের মধ্যে নিহিত বলিয়া আমরা ইহার জন্য দায়ী নহি এবং আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মের দ্বারাই সমগ্র ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য আমরাই দায়ী থাকিব। এইজন্য সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায়গুলি সম্বন্ধে আমাদের খুব বেশী সতর্ক হইতে হইবে। বিশেষ করিয়া যাহার আওতায় ও প্রভাবে আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মন গড়িয়া উঠিবে তাহা সামান্য পরিমাণেও সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক হইলে ভবিষ্যতেও সাম্প্রদায়িকতা

দূর হইবে না এবং হয়ত বা বর্দ্ধিত আকারে দেখা দিতে পারে।

আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মন ও চরিত্রের উপর যে-সকল জিনিসের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হইবে তাহার মধ্যে শিক্ষা ও সাহিত্যই প্রধান; আবার মানুষের মনকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরে আনিবার জন্য প্রধানতঃ আমাদের এই দুইটি জিনিষের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কাজেই এই দুইটি জিনিষের উপর আমাদের সদা সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হইবে; এবং তাহা রাখিতে না পারিলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে আমরা সকলেই অল্পাধিক সাম্প্রদায়িক বলিয়া সাম্প্রদায়িকতা সমূলে ধ্বংস হউক একথা আমরা প্রায় কেহই কামনা করি না এবং যে ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা পুরাপুরি দূর হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারি না। সেইজন্য কখন স্থূল এবং কখন সূক্ষ্ম আকারে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত আলোচ্য প্রশ্নটা সাহিত্য লইয়া। ভাল সাহিত্য হইলেই যে তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক কিছু থাকিতে পারে না তাহা নহে এবং বাংলাসাহিত্য যে এই দোষ হইতে মুক্ত তাহাও নহে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় সম্বন্ধে হীনতা বা অপমান সূচক অথবা—বিদ্বেষ বা হিংসা প্রণোদিত কোন প্রকার উক্তি যাহাতে আছে, এমন কোন পুস্তক বা পুস্তকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া কখনই উচিত নহে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় সম্বন্ধে যদি কোন তিক্ত ঐতিহাসিক সত্য থাকে তবে বালকদের ইতিহাস শিক্ষার পক্ষে তাহার জ্ঞান অপরিহার্য্য কিনা তাহা দেখিতে হইবে। যদি প্রকৃতপক্ষে তাহা অপরিহার্য্য হয় তবে, যাহাতে তরুণ বয়স্কদের কোমল চিত্তে কোন প্রকার আঘাত না লাগে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে যথাসাধ্য মৃদুভাবে উপস্থিত করিতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে কঠোরতা ও মনের ঝাঁজ বাদ দিতে হইবে।

কিন্তু কোন কবিতায় বা গদ্যাংশে হিন্দু দেব-দেবীর কাহিনী আছে বলিয়া এবং হিন্দু দেব-দেবীদের কোন বিশেষ কাহিনী বা গুণ লইয়া কোন কিছু রচিত বলিয়া অথবা মানুষের কোন গভীর অনুভূতির সহিত, অথবা তাহার সুখ দুঃখ, বিস্ময়, আনন্দ বা আত্মোৎসর্গের সহিত হিন্দু বা অন্য কাহারও পূজার্চ্চনার কথা বা দেবদেবীর নাম, সাহিত্যে কোথায়ও জড়িত হইয়া আছে বলিয়া তাহাতে যে মুসলমানদের ধর্ম্ম বা সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে, কিংবা তাঁহারা যে পৌত্তলিক বা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িবেন, এমন আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক এবং অস্বাভাবিক।

দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা (যদিও এক দেশবাসী এবং এক ভাষাভাষী লোকের মধ্যে এই ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক নহে) আছে, ধর্ম্মবিশ্বাসের অনৈক্য আছে; কিন্তু মানুষের এই পার্থক্য মনের উপরিভাগের, তাহার গভীর অন্তরে মানুষ এক। উপরের শত পার্থক্য সত্ত্বেও, এই অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে সংযোগ অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। এই জন্যই সামাজিক রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, ভাষা, বিশ্বাস, মনের গঠন প্রভৃতির দুরতিক্রম্য ব্যবধান সত্ত্বেও যে কোন দেশের এবং যে কোন কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সকল দেশের এবং সকল কালের মানুষের কাছে মূল্য পায়।

ইংরাজী ভাল কবিতা বা গল্প-উপন্যাস পড়িবার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকেরই আছে। সে যে ভিন্নদেশের ভিন্নভাষার সাহিত্য; সে ভাষার, সে সাহিত্যের সহিত যে আমাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক বা সংযোগ নাই—ভাল বই পড়িবার সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই সে কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। মানুষের যে গভীর চিত্ত দেশ, কাল বা পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হয় না সাহিত্য তাহাকেই উদ্ঘাটিত করে।

সব ভাল সাহিত্য যদিও আমাদের পরিবেষ্টনীর সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়, আমাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতির ঊর্দ্ধে যদিও ইহার লক্ষ্য তবুও, এই সকল ক্ষুদ্র জিনিসকেই আশ্রয় করিয়া তাহা গড়িয়া উঠে, ইহাই তাহার একমাত্র এবং প্রধান অবলম্বন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকের মধ্যে বহুবিধ ভিন্নতা বিদ্যমান বলিয়া সাহিত্যের অবলম্বনীয় বিষয়গুলি,

তাহার প্রকাশের উপায়গুলি, প্রকাশের ভঙ্গী ও অন্যান্ত খুঁটিনাটি সমূহের মধ্যেও এই পার্থক্য থাকিয়া যায়। কিন্তু এই আপাত পার্থক্যের অন্তরালে যে গভীর এবং শক্তিশালী ঐক্যের ধারা আজও মানুষকে সর্ব্বোপরি মানুষ রাখিয়াছে, তাহাই সাহিত্যের লক্ষ্য বলিয়া তাহার শক্তি ও প্রভাব সাহিত্যের বহিরাবরণকে অতিক্রম করিয়া যায়, ইহার আত্মা ইহার দেহকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। মানুষের মনের উপর সাহিত্য যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহাও এই দেহাতীত প্রভাব; যে বিষয়বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে মানুষের মনের কাছে তাহার মূল্য বেশী নহে। ছাত্রদের ভাল সাহিত্যের সহিত এই জন্য আমরা পরিচিত করিতে চাহি যে, তাহাদের মনের সুপ্ত গভীর প্রদেশ তাহাতে উন্মুক্ত ও জাগ্রত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের আশ্রয় ও উপলক্ষ্যে যে বিষয়বস্তু, মনের উপর তাহার প্রভাব নিতান্তই তুচ্ছ। এই জন্য পরধর্ম্মের উপর বিদ্বেষ যতই থাকুক, পরধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান কোথাও দেখা যায় না।

কোন দেশে কোন সময়েই মানুষের মন সমগ্র অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকদের পক্ষেও এ কথা সত্য। হিন্দুদের অতীত সভ্যতার সমস্তটা, তাঁহাদের সকল মহৎ কল্পনাই নানা দেবদেবীর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। কোন স্থানে ইহারা বিশেষ কোন গুণের প্রতীক, কোথায়ও ইহারা আদর্শের মূর্ত্তরূপ, কোথায়ও বা ইহারা কাহিনীর নায়ক নায়িকা। ইহার মূলে পৌত্তলিকতার কল্পনা থাকিলেও বহুদিনের অভ্যাসের ফলে (সেই অভ্যাস কাব্য, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতির মধ্য দিয়াই গঠিত হইয়াছে) আমাদের মনের কাছে এই সকল দেবদেবীর নাম কোন না কোন গুণ, শক্তি বা ক্ষমতার বিশেষ অর্থপূর্ণ নামই ইহার দাঁড়াইয়াছে। কোন নাম হয়ত কোন কাহিনীর সহিত এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, সেই কাহিনীর উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব সেই নামের দ্বারাই সূচিত হইয়া আসিতেছে। কত বীরত্ব, কত মহত্ব, কত ত্যাগ, কত স্বেচ্ছাবৃত দুঃখ, কত শোকাবহ কারুণ্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কত অভ্যুত্থান, সত্যের জন্য কত প্রাণদান, কত কৃচ্ছ্রসাধন, কত তপস্যা, কত নির্ব্বাণ, কত সংযম, কত স্নেহ প্রেমভক্তির অত্যুজ্জল দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া কত নাম অমর হইয়া আছে; কত নাম হিংসা ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসের প্রতীক হইয়া আছে। বর্ত্তমানে লেখকেরা দেবদেবীদের প্রতি ভক্তিবশতঃ অথবা দেবদেবীদের উপর অন্য লোকদের ভক্তি বাড়াইবার দুরভিসন্ধি বশতঃ এই সকল নাম ব্যবহার করেন না। মুসলমান লেখকেরাও এই জন্য সমানই আগ্রহের সহিত এই সকল নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কাজেই বাঙ্গালী মুসলমানেরা যদি এই দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যে সম্প্রদায়িকতার বিচার করেন তবে একদিকে যেমন সাহিত্যের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে, অন্যদিকে তেমনই সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক দলাদলি অকারণে বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত সময় সমাজ-দেহে সংক্রামিত হইবে।

এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্যের যে সকল বিষয় সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন ভাল সাহিত্যই সেই সকল আপত্তির কারণ হইতে মুক্ত নহে। ছাত্রদের ইংরাজী সাহিত্যের যে সকল পুস্তক বা অংশ পড়িতে হয়, তাহাতে কথিত প্রকারের আপত্তির কারণ কিছুমাত্র কম নাই।

অটোয়া চুক্তির অবসান

ব্যবস্থা পরিষদে অটোয়াচুক্তি সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার সংশোধক প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়াতে অটোয়াচুক্তির অবসান ঘটিল। অবসান ঘটিল বলিতেছি এইজন্য যে আলোচনা কালে বাণিজ্য-মন্ত্রী মির জাবরউল্লা বলিয়াছিলেন যে, অটোয়াচুক্তি সম্বন্ধে পরিষদের মতই সরকার মানিয়া লইবেন; এবং আশা করিতেছি, সরকার বাণিজ্য-মন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

এক্ষণে মিঃ জিন্নার প্রস্তাবানুসারে (এবং আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি) ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এরূপ ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক বাণিজ্য-চুক্তি যাহাতে সম্পাদিত হইতে পারে তাহাই সর্বতোভাবে করা উচিত।

ভারতবর্ষে দ্রুত শ্রমশিল্পের প্রসার লাভ ঘটিলেও, ভারতবর্ষ এখনও শ্রমশিল্পে শিশু। প্রতি বৎসরই আমাদের নানা-

বিধ প্রয়োজন মিটাইতে কোটি কোটি টাকার বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের আমদানী করিতে হয়। এ সকল দ্রব্য যদি শ্রমশিল্পের সাহায্যে ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব হইত তবে, কি কৃষকদিগের মধ্যে, কি শ্রমিকদিগের মধ্যে, কি শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর মধ্যে—বর্ত্তমান বেকার সমস্যার কিঞ্চিত লাঘব ঘটিতে পারিত। কিন্তু দ্রুত প্রসারণ সত্বেও, শ্রমশিল্পের প্রসারণ পর্য্যাপ্ত না হইবার একটি কারণ এই যে, নানাপ্রকার শ্রমশিল্পের প্রবর্ত্তনে ও উপযুক্ত যোগ্যতার সহিত পরিচালনে যে-জাতীয় বিদ্যা ও কর্ম্মকুশলতার আবশ্যক তাহা ভারতবর্ষে অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। অথচ বিদেশের কারখানায় থাকিয়া উপযুক্ত বিদ্যা ও কর্ম্মকুশলতা অর্জ্জনও ভারতীয়দের পক্ষে বিশেষ সম্ভব নহে। ভারতীয় যুবকেরা যাহাতে বিদেশের কারখানায় থাকিয়া নানাপ্রকার শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও কুশলতা অর্জ্জন করিতে পারে সে-বিষয়ে উল্লিখিত পারস্পরিক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন কালে ব্যবস্থা করা উচিত। বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন কালে এশিয়ার অনেক রাষ্ট্র ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রের সহিত এইরূপ সর্ত্ত করিয়া লইতেছে। পরিষদ কর্ত্তৃক অটোয়া চুক্তি আলোচিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন কালে অনুরূপ সর্ত্ত করিয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছেন। কোন কোন বাণিজ্য-সমিতিও এই প্রকার সর্ত্ত করিবার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

নূতন শাসন তন্ত্রের স্বরূপ

নয়াদিল্লী, ২৫শে মার্চ্চ

অদ্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অতিরিক্ত বরাদ্দ মঞ্জুরীর আলোচনা সমাপ্ত হইলে পর রাজস্বসচিব স্যার জেমস গ্রীগ প্রস্তাব করেন,—রাজস্ব বিলে প্রথমতঃ লবণ শুল্ক সম্বন্ধে যে বিধান করা হইয়াছিল তাহাই পুনরায় বহাল করা হউক।

প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া তিনি বলেন, লবণ ও পোষ্টকার্ড সম্বন্ধে পরিষদের মত সরকার গ্রহণ করিতে অসমর্থ...। এ-পি

প্রথমবার রাজস্ব বিল আলোচনা কালে, পরিষদ ভোটাধিক্যে লবণ শুল্ক ও পোষ্টকার্ডের মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু বড়লাট উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া রাজস্ব বিলে প্রথমতঃ লবণ শুল্ক ও পোষ্টকার্ডের মূল্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাই যাহাতে পরিষদ বহাল রাখেন সেজন্য বিলটি পরিষদে পুনঃ প্রেরণ করেন। বিলটির পুনরালোচনা কালে মিঃ জিন্না ও জাতীয়দলের নেতা শ্রীযুক্ত আনে বলে, তাঁহারা লবণ শুল্ক সম্বন্ধে বড়লাটের প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজী আছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পরিষদের পোষ্টকার্ড সম্পর্কিত সুপারিশটী মানিয়া লইতে রাজী আছেন কি?

লবণ শুল্ক ও পোষ্টকার্ডের মূল্য সম্বন্ধে পরিষদ পূর্ব্ব অভিমতই বহাল রাখিয়াছেন। বড়লাট বিলটি নিজের বিশেষ ক্ষমতাবলে পাশ করিয়া রাষ্ট্র পরিষদের নিকট পাস করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

বিশেষ ক্ষমতাবলে, পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য বিল বা বিলের কতকাংশ বড়লাট কর্ত্তৃক পাশ করা আমাদের দেশে নূতনও নহে ত অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন কালে, বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার নূতন শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বুঝাইয়া দেয়।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত রক্ষা কবচ ও বড়লাট প্রভৃতির বিশেষ ক্ষমতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে গুলি বিশেষ প্রয়োজনের জন্যই রাখা হইয়াছে বলা হয়। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে এ-গুলি ব্যবহৃত হইবে না, তবে যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয় তবেই ওগুলি প্রয়োগ করা হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে যে সকল দেশ স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিয়াছে সে সকল দেশের শাসন তন্ত্রেও রক্ষা কবচের ব্যবস্থা থাকিলেও সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এসকল কথা ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অধীন স্বায়ত্ত-শাসনপ্রাপ্ত দেশ সমূহের সহিত ভারতবর্ষের যে তুলনা করা হয় তাহা যে কত ভুয়া তাহা, সরকার যে পোষ্টকার্ডের মূল্য সম্বন্ধে পরিষদের দুইবার বিবেচিত অভিমতটুকুও গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে। পূর্ব্ব ইতিহাস হইতেও দেখা যায়, যেখানেই সরকারের সহিত পরিষদের কোন গুরু বিষয়ে মতভেদ ঘটে সেখানেই সরকার পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় মতামত বহাল রাখেন। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে, সরকার পরিষদের মতামতের পর এখন অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইবেন, এমন কিছুই নূতন শাসনতন্ত্রে নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী

প্রবেশিকা

বৎসর	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫
মোটসংখ্যা	১৯,০৮১	২০,৭৬৮	২৩,১১৫	২৪,৮৬৬
ছাত্র	১৮,৪১১	১৯,৯২১	২১,৯৯৩	২৩,৪০৭
ছাত্রী	৬৭০	৮৪৭	১,১২২	১,৪৫৯
হিন্দু	১৫,৭৫৮	১৭,১৪৭	১৯,২৪৪	২০,০৫০
মুসলমান	২,৮৮১	৩,১৭৭	৩,৫২১	৪,২৩৮
খ্রীষ্টান	৩৩৯	৩৭৩	৩০৭	৪৬৩
অন্যান্য	১০৩	৭১	৪৩	১১৫

আই-এ

বৎসর	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫
মোটসংখ্যা	৩,৪৮১	৪,১৫২	৪,৯২৪	৫,৪৩৯
ছাত্র	৩,২৬৭	৩,৮৮৪	৪,৫৬৭	৫,০৩৯
ছাত্রী	২১৪	২৬৮	৩৫৭	৪০০
হিন্দু	২,৭৬০	৩,৩১৪	৪,০৪২	৪,৪১৮
মুসলমান	৬১৭	৭০২	৭৩২	৮৫৯
খ্রীষ্টান	৮৪	১১৮	১২৮	১২৯
অন্যান্য	২০	১৮	২২	৩৩

আই-এস-সি

বৎসর	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫
মোটসংখ্যা	৩,২৭২	৩,৭০৩	৩,৬৫৪	৩,৬৬৬
ছাত্র	৩,২৩৫	৩,৬৭৩	৩,৬০৯	৩,৬০৯
ছাত্রী	৩৭	৩০	৪৫	৪৫
হিন্দু	৩,০৩৭	৩,৪১৯	৩,৩৮৫	৩,৩৮১
মুসলমান	১৬৩	২০৩	১৮০	১৮৯
খ্রীষ্টান	৬২	৬০	৬৭	৭৯
অন্যান্য	১০	২১	২২	১৭

বি-এ

বৎসর	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫
মোটসংখ্যা	২,৮১০	২,৯০৯	৩,০৩৩	৩,৬২৬

বি-এ

বৎসর	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫
মোটসংখ্যা	২,৮১০	২,৯০৯	৩,০৩৩	৩,৬২৬
ছাত্র	২,৬৯৭	২,৭৭৬	২,৮৭০	৩,৪৮৩
ছাত্রী	১১৩	১৩৩	১৬৩	১৪৩
হিন্দু	২,৩৩৯	২,৪১৭	২,৫১৮	৩,০২২
মুসলমান	৩৭১	৪০২	৪৪৫	৫০৬
খ্রীষ্টান	৬৭	৬৪	৬৩	৮৪
অন্যান্য	৩৩	২৬	৭	১৪

বি-এস-সি

বৎসর	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪	১৯৩৫
মোটসংখ্যা	৭২৪	৮৬৫	৮৪৮	৯৪৫
ছাত্র	৭২০	৮৫৭	৮৪৯	৯৪১
ছাত্রী	৪	৮	৯	৪
হিন্দু	৬৬৭	৮০১	৭৮২	৮৮৭
মুসলমান	৩১	৩৪	৪০	৪০
খ্রীষ্টান	১৪	২৭	২৩	১৫
অন্যান্য	২	৩	৩	৩

শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা!

কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজের একটি সংবাদে দেখা যায়, শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরুর সহিত শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের আলাপ আলোচনা হওয়ার পর উভয়েই ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন; এবং শ্রীযুক্ত বসু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করিবেন ও কংগ্রেসের কার্য্যে শ্রীযুক্ত নেহেরুর সহিত সহযোগিতা করিবেন। এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর ভিয়েনাস্থ ব্রিটীশ-কনসাল শ্রীযুক্ত বসুকে জানান, তিনি যদি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সংকল্প করিয়া থাকেন তাহা হইলে ভারতে ফিরিয়া তিনি যেন মুক্ত থাকিবার আশা না করেন।

এইভাবে প্রকারান্তরে সরকার যে শ্রীযুক্ত বসুকে বিদেশে নির্ব্বাসিত করিবার বা কারাগারে নিক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ প্রতিবাদ-সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ প্রস্তাব

আলোচনাকালে সরকার পক্ষ হইতে, রাজবন্দীদের সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব আলোচনা কালে সরকার যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাই বলা হইয়াছে।

সরকার বলিয়া থাকেন, এই সকল রাজবন্দীদের প্রকাশ্য আদালতে অভিযুক্ত করিলে যে সকল গুপ্তচর ইহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের প্রাণহানি হইতে পারে। সরকার এপর্য্যন্ত অনেক সন্ত্রাসবাদীকেই প্রকাশ্য আদালতে অভিযুক্ত করিয়াছেন, এবং যাহাদের অভিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে এবং প্রাণদণ্ডও ভোগ করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কয়জন গুপ্তচর সন্ত্রাসবাদী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? ইদানিং বহু মামলায় দেখা গিয়াছে, গুপ্তচরেরা পদোন্নতির জন্য কখনও বা পুরস্কারের লোভে নির্দ্দোষ লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে; নির্দ্দোষ ব্যক্তির বাটীতে বোমা রাখিয়া তৎপরে পুলিস দিয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাইয়া মিথ্যা মামলার সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং যতক্ষণ না গুপ্তচরের আনিত সংবাদাদি প্রকাশ্য আদালতে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে, ততক্ষণ ঐ সকল সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও বন্দী বা নির্ব্বাসিত করিলে, বিনা কারণে তাহার স্বাধীনতা হরণ করা হয় মাত্র।

সরকার পক্ষ বলিয়া থাকেন গুপ্তচরের আনিত সংবাদ (যাহাকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে তাহার) কোন আত্মীয় কর্ত্তৃক সমর্থিত না হইলে, কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না আত্মীয়ের সাক্ষ্য প্রকাশ্য আদালত কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে, ততক্ষণ তাহাকে প্রামান্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। আত্মীয় মাত্রেই সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, লোভমুক্ত, উৎকোচে অবশীভূত হইবেন এমন কোনও কারণ নাই। লোকে যাহাতে বিপদে না পড়ে, আত্মীয় তাহাই চেষ্টা করে। সুতরাং যদি কোন আত্মীয় তাহার কোন আত্মীয়কে নির্ব্বাসিত করিতে সাহায্য করে, তবে বুঝিতে হইবে আত্মীয়ের প্রতি তাহার আত্মীয় বলিয়া কোন স্নেহ, প্রেম বা হিতাকাঙ্ক্ষা নাই, আত্মীয়ের পক্ষে সে একজন সাধারণ লোকের অপেক্ষা অধিক বলিয়া গন্য হইবার উপযুক্ত নহে। সুতরাং এইরূপ ভণ্ড আত্মীয়ের পক্ষে আত্মীয়ের বিরুদ্ধে উৎকোচে-বশীভূত হইয়া কোন মিথ্যা বলা কি অসম্ভব? উপরন্তু, শুধু মাত্র জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেই যে ভ্রাতা ভ্রাতার বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত যখন বিরল নহে, তখন যদি আত্মীয় আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের সমর্থন করে তবে সে সমর্থন কতদূর নির্ভরযোগ্য?

সরকার পক্ষ বলিয়াছেন কাহাকেও বিনা বিচারে আটক করিবার পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি দুইজন জজ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে বিচার হইয়া নির্দ্দিষ্টকালের জন্য দণ্ডভোগ করা ও গোপনে দুইজন জজ কর্ত্তৃক প্রমাণাদি পরীক্ষিত হইয়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য আটক থাকা দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যে আকাশ-পাতাল।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণস্বরূপে আইন-সচীব মহাত্মা গান্ধীকে লেখা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। পত্রের উদ্ধৃতাংশটুকু হইতে দেখা যায়, 'শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের বিশ্বাস সুভাষ বাবু 'যুগান্তর' নামক কোন বিপ্লববাদীদলের সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস এক সময় মহাত্মাজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু, কৃষ্ণদাসই হউক বা কৃষ্ণদাস হইতে অধিকতর দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠাবান কোনও ব্যক্তিই হউন, উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহারও 'বিশ্বাস' অপরের স্বাধীনতা হরণের জন্য ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন নহে।

পরিষদ্ গৃহে আইন-সচিবের এই পত্র সম্বন্ধে উল্লেখের পর কোন্ সময়ে এবং কিরূপ অবস্থার ভিতর এই পত্র লিখিত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস সংবাদ পত্রের মারফত তাহা বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বলেন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যুগান্তর দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি না সে বিষয় তাঁহার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা গাল-গল্প ও প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই লিখিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আরও বলিয়াছেন, "কলিকাতা ও লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মাজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা ও প্রকাশ্য আলোচনা করার দরুন শ্রীযুক্ত বসুর প্রতি আমাদের গান্ধীপন্থীদের মনে মনে রাগ ছিল।" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের যে পত্রের উপর নির্ভর করিয়া সরকার সুভাষ বাবুর

স্বাধিনতা হরণ করিতেছেন, সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে পত্রখানির মূল্য যে কতখানি তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে সুভাষ বাবুর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে পরিষদ-গৃহে আইন-সচীব পত্রখানির উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কোন বিবৃতি প্রকাশ করেন নাই কেন? সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে গান্ধীপন্থীদের রাগ কি এখনও বিদ্যমান? এইজন্যই কি এবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে সুভাসবাবুকে সভাপতি পদে ধৃত করিবার কথা তোলা হইলে এত হৈ চৈ উঠিয়াছিল!

ভিন্ন মতাবলম্বী একজন একনিষ্ঠ দেশসেবীর সম্পর্কে মহাত্মার অনু ও সহচরেরা কি প্রকার মত পোষণ ও কি ধরণের সাধু ব্যবহার করেন, তাহার এই প্রকাশ্য প্রমাণ পাইয়া এবং সেই প্রমাণকে সরকার পক্ষের দ্বারা অস্ত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া মহাত্মাজী কি বলেন এবং প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

বিশ্বভারতীতে ষাট হাজার টাকা দান

যাঁহারা আমাদের রাষ্ট্রিক চিন্তা ও আন্দোলনের নেতা, যাঁহারা নূতন সামাজিক বিধি বা অন্যবিধ সংস্কারের প্রবর্ত্তক অথবা যাঁহারা দেশের পক্ষে হিতকর কোন না কোন কার্য্যের নায়ক তাঁহাদের কার্য্যের একটা নগদ মূল্য আছে এবং সে মূল্য সাধারণ লোকে বুঝিতেও পারে। কিন্তু যাঁহারা মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের উদ্বোধনে, মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ, তাহার কোমল ও গভীর অনুভূতি এবং সূক্ষ্ম পরিমার্জ্জনার বৃদ্ধিসাধনে, সকল শক্তি ও উদ্যম নিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কাজের ফল ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলিয়া লোকে পুরাপুরি তাহার মূল্যদান বর্ত্তমানকালে করিতে পারে না।

এইজন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের মর্য্যাদাকে কতটা বৃদ্ধি করিয়াছেন, আমাদের অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতেও আমাদের বুদ্ধি ও মনকে কতটা প্রভাবিত করিতেছেন, আমাদের রাজনীতির বর্ত্তমান দৃশ্যপট ও অন্য সর্ব্ববিধ ঘটনাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইবার, এবং বর্ত্তমানের উন্মাদক ঘটনাটী লোকে বিস্মৃত হইবার বহুদিন পর পর্য্যন্তও যে লোকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, ভাব ও আদর্শের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হইবে, তাহার হিসাব লওয়া এবং তদনুসারে তাঁহাকে মর্য্যাদা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না।

কিন্তু তবুও, আমরা যাহারা শিক্ষার গর্ব্ব করিয়া থাকি, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলার চিত্রশিল্প এবং বাংলার কৃষ্টি সম্বন্ধে গৌরব বোধ করি, তাহারা যে এই সকল ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ ও মূল্য যে কতকটা না বুঝি তাহা নয়। কাজেই বিশ্বভারতীর পোষণের সামান্য অর্থের জন্য যে বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও কবিকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেড়াইতে হইতেছে ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের দিল্লী অবস্থানের সময় কোন কোন বন্ধু নিজেদের নাম অজ্ঞাত রাখিয়া বিশ্বভারতীর দেনার ষাট হাজার টাকা পরিশোধের জন্য উক্ত পরিমান টাকা কবিকে দান করিয়াছেন। ইহাতে ভারতবাসীদের মুখ কতকটা রক্ষা পাইলেও, নাম অজ্ঞাত বলিয়া বাঙ্গালীদের সম্মান রক্ষা পাইয়াছে কিনা, জানা যায় নাই। তবে আশা করা যাইতে পারে, এই দানের ফলে বাঙ্গালীরাও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটু সজাগ হইবেন।

কংগ্রেসের "ফরেন-ডিপার্টমেণ্ট"

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে অধিবেশনের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় উত্থাপিত করিবার জন্য কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি যে সমস্ত প্রস্তাবের খসড়া পাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটিতে কংগ্রেসের "বৈদেশিক-বিভাগ" স্থাপনের কথা আছে। বৈদেশিক বিভাগের উদ্দেশ্য হইবে—

"Creating and maintaining contacts with Indians over-seas and with international labour and other organisations abroad with whom co-opertion is possible and likely to help in the cause of Indian freedom"

তাৎপর্য্য: প্রবাসী ভারতবাসী ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ ও যাহাদের সহিত সহযোগিতা সম্ভব এবং যাহাদের সহযোগিতা

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়ক হইতে পারে বিদেশের এমন সব প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা স্থাপন ও রক্ষা করা।

কংগ্রেসের এমন একটি বিভাগের প্রয়োজন ছিল, এবং সুপরিচালিত হইলে এই বিভাগটী স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ সাহায্য করিবে। এই বিভাগের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশে প্রচার কার্য্য চলাইবার ব্যবস্থা থাকিলে আরও ভাল হইত।

নূতন শাসনতন্ত্র ও কংগ্রেস

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের নূতন শাসনতন্ত্র বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই চলিবেনা; স্বাধীনতা বলিতে কংগ্রেস কি বুঝেন, স্বাধীনতা পাইলে, ধনিক-শ্রমিক সমস্যা, জমিদার-প্রজা প্রভৃতি যে সমস্ত সমস্যা দেশে প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে তাহার কিরূপ সমাধান কংগ্রেস করিবেন—এ সকলের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া একটি প্রস্তাব পাস হওয়া উচিত। নেহেরু-রিপোর্টে ও করাচী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সমূহে কংগ্রেস 'স্বাধীনতার ছায়া' বলিতে কি বুঝেন, ও উল্লিখিত সমস্যা সমূহের সমাধান কিরূপে করিবেন তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কংগ্রেস-বাঞ্ছিত স্বাধীনতার রূপ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। জনসাধারণকে স্বাধীনতা-আন্দোলনে ব্রতী করিতে গেলে, তাহাদের সহযোগিতা আরও সম্পূর্ণভাবে আকাঙ্ক্ষা করিলে, কোন লক্ষ্যে কংগ্রেস পৌছিতে চাহেন তাহা দেশবাসীকে কংগ্রেসের স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে জন-সাধারণের মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে, কংগ্রেস শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

প্রতীক্ষায়

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চমক দেওয়া হাতছানি কার পাতার ফাঁকে চোখে ভাসে!
রূপের মায়ায় পুলক জাগায়, নূতন মাতন হিয়ায় আসে।
উঠছে ফুটে তারার আলি, তারই মাঝে চাঁদের ফালি,
ছায়ার পিঠে আলোর তালি, আকাশ-থালে রতন ডালি;
গায়ে জরার নামাবলি, তবু আসে চারি পাশে
উতল হাওয়া, আলোর খেয়া; ফাগুন এল শ্রাবণ মাসে।

শুক্লা নিশি

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

কি অপরূপ রাত্রি; এমন রাত্রি শুধু যৌবনেই সম্ভব বন্ধু। তারায় তারায় ভরা আকাশখানি এমন উজ্জ্বল যে তার দিকে চাইলেই মনে হয় এই আকাশের তলে খুঁৎখুঁতে, বেরসিক লোকগুলো বেঁচে থাকে কী করে? এ প্রশ্নটাও শুধু যৌবনের বন্ধু—একেবারে যৌবনের; এই প্রশ্নই যেন বারবার তোমার মনে জাগে......। বদমেজাজী, অরসিক লোকগুলোর কথা বলতেই মনে পড়ে গেল সেদিন সারা সকাল দুপুর কি অবস্থায় যে আমার কেটেছে। খুব ভোর থেকেই কিসের যেন একটা বোঝা মনের ওপর চেপে বসেছিল: হঠাৎ মনে হল যেন আমি একেবারে অসহায়, একেলা; সবাই যেন আমাকে ফেলে যেতে চায়। অবশ্য, প্রশ্ন উঠতে পারে যে সবাই মানে কে কে, কারণ যদিও একটানা আট বছর পিটারস্‌বার্গে আছি, তবুও একজনের সাথেও আমার আলাপ নাই। কিন্তু আলাপী লোক নিয়ে কি হবে? সমস্ত পিটারস্‌বার্গ সহরটার সঙ্গেই যে আমার পরিচয়; কাজেই বাক্স পেঁটরা বেঁধে যখন পিটারস্‌বার্গের সবাই গ্রীষ্মভিলাতে যেতে সুরু করলে, তখনই মনে হল যেন সবাই আমাকে একেলা ফেলে যেতে চায়। বুঝি আমাকে একা ফেলে চলে গেল, এই ভয় আমাকে একেবারে আকুল করে তুললে; তিন দিন আমি পাগলের মত সারা পিটারস্‌বার্গে ঘুরে বেড়ালাম—কি করব কিছুই না জেনে। নেভ্‌স্কিতে, বাগানে, কি নদীর ধারে যেখানেই যাই না কেন, সারা বছরের প্রত্যেকটি দিন যে সব চেনা মুখ বারবার চোখে পড়েছে তাদের কাউকে দেখতে পাই না। অবশ্য আমাকে কেউ চেনে না কিন্তু আমি যে তাদের চিনি। ওদের সাথে যে আমার অতি নিবিড় পরিচয়, ওদের মুখ এখনও যে আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। তারা হাসলে আমার বুকটা নেচে ওঠে, ওদের মুখ আঁধার হলেই আমার বুকটা যেন ধসে যায়।

একটা বুড়োর সঙ্গে ত আমার প্রায় ভাবই হয়ে গিয়েছে। রোজ, প্রত্যেকটি দিন ঠিক একই সময়ে ফোনটানকায় দুজনের দেখা হয়। কি গম্ভীর, চিন্তাশীল মূর্ত্তি; সব সময়েই সে যেন আপন মনে কি বলে। বাঁ হাতটা দোলাতে থাকে আর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে থাকে একটা মোটা লাঠি, মাথাটা সোণা বাঁধানো। আমার দিকে মাঝে মাঝে ফিরে চায়, বোধ হয় আমাকে চেনেও। যদি কোনও দিন ঠিক সময়ে আমি ফোনটানকায় সেই জায়গাটায় না থাকি, নিশ্চয়ই তার মনে দুঃখ হয়। তাই যেদিন মন ভালো থাকে, আমরা দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে একটুখানি ঘাড় হেলিয়ে অভিবাদন করি। এই সেদিন, ক'দিন না দেখা হওয়ার পর, হঠাৎ যেদিন আমাদের দেখা হল, আর একটু হলেই দু'জনে টুপি খুলেছিলাম আর কি! কিন্তু ঠিক সময়ে সামলে নিয়ে, একটু হেসে পাশ কাটিয়ে দুজনে চলে গেলাম।

বাড়ীগুলোও আমি চিনি। যখন হেঁটে চলে যাই, তারা যেন সাথে সাথে সারা পথটা ছুটে ছুটে জানলাগুলো দিয়ে আমার দিকে চেয়ে, ডেকে বলে, "গুড্‌মর্ণিং, কেমন আছেন? আমি বেশ আছি; যাক এবার বাঁচা গেল, আমার নূতন একটা কোঠা উঠবে মে মাসে।" কিংবা হয়ত, "কেমন আছেন? কাল সকালে আসছেন নাকি এদিকে?" কিংবা "আর একটু হলেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম সে দিন—কি ভয়ই না লেগেছিল।" এমনি আরও কত কি। তাদের মাঝে কয়েকটাকে আমার অত্যন্ত ভালো লাগে; কেউ কেউ ত আমার বিশেষ বন্ধু। একজনের ওপর রাজমিস্ত্রী এইবার হাত চালাবে; রোজ যেতে হবে দেখতে; আপদ-বিপদ না ঘটে, দোহাই ভগবান্। কিন্তু সেই ছোট্ট টুকটুকে গোলাপী বাড়ীটার কথা মরে গেলেও ভুলছি না। এতটুকু পাকা বাড়ী। এমন আপন জনের মত আমার দিকে চেয়ে থাকত আর

আশে পাশের বিশ্রী বাড়ীগুলোর পানে ঠোঁট বেঁকিয়ে এমন করে হাসত, যে তার পাশ দিয়ে গেলেই গর্ব্বে বুকটা ফুলে উঠত আমার। হঠাৎ প্রায় সাত আট দিন আগে সেই দিকে যাচ্ছি, বন্ধুর দিকে চোখ পড়তেই বেচারা ডুকরে কেঁদে উঠল, "আমাকে ধরে হলদে রং করে দিচ্ছে!" সয়তান! ডাকাত! কিছুই ছেড়ে কথা কয়নি। থাম, কার্নিশ, সব রঙে ভূত। বন্ধু আমার একেবারে ক্যানারীর মত হলুদে ডুবু-ডুবু। আমার গা রী-রী করে উঠল; আজ পর্য্যন্ত বন্ধুকে আবার দেখতে যাওয়ার সাহস আমি বেঁধে উঠতে পারলাম না।

বুঝলে বন্ধু, তাই বলছি যে সমস্ত পিটারস্‌বার্গের সাথেই আমার নিবিড় পরিচয়।

আগেই বলেছি যে তিন দিন ধরে কেবলই ভেবে মরেছি আমার এ দশা হ'ল কেন। পথে বার হলেই কান্না আসে: যে —চলে গেল, আমার কেউ নাই। বাড়ীতেও মন টেকেনা একদণ্ড। দুদিন বসে বসে মাথায় হাত দিয়ে কেবলই ভেবেছি আমার এ ছাই কি হল—আমার চিরদিনের ভাল লাগা কোটরে মন আজ এত হাঁপিয়ে ওঠে কেন? ব্যাকুল হয়ে ভূতুড়ে নীল দেওয়ালগুলোর দিকে সজোরে চেয়েছি, মাকড়সার জালে ঢাকা (যে জালগুলো ম্যাট্রোনা কত যত্ন করেই না পুষেছে) কড়িকাঠগুলো বার বার ভাল করে দেখেছি। আবার পত্র পাতি পাতি করে খুঁজেছি, এক একটা চেয়ার নেড়ে দেখেছি যদি কোথাও কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়; (কারণ যে চেয়ারটা আগের দিন যেখানে ছিল, পরের দিন একচুল এদিক ওদিক হলেই, আমি আর থাকতে পারতাম না।) জানলার দিকে চেয়েছি সবই বৃথা; আমার মনের চঞ্চলতা একটুও কমল না। ম্যাট্রোনাকে ডেকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দেওয়া সুরু করলাম, মাকড়সার জাল রক্ষা ও তার সাধারণ হেলা ফেলা কাজ কর্ম্ম নিয়ে; কিন্তু সে শুধু হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে, আর তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, একটীও কথা না বলে—তাই আজ পর্য্যন্ত লূতাতন্তু আমার ঘরের কড়ি কাঠে কাঠে দোদুল। মাত্র আজ সকালে বুঝলাম আমার ব্যথাটা কোনখানে। হুঁ ঠিক, আমাকে ফাঁকি দিয়ে সবাই হাওয়া খেতে চলে গেছে গ্রীষ্ম-ভিলায়। নিতান্ত খেলো একটা কথা বললাম বলে ক্ষমা করো, কিন্তু বিশুদ্ধ ভাষা বলার ক্ষমতা এখন আর আমার নাই। পিটারস্‌বার্গের সব জিনিষই গ্রীষ্মাবাসের দেশে চলে গেল, নয় চলতে উন্মুখ। ভদ্র চেহারাওয়ালা একটা লোক গাড়ীতে উঠে বসলেই আমার চোখে তার রূপ বদলে যায়। সারাদিনের কাজের পর গ্রীষ্মভিলায় আপন পরিবারের বুকের মাঝে ফিরে চলেছে সে—হাস্যমুখর সকলে আছে তারই পথ চেয়ে। রাস্তা দিয়ে যারা চলে যায়, সকলেরই চোখে মুখে আজ একটা অদ্ভুত জ্যোতিঃ, যেন জগৎকে ডেকে বলতে চায় তারা; "মোটে ঘণ্টা দু'একের জন্য এখানে এসেছি মশাই, এখুনি চলে যাব গ্রীষ্ম-ভিলায়।" চাঁপার কলির মত কয়েকটা দুধের মত সাদা আঙুল দিয়ে জানলা খুলে ধরে একটি তরুণী পথে উঁকি দিয়ে ফুলওয়ালীকে ডাকে, আর আমার মনে হয় শুধু যে সহরের দম বন্ধ করা ঘরগুলোর মধ্যে গন্ধ শুঁকতে জড়ো করা হল টুকটুকে ফুলগুলো, তা নয়, এখুনি তাদের নিয়ে যাওয়া হবে গ্রীষ্মভিলায়।

যখনই চোখে পড়ে সারি সারি গাড়ী, গাড়োয়ানগুলো হাতে রাশ ধরে পাশে পাশে চলেছে, গাড়ীর ওপর পাহাড়ের মত বোঝাই জিনিষ পত্র, আর তাদের সবারই ওপরে জরাজীর্ণ একটি ভৃত্য ঢুলতে ঢুলতে প্রভুর সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে, তখনই মন আমার ছুটে চলেছে তাদের পিছু পিছু। আমার চোখে তারা শত সহস্র গুণ বড় হয়ে ওঠে—মনে হয় সমস্ত সহরটাই যেন ডানা মেলে কোথায় উড়ে যেতে চায়। পিটারস্‌বার্গ বুঝি খাঁ খাঁ করে ওঠে, শূন্য প্রান্তরের মত। চোখ দুটো আমার জ্বালা করে ওঠে লজ্জায়, দুঃখে রাগে—আমার যাবার কোনও জায়গা নাই, যাবার কারণও নাই কোনও। যে কোনও গাড়ীর সময়ে হোক্, চলে যেতে আমার একটুও বাধত না, যে কোনও লোকের সঙ্গে চলে যেতে একটুও দ্বিধা হ'ত না আমার, কিন্তু কেউ—একেবারে কেউ-ই ত আমাকে একটি-বারও ডাকলে না। মনে হল যেন সবাই ভুলে গিয়েছে আমার কথা, সবার মাঝে আমিই যেন একা বিদেশী।

শুধু দূর, বহু দূর ধরে বেড়াতে লাগলাম আমি, আর ঠিক আগের মতই বেড়াতে বেড়াতে ভুলে গেলাম কোন পথ ধরে কোথায় চলেছি। হঠাৎ দেখি দু'পা আগেই সহরের গেট্।

এক নিমেষে আমার মনটা হাল্‌কা হয়ে উঠল, প্রাচীর পেরিয়ে চলে গেলাম যতদূরে চোখ যায় দুধারে শুধু চষা ক্ষেত; এতটুকু ক্লান্তি বোধ হ'ল না আমার, শুধু মনে হ'ল যেন প্রকাণ্ড একটা ভারী বোঝা ধীরে ধীরে বুকের ওপর থেকে নেমে পড়ছে। রাস্তায় পথিকের দল এমন হাসিমুখে আমার দিকে চাইতে লাগল যেন আমাকে অভিনন্দন দিতে সবাই উন্মুখ, কে জানে কেন, খুশীর একটা ছটা তাদের চোখে মুখে। সকলের মুখে একটা করে সিগার,—সকলের মুখেই। হঠাৎ আমার মনটা ভারি খুসি হয়ে উঠল; এমনটি আর আগে কোনও দিন হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। মনে হল যেন ইটালি দেশ আমার চোখের সামনে হেসে উঠেছে, আধ-মরা সহরে লোকের ওপর শ্যামলা প্রকৃতি এমনি একটা মাদকতার ঘোর এনে দেয়।

পিটারসবার্গের চারি পাশের প্রকৃতির এমন একটা সহজ করুণ ভাব আছে যে বলা যায় না। বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বা কিছু ক্ষমতা তার আছে সব একত্র করে প্রচণ্ড চেষ্টায় আপনাকে সে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলে। কচি পাতা নূতন ফুল আর লতার বাহার নবীন সাজে।...কেন জানি না আমার মনে হয় শুধু একটি ছিপছিপে মেয়ের কথা। গাল দুটি তার পাণ্ডু রক্তলেশহীন; তার পানে চেয়ে লোকে একটু খানি দুঃখ জানায়। কেউ বা কৃপা করে একটু খানি ভালোবাসে আর কেউ বা দেখেও দেখে না। কিন্তু এক দিন যেন মন্ত্রের বলেই অপরূপ সুন্দরী হয়ে ওঠে সে, তার পানে চোখ পড়লেই রূপের নেশায় মাতাল হয়ে সবাই জানতে চায় কি মন্ত্রে কিসের গুণে সেই বিষাদমাখা আনত নয়ন দুটিতে জ্বলে উঠল এমন তীব্র জ্বালা? পাণ্ডু কপোল দুটিতে ওই যে গোলাপী আভা, এতদিন তা কোথায় ছিল? তার তম্বী তনুলতা আগুনের ফুলকির মত আজ সব জ্বালিয়ে দিতে চায় কেন? শুষ্ক হিয়া তার আজ যে হঠাৎ দুলে দুলে উঠেছে, সে কার পানে? হঠাৎ কেন আজ বেচারার মুখে এ দিব্য জ্যোতি, চোখে এ স্নিগ্ধ দৃষ্টি, এমন মনকাড়া হাসি? চোখে চোখে ওই যে ছটা আজ কেঁপে কেঁপে উঠছে, এতদিন ত একবারও তা দেখিনি...সে নিমেষ টা মিলিয়ে যায়—আবার দেখতে পাবে আগেকার সেই পাণ্ডু মুখখানি, নিষ্প্রভ চোখ দুটি আনত, বিষাদমাখা দৃষ্টি। আচরণ তার সলাজ, কি জানি কেন সে কুণ্ঠিত। অনুতাপ, বেদনা?...সেই উচ্ছৃঙ্খল নিমেষটুকুর...মনটা ভরে ওঠে বেদনায়, দেখতে দেখতেই ও রূপের আগুন নিভিয়ে গেল, হয় ত বা চিরদিনের জন্যই—কেন শুধু এক নিমেষ জ্বলে উঠল ও সর্বনাশী শিখা, কেন,—কেন মিছামিছি? যদি তাকে একবার ভালোবাসার, একবার বুকে নেবার অবসরও সে দিলে না?...

তবুও কিন্তু দিনটার চেয়ে সে রাত্রিটা আমার কেটেছিল ভালো। কেন, তা এখুনি বলছি।

অনেক রাতে সহরে ফিরে এলাম, বাসার দিকে যখন চলেছি দশটা বেজে গিয়েছে। খালের উঁচু প্রাচীরের পাশ দিয়েই আমার পথ, একটি জন-প্রাণীরও তখন দেখা নাই সেখানে। মৃদুস্বরে গান গাইতে গাইতে চলেছিলাম, যখনই মনটা একটু হাল্কা থাকত, আপন মনে গুন্ গুন্ করা যেন আমার একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল বল্‌লেই চলে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল।

খালের রেলিঙের ওপর হেলান্ দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, কনুই দুটো রেলিঙের ওপর ভর করে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে আছে ঘোলাটে জলটার পানে একদৃষ্টে। মাথায় চমৎকার একটা হলদে টুপি আর পরণে পরিষ্কার একটা পোষাক। হঠাৎ মনে হল মেয়েটা নিশ্চয়ই কালা; আমার পায়ের শব্দ বোধ হয় সে শুনতে পেলে না, নিশ্বাস বন্ধ করে, কম্পিত বুকে যখন তার পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম, তখনও ত সে নড়ল না। এতটুকু।

তাইত! এমন নিশ্চল হয়ে সে দেখছে কী? হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম; পা দুটো যেন পাথর হয়ে জমে গিয়েছে; একটা চাপা কান্নার শব্দ এসে কানে লাগল। সত্যিই তাই—মেয়েটি কাঁদছে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সমস্ত শরীরটা বার বার উঠছে ফুলে ফুলে। ভগবান্—আমার বুকটা ধসে গেল। চিরকালই নারীর সামনে আমি ভীষণ মুখ-চোরা। কিন্তু আজ...এমনি সময়ে...। ফিরে দাঁড়ালাম; হয়ত বা ডাকতামও; একটু ভেবে থেমে গেলাম। কি বলে ডাকব ভাবতে ভাবতেই মেয়েটি বোধ হয় নিজেকে সামলে নিয়ে, চমকে উঠে, চোখ দুটো নীচু করে দ্রুতপদে পথে নেমে পড়ল।

আমিও পিছু নিলাম। বোধহয় আগেই বুঝতে পেরেছিল; তাই ত্বরিতপদে রাস্তাটা পেরিয়ে ও পাশের ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল সে। রাস্তা পেরিয়ে তার পিছু নেওয়ার সাহস আমার হল না; হাতের মুঠোর মাঝে ধরা পাখীর মত বুকটা আমার ছট্‌ফট্‌ করে উঠল। হঠাৎ দৈবই বুঝি সহায় হল আমার।

যে ফুটপাথ ধরে মেয়েটি চলেছিল, হঠাৎ সেই পথেই কোথা থেকে একটা লোক এসে হাজির। ভদ্র লোকের মত চেহারা, বয়সও নিতান্ত অল্প নয়, কিন্তু চলার ভঙ্গীটাই তার ঠিক ভদ্র বলা চলে না। টলতে টলতে এগিয়ে চলেছিল সাবধানে দেওয়াল ধরে ধরে। তাকে দেখেই মেয়েটি ছুটে চলল তীরের মত, আর চকিতে কিছু বুঝবার আগেই তিনিও উধাও হয়ে ছুটলেন আমার অজানা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। মেয়েটি ছুটে চলেছিল বাতাসের ও আগে কিন্তু ইনি তাকে প্রায়...একেবারে ধরে ফেললেন। তীব্র একটা চীৎকার ...ভাগ্যি সেদিন আমার হাতে এই মোটা লাঠিটা ছিল; চোখের পলক পড়তে না পড়তেই আমি রাস্তার ওপারে গিয়ে হাজির। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোকটি বোধ হয় ব্যাপারটা অনুমান করে নিলেন, অমোঘ লাঠৌষধির গুণ আঁচ করে নিয়ে সরে পড়লেন বিনা বাক্যব্যয়ে—শুধু যখন আমরা অনেকদূর চলে গিয়েছি, তখন চূড়ান্ত করে গালাগালি করতে লাগলেন আমাকে। সব কথাগুলো তখন স্পষ্ট শুনতেও পেলাম না।

মেয়েটিকে বললাম, "আমার হাত ধর, আর কোনও ভয় নাই;" একটি কথাও না কয়ে সে হাতখানা চেপে ধরল; ভয়ে, উত্তেজনায় তখনও কাঁপছে। হে অর্দ্ধোন্মত্ত, লম্পট, পুরুষ, তখন তোমাকে আমি মনে মনে কতই না আশীর্ব্বাদ করেছি! চুরী করে একবার তার দিকে চেয়ে দেখে নিলাম —ভারী সুন্দর, শ্যামাঙ্গী, আমার অনুমান মিথ্যে হয় নি।

তা'র কালো চোখের পাতার ওপর তখনও এক ফোঁটা জল চক্‌চক্‌ করছিল, ভয়ে, না আগেকার দুঃখে তা' জানি না। কিন্তু এরই মধ্যে ঠোঁটের ওপর মৃদু একটা হাসির ছটা ফুটে উঠেছে। সেও একবার চুরী করে চেয়ে নিল আমার পানে; একটুখানি লাল হয়ে চোখ দুটো নামিয়ে নিল।

"দেখ্‌লে ত? আমাকে তাড়িয়ে দিলে কেন—আমি থাকলে ত এসব কিছুই হ'ত না।"

"আমি ত জানতাম না তোমাকে; ভাবলাম তুমিও বুঝি..."

"এখন কি জেনে নিয়েছ আমাকে?"

"একটুখানি—এই ত—আচ্ছা তুমি কাঁপছ কেন?"

"বাঃ ঠিক্ ধরেছ" মনটা আমার খুশী হয়ে উঠল; সহচরী আমার নিতান্ত বুদ্ধিহীনা নয় তা' হলে। রূপের সাথে বুদ্ধির কি চিরবিবাদ থাকতেই হবে?

"হ্যাঁ প্রথম দেখাতেই বুঝে নিয়েছ দেখছি যে আমি কি রকম লোক; সত্যি সত্যি, আমি ভারী লাজুক; মেয়েদের সামনে যে ভয়ানক ঘাবড়ে যাই সে কথা ত অস্বীকার করছি না। এক মুহূর্ত্ত আগে ভয়ে তোমার বুকটা যেমন করছিল, এখন তেমনি করছে আমারও।...একটা স্বপ্ন; কোনও দিন কোন মেয়ের সঙ্গে সামনা-সামনি যে দুটো কথা বলব, একথা কল্পনাতেও কখনও ভাবি নি।"

"সত্যি...?"

"হ্যাঁ আমার হাতটা যে এখন এমন কাঁপছে তার কারণ তোমার হাতের মত সুন্দর হাতখানি দিয়ে কেউ কখনও একে জড়িয়ে ধরে নি। মেয়েদের সভার মাঝে আমি চির বিদেশী, কখনও কারও সঙ্গে মিশতে চাইনি। সত্যি বলছি বিশ্বাস করো আমায়···আমি একেবারে একলা থাকি···কি করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাও জানি না। তোমার কাছেই হয় ত যা' তা' কিছু বলে ফেলেছি...সত্যি বল না, আমি রাগ করব না কখনও।"

"না, না, একটুও রাগ করিনি, বরং ঠিক তার উল্টো। সত্যিকথা যদি শুনতে চাও তা'হলে বলি যে মেয়েরা এইরকম লোকই পছন্দ করে, আর যদি আরও শুনতে চাও তা'হলে বলি যে আমিও তাই করি: বাড়ী পঁহুছাবার আগে তোমাকে আমি যেতে বলব না, কোনও ভয় নাই।" আনন্দে দিশেহারা হয়ে বললাম, "তুমি আমার সব লজ্জা ভয় দূর করে দিচ্ছ, শেষে সুযোগ না ফুরিয়ে যায়......।"

"সুযোগ?···কীসের সুযোগ?···"

"মাপ করো আমাকে; সত্যি আমি ভারি লজ্জিত,

মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, রাগ করো না, দোহাই তোমার, ভেবে দেখ, একটুখানি ভেবে দেখ আমার অবস্থাটা। চব্বিশ বছর বয়স হল, এখন পর্য্যন্ত একদিনও কারও সঙ্গে একটা কথা বলিনি। ধীরে সুস্থে কথা আমি বলি কী করে?··· তোমাকে সব খুলে বললেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে:...সারা প্রাণটা যখন মুখর হয়ে ওঠে তখন যে চুপ করে থাকতে পারি না। যাকৃগে, সত্যি বলছি, কখ্খনও কোনও মেয়ের সাথে—একটির সাথেও, একটা কথাও বলিনি—একেবারে কখনও বলিনি। আর রোজ রাত্রেই স্বপ্ন দেখি বুঝি কেউ এসে আমায় ডাকবে, কারও সাথে—যে কারও সাথে একবার কথা কইব...ওঃ যদি জানতে এমনি করে কতবার না-ভালবেসে ফেলেছি..."

'সত্যি?···কাকে?"

"কাউকে না—আমার মানসীকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোজ যাকে স্বপ্ন দেখি। ঘুমের ঘোরে সে যে কি আনন্দ, কি বলব! অবশ্য দু'একটা স্ত্রীলোক দেখেছি আমি, কিন্তু তারা কি জানে ছাই? তারা শুধু বাড়ীওয়ালী...বাড়ীই ভাড়া দেয়। তোমার হাসি পাবে শুনে, কিন্তু সত্যি বলছি, কতবার ইচ্ছে হয়েছে কথা কইবার—শুধু দুটো কথা কইবার, কোনও একটি ভদ্র মেয়ের সঙ্গে—রাস্তা দিয়ে কতই ত হেঁটে চলে যায়। মৃদুস্বরে, চুপি চুপি প্রাণভরে শুধু দুটো কথা ..বলব তাকে যে একলা আমি আর পারি না, এবার সত্যি মরে যাব—আমায় তাড়িয়ে দিও না, দিও না—কারও সঙ্গে যে যেচে কথা বলব সে সাহস আমার নাই। ভালো করে বুঝিয়ে বলব যে আমার মত অসহায় অভাগাকে তাড়িয়ে দিলে কখনও জীবনে সুখী হবে না সে। শুধু দুটো কি তিনটে কথা বলবে আমায়...আপন বোনটির মতই হাসিমুখে ভালবেসে...আমাকে বিশ্বাস করবে···আমার কাহিনী শুনবে...হেলাভরে ফিরে তাকাবে না। ইচ্ছে হয় ঠাট্টা করতে পারে, তবু মনে একটু সাহস দেবে···আবার দেখা হবে বলে চলে যাবে......না, না যাক্ তুমি হাসছ, সেইজন্যই ত বলছিলাম..."

"রাগ করো না তুমি, আমি হাসছি শুধু নিজের শত্রু তুমি নিজে হয়েছ তাই দেখে; চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পেতে: পথের মাঝে হঠাৎ দেখা হলেই বা কি ক্ষতি? যে দুটো কথা শুনতে তুমি এত পাগল, কেউ তোমাকে এটা প্রত্যাখ্যান করতে পারতো না......যাকৃগে যা' তা' কি বকে চলেছি।"

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ; তুমি আজ আমাকে যা দিলে তার আর তুলনা নাই।"

"সত্যি আমি ভারী খুশী হয়েছি—ভারী খুসী। কিন্তু তুমি কি করে জানলে যে আমি এই ধরণের মেয়ে যার সঙ্গে ...যার সঙ্গে এই···এই বন্ধুত্ব করতে কোনও বাধা নাই?—যে শুধু বাড়ীওয়ালী নয়? আমার কাছে হঠাৎ তুমি ছুটে এসেছিল কেন?"

"কেন?···তুমি যে একলা ছিলে; আর তা ছাড়াও মাতালটা তোমার পিছু নিয়েছিল—তায় আবার রাত্রিকাল। এটা আমার উচিত হয় নি কি?"

"না, না, তা নয়; তার আগে রাস্তার ওপাশে।"

"রাস্তার ওপাশে?...সত্যি কি বলব বুঝছি না। ভয় হচ্ছে...আজ সারাটা দিন কি আনন্দে আমার কেটেছে জানো না; গুণ গুণ করে শুধু গেয়ে চলেছি—সহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম বাইরে; এমন আনন্দ আর কোনও দিন পাই নি। তুমি...বোধ হয় শুধু আমার কল্পনা এটা...সে কথা আবার তোমায় মনে করে দিচ্ছি বলে মাপ করো...আমার মনে হল যেন তুমি কাঁদছ; আমি থাকতে পারলাম না... সমস্ত বুকটা টনটন্ করে উঠল...ভগবান্! মনটা কেমন করতে লাগল: ভায়ের মত ভালোবাসতেও কি দোষ? মাপ করো—রাগ করো না, না জেনে তোমার কাছে এসেছিলাম বলে···।"

"থামো; বুঝেছি—ওকথা আর বলো না।" মাটির 'পরে চোখ দুটো নামিয়ে নীরবে সে আমার হাতের ওপর একটুখানি চাপ দিলে। "একথা তোলা আমারই অন্যায়... তোমাকে ভুল বুঝি নি...সত্যি, ভারী খুসী হয়েছি আমি...। যাক্ এই যে বাড়ী এসে পড়েছি—এই মোড়টা ঘুরে আমাকে যেতে হবে—এই মোটে দু'পা। আচ্ছা...শুভরাই···ধন্যবাদ।"

ব্যাকুল হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "না, না, যেয়ো না... আর কি কখনও দেখা হবে না আমাদের? সব শেষ···সব শেষ হয়ে গেল এরই মধ্যে?"

হাসতে হাসতে মেয়েটী বলল "এই দেখ মজাটা! একটু আগে শুধু দুটো কথা শুনতে চেয়েছিলে আর এখন ..যাকৃগে, কিছু বলব না; হয়ত আবার দেখা হবেও।"

"কাল আসব আমি। এইখানে ঠিক আসব...; মাপ করো আমায়, ভুলে অন্যায় দাবী করে ফেলেছিলাম।"

"তুমি···তুমি ভারী চঞ্চল; একেবারে নাছোড়বান্দা।"

বাধা দিয়ে আমি বললাম "দাঁড়াও দাঁড়াও একটু শোন—আর একটা কথা মোটে—রাগ করোনা দোহাই তোমার! কাল না এসে আমি পারব না...আমি যে শুধু স্বপ্ন দেখি। সত্যিকার জীবনটুকু আমার এত অল্প যে আজকের এই কয়েক

মিনিট আমার কাছে অমূল্য ; ঘুরে ফিরে বার বার আমি এই স্বপ্ন দেখব। সারারাত্রি তোমাকে স্বপ্ন দেখব,—সারা রাত্রি, রোজ রোজ সারা বছর—চিরকাল। নিশ্চয়, নিশ্চয়ই আসব কাল ; এইখানে—ঠিক এইখানে, ঠিক এই সময়। আর আজকের কথাটা মনে করে মনটা খুসী হয়ে উঠবে। এরই মধ্যে এ জায়গাটাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি। পিটারস্‌বার্গে এমন দু'তিনটে জায়গা আমার আছে...একদিন স্মৃতি নিয়ে বসে বসে কত কেঁদেছি...তোমার মত...কে জানে হয়ত দশ মিনিট আগে তুমিও কি কথা মনে করে কাঁদছিলে...ক্ষমা করো—ক্ষমা করো আবার ভুলে বলে ফেলেছি—হয়ত এ জায়গাটা একদিন তোমার কত না প্রিয় ছিল...।"

মেয়েটি বলল, "আচ্ছা, বোধহয় আমিও কাল আসব এইখানে দশটার সময়। দেখছি তোমাকে বারণ করা যাবে না কিছুতেই...। ব্যাপারটা এই যে আমাকে এইখানে আসতেই হবে ; তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই যে আসব তা'ভেবো না। আগেই বলে রেখেছি যে আমার নিজের কাজেই আসতে হবে আমাকে। কিন্তু...তোমাকে খুলেই বলছি... তোমার আসাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। হয়ত আজকার মতই কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আবার...কিন্তু মনে করো না তোমার সঙ্গে দেখা করব...শুধু কয়েকটা কথা কইব···কিন্তু আমার সম্বন্ধে মনে কোনও বিশ্রী ধারণা করো না যেন। যাঁর তাঁর সঙ্গে আমি এমনি করে বেড়াই ভেবো না···তোমার সঙ্গেও আর দেখা করতে রাজী হতাম না, যদি না...থাক্‌গে সে কথা এখন চাপাই থাক।...দাঁড়াও আগে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে..."

"প্রতিজ্ঞা ? বল বল আগেই বলে দাও। যা বলবে আমি তা'তেই রাজী। যা করতে বলবে আমি না বলব না।" উল্লাসে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "আমি শপথ করছি তোমার সব কথা শুনব—কখনও না বলব না...তুমি ত জান আমাকে"

হাসতে হাসতে সে বললে "তোমাকে জানি বলেই আসতে বলছি কাল ; একেবারে চিনে নিয়েছি তোমাকে... কিন্তু শুধু একটা সর্ত্তে আসতে পার, (রাগ করো না··· আমার কথা রেখো...দেখ আমি খোলাখুলি বলছি) যদি কোনও দিন আমার প্রেমে না পড়ে যাও...অসম্ভব...সে অসম্ভব আগেই বলে রাখছি ; বন্ধু হতে আমি রাজী—এই দাও আমার হাত···কিন্তু কক্ষণও...কক্ষণও আমায় ভালোবাসতে পাবে না।"

সজোরে তার হাতখানা ধরে চাপ দিয়ে বললাম, "আমি শপথ করছি..."

"থামো ; শপথ করতে হবে না। জানি তুমি বারুদের মত একটুতেই জ্বলে ওঠো। একথা বললাম বলে আমাকে খারাপ ভেবো না। শুধু যদি জানতে...একটা কথা বলবার লোক আমারও নাই ; একটা কথা কইবার—একটা পরামর্শ চাইবার কেউ নেই। অবশ্য রাস্তার লোক ধরে এনে পরামর্শ চাওয়া অন্যায়, কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তোমাকে চিনে নিয়েছি আমি : সারাজীবনই আমরা বন্ধু। আমাকে বঞ্চনা করো না কখনও।

"দেখতেই পাবে...এখন বাকী চব্বিশ ঘণ্টা যে কেমন করে বেঁচে থাকব তাই ভাবছি।"

"যাও নিশ্চিন্তে ঘুমোও গিয়ে। গুড্ নাইট্—মনে রেখো এরই মধ্যে তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি। এখন মিষ্টি করে তুমি বলেছিলে যে 'ভায়ের মত ভালোবাসতেও কি দোষ' যে তোমাকে একটা কথা বলতে মনটা আমার ছটফট করছে।"

"বল, বল, ভগবানের দোহাই তোমার কী হয়েছে ? কী বলতে চাও আমায় ?"

"দাঁড়াও ; কাল হবে : আজ সে কথা থাক্। তোমার পক্ষেই ভালো ; ইতিমধ্যে তোমার মাথায় একটা রোমান্সের চিন্তা জেগে উঠুক্ না কেন। হয়ত কাল তোমাকে বলব সে কথা,...হয়ত বা বলব না...তার আগে তোমার সঙ্গে আরও একটু গল্প করব···দু'জনে আরও ভালো করে চিনব দুজনকে।"

"নিশ্চয়ই। কাল আমি তোমাকে সব বলব আমার কথা। কিন্তু একী হল ? আমার হঠাৎ একী হল ? ভগবান্! আমি কোথায় ? আচ্ছা সাধারণ একটা মেয়ের মত রাগ করে যে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দাওনি এতে কি তোমার একটুও আনন্দ হচ্ছে না ? দু'মিনিটের মধ্যেই তুমি চিরদিনের জন্যে আমাকে এমন সুখী করে তুললে...সত্যি সুখী...বোধ হয় তুমি আমার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিলে··· এবার বোধ হয় শান্তি পাব। হয়ত সময়ে সময়ে···যাক্‌গে কাল সব বলব—একেবারে সব বলব তোমাকে।

"আচ্ছা—তা'হলে তুমিই আরম্ভ করবে।"

"রাজী"

"গুড্ বাই—কাল না দেখা হওয়া পর্য্যন্ত।"

"কাল না দেখা হওয়া পর্য্যন্ত।"

আমরা দু'জন দুদিকে চলে গেলাম। সারা রাত্রি ঘুরে বেড়ালাম, বাসায় ফিরবার ইচ্ছেই হলনা। মনটা এত খুসী হয়ে উঠল...কাল···কাল···।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

বুক-সাঁতার

শ্রীশান্তি পাল

বুক-সাঁতার অতি প্রয়োজনীয়। অনেক সময়ে লোকে সাঁতার জানিয়াও জলে ডোবে; পরণের কাপড়, জামা জড়াইয়া গিয়া এমন অবস্থা হয় যে নিমজ্জমানের পক্ষে কোন প্রকারে 'পাড়ি' দেওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু

১নং চিত্র

বুক-সাঁতারের পাড়ি এমন সরল যে কাপড় জামা পরা থাকিলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। বুক-সাঁতার জানা থাকিলে উপর্য্যুপরি তরঙ্গের আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করা সহজ হয়। ঝাঁঝি-পূর্ণ পুষ্করিণীতে সাঁতার দিবার সময় যদি কোন ক্রমে ঐগুলি গায় জড়াইয়া যায় তাহা হইলে এই বুক-সাঁতারের দ্বারাই নিজেকে বিমুক্ত করা সম্ভবপর। কোন নূতন সাঁতারু হয়ত অধিকদূর গিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছে এবং জলে ডুবিয়া যাইতেছে, এমন স্থলে তাহার মতন দুই জনকে পৃষ্ঠে করিয়া স্বচ্ছন্দে বুক-সাঁতারের দ্বারা বহিয়া আনা যায়। বুক-সাঁতারে সাঁতারুর হাত, পা মুক্ত থাকে;—এই জন্য নিজের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া অন্যকে বাঁচান অপেক্ষাকৃত সহজ হয় বলিয়া মনে হয়।

এইবার কি উপায়ে এই সাঁতার কাটিতে হয় তাহার আলোচনা করিব। এই সাঁতার কাটিতে হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে শরীর যেন একপেশে না হয়। স্কন্ধ দুইটি সর্ব্বদাই জলের সহিত এক রেখায় থাকিবে, এবং চিবুক হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

(ক)—উভয় হস্তের তালু চিবুকের নিম্নে চারি ইঞ্চি জলের নিচে গুটাইয়া ১নং চিত্রানুযায়ী পাশাপাশি রাখিতে হইবে। তালুদ্বয় জলের নিম্নাভিমুখী হইবে, এবং দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দুটি পরস্পর স্পর্শ করিয়া থাকিবে; হাতের অন্যান্য আঙ্গুলগুলি যুক্ত হইয়া সম্মুখদিকে প্রসারিত থাকিবে।

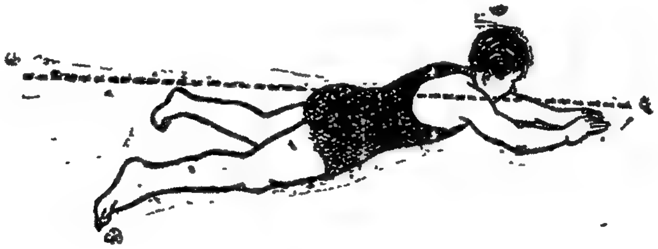

২নং চিত্র

(খ)—ঐ সময় পদদ্বয়ের গোড়ালি যুক্ত রাখিয়া যতদূর সম্ভব ভেকের অনুকরণে ঐ ১নং চিত্রানুযায়ী পশ্চাতে গুটাইয়া আনিতে হইবে।—এস্থলে শিক্ষার্থী যদি জলে বা স্থলে ভেকের পশ্চাতের পদদ্বয় নিক্ষেপ করিবার ভঙ্গী লক্ষ্য ক'রেন, তবে বুক-সাঁতারের সময় কি ভাবে পদদ্বয় রাখিতে বা নিক্ষেপ করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(গ)—এইবার চিবুকের নিকট হইতে হস্তদ্বয় ২নং চিত্রানুযায়ী পদদ্বয়ের আঘাতের সহিত সোজাভাবে সম্মুখদিকে প্রসারিত করিয়া হাতের কব্জি বাহির দিকে—অর্থাৎ যাহাতে হাতের বুড়া আঙ্গুল দু'টি জলের নিম্নাভিমুখী হয়, ঘুরাইতে হইবে। জলের ভিতর পদদ্বয় সজোরে পশ্চাতের দিকে ভেকের অনুকরণে আঘাত করিতে হইবে।

(ঘ)—এখন হাত দু'টি 'গ' বর্ণিত অবস্থা হইতে স্কন্ধের

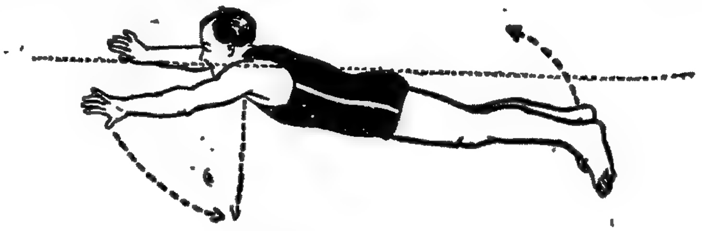

৩নং চিত্র

সহিত সমান্তরাল রাখিয়া পশ্চাতের দিকে ৩নং চিত্রানুযায়ী জল টানিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং হাতের কনুই দু'টি শক্ত রাখিতে হইবে। হাত দুটি স্কন্ধের সহিত সমরেখায় আনিবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গুটাইয়া 'ক' বর্ণিত অবস্থায় (১নং চিত্র) আনিতে হইবে। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য 'গ' বর্ণিত অবস্থা হইতে 'ক' বর্ণিত অবস্থায় হাত আনিবার মধ্যেই

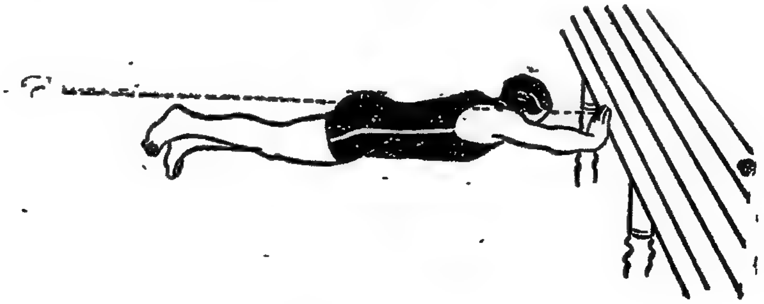

৪নং চিত্র

পদদ্বয়কেও গুটাইয়া 'ক' বর্ণিত অবস্থায় আনিতে হইবে। 'ক' বর্ণিত অবস্থায় হাত আনিবার অবকাশে মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ ও 'গ' বর্ণিত অবস্থা হইতে জল টানিবার সময় নাসিকা দ্বারা প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। এই সমস্ত ক্রিয়া সাঁতারু নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী করিবেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যেন মুহূর্ত্তের জন্যও হাত জল হইতে সম্পূর্ণ উঠিয়া না যায়। সাঁতারুর সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে প্রতিক্ষেপে ঘুরণের সময় উভয় হস্তের দ্বারা মঞ্চ স্পর্শ করিবেন এবং উভয় হস্ত দ্বারাই মঞ্চ স্পর্শ করিয়া সাঁতার শেষ করিবেন।

প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব সাঁতারের কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কৌশল

প্রতিযোগিতার দিন সাঁতারু কখনও হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি, নিরর্থক গল্প, চীৎকার, রৌদ্রাকীর্ণ স্থানে যাতায়াত ইত্যাদি করিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পূর্ব্বে প্রতিযোগিতার স্থানে গমন করিবেন। সর্ব্বদাই দুই একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত রহস্যালাপে আপনাকে নিযুক্ত রাখিবেন। প্রতিযোগিতার বিষয় আদৌ চিন্তা করিবেন না। ঘণ্টা বাজিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে সর্ব্বদেহে উত্তপ্ত করিয়া সরিষার তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে। এই মর্দ্দনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। যে সে লোকের দ্বারা ঐ প্রকার মর্দ্দন সম্ভবপর নয়। যে ব্যক্তি এই কার্য্যে পটু তাহার দ্বারাই মর্দ্দন করাইয়া লওয়া বিধেয়। ঘোষণাকারী কর্ত্তৃক আহুত হইলে প্রতিযোগী

আহ্বানকারীর কথা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাচিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইবেন। সর্ব্বদাই আজ্ঞাকর্ত্তার (starter) মুখের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারিত হইলেই আজ্ঞাকর্ত্তার (starter) হাতের বন্দুকের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন এবং মঞ্চের প্রান্তভাগে দুই পদ

৫ নং চিত্র

একত্রীভূত করিয়া পায়ের আঙুলে ভর দিয়া চিবুকের সোজাসুজি দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া আজ্ঞাকর্ত্তার হাতের বন্দুকের ঘোড়ার উপর দৃষ্টি রাখিয়া মনে মনে এক, দুই, তিন বলিতে হইবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন যে "দুই" ও "তিনের" অবকাশের বন্দুকের আওয়াজের একের চতুর্থাংশ সেকেণ্ডের পূর্ব্বেই যতদূর সম্ভব জল-পৃষ্ঠের উপর দিয়া গড়াইয়া জলে ঝাঁপ দিবেন। এই বন্দুকের আওয়াজ জল-স্পর্শের সঙ্গে

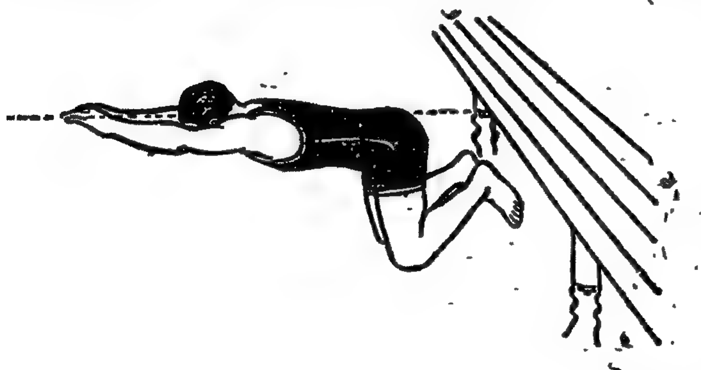

৬নং চিত্র

সঙ্গেই যেন শ্রুত হয়। যতদূর সম্ভব নিজেকে সাঁতারুর দল হইতে মুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া সাঁতার কাটিতে সুরু করিবেন। প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাসের পর উপরোক্ত ঝাঁপ দিবার প্রণালী অন্ততঃ দশ পনের বার করা উচিত। তাহা হইলে প্রতিযোগিতার দিন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ঝাঁপ দিয়া জলে পড়া উৎকৃষ্ট সাঁতারুর বিশেষত্ব। অল্প-দূরত্বের প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় অনেক ক্ষেত্রে ঝাঁপ দিবার কৌশলের উপর নির্ভর করে।

ঝাঁপ দিবার কৌশল শিখিলেই যে সমস্ত হইয়া গেল তাহা নহে। অধিক-দূরত্বের প্রতিযোগিতায় আর একটি কৌশল পালন করা বিধেয়। দ্রুত ঘুরণ, গতিবেগ নির্দ্ধারণ কিম্বা ইচ্ছামাত্র গতিকে সংযমন ইত্যাদি কতকগুলি কৌশলের উপর প্রতিযোগিতার জয় পরাজয় নির্ভর করে। সাঁতারু শক্তি ও দম অনুযায়ী সাঁতার সুরু করিবেন। প্রতিক্ষেপে গতিবেগ কিছু কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন।

৭নং চিত্র

প্রতিযোগিতার সময় প্রতিক্ষেপে মিটার সন্তরণ ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হইতেছে। উভয় তীরের মঞ্চের কিম্বা পাড়ের দশ গজ দূর হইতে যে গতিবেগে সাঁতার কাটা হইতেছে তার অপেক্ষা কিছু দ্রুতবেগে আসিতে হইবে। তারপর এক গজ তফাৎ হইতে সাঁতারুর সুবিধা অনুযায়ী একটা ছোট লাফ দিয়া অর্থাৎ কাঁধের ধাক্কা দিয়া ৪নং চিত্রানুযায়ী দক্ষিণ কিম্বা বাম হাতের দ্বারা মঞ্চ স্পর্শ করিবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ৫নং চিত্রানুযায়ী দেহ ঘুরাইয়া জলের নিম্নে মঞ্চের পাটাতনে দুই পায়ে ৬নং চিত্রানুযায়ী সজোরে ধাক্কা দেবেন। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ৭নং চিত্রানুযায়ী ঋজুভাবে জল পৃষ্ঠ হইতে ৬।৭ ইঞ্চি নিম্নে রাখিয়া ঐ অবস্থা হইতে পাড়ির সাহায্যে পুনরায় জল-পৃষ্ঠে উঠিয়া উপরি উক্ত দশ গজ পথ সজোরে অতিক্রম করিবার পর, নিজের 'দম' হাতে রাখিয়া সাঁতার কাটিতে সুরু করিবেন। এইরূপে কয়েকবার যাইতে পারিলেই প্রতিদ্বন্দ্বী নাগাল ধরিতে পারিবেনা। উপরি উক্ত কৌশলগুলি সাঁতারু যত্নের সহিত অভ্যাস করিবেন। উহার উপরেও জয়-পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে।

শান্তি পাল

রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা"

শ্রীমতী রুবি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার ম্যাডান্ থিয়েটারে রবিবাবুর 'চণ্ডালিকার' আবৃত্তি শুনে মনে এক গভীর ছায়া পড়েছিল, ইচ্ছা ছিল একদিন নিজে সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখব, আজ সেই সুযোগ এসেছে। বইখানি যতবার পড়ছি ততই ইহার অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বটি বেশ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পাচ্ছি। গল্পটী এইরূপ :—

শ্রাবস্তী নগরে একদিন ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ এক গৃহস্থের বাড়ী থেকে আহার শেষ করে তাঁর বিহারে ফিরছিলেন, এমন সময় পথে তিনি তৃষ্ণা বোধ করলেন এবং দেখতে পেলেন প্রকৃতি নামে এক চণ্ডালের মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে; তিনি তার কাছে গিয়ে জল চাইলেন, সে দিল; মেয়েটি তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং অন্য কোন উপায় না দেখে সে তার মার কাছে সাহায্য চাইল। তার মা যাদু বিদ্যা জানত। মেয়ের অনুরোধ মা ঠেলতে পারলে না এবং আঙিনায় মন্ত্রের সব উপকরণ সাজিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগল; আনন্দ এই জাদুর শক্তি কোন মতেই বোধ করতে পারলেন না এবং সেই রাত্রে তিনি চণ্ডালের গৃহে উপস্থিত হলেন। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য শয্যা প্রস্তুত করতে লাগল; আনন্দের মনে তখন গভীর পরিতাপ উপস্থিত হোল, তিনি তখন পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন; মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডালীর বশীকরণ বিদ্যা দূর হোল এবং আনন্দ তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন।

এই গল্পটিকে কেন্দ্র করে নাটিকাটির মধ্যে কবি এক অপূর্ব্ব রসের বস্তু গড়ে তুলেছেন। দেশকাল পাত্রের বাধা বিচার না মেনে নরনারীর মনের যে চিরন্তন লীলা, সৃষ্টির আদিম কাল থেকে যুগে যুগে মানুষকে অমৃতের সন্ধান দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপর্য্যয়ও ঘটিয়েছে তাকে কল্যাণের ও ত্যাগের পথে পরিচালিত করতে না পারলে সংসার-সমুদ্র-মন্থনে যে হলাহলের উদ্ভব হয় তাকে কণ্ঠে ধরবার শক্তি নীলকণ্ঠেরও থাকে না। এক হিসাবে এই নাটিকাটি একটি psychological study—মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ—কোন দিন ঠিক তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত লাগলে, মানুষের সুপ্ত মন মগ্ন চৈতন্য কেমন করে জেগে ওঠে তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য—জড় জগতের জৈব নিয়মে তার বিশ্লেষণ করা যায়না। হয়ত এমনি করেই চির-রাস-রসিকের বাঁশীর সুরে যমুনার কূলে উজান বইয়ে গোপীরা জেগে উঠেছিল।

নরনারীর প্রেম কখনও দেশ কাল জাতি হিসাবে বাধা মানতে চায় না—এই হচ্ছে সনাতন নিয়ম। চণ্ডালের মেয়ে প্রকৃতি যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ আনন্দকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল তখন সে ভুলে গেল যে সে একজন সামান্য চণ্ডালের মেয়ে, অতি নীচ কুলে তার জন্ম, ভিক্ষু আনন্দকে পাওয়া তার কাছে দুরাশা মাত্র। নিজের গণ্ডীর বাইরে অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়ান তার পক্ষে মস্ত অপরাধ। তার অন্তরে হয়ত ধূলি না থাকতে পারে কিন্তু যে ধূলির মধ্যে তার জন্ম হয়েছে, সমাজ তাকে সেটা কোন মতেই ভুলতে দেবেনা। তাই তার মা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাছা তোর কি মনে পড়ছে কোন পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী?"—সে উত্তর দিলে "এ কাহিনী আমার নূতন জন্মের।"

রূপকথার সোনার কাটির জীয়ন-পরশে জেগে উঠেছে তার ভিতরকার "আমি নারী, আমি মহীয়সী, আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।" মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন দিন আসে যখন এক

মুহূর্ত্তে, এক শুভ লগ্নে কিসের প্রেরণায় মন সাড়া দিয়ে ওঠে তা বলা যায় না, অথচ এক বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিতে সমস্তই অনায়াসসাধ্য বলে মনে হয়। প্রকৃতির জীবনে সেই দুঃসাধ্য ব্রতের বোধন—ভিক্ষু আনন্দ—তাকে পাওয়াই তখন তার চরম ও পরম সার্থকতা।

ভিক্ষু আনন্দ সমস্ত সকাল বেলা ভিক্ষা শেষ করে মাঠ পার হয়ে নদীর তীর বেয়ে প্রখর রৌদ্র মাথায় করে যেতে যেতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়েন, ও চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিকে বলেন —'জল দাও'—রাজদুয়ারে দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা তখন বেজে গেছে—আতপ্ত দীর্ঘ দগ্ধ দিনের নিদাঘ মধ্যাহ্ন।

"বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।"

আনন্দ যখন চণ্ডালের মেয়ে প্রকৃতির কাছে জল চাইলেন তখন সে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল তার মুখের পানে—যেন বিশ্বাসই করতে পারলেনা যে এমন কথা কেউ তাকে বলতে পারে। সে চণ্ডালিনী "সবার পিছে, সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে" তার স্থান, চিরদিন্ সমাজ তাকে পদদলিত করে এসেছে, মানুষের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে মাথা তুলতে দেয়নি। আজ জীবনে সে প্রথম শুনলে "জল দাও।" তার মন এক অশ্রুতপূর্ব্ব বীণার ঝঙ্কারে আলোড়িত হয়ে উঠল—সপ্তস্বরা রাগিনীর মত—মনের, সমাজের, সংস্কারের অবগুণ্ঠন খুলে গেল। সে আর তখন অশুচি নয়, অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য নয়। তরুণ প্রভাতের নবারুণ রাগ, তার নবজনমের সূচনা করে তাকে দীপ্ত মধ্যাহ্নে আহ্বান করলে এবং তার ললাটে শুভ্র শুচিতার জয়-তিলক এঁকে বলে দিলে—তুমিও মানুষ, তোমারও মন আছে, অধিকার আছে। সে বল্লে, "প্রভু আমি চণ্ডালের মেয়ে, জল আমার অশুদ্ধ" তিনি বল্লেন "যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।"

শুনে হৃদয় তার আনন্দে কেঁপে উঠল। চিরদিন সে সকলের কাছে কেবল লাঞ্ছনা অপমানই সহ্য করে এসেছে; সে যে মানুষ তাও যেন সে এতদিন লজ্জায় ঘৃণায় ভুলে ছিল কিন্তু আজ এই মহাপুরুষের স্পর্শে, তার সব লজ্জা, সব অপমান, সব ভয় ঘুচে গেল। প্রথম এক গণ্ডুষ জল তাঁর চরণে দিয়ে সে সার্থক হোল—তার কুলের ইতিহাস, জন্মের অভিশাপ ও অস্পৃশ্যতার গণ্ডী ধুয়ে গেল। তিনি জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে হোক্ সে চণ্ডালের মেয়ে তবু বিধাতার এই বিচিত্র সংসারে তার সেবা চলবে, কারণ শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেও কিছু ক্ষতি নাই, কারণ তাতে তার জাতও বদলায় না জলের গুণও যায় না।

প্রকৃতির মা কিন্তু তার জন্মগত সংস্কার এখনও ভুলতে পারেনি—যে আবেষ্টনের মধ্যে সে বেঁচে আছে সেই আবেষ্টন তাকে ক্রমাগতই জানাচ্ছে যে সে অস্পৃশ্য, সে চণ্ডালিনী; তার হাওয়া পর্য্যন্ত অশুচি, দাসী জন্মই তার শেষ কথা। কিন্তু প্রকৃতির মন এখন আর সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নাই, লজ্জা ও ভয় ঘুচে গিছে, নিজেকে সে এখন আর দাসী বলে স্বীকার করতে রাজী নয়—সে সেবিকা—সেবাতেই তার সার্থকতা। সে বুঝতে পেরেছে যে সেই ধর্ম্ম মিথ্যা যা মানুষকে অপমান করে সকলের পায়ের তলায় ঠেলে রেখে দেয়। অদৃষ্টদোষে তার দাসীঘরে জন্ম বটে কিন্তু কত চণ্ডাল জন্মায় ব্রাহ্মণের ঘরে। "জল দাও" এই একটি কথায় সে জানতে পারলে যে তারও কিছু দেবার আছে, সে রিক্ত নয়, নিঃস্ব নয়, "অফুরাণ জল" সে দিতে পারে। এক নিমেষে সে জেনে গেল যে তারও বেঁচে থাকার সার্থকতা আছে; তার সত্তা, তার নারীত্ব উদ্বোধিত হল।

তার পরে চলল সেই দ্বন্দ—প্রতিদিন বুকের ভিতর ঢেউ ওঠে "চাই, চাই, চাই" যেন 'খাঁচার ভিতর পাখীর পাখা আছড়ে মরা।' তার মা বলে, "ভুলে যা এই এক নিমেষের স্বপ্ন।" কিন্তু তার মন বলে, তাকে ফিরিয়ে আনবোই, তার মনকে পাকে পাকে জড়াব, সে আমায় এড়িয়ে যেতে পারবে না, সাগর তীরেই থাকুক্ আর শৈলশিরেই থাকুক্—

"আবার আসুক্, আবার আসুক্, আসুক্ ফিরে
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে"

প্রকৃতি জানে যে এই দেওয়া নেওয়ার মাঝে দানের কার্পণ্য

চলবেনা—সব উজাড় করে দিতে হবে। কিন্তু যে মন্ত্রে আনন্দকে আবাহন করা হচ্চে সে মাটির মন্ত্র, জননী বসুন্ধরার টান্—সৃষ্টির সেই আদীম মন্ত্রে সন্ন্যাসীর শুষ্ক সাধন কি উড়ে যাবে—ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে নিশীথ রাত্রে নিঃশব্দচরণে তারই বাঞ্ছিত তার দুয়ারে আসিবে। এ পাওয়ার স্বার্থকতা আছে কি না প্রকৃতি তখনও বোঝেনি- -যে আগুন সে জ্বালালে তার দাহিকাশক্তি যখন তাকেও স্পর্শ করে তাকে সর্ব্বত্যাগী করে তুলবে তখনই হবে তার মুক্তি। আনাতোল ফ্রান্সের Thais এরই ইঙ্গিত পাই—Paphunulius এর মুক্তি হল না। রূপজ মোহ যদি মোহের আবেষ্টন না ছাড়তে পারে—যদি প্রেমের জন্য তপস্যা ও ত্যাগ নাই হোল, তাহলে আর তার স্বার্থকতা কোথায়। প্রাচীন কবি উমার, শকুন্তলার তপস্যার মধ্যেই তাদের প্রেমকে জয়ী করেছেন—ত্যাগেই তাদের স্বার্থকতা হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে এরই সূচনা দেখতে পাই—ঝড় গিয়ে লেগেছে আনন্দের বুকে, অভ্রভেদী বনস্পতিকে মন্ত্রেব হাওয়া দোলা দিচ্ছে। প্রকৃতি ক্রমশঃ অনুভব করছে যে কি দুঃখ দিয়ে আনন্দকে আনছে—কিন্তু কাছে পেলে সমস্ত দুঃখ উজাড় করে তার দুঃখ মিটিয়ে দিতে পারে। গভীর রাত্রে যখন পথিক এসে পৌছাবে তখন সমস্ত বুকের জ্বালা দিয়ে প্রদীপ জ্বালান হবে—গভীর অন্তরে যে সুধার অমৃতধারা আছে তারই জলে তার অভিষেক হবে; কারণ সে যে শ্রান্ত, তপ্ত, সে যে ক্ষত-বিক্ষত

"দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার
মোর সংসার দিব যে জ্বালি
শোধন হবে এ মোহের কালী
মরণ ব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার।"

প্রকৃতির টানে আনন্দের মনে যে ভীষণ সংঘর্ষ চলেছে তাকে কেন্দ্র করে কবি এইখানে লোকাতীত বিরাট দ্বন্দ্বরূপের কল্পনা করেছেন। "যুদ্ধ চলেছে—ভীষণ আগুণে গলে মিশেছে সোনার সঙ্গে তামা—নতুন সৃষ্টির নতুন বৈরাগ্য—ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দুঃখ নেই, ভাঙছে, জ্বলে উঠছে, গলে যাচ্চে, ছিটকে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ।" এই দ্বন্দ্ব বেশীক্ষণ স্থায়ী হোলো না, মারণমন্ত্র জয়ী হোল—।

বশীকরণের শেল আনন্দের মর্ম্মে গিয়ে বিঁধল। আনন্দকে তখন দেখাচ্চে যেন "দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাকাশে মুখ।"

নিজের সঙ্গে যেই সমস্ত সংঘর্ষের মীমাংসা হয়ে গেল অমি আনন্দের দেহে এল এক শৈথিল্য এবং মুখে একটা বিহ্বলতা। চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য ধরে তিনি এগিয়ে আসতে লাগলেন প্রকৃতির কাছে ধরা দিতে—কি ম্লান, কি ক্লান্ত; আত্মপরাজয়ের কি প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে। কিন্তু প্রকৃতি তখন তাঁর সত্যকারের রূপ দেখতে পেয়েছে—সে চায়না যে তার প্রিয়তম আসবে মাথা হেঁট করে;—তার ভোগের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। তার জন্মান্তরের দিনে, তার মুক্তির শুভক্ষণে সে বীরের অপমান করবেনা। তার প্রিয়তম চিরবাঞ্ছিতকে কাছে পেয়েও তাকে ত্যাগ ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করার শক্তি সে অর্জ্জন করেছে—সার্থক হোল তার ধূলা লাগা, সার্থক হোল তার নারী জন্ম, জয়ী হল তার প্রেম—

"জয়ী প্রেম জয়ী ক্ষেম জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে"

রুবি বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলা ধুলা

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী এম্-এ

আনন্দ মেলার স্পোর্টস

মার্কাস স্কোয়ারে আনন্দ মেলার পঞ্চম বার্ষিক স্পোর্টস্ শেষ হয়েছে। এই স্পোর্টসে শুধু মেয়েরা যোগ দিয়েছিলেন। এবার প্রায় এক শতের অধিক প্রতিযোগিনী এই প্রতিযোগীতায় যোগ দিয়েছিলেন।

৩৫ মিটার স্যাক্ রেস (সিনিয়ার)

১ম—ইলা সেন (বেথুন)

২য়—মায়া মিত্র (রামকৃষ্ণ মিশন)

৩য়—তারা মুখার্জ্জী (চিলড্রেনস্ ওয়েল ফেয়ার)

বার্ষিক আনন্দ মেলা স্পোর্টস্—১০০ গজ নীচু-বেড়ার দৌড়ে মিস্ হিরণ্ময়ী বসু (নং ১৭) প্রথম স্থান অধিকার করে।

প্রতিযোগিতার কয়েকটি ফলাফল :

১০০ গজ দৌড় (সিনিয়ার)

১ম—মিস্ এইচ, বোস (রামকৃষ্ণ মিশন)

২য়—মিস্ এল, সেন গুপ্ত (খেলাঘর)

৩য়—মিস্ রাণী চ্যাটার্জ্জী (ভারত স্ত্রী বিদ্যালয়)

৭৫ মিটার ব্যালান্স রেস (সিনিয়ার)

১ম—গীতা ব্যানার্জ্জী (কমলা গার্লস)

২য়—বেনু চাটার্জ্জী (বেথুন)

৩য়—শান্তা রুদ্র (আনন্দমেলা)

ইণ্টার রেলওয়ে স্পোর্টস

দিল্লি আরউইন ষ্টেডিয়ামে রেলওয়ের অষ্টম বার্ষিক স্পোর্টস্ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ে হতে প্রায় দেড় শতের অধিক উন্নত তরুণ এ্যাথেলেটীকরা যোগ দিয়েছিলেন। এবার ২২০ গজ দৌড়ে হোয়াইট সাইড্ মাত্র ২২$\frac{১}{১০}$ সেঃ-এ জয়ী হয়ে ভারতে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। এর পূর্ব্বে উক্ত দৌড়ে বাংলার এম্ সার্টনের রেকর্ড ছিল ২২-২ সেঃ। এ ছাড়া লংজাম্প, ডিসকাস্ থ্রো ও ৪৪০ গজ দৌড়ে তিনটি নতুন রেলওয়ে রেকর্ড হয়েছে।

কয়েকটী ফলাফল:

ডিসকাস থ্রোঃ

১ম—ভি, ফিলিপস্ (এন, ডবলু, আর)

২য়—ও, কালাযাম (এস, আই, আর)

৩য়—এম্ বেলেটী (এস, আই, আর)

দূরত্ব—১১৮ ফিট ৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

লং জাম্প

১ম—এন, সিংহ (ই, বি, আর)

২য়—এ, স্মিথ (এস, আই, আর)

৩য়—এ, করদেল (ই, আই, আর)

২১ ফিট ৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

ইণ্টার কলেজ ছাত্রীদের স্পোর্টস

মেয়েদের স্কুল কলেজে কম্পালসারী খেলাধুলা প্রচলন হলে নষ্ট-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ও দেশের মঙ্গল হয়, এ সম্বন্ধে "বিচিত্রায়" আমরা বহুবার উল্লেখ করেছিলুম। এতদিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়েছে দেখে আমরা ভবিষ্যতে অনেক কিছু আশা রাখি।

বেথুন কলেজের ব্যায়ামপ্রিয় ছাত্রীগণ যাঁরা এ বৎসর আনন্দ মেলা স্পোর্টসে যোগদান করেছিলেন।

সেদিন গলষ্টন পার্কে ইণ্টার কলেজ ছাত্রীদের প্রথম বার্ষিক স্পোর্টস সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত স্পোর্টসের অধিকাংশ বিষয়গুলি বেশ প্রতিযোগীতামূলক হয়েছিল। কলেজ চ্যাম্পিয়ানশিপ্ লাভ করেছেন ভিক্টোরিয়া।

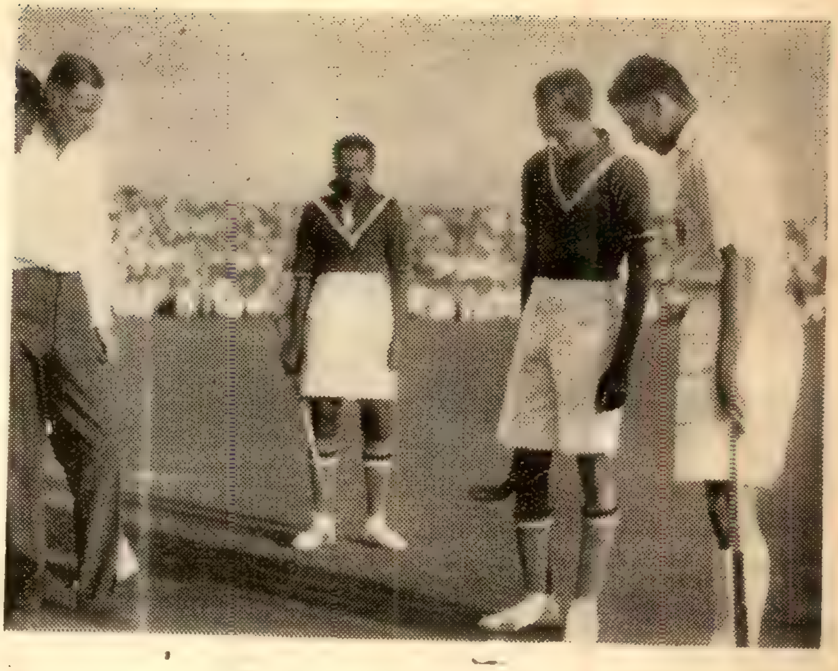

আন্তর্প্রাদেশিক ফাইন্যাল খেলায় বেঙ্গল এবং মানভাদার—এক গোলে (১-০) বেঙ্গল জয়ী হয়েছেন

মানভাদার দল

ভূপাল দল

কয়েকটী ফলাফল ঃ

৮০ গজ দৌড়ে

১ম—সারা এজরা (স্কটিশ চার্চ্চ)

২য়—অন্নপূর্ণা ব্যানার্জ্জি (আশুতোষ)

৩য়—স্নেহ মিত্র (বেথুন)

সময়—৮⅘ সেঃ।

ইউ, পি, দল

৪৪০ গজ দৌড়
১ম—নীলিমা মিত্র (বেথুন)
২য়—অরুণা সান্যাল (আশুতোষ)
৩য়—কৃষ্ণা সেন (ভিক্টোরিয়া)
সময়—২ মিনিট ১৫ সেঃ।
অঙ্কের হাঁরে ভাঙ্গা
১ম—অর্পণা রায় (ভিক্টোরিয়া)
রীলে রেস
বিজয়ী—স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ।
ইভলিন লোরা, রেবা দত্ত, ডলি স্যামুয়েল ও সারা এজরা।

সেই মাধুর্য্য ও চাতুর্য্য দেখা যায় না। পর পর বাজে টীমের কাছে ড্র ও পরাজয় স্বীকার করে মোহনবাগান লীগে অতি নিম্ন স্থানে এসে পৌছেছে। রিবেলোকে পেয়ে এবং টীমটাকে নতুনভাবে গঠিত করে কাষ্টমস্ প্রতিদ্বন্দ্বী টীমদের গোল দিয়ে অপরাজেয় হয়ে চলেছে। কাষ্টমস্-এর হাত থেকে লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ কেড়ে নিতে একমাত্র রেঞ্জার্স ও মোহন বাগানের সাহস ছিল কিন্তু এবার দুইদলই তার মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান পয়েট নষ্ট করেছে। আগেকার চেয়ে রেঞ্জার্স দল তত উন্নত ও দৃঢ় না হলেও লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। কাষ্টমস ও রেঞ্জাস এই দুই পুরোন প্রতিদ্বন্দ্বী

সিন্ধ দল

হকি

হকি লীগ খেলা প্রায় শেষ হতে চল্‌ল। লীগের গোড়া হতেই খেলার ততখানি উৎসাহ ও আনন্দ সৃষ্টি করতে পারেনি যদিও প্রতিদিন সেই পুরোন নামজাদা খেলোয়াড়দের মাঠে দেখা যায়। গত বছর মোহন বাগান লীগবিজয়ী হওয়াতে হকি খেলার প্রতি বাঙ্গালী দর্শকের উৎসাহ একটু বেড়ে গেছে। এইচ, মিত্র ও এ, দেব বি, জি, প্রেসে যোগদান করাতে মোহন বাগান একটু দুর্ব্বল হয়েছিল,—কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ হয়েছিল তরুণ বেনীপ্রসাদ ও সুলতানীকে লাভ ক'রে। চতুর সেণ্টার ফরোয়ার্ড এম, খার খেলায় আর

টীমের খেলার ওপর লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ নির্ভর করছে। সেণ্ট জেভিয়ার্স, সেণ্ট জোসেফ ও মিলিটারী মেডিকেল এই তিনটী কলেজ টীমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ উপভোগ্য! এঁরা লীগে ভালই খেলছেন এবং ভাল স্থান অধিকার করবেন। এবার ভবানীপুরের ক্রীড়াদক্ষতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাষ্টমসদের সঙ্গে ড্র করে ভবানীপুর ক্রীড়া-মহলে বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত করেছিল। ই, বি, আর ক্যালকাটা ও পুলিশ মাঝে মাঝে সুন্দর খেলে সকলকে চমৎকৃত করেন। লীগে দু একটি আপসেটও করেছে। আর্ম্মেনিয়ান, লিলুয়া ও ডিভনসকে লীগ থেকে বোধ হয় বিদায় নিয়ে দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে হবে।

আন্তর্প্রাদেশিক হকি খেলা

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের পূর্ব্বে ভারতীয় হকি ফেদারেসন কলিকাতায় আন্তর্প্রাদেশিক হকি খেলার উদ্বোধন করেন। পাঞ্জাব, ইউ পি, বোম্বে, রাজপুতানা, অল রেলওয়ে, সিন্ধু, প্রভৃতি টীমে ভারতের নামজাদা খেলোয়াড়দের দেখা গিয়েছিল। ভূপাল ও মানভাদার এই সর্ব্বপ্রথম আন্তর্প্রাদেশিক খেলায় যোগদান করেন। গতবারের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব শুধু তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে মাঠে নেবেছিলেন। একমাত্র জাফর ছাড়া এই বিজয়ী টীমের কোন খেলোয়াড়ই ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেনি। ভূপাল ও মানভাদারের খেলা এত সুন্দর ও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে শেষ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব, ইউ, পি, বোম্বে প্রভৃতি বিখ্যাত টীমসকল এদের হাতে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। হকি খেলা কত নিকৃষ্ট হতে পারে তারি পরিচয় দিয়েছিল বিহার ও উড়িষ্যা। বাংলার কাছে কম করে ১০ গোল খেয়ে ভগ্ন হৃদয়ে মাঠ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

রূপসিংহ, ওয়েলসকে নিয়ে ইউ, পি ২-১ গোলে বোম্বের কাছে হেরে যায়। ফাইনাল গেমে বাংলা মানভাদার দলকে সাক্ষাৎ করেন। খেলার প্রথম ভাগে দুই দলেই আক্রমণ করে খেলেছিল। গোল দিবার সুযোগও অনেকগুলি নষ্ট হয়েছিল। খেলার শেষের দিকে বাংলা দল নব উদ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী মানাভাদারকে আক্রমণ করে চেপে রাখে। আর, কার একাকী সকলকে অতিক্রম করে অতি সুন্দর ব্যাকে পাস করেন ও ডেভিডসন গোল দেন! তার পরেই খেলা শেষ হয়। বাংলা এক গোলে জয়লাভ করেন। মানাভাদার দলে মামুদ ও সাহাবুদ্দিন এবং বাংলার দলে এস, চাটার্জ্জী, আর, কার, ও গ্যালিবর্ডির খেলা খুব প্রশংসনীয় হয়েছিল।

বাংলা দল—এলেন, ট্যাপসেল ও হজস; এস, চাটার্জ্জী;

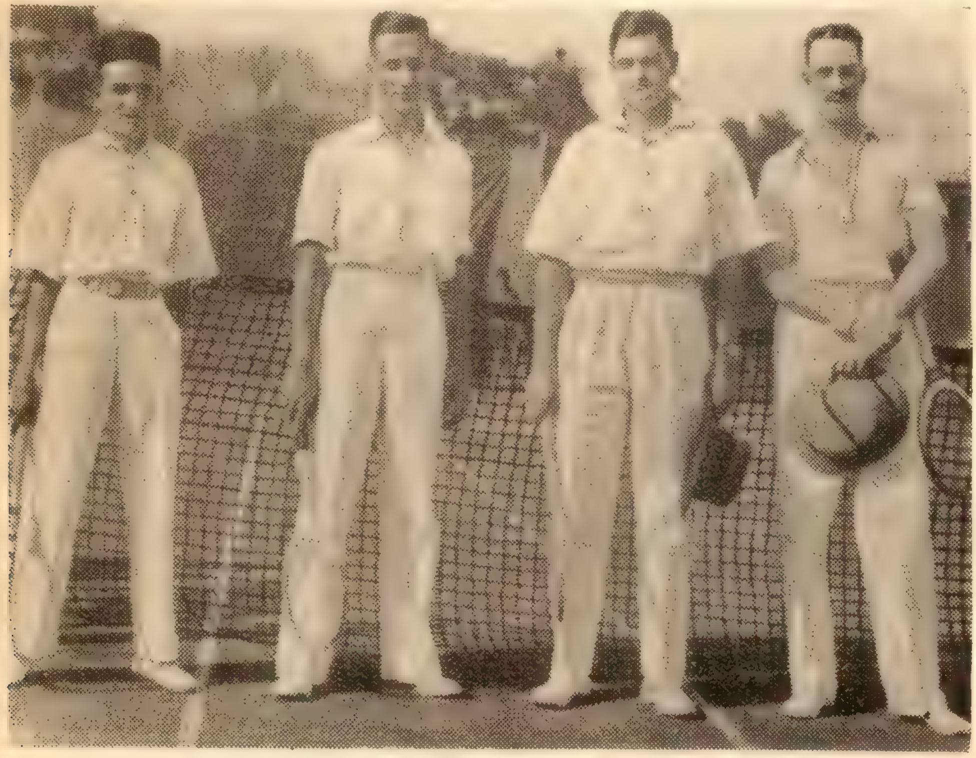

বালীগঞ্জ টেনিস টুর্ণেতে Open Men's Doubles এ শেষের খেলোয়াড়গণ (Finalists)
বাম হইতে—সুরি, ডোভার, মিচেলমোর ও হজস্

ট্যাপসেল ও গ্যালিবর্ডি; এ, দেব, ডেভিডসন, আর, কার, সুলতানী ও নাজীর।

মানাভাদার দল—বোস্তন খাঁ, সত্তর ও মহম্মদ হোসেন, সৈয়দ, মামুদ ও শাহুর; সাহাবুদ্দিন, সুলতান, আমেদ, জব্বর ও রবার্টস।

অলিম্পিক টীম

এবার অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান হবে বার্লিনে। বিদেশে ভারতীয় হকি টীমের কৃতিত্ব কে না জানে? এবারও বার্লিনে ভারতের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে এ আশা করা অন্যায় নয়। ভারতীয় টীমে স্থান পেয়েছে ধেয়ানচাঁদ, রূপসিংহ, এলেন ট্যাপসেল, মহম্মদ হোসেন, মামুদ, গ্যালিবর্ডি, নির্ম্মল, আর, কার, সাহাবুদ্দিন, জাফর, ফারনেজ ইসেট, আসান খাঁ, কালেন, প্রভৃতি।

টেনিস

কলিকাতায় টেনিসে নামজাদা টুর্ণামেণ্ট বালিগঞ্জের খেলা শেষ হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বহু খ্যাত ও অখ্যাত খেলোয়াড়রা যোগ দিয়েছিলেন। এই টুর্ণামেণ্টের মাঝের দিকে দু একটি আপসেট হয়। বেঙ্গলে চ্যাম্পিয়ান ডি, হজেস ভোডারের কাছে পরাজিত হওয়ায় একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। পুরুষ সিঙ্গল্‌স্ ফাইনালে সুদক্ষ মিচেল মোর মেজর হেনীকে সাক্ষাৎ করেন। মেজর হেনী এই বোধ হয় প্রথম কলিকাতায় কোন নামজাদা টুর্ণামেণ্টে ফাইনালে উঠলেন। প্রথম সেট মিচেলমোর অতি সহজেই ৬-২ গেমে হারান। দ্বিতীয় সেটে মেজর হেনীর খেলা বেশ প্রশংসনীয় হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মিচেলমোর ৬-২, ৬-৪ গেমে জয়ী হন।

মিচেলমোর—যিনি বালীগঞ্জ টেনিসের Single-এ জয়ী হন

ইংলণ্ডগামী নিখিল ভারত ক্রীকেট টীম-এর সভ্যগণ—
বম্বে হইতে রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে।

মহিলা সিঙ্গলস ফাইনালে গেমটি বেশ প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়েছিল। মিস হার্ভে জনসন ক্রীড়ানৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দেন কিন্তু সুদক্ষ মিসেস ম্যাক ইনিস্ ৬-৪, ৬-৩ গেমে মিস হার্ভে জনসনকে পরাজিত করেন। লেডিস ডাবলস ফাইনালে মিস ই, হোমান ও মিসেস ফ্লুটিট ৬-১, ৬-৩ গেমে মিসেস ম্যাক ইনিস ও মিসেস ম্যরিকে পরাজিত করেন।

ইন্টার-ভার্সিটি বাইচ প্রতিযোগিতা

পাশ্চাত্য দেশে বাইচ প্রতিযোগিতায় কেম্‌ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিরস্মরণীয়। এই বাইচ প্রতিযোগিতা সেখানে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। ভীষণ ঠাণ্ডায় কিন্তু অগণিত নরনারীর উৎসাহ নিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অক্সফোর্ড প্রথমে কেম্‌ব্রিজকে থ্রিফোর লেংথএ পেছিয়ে রেখে হেমার স্মিথ ব্রীজ

বিজয়নগরের মহারাজকুমার—নিখিল ভারত ক্রীকেট টীমের ক্যাপ্টেন, হাতে টীম-এর মাঙ্গলিক (mascot) বহন করিতেছেন।

পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়; কিন্তু অক্সফোর্ডের গভীর জয়-উল্লাস খুব অল্পক্ষণই স্থায়ী হয়েছিল। কেম্‌ব্রিজ ২১ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে উক্ত দীর্ঘ পথটুকু অতিক্রম করে অক্সফোর্ডকে পাঁচ লেংথএ পরাজিত করেন। এই নিয়ে লাইট ব্লু ক্রমান্বয়ে ১৩ বার ডার্ক ব্লুকের পরাজয়ের গ্লানিতে ভরিয়ে দিল! এই বাইচ প্রতিযোগিতায় কেম্‌ব্রিজ অদ্ভুত রেকর্ড করে চলেছে।

ক্রিকেট

রঞ্জি গোল্ড কাপ টুর্ণামেণ্ট

সুন্দর আবহাওয়া, ভাল মাঠ ও বহু দর্শকের উৎসাহ নিয়ে দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসিপ, ফাইনাল খেলা আরম্ভ হয়। গত বছরের বিজয়ী বোম্বে দল এবার মাদ্রাজ দলকে সাক্ষাৎ করেন। টস জিতে বোম্বে দল ব্যাট করতে নাবেন এবং প্রথম ইনিংসে মোট রান হয় ৩৩৪। হিণ্ডেলকার ও কাদির টীমের সত্যিকার গোড়া পত্তন করেন। রান করেন ৫৪ ও ৮৩! তারপর বাপোরিয়া ৯০ ও ওয়াদকার ৬৪ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য! মাদ্রাজের বোলারদের আক্রমণ বার বার ব্যর্থ করে বোম্বে দল এত উচ্চ রান তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এর প্রত্যুত্তরে মাদ্রাজ দল রান করেন ২৬৮। মাদ্রাজ দলে বিখ্যাত ইউরোপিয়ান খেলোয়াররা যোগদান না করায় ব্যাটিং বেশ দুর্ব্বল হয়। দুর্দ্ধান্ত বোম্বের বোলারদের বিরুদ্ধে একমাত্র কৃষ্ণস্বামী, গোপালাম ও রামসিংহের খেলা খুব প্রশংসনীয় হয়েছিল। কৃষ্ণস্বামী ৭৭, গোপালাম ৩৩ ও রামসিংহ ৩২। প্রথম ইনিংসে বোম্বে দল তখন ৬৬ রানে এগিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে বোম্বের নামজাদা ব্যাটস্‌ম্যানরা মাদ্রাজের বোলারদের জব্দ করতে পারলেন না। হিণ্ডেলকার ও কাদিরের ন্যায় সুদক্ষ খেলোয়ার মাত্র ১ রানে আউট হয়ে যায়। মার্চ্চেণ্ট ৭৭ রান করে টীমটাকে দাঁড় করান। মার্চ্চেণ্টের খেলা সেদিন সত্যিকার উপভোগ্য হয়েছিল। টীমের ক্যাপ্টেন ভাজিফদার রান করেন ৪৮। সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১৯৯ রানে বোম্বের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। রামসিংহ ৫ উইকেট ৯২ ও রামচন্দ্র ৩ উইকেট ২৪ রান নেন। মাদ্রাজদলের খেলার প্রথম মুখে এক ভাগ্যবিপর্য্যয় সুরু হয়। কৃষ্ণস্বামী, গোপালাম প্রভৃতি মাত্র ২ রানে আউট হয়ে যান। উত্তাপা ও রামসিংহও বেশীক্ষণ টিঁকে থাকেননি। তখন মাদ্রাজ দলের মাত্র ৫ উইকেট ৫০ রান। সুতরাং পরাজয় যে অনিবার্য্য তা সকলেই জানত। এই সময় বোম্বের আক্রমণকে কাবু করলেন রামস্বামী। অতি চমৎকার খেলে রান তুললেন ৪০। তারপর বাকি খেলোয়াররা আউট হয়ে বিষন্ন মনে তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে বোম্বের বিখ্যাত শ্লো বোলার জ্যামসেটজীর ক্রীড়া-চাতুর্য্যে সকলেই আনন্দ লাভ করেছিল। উনি তিন উইকেট ১৮ রান নেন। ১৯০ রানে মাদ্রাজ দলকে হারিয়ে বোম্বে দল দ্বিতীয়বার অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান হন। খেলার শেষে বিজয়ী দলকে গ্রাণ্ট গোভান রঞ্জি ট্রফি উপহার দেন।

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

কাগজওয়ালা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

রাস্তার পাশের গির্জ্জা ঘরে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল,—সে ত্বরিত পদে পথ চলিতে লাগিল। ছোট ভাইটীর জ্বর; সে এতক্ষণ হয়ত ক্ষুধায় ছট্ ফট্ করিতেছে। এক মেসের বাবু মাস-হিসাবে কাগজ রাখেন, গত দুই মাসের কাগজের দাম তার কাছে বাকী; তিনি সাত আট দিন পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া আজ তাহাকে ঘণ্টা দুই বসাইয়া রাখিয়া কোন্ পথ দিয়া যে মেস হইতে বাহির হইয়া গেলেন সে বুঝিতেই পারে নাই। বাবুলোকে এইরূপ ব্যবহার করিলে গরীব দুঃখী কাগজের ফেরিওয়ালা বাঁচে কি করিয়া? ভাইটী বড্ড কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার জন্য কিছু আঙ্গুর বেদানা না কিনিলেই নয়—নিজের আটার পয়সাটা হইলে হয়···

হঠাৎ পাশ হইতে 'এই কাগজওয়ালা,' বলিয়া কে যেন ডাকিল।

সে আশান্বিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল একজন চশমাধারী বাবু একটা বাড়ীর গেটে দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বেই একটা ঝাঁকায় প্রকাণ্ড বাক্স, একটা স্যুটকেশ, মোটা বিছানা ও কয়েকটা ছোট বড় টোপলা টুঁপলি বোঝাই দিয়া ছোক্‌রা-মতন একজন কুলী। 'ষ্টেস্‌ম্যান চাই বাবু?' বলিয়া একটা ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজ বাহির করিয়া সে অগ্রসর হইল। বাবুটী কাগজ হাতে লইয়া পকেটে হাত দিয়া পয়সা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন "তুই এর বোঝাটা একটু তুলে দে ত।"

দুই জনে ধরাধরি করিয়া ঝাঁকা তুলিতে প্রবৃত্ত হইল—ইত্যবসরে বাবু কাগজের ভাঁজ ভাঙ্গিয়া প্রথম পাতা উল্টাইয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন।

বোঝাটা ছোকরা-কুলীর মাথায় চাপাইয়া দিয়া সে বলিল, "বাবু, বড্ড ভারী, ও ছেলে মানুষ; নিতে পারলে হয়।"

'আরে থোড়া ভারী, কিছু কষ্ট হোগা নেই"—বলিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বাবুটী কাগজ দেখিতে লাগিলেন। কুলী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

'বাবু, আমার পয়সা কয়টা...'

'দাঁড়া দাঁড়া, ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন?' বলিয়া বাবু দ্রুত কাগজের উপর চোখ বুলাইতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে কাগজটী ভাঁজাইয়া তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "নে ওয়াণ্টেড টা একটু দেখলুম।"

'কাগজ রাখবেন না বাবু?'

'ওরে না, ওতে কিছু নেই, তা রেখে কি ক'রব?' বলিয়া কাগজটা তাহার হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া বাবুটী কুলীর পশ্চাতে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কাগজওয়ালার মনে হইল, সময় থাকিলে সে বাবুটীর পথ আগুলিয়া ধরিয়া তাহার সহিত ঝগড়া করিত। কিন্তু ওদিকে ভাইটী যে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে—সে ডাইনে বামে না চাহিয়া আবার দ্রুত পদে পথ চলিতে লাগিল।

আর গোটা কয়েক বাড়ী ছাড়াইলেই তাহাদের গলি পাওয়া যাইবে।

'এই কাগজ ওয়ালা—'

যে দিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিক পানে চাহিয়া সে দেখিল, মোটরের মধ্যে একজন হ্যাটকোটধারী বাঙ্গালী সাহেব গাড়ীখানা গ্যারেজ হইতে বাহির করিয়া রাস্তার উপর নেবার চেষ্টা করিতেছেন। পাইপ বসাইবার জন্য ফুটপাথের পার্শ্বেই দুই তিন হাত প্রস্থ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত মাটী তোলা হইয়াছে, গাড়ীর পিছনের চাকা সেই খালের মধ্যে আটকাইয়া গিয়াছে। দুই তিন জন কুলী গাড়ীর পিছন দিকটা উঁচু করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। সম্ভবতঃ তাহাকেও ওই কাজের জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে মনে করিয়া সে বলিল, "বাবু, আমার সময় নেই আমার ভাইয়ের...'

বাধা দিয়া বাঙ্গালী সাহেব বলিলেন, "আরে, কাগজ দেওয়ারও সময় নেই নাকি? সহরে চাল তোদের ভেতরও ঢুকেছে দেখছি! দে একটা কাগজ দে।"

'কি কাগজ বাবু ?'

"এই যে, এবার সময় হয়েছে দেখছি—দে যা হয় একটা।"

সে একটা কাগজ সাহেবের হাতে দিল—সাহেব কাগজটা হাতে লইয়া পকেট হইতে একটা মনিব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন "ওদের সাথে একটু ধাক্কা দে না। দেখছিস্ না গাড়ীটা উঠছে না ?"

সে অগত্যা কুলীদের দলে গিয়া মিশিল।

ভাল আঙুরের জন্য নানা রাস্তা ঘুরিয়া সে যখন বাসায় পৌছিল তখন ঠিক এগারোটা। ভাইটী সত্যই ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে বলিল এমন বেশী ক্ষিধে পায় নাই। ভাইটীকে সে চিনিত—তাই তাড়াতাড়ি উনানটীতে কয়লা ও নীচে ঘুঁটে কেরোসীন দিয়া আগুন ধরাইয়া সে পাখায় বাতাস করিতে লাগিল এবং 'এই দেখতে দেখতে তোর সাবু রান্না হয়ে যাবে—একটু সবুর কর—' প্রভৃতি বকিতে লাগিল।

কলে জল খুব বেশীক্ষণ থাকিবেনা—ভাইটী এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেই সে তাড়াতাড়ি উনানটী ঘরের বাইরে রাস্তার উপর বাতাসে রাখিয়া তুইটা বাল্‌তি লইয়া বাহির হইয়া গেল। জলকলটা কিঞ্চিৎ দূরে। সে দ্রুতপদে জল-কলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, আগে হইতেই পাঁচ ছয়-জন গ্রাহক প্রত্যেকেই তুই তিনটা বাল্‌তি কলসী প্রভৃতি লইয়া কলটী ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে আগে নিবে, কে পরে নিবে এই লইয়া গোলমাল বাধিতে পারে, এই আশঙ্কায় গ্রাহকদের মধ্যে একটা বন্দোবস্তও হইয়া গিয়াছে। যে আগে আসিয়াছে তাহার বাল্‌তি কলসী কলের অতি নিকটে, যে তাহার পরে আসিয়াছে তাহার গুলি তৎ পশ্চাতে, এমনিভাবে সকলে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই বন্দোবস্তের মধ্যে কথা কহিয়া কোন লাভ হইবে না মনে করিয়া সে সর্ব্বপিছনে আপন বাল্‌তি তুইটা স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আপন আপন বাল্‌তি কলসী জলে পূর্ণ করিয়া একে একে সকলেই প্রস্থান করিল। সে তাড়াতাড়ি আপন বাল্‌তিটা কলের নীচে স্থাপন করিয়া হ্যাণ্ডেল চাপিতে যাইবে এমন সময় এক ময়লা জামা কাপড় পরা বাবু নিকটস্থ এক মিঠাইয়ের দোকান হইতে ঠোঙ্গায় করিয়া খানকয়েক কচুরী ও একটু হালুয়া গিলিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতেই—"দাঁড়া দাঁড়া, একটু সবুর কর, এই আমার এক সেকেণ্ডের বেশী লাগ্‌বে না" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিয়াই কলের নীচে হাত পাতিয়া দিল।

'তোর বাল্‌তিটা একটু সরিয়ে রাখ্, সকড়ি লাগ্‌বে।'

সে বাধ্য হইয়া বাল্‌তিটা সরাইয়া রাখিল।

'ওটা একটু চেপে ধরনা ?'

সে হাত দিয়া হ্যাণ্ডেল চাপিয়া ধরিয়া কিঞ্চিত দূরে সঙ্গিতে রত এক ভিক্ষুকের দিকে চাহিয়া রহিল। বাবুটী মিনিট তিনেক ধরিয়া কুলকুচি করিলেন—পরে চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন।

সে যখন চোখ ফিরাইল, তখন বাবুটী নাই। অন্য একজন লোক কলের জলধারার নীচে ঘটি ধরিয়াছে এবং তাহার ঘটিতে কিঞ্চিত জলও পড়িয়াছে। সে ঘটি ভর্ত্তি হওয়া অবধি হ্যাণ্ডেল চাপিয়া রাখিল। ঘটি ভর্ত্তি করিয়া সেই লোকটী প্রস্থান করিলে সে আপন বাল্‌তিটা কলের নীচে স্থাপন করিতে যাইবে, এমন সময় পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের পাড়ার রাখাল একটা বাল্‌তি ও একটা কলসী হাতে ম্লান বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

'কিরে অমন মুখ করে রয়েছিস কেন ? আজ আবার মেরেছে নাকি ?'

'জল নেওয়ার জন্য মাত্তর চার মিনিট সময় দিয়েছে। ঘড়ি ধরে' বসে আছে—একটু দেরী হলে জুতাপেটা করবে বলেছে। তোকে ত মারবার কেউ নেই—।"

শেষের কথাটা তাহাকে বড় বিঁধিল। সত্যই সামান্য সামান্য বা বিনা কারণেও রাখালের কাকা তাহার পৃষ্ঠ কর্ণ ও মুখমণ্ডলের তুর্দ্দশার একশেষ করিয়া ছাড়ে। সে দেখিল রাখালের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছে। সে কোন কথা না বলিয়া আপন বাল্‌তি সরাইয়া রাখালের বাল্‌তিতে জল ভরিতে আরম্ভ করিল।

গামছা দিয়া একটা বিড়া তৈরি করিয়া কলসীটা রাখালের মাথায় তুলিয়া এবং বাল্‌তিটা হাতে ধরাইয়া দিল। রাখাল ত্বরিত পদে রাস্তা দিয়া ছুটিল। পরিশেষে নিজের বাল্‌তিটা কলের নীচে স্থাপন করিয়া হ্যাণ্ডেলে চাপ দিতেই তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল—আরো খানিকটা জোরে চাপ দিয়াই সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। একবার চাহিয়া দেখিল মাথায় কলসী, হাতে বাল্‌তি দ্রুত ধাবমান রাখাল ওই গলির মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার কালীবর্ণ মুখে-চোখে কিসের যেন আভা খেলিয়া গেল—বোধকরি সেই তুপুর বেলার প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মির ঝিকিমিকি। সে পা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

দেওঘর হইতে

শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তফী এম-এ

প্রকৃতি আমি যে তোমার দুলাল,
আমারে রাখো গো করিয়া আড়াল
তোমার স্নেহের কোলে,
অবারিত তব মাঠের উপর, গাছের ছায়ার তলে।
আমারে দিও না ছেড়ে
সহরের কারাগারে,
জীবন যেথায় বাঁচিবার লাগি প্রাণপণ ক'রে যুঝে,
দুবেলা দুমুঠি অন্ন খুঁটিয়া মরিতেছে খুঁজে খুঁজে,
কুৎসিৎ সংগ্রাম,
সভ্য সমাজে সকলের মতে বেঁচে থাকা যা'র নাম।

দূর আকাশের বুকে,
নীল রং দিয়ে পাহাড়ের ছবি কে যেন দিয়েছে এঁকে,
তাই শুধু চেয়ে দেখি,
কোন আকাঙ্ক্ষা পূরাবার আশা আর নাহি মনে রাখি,
প্রার্থনা নেই কিছু,
চাহি না ছুটিতে মন-গড়া কোন আলেয়ার পিছু পিছু,
সকলে চাহিছে যাহা,
আমার নিকটে ধূলির মতন ব্যর্থ, তুচ্ছ তাহা।

এই মাটি, এই জল,
বন্ধুর মত গলাগলি ক'রে দাঁড়ান গাছের দল,
সবুজ তৃণের প্রাণ,
অন্তরে মোর নীরব ভাষায় জাগাইছে কলতান,
আমি তাই তাহাদের,
সবুজ তৃণের, ধূসর মাটির, শাল আর শিমুলের।

সম্মুখে যত চাই,
চক্ষু ততই প্রসারিয়া চলে পথে কোন বাধা নাই,
নাই কোন ঘর বাড়ী,
নাইক' মানুষ, নাইক' তাদের চলাফেরা তাড়াতাড়ি।
অগাধ শূন্যতা,
সেইখানে আজ সারাখন্ ধ'রে বায়ুর মত্ততা,
প্রবল ঘূর্ণীবেগ,
সরাইয়া দেয়, ভাগাইয়া দেয়, যে ক'খানা ছিল মেঘ।
আমারই চোখের আগে,
বর্ষার দিনে আকাশের বুকে ঘন শ্যামলিমা লাগে,
দীর্ঘ মধুর ছায়া,
অন্তরে মোর, দুই চোখে মোর বুলায় কিসের মায়া,
আমি তাই তাহাদের,
প্রসারিত এই শূন্যের আর সীমাহীন আকাশের।

———

ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

ডাঃ আর, ঘোষ, এল্-এম্-এফ্

বর্ত্তমান বাংলার বিগত শ্রী ও স্বাস্থ্যজীবনকে পুনর্গঠন করিবার সঙ্কল্প আজ প্রায় সর্ব্বত্রই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে দুঃখ দুর্দ্দৈব ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার ভিতর ইহা যে একটী বিশেষ শুভলক্ষণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মানুষকে স্বাধীন হইতে হইলে, স্বাস্থ্যগত প্রাণ হওয়া একান্তই দরকার। স্বাস্থ্য স্বাধীনতার মেরুদণ্ড। রাজ্য বলুন, আর সমাজ বলুন, সকলের মূল ভিত্তি স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য না হইলে জগতে কিছুই প্রতিষ্ঠা হয় না। যেখানে স্বাস্থ্য নাই, সেখানে কিছুই নাই। শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সাধারণের প্রচার অল্পদিনের মধ্যে; রোগ নির্ণয় এবং নিরাময় পদ্ধতি বহুকালের। নিজের জীবনের মায়া বা জীবন সুস্থতার মধ্যে যাপন করিবার আকাঙ্খা প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে। প্রাণীজগতের অতি নিম্নতম স্তরের সমস্ত প্রকার জীব জন্তু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত, নিজ নিজ শরীর রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকের বিপদ হইতে আত্মরক্ষার কৌশল জানে। এ কৌশল হয় অন্যের নিকট হইতে শিখিয়াছে, আর না হয় প্রকৃতির সৃষ্টি রক্ষার কৌশল ভাবিয়া সহজাত ভাবে আপনিই বোধের মধ্যে জাগিয়াছে। যে ভাবেই হউক প্রাণী মাত্রই রক্ষণশীল।

সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করিবার একটী সুসুপ্ত আকর্ষন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। আদিমকাল হইতে অদ্যাবধি অসভ্য জাতির মধ্যেও চিকিৎসার ব্যবস্থা বর্ত্তমান। অধুনা বৈজ্ঞানিক ঔষধ-প্রত্রের প্রচলন বেশী। আমাদের দেশে যাবতীয় বাত, পুরাতন বাত, বাতে অঙ্গুলীর আড়ষ্টতা, পক্ষাঘাত, বুকে বেদনা, মাথা ধরা, কর্ণের বেদনা, ঘাড়ের বেদনা, অনিদ্রায় অধিকাংশ লোকই রোগগ্রস্থ হইয়া পড়েন। ইহার কোন ঋতু বা কাল নাই। এই সকল রোগের ফলে, অকাল-বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই এই ব্যাপারকে রহস্যময় বলিয়া মনে হয়। বাংলার এই অসুস্থতার মূলে, কি গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহা যদি জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। রোগ হইলে চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া বহু টাকা ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু জীবনে ব্যাধি দূর করা বড়ই কঠিন।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের "রচি কোম্পানী" আধুনিক চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং কঠোর গবেষনার ফলে সারিডন ট্যাবলেট আবিষ্কার করিয়া বহু রোগীর উপকার সাধন করিয়াছেন। আধুনিক চিকিৎসকগণ বহুদিনের পরিচয়ের ফলে, এই ঔষধ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ হিসাবে ব্যবহার করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। সারিডন নিরাপদ বেদনা-নাশক ত বটেই, উপরন্তু ইহার দ্রুত কার্য্যকারী ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকায় রোগী অল্পসময়ের মধ্যে সুস্থ বোধ করিতে পারেন। গরম ফ্লানেল দ্বারা সেক, কালোপযোগী ফল ভক্ষণ, যথেষ্ট গরম দুধ পান প্রভৃতিতে রোগের অনেক উপসম হয়।

বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞ ডাক্তারগণ "রচি কোম্পানী"র প্রস্তুত সারিডনের সর্ব্বতোভাবে প্রসংসা করেন।

ডাঃ আর, ঘোষ

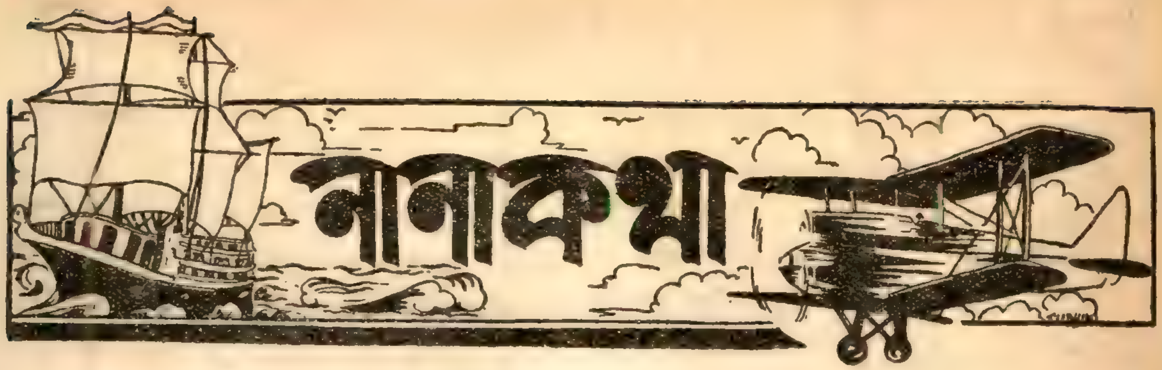

পঁচিশে বৈশাখ

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল পঁচিশে বৈশাখের দিনটি উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাক্‌বে। ১২৬৮ সালের ঐ দিবসে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন কে ভাবতে পেরেছিল যে, সেদিনকার সেই সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে সেই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন ভবিষ্যতে তিনি বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যকে নূতন রূপ নূতন গঠন নূতন ব্যঞ্জনা দিয়ে অপরূপ ক'রে তুলে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

১৩৪৩ সালের ২৫ শে বৈশাখ আগতপ্রায়। ঐ দিবসে রবীন্দ্রনাথ ৭৬ বর্ষে পদার্পণ করবেন, অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৩ রবীন্দ্রনাথের ষট্‌সপ্ততিতম জন্মদিন। আমরা ঐকান্তিক চিত্তে কামনা করি সুখে স্বাস্থ্যে রবীন্দ্রনাথ শতায়ু হোন,—দীর্ঘ অনাগত কাল তাঁর অপরিম্লান প্রভায় বাঙ্গালা দেশ প্রদীপ্ত থাকুক।

রবীন্দ্রনাথকে ষাট হাজার টাকা দান

বিশ্বভারতীর ঋণ পরিশোধার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ উত্তর ভারতের নগরে নগরে অভিনয় করে বেড়াচ্ছিলেন। দিল্লীতে তিনি উপস্থিত হলে সেখানকার কয়েকটি সহৃদয় ব্যক্তি এই বৃদ্ধ বয়সে এবং অসুস্থ দেহে অভিনয়ের কষ্ট থেকে রবীন্দ্রনাথকে অব্যাহতি দেবার জন্য ষাট হাজার টাকা দান করেন। এই অর্থ পাওয়া মাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাকি ভ্রমণ-তালিকা পরিত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৃহৎ টাকাটা যাঁরা দান করেছেন তাঁরা তাঁদের নাম সাধারণের নিকট গোপন রেখেছেন। তাঁরা যেই হোন-না কেন, সৎকার্য্যের জন্য তাঁরা যে সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিশ্বভারতী যে শুধু রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি নয়, পরন্তু গৌরবের দিক থেকে সমগ্র ভারতবাসীর সম্পদ্‌, একথা সকলের মনে, বিশেষতঃ প্রত্যেক বাঙালীর মনে, বদ্ধমূল হওয়া উচিৎ। বিশ্বভারতী জাতীর গৌরবের বস্তু, সমস্ত বিশ্বের বিদ্বৎকুলের তীর্থস্থল এই শান্তিনিকেতন সুদূর বিদেশে বাঙালীর পরিচয়ের সামগ্রী। এর ব্যয় নির্ব্বাহের অর্থ-সংগ্রহের জন্য আর কত-দিন রবীন্দ্রনাথ দেশ বিদেশে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াবেন? বাঙলা দেশের ধনকুবেররা ইচ্ছা করলে একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথকে অর্থসমস্যার দুশ্চিন্তা থেকে পাকা-ভাবে মুক্তি দিতে পারেন। এতদ্বারা তাঁরা নিজেরাও তাঁদের দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের ঋণ থেকে মুক্তিলাভ করবেন। রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের অবসর কাল এইটুকু শান্তি এবং নিশ্চিন্ততা দাবী করতে পারে না কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিক প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতা

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিক প্রকাশ বিভাগের সম্পাদকের অনুরোধক্রমে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ শত বার্ষিক কমিটি নিম্নলিখিত ভাবে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন।

১। গবেষণাত্মক নিবন্ধ (The sis) প্রতি-যোগিতা। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল নিবাসী যে

কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের পক্ষে উন্মুক্ত ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এম্‌-এ অথবা এম্‌-এস্‌-সির অনুরূপ দাবী প্রতিযোগীগণের উপযুক্ততার নিম্নতম দাবী হওয়া চাই। "The Philosophy of Sri Ramkrishna and its bearing on World culture" বিষয়ের উপর ২০,০০০ কথার মধ্যে নিবন্ধটি ইংরাজি ভাষায় লিখতে হবে।

১ম পুরস্কার—নগদ ২০০৲ দুইশত টাকা
২য় পুরস্কার—নগদ ১৫০৲ দেড়শত টাকা

২। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(ক) কলেজের ছাত্রদের মধ্যে। ভারতবর্ষ ব্রহ্ম এবং সিংহলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (সরকারি অথবা বেসরকারি) অ গত ছাত্রদের (বালক অথবা বালিকা) জন্য উন্মুক্ত। ই াজি ভাষার চার হাজার কথার মধ্যে "Sri Ramkrishna's contribution to the Social and Religious Life of India" বিষয়টির উপর প্রবন্ধ লিখতে হবে।

ছাত্রদের জন্য ১ম পুরস্কার ৩০৲ ত্রিশ টাকা
২য় পুরস্কার ২৫৲ পঁচিশ টাকা
ছাত্রীদের জন্য ১ম পুরস্কার ৩০৲ ত্রিশ টাকা
২য় পুরস্কার ২৫৲ পচিশ টাকা

প্রত্যেক পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে (ক) এক সংখ্যা "The cultural Heritage of India" (শত বার্ষিক পুস্তক —দুই খণ্ডে, ৮ পেজী ডবল ক্রাউন প্রায় ২000 পৃষ্ঠায়) (খ) একটি পদক ও (গ) নগদ টাকা

(খ) স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের যে কোনো সরকারি অথবা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত। প্রতিযোগীদের মাতৃভাষায় ২000 কথার মধ্যে "Sri Ramkrishna and his Teachings" বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতে হবে। নিম্নলিখিত ভাষাগুলির মধ্যে যে কোনোটিতে প্রবন্ধ লিখতে হবে। (১) অসমীয় (২) বাঙলা ভাষা (৩) উৎকলীয় (৪) হিন্দি (৫) উর্দ্দু (৬) গুরুমুখী (৭) সিন্ধি (৮) গুজরাটি (৯) মারাঠি (১০) তামিলী (১১) তেলেগু (১২) মলয়ালয়ম্ (১৩) কানারিজ (১৪) ব্রহ্মদেশীয় (১৫) সিংহলীয়।

স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য সব শুদ্ধ ৬০টি পুরস্কার থাকবে। প্রত্যেক ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুটি প্রবন্ধ লেখককে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টা দুটি প্রবন্ধ লেখিকাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

ছেলেদের জন্য ১ম পুরস্কার—১৫৲ টাকা
২য় পুরস্কার—১০৲ টাকা
মেয়েদের জন্য ১ম পুরস্কার—১৫৲ টাকা
২য় পুরস্কার—১০৲ টাকা

প্রত্যেক পুরস্কার মূল্যবান পুস্তকে এবং একটি করে পদকে দেওয়া হবে।

টাইপে অথবা পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখিত হয়ে থিসীসগুলি ৩১ শে আগষ্ট ১৯৩৬ অথবা তৎপূর্ব্বে এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরের লিখিত হয়ে প্রবন্ধগুলি ৩১শে জুলাই ১৯৩৬ অথবা তৎপূর্ব্বে স্বামী সমুদ্ধানন্দর নামে Asst. Secretary, Sri Ramkrishna Centenary Committee, Albert Hall, 15 College Square, Calcutta ঠিকানায় পৌছানো চাই। প্রবন্ধ-প্রতিযোগীগণ যে তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষালয়ের যথার্থ ছাত্র অথবা ছাত্রী এই মর্ম্মে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট হতে একটি করে সার্টিফিকেট পাঠাবেন। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে পুরস্কার প্রাপ্তির ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরস্কার বিতরিত হবে।

বিহার প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের জীবনী সংগ্রহ

পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘের সম্পাদকের নিকট হ'তে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত চিঠিখানি আমরা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম। প্রভাতী সঙ্ঘের এই কার্য্যের কল্পনা খুবই প্রশংসনীয়। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে ইহা অতি মূল্যবান উপকরণ প্রস্তুত করবে তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে প্রভাতী সঙ্ঘকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবার জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করছি।

"আমরা বিহার প্রবাসী বাঙালী (জীবিত ও মৃত, বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব, আধুনিক ও প্রাচীন, খ্যাতনামা ও অখ্যাত) সাহিত্যিকদের জীবনী সংগ্রহ করিতেছি। এই কার্য্যে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব বিহার প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন তাঁহারা নিজ নিজ সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাদের পাঠান। অন্যথায় তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুবর্গ এই কাজ করিবেন ইহাই অনুরোধ।

মৃত সাহিত্যিকদের আত্মীয় বন্ধুবর্গ যদি আমাদের অনুরোধ পালনে তৎপর হন অর্থাৎ স্বর্গতঃ সাহিত্যিকদের জীবনী প্রেরণ করেন তবে আমরা অত্যন্ত বাধিত হই।

জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া বিহার প্রবাসী বাঙালীদের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে এ বিষয়ে যিনি যাহা জানেন আমাদের অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। তাঁহাদের নিকট কোন সংবাদ পাইলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

এ বিষয়ে যাঁহারা কিছু আলোচনা বা চর্চা করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনার বিশদ বিবরণ জানাইলে ভাল হয়।

সম্পাদক, প্রভাতী সঙ্ঘ
৺অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়ের বাটী
"পাটলিপুত্র" বাঁকীপুর (পাটনা)।"

সিন্ধু এবং উড়িষ্যা

বিগত ১লা এপ্রিল ১৯৩৬ হতে সিন্ধু এবং উড়িষ্যা গভর্ণরের অধীনে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হল জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা এবং ঐতিহ্যের সমন্বয়ের দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে এই দুটি পৃথকীকরণ ক্রমোন্নতি এবং ক্রম বিকাশের অনুকূল হয়েছে ব'লেই মনে হয়, কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয় এ দুটি প্রদেশই, বিশেষতঃ উড়িষ্যা এমন দরিদ্র, যে এদের শাসনব্যয় নির্ব্বাহ কেমন ক'রে এদের নিজেদের আয়ের দ্বারা সম্ভবপর হবে তা একটি কঠিন সমস্যা ব'লে মনে হচ্ছে। সুতরাং নূতন কর ধার্য্য কিম্বা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হাত পাতা ভিন্ন গত্যন্তর নেই ব'লে মনে হয়। প্রথমোক্ত উপায়টি নবগঠিত প্রদেশদ্বয়ের পক্ষে এবং শেষোক্ত উপায়টি অপরাপর প্রদেশ সমূহের পক্ষে, আপত্তিজনক এবং অসমীচীন হবে।

বিহার এবং উড়িষ্যা যখন বঙ্গের সঙ্গে একটি অখণ্ড প্রদেশে সংযুক্ত ছিল তখন তাদের সংস্থিতির মধ্যে অসঙ্গতি কিছু ছিল না। তারা ছিল একটি বৃহৎ ভূখণ্ডের দুটি বিভিন্ন অংশ। বঙ্গের সঙ্গে পৃথক হ'য়ে তাদের সংস্থিতি এমন অসুবিধাজনক হল যে উড়িষ্যার প্রধান নগরগুলি থেকে রাজধানী পাটনায় যাবার সহজ পথ রইল পৃথকীকৃত বাঙলার রাজধানী কলিকাতারই ভিতর দিয়ে। শুধু তাই নয়, অভিন্ন বন্ধু বাঙলার সহিত যোগবর্জ্জিত হ'য়ে এ দুটি প্রদেশের যোগ হ'ল চিনির সহিত বালিয়া যোগের মত,—কিছুতেই মিশ খাবার মতো নয়। বিহারের সহিত হাত ছাড়াছাড়ি হ'য়ে উড়িষ্যার মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল তাতে সন্দেহ নেই।

সুভাষচন্দ্র বসু

গত ৮ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করা মাত্র পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভারত গভর্মেণ্ট তাঁকে জানান যে ভারতবর্ষে আগমন করলে তিনি স্বাধীনতা ভোগ করবার আশা যেন পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বাপর সকল কথা বিবেচনা ক'রে সুভাষচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমন করাই মনস্থ করেন, ভারত গবর্মেণ্টও নিজ কথা রাখবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করেছেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে সুভাষচন্দ্র যদি এমন কোনো কাজ করতেন যাতে তাঁকে বন্দী করা গভর্মেণ্টের নিজ স্বার্থরক্ষার দিক থেকে সমীচীন হোত তা হ'লে অবশ্য কিছু বলবার থাকতনা। কিন্তু সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনই অপরাধ ব'লে গণ্য ক'রে তাঁকে ভারতবর্ষে আসতে নিষেধ করা, এবং তার কারণ প্রদর্শনে সুভাষচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা এবং লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করবার শক্তির উল্লেখ করা গভর্মেণ্টের পক্ষে আদৌ যৌক্তিক হয়নি। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন অপরাধ নয়, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ অপরাধ। বুদ্ধিমত্তা এবং

লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করবার শক্তি থাকা অপরাধ নয়, পরন্তু সেই বুদ্ধি এবং সঙ্ঘবদ্ধ করবার শক্তি গভমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়ত অপরাধ। সুভাষচন্দ্রের মতো বুদ্ধি এবং সঙ্ঘবদ্ধ করবার শক্তিবিশিষ্ট দু-চার জন ব্যক্তি ভারতবর্ষে যে নেই যাঁরা স্বাধীনতা ভোগ করছেন—তা নয়। তা হ'লে গভমেণ্টের পক্ষে উচিৎ সেই সকল ব্যক্তিকে হয় বিদেশে চালান দেওয়া, নয় কারারুদ্ধ করা।

সে যাই হোক্, সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করবার জন্য সমস্ত দেশে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে, আমরা আশা করি গভর্মেণ্ট তৎপ্রতি সদয় কর্ণপাত ক'রে হয় সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি প্রদান করবেন, নয় তাঁর শরীর, যা এখনও সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হ'তে পারেনি, যাতে আরও রুগ্ন না হ'য়ে পড়ে তার যথোচিত ব্যবস্থা করবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে মহিলা-কাউনসীলার

বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মুয়াইদজাদা এম্-এ, বি-এল্ কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট। ইনি এবার গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হ'য়ে কলিকাতা ম্যুনিসিপাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়েছেন। কলিকাতা ম্যানিসিপ্যালিটিতে ইনিই প্রথম মুসলমান মহিলা কাউন্সিলার।

ডাক্তার স্যর কেদারনাথ দাস

গত ১৩ই মার্চ্চ ধাত্রীবিদ্যা এবং স্ত্রীরোগের প্রধান চিকিৎসক স্যর কেদারনাথ দাস ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অল্পদিন তথায় কাজ করেন। তারপর ক্যাম্পবেল স্কুলে চাকরি গ্রহণ ক'রে ২৩ বৎসর তথায় অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথায় পরে অধ্যক্ষ মনোনীত হন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্যর কেদার দাস কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত কলেজকে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন। তাঁর সঞ্চিত সমস্ত পুস্তকাবলী তিনি উক্ত কারমাইকেল কলেজকে দান ক'রে গেছেন।

স্যর কেদারনাথ তাঁর অদ্ভুত প্রতিভাবলে প্রসব কার্য্যের ব্যবহারের জন্য 'Obstretrix Forceps' নামক একটি যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে গেছেন যা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করেছে। ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি পুস্তক রচনাও করেছিলেন।

স্যর কেদারনাথের মত গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং শিক্ষকের মৃত্যুতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Saratchandra Mukherjee at the Sahitya-Bhaban Press, 26, Sitaram Ghose Street, and Published by the same from 27-1, Fariapooker St. Calcutta.

বিচিত্রা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

মাটকোঠা

শ্রীকানাই ভড়

বিচিত্রা

নবম বর্ষ, ২য় খণ্ড	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩	৫ম সংখ্যা

কলাবুদ্ধি ও কলবুদ্ধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৫ মাঘ, ১৩৩৯

এই পৃথিবীকে আমরা ভালোবেসেচি, এঁকে আমাদের ভাল লাগে, কেবলমাত্র এ জন্যে নয় যে, এর থেকে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়। এর রঙে রূপে রসে আমাদের মন ভুলিয়েচে। এর সকালবেলাকার সূর্য্যোদয় কেবল যে আমাদের আলো দেয় তা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু দেয় যাকে বলি আনন্দ। সেই আনন্দের উপাদানগুলি খুব সূক্ষ্ম খুব ব্যাপক, সেগুলির স্পর্শে খুসি হয়ে আমাদের মন দেয় সাড়া। আমার বাগানের রাস্তায় সকালে যখন বেড়াচ্চি দেখি আমার পলাশ গাছের ডালে ডালে গুটি ধরেছে, পাতা-ঝরা শিমুল গাছ ভরে গেছে কুঁড়িতে, অপেক্ষা করে আছি কবে মাঘের শেষে হাওয়া দেবে দখিন থেকে, নীল আকাশের আঙিনায় ফুলের গুচ্ছে গুচ্ছে লালরঙের পাগলামি লেগে যাবে। এই যে আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের একটা ভালো-লাগবার সম্বন্ধ নানাপ্রকার রূপকে নিয়ে ভাবকে নিয়ে গভীর হয়ে ছড়িয়ে পড়েচে, একে অবজ্ঞা করা চলে না। এ যে কেবল সুখের, আরামের তা নয়, এর মধ্যে কঠোরতা আছে, বেসুর আছে, দ্বন্দ্ব আছে। সব সুদ্ধ জড়িয়ে এ আমাদের চৈতন্যকে জাগিয়ে

রেখেচে, নানা রঙে রঙিয়ে রেখেচে। এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের রসবোধের সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গেও তেমনি। সে আরো বিপুল, আরো গভীর, তার সুখদুঃখের তীব্রতা আরো প্রবল, তার মধ্যে পদে পদে অভাবনীয়তা, তার ঘাতপ্রতিঘাত আমাদের সমস্ত দেহমন প্রাণকে নাড়া দিয়ে তোলে। এই নিয়ে আমাদের চৈতন্যের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার মূল্য অনুসারে আমাদের ব্যক্তিস্বরূপ সম্পদ্‌বান হয়ে উঠেচে। মানুষের এই বহুবিচিত্র প্রাণবান অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ মূল্য প্রকাশ পাচ্ছে তার সাহিত্যে তার কলাবিদ্যায়। এই অভিজ্ঞতা রসের অভিজ্ঞতা যাকে ইংরেজিতে বলে Emotion। এ বুদ্ধির অভিজ্ঞতা নয়, প্রয়োজনের অভিজ্ঞতা নয়।

শক্তির প্রকাশ দেখলেও মানুষের বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ হয়, সার্কাসে ঘোড়ার উপর ডিগবাজি-খেলা দেখলে হাততালি দিয়ে ওঠে। এর একটা হেতু আছে, সেই হেতুটা হচ্চে দুঃসাধ্যসাধন; তাসের খেলার ভোজবাজির মধ্যেও সেই হেতু আছে, কী করে কী হোলো বোঝা গেল না বলে মজা লাগ্‌ল। কিন্তু আমার পলাশ গাছে যখন ফুল ফোটে তখন সে কোনো শক্তির ডিগ্‌বাজির ধাক্কায় আমাদের চৈতন্যকে তরঙ্গিত করে না। "Love is enough" ভালোবাসা ভালোলাগা আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত।

মানুষের সবকিছুর মতো এই ভালোলাগারও একটা চর্চ্চা আছে, একটা বিদ্যা আছে। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানবপ্রকৃতি থেকে বাছাই করে সাজাই করে মানুষ আপনার একটি বিশেষ আনন্দ-লোক আপনি সৃষ্টি করে তুলচে। দেশে দেশে কত কাব্য কত ছবি কত মূর্ত্তি কত মন্দির তার এই সৃষ্টির অন্তর্গত। আজ মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হঠাৎ অত্যন্ত বিপুল হয়ে উঠেচে। তার ফল অত্যন্ত প্রভূত, জিনিষ উৎপন্ন হচ্চে অসংখ্য আকারে অসম্ভব বেগে, সংখ্যায় এবং পরিমাণে, শক্তির দুঃসাধ্যতায় ও কৌশলে মানুষের মনকে অভিভূত করে দিয়েচে। লোভে এবং দুরাকাঙ্ক্ষায় মানুষ আপন প্রাণকে পীড়িত করে মানবসম্বন্ধকে ভেঙে চুরে যন্ত্রকে ও বস্তুকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো করে তুল্‌চে। তার এই শক্তিমদমত্ততার অবস্থায় যন্ত্রশক্তির প্রকাশকেই সে যদি বলিষ্ঠ বলে আস্ফালন করে এবং প্রাণের প্রকাশকে হৃদয়ের প্রকাশকে বলে সেন্টিমেণ্টাল দুর্ব্বলতা তা হলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, সুন্দর দুর্ব্বলও নয় সবলও নয়, তা সুন্দর; তার শ্রেষ্ঠতা যদি এই বলে বিচার করতে চাই যে সে এক সেকেণ্ডে কয়বার চাকা ঘোরাতে পারে, কিম্বা তার উৎপাদনের সংখ্যা কত তা হলে বলব সেটা বর্ব্বরতা। এবং সেই সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, যন্ত্রের অপরিমিত জটিলতা, তার বিকট আওয়াজ, তার দুরন্তবেগ ও দুর্ম্মূল্য উপকরণ, যাতে করে সে বর্ত্তমান যুগের মনকে ছেলেভোলানোর মতো করে ভোলায় সেটাতে তার শক্তির চেয়ে অশক্তিরই পরিচয় বেশি। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যতই উন্নতি হবে তার হাঁসফাঁসানি ততই কমবে, তার মানুষমারা দৌরাত্ম্য ততই হালকা হয়ে আসবে, তার উপকরণ ততই হবে সহজ। কারখানাঘর কুশ্রী কেন না মানুষের অশক্তিই এখানে উৎকট হয়ে উঠেচে, নিজের শক্তি দিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে বাঁধতে গিয়ে বন্ধনটাকেই করে তুলেচে অত্যন্ত জবড়জঙ্গ, সেইটেই তার দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতা কুশ্রী। যে মানুষ সাঁতার জানে না, সে বিকট রকম হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করে, তার আস্ফালনে শিশুর মন ভুলতে পারে, কিন্তু যে মানুষ সাঁতার জানে সমজদার তার সাঁতারের ভঙ্গী দেখে বাহবা দেয়—

কেবল যে সেই ভঙ্গী ফলদায়ক তা নয়, সেই ভঙ্গী সুশ্রী, তার গতির সুপরিমিত সুঠামতা তার শক্তির উদ্দামতাকে অনায়াসে সংযত করে রাখে। শক্তি বর্ত্তমান যুগের কলকারখানায় দৈত্যের মতো বিকটাকার, কেন না আপন উদ্দামতাকে সে দেবতার মতো সহজে সংযত করতে পারে নি, তাই সে আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধকে সৌন্দর্য্যবোধকে মানবসম্বন্ধবোধকে এমন করে পীড়িত করচে। মানুষের কলাবুদ্ধি আনন্দিত হয় দেবতাকে নিয়ে, কলবুদ্ধি দৈত্যকে নিয়ে ; এই দৈত্যের সঙ্গে তার লোভ মিতালি করতে পারে কিন্তু তার আনন্দ এর বেদীতে পূজা আনবে না। কলকারখানার প্রয়োজন নেই এমন কথা আমি কখনই বলিনে— কিন্তু সে দাস, পণ্য বিনিময়ের কাজে তাকে পুরো দমে খাটিয়ে নেও কিন্তু তার সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের ভাণ করতে যাওয়া ছেলেমানুষী।

চিঠির একটা অংশের উত্তর দেওয়া হয়নি, সেটুকুও যোগ করে দিই। লিখেছিস্ একটা যুগ আসচে যখন আমরা বিজ্ঞান, economic production নিয়ে কবিতা লিখব। কত ধানে কত চাল হয় এই প্রয়োজনীয় বিষয়টা এতকাল ধরে এত গৃহস্থকে আলোচনা করতে হয়েছে তবু কেন আজ পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ কবিতা লেখেনি। কিম্বা "ধন্য রাজা পুণ্যদেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ", এই ছড়াটাকে কেন কেউ সাহিত্যে বড়ো জায়গা দেয়নি ? মাঘের শেষে বৃষ্টি হলে চাষীদের উপকার হয় এ তথ্যটা তো "production" তত্ত্বের অন্তর্গত। এক্‌সচেঞ্জের বাজার ওঠানামা নিয়ে দেশজুড়ে সুখদুঃখ তো কম নয়, এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি চলে, কিন্তু ভৈরবীরাগিণীতে আলাপ তো কেউ করে না। মানুষের জীবনের একটা ভাগ আছে যেটা খবর দেওয়া-নেওয়া নিয়ে—তা নিয়ে লাভ লোকসান ঘটে কিন্তু তা নিয়ে কেউ গান গায় না, নাচে না, মূর্ত্তি বানাতে বসে না। তা নিয়ে যা লেখালেখি হয় তা হিসেবের খাতায়, সেই খাতায় কবিত্ব ফলাতে গেলেই মনিবের কাছে কানমলা খেতে হয়। আইনষ্টাইন বেহালা বাজাতে ভালোবাসেন কিন্তু রেলেটিভিটি নিয়ে সঙ্গীত রচনার কথা তাঁর মনে হয়নি, সেটা তাঁর পক্ষে ও তাঁর বিজ্ঞানের পক্ষে ভালোই হয়েচে। রেলেটিভিটি তত্ত্বে দেশ ও কালের যুগল মিলন ঘটেছে বলে কোনো কবি যদি তাই নিয়ে সনেট্ লিখতে বসেন, তা হলে আপত্তি করব না যদি রচনাটা ভালো হয়। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে সাহানা রাগিণীর নাড়া খেয়ে রেলেটিভিটি তত্ত্বটা ঘুলিয়ে যাবে সে কথাটা ধরে নিতেই হবে। তোর মতে, স্বয়ং বিজ্ঞান যখন কবিত্বের আসরে নামবে সেই যুগে অকাম প্রেমের জায়গায় লালসার আকর্ষণ মানুষের স্বভাবের অতীত ভাবুকতার জায়গায় স্বভাবসঙ্গত প্রবৃত্তি সাহিত্যে সম্মান পাবে।—কথাটা ভেবে দেখা যাক্। কলকারখানা জিনিষটা স্বভাবসঙ্গত নয়। মানুষের হাতদুখানা স্বভাবদত্ত, সেই হাত দিয়ে মাটি খোঁড়াটা ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক, খুঁড়তে গায়ের জোরও লাগত বেশি। অথচ তোর মতে কৃত্রিম কলকারখানায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেইজন্যে সেইটেই কবিতার বিষয় হওয়া উচিত, তাই ট্রাক্‌টার তোকে মুগ্ধ করচে। অথচ যাকে তুই ন্যাচারাল ইন্‌স্‌টিঙ্‌ক্‌ট্ অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি বলচিস্ সেটাকে তুই বড়ো বলচিস্ মানুষের বানানো সেন্টিমেন্টের চেয়ে। এটা যে উল্‌টো কথা হোলো। সায়ান্সের বেলায় মানুষ পশুর স্বাভাবিক বুদ্ধি ছাড়িয়ে নিজ চেষ্টায় বড়ো হয়ে উঠবে অথচ তার চরিত্রের বেলায় মানুষ পশুর সহজ প্রবৃত্তির দিকে গেলেই তার বাহাদুরী এ কেমনতরো কথা হোলো। ক্ষিদে পেলেই কুকুর যেমন তেমন জায়গা থেকে

যেমন তেমন করে খায়, ক্ষিদের এইটেই স্বভাব। কিন্তু মানুষ রেঁধে খায়, সাজিয়ে খায়, যেমন তেমন করে খাওয়াটাকে ঘৃণা করে। মানুষ ক্ষিদের ইন্‌স্টিঙ্‌ক্‌টের সঙ্গে আর্টের আনন্দ মিলিয়ে তবেই খেয়ে সুখ পায়। সে কুকুরের মতো খায় না বলে কেউ তাকে সেন্টিমেন্টাল বলে উপহাস করে না। অসভ্য মানুষেরা যেমন-তেমন করেই খায় তাই বলে তারাই যে উঁচুদরের মানুষ এমন কথা কেউ বলে না। কামুকতা নিয়েই মানুষ পুরো তৃপ্তি পায়নি বলেই প্রেমিকতাকে বড়ো করে তুলেচে। তাতে আনন্দের গভীরতা প্রবলতা ও স্থায়িকতা বেশি তাই তার মূল্য বেশি। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ নিতান্তই যেমন তেমন ভাবে যদি ঘটে তাহলে সেটা কুকুরদের সমান হয় বলেই যদি তাকে প্রবল ও পুরুযোচিত বলা হয় তা হলে থাবা দিয়ে ধুলো থেকে খাবার খাওয়া চাই এবং ট্র্যাকটার পুড়িয়ে হাত দিয়ে আঁচড়ে মাটির চাষ করা কর্ত্তব্য। তুই বলবি হাত দিয়ে মাটিখোঁড়ার চেয়ে ট্র্যাকটার দিয়ে চাষ করে ফল বেশি পাওয়া যায়, আমি বলব অমিশ্র কামুকতার চেয়ে প্রেমিকতায় আনন্দের পূর্ণতা বেশী। ভালো করে খাওয়াও মানুষের সৃষ্টি, তেমনি স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধকে সংযমে ত্যাগে শোভনতায় ভরিয়ে তোলাও মানুষের। কেবল শক্তির নয়, আনন্দেরও একটা সায়ান্স আছে, সেই সায়ান্সে মানুষের উপভোগকে তার সহজ পশুত্ব থেকে- বড়ো করে তুলেছে, তার বিচিত্র সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে উদ্বোধিত করচে। এতদিন তো মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখাকেই বলিষ্ঠতা বলে সকলে জানত, আজ কি তার উল্টো কথা বলবার দিন এলো। যে ভাবী যুগে কেবল সায়ান্সই মানুষের আদিম শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে আর তার চরিত্রই নামবে আদিমতার দিকে, সে যুগে কবিতাই থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা কথা-সাহিত্যের কয়েকটি অভাব

শ্রীবিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে যাঁরা বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাঁরা যদি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের তুলনা করেন, তা হলে স্বীকার করবেন, যে বাংলা সাহিত্য অনেক দিক্ দিয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সেটা ঐশ্বর্য্য অথবা দৈন্যের চিহ্ন সে বিচারের এখন প্রয়োজন নেই। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের এই বিস্ময়কর পরিবৃদ্ধির জন্য আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের নিকটে ঋণী। প্রবন্ধে ও কবিতায়, উপন্যাসে ও ছোট গল্পে, নাটকে ও রস-রচনায়, পত্রাবলীতে ও পারিভাষিক বিষয়ে—সকল দিকেই তাঁর অকৃপণ, অভাবিত দান। কিন্তু আধুনিক বলতে আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের কথা বলছি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও লেখনীর বিরাট প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়। তবু তারই মধ্যে থেকে অনেক সাহিত্যিকই আপনার বিশিষ্ট ভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করেছেন।

সেটার সম্ভব হয়েছে আমাদের দেশে দিন দিন সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বলে। যে সব কাগজের ব্যবসায়িক দিক্‌টাই মুখ্য, যে কাগজের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নেই তাদের সার্থকতা কোথায় ও কিসে আমরা বলতে পারিনা। কিন্তু অপরগুলি, যাদের নিষ্ঠা আছে ধৈর্য্য আছে, তাদের প্রয়োজনও আছে। সুতরাং এই সব পত্রিকার দ্রুত পরিবর্দ্ধন দেখে হতাশ হবার কারণ দেখিনা। সাহিত্য যদি মানব-মনের বিকাশ-ক্ষেত্র হয়, তাহলে মানতেই হবে, সে জড়ধর্ম্মী নয়। তার উন্নতির একমাত্র পন্থা নব নব পরীক্ষা-বৃত্তি, প্রগতি। যাঁরা পত্রিকা সাহিত্য বলে বিরূপতা প্রকাশ করেন, তাঁদের ভেবে দেখা উচিত পত্রিকার মারফৎ আমরা কত মূল্যবান্ জিনিষের সন্ধান পেয়ে থাকি। সাহিত্য, তথা সমাজের, ক্রমশঃ অভিব্যক্তি এই পত্রিকার সাহায্যেই সাধিত হয়েছে। এমন কি বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য পূর্ব্বকালের সংবাদ সাহিত্য সযত্নে সঙ্কলন করে থাকেন।

আর একটা সহজ কথা। এতগুলো কাগজ যখন প্রকাশিত হচ্ছে, এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি যে ভালো ভাবেই চলছে, সেইটাই কি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নয় যে আগেকার চেয়ে আজকাল সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পাঠলিপ্সা, অথবা জ্ঞানানুরাগ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বেড়েছে? পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে সর্ব্বত্রই একটা নিজস্ব দল গঠিত হয়। এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দেশে আরো হওয়া উচিত। সাহিত্যের ওপর coterie-র প্রভাব পড়েই থাকে। আর অনেক স্থলে সেইসব কাগজে এমন এক একটি অনুপ্রাণিত রচনা দেখতে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে সত্যকারের সাহিত্যের বিশেষ প্রভেদ নেই। একখানি কাগজ অনেক-কালব্যাপী সাধনার ফলে যদি একটি সাহিত্যিকেরও অজ্ঞাত প্রতিভা আবিষ্কার করে, উৎসাহ দিয়ে লোকসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে অথবা তার আত্মোপলব্ধির পথে সহায়তা করে, তা হলে তার জীবন সফল হয়েছে মনে করতে হবে।

তবে আধুনিক কথা-সাহিত্য প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে প্রত্যেক কাগজেরই একটি নিজস্ব দল ও মত থাকা বাঞ্ছনীয়। তাতে কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ নেই। তাতে কাগজের একটা স্বকীয় ধারা বজায় থাকে এবং তাকে অবলম্বন করে সাহিত্য-সাধনার কোনো একটা বিশেষ রূপ মূর্ত্ত ও প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজ পত্র, পরিচয়, কল্লোল কাগজগুলির ইতিহাসের সঙ্গে অনেক সাহিত্যিকের গঠন ও প্লান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে। আমাদের দেশে এই ধরণের কাগজের চাহিদা এখনও আছে। জনসাধারণে যাই বলুক, নতুন ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত পত্রিকার অভাব আমরা লক্ষ্য করে থাকি।

অবশ্য মুখপত্র, ও বিবৃতিটাই আসল নয়, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য অনুসরণটাই বড় কথা। কথা-সাহিত্যের সম্ভব ও প্রকাশ-স্থান হিসাবে সাময়িক পত্রিকার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

কথা-সাহিত্যের উৎপত্তি থেকে তার বাহ্য রূপ ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবের কথা আসা স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকা খুললেই ছোট গল্প ও ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রাধান্য লক্ষিত হবে। অবশ্য যেখানে বেদান্ত ও উপনিষদ্ থেকে আরম্ভ করে প্রিয়ার চুলের ওপর কবিতা, সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী থেকে ফলিত জ্যোতিষ, সব রকম জিনিষই পাওয়া যায়। কিন্তু কথা-সাহিত্যের যে দুটি প্রধান ও প্রচলিত বিভাগ আছে—সে দুটি হ'ল গল্প ও উপন্যাস। বাংলা দেশে অধুনাতন গল্প ও উপন্যাস-রচয়িতার মধ্যে জনকয়েক বিশিষ্ট, ক্ষমতাবান্ লেখক আছেন এবং তাঁরা আপন আপন ক্ষেত্রে যশস্বীও হয়েছেন। কিন্তু তবুও একথা সত্য, যে বাংলা ভাষার, তথা সাহিত্যের, সকল সম্ভাবনা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। গেলে বোধ করি ভালোই হত, তা' হলে প্রবন্ধ আর বিতর্কের প্রয়োজন হত না।

ছোটো-খাটো সমস্যার মধ্যে ভাষা-বিভ্রাটের কথা না তোলাই ভালো। বাংলা দেশের জাতিগত ঐক্য থাকলেও ভাষাগত এত দ্বন্দ্ব আছে যে এই ভৌগোলিক সংস্থানের কোন্ অংশ-বিশেষের চলিত কথা নিয়ে বাংলা ভাষা রচিত হবে,—সে মীমাংসার নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। তার ওপর সাম্প্রদায়িক মতানৈক্য আছে, আমাদের কলকাতা-বাসীর উচ্চণ্ড আভিজাত্য আছে এবং এই ধরণের আরো নানা বিপত্তি আছে। বিপদের ওপর বিপদ্—বাংলা ভাষার হরফ রোম্যান হবে কি আর কিছু হবে, তা' নিয়েও পণ্ডিতী তর্ক আছে। সেসব সমস্যার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কথা-সাহিত্যের মধ্যে এখনো যে কয়টী গলদ্ অথবা ফাঁক আছে, সেগুলি পূর্ণ হয় কিসে, তারি চেষ্টা সাহিত্যিকদের করা উচিত? বিষয়বস্তুর সর্ব্বাঙ্গীণ সিদ্ধি সকলেরই কাম্য,—যে ভাবে ও যে-ভাষায় হোক্, তাতে কোনো আপত্তি থাকার কারণ নেই।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যে রচনা-ভঙ্গীর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, একথা স্বীকার করতে হবে। বুদ্ধদেবের, অচিন্ত্য-কুমারের, প্রেমেন্দ্রের, শৈলজানন্দের অথবা জগদীশ গুপ্তের প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্ট রচনা-ভঙ্গী আছে। চিন্তাধারায় পূর্ব্বসূরিদের প্রভাব থাকা আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু ষ্টাইল্ তাঁদের স্বকীয়। বিশেষ করে বুদ্ধদেবের। হয়ত কখনো কখনো এঁদের লেখায় কৃত্রিম অনুষঙ্গ এসে পড়েছে, অথবা ইন্‌ভ্যরশন্-এর বাহুল্য দেখা গেছে, কিন্তু লেখার নিজস্ব জোর ও ধার, দুটোই লক্ষ্য করবার বিষয়।

কিন্তু রচনা-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য থাকলেও টেক্‌নিক অথবা শিল্প-কৌশলের দিক্ থেকে নতুনত্ব তেমন কিছু চেষ্টা করা হয়নি, অন্ততঃ ততটা নয়, যতট বিদেশে হয়ে থাকে, অথবা স্বদেশে হওয়া উচিত। এঁদের হাতে প্রসঙ্গ অনেকটা তার পুরানো মলিন বেশ ত্যাগ করেছে, কিন্তু পদ্ধতির অভিনবত্ব নিয়ে এখনো পরীক্ষা করবার সুযোগ ও অবসর আছে। মাত্র দু খানি বই-এ এই ত্রুটির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি। একখানি—'পথের পাঁচালী', যা একদা বাংলার পাঠকবর্গকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। অপরখানি—'অন্তঃশীলা' যা অনেককেই সচকিত এবং বোধ করি সমস্ত করেছে। প্রথমটীতে উচ্ছ্বাসের বাহুল্য আছে, ভাবের অতিশয্য আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র ত্রুটি সত্ত্বেও তা' সত্যকারের সাহিত্য-সৃষ্টি। দ্বিতীয়টীতে চিন্তাশীলতা আছে, কিন্তু দুরূহতাও অনেক আপাত—অবান্তর প্রসঙ্গ আছে। থাকলেও তা' সম্পূর্ণ অভিনব রচনা। একটিতে কল্পনা-প্রবণ শিশুমনের পরিবর্দ্ধন সুমিষ্ট ও মিশ্র পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে এক সজাগ মনের অভিব্যক্তি এবং বলশালী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ধ্রুব পদ্ধতিতে উৎসারিত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী'তে কাব্যপ্রাণ হৃদয়ের আধিপত্য, মনের বিস্ফার-জনিত কৌতূহল, অন্তঃশীলায় বিশ্লেষণ-মূলক বুদ্ধির এক-রাজ্য, চিত্তের উৎকর্ষ-প্রসূত চাঞ্চল্য। দুখানি বইয়েই নূতন রচনা-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে এবং গল্পাংশের চেয়ে মনো-বিকাশকেই প্রাধান্য বেশী দেওয়া হয়েছে,—'পথের পাঁচালী'তে কল্পনা ও অনুভূতিধারার সাহায্যে, 'অন্তঃশীলা'য় চৈতন্য স্রোত-চালিত চিন্তার মধ্যস্থতায়। হয়ত বিদেশী মনীষীর অনুসৃত পদ্ধতির প্রভাবগুণে এতটা সম্পদ্-বৃদ্ধি সম্ভব

হয়েছে। তা হোক্, এতে যদি সাহিত্যের আবয়বিক সৌন্দর্য্য অথবা আঙ্গিক পুষ্টিসাধন হয়, তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত কথা-সাহিত্যের মধ্যে 'তৃণখণ্ড'ও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্যগুণে এবং দুটি বিভিন্ন পদ্ধতির অভাবিত সংমিশ্রণে এ বইখানিও সম্পূর্ণ স্বকীয়তার দাবী অনায়াসে করতে পারে।

পদ্ধতি থেকে প্রসঙ্গের কথা চিন্তা করলে আমরা দেখি—বিষয়বস্তুর অপেক্ষাকৃত নূতনত্ব আধুনিক সাহিত্যে অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও অনেকগুলো ফাঁক এখনো পড়ে রয়েছে, যেদিকে আমাদের নবীন সাহিত্যিকদের দৃষ্টিপাত হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস, শক্তিশালী লেখক সেই সব নূতন কথাবস্তুর প্রচলন করে সাহিত্যকে সত্যই সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

যে অভাবটি প্রথমেই নজরে পড়ে, সেটি হ'ল আমাদের উপন্যাসে ঐতিহাসিক পরিবেশ নেই বলেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা না করলেও একটা বিগত যুগের প্রতিভাষ দিয়েছিলেন। তাঁর পরে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁর 'বেনের মেয়ে' বইখানি একটী সফল ও গৌরবময় প্রচেষ্টা। ৺রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও 'ধর্ম্মপাল', 'শশাঙ্ক' প্রভৃতি রচনায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা অমুদ্‌ঘাটিত রূপ দেখিয়েছিলেন। তাঁর মত বিজ্ঞ ও ব্যুৎপন্ন লেখকের অসাময়িক তিরোভাবে বাংলা সাহিত্য কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—সে কথা সুধিজনেরা বিচার করবেন। রাখাল বাবুর পর ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসম্পূর্ণ 'ডঙ্কা' ছাড়া এ যাবৎ কোনো উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়নি। অনেকদিন পরে 'বিচিত্রা'র মারফত পাঠকেরা একটা ঐতিহ্যগত উপন্যাসের নমুনা পাচ্ছেন। শ্রীনলিনীমোহন সান্যালের 'সুভদ্রাজী' ক্রমশঃ প্রকাশ্য, সুতরাং সে-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁর উদ্যমের প্রশংসা করি। অবশ্য ঐতিহাসিক অথবা ইতিবৃত্ত-সম্পর্কিত সাহিত্য রচনা সকলের দ্বারা সম্ভবপর নয়। যে পরিমাণে শিক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতি-জ্ঞান থাকলে এ কাজে অবতীর্ণ হওয়া যায়, অনেক লেখকেরই তা নেই। কিন্তু যাঁরা পারেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। খাঁটি Historical novel না লিখলেও, romance cf historical imagination রচনা অসম্ভব নয়।

বিদেশে এমন অনেক উপন্যাস আছে যেগুলি একটি বিশিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয়েছে। Hardyর উপন্যাস 'ওয়েসেকস' নিয়ে, তাঁরই সৃষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে অন্যান্য অনেক লেখক যশস্বী হয়েছেন। Bennett লিখেছেন 'ফাইভ্ টাউন্‌স্' নিয়ে। Eden Phillpotts হলেন 'ডার্টমুরের' ঔপন্যাসিক, Quiller-Couch 'কর্ণোয়ালে'র এবং Sheila Kaye-Smith তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন 'স্যাসেক্স'-প্রদেশকে কেন্দ্র ক'রে। এ রকম লেখায় একটা বিশেষ সুবিধা আছে। শুধু যে একটা ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য্যের সুর রক্ষিত হয়, তা' নয়, একটা স্থানীয় সমাজ, ইতিবৃত্ত, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহজ ও সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। উপন্যাসের চরিত্রগুলি আপন পরিস্থিতির অভ্যন্তরে আরো স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়। শ্রীযুক্ত চারু দত্ত ও অবিনাশ বসুর লেখায় এই বৈশিষ্ট্য আছে, নতুবা আমাদের কথা-সাহিত্যে এই লোক্যাল কলার এখনো সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেখানে গুটিকয়েক মানুষ একত্র বসবাস করে, সেইখানেই জীবন-নাট্যের উপাদান পাওয়া যায়। অবশ্য প্রতিভাবান লেখক না হলে, দিনানুদৈনিক জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাগুলির মধ্যেও যে অপরিসীম সম্ভাবনা আছে, তা' আবিষ্কার করা শক্ত। যিনি প্রকৃত শিল্পী, তাঁকের রস সন্ধানের জন্য দেহলীর বাইরে বেশী দূর যেতে হয় না, কারণ তাঁর দৃষ্টি প্রখর ও অব্যর্থ। পরিচিত উপকরণ নিয়েই তিনি সাহিত্য রচনা করেন। আর যিনি অপটু, তাঁকে ছুট্‌তে হয় কাল্পনিক নর-নারী আর অ-বাস্তব দৃশ্যের সন্ধানে।

পরিচিত জগতের কথা থেকে আমাদের এই সহরের কথা মনে পড়ল। এই কলকাতা সহরের বিচিত্র রূপ নিয়ে কেউ এখনো উপন্যাস রচনা করেননি। বুদ্ধদেব বসু 'কলকাতা' শীর্ষক প্রবন্ধে এ নিয়ে অনেক আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু তাঁরই ত লেখা উচিত ছিল। যিনি 'ক্লাইভ ষ্ট্রীটে চাঁদ', আর 'ছাদ' লিখতে পারেন, তাঁর রসসৃষ্টি ক্ষমতায় আস্থা রাখা স্বাভাবিক। তাঁর "হঠাৎ আলোর ঝলকানি" সহরে কবি-মনের প্রকৃষ্ট পরিচয়। কিন্তু সে যাই হোক, তিনি কল-

কাতাকে কেন্দ্র ক'রে এখনো কোনো উপন্যাস লেখেননি। প্রেমেন্দ্রকুমার একাধিক স্থলে এই সহরের কুৎসিত ও সুন্দর রূপ বর্ণনা করেছেন; অচিন্ত্যকুমারও তাঁর 'ঊর্ণনাভ' উপন্যাসে এই মহানগরীর বাহ্যরূপ ও অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সকল লেখাতেই এ রাজধানী পটভূমিকায় পর্য্যবসিত হয়েছে। তার যে একটা বহু ভাবের সমন্বয়ে অখণ্ড রূপ আছে, সে রূপ কোথাও প্রধান ও মূর্ত্ত হয়ে ওঠেনি। আংশিক ভাবে, প্রক্ষিপ্তরূপে এই সহরের সৌন্দর্য্য ও কুশ্রীতা আধুনিক সাহিত্যে প্রকটিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অথবা তার পল্লীবিশেষ নিয়ে সম্পূর্ণ উপন্যাস আজো রচিত হয়নি। অথচ বিদেশে কত লেখকই লণ্ডন ও প্যারীকে কেন্দ্র করে তাঁদের প্রতিভা নিযুক্ত করেছেন। বিশেষ করে বিলাতে, একাধিক ঔপন্যাসিক, যেমন টমাস্ বার্ক, লণ্ডন সহরের উপন্যাস লিখেছেন। সে সব চিত্র এত সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠেছে, যে আমরা বহু দূরে থেকেও, বিদেশবাসী হয়েও, সে সহরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। লেখার গুণে তাকে অতি পরিচিত বন্ধু মনে হয়।

অবশ্য বাস্তবতার ও সত্যের সৃষ্টি হয় সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় থেকে। সহরের সঙ্গে যদি চাক্ষুষ ও সম্যক্ পরিচয় না থাকে, তা'হলে তার সমগ্র রূপটি কখনও ধরা পড়বেনা। কিন্তু সহর ছাড়াও কথা-সাহিত্যের নূতন উপকরণ আছে। একটা ছোটো পল্লী অথবা তার একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাজকর্ম্ম, জীবন-প্রণালী নিয়ে যে উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করা যেতে পারে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ Johan Bojer ও Giovanni Vergaর লেখা। Cossackদের নিয়ে অনেক গল্প আছে, ও সম্প্রতি 'And Quiet flows the Don' বইখানি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হয়েছে। বর্ত্তমান জর্ম্মনীতেও নূতন টেকনিকে একটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে এই জাতীয় সাহিত্যের পরীক্ষা চলছে এবং সেই সূত্রে যে উপন্যাসখানির সব চেয়ে নাম হয়েছে, সেখানি "The Revolt of Fishermen."

সাধারণ পল্লীজীবনের বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। সাহিত্যিক আসরে গ্রাম অথবা পল্লীর কাহিনী ও বর্ণনা অন্তেবাসী নয়, তার স্থান অতি সম্মানের। শরৎচন্দ্র থেকে অতি আধুনিক সাহিত্যিকের রচনায় পল্লীজীবন অনেক স্থলেই অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত

তাঁর সাধনা ও প্রতিভা নিযুক্ত করেছেন। Powys ভ্রাতৃদ্বয় অথবা Norman Lindsay যেমন একটি বিশিষ্ট পল্লী নিয়ে, তার নর-নারী, তাদের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য ও শিক্ষা-দিক্ষা আশ্রয় করে উপন্যাস লিখেছেন, আমাদের সাহিত্যে ঠিক এই ধরণের লেখা বিরল। শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজ' উচ্চশ্রেণীর রচনা হলেও তাতে পল্লীর পৃথক্ সত্তা বা নৈর্ব্যক্তিক রূপ নেই, সমাজ ও অধিবাসীর জীবনের সঙ্গে তা' অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছে। আমার বোধ হয় এই আদর্শের কাছা-কাছি পৌছেচে একমাত্র শৈলজানন্দের 'ষোল আনা'। হয়ত বিদেশের পল্লীর সঙ্গে বাংলার পল্লীর অনেক তফাৎ এবং প্রাণের সংযোগ নেই বলেই তার মূর্ত্তিতে সত্যের সৌন্দর্য্য নেই, আছে অবাস্তব অলঙ্করণ।

বাংলা দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাব নেই, বরং প্রাচুর্য্য আর অপচয় আছে। পাহাড় থেকে আরম্ভ করে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রকৃতির বিভিন্ন স্তর সেখানে বর্ত্তমান। বাংলা সাহিত্যে সে সব সৌন্দর্য্যের চিত্র অতি সুপরিচিত। কিন্তু অনেক স্থলেই তা' প্রক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত, সমগ্র নয়। অর্থাৎ বাংলা দেশের প্রকৃতির বিভিন্ন রূপবর্ণনা ও অজস্র বর্ণবৈচিত্র্য থাকলেও তাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পাহাড় আর সমুদ্রের কথা বাদ দিলাম, কেননা এ দুটি নিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব হলেও সকলের পক্ষে সহজ নয়। কারণ তাদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন। তা ছাড়া বাঙ্গালী পাহাড়ী নয়, নাবিকও নয়। য়ুরোপে অনেক দেশেই সমুদ্র হ'ল জাতীয় জীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ; সেই কারণে সেখানে Conrad-এর সার্থকতা এবং Virginia Woolf-এর 'দি ওয়েভ্স্'-এর জন্ম হয়। আর পর্ব্বতমালা হ'ল ভ্রমণ, আবিষ্কার, ও উপভোগের সামগ্রী। এক আলপ্স্ পর্ব্বতশ্রেণীই অনেকগুলি দেশকে পরিবৃত করে আছে,—তাদের জীবন, স্বপ্ন ও সাহিত্যকে আচ্ছন্ন ক'রে। কাজেই তার অধিত্যকা, তার সানুপ্রদেশ, তার বিস্তৃত তুষারক্ষেত্র সাহিত্যে অবাধ প্রবেশলাভ করেছে। বিলাতের একমাত্র সম্বল স্নোডন-ও একাধিক গল্পের ঘটনাস্থল। কিন্তু এ ছাড়া বাংলা প্রকৃতির যে অপরাপর চিত্তাকর্ষক রূপগুলি প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, সেগুলির এক একটিকে নায়কস্থানীয় করে উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করা যেতে পারে।

বিলাতী সাহিত্যের একটা উপমা দেওয়া যাক্। হার্ডির শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে প্রকৃতি শুধু জড়িত নয়, শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। এগ্‌ডন হীথ, উড্‌ল্যাণ্ড্‌স্ প্রভৃতি স্থানগুলি উপন্যাসের রূপশোভা নয়, তারা নিয়তির মতই মুখ্য, অপরিহার্য্য। আমাদের বাংলা দেশেও অনেক গ্রামেই কত বিল, বাঁওড়, জলাভূমি আছে। এবং হয়ত তাদের সঙ্গে গ্রামের ইতিহাস ও সংস্কার অতি ঘনিষ্ঠ ভাবেই সম্পৃক্ত। এক বিভূতিভূষণের কয়েকটি গল্প আর মনোজ বসুর রচনাগুলি ছাড়া এই প্রাকৃতিক অঞ্চগুলি ঘিরে কোনো ভালো বই লেখা হয়নি। অথচ বিদেশে এই ধরণের সাহিত্যের ভূরি নিদর্শন আছে,—যেমন Brontiএর Wuthering Heights অথবা ফরাসী উপন্যাস The Peat Cutters.

তারপর ধরা যাক্ নদীর কথা। বাংলা হ'ল নদীমাতৃক দেশ। আর কিছু না থাকুক নদীর অজস্রতায় বাংলা দেশ প্লাবিত। এই সব নদীর কোনো একটিকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যেতে পারে না কি? অবশ্য নদীর কথা,—তার তরঙ্গায়িত রূপ, তার শান্ত, স্তিমিত সৌন্দর্য্য, তার ভীষণতা, তার নিরীহতা উপমায়, বর্ণনায় রূপায়িত হয়েছে অনেক গল্পে, অনেক উপন্যাসে। ধরতে গেলে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্যতম 'ছিন্ন পত্র'ই ত পদ্মার কথায় ভরপুর। কিন্তু সে হ'ল নদীর বিভিন্ন, পরিবর্ত্তনশীল রূপের সঙ্গে কবিচিত্তের ও ভাবধারার অপূর্ব্ব সমন্বয়। আমি বলতে চাই, নদীকে কোনো উপন্যাসে কোথাও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়নি। আমাদের কথা-সাহিত্যে নদীকে মধ্যস্থ ক'রে মানবমনের আবেগ ও অনুভূতির প্রসার দেখানো হয়েছে, জীবনের বিচিত্র কাহিনী লীলায়িত করা হয়েছে,—কিন্তু তাকে অখণ্ড প্রভুত্ব দান করা হয়নি। খুব কম লেখাতেই দেখেছি যে মানুষ গৌণ, নদী মুখ্য। অবশ্য মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি'তে অনেকটা চেষ্টা করেছেন বটে। কিন্তু এ যাবৎ মাত্র একখানি উপন্যাস রচিত হয়েছে যাতে এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে। প্রমথ বিশীর 'পদ্মা' সেই কারণে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও অভিনব রচনা বলে বিবেচনা করি। সেখানে পদ্মা নরনারীর বিলাস-কল্পনার ক্ষেত্র নয়, কেবল নিঃসঙ্গ মানুষের নীরব সঙ্গিনী নয় অথবা ছলনাময়ী দানবীও নয়। সে হ'ল স্বপ্রধান, স্বয়ং-সত্য,—উপন্যাসের নায়িকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতি এখনো পারিপার্শ্বিকের পর্য্যায়েই পড়ে আছে, তাতে মানবত্ব আরোপ করে নায়িকা-পদে অধিষ্ঠিত করার যথেষ্ট সুযোগ বর্ত্তমান।

প্রকৃতির সঙ্গে শিশুমনের সর্ব্বত্রই ঘনিষ্ঠ সংযোগ। গত দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্যের বিস্ময়কর বৃদ্ধি ও রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। শিশু-সাহিত্য কি ভাবে রচিত হওয়া উচিত, তাতে সত্য থাকবে কি মিথ্যা থাকবে, ভূতের গল্প থাকবে কি অন্য কিছু থাকবে, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে কি ধরণের বই আজো লেখা হয়নি, সেই-টুকুই উল্লেখ করা যেতে পারে। Alice in Wonderland যা' নিয়ে অপরূপ সৃষ্টি, সেই জিনিষের অভাব আমাদের খুবই। উপকরণ অনেক আছে,—শক্তিশালী লেখকও আছেন, অথচ বিখ্যাত বিদেশীয় রূপকথার সমকক্ষ রচনা কয়জন লিখতে পেরেছেন? কেবল Henty ও Ballantyneএর অক্ষম ও কৃত্রিম অনুকরণে মিথ্যা এ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী সৃষ্টি করে কি লাভ, যা' কোনো কালেই কোনো অবস্থাতেই আমাদের দেশে সম্ভব নয়? শিশুমন মাত্র কয়েকটি অসম্ভাব্য বীরত্ব-কাহিনী অথবা নীতিগল্পগুচ্ছে পরিতৃপ্ত হবে না। একই পরিচিত জগতের নূতন নূতন পরিকল্পনা দিয়ে সাহিত্যিক শিশুর কল্পনাপ্রবণ মন ও অনুভূতির পূর্ণ বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।

কেবল শিশু-উপন্যাসেই নয়—জীবজন্তুর গল্পেও এই গতানুগতিকতার আভাস আছে। Kenneth Grahame প্রণীত The Wind Among The Willows বইখানিতে যে অপূর্ব্ব বিস্ময়, যে অনাস্বাদিত পুলক আছে, সে রস-বোধ এখনো আমাদের সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করেনি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি পরিচিত অভাবের কথা মনে পড়ল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পশুপক্ষীর স্থান নেই বললেই হয়। হয়ত দৈন্যপীড়িত অকাল বার্দ্ধক্যের দেশে তাদের যথোচিত সমাদর সম্ভব নয়। দু-একজন লেখক অবশ্য তা' সত্ত্বেও তাদের নিয়ে গল্প লিখেছেন। সেই সব রচনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' ও মণীন্দ্রলাল বসুর 'রতন' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু Kipling-এর কুকুরের ওপর বড় গল্প এবং Virginia Woolf-এর 'ফ্লাশে'র সমশ্রেণীর সচের বাংলা সাহিত্যে বিরল।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের উৎপত্তিস্থল সাময়িক পত্রিকা থেকে সুরু করে সেই সাহিত্যের রূপ, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যে ছিদ্রগুলি আছে,—তারি উল্লেখ করেছি। কিন্তু এগুলি অভাবের অনুযোগ নয়, অবসর নির্দ্দেশমাত্র। বলা বাহুল্য, এক দিনেই সে ফাঁকগুলো ভরে উঠবে না। তবে সাধনা ও প্রয়োগ-শিল্পের গুণে কোনোদিন নিশ্চয়ই প্রতিভাশালী লেখকেরা তাঁদের সাহিত্যের এই বিরল অবকাশগুলি নবীন ও প্রাণবান্ প্রচেষ্টায় পূর্ণ করে দেবেন।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

* কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

সাহিত্য বনাম নভেল

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

মনে আছে তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। সবে মাত্র নভেল পড়িতে শিখিয়াছি। গুরুজনের চড়-চাপড় ও কর্ণমর্দ্দনের শাসন ছাড়াইয়া উঠিবার বয়স হয় নাই, কাজেই নভেল লইয়া চিত্তবিনোদন করিতে হইলে সম্ভাবিত ভয়স্থান শতানি এড়াইয়া চলিতাম।

একদিন দাদামশাই সামনে দিয়া আনাগোনা করিতেছিলেন, সেটা অত খেয়াল করি নাই। আমা হেন সুবোধ বালকের পড়িবার দিকে অসঙ্গত মনোযোগ দেখিয়া বোধ হয় তাঁর আশ্চর্য্য ঠেকিল। টেবিলের উপরে জিয়োমেট্রিখানা খোলা, পেনসিলটি হাতে; কিন্তু আমার চোখ ছিল কোলের উপর খোলা 'দেবী চৌধুরাণী'র পাতায়,—যেখানে প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের দোকানে জিনিস কিনিতেছিল। দাম দিতে গিয়া—

এদিকে অকস্মাৎ বজ্রপাত! দাদামশাই সামনে দাঁড়াইয়া হাঁক দিলেন, কি পড়ছিস ওটা?

আমার মুখকমল বিশুষ্ক অর্থাৎ গো-তস্করের মত হইয়া গেল; লুকাইবার কোনো উপায় ছিল না। দাদামশায়ের একটী মাত্র চোখ, আর একটা আপদ সৌভাগ্যক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই অদ্বিতীয় চক্ষুতে রাবণের বিংশতি নেত্রের কাজ করিতে পারেন। আমতা আমতা করিয়া বলিলাম,—এই এই একখানা বাঙ্‌লা সাহিত্য।

বুড়ো, কাকের মত মাথা বাঁকাইয়া দেখিয়া, শ্যেনের মত ছোঁ মারিয়া বইখানা তুলিয়া নিলেন। দেখিয়া বলিলেন, হুঁঃ—বিদ্যে হয়েছে দেখছি! নাটক নভেল পড়ছেন, আবার বলেন, বাঙ্‌লা সাহিত্য! একটু বয়স হোক ভায়া, তারপর একটা 'দেবী চৌধুরাণী' আমিই খোঁজ ক'রে দেবো। এখন এই 'গিয়োমেট্রি' কষ। (দাদামশাইকৃত Geometryর উচ্চারণ।)

কণ্ঠের কাকু এবং মুখের ত্রিবক্রভঙ্গিমা দেখাইয়া একচোখ ঠারিয়া যে ভাবে 'গিয়োমেট্রির' উপদেশ করিলেন, অপিচ 'দেবী চৌধুরাণী'কে করতলী করিলেন, তাতে আমার কাণ পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া গেল। এর বদলে পাঁচটা চড় দশটা কাণমলা খাইতেও রাজি ছিলাম।

তিন চারি বছর পরেই যখন 'জেন্টেলম্যান' হইলাম, অর্থাৎ যখন কলেজে পড়ি, তখন ঐ দাদামশায়ই আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য পড়াইতেন। তখনও কিন্তু ভরসা করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই,—দাদামশাই! শকুন্তলা, মেঘদূত রত্নাবলী; এসব সাহিত্য না 'গিয়োমেট্রি'?

ছেলে বেলাকার সেই কথাটা মনে করিতে এখন কৌতুক লাগিতেছে। তখন অবশ্য দায়ে পড়িয়াই নভেলটাকে সাহিত্য বলিয়া দোহাই পাড়িয়াছি; এখন দেখি যে বিনা বিচারে খাঁটি কথাটাই উচ্চারণ করিয়াছিলাম। দাদামশাই নাটক নভেলকে ইতর জাতি সাব্যস্ত না করিয়া, আমার অধিকার অর্থাৎ হজম-শক্তি সম্বন্ধে হিতকথা বলিলেই ভাল করিতেন।

নাটক নভেল সাহিত্যের কতখানি অঙ্গ, সেটা বুঝিতে হইলে সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়, তাহা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। প্রথমে সেই চেষ্টা করা যাউক।

সাহিত্য বলিতে কোন বস্তু বুঝিব, তাহার বহু বহু বিজ্ঞজনসম্মত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ব্যাখা লক্ষণাদি পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় সাধারণের কাছে সেগুলি হয় 'ভুক্তয়ে, ন তু মুক্তয়ে'। অর্থাৎ দেখিয়া শুনিয়া তাক্ লাগে, চমৎকার বলিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সাহিত্যের ধারণাটা কুহেলিকাবৃতই থাকে,—অস্পষ্টতা থেকে মুক্তি পায় না। সহজ ও সরল কথায় এটাকে সুলভ করা যায় কিনা তার একটা চেষ্টা চলিতে পারে।

সাহিত্য কথাটি আমরা নিত্যই ব্যবহার করি; স্বীকার করিতে হয় যে বস্তুটীর সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় আছে

তাতে নিত্যকার কাজ বেশ চলিয়া যায়। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সাহিত্যের স্বরূপটা কি, অথবা কোন্ কোন্ বিশিষ্ট ধর্ম্ম বা গুণ আছে বলিয়া সাহিত্য তৎপদ বাচ্য, তবেই মাথা চুলকাইতে হয়। এ বিষয়ে চর্চ্চা না থাকিলে কোনো সদুত্তর করা যায় না। তখন ধরা পড়ে, এই নিত্যাভ্যস্ত কথাটি নেহাৎ জানা নয়। লোক মুখে এবং কতগুলি বইএর মধ্য দিয়া সাহিত্যের একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি; এবং সেই দিশায় অপরকে বুঝাইতে পারি এই মাত্র।

নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেই আমাদের এইরূপ ভাসা ভাসা পরিচয়; যেমন ভগবান; এ বেলাও লোকমুখে এবং কতগুলি বইএর মধ্য দিয়াই একটা দিশা ধরিয়া কথায় বার্ত্তায়, ঘরে বাইরে, হাটে বাজারে নিত্য ব্যবহার করি। অথচ আসল বস্তু যে কি সেটা কেউ জানি না, কৌতুক করিয়া লোকে ঐ একটা বস্তুর যে কত নামই দেয় সেটাও খেয়াল করি না, যেমন আজ কালকার চলিত নাম 'ভিটামিন'।

সাহিত্য বলিতে কোন্ কোন্ পুস্তকগুলি বুঝাইবে এটার একটা মোটামুটি ধারণা যে আমাদের আছে, সেটা স্বীকার করিয়া লই। নানাশ্রেণীর নানাপ্রকারের পুস্তকের মধ্য থেকে সাহিত্যশ্রেণীর বইগুলি বাছিয়া আনাটা একরূপ চলে।

মনে করা যাউক, কেহ লাইব্রেরীর নানাবিধ পুস্তকাবলির মধ্য থেকে সাহিত্যের বইগুলি বাছিয়া গুছাইয়া আনিয়াছে। দেখা যাইবে এর মধ্যে আছে,—

কাব্যগ্রন্থ, যার মধ্যে মেঘনাদ বধ আছে, কড়ি ও কোমলও আছে, কিন্তু শুভঙ্করীর কাব্যখানা নাই।

নাটক নভেল এবং অন্যান্য আখ্যায়িকা, যার মধ্যে কাদম্বরী থেকে ঘরে বাইরে পর্য্যন্ত অনেক বই আছে।

প্রবন্ধাবলি, যেমন নিশীথ চিন্তা, বিবিধ প্রবন্ধ পঞ্চভূতের ডায়েরী ইত্যাদি। আর কতগুলি, যার মধ্যে পুরাতন ভক্তিবাস, কাশীরাম দাস বিরাজমান। কিন্তু এদের মধ্যে দাদা মহাশয়ের 'জিয়োমেট্রি' নাই, বিজ্ঞান পাঠ নাই, স্বাস্থ্যতত্ত্ব বা কথামৃত নাই;—এমন কি গীতাও বাদ পড়িয়াছে। তার বদলে বিদ্যাসুন্দর আর আরব্য উপন্যাস হাজির হইয়াছে।

এই বইগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ সমতুল গুণ আছে বলিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করা হইল সেটা একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। এখানে সাহিত্যের পরিচায়ক কতগুলি লক্ষণ মিলিবে, যেগুলিকে দার্শনিক পরিভাষা খাটাইয়া বলা যায়, সাহিত্যের তটস্থ লক্ষণ।

উপর উপর দেখিয়া, বিশেষ চিন্তা না করিয়াই এদের সম্বন্ধে দুটা কথা বলা যায়। একটা, এতে কোন্ গুণ বা ধর্ম্ম আছে, দ্বিতীয়, কোন্ ধর্ম্ম এদের মধ্যে নাই।

প্রথমেই বলা যায়, এগুলি সর্ব্বসাধারণের ভাল লাগে, তারা পড়িয়া আনন্দ পায়। (অবশ্য, যারা কিছু পরিমাণে লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাদের লইয়াই কথা, এটা আগেই ধরিয়া নিয়াছি) কোনো বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের চিত্তরঞ্জক মাত্র একপ নয়;—নির্ব্বিশেষে জনসাধারণেরই আনন্দদায়ক এগুলি। এইটা হইল positive লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ—মানুষের জীবন যাত্রার পক্ষে কোনো সহায়ক এগুলি মোটেই নয়, অর্থাৎ নিত্যকার আহার বিহারের প্রয়োজন সাধন এদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আবার কোনো তত্ত্ব উপদেশ বা শিক্ষার কথা প্রত্যক্ষভাবে এতে নাই। শিক্ষা অথবা উপদেশ হয়তো বা এর মধ্য থেকে মেলে, কিন্তু সেগুলি দিবার প্রয়াস এদের মধ্যে স্পষ্ট উচ্চারিত নয়। এইটা negative লক্ষণ। সাহিত্য চিনিবার পক্ষে এই ভাব এবং অভাবাত্মক দুটা লক্ষণ অতীব প্রয়োজনীয়।

এইরূপ লক্ষণকে বলা যায় তটস্থ লক্ষণ (accidental); যাহা দ্বারা বস্তু চেনা যায়। যেমন ফোঁটা তিলক দেখিয়া বৈষ্ণব চেনা, গৈরিক দেখিয়া সাধু চেনা। এগুলি অনেক সময় ভুল বলে। শুধুই এগুলির উপর নির্ভর করিলে যে অনেক ক্ষেত্রে ঠকিতেও হয় সেটা সবাই বোঝে। তাই বস্তুর স্বরূপ লক্ষণের পরিচয়ও কিছু কিছু খুঁজিতে হয়; এবারে সেটা দেখা যাউক। সেটা হবে বস্তুতন্ত্রবিদ্যা, বলা যায় objective।

সমাজ সভ্যতা লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে ওতপ্রোত থাকে সাহিত্য। এই সাহিত্য বস্তুটি কি, কোন প্রেরণায় সৃষ্ট হয়, কি উদ্দেশ্য সাধন করে, ইত্যাদির ইতিহাস বড় চমৎকার, কিন্তু সে বহুবচন। সংক্ষেপে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যাই।

মানুষ সামাজিক জীব। কথাটি ছোট খাট; দর্শনসূত্রের

মত স্বল্পাক্ষর আবার তারই মত বিশ্বতোমুখ; অর্থাৎ বহুদিকে বহুমুখী ভাবনার লহরী তুলিয়া দেয়। যে দিশা ধরিয়া এখানে কথাটি বলিতেছি, সেটা এরূপ। মানুষ আছে, তো সমাজ আছে; একপক্ষ স্বীকার করিতেই অপর পক্ষ আসিয়া পড়ে। সমাজ ছাড়া মানুষ,—এ অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারিনা।

মানুষ আদিমকালে কেমনতর ছিল, কোনভাবে জীবন কাটাইত, সেকথা কোনো ইতিহাসে নাই। পুরাতন সাক্ষী কাকভূষণ্ডীরও কোনো উদ্দেশ মেলে না। যুক্তিসঙ্গত কল্পনা; অর্থাৎ কল্পনার কুশলতাই এখানে একমাত্র অবলম্বন। একটা সঙ্গত অনুমান করিয়া নেওয়া চলে যে এইভাবে মানুষ সভ্যতার উষাকালে চলিত। শুধু দেখিতে হয়, আমাদের বুদ্ধিবিচারে সে কল্পনাটা বিষম না খায়। পণ্ডিতেরা তাহাই করিয়া থাকেন।

কোনো কালে যে মানুষ একাকী নিঃসঙ্গ ছিল এরূপ কল্পনাই করা যায় না। একা থাকাটা সম্ভবে কি? দশ জনকে লইয়াই তো তার মনুষ্যত্ব। দলবদ্ধ অর্থাৎ সমাজস্থ হইবার অভাব যখন তাহার প্রকাশ পাইল তখনি সে অপরাপর জীব থেকে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ হইয়া গেল। তাহার ভাবনা বাসনা, কাজকর্ম্ম জীবন যাত্রার মারামারি কাটাকাটি সবই যে দল লইয়া এবং দলে থাকিয়া। কার্য্যের ভালমন্দ বাছাই বিচার, রাগ দ্বেষ, হিংসা ভালবাসা, সকল বিষয়েই আত্ম ভিন্ন অপরের প্রয়োজন; দশ জনকে লইয়াই এগুলি প্রকাশ পায়।

পুরাণে লেখে, নরের অধম অসদাচারী দেবতাবৃন্দ পূর্ব্বকালে বিরোধ করিয়া কাল কাটাইতেন; কখনও নিজেদের মধ্যে, কখনও অসুরদের সঙ্গে; তাও সমাজবদ্ধ হইয়া। নিঃসঙ্গ একাকী অনন্য এবং অদ্বিতীয় থাকিতে পারেন, এরূপ একজনার কথা শোনা যায় বটে, তবে তাঁর সকল চর্য্যাই কল্পনাতীত অদ্ভুত, মানুষের বুদ্ধির অগোচর। এযাবৎ কেউ তাঁর প্রকৃত পরিচয় পায় নাই। আবার এ-ও শোনা যায় একাকী নিঃসঙ্গ থাকিতে তাঁর ভাল লাগেনা বলিয়া খেলিবার জন্য সাথী সন্ততি দেব মানবাদি তৈয়ারী করিয়া লইয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যায়, থাকিতে গেলে সঙ্গী ও দল জোটাইতে হয়ই। মানুষের বেলাও এজন্যই একা নিঃসঙ্গ অবস্থা ভাবিতে কল্পনা ব্যাহত হয়। দশ জনকে লইয়া মিলিয়া মিশিয়া, অথবা অপর দশজনের সঙ্গে বাদ বিসংবাদ করিয়া মানুষের জীবনযাপন; এরূপ এখনও দেখি, অন্যথা কোনো কালেই ছিল না।

সমাজ স্বীকার করিয়া নিলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু সভ্যতা স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ সমাজ পাইতে সভ্যতাও সঙ্গে পাওয়া চাই নতুবা সমাজই হয় না। অসভ্য জাতি, মানে সভ্যতা তাদের আদৌ নাই এটা নয়। আমাদের হিসাবে যেটা সভ্যতা, সেটা তাদের অনেক পরিমাণে নাই, এইমাত্র। 'নঞ্'এর অর্থ 'তদন্যত্বম্' এবং 'তদল্পতা' উভয়ই এখানে খাটে। সমাজবদ্ধ থাকাটাই যে সভ্যতা থাকিবার লক্ষণ, তা যতটুকুই হউক এবং যে প্রকারেরই হউক। পরস্পরের ভালমন্দ দেখা, রক্ষণাবেক্ষণ, কিছু না কিছু করিতেই হয়, সেটা যারা পারে, তারা অনেক পরিমাণে সভ্য। ক্রমে সেই সভ্যতার বিস্তার হয়, যখন সাহিত্যের বিকাশ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থাও উন্নত হয়। শেষে দেখা যায় এই তিনটিই একত্র হাত ধরাধরি করিয়া চলে। সেটা কেমন করিয়া হয় বুঝিবার চেষ্টা করি।

প্রথমে সাহিত্য সৃষ্টির কথা। দেখা যাউক, কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এটার সম্ভব হইয়াছে। মানুষের স্বভাবই এই যে জীবন ধারণের জন্য কর্ম্ম ব্যাপৃতির অবসরে অনবসরে পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তার আদান প্রদান করে। নিজের ভাবনা চিন্তা আশা হতাশার কথা, নানাবিধ বাস্তব ও কাল্পনিক অভিজ্ঞতার কথা অপরকে যেমন জানাইতে চায়, নিজেও তেমনি অপেরেরটা শুনিতে বুঝিতে চায়। বলিতেও আনন্দ, শুনিতেও আনন্দ। এই গুলিই যখন ভাষামুখে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়, তখনি বলা হয় সাহিত্য। মানুষের এইভাবে আনন্দ পাইবার সহজাত ইচ্ছা থেকে সাহিত্যের জন্ম।

সাহিত্য কথাটির ইংরাজি literatureএর সমার্থক রূপে ব্যবহারটা প্রাচীন নয়, অল্পদিন হয় সুরু হইয়াছে। অতএব শ্লেষ করিয়া বলা যায়, আমাদের দেশের সাহিত্যটা অর্ব্বাচীন। দেশীয় কথাটির মূলার্থ ধরিলে দেখা যায়, literature বলিতে যে বস্তু বুঝি, সেটার স্বরূপ পরিচয় সাহিত্য কথাটিতে বেশী মেলে। 'সহিত' মানে-একত্র গমন

তারপরে 'ষ্ণ্য' প্রত্যয়। অর্থ বলা আছে; মিলন, অর্থাৎ একত্র-স্থিতি, গতি কাজকর্ম্ম সবই। এই শব্দের নৈয়ায়িক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে,—সকলে মিলিয়া একত্র এক সময়ে কাজ করিবার মধ্যে যে মিলন তাহাই। (তুল্যবদেক ক্রিয়াম্বয়িত্বম,—শব্দশক্তি প্রকাশিকা)। দেখা যায়, বিদেশী কথা literature অপেক্ষা সাহিত্য কথাটার যাথার্থ্য বেশী;—নামটার মধ্যেই জন্ম প্রক্রিকা রহিয়াছে।

আমাদের ভাষায় সমাজ, সাহিত্য এবং সভ্যতা এই তিনটী কথার মধ্যে আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। সম্—তুল্য বা সহিত; অজ মানে গমন করা। একত্র গমন, অর্থাৎ জীবন যাপন, চলা ফেরা ইত্যাদি, (সাহিত্যের যে অর্থ এখানেও তাই)। এরূপ যারা পারে, তারাই সভ্য, তাদের লইয়াই যে সভা এবং সমিতি। অভিধানে তাই সমাজিক মানে সভ্য বলা আছে। আবার, সভ্য কথাটার মূলেও 'একত্র মিলন' অর্থ রহিয়াছে, (সহ মিলিতা ভান্তি—ইতি রায় ভরতৌ) দেখা যায়, একই উদ্দেশ্য বুঝাইতে সভ্যতা সমাজ এবং সাহিত্য এই তিনটী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে যাদের কোনও একটা আছে, তাদের অপর দুইটীও থাকিবে।

আচ্ছা, পশুরাও তো দলবদ্ধ থাকে, তাদের বেলা কি সমাজ বলিব? আজকাল চলতি কথায় তাই বলা হয় বটে; যেমন—পশু-সমাজ। কিন্তু পূর্ব্বকালে মানব সমাজ থেকে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য পশুদের বলা হইত সমজ। অমর-কোষে আছে—"পশূনাং সমজঃ, অন্যেষাং সমাজঃ।" সাহিত্য বোধ, অর্থাৎ মনোভাব আদান প্রদানের শক্তিনিপুণতা এবং তজ্জনিত আনন্দ বোধ,—এই বোধ পশুদের মধ্যে নাই বলিয়াই তো পার্থক্য।

এই সাহিত্য আবার কালক্রমে পরিণত আকার প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বিস্তার হয়, সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। এই ত্রয়ী একে অন্যকে পরিপুষ্ট করিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলিয়া চলিতে থাকে। অতএব মানুষ সভ্য হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হয়,—অন্ততঃ এরূপ বুঝা উচিত যে তার সমাজ সুনিয়মবদ্ধ এবং তার সাহিত্য বিকাশপ্রাপ্ত, উন্নত।

মানুষের মনোগত ভাবপ্রকাশের আনন্দ থেকে অনেক কিছুই জাগিয়া উঠে। তার জীবনের সুখ দুঃখের উল্লাস, উত্থান পতন, দুর্দ্দৈব সৌভাগ্য, জয় পরাজয়, বাস্তব ও কল্পনা ইহারই বার্ত্তা জানিবার ও জানাইবার কৌতূহল ও কৌতুক থেকে ললিতকলা, শিল্প সাহিত্য ইত্যাদির উদ্ভব হয়। তারপরে চিত্ত যখন নিয়মিত হয়, তখন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির বিকাশ দেখা দেয়।

আদিমকালে যখন স্বভাবের প্রেরণ বশত মানুষ মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়াছে তখন প্রথম গতি কোন্ কোন্ মুখে আরম্ভ হইয়াছিল সেটা ভাবিয়া দেখা যাউক। প্রথম প্রকাশ ভাষা দ্বারা হয় নাই, কেন না, ভাষা তখনো স্ফুট হয় নাই। কোনো কিছুর মধ্য দিয়া সেটা প্রকাশ হইবে তো, আমাদের কোনো না কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারপথে সেটা গ্রহণ করিব; কারণ প্রকাশটা যে আমাদের কাছে। স্বাভাবিক অনুকরণ চেষ্টা, (Aristotle বলেন, Imitation) এবং একটা অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্যলিপ্সার ফলে প্রথম প্রকাশটা মনে হয়, হইয়াছিল (ক) চিত্রে, সেটা চক্ষুর অধিকার, এবং (খ) ধ্বনিতে, সেটা কাণের অধিকার। এই ধ্বনিময় (খ) প্রকাশটা দুই ভাগে বিভক্ত। এই ধ্বনি বাঙময় না হওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ, প্রত্যক ধ্বনির কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ স্বীকৃত ও সর্ব্বসম্মত না হওয়া পর্য্যন্ত মানব মনের যে অপরিস্ফুট প্রকাশ সূচনা করে, সেখানেই মিলিবে সঙ্গীতের গঙ্গোত্রী। এইটাই ধ্বনিময় প্রকাশের প্রথমধারা। অতঃপর সঙ্গীতটা আমরা যেরূপ পাইয়াছি, সেটা ঐ ধারা বহুকালের মধ্য দিয়া চলিয়া, বহুশিক্ষার সৌষ্ঠব পাইয়া, বহু কলা কল্পনার অববাহিকা থেকে পূরণ লইয়া এক অপার্থিব মন্দাকিনী ধারা।

ঐ যে মানব মনের বহিঃপ্রকাশ এক ধারায় ধ্বনিময় এরূপ বলা গেল, সেই ধ্বনির উৎপত্তি আলোচনা করিলে বলিতে হয়, বাঙময়; অর্থাৎ কোনো একটা বিষয় বুঝাইবার জন্য বিশেষ একটা ধ্বনি। এইটি যখন স্বীকৃত ও পরিস্ফুট হয়, তখন বলা হয় বাক্য। সে বাক্যের মূর্ত্তি কল্পনা হইয়াছে অক্ষরে। ধ্বনির এই মূর্ত্তি-কল্পনার সীমান্তে প্রকাশটা শ্রুতির অধিকার ছাড়াইয়া চক্ষুর অধিকারে গিয়া পড়িতেছে। এইখানে ধ্বনিময় প্রকাশের দ্বিতীয় ধারা।

মোটামুটি দাঁড়াইল এই—মানবচিত্তের প্রথম প্রকাশ চিত্রে এবং ধ্বনি মুখে। ধ্বনির যে প্রকাশটা সম্পূর্ণ বাঙময় হইয়া

দাঁড়াইল, সেখানে সাহিত্যের আদিম উন্মেষ। আর যে প্রকাশ বাঙ্ময় না হইয়া ধ্বনিময়ই রহিয়া গেল, সেটা থেকে হইল সঙ্গীতের সূত্রপাত। এখন বুঝা যাইবে, চিত্র, সঙ্গীত এবং সাহিত্য, এই তিনটি কলা ভগিনীর মধ্যে যে একটি অতি নিকট সম্বন্ধ আমরা অনুভব করি, সেটা আকস্মিক আগন্তুক নয়,—আমাদের মতিভ্রমও নয়। এই তিনটির জন্মকালে যে নাড়ীর যোগ ছিল, তাহাই অনাদিকাল থেকে অবিচ্ছিন্ন চলিয়া আসিয়াছে।

সাহিত্য কথাটির উৎপত্তি বিচার করিয়া বলা যায়, এটা ত্রিমূর্ত্তি,—চিত্র সাহিত্য, গীত সাহিত্য, বাক্‌সাহিত্য। ভাষা এই বাক্‌সাহিত্যের বাহন, আদৌ শ্রুতিগ্রাহ্য, অর্থাৎ কাণে শুনিয়া বুঝি। চক্ষুর গ্রাহ্যও কেমন করিয়া হইল সেটা বলা হইতেছে।

ভাষার এই ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া এক একটা ধ্বনির unit (বা মাত্রা-মীয়তে অনেন;) ধরিয়া পাওয়া যায় বর্ণ। সেই বর্ণের এক একটা রূপ-কল্পনার চিত্র হইতেছে অক্ষর। এই অক্ষর চিত্রাবলির দ্বারা ভাষার ধ্বনিকে crystalise করা গিয়াছে, অর্থাৎ বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। এখন বহুকালের আচার ও অভ্যাসে এই চিত্র দেখিবামাত্র কাণে ধ্বনি ভাসে, আর মনে সে ধ্বনি বা শব্দের অর্থ উদয় হয়। এই অর্থটি সেই আদিম প্রকাশ,—প্রথমে মানুষ ধ্বনি করিয়া যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিল। তাই মীমাংসা শাস্ত্রে বলে, শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ।

সংক্ষেপে কথাটি হইল এই,—সাহিত্য বলিতে বুঝি মানুষের মনের কথা পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান হইবার উপযোগী করিয়া ভাষায় গাঁথা; অর্থাৎ সাহিত্যের বাহন ভাষা। সেই ভাষা আবার অক্ষরাবলিরূপে কাগজের উপর অঙ্কিত হইয়াছে;—অর্থাৎ গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। সেখানে দেখি কতগুলি চিত্র, এই অক্ষরময় চিত্র দেখিয়া আমরা মনের কাণে ভাষার ধ্বনি শুনি, আর সে ধ্বনির অর্থ করিয়া মানুষের মনের কথা টের পাই। আমাদের নিত্য ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত এই বইগুলিকেই বলি সাহিত্য।

সাহিত্যটা কি, এরূপ প্রশ্ন করিলে দেখানো হয়, এই এই বইগুলি সাহিত্য, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু উত্তরটা ঠিক হইল কি? সাহিত্য কি পুস্তকগুলির সমষ্টি? উপর উপর মনে হয় তাই বই কি। কিন্তু একটু ভাবিতে গেলে আর দুটিকে এক করা যায় না। এদের মধ্যে একটি বিচিত্র সম্বন্ধ আছে, যেমনটি থাকে গান এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের মধ্যে। গান রেকর্ডগুলির সমষ্টি নয়; রেকর্ড থেকে বাহির করিয়া শুনিতে হয়। সাহিত্যও তেমনি পুস্তকগুলি নয়, গ্রন্থে সাহিত্য নিবদ্ধ থাকে;—বলা যায়, ওগুলি সাহিত্য পরিচয়ের medium।

দর্শন দিশায় বলা যায়, বইগুলি সাহিত্যের প্রতীক। বইগুলিতে সাহিত্যবুদ্ধি করা চলে; অর্থাৎ বইগুলিকে সাহিত্য বলিতে বাধা নাই। কিন্তু পাল্টাইয়া (vice versa) বলা যায় না; অর্থাৎ সাহিত্যটা আর কিছু নয়,—এই বইগুলির সমষ্টিমাত্র, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। যেমন দর্শনে বলে, প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি করা চলে, 'উৎকর্ষাৎ' কিন্তু "ন প্রতীকে ন হি সঃ"। *

এতক্ষণে বলা যাইতে পারে, সাহিত্যের স্বরূপ লক্ষণটি কি। আদি মূল ধরিয়া বলিতে হয়, মানব মনোজগতের বাহিরে প্রকাশ। এইটাই মূলার্থক মেলনসূত্র। এটি আবার প্রস্থানত্রয়ী; প্রথম ও দ্বিতীয়,—চিত্র এবং সঙ্গীত। মানুষের যে সব হৃদয়বেদন ভাষামুখে প্রকাশ পাইতে চায় না, সুন্দরের কল্পলোক পাইয়া তাহাই কুসুমিত হইয়া উঠে এই দুটি শাখায়। এদুটিকে ভিন্ন রাখিয়া সাহিত্য প্রস্থান বলিতে বুঝাইবে, মানুষের অন্তরের সেই প্রকাশ, ভাষা যার বাহন। এইবার মোটামুটি একটা লক্ষণ পাওয়া গেল। মনের কথাটার দেনা পাওনাই সাহিত্য (মূলগত অর্থ—মেলন); কিন্তু এর মধ্যে মানুষের আর একটা 'বাহানা' আছে সে সর্ব্বত্রই সুন্দরকে পাইতে চায়। মানুষের প্রকৃতিগত যে সৌন্দর্য্যলিপ্সা আছে সেটা চিত্র ও সঙ্গীত প্রস্থানে বেশী ফুটিয়াছে। সেটার অধিকার সাহিত্যেও আছে। যাহা বলিতে ও শুনিতে চায়, সেটা সুচারুরূপে হইলেই মানুষ আনন্দ পায়; এবং যাহাতে সুন্দর করিয়া ধারাবদ্ধভাবে এই আদান প্রদান হয়, সেজন্য দাতা ও গ্রহীতা

* প্রতীকে (Symbol এ) ব্রহ্মজ্ঞান করিও না, সে প্রতীক ব্রহ্ম নহেন। সেই প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে পার, কিন্তু বিপরীত ভাবনা অকর্ত্তব্য। যেরূপ "আমাত্যে রাজদৃষ্টিযুক্তা, ন তু রাজ্ঞে আমাত্যদৃষ্টিঃ"—কেননা, "ব্রহ্মণঃ উৎকর্ষাৎ"।

উভয় পক্ষই যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ইংরাজীতে এই প্রবৃত্তিকে বলা হয় aesthetic impulse। সুন্দরের প্রতি এই লোভটি সাহিত্যে প্রকাশিত হইলে সেটা হইয়া উঠে, শিল্প ও কলা।

এই রকমটি হইল সাহিত্য সৃষ্টির ইতিবৃত্ত। অতএব সাহিত্য বলিতে বুঝাইল মানুষের মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ, যেটা হয় ভাষামুখে এবং সুন্দরভাবে। এই পর্য্যন্ত যদি হয় সাহিত্যের সংজ্ঞা তবে বলিতে হয় যাবতীয় গ্রন্থই সাহিত্যের পর্য্যায়। সাহিত্যের ব্যাপক অর্থ বস্তুত তাহাই।

তবে ঐ যে পূর্ব্বে সাহিত্য চিনাইতে গিয়া পুস্তকগুলির মধ্যে একটা বাছাই চলিয়াছিল,—কোনো কোনো পুস্তক বাদ পড়িয়াছিল, সেটা হইল কেমনতর? উত্তরে বলিতে হয়, বাছাইটা ঠিক পথেই চলিয়াছে, কিন্তু অবোধপূর্ব্বম্,—অর্থাৎ বিচার না করিয়া সহজ সংস্কারবশে। সেখানে সাহিত্য কথাটির ব্যাপক অর্থটি ধরা হয় নাই, সংক্ষিপ্ত অর্থে বিশুদ্ধ সাহিত্য (pure literature) বলিয়াই বুঝিয়া নিয়াছি, এবং সেই বোধ অনুযায়ী সাহিত্যের গোত্র ঠিক করিয়াছি। এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়, কোন বিশিষ্ট গুণ বিচারে এই শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে।

ব্যাপক অর্থে যাবতীয় ভাষাগ্রন্থই সাহিত্য প্রস্থান—কেননা সবই মানব মনের ভাষামুখে বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এদের মধ্যে যে নানা শ্রেণী আছে সেটা স্বীকার করিতে হয়। রচনার প্রয়োজন, বিষয় আশয় লইয়া নানাবিধ। কতগুলি নেহাৎ নিত্য উপস্থিত প্রয়োজনের কথা বলে, যথা পাকপ্রণালী। কতগুলি বিভিন্ন দিকে শিক্ষাদান করিবার সাধন, যেমন বিজ্ঞান শাখার পুস্তক, চিকিৎসা শাস্ত্র আদি। কতগুলি মানুষের ইহকালের ভালমন্দের খবর যেমন নীতিধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ। আবার কতগুলি পরকালের দিশা দিবার চেষ্টা করে,—মানুষের চরম উদ্দেশ্য ও পরম বিধেয় জানাইয়া দিবার প্রয়াস; যেমন দর্শন, পুরাণ, গীতা শাস্ত্রাদি। মানুষের বহুমুখী আকাঙ্ক্ষা, আশা উদ্যম জানিবার শুনিবার বিষয় কতই আছে। যথাসাধ্য সব দিকের জ্ঞান লাভ করিবার উপায় স্বরূপ কত রচনাই আছে।

কিন্তু একশ্রেণীর রচনা আছে যার মধ্যে প্রয়োজনের no admission, বলা যায়, যাবতীয় প্রয়োজনের নিষেধ। খুঁজিয়া কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, কোনো শিক্ষা দিবার ভরসা দেখায় না, কোনো কিছু প্রমাণও করে না। নানামুখী প্রয়োজন নিরপেক্ষ শুধুই আনন্দ দান এদের কার্য্য—অবসর সময়ের চিত্তবিনোদন মাত্র। এগুলির মধ্যে সংসারে চলিবার সুবিধা কুবিধার কোনো উপদেশ নাই, আহার বিহার জীবিকা নির্ব্বাহের কোনো সাধন নাই, নিষ্প্রয়োজন কথাবার্ত্তার আদান প্রদান মাত্র। তাই প্রয়োজনের জগৎ একেবারে এড়াইতে গিয়া বাস্তবটা নিয়া এরা বেশী আলোচনা করিতে পারে না। কারণ বাস্তবটা যে কোনো না কোনো প্রয়োজন লইয়াই অত্যন্ত বাস্তব। সেই জন্যই কল্পনার মধ্য দিয়া এদের বিকাশ প্রকাশটা বেশী। শিল্পী মানুষ কল্পনার মায়াপুরী গড়িয়া সকলকে তার মধ্যে আনন্দোৎসবে যোগ দিতে আহ্বান করে। এই কল্পলোকের বিত্তসম্ভার লইয়া এই শ্রেণীর রচনা এবং এই সম্পদ লইয়াই তাদের অহঙ্কার।

যাবতীয় নাটক নভেল কাব্যগ্রন্থ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অবশ্য কোনো কোনো উপদেশাত্মক রাহু অমৃত লোভে ছদ্মবেশে এই শ্রেণীতে বসিয়া যায়; তখন অগত্যা সুদর্শন অর্থাৎ সমালোচন সাহায্যে সেটার প্রয়োজনাংশটা ভিন্ন করিয়া লইতে হয়।

উপরিকথিত শ্রেণীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, আরব্য উপন্যাস; জগতের কথাসাহিত্যের অদ্বিতীয় পুস্তক। অমন মজার বই আর মেলেনা, কিন্তু কোনো শিক্ষা দেয় না। উপদেশের লক্ষণ গন্ধ নাই কোনো বিজ্ঞান, দর্শন, পরমার্থ কথা, শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনের বিভীষিকা, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের আহাম্মুকি, কিছুই নাই। অবসর সময়ের নর্ম্ম সহচরী অথচ নিষ্প্রয়োজন কথার লহরী।

একটা কথা শোনা আছে 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য' ইত্যাদি,—যা কিছু কাজ সবই কোনো না কোনো প্রয়োজন সাধনের জন্য। নিষ্প্রয়োজন কাজ কে করে? সত্যই তো। তবে এই যে সাহিত্য বইগুলি যাদের নিষ্প্রয়োজন ব্যবসায়, সেগুলি কেন হইল?

উত্তরে বলা যায়, আনন্দের প্রয়োজনেই এদের সার্থকতা। এই রচনার প্রেরণায় থাকে একটা আনন্দবেদন, কেমনতর তা বলিয়া বুঝানো যায় না। সেই আনন্দ পরকে না জানাই-

লেই নয়, অপরের সঙ্গে ভাগী না হইতে পারিলে সোয়াস্তি নাই, সার্থক হয় না, হৃদয় পীড়িত হইতে থাকে। অন্তর্গূঢ় ঘন ব্যথা, তাই সৃষ্টি করিতেই হয়। সাহিত্যকে যদি প্রশ্ন করা যায় তোমার অস্তিত্ব কিসের তরে? সাহিত্য প্রত্যুত্তরে বলিতে পারে, অন্য প্রয়োজন নির্ব্বিশেষ আনন্দ দান করিব, এই আমার সাধ; এই ভরসাতেই আমার জন্ম ও স্থিতি সেটুকু পারিলেই আমার সার্থকতা।

বলিতে গেলে, সাহিত্য রচনা মানুষের মনের খুসীর কথা, আনন্দের অভিব্যক্তি। এটা অবশ্য যে কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া হইতে পারে, হইয়াও থাকে। যেমন মানুষের জীবনযাত্রা, সুখদুঃখ, আশা নিরাশা, নর নারীর মধ্যে প্রেমের খেলা ইত্যাদি লইয়া সাহিত্য। কত বড় কল্পনার জগৎ আছে তাহার কথা, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের কথা, অতি প্রাকৃত রাজ্যের স্বপ্ন ও সন্ধান, কত কি সাহিত্যের বিষয় আছে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সাহিত্য কোনো প্রয়োজনের ধার ধারে না, প্রকাশ পাইয়াই পর্য্যাপ্ত। যে হেতু তার থাকা দরকার, যেমন আনন্দটা মানুষের থাকা চাই, সেই হেতুই আছে, অন্য কোনো কারণ নাই।

এই রূপটি হইল অনাবিল সাহিত্যের মানমন্দির, যার মধ্যে কলা সরস্বতীর শ্বেতশতদল আসন। এটাকে কেন্দ্র করিয়াই নানা শাখা সাহিত্য গড়িয়া উঠে। প্রয়োজন সাধন লইয়া গ্রহ উপগ্রহরাজি একে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান দেয়, বিলকুল লইয়া সাহিত্যের সৌরজগৎ—ব্যাপক সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝাইতে চাই। একটা জাতির সাহিত্য বলিতে এই জগৎটাই বুঝায়।

গল্পে শুনিয়াছি, কোনো বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সুখ্যাতি শুনিয়া দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ 'হ্যামলেট খানা' পড়িতে গিয়াছিলেন। পাতা উল্টাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, what does it go to prove? তার জানা ছিল না যে সাহিত্য কোনো কিছু প্রমাণ করিবার ভার নেয় না। ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে সাহিত্যের বনিবনাও নাই। এমন কি ন্যায়শাস্ত্র যেখানে হার মানে সাহিত্যে সেটা মজার কথা বলিয়া গণ্য হয়। যেমন শ্রীমান্ ঈশ্বরের বেলা; প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ হইয়াছেন, এই খবরটায় সবাই খুসী, অর্থাৎ কথাটা সাহিত্যাধিকারে আসিয়াছে। কেননা, খুসী করাটা সাহিত্যের প্রধান অভিপ্রায়।

কোনো তত্ত্বসন্দেশও সাহিত্যের পেটে সয়না, অমনি অম্বল জন্মায়, অর্থাৎ—রসাপকর্ষক হয়। সাহিত্য রসটুকু চায়, তত্ত্বটা বাদ দেয়; যেমন দেখা যায় রাধা-কৃষ্ণের লীলা ব্যাপারে। তত্ত্বটা থাকে সাধুসন্তের জন্য, তারা তত্ত্বের আঁঠি চোষেন, আর, রসটা নেয় সাহিত্য, পরকে আস্বাদন করায় সে-ই। কলসী কাঁখে এক রাঙা মেয়ে নিত্য জল আনিতে যায়, আর ঘাটের পথে কদম তলায় একটা কালো ছেলে কেন যে বাঁশী বাজায় আর আড়চোখে চায়,—তারই মজার কথা লইয়া সাহিত্য ব্যস্ত থাকে।

সাহিত্য কোনো কিছু শিখাইতে চায় না, কথাটা বড় সাংঘাতিক। হয়ত কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। এ কথার সমর্থনায় অনেক নজীর দেখানো যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কথাটি উদ্ধার করি,—"লোকে যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে, তবে পাইতেও পাবে। কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না, কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল মাষ্টারীর ভার লয় নাই।"

আচ্ছা যদি তর্ক ধরা যায়, রামায়ণ মহাভারতে তো নীতি শিক্ষাই আছে, তবে এগুলি কি বিশুদ্ধ সাহিত্য শ্রেণীর নয়? ইহার সমাধানকল্পে বলা যায়, এগুলি নীতি শিক্ষার সহায়ক মাত্র,—এইরূপে যখন পাঠকের কাছে প্রতীয়মান হয়, তখন এদের বিশুদ্ধ সাহিত্যের গণ্ডি থেকে পা বাড়াইয়া প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কাজ করিতে হয়,—ব্রাহ্মণ যেমন যজন যাজন ছাড়িয়া হাতা বেড়ী হাতে পাকশালায় ঢোকে।

রামকৃষ্ণ কথামৃতের মধ্যে পাওয়া যায় মজার মজার কথা, মাঝে মাঝে চমৎকার গল্প। উপমাসূত্রে বিষয়বস্তু বুঝাইবার এমন চমৎকার রসপূর্ণ দৃষ্টান্ত আছে, যা আর কোথাও নাই, কালিদাস রবীন্দ্রনাথেও মেলে না। আবার বিষয়টি বলিবার ভঙ্গি অপূর্ব্ব। এই সব হিসাবে যদি কোনো পাষণ্ড ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ পায়, পরমার্থ আছে কি নাই সে বিষয়ে উদাসীন থাকে, তবে হয় বিশুদ্ধ সাহিত্য ভোগ।

এ ক্ষেত্রে ভক্তগণ অর্থাৎ ভণ্ডমণ্ডলী নাক সিঁটকাইয়া হয়তো বলিবেন, শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটা। তা হউক, বাটনাটা রান্নার জন্যইতো,—পেট ভরাইবার অন্যতম সাধন; এই পেটটি বড় বেয়াড়া;—ভরা না থাকিলে ব্রহ্মবস্তু পর্য্যন্ত মিথ্যা করিয়া দেয়।

কোনো কোনো সাহিত্যগ্রন্থ নিশ্চয়ই আছে যারা একাধারে প্রয়োজনসাধক, অপিচ প্রয়োজননিরপেক্ষ স্বতই মনোজ্ঞ। তখন তাদের দুইদিক দেখিতে হয়,—কাকাক্ষি-গোলক ন্যায়ে পড়া শিখাইতেও হয়, খেলা শিখাইতেও হয়; গোপালের মত সুবোধ বালকেরও প্রিয় হয়, দুরন্ত অনাবিষ্ট রাখালও পছন্দ করে। সাহিত্যের মধ্যে সব্যসাচী স্বরূপ এই গ্রন্থগুলির সম্বন্ধেই সংশয় হয় যে এরা সাহিত্যের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আসন পাইবে, না, প্রয়োজন প্রমুখ সাহিত্যের দলে মিশিবে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাউক, যোগবাশিষ্ঠ। এ গ্রন্থে মানুষের চরম প্রয়োজনের কথাই নিবদ্ধ বটে, কিন্তু উহার কাব্যাংশ অদ্বিতীয় চমৎকার। যখন কেহ শুধু কাব্যাংশ পাঠে খুসী হয়, তখন হয় ওখানার শুদ্ধ সাহিত্য ভোগ। সাহিত্য কথাটা তাহা হইলে, কতকাংশে subjective; অর্থাৎ পাঠকের রুচি, দেখিবার দিশা, অর্জ্জিত সংস্কারের উপর নির্ভর করে। ঐ গ্রন্থখানি সাহিত্যপর্য্যায় না বেদান্তপ্রস্থান, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইবে ভোক্তার বুদ্ধি বিচারে, অর্থাৎ কোন lightএ গ্রন্থখানার আনন্দলাভ হইল সেইটী ধরিয়া।

আবার, নিছক সাহিত্যও বহু আছে। কাব্য পর্য্যায় প্রায় সবই এই শ্রেণীর। এই শ্রেণীর মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়াও বিন্দুমাত্র পরমার্থ বা সদুপদেশ মেলেনা; যেমন রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। যদি কেহ উহা থেকে নীতি শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তবে বুঝিব তাঁহার পরম সৌভাগ্য,—আর, রবীন্দ্রনাথের চরম দুর্ভাগ্য।

অনেক সময়ে অবশ্য রামপ্রসাদকে ভূতের বেগার খাটিতে হয়। যেমন পাঠ্য পুস্তক হিসাবে কপালকুণ্ডলা, দত্তা, কৃষ্ণকান্তের উইল, তপতী। এগুলি যে নিষ্প্রয়োজন সাহিত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়া শিক্ষার বাহন হইয়াছে। এক্ষেত্রে 'মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া লোকের পিঠে চড়ে'।

এতখানি বচন বিন্যাসের পর বোধ হয় আর বলিবার অপেক্ষা রাখেনা যে নভেলটা নিছক সাহিত্য কিনা। নভেল কেন এত লোকরঞ্জক? প্রথম ও শেষ উত্তর এইমাত্র যে মানুষ গল্প শুনিতে ভালবাসে। সেই গল্প যখন মানুষ লইয়া হয়, তখন হয় সমধিক চমৎকার; কারণ মানুষের সম্বন্ধে জানিতে শুনিতে মানুষের কৌতূহলের অবধি নাই।

এই ক্ষণিক সুখ এবং অধিক দুঃখ-বহুল সংসারক্ষেত্রে আশা নিরাশা সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া হোঁচট খাইতে খাইতে মানুষ সারা জন্মটা ধরিয়া চলে;—কিসের জন্য সে রহস্য কি কেউ কোনো কালে বুঝিল? জীবনটা যে মোটেই সুখ সোয়াস্তির নয়, সেটা তো অতি স্পষ্ট; তবু যে মানুষ চিরকাল মেয়ে পুরুষে জোড়া বাঁধিয়া পথিমধ্যে খেলার ঘর সাজাইতে বসিয়া যায়, সেইটাই বা কি ব্যাপার? তারপরে ক্রীড়াভূমি থেকে খেলোয়াড়দের একে একে অকস্মাৎ অভাবনীয় অন্তর্ধান। রহস্যের সীমা নাই; কিছুই দিশা না পাইয়া জল্পনা কল্পনারও অবধি নাই, ভয় ভাবনারও সীমা নাই। আবার মানুষের এর কাহিনী শুনিতে মানুষের কৌতূহলেরও শ্রান্তি নাই। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের এই অনন্ত জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র সাহিত্য রচনা। আবার এই কেন্দ্র থেকেই নাটক নভেলের সূত্রপাত। এই জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই গল্প-সাহিত্য আমাদের কাছে বেশী প্রীতিপ্রদ।

মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্যে সাহিত্যের উদ্ভব, সেটা নানামুখী শাখার অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গেছে। নভেল সেই আদিম সৃষ্টির প্রয়োজনটাকে এখনও গোচরে আনিয়া দেয়। কথা ও কাহিনী শুনিবার কৌতূহল আমাদের শৈশব থেকেই ধরা পড়ে। শিশুমনের এই আগ্রহ জগতের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আবার অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্পনা দিয়া গল্পগুলিকে রসমণ্ডিত করা হয়, কারণ শৈশবমন কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করে। বয়স হইলে বাস্তব সংসারের পরিচয় লাভ করিয়া বাস্তব বনিয়া গিয়া আমরা সেই উদ্ভট কল্পনার রসাস্বাদ হারাইয়া ফেলি; সেটা আমাদের লাভ কি লোকসান সে বিষয়ে সংশয় আছে। যে শেয়ালটা মানুষের মত কথাবার্ত্তা বলে, আর ও বাড়ীর সরকার মশাইর মত ধড়িবাজ সে যে নাঙ্গুর জলে নক্র পাইয়া খুসী হইয়া গেল, এটার সম্ভব অসম্ভব, সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার না করিয়াই প্রভূত আনন্দ পাইয়াছি, এখনও দেখি কিছু পাই। এর মূলে আছে সেই অপরের কথা শুনিবার কৌতূহল, তা হউক না সে ইতিহাসটা অসম্ভব।

আমরা অনর্থক পর চর্চ্চা করি, সেটা সেই আদিকালের প্রকৃতির বিকৃতি। কাণ পাতিয়া অপরের গোপন কথা শুনিতে যাই; আড়ি পাতিয়া দেখি লুকাইয়া কে কি করে, এ সবারি মূলে সেই আদ্যকালের বুড়ীটা এখনও ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছে;—বোধ হয় বরাবরই থাকিবে।

বড় হইয়া বাস্তব সংসারে ঢুকিয়া মানুষের বাস্তব জীবন-যাত্রার কাহিনীও আমরা শুনিতে সমুৎসুক হই। এখানে একটী মজার কাণ্ড ঘটে;—যদিও শুনিতে চাই বাস্তব ক্ষেত্রের কথা, তবু সেটা কল্পনার মধ্য দিয়া আসা চাই; নহিলে আমাদের চমৎকার ঠেকে না। বাস্তব কথা কল্পনার সুরতরঙ্গে ভাসিয়া মনোহর সঙ্গীত হইয়া উঠে। সেই কল্পনা বাস্তবের ধারাটি উল্টাইবে না, এইটুকু মাত্র আমাদের অনুমোদনের অনুশাসন; অর্থাৎ, একেবারে অসম্ভব বা অসঙ্গত যদি কিছু হয় তবে সেটা কৌতুকটাকে মাটি করিয়া দেয়।

মানুষের জীবনপথে বিচিত্র উৎসব ঘটে নরনারীর মিলন লইয়া। এটা লইয়া যত চর্চ্চা চিরকাল ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। পরস্পর একত্র হইবার জন্য আকুতি লইয়া কত অঘটনঘটনের কাহিনী, কত কাব্য রচনা হইয়া গিয়াছে, তবু একথা শুনিতে লোকের শ্রান্তি নাই। এই চিরন্তন রহস্য চিরকালের জিজ্ঞাসায় উদাসীন থাকিয়া লোকের কৌতূহল সদা-জাগ্রত রাখিতেছে। এই কাহিনী সুন্দরভাবে বলা থাকে নাটক নভেলে। গল্প মধ্যস্থিত কয়েকটা বন্ধু ও বান্ধবী কিভাবে মিলন পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার ইতিহাসটাই নাটক নভেল। এ দুটীতে শুধু বলিবার ঢঙের তফাৎ। আশ্চর্য্য এই যে যথাবদ্‌বস্তুবর্ণন, অর্থাৎ প্রকৃতই যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তার হুবহু ইতিহাসটা আমাদের তেমন ভাল লাগে না, যেমনটী লাগে কল্পনামণ্ডিত ঘটনা। সেটা হয়ত আদৌ ঘটে নাই, কিন্তু ঘটিতে পারে,—ঘটন কিছুই অসম্ভব নহে। এই কাল্পনিক প্লট্ লইয়াই নভেলের নভেলত্ব। এই ধর্ম্মান্বিত হইয়া এটা ইতিহাস বা জীবনচরিত থেকে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

নভেলটা যে সাহিত্য এবিষয়ে কোন সংশয় তো নাই-ই; সাহিত্যের লক্ষণ বিচারে এটা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য। ইংরাজ পণ্ডিতগণও এইরূপ সাক্ষ্য দেন, —'Novel, the principal literary form of our complex and manysided modern world'—Hudson. এই নভেল প্রসঙ্গে বহু আলোচনা চলিতে পারে। এখানে শুধু বলিতে চাহিয়াছিলাম, ছেলেবেলা যে লুকাইয়া দেবীচৌধুরাণী পড়িতেছিলাম, সেটা প্রকৃত সাহিত্যেরই সেবা বা সেবন করিতেছিলাম। ক্লাসের উপযোগী যথোচিতটা করিতে নিতান্তই নারাজ ছিলাম, সেই-টিই ছিল দাদামশাইর উষ্মার কারণ। সেই মহাপাতকের শাস্তি স্বরূপ তিনি আমার স্কন্ধে চাপাইলেন 'গিয়োমেট্রি'—যেটা হইল সাহিত্যের দুশ্‌মন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

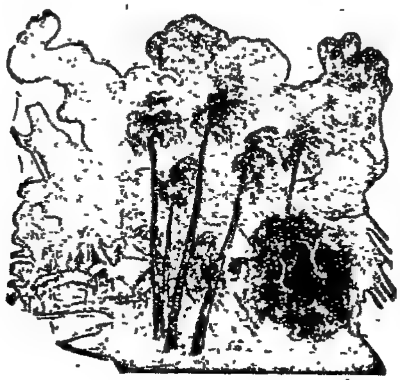

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৪

প্রমথ এবং প্রিয়লালের মধ্যে কথোপকথন জমে উঠেছিল, সন্ধ্যা প্রমথর দিকে মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন খাবার দোব?"

সন্ধ্যার দিকে ফিরে চেয়ে প্রমথ তেমনি মৃদুস্বরে বললে, "দাও।" তারপর চোখের বক্র কটাক্ষে প্রিয়লালের প্রতি ইঙ্গিত করে আরও নিম্নকণ্ঠে বললে, "অতিথিকে নিশ্চয় ভুলো না।" প্রিয়লালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "ডক্টর চৌধুরী, সামান্য একটু খাবার দিলে, আশা করি তাতে আপত্তি করবেন না।"

প্রমথর প্রস্তাব শুনে প্রিয়লাল ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল, বললে, "না, না, মিষ্টার মুখার্জ্জি, অনেক উপদ্রব আপনাদের ওপর করেছি,—তার ওপর খাবারেও ভাগ বসাতে চাইনে।"

মাথা নেড়ে সহাস্যমুখে প্রমথ বল্‌লে, "ভুল, ডাক্তার চৌধুরী, আপনার ভুল। কেউ কারো জিনিষে ভাগ বসাতে পারেনা যতক্ষণ না ভাগ্য নিজে তার ব্যবস্থা করে। পশুশক্তির সাহায্য অপরের বস্তুতে ভাগ বসানো যায় বটে, কিন্তু সে আর কতটুকু? ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন আর সীমা-পরিসীমা থাকে না, একেবারে অখিল ভ'রে দিয়ে যায়,—তখন ফকিরকে বানিয়ে দেয় আমীর।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লালের মুখমণ্ডলে দুঃখের একটা ক্ষীণ ছায়াপাত হ'লো; বিষণ্ণমুখে সে বললে, "ভাগ্যকে সব সময়ে খুব নিরাপদ বন্ধু ব'লেও মনে করবেন না মিষ্টার মুখার্জ্জি। সে যখন বিরূপ হয় তখন সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে আমিরকে ফকির বানিয়েও ছাড়ে।"

প্রমথ বল্‌লে, "কিন্তু সে ভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যেরই বৈমাত্র ভাই। ওরা দুজনে পাশাপাশি বাস করে, আর কে যে কখন আমাদের কাঁধে চড়াও হয় তা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক্, এখনো আমার খাবার সময় হয়নি, অনেক বেলায় আজ খেয়েছি।"

মাথা নেড়ে প্রমথ বল্‌লে, "তাহ'লে আপনি খাবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় কখন, সে বিষয়ে জগতের একজন অতি বিচক্ষণ লোকের উপদেশ কি তা নিশ্চয় জানেন না। জানেন কি?"

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বল্‌লে, "না, তেমন ত কিছু মনে পড়ছে না।"

প্রমথ বল্‌লে, "তাঁর উপদেশ, খাবারটা যদি নিজের পয়সায় হয় তা হ'লে যখন খিদে পাবে তখন, আর যদি পরের পয়সায় হয় তাহ'লে যখনই হাতে পাওয়া যাবে তখন।"

আহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়ের সূত্র শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "আপনার বিচক্ষণ লোকের এইটুকু বিবেচনার অভাব হয়েছিল যে, তাঁর মত পরিপাক শক্তি যে সকলেরই থাকবে এ কথা তাঁর মনে করা উচিত হয়নি। কিন্তু সে যাই হোক্, আমি তাঁর উপদেশ পালন করব। অসময়ে না খেয়ে প্রমাণ করব যে আপনারা আমার পর নন্, আপনার।"

এই অসংশয়িত পরিহাস-বাণীর মধ্যে দৈবক্রমে যে মর্ম্মন্তুদ সত্য প্রচ্ছন্ন ছিল তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থেকে প্রিয়লাল হাসতে লাগ্‌ল; কিন্তু কমলা নেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে একটা অনতিবর্ত্তনীয় দুঃখে সন্ধ্যার চক্ষু সজল হ'য়ে এল; এবং কৌতুক-বাক্যের সফেন জলরাশির মধ্যে সহসা নির্ম্মম সত্যের কঠিন পাথর দেখ্‌তে পেয়ে বিমূঢ়তায় এবং বেদনায় প্রমথ নির্ব্বাক হয়ে গেল। ট্রেণ তখন রোহিণীর "লেভ্‌ল্ ক্রসিং"এর উপর দিয়ে শড়াক্ শড়াক্ শব্দে দ্রুতবেগে অদূরবর্ত্তী জসিডি ষ্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে।

প্রমথকে নিরুত্তর থাকতে দেখে প্রিয়লাল সহাস্যমুখে

বললে, "কি মিষ্টার মুখার্জ্জি, নিজের জালে নিজেই ধরা পড়লেন না কি? মুখে কথা নেই যে!"

শুনে প্রমথ নিজের স্বভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে হাসতে লাগল; বললে, "ধরা প'ড়ে যদি এই প্রমাণ ক'রে থাকি যে আপনি আমাদের পর নন, আপনার,—তা হ'লে ধরা পড়ার জন্যে একটুও দুঃখিত নই। কিন্তু আপনি যে আমাদের আপনার, তার এই অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকব না ডক্টার চৌধুরী, এর খুব জোরালো রকমের প্রমাণ ভবিষ্যতে আপনাকে দিতে হবে।"

"কিন্তু প্রমাণের দায়িত্ব আপনারা ত' আমার উপর দিচ্ছেন না, প্রমাণ ত' আপনাদেরই দিক থেকে আসছে।" বলে প্রিয়লাল হাসতে লাগ্‌ল।

প্রিয়লালের পিছন দিকে ইঙ্গিত ক'রে প্রমথ বললে, "ফিরে দেখুন, পিছন দিক থেকেও আসছে।"

প্রিয়লাল পশ্চাতে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখ্‌লে দুইহাতে দুটি খাবারের প্লেট নিয়ে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়েছে। একটিতে ফল এবং মিষ্ট,—অপরটিতে কচুরি, চপ্‌, কাটলেট প্রভৃতি নোন্‌তা খাবার। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার হাত থেকে প্লেট দুটি নিয়ে প্রিয়লাল বললে, "এ দুটি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর জন্যে মিসেস্ মুখার্জি?"

নিমেষের জন্য দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হ'ল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দৃষ্টি অবনত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "না, এ আপনার জন্যে।"

"আমার জন্যে? কিন্তু আমি ত'—" সন্ধ্যার বিরুদ্ধে ঠিক কি প্রতিবাদ করবে ভেবে না পেয়ে প্রিয়লাল তার কথার মধ্যে অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় থেমে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার হাত থেকে খাবারের আরো দুখানা প্লেট নিয়ে প্রমথ বললে, "উচ্চ আদালতে আপনার মামলা টিকল না ডক্টার চৌধুরী, অতএব খাবারের সদ্ব্যবহার করুন।"

চিন্তিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "টিকলনা তা ত' বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু—

"কিন্তু কি?"

প্রমথর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "আপনার খাবার ত দেখচি নে মিসেস্ মুখার্জ্জি। নিজের খাবারটাই বুঝি আমাকে দিলেন?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "না, খাবার যথেষ্ট আছে।"

"তবে এখন নিলেন না কেন?"

"পরে নোবো অখন।"

"কিন্তু সে রকম ইচ্ছে ত' আমারও ছিল মিসেস্ মুখার্জি, তবে আমাকেই বা এখন কেন দিলেন?"

এ কথার উত্তর প্রমথ দিলে; বললে, "হয়ত' ওঁদের মেয়েলী শাস্ত্রের নিগূঢ় কোনো কারণে,—হয়ত অতিথি সংকারের নিয়মে অতিথিকে খাওয়ানো শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকলে পুণ্যের অঙ্কটা একটু বেশি ফুলে ওঠে।"

প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু অতিথি সৎকারের উদ্দেশ্য যদি অতিথিকে আনন্দ দান করাই হয়, তা হ'লে আমার মনে হয় অভুক্ত না থাকলেই বেশী ফোলে।"

প্রমথ বললে, "আমাদের পুরুষদের শাস্ত্র মতে ত' সেই কথাই বলে।"

সমস্যাটার সমাধান হ'ল অসিডি ষ্টেশনে। গাড়ি থামতেই মাধব ছুটে এল, তারপর গাড়ীর ভিতর দৃষ্টিপাত ক'রেই বললে, "মা, প্লেট্ ত কম পড়েছে, আর দুখানা প্লেট্ এনে দিই?"

সন্ধ্যা বললে, "দুখানার দরকার নেই, একখানা নিয়ে এস, তা হ'লেই হবে।"

প্রমথ বললে, "ব্যাপারটা তা হ'লে এতক্ষণে বোঝা গেল ডক্টার চৌধুরী।"

প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু এ কথা একটুও বোঝা গেল না যে, ওঁর যখন একখানা প্লেটেই চলে, তখন চারখানা প্লেটের মধ্যে তিনখানাতে আমাদের তিন জনের কেন চলতনা।"

প্রমথ বললে, "ওঁদের বোধ হয় এই রকম কিছু ধারণা আছে যে, নিজেদের একখানা ক'রে প্লেট নিতে হ'লে আমাদের দুখানা ক'রে না দিলে সৌজন্যের ত্রুটি হয়। ওঁদের সঙ্গে আমাদের রেশিয়োটা অন্ততঃ ওয়ান্ টু টু হওয়া উচিত বলে ওঁরা বোধহয় মনে করেন।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগ্‌ল; বললে, "সত্যিই তাই।" তারপর সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে সবিনয়ে বললে, "আমার অনধিকার-চর্চ্চা ক্ষমা করবেন মিসেস মুখার্জ্জি, কিন্তু এর জন্যে প্রধানতঃ আপনারাই দায়ী। পুরুষদের সুবিধের জন্যে নিজেদের বঞ্চিত ক'রে ক'রে আপনারা আমাদের এত demoralised ক'রে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় আপনারা যা আমাদের দান করেছেন তা আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা ব'লে মনে করি। আপনাদের আত্মসঙ্কোচকে আমরা আপনাদের অধিকারের খর্ব্বতা ব'লে ধ'রে নিই।"

প্রমথ বললে, 'কিন্তু স্থল-বিশেষে ওঁদের আবার এমন আত্মস্ফীতি আছে যে, তার মধ্যে গোটা দশ বারো আত্মসঙ্কোচ ডুব মারতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি ওঁর কানের অলঙ্কারের একখানার দামে আমার ঘড়ি চেন আঙটী বোতাম অন্ততঃ দশ সেট কেনা যেতে পারে। অপরাপর অলঙ্কারের কা কথা।"

প্রিয়লাল বল্লে, "কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ের গহনাও অধিকাংশ স্থলেই Reserved fund যা সংসারের সঙ্কটের সময়ে কাজে লাগে।"

প্রমথ বল্লে, "সে হয়ত কোনোদিন লাগ্‌তে পারে, কিন্তু সেই Reserved fundকে পুষ্ট করতে করতে নিত্য-কার Current account এত বিশীর্ণ হয়ে ওঠে যে সংসারের খরচ চালানোই দুষ্কর হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে উপস্থিত আমরা আহারে মন দিতে পারি, কারণ মাধব দুখানা প্লেটই দিয়ে গেছে, সুতরাং প্লেট-সঙ্কোচের কোনো অভিযোগ এখন আর নেই।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্লে, "মাধবকে ধন্যবাদ!"

শিমুলতলা থেকে গাড়ী হড়্ হড়্ করে ঝাঝার দিকে নেমে চলেছিল। উভয় পার্শ্বে তরুগুল্মমণ্ডিত ঘননিবদ্ধ পর্ব্বতশ্রেণী, মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ রেলপথ অতিকায় সরী-সৃপের মত এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে। কিছু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায় সমস্ত গাছপালা একটা আর্দ্র স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করেছে। প্রিয়নাথ, প্রমথ এবং সন্ধ্যা প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব স্তিমিত সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্তব্ধ হ'য়ে বসে ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ি এসে ঝাঝা ষ্টেশনে দাঁড়াল।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সের একজন আরোহী যুবক কুলির মাথায় সুটকেস্ এবং বেডিং চাপিয়ে ঈষৎ বিবর্ণমুখে ইণ্টার ক্লাসের দিকে চলেছিল, হঠাৎ প্রমথর উপর দৃষ্টি পড়ায় থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর নিকটবর্ত্তী ইণ্টারক্লাস কামরায় তাড়া-তাড়ি জিনিষ-পত্র রেখে কুলির পয়সা চুকিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল প্রমথর গাড়ীর সম্মুখে। ভাল করে প্রমথকে নিরীক্ষণ ক'রে গাড়ীর কাছে এসে বল্লে, "প্রমথ না?"

যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখে ঔৎসুক্যভরে প্রমথ বল্লে, "প্রমথ। কিন্তু আমি ত' ঠিক্—" তারপর সহসা উল্লসিত হয়ে জানলা দিয়ে যুবকের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, "আরে, আরে সুরেশ যে! কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা রে সুরেশ!"

সুরেশ প্রমথর হাত নিজ হাতের মধ্যে ধারণ করে স্মিতমুখে বল্লে, "তা হ'লে চিন্‌তে পেরেছিস্? আমি ভেবেছিলাম হয়ত' চিন্‌তেই পারবিনে।"

প্রমথ বল্লে, "এমন কিছু অন্যায় ভাবিসনি। সেই ত' বি, এ পরীক্ষের পর ছাড়াছাড়ি, তারপর এই বার তের বছর আর দেখা নেই। কোথায় যাচ্ছিস?"

"মুঙ্গের।"

"মুঙ্গের? তবে ত এ গাড়িতে মোটে কিউল পর্য্যন্ত। উঠে আয়না, গল্প করতে করতে যাই।"

মৃদু হেসে সুরেশ বল্লে, "আমি লাল টিকিটের যাত্রী, আমাকে এ গাড়িতে উঠতে দেবে কেন? তার চেয়ে তুই আয়না আমার গাড়ীতে।" তারপর সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্লে, "মেয়েরা আছেন অসুবিধে হবে হয়ত, থাক্ না-হয়।" ট্রেনের পিছন দিকে দেখে প্রমথর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লে, "গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে, চললাম প্রমথ।"

ব্যস্ত হয়ে প্রমথ বল্লে, "দাঁড়া সুরেশ, আমিও যাচ্ছি।" তারপর সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বল্লে, "সুরেশের সঙ্গে একটু গল্প করতে চল্‌লাম উষা।" প্রিয়লালকে বল্লে, "আপনারা গল্প-টল্প করুন ডক্টার চৌধুরী, কিউলে ফিরে এসে ভাল ক'রে গল্প জমানো যাবে।" তারপর গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটে গিয়ে যখন সুরেশের পিছনে পিছনে ইণ্টারক্লাসে উঠে পড়ল তখন ট্রেণ চল্‌তে আরম্ভ করেছে।

উদ্বিগ্নচিত্তে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সন্ধ্যা দেখ্‌ছিল প্রমথ নির্ব্বিঘ্নে গাড়িতে উঠ্‌তে পারে কি না, প্রমথ গাড়িতে প্রবেশ করলে সে মুখ ভিতরে ক'রে নিয়ে সোজা হয়ে বস্‌ল।

সন্ধ্যার উদ্বেগ এবং উদ্বেগের কারণ বুঝতে পেরে প্রিয়লাল বল্লে, "এ-রকম ছুটোছুটি ক'রে গাড়িতে ওঠা-নাবা নিরাপদ নয় মিসেস্ মুখার্জ্জি।"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বল্লে, "কিন্তু সেটা বোঝে কে বলুন।"

প্রিয়লাল বল্লে, "তা সত্যি। উত্তেজনার মুখে আমা-দের কিছুই মনে থাকে না। আজ আমি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে উপদেশ দিচ্ছি, কালই হয়ত আমার বিরুদ্ধে তাঁর উপদেশ দেওয়ার কারণ হ'তে পারে। কিন্তু কি চমৎকার মানুষ আপনার স্বামী মিসেস্ মুখার্জ্জি! এই অল্পক্ষণের মধ্যে আমাকে এমন আপনার ক'রে নিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছে, আপনারা আমার একটুও পর নন্, পরম আত্মীয়। এমন সহৃদয় মিশুক লোক জীবনে আমি আর একটি দেখিনি। আমার লাহোর যাওয়ার পথে এইবারই আমাকে লক্ষ্ণৌয়ে আপনাদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে যাবার জন্যে এর মধ্যে তিনবার অনুরোধ করেছেন। আপনি তার কিছু শুন্‌তে পেয়েছিলেন?"

সন্ধ্যা বল্লে, "হ্যাঁ, কিছু-কিছু শুন্‌তে পাচ্ছিলাম।"

প্রিয়লাল বল্লে, "এবার হবে না, তাড়াতাড়ি আছে; কিন্তু কাশ্মীর থেকে ফেরবার পথে একদিনের জন্যে আপনাদের দর্শন ক'রে যাব।"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা কোনো কথা বল্লে না, শুধু ক্ষণি-কের জন্য একবার প্রিয়লালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করে চুপ ক'রে রইল। তার পক্ষ হ'তে যথোচিত আগ্রহ এবং

সহযোগিতার অভাবে কথোপকথন ভাল ক'রে অগ্রসর হ'তে পারছিল না; অগত্যা প্রিয়লালকেও চুপ করতে হ'ল। সন্ধ্যার শুষ্ক মূর্ত্তি এবং স্বল্পভাষিতা লক্ষ্য ক'রে তাকে স্বভাবত লাজুক এবং গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোক ব'লেই প্রিয়লালের মনে হয়েছিল; তা ছাড়া, এ কথাও সে মনে মনে বিচার ক'রে দেখ্‌লে যে, তার সহিত সন্ধ্যার পরিচয়ই বা কতটুকু এবং সে পরিচয়ের ভিত্তিই বা কি-এমন, যাতে করে সন্ধ্যার পক্ষে তার সহিত নিরবচ্ছিন্ন কথোপকথন চালানো বিরক্তিকর না হলেও অসুবিধাজনক হবে না। নিজের দিক থেকেও সে ভেবে দেখ্‌লে যে, আত্মীয়তাব অনুপাতাতিরিক্ত মনোযোগ প্রদর্শন শুধু অনাবশ্যকই নয়, সুরুচি-বিগর্হিত।

গাড়ি তখন গিধৌড় ষ্টেশন ছেড়ে জামুইয়ের দিকে ছুটে চলেছিল, প্রিয়লাল তার এটাসি কেস্ থেকে একখানা ইংরাজি ম্যাগাজিন বার ক'রে একটা অর্দ্ধসমাপ্ত প্রবন্ধে মনোনিবেশ ক'রে বস্‌ল।

সন্ধ্যা বুঝ্‌তে পারলে, প্রিয়লালের এ আচরণের জন্য তার নিস্পৃহতার ভঙ্গীই দায়ী। তার মনের মধ্যে উপস্থিত যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে এ নিস্পৃহতা হয় ত' অসঙ্গত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি এর সংবাদ অবগত নয় তার কাছে এ নিস্পৃহতা যে অশোভন মনে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ কথা মনে হওয়া মাত্র সন্ধ্যা নিজেই কথা আরম্ভ করলে; বল্‌লে, "মিষ্টাব চৌধুবী, কতদিন আপনি কাশ্মীরে থাক্‌বেন?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল বইখানা মুড়ে বেঞ্চের উপর রেখে দিয়ে বল্‌লে, "ইচ্ছে আছে কাশ্মীরে মাস দুই থাকব। ফিরতে কিন্তু মাস তিনেকের কম হবে না।" তারপর সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে আগ্রহের সহিত বল্‌লে, "মিসেস্ মুখার্জ্জি, চলুন না আপনারা দুজনে আমার সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে! যাবেন? অনুগ্রহ ক'রে যদি যান তা হ'লে কাশ্মীর ভ্রমণটা যে কি আনন্দের হয় তা রেলের এইটুকু পথের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝ্‌তে পারছি! যাবেন?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "সম্ভব হবে ব'লে ত' মনে হচ্ছেনা।"

"কেন? সম্ভব হবে না কেন?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মাথা নেড়ে তেমনি মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, 'না, বোধহয় হবে না।"

আর অনুরোধ করে বিশেষ কোন ফল হবেনা বুঝতে পেরে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "হলে কিন্তু ভারী খুসী হতাম।" তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বললে, "মিসেস্ মুখার্জ্জি, সময়ে সময়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের আকৃতির খুব মিল থাকে, এ বোধহয় আপনি জানেন?

প্রিয়লালের এ প্রশ্নের গতি কোন দিকে যাবে, তা' বুঝ্‌তে পেরে সন্ধ্যা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল; বল্‌লে, "শুনেছি, থাকে।"

প্রিয়লাল বললে, "সত্যিই থাকে। আমার একটি আত্মীয়ার সঙ্গে আপনার আকৃতির এমন অদ্ভুত মিল আছে যে, মৃত্যু যদি সে রকম মনে করবার পক্ষে বাধা না হোত তা হ'লে হয়ত মনে করতাম আপনিই তিনি।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "মৃত্যু বাধা কেন?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "মৃত্যু বাধা এই জন্যে যে, আমি যাঁর কথা মনে করছি বছর চারেক হ'ল তাঁর ইহলোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার বিস্ময়েব অবধি রইল না। দ্বিধাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "মারা গেছেন তিনি? কোথায়, কেমন করে মারা যান বল্‌তে আপত্তি আছে কি?"

একটু ইতস্ততঃ করে প্রিয়লাল বল্‌লে, "না, আপত্তি আর কি থাক্‌তে পারে। কাশীতে তাঁর একজন আত্মীয়ের কাছে তিনি ছিলেন, সেইখানে কলেরা হয়ে মারা যান।"

সন্ধ্যা বুঝতে পারলে বিশেষ কোনো অভীষ্ট সাধনের জন্য কেউ প্রিয়লালকে তার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল, এবং এখনো প্রিয়লাল জানে যে সন্ধ্যা জীবিত নেই। একথা জান্‌তে পেরে সে মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

"মিষ্টার চৌধুরী?"

"আজ্ঞে?"

"আপনাকে এখন চা দোবো কি? ফ্লাস্কে গরম চা আছে।"

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "এখন থাক, কিউলে মিষ্টার মুখার্জ্জি এলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে অখন।"

কিন্তু আধ ঘণ্টাটাক পরে গাড়ি যখন কিউল ষ্টেশনে পৌছল তখন সহসা এমন একটা গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হ'ল যার জন্য চা খাওয়ার কথা কারও মুহূর্ত্তের জন্য মনেও পড়ল না, সমাগত বিপদের ঘন ছায়াপাতে সকলের মন তমসাবৃত হয়ে গেল।

সন্ধ্যাদের গাড়ির সামনে উপস্থিত হ'য়ে বিশুষ্ক মুখে প্রমথ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ হয়েচে উষা!"

সন্ত্রস্ত হয়ে উদ্বিগ্নমুখে সন্ধ্যা বললে, "কি হয়েচে!"

"সুরেশের কলেরা হয়েছে।"

"ওমা, সে কি কথা!"

"ঝাঝাতেই রোগের সূত্রপাত হয়। ওদের পাড়ায় কলেরা হচ্ছিল, তুবার দাস্ত হ'তেই ও ভয় পেয়ে মুঙ্গেরের জন্যে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রোগ এত বেড়ে গেছে যে সুরেশ বাঁচবে ব'লে আমার ভরসা হয় না।

এরই মধ্যে নাড়ী ছিঁড়ে এসেছে, গলা ভেঙে গেছে। কুলির জিম্মায় প্লাটফর্ম্মের একটা লুকোনো জায়গায় তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি, রেলের লোক জানতে পারলে আর গাড়ীতে উঠতে দেবে না। কোনো রকমে এখন মুঙ্গেরে ওকে পৌছে দিতে পারলে বুঝি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তুমি ওঁর সঙ্গে যাবে না-কি?"

"তা না গেলে আর কে যাবে বল? আর কি কেউ আছে?"

"না, তা কিছুতে হবে না, তুমি যেতে পাবে না। অন্য কোনো ব্যবস্থা কর।"

ভৎর্সনার সুরে প্রমথ বললে, "ছিঃ উষা! এ কি কথা বলছ! জীবনটা তুচ্ছ নয় বটে, কিন্তু এত বড়ও নয় যে, এই বিপদে সুরেশকে পরিত্যাগ করতে পারব।"

"মুঙ্গেরের গাড়িতে তুলে দিলে উনি-যেতে পারবেন না?"

"ওর অবস্থা দেখলে এ কথা আর জিজ্ঞাসা করতে না। ও কি পুরোপুরি বেঁচে আছে, এখন সে আধ-মরা মানুষ! হয়ত' মুঙ্গের পর্য্যন্ত পৌছতেও পারবে না। হাত জোড় ক'রে আমার মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে যখন বললে, "ভাই প্রমথ, মুঙ্গেরে গিয়ে অন্ততঃ যাতে স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সামনে মরতে পারি দয়া করে এইটুকু করে দাও' তখন বুকখানা যেন ফেটে গেল।"

প্রমথর চক্ষু সজল হয়ে এলো, সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখটা মুছে ফেললে।

সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তাড়াতাড়ি জিনিষ-পত্তর নামাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

চক্ষু বিস্ফারিত করে প্রমথ বললে, "কি বলছ উষা? তুমি আমার সঙ্গে যাবে? তাতে সুবিধে ত কিছুই হবে না, অত্যন্ত অসুবিধেই হবে। ছেলেমানুষি করোনা, ও কিছুতে হতে পারে না।" তারপর প্রিয়লালের দিকে তাকিয়ে বললে, "মিষ্টার চৌধুরী, এ বিপদে আপনার কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া দরকার, আশা করি তা' নিশ্চয় পাব। উষার সঙ্গে আপনি লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যাবেন এবং আমি না ফেরা পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বললে, "এ আমি নিশ্চয়ই করব; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

প্রমথ বললে, "আমার জন্যে ভেবো না উষা, আমি সাবধানে থাকব। পরশু কোন সময় আমি লক্ষ্ণৌ পৌছব। আমার না যাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই মিষ্টার চৌধুরীকে ছেড়ো না।"

গাড়ীর সামনে এসে মাধব দাঁড়িয়ে ছিল, সন্ধ্যা বললে, "মাধব, শীগগীর ভেতরে এসো।" মাধব ভিতরে এলে তাড়াতাড়ি একটা সুটকেসে কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিষ ভরে দিয়ে মাধবকে বললে, "মাধব, তুমি বাবুর সঙ্গে বরাবর থাকবে।"

প্রমথ বললে; "আঃ, মাধব আবার কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "না, নিশ্চয়ই মাধব তোমার সঙ্গে যাবে। মাধবের মত একজন লোক তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার সুবিধেই হ'বে, অসুবিধে হবে না।"

প্রমথ আর কোন আপত্তি করলে না। গাড়ীর ঘণ্টা পড়েছিল, মাধব তাড়াতাড়ি নেবে গেল। সন্ধ্যার টিকিটটা প্রিয়লালের হাতে দিয়ে প্রমথ বললে, "যা বললাম, মনে রেখো প্রিয়লাল। আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত চলে যেয়ো না ভাই।"

বিপদের চরম মুহূর্ত্তে এই আকস্মিক আত্মীয়তার সম্বোধনে হর্ষপ্লুত হয়ে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রমথর হস্ত ধারণ করে প্রিয়লাল বললে, "নিশ্চয় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

গার্ড ছেড়ে দিলে। যতক্ষণ প্রমথকে দেখা গেল সন্ধ্যা ও প্রিয়লাল জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। অদৃশ্য হ'লে মুখ ভিতরে করে নিয়ে তারা সোজা হয়ে বসল।

প্রিয়লাল বললে, "মিসেস মুখার্জ্জি, আপনার স্বামী একজন উদার ব্যক্তি তা পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এত মহৎ তা জানতাম না।"

সন্ধ্যা একটু পিছন ফিরে বসে ছিল, কোন উত্তর দিলে না; কিন্তু তার পৃষ্ঠের মৃদু কম্পন দেখে প্রিয়লালের মনে হ'ল সে হয়ত নির্গমোন্মত্ত রোদনকেই সামলাবার চেষ্টা করছে। সুতরাং আর কিছু বললে না।

গাড়ি তখন লক্ষীসরাইয়ের পুলের উপর দিয়ে মহা কলরব করতে করতে চলেছিল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শিবপুর শিল্প-প্রদর্শনী

গত জানুয়ারী (১৯৩৬) মাসের ২৬ শে তারিখে হিন্দুস্থান সঙ্ঘের উদ্যোগে শিবপুর সাধারণ লাইব্রেরী হলে একটি চিত্র এবং কারুশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়, এবং তৎপরে এক সপ্তাহ কাল সাধারণের দর্শনের জন্য প্রদর্শনীটি খোলা থাকে। এই প্রদর্শনীটি সঙ্ঘের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী।

যে-কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জনের জন্য তদ্বিষয়ে শিক্ষানবিসী যে কত প্রয়োজনীয় বস্তু তা এই একবৎসর বয়ক্রমের শিশু প্রদর্শনীর আয়তনের বহর দেখে বোঝা গিয়েছিল। এই প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনী সেন এবং তাঁর শিল্পী বন্ধু কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশ কলিকাতা একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনীর গঠন ব্যাপারে প্রতিবৎসর প্রভূত পরিশ্রম এবং কার্য্যশীলতার দ্বারা যে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন, তারই ফলে এই অনুষ্ঠানটি এত অল্পদিনের মধ্যে এমন সফলতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

প্রদর্শনীটি নামে চিত্র এবং কারুশিল্প বিষয়ক হ'লেও অন্যান্য বিভাগের তুলনায় চিত্র বিভাগটী এত সুন্দর এবং বৃহৎ হয়েছিল যে, বস্তুতঃ প্রদর্শনীটিকে চিত্র প্রদর্শনী বলাই সঙ্গত। অপরাপর বিভাগগুলি অধিকাংশ স্থলেই অপরিপুষ্ট এবং কোনো কোনো স্থলে অসগোত্র।

কয়েকটি খ্যাতনামা চিত্রকরের কয়েকখানি চিত্র ভিন্ন প্রদর্শিত সমস্ত চিত্রগুলিই নবীন চিত্রকরদের অঙ্কিত, তন্মধ্যে অধিকাংশই অখ্যাত এবং অজ্ঞাতনামা। সুতরাং পুরাতনের অনুবর্ত্তী একদল উৎসাহশীল নবীন চিত্রশিল্পী যে গ'ড়ে উঠেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কতকটা পরিচয় লাভ করে সুখী হলাম। আরও সুখী হলাম এই দেখে যে, তাঁরা শুধু বয়সেই নবীন নন, তাঁদের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই একটা নবীনতার সাহস এবং আনন্দ সুপরিস্ফুট—; অর্থাৎ, গতানুগতিকতার একনিষ্ঠ ধারায় আবদ্ধ না থেকে তাঁরা বক্তব্য এবং ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে যত্নশীল।

উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত কানাই ভড় কর্তৃক অঙ্কিত—এই সংখ্যায় প্রকাশিত রঙিন ছবি "মাটকোঠার" উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ছবিটীতে, এবং উক্ত শিল্পীর অঙ্কিত আরও কয়েকটি ছবিতে এমন একটি স্তিমিত আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল যা সত্যই চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করে।

শ্রীযুক্ত অবনী সেন অঙ্কিত "কর্দ্দমবিলাস" এবং "গোযান" ছবি দুটি অঙ্কন-পদ্ধতির সরলতা এবং অবলীলায় সমৃদ্ধ। মনে হয় শিল্পী তাঁর শক্তির সামান্য মাত্র অংশ প্রয়োগ করে ছবি দুটীতে এমন সুন্দর অনায়াসশীলতার ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলেছেন। উক্ত শিল্পীর অঙ্কিত "মুখাবয়ব" চিত্রটি বলিষ্ঠ বার্দ্ধক্যের একটি প্রশংসনীয় ষ্টাডি। পরিশ্রান্ত দৃষ্টির ভিতর অলসতার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশ অঙ্কিত "বস্তি" নামক চিত্রের সংযোজন (Composition) এবং "মুখাবয়ব" চিত্রের রেখা ও লেপের লীলা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

শ্রীযুক্ত ইন্দু রায়ের "পল্লীগ্রাম", শ্রীযুক্ত দিলীপের "বাঁশের পুল" শ্রীযুক্ত জাইনুলের "নৌবৃন্দ" এবং তটিনী মুখোপাধ্যায়ের "কুটীর" প্রায় একই পদ্ধতির ছবি এবং প্রত্যেকটিই প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত "গোবৎস" রেখা চিত্রের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। গো মাতা এবং গোবৎসগণের ভঙ্গী বেশ সজীব এবং স্বাভাবিক হয়েছে।

শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়ের "কাঠুরিয়া" এবং শ্রীযুক্ত হরিধন দত্তের "পাকশালা" ছবি দুটিও উপভোগ্য। শেষোক্ত ছবিতে রন্ধনকারিকার দক্ষিণ হস্ত রন্ধনে ব্যস্ত এবং বাম হস্ত শিশু-বালককে শাসনে রাখতে আবদ্ধ—একটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

এ প্রবন্ধে উল্লিখিত চিত্রগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি ছবি আমাদের মনোযোগ এবং প্রশংসা উদ্রিক্ত করেছিল, তন্মধ্যে কতকগুলির প্রতিলিপি প্রকাশিত হ'ল।

এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণকে তাঁদের উদ্যম এবং সাফল্য লাভের জন্য আমরা অভিনন্দিত করছি।

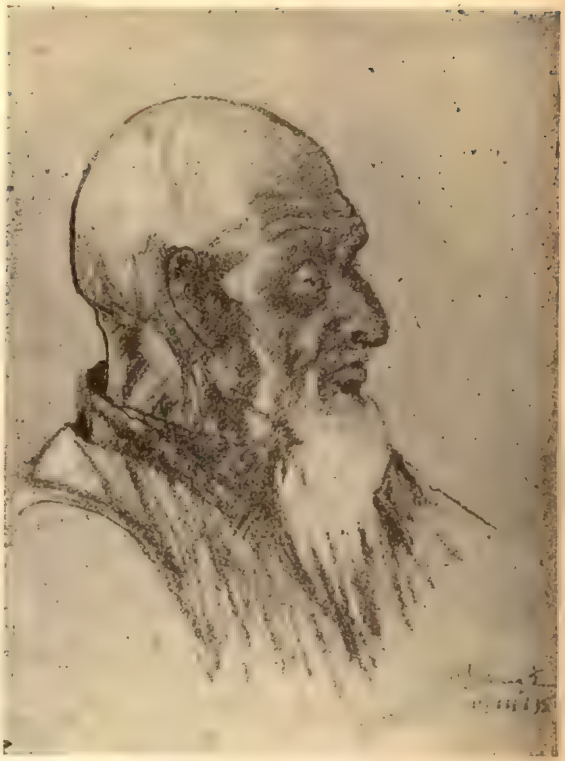

মুখাবয়ব

শ্রীঅবনী সেন

কর্দ্দম বিলাস শ্রীঅবনী সেন

মুখাবয়ব

শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

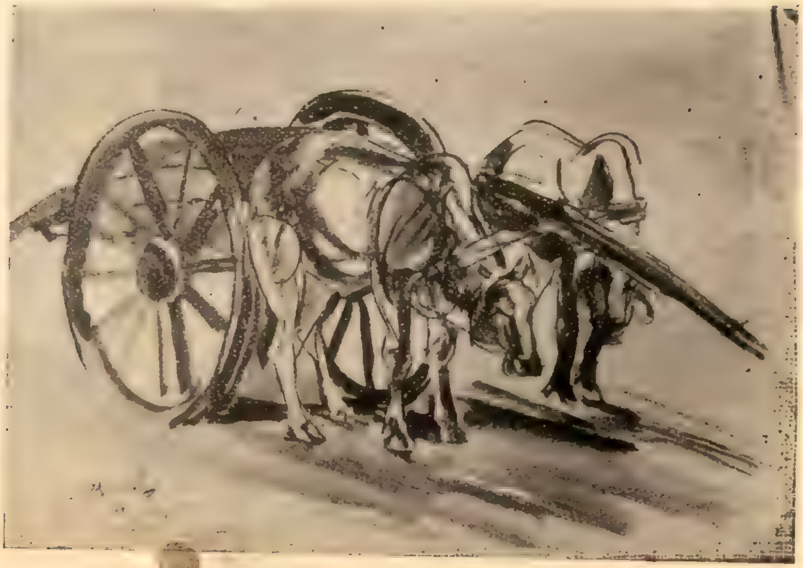

গোযান শ্রীঅবনী সেন

বস্তি শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

পল্লীগ্রাম শ্রীইন্দু রায়

নৌশ্রেণী   শ্রীযুক্ত জইনুল

বাঁশের পুল   শ্রীযুক্ত দিলীপ

গোবৎস শ্রীবঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়

কুটীর শ্রীতটিনী মুখোপাধ্যায়

কাঠুরিয়া শ্রীসুবোধ রায়

পাকশালা শ্রীহরিধন দত্ত

এই প্রবন্ধে প্রকাশিত সমস্ত চিত্রগুলির ফটোগ্রাফ কলিকাতার সুবিখ্যাত আলোকচিত্র-ব্যবসায়ী ১৫৭ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের ফটোসোসাইটি কর্ত্তৃক গৃহীত।

বিচিত্রা সম্পাদক

লা সিবা

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপেই কলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। কলার ব্যবসায়ের জন্য সে সব দেশ টিকিয়া আছে এবং দেশের সমস্ত মূলধন ও পরিশ্রমের বারো আনা অংশ কদলী উৎপাদন ও রপ্তানী কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারীর নিম্নলিখিত বিবরণটী হইতে আমরা ইহার একটি সুন্দর ছবি পাই—

উষার অরুণ রাগ পূর্ব্বাকাশে সবে দেখা দিয়াছে।

কলা বহন করে রেলওয়েতে নিয়ে যাওয়া হইতেছে

আমরা হন্দুরাস দ্বীপের উপকূল বাহিয়া লা সিবা বন্দরের দিকে চলিয়াছি।

উপকূল ভাগ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং বালুময়। তার পিছনে উচ্চ পর্ব্বতমালা, আকাশের রং তখনও নীল হয় নাই, কিন্তু পর্ব্বতের মাথাগুলা রাঙা হইয়া আসিল।

একটু পরেই সূর্য্য উঠিল, এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ও সমুদ্রের রং যেন কোন ইন্দ্রজাল দণ্ডের স্পর্শে বেমালুম বদলাইয়া গেল। আকাশ হইল ঘন নীল, সমুদ্রও ঘন নীল—উপকূলে যা এতক্ষণ ছিল কৃষ্ণবর্ণ জমাট অন্ধকার, এইবার তাহা হইল ঘন সবুজ অরণ্যানী। সকালের কুয়াসাও কাটিয়া গেল।

কলার চাষে জলসেচন করা হইতেছে

উপকূলের বনের রং আরও সবুজ হইল—। কেবল মাঝে মাঝে সাদা বনফুলের রাশি যেখানে বনের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে, বনের সেই অংশ ছাড়া।

আমাদের চারিপাশে কিন্তু কোনো শব্দ নাই, কাহাকেও নড়িতে চড়িতে দেখা যায় না। এত সকাল, যে বোধ হয় শয্যাত্যাগ করিয়া অনেকেই ওঠে নাই।

উপকূলের এত কাছ ঘেঁসিয়া আমরা চলিয়াছি যেন জঙ্গলের গাছপালার পাতা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। এমন সময় জাহাজের লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'লা সিবা'।

দূরে দিগন্তের কোলে এক পোঁচ কালো কালির মত কি একটা ব্যাপার দেখা যাইতেছিল বটে। উপকূলে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল ; সবুজ নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে পাতায় ছাওয়া ছোট ছোট কুটীর। দু-একটা কুটীরের ভিতর হইতে সরু ধোঁয়ার রেখা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে।

সম্মুখে ক্রমে একটা কাঠ ও লোহার তৈরী জেটি ও জেটিতে বসানো বড় বড় মাল উঠাইবার লৌহযন্ত্র স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে লাগিল। উপকূলের এই বন্য সৌন্দর্য্যের পাশে হঠাৎ এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-সভ্যতার প্রকৃষ্ট চিহ্নগুলি যেন বড় বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু ঠেকিল। সুখের বিষয় এই যে তাহারা জঙ্গলকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে পারে নাই, জঙ্গলই তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছে। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে এক সারি সাদা রংয়ের ঘর বাড়ী, বোধ হয় বা গুদাম কিংবা জেটি আপিস। নারিকেল বনের নীচে কালো কয়লার স্তূপ।

ইহাদের পিছনে কিন্তু আর কিছু দেখা যায় না, উপকূলের অপেক্ষাকৃত নিম্ন শৈলরাজির পিছনে খুব উঁচু পাহাড়-পর্ব্বত, আর কি ভয়ানক জঙ্গল সেই সব

স্প্যানীশ্ হোণ্ডুরাসে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি গ্রাম

পর্ব্বতের সানুদেশে! দ্বীপের আভ্যন্তরীণ কোনো দৃশ্য কৌতুহলী বৈদেশিক ভ্রমণকারীর চোখে না পড়ে, সেজন্য প্রকৃতি যেন সবুজ যবনিকার আড়ালে ও-দিকটা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উঃ কি ভীষণ গুমট গরম এই সকাল বেলাতেই!

জাহাজে চালান দেওয়ার জন্য কলার কাঁধি কাটা হইতেছে

বেলা এখনও আটটা হয় নাই, কিন্তু এরই মধ্যে রাস্তায় চলে কার সাধ্য! উষ্ণদেশের প্রচুর সূর্য্যালোক আমাদের পক্ষে একদিকে যেমন অতি লোভনীয়, এই অসহ্য উত্তাপ তেমনি কষ্টদায়ক। পথের ধারে একটা সৈন্যাবাস, কতকগুলি ছন্নছাড়া মূর্ত্তির সৈন্য তার সামনে প্রাভাতিক কুচকাওয়াজের চেষ্টায় আছে। চারি ধারেই মাটীর বাড়ী। খড়ে বা নারিকেল পাতায় ছাওয়া। ময়লা কাপড় পরা ছেলে মেয়ে বাড়ীর সামনে রাস্তায় ধূলায় খেলা করিতেছে। লাল টালির ছাত-ওয়ালা বাড়ীগুলি বোধ হয় গবর্ণমেন্টের, কারণ এসব অঞ্চলে অনবরত বিদ্রোহের ফলে তাদের দেওয়ালগুলির গায়ে ঝাঁঝরা হইয়া আছে। যেন নদীর পাড়ে পাখীর বাসার গর্ত্ত।

এই হইল 'লা সিবা'র সাধারণ অবস্থা। এই রাজনৈতিক অবস্থায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব বেশী উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। কলার চাষ না থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দাঁড়াইত।

যে কয়েকটি আমেরিকান ও ইউ-রোপীয় ধনী এখানে মূলধন ফেলিয়াছে, বর্ত্তমান 'লা সিবা' তাহাদেরই সৃষ্টি। তাহাদেরই অর্থে ও যত্নে এই জঙ্গলের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে, কংক্রিটের ঘর বাড়ী, গুদাম ও জেটি তৈরী হইয়াছে, রাস্তার উপর পিচ ঢালা হইয়াছে। তাহাদেরই অর্থে এখানে ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, ক্লাবে টেনিস খেলা চলে, এবং বড় বড় তাল জাতীয় গাছের তলায় প্রস্ফুটিত বুগেনভিলিয়া ফুলের আড়ালে কাঠের সুদৃশ্য বাংলো-গুলি তাহাদেরই।

'লা সিবা'র গৌরব করিবার কিছুই নাই, না আছে ইহার গৌরবময় অতীত, না আছে এখানে কোনো প্রাচীন গির্জ্জা, কি রাজপ্রাসাদ। কদলীই এখানকার সকল ঐশ্বর্য্য ও সকল আধুনিকতার মূলে। সুতরাং এখানকার কদলীক্ষেত্র-গুলি দেখিবার ইচ্ছা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

জেটির সঙ্গেই ছোট রেল লাইন। এই রেল লাইন বিভিন্ন কলা বাগানে গিয়াছে।

আমরা ট্রেণে উঠিয়া কলাবাগান দেখিতে চলিলাম।

দেখিলাম দেশের অভ্যন্তরে সমগ্র ক্ষেত্র, সমগ্র উপত্যক, নদীতীর জুড়িয়া শুধুই কলাবাগান। না দেখিলে লা সিবার কলা বাগানের বিশালত্ব বুঝিবার উপায় নাই। আমাদের ধারণা ছিল না যে কলাবাগান এত বিস্তৃত, এত বিরাট হইতে পারে।

ছোট রেল লাইন বাহিয়া আমাদের ট্রেণ অগ্রসর হইতে লাগিল। রেল লাইনের ধারে নানা জাতীয় কলার বাগান। কোনো বাগানে কলাগাছ দুই তিন হাতের বেশী লম্বা নয়, কোনো বাগান হয়তো জঙ্গল কাটিয়া সম্প্রতি তৈরী করা হইয়াছে, কোনো বাগানে প্রতিগাছে কলায় কাঁদি পড়িয়াছে, মাইলের পর মাইল শুধুই এই দৃশ্য। কোনো বাগানে প্রত্যেক গাছেই মোচা ঝুলিতেছে।

কলার কাঁদি গাছে পাকানোর নিয়ম নাই। কাঁদি পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে সব বাগান, সেখানে কৃষ্ণকায় স্ত্রী ও পুরুষ মজুরেরা অস্ত্র দিয়া কাঁদি কাটিয়া গাছ হইতে নামাইতেছে এবং অতি সন্তর্পণের সহিত রেলপথের পার্শ্বস্থ বড় বড় কলার পাতায় ছাওয়া গুদামের মধ্যে রাখিতেছে। মাঝে মাঝে আমাদের ট্রেণ পাশের লাইনে রাখা হইতেছিল, বন্দরগামী কলা বোঝাই মাল-গাড়ীকে রাস্তা দিবার জন্য।

অনেক জায়গায় নূতন কলাবাগানের জমি তৈরী করিবার জন্য জঙ্গল আগুন লাগাইয়া পরিষ্কার করা হইতেছে। বহুদূরব্যাপী দগ্ধ ও অর্দ্ধদগ্ধ গাছের গুঁড়ির মধ্যে দু একটা বৃহৎ বনস্পতি দাঁড়াইয়া আছে, স্বভাবতঃ তাহাদের মূল্যবান কাঠের জন্য তাহাদিগকে নির্ম্মূল করা হয় নাই।

দু একটা কলার বাগান পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা গেল। চার পাঁচ শত একার জুড়িয়া এক একটা কলার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে। এ সব স্থানের মাটী এমন যে কিছুদিন পড়িয়া থাকিলেই আগাছায় জঙ্গলে ভরিয়া যায়। পরিত্যক্ত বাগানগুলিতে কলার ঝাড়ের তলায় নীচু আগাছায় জঙ্গল এত ঘন যে কাটিয়া পরিষ্কার না করিলে তাহাদের মধ্য দিয়া যাতায়াত অসম্ভব।

কিন্তু কলার বাগান যত বড়ই হউক, লা সিবার জঙ্গলকে ইহা তাড়াইতে পারে নাই। জঙ্গল এখানে নিজের প্রভুত্ব এখনও হারায় নাই। রেল লাইনের দূরে নিকটে ঘন নিস্তব্ধ জঙ্গলের গাছপালা যেন সব সময় মানুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

জঙ্গলের এই প্রভুত্ব আরও বাড়িয়াছে এইজন্য, যে, এখানে মানুষের বাস খুবই কম। এখনও বর্ষাকাল সুরু হয় নাই, নদীনালা জলহীন। একটা পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া জনৈক দেশী কুলীর সর্দ্দার বাগান পরিদর্শনে চলিয়াছে। আরও অনেক দূর গেলে তবে দেখা গেল হয়তো জনৈক ইণ্ডিয়ান্ বালক একটা গাধা হাঁকাইয়া কোথায়

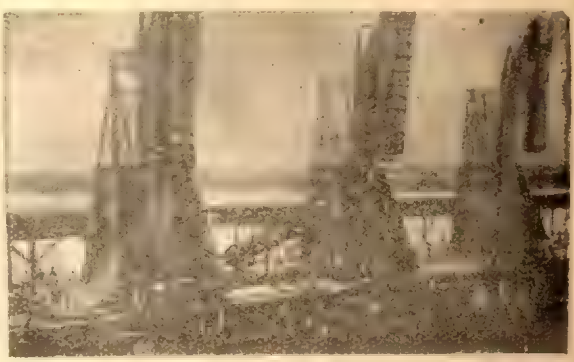

জেটির উপর কদলী বহনকারী বিষম বড় বড় যন্ত্র

যাইতেছে। তিন চার মাইলের মধ্যে এই দুটী মানুষ দেখা গেল, মধ্যে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল।

কলাবাগান যেখানে আছে সেখানে, জঙ্গল দূরে সরিয়া গিয়াছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। এদেশে জঙ্গলকে সম্পূর্ণরূপে হঠানো বড় সোজা কথা নয়।

ট্রেণ ছোট একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইল। সম্ভবতঃ এঞ্জিনে জল লইবে।

ষ্টেশনের কাছে খানকতক খড়ের ঘর। ঘরের সামনে গুটীকতক কৃষ্ণকায় বালক বালিকা ধূলার উপর বসিয়া খেলা করিতেছিল। খেলা ফেলিয়া তাহারা গাড়ী দেখিতে দৌড়িয়া আসিল এবং আমাদের দেখিয়া কৌতুহলের সহিত আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

কলারবাগানের শ্রমিক ছাড়া এখানে অন্য মানুষের মধ্যে এক ইহাদেরই যা দেখিলাম। এঞ্জিন জল লওয়া শেষ করিয়া আবার চলিল। এবার গাড়ী যেন নীচের দিকে

নামিতেছে। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। রেলপথের দুধারে এখানে ভীষণ জঙ্গল। লম্বা লম্বা ডালপালা প্রায় চোখে মুখে আসিয়া ঠেকে। আমরা জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম, জানালায় কাচের গায়ে ডালপালা ঠেকিয়া খড় খড় শব্দ করিতে লাগিল।

জঙ্গল ছাড়াইয়া আবার একটা খুব বড় কলা বাগান। তার পরেই নদী।

নদীর ধারে জেটির পাশে আসিয়া ট্রেণ দাঁড়াইলে আমরা নামিয়া ছোট একটা বোটে চড়িলাম। জেটির কাছে কলা রাখিবার অনেকগুলি গুদাম। জন কয়েক ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো কুলী জেটিতে কাজ করিতেছে। আমাদের তো দেখিয়া মনে হইল এখানে কিছুই কাজ করিবার নাই, উহারা শুধু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোদ পোহাইতেছে। এ যেন ঘুমের দেশ। এই ভীষণ জঙ্গলে এখানে মানুষকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে।

নদীর উজানে আমরা চলিয়াছি। আবার সেই নিস্তব্ধতা, আবার সেই জঙ্গল। এবার যেন আরও বেশী। নদীর দুই তীরে এবার আর মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই। শুধুই জঙ্গল। বড় বড় গাছ জলের ধার পর্য্যন্ত গজাইয়াছে। বড় বড় লতা এডালে ওডালে জড়াজড়ি করিয়া বন আরও দুষ্প্রবেশ্য করিয়া তুলিয়াছে। বনে দু একটা বাঁদর ছাড়া অন্য জানোয়ার দেখা গেল না।

পরদিন আমরা সমুদ্রের ধারে ফিরিলাম।

চার পাঁচখানা কলা বোঝাই মালগাড়ী ইতিমধ্যে জেটির ধারে আসিয়া লাগিয়াছে। অনেকগুলি জাহাজও কলার কাঁদির বোঝা তুলিবার জন্য প্রস্তুত লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একখানা ট্রেণ আসিয়া জেটির সাইডিং লাইনে জাহাজের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দাঁড়াইল। নিগ্রো কুলীরা গাড়ীর দরজা খুলিতেই দেখা গেল স্তূপীকৃত কলার কাঁদি থাকে থাকে মাল গাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত ঠাসা রহিয়াছে। কুলীর দল ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে কলা নামাইতে লাগিল। মাল উঠাইবার কলগুলি ঘড় ঘড় শব্দে জেটির ধার হইতে মাল তুলিয়া জাহাজে ফেলিতে লাগিল। চারিধারে এবার দেখিলাম খুব ব্যস্ততা, —খুব হৈ চৈ।

কুলীরা সকলেই নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ান, দু একজন তদারক-কারী কর্ম্মচারী দেখিলাম তা শিক্ষিত নিগ্রো। ইহারা জেটির মুখে দাঁড়াইয়া নোট বইতে কলার কাঁদির হিসাব রাখিতেছে। মাঝে মাঝে ইহাদের মধ্যে কেহ হয়তো একটা কলার কাঁদি নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, কলা প কিয়াছে কিনা। কাঁদিতে পাকা কলা থাকিতে দিবার নিয়ম নাই। কারণ তাহা হইলে অন্য অন্য কলার ছড়াগুলিও শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া যাইবে। তাই ইহাদের কাজ হইতেছে পাকা কলা বাহির করিয়া সেগুলি কাঁদি হইতে ছিড়িয়া বাদ দেওয়া।

চল্লিশ হাজার কলার কাঁদি বোঝাই হইয়া গেলে আমাদের জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া বাহিরের মুক্ত সমুদ্রের অভিমুখে চলিল

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

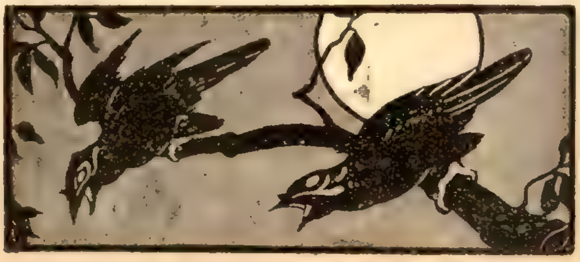

ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গোস্বামী

দুর্ব্বল এবং ভীরু ব'লে বাঙালী জাতির একটা দুর্নাম বহু-কাল হ'তে প্রচলিত আছে। সাহসিকতায় বাঙালী জাতি

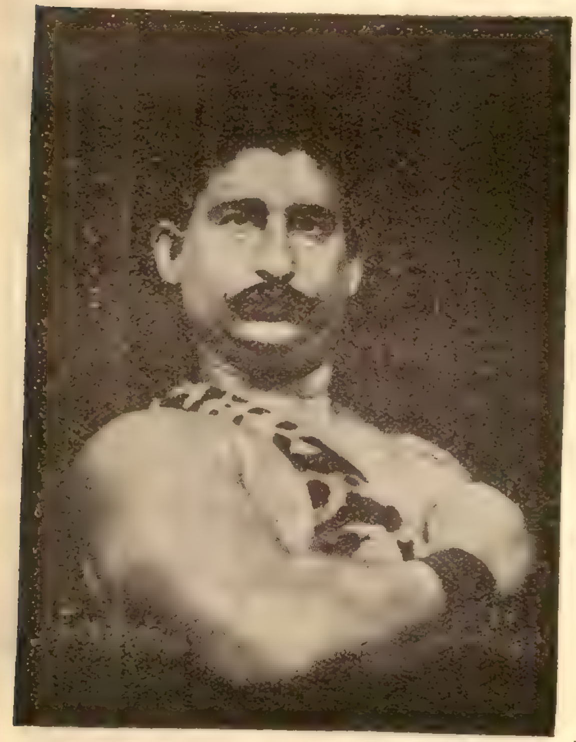

ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গোস্বামী

যে অন্যান্য জাতির চেয়ে অপকৃষ্ট তা স্বীকার করিনে, কিন্তু শারীরিক শক্তিমত্তায় বাঙালী যে সাধারণতঃ দুর্ব্বল জাতি সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই শক্তিহীনতার জন্য বাঙালী অলস, উদ্যমহীন, পরিশ্রমবিমুখ;—সেই জন্য অপরাপর শক্তিশালী কর্ম্মঠ জাতির সহিত পরিশ্রমসাপেক্ষ কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় সে হাটে ঘাটে মাঠে ব্যবসা বাণিজ্যে সর্ব্বত্র ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। Health is Wealth বলে ইংরাজিতে একটি যে বহুকথিত প্রবচন আছে, বাঙালীরা তার সত্যতা সপ্রমাণ করেছে বিপরীতটার সত্যতা প্রমাণিত করে।

এই দুরবস্থা হতে মুক্তির একমাত্র উপায় ব্যায়ামচর্চ্চা এবং স্বাস্থ্য-নিয়মসমূহ পালন। সম্প্রতি কিছুদিন হ'তে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আকারে মনোযোগ দেখা দিয়েছে, এবং তজ্জনিত সুফলও পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করেছে। বিখ্যাত শারীর-শক্তিবীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর গোস্বামী দুর্ব্বল বাঙালী জাতির মধ্যে স্বাস্থ্য এবং শক্তি সঞ্চারিত করবার জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন তা পরিদর্শন করে আমরা অতিশয় আনন্দিত এবং আশান্বিত হয়েছি। এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য তিনি সমস্ত বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।

শ্যামসুন্দরের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু প্রামাণিক

ডাক্তার গোস্বামীর শক্তিসাধনার প্রতিষ্ঠান "গোস্বামী ইন্‌ষ্টিটিউটে"র বিশেষত্ব এই যে তিনি তথায় শরীর সবল ও সুগঠিত করবার জন্য শারীরবিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ নিয়ম এবং কৌশলগুলি নির্ব্বাচিত এবং প্রযুক্ত করেই ক্ষান্ত হন নি, পরন্তু তৎসহিত ভারতীয় যোগসাধনার কিঞ্চিৎ ক্রিয়া-কৌশল সংযুক্ত

শ্যামসুন্দরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিতাইসুন্দর গোস্বামী

করে তাঁর পদ্ধতিকে প্রভূতভাবে শক্তিশালী করে তুলেছেন। শক্তি-সাধনার এই উন্নত পদ্ধতি হয়ত সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবও নয় আবশ্যকও নয়, সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হয়ত ডাক্তার গোস্বামীর সাধারণ পদ্ধতিও আছে,—কিন্তু যাঁরা শক্তিসাধনাকে জীবনের প্রধান অভিব্যক্তি অথবা অবলম্বন করতে বাসনা করেন তাঁদের পক্ষে ডাক্তার গোস্বামীর এই উন্নত পদ্ধতি যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত ডাক্তার গোস্বামীর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু প্রামাণিকের মাংসপেশী পরিচালনা প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক ব্যায়ামক্রিয়া এবং হঠযোগের সাহায্যে মূত্র এবং মলদ্বারের দ্বারা শরীর মধ্যে দুগ্ধাদি তরল পদার্থের ইচ্ছামত প্রবেশন এবং নিঃসারণ দেখলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকবে না। ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দরের প্রবর্ত্তিত এই ব্যায়াম এবং হঠযোগের সমন্বয় গোস্বামী-পদ্ধতির দ্বারা বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই শিক্ষিত হতে পারেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চা করলে শরীরের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী তার প্রমাণ ডাক্তার গোস্বামী এবং তাঁর দুই ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিতাই সুন্দর গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর গোস্বামী। এঁদের বলিষ্ঠ সুগঠিত সুন্দর দেহ দেখলে মনে আনন্দের উদয় হয়।

শ্যামসুন্দরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর গোস্বামী

ডাক্তার গোস্বামী শুধু দুর্ব্বল সহজ শরীরকেই সবল করেন না, পরন্তু রুগ্ন শরীরকেও রোগমুক্ত এবং সবল সুগঠিত করেন। এজন্য তিনি তাঁর ব্যায়াম পদ্ধতির সহিত অধুনা আমেরিকায় বিশেষভাবে প্রচলিত "ন্যাচুরোপ্যাথী" চিকিৎসার সাযুজ্য গ্রহণ করেন। এই "ন্যাচুরোপ্যাথী" চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তার গোস্বামী বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন ব'লে আমেরিকার "ন্যাচুরোপ্যাথিক অ্যাসোসিয়েশন" কর্ত্তৃক তিনি আজীবন সদস্য নির্ব্বাচিত হয়ে বিশেষ সম্মানের পদ লাভ করেছেন।

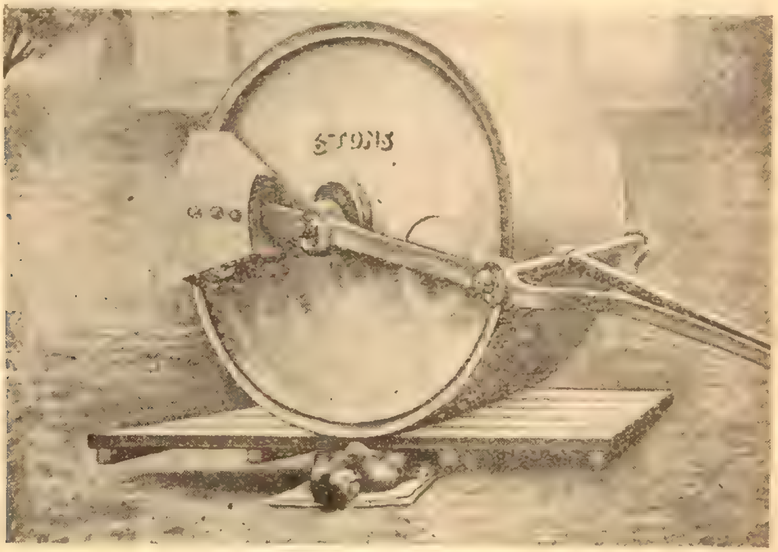

শ্যামসুন্দরের বক্ষের উপর ৬টন ওজনের (প্রায় ১৬২ মণ) একটি লোহার রোলার স্থাপন করা হয়েছে

দৈহিক শক্তি এবং চিকিৎসানৈপুণ্যের পরিচয়ের দ্বারা শ্রীযুক্ত গোস্বামী ভারতবর্ষের বহু স্থানে বিশিষ্ট সমাজে এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে বিশেষ যশ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। হায়দ্রাবাদের নবাব সালর জং বাহাদুর, নেপালের মহারাজা, পিঠাপুরমের মহারাজা, রামনাদের রাজা প্রভৃতি তাঁর কাছে শক্তি শিক্ষা লাভ করে তাঁর ক্রিয়া-কৌশলে পরিতুষ্ট হয়ে তাঁকে মূল্যবান উপঢৌকনে পুরস্কৃত করেছেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামীকে নেপালের মহারাজা স্বর্ণখচিত কুকরী এবং স্বর্ণপদক, পিঠাপুরমের মহারাজা হীরকখচিত পদক এবং কাশ্মীর মহারাজা ও হায়দ্রাবাদের নবাব বাহাদুর বহুমূল্য স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

ভারতবর্ষের যোগবিদ্যার প্রচারের জন্য, স্বীয় প্রবর্ত্তিত "গোস্বামী পদ্ধতির" পরীক্ষা এবং প্রতিষ্ঠাপনের জন্য এবং পাশ্চাত্য শক্তিসাধন পদ্ধতির তুলনামূলক বিশেষ পরীক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত গোস্বামী শীঘ্রই তাঁর শিষ্য দীনবন্ধুর সহিত ইউরোপ গমন করবেন। আমরা আশা করি তথায় বিশেষ পরিদর্শন এবং গবেষণার ফলে "গোস্বামী পদ্ধতি" অধিকতর পুষ্ট হবে এবং তদ্দ্বারা হীনবল বাঙ্গালী জাতি সবিশেষ উপকার লাভ করবে।

বিচিত্রা-সম্পাদক

বীতবর্ষণ রাতে

শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত

আজি বরষার বর্ষণহীন রাতে
উদিতা শুক্লা শশী,
মুছিয়া গিয়াছে বাদলধারার সাথে
স্নিগ্ধ সজল কাজল মেঘের মসী।
অজানা অতিথি এলো আজি পথ ভুলি'
জ্যোৎস্নায় ভরি ধরার ধূসর ধূলি,
মৃদুল মলয়ে কদম্বরেণুগুলি
ভূতলে পড়িছে খসি'—
সুন্দর এলো নভ নন্দিত করি,
আকাশে হাসিছে শশী।

বিরহী যক্ষ জাগে বিনিদ্র নিশা
বারতা কাহারে ক'বে ?
নরপতি-পথে আজি হারাবে না দিশা
অভিসারিকার যাত্রা সুগম হবে !

প্রিয়ার কেতকী-সুরভিত কেশপাশে
জ্যোৎস্নার ধারা লীলায়িত হয়ে হাসে,
পদ্মেরে ভুলি ভ্রমর অন্যমনা
কুটজকুসুমে আজিকে তৃপ্ত হবে।
নীপশাখে বাঁধা ঝুলনের দোলাখানি
সফল রাসোৎসবে !

দীপিছে আকাশে মণিদীপ তারকার
দশমীর চাঁদ সাথে,
সমীরে দুলিছে শ্যাম তরু-বীথিকার
পল্লবগুলি আলোক-আশীষ মাথে।
অনিমেষে চাহি' মুক্ত সে বাতায়নে
রাতের প্রহর কেটে যাবে জাগরণে,
মল্লার-মীড় বীণার গুঞ্জরণে
প্রেয়সীর আঁখিপাতে
লভিয়াছে সীমা সারা আকাশের আলো ;
আজি বরষার বীতবর্ষণ রাতে।

———

নব-বর্ষোৎসব *

শ্রীসুশান্তকুমার বসু

ভগিনী ও বন্ধুগণ,

আপনাদের প্রীতির দান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলাম. নিজের অযোগ্যতার কথা ভুলিয়া, আনুষ্ঠানিক বিনয় প্রকাশ করিয়া আপনাদের অমর্য্যাদা করিব না। আমার শ্রদ্ধায় অবনত, প্রীতিতে মুগ্ধ, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের অর্ঘ গ্রহণ করুন। আপনারা যে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে গীতিয়া সারস্বত পরিষদের উল্লেখ করিয়াছেন সেজন্য আমি বিশেষ গৌরব বোধ করিতেছি।

বন্ধুগণ,

মিলনের মধ্য দিয়া, ঐক্যের মধ্য দিয়া, প্রীতির মধ্য দিয়া, বর্দ্ধিত দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়া নববর্ষকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিনের মধ্যে আমরা নূতনকে বরণ করি নাই। কালচক্রের আবর্ত্তনে, হাজার বৎসর ধরিয়া এখানে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া আসিয়াছে; নূতনের ছদ্মবেশ পরিয়া পুরাতন বারবার আমাদের প্রতারিত করিয়াছে। আমাদের কর্ম্মের দ্বারা, উদ্যমের দ্বারা, প্রচেষ্টার দ্বারা, ভবিষ্যৎকে আমরা অনেক দিন সৃষ্টি করি নাই, অনাগতকে সম্ভাবিত করি নাই, নূতনকে বরণ করি নাই। শুধু যে, ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তাহা নহে, অন্যত্র যখন মানুষ অজানার অভিসারে অন্ধকারে পা বাড়াইয়াছে, জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছে, সত্যের সন্ধানে তথ্যের আবিষ্কারে যখন সে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াছে, প্রাণ দিয়া বাঁচিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, ভারতবর্ষ তখন নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রের বিধান খুঁজিয়াছে, দুঃখ বিষাদের অবসানের জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছে। যেদিন এই চলমান মানবচিত্ত হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম, দুঃখ বিপদ জয় করিবার, বিঘ্ন বাধা লঙ্ঘন করিবার, নব নব সমস্যার সম্মুখীন হইবার, ভুল করিবার দুঃখ সহিবার, প্রতিকূল আবেষ্টনের সহিত যুঝিয়া শক্তি অর্জ্জন করিবার, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে দেখিবার, সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তকে মোহমুক্ত করিবার অধিকার হারাইলাম, সেদিন হইতেই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হইল।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনে এই কথাটাই আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে যে, সমগ্র ভাবীকালের প্রতীকরূপে যে ভারতবর্ষের যুবকচিত্তের উপর দাবী লইয়া আসিয়াছে, এই দেশের কোটি কোটি লোককে বিমূঢ়তা হইতে, বুদ্ধির দুর্গতি হইতে, সংশয় হইতে, প্রাচীনত্বের ও বৈশিষ্ট্যের মোহ হইতে উদ্ধার করিবার। বন্দী যৌবনকে মুক্তি দিতে হইবে শাস্ত্রের নিগড় হইতে, বিশ্বাসের দংশন হইতে, প্রাণহীন নির্জ্জীবতার পঙ্কুস্ব হইতে; উদ্ধার করিতে হইবে তাহাকে উদ্যমহীন প্রচেষ্টাহীন শান্তির মৃত্যু হইতে, অনৈক্যের আত্মঘাত হইতে।

কোন নূতন জিনিষের বিরুদ্ধে যখনই কোন যুবককে বলিতে শুনি যে, তাহা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের বিরোধী, অন্য কোন কোন দেশে তাহা সম্ভব হইলেও ভারতবর্ষের অবস্থা ও ইতিহাসের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, তখনই বুঝিতে পারি যে, তরুণ দেহের অভ্যন্তরে সংশয়াকুল জরাজীর্ণ প্রাচীন মন আমাদের অগ্রগতির পথ কি ভাবে রোধ করিয়া আছে। এক দেশের মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, সত্য হইয়াছে, যাহা তাহাকে সুখ সমৃদ্ধি ও শক্তির অধিকারী করিয়াছে, তাহা যে, আমাদিগকেও সুখ সমৃদ্ধির সন্ধান দিতে পারে;

---

* যশোহর 'মিলন মন্দিরে' অনুষ্ঠিত নববর্ষোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ। 'মিলন মন্দির' যশোহরের প্রগতিশীল তরুণদের প্রতিষ্ঠান ইহার পাঠাগার, ব্যায়াম সমিতি, ক্রীড়াদির ব্যবস্থা প্রভৃতি ইহার সদস্যদের উদ্যম এবং প্রাণ ও কর্ম্মশক্তির পরিচায়ক।

সত্যের যে জাতি বা দেশ নাই, বৈশিষ্ট্য যে অতীত ইতিহাসের কথা, গতিশীল বর্ত্তমানকে যে তাহা নিশ্চল অতীতের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে চায়, দেশের তরুণ মন যখন এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, দুর্গতির অবসান হয় নাই, দুঃখের রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর চলিতেছে।

দেশের যাহারা সত্যকারের তরুণ, আজ তাহাদিগকে অবহিত হইতে হইবে যে, নূতনকে বরণ করিয়া লইবার এই যে উদ্যোগ ইহা যেন অনুষ্ঠানেই শেষ হইয়া না যায়, ইহা যেন বিশ্বব্যাপী তারুণ্যের অভিযানের সহিত তাহাদের সংযুক্ত করিতে পারে।

সকল অনুষ্ঠানের ন্যায় আজকার দিনেও আমাদের তরুণদের মনে করিতে হইবে যে, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, ও অশিক্ষায় নিমজ্জিত, অনৈক্যে ও ভেদে খণ্ডীকৃত পরাধীন দেশে জন্মিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হইয়াছে। যে দুরূহ সাধনা ও দুঃসাধ্য প্রচেষ্টার মধ্যে যৌবন তাহার শক্তি অনুভব করিতে পারে, যে বিরামহীন ও ক্লান্তিহীন উদ্যমের মধ্যে যৌবন সার্থক ও সফল হইয়া ওঠে, যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, অপরাজেয় ইচ্ছা ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপে যৌবন তাহার পূর্ণ মহিমায় দীপ্তি পায়, তাহার পক্ষে এমন অনুকূল ক্ষেত্র পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধহয় আজ আর নাই।

বন্ধুগণ, আজ দিন আসিয়াছে, আমাদের বীর্য্যহীন তারুণ্যকে দুর্গতির পঙ্ক হইতে, অপমানের লাঞ্ছনা হইতে, অলসভোগের গ্লানি হইতে, বার্দ্ধক্যের সংশয় হইতে উদ্ধার করিবার। দিন আসিয়াছে, বীর্য্যের সিংহাসনে, পৌরুষের সিংহাসনে, আত্মবিশ্বাস ও মর্য্যাদার সিংহাসনে যৌবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার।

বন্ধুগণ, মনে রাখিও, তোমার দেশের কোটি কোটি মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত, অস্পৃশ্যতা, দাসত্ব ও হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত, নির্ম্মম শোষণে নিঃস্ব, সাম্প্রদায়িক গোড়ামিতে অন্ধ। বন্ধুগণ, ভগিনীগণ, মনে রাখিও তোমার দেশে নারী শৃঙ্খলিত, দাসত্বে লাঞ্ছিত, আলোবাতাসের গতিবিধির অধিকারে বঞ্চিত।

আর বন্ধুগণ, এই উৎসব-বাসরে দাঁড়াইয়া, ক্ষণে ক্ষণে মনে জাগিতেছে, বুঝি এই আনন্দ উপভোগ করিবার অধিকার আমাদের নাই। যে হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থা, অপরকে বঞ্চনা করিয়া নিজের উদরপূর্ত্তির যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা দেশে দেশে মানুষকে পশু করিতেছে, তাহাই আজ আমাদের **মিলন মন্দিরের** আনন্দোৎসবকেও ম্লান করিয়া দিতেছে। রোগরুক্ষ দেহ লইয়া, শিক্ষার অভাব ও ক্ষুধার বেদনা লইয়া তাহারা আমাদের উৎসবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। বন্ধুগণ, কেমন করিয়া ভুলিব যে, তাহাদের কলুষ-বিভৎস মুখ, পাপে ভরা দৃষ্টি, প্রচণ্ড হিংসা, জঘন্য লালসা, অপরাধের ক্রম-বর্দ্ধমান প্রবণতার দায়িত্ব আমাদেরই। যে সর্ব্বহারা নিঃস্বের দল আজ বিষময় পাপের পঙ্কিল আবর্ত্ত তুলিতেছে, আবর্জ্জনার মধ্যে জীর্ণগৃহে, ছিন্নশয্যাপরে, লাখে লাখে জন্মিয়া যাহারা শিক্ষার অভাব অতৃপ্ত ক্ষুধা ও সহস্র কদর্য্যতার মধ্যে বড় হইতেছে, যাহারা আমাদের কল্যাণের যাত্রাপথকে বিঘ্ন-সঙ্কুল করিয়া তুলিতেছে, আজ যদি এই মঙ্গলোৎসবের মধ্যে তাহাদের কথা ভুলিতে না পারিয়া থাকি বন্ধু, তবে আমাকে ক্ষমা করিও।

এ আমার, এ তোমার, এ যে সর্ব্ব মানবের পাপ
দেবতার আলো করি চুরি,
অন্ন রাখি কেড়ে,
শান্তি যায় বেড়ে বেড়ে দিনে দিনে।
যত জন্ম ব্যর্থ করি দেবতার,
যত প্রাণ পুষ্টি বিনা মরে
মানবের যাত্রা পথে
তত জমে সুবিপুল বাধা।

তরুণ বন্ধুগণ, তরুণী ভগিনীগণ, সর্ব্বমানবের এই পাপের বোঝা তোমাদের বহন করিতে হইবে; তোমার বলিষ্ঠ তারুণ্যের দিকে অসহায় জগৎ চাহিয়া আছে। তুমি জাগিয়া ওঠ বীর্য্যে, বিশ্বাসে, পৌরুষে ও দৃঢ়তায়; পরিহার কর সংশয় মোহ ভয়; ঝাড়িয়া ফেল দুর্ব্বলতা ও অবিশ্বাস, নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ কর জড়তাকে জীর্ণতাকে, অভ্যাসের দাসত্বকে। নববর্ষের প্রদীপ্ত সূর্য্য তোমাকে তেজ ও শক্তি দান করুক; জয় হউক তোমাদের, সার্থক হউক নূতন অতিথির অভিনন্দন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

তনুত্যাগে

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

তোমার দুয়ারে যবে হানিলাম কর
তুমি দ্বার খুলিলে না, রহিলে নীরবে।
নিশি ভোর হয়ে এল, জাগিল পূরবে
রবির অরুণ রাগ। দেহলির 'পর
শেষ হল ব্যর্থ মোর বাসর জাগর।
অচিরে অর্গল খুলি' বাহিরিলে যবে
শুধানু,—দুয়ার তব মুক্ত র'বে কবে?
কহিলে,—খুলিবে মোর মরণের পর।

স্বরে তব ছিল না ক ভৎসনার লেশ,
ক্ষমাস্নিগ্ধ প্রেমোজ্জ্বল ঢলঢল আঁখি,
কুণ্ঠাহীন অকপট সে আশ্বাস বাণী।
আমারে মরিতে হবে? তোমার আদেশ
করিলাম শিরোধার্য্য। দেহ পিছে রাখি'
আবার আসিনু যবে নিলে বক্ষে টানি'।

তবু

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

জানি আনিবে না তুমি স্মরণে তোমার
আমার অশ্রুর বিন্দু—কুসুমের লাগি
ভঙ্গুর শিশিরকণা, অথবা বিবাগী
আশার পক্ষের ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ হাহাকার।
আমার কৌতুকবাণী তোমার হাসির
ফুলঝুরি জ্বালিবার লোলুপ উল্লাসে
তুমি রাখিবে না মনে, আমার বাঁশির
প্রেমকম্প্র কলতান মিলাবে বাতাসে,
তোমার শ্রবণপথে পশিবেনা প্রাণে।
মোর অশ্রু নিরাশা ও রহস্যকৌতুক,
মুখরিত মর্ম্মবাণী বাঁশরির তানে
অনায়াসে ভুলে যাবে, কোনো সুখদুখ
রাখিবে না চিহ্নলেশ তোমার স্মৃতিতে,
তবু সে উপেক্ষাগুলি গাঁথি মোর গীতে।

শুক্লা নিশি

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

দ্বিতীয় রাত্রি

আমার দুটো হাত ধরে একটু চাপ দিয়ে সে বললে, "এই যে এখনও বেঁচে আছ ?"

"দু ঘণ্টা এসে বসে আছি আমি, সারা দিনটা যে কি করে কাটিয়েছি জান না।"

"জানি, জানি খুব জানি। কিন্তু এবার কাজের কথা হোক ; আজ কেন এসেছি জান ? কালকের মত আবোল-তাবোল বকতে নয়। এবার থেকে আর ও রকম ছেলে-মানুষী করলে চলবে না—কাল রাত্রে অনেকক্ষণ ভেবেছি আমি—"

"ছেলেমানুষী ! আমরা ছেলেমানুষী করলাম কবে ? তুমি যা বলবে আমি তাতেই রাজী, কিন্তু সত্যি বলছি আমার সারা জীবনে কালকের মত রাত্রি আর কখনও পাই নি। এটা কি ছেলেমানুষী ?"

"সত্যি ?...প্রথম কথা আমার হাত দুটো ও রকম করে চেপো না, দোহাই তোমার ; দু নম্বর এই যে তোমার কথা অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালো করে ভেবেছি—এখনও কটা কথা জানা দরকার।"

"বল—"

"বলব ? কথাটা এই যে আজ আমাদের পরিচয় আবার একেবারে গোড়া থেকে সুরু করতে হবে, কারণ অনেক ভেবে ঠিক করলাম যে তোমাকে আমি একেবারেই চিনি না। কাল রাত্রে নিতান্ত খুকীর মত বকেছি একেবারে কচি খুকীটির মত, অর্থাৎ, শুধু নিজের প্রশংসাই করেছি, নিজের কাঁচা, সবুজ মনটার···। তাই আজ তোমার সব কথা জানতে চাই। কিন্তু যখন তুমি ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে না তখন তোমাকেই সব খুঁটিয়ে বলতে হবে। তুমি কী ধরণের মানুষ ? বল বল তাড়াতাড়ি, মিছে দেরী করো না, তোমার সমস্ত ইতিহাস বল আমাকে।"

সভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম "ইতিহাস... আমার ইতিহাস ! কে বললে তোমাকে যে আমার কোনও একটা ইতিহাস আছে ? আমার কিছুই নাই কোনও ইতিহাস নাই।"

বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে সে বললে, "সে কি ? যদি কোনও ইতিহাসই না থাকবে ত এতদিন বেঁচে আছ কি করে ?"

"সত্যি, এক ফোঁটা ইতিহাস নাই আমার। আমি বেঁচে আছি শুধু আপনা আপনি ; একা, শুধু একা-একা, একেবারে একলা। একলা থাকাটা যে কি রকম জানো তুমি ?"

"একলা কেন ? তুমি কি বলতে চাও যে কখনও কোনও মানুষের মুখও দেখনি ?"

"না, না রোজই ত কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু তবুত আমি একেবারে একলা।"

"কেন কারও সাথে কথা কওনা বুঝি ?"

"সত্যিকথা বলতে গেলে একেবারে কারো সাথে না।"

"তবে তুমি কি রকম ? তুমি কে ? বল বল, সব খুলে বল আমাকে। দাঁড়াও বুঝেছি এবার—আমার মত তোমারও এক দিদিমা আছে, না ? দুচোখ তার একবারে কাণা কোনও দিন কোথাও আমাকে যেতে দেবে না ; মানুষের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তাই ভুলে গিয়েছে। বছর দু'এক আগে কবে একটুখানি দুষ্টামী করেছিলাম আর সেই বুড়ী দেখলে যে আমাকে আর ধরে রাখা যায় না তখনই করলে কি জান ? আমাকে কাছে ডেকে তার "গাউনে"র সঙ্গে আমার কাপড়-খানা পিন্ দিয়ে এঁটে দিলে। দিনের পর দিন পাশাপাশি এমনি করে দুজন আমরা বসে থাকি। কাণা হলেও দিব্য আপন মনে সে "মোজা" বুনে যায় আর আমি পাশে বসে হয় সেলাই করি, নয় বই পড়ে শোনাই। অদ্ভুত কাণ্ড—গোটা দুটো

বছর এমনি—শুধু এমনি করেই কেটেছে, তার সঙ্গে পিন্ দিয়ে আমার গাঁটছড়া বাঁধা।"

"সর্ব্বনাশ। কি যন্ত্রণা। না না আমার দিদিমা নাই।"

"তাই যদি না থাকবে তবে চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকো কেন?"

"শোন, আমি কি রকম লোক জানতে চাও?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"একেবারে সত্যি সত্যি?"

"সত্যি—সত্যি—সত্যি।"

"বেশ, শোন তবে—আমি একটা আদর্শ।"

যেন সারা বছরের মধ্যে একটিবারও হাসতে পায়নি, এমনি করে হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে সে বল্ল, "আদর্শ? আদর্শ। কিসের আদর্শ? সত্যি তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভারী লজ্জা লাগে। এস এইখানে একটু বসা যাক্। এদিক দিয়ে কেউ যায় না—কেউ শুনতে পাবে না আমাদের কথা। বল, তোমার কাহিনীটা বল এইবার। মিথ্যে বললে কি হবে, জানি তোমার ইতিহাস আছেই—শুধু লুকোচ্ছ তুমি। দাঁড়াও আগে বল আদর্শ মানে কি?

"আদর্শ? আদর্শ মানে একটা নমুনা—একটা আলাদা কিছু, একটা অদ্ভুত লোক—"

তার হাসির ছোঁয়াচ লেগে হাসতে হাসতে ফের বল্লাম, —"একটা স্বভাব; শোন শোন, ভাবুক কাকে বলে জান?"

"ভাবুক?...নিশ্চয় জানি। আমি নিজেই ত একটা ভাবুক। দিদিমার পাশে বসে থাকতে থাকতে সময়ে সময়ে আমিই জেগে জেগে কত স্বপ্ন দেখি। একবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ হলে...কোথা দিয়ে যে কি হয়ে যায়—হয়ত হঠাৎ চীনের মুলুকের এক বাদ্‌সাকেই বিয়ে করে ফেলি...মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখা ভালো, কিন্তু...।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে এইবার সে বলে উঠল, "কিন্তু যদি স্বপ্ন ছাড়া সত্যি কিছু ভাববার থাকে? তা হলে—তা হলে?"

"চমৎকার। যদি চীন পর্য্যন্ত উড়ে গিয়ে বাদসাব রাণী হযে থাক তা হলে তুমিই আমাব কথা বুঝবে। শোন শোন তবে...দাঁড়াও; তোমার নাম যে জানি না এখনও।"

"যাক্—অবশেষে; এতক্ষণে সেকথা মনে পড়ল তবু ভালো।"

"সত্যি, সর্ব্বনাশ। এ কথাটা আমার মাথাতেই ঢোকে নি। যে-টুকু পেয়েছি তাই নিয়ে এত মসগুল ছিলাম যে..."

"আমার নাম নাস্তেন্‌কা।"

"নাস্তেনকা, শুধু নাস্তেন্‌কা? আর কিছুই না?"

"না কেন, এ টুকুতে মন ভরল না? অদ্ভুত লোক তুমি কিন্তু।"

"মন ভরল না? বরং ঠিক তার উল্টো...অনেক ভরেছে—খুব ভরেচে।

"নাস্তেন্‌কা—লক্ষীটি, তুমি আমার নাস্তেন্‌কা, সত্যি তুমি ভারী ভালো..."

"আচ্ছা। তারপর?"

"শোন শোন নাস্তেন্‌কা, এবার আমার অদ্ভুত ইতিহাসটা শোন।"

তার পাশে বসে পড়লাম। পণ্ডিতের মত মুখখানা ভারী করে এক নিশ্বাসে আরম্ভ করলাম, যেন একখানা বই থেকেই পড়ে চলেছি—

"তুমি জানো কি না জানি না নাস্তেন্‌কা, কিন্তু এই পিটার্স-বার্গেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব কুণো জায়গা আছে। বোধহয় যে সূর্য্যটা আজ আকাশ থেকে সমস্ত পিটার্সবার্গটাতে আলো ছড়ায়, সে আর এই অদ্ভুত কোণগুলোতে উঁকি দেয় না। সে জায়গাগুলোর জন্যে একটা নূতন সূর্য্য গড়া হয়েছে—তার ছটা যেখানেই পড়ে সবই যেন কেমন কেমন হয়ে যায়। এই কোণগুলোতে, জানো নাস্তেনকা, এই কোণগুলোর মাঝে জীবনটা একেবারে আলাদা রকম, আমাদের চারিপাশের জীবনের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই তার। সে রকমের জীবন অন্য কোনও দেশে অন্য কোথাও থাকলেও হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের এই ব্যস্ত, অতি ব্যতিব্যস্তের মধ্যে নাই। সে জীবনটা খানিকটা একেবারে খেয়াল, খানিকটা প্রাণের সব আকুলতা মাখা আকুতি, মাঝে মাঝে আবার—হায় নাস্তেন্‌কা, নীরস গদ্য—অতি সাধারণ—অশ্লীল কদর্য্যতা।"

"উঃ সর্ব্বনাশ। কী ভয়ংকর ভূমিকা...কী যে শুনতে বসেছি।"

"শোন নাস্তেন্‌কা—নাস্তেন্‌কা নাস্তেন্‌কা বলে সারা-জীবন তোমাকে ডাকলেও সাধ মিটবে না আমার। এই সব কোণগুলোতে একদল মানুষ বাস করে, তারা সবাই এক একটা ভাবুক। ভাবুক মানে এক কথায় বলতে গেলে—যারা ঠিক সাধারণ মানুষ নয়, মাঝামাঝি এক রকমের জীব। বেশীরভাগ সময়টাই একটি কোণে চুপ্‌চাপ্‌ বসে থাকে সে—দিনের আলোর কাছ থেকে লুকোতে পারলেই যেন বাঁচে। একবার আপনার কোটরে গিয়ে ঢুকতে পারলে শামুকের মত আপনার চারিপাশে সে দেওয়াল তুলে দেয়; তারা অনেকটা সেই জীবের মত—নিজের নিজের মাথা গুঁজবার ঠাঁই যারা ঘাড়ে করেই ঘুরে বেড়ায়—অর্থাৎ কচ্ছপ জাতি। কেন যে ঐ চারটে দেওয়াল, নীল ঘোলাটে রঙে লেপা, মলিন, ভূতের গত, তামাকের গন্ধে ভরপুর তার অত ভালো লাগে জানো? যদি কোনও দিন পথ ভুলে কেউ এসে পড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে (ধীরে ধীরে সব বন্ধুবান্ধবই সে পরিত্যাগ করেছে) কেন সেই অদ্ভুত লোকটি এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে? ক্ষণে ক্ষণে এমন লাল হয়ে ঘেমে ওঠে কেন? হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে—যেন এইমাত্র ভয়ঙ্কর অন্যায় একটা কাজ করতে করতে ধরা পড়ে গিয়েছে। যেন তার নোট জাল করা লোকে দেখে ফেলেছে কিংবা হয়ত জুয়াচুরী করে নিজের লেখা কবিতাগুলো পাঠাচ্ছে ছাপাতে—বেনামী চিঠি দিয়ে যিনি কবিতাগুলো লিখেছিলেন তিনি আর এ জগতে নাই; তাঁর বন্ধু প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই কবিতাগুলি ছাপাতে চান। কেন? বল দেখি নাস্তেন্‌কা, কেন সে দুটি বন্ধু সহজভাবে কথাবার্ত্তা কইতে পারে না? হাসি তামাসা করা কি তাদের একেবারে বারণ? নূতন আগন্তুকটি অন্য সময়ে যার মুখে কথার ফোয়ারা খুলে যায়—এমন মন-মরা হয়ে চুপ করে বসে থাকে কেন? জগতে এত বিষয় থাকতেও তাদের কোনও সরস কথাবার্ত্তা, কোনও মেয়ের বিষয় আলোচনা হওয়ার কী বাধা? আর এই বন্ধুটি বোধ হয় সবে কিছুদিন হল আলাপ হয়েছে—প্রথম দিনের দেখাতেই (কারণ আর বোধ হয় কোনও দিন দেখা হবে না) কেন এমন চুপ করে বসে থাকেন? এমন মন-মরা, বিমুখ হয়ে যান কেন? নীরবে চেয়ে থাকেন তাঁর বন্ধুটির পানে, আর তিনি যেন কথা কইবার প্রকাণ্ড একটা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে একেবারে অসহায়ভাবে চেয়ে থাকেন কত অপরাধীর মত। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, আলাপ করবার ক্ষমতা, নারীজাতির বিষয় আলোচনার স্পৃহা সবই কোথায় মিলিয়ে যায় বন্ধুটির সামনে—বেচারা দেখা করতে এসেছে তাঁর সঙ্গে, যেন জলছাড়া মাছের মত। হঠাৎ সেই ভদ্রলোকটির মনে পড়ে যায় খুব একটা জরুরী (যে কাজ নাই) সেই কাজের কথা। হঠাৎ উঠে টুপিটা তুলে নিয়ে বন্ধুর হাত থেকে নিজের হাতটা একরকম ছিনিয়ে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে যান্; বেচারা বন্ধু প্রাণপণ চেষ্টা করে আপন অক্ষম ব্যথা জানাবার—নূতন কথার অবতারণা আর হয় না। দোরের বাইরে গিয়েই বন্ধুটি অবজ্ঞার হাসি হেসে ওঠে, মনে মনে শপথ করে ফেলে এ অদ্ভুত, বেয়াড়া জীবের কাছে আর আসবে না কোনও দিন কখনও,—যদিও বাস্তবিক লোকটা খুবই ভাল মানুষ। হঠাৎ তার মনে হয় লোকটার মুখের ভাবখানা, কথা কইবার সময় কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল; যেন হতভাগা এক বেড়ালের ছানা, ঝুলিয়ে ধরে ফেলা হয়েছে তাকে, তারপর খোকাখুকীর হাতে চূড়ান্ত অপমানের পর, লজ্জায়, দুঃখে মর্ম্মাহত হয়ে, অন্ধকারে চেয়ারের তলে লুকিয়ে পড়তে চায়। খানিক পরে আপন মনে আপনি গা ফুলিয়ে লেজটা মোটা করে ওঠে, বার দুই হেঁচে নিয়ে সামনের থাবা দুটো দিয়ে ঘষে নেয় মুখখানা, আর অনেকক্ষণ পরে চোখ পাকিয়ে তাকায় সারা জগতটার পানে—এমন কি তার মনিবের প্লেটের রুটির টুকরোগুলোরও দিকে...।"

"থামো..." নাস্তেন্‌কা বাধা দিয়ে উঠল। এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হয়ে সে আমার কথা শুনছিল, তার বড় বড় দুটো চোখ আর ছোট্ট মুখখানি তুলে ধরে—"থামো! কেন এমন হয় তা আমি মোটেই জানি না; তুমি আমাকে এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন কর কেন? তবে এটুকু বুঝেছি যে যা বললে, বর্ণে বর্ণে এ সব তোমারই হয়েছে।"

গম্ভীর হয়ে আমি বললাম, "নিশ্চয়ই"।

"বেশ তবে আর কি বলে যাও; তারপর? এর শেষ পর্য্যন্ত আমাকে শুনতেই হবে।"

"তা' হলে নাস্তেন্‌কা, শুনতে চাও তুমি, সে অর্থাৎ আমার কাহিনীর মানুষটি অর্থাৎ আমি নিজেই—কারণ এই

ক্ষুদ্র আমিই সমস্ত গল্পটার নায়ক—আমি সেই কোণে বসে বসে কী করলাম? জানতে চাও, কেন সেই বন্ধুটির অতর্কিত আবির্ভাব ওরকম ব্যতিব্যস্ত, বিহ্বল করে তুললে? জানতে চাও, কেন ঘরের দুয়োরটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠলাম, কেন ঘেমে উঠে লাল হয়ে গেলাম তেমন করে? জানতে চাও, কেন আমি তার কোনও খাতির করতে পারলাম না, আপন সলাজ অতিথি পরিচর্য্যার বেদনা নিয়ে হয়ে পড়লাম আপনা আপনি…?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ; শোন, শোন, তুমি যা বল সবই ভারী চমৎকার, কিন্তু আরও একটু কম চমৎকার করে বলতে পার না এগুলো? কথা কয়ে যাও, মনে হয় যেন একটা বই থেকে পড়ে বলছ।"

অতি কষ্টে হাসি চেপে কঠিন স্বরে গম্ভীর হয়ে বললাম, "নাস্তেন্কা, নাস্তেন্কা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি জানি যে আমি যা বলি সবই ভারী চমৎকার, কিন্তু আর অন্য রকম করে বলতে পারি না আমি। আমি এখন রাজা সলোমনের মত, হাজার বছর ঘুমের পর আজ আমার ঘুম ভেঙেছে। এই মুহূর্ত্তে, নাস্তেন্কা, কত যুগ যুগের ছাড়াছাড়ির পর আজ আবার দেখা হওয়ার দিনে—চিরকাল ধরে যে তোমার সাথে আমার পরিচয় নাস্তেন্কা—কার আশায় বসেছিলাম আমি এতদিন পথ চেয়ে? তোমার সঙ্গে আজ যে আমার দেখা হবেই এ যে বিধাতার লিখন—এই মুহূর্ত্তে আমার মগজের মধ্যে হাজার হাজার ফোয়ারা খুলে গিয়েছে, কথার নদী হয়ে আমি বয়েই যাব, নইলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব একেবারে। দোহাই নাস্তেন্কা, বাধা দিয়ো না আমায় চুপ করে শোন, নইলে বল আমি চুপ করি।"

"না, না, বলে যাও তুমি; আমি আর একটি কথাও কইব না।"

"শোন তবে,—সারা দিনের মধ্যে একটা ঘণ্টা—বন্ধু আমার, মাত্র একটি ঘণ্টা ভারী ভালো লাগে আমার। সে সময়টা হচ্ছে যখন সব কাজ, দিনের সব কাজ শেষ করে দ্রুত পদে বাড়ী মুখে ছোটে সবাই, মনটা উড়ে চলে তাদের বিশ্রামের জন্যে উন্মুখ হয়ে। সকল চিন্তা, সকল দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে ছুটীর ঘণ্টা কয়টার মোহন ছবিই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সেই সময়ে সে—দোহাই নাস্তেন্কা "আমি" না বলে "সে" বলেই গল্পটা আমায় বলতে দাও—সেই সময়ে সে, তারও কাজ সারা হয়ে গিয়েছে—সকলের পিছু পিছু চলেছিল। কিন্তু কিসের একটা অদ্ভুত তৃপ্তি তার মুসড়ে পড়া মুখখানাকে সজীব করে তুলেছিল। ফিরে ফিরে বার বার চাইছিল পিটার্সবার্গের ম্লান গোধূলি ছাওয়া আকাশটার পানে। চাইছিল বললাম কিন্তু কথাটা বোধহয় ভুল বলা হল। আকাশটার দিকে চায়নি; না চেয়েই, কিছু না দেখেই যেন সে দেখতে পাচ্ছিল; মনটা তার ভরপুর ছিল অন্য কোনও আরও সুন্দর বিষয় নিয়ে। অন্যদিকে একটুখানি মাত্র চাইবার অবসরও তার ছিল না। মনটা এত খুসী কারণ কালকের আগে আর কাজে যেতে হবে না—কাজটা তার দু' চোখের শূল—ইস্কুলের পড়ুয়া নিদারুণ লেখাপড়ার হাত থেকে খেলাধূলা আর দুষ্টামীর রাজ্যে মুক্তি পেলে যেমন উল্লাসিত হয়ে ওঠে, তেমনি উৎফুল্ল সে। দেখ দেখ, ওর পানে চেয়ে দেখ নাস্তেন্কা। চাইলেই দেখতে পাবে খুসীটা নেশার মত ওর মাথায় চড়ে গিয়েছে, পাগল করে তুলেছে ওকে। দেখছ দেখছ—কি যেন ভাবছে…খাবার কথা ভাবছে না কি…এমন সন্ধ্যাবেলাটার কথা…ওরকম করে চেয়ে আছে কিসের পানে? ঐ চমৎকার পোষাক পরা ভদ্রলোকটি ছবির মত ঘাড় দুলিয়ে অভিবাদন করছে গাড়ীর ভিতরে ওই যে মেয়েটিকে—ঘাড় বাঁকিয়ে সাদা জুড়ীটা নাচতে নাচতে ছুটেছে—ওরই পানে কি? না নাস্তেন্কা; ওসব ছোট ছোট জিনিষে এখন তার কি যায় আসে? সে যে এখন নিজের মনের রূপালোকেই বিভোর; হঠাৎ কী ধনে ধনী হয়ে উঠেছে সে? সামনের আকাশটা ঐ যে ফিকে গোলাপী সূর্য্যাস্তের হাসি হেসে আজ বিদায় চাইছে, মনের বুকে কত কথা জাগিয়ে দিয়ে, সে কি শুধু শুধু? যে পথের সামান্য একটু ধূলিকণাও তার চোখ এড়িয়ে যেত না, সে পথটাই এখন আর সে দেখতে পায় না। কল্পলোকের মানস দেবীর চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে বোনা রূপালী জালে মায়া-জগতের কাঁচা সোণার ছবি আজ হিল্লোল তুলে যায়, হয়ত বা দেবী আপনি তাকে দুই হাতে ধরে নিয়ে যান সপ্ত ভুবন ছাড়িয়ে স্বর্গের স্ফটিক বেদীটির তলে—ধরার যে পাষাণের বুকে পা

ফেলে চলেছে সে তার চেয়ে দূরে...বহুদূরে। হঠাৎ থামিয়ে একটিবার জিজ্ঞেস্ করো যদি তাকে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে, চলেছেই বা কোথায়, দেখবে তার মুখ লাল হয়ে উঠবে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর কোথায় যে চলেছে কোনও কথাই মনে নাই। মহা বিরক্ত হয়ে নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে একটা মিথ্যে কথা বলে বস্‌বেই।... দেখলে, ওই দেখ, একটি মহিলা মৃদুস্বরে তাকে একটা রাস্তা কোন্ দিকে জিগেস করতেই কি রকম ভীষণ চম্‌কে উঠল। চোখে আগুন জালিয়ে বিরক্তিতে ভ্রুকুটি করে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলল, একটিবারও ফিরে তাকিয়ে দেখল না যে পথের লোক অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে তার পানে। কল্পনা তার সকলকে ঘিরে হাজার ছলায় লক্ষ রকম জাল বোনে ঊর্ণনাভেরই মত। আপন গুহায় ফিরে আসে, বসে বসে ভাববার নূতন নূতন রসদ নিয়ে। ডিনারের শেষে ম্যাট্রোনা যখন টেবিল সাফ করে পাইপ্‌টা হাতে তুলে দেয়, তখন যেন সে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে টের পায় যে নৈশ ভোজন শেষ হয়ে গিয়েছে তার, যদিও কি করে যে হল সে কথা তার মনে নেই মোটেই। আঁধার ভরে এসেছে ঘরটাতে। মনটা তার উদাস আর কিসের চাপে যেন অবনত। কল্পনার জগৎটা চারিপাশে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল, টুকরো টুকরো নিশ্চিহ্ন হয়ে—নিঃশব্দে ভেসে চলে গেল স্বপ্নের মত, নিজেই বুঝতে পারল না কিসের স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। ক্ষীণ একটা বাসনা ধীরে দোলা দিতে লাগল বুকের রক্ত কণাগুলোকে, না জানতেই জেগে উঠল না পাওয়ার ব্যথা। নূতন কামনা প্রলোভন ছড়িয়ে দিল তার শিরায় শিরায়, কল্পনার শিখা জলে উঠতেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছায়াছবি এসে ঘিরে ধরল। ছোট্ট ঘরটিতে নীরবতাই রাণী, মূক অলসতা বাড়িয়ে তুললে কল্পনার আগুন। ক্ষীণ শিখা ধিকি ধিকি জলে উঠল। হঠাৎ দপ করে জলে উঠল আলো। আনমনে যে বইখানা হাতে তুলে নিয়েছিল সেটা পড়ে গেল হাত থেকে (তখনও মাত্র তিন পাতাও পড়া হয় নি)। আবার জেগে উঠেছে কল্পনা, নূতন জগৎ, নবীন জীবনের শত রহস্য হেসে উঠেছে চোখের সামনে। নূতন স্বপ্ন, বিবশ করা সুখ চঞ্চল, ফেণিলোচ্ছল বিষের বাঁধ-ভাঙ্গা উদ্দাম ঢেউ। সত্যিকার বাস্তব জীবন নিয়ে তার কী হবে? তার চোখে আমরা বেঁচে আছি, তুমি আমি বেঁচে আছি নাস্তেন্‌কা, অসহায়, নির্জ্জীব, পঙ্গু হয়ে। আপন আপন নিয়তি খণ্ডাতেই ব্যস্ত আমরা, সারা জীবনটা একটা বিরাট নাগপাশ। আর সত্যি, একটু ভেবে দেখ, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে আমাদের প্রাণই নাই মুসড়ে পড়া যেন আমরা বেঁচেও মরে আছি...অসহায় বেচারার দল। কোনও দোষ নাই তার। মায়াছবির টুকরোগুলোর পানে চেয়ে দেখ, কেমন নিঃসঙ্কোচে, খাম খেয়ালী যাদুকরীর জীবন্ত ভেল্কীর মত চোখের সামনে তারা নেচে চলেছে—অবশ্য তাকেই ঘিরে, আমার নবীন ভাবুকটিকেই ঘিরে। লক্ষ লক্ষ লীলাভঙ্গি, কোটি কোটি ভাস্বর স্বপ্নচ্ছটা! শুনবে, কিসের স্বপ্ন দেখছে সে এমন বিভোর হয়ে?...সব স্বপ্ন দেখতেই পটু সে; সারি সারি কবির দল, প্রথমে কেউ চিনত না তাদের, পরে বিজয়মাল্য নিয়ে তারাই এগিয়ে এসেছে যেচে। ফুলের রাশি, ধূপের গন্ধ, গীর্জ্জার দূরাগত মৃদু ঘণ্টাধ্বনি; ভেজিনার যুদ্ধ...ক্লিয়োপেট্রা নিজের একটি ছোট্ট বাড়ী...পাশে প্রিয় কেউ একজন দুই চোখে অসীম কৌতূহল নিয়ে আকুল আগ্রহে কাহিনী শুনছে—এই তুমি যেমন শুনছ এখন, পরী আমার।...না নাস্তেনকা, আমাদের এই জীবন, যার জন্যে আমরা এতই কেঁদে মরছি এই জীবনটাতে এমন কী আছে যা সেই উদ্দাম নিষ্কর্ম্মার প্রিয় হতে পারে? সে ভাবে যে এ জীবনটা নিতান্তই নীরস, বিশ্রী; একবার ভেবেও দেখে না যে একদিন এই বিশ্রী জীবনটার একটি মুহূর্ত্ত ফিরে পাবার জন্যেই তার যুগ যুগ সঞ্চিত খেয়ালী ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি বিলিয়ে দিতেও এতটুকু ব্যথা লাগবে না তার। এখনও সেই মুহূর্ত্তটির আবির্ভাবের দেরী আছে, তাই কিছুই চায় না তার। সে যে চাওয়ার অনেক ওপরে, তার সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে...এত ভোগ করছে যে লিপ্সা আর নাই। আপনার জীবন শিল্পী সে আপনি, ক্ষণে ক্ষণে খেয়াল মত নব নব রূপ সৃষ্টি করে আপনার মন রঞ্জিত করে তোলে। পরী-রাজ্যের এই অদ্ভুত জগৎ কত সহজে কত অনায়াসে সৃষ্টি করা যায় জানো? মনে হয় যেন মিথ্যের লেশমাত্র

এতে নাই। সত্যি, সময়ে সময়ে তার মনে হয় যেন এ জগৎ, তার কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা নয়, স্বপ্নের আবছা গুণ্ঠন ঘিরে নাই কোনও খানে—সবই সত্য, সবই কঠিন বাস্তব।"

"কেন নাস্তেনকা, কেন কম্পিত বক্ষে, শ্বাস রোধ করে, এমন সময়ে সে কিসের প্রতীক্ষা করে? কেন...কী যাদু বলে... কোন মায়াবিনীর কটাক্ষে বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে,... সজল হয়ে ওঠে চোখ দুটো; পাণ্ডু কপোল দুটিতে ফুটে ওঠ গোলাপের আভা, সব ইন্দ্রিয় তার বিবশ করে দিয়ে জেগে ওঠে পরম, স্নিগ্ধ শান্তি! বিনিদ্র রজনীর দীর্ঘ প্রহরগুলো আনন্দের একটি হিল্লোলে কেটে যায়, গোলাপী ঊষা ত্রস্ত চরণে এসে দাঁড়ায় তারই বাতায়ন পাশে—দিনের আলো দোর ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে আঁধার ঘরটার মাঝখানে...শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সে লুটিয়ে পড়ে তখন, ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখদুটি, বিবশ তনুলতা শিউরে শিউরে ওঠে কার স্পর্শে স্পর্শে, সারা বুকখানি ভরে যায় কোন অজানা সুখের বেদনায়! হ্যাঁ নাস্তেনকা·· মনে হয় যেন সত্যিই কী এক সর্ব্বগ্রাসী জ্বালা কাঁপিয়ে তুলেছে শোণিতের প্রতি কণাটিকে; কোনও কিছু না জেনে আপনা আপনি মনে হয় যেন স্বপ্নের মধ্যেও একটা কিছু আছে যেটা সত্যি, একেবারে সত্যি, দিব্য ধরা ছোঁয়া যায়। একি শুধু কল্পনার মায়া? এই অপরূপ রাজ্যে... প্রেমের সাথে মিশে আছে তার উজ্জ্বল আনন্দের মর্ম্মর, তপ্ত বুক ভরা জ্বালা...তার পানে একবার শুধু চেয়ে দেখ; দেখলেই বুঝতে পারবে। নাস্তেনকা, নাস্তেনকা, ওর পানে চেয়ে কি মনে হয় যে, যে প্রিয়াকে ঘিরে রাতের পর রাত তার স্বপ্নগুলো ছায়াতন্ত্রী বুনে চলেছে, তাকে একেবারেই চেনে না সে! এও কি সম্ভব যে শুধু চটুল মোহের ঘোরেই দুজনের দেখাশোনা?···তাকে পাবার এ ব্যাকুলতা কি শুধুই স্বপ্ন? যুগ যুগ হাতে হাত দিয়ে কাটিয়ে এসেছে দুজনে একলা শুধু তারা দুজন মাত্র, সমস্ত পৃথিবীটাকে পিছনে ফেলে দিয়ে।...দুজন তারা, একজন অপরটির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে খুঁজে পেয়েছে আবার। বিদায়ের লগ্ন যখনই এসেছে ঘনিয়ে, সজল চোখে প্রিয় যে লুটিয়ে পড়েছে তারই বুকের উপর···কালীমাখা আকাশের তলে যে রুদ্র ঝড় ফুঁসে চলেছে তার কোনই খবর না রেখে; যে পাগলা বাতাসের ঝটকা তার কাজলমাখা চোখদুটি থেকে অশ্রু ফোঁটাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে ছুটেছে, সে কথাও মনে পড়েনি তাদের।···সবই কি শুধু স্বপ্ন?... আর সেই ফুলের বাগানখানা, মলিন ধূলি-ধূসর আগাছায় ভরা? সরু, বাঁকা, পায়ে হাঁটা পথগুলি সবুজ শ্যাওলায় ছেয়ে ফেলেছে···নির্জ্জন, আঁধিয়ারে ঢাকা? যে পথে বেড়িয়ে বেড়াত ত তারা দুজন...হাতে হাত দিয়ে...ভালোবেসে··· এত দিন···কত দিন ধরে। আর সেই অদ্ভুত পুরান বাড়ীখানা? বছরের পর বছর ধরে সে কাটিয়েছে তার দিনগুলো, একলা নির্জ্জনে, তার পঙ্গু, জরাজীর্ণ স্বামী প্রভুটির শয্যাপাশে। কত জ্বালা, কত বেদনা কত না ভয়...কী মধুর কত ভালো তাদের সে ভালোবাসা···লোকে কতই না মন্দ বলেছে তাদের উঃ ভগবান! অবশ্য পরেও দুজনের দেখা হয়েছিল, দূরে, বহুদূরে, প্রবাসে···বিদেশী আকাশের তলে, চোখ ধাঁধান আলোর মাঝখানে, নীচের মজলিসে। সঙ্গীতের ঝনৎকার, আলোর সমুদ্র···তারই পাশে ফুলের কুঞ্জে বাতায়ন তলে। তাকে চিনতে পেরেই ছিঁড়ে ফেললে সে আপনার গুণ্ঠনখানি, বেপথু উল্লাসে দুহাত বাড়িয়ে আপনাকে সঁপে দিল তারই ব্যাকুল বাহুর আলিঙ্গনে। প্রিয়বাহুবেষ্টনীর মাঝখানটিতে নিমিষেই ভুলে গেল দুজনে এতদিনের সঞ্চিত অপমান ব্যথা, এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা। সকল দুঃখ দীর্ঘ বিরহ...জরাজীর্ণ বাড়ীখানি...পঙ্গু স্বামীপ্রভুটি, ...দূরে বহুদূরের আগাছা ভরা সেই বাগানখানি... সেই চরম মুহূর্তটি; উজাড় করা, শেষ ব্যাকুল চুম্বন ওষ্ঠপুটে এঁকে নিয়ে, আপনাকে জোরকরে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল যে সে...! ওঃ নাস্তেন্‌কা, ছেলেমানুষের মত তুমিও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে···ইস্কুলের পড়ুয়ার মতই লাল হয়ে উঠত কানদুটি—পথের পাশের গাছথেকে আপেল চুরীর কথা জানাজানি হয়ে গেলে যেমন হয়—লম্বা, চওড়া, হাসিখুসী মেজাজের লোকটা এগিয়ে এসে যখন বললে 'এই আসছি প্যাভ্‌লোভ্‌স্ক থেকে...। ভগবান্··· ভগবান্···বৃদ্ধ, পঙ্গু, কাউন্টটির ভবলীলা শেষ হয়ে গিয়েছে— সুখ...শান্তি...মুক্তি...প্রেম।'

আমার বক্তৃতা শেষ করে নিতান্ত অসহায় ভাবে চেয়ে রইলাম নাস্তেনকার মুখের দিকে। জোর করে একবার অট্টহাসি হেসে উঠতে ইচ্ছে হল খুবই...আমার সারা শরীরটা কোন্ রাক্ষস্ এমন করে নাড়িয়ে দিয়ে গেল...গলায় আর ঢোক্ গেলা যায় না...ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে, চোখ জ্বালা করে জল গড়িয়ে পড়ল যে···।

ভেবেছিলাম বুঝি এতক্ষণে খিল্ খিল্ করে নাস্তেনকা হেসে উঠবে...বুঝি অনেকখানিই এগিয়ে গিয়েছি এতদিন পরে সে কথা...। কিন্তু নাস্তেন্‌কা কিছুই বললে না। একটু পরে শুধু আমার হাত দুটিতে ধীরে চাপ দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে "সত্যি সারা জীবনটা এমনি করে কেটেছে তোমার ?"

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম, "সারা জীবনটা নাস্তেন্‌কা—সারা জীবনটাই। সারা জীবনটা এমনি কেটেছে, আর বাকিটাও এমনি কাটবে বোধ হয়।"

ব্যস্ত হয়ে সে বললে, "না তা হবে না; কক্ষণও না... অমন করে সারা জীবনটা কাটান ভাল নয়, তা' জানো ?"

বুকের মধ্যে যে জিনিষটা ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছিল তাকে আর চেপে রাখতে না পেরে, চীৎকার করে আমি বলে উঠলাম, "জানি নাস্তেন্‌কা, খুব জানি,। এতদিন পরে বুঝতে পেরেছি যে জীবনের সেরা দিনগুলোই এমনি করে খুইয়ে বসে আছি আমি...এতদিনে বুঝি বিধাতা তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন...তোমাকে···আমার চোখে আঙুল দিয়ে তাই দেখিয়ে দিতে। তোমার পাশে বসে ভবিষ্যতের দিনগুলোর কথা ভেবে হাসি আসছে—কারণ ভবিষ্যতে ত আমি আবার একলাই...একা-একাই এ নোংরা, অকারণ দিনগুলো...। সত্যি বলছি, এত আনন্দ পেলাম তোমার পাশে বসে—এবার আর স্বপ্ন দেখা কী নিয়ে ? তোমাকে আজ প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি...কল্যাণী ঘৃণা করে আমাকে দূর করে দাও নি...মনে মনে বলতে পারব যে তবু দু'রাত্রি বাঁচার মত সত্যি বেঁচেছি।

প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে নাস্তেনকা বলে উঠল, "না, না, ওগো কক্ষণও না—"চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল—"না, এমন করে আর তুমি থাকতে পাবে না—ছেড়ে দেবনা তোমাকে আমি···দুটি রাত···মোটে দুটি রাত ?"

"নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা তুমি যে আমাকে কী দিয়েছ, তা যদি বুঝতে পারতে—জানো, মরতে আর আমি চাইব না; আমার দুষ্কর্মের ইতিহাস আর বার বার মনে পড়বে না, জানো ?...এরকম জীবন দুষ্কর্ম নয় ত কি ? মনেও ভেবো না যে আমি বাড়িয়ে বলছি—দোহাই তোমার কক্ষণও তা ভেবো না নাস্তেন্‌কা। সময়ে সময়ে কি জ্বালা জেগে ওঠে, সে কী জ্বালা...সময়ে সময়ে মনে হয় সত্যি বাঁচা আমার পক্ষে অসম্ভব;...হারিয়ে ফেলেছি...আমি যে সত্যিকার জীবনের স্পর্শমণি হারিয়ে ফেলেছি...আমি ভালো হয়ে উঠেছি; খেয়ালী রাত্রি ভোর হয়ে গেলেই আমি যে তখন সাধারণ মানুষের মতই হয়ে যাই...উঃ কী ভীষণ। আর এরই মাঝে...ঐ শোন তোমারই চারি পাশে জীবনের দুর্দম ঘূর্ণীর প্রচণ্ড কলরোল...শোন...দেখ, চেয়ে দেখ, মানুষ সত্যি সত্যি কেমন বেঁচে থাকে। তাদের বাঁচতে মানা নেই, জীবনগুলো তাদের মায়াডানা মেলে স্বপ্নের মত উড়ে পালায় না; ক্ষণে ক্ষণেই জীবনটা তাদের নূতন হয়ে উঠছে...চির তরুণ, অক্লান্ত, অফুরন্ত সুখপ্রহরগুলো। কল্পনা কালো, কল্পনার কী বা আছে ? মোহমায়ার ক্রীতদাসী; যে ছায়াখানি ঘিরে ফেললে সূর্য্যটাকে, তারও পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে সে দিনে দিনে শুকিয়ে ওঠে, চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গুঁড়িয়ে যায় ধুলার কণার সাথে। মনটা কেঁদে ওঠে আরও কিছু পাবে বলে। বৃথাই বার বার স্বপ্নের বুলি ঝাড়ে সে, রাশি রাশি ছাই-স্তূপের মাঝে খুঁজে ফিরে আগুনের একটি কণা, ফুঁ দিয়ে জাগিয়ে তুলবে তাকে—তার মরণশীতল কল্পনাকে চঞ্চল করে তুলবে জীবনের তপ্ত শোণিতের স্পন্দন দিয়ে...বেজে উঠবে আবার সেই চটুল মঞ্জীর, নেচে উঠবে তারই তালে তালে শিরায় শিরায় ফেনিল রক্তের নদীর উচ্ছ্বাস। আমি কোথায় এসে পঁহুছেছি, জানো নাস্তেন্‌কা ? আমার সকল অনুভূতির একটা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করি জানো ? আমার আধফোঁটা অনুভূতির রাশি—কোনও দিনই যা ছিল না, হয় নি; বিশেষ বিশেষ দিনে আমি বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঘুরে বেড়াই কেন জানো ? যেখানে যেখানে একটি দিনও একটুখানি আনন্দ পেয়েছি, সেই সেই দিন সেই জায়গাতেই গিয়ে বসি আমি। সে কী আরাম; মনে পড়ে,

ঠিক একটি বছর আগে আমি চলেছিলাম এই পথেই, মনটা আমার দুঃখ ভারে নত। মনে পড়ে···স্বপ্নগুলোও বিষাদ মাখা। যদিও আগের দিনগুলো আজকের দিনটার মতই একঘেয়ে, নিরানন্দ, তবুও মনে হয় যেন সেগুলো এর চেয়ে একটুখানি ভালো ছিল, জীবনটা বোধ হয় আরও একটু সুন্দর ছিল—কালো ছায়াগুলো বোধ হয় ঘিরে আসত একটুখানি কম, বুকের মাঝে দিবারাত্রি এমন তুষের আগুন জ্বলত না বোধ হয়। মাথাটা একটু নেড়ে মন বলে ওঠে 'উঃ কী তাড়াতাড়ি ছুটে চলে দিনগুলো;' আবার মনে হয় 'তাইত এতদিন করাগেল কী? জীবনের সেরা দিনগুলোকে কবর দিয়ে এলে কোন শ্মশানে? এতদিন বেঁচেছিলে না মরে?' দেখ দেখ কেমন তুষারশীতল হয়ে আছে জগৎখানি—আরও কয়েকটা দিন কেটে গেলেই, বাস্। একেবারে মুখ বন্ধ নির্জ্জনতা পঙ্গু, জরা, দুঃখের বুকভরা পসরা। মায়ার ভুবন শুকিয়ে ঝরে যাবে, উঠে যাবে স্বপ্নের মায়া, গাছ থেকে হলদে পাতার মতই ঝরে পড়বে,...খসে খসে ভেসে যাবে...। নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা, একলা থাকা···ভারী ...ভা...রী খারাপ লাগে, জানো?—আর যদি কিছুই না থাকে...দুঃখ করবারও যদি কিছু না থাকে...একেবারে কিছুই না...সবই কিছু না, শুধু শূন্য...একেবারে ফাঁকা, শূন্য... ভুয়ো,· অসম্ভব...শুধু স্বপ্ন মাত্র..."

গালের ওপরে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়া ধারাটি আঙুল দিয়ে মুছতে মুছতে নাস্তেন্‌কা বললে, "থামো, আর কাঁদিও না আমাকে। এবার ওসব ফুরিয়ে গিয়েছে, দুজনে এবার থাকবো আমরা—যাই হোক না কেন, ছাড়াছাড়ি আমাদের হবে না কোনও দিন। শোন···ঠাকুরমা আমার জন্যে একটা মাষ্টার রেখে দিলেও লেখাপড়া আমি বিশেষ শিখিনি। তা'হলেও সব কথা বুঝেছি তোমার। আমারও ঠিক্ অমনি হত, ঠাকুরমা যখন নিজের কাপড়ের সাথে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখত আমায়। অবশ্য তোমার মত সুন্দর করে বলতে আমি পারব না—আমি ত লেখাপড়া শিখিনি।"

আমার বক্তৃতায় আর ভাষার আড়ম্বরে ভারী বিস্মিত হয়েছিল বেচারী। একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগল, "কিন্তু আমাকে সব খুলে বলেছ দেখে সত্যি ভারী খুশী হয়েছি। আর শোন, আমিও আমার সব কথা বলব তোমাকে—কিছুই লুকোব না—পরামর্শ দিয়ো আমাকে"।

"নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা"; আনন্দে দিশেহারা হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম "আমি কোনও দিনই কাউকে পরামর্শ দিই নি—উচিত পরামর্শ ত দূরের কথা। কেমন পরামর্শ চাও তুমি পরী আমার? বল, বল, সত্যি এ মুহূর্ত্তে এত আনন্দ হচ্ছে আমার—নিজেকে এত সাহসী, এত বুদ্ধিমান্ বলে মনে হচ্ছে,—সারি সারি ভীড় করে ঠেলে উঠছে কত কথা"—

হাসতে হাসতে বাধা দিয়ে নাস্তেন্‌কা বললে, "থাম থাম; উচিত, সাধু, বিকট পরামর্শ আমি চাই না; ...শুধু ভাইএর মত ছোট্ট একটুখানি পরামর্শ"...

"রাজী নাস্তেন্‌কা, রাজী, সারা জীবনটা তোমাকে জানলেও এখন তোমাকে যতখানি ভালোবাসি, তার চেয়ে ভালো বাসতাম না নিশ্চয়ই"—

"তবে তোমার হাত দাও"...

আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই ছোট্ট একটি মৃদু কম্পন দিয়ে নাস্তেন্‌কা বললে "এবার আমার ইতিহাস বলি, শোন"।—

নাস্তেন্‌কার কথা:

"আমার ইতিহাসের অর্দ্ধেকটাত জেনেই নিয়েছ—অর্থাৎ আমার ঠাকুরমার কথা তোমাকে বলেইছি"...

অট্টহাস্য করে বাধা দিয়ে আমি বললাম, "যদি বাকী অর্দ্ধেকটা এরই মত সংক্ষেপে শেষ করতে চাও"...

"চুপ্ করে শোন; সবার আগে কথা দাও যে আমাকে হঠাৎ বাধা দেবে না, নইলে সব ঘুলিয়ে যাবে আমার; শোন্ চুপ করে। খুব ছোট বয়সেই মা বাবা দুইজনই মারা যান। তখন থেকেই বুড়ী ঠাকুরমার কাছে আছি। বোধ হয় আগে ঠাকুরমার অবস্থা ভালোই ছিল কারণ এখনও মাঝে মাঝে তিনি আগেকার সুদিনের কথা বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। নিজেই আমাকে ফ্রেঞ্চ্ শিখিয়ে তারপর একটা মাষ্টার যোগাড় করে দিয়েছিলেন; পনেরো বছরে পড়তেই (এখন আমার বয়স সতেরো) লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময়ে একটা দুষ্টুমি করে ফেললাম; কি করেছিলাম তা তোমাকে বলবার দরকার নাই, কারণ সেটা খুব জরুরী কথা নয়। তার প

একদিন সকালেই আমায় ডেকে ঠাকুরমা বললেন যে কাণা মানুষ বলে তিনি না কি আমার দেখা শোনা করতে পারেন না ; একটা পিন্ নিয়ে তাঁর কাপড়ের সাথে আমার কাপড় আট্‌কে দিয়ে বললেন যে চিরকাল ঐ রকম করেই বসে থাকতে হবে আমাকে তাঁর কাছে—অবশ্য যদি আমার স্বভাব না শুধ্‌রে যায়। প্রথম দিন কতক তাঁকে ছেড়ে এক পাও নড়তে পারতাম না। ঠাকুরমার কাছটিতে বসেই লেখাপড়া, কাজকর্ম্ম, আমাকে সবই করতে হ'ত। একবার ফাঁকী দেবার মতলব করে ফেকলাকে আমার জায়গায় বসাতে রাজী করলাম। ফেক্‌লা আমাদের কয়লাওয়ালী—একবারে বদ্ধ কালা। আমার বদলে সেই বসে থাকল ; যেই ঠাকুরমার চোখ দুটো একটু ঢুলে এল, আমি পালিয়ে গেলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ী। ফিরে এসে দেখি তুমুল ব্যাপার। আমি বাইরে যাবার পরই ঠাকুরমা জেগেছেন ; আমিই পাশে আছি মনে করে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস্ করেছেন; ফেক্‌লা কোনও উত্তর দিতে পারে নি। কি করবে বুঝতে না পেরে, বেচারী পিন্‌টা খুলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে"—

থেমে গিয়ে নাক্তেন্‌কা ভয়ানক হাসতে লাগল ; সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাস্‌তে আরম্ভ করতেই হঠাৎ চুপ করে বেজায় গম্ভীর হয়ে বললে "খবরদার, আমার ঠাকুরমাকে নিয়ে ঠাট্টা করো না। আমি হাসছি সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা মনে পড়ায়... ঠাকুরমা যে অমনি তার আমি কি করব ? কিন্তু তবু তাঁকে ভালো লাগে আমার। যাক্‌গে...তখুনি বসে পড়লাম তাঁর পাশে, আর সেই থেকে একটুও নড়তে পেতাম না কোনও দিন"।

একটু দম নিয়ে আবার আরম্ভ হ'ল; "ও হো বলতে ভুলে গিয়েছি তোমাকে, যে বাড়ীটাতে থাকতাম, সেটা আমাদেরই বাড়ী, অর্থাৎ ঠাকুরমার বাড়ী। ছোট্ট কাঠের বাড়ী, তিনটে জানালা, ঠাকুরমার মতই ঝুরঝুরে। ওপর তলায় হঠাৎ একদিন নূতন একটা ভাড়াটে এসে হাজির"—

আমি বললাম, "তা হলে আগে একটা পুরাণো ভাড়াটে ছিল বলতে হবে ত"—

"নিশ্চয়ই। কিন্তু সে কক্ষণও তোমার মত বক্‌বক্ করত না। বাস্তবিক কোনও দিন কেউ তাকে কথা বলতে শোনেনি। বোবা, কাণা, খোঁড়া, আম্‌সিপানা ছোট্ট থুবথুরে বুড়ো—আর যখন বেঁচে থাকতে পারল না, টুপ্ করে মরে গেল। কাজেই একটা নূতন ভাড়াটে দেখতে হল, কারণ ভাড়াটে না হলে আমাদের চলে না ; ওপর তলার ভাড়া আর ঠাকুরমার পেন্সন—এই আমাদের সম্বল।"

"কিন্তু নূতন ভাড়াটে যে এল, বয়স তার বেশী নয়—একেবারে নূতন এসেছে এ দেশে। ভাড়া নিয়ে কোন কষাকষি করল না, ঠাকুরমা তাকেই ঘরগুলো ছেড়ে দিলেন। সব ঠিক হওয়ার পর জিগেস্ করলেন আমাকে, "বল্ দেখি নাস্তেন্‌কা, ভাড়াটেটা ছোকরা না বয়স আছে ?" মিথ্যে কথা বলবার ইচ্ছে আমার ছিল না, তাই বললাম যে ঠিক বুড়োও না আবার খুব কম বয়স ও নয়। ঠাকুরমা জিজ্ঞেস্ করলেন, দেখতে কেমন ? এবারও মিথ্যে কথা বলবার ইচ্ছে আমার হল না, তাই বললাম—দেখতে বেশ। ঠাকুরমা বললেন, "কি আপদ, কি আপদ খবরদার বাছা, ওর সঙ্গে কথা কইবি না কিন্তু। কি যে দিনকাল পড়েছে ; এই ত ভাড়াটে, তার আবার রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, আমাদের কালে এ সব বালাই ছিল না"—

"সব সময়েই ঠাকুরমা আগের দিনের কথা তুলে খুঁৎ খুঁৎ করতেন—আগে চোখে দেখতে পেতেন, গায়ে বল ছিল রোদের তেজ ছিল বেশী—দুধ এত শিগ্‌গির টক্ হয়ে যেত না—খালি আগের দিন, আর আগের দিন। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলাম, ঠাকুরমা ও কথা বললে কেন ? ভাড়াটে দেখতে ছাই কি ভালো, বারবার ও কথা জিগেস্ করলে কেন ? কিন্তু বাস। শুধু ঐ টুকুই মনে হল আমার ; তারপরেই ঘর গুণে গুণে হাতের মোজা জোড়া বুনতে লাগলাম, আর একটু পরেই ভুলে গেলাম সব কথা।"

"হঠাৎ একদিন সকালে ভাড়াটে দেখা করতে এল আমাদের সঙ্গে ; এ-কথা থেকে সে-কথা সুরু হল। ঠাকুরমার বেশী কথা বলার বাতিক আছে ; আমাকে পাশের ঘর থেকে কি একটা আনবার হুকুম হল। চম্‌কে লাফিয়ে উঠলাম ; কি জানি কেন সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল—হঠাৎ ভুলে গেলাম যে আমার কাপড়খানা পিন্ দিয়ে ঠাকুরমার কাপড়খানার সঙ্গে আটকান। ধীরে না খুলে নিয়ে, হ্যাঁচ্‌কা টান

দিতেই ঠাকুরমার চেয়ারখানাও নড়ে উঠল। ভাড়াটে আমার অবস্থাটা দেখে ফেলেছে দেখে আরও লাল হয়ে উঠলাম আমি —দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মত—যেন কেউ গুলি মেরেছে বুকের মাঝখানে—তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। সে-সময় এত লজ্জা হচ্ছিল আর এমন কান্না আসছিল আমার। ঠাকুরমা বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলি যে..." আমি আরও কাঁদতে লাগলাম। ভাড়াটে যখন দেখলে সে তারই জন্যে এ লজ্জায় পড়তে হয়েছে আমাকে, তখন নমস্কার করে ধীরে ধীরে চলে গেল।"

"তারপর থেকে সিঁড়িতে একটুখানি শব্দ হলেই আমার মরে যেতে ইচ্ছে করত, খালি বুক কাঁপত, এই বুঝি ভাড়াটে এসে পড়ল। চুপি চুপি পিনটা খুলে রাখতাম, কিন্তু সে আসত না কখনও। পনেরো দিন কেটে গেল। ফেকুলাকে দিয়ে সে বলে পাঠালে যে অনেক ভালো ভালো ফ্রেঞ্চ বই আছে তার কাছে; যদি ঠাকুরমা বলেন, পাঠিয়ে দেবে। আমার সময়টা কাটবে ভালো। ঠাকুরমা রাজী হলেন, কিন্তু খালি জিজ্ঞেস্ করতে লাগলেন সে বইগুলো ভালো কি না; খারাপ বই পড়লে যত সব খারাপ চিন্তা মাথায় এসে বাসা বাঁধবে।

"কেন ঠাকুরমা, এমন কী আছে সেগুলোতে?"

"সেগুলোতে আছে কি করে বদমাইস ছোকরার দল ভালো ভালো মেয়েদের ফুসলিয়ে বার করে নিয়ে যায়; বিয়ে করবে বলে বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে যায় তাদের; তারপর একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যায় কোথায়—আর হতভাগীগুলো কেঁদে কেঁদে শেষটা মরে যায়।"

ঠাকুরমা বললেন, "অমন অনেক বই পড়েছি আমি, আর বইগুলো এমনি চটক দিয়ে লেখা যে লুকিয়ে সারা রাত পড়তে ইচ্ছে করে। খবরদার নাতজেন্কা, ও সব বই পড়তে পাবে না।...কি কি বই পাঠিয়েছে বল দেখি—"

"সবগুলোই ওয়াল্টার স্কটের নভেল, ঠাকুরমা।"

"ওয়াল্টার স্কটের নভেল?...থাম থাম দাঁড়া; দেখ্ দেখি ওগুলোর মধ্যে কোনও চিঠিপত্র লুকোন নাই ত—"

"আমি বললাম, "কই ঠাকুরমা, চিঠিত কোথাও নাই।"

মলাটগুলো উল্টে ভাল করে দেখ দেখি; কখনও আবার মলাটের পিঠ উল্টে চিঠি গুঁজে দেয় হতভাগারা—"

"না ঠাকুরমা, মলাটের মধ্যেও কিছু নাই।"

"আচ্ছা পড় তা' হলে।"

"ওয়াল্টার স্কট পড়া শুরু হল; মাস খানেকের মধ্যেই প্রায় অর্দ্ধেক বই পড়া হয়ে গেল আমাদের। তারপর আরও বই এল, এমন কি 'পুসকিনেরও'। শেষে এমন হল যে বই না হলে দিন কাটত না আমার; আবোল তাবোল ভাবনা ছেড়ে বইএর মধ্যেই ডুবে গেলাম একেবারে।

এমন সময় একদিন হঠাৎ সিঁড়ির ওপর দুজনে মুখো মুখি দেখা। ঠাকুরমা কি একটা নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আমি লাল হয়ে উঠলাম; আড়-চোখে দেখলাম তাঁরও সেই অবস্থা। তবুও একটু হেসে আমাকে গুডমর্ণিং জানিয়ে ঠাকুরমার কুশল জিগেস করে বললেন, "বইগুলো পড়েছ?" ঘাড় নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ।"

"কোনটা ভালো লাগলো সব চেয়ে?"

"আইভান্‌হো আর পুসকিন" বলেই পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

সপ্তাহ খানেক পরে আবার সিঁড়ির ওপর দেখা। এবার আর ঠাকুরমা কোনও কাজে পাঠান নি আমাকে, আমি নিজেরই কাজে চলেছিলাম। ছুটো বেজে গিয়েছিল তখুনি তাঁর বাড়ী ফিরবার সময়।

"গুড আফটারনুন"—স্বর শুনে চমকে উঠেই একটু সামলে নিয়ে বললাম, "গুড আফটারনুন"

"সারা দিন ঠাকুরমার কাছে বসে থাকতে ভালো লাগে তোমার?"

কথাটা শুনেই লাল হয়ে উঠলাম—কেন কি জানি। ভারী লজ্জা হল, আবার রাগও হল খুব, বোধ হয় ঠাকুরমার কথা তুলেছিলেন বলে। কোনও জবাব না দিয়েই চলে যাব ভাবলাম, কিন্তু কাজে তা হয়ে উঠল না।

"তোমার মত শান্ত মেয়ে আমি আর দেখিনি; তোমার সঙ্গে এমন করে কথা কইছি বলে রাগ করো না—সত্যি বলছি, তোমার ঠাকুরমার মত আমিও তোমার ভালো চিন্তাই করি। গিয়ে দেখা করবার মত কোনও বন্ধুবান্ধব নাই তোমার?"

বললাম যে কেউ কোথাও নাই। ছিল শুধু মাসেন্‌কা, কয়েকদিন হল সেও চলে গিয়েছে ক্লোভে।

"আমার সঙ্গে থিয়েটারে যাবে ?"

"থিয়েটারে ? ঠাকুরমা···?"

"ঠাকুরমাকে না জানিয়েই কিন্তু তোমাকে যেতে হবে।"

আমি বললাম, "না, ঠাকুরমাকে ফাঁকী দিতে আমি চাই না।...গুডবাই।"

"গুডবাই" বলে চলে গেলেন—আর কথা হল না।

ডিনারের পর দেখা করতে এলেন ঠাকুরমার সঙ্গে; অনেকক্ষণ গল্প হল। কখনও বিদেশে গিয়েছেন কি না, এখানে আলাপী কে কে আছে, এই সব কথা হতে হতে হঠাৎ বললেন, "আজ থিয়েটারে একটা বক্স নিয়ে ফেলেছি, কয়েকটি বন্ধু যাবে বলেছিল। কিন্তু এখন বলে কেউ যাবে না—"সেভেই-এর বার্ব্বার" আছে আজ।"

উৎফুল্ল হয়ে ঠাকুরমা বললেন, "সেভেই-এর বার্ব্বার" সেই আগে যেটা হত ?

"হ্যা, সেইটেই" বলেই চাইলেন আমার পানে। মানেটা বুঝলাম, সারা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, বুকটা জোরে জোরে দুলতে লাগল···

ঠাকুরমা বললেন, "এটা ত আমি জানিই; আমি যে একবার রোজিনা সেজেছিলাম।"

"চলুন না আজ, নইলে আমার টিকেটটাই মাটি।"

খুবই খুশী হয়ে ঠাকুরমা বললেন, "বেশ ত চল না, তাতে আর কি ? বেচারা নাস্তেনকা থিয়েটারও দেখেনি কখনও।"

ওঃ সে কী মজা। তখুনি তৈরী হয়ে রওনা হলাম। চোখ না থাকলেও গান বাজনা শুনবার সখ ঠাকুরমার ছিল আর তা ছাড়া আমাকে খুশী করবার জন্যই তিনিও চললেন সঙ্গে।

থিয়েটার কেমন লাগল সে কথা এখন থাকগে। কিন্তু সারাক্ষণ তিনি এমন মিষ্টি করে কথা কইতে লাগলেন, এমন স্নেহ ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার পানে যে বুঝতে একটুও দেরী হলনা আমার যে বিকেল বেলা যখন একলা থিয়েটারে যাবার কথা বলছিলেন, তখন আমাকে পরীক্ষা ভারী আনন্দে কাটল সময়টা। ঘুমোতে যাবার সময়ও মনটী খুশীতে এত ভরে ছিল যে রাত্রে ঘুমই হল না ভালো করে। সারা রাত্রি মাথায় ঘুরতে লাগল শুধু 'সেভেই-এর বার্ব্বারের' কথা।

ভেবেছিলাম এর পর বুঝি আরও ঘন ঘন দেখা পাওয়া যাবে তাঁর। কিন্তু কই ? মোটেই না। তিনি আমাদের কাছে আসা প্রায়ই বন্ধই করে দিলেন। মাসে বোধ হয় মাত্র একবার আসতেন, তা' শুধু থিয়েটারে যাবার নেমন্তন্ন করতে। আরও দু'বার থিয়েটারে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলো আমার মোটেই ভালো লাগেনি। স্পষ্টই দেখতে পেতাম যে আমার প্রতি ঠাকুরমার ব্যবহার দেখে শুধু দুঃখ হত তাঁর—তা' ছাড়া আর কিছু না—একেবারেই আর কিছু না। যতদিন যেতে লাগল, অশান্তি বেড়ে উঠল আমার। চুপ করে বসে থাকতে পারতাম না, বই পড়তে ভালো লাগত না, কাজকর্ম সব ভুলেই গেলাম। কখনও কখনও পাগলের মত হঠাৎ হেসে উঠতাম, ঠাকুরমাকে রাগাবার জন্যে যখন তখন যা' তা' করে বসতাম, সময়ে সময়ে বসে বসে চুপ করে কাঁদতামও। ভারী রোগা হয়ে পড়লাম—শেষে প্রায় অসুখই হয়ে পড়ল। থিয়েটার আর দেখান হয় না এখন তাই তিনি আমাদের কাছে আসা একেবারেই বন্ধ করে দিলেন। যখনই দেখা হত (অবশ্য সেই সিঁড়িটার ওপর) এমন গম্ভীর ভাবে নমস্কার করতেন যেন কথা কইতে আদৌ ইচ্ছে নেই তাঁর—ধীরে ধীরে নেমে চলে যেতেন। আর আমি সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠতাম। ওঁকে দেখলেই সমস্ত রক্ত যেন আমার মুখে ছুটে আসত।

···এইবার শেষ হয়ে এল। ঠিক একটি বছর আগে, যে মাসে এসে বললেন ঠাকুরমাকে যে এখানকার কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে—এবার মস্কো যেতে হবে এক বছরের জন্যে। কি হল জানি না; কিন্তু কথা শুনেই আমি আধমরার মত চেয়ারের গায়ে হেলে পড়লাম। ঠাকুরমা কিছুই বুঝলেন না। শিগ্‌গির চলে যাবেন জানিয়ে দিয়ে তিনি নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

কী করব আমি···? ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠলাম।

চলে যাবার কথা। ঠিক করলাম সেই রাত্রেই ঠাকুরমা ঘুমোলে যা হয় শেষ করে ফেলব।...তাই হল ; আমার কাপড় গুলো একটা পোঁটলা করে—যা কিছু ছিল আমার—নিয়ে কোন রকমে টলতে টলতে, মড়ার মত তাঁর ঘরে চললাম। বোধ হয় ঘণ্টাখানেক সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁর ঘরের দোরটা খুলতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন আমাকে দেখে···লোকে ভূত দেখলে যেমন হয়। ...আর দাঁড়াতে পারলাম না—পড়তে পড়তে কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলাম। আমার অবস্থা দেখে জল নিয়ে ছুটে এলেন। এত জোরে রক্ত চলছিল আমার বুকের মধ্যে যে সমস্ত মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছিল আমার—কি করছি কোনও কাণ্ড জ্ঞান ছিল না তখন। একটু সামলে নিয়ে পোঁটলাটি বিছানার ওপর রেখে তারি পাশে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লাম—চোখের জল আর বাধা মানল না। বোধ হয় তখুনি সব কথা বুঝলেন তিনি ; এমন অসহায় ভাবে চাইলেন আমার দিকে, মনে হল যেন সারা বুকটা আমার ছিঁড়ে গিয়ে গেল।

"নাস্তেন্‌কা, আমি যে কিছুই করতে পারি না। ভারী গরীব আমি ; তোমাকে বিয়ে করলে কী খাওয়াব ?"

...অনেকক্ষণ কথা হ'ল। শেষে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। বললাম ঠাকুরমার কাছে আর আমি থাকতে পারি না—পালিয়ে যাবই—সারাদিন বাঁধা থাকা সয় না আর। মস্কোতেই যাব তাঁর সঙ্গে—তাঁকে ছেড়ে একদিনও বাঁচতে পারব না। লজ্জা, ভয়, ভালোবাসা সব যেন একসঙ্গে তুমুল কোলাহল লাগিয়ে দিলে আমার মধ্যে—খালি মনে হতে লাগল তিনি প্রত্যাখান করলে বেঁচে থাকতে আর পারব না কিছুতে।

কয়েক মিনিট চুপ করে বসে থেকে, উঠে এসে আমার হাতটি ধরে বললেন, "নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা, শোন ; তোমার কাছে শপথ করছি, যদি কোনও দিন বিয়ে করবার মত অবস্থা আমার হয়—তুমিই আমাকে সুখী করবে।···তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি, এখন থেকে পৃথিবীর মধ্যে তুমিই —শুধু তুমিই আমার প্রেয়সী। মস্কো যাচ্ছি—এক বছর থাকব ; হয়ত কোনও রকমে দাঁড়াতে পারব। ফিরে এসে—যদি তখনও তুমি ভালোবাস আমাকে—শপথ করছি—মিলন হবেই আমাদের। এখন এ যে একেবারে অসম্ভব।..আমি কিছুতেই পারি না—কোন অধিকার নাই আমার তোমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেবারও। আবার বলছি—যদি এক বছরে না হয় —একদিন হবেই। অবশ্য যদি এর মধ্যে আর কারও হ'তে তোমার ইচ্ছে না হয়, (তোমাকে আমি ত কোনও বাঁধনে বাঁধতে পারি না এখন থেকে) হাত ধরেই দুজনে চলব জীবনের পথে।"

পরের দিন মস্কো চলে গেলেন। ঠিক হয়েছিল যে ঠাকুরমাকে কোনও কথাই জানান হবে না আমাদের বিষয়ে। আমার কাহিনী শেষ হয়ে এল এইবার...ঠিক একটি বছর কেটে গিয়েছে—তিনি ফিরে এসেছেন আজ তিন দিন... আর···আর....।

অধীর হয়ে আমি জিজ্ঞেস্ করলাম, "বল, বল—"

যেন সমস্ত ক্ষমতা একত্র করে নাস্তেন্‌কা বললে, "—আর এখনও একবার দেখা করতে আসেন নি।"

নাস্তেন্‌কা নীরব হল। মাথা নীচু করে, দুহাতে মুখ ঢেকে এমন করে ডুকরে কেঁদে উঠল বেচারা...গল্পের এমন উপসংহার যে কখনও মনে হয়নি আমার।

অত্যন্ত মৃদু স্বরে আরম্ভ করলাম, "নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা, দোহাই তোমার—কেঁদো না লক্ষ্মীটি। বোধ হয় এখনও এসে পঁহুছান নি তিনি...।"

বারবার মাথা নেড়ে সে বলতে লাগল, "না, না, এসেছেন —আমি জানি তিনি ফিরে এসেছেন। সেদিন চলে যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন যে আমাকে। সব কথা শেষ হয়ে গেলে দু'জনে বেড়াতে এসেছিলাম এইখানে। এই জায়গাতেই বসেছিলাম। আমার চোখে তখন আর জল ছিল না। তাঁর কথা শুনতে এত ভালো লাগত...; বলে গেলেন যে এখানে এসে পঁহুছালেই সোজা চলে আসবেন এইখানে ; যদি আমার আপত্তি না হয় তখুনই ঠাকুরমাকে সব কথা ভেঙ্গে বলা হবে। এসেছেন...নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন...তবু একবার দেখা পেলাম না।"

বলেই আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে বেচারা।

উন্মাদ হয়ে লাফিয়ে উঠে আমি বললাম, "উঃ ভগবান্···

তোমার জন্যে কি কিছুই করতে পারি না আমি? বল, বল নাস্তেন্‌কা, একবার যাব তাঁর কাছে?"

চম্‌কে উঠে, মাথা তুলে নাস্তেন্‌কা বললে, "যাবে…?"

"না, তা কি হয়! তার চেয়ে বরং একটা চিঠি লেখ—"

ঘাড় বাঁকিয়ে আমার চোখ থেকে চোখ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে সে বললে, "না, না, সে অসম্ভব—আমি পারব না লিখতে।"

তবু বকেই চললাম আমি, "অসম্ভব? কেন অসম্ভব কিসে।…অবশ্য চিঠি সব রকমেরই হয়…নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা শোন, তোমাকে কুপরামর্শ দেব না আমি; সব ঠিক করে দিচ্ছি। সেদিন তুমিই সেধে গিয়েছিলে আর আজ পারবে না কেন?"

"না, না, তা পারব না আমি; মনে হবে যেন জোর করে নিজেকে গছিয়ে দিচ্ছি…"

একটুখানি মৃদুহাসি চাপ্‌তে চাপ্‌তে বললাম, "পাগল মেয়ে,…না, না, তোমারও অধিকার আছে বৈ কি। তিনি ত কথা দিয়েই গিয়েছিলেন। আর তা ছাড়া তাঁর মনটা যে অতি উদার ছিল তা বেশ বুঝতে পারছি। তোমার সঙ্গে তাঁর আচরণের কথা ভেবে দেখ—" বকেই চললাম, নিজের যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে, "তাঁর কথাগুলো ভেবে দেখ; নিজেই শপথ করে গিয়েছেন—যদি কখনও বিয়ে করি, তোমাকেই বিয়ে করব। তোমাকেত বেঁধে রেখে যান নি। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন, যখনই ইচ্ছে হবে, 'না' বলবার। এ অবস্থায় নিজে থেকে এগিয়ে যাওয়াতে কি দোষ? তোমার উচিত…নিশ্চয়—তোমার উচিত…ধর যদি স্বপথ থেকে মুক্তিই দিতে চাও তাঁকে…"

"থামো, থামো, কি বলে লিখবে?"

"কি লিখব?"

"এই চিঠিখানা।"

"কেন? লিখব ডিয়ার স্যর—"

"ডিয়ার স্যর বলে লিখতে হবে?"

"নিশ্চয়ই…অবশ্য তাছাড়া…জানিনা…আমি…যদি লেখ…"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তারপর?"

"ডিয়ার স্যর, আমার সবিনয়ের জন্য ক্ষমা করবেন—না না ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন নাই; শুধু লেখ—"

"আপনাকে লিখতে হল; আমার অধীরতা ক্ষমা করবেন। এক বছর আশায় আশায় সুখে কাটিয়েছি, যদি আর একদিনও সন্দেহ ভয় সহ্য করতে না পারি, সে দোষ কি আমার? আপনি ফিরে এসেছেন, হয়ত আপনার মনও বদলে গিয়েছে এতদিনে। যদি তাই হয়, আমি আপনাকে কোনও দোষ দিই না, কোনও দুঃখ করি না। আপনার দোষ নাই…আপনার মনের ওপর যদি আমার কোনও দাবী নাই থাকে, সে দোষ শুধু আমার অদৃষ্টের।"

"আপনি উদারচেতা; আমার এই ব্যাকুলতায় অবজ্ঞা ভরে হাসা বা বিরক্ত হওয়া আপনার সাজে না। দীনহীনা বালিকার লেখা বলে ক্ষমা করবেন; কেউ নাই তার, তাকে বোঝাবার, তাকে উপদেশ দেবার। মন যে তার কিছুতে বারণ মানে না। যদি একটা ক্ষীণ সন্দেহ রেখা শুধু নিমেষের জন্যও তার মনে ছায়াপাত করে থাকে, ক্ষমা করবেন আপনি। আপনার দ্বারা কখনও স্বপ্নেও অমর্য্যাদা হবে না তার, যে একদিন প্রাণ দিয়ে আপনাকে ভালোবেসেছিল আর আজও তেমনি ভালোবাসে।"

নাস্তেন্‌কা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, "ঠিক্ ঠিক্ হুবহু ঐ কথাই ভাবছিলাম।" দুচোখে তার খুসীর দীপ্তি। "তুমি আমার ভাবনা ঘুচিয়ে দিলে; ঈশ্বরই পাঠিয়েছেন তোমাকে আমার কাছে; ধন্যবাদ…ধন্যবাদ।"

তার হাসিমাখা ছোট্ট মুখখানার দিকে চেয়ে বললাম, "কেন, ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন বলে?"

"ধরে নাও তাই-ই।"

"জানো নাস্তেন্‌কা, সময়ে সময়ে এমন হয় যে আর একজনের সঙ্গে একই কালে, একই পৃথিবীতে বেঁচে আছি বলে—শুধু বেঁচে আছি বলেই তাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে, তোমার কথা চিরদিন মনে করে রাখতে পারব বলে।"

"হয়েছে হয়েছে, থাক্। এখন যা বলি শোন। সেদিন কথা হয়েছিল যে এসে পঁহুছালেই অন্য একটা জানা ঠিকানায় চিঠি দেবেন আমাকে। আর যদি চিঠি দেওয়া সুবিধা না হয়,

কারণ চিঠিতে ত বলা যায় না সব কথা, তা'হলে যেদিন এসে পঁউছোবেন, সেই দিনই দশটার সময়ে দেখা করবেন এইখানে। আমি ঠিক জানি এসেছেন। আজ তিন দিন হয়ে গেল, কিন্তু এখনও চিঠি পাই নি—তাঁরও দেখা নাই। সকালে ঠাকুরমার কাছ থেকে পালান অসম্ভব। কাল সকালে আমার চিঠিখানা —দের বাড়ী দিয়ে এসো। তারাই পাঠিয়ে দেবে তাঁর ঠিকানায়। আর যদি কোনও উত্তর আসে, কাল রাত্রে নিয়ে এসো, দশটার মধ্যে ঠিক।"

"কিন্তু চিঠি?...চিঠি কই? আগে চিঠি লিখতে হবে যে। হয়ত কাল হবে না, পরশু উত্তর পাবে।"

একটু বিব্রত হয়ে নাস্তেন্‌কা বললে, 'হ্যাঁ চিঠি... কিন্তু...

কথা আর শেষ হল না। আমার কাছ থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে গোলাপের মত টকটকে লাল হয়ে উঠেই হঠাৎ আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে একখানা চিঠি—নিশ্চয়ই অনেক আগে লেখা সেটা—খামে বন্ধ, সিল্ করা, একেবারে তৈরী। চিরপরিচিত সুমধুর একটা স্মৃতির ছায়া মনে মনে হিল্লোল তুলে দিয়ে গেল।

"রো—জি—না"

দুজনাই গুণ্‌গুণ্ করে উঠলাম, "রোজিনা"। আনন্দে দিশেহারা হয়ে প্রায় বুকেই টেনে নিয়েছিলাম তাকে, আর সে ক্ষণে ক্ষণে রাঙা হয়ে উঠছিল গোলাপের মত...তেমন রাঙা হতে শুধু সেই পারে···চোখের পাতায় মুক্তার মত টলটলে জলের ফোঁটা আর তারি মাঝে তার হাসির কলকাকলী।

তাড়াতাড়ি দ্রুতস্বরে বলে উঠল, "থামো, থামো ঢের হয়েছে। এই চিঠি— এই ঠিকানায় দিয়ে এসো। গুড্‌বাই, আবার দেখা হওয়া পর্য্যন্ত। আবার কাল···কাল।"

গভীর প্রীতিভরে আমার দুটো হাত ধরে চাপ দিয়ে, মাথাটা একটু দুলিয়ে তীরের বেগে গলি দিয়ে উড়ে চলে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম তারই যাওয়ার পথ চেয়ে।

নাস্তেন্‌কা চোখের আড়াল হয়ে যেতে যেতে, কানে শুধু বাজতে লাগল, "আবার কাল···কাল।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

উদাসিনী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নদীর বেলায় পড়ে আসে বেলা ধীরে ধীরে
গাগরী ভরিয়া ফিরে চলো,
কেন উদাসিনী বুঝিতে পারি না, চাহ ফিরে
ঘাটেতে রয়েছ কেন বলো ?
বনের কুটীর তোমারে যে ডাকে নাম ধরে'
ও গাঁয়ের মেয়ে! বারে বারে,
ঘরে ফিরে এ'ল শ্যামলী ধেনুরা মাঠ চরে'
খুঁজিছে তোমাকে চারিধারে।

লতিকা-বিতানে কুসুম-বধূরা খনে খনে,
তোমারি লাগিয়া ব্যাকুলিত।
রাখাল-ছেলের বাজিতেছে বাঁশী বনে বনে,
সুরে সুরে হৃদি সুললিত।
আকাশ-বাতাস করে কানাকানি সাবধানে
গুঞ্জন-রত মধুকর।
দিনের দেবতা চলে যায় অতি দূর পানে,
হে'র তার গতি মন্থর।

সন্ধ্যারাগের মাধুরী-মিশানো মনোহারী
ভুবনে পাঠাবে সঙ্গীত—
গগন-দেউলে আরতির দীপ সারি সারি
এখনি জ্বালাবে পুরোহিত।
শেষের খেয়ায় পারের পথিক গাহে গান
হৃদি তার নাচে দুলে-দুলে,
এপার-ওপার তারি মাঝে নদী ব্যবধান
ঢেউ তার ওঠে ফুলে-ফুলে।

দিন-রজনীর এই মোহানায় ছল-ছলি'
কেন রহে তব আঁখি-তারা!
দূরে কি জীবন-বলাকার দল গেছে চলি,'
তাই কিগো মন দিশাহারা ?
তুমি ফিরে চলো আপন কুটীরে হেথা হ'তে,
যারা গেছে দূরে তারা যাক্।
যারা আছে তব পরাণ ধরিয়া কোন মতে
তাদের করো না হতবাক্।

ষ্টোভ্ ফেটালিটি

শ্রীবিমল সেন

সুদূর বম্বে সহরের চারিতলা এক বাড়ীর একটি ছোট ঘরে থাকি। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হারা উদ্দেশে এখানে আসিয়া, প্রথমে যেন অথৈ জলে পড়িয়াছিলাম। অনেক অনুসন্ধান এবং ঘোরাঘুরি করিয়া যখন প্রায় অনশনে দিন কাটিতেছিল সেই সময়ে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার এক চাকরী জুটিয়া যায়। ঘোর অন্ধকারে আলো দেখিতে পাইয়া সেই চাকরিই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম।

একলা মানুষ; কোন প্রকারে দিন কাটে। বাপ নাই, মা নাই, স্ত্রী-পুত্র পরিবার নাই; অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা কে কোথায় আছেন, তাহার সন্ধানও রাখি না। কাহারও জন্য ভাবিয়া মরিতে হয় না। তাই, মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করি—বেশ আছি।

কিন্তু সত্যই কি বেশ আছি? কখনও কখনও কর্ম্মক্লান্ত দেহে সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিয়া আসি—নিঃসঙ্গতা যখন বড় বেশী করিয়াই বুকে বাজিতে থাকে—মনে মনে ভাবি, আহা, এমন যদি এখন কেহ থাকিত, যে তাহার…যাক সে সব অবান্তর কথা, যাহা বলিতে বসিয়াছি তাহাই বলি।

সেদিন কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ঘরে একখানি চিঠি পড়িয়া আছে। এক দূর সম্পর্কীয়া বৌদিদি লিখিয়াছেন। চিঠি পত্র আমার আসে না বলিলেই হয়। তাই ক্বচিৎ কখনও কাহারও চিঠি পাইলে মন এক অকারণ পুলকে ভরিয়া ওঠে।

বৌদিদি লিখিয়াছেন—"আমার বোন সুরুচি বম্বেতে থাকে তা'ত জানই। আজ প্রায় একমাস গত হইল, তাহাদের কোন সংবাদ পাই নাই। মাও কাঁদিয়া কাটিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছিল, সুরেনের নাকি অসুখ। তারপর হইতেই একেবারে চুপচাপ। কী যে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তোমাকে তাই অনুরোধ করিতেছি একবার তাহাদের খবর লইয়া বিস্তারিত সব লিখিবে। তাহাদের বাড়ীর ঠিকানা দিলাম; সময় করিয়া আজই একবার যাইও।"

চিঠি পড়িয়া, অনেক দিন পূর্ব্বেকার একটি ঘটনার স্মৃতি মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই ঘটনার পর হইতে সুরুচিদের কোন সংবাদ লইতে পারি নাই বটে; কিন্তু তার দুরদৃষ্টের কথা সজল চোখে প্রায় নিত্যই স্মরণ করিয়া থাকি।

সে প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বের কথা। সেদিনও এই বৌদিদি সুরুচিদের চিঠি-পত্র না পাইয়া, তাহাদের সংবাদ লইতে লিখিয়াছিলেন। ঠিকানা যাহা দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের পাড়ায়, খুব নিকটেই একটি বাড়ীর ঠিকানা।

সুরুচিকেও পূর্ব্বেই চিনিতাম। বড় ভাল মেয়ে। শান্ত, নম্রমুখী, মুখে মিষ্ট হাসি আর মিষ্ট কথা লাগিয়াই থাকিত। আমার কাছে সেই ছিল আদর্শ স্থানীয়া নারী। বিবাহ হইবার পর আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার স্বামী সুরেনকেও কখনও দেখি নাই।

সে এখানে এত কাছে আছে জানিয়া অত্যন্ত পুলকিত চিত্তেই দেখা করিতে চলিলাম।

মস্তবড় বাড়ী। ছোট ছোট ঘরে, বিশ রকমের ভিন্ন জাতীয় এবং ভিন্ন দেশীয় লোকেরা সেখানে থাকে। নম্বর অনুযায়ী একটি ঘরের কাছে আসিয়া দেখি বাহিরে তালা ঝুলিতেছে।

তখন বিকাল বেলা। সকলের অফিস হইতে ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে সাধারণতঃ সকলে বাড়ীতেই থাকে। সুরুচি হয়ত অন্য কোন ঘরে গিয়া থাকিবে ভাবিয়া সম্মুখের বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলাম। এখনই কেহ না কেহ আসিবেই।

তাহাদের ঘরের পাশের ঘরে, খোলা দরজার কাছে বসিয়া একটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক কি সেলাই করিতেছিল। তাহাকে ঘিরিয়া ছোট-বড়-মাঝারি সব বয়সের পাঁচ ছয়টি উলঙ্গ নোংরা ছেলে মেয়ে কিলবিল করিতেছে। অন্যান্য অনেক ঘরেরই দরজা খোলা। ছেলেপিলেদের চেঁচামেচি এবং মেয়েদের কথাবার্ত্তা শোনা যাইতেছে।

কিছুক্ষণ পায়চারী করিবার পর পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি আমাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি চাও, বাবুজি?

বলিলাম—ঐ ঘরের সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আফিস থেকে এখনও ফেরেননি দেখছি।...তাঁর স্ত্রী কোথায় বেরিয়েছেন, বলতে পার?

স্ত্রীলোকটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিল—তাঁর স্ত্রী কোথাও বেরোননি। ঘরেই আছেন।

ঘরেই আছেন? অথচ বাহিরে তালা ঝুলিতেছে। এ কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, পুনরায় প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে সে আবার বলিল—আজ বাঙ্গালীবাবু তাঁর স্ত্রীকে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে গেছেন। মারধোরও করেছেন বোধ হয়।...আহা, বৌটা নেহাত ভালমানুষ—তাই এত সয়...

একি অদ্ভুত কথা! নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তাঁর স্ত্রী কি ঐ ঘরের ভিতর আছেন নাকি এখন?

—আর কি করবে, বাবুজি?

হায়রে, সুরুচি কি শেষে এক জানোয়ারের হাতে পড়িয়াছে?

কি করি? ইচ্ছা হইল কড়া নাড়িয়া ডাকি। কিন্তু, এ অবস্থায় উঁহাকে ডাকিয়া লজ্জিত, বিব্রত করিয়া তোলাটা ঠিক হইবে না। হয়ত ঐ ক্ষুদ্র ঘরের কোণে পড়িয়া সে নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে, আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে। আমাদের দেশে এ ঘটনা নূতন নহে। প্রায়ইত শুনিতে পাই কোন কোন বীর পুরুষ, নিজের স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিয়া পৌরুষের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু আহা, সুরুচির ভাগ্যেও এই হইয়াছে! অবশ্য, ইহাও নূতন নহে। চিরদিন দেখিয়াছি, দুনিয়ায় সরল প্রকৃতির ভালোমানুষদেরই লাঞ্ছনার [illegible] না।

আমিও যেন কেমন কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। সে এক বিশ্রী অবস্থা। এমনি সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

পাঞ্জাবনন্দিনী আবার শুনাইল—তোমরা বাঙ্গালী বাবুরা এমন, তা ত জানতাম না। বৌকে মারধোর করা, ঘরে আটকে রেখে যাওয়া...তোমরা সব লেখা-পড়া জানা লোক, ছিঃ ছিঃ ......

ইচ্ছা হইতেছিল ফিরিয়া যাই।

কিন্তু, তখন এমন একটি অবস্থা হইয়াছে যে, চলিয়া যাইতেও পারিতেছিলাম না, অথচ সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকাও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষ অবধি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তালাটা ধরিয়া নাড়া দিতে যাইব, এমনি সময়ে, অত্যন্ত নিকটে, পুরুষ কণ্ঠে কে যেন প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল—একি মশাই, কে আপনি?...কাকে চান এখানে? তালা ভাঙবার মতলব নাকি? কোত্থেকে আসছেন?

বলিতে বলিতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক হুড় মুড় করিয়া একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়িলেন। হয়ত বা ঘাড়ে হাতও দিতেন। সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি সুরেন বাবু?

—হ্যাঁ। কেন বলুন ত? ঘরে তালা বন্ধ দেখছেন, তবু, নাড়াচাড়া লাগিয়েছেন—এ আপনার কেমন ভদ্রতা? কি চাই আপনার?

ক্রোধে কান লাল হইয়া গেল। ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতেও লোকটা জানে না দেখিতেছি।

লম্বা, কালো লিকলিকে দেহ। চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা। গায়ে কালো কোট।

এই সুরুচির স্বামী-দেবতা?

নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া পরিচয় এবং আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম—কিন্তু, এ কি ব্যাপার বলুন ত? এ ভাবে ওকে ঘরে আটকে রেখে যাবার হেতু?

সুরেন এইবার অনেকটা নরম হইয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। শেষে আমায় আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া বলিল—ও-ও-ও, আপনিই [illegible]? [illegible] মাঝে মাঝে

শুনতে পাই বটে।...তা দেখুন, আপনার এই ভগ্নীটি—না, কি হন উনি, তা আপনারাই জানেন—আজকাল বড় বাড়িয়ে তুলেছেন। এই বম্বে সহরে মেয়েদের ত পর্দ্দা-টর্দ্দার বালাই নেই—তাই দেখে দেখে ইদানিং ওঁর আজ এত মোটা হয়ে গেছে যে, একটু শিক্ষা দেবার দরকার হয়ে পড়েছিল।

এই বলিয়া পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া তালা খুলিল। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আবার বলিল—আপনার বৌদিদিকে লিখে দিন গিয়ে যে, আমাদের জন্মে ভাববার দরকার নেই—ভালই আছি।...চিঠি-পত্তর লিখতে আমার ভারি কুঁড়েমি ধরে মশাই। হয়ে ওঠে না।

বাহির হইতেই বিদায় করিয়া দিতে চাহে। অসভ্য লোকটার নাকে এক ঘুঁসি বসাইয়া দিয়া চলিয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু, বেচারি সুরুচির কথা স্মরণ করিয়া দুইটা ইচ্ছাই দমন করিতে হইল। লজ্জারও মাথা খাইয়া বলিলাম—সুরুচির সঙ্গে একবার দেখাটা.......

মুখে 'না' না বলিয়াও, ভাবে-ভঙ্গিতে এমন করিয়া অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে খুব কমই দেখিয়াছি। অবশ্য, শেষে বলিল—আসুন ভেতরে।

পর্দ্দা খাটাইয়া, একটি ঘরের দুই অংশ করা হইয়াছে। বাহিরের অংশ বোধ হয় 'বৈঠকখানা', এবং ভিতরেরটা 'অন্দরমহল'। 'বৈঠকখানায়' একটা চেয়ার ছিল। কিন্তু বসিতে না বলিয়া সুরেন বলিল—দাঁড়ান একটু দেখছি।

বলিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া 'অন্দর মহলে' প্রবেশ করিল। এবং পরক্ষণেই তাহার কর্কশ চাপা কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বলিতেছে—ওকি, আবার আজ ওপাশের জানালাটা খুলে রেখেছ? এততেও শিক্ষা হল না?...ওঃ, কী বিষম মেয়ে মানুষ তুমি রে বাবা!

বলিয়া দড়াম করিয়া জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল।

আবার বলিল—যত সব বকাটে ছোঁড়া এসে জুটেছে ঐ বাড়ীটাতে। জুতো-পেটা করতে হয় এক একটাকে ধরে।...আর ওদেরই বা দোষ কি? এমন করে জানলা খুলে রাখলে কার না সাহস বাড়ে?...নাও ওঠো এখন; তোমার সেই সত্যদা' না কে দর্শন করতে এয়েছেন।

কথাগুলি আস্তে বলা হইলেও, সবই কানে আসিয়া পৌঁছাইল। সুরুচির কিন্তু সাড়াও পাওয়া গেল না। অবশ্য তাহার কথা না বলাই স্বাভাবিক। চিরদিন তাহাকে সব বেদনা এবং পীড়ন নীরবে সহিয়া যাইতে দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া সে যে নেহাৎ আমাদেরি দেশের মেয়ে...।

বৈঠকখানায় আসিয়া সুরুচি দূর হইতে গড় করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চোখ এবং মুখ দেখিয়া কোন সন্দেহই আর রহিল না যে, আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সে এই বন্ধ ঘরে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছে।

এ যেন সে সুরুচি নহে। সে সোণার বর্ণ কালি হইয়াছে। দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

'কেমন আছ' কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। তাই, বলিলাম—বৌদিদি তোমাদের চিঠিপত্র না পেয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখেছেন।...তাঁর চিঠিতেই জানলুম যে, তোমরা বম্বেতে আছ। আমি ত এই পাড়াতেই থাকি, অথচ সুরেন বাবুর সঙ্গেও কখনও দেখা হয়নি।

সুরুচি নিতান্ত সহজভাবে হাসিমুখে বলিল—আমি জানতুম যে, আপনি বম্বেতে আছেন। ওঁকে কতদিন বলেছি খোঁজ করতে।—তা' এইত দেখুন, এখন আপিস থেকে ফেরা হল; হাত পা ধুয়ে একটু বিশ্রাম করতে না করতেই খাবার দাবার সময় হবে। আবার বেরতে হয় সকাল সাড়ে আটটায়।...কেমন আছেন? অনেক দিন বাদে দেখা হল।

বলিলাম—হুঁ, অনেক দিন হল।

সুরুচি বলিল—যাক, এই পাড়াতেই আছেন; ভালই হল। দেশের লোকের মুখ দেখতে পাইনা; মাঝে মাঝে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

সুরেন নিকটে দাঁড়াইয়া একবার আমার দিকে এবং একবার সুরুচির দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। সুরুচির কথা শুনিয়া অধীরভাবে একটু নড়িয়া উঠিল। হয়ত বা কিছু বলিতও; কিন্তু সুরুচি চট করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—ওগো যাওনা, দেরি করছ কিসের জন্যে? হাত-মুখ ধুয়ে এসে একটু ঠাণ্ডা হও। আমি ততক্ষণে চায়ের জল চড়িয়ে দিই।...বসুন সত্যদা, দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ?

কী স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গতি—কণ্ঠস্বর একবারও কাঁপিল না। মুখে তেমনি মিষ্ট হাসি। দেখিয়া কে বলিবে যে, আজ হয়ত সারাদিন ধরিয়া সে ভগবানের নিকট মৃত্যু ভিক্ষা করিয়াছে। আমি যে তাহার আজিকার দুর্গতির কথা টের পাইয়াছি তাহা হয়ত সে এখনও বুঝিতে পারে নাই।

দেখিয়া মনে হইল—আমাদের দেশে এইটুকুই শুধু অবশিষ্ট আছে—নারীর মাধুর্য্য এবং মহত্ব। আর ত সব দিক দিয়াই ভগবান আমাদের হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন—ধ্বংসের মুখে।

সুরুচি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং অনেক কথাই বলিল। কিন্তু নিজের উপস্থিত জীবনের কণামাত্র আভাষও দিল না। লক্ষ্য করিলাম, আজকাল সে অনেক কথা বলিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিল।

কি জানি, হয়ত বুকের ভিতরে তাহার ঝড় বহিতেছিল; উহা সামলাইতেই তাহার এই প্রাণপণ চেষ্টা।

আরও কিছুক্ষণ পাহারা দিয়া, বুঝিবা বিশেষ প্রয়োজনেই সুরেনকে উঠিতে হইল। গামছা কাঁধে ফেলিয়া, বাথরুমের দিকে যাইতে যাইতে সুরুচিকে বলিয়া গেল—যাও. চায়ের জলটা চড়াও গিয়ে—খিদে পেয়ে গেছে। তোমার সত্যদা' না হয় একলাই একটু বসবেন'খন।

—এই যাই। বলিয়া সুরুচি 'অন্দর মহলে' প্রবেশ করিল এবং ঐ দিকে সুরেন বাথরুমের দরজা বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে যখন আবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার সেই অপরিসীম ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দুই চোখে বর্ষার বারিধারার মত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। অঞ্চলে চোখ মুছিয়া, সে একবার বাথরুমের দিকে দেখিল; শেষে কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে পড়িতে বলিল—আজ ত অনেক কিছুই দেখে গেলে, সত্যদা'। তোমার পায়ে পড়ি, এসব কিন্তু ঘুনাক্ষরেও দিদিকে কিছু লিখো না—আমার অনুরোধ। কথা দাও।

সুরুচিকে কথা দিতে কখনও দ্বিধা বোধ করি নাই। বলিলাম—আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, সুরুচি; তোমার সঙ্গে যে কেউ এমন করতে পারে, এ যে আমার ধারনায় আসে না।...আজ হয়েছিল কি?

সুরুচি বলিল—কিছুই হয়নি। ওঁর রাগটা একটু বেশি। আজ আপিস যাবার সময়ে হঠাৎ রাগ হল—ঘরে বন্ধ করে চলে গেলেন।...তা তা'তে আমার কষ্ট ত কিছু হয়নি। বাইরে যাবার দরকারই হয় না—যাইও না। ওতে আর এমন কি হয়েছে!

বলিলাম—তুমি যে এই কথাই বলবে, তা জানি; কিন্তু, আমার কাছে ব্যাপারটা লুকোতে চেষ্টা কর না, সুরুচি। ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার ঐ সুরেন বাবুকে ভাল করে একটু শিক্ষা দিয়ে যাই। বলি যে,......

বাধা দিয়া, ব্যগ্র, কাতর কণ্ঠে সুরুচি বলিল—না, না সত্যদা, খবরদার অমন কাজ করতে যেয়ো না। আমার মাথা খাও। এখানে এসেই ত অপমান সইলে—আরও চাও নাকি?

অগত্যা নীরব হইলাম।

সে বলিল—থাক, একবারটি দেখা পেলাম, এই আমার ভাগ্যি। কতদিন তোমার কথা ভেবেছি। আর বোধ হয় কোন দিন আসবে না; আজই হয়ত তোমার ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু, সত্যদা', ঘেন্না না ধরে থাকলেও, আমি অনুরোধ করছি যে, মাঝে মাঝে এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা মনেও স্থান দিয়ো না। বরং, একেবারেই আর যদি না আস—তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হব। বল, সত্যদা'—কথা দিয়ে যাও।

সুরুচি আমার কে? কেহই নহে। কিন্তু, তবু, তাহার জন্ম ব্যথায় মন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। কিসের জন্ম তাহার এই অদ্ভুত অনুরোধ, কেন এত মিনতি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বলিলাম—তা' হতে পারে না, সুরুচি। বিশেষতঃ আজ যা' দেখে গেলাম—তাতে, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারব না। তোমার ভাবনা নেই, ওসব অপমান আমার গায়ে লাগবে না।

—তোমার ত কোন দিন কিছু গায়ে লাগেনি। কিন্তু, আমার লাগবে।...সবই ত ছেড়েছ; মিছিমিছি আবার আমার জন্মে হাঙ্গামায় জড়াতে আমি দেব না।

তাহা বটে, সবই ছাড়িয়াছি। কিন্তু, সত্যই কি কোন দিন গায়ে কিছু লাগে নাই? কোনও দিন কি কাহারও জন্ম বুকে ব্যথা বাজে নাই?

কথা দিতে হইল। বলিলাম—এই কঠিন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলে বটে—আমিও যথাসাধ্য তা' পালন করে চলব। কিন্তু, আমার মন সর্ব্বদা পড়ে থাকবে এখানে। এই কথাটা শুধু মনে রেখো, সুরুচি।

—রাখব, সত্যদা'।

বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া ভিতরের অংশে প্রবেশ করিল। অনতিবিলম্বে সুরেন বাথ-রুম হইতে বাহির হইয়া, হন্ হন্ করিয়া ঘরে আসিল, এবং ভিতরে গিয়াই বলিল—ভাবছ, আমি কিছু টের পাইনি—না? বাথ-রুমের দরজা দিয়ে সব দেখেছি—জান?...ওঃ, এমন নিলর্জ্জ মেয়ে মানুষ দেখিনি, বাবা! যেই বেরিয়েছি, অমনি গিয়ে ফুসুর ফাসুর লাগিয়েছ? —কি কথা হচ্ছিল ওর সঙ্গে?

সুরুচি স্থির কণ্ঠে বলিল—সে পরে শুনো'খন। যাও, বাইরে বোসো গিয়ে—চা আনছি।

চা পান করিয়াই বিদায় গ্রহণ করিলাম। সুরুচি আর একটি কথাও বলিল না। কিন্তু, সুরেন, আমার সহিত

নীচে আসিয়া, হঠাৎ এক সময়ে বলিল—দেখুন সত্যবাবু, য' ইচ্ছে হয় মনে করতে পারেন—তা'তে আমার কিছু যাবে-আসবে না। কিন্তু, আগে থেকেই কথাটা পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই। আপনার এবং আমার স্ত্রীর ভেতর এমন কোন সম্পর্ক নেই, যাতে, যখন-তখন এখানে এসে তার খোঁজ নেবার আপনার দরকার হতে পারে। আমার ওসব পছন্দ নয় তা' বুঝতেই পারছেন। অতএব, সে চেষ্টা না করলেই সুখী হব।

এতবড় অসভ্য এবং অভদ্র লোক যে পৃথিবীতে আছে—তাহা শুধু লোকমুখেই শুনিয়াছিলাম। আজ স্বচক্ষে দেখিলাম।

বলিলাম—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার মত লোকের বাড়ীতে, একবারের বেশি দুবার আসতে কোন ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি হবে না।

বলিয়া, চলিয়া আসিলাম।

* * * *

ইহার পর আর সুরুচির কোন সংবাদ পাই নাই। শুনিয়াছিলাম যে, আমার ও-বাড়ীতে যাইবার এক মাস পরেই, তাহারা অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে। কোথায় গেল তাহারও খোঁজ লই নাই। মধ্যে মধ্যে ভাবি, সুরুচির দুরদৃষ্টের কথা; দিনগুলি তাহার কি ভাবে কাটিতেছে জানিতেও ইচ্ছা করে।

আজ ছয় মাসের পর, বৌদিদির চিঠি পাইয়া, এবং সুরুচির নূতন বাড়ীর ঠিকানা জানিতে পারিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। যত খুসি রাগ করুক—কিন্তু যাওয়াই ঠিক করিলাম—এবং বাহির হইলাম বেলা দুইটার সময়ে—যে সময়ে ঐ অসভ্য লোকটার বাড়ীতে না থাকার কথা।

অনেকে খোঁজাখুঁজির পর, বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। একেবারে সহরের ঘিঞ্জীর ভিতর। নোংরা এবং বিশ্রী। বাসিন্দারাও তেমনি। বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাম্বুলেন্সের একটা 'লরি' দাঁড়াইয়া ছিল।

ঘরের নম্বর খুঁজিতে খুঁজিতে চারিতলায় আসিয়া দেখি, সেখানে অনেক লোকের ভীড়। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সবার চোখেই উত্তেজিত ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি। নীল উর্দ্দী পরা, হলদে সামলা মাথায়, দুইজন পুলিশের সেপাই একটি ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। অন্যান্য সকলের দৃষ্টিও সেই ঘরের দিকেই নিবদ্ধ। ঘরের ভিতর হইতে ঘন ধোঁয়া এবং পোড়া গন্ধ বাহির হইয়া চারিদিক ভরিয়া তুলিয়াছে।

ধোঁয়া একটু সরিলে, ঘরের নম্বর দেখিয়া বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! ঐ ত সুরুচিদের ঘর! আজ আবার এ কি দেখিতে আসিলাম?

সেই সময়ে অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা 'ষ্ট্রেচার'এ করিয়া কাহাকে লইয়া বাহিরে আসিল। সঙ্গে একজন পুলিশের সার্জ্জেন্ট। চুলগুলি পুড়িয়া গিয়াছে। বীভৎস হইয়া গেলেও, মুখ দেখিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না—সে কে। সার্জ্জেন্ট তাহার মুখ ঢাকিয়া দিয়া, গাড়ীতে লইয়া যাইতে আদেশ দিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মত সার্জ্জেন্টের সম্মুখীন হইয়া, নিজের পরিচয় দিয়া, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে নির্ব্বিকার ভাবে জানাইল—'ষ্টোভ অ্যাক্সিডেন্ট', আর কি! চা করতে গিয়ে শাড়ীতে আগুন ধরে গেছল?

জিজ্ঞাসা করিলাম—মারা গেছে?

—না। তবে, বাঁচবে না বেশিক্ষণ।

—স্বামীটি বোধ হয় আফিসে?

—হ্যাঁ, তাঁকে ফোন্ করা হয়েছে—K. E. Hospital-এ আসতে। আপনিও আসতে পারেন।

সঙ্গে চলিলাম।

মনে মনে পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের তারিফ করিতে লাগিলাম; ঘটনাগুলি কী অদ্ভুত ভাবেই না সাজাইয়াছেন! আজই বৌদিদির চিঠি পাইলাম, আজই বাহির হইয়া পড়িলাম খোঁজ লইতে—আর আজই সুরুচি চলিল—পরপারের পথে!

কী সুন্দর! কী বিচিত্র!

হাঁসপাতালে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, সুরুচির জীবনের ক্ষীণ প্রদীপটি নিভিয়া গেল। একটিবার শুধু সে বলিয়াছিল—'চল্লুম, সত্যদা'।

মুখে ছিল তাহার, ব্যথাতুর হাসি।

খবরের কাগজের এক কোণে সংবাদ বাহির হইল—'ষ্টোভ ফেটালিটি।'

করোনার কোর্ট বসাইয়া, 'ভারডিক্ট' দিলেন—Accidental death, due to extensive burns.

লোকে তাহাই বুঝিল। বুঝিয়া গায়েও মাখিল না। বম্বে সহরে, 'ষ্টোভ ফেটালিটি' ত প্রায় নিত্যই লাগিয়া আছে।

আমারি শুধু মন মানিতে চাহিল না।

সত্যই কি, অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ?

সত্যই কি, অসাবধানতার জন্য কাপড়ে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল?

ইচ্ছা করে, ঐ জানোয়ার সুরেনটার ঘাড় ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি।

শ্রীবিমল সেন

যে মালা মোর

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার

যে মালা মোর পরিয়ে দিলেম
থাকবে কি তা গলে পরে',
নিত্যকালের ভাঙাগড়ায়
পড়্‌বে না তার কুসুম ঝরে ?

যে বাণী মোর জাগলো মনে
পাপড়ি-ঝরা ফুলের বনে,
দলিত যা পলে পলে
কালের চরণে,
রাখবে স্মরণে ?

ভাণ্ডারে তার দেবে না কি
যেকথা মোর আছে বাকী,
নিত্য পূজায় চেয়েছি যা
যাত্রাপথের আয়ু ঘরে

ভবের হাটে বেচা-কেনায়
খেলার বাসর-ঘরে
যে প্রতিমা গড়েছিলেম
ধূলির মুঠি ভ'রে—

কবে কখন একটি ক্ষণে
ভাঙ্গিলে হাট নিরজনে
হিসাব নিকাশ চুকিবে তার
কালের হরণে
গভীর মরণে।

জ্বল্‌বে না আর একটি বাতি,
তারায় তারায় কাঁদবে সাথী,
বাঁধন হারা আঁধার রাতি
চিহ্ন তাহার রাখবে না আর
উষার সিঁথি পরে।

যে মালা মোর পরিয়ে দিলেম
আপন হাতে তোমার গলে
ফুটবে বঁধু তাহার কুসুম
আমার চিতাবাসর তলে।

পথিক বন্ধু

শ্রীঅপরাজিতা ঘোষ এম্-এ

পশ্চিমের ধূসর বালুর মাঝখান দিয়া দীর্ঘকায় ট্রেনখানি আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে দূরে নগ্ন নিরাভরণ পাহাড়গুলি মেঘের বুকে মাথা রাখিয়া ছায়ার মত দাঁড়াইয়া আছে। যতদূর দৃষ্টি চলে চারিদিকে শুধু বৈরাগীর ঔদাসীন্য; বাংলার শ্যামল সৌন্দর্য্যে যৌবনের যে সজ্জা প্রকৃতির বুকে জাগিয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমের ধূসরতার মাঝে তাহা ভোগ ত্যাগী বৈরাগীর গৈরিক বসনে রূপান্তরিত হইয়া গেল। উদাসীন প্রকৃতির সমস্ত বিমুখতাকে অগ্রাহ্য করিয়া শুধু মাঝে মাঝে বাবলাগাছের শুকনো ডালে সোনালী রংএর এক রাশ ফুল বৈশাখের দীপ্ত রৌদ্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া প্রকৃতিকে সাজাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। বাহিরের এই গেরুয়া সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করিবার যাত্রী বড় কেহ একটা নাই। গ্রীষ্মের উত্তাপ ও দীর্ঘপথ পর্য্যটনের ক্লান্তিকে ভুলিয়া থাকিবার অভিপ্রায়ে অধিকাংশ যাত্রী শুইয়া বসিয়া নিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত। মেয়ে-গাড়ীগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আব্দারে চীৎকারে মুখর। শুধু এক কোণে বসিয়া ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধা নিঃশব্দে কোলাহলের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল। বাহিরের বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন শুষ্কদৃশ্যের মাঝে যেন সে আপনার জীবনের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাইল। সামনের বেঞ্চখানি জুড়িয়া তাহারই সমবয়সী এক বৃদ্ধা নাতি-নাতনী সহ সমস্ত সংসারটিকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন। মিষ্টিগলায় অস্ফুট উচ্চারণে যখন ছোট্ট খোকাটি 'দাদি' 'দাদি' বলিয়া ঠাকু'মার কোলখানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে, তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট বৃদ্ধার সঙ্গীহীন জীবনখানি দুর্ব্বহ মনে হইতে থাকে। মনে হয়, যৌবনের উষ্ণ রক্তস্রোত শিরায় শিরায় আপনার জয়গান গাহিয়া যেদিন সংসারের সব কিছু তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছিল— স্নেহ ভালবাসার বন্ধনকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া একাকীত্বের স্তুতিবাদে কান ভরাইয়া প্রাণকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল— সেদিন কতো বড় প্রতারণাই সে করিয়াছিল। কিংবা হয়তো সেটা তাহার প্রতারণা নয়—হয়তো মানুষের স্বাভাবিক ভ্রান্তি এটা চক্ষুর সম্মুখে ক্ষুদ্রতম সময় লইয়া যে বর্ত্তমানটুকু জমিয়া থাকে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া দূরের দিকে তাকাইতে বুঝি সে অক্ষম। তাই যখন যৌবনের শক্তি নিজেকে শক্ত করিয়া দাঁড় করাইবার ক্ষমতা দিয়াছিল, তখন চোখে পড়ে নাই যে একদিন এই শক্তির শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া যাইবে—সোজা হইয়া দাঁড়াইবার যে মেরু ও তাহা স্বভাবধর্ম্মে কুব্জ হইয়া আসিবে—কোথায় তখন নির্ভর পাইব? তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার অবসর মিলে নাই, প্রয়োজনও মনে পড়ে নাই; তাই যেদিন হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতে শক্তির শেষ হইল, সেদিন নিঃসহায় জানিয়া মনটা কাঁদিয়া উঠল; কিন্তু আর তো সময় নাই ভুল সংশোধনের! বৃদ্ধার কানের কাছে এক প্রকার হারানো সংসারের মায়াগুঞ্জন অস্ফুটে ধ্বনিত হইতে লাগিল—আর মাঝে মাঝে নিজের শুষ্কজীবনের মরুছায়ার চিত্র চোখের সামনে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আনমনা করিয়া তুলিতেছিল। মনের এই ছায়াচিত্রের সামনে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নিমীলিত দৃষ্টির মাঝে অতীতের ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

* * *

চল্লিশ বছর আগের কথা, সেও এমনি ট্রেনের পথ! অমাবস্যার রাত সেদিন; কার্ত্তিক অমাবস্যার দেয়ালী উৎসব। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, রাত্রি প্রায় ৮টা বাজে। আগ্রা হইতে রওয়ানা হইয়া মহেন্দ্র টুণ্ডলা

ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সঙ্গের যৎসামান্য মালপত্রগুলিকে সাবধানে কুলির জিম্মায় রাখিয়া ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সে প্লাট্‌ফর্মে পায়চারি করিতেছিল। বেশ শীত পড়িয়া গিয়াছে, অন্ততঃপক্ষে বারমাস কলিকাতাবাসী বাবুর পক্ষে পশ্চিমের সেই কন্‌কনে হাওয়াটাই যথেষ্ট মনে হইতেছিল; চারিদিকে কুয়াশাও বেশ গাঢ় হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে; মহেন্দ্র খানিকক্ষণ কয়েকটা বুকষ্টলের কাছে ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে নিঃসঙ্গ রাতটার খোরাকের মত একটী ইংরাজী সাপ্তাহিক কিনিয়া লইয়া জনতার ভিড় হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সরিয়া একটুখানি চলিয়া আসিতেই চোখে পড়িল, দূরে এবং অদূরে কুয়াশার অন্ধকারের মাঝে দেয়ালী উৎসবের আলোর মালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আলো-অন্ধকারের বিচিত্র সৌন্দর্য্যটুকু মহেন্দ্রকে যেন মোহিত করিয়া তুলিল; প্রবাসের তিনটি দিনরাত্রির সবখানি মাধুর্য্যের স্মৃতিকে যেন দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য সে অন্ধকারে তাহার একান্ত সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বাংলার চিরশ্যামল সৌন্দর্য্যের মাঝেও যাহার অভাব আছে, ধূসর আগ্রার প্রস্তরতাজে যে তাহা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই অনুভূতিই মহেন্দ্রের চিত্তকে দোলা দিতে লাগিল। খানিকক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইতেই চোখে পড়িল, ঠিক তাহার পশ্চাতে আপাদমস্তক একটী কম্বলে আবৃত করিয়া প্ল্যাটফর্মের শেষ লাইট্‌পোষ্টের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে এক ক্ষীণ-কায়া তরুণী। মুখখানা তাহার অন্ধকারের দিকে ফিরানো, তাই বিশেষ কিছু আর চোখে পড়ে না। লোকের ভিড় হইতে দূরে আধ-অন্ধকারের মাঝে একটি অপরিচিতা মেয়ের সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে মহেন্দ্রের মনটা একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি সে ভিড়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল......

কাল্‌কা-সিম্‌লা-প্যাসেঞ্জার আসিবার সময় হইয়াছে, সিগ-ন্যাল্‌ ডাউন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ধাঁধাঁইয়া গাড়ীর মস্ত বড় আগুনের গোলার মত চোখ দুটো দেখা দিল; সমস্ত যাত্রী মুহূর্ত্তের মধ্যে সচকিত হইয়া যে যাহার মালপত্রের তত্ত্বাবধানে লাগিয়া গেল; অত বড় প্ল্যাটফর্মের একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত চাঞ্চল্যের কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র যাত্রীর ওঠা-নামা সুরু হইয়া গেল। কয়েক মিনিট মাত্র—তারপরেই বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল।

ইণ্টার ক্লাসের মস্ত কামরাখানিতে অধিকাংশ জায়গাই খালি পড়িয়া আছে। একটী জানালার পাশে জায়গা করিয়া বসিয়া পড়িয়া মহেন্দ্র এতক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে মুখ বাড়াইয়া লোকজনের যাতায়াত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কথা বলার লোক আর একটিও নাই, শুধু দীর্ঘকায় জনতিনেক হিন্দুস্থানী আগাগোড়া মুড়িয়া আরামে টান হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের দিকে চাহিয়া সারা রাত্রির নিঃসঙ্গতা যেন মহেন্দ্রকে চিন্তিত করিয়া তুলিল; হাতের পত্রিকাখানিও বিশেষ আর আশার বাণী শুনাইল না!

এমন সময়ে হঠাৎ চোখে পড়িল, সেই কামরারই দরজার হাতলটি ধরিয়া একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। ছেলেটিকে দেখামাত্র প্রথম নজরেই তাহাকে পশ্চিম দেশীয় বলিয়া ঠাহর করিয়া লইতে মহেন্দ্রের কিছুমাত্র ভুল হইল না, তাই অনাবশ্যক কোনও কৌতূহলও আর জাগিল না; কিন্তু তাহার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেই চোখে পড়িল যে পাশে দাঁড়াইয়া সেই তরুণী। মনটা তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু কেন যে একটা অহেতুক চাঞ্চল্য তাহার মনের মাঝে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল, তাহার কোনও কারণ যেন সে নিজেই পাইতেছিল না। চার চোখের মিলন-মাত্রে যে প্রণয়ের কাহিনী উপকথা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে, তাহাতে মহেন্দ্রের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই, এবং সে-প্রকৃতির ছেলেও সে নয়; আগন্তুকার দিক দিয়াও কোনও কারণ বোধ হয় কাহারো চোখে বিশেষ পড়িত না; কেননা, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া লক্ষ্য করিবার মত কিছুই তাহাতে ছিল না;—তবু যেন মহেন্দ্রের নিকটে কোথায় একটা বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব ধরা পড়িল, যাহাতে প্রথমেই তাহার দিকে চোখ না পড়িয়া পারিল না। একটু কৌতূহলী হইয়া সে চাহিয়া রহিল। ছেলেটিকে তাহারই সঙ্গী বলিয়া মনে হইল, যদিও প্ল্যাটফর্মে একটিবারেও তাহাকে চোখে পড়ে নাই। মেয়েটির পোষাক পরিচ্ছদ ভালভাবে

চোখে পড়ে না—কম্বলে এমনি সর্বাঙ্গ আবৃত—কাজেই কোন্ দেশীয়া তাহাও বুঝিবার উপায় নাই—তবে সঙ্গীটি যে হিন্দুস্থানী তাহাতে সন্দেহ নাই ; পরণে তাহার ঢিলা পায়জামার উপরে ডোরাকাটা সার্ট, গলায় জড়ানো একটী মাফ্লার, গায়ে খয়েরী রংএর গরম কোট, মাথায় উঁচু একটী টুপী। কামরায় ঢুকিয়া কুলির মাথা হইতে মালপত্র নামাইয়া লইয়া তাহাকে পয়সা চুকাইবার পালাও শেষ হইয়া গেল। সদ্য কলিকাতা আগত, হাম্, তোম্ পর্য্যন্ত হিন্দীজ্ঞানী মহেন্দ্র তাহার অনর্গল হিন্দী শুনিয়া নিঃসংশয়ে তাহাকে দেশী বলিয়া মানিয়া লইলেন ; কিন্তু তাহার ঐ সঙ্গীটকে কিছুতেই যেন পশ্চিমা বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতেছিল না; তাহার মুখের উপর যে স্নিগ্ধ কমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে হিন্দুস্থানী বলিতে মহেন্দ্রের ঘোর আপত্তি ; যদিও বাঙ্গালী ঘরের মেয়েসুলভ লজ্জা সঙ্কোচের চিহ্নও তাহাতে কিছু ছিল না। শান্ত অথচ দৃঢ় মুখখানার দিকে তাই মহেন্দ্র বারে বারে সন্দিগ্ধভাবে চাহিতে লাগিল।

কুলি বিদায় লইতেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইল, জানলার কাছে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি চা খাবে ?"—মহেন্দ্র চম্‌কাইয়া উঠিল—একি তবে বাঙ্গালী নাকি ? মেয়েটি একটুখানি হাসিয়া মাথা নাড়িল, ছেলেটি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া বেঞ্চের উপর হইতে টুপিটি তুলিয়া লইয়া বলিল—"আচ্ছা, তুমি তাহলে ততক্ষণ জায়গা ক'রে রাখো, আমি চা খেয়ে আসছি। এখনও বারো মিনিট বাকী গাড়ী ছাড়তে।" ভাইটি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়া গেল, দিদি তাহার গতির দিকে চাহিয়া আবার আপন মনে একটুখানি হাসিল।

"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, কলকাতা বুঝি ?"—মহেন্দ্র চিরদিনই এমন অতিসাহসী ; নিজের মধ্যে তাহার কোথাও বিন্দুমাত্র গোলমাল নাই, তাই ভয় ও সঙ্কোচকে ভদ্রতার আবরণে ঢাকিতেও সে অভ্যস্ত নয়। নিতান্ত অপরিচিত এই মেয়েটিকে বিনা ভূমিকাতেই তাই এমনি ফস্ করিয়া সম্বোধন করিতেও তাহার কিছুমাত্র বাধিল না। মেয়েটি প্রশ্ন শুনিয়া সচকিতে মুখ ফিরাইল, এতক্ষণে তাহার ভাল করিয়া নজরে পড়িল যে তাহারই দেশের ভাই পাশে বসিয়া সপ্রশ্নে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে ; মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন তাহাকে পরম পরিচিত বলিয়া মনে হইল, স্মিতহাস্যে কমলা উত্তর করিল—'না, আপাততঃ বেনারস যাচ্ছি।' 'বাঃ বেশ তো, একই জায়গার যাত্রী তাহলে।' বলিয়া মহেন্দ্র যেন নিতান্ত নিশ্চিন্তচিত্তে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল ; বসিয়া বসিয়া গল্প জমাইলে হয়তো বা রাতের ঘুমের সুযোগটুকু হারাইতে হইবে, অথচ তাহাদের কাছে ঘুমের মূল্যটা বড় বেশী রকম। সে উঠিয়া একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া লইল, তিনটি অবশিষ্ট বেঞ্চ জুড়িয়া যে তিনটি ব্যক্তি এত গোলমালেও নিঃসাড়ে পড়িয়া ছিল, তাহাদের কাহারো পায়ের কাছে শুইবার প্রবৃত্তি তাহার নাই—কাজেই বাঙ্কের উপরেই স্থান করিতে হইল ; অবশ্য এ জায়গা চিরদিনই কমলার প্রিয়, কেন না ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলির হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া অনেক সময়ে এখানে নিরাপদে রাত কাটানো যায়। দুইজনের দুইখানি কম্বল বিছাইয়া সে জায়গা অধিকার করিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া দিল ; ঘড়ির কাঁটাটা সরিতে সরিতে প্রায় শেষ জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—আর মিনিট খানেক—তারপরেই শত সহস্র যাত্রীকে দোলা দিয়া এই বিরাট বপুখানি আলোর আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এখনও সন্তুর চা খাওয়া হয় না ? কমলার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুতপদে সন্তোষ দেখা দিল। ঢং—ঢং—ঢং—গাড়ী ছাড়িয়া দিল, বোধ হয় ৮—২৪।

*   *   *   *

দুইপাশে গাঢ় অন্ধকার ; কোন লোকালয় নাই—কোথাও আলোর চিহ্ন মাত্র নাই। যোজনব্যাপী প্রান্তর গুলি অসহায়, পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে ; মনে হয়, কাহারো দৃষ্টি বুঝি ঐ নির্জ্জন ক্ষেত্রের বুকে কোনও কম্পন জাগায় না। শুধু দিনান্তে একটি বার দৈত্যের মত গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার বক্ষ দলন করিয়া গাড়ীগুলি আপনার গতির পথে অগ্রসর হয়। চির-নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে সেই গর্জ্জন বাজিতে থাকে—দূর হইতে দূরে ; বনে বনান্তরে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া সে মুখর হইয়া ওঠে। নিকষ কালো

অন্ধকার—তাহাকেও যেন কৃষ্ণতর করিয়া স্থানে স্থানে ছায়ার মত গাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বিন্দুমাত্র শব্দ নাই, গুঞ্জন নাই, প্রকৃতির ঝিল্লীরবও বুঝি সে স্তব্ধতার মাঝে নিঃশ্বাস চাপিয়া আছে।—রাত্রি একটা পার হইয়া গিয়াছে। সব যাত্রী এতক্ষণে গভীর ঘুমে অচেতন,—বাহিরের নিস্তব্ধতার অনুরূপ গভীর শান্তি ও নীরবতা সেখানেও বিরাজ করে। শুধু মাঝে মাঝে দুএকটা ষ্টেশনের সন্নিকটে গিয়া একটু চাঞ্চল্য কোলাহল সাড়া দেয়—ওঠা নামার ব্যতিব্যস্ততায় চারিদিক ধ্বনিত হইয়া ওঠে, আবার সব চুপ। এই অসহ্য নীরবতার মাঝে একা মহেন্দ্র চোখ চাহিয়া বসিয়া আছে। গায়ের কাপড় খানিতে যতদূর সম্ভব হাত পা গুলিকে শীতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া সে কনুইতে ভর দিয়া শুইয়া আছে, মাথাটা পর্য্যন্ত বালিশে ঠেকায় নাই। এক একবার পাশের জানালার কাঁচের সার্শিখানি দূরে সরাইয়া বাহিরে মুখ বাড়ায়—অন্ধকারের মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া দৃষ্টি ফিরিয়া আসে, ধারালো শীতের হাওয়া আসিয়া মুখের উপরে আছাড় খাইয়া পড়ে,—বাধ্য হইয়া সে ভিতরে মাথাটা টানিয়া আনে, সার্শি তুলিয়া দিয়া আবার হাতের উপরে ভর করিয়া মাথাটা রাখে—চোখ মেলিয়া সকলের দিকে তাকায়। থাকিয়া থাকিয়া উন্টা দিকে বাঙ্কের উপরে চোখ পড়ে,—দুই ভাই বোনে কি আরামে ঘুমে অচেতন। ইচ্ছা করে যেন শক্ত করিয়া নাড়া দিয়া তাহাদের তুলিয়া দেয়, বলে, 'আমার যখন ঘুম আসিতেছে না, তখন তোমাদেরও ঘুমাইবার অধিকার নাই' কিন্তু কার্য্যত তাহা আর হইয়া উঠে না—শুধু চাহিয়া চাহিয়া ঈর্ষায় সে জ্বলে। এত আশা করিয়া কেনা পত্রিকাখানি অনাদৃত হইয়া হাতের পেশনে একেবারে মুষড়াইয়া হাতের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া আছে, সেদিকে মহেন্দ্রের খেয়াল নাই। শুধু অনিদ্রিত মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিয়া কতো সম্ভব অসম্ভব চিন্তা একটার পর একটা আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিল ঐ দুইটি অজানা নিদ্রিত প্রাণীর মুখের পানে চাহিয়া। অন্যমনস্ক হইয়া সব ভুলিয়া মহেন্দ্রের দৃষ্টি কমলার নিদ্রাকাতর মুখের মাঝে বদ্ধ হইয়া রহিল; কি যেন একটা অজানা ব্যথার ভারে তাহার বুকখানা ভারী

দারুণ শীত কম্বলখানায় আর মানিতে চাহে না, শীতের আধিক্যে ঘুমের মধ্যেও একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে করিতে কমলা এপাশ ওপাশ করিয়া নড়াচড়া করিতেছিল; তাহার অর্দ্ধচৈতন্য চেতনার অস্বস্তিটা হঠাৎ একেবার বিরক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। কিসের এক তীব্র গন্ধ যেন নাকে ঢুকিয়া ঘুমের পর্দ্দাটাকে চোখ হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে চোখ মেলিল। চোখ চাহিয়া পাশ ফিরিতেই হঠাৎ মহেন্দ্রের নিবদ্ধ দৃষ্টির সহিত চোখাচোখী হইয়া গেল। এত গভীর রাত্রে নিতান্ত অপরিচিতের চোখের একাগ্র দৃষ্টি এমন-ভাবে অনুভব করিয়া কমলা একটুখানি লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাকে সঙ্কোচের কোনও অবসর না দিয়া মহেন্দ্র সহাস্যে বলিয়া উঠিল—"বাপরে, ধন্য ঘুম আপনাদের! সেই যে ৯টা না বাজতে চোখ বুজলেন, আর সাড়াটি নেই।"

কমলার বুকখানাও যেন এই অনাবিল হাস্যের স্পর্শে দ্বিধামুক্ত হইয়া গেল। কোনো দিনই সে অপরিচিতের সন্নিধানে বিশেষ অপ্রতিভ হয় না, তবু হয়তো সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করিতে বাধে; কোথাও থাকে মনের একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব যেখানে প্রবেশেরও জায়গা পায় না—আপনার জন বলিয়া ভাইএর দাবীতে বন্ধুর অধিকারে মুহূর্ত্তের মাঝে মন অধিকার করিয়া লয়; আর কতো জায়গায় শুধু হৃদ্যতাহীন ভদ্রতার একটা ধারকরা পালিশ আবরণ; সেই সব ছদ্মব্যবহার কমলার ধাতে পোষায় না, তবুতো তারই প্রয়োজন কতো।—এখানে হঠাৎ এমন স্বাভাবিক বন্ধু-প্রীতির উচ্ছ্বাস দেখিয়া কমলাও সুখী হইল, মনে মনে বন্ধুর সম্বর্দ্ধনা করিল। হাসিয়া সে উত্তর দিল—"বাঃ, ঘুমোবো না? সারারাত তা'হলে কি শীতের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপবো নাকি? আচ্ছা, বলতে পারেন রাত কতো?"

"কি জানি, ঠিক তো বলতে পারিনা, তবে কানপুর ছাড়িয়ে এসেছি অনেকক্ষণ, বোধ হয় ১॥টা ২টো হবে এখন।"

"ওঃ, তা'হলে তো আরও চার ঘণ্টা ঘুমোবার সময় মিলবে। মোগলসরাই তো সেই ৬ টায়,—নয়।"

বিচিত্রা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

বিশ্রাম

শ্রীবিজয়কুমার সেনগুপ্ত

"হ্যাঃ কিন্তু তা হবে না, আমি কখনো আপনাকে আর ঘুমুতে দিচ্ছিনা।"

"তবে কি কোরবো, জেগে বসে?"

"কেন, আসুন গল্প করি।"

"হুঁ।" বলিয়া কমলা একটু হাসিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো তাহার ঘুমে আবার জুড়িয়া আসিল। মহেন্দ্র তাহার নিমীলিত চোখের পানে চাহিয়া যেন সত্যই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল; ডাক দিয়া কহিল, 'একি সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছেন নাকি? এ কিন্তু ভারী অন্যায় আপনার; আমার চোখে এক ফোঁটা ঘুমের নাম নেই, আর আপনারা দুজনে একেবারে যে কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুচ্ছেন; যাই মনে করুন না কেন, আমার ভারী ঈর্ষা হচ্ছিল আপনাদের উপরে, সত্যি ভাবছিলাম কি জানেন, দিই ডেকে তুলে।"

কমলা জোর করিয়া চোখের পাতা টানিয়া তুলিল, চোখ দুইটা যেন জ্বালা করিতে লাগিল; তবু বন্ধুর এত অনুরোধের অসম্মান হয়—তাই চোখ খুলিল; বলিল, "বেশ তো আপনিও কেন ঘুমিয়ে নিলেন না? জায়গা তো ওখানে ঢের রয়েছে।"

মহেন্দ্র যুক্তি দিল যে ট্রেণের পথে ঘুম তাহার একেবারেই অসম্ভব হয়—সেকি এতক্ষণ কম চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু সে যুক্তিতে তো কমলার ঘুম ভাঙেনা, শীতের মধ্যে জাগিয়া বসিয়া গল্প করা যে কতদূর কষ্টকর তাহা সেই বোঝে! কিন্তু মহেন্দ্র তাহা কিছুতেই বুঝিবে না, সেতো আর কমলাকে নীচে নামিয়া আসিয়া শীত ভোগ করিতে বলে নাই, বেশ তো কম্বলের তলে শুইয়াই গল্প চলুক না ক্ষতি কি! অগত্যাই জোর করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। কথায় কথায় আর একটা ষ্টেশন আসিয়া পড়ে। কমলা বলে, "অনেক তো গল্প হ'লো, এবারে ঘুমুই?"

"বাঃ, ওকথা যে ভুলতেই পারছেন না দেখছি, আর বেশী রাত নেই, এলাহাবাদ তো গেল, এই বারে তিনটা হবে বোধহয়।"

"ওই যে কতোগুলো কাবুলিওয়ালা কি সব হিংএর বোঝা নিয়ে উঠেছে—ওরাই তো আমার ঘুম ভাঙালে।" একটু হাসিয়া কমলা তাহার কাবুলিওয়ালা সহযাত্রীদের অনুযোগ করিল।

"কিন্তু, আমি ওদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, তব্‌তো ঘুমটা আপনার ভাঙলো! যাক্—ঘুম আর হবে না, এ আমি ব'লে রাখছি। সে চেষ্টা করেন তো বেজায় রাগ করবো কিন্তু!"

কমলা এত দৌরাত্ম্যে হাসিয়া উঠিল।

মহেন্দ্র তাহার যাবতীয় কথার ভাণ্ডার খুলিয়া বসিল; তাহার কোনও অর্থও সময় সময় পাওয়া যায় না এত কথার আধিক্যে কমলার আর কথা বলিবার ফুর্‌সৎও নাই, মাঝে মাঝে দুই একটা মন্তব্য দিয়াই সে খালাস। হঠাৎ মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আচ্ছা—বেশ, এতদূর লেখা পড়া শিখ্‌লেন—এরপরে কি করবেন।"

"কাজের অভাব কি বলুন, যা করবো তাতেই কাজে লেগে যাবো।"

"তা হোক্—কেন, সংসারী হবেন না বুঝি"! এ রকম প্রশ্নের জন্য কমলা প্রস্তুত ছিল না। যতই হোক না কেন, অপরিচিত ব্যক্তি, এতখানি অগ্রসর হইবার তাহার কি অধিকার। মনে মনে একটু বিব্রত হইয়া কমলা ইতস্ততঃ ভাবে তাহার দিকে চাহিল। তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া মহেন্দ্র নিঃসঙ্কোচে আবার প্রশ্ন করিল—"কিছু মনে করবেন না আমার কথায়। এমনিই আমার স্বভাব! তা যাক্, সত্যি বলুন না, সংসারী হ'তে দোষ কি?"

"সংসারেই তো আছি! মা বাপ সব রয়েছেন, তবে আবার কি?"

"না তা নয়—বলুন সত্যি ক'রে।"

না বোঝার ভান করিয়া থাকিলেই ছাড়িবার পাত্র সে নয়, কাজেই অগত্যা কমলা উত্তর দিল, "কি দরকার বলুন, এইতো বেশ আছি, কোনও তো অভাব নেই; সংসারী হ'য়ে শুধু ঝঞ্ঝাট বাড়ানো বৈ তো নয়?"

অকস্মাৎ যেন মহেন্দ্রের সহাস্য মুখখানা একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল, "তা নয়, ভুল বলছেন। আজ কি না বয়সের জোর রয়েছে, তাই মনে হয় কোনও কিছুরই আর দরকার নেই। কিন্তু চিরদিনই কি এ সময়টা থাকবে? তা থাকে না, তখন মনে হয়, যদি কেউ থাকতো তার উপরে ভার দিয়ে বাঁচতাম। —আপনি হয়তো বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু এ

সত্যি ; এই জন্যে লোকে বিয়ে করে—সংসারী হ'তে চায়। আজ কালকার দিনে ওটা আপনাদের একটা ভুল ধারণা।"

কমলা ঈষৎ লজ্জা পাইল ; কিন্তু এত সুযুক্তিতেও তাহার বোধহয় মত পরিবর্ত্তন হইল না। বেশ একটু জোরের সঙ্গে সে হাসিয়া উঠিল, মুখে কিছু বলিল না। এ সব কথা নিয়া তর্ক করিবার কোনও প্রবৃত্তিও তাহার নাই। অথচ তাহার হাসির অর্থটুকু পরিষ্কার।—মিনিট কয়েক চুপচাপ—এ প্রসঙ্গের ঐখানেই শেষ। চুপ করিয়া থাকিবার লোকই মহেন্দ্র নয় ; মিনিট কয়েক পূর্ব্বের সুগভীর তত্ত্বের প্রেরণা কোথায় চলিয়া গিয়াছে ; তাহার সহজ কণ্ঠে সে আবার বলিয়া উঠিল—"উঃ রাত কি কাট্‌বে না, আমার যে খিদে পেয়ে গেল।"

কমলা হাসিয়া ফেলিল "বেশ তো খান্, খিদে যখন পেয়েছে ; কিন্তু রাত তিনটায় কারো খিদে পায় তা এই প্রথম দেখ্‌লাম।"

"আপনারও নিশ্চয় পেয়েছে, সেই তো ছ'টার আগে খেয়ে আগ্রা থেকে বেরিয়েছি, এতক্ষণে পাবে না খিদে ? খাবেন ? আমার সঙ্গে দয়ালবাগ ভাণ্ডারীর' খাঁটি দুধের খাবার আছে—খান্।"

এতক্ষণে সন্তোষের সাড়া পাওয়া গেল ; কম্বল ফাঁক করিয়া অতি সন্তর্পণে মুখখানা একটু বাহির করিয়া হাঁক দিয়া উঠিল—"কিসের ব্যবস্থা টের পাচ্ছি। ঠিক সময়ে তো ঘুম ভাঙ্গলো তাহ'লে।"

মহেন্দ্র তাহার দিকে সঙ্গী পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; "সন্তোষ বাবু শীগগির নেমে আসুন।" । সন্তোষের নামিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেলনা—নিশ্চিন্তে পড়িয়া রহিল, "শুয়ে শুয়ে চলে না, মহেন্দ্র বাবু ? এই শীতে যে ওঠা দায়।"

কমলা ভাইকে তাড়া দিয়া উঠিল—"এই রাত দুপুরে অসময়ে খেও না সন্তু ; অসুখ করবে।" মহেন্দ্র তাহাতে কর্ণপাতও করিল না—খাবারের পোঁটলা খুলিয়া বসিল। সন্তোষকে দিয়া খান তিনেক ভাবী মালপো লইয়া সে কমলার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। কমলা ঘোর আপত্তি তুলিল, এতো রাতে তাহার কখনো খাওয়ার অভ্যাস নাই, সে খাবে না। মহেন্দ্র ক্ষুণ্ণমুখে অনুরোধ করিল, "একটু খান্, নয়তো আমিও খাবো না।" অগত্যা সে উপরোধকে মানিয়া লইতে হইল।

খাওয়ার পালা শেষ হইল। রাতের গাঢ় অন্ধকারটা এতক্ষণে ফ্যাকাসে হইয়া আসিয়াছে ; লালের আভা তখনও আকাশের বুকে ছড়াইয়া পড়ে নাই, কিন্তু ভোরের আভাস পাওয়া যায়। ভূতের মত ছায়াগুলি গাছপালার অস্পষ্টরূপ ধরিয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; আর ঘণ্টাখানেক, তার পরেই বন্ধুত্বের মাঝখানে দাঁড়ি পড়িয়া যাইবে, বোধহয় চির জীবনের জন্যই। সন্তোষ ও কমলা নামিয়া আসিল। জান্‌লাগুলি খুলিয়া তাহার মধ্য দিয়া অস্পষ্ট প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মাঝে কমলা তন্ময় হইয়া গেল। মহেন্দ্র ও সন্তোষ নানা আলোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। পথের সঙ্গী তিনজন, মাত্র ঘণ্টা কয়েকের পরিচয়, তাহার মাঝে অন্তরঙ্গতায় সকলের বুক যেন ভরিয়া উঠিয়াছে ; মনেও হয় না যে ঘণ্টাখানেক পরেই ভোরের সুস্পষ্ট আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাত্রির একান্ত নিবিড় বন্ধুত্বের চিত্রখানি স্বপ্নের মত ছায়ায় মিলাইয়া যাইবে। হয়তো আর কখনো কাহারো জীবনে এ স্বপ্নছবি জাগিবে না। যে যাহার যাত্রাপথে যখন অনন্ত ভবিষ্যতে ঘুরিয়া মরিবে, তখন এক রাত্রির স্মৃতি কি কাহারো বুকে বাজিবে ?—

* * *

আজ কি আবার চল্লিশবৎসর পরে তরুণী কমলার বার্দ্ধক্যজীর্ণ দৃষ্টির অস্পষ্ট আলোর মাঝে সেই একরাত্রির বন্ধুর স্মৃতিই জাগিতেছিল ? বন্ধু, কি অভিশাপ সেদিন তুমি দিয়াছিলে—সেযে বড়ো কঠোর বড় নির্ম্মম।

শ্রীঅপরাজিতা ঘোষ

ছন্দের মায়া

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ

কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সমস্যাই আছে। ইহাদের মধ্যে ছন্দ-সমস্যা একটি। ছন্দের আবার একাধিক সমস্যা রহিয়াছে। কাব্যে ছন্দের অবশ্যম্ভাবিতা ইহাদের অন্যতম।

যদি কেহ প্রশ্ন করিয়া বসে, কাব্যের ডেফিনিশন্ কি, তবে এক কথায় সোজা কাব্যনির্ণয় করা যে-কাহারো পক্ষে কঠিন হইবে। কিন্তু কঠিন বলিয়া ইহা অসম্ভব নয়। ইংরাজী সাহিত্যে Johnson হইতে Tennyson অনেকেই কাব্যের ডেফিনিশন্ দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোনটাই সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতায় অসন্দিগ্ধ হইয়া উঠে নাই। হয় নাই বলিয়াই এ আলোচনার আর অন্ত নাই। কাব্যকে "Musical Thought," বা "Expression of the imagination" অথবা "The most delightful & perfect form of utterance"ই বলি, কাব্যের সবখানি ইহাতে ব্যক্ত হইয়া উঠে না। ভারতীয় সাহিত্যেও সে আলোচনা রহিয়াছে। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" বলিলে কাব্য সম্বন্ধে যতখানি বলা হইল, তাহা অপেক্ষা বলা হইল না-ই বেশী: এই বাক্যের বিশ্লেষণ না করিলে কাব্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই গড়িয়া উঠে না। যে কাব্যকে বৃদ্ধ প্রাচীনগণ "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ" রূপে পরিকল্পনা করিয়া ইহাকে এই নশ্বর জগতের অন্যতম অমৃত ফল বলিয়া অমর করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে শুধু 'রসাত্মক বাক্য' বলিয়া পরিচয় দিলে অপরিচয়ের বেদনাই মনকে ব্যথিত করিয়া তোলে; আস্বাদনের আভাষ মাত্র লাভ করা যায়। এক কথায়, তাই কাব্যের কবিতার রহস্য উদ্ঘাটিত করা কঠিন। ইহার প্রয়োজনও নাই।

কাব্যের কয়েকটি ধর্ম্ম ও অসামান্যতা আছে, যাহা ইহাকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা হইতে স্বতই পৃথক্ ও বিশিষ্ট করিয়া একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। নানা দিক হইতে গদ্য হইতে পদ্য বিভিন্ন। কিন্তু বলিয়া রাখি, এমন রচনাও পাওয়া যায়—যেখানে গদ্যপদ্যের এই সীমা ম্লান হইয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যায়। পরে এই অভেদ ঐক্যতার রহস্যটির কথা বলিব। কাব্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে, ইহাতে একটি ভাব বা ভাবগ্রাম কবির কল্পনা ও অনুভূতির বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কল্পনা দ্বারা কবি বিশ্বকে যে-দৃষ্টিতে ঈক্ষণ করিয়াছেন, কাব্য তাহারই চিত্র-সঙ্গীত বহন করিয়া আনে। কাব্য কবির আবেগসিক্ত কল্পনানুরঞ্জিত বিশ্ব-দর্শন। গাছকে শুধু গাছ বলিয়া বর্ণনা করা ফটোগ্রাফি; সূর্য্যের তাপে আর বর্ষার বারিতে বৃক্ষের শিকড়ে পত্রে যে প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি উৎসারিত হয়, কবির নিকট সে খবর অবান্তর। প্রভাতের অরুণালোয় সাথে-সাথে যখন নবীন কিশলয়গুলি কাঁপিতে থাকে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতায় পাতায় যে মর্ম্মরধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠে, দক্ষিণ সমীরণে ডালে ডালে যে হিন্দোল শিহরিত হয়, কবি সেই বিস্মিত সৌন্দর্য্যের যবনিকাখানি একটু সরাইয়া দিয়া একখানি শাশ্বত ইঙ্গিত পাঠাইয়া দেন।

ইহাত গেল কাব্যের অন্তরের ভাববস্তুর কথা। কিন্তু ইহার বাহিরেরও একটা রূপ আছে, ইহার দেহ। কাব্য প্রকাশের একটি বিশেষ পথ ধরিয়া অভিব্যক্ত হয়; কাব্য-রচনার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী বা কৌশল আছে: ইহা কাব্যের আর্ট। কাব্যের এই দেহরূপটি, এই প্রকাশ বৈচিত্র্যটি কি? —ইহা কাব্যের ছন্দ। যে ভাববস্তু কল্পনা ও অনুভূতির রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া ছন্দের সঙ্গীতে মুক্তি লাভ করে, কাব্য তাহাকেই বলি।

এখানেই প্রশ্ন উঠে—এই যে রূপ, কাব্যের এই যে form, কাব্যপ্রাণের সহিত substancer সহিত ইহার কোন আত্মিক যোগাযোগ আছে কি না? ছন্দ ব্যতীতও কি উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয় না? এখন এমন একটা সমস্যায় আসিয়া

পড়া গেল, যেখানে মত বিরোধের তর্ক মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কেহ বলেন, ছন্দ ছাড়াও কাব্যসৃষ্টি হইতে পারে; কেহ আবার বলেন, ছন্দই কাব্যের প্রাণ।

কাব্যসমালোচকগণ এখানে একমত নহেন। Sir Philip Sidney, Bacon, Coleridge প্রভৃতি ইংরাজ সাহিত্য-সমালোচকগণ কাব্যে ছন্দের মৌলিক অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করিয়াছেন। Coleridge স্পষ্টই বলিয়াছেন, "poetry of the highest kind may exist without metre." Hunt, Carlyle, Arnold প্রভৃতি ইংরাজ সমালোচকগণ কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা নয়, অবশ্যম্ভাবিতা মানিয়া লইয়াছেন। Arnold বলেন, 'The rhythm & measure of poetry elevated to a regularity, certainty and force very different from that of the rhythm & measure which can pervade prose, are a part of its perfection,"

ব্যাপারটি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্। কবিত্ব, কাব্য যে ছন্দনিরপেক্ষ, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন রচনা গদ্যে মিলে, যাহাতে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ওতপ্রোত হইয়া আছে। সমগ্র গ্রন্থ হিসাবেই দেখি, বা খণ্ড রচনা হিসাবেই বিচার করি, পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কাব্যসৌন্দর্য্য ছন্দের ঝঙ্কারের সংযোগিতার অপেক্ষা রাখে নাই, এমন দেখা গিয়াছে। Sartor Resortus বা ছিন্নপত্র, Silas Manner বা শেষের কবিতা উচ্চকাব্যসম্পদে ভাস্বর—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটা উদাহরণ ধরা যাক্। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' রচনায় আছে:

এখানে নামলো সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন দেশে কোন সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হ'লো?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠেছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোনখানে ফুটল ভোর বেলাকার কনক চাঁপা?

জাগলো কে? নিবিয়ে দিলো সন্ধ্যার জ্বালানো দীপ, ফেলে দিলো রাত্রে-গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা?

ইহাকে কবিতা না বলিয়া পারা যায় না। এখানে কবির কল্পনা ও অনুভূতি ঝিলমিল করিয়া উঠিয়াছে।

'শ্রাবণ-সন্ধ্যার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

অন্ধকারের নিস্তব্ধতার উপর এই ঝর ঝর কলশব্দ যেন পর্দ্দার উপরে পর্দ্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে গভীর করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

এই চিত্রে বর্ষণমুখর শ্রাবণসন্ধ্যায় নির্জ্জন বিশ্বের নির্ব্বাসিত যে বেদনা আসন্নস্তম্ভিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্যেরই ভাববস্তু। ইহার সঙ্গে স্বতই মনে পড়িয়া যায় 'বর্ষার দিনে' কবিতার—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
* * * *
সে কথা শুনিবেনা কেহ আর
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

এইরূপ গদ্য রচনায় গদ্যপদ্যের সীমারেখা বর্ষার আকাশেরই মত সুনীল সুস্পষ্টতা হারাইয়া ফেলে। কাব্য তাই ছন্দকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। গদ্যেও শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে।

এমন অনেক সময় দেখা যায়, ছন্দোবদ্ধ রচনা বটে, কিন্তু কাব্য ইহাতে নাই। মনে হয় ইহা যেন "prose cut into lines of equal length." আমার ত মনে হয় বৃত্রসংহারের অনেকটাই তাই। আদর্শের সর্ব্বাঙ্গীনতার প্রমাণ বলিয়া শ্রদ্ধা ইহার প্রতি পাঠকের যতখানিই থাকুক, কাব্যসৌন্দর্য্যে ইহাকে নিষ্প্রভ বলিতেই হইবে। বাংলার আর এক কবি লিখিয়াছেন:

জলে হরি, স্থলে হরি
অনলে অনিলে হরি
হরিময় সকল সংসার।

ইহার ভিতর আর যাহাই থাকুক, কাব্য নাই। ইহার পাশে আর একটি কবিতা দেখা যাক; আইডিয়া একই, কিন্তু বর্ণনাকুশলতার কত প্রভেদ, অনুভূতির কত তারতম্য:

যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে,
তবে কেন ভোরের আকাশ
ভরে দিলে এমন গানে গানে ?

এখন যদি কেহ সদ্ভাব শতকের কবিতা, বা,
ত্রিশদিনে পূর্ণ হয় মাস সেপ্টেম্বর,
সেরূপ এপ্রিল আর জুন নবেম্বর।

অথবা শুভঙ্করী আর্য্যা বা কুন্তলীনের বিজ্ঞাপনকে কবিতা বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠেন তবে সেই পুরাতন আপ্তবাক্য "অরসিকেষু—"র পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে কবিদের গদ্যছন্দের কথা বলিতে হয়। সাহিত্যে সে এক সমস্যা। ইহারা না গদ্য না পদ্য; সাহিত্যে ইহারা বর্ণসঙ্কর। টুর্গেনিভের Prose Poems হুইটম্যানের Leaves of Grassই বলি, রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চই ধরি, ইহাদের রূপ মিশ্র বা অবিমিশ্র হোক, ইহাদিগকে কাব্য বলিতে এতটুকু সঙ্কোচ করিবার অবকাশ কবিগণ আমাদের দেন নাই। তখন মনে হয়, কাব্যসৃষ্টিতে ছন্দের অবশ্যম্ভাবিতা নাই। ভাবের সহিত ছন্দের সম্বন্ধ organic নয়, arbitrary।

দেখা গেল, গদ্যে রচিত হইলেও কোন ভাব প্রকাশ-কুশলতায় কাব্যের সমধর্ম্মী হইতে পারে; অন্যদিকে আবার ছন্দোবদ্ধ রচনা কাব্য না হইতেও পারে। এখন কাব্য যদি ছন্দ নিরপেক্ষ হয়, তবে ছন্দের কি কোন সার্থকতাই নাই ? সে কথাটারই এখন বিচার করিতেছি।

জগতের প্রায় সকল দেশেই সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যের জন্ম হইয়াছে প্রথম। মানুষ প্রথম গান ও ছড়াই রচনা করিয়াছিল, গদ্য নয়। আমাদের প্রবৃদ্ধ পূর্ব্বপুরুষগণ ছন্দের অন্তর্লীন মায়াতত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। তাই জ্যামিতি-ভূগোল-ব্যাকরণ পর্য্যন্ত ছন্দে আবদ্ধ হইয়া রহিল। মিলের মায়ায় স্মৃতিতে স্বরলোকের যে সৃষ্টি হয়, রসজ্ঞ পিতামহগণ তাহা সবিশেষ অবগত ছিলেন। ছন্দের ঝঙ্কারে কল্পনায় যে দ্যোতনার ঝিলিমিলি চমকিয়া উঠে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। Carlyle প্রাচীনগণের এই সত্য ধারণা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'For my own part, I find considerable meaning in the old vulgar distinction of poetry being metrical having music in it" ছন্দ আমাদের শ্রুতিকে শুধু নয়, স্মৃতিকেও আঘাত করে।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।

এই কবিতাটিকে যদি গদ্যে রচনা করা হইত তবে ছন্দের তালে নিহিত অস্পষ্ট দূরের গম্ভীর মহিমা ফুটিয়া উঠিতনা।

পবন যখন ছুটলনা আর পাথার হাওয়ায় সবরতে।
দৌড়ে তখন এলাম ছুটে শিলং নামক পর্ব্বতে।

সহজ কথা; গদ্যে লিখিলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তখন ছন্দের দোলার ধাক্কাটুকুর সুখ ত পাইতাম না। বাংলার রূপকথা গীতিকথায় ছড়াগানের খুব ছড়াছড়ি' ইহার কারণ ছন্দের মায়া-শক্তি। শিশু-মনকে মাতাইয়া রাখিবার ইহা একটি প্রধান উপায়। অর্থের খোঁজ কে রাখে।

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ী
খেয়ে যাবে কি ?
ঘরে আছে পাতা দই
মেনা গাইর ঘি॥

খুশী হইয়া শুনিতে শুনিতে খোকাবাবু শ্বশুরবাড়ীর পথ ভুলিয়া ঘুমের পুরীতে নিঃশব্দে প্রয়াণ করেন।

উপরি-উল্লিখিত কবিতাগুলিকে যদি গদ্যে রূপান্তরিত করি, তবে কাব্যের পূর্ণ আস্বাদন-ত পাই না। কিন্তু কেন ? এখানে কোন বস্তুটির অভাব ঘটিল ? সহজেই ছন্দের অদৃশ্যতা আমাদের মনকে পীড়িত করে। ছন্দের এই অভাব হইতেই বুঝিতে পারি ছন্দ আমাদের কতখানি মন জুড়িয়া বসিয়াছিল। ছন্দ ছিল বলিয়াই ভাববস্তুটিকে একটি মধুর আস্বাদনের ভিতর লাভ করিয়াছিলাম। তাহা হইলে দেখা গেল ছন্দ কাব্যসৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণতা ও কাব্যরসের পরিপূর্ণতা সাধনে অনেকখানি সাহায্য করে। ছন্দ আমাদের aesthetic satisfaction অনেকখানি আনিয়া দেয়। Mathew Arnold রসের যে perfection এর কথা বলিয়াছেন, ছন্দ তাহাই পূর্ণ করিয়া আনে। এক কথায়, ছন্দ কাব্যরসকে নিবিড়ভাবে ঘনীভূত করিয়া তোলে।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন রসের অবতারণায় বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহৃত হয়। কাব্য-সাহিত্যে ইহা একটি প্রত্যক্ষ বিস্ময়। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে পয়ার-ত্রিপদীর এইরূপ রসানুগ বৈচিত্র্য ছিল। সাধারণ বর্ণনায় আমরা পাই পতিতপাবন পয়ারকে। কিন্তু দুঃখ বর্ণনায় ত্রিপদী ছিল একেশ্বরী। ১৯শ শতাব্দীতেও এই ধারা একেবারে

অবলুপ্ত হয় নাই। হেমচন্দ্র শিবকে ত্রিপদীতে কাঁদাইয়াছেন :—

"রে সতি, রে সতি" কাঁদিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগমগনহর তাপস যত দিন
ততদিন না ছিল ক্লেশ।

ভারতচন্দ্র ভুজঙ্গপ্রয়াতে মহারুদ্রকে যে ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে আমরা নটরাজের সজ্জাকে শুধু দেখি না, শুনিও বটে :—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।
লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন ছন্দে আসন্ন বর্ষার সজল সমারোহ পুঞ্জীভূত গৌরবে আবির্ভূত হইতেছে :—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

'দুঃসময়' আসন্ন সায়াহ্নের ক্লান্তি-জড়িমায় মন্থরতার সকরুণ সঙ্গীতে গুমরিয়া উঠে। ইহাতে ছন্দ কতখানি ভাবকে প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছে, প্রথম অংশটি পড়িলেই তাহা আপনি হৃদয়ঙ্গম হইবে :—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মৌনমন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌনমন্থরে
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

সত্যেন্দ্র নাথের 'পাল্কীর গান', 'চর্‌কার গান', 'দূরের পাল্লা', 'ঝর্ণা', 'ছন্দহিন্দোল' প্রভৃতি কবিতায় ছন্দের তালে যেন ভাবটি দুলিয়া ফুলিয়া, নাচিয়া গাহিয়া আপনি উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। ইহাদিগকে অন্য ছন্দে বা গদ্যে রচনা করিবার কথা মনে হওয়াটাই প্রায় অসম্ভব।

এই সকল উদাহরণ হইতে এই বুঝিলাম যে ভাব ও ছন্দ এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে ওতপ্রোত। ছন্দকে বাদ দিলে ভাব নিতান্তই অচল হইয়া পড়িবে। ছন্দ এখানে ভাবে যে সুর, যে সঙ্গীত লাগাইয়া দিয়া ইহাকে নিবিড় গভীর করিয়া তুলিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ষার উৎসব-সমারোহ, বা সায়াহ্নের করুণ-মন্থরতা এই সকল কবিতায় জাগাইয়া তোলা কঠিন হইত, যদি না বিশেষ ছন্দে ইহাদের অভিব্যক্তি হইত।

ইহা হইতে মনে হয়, কাব্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি ও রস-আস্বাদনের জন্য ছন্দের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ছন্দ-লোকে ইহা অপেক্ষা আর একটি নিগূঢ় রহস্য নিত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠিতেছে। হিমাদ্রিশৃঙ্গে যেদিন আসন্ন আষাঢ় নামিয়া আসিয়াছিল, সেদিন তমসার তীরে বেদনা-বিদীর্ণ অন্তর লইয়া উদ্বেলাকুল মহর্ষির পক্ষে একখানি কাদম্বরী রচনা করা অসম্ভবই ছিল। শ্লোক সৃষ্টি ছাড়া তাঁহার আর তখন অন্য উপায় ছিলই না। বাল্মীকির এই কাহিনীতে কাব্য রহস্যের একটি সূক্ষ্ম তথ্য নিহিত রহিয়াছে। মানুষের হৃদয় যখন ভাবাবেগে দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত ফাটিয়া পড়িতে চায়, তখন বাণী স্বতই ছন্দে আপনার মুক্তি খুঁজিয়া লয়। অন্তরের এই সহজ ধারাটির মর্ম্ম কি জানিনা। তবে ইহা একটি সত্য ব্যাপার যে, ভাব যখন পূর্ণ, ছন্দ তখন আপনি উৎসারিত হইয়া ভাবকে ভারমুক্ত করিয়া দেয়। আবেগের সহজ অভিব্যক্তি হয় ছন্দে সঙ্গীতে।

বলিয়াছি, কবিতায় ছন্দ তুলিয়া দিলে কবিতার প্রাণ অনেকখানি ক্ষীণ হইয়া আসে। একটা কবিতাকে যখন গদ্যে রূপান্তরিত করা যায়, তখন ছন্দেরই শুধু অভাব ঘটে না; নূতন বিপর্য্যয় আরো অনেকখানি ঘটিয়া উঠে। গদ্যে রূপান্তরের সময় শব্দ অলঙ্কারও স্বভাবত বদলাইয়া যাইবে। ছন্দের প্রয়োজনে কবিতায় শব্দ-অলঙ্কারের যে গঠনসংস্থান ও তজ্জাত যে চিত্ত-বিনোদন—গদ্যে রূপান্তরের কালে তাহারা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়; দেখা দেয় শুধু প্রতিমা-পঞ্জর। ছন্দের সঙ্গে ভাষার এই যোগাযোগের আড়ালে পরোক্ষে ভাবের সহিত ইহার নিবিড় সম্বন্ধের খবর আমরা পাই। কাব্যের সহিত ছন্দ তাই, অবশ্যম্ভাবী বলিতে হইবে।

ভাব যেখানে কল্পনামুখর, ছন্দ সেখানে আপনি অনুসরণ করে। ছন্দের এই স্বত-উৎসারিত অনুস্থিতির অনিবার্য্যতাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় Herbert Spencer বলিয়াছিল, "No one should write verse, if he can help it." কাব্যে ছন্দ প্রকাশের অনিবার্য্য মাধ্যম। কবিতায় Substance ও Form এর, ভাব ও রূপের সম্বন্ধ আকস্মিক নয় আত্মিক। ছন্দই কাব্যের সহজ রূপ।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার

চ্যাঙের আত্মকথা

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

গল্পটা যার বিষয়েই হোক না কেন,—তাতে কিবা যায় আসে? পৃথিবীতে যে কেউ একবার জন্ম নিয়েছে, তকে নিয়েই গল্প বলা যায়।

একদিন চ্যাংও দেখলে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, আর যেদিন প্রথম দেখলে তার কাপ্তেন প্রভুকে,—সেইদিন থেকে তার পার্থিব জীবন ঐ কাপ্তেনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। তারপর ছ'বছর কেটে গেছে;—জাহাজের বালির ঘড়িতে যেমন বালিগুলো ঝুর্ ঝুর ক'রে ঝ'রে পড়ে তেমনি ক'রে ওর দিনগুলো একে একে ঝ'রে চলে গেছে।...

এই যে এলো রাত্রি,—এ স্বপ্ন, না জাগরণ? আবার এই যে হোলো দিন,—এও কি স্বপ্ন, না জাগরণ? চ্যাং এখন বুড়ো হ'য়ে গেছে। চ্যাং নেশার ঘোরে থাকে,—কেবল ব'সে ব'সে ঝিমোয়।

বাইরে ওডেসা সহরে দারুণ শীত। দিনটা বিশ্রী ঘোলাটে,—চীনদেশে চ্যাং যেদিন প্রথম কাপ্তেনের কাছে আসে সে দিনটাও বিশ্রী ছিল, কিন্তু এ তার চেয়েও খারাপ। ঝোড়ো হাওয়ায় বরফের কণাগুলো তীরের মত ছুটেছে; সমুদ্রতীরের প্রশস্ত পথ জনবিরল,—যে দুএকজন পথিক পকেটের মধ্যে হাত ভ'রে ঘাড় নীচু ক'রে সেই পিছল পথে এদিক ওদিক ছুটছে তাদের মুখে এসে বিঁধছে তুষারের ঝাপ্টা। বন্দরে ঘাট জনশূন্য, উপসাগরের অপর পারে কেবল পতিত জমি ধূধূ করছে, ঝাপসা মতই তা দেখা যায়। জাহাজঘাটের জেটি ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন; ফেনা ওঠা ঢেউগুলো উদয়াস্ত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস লেগে ওপরের টেলিফোনের তারগুলো কাঁপিয়ে দিচ্ছে।...

এমন দিনে সহরের জীবনযাত্রা খুব সকাল থেকে সুরু হয় না। চ্যাং আর তার কাপ্তেনেরও ঘুম ভাঙতে অনেক দেরী হয়। ছ'বছর—সে কি খুব অনেক সময়, না অল্প? কাপ্তেনের বয়স যদিও এখনও চল্লিশ পার হয় নি, তবু এই ছ'বছরের মধ্যে কাপ্তেন আর চ্যাং দুইজনেই বুড়ো হ'য়ে গেছে; ভাগ্য ওদের নির্ম্মমভাবেই বদলে গেছে। এখন আর ওরা সমুদ্রযাত্রায় বেরোয় না—কেবল তীরেই বাস করে। প্রথমে ওরা এসে যেখানে বাসা নিয়েছিল সেখানেও আর এখন থাকে না, এখন থাকে অন্ধকার গলির মধ্যে এক এঁদো ঘরে। বাড়ীটাতে ঢুকলেই নাকে আসে কাঁচা কয়লার একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ; সেখানে কতকগুলো ইহুদি বাস করে,—তারা সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরে আর টুপি প'রেই একেবারে খেতে বসে যায়। চ্যাং আর কাপ্তেন যে ঘরে থাকে সেটা যেমন নীচু তেমনি ঠাণ্ডা। ঘরটা সর্ব্বদাই অন্ধকার থাকে; কেবল ঘুলঘুলির মত দুটি ছোট জানালা আছে, ঠিক যেন জাহাজের কেবিনের পোর্টহোলের মত। দুই জানলার মাঝে একটি দেরাজ-আলমারি, আর বাঁদিকের দেয়াল ঘেঁসে একটা পুরোনো লোহার খাট,—আসবাবের মধ্যে কেবল এই,—আর আছে ঘর গরম রাখবার জন্য একধারে একটি উনোন।

চ্যাং শোয় উনোনের ধারে আর কাপ্তেন শোয় খাটে। কিন্তু কেমন সে খাট আর কেমন তার বিছানা তা এই সব বাসাড়ে ঘরে যে কখনো বাস করেছে সেই জানে; খাটের মাঝখানটা তো ঝুলে গিয়ে একেবারে জমি স্পর্শ করেছে, আর তার ময়লা বালিশটা এত পাৎলা যে কাপ্তেন নিজের কোটটা মুড়ে তার তলায় গুঁজে দিয়ে তবে শুতে পারে। কিন্তু এই বিছানায় শুয়েও কাপ্তেন স্বচ্ছন্দে ঘুমোয়; চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে সে একেবারে মড়ার মত নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। তার আগেকার দিনের বিছানা কত সুন্দর ছিল! নীচে কয়েকটা দেরাজ, তার ওপর ছিল উঁচু বিছানা; মোটা

Ivan Bunin-এর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত Dreams of Chang গল্পের অনুবাদ।

গদি, তার ওপর নরম চাদর আর তুষারশুভ্র বালিশ। কিন্তু সেরকম বিছানায় শুয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলা খেয়েও তখন তার এখনকার মত গভীর ঘুম হোতো না; এখন সে দিনের বেলা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া এখন আর তার ঝক্কিই বা কি আছে,—রাত্রে শোবার সময় সে কি কথাই বা ভাব্‌বে, আর পরের দিন সকালে উঠে কি প্রত্যাশাই বা করবে? এক-কালে তার কাছে পৃথিবীতে দুটি মাত্র সত্য ছিল,—ক্রমাগতই ঘুরেফিরে সে একবার বল্‌তো এটা, একবার বল্‌তো ওটা। তার একটা হচ্ছে এই যে, জীবনটা ভয়ানক রকমের সুন্দর; আর একটা হচ্ছে এই যে, জীবনের কিছু অর্থ আছে এ যারা বলতে চায় তারা পাগল্‌। কিন্তু আজকাল কাপ্তেন নিঃসংশয়ে ব'লে থাকে যে সত্য এক এবং অদ্বিতীয়, যা পৃথিবীতে চিরকাল ছিল, চিরকাল-আছে, এবং চিরকাল থাকবে,—যে চরম সত্যের কথা বলে গেছেন হীব্রুদের জব, আর তাই বলে যত ধর্ম্মযাচকের দল এবং নানা বিভিন্ন দেশের সাধুরা। মদের দোকানে ব'সে কাপ্তেন প্রায়ই সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—"ভাই, যৌবন থাকতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে এই বেলা চিনে নাও,—মন্দ সময় যখন পড়বে, দিন যখন ঘনিয়ে আসবে, যখন বলবে জীবনে আর কোন সুখ নেই, তার আগে থেকেই ব্যাপারটা বুঝে নাও।" কিন্তু তবু দিন আর রাত্রি আগের মত সমানেই আসা যাওয়া করে; এই একটা রাত্রি আবার পার হ'য়ে গেল, আবার সকাল হ'য়ে এসেছে। কাপ্তেন আর চ্যাং ঘুম থেকে জেগেছে।

কিন্তু জেগেও কাপ্তেন চোখ খোলে না, কিংবা শয্যা ত্যাগ করে না। চ্যাং বেচারা সমস্ত রাত্রি উনোনের ধারে শুয়ে ছিল, সারারাত সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস তার গায়ে এসে লেগেছে। কাপ্তেন শুয়ে শুয়ে কি ভাবছে তা সে কিছুই জানে না। কিন্তু এটা সে জানে যে কাপ্তেন অন্ততঃ একঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠিক ঐ ভাবেই শুয়ে থাকবে। আড়চোখে একবার চেয়ে নিয়ে আবার সে চোখ বোজে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। চ্যাংও মাতাল; সকালে ঘুম থেকে উঠে সে পৃথিবীর দিকে চায় নিতান্ত ক্লান্ত চোখে, ঠিক যেন সমুদ্রপীড়ায় কাতর সমুদ্র-যাত্রীর মত। তখনি আবার সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আগেকার দিনের একটা বিশ্রী রকমের স্বপ্ন দেখতে থাকে।...

সে দেখে:—

একটা বুড়ো ঘোলাচোখ চীনেম্যান্‌ জাহাজের ডেকের ওপর উঠেছে, সেখানে উবু হ'য়ে বসেছে। এক ঝুড়ি পচা মাছ নিয়ে সকলকে কাকুতি মিনতি করছে তাই কেনবার জন্যে। চীন দেশের একটা বড় নদী, দিনটা মেঘলা। নদীর ঘোলা জলের ওপর একখানা পালতোলা পান্‌সি দুলছে, তাতে ব'সে আছে একটি ছোটো কুকুরছানা; তার রংটা বাদামী, গলার কাছে বড় বড় রোঁয়া, দেখতে যেন শেয়ালের মত, আবার কতকটা নেকড়ে বাঘেরও মত; কাণ দুটো খাড়া ক'রে সে ভারী উৎসুক দৃষ্টিতে উঁচু জাহাজটার নীচে থেকে ওপর পর্য্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখছে।

"তোর কুকুরটা বেচবি?"—জাহাজের তরুণ কাপ্তেন এতক্ষণ চুপ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়েছিল, সে কতকটা মুরুব্বিয়ানার সুরে চেঁচিয়ে চীনেম্যানকে এই ব'লে সম্বোধন করলে।

চ্যাংয়ের আদি মনিব সেই চীনেম্যান কতকটা থতমত খেয়ে কাপ্তেনের দিকে চেয়ে দেখলে। কাপ্তেনকে চিনতে পেরে খুসী হ'য়ে সে বার বার সেলাম করতে লাগলো। "বড় ভাল কুকুর হুজুর, বড় ভাল কুকুর।" কুকুরটা এক টাকায় কেনা হ'য়ে গেল; তার নাম রাখা হোলো চ্যাং। পরের দিনই সে তার নতুন মনিবের সঙ্গে রুষিয়া যাত্রা করলে; তিন সপ্তাহ কাল তার সমুদ্রপীড়ায় এমন কষ্ট হোলো যে সে একেবারে মড়ার মত প'ড়ে রইলো, সমুদ্রও দেখতে পেলে না, সিঙ্গাপুরও না, কলম্বোও না।...

চীনদেশে তখন বর্ষা আরম্ভ হ'য়ে গেছে; ঝড় দেখা দিয়েছে। সমুদ্রসঙ্গমে এসে পড়তে না পড়তেই চ্যাংয়ের গা মাথা টলতে লাগলো। যেমন বৃষ্টি তেমনি কুয়াসা; জলের ওপর অসংখ্য সাদা সাদা ফেনার চূড়া; ঘোলা সবুজ জলের রাশি নির্ব্বোধের মত অনর্থক দিগ্‌বিদিকে ফুলে, ফেঁপে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, তেড়ে তেড়ে উঠতে লাগলো; এদিকে জলের প্রসার ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, যা-ও বা একটু কিনারা দেখা যায় তাও কুয়াশায় ঢেকে গেছে। চারিদিকে জল ক্রমশই বিস্তৃত। ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দিয়ে টুপি মাথায় কাপ্তেন জাহাজের ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, চ্যাংও তার পাশে

এসে দাঁড়িয়েছে, বৃষ্টিতে তার গায়ের রোঁয়া ভিজে চক্ চক্ করছে। কাপ্তেন সেখানে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছে, আর চ্যাং শীতে কাঁপছে, মধ্যে মধ্যে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে। দিগন্তবিস্তারী জলের রাশি কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশের সীমান্তের সঙ্গে মিশে গেছে। ঝোড়ো হাওয়া এক এক ঝাপ্‌টা মেরে ঢেউয়ের মাথা চূর্ণ ক'রে দিখিদিকে ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে; কখনো বা মাস্তলগুলোকে নাড়া দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে বাঁশী বাজাচ্ছে, কখনো বা বিপুল গর্জ্জনে পালগুলোর গায়ে ধাক্কা মেরে সেগুলো ফুলিয়ে দিচ্ছে; খালাসীরা বর্ষাতি টুপি মাথায় দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে পালের রশী খুলে দিচ্ছে। বাতাস যেন সুবিধা খুঁজতে লাগলো কোনখানে মারলে ধাক্কাটা সব চেয়ে জোরে লাগবে, আর যেমনি জাহাজ ডানদিকে একটু মোড় ফিরেছে, অমনি বাতাসে তাকে এক অত্যুচ্চ ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তুলে ধরলে, সেখান থেকে নাবতে গিয়ে জাহাজের মাথাটা ফেনারাশির মধ্যে ডুবে গেল; কাপ্তেনের কেবিনে টেবিলের ওপর একটা কফির পেয়ালা ছিল; সেটা হঠাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝেয় প'ড়ে চুরমার হ'য়ে গেল।...তার পরেই যা মজা শুরু হোলো!

তার পর থেকে দিন কাটতে লাগল নানা বৈচিত্র্যে; কোনো দিন বা প্রচণ্ড রৌদ্রে সমস্ত ঝলসে যেতো; কোনো দিন বা আকাশে মেঘ জমতো পাহাড়ের মত আর বজ্র-নির্ঘোষে সমস্ত আকাশ ফেটে পড়তো; কখনো বা বৃষ্টির মুষলধারে জাহাজ আর সমুদ্র একেবারে ভেসে যেতো; নোঙরে বাঁধা থাকলেও ক্রমাগত দুলতো। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে চ্যাং একবারও মাথা তোলে নি, সেকেণ্ড ক্লাস কেবিন-গুলোর অন্ধকার গলি-পথের দরজার গোড়ায় কোণটিতে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিল। দিনান্তে এই দরজাটি একবার খুলতো, কাপ্তেনের চাকর তখন তার খাবার দিয়ে যেতো। রেড্ সি-তে এই সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই তার কেবল মনে পড়ে জাহাজের কাঠগুলো চড়্ চড়্ শব্দ করছে, তার ক্রমাগতই গাবমি করছে, বুকের ভেতর যেন কেমন করছে, আর জাহাজখানা একবার পাতালের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার যেন সর্ব্বসমেত স্বর্গে উঠে যাচ্ছে; আরও মনে পড়ে জাহাজের গায়ে ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে কামানের মত এক একটা শব্দ হচ্ছে, আর ভয়ে তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে; জাহাজের পিছনটা এক একবার শূন্যে উঠে পড়ছে আর তার চাকাটা সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করে উঠছে; জলের ঝাপটা লেগে পোর্ট-হোলের গবাক্ষ ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে, তার মোটা কাঁচের গা বেয়ে ছাটের জল গড়িয়ে পড়ছে। চ্যাং শুয়ে শুয়ে শুনছে কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি হুকুম দিচ্ছে, তীব্র স্বরে একটা বাঁশী বেজে উঠলো, মাথার উপরের ডেক দিয়ে কয়েকজন খালাসী দৌড়ে গেল; ঝপাং ক'রে জলের একটা শব্দ হোলো; অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে চ্যাং দেখতে পাচ্ছে সমস্ত গলিপথটা বড় বড় চায়ের বস্তায় ভরা,—গরমে আর চায়ের গন্ধে চ্যাঙের গা পাক দিতে লাগলো, মাতালের মত সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো...

এইখানে হঠাৎ চ্যাঙের স্বপ্ন ভেঙে গেল।

চমকে উঠে চ্যাং চোখ মেলে চাইলে। কামানের মত যে শব্দটা হয়েছিল সেটা জলের শব্দ নয়,—নীচে কোথায় কে একজন সজোরে ধাক্কা মেরে কপাট খুললে। কাপ্তেন একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বিছানায় উঠে বসলো; ছেঁড়া জুতোটা পায়ে দিয়ে ফিতেগুলো বাঁধলে, বালিশের তলা থেকে কোট বের করে তাতে পিতলের বোতামগুলো লাগালে; এই দেখে চ্যাংও হাই তুলে একটা আলস্যজড়িত শব্দ করলে, তারপর মাটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। দেরাজের ওপর একটা বোতলে খানিকটা ভড্‌কা ছিল, কাপ্তেন তার থেকে কতক খেয়ে ফেললে, তারপর মুখ মুছে চ্যাঙের কাছে গিয়ে একটা বাটিতে তার জন্যেও একটু ঢেলে দিলে। এক নিমেষে চ্যাং সেটুকু চেটে শেষ করে ফেললে। কাপ্তেন একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুলো, আরো একটু বেলা হ'লে তবে উঠবে। রাস্তায় ট্রাম চলার শব্দ আরম্ভ হয়ে গেছে; অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে; কিন্তু কাপ্তেনের বেরোবার সময় হয়নি এখনও। সে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে। ভড্‌কা চেটে নিঃশেষ করে চ্যাং বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠলো, ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাপ্তেনের পায়ের কাছে কুণ্ডলি হ'য়ে শুলো, তারপর ভড্‌কার নেশায় ভেসে চললো কোন আনন্দলোকে। চোখ দুটো প্রায় নিমীলিত করে প্রভুর মূর্ত্তিটা অস্পষ্ট দেখতে দেখতে তার

প্রভুভক্তি অন্তরে অন্তরে আবেগময়ী হ'য়ে উঠলো; সেই মনের ভাবটা যদি মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় তা হ'লে তার অর্থ এই রকম হয়—"ওরে, তোরা অতি বোকা, বোকা! পৃথিবীতে কেবল একটি মাত্র সত্য আছে,—যদি তোরা জানতিস্ কি চমৎকার সে জিনিষ!"

স্বপ্ন-জাগরণের মধ্য দিয়ে আবার সে আগেকার দিনে ফিরে গেল, জাহাজটা যখন উদ্বেল সমুদ্র পার হ'য়ে রেড্ সিতে গিয়ে পড়েছে...

স্বপ্ন চলতে থাকে...

পেরিম পার হবার পর জাহাজের দোলা অনেক কমে গেছে, চ্যাং সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ চমকে উঠে তার ঘুম ভাঙলো। জেগে উঠেই সে একেবারে অবাক হ'য়ে গেল। কোথাও আর গোলমাল নেই, জাহাজের চাকা বেশ সমান তালে ঘুরছে; জলের বেশ শান্ত কল্ কল্ শব্দ শোনা যাচ্ছে; রান্নাঘর থেকে চমৎকার রান্নার গন্ধ আসছে.. চ্যাং উঠে বসে কেবিনের ভিতর চেয়ে দেখলে,—বাইরে দূর আকাশের গায়ে দেখা গেল একটা সিঁদুরের মত লাল আলোর আভাস, সবটুকু দেখতে না পেয়েও তার মনটা বড় আনন্দিত হ'য়ে উঠলো; উন্মুক্ত পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের নীল জল আর বিস্তৃত আকাশ, গবাক্ষ পথে সুন্দর হাওয়া আসছে, আলোর রশ্মি এসে আয়নার ওপর পড়ছে, তার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে দেয়ালের গায়ে পড়েছে, আলোক রশ্মিগুলো কাঁপছে কিন্তু কোথাও সরে যাচ্ছে না......

এমনি দিনে কাপ্তেনের যে রকম দিব্যদৃষ্টির উদয় হোতো, আজ চ্যাংয়ের মনেও সেই রকম ভাবের উদয় হয়েছে; হঠাৎ সে এখন উপলব্ধি ক'রে দেখলে যে জগতে কেবল একটি মাত্র সত্য নেই, সত্য আছে দুটি; একটি হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে জন্ম নিলেই যদি জাহাজে চড়তে হয় তো সে বড় ভয়ানক ব্যাপার; আর একটি হচ্ছে...কিন্তু সে কথা ভাববার আর ফুরসৎ পেলে না, হঠাৎ একদিককার দরজা খুলে গেল, কাপ্তেন সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের এঞ্জিন ঘর থেকে উঠে এলো। কাপ্তেনের ইতিমধ্যে দাড়ি কামানো ও স্নান করা হয়ে গেছে; তার গা থেকে ওডিকলোনের টাটকা গন্ধ বেরুচ্ছে, গোঁফটা জার্মানদের মত পাকিয়ে দুদিকে তুলে দেওয়া হয়েছে; তার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, সদ্যপরিহিত কাপড় চোপড় একেবারে ফিট্‌ফাট্, তুষারের মত সাদা। এই সব দেখে চ্যাং খুসী হ'য়ে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে উঠলো, কাপ্তেন তখনই তাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরে কপালে একটি চুম্বন দিলে, তার পর তাকে কোলে নিয়ে দুই তিন লাফে নীচের ডেকে গেল, সেখান থেকে গেল উপরের ডেকে, সেখান থেকে আবার জাহাজের সবচেয়ে উপরকার সেই ব্রিজে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

কাপ্তেন তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে পাইলটের ঘরে গিয়ে ঢুকলো আর চ্যাং বাইরে ল্যাজটি ছড়িয়ে বসলো। সেখানে এখন থেকেই রৌদ্রের বড় তেজ। যেখান দিয়ে জাহাজ চলেছে তার পাশেই আরব দেশ, সেখানেও নিশ্চয় এমনি গরম; স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আরব্য পর্ব্বতমালা, যেন কোনো উপগ্রহের ভিতরকার পর্ব্বতশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ, তার উপকূলে যেন স্বর্ণরেণু ছড়ানো,—এ সব এমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেন মনে হয় জাহাজ থেকে এক লাফ দিলেই সেখানে পৌছনো যায়। ব্রিজের ওপর এখনো ভোরের হাওয়ার আমেজ কিছু কিছু পাওয়া যায়, এখনো এক একবার ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যায়; কাপ্তেনের একজন মেট্—যে লোকটা চ্যাঙের নাকের মধ্যে ফুঁ দিয়ে মধ্যে মধ্যে তাকে ভয়ানক রাগিয়ে দিতো—সে খুব ধব্‌ধবে পোষাকে সাদা টুপি মাথায় দিয়ে আর খুব পুরু এক কালো ফ্রেমের চশমা প'রে ব্রিজের ওপর দ্রুত পায়চারী করে বেড়াচ্ছে এবং বার বার জাহাজের মাস্তুলটার ডগার দিকে চাইছে, সেখানে আকাশের গায়ে সামান্য একটু মেঘ দেখা যাচ্ছে...কাপ্তেন ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিলে—"চ্যাং এদিকে আয়! একটু কফি খাবি আয়!" চ্যাং অমনি একলাফে কেবিনটা প্রদক্ষিণ ক'রে পিতলের দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকলো। ব্রিজের ওপরের চেয়ে এ জায়গাটা আরো ভাল; সেখানে একটা চামড়া দেওয়া বেশ চওড়া বসবার জায়গা আছে, সেটা দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা; তার ঠিক ওপরে দেয়ালের গায়ে একটা ঘড়ি টাঙানো আছে, তার পালিশ করা পিতল আর কাঁচগুলো চক্ চক্ করছে; মেঝের ওপর একটা বাটিতে দুধের সঙ্গে রুটি মাখানো রয়েছে। চ্যাং পরম আগ্রহে সেটি চেটে

খেতে লাগলো, কাপ্তেন আপনার কাজ করতে লাগলো। জানলার ধারে টেবিলের ওপর একখানা ম্যাপ খুলে রেখে একটা রুল নিয়ে তার ওপর লাল কালির লাইন টানতে যতক্ষণ সে ব্যস্ত, ততক্ষণে চ্যাং সমস্ত চেটে খেয়ে ফেলেছে, তার ঠোঁটে দুধের দাগ লেগে গেছে,—সে ঐ জানলার ধারে লাফ মেরে উঠে দেখতে পেলে নীল নীল রংয়ের ঢিলা পোষাক পরা একজন খালাসী সামনে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডেল দেওয়া একটা চাকা ঘোরাচ্ছে। কাপ্তেন তখন চ্যাঙের সঙ্গে গল্প করা সুরু করে দিলে; চ্যাং পরে জানতে পেরেছিল যে সে ছাড়া আর কেউ যখন কাপ্তেনের কাছে থাকত না তখনই কাপ্তেন তাকে কাছে ডেকে নানা রকম গল্প করতো আর নিজের মনের কথাগুলি বলতো।

কাপ্তেন বললে—"বুঝলে চ্যাং, যেখান দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেড্ সি। দেখছো কেমন সুন্দর রং,—কিন্তু এখান দিয়ে আমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। ওডেসাতে যখন পৌছবো তখন তোমার চেহারাটা খুব সুন্দর দেখানো দরকার, তারা ইতিমধ্যেই তোমার পরিচয় সব জেনে গেছে। যে মেয়েটির কাছে আমি তোমার অনেক সুখ্যাতি ক'রে লিখেছি, সে ভারী খুঁৎখুঁতে মেয়ে; খবরটা তারযোগে পাঠিয়েছি,—বুদ্ধিমান মানুষ এইরকম খবর পাঠাবার জন্যে সমুদ্রের তলা দিয়ে অনেক তার পেতে রেখেছে, বুঝেছ কিনা...যাই হোক চ্যাং, আমার কপালটা ভালই বলতে হবে, জাহাজ নিয়ে এই আমার প্রথম লম্বা পাড়ি, এখন হঠাৎ জাহাজটা কোথাও ঠেকে গিয়ে আমার বদনাম না হ'য়ে যায়..."

কথা বলতে বলতে কাপ্তেন থেমে গিয়ে হঠাৎ চোখ রাঙিয়ে চ্যাংয়ের গালে এক চড় মারলে:

"পা নাবিয়ে নে; গবর্ণমেণ্টের আসবাবে পা তুলে দেওয়া!"

চ্যাং মাথাটা সরিয়ে নিয়ে গোঁ গোঁ ক'রে উঠলো, অপমানে তার মুখের চামড়া কুঁকড়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সে প্রহৃত হোলো, তার মনে বড় আঘাত লাগলো আবার তার বোধ হতে লাগল যে পৃথিবীতে জন্মে সমুদ্রপথে ঘোরা বড় বদ জিনিষ। মুখটা সে ঘুরিয়ে নিলে, হলদে সঙ্কুচিত চোখ দুটো নিতান্ত নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল, গোঁ গোঁ করতে করতে তার দাঁত বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু কাপ্তেন তার এ মনোভাব গ্রাহ্যই করলে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে টেবিলের দিকে ফিরলো; বুক পকেট থেকে একটা সোণার ঘড়ি বের ক'রে তার পিছনের ঢাকনিটা খুলে ফেললে, তার ভিতর দেখা গেল একটা চকচকে চাকা খুব চঞ্চল হ'য়ে ঘুরছে, তার থেকে অনবরত একটা গুঞ্জনের শব্দ হচ্ছে; সেইদিকে চেয়ে কাপ্তেন আবার সহজভাবে তার সঙ্গে কথা সুরু ক'রে দিলে: তাকে জানিয়ে দিলে যে এবার যেতে হবে ওডেসাতে এলিসাবেথিন্স্কায়া ষ্ট্রীটে; যেহেতু প্রথমতঃ ঐ ষ্ট্রীটেই হচ্ছে তার বাসা; দ্বিতীয়তঃ সেখানে আছে তার সুন্দরী স্ত্রী; আর তৃতীয়তঃ সেখানে থাকে তার সেই চমৎকার মেয়েটি; সুতরাং মোটের উপর বলা যায় যে কাপ্তেন খুব ভাগ্যবান পুরুষ।

কাপ্তেন বলতে লাগলো—"ভাগ্যবান পুরুষ, বুঝলে চ্যাং! আমার সেই যে মেয়েটি, সে এক অদ্ভুত মেয়ে, যা করবে তাই করবে, বুঝলে চ্যাং!—তোমার মধ্যে মধ্যে ভারী বিপদ হবে, ল্যাজটা বাঁচানোই হয়তো দায় হ'য়ে উঠবে! কিন্তু কি চমৎকার মেয়ে তা যদি তুমি একবার দেখ চ্যাং! আমি তাকে এত বেশী ভালবাসি যে মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়; আমার জীবনে সে ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু এতটা তো ঠিক নয়! কাউকেই এত বেশী ভালবাসাটা উচিত নয়, কি বল? বুদ্ধ-টুদ্ধ যে সব কথা বলে গেছে,—তারা কি আর তোমার আমার চেয়ে বোকা ছিল? তারা বলে সমস্তই মোহ, পৃথিবীর যা কিছু জিনিষ তুমি ভালবাস,—আলো বল, ঢেউ বল, বাতাস বল, স্ত্রীলোক বল, শিশু বল, আর বেল ফুলের গন্ধই বল। তোমাদের দেশের চিনারা যে তাওয়ের কথা বলে, জিনিষটা কি জান? আমি অবশ্য ভালরকম জানি না, কিন্তু সকলের ধারণাই প্রায় ঐ রকম: তা যতটুকু জানি, ওর ভেতরকার মোট কথাটা তো তাই? শূন্য,—তাই হচ্ছে আমাদের আদি জননী; যা কিছু পৃথিবীতে দেখছো সমস্তই সেখান থেকে জন্মায়, আবার তাও জননী সে-সমস্তই গ্রাস করে, ফের সমস্তই নতুন ক'রে জন্ম দেয়:—কিংবা আর এক কথাও বলা যায় যে পথ আছে সেই একটি মাত্র, সে পথ থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। তবু নিয়তই আমরা

ভুল ক'রে বিপথে যেতে চাই; কেবল যে সুন্দরী স্ত্রীলোকটি-কেই পেতে চাই তা নয়, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই আমরা পেতে চাই। পৃথিবীতে বাস করা মহা কষ্ট, বুঝলে চ্যাং! এখানে সুখও যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু কষ্টও যথেষ্ট, বিশেষতঃ আমার মত লোকের পক্ষে। আমি সুখটিই কেবল খুঁজে বেড়াই, সেই জন্যে কেবলই পথ হারিয়ে ফেলি: মনে হয় পথটা কেবলই বুঝি অন্ধকার,—কিংবা হয়তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই বা কে জানে?"

একটু চুপ করে কাপ্তেন আবার বলতে লাগলো: "কিন্তু আসল রহস্যটা কোথায় জানো? যদি তুমি কাউকে ভালবাস, তা হলে দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে যে সে কিন্তু তোমায় মোটেই ভালবাসে না। এইখানেই সয়তানের খেলা, বুঝলে চ্যাং? তবু তা সত্ত্বেও জীবনটা কী বিরাট ব্যাপার বল তো!"

বেলা প্রখর হলো, রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে জাহাজ বিশাল বেড্‌সির উপর দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছে। উত্তপ্ত আকাশ কেবিনের দরজা দিয়ে উঁকি মারছে। মধ্যাহ্ন হয়ে এসেছে, জাহাজের পিতলের সরঞ্জামগুলো রৌদ্রতেজে জলছে; জলের উপর রৌদ্রকিরণ পড়ে চোখ ঠিকরে দিচ্ছে, সে রশ্মি তির্য্যক্-ভাবে কেবিনের মধ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চ্যাং বেঞ্চের উপর বসে কাপ্তেনের কথা শুনছিল। কাপ্তেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে বেঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলে—"নেমে বোসো, এখানটা ভয়ানক গরম!" চ্যাংয়ের এখন আর এতে রাগ হলো না, এই মধ্যাহ্নে পৃথিবীটাকে তার খুব ভালই লাগছিল। তারপর······

আবার স্বপ্নে বাধা পড়লো।

"উঠে পড় চ্যাং!" বলে কাপ্তেন বিছানা থেকে পা নামিয়ে বসলো। বিস্মিত হয়ে চ্যাং চোখ খুলে দেখলে সে রেড্‌ সিতে জাহাজের উপর আর নেই, ওডেসা সহরে একটা ছোট কুটুরীর মধ্যে রয়েছে; সময়টা মধ্যাহ্নই বটে কিন্তু সে রকম চমৎকার মধ্যাহ্ন নয়, বন্ধ ঘরের মধ্যে একটা গুমোট অন্ধকার ভাব,—কাপ্তেন তার সুখের স্বপ্নটা ভেঙে দিয়েছে বলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে গোঁ গোঁ করে উঠলো। কাপ্তেন উঠে আপন মনে তার সেকেলে কাপ্তেনি টুপিটা মাথায় দিলে, পুরানো ওভারকোটটা পরলে, তারপর পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে চললো। চ্যাংকেও কাজে কাজেই বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি নাবতে হোলো। সিঁড়ি দিয়ে নাবা কাপ্তেনের পক্ষে কঠিন, নিতান্ত প্রয়োজন বলেই অনিচ্ছা সত্ত্বে সে নীচে যাচ্ছে, কিন্তু চ্যাং একটু তাড়াতাড়ি নেবে গেল,—ভডকার নেশাটা ছেড়ে যাওয়াতে তার মেজাজটা বিগ্‌ড়ে গেছে।······

আজ দুবছর হতে চললো কাপ্তেন আর চ্যাং প্রত্যহ সকালে যায় কোনো না কোনো রেস্তোরাঁয়। সেখানে গিয়ে তারা দুজনেই মদ্যপান করে, পাশে বসে পান করে কত রকমের মাতাল, আর চারিদিকে কেবল গোলমাল, চুরুটের ধোঁয়া, নানা রকম বদ গন্ধ। চ্যাং কাপ্তেনের পায়ের কাছে শুয়ে থাকে। টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে কাপ্তেন বসে বসে চুরুট ফোঁকে, এ অভ্যাসটা তার জাহাজ থেকেই আছে। অন্য একটা হোটেলে কিংবা কাফিশালায় খাবার সময় পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করে বসে থাকে, কখন সেই সময় হবে মনে মনে তার একটা ধারণা আছে; কাপ্তেন আর চ্যাং খাবার খায় এক যায়গায়, মদ খায় আর এক জায়গায়, কাফি খায় আর এক জায়গায়, ডিনার খায় আর এক জায়গায়। কাপ্তেন প্রায় চুপ করেই বসে থাকে। কিন্তু এক এক সময় তার এক এক জন বন্ধু জুটে যায়, তখন অনবরত সে বকতেই থাকে, কেবলই বলে জীবনটা নিতান্ত অসার, আর মিনিটে মিনিটে মদ ঢালে; একবার নিজে খায়, একবার বন্ধুকে দেয়, একবার দেয় চ্যাংকে,—তার জন্যে একটা স্বতন্ত্র পাত্র রাখা আছে। আজকের দিনটাও সেই ভাবে কাটবে; একজন পুরাণো বন্ধুর সঙ্গে তাদের খাবার কথা আছে, সে একজন আর্টিষ্ট, মাথায় লম্বা সিল্কের টুপি পরে। প্রথমে ওরা যাবে একটা মামুলি বিয়ারের দোকানে,—সেখানে যত লালমুখো জার্ম্মানের দল, তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে কেবল এই খাদ্য-পানীয়েরই জন্যে, তারা কেবল খাটে আর খায় আর তাদেরই মত আরো কত মানুষের জন্ম দেয়। ওখান থেকে যাবে এরা কাফিশালায়, সেখানে যত গ্রীক আর ইহুদি, তাদেরও জীবন এমনি অর্থহীন, তারা কেবল ষ্টক্-এক্সচেঞ্জের দরের খবর জানবার জন্যেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখান থেকে

এরা যাবে এক রেস্তোরাঁতে, সেখানে হরেক রকম লোকের ভীড়; ঐখানে থাকবে তারা অনেক রাত পর্য্যন্ত।...

শীতের দিন একেই তো ছোটো, কিন্তু কাছে যদি থাকে মদের বোতল, আর থাকে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু, তা হলে দিনটা আরো ছোটো হয়ে যায়। কাপ্তেন, চ্যাং আর সেই আর্টিষ্ট, তিনজনে মিলে বিয়ারের দোকান আর কাফিখানা ঘুরে এসে রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া দাওয়া করছে, ইতিমধ্যে ছয় ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। কাপ্তেন আবার তেমনি করে টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে বন্ধুকে প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে পৃথিবীতে আছে শুধু একটি মাত্র সত্য,—আর সেটা এক জঘন্য সত্য। "একবার শুধু চারদিকে নজর দিয়ে দেখ, ঐ বিয়ারের দোকানে, ঐ কাফিখানায়, এই পথে ঘাটে যে সব মানুষকে আমরা নিত্যই দেখছি তাদের কথা একবার মনে করে দেখ। বন্ধু, আমি সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে দেখেছি,—মানুষ সব জায়গাতেই সমান। জীবনের যে রকম অভিনয় তারা দেখায় তার সমস্তই ভান মাত্র, সমস্তই মিথ্যা; তাদের না আছে ভগবান, না আছে জ্ঞান-চৈতন্য, না আছে জীবনের কোনো উদ্দেশ্য, না আছে প্রেম, না আছে প্রীতি, না আছে সাধুতা,—সামান্য দয়ামায়াটুকু পর্য্যন্ত নেই। মানুষের জীবনটা কি রকম জানো,—যেন কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের দিনটা নোংরা এক সরাইখানার মধ্যে কোনোমতে কাটিয়ে দেওয়া, আর কিছু না......"

চ্যাং টেবিলের নীচে শুয়ে শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে এইসব শুনছে। কাপ্তেনের সব কথার সে সমর্থন করে কি না কে জানে? ঠিক ক'রে বলা তার পক্ষে অসম্ভব,—আর তা অসম্ভব ব'লেই যত কিছু গোলমাল। চ্যাং তা জানেই না, বুঝতে পারে না কাপ্তেনের কথা সত্য কি না; কিন্তু এ তো কেবল দুঃখের দিন এলেই আমরা বলে থাকি—"কিছু জানি না, কিছু বুঝতে পারি না।" আবার যখন সুখের দিন আসে তখন সবাই মনে করে আমরা সব জানি, সব বুঝি।...হঠাৎ তার বোধ হোলো যেন তন্দ্রার অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোকরশ্মি ফুটে উঠলো; বিচিত্র সুরে রেস্তোরাঁর ব্যাণ্ড বেজে উঠলো,—প্রথমে বাজলো একটা বেহালার সুর, তারপর আর একটা, তারপর আর একটা...বাজনার শব্দে সমস্ত আকাশ বাতাস ভরে গেল,—চ্যাংয়ের অন্তরাত্মা এক নতুন রকম বিমর্ষতায় ডুবে গেল, নতুন রকমের উদ্বেগে আকুল হ'য়ে উঠলো। কি এক অজানিত আনন্দে তার প্রাণের ভিতর কাঁপতে লাগলো, কাতর হোলো কি এক করুণ বেদনায়, কি যেন অনির্দ্দিষ্ট সামগ্রী সে পেতে চায়,—চ্যাং আর বুঝতে পারে না সে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। সঙ্গীতের সুরে সে তার সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভেসে চলেছে আর এক জগতে—সে এক আনন্দের জগতের সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে; আশ্চর্য্য, বিশ্বজগৎকে আবার মনে হয় সুন্দর, আবার তার মনে পড়ে সেই কুক্কুরছানা জাহাজে যেন রেড্‌ সি পার হ'য়ে চলেছে···

কতকটা সে ভেবে নেয়, কতকটা স্বপ্ন দেখে। "কেমন দিন তখন ছিল? মনে পড়েছে; রেড্‌ সিতে জাহাজের ওপর সেদিনের সেই তপ্ত মধ্যাহ্নটা বড়ই ভাল লেগেছিল।" চ্যাং আর কাপ্তেন কিছুক্ষণ ছিল পাইলটের গোল-ঘরে, তারপর সেখান থেকে চলে যায় ব্রিজের ওপর...কি উজ্জ্বল আলো! কি নীল জল, আকাশের কি আস্‌মানি রঙ্‌! জাহাজের রেলিংয়ে শুখোচ্ছে নাবিকদের পোষাক, সাদা, লাল, হলদে,—রংগুলো কি চমৎকার ফুটে উঠেছে! তারপর চ্যাং আর কাপ্তেন নেবে গেল ফাষ্টক্লাসের খানা খাবার ঘরে, জাহাজের অন্যান্য লোকেরা তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলে,—তাদের লাল মুখ, তৈলাক্ত চোখ, কপালে ঘামের বিন্দু। সেখানে তারা খাবার খেতে লাগলো, আর এক পাশের ভেন্টিলেটারের মধ্য দিয়ে হু হু ক'রে হাওয়া আসতে লাগলো। খাবার পর চ্যাং একটু নিদ্রা দিলে; তারপর হোলো চা পান, তারপর ডিনার, তার পর আবার সে কাপ্তেনের সঙ্গে চলে গেল উপর তলায়, সেখানে একজন চাকর এসে কাপ্তেনের জন্যে রেলিংয়ের ধারে একটা ক্যাম্বিসের চেয়ার পেতে দিয়ে গেল; সেখানে বসে সে চেয়ে রইলো সমুদ্রের দিকে; চেয়ে রইলো সে সূর্য্যাস্তের আকাশের পানে যেখানে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের খণ্ড খণ্ড মেঘের মধ্যে একটি সবুজ আভা অত্যন্ত স্নিগ্ধ হ'য়ে দেখা দিয়েছে: ছটাবিহীন হিঙ্গুলবর্ণ সূর্য্য যেখানে ঘোলাটে দিগন্তের প্রান্তসীমায় গিয়ে ঠেকেছে, এবং সেখানে ঠেকেই সমাটে হ'য়ে লাল সরু

টুপির মত আকার নিয়েছে...জাহাজ দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে যেন তারই উদ্দেশ্যে; দু'পাশের জল সেই আলোতে চক্ চক করছে, নীল জলের মধ্যে যেন গোলাপের আভা ভেসে ভেসে উঠছে। সূর্য্য নেবে চলেছে তাড়াতাড়ি, সমুদ্র যেন তাকে ক্রমশঃ গ্রাস ক'রে নিচ্ছে,—কমৃতে কমৃতে সেটা যেন একটা লম্বা অগ্নিরেখার মত হ'য়ে গেল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে সেটুকু হঠাৎ গেল নিভে; তখনই যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়লো সমস্ত বিশ্বের ওপর, বাতাস আরো এলোমেলো বইতে সুরু হোলো। কাপ্তেন একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সেই সূর্য্যাস্তের দিকে, তার মাথা অনাবৃত, চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, মুখে একটা চিন্তান্বিত, গর্ব্বিত, অথচ বিমর্ষ ভাব। চিন্তা তার যাই থাক, সে অনুভব করেছিল যে তবুও সে সুখী, কেবল এই জাহাজটুকু নয়, সমস্ত বিশ্বই বুঝি তার মমতার অধীন; সেই মুহূর্ত্তে সে দেখেছিলো যে সারা বিশ্ব তার অন্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ,— মদের গন্ধটুকুও তার মুখে তখন মিলোয় নি...

রাত্রি এলো,—সে এক বিরাট থম্‌থমে রাত্রি। অত্যন্ত কালো, অতিশয় ভয়াবহ, বাতাস বইছে অতি দুরন্ত, ঢেউয়ের মাথায় হঠাৎ এমন এক একটা আলো জলে উঠছে যে কাপ্তেনের পিছু পিছু চলতে চলতে চ্যাং তাই দেখে চমকে ভয় পেয়ে রেলিংয়ের ধার থেকে সরে যাচ্ছে। কাপ্তেন তখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে মাথাটা রাখলে তার বুকের কাছে— সেখানে যেমন ধুক্ ধুক্ শব্দ হচ্ছে কাপ্তেনের বুকেও ঠিক তেমনি ধুক্ ধুক্ শব্দ; কোলে নিয়ে কাপ্তেন ডেকের শেষ প্রান্তে চলে গেল, সেখানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চ্যাং চমৎকৃত হ'য়ে গেল। জাহাজের পিছনের প্রকাণ্ড চাকাটা সশব্দে অনবরত ঘুবছে, আর তার গা থেকে অসংখ্য জ্যোতি-কণা ফুলঝুরির মত ঝুর ঝুর ক'রে ঝরে পড়ছে; চাকার আলোড়নে জলের ওপর একটা স্বচ্ছ পথরেখা কেটে জাহাজ এগিয়ে চলেছে, আর জ্যোতিকণাগুলো তারই মধ্যে পড়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। কখনো বা সেখানে নীল রংয়ের বড় বড় তারা কাটছে; কখনো বা এক একটা সুবৃহৎ নীল জলপিণ্ড তার ভিতর থেকে ঠেলে উঠেই মুহূর্ত্তমধ্যে ফেটে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা বহস্যজনক সবুজ রংয়ের স্ফুরজ্জ্যোতি সেই তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে বিকীর্ণ হচ্ছে। চারিদিক থেকে বাতাস এসে লাগছে চ্যাংয়ের গায়, গলার রোঁয়াগুলো ফাঁক হয়ে বাতাস ঢুকছে,—সে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কাপ্তেনের বুকের ভিতর সে মুখ গুঁজে দিলে, সমুদ্রতল থেকে একটা ভিজে হাওয়া এলো, তাতে যেন গন্ধকের মত গন্ধ। জাহাজের চাকাটা কেঁপে কেঁপে ঘুবতে লাগলো; কোন এক অদৃশ্য শক্তিতে সেটা জলের মধ্যে ডুবে আবার ঘুবে ওপরে উঠতে লাগলো, চ্যাং উত্তেজিত হয়ে দেখতে লাগলো এই অন্ধ এবং অন্ধকারময় অতলজলের উচ্ছ্বসিত লীলা। এক একটা উচ্ছৃঙ্খল ঢেউ জাহাজের চাকা লঙ্ঘন ক'রে ওপরে উঠতে লাগলো, তার আলোতে কাপ্তেনের সাদা পোষাক আর হাত-দুখানা হঠাৎ এক একবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।...

সেই রাত্রেই প্রথম চ্যাংকে কাপ্তেন তার আপন শোবার ঘরে নিয়ে গেল;—প্রকাণ্ড কেবিন, তার মধ্যে স্নিগ্ধ লাল আলো। বাতিটা লাল সিল্কের কাপড় দিয়ে মোড়া। বিছানার একপাশে টেবিলটা দেয়ালের গায়ে ঠেসানো, সেখানে স্তিমিত আলোতে দেখা যাচ্ছে ফ্রেমে বাঁধা দুখানা ফটোগ্রাফ; এক-খানাতে একটি ফুটফুটে ছোটো মেয়ে মাথায় কোঁকড়া চুল নিয়ে এক মস্ত আরম্ চেয়ারে কৃত্রিম ভঙ্গিতে বসে আছে; আর একখানাতে এক তরুণী—দীর্ঘদেহা, সুন্দরী, চিন্তারতা, যেন রাণীর মত, সুদৃশ্য বাসন্তী পোষাক নিপুণভাবে পরা, গলায় সাদা লেস, মস্ত এক টুপিতে মুখের অনেকখানি ঢাকা। কাপ্তেন পোষাক ছাড়তে ছাড়তে কথা বলতে লাগলো:

"ঐ যে স্ত্রীলোকটিকে দেখছো চ্যাং, ও তোমাকেও পছন্দ করবে না, আমাকেও না। এক জাতীয় স্ত্রীলোক আছে যারা আজীবন কেবল পরের কাছ থেকে ভালবাসা পেতেই কামনা করে, সেই জন্যেই জীবনে কাউকে তারা নিজে কখনো ভালবাসতে পারে না। এই সব মেয়েরা হৃদয়হীন মিথ্যা কথা কয়, এরা কখনো বা থিয়েটারে অভিনয় করার স্বপ্ন দেখে, কখনো চায় নতুন মোটর গাড়ী কিনতে, কখনো চলে যায় পিক্‌নিক করতে—আর যে কেউ নতুন স্পোর্টস-ম্যান-যুবক পমেটম্ লাগানো পাটকরা চুলে চেরা সিঁথি

কেটে ইংরেজ পরিচয়ে এসে উপস্থিত হয়, তার ওপরই এদের মোহ লেগে যায়। কিন্তু কে এদের বিচার করবে—কে জানে এদের মনের কথা? সকলেই এখানে আপন চোখ দিয়ে দেখে, নিজে যা ভাল বোঝে তাই করে—চ্যাং। কে জানে ওরা তাও-দেবতার কোন গোপন অভিসন্ধি পূরণ করতে এখানে এসেছে?—এই গভীর কালো জলরাশির মধ্যে যে সামান্য সমুদ্রচর প্রাণী আপন মনে যথেচ্ছা বিচরণ করছে সেই বা কি অভিসন্ধি পূরণ করছে তাই বা কে জানে?"

"উঃ—ঃ!" চেয়ারে বসে সাদা জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে কাপ্তেন বলতে লাগলো—"কি যন্ত্রণাই সেদিন পেয়েছিলাম চ্যাং,—যেদিন প্রথম জানতে পারলাম যে ও একান্ত আমার নয়! সেদিন একলা সে প্রথম গিয়েছিল বলনাচের উৎসবে আর ফিরে এলো শেষ রাত্রে একেবারে যেন ঝরা গোলাপের মত, অবসাদে চেহারা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে তবু উত্তেজনা তখনো ঘোচে নি, কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত, যেন হঠাৎ আমার কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছে! তুমি যদি তখন একবার দেখতে কেমন ক'রে সে আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলে, কি যে তার অনন্থকরণীয় ভঙ্গী, কেমন নিতান্ত ভালমানুষের মত একেবারে অবাক হ'য়ে আমায় বললে,—'এ কি, এখনো যে তুমি ঘুমোও নি?' আমি তখন কোনো কথাই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলাম না, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আমায় বুঝে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপ ক'রে গেল। একবার আমার দিকে আড়চোখে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে কাপড় ছাড়তে লাগলো। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে খুন ক'রে ফেলি, কিন্তু সে অত্যন্ত সহজ সুরে আমায় বললে—, 'আমার পিছনের বোতামগুলো খুলে দাও তো'। বিনাবাক্যে আমি কাছে এগিয়ে গেলাম, কম্পিত হাতে বোতাম আর হুকগুলো খুলে দিলাম,—তার পর যখনি আমার ফাঁক দিয়ে তার অঙ্গ দেখতে পাওয়া গেল, দুটো কাঁধের মাঝে তার পিঠটা বেরিয়ে পড়লো, তার সেমিজটা কাঁধ থেকে খসে কোমরের কাছে এসে জড়ো হোলো;—যেমনি তার মাথার চুলের সৌগন্ধ পেলাম, উজ্জ্বল আলোতে বড় আয়নাটার মধ্যে দেখতে পেলাম কাঁচুলির পাশ থেকে তার উন্নত বক্ষের আভাস—"

এই পর্য্যন্ত বলে কাপ্তেন আর কথাটা সমাপ্ত করলে না, শুধু হতাশভাবে হাতের একটা ভঙ্গী করে থেমে গেল।

কাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে কাপ্তেন শুয়ে পড়লো, আর চ্যাং টেবিলের পাশে মরক্কো চেয়ারের উপর বসে দেখতে লাগলো সমুদ্রের সেই মসীলিপ্ত বিশাল জলরাশিকে বিভিন্ন ক'রে সারি সারি আলোকজ্যোতি কেবল জ্বলছে আর নিভছে; মধ্যে মধ্যে এক একটা আলেয়ার আলো হঠাৎ সেই কালো দিগন্তের পটভূমির উপর কেমন উল্কার মত জ্বলে উঠছে; এক একটা উত্তাল ঢেউ যেন জীবন্ত হ'য়ে সগর্জ্জনে ছুটে আসছে, জাহাজের সমান উঁচু হ'য়ে উঠে কেবিনের মধ্যে উঁকি মারছে,—যেন রূপকথার অজগর সাপের মত উদ্যত তার ফণা, অসংখ্য চোখ তার সারা অঙ্গে জ্বলছে, মণি-মুক্তা হীরা জহরতের দ্যুতি তার সকল দেহে। একপাশে তাকে ঠেলে দিয়ে জাহাজ আপন পথে অগ্রসর হ'য়ে চললো;—জাহাজ ভেসে চলেছে সেই দোলায়মান বিপুল জলরাশির মধ্যে—সৃষ্টির প্রাক্কালে যা ছিল একাকার, এখন আমরা যাকে পৃথক ক'রে নাম দিয়েছি সমুদ্র...

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাপ্তেন হঠাৎ একবার চেঁচিয়ে উঠলো; নিজের এই বীভৎস চীৎকার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে সে বিদ্রূপের সুরে নিজের মনেই বললে—

"হাঁ হাঁ, খাঁটি কথাটা হচ্ছে এই! গোখরো সাপের মাথায় যেমন মণি থাকে, রমণীর সৌন্দর্য্যও তেমনি! মহাপুরুষ সলোমন, তুমি বলেছিলে এই কথা, তোমার এ কথা একেবারে তিনগুণ সত্য!"

অন্ধকারে হাৎড়ে সিগারেট কেস্ খুঁজে নিয়ে সে একটা সিগারেট ধরালে, কিন্তু দুটান দিতে না দিতেই তার হাত-খানা ঝুলে পড়লো, এই ভাবেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো, সিগারেটটা হাতে জ্বলতে লাগলো। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল, কেবল ঢেউগুলো জ্বলতে লাগলো, দুলতে লাগলো, আর সশব্দে জাহাজের গায়ে ধাক্কা মারতে লাগলো।...

অকস্মাৎ একটা বজ্রপাতের মত ভয়ানক শব্দ, চ্যাংয়ের কানে যেন তালা লেগে গেল। ভয়ে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ব্যাপার কি? সেই তিন বছর আগে কাপ্তেন মাতাল হয়ে যেমন একবার জাহাজে ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল চোরা পাহাড়ের সঙ্গে, আবার তাই হোলো নাকি? না

কাপ্তেন আবার তার সুন্দরী স্ত্রীকে গুলি করেছে? না না, এ তো রাত্রিকাল নয়। এটা সমুদ্রও নয়, আর সেই এলিসাবেথিন্স্কায়া স্ট্রীটে শীতের দিনও নয়,—এ সেই আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁ, চারিদিকে কেবল হট্টগোল আর ধোঁয়া। কাপ্তেন মাতাল অবস্থায় টেবিলের ওপর সশব্দে ঘুষি মেরেছে, সেই আর্টিষ্ট বন্ধুকে চীৎকার শব্দে বলছে:

"ফাঁকি, ফাঁকি! সাপের মাথায় যেমন মণি, তোমার নারীও তাই!—'বিছানার ওপর কেমন চাদর বিছিয়ে রেখেছি, কারুকার্য্য করা ঝালর লাগিয়েছি, মিসর দেশের বহুমূল্য আসবাব দিয়ে সাজিয়েছি,...এস এস প্রণয় উপভোগ করি...ও তো এখন বাড়ী নেই'...এই হচ্ছে নারী! মৃত্যুর মধ্যেই তার বনবাস, ধ্বংসের পথেই সে চলে...। থাক্ থাক্ যথেষ্ট হয়েছে। চল বন্ধু, এখন যাবার সময় হোলো, এবার ওরা দোকান পাট বন্ধ করবে; চলে এসো!"

এক মিনিট পরেই কাপ্তেন, চ্যাং আর সেই আর্টিষ্ট, তিনজনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, সেখানে তখন ঝড় হচ্ছে, বরফ পড়ছে, রাস্তার বাতিগুলো তাতে কাঁপছে। কাপ্তেন আর্টিষ্টকে আলিঙ্গন করলে, তারপর তারা দুজনে বিপরীত দিকে চল্লো। অর্দ্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় কাপ্তেনের পাশে পাশে চ্যাং চলেছে ফুটপাতের ওপর দিয়ে; দ্রুতগতিতে কাপ্তেন চলেছে টল্‌তে টল্‌তে।...আরো একটা দিন কেটে গেল,—স্বপ্ন না সত্য?—বিশ্বময় আবার কেবল অন্ধকার, কেবল শীত আর ক্লান্তি।...নাঃ, কাপ্তেনের কথাই ঠিক, একেবারে খাঁটি সত্য কথা: এ জীবনটা শুধুই বিষাক্ত দুর্গন্ধ সুরা মাত্র, আর কিছুই নয়।...

একঘেয়ে দিন আর রাত্রিগুলো চ্যাংয়ের এমনি ভাবেই কাটে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে দুনিয়াটা যেন একটা জাহাজের মত পূরোদমে ছুটে এসে কোন জলতলস্থ অদৃশ্য পাহাড়ের গায়ে মারলে এক প্রবল ধাক্কা। শীতকালে সেদিন ঘুম থেকে উঠে চ্যাং আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলে ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। তাড়াতাড়ি উঠে কাপ্তেনের খাটের কাছে গেল,—দেখলে সে চিৎ হ'য়ে পড়ে আছে, ঘাড় বেঁকে গিয়ে মাথাটা খাট থেকে ঝুলছে, মুখখানা একেবারে নীল হ'য়ে গেছে, চোখ দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত, চোখের পাতা একটুও নড়ছে না। চোখের পাতা লক্ষ্য ক'রে চ্যাং হতাশ হ'য়ে এমন তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো যেন সে দ্রুতগামী কোনো মোটরের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে—।...তারপর সেই ঘরের দোর ভেঙে অনেক লোক এসে ঢুকলো, আবার বেরিয়ে গেল, আবার এসে ঢুকলো, নানারকম কলরব করতে লাগলো; নানারকমের সব লোক,—দরোয়ান, পুলিশ, লম্বা হ্যাট্ মাথায় সেই আর্টিষ্ট, আরো কত লোক যারা রেস্তোরাঁয় রোজ কাপ্তেনের সঙ্গে বসে খেতো,—দেখে শুনে চ্যাং একেবারে পাথর হ'য়ে গেল। আহা কাপ্তেন কত ভয়ে ভয়েই তখন বলতো,—"একদিন বাড়ীর লোকেরা সবাই ভয়ে কাঁপবে...যারা জানলা দিয়ে সে দৃশ্য দেখবে তাদের মুখ অন্ধকার হ'য়ে যাবে...যে জিনিষ সব চেয়ে সত্য তা যে প্রত্যক্ষ করবে সেই ভয় পাবে...মানুষ যাবে তার চিরকালের ঘরে, আর শোক-প্রকাশকেরা পথে বেরুবে সারে সারে...ঝরণার কাছে গেলেই কলসী যায় ফেঁসে আর কুয়ার কাছে পৌছলেই গাড়ীর চাকা যায় খসে..." কিন্তু চ্যাং এখন আর কোনো ভয়ও অনুভব করতে পারে না। সে এখন মেঝের ওপর প'ড়ে থাকে কোণের দিকে মুখ দিয়ে; চোখ দুটো চেপে বন্ধ ক'রে থাকে যাতে কিছুই আর না দেখতে হয়, যাতে সব ভুলে থাকতে পারে। জলে ডুবে যেতে যেতে যেমন সমুদ্রগর্জ্জন কাণের কাছে ক্ষীণতর হ'য়ে আসে, তেমনি পৃথিবীর কোলাহল অতি কাছের থেকেও দূরশ্রুত শব্দের মত সে শুনতে পায়।

যখন প্রথম তার চৈতন্য ফিরে এলো তখন দেখলে সে এক গির্জ্জার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভিড়ের একপাশে মাথা গুঁজে সে বসলো; উদ্‌ভ্রান্তের মত, অর্দ্ধমৃতের মত,—তার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ গির্জ্জার দরজা খুলে গেল,—ভিতরে আধা অন্ধকার, সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য চ্যাং প্রত্যক্ষ করলে, বহুলোক একযোগে মধুর সুরে গুঞ্জনধ্বনি ক'রে উঠলো। চ্যাংয়ের চোখের সামনে এক গোথিক্ মন্দির গৃহ, চারিদিকে প্রজ্জলিত লাল আলো, বহু গাছপালা দিয়ে ঘেরা কৃষ্ণবর্ণ উঁচু বেদীর ওপর ওক্ কাঠের এক শবাধার। সকলের কালো পোষাক; তার মধ্যে ভিন্ন বয়সের দুটি অপরূপ সুন্দরী, কালো পোষাকে

যেন মার্ব্বেল পাথরের প্রতিমার মত, দেখে মনে হয় যেন ছোট বড় দুই বোন; বহু বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠলো, সকলে উচ্চতানে তার সঙ্গে একস্বরে গেয়ে উঠলো কোন স্বর্গলোকের শান্তিপূর্ণ করুণ গাথা,—গম্ভীর, বজ্রনির্ঘোষের মত চারিদিক থেকে তার প্রতিধ্বনি উঠলো। গম্ভীর, প্রশান্ত, দূরপ্রসারী,—সে সম্মিলিত ধ্বনি যেন এ-জগতের নয়, সমস্ত তুচ্ছ শব্দ তাতে নিমগ্ন হ'য়ে যায়। এই দৃশ্যে চ্যাংয়ের প্রত্যেক লোমটি খাড়া হ'য়ে উঠলো, এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার সমস্ত প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠলো। সেই আর্টিষ্ট বন্ধু চোখ দুটি লাল ক'রে এই সময় গির্জ্জা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ চ্যাংকে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে থমকে দাঁড়ালো। চ্যাংয়ের কাছে মুখ নামিয়ে ব্যগ্র ভাবে বললে :—

"চ্যাং! কি রে চ্যাং, কি হয়েছে রে?"

কম্পিত হাতখানি সে চ্যাংয়ের মাথার উপর রাখলে,—মুখটা আরো নীচু করলে, দুজনের জলভরা চোখ পরস্পর মিলিত হোলো, সে দৃষ্টিতে পরস্পরের কি প্রেম, কি সহানুভূতি,—চ্যাংয়ের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চীৎকার ক'রে বলে উঠলো—"না, না, না,—পৃথিবীতে আরো তৃতীয় সত্য আছে, এটা আমি আগে কখনো জানতাম না।"

সেই দিন গোরস্থান থেকে ফেরবার পর চ্যাং গেল তার তৃতীয় প্রভুর ঘরে,—আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে অন্য একটা কুঠরি; কিন্তু ঘরটা বেশ গরম, সর্ব্বদা সেখানে চুরুটের গন্ধ; মেঝেতে কার্পেট বিছানো, চারিদিকে নানারকম প্রাচীন যুগের আসবাব, নানারকমের ঝালর ঝুলছে।...সন্ধ্যা হ'য়ে এলো; উননের ভিতর গন্‌গনে কয়লার আগুন জ্বলছে; চ্যাংয়ের নতুন মনিব একটা চেয়ারে বসে আছে। বাড়ী এসে পর্য্যন্ত সে মাথার টুপিটাও খোলেনি, গায়ের ওভার কোটটাও ছাড়েনি; চুরুট ধরিয়ে নিয়ে একটা মস্ত চেয়ারে সে বসে আছে, কেবল ধোঁয়া ছাড়ছে আর সেই চিত্র গৃহের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। ক্লান্ত জর্জ্জরিত চ্যাং বেচারী ম্রিয়মাণ হ'য়ে আগুনের পাশে কার্পেটের ওপর পড়ে আছে, চোখ দুটি মুদ্রিত, সামনের পায়ের ওপর মুখটা গুঁজে রেখেছে। সে স্বপ্নের ঘোরে যেন দেখছে :

এই অন্ধকার সহর অতিক্রম ক'রে, বহুদূরে সেই গোরস্থানের প্রাচীরের সীমান্তে কবরের মধ্যে কে একজন শুয়ে আছে। কিন্তু এ সেই কাপ্তেন নয়—না এ সে নয়। চ্যাং যদি এখনও কাপ্তেনকে ভালবাসে আর এখনও আর সান্নিধ্য সর্ব্বদা অনুভব করে, যদি আপন স্মৃতিপটে সে কেবল তাকেই রেখে,—আর নিজের অন্তরে যদি সে তাতে স্বর্গীয় কিছুর আভাস পায় যা সে নিজেই বুঝতে পারে না,— তা হ'লে এই কথাই ধরে নিতে হবে যে কাপ্তেন এখনও তার কাছে কাছেই রয়েছে : সে রয়েছে সেই জগতে যার আদি নেই, অন্ত নেই, মৃত্যু যেখানে প্রবেশ করতে পারে না। সেই জগতে আছে কেবল একটি মাত্র সত্য,—সে ঐ তৃতীয় সত্যটা; কিন্তু সে সত্য যে কি তা জানে মাত্র ওর শেষ প্রভু, যার কাছে চ্যাং একদিন অচিরে গিয়ে উপস্থিত হবে।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

যদি কান পেতে থাকো

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম যেদিন হোলো দ্যাখা
নিরালায় নদীকূলে নয়
বহুলোকের সভাতলের মাঝে,
বলেছিলাম তোমার কানে কানে
এখানে নয়, এখানে নয়,
যেখানে বালুতটে শিলারাশির মাঝে
তটিনীর জল করে ছলছল,
যেখানে পাহাড় গান গায় আর পাখী শোনে,
পাখী গান গায় আর পাহাড় শোনে
সেই খানে যাবে আমার সাথে ?
তুমি হেসে বলেছিলে, যাবো।
কিন্তু যাও নি।

তারপর কতদিন কেটে গেল
আজ আর সে সব কথা তোমার মনে নেই।
আজ যদি বলি, চলো নদীর তীরে, কাশের বনে,
তুমি নিমন্ত্রণ করে আনো বন্ধুদের,
করো বন ভোজনের আয়োজন।
যে কথা মনে ভাবি বলব তোমায়
পলাশের আগুন-লাগা শাখার তলে,
সে কথা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়
বন্ধু ও বান্ধবীদের অট্টহাসে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায়
তুমি আর আমি বসব মুখোমুখী,
আর কেউ নয়, শুধু তুমি আর আমি,—
তুমি গান গেয়ে শোনাবে আমায়
আমি চেয়ে রব তোমার মুখের পানে ;
কিন্তু এমনটি ত হবার নয় !
এ শুধু কবিতাতেই সম্ভব।
যেদিন কেউ না এলো ভিড় করে
তোমার কাছে সেদিনটি হোলো মাটী।
আমি জানি তাদের না আসার অভাব
আমি পারি না মেটাতে।
তাই কাছে না এসে দূর থেকেই তোমায় দেখে যাই
ভাবি, না জানি তোমার কী একলাই লাগছে।

যখন চোখে পড়ে নদীর ধার
শালের বনে বনে সোণালি আলো,
যখন চেয়ে দেখি কোমল তৃণ
চারিদিকের বনগাছের আড়ালে রয়েছে লুকিয়ে,
ভাবি এই ত আমাদের আসন
অপেক্ষা করছে যেন এ কতদিন, কতকাল ধরে
তোমায় ও আমায়।
আমি গিয়ে বসি একাকী
আর ভাবি, তুমি যদি আসতে আমার সনে।

দখিণে বাতাস বয়, চাঁদ ওঠে
ছাদের উপর আমি গিয়ে বসি।
তুমি জানো এখানে এসে আমরা দুজনে বসব
এ আমার কত কালের আশা।
কিন্তু বসা আর হলো না কোনোদিন তোমার সাথে।
তবুও চাঁদ ওঠে
দখিণের বাতাস বয়।

এম্নি করে একদিন আসবে বিদায়ের পালা,
সব খেলা হয়ে যাবে শেষ,
মান-অভিমানে পড়বে যবনিকা,
সব মিলন-বিরহের হবে ছেদ।

সেদিন করব না কোনো নালিশ
তুমি মনে দুঃখ পাছে পাও।
বলে যাবো, বেশ ছিলুম, যেতে চাইনে।
কিন্তু যখনি উঠবে চাঁদ ঐ অলিন্দের ওপর,
যখনি ঝকমকিয়ে উঠবে নদীর জল,
যখনি শালের বনে কেঁপে কেঁপে যাবে হাওয়া
তখনি শুনতে পাবে আমার দীর্ঘশ্বাস,
যদি কান পেতে থাকো।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

কর্মহীন অবসরে মোর

রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

কর্মহীন বৃথা অবসর!
আহত পৌরুষ মম শুধু, শুধু নিরন্তর
বৈশাখীর ব্যাকুল-ব্যথায় ফেলে দীর্ঘশ্বাস;
শরতের শ্যাম শান্তি-ভরা স্নেহের আভাস
ক্ষুণ্ণ আজি। বসে রহি' মুক্ত বাতায়ন-চাহি
উদ্বেলিত পারাবার—নাহি সীমা, সীমা নাহি।
কৈফিয়ৎ এই শুধু রহে—'দুর্দৈব ভীষণ,
মিথ্যা নহে ললাটের সূক্ষ্ম অখণ্ড লিখন।'
বাস্তবতা মানে কোথা'!—
উৎকণ্ঠা-উদ্বেগে—
রুদ্ধশ্বাসে চিত্ত মোর ওঠে অকস্মাৎ জেগে।
অতীতের নেশার আমেজ শত ভাগে টুটি',
ভবিষ্যের আঁধার গরভে পড়ে তা'র লুটি'।
ভাবিবার অবশেষ নাহি; হ'য়ে হারাদিশা
ভাবি তবু। অতিষ্ঠ অন্তরে বাজে দিবানিশা
ব্যথাতুর কাতর নয়ন—
সহায়-সন্ধানে
ভাষাহীন দৃষ্টি মেলি' যা'রা চেয়ে মোর পানে॥

নব যুগভাব

শ্রীনবেন্দু বসু

সমবেত মহিলা ও ভদ্রমণ্ডলী !

আমাকে আজকের অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত করার জন্যে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বৈশাখী সম্মিলনীর ইতিহাস বেশী দিনের নয়। এর বর্ত্তমান পরিণতি স্থানীয় তরুণ-সংঘের এক নতুন প্রচেষ্টা। এই নতুন সৃষ্টির প্রেরণাকে নব যুগভাবের একটি লক্ষণ বলে মনে করতে পারি। আজকের উৎসব প্রসঙ্গে এই নব মনোভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

প্রত্যেক মানুষের কাছেই তার অনুভূতি আর চিন্তার অভিজ্ঞতা একটা সত্য। এই সত্যের প্রমাণ তার কাছে এই যে সেটা তার অন্তরের গূঢ় সামঞ্জস্য আর সম্পূর্ণতাবোধকে তৃপ্ত করে। সত্যের তাই একটা ব্যক্তিগত আর আপেক্ষিক রূপ আছে। অর্থাৎ একের সত্য সব সময়ে অপরের সত্য নয়। কিন্তু কালের গতি প্রবাহে, সমাজনীতি আর সমাজ বন্ধনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে, জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলার প্রয়োজনে, চিন্তা আর কার্য্যক্ষেত্রের অনেক তথ্য সামাজিক সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত আর প্রচলিত হয়ে গেল। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠির অস্তিত্ব আর আদর্শ স্বীকার করে বর্ত্তমান যুগের গোড়ার দিকে আমরা আমাদের চিন্তা আর কার্য্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করলুম।

এই ছিল অবস্থা। এমন সময় তথাকথিত আধুনিক যুগ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে এল আর নিয়ে এল দুটো জিনিষ—জ্ঞানের বৃদ্ধি আর অবস্থার বৈচিত্র্য। সঙ্গে সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতির কার্য্যকারিতা আর সাফল্যের আওতায় পুষ্ট হ'ল একটা প্রশ্ন আর পরীক্ষার মনোভাব। তখন ধরা পড়ল যে ব্যক্তিগত সামঞ্জস্য আর সম্পূর্ণতাবোধের সঙ্গে গৃহীত—সমষ্টিগত সত্যের সব সময়ে মিল ঘটছে না। নব উন্মেষিত প্রশ্ন আর অনুসন্ধান তাই লাগল মানুষের নিজস্ব ভাব চিন্তা আর কর্ম্মের মূল তত্ত্ব অন্বেষণে, সামাজিক সত্যের স্তম্ভগুলির পরীক্ষায়, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাবৈচিত্র্যের নানা জটিলতার সমস্যা নির্ণয়ে। এর ফলেই এল আমাদের পরিচিত আধুনিক যুগের সব নূতন ধারা—মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, তাদের বিচার, অর্থবিজ্ঞান আর ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পর্কে নানা মতবাদ, নানা নতুন রূপে গড়া সাহিত্য আর শিল্প। সকল পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অপ্রতিহত রইল মূল অনুসন্ধানের ধারা যে সংঘজীবনের বাহুল্য, জটিলতা আর বৈষম্যের সঙ্গে একা মানুষের অন্তরের ঐক্যবোধের সামঞ্জস্য ধারণ করা যায় কিনা; যাতে ঘটতে পাবে একের জীবনের একটা সহজ স্বাভাবিক বিকাশ আর সামাজিক জীবনের একটা কমনীয় পরিণতি।

এই চিন্তাগতিকে অন্যকথায় বর্ণনা করা যায় এই ভাবে, নতুন মনোভাব সমষ্টিগত জীবনের নানা বিরোধের লক্ষণগুলিকে শুধু ঐতিহ্য নামক গুরুজনের ভয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। সে এই অধিকার চেয়েছে যে অসঙ্গতি আর ব্যবধানের দরুণ তার যা কিছু অতৃপ্তি, অনাস্থা আর নৈরাশ্য সেটা তাকে প্রকাশ করতে দেওয়া হোক। সত্যটা এপাশে, না ওপাশে, না মাঝামাঝি কোথায়, সেটার মিলিত সন্ধান দু'পক্ষে করুক। তার নতুন পাওয়া অনুসন্ধানের আলো তাকে জীবনের নানা অভিব্যক্তির ওপর ফেলতে দেওয়া হোক। আর নিজের মতন করে অবাধে নিজের মতামত বলবার অনুমতি দেওয়া হোক। যেখানে তার যন্ত্রণাবোধ আছে সে বেদনার আবেগকে সে দিতে পারুক মুক্তির পথ। সে পরীক্ষা করে দেখুক যে সে যেটাকে বুঝেছে যান্ত্রিক নিয়মের নিষ্প্রাণ লৌহসত্য, সেটার সঙ্গে এমন কোন খাদ মেশানো যায় কিনা যাতে সেটাকে উদ্ধার করে আনা যায়

লক্ষ্ণৌ তরুণ-সংঘ কর্ত্তৃক আহূত বৈশাখী সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে প্রথম দিনের সভাপতির অভিভাষণ।

মানবতার কোমল মাটিতে। এক কথায় সে এসেছে চোখে স্বপ্ন আর কণ্ঠে উৎসাহ নিয়ে আর চেয়েছে হৃদয়ের ধৈর্য্য আর স্পর্শের অনুকম্পা।

এইভাবে গৃহীত সত্যকে বাজিয়ে যাচাই করে নেবার, আর ভ্রান্ত হ'লে গালিয়ে পুনর্গঠন করবার প্রবণতাকেই আধুনিক মনোভাবের প্রধান ধর্ম্ম বলি। এ মনোভাব তা হ'লে প্রকৃত-পক্ষে একটা নিষ্ঠারই ভাব আর মানুষের চিন্তা আর কর্ম্মে নিষ্ঠার চেয়ে বড় আমাদের কিছু জানা নেই।

আধুনিক মনোভাব কিন্তু বাজারে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা পেলে না, তার কারণ এই যে প্রয়োগক্ষেত্রে তার স্বরূপ অনেক সময়ে ঢাকা পড়ে গেল। কতকগুলি এমন বাহ্যিক লক্ষণ পরিস্ফুট হ'ল যার ফলে যেটার উৎপত্তি ছিল নিষ্ঠার মধ্যে সে অর্জ্জন করলে কপটতার নিন্দাবাদ; যে কামনা করেছিল মনোযোগ সে পেলে তাচ্ছিল্য; যার গ্রহণ হওয়া উচিত ছিল সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধার মধ্যে তার প্রতি বর্ষিত হ'ল বিদ্রূপ আর কটাক্ষ; লোকে আধুনিকতার পরিভাষা করলে ঢং বলে। এ রকম কেন হ'ল? গৃহীত সত্যের ভিত্তি পরীক্ষা করবার জন্যে তাকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে সিংহাসনচ্যুত করতে যাওয়া হ'ল দু'দলে একটা বল পরীক্ষার মতন। আর আমরা সকলেই জানি যে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হ'লে আবশ্যক হয় অনুশীলন আর সাধনার, শক্তির সংরক্ষণ আর পরিমিত ব্যয়ের। আধুনিকতার অভিযানে এই অনুশীলন আর সংরক্ষণের অনেক স্থলে অভাব ঘটতে লাগল। ফলে যেখানে বর্ত্তমান মনোভাবের জানাবার ছিল আপত্তি সেখানে প্রকাশ পেলে ঔদ্ধত্য। যেখানে প্রকাশ করবার ছিল অসন্তোষ সেখানে দেখা গেল ক্রোধ। যেখানে ছিল অবিশ্বাস সেখানে এল বিদ্রূপ, ধৈর্য্যের স্থানে অসহিষ্ণুতা, সংযমের স্থলে প্রগল্‌ভতা। চিন্তা করতে গিয়ে অনেক সময়ে ভাবুক বকলে প্রলাপ, পরীক্ষা করতে গিয়ে করলে আস্ফালন, আলোচনার বেলা অবান্তর তর্ক, ভাব পরিণত হ'ল ভাবালুতায়, কার্য্য হ'ল অভিনয়, গাম্ভীর্য্যের বদলে এল লঘুতা, মিতব্যয়ের বেলা অপব্যয়, ঘনতার বেলা বিস্তার, স্পষ্টতার বেলা ছায়া, সহজ অভিব্যক্তি না পেয়ে পেলুম কষ্ট-কল্পনা, মৌলিকতার বেলা মাত্র চমৎকৃতি, ভঙ্গীর বেলা ভঙ্গিমা।

আধুনিক মনোভাবকে কার্য্যক্ষেত্রে গণ্য হতে হ'লে এই সকল অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। আধুনিকতাবাদীকে তার মন্ত্র আর প্রেরণা সম্বন্ধে স্পষ্ট আর যুক্তিসঙ্গত ধারণা রাখতে হবে। শুধু নতুন আর পুরাতন ভেদ করাতেই আধুনিকতার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। সেদিনে গৃহস্থ পরিবারে বাঙ্গালীর ছেলে পিতামাতার সমক্ষে পত্নীর সঙ্গে আলাপ করতো না। আজ সে অনেক স্থলে তা করে আর অনেক প্রাচীনপন্থীর তা মনোমতও নয়। কিন্তু প্রাচীন আর নবীন দুয়েরই এই বিষয়টিকে আর একটু চিন্তা করে দেখবার অবসর আছে। প্রাচীন হয়ত স্বীকার করবেন যে আদিম যুগে গুহাবাসী মানব, যখন একমাত্র নিজের শক্তিতে পশুবধ করে তার সঙ্গিনী আর সন্তানের উদর পূরণ করতো তখন তারা এমন একান্তভাবে তার ওপর নির্ভর করেছিল যে দিনে দিনে পরিবার মধ্যে তার শ্রেষ্ঠ স্থান সম্বন্ধে তার চেতনা পুষ্ট আর ধারণা দৃঢ় হয়ে গেল। যে শক্তিতে সে পশুবধ করতো সেই শক্তির বোধই তাকে শেখালে কুটীরে ফিরে এসেও নিজের ক্ষমতা আর শ্রেষ্ঠতাকে অপ্রতিহত রাখতে, ঠিক যে ভাবে Ibsenএর Pillars of Society তে Aune বলেছিল I have always been accustomed to stand first in my own home। এখন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার একটা স্বাভাবিক উপায় নিজের আচার বিচারে একটা স্বাতন্ত্র্য রেখে চলা। অতএব যেখানে সে স্বাতন্ত্র্য নেই অথচ প্রতিষ্ঠা রাখতে হবে সেখানে পন্থা হ'ল গোপন বা দমন করা। তাই বোধ হয় পূর্ব্বপুরুষেরা যখন দেখলেন যে তাঁদের সন্তান সন্ততি যৌন ব্যাপারে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে স্বভাবতঃ উৎসাহী, আর নিজেদেরও সে পথ ত্যাগ করবার উপায় নেই, তখন তাঁরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করলেন। তাঁরা সন্তান সন্ততির চোখের সামনে থেকে নিজেদের যৌন জীবন গোপন করে ফেললেন আর তাদেরও দিলেন সেই আদেশ। বর্ত্তমানে কিন্তু বৈজ্ঞানিক আর অর্থনৈতিক আর তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে পারিবারিক জীবনের ধারা গেল অনেকটা বদলে। স্বাবলম্বনে আর তেমন ভাবে চলে না, সাহায্য আবশ্যক হয়। কর্ম্ম আর ভোগজীবনে পিতাপুত্র আজকের দিনে অনেক সময়ে সঙ্গী,

পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ফলে আজ একের আদিম সহজ প্রবৃত্তিগুলি অন্যের কাছে বারে বারে ধরা পড়ছে। অতএব এখন নিজেকে রহস্যের জালে ঘিরে আর বয়ঃকনিষ্ঠকে অন্তরালে পাঠিয়ে স্বাতন্ত্র্য আর শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করা সব সময়ে সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। এখন পদে পদে পিতাপুত্র সম্পর্ক ঘুচে মনুষ্যত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই এযুগে সেই ব্যাধযুগের ব্যবস্থা কেবলই ভেঙে পড়তে চায়। নবীন বলে যে তুমিও সহজ হ'তে চাও, আমিও তাই চাই। প্রবীণও কষ্ট করে অস্বাভাবিক ভাবে থেকে থেকে আর পেরে উঠছে না। আজ তাই দুপক্ষই চিন্তিত আর ওদিকে কাল তার চক্র ঘুরিয়ে চলেছে। এই ভাবে সকল বিরোধের আলোচনায় যদি দুই পক্ষ মূল কারণের অনুসন্ধান করেন তাহ'লে হয়ত অনেক বিষয়ে একটা মনোমত সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে যেটার ভিত্তি হবে সৌন্দর্য্য আর শ্রীর ওপর। যে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ঠিক না হয়, কারণ অনেকটা হাত প্রকৃতি আর কালের সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ গ্লানি আর সঙ্কোচ দূর হয়ে ধৈর্য্য আর প্রীতি আসতে পারে। আর ধৈর্য্য আর প্রীতিতেই আসে চিত্তের মুক্তির অবসর যে মুক্তি বা স্বাধীনতার লক্ষ্য বোধ করি নবীন আর প্রবীণের সমান কামনার।

পারিবারিক জীবনে যেমন, তেমনি উদাহরণ দেওয়া চলে আমাদের সমাজ জীবন থেকে; তেমনি বলা চলে আমাদের মানসজীবনের দ্বন্দ্ব আর ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে। সকল ক্ষেত্রেই অগ্রসর হ'তে হবে শুধু প্রকৃতের সন্ধানে। এই সন্ধান যাত্রায় নতুন আর পুরাতনের সমান অধিকার। সুতরাং অপ্রাপ্তভাবে যা পেতে হবে সে হবে সন্ধানের সূত্রগুলি। সকল পরিবর্ত্তন আর বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে তার আর মানসলোকের কতকগুলি চিরন্তন সত্য কালের পথ অতিক্রম করে চলে এসেছে, সেগুলির একটা স্থির আর সূক্ষ্ম উপলব্ধি অন্তরের মধ্যে সজাগ থাকা চাই। এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রচেষ্টা জীবনের ওপর ওপরকার স্থূল অভিব্যক্তি আর ঘটনারাজি নিয়ে নয়, তার মূল প্রকৃতি নিয়ে। তার অন্তর্নিহিত প্রাচীন, বলবান, প্রাথমিক আবেগগুলিকে নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে আর তারপর নতুন ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়ায় নতুন অভিজ্ঞতারাজির সঙ্গে সঙ্গত করে নতুনরূপে তাদের সৃষ্টি করতে হবে। বর্ত্তমান জীবনের গোলকধাঁধার মধ্যে সুশৃঙ্খল আর বিশৃঙ্খল, সুন্দর আর কুৎসিৎ, সকলকেই একটা সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে হবে তবেই হয়ত তাদের অতীতে একটা অখণ্ড রূপের ছক কতকটা ধরা যেতে পারবে। প্রয়োজন হবে আবেষ্টনমুক্ত একটা দূরদৃষ্টির, উদ্যম আর সংযমের একাগ্র অনুশীলনের, তবেই হয়ত আমরা বর্ত্তমান জীবনের ভাব আর চিন্তা-সংঘাতের মধ্যে থেকে মূল্যবান আর রমণীয় দুটি একটি সত্য উদ্ধার করতে পারবো, তার সাহায্যে আমাদের মানসের গভীর রহস্যকন্দরগুলি আলো করে তুলতে পারবো। সেটাই হয়ত আমাদের উত্তীর্ণ করবে এক অভাবনীয় সৌন্দর্য্য আর বিশ্বাসের রাজ্যে, ব্যক্তিগত ভাব আর ধারণারও অন্তে, অনাসক্তির পরিমণ্ডলে, সকল প্রেরণা আর প্রবণতা যেখানে সুসমঞ্জসভাবে গ্রথিত। তবেই আমাদের শিল্প আর সাহিত্য নূতনরূপে সার্থকতা লাভ করবে, আর আমাদের চিন্তা আর কর্ম্ম পাবে এক অপূর্ব্ব শ্রী আর সৌষ্ঠব। আজকের উৎসব অনুষ্ঠান যেন এই মনোহর লক্ষ্যেরই উপাসনা হয়।

শ্রীনবেন্দু বসু

১০

সাবিত্রীর সঙ্গে সে সময় কটা দিন যে কি ভাবে কেটেছিল ভাব্‌লে আজ আমি অবাক হই—এত রসও একদিন ছিল আমার প্রাণে। কয়েকটা দিন, সেই সময় জীবনের কয়েকটা দিন মাত্র, আমি যেন আর এ পৃথিবীর লোকই ছিলাম না। কল্পনালোকে একটা রসের সমুদ্রে দিনরাত ভেসে বেড়াচ্ছি,—তরঙ্গের উত্থান পতনে কখনও উঠছি, কখনও নামছি। আর সেই উঠা নামার অপূর্ব্ব শিহরণে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে যেন আর সামলাতে পারছিলাম না।

সাবিত্রী মাঝে মাঝে বল্‌ত, "তোমাদের সঙ্গে আর পারি না শান্তদা।" পাচ্ছিল না যে, তা আমি বিলক্ষণ জান্‌তাম; কিন্তু পারাপারির মালিক আমিও ছিলাম না, সাবিত্রীও না। যে প্রবল বন্যা বয়ে গিয়েছিল আমাদের জীবনের উপর দিয়ে সেই সময়টা, তাতে ত দুজনেই নাকানি চোবানি খাচ্ছিলাম—কেই বা কাকে সামলায়। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম—এইটেই স্বাভাবিক এবং সাধারণ জীবনের ধর্ম্ম। কিন্তু সে সময়টা আমাদের দুজনার জীবনেই ধর্ম্ম হয়ে উঠেছিল "কর্ম্মের ইচ্ছায় কর্ত্তা।"

প্রেম?—হ্যাঁ তা ছাড়া আর কিই বা বলা যায়—বয়সে দুজনেই ছিলাম নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই জগতের প্রেমের হাটে, আমাদের সে বয়সের কাঁচা প্রেমটুকুর মূল্য হয়ত বিশেষ কিছুই দাঁড়ায় না, কিন্তু তবুও আমার আর সাবিত্রীর মধ্যে সে বয়সে যে লীলাটুকু ঘটেছিল তাকে অস্বীকার করা গেলেও অস্বীকার করা চলে না। তার মধ্যে কোনও ভেজাল ছিল না। তার জাত ও ধর্ম্ম ছিল একেবারে খাঁটী।

দেখতে দেখতে জিনিষটা গড়ে বেড়ে উঠল। প্রত্যেক দিন রাত পোহানর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা নতুন অনুপ্রেরণা; একটা নতুন পুলকের মধ্য দিয়ে, নতুন নতুন ঘটনায় জিনিষটার ক্রমবিকাশ আমাদের দুজনকেই বিশেষভাবে অভিভূত করে ফেলল। চোখে চোখে গড়ে উঠল একটা নতুন ভাষা, যা কেবল আমরা দুজনেই বুঝতাম। দুজনে কাছাকাছি থাকি বা দূরে দূরেই থাকি প্রাণে প্রাণে গড়ে উঠল এমন একটা নির্ভরতা, এমন একটা দাবী, যে তা উপেক্ষা করার শক্তি আমাদের দুজনের কারুরই ছিল না।

মুখে মুখে যে প্রকাশ বিশেষ কিছু ছিল তা নয়, বরং বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও অন্তরের নীরব ভাষায় দুজন দুজনকে বরণ করে নিয়েছিলাম, আনন্দে, প্রাণের চঞ্চল আবেগে—কেউই এতটুকু বাধা দেয়নি।

এই বরণের আমন্ত্রণ প্রথম কার কাছ থেকে এসেছিল তাও জানি না। কিন্তু যার কাছ থেকেই এসে থাকুক, দুজনেই এই বরণের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম—এ বিষয় কোন সন্দেহই নাই। তাই সেদিন ভোরে সাবিত্রীর হাতখানি আমার হাতের মধ্যে ধরা দেওয়ার পর থেকেই, সকলের চোখের অন্তরালে যখনই আমরা দুজনে একসঙ্গে হয়েছি, সাবিত্রীর হাতখানি আমার হাতে ধরা দিয়েছে; বিনা দ্বিধায়—মুখের কথার কোন প্রয়োজনই হয়নি। তাই, সাবিত্রী আর

জোচ্চরদের সঙ্গে খেল্‌বে না এই শপথ করে উঠে যাওয়ার দুদিন পরে মণ্টী বোঠান যখন দুঃখ করে আমাকে বল্লেন "সাবি যে কি রকম একগুঁয়ে মেয়ে জানেন না ঠাকুরপো, এত করে বল্‌ছি কিছুতেই খেল্‌তে রাজী হচ্ছে না।" তখন কেমন যেন একটা জোর, একটা প্রাণের দাবী, অনুভব করেছিলাম যে আমি যদি সকলের আড়ালে সাবিত্রীর হাত-খানি ধরে বলি "খেলবে না সাবি? রাখবে না আমার কথা?" সাবিত্রী অস্বীকার করতে পারবে না।

বোঠানকে বল্‌লাম আচ্ছা—সাবিকে আমি মত করিয়ে নেবোখন।—

বোঠান বল্‌লেন, "দেখা যাক্ আপনি যদি পারেন। আমার দ্বারা ত হল না। কিন্তু ছোড়দারই বা খবর কি? সেও ত দুদিন এ বাড়ীমুখো হচ্ছে না।"

আমি বল্‌লাম, "তাকে ত টেনে আনলেই হয়।"

* * * *

বোঠানের সঙ্গে আমার এই কথা বার্ত্তা হয়েছিল দুপুর বেলা খেতে বসে। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা একলা ঘাটে চুপ করে বসে ছিলাম। এক একবার ভাবছিলাম—যাই একবার বেড়াতে বেড়াতে মুকুন্দদের বাড়ী, কিন্তু কেমন যেন বাড়ী থেকে নড়তে ইচ্ছে করছিল না। সাবিত্রী তখনও আমা-দের বাড়ীতেই ছিল—বাড়ী যায় নি।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে একটা ঘন কালো ছায়া ক্রমেই অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে আস্‌ছিল। আমি চুপ করে বসে বসে কি যে সব যা তা ভাবছিলাম, এখন সব ঠিক মনে নাই এবং যাও আছে তাও লেখার মত বিশেষ কিছুই নয়। খানিকক্ষণ এই ভাবে কাট্‌ল—বাড়ীর ভিতরেও যাচ্ছি না, পুকুর ঘাট থেকে নড়চিও না কোথাও। বোধ হয় একটা আশা নিয়েই বসে ছিলাম। সাবিত্রী ত বাড়ী যাবে এবং আমাদের অন্দর হতে বেরিয়ে ঘাটের পাশ দিয়েই সাবিত্রীকে যেতে হবে। তখন হয়ত একটুখানি দুজনার দেখা হবে—নিরালা।

ক্রমে চাঁদ উঠ্‌ল। আমি চুপ করে বসে আছি এবং থেকে থেকে এক একবার চাইছি আমাদের অন্দরের দরজার দিকে।

এমন সময় হঠাৎ আমার পিছন দিকে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখে কেমন যেন একটু চমকে উঠ্‌লাম। দেখ্‌লাম আমাদের ঘাটের কাছেই পশ্চিমদিকের একটা পেয়ারা গাছের তলায় একটা নীচু ডাল ধরে সাবিত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। —একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। মুখে, গায়ে লুটিয়ে পড়েছে চাঁদের আলোয় পেয়ারা গাছের ডাল পালা পাতার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছায়া। পাতলা চাঁদের আলোয় চারিদিকের ছোট বড় গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে এক-একটা দৈত্যের মত, এবং তারই একটি গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সাবিত্রী—একটুও নড়ে না—দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটাও কেমন যেন অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। সবই যেন একটা মায়া।

বল্‌লাম "বাবা! চম্‌কে উঠেছি। অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

সাবিত্রী হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এল।

বল্‌লে—"আমায় ডেকেছ শান্তদা?", কথার সুরের মধ্যে যেন একটু আদর মাখান ছিল।

বল্‌লাম "কে বল্লে?"

বল্‌লে "কেন বোঠান। বল্‌লে—ঠাকুরপো তোকে ডেকেছে।"

বল্‌লাম "হ্যাঁ কথা আছে। বস।"

বললে "না—আর বস্‌ব না—। রাত হয়ে গেছে এখন বাড়ী যাই।"

বল্‌লাম "রাত হয়ে গেছে, এখন তুমি একলা বাড়ী যাবে কি করে?"

বল্‌লে—"একলা ত যাব না।"

বল্‌লাম—"তবে?"

বল্‌লে, "তুমি আমায় পৌঁছে দেবে যে।"

বল্‌লাম, "কে বল্লে?"

বল্‌লে, "আমি বল্‌ছি।"

কথাটা এত ভাল লাগ্‌লো যে ঠিক উত্তর খুঁজে পেলাম না। একটু চুপ করে আছি এমন সময় সাবি আবার বল্‌লে "চল"।

বল্‌লাম, "বেশত"।—উঠে দাঁড়ালাম।

দুজনে চলতে লাগলাম। আমাদের বাড়ীর সদর ছাড়িয়ে নিরিবিলি পথে এসে দাঁড়াতেই সাবিত্রীর হাতখানি আমার হাতে দিল ধরা। হাত ধরাধরি করে চলেছি দুজনে নির্জ্জন গ্রাম্যপথে।

অত্যন্ত কোমল স্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করলে

"কেন ডেকেছিলে শান্তদা?"

বললাম, "তুমি নাকি আর কখনও তাস খেলবে না সাবি?"

সাবিত্রী হঠাৎ যেন কেমন একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "খেলবে না সাবি?"

শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল, "না"।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

কোন উত্তর দিলে না। চুপ করে রইল।

বললাম, "আর যদি আমরা জোচ্চুরী না করি তবুও না?"

বললে, "ছোড়দার সঙ্গে আমি আর খেলব না।"

কথাটা শুনে খুসী হলাম। তাহলে রাগটা মুকুন্দর উপর। আমার উপর নয়।

বললাম, "তাহলে আমার উপর তুমি রাগ করনি সাবি? কেমন?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে,

"ছোড়দা জোচ্চুরীও করবে আবার চোখও রাঙাবে।"

বললাম, "মুকুন্দর দোষে তুমি সবাইকে শাস্তি দেবে সাবি?"

বললে, 'কেন?'

বললাম, "তাস খেলাত বন্ধ হলো।"

বললে, "কেন? বড়দাকে ত বৌঠান রাজী করবেন বলেছেন। বড়দাকে নিয়ে তোমরা খেল।"

তখন চাঁদের আলো ছাড়িয়ে একটা ছায়াপথ দিয়ে আমরা চলেছি। দুপাশে বড় বড় গাছ নুয়ে পড়ে পথটাকে খানিকটা অন্ধকার করে দিয়েছে। আমি চট্‌ করে সাবিত্রীর হাত ছেড়ে দিয়ে হাতখানা রাখলাম তার পিঠের উপরে। একটু কাছে টেনে নিয়ে বললাম, "না। তা হয় না। তুমি না খেললে আমিও খেলব না।"

"কেন?" মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চাইলে। গলার স্বর আবার কোমল হ'ল।

বললাম, "ভালই লাগে না খেলা, তুমি না খেললে"

বললে, "খেলতে খেলতেই ভাল লাগবে।"

বললাম, "না।"

বোধহয় আরও খুসী হল। আরও যেন একটু কাছে এগিয়ে এল। দুজনে চলেছি চুপচাপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। পথের একটা মোড় ফিরে প্রায় সাবিত্রীদের বাড়ীর কাছে এসে পড়লাম।

বাড়ীর ফটকের সামনে এসে দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলাম। সাবিত্রীর হাত আমার হাতের মধ্যে। সাবিত্রী আমার মুখের দিকে সোজা চেয়েছিল—মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একটা মৃদু হাসিতে।

বললাম, "তাহলে খেলবে না তুমি সাবি?" ঠিক তেমনি ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঈষৎ মাথা দুলিয়ে বুঝিয়ে দিলে, "না"। ঠোঁটে কিন্তু মৃদু হাসিটি লেগে আছে।

বিষণ্ণ স্বরে বললাম, "বেশ, রাখলে না আমার কথা।"

ঠিক তেমনি ভাবে খানিকটা চুপ করে চেয়ে রইল। কিছু বললে না।

হঠাৎ বললে, "তুমি যদি আমার খেঁড়ী হও তাহলে খেলব।"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হাত ছাড়িয়ে ছুটে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

সাম্প্রদায়িক মনোভাবের মূলে অর্থনীতিক কারণ

আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে যে সকল সমস্যা নিতান্ত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে, কোন প্রকারেই যাহাদের কোন সমাধান সম্ভব হইতেছে না, তাহাদের সকলগুলিরই মূল অর্থনীতিক। কিন্তু, মূলগত এই অর্থনীতিক কারণ সমূহকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা যায় আমাদের শক্তিতে, না হয় আমাদের সাহসে কুলাইতেছে না এবং তাহার ফলে অবিরত জোড়াতালির কাজ চলিতেছে এবং প্রকৃত সমাধান ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

সাম্প্রদায়িক এবং উপসাম্প্রদায়িক মনোভাবের যে সকল অপ্রত্যাশিত প্রকাশে আমরা বিচলিত হইতেছি, তাহা যে ছদ্ম ভদ্রবেশে আমাদের সকলের মধ্যেই সদাসর্ব্বদা রহিয়াছে এবং আমাদের মনের এই সাম্প্রদায়িক গঠনকে নির্ম্মমভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বিতাড়িত করিতে না পারিলে যে ইহার তীব্রতা হ্রাস পাইবে না, এবং ক্রমেই অধিকতর অকল্যাণের মধ্যে যে ইহা আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিবে সে কথাটা আমরা গত কয়েক সংখ্যায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমাদের মনের সাম্প্রদায়িক গঠনের মূল কারণ যে সমাজের অর্থনীতিক বিভাগ এবং অর্থনীতিক ইতিহাস, সে কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে এবং দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণভাবে দুরীভুত করিতে হইলে, ইহাকে যথোচিত মূল্য দান করিতে হইবে।

নানা ঐতিহাসিক কারণে সমবায়ে সমাজে যে আর্থিক বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একদিকে পড়িয়াছেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং অপরদিকে পড়িয়াছেন মুসলমান এবং অনুন্নত হিন্দুরা। এদেশে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সমাজের তখনকার নিম্নস্তরের মধ্যেই এই ধর্ম্মের অধিকতর প্রসার লাভ ঘটে। অর্থ, প্রতিপত্তি, বিদ্যা ও বুদ্ধিশালিতা প্রভৃতিতে যাঁহারা সমাজের উচ্চস্তরে ছিলেন তাঁহারা অধিকাংশই হিন্দু থাকিয়া গেলেন। ফলে, দেশে ধর্ম্মের যে বিভাগ হইল তাহা সমাজের স্বাভাবিক আর্থিক বিভাগের অনুসরণ করিল। পরে আবার ইংরেজ আমলের প্রথম হইতে আমাদের মধ্যে স্বাদেশিকতার উদ্ভবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের রাজানুগত্য এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের জন্য শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রবর্ত্তিতার ফলে, দেশের যাহা কিছু কায়েমী স্বার্থ তাহা তাঁহাদেরই হাতে আসিয়া পড়িল, অর্থ এবং সম্পত্তি তাঁহাদেরই হাতেই সঞ্চিত হইল। মহাজন, জমিদার, ব্যবসায়ী, ছোট বড় মূলধনের মালিক, বড় বড় চাকুরে, উকিল, ব্যারিস্টার, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি সবই হইলেন প্রায় হিন্দুরা। হিন্দুরা সকলেই ধনী ও সম্পত্তিশালী হইলেন, এরূপ না হইলেও, সঞ্চিত ধনসম্পত্তির বেশীর ভাগ হিন্দুদের হস্তগত হইল এবং হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা দরিদ্র থাকিলেন (ইঁহাদের সংখ্যাই অবশ্য বেশী), তাঁহারাও ধনী (অপেক্ষাকৃত) সমাজের আওতায় থাকিলেন বলিয়া, তাঁহাদেরও বাহিরের চালচলন, জীবনযাত্রা প্রভৃতি অনেকটা ধনীদের অনুরূপ হইল, জীবিকার জন্য কায়িকশ্রম করা অপ্রচলিত হইল, এবং ধনীদের অনুগ্রহভাজন হওয়া, তাঁহাদের ছোটখাটো কাজে লাগিয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করা অথবা নিজেরা ধনী হইবার চেষ্টা করাই ইঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। ছোট বড় ব্যবসা, ছোট ছোট মহাজনী এবং মূলধনের কারবার হিন্দু সমাজের মধ্যস্তরের লোকদের হাতে

পড়িল। অন্যদিকে কায়িকশ্রমের প্রায় সকল কাজ বিশেষ করিয়া কৃষি বলিতে গেলে মুসলমানদিগের একমাত্র জীবিকা হইল। কৃষির একটা বৃহৎ অংশ এবং নানাবিধ শ্রমশিল্প হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের বলিয়া বিবেচিত লোকদের হাতে থাকিলেও, মুসলমান সমাজের নিতান্ত মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত প্রায় সকলেই কৃষক অথবা অন্যবিধ শ্রমিক হইলেন। সমাজের এইরূপে যে ভাগ হইল, তাহাতে দেখা গেল, জমিদার, মহাজন, ব্যবসাদার প্রভৃতি বলিতে হিন্দুদের বুঝাইতেছে, এবং কৃষক বলিতেই মুসলমান না বুঝাইলেও, মুসলমান বলিতে কৃষকই বুঝাইতে লাগিল।

এইরূপে বহুদিন ধরিয়া মুসলমানেরা দেখিতে অভ্যস্ত হইলেন যে, কায়িকশ্রম, দারিদ্র্য, ধনীশ্রেণীর অবজ্ঞা, অশিক্ষা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দুরূহতাই তাঁহাদের একমাত্র ভাগ্য; অপরদিকে অর্থ, সম্পত্তি, ভোগবিলাস, সম্মান, প্রতিপত্তি হিন্দুদের একচেটিয়া। এই বৈষম্য স্বভাবতঃই বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছে এবং প্রাত্যহিক জীবনের বহুবিধ আচার ব্যবহার রীতিনীতির মধ্যে তাহা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে।

মুসলমান কৃষক দেখিয়াছে; সে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া শস্যোৎপাদন করিতেছে, কিন্তু, দেনার দায়ে, বাকি খাজনার দায়ে, জমিদার, মহাজনের কর্মচারীদের হিসাবের নানা মারপ্যাচে তাহা উঠিতেছে অন্যদের ঘরে (এবং ইহারা প্রধানতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দু), এবং তাহারা না খাইয়া মরিতেছে। অবস্থার এমন ফের যে, যাহারা কিছু মাত্র পরিশ্রম করিল না, উৎপাদনে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিল না, আলস্য, ভোগ বিলাস ও ফন্দীবাজিতে দিন কাটাইল, তাহাদের আহার বা বিলাসের অভাব হইল না, তাহাদের ঘরে ভোগের উপকরণ সঞ্চিত হইল, অপব্যয়ের ঢেউ বহিতে লাগিল, আর যাহারা জলে ভিজিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া শস্য উৎপাদন করিল, তাহাদের পুত্র কন্যা না খাইয়া মরিল, তাহাদের পরণের বস্ত্র জুটিল না, লাভ হইল অপরের গালাগালি এবং তাড়না, ইহাতে মনে যদি বিদ্বেষের ভাব না জাগে, তবে আর কিসে জাগিবে। অজন্মা হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, কিন্তু জমিদারের পেয়াদা অনুপস্থিত হয় নাই, কর্মচারীর কড়া শাসন শিথিল হয় নাই, মহাজনের সুদের হার কমে নাই, ভিটামাটি বিক্রয় বন্ধ হয় নাই। নিরুপায় হইয়া মানুষ ইহা সহ্য করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া মনের উপর ইহার অবশ্যম্ভাবী যে ফল তাহা কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবার যে দুঃখ, নিজেদের ধনসম্পত্তি অপরের কবলস্থ হইতে দেখিবার যে মর্মবেদনা, অপরের শোষণের নিরুপায় পাত্র হইবার যে দুঃসহ অবস্থা অনেক বৎসর ধরিয়া তাহা বাঙালী মুসলমানদের মনে জমিয়া কিছুদিন হইতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিদারুণ বিদ্বেষের আকারে দেখা দিয়াছে। যে বিরোধ প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক, তাহার একদিকে হিন্দু এবং অপর দিকে মুসলমান থাকায়; সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকারেই তাহা দেখা দিয়াছে।

অবশ্য এ কারণটির মধ্যেও একটু তলাইয়া দেখিবার কথা আছে। কোন কারণে যখন কাহারও উপর আমাদের আক্রোশ হয় তখন, আমাদের মন নিবিষ্টভাবে সেই কারণটিকেই তলাইয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হয় না, অথবা আমাদের মনের আক্রোশ ধরাবাঁধাভাবে সেই কারণের সীমারেখার মধ্যেই আবর্তিত হয় না। বরং সেই লোকের বাহিরের হাবভাব চাল চলন এমন কি কথাবার্তা, পোষাক পরিচ্ছদের ধরণ প্রভৃতিও আমাদের মনে বিতৃষ্ণা জাগায়। এদেশের কৃষক এবং কায়িক শ্রমিকদের মনে ধনী এবং অভিজাতদিগের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল, তাহাতে প্রথমোক্তরা এ কথা ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই যে, তাঁহাদের অভিযোগ অর্থনৈতিক। তাঁহারা প্রথমেই দেখিতে পাইলেন যে, যাহারা তাঁহাদের উপর অন্যায় করিতেছে, তাহাদের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য হইতেছে ধর্ম্মের, কাজেই, তাঁহারা স্বভাবতঃ অপর পক্ষের ধর্ম্মকে দায়ী করিয়া বসিলেন। অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে ধর্ম্মের প্রভাব শক্তিশালী বলিয়াও এই প্রকার ধারণা গড়িয়া উঠা এবং স্থায়ী হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটু ঐতিহাসিক কারণও বর্ত্তমান আছে।

সমাজের প্রথমাবস্থায় মানুষের মধ্যে যে সংঘবদ্ধতা গড়িয়া উঠে, বহুলোকের সহিত তাহার যে আত্মীয়তাবোধ জন্মে তাহা প্রধানতঃ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া। সে সময় ধর্ম্মই (আনুষ্ঠানিক) মানুষের চিত্তক্ষেত্রের প্রায় সবখানি অধিকার করিয়াছিল।

আমাদের দেশের জনসাধারণ এখনও এই অবস্থা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মুসলমানেরা যখন এদেশে বিজেতারূপে প্রথম আসিলেন তখন, এদেদেশের লোক তাঁহাদিগকে বিদেশী অপেক্ষা বিধর্মীই বেশী করিয়া মনে করিল, দেশ অপেক্ষা ধর্ম্ম বিপন্ন হইল বলিয়াই লোকে বেশী আতঙ্কগ্রস্ত হইল। হিন্দু, মুসলমান উভয়েরই সভ্যতাই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, উভয়-সভ্যতা পরস্পরের সন্নিহিত হওয়ায় যে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল তাহা ধর্ম্মের দ্বন্দ্বেরই রূপ গ্রহণ করিল। দেশজয়ের পর বিজেতাদিগের দ্বারা বিজিতদিগের উপর যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, বিজেতারা সকলেই ধর্ম্মে মুসলমান এবং এদেশীয়েরা সকলেই প্রায় হিন্দু হওয়ায়, তাহা হিন্দুদিগকে মুসলমান বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। এ দেশ যাঁহারা জয় করিলেন, তাঁহারাও কোন বিশেষ ভূখণ্ড অপেক্ষা বিশেষ ধর্ম্মেরই লোক ছিলেন; ধর্ম্মোন্মাদনাই তাঁহাদিগকে এক, শক্তিশালী ও দেশজয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এদেশের লোকদের বিজিত দেশের লোক বলিয়া যতটা না হউক, কাফের বলিয়াই বেশী ঘৃণা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের ধর্ম্মের বিশেষ করিয়া পৌত্তলিকতার উপর তীব্র আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। মুসলমানেরা যখন এদেশের বহুলোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দিতে লাগিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পর যখন নবদীক্ষিতেরা বিজেতাদিগের সমান পদ, অধিকার, সুবিধা প্রভৃতি পাইতে লাগিলেন, তখন এই ধারণা আরও দৃঢ় হইল। বিজেতাদিগকে যদি এদেশীয়েরা শুধুমাত্র বিদেশী মনে করিতেন এবং তাঁহাদের আচরণও অন্যপ্রকার না হইত তবে, হয়ত, বিদেশীরা অনেকদিন এবং অনেক পুরুষ এদেশে বাস করিবার পর এদেশের লোকেরা তাঁহাদিগকে পর মনে করিত না এবং এদেশের লোক যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন (এবং ইঁহাদের সংখ্যাই অনেক বেশী) তাঁহাদের সম্পর্কে হিন্দুদের, অথবা হিন্দুদের সম্পর্কে তাঁহাদের বিদ্বেষ স্থায়ী হইত না।

কিন্তু, এসকল সত্ত্বেও যদি অর্থনীতিক কারন ইহার সহিত এইভাবে যুক্ত না হইত তবে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এত-বড় সাম্প্রদায়িক ব্যবধান গড়িয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু, আর্থিক বিভাগ সাম্প্রদায়িক বিভাগের সহিত মিশিয়া যাওয়ায় সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও বিদ্বেষ যেমন হ্রাস পাইল না, তেমনই পার্থক্যের অনুভূতি সম্প্রদায়গত হওয়ায় অর্থনৈতিক যে অভিযোগ তাহার প্রকাশের রূপ হইল সাম্প্রদায়িক। মুসলমান কৃষকদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার ও দলের যে চেতনা ছিল তাহার ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম। ইঁহারা নিজেদের এই কারণে অন্যদের হইতে স্বতন্ত্র দল বলিয়া মনে করিতেন যে, তাঁহারা মুসলমান, অন্যেরা মুসলমান নহেন। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া এই যে দলের চেতনা, রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক, জাতীয়তা প্রভৃতি চেতনার উন্মেষের সহিত তাহা হ্রাস পাইতই। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একত্ববোধের ফলেই যে দলের সৃষ্টি হইল, তাহাতে এমন একটি কারণ যোগ দিল, যাহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ঠিক এই দলটিই গড়িয়া উঠিতে পারিত। ইহার অপরিহার্য্য ফল দাঁড়াইল এই যে, পরবর্ত্তী কারণে দলটি দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিল বটে, কিন্তু, অনুভূতির দিক দিয়া ইহা দলটীর ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য-বোধকেই তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিল। বাংলাদেশের মুসলমান কৃষক হিন্দুধর্ম্মী ও অভিজাতদিগের ব্যবহারে যতই বিরক্ত হইতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মুসলমান হিন্দুর দ্বারা নির্য্যাতীত হইতেছে। অর্থ ও ক্ষমতার যে ঔদ্ধত্য, মুসলমান কৃষকদের প্রতি তাহা হিন্দুদের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং মুসলমান কৃষকেরা ইহাকে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের অবজ্ঞা মনে করিয়া ভুল করিতে লাগিলেন। লোকের ধর্ম্মানুরক্তিকে ভাঙাইয়া খাওয়া যাহাদের ব্যবসা, মুসলমান কৃষকদের অর্থনীতিক অসন্তোষকে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে তাহারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে এবং অর্থনীতিক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে রূপান্তরিত করিয়াছে। সকল সমাজের লোকদেরই এই সকল স্বার্থান্বেষীদের স্বরূপ চিনিয়া ও উদ্দেশ্য জানিয়া রাখা ভাল।

একদিকে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে যখন এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে, কায়েমীস্বার্থ বিশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যেও সেইভাবে আর্থিক স্বার্থবোধ সাম্প্রদায়িক স্বার্থবোধের আকারে দেখা দিয়াছে। যে সকল কার্য্যকারণের প্রতিক্রিয়ায় ও ফলে মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবোধ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে তাহা হিন্দুদের মনোভাবকে সমানই

প্রভাবিত করিয়াছে। কায়েমী স্বার্থসমূহ রক্ষার দ্বারা যাঁহারা উপকৃত হইতে পারেন, তাঁহারা অধিকাংশই হিন্দু বলিয়া এই প্রকারের স্বার্থকে তাঁহারা হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বলিয়া মনে করেন। অর্থ এবং সম্পত্তি হাতে থাকার ফলে ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষার যে প্রসার ঘটিয়াছে জীবনযাত্রার মান যে উচ্চ হইয়াছে, সভ্যতা, কৃষ্টি, বুদ্ধি প্রভৃতির যে উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহাকে ইঁহারা হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, অন্যদিকে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য যে মানুষকে হীন, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নীতিবোধহীন করিয়াছে, হিন্দুরা তাহাকে গভীর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং সেই সকল দোষকে মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ের এই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া উভয় সম্প্রদায়ের উপর হইয়াছে এবং উভয়কেই অধিকতর সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিয়াছে।

ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আর্থিক অবস্থার এই অদ্ভুত সমবায়ের ফলে যখন উভয়েরই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি শানিত হইয়াছে তখন যে, সমস্যা নানাপ্রকারে জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এইজন্যই হিন্দু ও মুসলমান ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের স্বার্থ এক; হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া তাহাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। আবার হিন্দু ও মুসলমান ধনী ও মধ্যবিত্তদের দৃষ্টিও এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যেও মনোমালিন্য লাগিয়া আছে। কিন্তু, প্রশ্নটা আরও দুরূহ হইয়া উঠে যখন, মুসলমান অর্থশালী ও মধ্যবিত্তদের পরামর্শক্রমে ও তাঁহাদেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলমান কৃষক বা শ্রমিকেরা হিন্দু কৃষক ও শ্রমিকদের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হন, অথবা মুসলমান ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের স্বশ্রেণীর হিন্দুদের জব্দ করিবার জন্য মুসলমান কৃষক বা শ্রমিকদের সহায়তা গ্রহণ করেন।

এই প্রকার অবস্থার সৃষ্টির জন্য পূর্ব্ববর্ণিত কারণগুলির সহিত, পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থার ফলে উদ্ভূত আরও কতকগুলি কারণের সংযোগ অনেকাংশে দায়ী। মুসলমানদের মধ্যে ধনী বিদ্যাবুদ্ধিশালী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক কিছু যে না ছিলেন তাহা নয়, কিন্তু, তাঁহাদের সংখ্যা যে নিতান্তই নগণ্য ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু যাহার ভিত্তিতে এবং যে বুদ্ধি বশতঃই হউক, কতকগুলি লোক যখন অপরাপর সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ও সকলের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া একটা দৃঢ়বদ্ধ দলে পরিণত হয় তখন, অলক্ষিত আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফলে, সেই দলের মধ্যেই অর্থনীতিমূলক বিভিন্ন স্তর গড়িয়া উঠে। মুসলমানেরা যখন দেখিলেন, ধনসম্পত্তি, বিদ্যা, ব্যবসা, চাকরি প্রভৃতি সবই হিন্দুদের হাতে তখন তাঁহাদের স্বভাবতঃই ইচ্ছা হইল যে, তাঁহারাও ইহার অংশ গ্রহণ করেন। সম্প্রদায়ের এই যে ইচ্ছা, ইহাকে কাজে লাগাইবার মত লোক ক্রমে জুটিতে লাগিল। যখন কেহ কেহ চাকরি পাইতে লাগিলেন, লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন, ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া বড়লোক হইতে লাগিলেন তখন, সম্প্রদায়ের সকল লোকই ইঁহাদের সাফল্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা যে প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবহির্ভূত হইয়া পড়িলেন সে কথা মনে না করিয়া, সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা মনে করিতে লাগিলেন যে তাঁহাদেরই কেহ কেহ বড় হইতেছে। ইঁহাদের বড় হইবার পথে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের সাহায্য ও সমর্থন ইঁহারা সর্ব্বপ্রকারে পাইতে লাগিলেন এবং ইঁহাদেরই বুদ্ধি ও পরামর্শ মত সম্প্রদায় পরিচালিত হইতে লাগিল। এইরূপে মুসলমানদের মধ্যে একটি ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিশালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধি ও পরিশ্রমজীবি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে। নিজ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের আওতায় থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছেন বলিয়া, ইঁহারা এই রক্ষাকবচকে যে কিভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহা পরবর্ত্তী কোন আলোচনায় দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। যে কথা মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হইল, তাহার কোন কোন অংশ অনুন্নত হিন্দুদের পক্ষেও সত্য এবং এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে সকল লোক অর্থশালিতা, বিদ্যা প্রভৃতিতে বড় হইতেছেন, তাঁহারাই আবার নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য, অনুন্নত হিন্দুদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব প্রসঙ্গে অনুন্নত হিন্দুদের অবস্থাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। ইঁহাদেরও অধিকাংশই কৃষক বা অন্যবিধ কায়িক শ্রমের উপর জীবিকার জন্য

নির্ভরশীল। কাজেই, আর্থিক বিচারে ইঁহারা মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্তরের লোক এবং তাঁহাদের সহিতই ইঁহাদের স্বার্থ অভিন্ন। কিন্তু, স্বার্থবোধ প্রচ্ছন্ন থাকায় এবং নিজেরা হিন্দু এই বোধই বিশেষভাবে তীব্র হওয়ায়, ইঁহারা কখনই নিজেদের অন্যধর্মের লোকদের সহিত সমস্তরের লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে রাজী হইতে পারেন নাই। বরং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে যে অবজ্ঞার ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইঁহারাও কিছু পরিমাণে সেই মনোভাবের অধিকারী হইলেন। ইঁহাদের এই মনোভাবকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিজেদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য সুকৌশলে ব্যবহার করিয়াছেন। নহিলে মুষ্টিমেয় বর্ণহিন্দুর পক্ষে এতটা প্রভাব বিস্তার ও প্রভাব রক্ষা সম্ভব হইয়া উঠিত না। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ণহিন্দুরা ইঁহাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ সদয় ব্যবহার করেন নাই। বরং নিজধর্মের লোক বলিয়া এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরই ইঁহারা নেতা ও হিতৈষী মনে করিতেন বলিয়া, বর্ণহিন্দুরা ইঁহাদের কতকটা হাতের মধ্যে পাইয়াছিলেন এবং অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তা প্রভৃতি কয়েকটি অতিরিক্ত বোঝা ইঁহাদের উপর চাপাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা যদি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া না যাইতেন, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত হিন্দু মুসলমান সমস্যাটি এমন গুরুতর হইয়া উঠিতে পারিত না, আর্থিক সমস্যাটিকে হয়ত হিন্দু এবং মুসলমান কেহই সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলিয়া ভুল করিতেন না।

বর্তমানে দেশের সর্বস্তরের লোকের মধ্যে একটা জাগরণ আসিয়াছে এবং তাহার ফলে অনুন্নতশ্রেণীর হিন্দুরাও কতকটা স্বতন্ত্র দল হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিতেছে, তাহারও ভিত্তি সাম্প্রদায়িক, কাজেই তাহার ফলে সমস্যা সহজ না হইয়া আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমস্যাটা যে প্রকারের দাঁড়াইয়াছে, ইঁহাদের এই স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরেও সেই প্রকারের সমস্যা দেখা দিয়াছে।

হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে অনুন্নত হিন্দুদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য এই চেষ্টাও খুব অল্পস্থানেই আন্তরিকভাবে পরিচালিত হইতেছে। সর্বস্তরের হিন্দুরা মিলিত হইয়া একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হইয়া উঠিতে পারিবেন কি না, এবং হইলেও তাহা দেশের প্রতি কল্যাণকর হইবে কি না তাহা বিশেষভাবে সন্দেহের বিষয়। তবে, এই প্রকার চেষ্টার ফলে অসংখ্য খণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ যদি নষ্ট হয়, সমগ্র দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যাটিকে যদি শুধুমাত্র হিন্দু মুসলমান-সমস্যায় আনিয়া ফেলা যায় তবে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের পথ অনেকটা বাধামুক্ত হইবে।

খুলনা মুসলিম ক্লাব ও লাইব্রেরী

খুলনা-মুসলিম ক্লাব ও লাইব্রেরীর কথা আমরা বিচিত্রায় পূর্বে একবার বলিয়াছি। সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া বাংলার মুসলিম তরুণদের মধ্যে যে একটা শক্তিশালী দল গড়িয়া উঠিতেছে, যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ও যুক্তি-অনুগামী মনোভাবের সৃষ্টি হইতেছে তাহার দিক দিয়া এই প্রতিবিধানটিকে অনেকটা প্রতিনিধিমূলক বলা যাইতে পারে। এই ক্লাবটিই এতদঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র শক্তিশালী কৃষ্টিমূলক প্রতিষ্ঠান। ইহার বহু পত্রিকা সমন্বিত সুসজ্জিত পাঠাগার, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, প্রাত্যহিক মজলিশ, বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিক অধিবেশন, জনসেবার প্রশংসনীয় উদ্যম প্রভৃতি ইহার বৈশিষ্ট্য।

এবার ইহার বার্ষিক উৎসব খুলনা করোনেশন হলে প্রায় তিন সহস্র হিন্দু-মুসলমান দর্শকের সমক্ষে সমারোহ ও আড়ম্বরের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই ক্লাবটি সহরের (এবং বাহিরেরও) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কতকটা মিলনসেতুর কাজ করিতেছে।

আলোচ্য বর্ষে এই ক্লাবে পঠিত একটি প্রবন্ধ বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে।

যশোহর 'মিলন মন্দির'

মিলনমন্দির যশোহরের প্রগতিশীল তরুণদের একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইহার সংলগ্ন পাঠাগার, ব্যায়াম সমিতি, খেলাধুলার ব্যবস্থা প্রভৃতির মধ্য দিয়া তরুণদের মধ্যে যে

একটা সুশৃঙ্খল সংঘবদ্ধ জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে তাহা ইহার সদস্যদিগকে যোগ্যতর নাগরিক ও শ্রেষ্ঠতর মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবে, আশা করা যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে যশোহরে এবার যে নবনর্ষোৎসব হইয়াছিল, সর্ব্ববিষয়ে তাহার নিখুঁত পারিপাট্য, তাহার প্রাণবন্ত সজীবতা, এবং সংযত পরিমার্জ্জনা ইহার সদস্যদিগের উদ্যম, শক্তি, শৃঙ্খলা, কর্ম্মক্ষমতা এবং মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। এই উৎসব অনুষ্ঠানে, ইহার আবৃত্তি, গান প্রভৃতিতে মেয়েরাও যোগ দিয়াছিলেন।

লঘুচিত্ততা, গভীর বিষয়ে মনোনিবেশের ক্ষমতার অভাব ও অনিচ্ছা যখন আমাদের তরুণদের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন এই প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মতৎপরতার উপরই ভবিষ্যতের আশা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

খাটুনীর মাহাত্ম্য

গত চৈত্র সংখ্যা বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে।

"ডিগ্‌নিটি অফ্ লেবার কথাটা ফাঁকি। কোন কাজে ডিগনিটি আছে, কোন কাজে নেই। সকল বিষয়েই এই কথা খাটে—যদি বলি ডিগনিটি অফ্ আর্টস্, তবে এ বোঝায় না যে তোমার আঁকা ছবিতেও ডিগনিটি আছে সেই কর্ম্মই উচ্চশ্রেণীর যাতে বুদ্ধি খাটে বা প্রীতিভক্তির দাবী আছে। লোকসেবার অনুরোধে নীচ কর্ম্মও উঁচুদরের, যেমন রোগীর শুশ্রূষায় মলিন কর্ম্মেও মহত্ত্ব আছে, বরং তাতে মহত্ত্ব বেশী আছে। তাই বলে রাস্তার লোক ধ'রে ধ'রে গায়ে পড়ে যেচে যেচে তাদের জুতো সাফ ক'রে দেওয়ায় ডিগনিটি আছে এ কথার মানে নেই। নিতান্ত দায়ে ঠেকলে উচ্চতরো বুদ্ধিজীবির কাজ যদি না পাওয়া যায়—তাহোলে প্রাণ রক্ষার জন্যে অন্য কাজও করা চলে, মর্য্যাদা না থাকলেও তার জরুরী থাকতে পারে। সকাল বেলায় দাঁতন করি, সেটার ডিগনিটি বা শোভা না থাকলেও তবু করতে হয়—কাব্য লেখা বা ছবি আঁকার সমান মূল্য তাকে দেওয়া মূঢ়তা। যদি কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে দাঁতন না করলেও চলত নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতুম কিন্তু কাব্য রচনা সম্বন্ধে সে কথা বললে চলবে না। মুটে মোট বয় বটে কিন্তু তার এতটুকু বুদ্ধি আছে যে সম্ভব হোলে সে মোট বওয়া ছেড়ে দিয়ে ইস্কুলের মাষ্টারি ক'রত,—তার মানে মোট বওয়ার দায় আছে, ডিগনিটি নেই, মাষ্টারিতে কুলিগিরির চেয়ে ডিগনিটি আছে। অভাব পক্ষে যে কোন কাজ হাতে পাও স্বীকার করো, কিন্তু বাজে বুলির সাহায্যে নিজেকে বা অন্যকে ফাঁকি দেবার দরকার কী?"

কথাটায় আমাদের মনে একটু খটকা লাগিয়াছে। কবি বলিয়াছেন শ্রম মাত্রেরই মর্য্যাদা নাই, যাহাতে বুদ্ধি খাটে বা প্রীতিভক্তির দাবী আছে, সেই কর্ম্মই মাত্র উচ্চ; লোকসেবার অনুরোধে নীচকর্ম্মও উঁচুদরের হয়। দায়ে পড়িয়া যে সকল সাধারণ কাজ আমাদের করিতে হয় তাহা না করিয়া উপায়ান্তর না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মর্য্যাদা নাই। কাজেই ডিগ্‌নিটি অফ্ লেবার কথাটা ফাঁকি এবং আমরা নিজেকে বা অপরকে এই ফাঁকি দিয়া থাকি।

কথাটা একটু গোড়া হইতে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। মানুষের অনেক গুণ, অনেক মহত্ত্বের সমবায়ে সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে কত সংযম, কত ত্যাগ, কত পরার্থপরতা, কত নিয়ম নিষ্ঠা দেখাইতে হইতেছে। কিন্তু, তাহা হইলেও ইহার মূল কাঠামোটি মানুষের শ্রমের দ্বারাই গঠিত এবং শ্রমের দ্বারাই তাহা রক্ষিত হইতেছে। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য শিল্প, আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি, আমাদের বুদ্ধি, মন, আত্মার সকল সম্পদ ও উৎকর্ষ যে শ্রমের উপর নির্ভরশীল, তাহার প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব পোষণ না করি তাহা হইলে মানব সভ্যতার গগনস্পর্শী প্রাসাদের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া যাইবে। আমাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও গৌরবের বস্তুর মূলীভূত যে শ্রম তাহার প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধাহারা হই তবে সভ্যতার ধ্বংস একদিন অবশ্যম্ভাবী হইবে। যাহা অমর্য্যাদাসূচক নিতান্ত দায়ে না পড়িলে তাহা কেহ করিতে চাহিবে না এবং নিতান্ত দায়ে না পড়িলে যে কাজ কেহ করিবে না তাহা কখনও ভালভাবে সম্পন্ন হইবে না; যাহারা তাহা করিবে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ এবং হীনতাবোধ সব সময়েই থাকিবে।

আমরা উৎকর্ষের কাছে, মহত্বের কাছে, শক্তির কাছে, সম্ভ্রমে নত হই। যাহার ফলে এ সকলের সৃষ্টি ও লালন সম্ভব হইতেছে, তাহার প্রতি মর্য্যাদাবোধ না থাকাই অসঙ্গত হইবে এবং থাকাটা কখনই ফাঁকি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কথা হইতে পারে; পূর্ব্বোক্তগুলির প্রতি আমাদের সম্ভ্রমবোধ কৃত্রিম চেষ্টার দ্বারা জাগ্রত করিতে হয় না—তাহা সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক। অথচ, অন্যদিকে সাধারণ কায়িকশ্রমের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণাই স্বাভাবিক—সম্ভ্রম জাগাইবার চেষ্টা কৃত্রিম। কাজেই, ইহার মূলে সত্য নাই। কিন্তু, যাহাকে স্বাভাবিক মনে করিতেছি, তাহাও মনের বহুদিনের অভ্যাসের ফল মাত্র, ইহারও পশ্চাতে, মানুষের প্রদত্ত হউক বা অবস্থাগত হউক শিক্ষা আছে। আর শিক্ষার দ্বারা যাহা লাভ করিতে হয়, তাহা যে কৃত্রিম বা ফাঁকি হয়, এমন কথা মনে করিবারও কারণ নাই। যাহার প্রকৃত খাঁটিরূপ, অশিক্ষিত মনের কাছে ধরা পড়ে না, শিক্ষাই তাহাকে উদঘাটিত করে।

মানুষ একদিন যখন একা ছিল, তখন কায়িকশ্রমকে তাহার অবহেলা করিবার উপায় ছিল না; কাহারও নিকট তখন ইহা অমর্য্যাদাসূচক ছিল না। কিন্তু, যখন মানুষকে বৃহৎ সমাজের অঙ্গীভূত হইতে হইল তখন, নানাকারণে শ্রমেরও বিভাগ হইল। এই বিভাগের ফলে যাহারা বুদ্ধি, মন ও আত্মা লইয়া থাকিবার সুযোগ ও অবসর পাইলেন, তাঁহারা সহজেই ইহার সহিত কায়িকশ্রমের সম্পর্কের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং অপরের কায়িকশ্রমের ফল ভোগ করিবার সুবিধা ঘটায় যে তাঁহারা কায়িক শ্রম না করিয়াও বাঁচিতেছেন এবং তাঁহাদের সকল সময় ও উৎসাহ অন্যত্র নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন, তাহা মনে না থাকায়, শারীরিক বা শ্রমের মূল্য ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে মনে ভুল ধারণার উদ্ভব হইল এবং একই সঙ্গে তাঁহারা শ্রমকে ও শ্রমিককে হীন মনে করিতে লাগিলেন। এখান হইতেই প্রকৃতপক্ষে ফাঁকি আরম্ভ হইল। কতকগুলি লোক ইচ্ছা করিয়া হউক বা দায়ে পড়িয়া হউক, যখন আর কতকগুলি লোকের খাওয়াপরা যোগাইতে লাগিল এবং তাহার ফলে ইহারা যখন উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইল তখন যদি শেষোক্ত দল মনে করে যে প্রথমোক্ত দলের কাজের কোন মর্য্যাদা নাই, তবে, তাহা যেমন অসঙ্গত হয়, শ্রম সম্বন্ধে আমাদের অবজ্ঞাসূচক মনোভাবও তেমনই অসঙ্গত।

সমাজের রক্ষা ও পোষণের জন্য কতকগুলি লোকের কায়িক পরিশ্রম অপরিহার্য্য। এখন কাহারা কায়িক শ্রম করিবে এবং কাহারা বা শ্রেষ্ঠতর কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে তাহা লোকের ইচ্ছা যোগ্যতা বা সুবিধার উপর নির্ভর করে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে বহুলোক এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছে যাহাতে মানসিক কোন উৎকর্ষের সুযোগই তাহাদের নাই এবং বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে শুধুমাত্র কায়িক শ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। সমাজের সকলের জন্যই ইহাদিগকে শ্রম করিতে হইতেছে বলিয়া সর্ব্বদাই ইহাদের কর্ম্মরত থাকিতে হয়। কোনপ্রকার মানসিক উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করিবার কিছুমাত্র সময় এবং সুযোগ ইহাদের থাকে না। ইহাদের শ্রমের ফলে সমাজের অলস অংশ যে শুধুমাত্র পুষ্ট হয় তাহা নহে, বর্ত্তমান ব্যবস্থার জন্য ইহাদের শ্রমোৎপন্ন অর্থ ও সম্পত্তির অধিকাংশই গিয়া ইঁহাদের হাতে পড়ে এবং শ্রমিকদের সকল দিক দিয়া বঞ্চিতজীবন যাপন করিতে হয়। যাহাদের জন্য আমাদের যাহা কিছু গৌরবের বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে, নিজেদের জীবনের সকল সম্ভাব্যতার বিসর্জ্জনে যাহারা সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহাদের কাজকে আমরা অবজ্ঞেয় মনে করিব কোন ঔদ্ধত্যে। সেবার কার্য্য যদি মহৎ হয় তবে কায়িক শ্রমও সেই মহত্বের দাবী করিতে পারে। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, কায়িক শ্রম করিতে হইতেছে বলিয়া এবং সেই কায়িক শ্রমোৎপন্ন অর্থাদি অন্যের হাতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া যাহারা অর্থ ও অবসরের অভাবে মানুষের আয়ত্তযোগ্য সকলপ্রকার বিকাশের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যের বহু লোক কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তাবীর প্রভৃতি হইতে পারিত। কিন্তু সমাজের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যে তাহারা তাহা হইতে পারিতেছে না এবং এই সুবিধাটা যে খুব অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে তাহার জন্য এই সুবিধাভোগী আমাদের লজ্জিত হইবার এবং ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে।

শ্রমের মর্য্যাদাবোধ, শ্রমিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, এবং

পরস্বাপহরণের গ্লানি হয়ত একদিন আমাদের সকলকে কায়িক-শ্রমে নিয়োজিত করিতে পারে এবং ফলে সকল মানুষের মধ্যে অবসরেরও কতকটা সমান বণ্টন হইতে পারে। শ্রম এবং অবসরের সমবণ্টন হইলেই, বর্ত্তমানে যে সুযোগ অল্পলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে তাহা সকলের মধ্যে প্রসারিত হইতে পারে এবং বর্ত্তমানে আমরা যে সকল কাজকে উঁচুদরের মনে করিতেছি তাহার সুযোগও সকলের কাছে উন্মুক্ত হইতে পারে। কাজেই সকল উচ্চ কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ যে সাধারণ কায়িক শ্রম তাহার প্রতি মর্য্যাদাবোধের শিক্ষা, ন্যায়ানুগ, সভ্যতার পরিপোষক এবং সভ্যতাসঙ্গত।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি কোনদিন দাঁতন করা এবং অন্যান্য অনেক কাজ ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে সেদিনকে আমরাও শুভদিন মনে করিব। কিন্তু, যন্ত্রের যতই উন্নতি হউক এবং আমাদের শ্রম হ্রাসে তাহা যতই সক্ষম হউক, এমন দিন আজও কল্পনা করা যাইতেছে না যখন তাহা মানুষের শ্রমের প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিবে। যন্ত্রের নির্ম্মাণের এবং তাহার পরিচালনে মানুষের শ্রম করিবার প্রয়োজন চিরদিনই থাকিবে এবং শ্রম সম্বন্ধে মর্য্যাদাবোধের প্রয়োজনও সমানই থাকিবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে ডি-পি-আই-এর অভিমত

কলিকাতা 'ইউনিভারসিটি 'ইন্‌ষ্টিটিউট'-এর সভায় ডক্টর জেম্‌কিন্‌স্ শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

'শিক্ষা, পুস্তক এবং পরীক্ষার ব্যাপার নহে। ইহা এমন কিছু যাহা নিদ্রায় জাগরণে মানুষের গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে। ইহা এমন কিছু যাহা স্কুলে প্রবেশের পূর্ব্বেও বালকের থাকে এবং স্কুল পরিত্যাগ করার পরও থাকিয়া যায়। যদি কেহ বাস্তবিক মহৎ লোকদের জীবনী পাঠ করেন তবে, তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের ভবিষ্য মহত্ত্বের বীজ তাঁহাদের স্কুল বা কলেজে পাঠকালে উপ্ত হয় নাই, বরং বাহিরের ও জনসমাজের সহিত সংস্পর্শের ফলেই তাহা হইয়াছে। এই সকল সংস্পর্শই তাঁহাদের নেতৃত্বের শক্তিকে বিকশিত করিয়াছে এবং তাঁহাদের মহত্ত্ব ক্রমে সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

"কেম্‌ব্রিজ অথবা অক্সফোর্ডের ছাত্রেরা শুধুমাত্র তাহাদের ক্লাসে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না—তাঁহাদিগকে বিদ্যালয় বহির্ভূত অনুষ্ঠান সমূহেও যোগ দিতে হয়। ক্রীড়া, সামাজিক অনুষ্ঠান, রাজনীতির সমস্যা, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, বিতর্ক, বৈঠকী আলোচনা ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের সুযোগ তাঁহাদের আছে। তাঁহাদের শক্তির বিকাশ এমন ধীরে ধীরে সাধিত হইতে থাকে যে শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের দ্বারা উদ্ভাবিত বিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন পাঠ্যতালিকার দ্বারা তাহা সমাপ্ত হইতে পারে না।"

'ডি-পি-আই' যদি তাঁহার অভিমত সম্বন্ধে অকপট হইয়া থাকেন তবে বুঝিতে হইবে যে রাজনৈতিক সমস্যা হইতে ছাত্রদের দূরে না থাকিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন।

জোহেন্‌স্‌বার্গের ভারতীয় ছাত্রদের দান

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে সরকারী মতে 'খাদ্যাভাব' ও বে-সরকারী মতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। যে-সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই সে সকল স্থানেও লোকে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। বঙ্গদেশের এই দুর্দ্দিনে সাহায্যার্থ সুদূর আফ্রিকার জোহেন্সবার্গ হইতে ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রবৃন্দ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত জহরলালের নিকট ২৫ পাউণ্ড পাঠাইয়াছেন। এই সম্পর্কে জহরলাল বলিয়াছেন : স্বদেশের দারিদ্র মোচনে বালকদের এই যুবকোচিত উৎসাহ বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলের সাহায্যার্থে দান করিতে অপরকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

জহরলালের আশা সফল হইলে, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলের কিছু সুবিধা হইবে সত্য। কিন্তু আমরা এই ভাবিয়া আশান্বিত হইতেছি যে, জোহেন্সবার্গের ভারতীয় বালকদের এই দান, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের প্রতি জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

আকাশ-কুসুম

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায়

ক্লাসের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত যে, নন্দলালের মাথায় একটু ছিট্ আছে। বিশ্বনিন্দুক সুরেশ্বর তাহার উপর খানিকটা রং ফলাইয়া বলিত—"একটু কি ? এতটা আছে যে তা'দিয়ে একটা ফুল সাইজের সার্ট হয়েও দু'গজ বেঁচে যাবে।"

এ হেন অপবাদ, আমি নন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াও, ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম না। নন্দলালের আচরণই ছিল ইহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাক্ষী।

নন্দলালের বাড়ীতে আমার অবাধ গতি। সেদিন, "নন্দ" বলিয়া হাঁক ছাড়িয়া, তাহাদের বাড়ীর অন্দর মহলে উপস্থিত হইয়াও সহসা তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎ-কাল পরে বিশ্বাসী বন্ধুদ্বয় নন্দকে আবিষ্কার করিল, উঠানের এক অখ্যাত স্থান হইতে।

দেখিলাম, তিনটা ইষ্টক একটা কড়াইকে নির্ব্বিবাদে মস্তকে ধারণ করিয়া উনান বলিয়া পরিচয় দিতেছে। উনানে নিবু-নিবু ভাবে পাটকাটি জ্বলিতেছে। নন্দ উবুড় হইয়া, গাল ফুলাইয়া, তাহাতে ফুঁ দিতেছে। আমার উদ্দেশ্যে "এখানে রে" হাঁকটার নিমিত্ত অল্প অবসর করিয়া আবার সে পূর্ব্বকার্য্যে রত হইল। কাছে গিয়া দেখি, কড়ায় সাদা সাদা মত অনেকখানি কি একটা পদার্থ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ও গুলো কি রে ?"

চকিতে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল—"ও বালু আর সোডা একসঙ্গে মেশান। খানিকক্ষণ ভাখ্, কাঁচ তৈরী করে ফেলব। শালা উনুনেরই যে জোর হচ্ছে না ছাই।"

বুঝিলাম, বিজ্ঞানের ক্লাসে কাঁচের আলোচনাটার Practical test করিতে নন্দ রত।

এমনি ছিল নন্দ। লোকে যে তাহাকে পাগল বলে সেটা মিথ্যা নয়।

তাহার জীবনের আর একটা মজাদার ঘটনা ঘটিল সেবারকার Terminal Examination এ।

English এ Essay ছিল—"What will you do after your school-life ?" সকলেই যাহা হউক কিছু লিখিয়াছে। নন্দকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁ রে, তুই কি লিখলি রে ?"

সে একটু বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলিল—"খাতা দেওয়ার সময়ই দেখতে পাবি।" দুই একবার খোসামোদ করিবার পর সে একটু মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল—"আবে যা তা কি আর লিখছি রে, বড় হাই আইডিয়া। সুবোধ বাবু প'ড়ে যদি কুড়ির মধ্যে উনিশ না দেন, তবে—উ-হু-হু হু..."

আর কিছু সম্মুখে না পাইয়া দেয়ালে কিল মারিয়া তাহার হাতে কালসিটি পড়িয়া গেল। আর্ত্তনাদ তাহারই বাহ্যাভিব্যক্তি।

তারপর কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। পরীক্ষার শেষে ফল জানিবার নিমিত্ত সকলেই উৎসুক। এমন একদিনে, সুবোধ বাবু একতাল খাতা বগলে ক্লাসে ঢুকিয়াই হাঁক ছাড়িলেন—"ইউ সায়েন্টিষ্ট, এণ্ড এঞ্জিনিয়ার।" দেখিলাম, নন্দ লালের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি।

অতঃপর চেয়ারে বসিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমাদের নন্দলাল তো এখন ইঞ্জিনিয়ার আর সায়েন্টিষ্ট হ'তে চল্ল।"

সকলেই বুঝিলাম, নন্দলাল essayতে একটা ছিট ঝাড়িয়াছে। উৎসুক হইয়া বসিলাম।

এই খানেই বলিয়া রাখা ভাল যে, গুরু-শিষ্য অর্থাৎ "গরু-শস্যের" সম্বন্ধটা সুবোধ বাবুর সহিত আমাদের প্রায় ছিলই না; সৌহার্দ্দ্যের বন্ধনই তথায় প্রবল ছিল।

চশমা খুলিয়া লইয়া মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন—

"নন্দ প্রথমেই ত' এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবে, অবিশ্যি 'অ ই' এস্-সি'র ছাপ পিঠে নিয়ে। তারপর বিলাত আর জার্ম্মানী ঘুরে 'সায়ান্সের' ভাল রকম রিসার্চ করে তবে দেশে ফিরবে।"

উপচক্ষুদ্বয়কে পুনরায় স্বস্থানস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি থামিলেন। পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, নন্দলাল গম্ভীর ভাবে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বসিয়া আছে। নিষ্কর্ম্মার কর্ম্ম কড়ি কাঠ গুণিতেছে, কি, কি করিতেছে তাহা সেই জানে।

সুরেশ্বর বরাবরই অস্থির প্রকৃতির; সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"তারপর?"

একটা হাত ঈষৎ তুলিয়া সুবোধ বাবু বলিলেন—"থাম থাম, ব্যস্ত হ'য়ো না। আরে এখনও আসলই বাকী, এ'ত গেল, উপক্রমণিকা। অবিশ্যি ব্যাকরণ কৌমুদী বা সংস্কৃতের কোন কিছুই এতে নেই। —এখন তারপরে ও মেলা প শ-টাশ করে দেশে একটা কারখানা খুলবে।"

তারস্বরে সকলে জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের কারখানা স্যার?"

সুবোধ বাবু বলিলেন—"কি জানি, লেখেনি তো কিছু। কিহে নন্দদুলাল, কিসের কারখানা?"

নন্দলাল ('দু'-টি সুবোধ বাবুর স্বকল্পিত যোগ) যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভাবে বসিয়া রহিল।

সুবোধ বাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"হ'ল না হয় জুতোরই কারখানা...।"

বলিতে বলিতেই নন্দলাল উঠিয়া তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করিল—"না স্যার, জুতোর না, চিনির।"

একটা হাসির স্রোত ক্লাসের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

সুবোধ বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন—"তা জুতোরই হোক বা চিনিরই হো'ক, তা নিয়ে কিছু এসে যায় না। ও সব থাক্; হ্যাঁ তারপর ওর টাকা হ'লে যত গরীবের উপকার করবে। শেষ জীবন ও কাটাবে কেবল লোকের উপকার করেই। গভর্ণমেণ্ট যদি ওকে রায়বাহাদুর কি রায়সাহেব কি "খানসামা" টাইটল্ই দিতে চায়, ও তা দুপায়ে ঠেলে ফেল্‌বে। এই হল তোমাদের Scientist-এর মোটামোটি জীবনধারা। কিহে নন্দলাল ঠিক এইত,' না কিছু বাদ দিয়েছি?"

নন্দলাল এমনি করিয়াই বসিয়া রহিল যে এই কথা যেন শুনিতেই পায় নাই, অথবা ইহা অন্য কাহারও সম্বন্ধে।

এক-এক করিয়া কতগুলি বৎসর পৃথিবীর বুকের উপর হাসিয়া খেলিয়া অতীতের কোলে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে, সাথে লইয়া গিয়াছে কত অশ্রু কত আনন্দোচ্ছ্বাস। পৃথিবীর তথা আমার মনের পরিণতির চিন্তা করিয়া সময় সময় বিস্মিত হই। First class এ থাকিতে আমার ডায়ারীতে লিখিয়াছিলাম—'পৃথিবীর সকল জিনিসই কি সুন্দর, কি আনন্দময়। নদী, সহর, পল্লী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা সকলই দেখিতে কত মনোরম, কত বিচিত্র। কত সুখের মধ্য দিয়া মনুষ্য জীবন যাপন করিতেছি। যে বলে দুঃখই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান, সে কখনও প্রকৃত সুখের সন্ধান পায় নাই। দুঃখ কি কোনও দিন আনন্দ দিতে পারে। উহা ভগবানের অতিবড় নিদারুণ অভিশাপ।"

আজ লিখিতে হইতেছে—"অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার শ্রেষ্ঠ পাথেয় দুঃখ। দুঃখের আঘাতেই মানুষের পরিপূর্ণতা সাধন হয়। ইহা মানবজীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে পরীক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারাটাই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়।..."

নিজের জীবনের গতির কথা বলিব না। যাহার কথা লিখিতেছি, সে নন্দলাল। শৈশব হইতেই আমার সহিত তাহার সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাহাকে আমিই সবচেয়ে বেশী জানিতাম, এবং সে জ্ঞান আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ ডিগ্রি আহরণ করিয়া সে বাধ্য হইয়াই পড়া ছাড়ে। পিতার পরলোক প্রয়াণই ইহার প্রধানতম কারণ। উচ্চতম পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই সে দেখিতে পাইল, দুই অনাথিনী তাহারই আয়ের পথ চাহিয়া অচল অবস্থায় কাল কাটাইতেছেন। এক তাহার প্রৌঢ়া মাতা, অপরা ভার্য্যা।

অতঃপর ৯৯½ ভাগ বাঙ্গালীর যা অবস্থা, তাহাই তাহার ভাগ্যকে অধিকার করিল। অচল সংসারের কথা ভাবিয়াই তাহাকে চাকুরীর উমেদার হইতে হইল। নিজের নূতন জুতা জোড়াকে সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য করিয়া এবং চাকুরী সম্বন্ধে

প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া যখন সে পঁচিশ টাকা বেতনে এক অখ্যাতনামা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কেরাণি নিযুক্ত হইল, তখন খবরটা আমাকে দিতেও সে যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। ছাত্রজীবনে সে বরাবরই ছিল আদর্শবাদী কথায় কথায় আউড়াইত "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" ভগবান যেন তাহার ভাগ্যে তাহারই কথার বিদ্রূপাত্মক প্রত্যুত্তর দিলেন।

বহুকষ্টে লজ্জা দমন করিয়া সে আমাকে এই খবরটা দিলে আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর বেদনাও অনুভব করিলাম। উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন্দলাল কিনা আজ ২৫ টাকা মাহিনার সামান্য একজন কেরাণি। কত বড় দুঃখে যে সে আপনাকে ঐ পদে বৃত করিয়াছে তাহা, তাহার অন্তরের সকল কথা জানিতাম বলিয়াই সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিলাম।

অর্থচিন্তা মানুষের কত পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাইলাম নন্দের চরিত্র হইতে। তাহার চাকুরী গ্রহণের পর তিন বৎসর কাল আমি অন্যত্র ছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া নন্দের যে রূপ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। বাচাল নন্দ আজ হইয়াছে মৌনী মুনি।

পুরাতন ক্ষুদ্র বাড়ীটির মধ্যে যে মনুষ্যবাসোপযোগী স্থান থাকিতে পারে তাহা ধারণাও করিতে পারিলাম না। কোনও মতে সম্মুখের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরটায় ঢুকিয়া দেখি, নন্দ একতাড়া কাগজ-পত্র বিছাইয়া লইয়াছে, অখণ্ড মনোযোগ সহকারে।

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন আছিস ?"

চকিতে মুখ তুলিয়া "ভালই, বোস" বলিয়া কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবিয়া গেল। আমি যে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি বোধ করি তাহাও ভুলিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে ঘড়ীর দিকে একবার চাহিয়া আবার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

অধৈর্য্য হইয়া একটু রাগতঃ স্বরেই কহিলাম—"এতদিন পরে এলাম, একটা কথাও বলবি না নাকি ? রেখে দেনা ও আজে-বাজে কাগজগুলো, তার বদলে আয়না খানিকক্ষণ গল্প করি ?"

অতি কষ্টে মুখে একটু শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলিল—"পাগল ! আজ সাবমিট না করতে পারলে এমাসের মাইনে পাব না তা জানিস ? তুই বরং মায়ের কাছে যেয়ে গল্প-সল্প করগে।

উঠিয়া তাহার মাতার নিকট গেলাম। প্রণাম করিতেই আশীর্ব্বাদ মিলিল, কিন্তু সহাস্যমুখে নয়। বধূ মৃণালিনী দ্বার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নীরবে। ক্রোড়ে একটি ক্ষুদ্র শিশু, সেও হাস্যবিমুখ। হাসিতে যেন ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে। একটি অস্বস্তিকর নির্জ্জনতা বাড়ীটিকে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে চাপিয়া ধরিয়াছে। সামান্য কথাবার্ত্তার পর চলিয়া আসিলাম, একটা অব্যক্ত বেদনার অনুভূতি সাথে লইয়া।

নন্দের মাহিনা ৩০ টাকায় উঠিয়াছে; কিন্তু কৈশোরের নন্দলালকে যেন আর খুঁজিয়া পাই না। পূর্ব্বে তাহাকে বলিতাম ছেলেমানুষ,—এখন সেই পদে পদে আমাকে শাসন করে—"তুইত বড় ছেলেমানুষ হ'য়ে গেছিস্, বুড়ো হ'তে চল্লি তবু তোর ছেলেমানুষী গেল না ?" অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকি; কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে সামান্য ৩।৪ বৎসরে।

কাছে ডাকিয়া নন্দলালের মাতা একদিন বলিলেন—"দেখ বাবা তুমি ত' আমার ছেলেকে ভাল করেই চেন। কাউকেই ও ঠকায় না, কোনদিন মিথ্যেও বলে না, তাই নয় ?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিতেই আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, কিন্তু আপনি একথা বলছেন কেন ?"

দেখিলাম তাঁহার চক্ষে জল।

অদ্ভুত ভাবে নিঃশব্দে একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন—"বড় দুঃখেই বলি বাবা। ও ত' মাইনে পায় ৩০ টাকাই, কিন্তু মাস গেলে আনে কিছু কম। আগে কোনও দিনই এর কারণ জিজ্ঞেস করি নি। ভাবতাম ছেলেমানুষ, একটু-আধটু ফুর্ত্তি আমোদ করে করুক। কিন্তু এখন ত' আর তা করলে চলে না। ওর প্রত্যেকটা পাইই যে আমাদের কাছে মূল্যবান। তাছাড়া বৌমারও আজকাল এত খাটতে হয় যে কি বলব। বাছার আমার শরীর দিন-দিনই যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।"

একটু থামিলেন। দেখিলাম তাঁহার নাসিকা কিঞ্চিৎ

স্ফীত, ওষ্ঠদ্বয় কম্পমান। "সে দিন আর না পেরে জিজ্ঞেস করলাম নন্দকে টাকার কথা। শুনলে বিশ্বেস করবে না বাবা, নন্দ আমাকে তেড়ে এল, বকে দিল আমাকে। আমার অমন শান্ত ছেলেকে ভগবান এ কি করে দিলেন।"—বলিতে বলিতে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন, বোধ হয় অশ্রু মুছিতে।

ক্ষণকাল পরে মিনতিপূর্ণ স্বরেই বলিয়া উঠিলেন—"দেখত' বাবা, তুমি একবার চেষ্টা কোরে। যদি মাস মাস ঐ কটি টাকা সংসার খরচে পাওয়া যায়- তবে কত লাভ হয় বলত?"

আশ্বাস দিয়া বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, ভারাক্রান্ত মনে। সহসা নন্দের মস্তকে সমস্ত অপরাধের বোঝা চাপাইতে পারিলাম না। শিশুকাল হইতেই তাহাকে চিনি। সে যে এতদূর অধঃপতিত হইবে তাহা কল্পনাও করিতে পারিলাম না।

ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমের ফলে নন্দের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু তবুও নন্দকে নিরস্ত করিতে পারিলাম না। যদি বলিতাম—"তোর এখন চেঞ্জে যাওয়া দরকার," সে হাসিয়া বলিত—"কিন্তু এতগুলো টাকা ত' আমার মত গরীবের কাছে সহজলভ্য নয়। বরং ওটাকা থাকলে একটা দোকান-টোকান দিয়ে আয় আরও একটু বাড়ান যাবে।"

সময় বসিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে আরও সাতটা শরৎ আসিল, চলিয়া গেল। নন্দলালের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া দেখিতাম—ইতস্ততঃ শুভ্রবর্ণ কেশগুলি বয়সের নিশানা করিয়া দিতেছে। ললাটের চিন্তারেখাগুলি জাঁকিয়া বসিয়াছে; উহারা আর ক্ষণিক সঙ্কোচনের ফল নহে, চিরকালের সাথী হইয়াছে। বিস্মিত হইয়াও হইতাম না।

অবশেষে একদিন তাহাকে নগ্ন গাত্রে দেখিয়া চমকিয়া গেলাম। বুকের ও পেটের হাড়গুলির উপর শুধু যেন একটা পাত্‌লা চামড়ার আবরণ দেওয়া। দেখিলে মনে হয় না যে, ছাত্র জীবনে এই লোকটাই Sportsএ First এবং Championshipএর Prize গুলি নিয়মিত ভাবে হস্তগত করিয়া গিয়াছে।

বলিলাম—"তোর কি কোনও অসুখ আছে রে নন্দ?"

সে একটু হাসিল। সেই হাসি দেখিয়াই আমার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। নন্দের শুভ্রহাসি বহুদিন দেখিয়াছি, কিন্তু এ ধরণের হাসি আজ নূতন দেখিলাম।

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে কহিল—"হ্যাঁ।"

ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি অসুখ রে! বাড়ীতে সকলে জানেন তো?"

সে উত্তর করিল—"যক্ষা। বাড়ীতে কাউকে জানাই নি। সুধু-সুধু ব্যস্ত করা বই ত' নয়।"

বাড়ীতে যখন সকলে জানিতে পারিলেন, তখন সে ক্ষয়ের শেষ মুহূর্ত্তে পৌঁছিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে সে এখনও যাইতে চায়, যাইতে দেওয়া হয় না। সকলের আকুল শুশ্রূষা দেখিয়া সে মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইতে গেলে বলে—"এত এত পয়সা সুধুই জলে ফেলছিস রে!" শুনিয়া মনটা হাহাকার করিয়া উঠে। হায়রে, পয়সাই কি জগতে সব; স্নেহ, প্রীতি ভালবাসার কি কোনই মূল্য নাই?

সকলের আকুল প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া নন্দের শেষ নিশ্বাস পড়িল—শনিবার রাত্রি ১১॥০ টার সময়।

তাহার মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, স্ত্রী ডুকরিয়া উঠিলেন, অষ্টম বর্ষীয় শিশু সত্বেও আকুল কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা! বাবা!!"—সে যে দরিদ্রের সন্তান; সামান্য আটটি বৎসরেই সে জগৎকে অনেকখানি চিনিয়াছে, অনেকখানি বুঝিয়াছে।

যে অবরুদ্ধ অশ্রু এতদিন এই পবিত্র পরিবারটিকে আশ্রয় করিয়া ছিল, সে আজ মুক্ত, তাহার বাঁধন গিয়াছে খুলিয়া।

শ্রাদ্ধ শান্তি হইবার কয়েকদিন পরে শোকাহত সদ্যবিধবা মৃণালিনী আমার হস্তে একটা শীলমোহর করা খাম দিলেন। খুলিলাম, একটি ছোট চিঠি ও একটি চেক্।

ভাই সত্যেশ,

ছোট বেলায় কত আকাশ-কুসুম রচনা করেছি তা ভাবতেও হাসি পায়। তখন কতটুকু জানই আমার চল্‌তি জগৎ সম্বন্ধে ছিল। চাকরী যে কত ক্ষুঠার সঙ্গে নিয়েছি, তা তুই জানিস্।

মাসে মাসে যে মাইনে পেতাম, তা থেকে দুচার টাকা করে জমাতে আরম্ভ করি। একটা উঁচু আশাও মনের ভেতর ছিল। আজ যাওয়ার ডাক এসেছে। জীবনটাকে দুঃখের মধ্যে দিয়েই চালাতে হ'ল; তার পুরস্কার কি পেলাম তা জানি ন, বোধ হয় ভগবানও জানেন না।

থাক ও সব কথা। আমার এ পর্য্যন্ত ৬৩৩ টাকা জমেছে, হিসাব করেছি। তার একটা চেকও এই খামের মধ্যে রেখে গেলাম। হতভাগ্য Survivorগুলোর একটা ব্যবস্থা করে দিস্। নন্দলাল।

বিস্মৃতির অতল তল হইতে একটি স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল—"ইউ এঞ্জিনিয়ার এণ্ড সায়ান্টিষ্ট।"

দুই ফোঁটা অশ্রু বাধা না মানিয়াই চক্ষু হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রায়

সাঁওতাল

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস

আমার ঘরের পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া সামনের ঐ পথটা অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। সকাল বেলা সাঁওতাল মেয়েরা দলে দলে এই পথ দিয়া পাশের ধানের কলে কাজ করিতে যায়; আবার এই পথেই বাড়ী ফিরে সন্ধ্যার পর। চমৎকার এই মেয়েগুলি। আমি তাহাদের নৃত্যচপল গতিভঙ্গির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি। কেমন হাসিয়া হাসিয়া কলরব করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলে। ওদের কোথাও জড়তা নাই, সঙ্কোচ নাই। প্রতি পদবিক্ষেপে তাহাদের সতেজ প্রাণের চাঞ্চল্য যেন ফুটিয়া উঠে। ওরা যেন বর্ষার পাগল-পারা ঝর্ণাধারা। কল কল ছল ছল করিয়া অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

উহাদের স্বাস্থ্যপূর্ণ নিটোল দেহের উপর পরিপূর্ণ যৌবনের উদ্দামতা যেন একটা সংযত শ্রী ধারণ করিয়াছে। রূপসী ওদেরে বলা চলেনা। কিন্তু রসজ্ঞের দৃষ্টিতে ইহাদের শ্রমপুষ্ট দেহের উপর একটা পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য্য ধরা পড়িবে। হৃষ্টপুষ্ট সবল দেহ দেখিলে চক্ষু তৃপ্ত হয়, মন আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া ওঠে—বাঃ বেশত। তাজা রক্তের চঞ্চলতা ইহাদের দেহের প্রতি ভঙ্গিতে যেন ব্যক্ত হইয়া পড়ে। প্রাণের দুর্দ্দমনীয় আনন্দবেগ যেন ইহারা কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারে না।

সকাল বেলাই কলে কাজ আরম্ভ হয়। ইহারা আসে অনেক দূর হইতে। তাই খুব সকালেই ইহাদিগকে বাহির হইতে হয়। এরই মধ্যে ঘর-কন্নার কাজ সারিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া ইহারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও পরিপাটি করিয়া খোপাটি বাঁধে, তাতে ২।১টি ফুল গুঁজিয়া দেয়। তার পর দুইজন করিয়া হাত ধরাধরি করিয়া দল বাঁধিয়া পথে চলে। চলিতে চলিতে কেউ কেউ বা গান গায়, কেউ কেউ গল্প করিতে করিতে আসে, আর কেউ কেউ বা এমনি চলে। রাস্তায় যাইতে যাইতে কোথাও ফুল দেখিলে ইহারা আনন্দে চঞ্চল হইয়া ওঠে; আর সেই ফুল ২।১টি সংগ্রহ করিয়া ইহারা খোপায় না গুঁজিয়া যায় না। এই সাঁওতাল মেয়েগুলি ফুল এত ভালবাসে! আমাদের বাগানের ওধারে রাস্তার পানে কি একটা ফুলের গাছ আছে, লাল লাল তার ফুল। এই ফুলগুলি যখন ফোটে ঐ মেয়েগুলির তখন আর আনন্দের অবধি থাকে না। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের মেয়েগুলিও ছুটিয়া গিয়া গাছের নীচে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। পুরুষরা কেউ সঙ্গে থাকিলে গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িয়া দেয়,—নতুবা মেয়েরাই কেউ গাছে চড়ে। ফুল পাইয়া ইহাদের কী আনন্দ! তাড়াতাড়ি কয়েকটা খোপায় গুঁজে;—আর কয়েকটি হাতে করিয়া ছুটিতে থাকে অগ্রগামিনী সঙ্গীনীদের ধরিবার জন্য।

অদ্ভুত এই সাঁওতাল জাতটা, ইহাদের সমস্ত জীবনটাই যেন একটা আনন্দের উৎস।

দুঃখ দারিদ্র ইহাদের নাই এমন কথা কেহই বলিবে না, দরিদ্র এরা খুবই। দিন আনে দিন খায়। একদিন কাজ না পেলে হয়ত পরের দিন উপবাস করিতে হয়। দুঃখও ইহাদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু দুঃখকে ইহারা দুঃখ বলিয়া গ্রাহ্যই করে না। শত উৎপীড়ন, শত অত্যাচারেও প্রাণের আনন্দোৎসব ইহাদের বন্ধ হয় না। যন্ত্র-দানবের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণেও ইহাদের অন্তরের রসের উৎস শুষ্ক হয় না। সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, তারপর সন্ধ্যার সময় কেমন প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফেরে। জোৎস্না রাত হইলে সারারাত ধরিয়া মদ খায়, নাচে, আর গান করে। তারপর পরদিন ভোরবেলা তেমনি দল বাঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে কলে কাজ করিতে যায়। ইহাদের জীবনে কোথাও কোন ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, যেন একটা

একটানা আনন্দের স্রোত তরতর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

অভাব ইহাদের সামান্যই। মোটা ভাত আর লজ্জা নিবারণ করিবার মত কাপড় পাইলেই ইহারা সন্তুষ্ট। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে এই সামান্য অভাবটুকু মিটাইয়া কিছু উদ্বৃত্তও থাকে। কিন্তু ইহারা সঞ্চয় করিতে জানে না। যাহা থাকে তাহা দিয়া মদ খাইয়া ফূর্ত্তি করে। কেমন সুন্দর অনাড়ম্বর আনন্দপূর্ণ জীবন, দেখলে মনে হয়, জীবনটাকে সত্য সত্যই উপভোগ করিতেছে। দেখিয়া এক একবার লোভও হয়, আহা উহাদের মত যদি হইতে পারিতাম! অথচ, ওরা অসভ্য, ওরা বন্য; আর আমরা সভ্য, কিন্তু এই সভ্যতার পাষাণচাপে আজ আমাদের জীবনের আনন্দরস সবটুকু নিঃশেষে বাহির হইয়া গিয়াছে। আমরা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছি, গান গাহিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আর নাচাকেও পাগলামীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। প্রাণ আমাদের শুষ্ক,—মরুভূমির মত শুষ্ক। অন্তরে বাহিরে কৃত্রিমতার বোঝা যত বাড়িয়া চলিয়াছে ততই জীবন আমাদের নীরস—ভয়ানক নীরস হইয়া পড়িতেছে। এই শুষ্কতা, এই আনন্দহীনতা আমাদের প্রাণশক্তিকে প্রতিদিন জীর্ণ করিয়া দিতেছে। আমরা যেন আজ জানিয়া শুনিয়াই নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছি!

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস

সকল প্রকার চর্ম্মরোগে প্রকৃষ্ট

ল্যাডকো

নিম সাবান

শিশু অঙ্গে নির্ভয়ে ব্যবহার্য্য

সকল বড় দোকানে পাইবেন।

ল্যাডকো : কলিকাতা

বিচিত্র জীবন

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

দুঃখ হ'তে দুঃখান্তরে
পেষণ হইতে নব পেষণ মাঝারে
চলেছে জীবন-গতি।
আসে দুঃখ, আসে ব্যথা,
নব নব দলন, পীড়ন।—
বিচিত্র আস্বাদ তার—
কভু জ্বালা, কভু ক্ষত ;
কভু হীন অবসাদ ;
কভু আসে বাক্যহীন নীরব যাতনা ;
কভু চোখে আসে জল ;
কভু চেয়ে থাকি শূন্যে উদাস নয়নে
দয়াহীন, স্নেহহীন আকাশের পানে ;
কভু অবনত মুখে
ডুবে যেতে চাই যেন ধরার গভীর গর্ভে।

* * *

এমনি নিয়ত করি পান
দৈন্য-বেদনার ধারা,—
অমৃতের ধারা নয়—
গরলের অনল-প্রবাহ তীব্র।

* * *

হে ধরণী,
হে অসংখ্য-সন্তান-পালিকে,
জীবদাত্রী জীবধাত্রী মাতা,
এ কি এ বেদনা, ক্লেশ,
এ কি অভিনব দুঃখ, অপার যন্ত্রণা
একক সন্তান 'পরে অর্পিলে জননী!
হাস্য আছে, আছে মধু,
আছে শোভা শত অপরূপ
তোমার বিশাল বক্ষে।
এ দুর্ভাগা সন্তানের তরে
এ কি এ গরল-স্রোত ঢাল অবিরাম!

* * *

দলন-পেষণ-দ্বন্দ্বে
আন্দোলিত জীবন আমার
কভু রহে মুহ্যমান,
কভু বা সতেজ সানন্দ উদ্দাম-গতি!
কভু সে দলিত দাস,
কভু সে বিজয়ী বীর অসীম-সাহসী।
দুঃখজয়ী গর্ব্বোন্নত কভু সে সম্রাট,
কভু রহে বাত্যাহত পাতিত পাদপ।

* * *

এমনি কাটিল দিন,
একে একে জীবনের চল্লিশ বৎসর।
নিত্য দেখা মোর
দৈন্য ও বেদনা সাথে।
বড় গলাগলি আর বড় ভালবাসা
দুঃখ সনে নিত্য মোর।
এ দুঃখ প্রেয়সী মোর
চুমা দেয়, দেয় আলিঙ্গন,

কত না সোহাগ করে।
সে চুম্বন-রস-ধারা
দেয় যে দাহন ;
আলিঙ্গন তার
কঠোর পেষণ শুধু ;
সে সোহাগ
ঘাতকের মৃদু হাসি সম।
* *
এস দুঃখ, এস দৈন্য,
এস তার নিত্য-সঙ্গী অনন্ত যন্ত্রণা ;
আমারে আঘাত কর প্রচণ্ড দুর্দ্দম।
তবু ভাঙ্গিবে না চিত্ত,
বিদীর্ণ হবে না প্রাণ,
রসহীন হবে না জীবন,
এ পৌরুষ হবে না নিস্তেজ।
যে রূপে এস না তুমি,
দাহনে শোষণে নিরাশায়,
দুর্ব্বার এ চিত্ত মোর প্রবল উদ্দাম
তোমারে বরিয়া লবে।
দৃপ্ত দম্ভ রহিবে অটুট।
বারংবার তোমারি আঘাতে
দৃঢ়ীভূত সুশক্ত জীবন
মানিবে না পরাজয়,
টলিবে না দুর্ব্বলের প্রায়।
যদি কাঁদি,
যদি হের অবসন্ন ক্ষণেকের তরে,
জেনো স্থির—
দ্বিগুণ উর্দ্দাম বেগে
নবতর উৎসাহ-তাড়নে
চূর্ণিব তোমারে দুঃখ,
জিনিব তোমারে সুনিশ্চয়।
ব্যর্থ করি' আক্রমণ তব
দাঁড়াব অপার বীর্য্যে পৌরুষ-গৌরবে।

আকাশ ও পৃথিবী

শ্রীকরুণাময় বসু

তুমি চলে যাও মেলিয়া ধূসর পাখা,
আমার দিবস রাত্রি তাহাতে ঢাকা,
বুঝিতে পারিনা কী যে মায়া তুমি জানো?
তোমার কেশের কালো অরণ্যে যেন
মনের হরিণ ফাঁদে পড়িয়াছে কেন?
কোন সুদূরের পিপাসা তুমি যে আনো।
সোনালী গগনে আলোর তুমি যে দূতী,
সাথে এনেছ কি হারানো রাতের দ্যতি,
দূর জনমের বাতায়ন-পথছায়।
আমার জীবনে আঁধার তুমি যে মিতা,
দেখেছি তোমারে হে মোর অপরিচিতা,
পারাপারহীন সন্ধ্যার মোহনায়।
আঁখির আকাশে আভাষে যে কথা নাচে,
রাতের তারকা আঁধারে সে বাণী যাচে,
জানি ওগো জানি প্রিয়তমা, সব জানি ;—
বনতলে তাই নীলমণি লতা দোলে,
আকাশ নেমেছে শিশু হয়ে ধরাকোলে,
কুসুমে কুসুমে তাই এত কানাকানি।
তুমি আছো ব'লে তোমার মুকুরে দেখি
আমার পরাণ জ্যোতিতে ভরেছে এ কী!
আকাশে আলোর রাজকীয় সমারোহ।
তুমি চ'লে যাও তেপান্তরের পারে,
আমি পথ হ'য়ে খুঁজে খুঁজে মরি কা'রে?
বাউল মনেতে লেগেছে কি জানি মোহ।

রবীন্দ্রনাথের "শিশু"

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে ভাবেই দেখিনা কেন সব দিকেই তাঁহার সৃষ্টিমাধুর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। কাব্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস, পত্র-রচনা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল অঙ্গে তিনি এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আর এক দিকে তিনি সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন —সেটি হইতেছে শিশু-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের "শিশু" তাঁহাকে শিশু-সমাজে অমর করিয়া রাখিবে। নিজের প্রতিভা তিনি শুধু বয়স্কদের জন্যই নিয়োগ করেন নাই, শিশুদের জন্যও তিনি তাঁহার প্রতিভার এক বিশিষ্ট অংশ ব্যয় করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন, "ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরানো আর কিছুই নাই। শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সর্ব্বপ্রথম দিনে সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় ছিল আজও ঠিক তেমনই আছে।" সে সত্যই "প্রভাতের আলোর সমবয়সী।" এই চিরনবীনতার কারণও রবীন্দ্রনাথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "এই চিরনবীনত্বের কারণ এই যে শিশু প্রকৃতির সৃজন আর বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।"

ভগবান নিজের লাবণ্যে শিশুকে গড়িয়াছেন। পাপময় পৃথিবীতে স্বর্গসুষমা আনিয়াছে ঐ শিশু। প্রতীচ্যের কবি অতি সুন্দর ভাষায় বলিয়াছেন "Where children are not, heaven is not." সংসারের কলুষের ছায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি এই শিশু চির দিন কবির হৃদয় জয় করিয়া আসিতেছে। বয়স্কের বহু ঊর্দ্ধে শিশুর স্থান। কেন না,

> "Man, a dunce uncouth,
> Errs in age and youth :
> Children know the truth."
>
> (Swinburne).

শিশুর স্বর্গীয় হাসিটুকু রবীন্দ্রনাথের প্রাণে এক অপরূপ ঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। এই যে ঝঙ্কার—ইহারই ফলে আমরা শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান "শিশু"কে পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির মধ্যে "শিশু" একটি।

'শিশু"র প্রথম কবিতাটির নাম "জন্মকথা"। এইটী রবীন্দ্রনাথের একটী প্রথম শ্রেণীর কবিতা। এত সুন্দর রচনা রবীন্দ্রনাথও বেশী দিতে পারেন নাই। খোকা তার মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে :—

> খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
> "এলেম আমি কোথা থেকে,
> কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?"
> মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
> খোকারে তার বুকে বেঁধে,—
> "ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

কী সহজ সুন্দর ভাষায় রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের অতি স্বাভাবিক চিন্তাটিকে রূপ দিয়াছেন! শিশু,—কোন অচিন্ দেশের বাসিন্দা ছিল সে, কেমন করিয়া সে এই আলোকময় ধরণীর মাঝখানটিতে আসিয়া পড়িল সেইটাই আজ তাহার এক মস্ত প্রহেলিকা হইয়া উঠিয়াছে! কোথায়, কোন্ খানে, কখন্ সে তার মায়ের শূন্য বুকখানি অধিকার করিয়া ফেলিল, এই প্রশ্নটীই আজ খুব বড় হইয়া তার মনে জাগিতেছে।

খোকার এই প্রশ্নের উত্তরে মা যে কথাগুলি বলিতেছেন, তাহাতে আমরা মাতৃহৃদয়ের শাশ্বত চিন্তাটীর সন্ধান পাই। এই খোকার মায়ের মত বিশ্বজননীর আপ্লুত ভাবনার বাণী আমাদের কাণে আসিয়া লাগে,

"জানিনে কোন মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটীর আড়ালে ॥"

শিশু মায়ের কাছে 'বিশ্বের ধন'—বরং তাহার অপেক্ষাও যদি কিছু কাম্য থাকে তাহাই। "মায়ের বিশাল হিয়া" সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া থাকে ঐ শিশু। মা ও শিশুর মধ্যে যে সম্বন্ধ ইহাতে স্বার্থের হানাহানি নাই, পৃথিবীর কোন কিছুই ইহাকে মলিন করিতে পারে না, শিশু যতই কুৎসিত যতই অ-সুন্দর হউক না কেন, মায়ের কাছে সে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। মায়ের মুখখানিও শিশুর নিকট অতুলনীয়। মায়ের কোলে উঠিয়া শিশু স্বর্গসুখ অনুভব করে, মা শিশুকে কোলে লইয়া জগৎ সুন্দর দেখেন।

খোকার মনের রাজ্যটী ভারি সুন্দর। সেখানে স্বার্থের গ্লানি নাই, সংসারের কলুষমালিন্যের সেখানে "প্রবেশ নিষেধ।" সে স্বার্থ বুঝে না, নিজের ভাল বুঝে না, কেন না ভালমন্দের বিচারশক্তি তার নাই। ভেদাভেদ সে জানে না। সারা পৃথিবীই তার খেলা-ঘর, চেতন অচেতন সকলই তার খেলার সাথী।

"জানে না তারা সাঁতার দেওয়া
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বনিক্ ধায় তরণী বেয়ে,
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা
জানে না জাল ফেলা।"

এই যে ভাবনা চিন্তাহীন নিষ্পাপ নির্লিপ্ত জীবন ইহাই হইল সত্যকারের Poetry। শিশুর মত কবি কে?

"শিশু" পুস্তকটিতে রবীন্দ্রনাথের শিশুমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। "বিজ্ঞ," "ছোট বড়," "বিচিত্র সাধ," "জ্যোতিষ শাস্ত্র," প্রভৃতি কবিতাগুলিতে তিনি শিশুমনস্তত্ত্ব যে ভাবে দেখাইয়াছেন তাহা অননুকরণীয়। শিশুর মনের কোন স্থিরতা নাই। একটা জিনিষের প্রতি সে নিজেকে বেশীক্ষণ নিবিষ্ট রাখিতে পারে না। সে এখন যাহা ভাবিতেছে, কিছু পরেই তাহা হয়ত স্বপ্নের মত মিলিয়া গেল এবং তাহার জায়গায় দেখা দিল এক নূতন চিন্তা। ঠিক এই জিনিসটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কাবুলীওয়ালা"র "মিনি"তে দেখাইয়াছেন।

পাঁচ বছরের দুরন্ত মেয়ে "মিনি" ঘরে ঢুকিয়াই তার নভেলপাঠরত পিতাকে জ্ঞাপন করিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বল্‌ছিল, সে কিছু জানে না। না?" কিন্তু ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে সামান্যমাত্র জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই সে তার দ্বিতীয় বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছিল, "দেখ বাবা, ভোলা বল্‌ছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছামিছি বক্‌তে পারে। কেবলই বকে, দিনরাতই বকে।"

কিন্তু পিতার মতামতের জন্য বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য না দেখাইয়াই সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বাবা, মা তোমার কে হয়?"—নানা রকম উদ্ভট চিন্তা, অসম্ভব কল্পনা শিশুর মনের রাজ্যে নির্ব্বিরোধে চলাফেরা করিয়া বেড়াইতেছে। শিশুদের এই "Flight of Imagination" এর ভাবটী "শিশু"র মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের "শিশু"টী একটু বেশী রকমের কবিপ্রকৃতির। বেলা দশটায় পাঠশালায় যাইবার পথে চুড়ির ফেরিওয়ালাকে দেখিয়া তাহার Bohemian Spirit জাগে।

"যায় সে চলে যে পথে তার খুসী,
যখন খুসী যায় সে বাড়ী গিয়ে।
দশটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরী।
ইচ্ছে করে শেলেট ফেলে দিয়ে
অম্‌নি করে বেড়াই করে ফেরী॥"

"শিশু"র লেখক রবীন্দ্রনাথকেও একদিন এই Bohemianism পাইয়া বসিয়াছিল। শুনা যায় এই শিশুটীর মত রবীন্দ্রনাথের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল খালি পায়ে, নিঃসম্বল হইয়া হাটিয়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের শেষ দেখিয়া আসিবেন। তাঁর সে কল্পনা কার্য্যে-পরিণত হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

খোকা আবার বেশ Adventure কল্পনা করিতে পারে। "বীরপুরুষ" কবিতাটিতে আমরা খোকার এই hivalryর

পরিচয় পাই। মায়ের কোলটিতে বসিয়া খোকা তার মা'র কাছে নিতান্ত নিজস্ব একটা কল্পনা ব্যক্ত করিতেছে। সে যেন তার মাকে লইয়া বিদেশ যাত্রা করিতেছিল। মা ছিলেন পাল্কীতে আর খোকা ছিল এক "রাঙা ঘোড়ার পরে"। পথে এক দস্যুদলের সাক্ষাৎ মিলিল,—সাক্ষাৎ কালান্তক তারা,—

"হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।"

বেহারারা ত পাল্কী ফেলিয়া কাঁপিয়া অস্থির। খোকা তলোয়ার হাতে অগ্রসর হইয়া ভীষণ যুদ্ধে তাহাদের হঠাইয়া দিল, তারপর খোকা বীরবেশে মায়ের সামনে দাঁড়াইল,—

"আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বল্‌ছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে,"
তুমি শুনে পাল্কী থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে;
বল্‌ছ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দ্দশাই হ'তো তা না হ'লে।"—

কিন্তু এ সবই ত কল্পনামাত্র। খোকার দুঃখ এই, যে এ সব কল্পনা বাস্তব হয় না কেন।

—"রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি না হয় আহা।"—

কিন্তু যেদিন "প্রথম বড়" হবে সেই স্মরণীয় দিনটির কল্পনায় সে ভরপুর। বয়স্কদের মত তার চিন্তাশক্তি নাই, সে যাহা চিন্তা করে নিতান্ত নিজের মনের মতন করিয়াই চিন্তা করে। শিশুর এই "প্রথম বড়" হওয়ার ধারণাটী—রবীন্দ্রনাথের—"ছোট বড়" কবিতাটিতে চমৎকার ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। "শিশু" বলিতেছে:—

"এখনো তো বড় হইনি আমি,
ছোট আছি ছেলেমানুষ বলে,'
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হ'ব
বড় হ'য়ে বাবার মত হ'লে।"

অর্থাৎ সে একদিন ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিবে পৃথিবীতে আর সবই যেমনটি ছিল তেমনই আছে—কোন গোলযোগ হয় নাই, মাঝখান হইতে সেই শুধু "বাবার মত বড়" হইয়া গিয়াছে। মা, দাদা, বাবা, মাষ্টার কেহই তাহা জানিতে পারিবেন না। নিত্য গঙ্গাস্নানের পর মা যখন খিড়কির দোর দিয়া ঢুকিয়া ঘরে গোল শুনিতে না পাইয়া খোকাকে খুঁজিতে থাকিবেন, তখন সে মাকে তার নিজের position জানাইয়া দিবে:

" * * মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি যে বাবার মত বড়।"

খোকার উক্তির মধ্যে logicএর ফাঁকিতে তার্কিকেরা শঙ্কিত হইতে পারেন, কিন্তু শিশুমনস্তত্ত্ব এমন ভাবে কেহ ফুটাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

"শিশু"র কবিতাগুলিকে আমরা মোটামুটী তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি:—১। শিশুর মনের কবিতা, যেমন, —"মাষ্টার বাবু", "সমব্যথা", "প্রশ্ন", "বৈজ্ঞানিক" ইত্যাদি। এই জাতীয় কবিতার সংখ্যাই অধিক: ২। সাধারণ কবিতা, যেমন,—"সাত ভাই চম্পা", "হাসিরাশি", "পূজার সাজ" ইত্যাদি। শিশুমহলে এই কবিতাগুলি সুপরিচিত। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"কে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "শৈশবের মেঘদূত" বলা যাইতে পারে। ৩। মায়ের হৃদয়ের কথা। যেমন "বিচার", "অপযশ", "আকুল আহ্বান", "স্নেহস্মৃতি" ইত্যাদি।

শেষোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি শিশুর মৃত্যুর পর মায়ের অন্তরের করুণ ক্রন্দন। শিশুর মৃত্যুর মত করুণ আর কিছুই নাই। শিশুর জীবন-প্রদীপ নিভিবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের মনের অন্তঃপুরটিও চিরতরে ম্লান হইয়া যায়। "বিদায়" কবিতাটীতে শিশু তার মার কাছে বিদায় চাহিতেছে। এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। শিশুর সঙ্গে মায়ের যে সম্বন্ধ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি তার বিচ্ছেদ? তা নয়। এ সম্বন্ধ চিরদিনের। মা ও শিশুর মন যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে,—মৃত্যু ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। বিদায়ের পরও খোকা তার মায়ের সঙ্গে খেলা করিতে ছাড়িবে না,

"স্বপন হ'য়ে আঁখির ফাঁকে
দেখতে আমি আসব মাকে

যাবো তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে
মিলিয়ে যাবো কোথায় কে তা জানে ॥"

কিন্তু এ যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর খেলা!—মাসী যখন পূজার কাপড় হাতে, খোকাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া মকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন মা তার কি উত্তর দিবেন, তা' খোকাই তাঁহাকে বলিয়া যাইতেছে,

"বলিস্ খোকা সে কি হারায়
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।"

কিন্তু খোকার অদর্শন মা কতদিন সহ্য করিবেন! খোকার প্রিয় দ্রব্যগুলি দেখিলেই তার মনে খোকার মুখখানি জাগিয়া উঠে। তার আদরের ধন ফুলগাছগুলিতে ফুল ফুটিয়াছে,—গন্ধে চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ গন্ধ যে খোকার স্মৃতিটুকুই ঘনাইয়া তুলিতেছে!

"ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ছিল ফুলের মত যে!"

মায়ের শূন্য প্রাণ হু হু করিয়া উঠে। দুঃখের আবেগে তিনি করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠেন :

"আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায় ॥
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন—শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া!"

মাতৃকণ্ঠের এই গভীর আহবান শিশুর কাণে পঁহুছিবে না কি ?

"শিশু"র শেষ কবিতাটির নাম "আশীর্ব্বাদ"। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য সকলের শুভ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। এই যে শিশুর দল ইহারা পথভ্রষ্ট স্বর্গপথিকের মত। পথ ভুলিয়াই ইহারা কলুষময় পৃথিবীতে আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়ে। ইহারা দুঃখ জানে না—ইহারা শুধু হাসিতে জানে। পার্থিব দুঃখ যেন ইহাদের প্রাণময় হাসিটুকু কাড়িয়া না লয়।

"ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ,
ইহাদের করো আশীর্ব্বাদ।"

ইহাদের যাত্রা জয়যুক্ত হউক। বিধাতা ইহাদের সমুজ্জ্বল ললাটে শ্বেতচন্দনের তিলক আঁকিয়া দিন। মঙ্গল-আলোক ইহাদের পথের অন্ধকার নাশ করুক্।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু

অচল সিকি

আবুল হাসানাৎ, আই-পী

১

সেদিন নিবারণ কাগজ, কলম, খাতাপত্র লইয়া যখন উঠিয়া পড়িল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। এক্লাফে ঘরে ঢুকিয়া কাঠের তাকে জিনিষ পত্র রাখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল স্ত্রী মহামায়া সামনে দাঁড়াইয়া। বলিল,—তাই ত দেখছি, বেলা পড়ে এল! আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

মহামায়া বলিল,—হ্যাঁ তা'ত বটে। কিন্তু তোমার মুখ ত দেখছি শুকিয়ে গিয়েছে। আবার মাথা ধরল না'ত?

—না মাথা ধরেনি তবে ঘুলিয়ে গিয়েছে। যাই আবার খেয়ে দেয়ে বার না হলে চলবে না দেখছি।

মহামায়া এই কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিবারণ স্নান করিতে চলিয়া গেল।

শিশুবৃত্তি হইতে ছাত্রবৃত্তি-এর কোন ধাপে যে নিবারণ ডিগবাজী খাইয়াছিল তাহা তাহার নিজেরই মনে ছিল না। তবে গাঁয়ের লোকেরা তাহাকে পণ্ডিত বলিয়াই জানিত। এক ঘটী কালি, দু'তিনটি বড় বড় খাগের কলম লইয়া ঘণ্টাখানেক কসরৎ করিলে সে একখানা "পুরোগজী" খৎ বা তমস্বুক লিখিয়া ফেলিতে পারিত। বড় বড় অক্ষরগুলি দেখিয়া সবাই বলিত—মশায়ের হাতের লেখা একটু বেশিরকম স্পষ্ট।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে নিবারণ যোগ্যতার সহিত ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছিল। সকাল হইতে বারান্দায় দপ্তর খুলিয়া বসিয়া রাস্তার দিকে শিকারের উদ্দেশে তাকাইয়া থাকিত। লোকজন আসিতেছে দেখিলেই খাতা পত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হিসাবে মন দিত। গাঁয়ের এ ব্যাঙ্কের সে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা।

ভাত খাইতে খাইতে নিবারণ স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ দিল, দত্তপাড়ার তিন তিনটী খাতক তিন তিন বার ওয়াদা করিয়াও ওয়াদা খেলাপ করিয়াছে, আজ তাহাদের আসিবার শেষ তারিখ ছিল। বোধ হয় অন্য কোনও মহাজন তাহাদের ভাগাইয়া লইয়া গিয়া থাকিবে। গিয়া একবার তত্ত্ব না নিলেই নয়।

যাইবার সময়ে মহামায়ার হাতে একটী টাকা দিয়া বলিল, —দত্তপাড়ায় যখন যাচ্ছি তখন আরও দু'টো গাঁ হয়ে আসব। সংসারটা কি কঠিন স্থান দেখেছ? দেশশুদ্ধ লোকের পরিচর্য্যে করে বেড়ানোই যেন আমার ব্রতের মতো হয়ে পড়েছে।

মহামায়া অনেক দেখিয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি থাকিলেও তাহার এই উপকার-ব্রতে আস্থা মোটেই ছিল না। মহামায়ার অন্তর ছিল উদার কিন্তু এ সংসারে ঢুকিয়া অবধি তাহাকে হইতে হইয়াছিল নির্জীব।

২

দুইদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া চুপ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া জানালার নিকট বসিয়া নিবারণ আদায় করা টাকা পয়সা গণিতে লাগিল। সিন্দুক খুলিয়া টাকা পয়সা রাখা বা লওয়া —এ উভয় কাজটি সে সকলের অলক্ষ্যেই করিত। ভাবিত, টাকা পয়সা আছে জানিলেই স্ত্রীলোকের অপব্যয় করিবার স্পৃহা জন্মে।

স্ত্রী রান্নাঘর হইতে ফিরিতেছে দেখিয়া সে টাকার তোড়া এবং চাবির ছড়া গোপন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখটী একটু গম্ভীর করিয়া ডাকিল, মহামায়া,—এই যে বাড়ী ফিরলুম। একটু এদিকে এস, খোকা কোথায়?

—হ্যাঁ গা তুমি? দিব্বি চোরের মত ঘরে ঢুকে খোকার জন্য মায়া দেখাচ্ছ? এলে দশ গাঁ বেড়িয়ে?

—উঃ মহামায়া,—সে যে কি কষ্ট! যে দুর্দ্দিন পড়েছে—একটী পয়সা আদায় করতেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়!

মহামায়া বিশ্বাস করিল, বলিল, হ্যাঁ, তা'হলে তোমাকে একটু সবুরই করতে হবে। লোকজনকে অযথা পীড়াপীড়ি ক'রো না। যাই রান্নাটা সেরে আসি গে।

—বাজারের আর দরকার নেই ত? তা' হলে ঘুরে আসতুম। সেই টাকাটার কত খরচ হয়েছে? বকী পয়সাটা দিয়ে তোমার ফরমাসটা বলে ফেল দেখি?

প্রথম কথার উত্তরে মহামায়া বলিল, না দরকার নেই। মোটে পনরটি পয়সা খরচ হয়েছে—ভাবনা নেই,—বলিয়া বালিশের তলা হইতে বাকী পয়সাগুলি আনিয়া নিবারণের সামনে ফেলিয়া দিয়া বাকী প্রশ্নের জবাব না দিয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

নিবারণ বিরক্ত হইল। পয়সাগুলি গণিতে গণিতে মন্তব্য করিল,—উঃ—এ জাতটাকে বাধ্য রাখা কি দায়!—

একটি পয়সার হিসাব না মেলাতে নিবারণ বাক্স-পত্তর উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, সিন্দুকের তলা ঝাড়িয়া, ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে রান্নাঘর হইতে মহামায়া ডাকিল,—ওগো মহাজন! শুনছ,—একটি পয়সা কিন্তু ভিক্ষুককে দিয়েছি—বলতে ভুলে গেছলুম।

নিবারণের বিরক্তির অবধি রহিল না। কিন্তু, একটি পয়সা লইয়া ঝগড়া করা ভাল দেখাইবে না ভাবিয়া উত্তর করিল,—বেশ করেছ, গিন্নী,—এক-আধটু দান না করলে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে? হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, একেবারে কিছু না বলিলে আবার মহামায়ার চাল খারাপ হইতে পারে। তাই আবার উপদেশ দিল,—কিন্তু দেখ, ওরা যখন পয়সা নিয়ে চা'লই কিনে খাবে তখন ওদের একমুঠো চা'ল দিলেই ত ভাল হয়। কথাটা বুঝলে ত মহামায়া? তা' বলে অন্যায় কিছু করো নি কিন্তু—অন্যায় কিছু করো নি।

মহামায়া বুঝিল; কিছু বলিল না।

নিবারণ এবার পয়সাগুলি পরখ করিতে যাইয়াই কাঁপিয়া উঠিল। উঃ—এ যে অচল সিকি!

৩

মহামায়ার উপরে এবার সত্য সত্যই তাহার রাগ হইল। মেয়েরা যদি ব্যবসাইত হইত, পুরুষেরা তাহা হইলে শুধু তাহাদিগকে ঠকাইয়াই কাজ হাসিল করিয়া লইতে পারিত।

সে বিমর্ষ বদনে উঠিয়া রান্নাঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মাত্র একটি পয়সার জন্য স্ত্রীকে উপদেশ দিয়াছিল। এখন আবার সিকি লইয়া উপদেশ দেওয়াটা কম কথা নয়।

সে ভাল করিয়া মিষ্টি গলায় ডাকিল,—মহামায়া! মহামায়া!

স্ত্রী উত্তর করিল,—কি, কী হয়েছে? বলেই ফেল না।

—না; না—বল্‌ছি কি—ত্যাখ—রান্নাটা কতদূর হ'ল? খিদে পেয়েছে!

—এই হ'ল বলে। তুমিই না বল্‌ছিলে আমায় বাজার ক'রে এনে দেবে?

সহসা সুযোগ মিলিয়া গেল। নিবারণ বলিল,—হ্যাঁ পারতুম বৈ কি? কিন্তু—কাল বাজারটা কা'কে দিয়ে করিয়েছিলে বল ত?

—কেন? ও বাড়ীর ছেলেটাকে দিয়ে—

—হ্যাঁ, তবেই বুঝেছি,—পাজী, নচ্ছার, বদমায়েস কোথাকার! সে যে তোমায় ঠকিয়েছে?

—ঠকিয়েছে? বল কি? কেমন ক'রে?

—হ্যাঁ, লক্ষ্মীটী—একবার দেখই না?—এই অচল সিকিখানা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। পাজী, গাধা—হারামজাদা কোথাকার!—

—আচ্ছা, কি করছ বল দেখি!—পুরাণ সিকিটে ত আর সে নিজে বানায়নি। বাজারে হয়ত কেউ ওকে ঠকিয়েছে। উপকার করে অবশেষে সে খাচ্ছে গাল! দাও আমায়, আমি নিজের গাঁট থেকে ক্ষতিপূরণ করে দিচ্ছি।

ক্ষতিপূরণের কথা শুনিয়া নিবারণ হাসিয়া ফেলিল—বলিল, আচ্ছা, তা না হয় হবে। কিন্তু সিকিটা ত আর তোমার কোন কাজে আসবে না। ওটাকে আমিই রেখে দিচ্ছি। ও বাড়ীর ছেলেটাকে দেখিয়ে একটু জিজ্ঞেস ত করতে হবে?

এবার মহামায়া ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—আর যাই করনা কেন, ছেলেটাকে তুমি কিছু বলিতে পারবে না! —আমার মাথার দিব্যি রইল—

নিবারণ হাত বাড়াইয়া সিকিটা ফিরাইয়া দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহামায়ার দ্বারা ক্ষতিপূরণে

তাহাদের সত্যিকারের কোন ক্ষতিপূরণ হইবে না। হাত ফিরাইয়া লইয়া বলিল,—আচ্ছা আমার কাছেই এটা এখন থাক্। পরে যা হয় করা যাবে।

পরদিন সকাল বেলা মহামায়া ও-বাড়ীর ছেলেটাকে পাকড়াও করিল। বলিল,—দ্যাখ, তুই অচল সিকিটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিস্ কেন রে! ঠকাবার আর বুঝি জায়গা পেলি না?

সতীশ ভরকাইয়া গেল,—কবে মা? আমি ত কিছুই জানিনে। সিকিটা অচল? কৈ দাও না দেখি, আমি চালিয়ে দিতে পারি কিনা?

মহামায়া বুঝিল নিবারণ ওকে কোনো কথা বলে নাই। বলিল,—আর জানতে হবে না বাবা। মনে কিছু করিস নে, আমি মিছিমিছি তোকে রাগাচ্ছিলুন।

৪

তিন দিন পরের কথা। সন্ধ্যায় খাইতে বসিয়া নিবারণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। সবিস্ময়ে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল,—হঠাৎ এত খুসীর কারণ কি হল?

—ওঃ—সে ভারি মজা—এ'কেই বলে তা—মা—সা! আজকের ভরা হাটে কি গণ্ডগোলই না লাগিয়ে দিলুম!—

মহমায়া গম্ভীর হইয়া গেল।

—আরে, ঐ যে সিকিটা নিয়ে গেলুম তোমার কাছ থেকে, ওটাকে একটুখানি চিন দিয়ে চালিয়ে দিলুম চাল্‌ওয়ালা আবেদ মিয়ার কাছে। কৈ ধরতে ত পারে নি?···না না, ছিঃ! মহামায়া, চালাবার মতলব আমার মোটেই ছিল না। ছিল শুধু একটু তামাসা দেখবার।—আরে আর যায় কোথা? ঘণ্টা দুই পরে দেখি মেছোবাজারে হল্লা! সে বিষম হল্লা! জলধর কৈবর্ত্ত আর রসিক বৈরাগী দু'জনে একেবারে বকাবকি ছেড়ে কিলোকিলি আরম্ভ করেছে। রসিক বলে, উল্লুক জেলে—ওটিকে কি আমি নিজে বানিয়েছি—তোর বাবারা যে আমাকে দিয়েছে। আমি সিকিটি একবার চেয়ে নিয়ে দেখি আমাদেরই তিনি! বলে নিবারণ হাসতে লাগল।

মহমায়া বিদ্রূপাত্মক সুরে বলিল—তা আর হাসবেনা? কিন্তু মার খেল যারা? রাখ তোমার তামাসা। আমি আর শুনতে চাইনে।

সেদিন রাত্রে মহামায়া সিকিটার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। নিদ্রাভঙ্গে সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে শুইয়া রহিল, তারপর যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, অপরাধ নিয়ো না, চিনতে পারিনি তোমাকে। এবার পেলে আর তোমাকে হারাচ্ছিনে। একেবারে অচল করব।

পরদিন সকালে সে স্বামীর নিকট সকাতরে নিবেদন করিল, ওগো তোমার পায়ে পড়্‌ছি। সিকিটি আমায় ফিরিয়ে এনে দাও। যেমন করে পার। বুঝলে?

নিবারণ হাসিয়া বলিল, না,—তা এখন আর সম্ভব নয়। ওটা এখন বড় শক্ত পাল্লায় গিয়ে উঠেছে। শোন নি ত—তারপর কি হ'ল—হল্লা শুনেই তেড়ে এল জগন্নাথ সিংজী—থানার সিপাই, বাজারে কিজন্যে এসেছিল। দু'পক্ষকেই বিস্তর কিল ঘুসো বিতরণ করে বল্‌ল,—শালা লোক—রাজার টাকা জাল করছে? চল্, সবকো হাম থানামে লে যায়েগী—চল।

এবার নিমেষের মধ্যে সব হল্লা থেমে গেল। কার কাছ থেকে কে পেয়েছে হিসেব দিতে দিতে আর হাতজোড় করতে করতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। সিকিটা সিংজী বার বার পরখ্ করে মাথার পাগড়ীর মধ্যে লুকিয়ে ফেল্ল। কি বল্‌ব, মহামায়া, আমার গা যে তখন কি রকম কাঁপছিল! মোটের উপর সবাইকে কিছু কিছু সেলামী দিতে হ'ল; তবে মোকদ্দমা মিট্‌ল। কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল! যাক্ সিকি-টিও রক্ষা পেল, আমরাও রেহাই পেলাম!

মহামায়া কাতর মুখে বলিল,—না গো না, ওর জন্য হয় ত আরও কত কি কষ্ট পেতে হবে—সব যে, আমার কপালের দোষ—না হলে কি আর ওটাকে হাতছাড়া হ'তে দিতাম!

নিবারণ বলিল, রাজার সিকি রাজার লোকের কাছে গিয়ে উঠেছে—ওর জন্যে আর মিছিমিছি ভেব না।

স্বামীর কথা শুনিয়া মহামায়ার ভাবনা দশগুণ বাড়িয়া গেল।

৫

মহামায়ার কিন্তু ভয় লাগিয়াই রহিল, পাছে সিকিটা তাহার কাছে না আসিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে।

নিবারণ কিন্তু মহামায়ার বিষণ্ণ বদন দেখিলে তাহাকে হাসাইতে চেষ্টা করিত।—মহামায়া, ঐ যে অচল সিকিটে! মনে আছে ত? কি তামাসাই না ওটা করল! হো হো হো!

কিন্তু ফলের চেয়ে কুফলই বেশী হইত। মহামায়ার শঙ্কিত প্রাণকে আরও ভাবাইয়া তুলিত।

ইহার পর কয়েক দিন চলিয়া গেল। ব্যাপারটা উভয়েই প্রায় ভুলিবার উপক্রম করিয়াছিল এমন সময়ে একদিন হঠাৎ হাট হইতে ফিরিয়া মাথার বোঝাটি নামাইয়া নিবারণ মহামায়াকে বাহিরের আঙিনায় পাকড়াও করিল। বলিল,—শেষ হয়নি মহামায়া, শেষ হয়নি। আমি ভুল বুঝেছিলুম—সেই সিকিটি আবার! ভয় ক'রো না—আবার ওটা বেশ চলতে আরম্ভ করেছে। কে বলে ওটা অচল!

মহামায়া আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল,—ও সব বাজে কথা রাখ, পেয়েছ ত শীগ্গীর আমাকে দাও!—আমার মাথার দিব্যি রইল—আর এক তিলও দেরী ক'রো না।

—আরে পাইনি, তবে সন্ধান পেয়েছি।—আগে ব্যাপারটাই শোন না! ওই যে দেবু ছোক্‌রাটা,—ফিরি করে মিঠাই বেচে—হাটে দেখা পেয়ে বলে কি,—নিবারণ কাকা, একটু নিরালায় চল, কথা আছে।—

আমি বললুম, চল, কিন্তু মিছিমিছি কাঁদিস্ কেন? হাটের এক কোণে গিয়ে চুপি চুপি আঁচল থেকে একটা সিকি বের করে বললে, একদিন জগন্নাথ সিপাই তার বাটা থেকে সের খানেক মিঠাই পেয়েছিল। পয়সা চাইতে এই সিকিটি দেয়। সিকিটি অচল দেখে দেবু ফেরৎ দিতে গেলে সিপাহী ধমক দিয়ে বলে,—রাজার মাথা আঁকা রয়েছে দেখছিস্‌নে—অচল বললে জেলে দেবো। দেবু ছোড়াটাত কেঁদে কেঁদে আকুল।—বলে, এখন কি করি বলত কাকা? আজকের বাজারে আমার যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! আমি পরামর্শ দিলুম—যা হয়েছে তার ত আর উপায় নেই। এখন ওটাকে শীগ্গীর কোথাও ফেলে দে—নইলে আবার কোন নতুন ফ্যাসাদে পড়ে যাবি। হয়ত বনে-বাদাড়েই ফেলে দিয়েই থাক্‌বে।

মহামায়া চিৎকার করিয়া উঠিল—তোমার উপরে না দিব্যি রয়েছে পেলেই আমাকে এনে দেবে, আর তুমি ফেলে দিতে বললে, যাও আমাকে আর জ্বালিও না। উঃ ভগবান! সারাজীবন চোখের জল দিয়ে শেষে আমাকে ওর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দেখছি! যাই দেবুকে খবর দিই গে, সে কি করতে পারে দেখি!

নিবারণ বাধা দিয়া বলিল, ছিঃ এমন কাজ করতে আছে? এক্ষুণি পুলিশ খবর পেলে বাড়ী চড়াও করে বসবে। আমি দেখব কোথায় ফেলেছে, তার খবর ওর কাছ থেকে নিতে পারি কি না।

পরদিন সকালে নিবারণ বারান্দায় বসিয়া হিসাব লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিল। মহামায়া উপস্থিত হইয়া বলিল, তুমি না বললে দেবুর কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে আসবে। কৈ গেলে না ত? অপ্রতিভ হইয়া নিবারণ বলিল, এই এক্ষুণি বের হব-হব মনে করছিলুম এমন সময়ে তুমি এসে পড়লে। ভেবনা মহামায়া, একটু পরেই যাচ্ছি।

"বাবা অন্ধকে দয়া কর" বলিয়া অন্ধ রহিম ছেলের মাথায় হাত দিয়া আসিয়া আঙিনায় দাঁড়াইল।

নিবারণ বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বলিল—আঃ কি চাই? শীগ্গীর বলে ফেল রহিম।

—বাবা, আর কিছু চাইনে, শুধু একটু সময় চাই—একটা কথা বলবার আছে। বাবা ছাদেক—আমায় আস্তে আস্তে বারান্দার কোণে একটু বসিয়ে দে ত।—খোদা, সকলই তোমার ইচ্ছে!

নিবারণ মহামায়াকে ডাকিয়া বলিল—তুমিই রহিমের কথাটা শোন মহামায়া,—আমি যাই দেবুর সন্ধানে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রহিমের কান্নাকাটি আরম্ভ হইল,—বাবা, সকলই খোদার মর্জ্জি!

মহামায়া বাধা দিয়া বলিল—উনি যে এক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন রহিম—তুমি আমাকে ব'ল, আমিই শুনছি।

—বলব বৈ কি মা! বাবা ছাদেক, দে'ত ঐ সিকিটে। কাল হাটে মা, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। কষ্টের কথা বলছি না মা—লাঞ্ছনা—উঃ কি লাঞ্ছনাটাই না আমীর সইতে হ'ল। কাল হাটের ভিড়—এক কোণে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছি—সারা দিনটায় শুধু দু'টো পয়সা পেয়েছি—কপালে সা তাই নয়? বাড়ী ফিরবার মুখে হঠাৎ কে একজন এসে এই সিকিটে হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেল।

—আমি কিন্তু বুঝেছিলুম, মা, এটা পোয়া পয়সা। সিকি? কে আমায় এত দেবে? হঠাৎ বাবা ছাদেক চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, সিকি পেয়েছি! সিকি পেয়েছি!!

—বুঝলে মা, মনের অবস্থা তখন আমার কি? বললুম, খোদা, শুকর তোমার। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মা—বাবা ছাদেক একদিন সন্দেশ খেতে চেয়েছিল, কিন্তু দিতে পারি নি। কি করে দেব বল? চারটের বেশী পয়সা ত আর মেলে না কোন দিন—আঃ বাছার আমার সে সাধ পূরণ করতে পারি নি এতদিন। বললুম চল্‌ত আমায় নিয়ে ময়রার দোকানে।

—রসিক শীলের দোকান থেকে দু' আনার সন্দেশ ওকে খাইয়ে কেবল সিকিটে তাদের দিয়েছি—অম্‌নি তেড়ে এল মা দোকানের সবাই। উঃ যে অন্ধকে মা, বাঘে খায় না, সাপে কাটে না তাকে মা মানুষ এমনি করে ঠকিয়ে গেল। গাল ত সবাই দিলে, মারতেও কেউ কসুর করত না যদি বাবা ছাদেক আমার অমন চেঁচিয়ে না উঠত। কেঁদে বললুম—ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার রেহাই দাও, সিকিটে পরখ করে দেখবার শক্তি আমায় খোদা দেয়নি—আমায় খোদা দেয়নি—

রহিমের কান্নার উচ্ছ্বাস হয় ত সারা জগৎকে কাঁদাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু যে নারীর সম্মুখে সে আত্মনিবেদন করিতেছিল, তাহার হৃদয়ে যে উহা কত নিষ্ঠুরভাবে প্রতিঘাত করিল তাহা শুধু দয়াময়ই দেখিলেন।

রহিম বলিতে লাগিল, না মা, দু'আনা পয়সা বৈত নয়? তা দশ গাঁ বেড়িয়ে এক দিনেই হয়ত যোগাড় করে ফেলব। করতেই হবে; না হলে ত আমার লাঠি আর গামছাটা ওরা ফেরৎ দেবে না, এতটুকুও বিশ্বাস করলে না মা ওরা আমায়। হ্যাঁ মা, বলত অন্ধ আর কতদূর পালিয়ে যেতে পারে?

আবার মহামায়ার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। একি নিদারুণ পরিহাস! মনে পড়িয়া গেল, তাহার স্বামী সিকিটায় চিহ্ন দিয়া গিয়াছিল। বলিল,—ভাই ছাদেক, নিয়ে আয় ত রে সিকিটে—দেখি।

সেই সিকিটাই বটে!

সিকি দেখিয়া মহামায়ার মুখে হাসির আভা দেখা দিল। বলিল—বাবা রহিম, সিকিটি আমার বড্ড পছন্দ হয়েছে; ওটিকে আমায় দিয়ে দাওনা—আমি পয়সা দিচ্ছি।

—অচল সিকি! ওর জন্যে আবার পয়সা?—অম্নি নিয়ে নাওনা মা, ওটাকে—আমার আর ওটা দিয়ে কি হবে?

মহামায়া ততক্ষণ উঠিয়া পড়িয়াছে। এক মুঠো পয়সা আনিয়া ছেলেটার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—ক'টা পয়সা দিলুম—সিকিটের কথা আর কারুর কাছে ব'লোনা বাবা—

"বাবা, বাবা, দেখ কতগুলো পয়সা!" বলিয়া ছাদেক রহিমের হাতে সব পয়সাগুলো ঢালিয়া দিল।

রহিম উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, একি মা? ওর জন্যে এত? কেন? বেঁচে থাক মা আমার! সংসার তোমার—

বাধা দিয়া মহামায়া বলিল,—আমার আর কি হবে বাবা?—আশীর্ব্বাদ কর, আমার খোকার মঙ্গল হোক্‌।

তাই হোক্‌ মা, তাই হোক। খোদা খোকার মঙ্গল করুক।

বাড়ী ফিরিয়া নিবারণ কৈফিয়ৎ দিল, দেবু সিকির কথা কিছুতেই বলিল না। জিজ্ঞাসা করিল, রহিম চেয়ে চিন্তে কিছু নিয়ে টিয়ে যায়নি ত?

মহামায়া উত্তর করিল,—না—সে কোনো জিনিষ নিতে আসেনি। শুনিয়া নিবারণ আশ্বস্ত হইল। ইহার বেশী তাহার কিছু জানিবার দরকার ছিল না।

কয়দিন পরে নিবারণ খোকাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিল। হঠাৎ তাহার গলায় রূপার একটি পদক দেখিয়া বিস্মিত হইল।

পরখ্‌ করিয়া দেখিয়াই মহামায়াকে পাকড়াও করিল—বলিল,—শেষে দেবু তোমায় দিয়ে গেছে না? বদমাস্‌টা আমায় ত সিকিটির কথা কিছুতেই বললে না। রোসো পুলিশ দিয়ে বেটাকে না ধরিয়ে দিই ত আমার নাম—

মহামায়া রাগ করিল,—তোমায় আমি কিছু বলতে পারি না—কিন্তু মাফ ক'রো—ভগবান ওটা আমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন—তোমার আর পুলিশ আনতে হবে না।

—তা যেন হ'ল, কিন্তু বলত শেষে অচল সিকি খোকার গলায় ঝুলিয়ে দিলে কেন? আমি কি সোনার পদক বানিয়ে দিতে পারতুম না?

শুষ্কমুখে মহামায়া বলিল, তা পারবে না কেন? ইচ্ছে হলেই গড়িয়ে দিয়ো। তারপর মনে মনে বুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে বললে, জানে না তাই সোনার পদকের কথা বলছে; এ অচল সিকি খোকার গলায় অচল হয়ে রইল।

আবুল হাসানাৎ

রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর

শ্রীহরিহর শেঠ

বাংলার মধ্যে যে-সকল মনীষী সরকারি কার্যে অথবা সরকারের সহযোগিতা করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে স্মরণীয় হইয়া গিয়েছেন, রায় বাহাদুর যামিনীমোহন মিত্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও পারিবারিক জীবনে বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর কথা ছাড়িয়া দিলেও

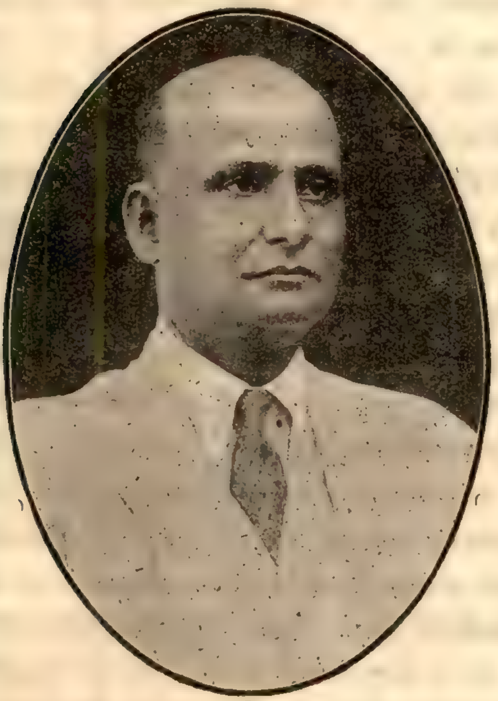

পরলোকগত যামিনীমোহন মিত্র

বিচার বিভাগে যেমন স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, শিক্ষা বিভাগে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আইনে স্যার রাসবিহারী ঘোষ, প্রত্নতত্ত্বে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গ্রন্থাগার বিভাগে হরিনাথ দে, কারেন্সি বিভাগে কৃষ্ণলাল দত্ত, তেমনই বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের ইতিহাসে যামিনীমোহনের নাম স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৮৮১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বর্দ্ধমান জেলায় যামিনী মোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মিত্র একজন সবজজ্ ছিলেন। যামিনীমোহনের ছয় ভ্রাতা ও এক ভগ্নী ছিল, তাহার মধ্যে এখন মাত্র দুই ভ্রাতা ও ভগ্নী বর্ত্তমান। যামিনীমোহন পিতার চতুর্থ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺মোহিনীমোহন বর্দ্ধমানে ওকালতি করিতেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺রমণীমোহন ডেপুটী কমিশনার অফ্ একসাইজ ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা ৺নলিনীমোহন সিমলায় সেক্রেটারিয়েট কর্ম্ম করিতেন। পঞ্চম ভ্রাতা ক্যাপ্টেন ৺ভামিনীমোহন আই, এম্, এস্ ছিলেন। ষষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রমোহন বর্ত্তমানে বাঙ্গালার ডাক বিভাগে সহকারী পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরেন্দ্রমোহন আই, সি, এস্ বর্ত্তমানে ভারত সরকারের বিচার বিভাগে নিযুক্ত আছেন।

যামিনীমোহন বাকেশ্বর হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম, এ পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মাত্র ছয়মাসের মধ্যেই এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সকলকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সিভিল্ সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১৯০৩ সালে সরকারী কার্য্যে যোগদান করেন।

স্বীয় প্রতিভাবলে ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে ১৯০৯ সালে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তিনি বঙ্গীয় সমবায় বিভাগে রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালী এই পদ প্রাপ্ত হন নাই।

১৯১২ সাল পর্য্যন্ত এই পদে থাকার পর তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ১৯২০ সালে এই বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। এই সময় মাত্র চারিমাসের মধ্যে তাঁহার দুই সুযোগ্য ভ্রাতা রায়সাহেব রমণীমোহন ও ক্যাপ্টেন্ ভামিনীমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন। উদারপ্রাণ যামিনীমোহনের হৃদয় তাঁহার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণের জন্য কাঁদিয়া উঠিল এবং তিনি ভারত সরকারের অধীনস্থ পূর্ব্বোক্ত উচ্চপদ পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নপদ "কীপার অব্ ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস"এর পদ গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। তৎপরে ১৯২২ সালে বাংলা সরকারের বিশেষ অনুরোধে ব্রিটিশ এম্পায়ার এক্‌জিবিসনে "বেঙ্গল কোর্টের" প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন এবং ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় রেজিষ্ট্রারের পদে যোগদান করেন।

সমবায় আন্দোলনের নেতৃরূপে তাঁহার আদর্শ কর্ম্মপদ্ধতির জন্য এই সময় তাঁহার নাম সমগ্র ভারতে ও ইউরোপের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং ১৯২৮ সালে সিমলায় বিভিন্নপ্রদেশের সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রারগণের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে তাঁহাকেই বহুদর্শী, বিচক্ষণ ও সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ বিবেচিত হওয়ায় সভাপতির পদে অভিষিক্ত করা হয়। পর বৎসর ইণ্ডিয়ান্ সেণ্ট্রাল্ ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটির অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি উহাতে যোগদান করিতে সমর্থ হন নাই। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ক্রমেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে থাকে এবং পরিশেষে ১৯৩০ সালে তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবন হইতে অবকাশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

উচ্চপদ সমূহের দীর্ঘ তালিকাই যে তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় তাহা নহে। বাঙ্গলার জনসাধারণের কার্য্যে তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ মোচন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাভাজন প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বদা দায়িত্ববহুল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও দেশের কৃষক ও শিল্পীদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করা সম্ভব,—যামিনীমোহন তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রচার ও সংগঠনের কার্য্যে যখন তিনি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার উদারতায় কৃষকগণ তাঁহাকে তাহাদেরই একজন মনে করিত। পাট বাংলার অতুলনীয় সম্পদ;—এই সঙ্গতির সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়া অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে সমবায়ের আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের সম্পূর্ণ অধিকারী করিবার যে বিরাট পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য তাহাতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই; সেই চরম সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে অবকাশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দেশহিতৈষীতায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বাংলার কৃষককুলের, তথা বাঙালী জাতির সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।"*

তিনি যথার্থই স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন এবং সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে তিনি সরকারের হইয়া সাধারণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন না, সাধারণের হিতার্থেই কার্য্য করিতেছেন। বঙ্গীয় সমবায় সমিতির জন্য তিনি যে কাজ করিয়াছেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লইয়া কার্য্য করিতেন, তাহার অভাব আজ তাঁহার উত্তরাধিকারী দিগের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে এবং সেই জন্য বঙ্গীয় সমবায় বিভাগ আজ তাঁহারই ন্যায় একজন বহুদর্শী, কর্ম্মী অধিনায়কের প্রতীক্ষা করিতেছে।

তাঁহার কার্য্যাবলীর জন্য শুধু যে সাধারণের নিকটই তিনি খ্যাতিপন্ন হইয়াছিলেন তাহা নহে, সরকারের নিকটও তিনি যথেষ্ট প্রসংশাভাজন হইয়াছিলেন। তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজি ১৯১৩, ১৪ ও ১৭ সালে ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম কো-অপারেটিভ্ কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন কালে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন সে প্রশংসালাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তিনি তাঁহার বিদায়কালীন ৮ম কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"I bid you all farewell; and as I do so I would like, in the clearest terms I can to express my appreciation of Rai Bahadur Jamini Mohan Mitra's work as Registrar. To

* প্রবাসী—কার্ত্তিক ১৩৪২—১৫৯ পৃষ্ঠা।

Mr. Mittra I feel that heartfelt thanks are due not only from us, but from all who hoped to see India flourish as I believe she can flourish." কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁহার কার্য্য এতাদৃশ সন্তোষের কারণ হইলেও তিনি ভারত সরকারের নিকট যে ব্যবহার পাইবার যোগ্য ছিলেন শেষ জীবনে তাহার কিছুই পান নাই।

যামিনীমোহন কলিকাতা নিবাসী স্বনামধন্য স্বর্গীয় নলিন-বিহারী সরকার সি, আই, ই মহোদয়ের তৃতীয়া কন্যাকে ১৯০৪ সালে বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। তাঁহার পারিবারিক জীবনও প্রশংসনীয় ছিল। সংসারে তিনি যে ত্যাগ ও মহত্বের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাও দুর্লভ। মাতৃবৎসল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, আত্মসুখ সম্বন্ধে নিশ্চেতন যামিনী-মোহন একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তিনি লোকের দুঃখে দুঃখী হইতেন এবং পরদুঃখ মোচনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। এজন্য তাঁহার গোপন দানও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার সরল মধুর ব্যবহারে সকলেই আকৃষ্ট হইত। কিন্তু অপর দিকে তিনি অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কখন নিজের স্বার্থের জন্য কাহারও নিকট মাথা নত করিতেন না।

কর্ম্ম হইতে অবকাশ গ্রহণ করিবার পর যামিনীমোহন তাঁহার নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলেও কথঞ্চিত ভাল ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ গত ১৯৩৪ সালের ৩১শে আগষ্ট কুন্দকুসুমসদৃশ তাঁহার অতি স্নেহের একমাত্র দ্বাদশ-বর্ষীয়া দৌহিত্রী কুমারী গীতা মল্লিকের অকালমৃত্যুতে যে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সেই শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিগত ২৭শে আগষ্ট মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার স্নেহের গীতার অনুগমন করিলেন।

শ্রীহরিহর শেঠ

সাহিত্যিক অসাধুতা

শ্রীযুক্ত বিচিত্রাসম্পাদক মহাশয়

করকমলেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার কাছে এ চিঠিখানা যদিও আমি লিখ্‌ছি বিচিত্রায় প্রকাশের জন্য তাহ'লেও এর ভিতরকার ব্যক্তিগত সুরটুকু আপনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা কর্‌লে আনন্দিত হ'ব।

একটা কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার কর্‌বেন যে প্রত্যেক মানুষের মনেই কোন না কোন সময়ে এ প্রশ্নের উদয় হয় যে সে বেঁচে আছে কিসের জন্য,—অর্থাৎ আমরা কেন যে জীবন ধারণ করি সেটা একটা চিরন্তন প্রশ্ন, এবং স্থানকাল ভেদে এর উত্তরটাও ক্রমাগত রূপান্তর গ্রহণ করতে থাকে। অর্থাৎ এক সময়ে জীবনধারণের যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনে কোনও সংশয় থাকে না অন্য সময়ে সে কথা মনে করে হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সেকথা যাক্। এখন মোটের উপর প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বেঁচে আছি কেন? এ প্রশ্ন আমি আমাদের খোকনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল চকোলেট খাওয়ার জন্য, এবং এ সম্বন্ধে সুজাতার কাছে অভিমত জানতে চাওয়ায় সে তার বড় বড় চোখ আরও বড় করে ঈষৎ চিন্তা করে উত্তর দিয়েছিল, আলুর পুতুল কেনা ছাড়া বাঁচবার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

এই প্রসঙ্গে জানাতে চাই যে খোকন এবং সুজাতার বয়স সাতের মধ্যে, এবং তার চেয়েও প্রয়োজনীয় সংবাদ এই যে জীবন ধারণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওদের সঙ্গে আমার মতে মেলেনি। কিন্তু বৈশাখ সংখ্যার বিচিত্রায় প্রকাশিত—"দেব-তার হাসি" গল্পের লেখক শ্রীযুক্ত কুড়নচন্দ্র সাহার বয়স না জানলেও এ বিষয়ে তাঁর মতের সঙ্গে আমার মত সহসা মিলেছে।—ব্যাপারটা একটু বিশদ করে বলি।

বৈশাখ সংখ্যার বঙ্গশ্রীতে শ্রীযুক্ত কুড়নচন্দ্র সাহা নামধারী জনৈক লেখকের একটি গল্প বেরিয়েছে 'দেবতার হাসি'।

সব দিক দিয়ে এতবড় সাদৃশ্য যখন পৃথিবীতে একেবারে

অসম্ভব না হলেও দুর্লভ, তখন আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি যে বিচিত্রা এবং বঙ্গশ্রীর কুড়নচন্দ্র এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল ;—তার কারণ এইখানে বলার দরকার :

আমি স্বভাবত অতিশয় অলস,—এত নিরবচ্ছিন্নভাবে অলস যে আমার বন্ধুদের মতে আমি কুড়েমি জিনিষটাকে প্রায় শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করেছি—এবং দু'পয়সা রোজগারের জন্য ফরমাস মাফিক পাইকারী হিসাবে গল্প উপন্যাস রচনার পক্ষে এমনতর শিল্পবস্তু একটা প্রকাণ্ড বাধা। অথচ যত বেশী টাকা পাওয়া যায় ততই ভালো। সেই জন্যই কুড়নচন্দ্রের "দেবতার হাসি"র যুগল আবির্ভাব দর্শনে মন প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল এ কৌশলটা এতদিন জানা ছিল না,—একই গল্প এবার থেকে একসঙ্গে দশ জায়গায় প্রকাশ করা চলবে,—কুড়েমি আর টাকা রোজগারের পথে অন্তরায় হ'বে না।—ভাবলাম কুড়নচন্দ্রকে যদি প্রশ্ন করতাম আমরা বাঁচি কেন, উত্তর পেতাম একই লেখা দুই কিংবা ততোধিক পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য, এবং খোকন ও সুজাতার সঙ্গে মতে না মিললেও এই পন্থার অপূর্ব্ব সুবিধার জন্য কুড়নচন্দ্রের সঙ্গে আমার মতভেদ হ'ত না।

কিন্তু এ ধরণের সাহিত্যিক অসাধুতা শুধু কুড়নচন্দ্রেরই নয়। আরও অনেক লেখকের এমনতর আচরণের নিদর্শন চোখে পড়ে বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যে। আমার নিজের চোখে দেখা এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্মিলিত করলে একথা আমি বল্‌তে পারি, বিলাতী ম্যাগাজিন থেকে গল্প ও প্রবন্ধ না বলে' গ্রহণ করা য়ুরোপীয় সাহিত্যের নামধাম পরিবর্ত্তিত করে সেই রচনাকে মৌলিক বলে চালাবার প্রচেষ্টা, নিজের লেখা পূর্ব্বপ্রকাশিত গল্পকে বহুবার বহু পত্রিকায় সম্পাদকদের না জানিয়ে বিভিন্ন আকারে বার করবার আগ্রহ এবং অন্য লেখকের লেখা সামান্য অদল বদল করে নিজ নামে প্রকাশ করবার সাধু প্রয়াস বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে হয়ত খুব দুর্লভ নয়। এ সম্বন্ধে তালিকা হ'বে দীর্ঘ সেই জন্যই এখানে আর তা দিলাম না,—কিন্তু আপনার যদি কৌতূহল হয় এবং যদি জানতে চান তাহ'লে আমি আপনাকে লেখকদের এবং তাঁদের রচনার নাম দিতে পারি।

আপনারা যাঁরা সাময়িক সাহিত্যের কর্ণধার, যাঁরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যের মারফত আনন্দরস পরিবেশনের ভার গ্রহণ করেছেন,—আপনাদের কাছে আমি একটা সরাসরি প্রশ্ন করতে চাই। দেবী বীণাপাণির যে দেউলে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা এবং নিশ্ছিদ্র সত্য আচরন একমাত্র পুজোপচার হওয়া আবশ্যক সেখানকার এই অসাধুতার গ্লানি মোচন করার জন্য আপনারা কি প্রতিবিধান করা সঙ্গত বলে মনে করেন ?

ইতি—

শ্রীআশীষ গুপ্ত

উত্তর

উল্লিখিত পত্রে শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত যে অভিযোগ এনেছেন বিচিত্রার ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আমরা কয়েকবার তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা মলিন বলে সে কথা পত্রিকা পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করা সমীচীন মনে করিনি, শুধু আত্মরক্ষার্থে 'ন্যাড়া বেলতলায় একাধিক বার যায় না' এই সারবান নীতি অবলম্বন করেছি। এ ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, বিশেষতঃ যখন একই লেখকের একই লেখা একই মাসে দুইটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সুখের বিষয় এরূপ অবিবেচনার দৃষ্টান্ত এত অল্প যে, লেখকদের সৌজন্যের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা অসতর্কতা বলে আমরা মনে করিনে। দীর্ঘকাল কোন লেখা অপ্রকাশিত থাকলে অন্য পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সে লেখা পাঠাবার অধিকার লেখকদের নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে সেকথা পত্রের দ্বারা জানিয়ে দেওয়ার কর্ত্তব্যও ঠিক সেই পরিমাণে আছে বলে আমরা মনে করি। এরূপ কর্ত্তব্য-পালনের দৃষ্টান্তও আমাদের অভিজ্ঞতায় বিরল নয়।

সম্পাদক

আমি

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

নাশিতে হইবে মমত্ব মায়া, নাশিতে হইবে আমার আমি,
এই বাণী আজ শুনালে আমারে, এ মন্ত্র আজ দিয়াছ স্বামী !
এ আমার আমি এ বনস্পতি হাজার শিকড় অধরে তার
ধরার বুকের অনন্ত রস ধারা পিয়ে পিয়ে বারংবার
অজর অমর অক্ষয় এযে ; এরে কি নাশিতে পারিবে প্রভু !
চালাও কুঠার, খুঁড়ে তোল জড়্, চেষ্টার ত্রুটী ক'রনা তবু !

এ 'আমার আমি' একে, একবার ভেবে দেখি মন তল্লাসিয়া
ধরায় গগনে ভাবের ভুবনে এ কে ফিরে সম সঞ্চারিয়া !
মহৎ হতেও মহিয়ান এযে, অণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর,
জ্ঞানী মানী দানী পুনঃ সে ভিক্ষু দুঃখী আতুর অন্ধ জড়
সে রাজদুলাল মহৈশ্বর্য্যে পূর্ণ তাহার মহৎ প্রাণ,
দুহাতে তাহার ভাব সম্পদ আর্ত্ত জগতে করিছে দান।
প্রাণরসধারা পিয়ে মাতৃহারা ফিরে শিশু সম ধরার বুকে
রূপপিয়াসী সে সাগরে অনলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সমান সুখে
সে মহান কবি, নিপুণ শিল্পী, অঙ্কনপটু চিত্রকর
গাঁথিছে আঁকিছে কি নব ছন্দ কি চারুচিত্র ধরার পর !
সুরের সাধক, সঙ্গীতরসে পূর্ণ, মূর্ত্ত সুরের রূপ !
গগনে পবনে বিলায় গন্ধ প্রাণ পোড়া তার সুরভি ধূপ।

অমিতাভ আর শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর তার প্রাণের গুরু,
গীতগোবিন্দ মোহমুদ্গর এক সাথে পাঠ করে সে সুরু !
উপসম্পদা নিয়ে ফেরে সে যে বুদ্ধসঙ্ঘে শ্রমণ বেশে,
ব্রহ্মদণ্ড ধরি হয় যতি, বৃন্দাবনের রসে সে মেশে।
প্রেমরস লোভী সে যে চিরগোপী, বাজে বাঁশী তার
হৃদয় মাঝে,
কালিন্দী কুলে কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরে চির অভিসারিকা সাজে।

যুগে যুগে দেশে দেশে কালে কালে যারে যত ভাল বেসেছে যেই
তাদের সে প্রেম সে সুধা গরল পান ক'রে চিরপাগল সেই !

সে যে স্নেহাতুরা জননী যশোদা কোলে দোলে চির
গোপাল তার,
প্রেম রস পাশে ক্ষীর ধারা তার বক্ষ মথিছে দুর্নিবার।
সে স্নেহসিন্ধু মন্থিত ননী তুলে দেয় মুখে বুকের ধনে
গোষ্ঠে পাঠায় হাসায় কাঁদায় চুম্বন শত শাসন সনে।
কাঁদে বিরহিনী মাথুর রাগিণী বহে তার চির হাহাকার
গগন পবন মূর্চ্ছামগন হেরি বুকফাটা শোণিত ধার !
অন্ধ নন্দ কোথা আনন্দ যশোদা কাঁদিয়া ভূমে লুটায়
ক্ষীরধারা তার লবণসিন্ধু উত্তাপ বেগে বহিয়া যায় !
কাঁদিছে জগৎ অহরহ হায় হারায়ে তাহার বুকের ধনে,
সে তীব্র শোকে ফেলে আঁখি বারি অবিরাম সে যে
তাহার সনে।
আর্ত্ত আতুর কাঙাল দুঃখী পাপী তাপী সাথে অবিচ্ছেদে
এক দুঃখ শোক ভোগে অবিরল পাপে তাপে দিন কাটায় কেঁদে।

কবে জেগেছিল ধরণী-জননী প্রথম তাহারে লইয়া বুকে
সেদিন হইতে এই 'আমি' তার বক্ষে খেলিছে সুখে ও দুখে।
তব দেউলের ভিত্তিস্তম্ভ কারে দিয়ে প্রভু গড়িতে চান ?
এ নহে অটল সুদৃঢ় পাষাণ, এযে গো কেবল মানবপ্রাণ !
যতদিন ধরা ধরিবে মানুষে হইবে কি নাশ তাহার 'আমি' ?
ও দেউল তব ধরিবে কি এরে বিচারিয়া মনে লহ গো স্বামী !

———

দান

শ্রীমতী সুপ্রভা দত্ত এম্-এ

সন্ধ্যা হয়ে আসে ; নব আষাঢ়ের মেঘ
নিজেরে মেলিয়া ধরি আকাশে আকাশে,
আপনার ঐশ্বর্য্যের নিবিড় চেতনা
করিতেছে অনুভব। দ্রুত গতিবেগ
ছুটেছি গৃহের পানে আশ্রয়ের আশে ;
হেন কালে কণ্ঠে ভরি' করুণ বেদনা
দাঁড়াল সম্মুখে আসি ভিখারিণী মেয়ে
রুক্ষ কেশ পড়িয়াছে বক্ষোদেশ ছেয়ে।
  এড়াইতে চাহিলাম ; করিয়া মিনতি
  চরণে পড়িতে চায়, করি' নিবারণ
  করতলে রাখিলাম সামান্য সে অতি
  একান্ত হেলার দান। চপল চরণ
  ফিরিবারে গেনু যেই ; সহস্র ধারায়
  আকাশের অশ্রুজল ঘিরিল আমায়।

(২)

মুহূর্ত্ত কাটিল মৌন ; নবধারা জলে
সিক্তকেশ, সিক্তবেশ রহিনু থমকি' ;
এখনো সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমি তবে
লভিব গৃহের ছায়া ! উঠিনু চমকি'
আবার সম্মুখে আসি লজ্জা ছলছলে
কহিল নয়ন তুলি, "কতক্ষণ রবে
এমন আশ্রয়হীন ! এস মোর সাথে
ক্ষণেক দাঁড়াবে মোর কুটীর ছায়াতে।"
  বৃষ্টি থেমে আসে ধীরে, অন্ধকার পথ
  চলেছি শঙ্কিত পদে ; তারাদীপ-হীন
  আঁধার অম্বর পথে বিরামবিহীন
  দ্রুতগতি ছুটে চলে মহাকাল-রথ ;
  একটি নিমেষ যদি ভুলে খসে যায়
  তাহারে কুড়ায়ে লয়ে রাখিব কোথায় ?

খেলা ধূলা

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী, এম্-এ

হকি

১৯৩৬ সালে হকি চ্যাম্পিয়ান হল কাষ্টমস্। এবার নিয়ে কাষ্টমস্ প্রায় কম করে তের বার লীগ বিজয়ী হল। লীগে রেঞ্জার্সের পয়েণ্ট হয়েছিল কাষ্টমসের সমান কিন্তু এসোসিয়েসনের ৬ নং রুল অনুসারে গোল এভারেজের জোরে কাষ্টমস্ লীগ বিজয়ী হ'ল। লীগের গোড়া হতেই কাষ্টমসের সুন্দর খেলায় প্রমাণ করছিল যে এবার রেঞ্জার্স ছাড়া অার কেউ তার সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। রেঞ্জার্স প্রথমে দু-একটা গেমে কয়েকটা মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করে। তা না হলে আজ রেঞ্জার্সই এত বড় সম্মান পেত। আগেকার মত রেঞ্জার্সের সেই মুগ্ধকর খেলা দেখা যায় না কিন্তু দুর্ব্বল টীম হয়েও লীগে রেঞ্জার্সের কৃতীত্ব গৌরবের বিষয়।

'ঝান্সি হীরোজ' টীম। মধ্য সারিতে বাম হতে তৃতীয় জগদ্বিখ্যাত খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ, চতুর্থ ধ্যানচাঁদের ভ্রাতা রূপসিং।

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সেণ্ট্ জোসেফ্। কয়েক বার ধরে সেণ্ট্ জোসেফ লীগে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে আসছে। এবার বি, জি, প্রেসের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলেই আনন্দিত হয়েছে। মোহনবাগানের এইচ, মিটার, এ, দেব, ডি, দাস প্রভৃতি নামজাদা খেলোয়াড়দের নিয়ে বি, জি, প্রেস লীগের বিখ্যাত টীমদের অতি সহজেই পরাজিত বা ড্র করেছে।

মিলিটারী মেডিকেল, আর্ম্মেনিয়ান, ক্যালকাটা, সেণ্ট জেভিয়ার, লীগের মাঝামাঝি স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট। কয়েকটী আপসেট এরা করেছে। ডালহাউসী বা পুলিশের খেলা তত চিত্তাকর্ষক হয়নি। গত বছর চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানের অবস্থা এবার সব চেয়ে শোচনীয়। টীম অনুসারে তারা দুর্ব্বল ছিল না। বেণীপ্রসাদ, সুলতান ও প্রেমলালের খেলা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল; কিন্তু পর পর বাজে টীমের কাছে পরাজিত হয়ে মোহনবাগান খেলার মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলে। মোহনবাগান লীগে অতি নিম্নস্থানে এসে পৌছেছে। শুধু বরাতজোরে গোল এভারেজ অনুসারে মোহনবাগান কোন মতে এ ডিভিসনে টিঁকে রইল। ই, বি, আর এবং লিলুয়া বি, ডিভিসনে নাবল। বি ডিভিসন চ্যাম্পিয়ান গ্রীয়ার এ ডিভিসনে উঠল। এবার মিলিটারী টিম ডিভেন্সের খেলার ফলাফল দেখবার মত; ১৪টী গেম খেলে পয়েণ্ট করেছে মাত্র দুই!

'নিখিল ভারত' বনাম 'রেষ্ট'। নিখিল ভারত টীমের মধ্যে নয় জন অলিম্পিক ক্রীড়ায় বার্লিনে যাচ্ছেন। উপরের চিত্রখানিতে বামদিকে ধ্যানচাঁদ গোল দিচ্ছেন।

লীগের ফলাফল।

লীগের ফলাফল

	গেম	জয়	পরা	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
কাষ্টমস	১৪	১১	১	২	৪০	৯	২৪
রেঞ্জার্স	১৪	১০	০	৪	৩৪	১২	২৪
সেণ্টজোসেফ	১৪	৯	৩	২	১৬	১০	২০
বি, জি, প্রেস	১৪	৫	২	৭	১২	৯	১৭
ক্যালকাটা	১৪	৬	৪	৪	৩১	২৫	১৬
সেণ্টজেভিয়ার্স	১৪	৬	৪	৪	১৬	১৪	১৬
আর্ম্মেনিয়ান	১৪	৪	৩	৭	১৩	১২	১৫
ভবানীপুর	১৪	৪	৫	৫	১৯	১৬	১৩
মিলিটারী মেডিকেল	১৪	৪	৫	৫	১৪	১৪	১৩
পুলিশ	১৪	৩	৫	৬	৮	১২	১২
ডালহাউসী	১৪	৪	৬	৪	১৪	২৫	১২
মোহনবাগান	১৪	৩	৬	৫	১৫	১৪	১১
ই, বি, আর	১৪	৩	৬	৫	৭	১১	১১
লিলুয়া	১৪	০	১০	৪	৫	২৬	৪
ডিভেন্স	১৪	০	১২	২	৮	৪৩	২

বাইটন কাপ

এদেশে সবচেয়ে পুরোণ ও নামজাদা টুর্ণামেণ্ট হল বাইটন কাপ। প্রতি বছরই সব বিখ্যাত টীমদের এই টুর্ণামেণ্টে দেখা যায়। এবার বোম্বে কাষ্টমস, ঝান্সি হীরোজ, লাক্ষ্ণৌ. বি, এন,

আর, মিরাট খালসা ক্লাব, ভূপাল, রায়পুর, এলাহাবাদ, ঢাকা অর্থাৎ ভারতের সব বিশিষ্ট টীমদের কলিকাতা মাঠে দেখা গিয়েছিল। ভারতের বাইরে আন্দামান হতে ব্রাউনিং ক্লাবের এই সর্ব্বপ্রথম বাইটনে যোগদানে এবারকার খেলাতে একটা বিশেষত্ব ছিল। দ্বিতীয় রাউণ্ড হতে যথার্থ খেলা আরম্ভ হয়। মনিপুর টীমের কলিকাতার কাছে ৭-২ গোলে এবং ডালহাউসীর ঝান্সির কাছে ৯-১ গোলে পরাজয় দর্শকদের রাউণ্ডে মোহনবাগান দুর্দ্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বোম্বে কাষ্টমসকে সাক্ষাৎ করে। খেলায় বেশীসময়ই মোহনবাগান বোম্বে কাষ্টমসকে চেপে রেখেছিল, এবং গোল দিবার বহু সুযোগও নষ্ট করে। কিন্তু ভাগ্যের জোরে অতিকষ্টে মোহন বাগানকে ২-১ গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউণ্ডে উঠে কাষ্টমসের খেলা খুলে গেল। রামপুরকে হারিয়ে বোম্বে দল ভূপালকে সেমি-ফাইনালে সাক্ষাৎ করল। অন্যদিকে বি, এন, আর ঝান্সির

কলিকাতার কাষ্টমস্ দল। ইহারা বাইটন কাফ্ ফাইন্যালে বম্বে কাষ্টমস্-এর কাছে পরাজিত হয়।

বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। ঢাকা ৪ গোলে ফরিদপুরের লা এলেগো টীমকে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে দুর্দ্দান্ত ভূপালের সঙ্গে একদিন ড্র করে; কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ২-১ গোলে হেরে যায়। দুঃখের বিষয় ব্রাউনিং ক্লাব নিজেদের ক্রীড়াচাতুর্য্যের সাফল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি! এলাহাবাদ তিন গোলে ব্রাউনিং ক্লাবকে হারায়। বাইটনে মোহন বাগান পুরোণ খেলার উৎসাহ ও দক্ষতা ফিরে পেল। ই, আই আর ভাল খেলোয়াড় থাক সত্ত্বেও ২-১ গোলে মোহনবাগানের কাছে পরাজিত হয়। তৃতীয় কাছে অপদস্থ হল। যাদুকর ধ্যানচাঁদ ও রূপ সিংহের কাছে বি, এন, আর টীমে ট্যাপসেল, কার, গ্যালিবর্দ্ধি প্রভৃতি অলিম্পিক খেলোয়াড়গণ থাকা সত্ত্বেও বি, এন, আর বার বার নিজের দুর্বলতা ধরা দিল। অতি সহজেই বি,এন, আরকে ৩ গোলে হারিয়ে ঝান্সি সেমি-ফাইনালে পৌছল। স্থানীয় দুই টীম বি, জি প্রেস ও কাষ্টমসের খেলা প্রথম দিন অমিমাংসিত ভাবে থাকে। দ্বিতীয় দিনে কাষ্টমসকে প্রতিদ্বন্দ্বী বি, জি, প্রেসকে হারাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সেমি-ফাইনাল

ভূপালের এক ভাগ্য বিপর্য্যয় উপস্থিত হল। বানী খাঁ, আসান খাঁ প্রভৃতি সুদক্ষ খেলোয়াড়গণ থাকা সত্ত্বেও বোম্বে কাষ্টমস পর পর ৬ গোলে ভূপালকে পরাজিত করে মাঠে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত করে। ঝান্সি আবার সাক্ষাৎ করল কলিকাতা কাষ্টমসকে। ১৯৩৬ সালে ভারতের এই দুই বিখ্যাত টীম বাইটনে ফাইনাল খেলেছিল। সেব র ঝান্সি ১ গোলে জয়লাভ করে। ফুটবলে মোহনবাগানের ন্যায় হকিতে ঝান্সি সকলের

বাইটন কাফ্ বিজয়ী কাষ্টমস্ দল।

প্রিয় হয়ে উঠেছে। তার কারণ বোধ হয় ধ্যান, রূপ, বাবুলাল ইসমাইল, মথুরাপ্রসাদ প্রভৃতি সকলের খেলা বেশ চিত্তাকর্ষক। তারপর ঝান্সির খেলোয়াড়গণ সকলেই আবার এ-দেশীয়।

এংলো ইণ্ডিয়ান টীমের বিরুদ্ধে ঝান্সির আশ্চর্য্যকর ক্রীড়াদক্ষতায় সকলেই সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হয়েছিল। প্রথম দিন খেলা ড্র হয়। খেলার শেষের দিকে ধ্যানচাঁদ একটী গোল দিলেও রেফারী বাওয়ারী গোলটী গণ্য করেন না। দ্বিতীয় দিনে কাষ্টমসের উন্নত ও সুন্দর খেলার বিরুদ্ধে ঝান্সির সর্ট পাশ খেলা সুবিধা করতে পারেনি। ঝান্সিকে ১ গোলে হারিয়ে কলিকাতা ও বোম্বে দুই কাষ্টমস দল ফাইনালে খেলতে নাবল। এই খেলাটী খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। খেলার আদান প্রদান সমান ভাবে চলে ও দুই টীমই গোল দিবার সুযোগ নষ্ট করে। শেষ পর্য্যন্ত বোম্বে কাষ্টমস ২-১ গোলে বিজয়ী হয়। কয়েক বছর আগে বোম্বে আগা খাঁ টুর্ণামেণ্টে একবার বোম্বে কাষ্টমস কলিকাতা কাষ্টমসকে পরাজিত করেছিল। বাইটন কাপ বিজয়ী বোম্বে দল এবারও আগা খাঁ ট্রফি লাভ করে হকিতে এক নতুন কীর্ত্তি রাখল।

অল ইণ্ডিয়া বনাম 'রেষ্ট'

অলিম্পিক ফাণ্ডের জন্যে কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া বনাম 'রেষ্ট' একটী এক্‌জিবিশন ম্যাচ হয়। অল ইণ্ডিয়া টীমে প্রায় ৯জন

অলিম্পিক খেলোয়াড় ছিল। টীমের ক্যাপ্টেন হন ধ্যানচাঁদ। গুজব যে বার্লিনে ইনি ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হবেন। অল ইণ্ডিয়ার বাছা বাছা খেলোয়াড়ের কাছে রেষ্ট টীম খুব দুর্ব্বল দেখাচ্ছিল। তারপর বোম্বে কাষ্টমসের পিণ্টো, জগৎসিংহ, আসলাম, হুইনী প্রভৃতি যোগদান না করায় অল ইণ্ডিয়া দল ৭-২ গোলে জয়লাভ করে। একা ধ্যানচাঁদই ৪ গোল দেয়। ধ্যানচাঁদের অপূর্ব্ব খেলার পরই রূপসিংহের নাম করা যেতে

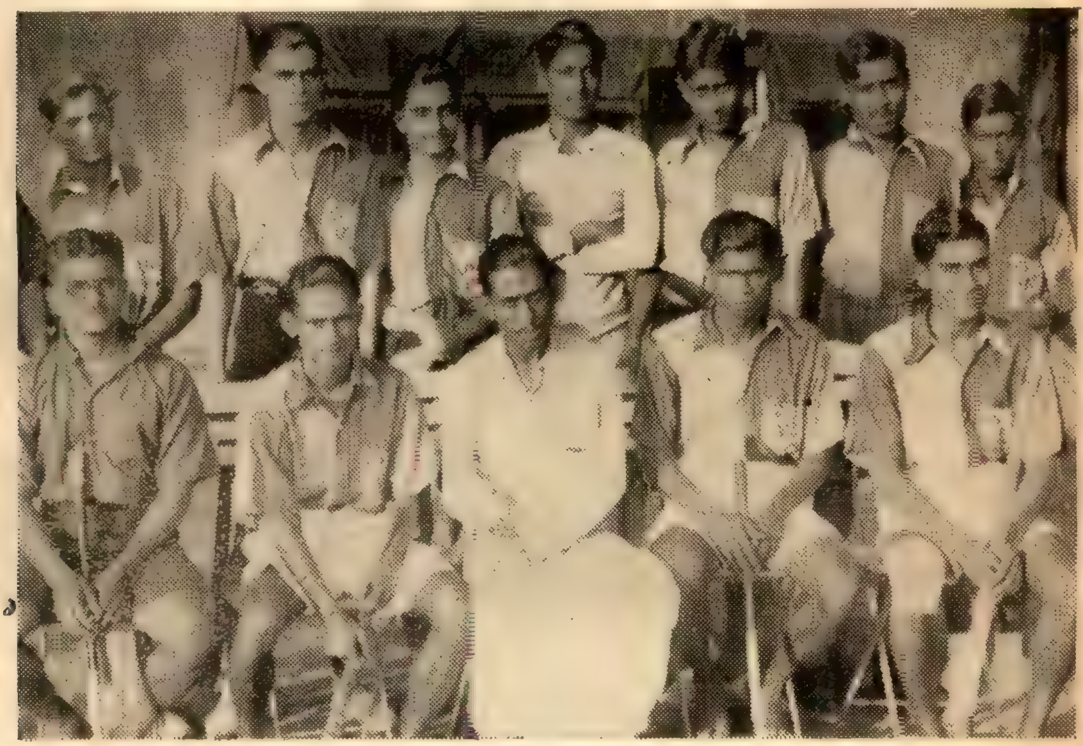

'বি' ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন 'গ্রীয়র' দল।

পারে। সেণ্টার হাফ বানি খাঁর খেলা বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। অলিম্পিক টীমে বানি খাঁ স্থান না পাওয়াতে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন। বিজেতা দলে রেবেও, এইচ, মিটার, ইসমাইল, লতিফ ভাল খেলেছিল।

অল ইণ্ডিয়া দল

এলেন; ট্যাপ্‌সেল ও মহম্মদ হোসেন; আসান খাঁ, বানি খাঁ ও গ্যালিবার্দ্ধি; কার, এমেট, ধ্যানচাঁদ রূপসিং ও জর্ব্বর।

রেষ্ট দল

রেবেও; ফ্রেচার ও এইচ, মিটার; সাইনুর, কনলী ও জাহির; এ, দেব, ইসমাইল, লতিফ সোভান ও নিস।

আম্পায়ার—পি, গুপ্ত ও হাফেজ।

লক্ষ্মীবিলাস শিল্ড

এবার মোহনবাগান ও ঝান্সি হিরোজ ফাইনালে সাক্ষাৎ করে। বাইটন কাপ ও লক্ষ্মীবিলাস শিল্ড এই দুইটী নামজাদা টুর্ণামেণ্ট জয় হবার ঝান্সী একটী প্রবল আশা রেখেছিল। প্রথমটীতে ভগবান বাদ সাধলেন; আর লক্ষ্মীবিলাসে হকি খেলার ক্রীড়া-নৈপুণ্য, চাতুর্য্য ও বলের ওপর অসামান্য দখল একমাত্র ঝান্সি টিমেই দেখা গেল। মোহনবাগান খেলার প্রথম মুখে ঝান্সির ডিফেন্সকে ভেদ করে প্রবলভাবে আক্রমণ করে খেলতে থাকে। প্রথম হাফে খেলার ফলাফল ২-২ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় হাফে মোহনবাগানের খেলা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে

আসে। ঝান্সি তখন অপেক্ষাকৃত ভাল খেলতে আরম্ভ করে। খেলা শেষ হতে মাত্র ৭ মিনিট বাকি এমন সময় পর পর ঝান্সি ৪ গোল দিয়ে মোহনবাগানের সব আশা ও উৎসাহ নিবিয়ে দিয়ে ৬-২ গোলে চ্যাম্পিয়ান হল।

টেনিস

বোম্বে স্নবারবন টুর্ণামেণ্ট

প্রতি বৎসরই বোম্বের বহু খ্যাত ও অখ্যাত খেলোয়াড়দের

মোহনবাগান বনাম এরিয়ান্স খেলার ফলাফল—ড্র।

ঝান্সি হিরোজ—নানেলাল ; বাবুলাল ও নবী সা ; এইচ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটে বাবু ও দয়াশঙ্কর : ইসমাইল, মথুরাপ্রসাদ, ধ্যানচাঁদ, রূপসিংহ ও ফেকনলাল।

মোহনবাগান—এন, মুখোপাধ্যায় ; পি, দাস ও কে, ব্যানার্জ্জি ; আরিফ, এস, চ্যাটার্জ্জি ও প্রেমলাল ; বেনীপ্রসাদ, হাফিজ, সুলতান খাঁ, পি, ঘোষ ও এস, বসু।

এই টুর্ণামেণ্টে দেখা যায়। এবার ফাইনালে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় ই, ববের বিরুদ্ধে খেলেছিল চুনিলাল। টেনিসে চুনিলালের নাম এখনও অজ্ঞাত। বোধ হয় কোন নামজাদা টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে এই প্রথম চুনীলালকে দেখা গেল। যদিও ই, বব অতি সহজেই ৬-১, ৬-২ গেমে জয়ী হন তবুও চুনীলালের খেলা বেশী সন্তোষজনক হয়েছিল। ডাবলস্‌ ম্যাচে

গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ই, বব ও পেরিয়ার নবাগত চুনীলাল ও কাউলের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কাউল ও চুনীলাল ৭-৫, ৬-৩ গেমে বব ও পেরিয়ারকে হারান। মিক্সড ডাবলস ম্যাচে কাউল ও মিস লিমা প্রতিদ্বন্দ্বী পেরিয়ার ও মিস ওয়াডিয়াকে হারাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কাউল ও মিস লিমা ৩-৬, ৬-২, ৬-৪ গেমে পেরিয়ার ও মিস ওয়াডিয়াকে পরাজিত করেন।

কৃষ্ণস্বামী ফাইনালে উঠে প্রতিদ্বন্দ্বী সুদক্ষ সানসোনীকে—৬-১, ১-৬, ৬-২, ২-৬, ৬-২ গেমে হারিয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। কৃষ্ণস্বামী খেলোয়াড় হিসেবে ভারতে বিশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করলেও আজ পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন বিখ্যাত টুর্ণামেন্টে জয়ী হননি। সিংহল টুর্ণামেন্টে জয়ী হয়ে আজ মনের আশা কিছু মিটল।

র‍্যাকওয়াচ বনাম ডালহৌসী র‍্যাকওয়াচ ২-০এ জয়ী হয়।

অল সিংহল টুর্ণামেন্ট

অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত হয়ে ভারতের তিন জন বিশিষ্ট খেলোয়াড় মিস লীলা রাও, চিরঞ্জীব ও কৃষ্ণ স্বামী সিংহলে খেলতে যান।

সিংহলের বাসস্থান সুবিধাজনক না হওয়াতে টুর্ণামেন্টে যোগদান না করে মিস লীলা রাও ভারতের দিকে রওনা হন। সেই নিয়ে কাগজে খুব হৈ চৈ হয়। পুরুষ সিঙ্গলস্ ম্যাচে কেম্ব্রিজ ব্লু চিরঞ্জীব খেলার প্রথম মুখে বিদায় নেয়। একমাত্র

ফুটবল

হকি খেলার পর এতদিনে মাঠে ভিড় জমতে সুরু হল। এবার প্রথম ডিভিসন ম্যাচ ২৭শে এপ্রিল হতে আরম্ভ হয়েছে। আগে বাইটন খেলার পরই আরম্ভ হত। দর্শকের উচ্চ বাহবা খেয়ে দু দুবার লীগ-চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সেই মহমেডান স্পোর্টিং আবার চ্যাম্পিয়ান হবার আশায় মাঠে খেলতে নেবেছে। নূর মহম্মদ কলকাতায় সব চেয়ে উৎকৃষ্ট সেণ্টার হাফ, সিরাজউদ্দিন সাবু, নাসিক প্রভৃতি মহমেডান স্পোর্টিং দলে

যোগ দিয়েছে। সুতরাং এদের পরাজিত করতে কলকাতা কোন টিম নেই বল্লেই চলে। ইষ্ট বেঙ্গলে লক্ষ্মীনারায়ণ, রমন, প্রসাদ, জি, ব্যানার্জ্জি খেললেও আজ মজিদ, সেলিম ও নূরমহম্মদ প্রভৃতি থাকলে টিম অন্য রকম দাড়াত। রহমত হবিব্ শেষ পর্য্যন্ত খেলবে না ঠিক করেছে। ভিজে মাঠে ইষ্টবেঙ্গল কলকাতার সঙ্গে ড্র, দুর্ব্বল এটচড্ সেক্সন দলকে ৪ গোলে হারিয়ে কালীঘাটের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছে। মোহনবাগান টিমে বেনীপ্রসাদ, প্রেমলাল ও এ, গাঙ্গুলী খেলছে। এরিয়ান্স, কাষ্টমস্ এই দুই টিমের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের খেলা যত নিকৃষ্ট হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া

লণ্ডন হোটেল ভিক্টোরিয়ায় ডিনার-পার্টিতে ভারতীয় ক্রিকেট টীমের সহিত লর্ড হেলশ্যাম্। এই ডিনার-পার্টি ভারতবর্ষীয় সম্মানে দেওয়া হয়েছিল।

গিয়েছিল। কলিকাতা ভাল খেলেও ১ গোলে মোহনবাগানের কাছে হেরে যায়। সেদিন গ্যালারীতে মুষ্টিমেয় দর্শকের সংখ্যা দেখে ১৩ বছর আগেকাক কথা ভেবে এক দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে! ডালহাউসী, এরিয়ান্স, কাষ্টমস চলনসই। ব্ল্যাকওয়াচ পর পর ই, বি, আর, এরিয়ান্স ও ডালহাউসীকে হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানের বাসনা রাখে। ই, বি,

খেলছে। নতুন টিম পুলিশ এখন কোন গেমে জয়লাভ করতে পারেনি। কালিঘাট টিমটি বেশ উন্নত ও পুষ্ট হয়েছে। রেঙ্গুনের বিখ্যাত পুগলি এই টিমে খেলছে!

ক্রিকেট

বিলেতে ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়েছে। মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম হলেন টিমের ক্যাপ্তেন। প্রথম ম্যাচটি ফ্রি ম্যানের টিমের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের ক্রীরা সাফল্যে আনন্দিত হবার কথা নয়। তারপর উরচেষ্টায় টিমের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল খেলতে নাবে। এবারও এস্ ব্যানার্জ্জি টিমে স্থান পায়নি। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দলের মোট রান হয় ২২৯। মুস্তাফ ১২, ও পালিয়া ৪২ রান করে। তার পরই অমরনাথের ৯ রানের পর নাইডু ও মার্চ্চেন্ট টীমের সত্যিকার গোড়া পত্তন করেন। রান করেন যথাক্রমে ৪৬ ও ৪৪। এই রানের বিরুদ্ধে উরচেষ্টার রান করেন ২৩৮। হাওয়ার্থ ৫৮, হিউম্যান ৫৪ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিসার ৪ উইকেট

ভারতীয় রান তত সুবিধাজনক নয়। মাত্র ১৫০ রানে সব আউট হয়ে যায়। একমাত্র হোসেন ৫৫ রান করে ভারতীয় মান রাখেন। দ্বিতীয় ইনিংসে উরচেষ্টার ৭ উইকেটে ১৩৪ রানে তিন উইকেটে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। ভারতীয় ফিল্ডিং ও ক্যাপ্টেন ভিজিয়ানাগ্রামের খেলা পরিচালনার দোষে ভারতীয় দল ওদেশের মাটিতে প্রথম পরাজয় স্বীকার করল। অক্সফোর্ড ভার্সিটি বনাম ভারতীয় দলের খেলায় প্রথম ইনিংসে অক্সফোর্ড অতি কষ্টে রান তোলে ২০২। হিণ্ডেলকার উইকেট কিপিং, অমরনাথ ও ব্যানার্জ্জির বোলিংএর বিরুদ্ধে অক্সফোর্ডের মোট রান এত অল্প হয়। ভারতীয় দলে প্রথম ইনিংসে গোড়া পত্তন করে ব্যানার্জ্জি ১১ হিণ্ডেলকার ২২। তারপরই মার্চ্চেন্টও নাইডু দুর্ব্বল বোলিংএর বিরুদ্ধে রানের পর রান তুলতে থাকেন। নাইডুর খেলা অতি প্রশংসনীয় হয়েছিল। মোট রান করেন ৮৩। তারপর ক্যাপ্টেন ভিজিয়ানাগ্রাম ৬০ ও পালির ৬০ রান বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সর্ব্বশুদ্ধ মোট রান হয় ৩৫২। দ্বিতীয় ইনিংসে অক্সফোর্ড পরাজয়ের ভয়ে জীবন পণ করে খেলতে সুরু করল। রান করল ২৯৭। কিমটন ৭৭, মিচেলইন্স ৬৮। ব্যানার্জ্জির বোলিং সত্যিকার প্রশংসার যোগ্য। ৪ উইকেট ৬৫ রানে নেয়। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট ১০৩ রান করে। সময়ের অভাবে অক্সফোর্ড পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে যায়।

ভলি বল

আজকাল কলিকাতার পার্কে মাঠে ভলিবলের খেলার বিশেষ প্রচলন হয়েছে। ভারতের মাটিতে এই আমেরিকান গেমটি প্রথম উপস্থিত করেন Y.M.C.A.। আজ বাস্কেট ও ভলি বল খেলা যুবকদের এত প্রিয় হয়ে উঠেছে তার প্রধান উৎস খুঁজলে Y. M. C. A. কর্ত্তৃপক্ষদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ হয়। কলিকাতায় ভলি বলের গেম বাস্কেটের ন্যায় প্রিয় হয়ে উঠেছে কিন্তু ভবানীপুর Y.M. C.A. যুবকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিয়েছে বিখ্যাত সুরেশ মেমোরিয়াল ভলিবল টুর্ণামেণ্ট আরম্ভ করে।

বিলাতের একটি খেলায় বাঙ্গালার ক্রিকেট খেলোয়াড় এইচ, ব্যানার্জ্জী সজোরে বল মারছেন

এবার ফাইনালে ভবানীপুর Y. M. C.A. পুরোন প্রতিদ্বন্দ্বী বালকসঙ্ঘকে সাক্ষাৎ করে। খেলাটি বেশ প্রতিযোগিতা-মূলক ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বালক সঙ্ঘ ২১-১১, ২১-১৭ গেমে ভবানীপুর দলকে পরাজিত করে। জাষ্টিস ডি, এন মিটার সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং মিসেস জে, সি, মুখার্জ্জি বিজয়ী ও বিজেতা দলকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

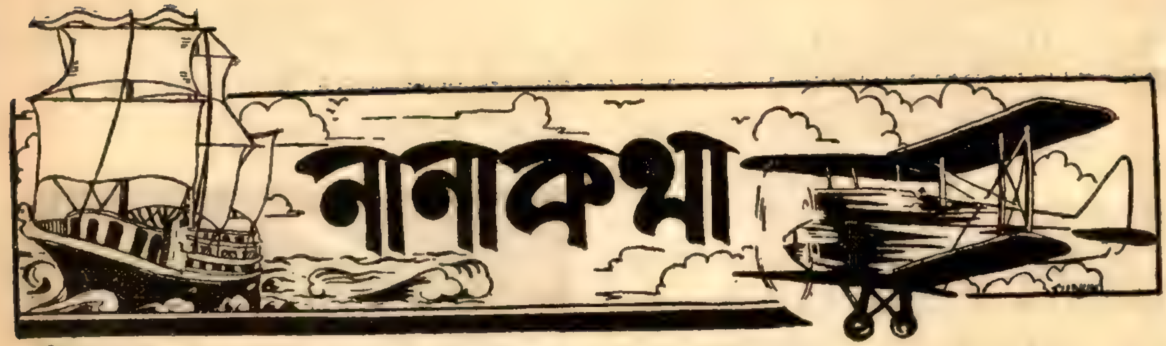

কংগ্রেস

এ বৎসর লক্ষ্ণৌএ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবারকার কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি। গত পঞ্চাশ বৎসরের কংগ্রেসের ইতিহাসের মধ্যে যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে সে প্রদেশের কোন অধিবাসীকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করা হয়নি। এ প্রথাটা বোধকরি শুধু শিষ্টাচারের দিক থেকেই, কোন নিয়মের অবর্ত্তমানে, উদ্ভূত হয়ে থাকবে। প্রদেশবাসী কোন ব্যক্তিকে সভাপতি করলে বিশেষ কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে তা মনে হয় না; কারণ সভাপতি যে প্রদেশেরই অধিবাসী হ'ন না কেন তাঁকে সমস্ত ভারতবর্ষের হয়েই কাজ করতে হয়। তথাপি যে প্রথা নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দীর্ঘকাল আচরিত হয়ে এসেছে বিশেষ কোন কারণ ব্যতিরেকে সে প্রথাকে ভঙ্গ না করলেই ভাল হ'ত। মহাত্মা গান্ধী হয়ত তেমনি কোনো কারণের অনুরোধে পণ্ডিতজীর নির্ব্বাচনে সহায়তা করে থাকবেন।

কংগ্রেসে বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি শুধু যায়নি, তার নিম্নতম অধিকারটুকু থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে বলে মনে হয়। গত বৎসরের কংগ্রেস পরিচালনায় বাঙ্গালীর কোন অংশ ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। এ বৎসরও এক হিসেবে সেইরূপ ব্যবস্থাই হয়েছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার সদস্য মনোনীত করা হয়েছে বটে কিন্তু একথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত ছিল না যে তিনি যখন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্দী অবস্থায় অবস্থান করছেন তখন কংগ্রেসের সভা সমিতিতে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। যতদিন তিনি বন্দী অবস্থায় থাকবেন ততদিনের জন্য তাঁর কোন প্রতিনিধিও মনোনীত করা হয়নি। এ ব্যবস্থা দেখে আমাদের কথা-মালার শৃগাল ও সারস পক্ষীর গল্প মনে পড়ছে। একটী থালার উপর মাংসের ঝোল ঢেলে সারসপক্ষীকে নিমন্ত্রণ করার কোন সার্থকতা আছে কি?

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু যে সর্ব্বতোভাবে সভাপতি হবার উপযুক্ত ব্যক্তি সে বিষয়ে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাঁর নিকট হতে কংগ্রেস পরিচালিত হবার একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ পাবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী—পি, ই, এন ক্লাব

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ষট্সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে বরানগরে শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলানবীশের গৃহে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পি, ই, এন ক্লাব রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত করেন। এই অনুষ্ঠানে কবি স্বয়ং উপস্থিত থেকে ক্লাবের সদস্যগণের ভক্তি-সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করেন। প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ক্লাবের মুখপাত্র স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধিত করেন ও যৎসামান্য ভক্তি অর্ঘ প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাষণ সেদিন বিশেষরূপ উপভোগ্য হয়েছিল। শেষকালে কবি তাঁর সেইদিনে প্রকাশিত নূতন কাব্যবই 'পত্রপুট' হতে দুটি কবিতা পাঠ করে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।

নেত্রকোণায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ষট্সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে নেত্রকোণায় সমারোহের সহিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উৎসব

নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণকারীগণ

১। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায়—সভাপতি ২। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও ৩। শ্রীযুক্ত নিখিল চন্দ্র বর্দ্ধন—যুগ্মসম্পাদক ৪। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মজুমদার, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তি-নিকেতন,—গীত-নায়ক ৫। শ্রীযুক্ত শ্যামাসুন্দরী দেবী—শান্তি-নায়িকা ৬। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সরকার—শান্তিনায়ক।

অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় এম-এ মহাশয় সভাপতির কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন। যে মুদ্রিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আমরা পেয়েছি তা' থেকে বোঝা যায় যে অনুষ্ঠানটি বিচিত্র এবং মনোরম হয়েছিল।

পাঁজিয়ায় গুণ্ডামির নৃসংশতা

যশোহর জিলার পাঁজিয়ায় সারস্বত পরিষদ একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, তাদের নানাবিধ দুর্দ্দশা মোচন, পর্দ্দা প্রথার উচ্ছেদ-সাধন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার উন্নতি-বিধান, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ জাতিভেদের তীব্রতা শিথিল করবার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা, হিন্দুসমাজের ভিতরে বিধবা বিবাহের প্রচলন; জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নির্য্যাতিতা নারীদের উদ্ধারসাধন প্রভৃতি প্রগতি ও জনসেবা-মূলক কার্য্য করে এই প্রতিষ্ঠানটি নূতন উদ্যম ও প্রেরণা এনেছে। যেরূপ শক্তি, ত্যাগ, সাহসের সহিত কর্ম্মীরা এই সকল আন্দোলন পরিচালনা করছেন, বিশেষ করে এঁদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা হিন্দুজনসাধারণকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে তা দেখে প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্ত্তনবিরোধী ব্যক্তিগণ ভীত হ'য়ে এঁদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়েছেন।

গত শীতকালে সারস্বত পরিষদের সমৃদ্ধ পাঠাগারটির সহিত তার বাংলা ঘরখানি কাহারা গভীর রাত্রে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করেছিল, এ সংবাদ বিচিত্রার পাঠকেরা জানেন। সারস্বত পরিষদের অনেক কর্ম্মী আততায়ীর হস্তে লাঞ্ছিত ও সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হয়েছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত

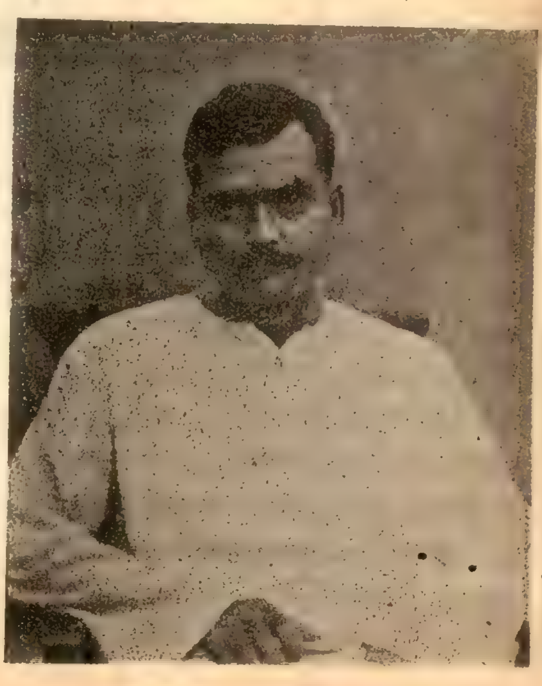

গুণ্ডাকর্ত্তৃক নিপীড়িত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু

সুশীলকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নিখিলকৃষ্ণ মিত্র ও অপর কয়েকজন কর্ম্মীর উপর গত ২৭শে এপ্রিল গভীর রাত্রে যে কাপুরুষোচিত আক্রমণ হয়েছে তা একান্ত বর্ব্বরোচিত। মৃতের সৎকার করে গভীর রাত্রে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে এঁরা যখন গৃহে ফিরছিলেন সেই সময় পিছন হ'তে কয়েকজন গুণ্ডা এঁদের আক্রমণ করে এবং সুশীলবাবু ও নিখিল বাবুকে এরূপ গুরুতরভাবে আহত করে যে উভয়কে চিকিৎসার জন্য যশোহরে এবং পরে শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র মিত্রকে কলিকাতায় পাঠাতে হয়। নিখিল বাবুর একটি আঙ্গুল প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। সুশীল বাবুর বাম ললাটের উপর একটি গভীর ক্ষত তাঁর ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রহারের পর সুশীলবাবুর সমস্ত শরীর কাল কাল দাগে ভরে যায় ও ফুলে ওঠে।

এই সুশীল বাবুই যে বিচিত্রার 'দেশের কথা' বিভাগের নিয়মিত লেখা শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু একথা সম্ভবত অনেকেই জানেন। এই শারীরিক গ্লানি এবং যন্ত্রণার মধ্যেও সুশীল বাবু যে এ মাসের 'দেশের কথা' লিখে পাঠিয়েছেন তদ্দ্বারা তাঁর ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে এবং সেজন্য আমরা তাঁর কাছে সত্যই কৃতজ্ঞ। যশোহরের অন্যতম জননায়ক ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ক্যাপ্টেন জীবনমোহন ধরের সুচিকিৎসায় ও যত্নে সুশীল বাবু ও নিখিল বাবু অপেক্ষাকৃত অল্পদিনেই সুস্থ হয়েছেন।

এই ঘটনা হ'তে যে মামলাটি প্রসূত হয়েছে তা এখন বিচরাধীন; সুতরাং নিঃসংশয়ে কোন কথা বলা চলেনা। কিন্তু [illegible] প্রকাশ ও যাহা নিপীড়িত ব্যক্তিগণ

সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন তা যদি অসত্য না হয় তাহলে বলি, হে সংস্কারপাপজর্জ্জরিত ভারতবর্ষ, তোমার নির্ম্মম, নৃশংস সন্তানগণের মানুষ হ'তে আর কত দীর্ঘকাল বিলম্ব আছে!

পূর্ণিমা সম্মেলনে দ্বাদশ অধিবেশনে গৃহীত আলোক-চিত্র—

উপরের পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট (বাম হ'তে দক্ষিণে)—(১) শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী বি, এ, (সদস্য); (২) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরনাথ তর্কতীর্থ; (৩) বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (দ্বাদশ অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি); (৪) শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সংখ্যতীর্থ (স্থায়ী সভাপতি); (৫) শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র গোস্বামী (সদস্য)।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট (বাম হ'তে দক্ষিণে)—(১) শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গোস্বামী (অস্থায়ী সম্পাদক); (২) শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গোস্বামী (সহঃ সভাপতি)।

তৃতীয় পঙ্‌ক্তি (বাম হ'তে দক্ষিণে)—(১) শ্রীযুক্ত শিবব্রত গোস্বামী (সদস্য); শ্রীযুক্ত কমলেশ সান্যাল (সদস্য)।

চতুর্থ পঙক্তি (বাম হ'তে দক্ষিণে)—(১) শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ তর্কতীর্থ (সদস্য); (২) শ্রীযুক্ত অনীলকুমার গোস্বামী (সদস্য)।

নবদ্বীপ সাহিত্য সভা

গত ২৩ শে বৈশাখ ১৩৪৩ উক্ত সভার পূর্ণিমা সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভা পরিচালনার জন্য সভাপতিত্বের ভার অর্পিত হয়েছিল বিচিত্রা-সম্পাদকের উপর। সভার পূর্ব্ব ইতিহাসের বিবরণী শ্রবণ ক'রে এবং দ্বাদশ অধিবেশনে অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী দর্শন ক'রে আমরা

বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছিলাম। এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে সম্মেলন তার নাতিদীর্ঘ আয়ুষ্কালের মধ্যে সাহিত্য সাধনার একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হয়েচে। নবদ্বীপ শুধু বাঙলা দেশের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল নয়, বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে সেখানে একটি সুষ্ঠু সাহিত্যের ধারা সুদীর্ঘ কাল হ'তে বহমান আছে। সেখানকার মানসিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সাধনা এবং সাহিত্য সৃষ্টির পথে অনুকূল এবং সম্ভাবনাবিশিষ্ট ব'লে আমরা মনে করি। সুতরাং এ কথা আশা করা বোধ করি অসমীচীন নয় যে, যথোচিত যত্ন, উদ্যম এবং নিষ্ঠার অভাব না হ'লে নবদ্বীপ তার এই পূর্ণিমা-সাহিত্য-সভার মধ্য দিয়ে বাঙলা দেশকে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীর সাহিত্য উপাহার দিতে সমর্থ হবে।

সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি সুসাহিত্যিক এবং সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সাহিত্যানুরাগ এবং পরিচালনা শক্তি, এবং সহকারী সভাপতি সুকবি শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের কর্ম্মনিষ্ঠা দেখে মনে হয় সম্মেলনের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

সম্মেলনের সদস্য এবং নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে আমরা যে অপরিমিত যত্ন মনোযোগ এবং আতিথ্য লাভ করে এসেছি এখানে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে অপরাধ হবে।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

গত ১০ই এপ্রিল সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়ক্রম ৬৩ বৎসর হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের পুত্র ছিলেন। আইন পাশ করার পর তিনি আলিপুর ক্রিমিন্যাল কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন ও সে বিষয়ে বিশেষ সফলতা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর থেকেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এ-বিষয়ে তিনি স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতাবলম্বী ছিলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীত্ব কালে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় কলিকাতার কর্পোরেশনের বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। কিছুকালের জন্য তিনি লণ্ডনে ভারত সচীবের পরামর্শ পরিষদে অন্যতম সদস্য ছিলেন, কিন্তু সেখানে ভারতীয় সদস্যদের দেশের প্রকৃত উপকার সাধন করবার কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই দে'খে নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার পূর্ব্বেই ঐ পদ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি আর প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্য্যে যোগদান করেনি। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি স্বীয় গ্রাম সিঙ্গুরের উন্নতিবিধানে যত্নবান হন। গ্রাম হ'তে ম্যালেরিয়া নাশ করা, পিতার নামে একটি হাসপাতাল ও মাতার নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক মতে মডার্ণ দলভুক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজন স্থলে কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে পশ্চাৎপদ হতেন না। একবার তিনি লর্ড রেডিংএর সম্মানে ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে টেবিলে আসন গ্রহণ করেছিলেন। এমন সময় সেখানে সংবাদ পৌছল যে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও আরও কয়েকজন মহিলা পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছেন। গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি তৎক্ষণাৎ ভোজন-টেবিল পরিত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সুরেন্দ্রনাথ অমায়িক, উদার, দানশীল ছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির তিনি বহুকাল স্থায়ী সভাপতি ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলা দেশ তার একজন সুসন্তান হারিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা তাঁর দেহবিমুক্ত আত্মার শান্তি কামনা করি।

বাঙ্গালী ভূপর্য্যটক

গত ১৯৩৩ সালে ঢাকা জিলার অন্তর্গত আড়িয়াল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসামের তিনসুকিয়া হ'তে একাকী পদব্রজে ভূপর্য্যটনে নির্গত হন। সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারত ভ্রমণ করে আকিয়াব বেসিন পাহাড়ের পথে রেঙ্গুনে উপনীত হন। রেঙ্গুন হতে সাইকেল যোগে ব্রহ্মদেশ, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বর্ণিও, সেলিবিস্, বলি, জাভা, সুমাত্রা, মালয় ষ্টেটস্

ও ষ্টেটস্ সেটলমেণ্ট অতিক্রম করে গত ৭ই মার্চ্চ মাদ্রাজে পৌছেন। তাঁর ভ্রমণ কালের মধ্যে দেশে বিদেশে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এগার বার ডাকাতের হস্তে নিঃস্ব হন এবং অরণ্যের মধ্যে বন্যজন্তু কর্ত্তৃক কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছিলেন। পিকিং হতে বহির্মঙ্গোলীয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার সময় কালসানের নিকট তিনি একবার চীনা সাম্যবাদী সৈন্যগণ

ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক ধৃত ও ভীষণভাবে নিপীড়িত হ'ন। বিদেশে ভ্রমণকালে চীন ও জাপানে তিনি পররাষ্ট্র-সচীবগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হ'য়েছিলেন। ভারতবর্ষেও তিনি পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মহাত্মাজী বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ, পণ্ডিত মালবীয় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তাঁর সফলতা কামনা করে তাঁকে পত্র লিখেছেন। মাদ্রাজে অবস্থান কালে ক্ষিতীশচন্দ্র ইংরাজীতে একখানি ভ্রমণ কাহিনী বই রচিত করেন। তথায় মুদ্রণের অসুবিধা হেতু তিনি কলিকাতায় এসেছেন। উক্ত বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর আগামী ১লা জুলাই তিনি সাইকেল যোগে কলিকাতা হতে বম্বে রওয়ানা হবেন, এবং সেখান থেকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জাহাজ যোগে আফ্রিকা যাত্রা করবেন। এতাবৎ তিনি পদব্রজে দশ হাজার মাইল, সাইকেলে তের হাজার মাইল এবং জাহাজে সাত হাজার মাইল ভ্রমণ করেছেন।

আমরা তাঁর ভূপর্য্যটন ব্রতে সফলতা কামনা করি।

লণ্ডনে বিষ্ণু-মন্দির

লণ্ডনে একটি হিন্দু বিষ্ণু-মন্দির স্থাপন করবার জন্য যে ব্যয় হবে তার সমস্ত ভার গ্রহণ করবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর গৌড়ীয় মিশনের স্বামী বন-এর (Swami Bon) নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছেন। মন্দির নির্ম্মিত হলে তন্মধ্যে যথাবিধি হিন্দুধর্ম্ম মতে ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্থাপিত হবে। এ বিষয়ে ইংলণ্ড বাসীগণের সহানুভূতি লাভের জন্য বিগত শীত ঋতুতে স্বামী বন লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন এবং সুখের বিষয় যে তিনি ব্রিটিস চার্চ্চ, অভিজাত সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের পেন্সন প্রাপ্ত সিভিল ও মিলিটারী কর্ম্মচারীগণ এবং ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিৎ ও সাংবাদিকগণের এ বিষয়ে প্রভূত সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

এই সঙ্কল্পর উদ্যোক্তাগণের মনে একটু সংশয় ছিল যে পৌত্তলিকতার বিরোধী ব্রিটিশ চার্চ্চ লণ্ডনের মধ্যস্থলে বিষ্ণু-মন্দির স্থাপনে হয়ত সম্মত হবেন না। কিন্তু সুখের বিষয়, অসম্মতি ত' দূরের কথা এই প্রস্তাবনাকে তাঁরা সানন্দে অভিনন্দিত করেছেন। গত ১৯শে মের অমৃত-বাজার পত্রিকা হ'তে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করলে এ বিষয়ে ব্রিটিশ চার্চ্চের মনোভাব সম্পূর্ণ বোঝা যাবে। * * * His Grace the Archbishop of Canterbury

has expressed in writing his "interest in the proposal to build a Hindu temple in London," and he desires to do anything in his power to draw his country and India closer together. His Grace the Archbishop of York is ready to give his name as a sympathiser with the project of Swami Bon. The Right Reverend the Lord Bishop of London has expressed in writing his interest in the building of a Hindu temple in London * * *

পরধর্ম্ম বিষয়ে এই নির্ব্বিকল্প সহনশীলতা এবং উদারতা দুর্লভ বস্তু, সেই জন্য সত্যই আদরণীয় এবং শ্রদ্ধার্হ। এর দ্বারা ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজকগণ নিজ ধর্ম্মের প্রতি কোনো রূপ গর্হিত আচরণ ত করেননি, পক্ষান্তরে এই কথাই সপ্রমাণ করেছেন, যে তাঁদের মনোবৃত্তি আধ্যাত্মিকতার অতি উচ্চ স্তরে অবস্থান করছে যেটা তাঁদের মতো শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজকগণের নিকট হতেই প্রত্যাশা করা যায়।

বিখ্যাত সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত রাজারাম সাহু

সন্তরণ-ব্যায়ামের যাঁরা সংবাদ রাখেন তাঁদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ সাঁতারু শ্রীযুক্ত রাজারাম সাহুর নাম সুপরিচিত। ১৯৩৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বেঙ্গল অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে ইনি বাঙ্গলার প্রতিনিধির স্থান অধিকার করেন। পাতিয়ালা নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতাতেও ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। পশ্চিম এশিয়াতে যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতেও এঁর স্থান প্রথম হয়েছিল। সেখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনে ফ্রী-ষ্টাইল সাঁতারে ১মিঃ ৮$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ডে ইনি ১০০ মিটার অতিক্রম করেন। ১৯৩৫ সালে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনে ঐ ১০০ মিটার ইনি ১মিঃ ৮$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। নিখিল ভারত অলিম্পিক ট্রায়েলে ফ্রি-ষ্টাইল সাঁতারে ইনি ১মিঃ ৭$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ডে এবং চিৎ সাঁতারে ১মিঃ ২৬ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার অতিক্রম করেন। ইনি শীঘ্রই বার্লিণ অলিম্পিক-এ যোগদান করবেন সে সম্ভাবনা আছে।

সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত রাজারাম সাহু

ডাক্তার আন্সারী

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এবং দেশনেতা ডাক্তার আন্সারী গত ৯ই মে পরলোক গমন করেছেন। চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি মুসৌরী গিয়েছিলেন, দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রেলগাড়ীতে তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। একজন পরিচারক ভিন্ন সঙ্গে আর কেহও ছিল না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৬ বৎসর হয়েছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ডাক্তার আন্সারী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে চিকিৎসা

শাস্ত্রে উপাধি লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের পর চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ ক'রে অনতি-বিলম্বে একজন সুচিকিৎসক বলে তাঁর খ্যাতি প্রচারিত হয়। এই সময় হতেই দেশসেবা ব্রতে তিনি দীক্ষিত হন, এবং ক্রমশঃ ১৯১৭ সালে ভারতবর্ষে হোমরুল আন্দোলন উপস্থিত হ'লে তিনি তাতে বিশেষভাবে যোগ দেন। দেশের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী যোগ ছিল। কংগ্রেসের তিনি একজন বিশিষ্ট নেতা এবং কর্ম্মী ছিলেন, এবং ১৯২৭ সালে তিনি মান্দ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তৎপর বৎসর ১৯২৮ সালে কলিকাতায় সর্ব্বদল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মুস্লীম লীগ এবং খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এবং ১৯২০ সালে মুস্লীম লীগের এবং ১৯২২ সালে খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের তিনি সভাপতিত্ব করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে বার দুই কারাবরণ করতে হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য গত বৎসর তিনি রাজনৈতিক জীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন।

ডাক্তার আন্সারীর রাষ্ট্রনীতিক মতে সাম্প্রদায়িকতার [illegible] ছিল না ব'লে তিনি যুগপৎ হিন্দু এবং মুস্লীম সম্প্রদায়ের নেতা এবং শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি উদার হৃদয় এবং দাতা ছিলেন, এবং তাঁর দানের ধারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রবাহিত হ'ত। রোগী এবং ছাত্রদের প্রতি তাঁর বদান্যতা অসাধারণ ছিল। দরিদ্র রোগীদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা ত' করতেনই, তেমন প্রয়োজন হলে নিজ ব্যয়ে ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থাও করতেন।

ডাক্তার আন্সারীর মতো একজন উদারহৃদয় নেতা এবং কর্ম্মীকে হারিয়ে ভারতবর্ষ যে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ওয়াজিদ আলী খাঁ পনি

মৈমনসিংহ জেলার করাটিয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার এবং জননেতা ওয়াজিদ আলি খা পনি সাহেব গত ২৭ শে এপ্রিল ১৯৩৬ পরলোকগমন করেছেন। সাধারণের নিকট ইনি 'আটিয়ার চাঁদ' অথবা 'চাঁদ মিঞা সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন।

ইনি একজন প্রভূত ধনশালী জমিদার ছিলেন এবং প্রজা-বর্গের কল্যাণ বিধানের জন্য স্বগ্রামে একটি মাদ্রাসা, একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত ক'রে গেছেন। এই সকল ব্যাপারে তাঁর তিন লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করতে হয়েছিল।

শুধু শিক্ষা বিস্তার ব্যাপারেই নয়, রাজনীতি ক্ষেত্রেও চাঁদ মিঞা সাহেবের কৃতিত্ব অল্প ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি প্রবলভাবে যোগ দিয়েছিলেন, ফলে তাঁকে কারাগৃহ বাস করতে হয়েছিল।

চাঁদ মিঞা সাহেব তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ওয়াকফ্‌ করে জনহিতকর কার্য্যে দান ক'রে গেছেন।

চাঁদমিঞা সাহেবকে আদর্শ জমিদার ব'লে অভিহিত করা যায়, এবং বাঙলার অন্যান্য জমিদারগণ যদি তাঁর সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তা হ'লে প্রজাদের দুঃখ দূরীভূত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চাঁদ মিঞার মৃত্যুতে বাঙলা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Saratchandra Mukherjee from 27-1, Fariapooker St. Calcutta.

বিচিত্রা মালবিকা শ্রীচিন্তামণি কর

আষাঢ় ১৩৪৩

বিচিত্রা

নবম বর্ষ, ২য় খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৪৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শেষ পহরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভালোবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্যই সেই দান;
উপেক্ষারই ডাকনাম সে।
পথের পথিকও পারে তা দিয়ে যেতে
পথের ভিখারীকে
শেষে ভু'লে যায় বাঁক পেরতেই।
তার বেশি আশা করিনি সেদিন।

চলে গেলে তুমি রাতের শেষ পহরে,
মনে ছিল বিদায় নিয়ে যাবে
শুধু ব'লে যাবে—"তবে আসি।"
যে কথা আর একদিন ব'লেছিলে
যা আর কোনোদিন শুনব না
তার জায়গায় ঐ দুটি কথা।
দয়াও নয়, শুধু সৌজন্য।
ঐটুকু প্রশ্রয়ের ক্ষীণসূত্রে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার?

প্রথম ঘুম যেমনি ভেঙেছে
বুক উঠেছে কেঁপে,
ভয় হয়েছে সময় বুঝি গেল পেরিয়ে।
ছুটে এলেম বিছানা ছেড়ে।
দূরে গির্জ্জের ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।
রৈলেম ব'সে আমার ঘরের চৌকাঠে
দরজায় মাথা রেখে,—
তোমার বেরিয়ে-যাবার বারান্দার সামনে।
অতি সামান্য একটুখানি সুযোগ
অভাগীর ভাগ্য তার থেকেও করলে আমায় বঞ্চিত,—
পড়লেম ঘুমিয়ে
তুমি যাবার কিছু আগেই।

আড়চোখে বুঝি দেখলে চেয়ে
মাটিতে এলিয়ে-পড়া দেহটা।
ডাঙায়-তোলা ভাঙা নৌকাটা যেন।
বুঝি সাবধানেই গেছ চলে
ঘুম ভাঙে পাছে।

চম্‌কে জেগে উঠেই বুঝেছি,
বৃথা হয়েছে জাগা।
বুঝেছি, যা পাবার তা গেছে এক নিমেষেই,
যা প'ড়ে থাকবার তাই রইল প'ড়ে,
যুগযুগান্তর।

নিস্তব্ধ চারিদিক
যেমন নিস্তব্ধ পাখীহারা নীড়
গানহারা গাছের ডালে।
কৃষ্ণ-সপ্তমীর করুণ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে
ভোর বেলাকার আপাণ্ডুর আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে আমার পাংশুবর্ণ
শূন্য জীবনে।

গেলেম তোমার শোবার ঘরের দিকে
অকারণে।
দরজার বাইরে জ্বলছে ক্ষীণশিখায়
হারিকেন লণ্ঠন,
ছেড়ে-আসা বিছানায় খোলা মশারি
কাঁপছে মৃদু বাতাসে।
জানলার বাইরের আকাশে
দেখা যায় শুকতারা।
হঠাৎ দেখি ফেলে গেছ ভুলে
তোমার সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠি গাছটা।
মনে হোলো, যদি সময় থাকে
তবে হয়তো ষ্টেশন থেকে ফিরে আসবে
খোঁজ করতে,
কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে বিদায় নেওয়া হয়নি ব'লে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বরানগর
১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১

কাব্যের প্রাণ * ধ্বনি—এবং প্রতিধ্বনি। পাশ্চাত্যে একেই বলা হয় suggestiveness, ব্যঞ্জনা—কিংবা আধুনিক সমালোচক একজন যেমন নাম করেছেন, obliquity, তির্য্যকভাব বা বক্রোক্তি। অন্য কথায়, বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে তখন যখন বাক্যটি তার আক্ষরিক অর্থের মধ্যে শেষ না হয়ে আরও বেশী কিছুর প্রতি নির্দ্দেশ করে; আর এই অনুক্ত বেশি-কিছুর মাত্রা যত অধিক হয় কাব্যটিও তত কবিত্বময়, কাব্য হিসাবে মহীয়ান হয়ে ওঠে। আধুনিক কাব্য ও শিল্পের একটি ধারার বিশেষত্বই হল এই যে আর সব অঙ্গকে—ছন্দকে বিষয়বস্তুকে—একরকম অবহেলা বা অগ্রাহ্য করে সে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে—অবশ্য এক নিজস্ব ভঙ্গীতে—কেবলই নির্জ্জলা এই বেশি-কিছুটি, এই ধ্বনিটি।

আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলেন যে কথার আছে তিনরকমের অর্থ—প্রথম, তার সাধারণ চলিত স্পষ্ট বা মুখ্য অর্থ, এর নাম অভিধা; দ্বিতীয়, একটা গৌণ, কখন কখন বলা হয় বক্র, অর্থ—এর নাম লক্ষণা, ইংরাজিতে যাকে বলে figurative sense; তৃতীয়ত এ দুটি ছাড়াও, এ দুটির অতিরিক্ত-কিছু বুঝাতে পারে, তার নাম ব্যঞ্জনা—আর একেই বলে ধ্বনি। তুলনা দিয়ে আরো বলা হয় যে একটা শব্দ হলে, শব্দটি যে স্থান হতে উঠে, ঠিক সেইস্থানে—তার সবচেয়ে বেশি স্থূলরূপ—শব্দের ঢেউ যতই সেই নাভী-স্থান হতে দূরে চলে যায় ততই তা সূক্ষ্মতর হতে থাকে—এই অতিদূরের রেশ বা প্রতিধ্বনির মতনই হল কাব্যের ধ্বন্যাত্মক অর্থ।

কাব্যসৃষ্টির আদি, আদিম ও প্রাথমিক রূপ হল শুধু বিবৃতি—কাব্যবস্তুর যথাযথ কথন—স্পষ্ট অর্থের ঋজু, পূর্ণ ও নিঃশেষ প্রকাশ। কাব্য তখন পদ্য মাত্র অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বা মিত্রাক্ষর গদ্য—এখানে প্রথম অর্থটি, অধিক পক্ষে দ্বিতীয় অর্থটি ধরেই বাক্যের সকল বক্তব্য ফুরিয়ে যায়, আর কোন অর্থ বা ভাবের প্রয়োজন হয় না—আর কোন অর্থের বা ভাবের উদ্রেকও সে করে না। কিন্তু পদ্য কাব্য হয়ে ওঠে সেই শিল্পীর হাতে যিনি তাঁর বাক্যে এনে দেন তৃতীয় পর্য্যায়ের অর্থ—ধ্বনির অনুরণন, ভাবের তির্য্যকগতি, অনুক্তের অনুরঞ্জন। গ্রীক সাহিত্যে হেসিয়ড'এর পরে হোমর, ইংরাজীতে গাওয়ার (Gower)এর পরে চসার এই রূপান্তরের ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিলেন। বাংলায় চণ্ডীদাসের হাতে এইরকম একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছিল মনে হয়।

অর্থের তৃতীয় পদ—ধ্বনি, তির্য্যকভাব, "বেশি-কিছু" বলতে ঠিক কি বুঝায়? শুনুন তবে প্রথমে স্কটের বিখ্যাত লাইন কটি—

Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land—

এটিকে নির্জ্জলা বিবৃতি বললে দোষ হবে না। এখানে অনুক্তের কোন রেশ নাই, কোন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় না। যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি হয়ত বেশ জোরের সাথে প্রকাশ করা হয়েছে, পাঠকের প্রাণে তাতে উৎসাহ উদ্দীপনাও এনে দিতে পারে, কিন্তু যেমন ভাবে বলা হয়েছে তার মধ্যে বলার সমস্ত বিষয় শেষ হয়ে গিয়েছে—অতিরিক্ত, অধিকন্তু কিছুর ইঙ্গিত নাই—সব স্পষ্ট খোলাখুলি। শুনুন এর পরে কবি গ্রে'র

The curfew tolls the knell of parting day.

একটা ভিন্ন, নূতন সুর, এখানে বোধ হয় না কি? একটা

* ধ্বনিকে আমি বললাম প্রাণ, আত্মাকে বলিব রস—এই পার্থক্যটির ব্যাখ্যা ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে এ পার্থক্য স্মরণ না রাখলেও চলে।

ঝঙ্কার ফুটে উঠেছে তা যেন ব্যক্ত অর্থকে ছাপিয়ে গিয়েছে, বাক্যটি শেষ হলেও যার রেশ শেষ হয় নাই? আইযাম্বের (Iamb) অভঙ্গ সমতান আর ল'এর ও ব'যের পুনঃপৌন্য-জনিত ঘন বোল একটা কি অভিনবত্ব এনে দিয়েছে বাচ্যার্থের মধ্যে। তবুও কিন্তু এখানে ঠিক তির্য্যকভাবের নিজস্ব ভূমিতে আমরা উঠি নাই—এখনও রয়েছি লক্ষণারই যদিও একটা গাঢ়তর উচ্চতর পদে। আরও একটু চলুন আগে—শুনুন ওয়ার্ডসওয়ার্থের

Will no one tell me what she sings—

এখানে বোধ হয় নাকি হাওয়ায় ভেসে কোন উর্দ্ধলোকে চলে গিয়েছি? বাক্যটি অবলম্বন মাত্র অর্থের দিকেও মন আকৃষ্ট হয় না—যে সুর এখানে তরঙ্গিত মনে হয় দূরে বহু দূরে চক্রবাল অতিক্রম করে সে গিয়ে পড়েছে—

Breaking the silence of the seas
Among the farthest Hebrides

কিম্বা শুনুন সেক্সপীয়রের

Cradled in the rude imperious surge—

এখানে যে কেবল উত্তাল সাগরের দোলটি ধ্বনিত হয়েছে তা নয়, তারও ওপারে কি একটা অনন্ত অসীমতার স্পর্শ আমাদের দেহে রোমাঞ্চ তুলে দেয়।

আমাদের বাংলায় এই তিনটি পর্য্যায়ের সাথে আমরা পরিচিত হতে পারি। প্রথমে শুনুন কাশীরামের *

ভীম দুর্য্যোধন করে মহারণ
দেখে সবে কুতূহলে

কিম্বা হেমচন্দ্রের *

---

* কাশীরাম বা হেমচন্দ্র এর চেয়ে উচ্চস্তরের পদ যে লেখেন নাই, তা আমি বলতে চাই না। কাশীরামের

তোমার শরীর দেখি, নিমিষ না ধরে আঁখি
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে

বাক্যের প্রায় দ্বিতীয় অর্থাৎ লক্ষণা গত অর্থ ধরেছে। হেমচন্দ্রের

পড়ে থাকে দূরগত
জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত
ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে

লক্ষণাকেও প্রায় ছাড়িয়ে গেছে।

আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী

এখানে উক্তির উপরে অধিকন্তু কিছু নাই—সুদূর প্রসারিত রেশের টান নাই। দাঁড়ির সাথে সাথেই সবই থেমে শেষ হয়ে যায়। পরের ধাপ, ভারতচন্দ্রের

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

অথবা আরও স্পষ্টভাবে মধুসূদনের

জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে—

এখানে অধিকন্তুর আভাস পাই—কিন্তু এখানেও আভাস মাত্র। সে আভাস সে অধিকন্তু কথ্যকে, ব্যক্ত অর্থকে ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে পারে নাই—শব্দার্থের সাথেই জড়িত আসক্ত হয়ে আছে। শব্দকে অর্থকে বহু পিছনে ফেলে আমরা চলে যাই, ধ্বনির নিজের রাজ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হই যখন শুনি রবীন্দ্রনাথের

গগনে গরজে মেঘ ঘনবরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

কিংবা,

পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ—

* * *

২

ধ্বনি, তির্য্যকভাব, অধিকন্তু-কিছু দুটি উপায়ে লাভ করা যেতে পারে—প্রথমত, ছন্দের সহায়ে, শব্দের ঝঙ্কার মূর্চ্ছনা হিল্লোল দিয়ে। বক্তব্য, কথ্যবস্তু অভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ছন্দের ছাঁচে পড়ে একটি হয়ে ওঠে কাব্য, তার অভাবে আর একটি থেকে যায় বাক্য। প্রাচীনতর যুগে যখন কাব্যের বিষয়টি বেশির ভাগ ছিল বস্তুতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, নিরেট, তার মধ্যে তারল্য, ধ্বনির পরিপ্লাবন, অধিকন্তু—কিছু যা তাকে আনা হত প্রধানত ছন্দের সহায়ে। এই জন্য তখন কাব্যরচনায় অলঙ্কারের (পাশ্চাত্যে, rhetoric-এর) এতখানি মর্য্যাদা ও প্রাধান্য ছিল; এবং তাই এক সম্প্রদায়ের

আলঙ্কারিক বলতেন যে, রীতি অর্থাৎ বিশিষ্ট পদ রচনাই কাব্যের আত্মা। ধ্বনির দ্বিতীয় বাহনটি হল অর্থ—ধ্বনিবাদীরা অবশ্য ধ্বনির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অর্থের ধ্বনির কথাই বলেছেন, কিন্তু বস্তুত অর্থের ব্যঞ্জনা তখন যে রকমে দেখান হত বা ছিল অনেকখানি সীমাবদ্ধ। বিরুদ্ধবাদীরা তাই সহজেই বলতে পেরেছেন অর্থ ছাড়া পদের মধ্যে ধ্বনি বলে অপরূপ অলৌকিক কিছু নাই—যাকে ধ্বনি নাম দেওয়া হয় সেটিও অর্থই—গৌণ অর্থ, উহ্য অর্থ—অনুমান মাত্র।

ছন্দের ব্যঞ্জনা সামর্থ্যে একটা ক্রম আছে—তা চলেছে স্থূল হ'তে সূক্ষ্মতরের, অনির্দ্দেশ্যের অনির্ব্বচনীয়ের দিকে। এখানেও মোটামুটি তিনটি ক্রম নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথমে হল একান্ত স্থূল, অতিস্পষ্ট রূপ—যার নাম অনুকার—যেমন জয়দেবের

চরণরণিতমণি নূপুরয়া

কিংবা

কোকিলকলরবকূজিতয়া

অথবা ভারতচন্দ্রের

ছলস্থল টলটল কলকল তরঙ্গা

দ্বিতীয় স্তরে এই একান্ত বাহ্য রোল বা ঝঙ্কারকে সংযত স্তিমিত করে, দেওয়া হয় একটা অন্তর্মুখী মূর্চ্ছনা ব সূক্ষ্মতর রোল—যেমন কালিদাসের—

চচাল বালা স্তন ভিন্ন বল্কলা

কিংবা

বৈদেহী পশ্যামলয়াৎ বিভক্তং
মৎ সেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্—

অথবা, রবীন্দ্রনাথের

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার

কিংবা

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা

তবে এখানেও বক্ষ্যমান বস্তুর স্থূল অঙ্গভঙ্গি, বাহ্যগতি-ধারারই অনুরূপ দোল বা রোল—প্রতিচ্ছায়া, প্রতিধ্বনি—ছন্দের তরঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখনও আমরা অনুকারের রাজ্যে রয়েছি, তবে উঠেছি তার সূক্ষ্মতর পর্দ্দায়।

এই সকলের উপরে বা গভীরে ছন্দের যে সূক্ষ্মতম পদ যেখানে বস্তুর দেহগত গতির দিকে সে ততখানি দৃষ্টি দেয় নাই—সে চেয়েছে অন্তরাত্মার চলনের কিছু আভাস দিতে—শব্দের মূর্চ্ছনার দূরতম প্রতিধ্বনি, তন্মাত্রিক রেশ দিয়ে সে ছন্দের লীলায়িত ধারা রচিত হয়েছে। কেবল স্থূল শ্রবণের গ্রহণযোগ্য করে তার ঢেউ ধ্বনিত করা হয় নাই, তার ঢেউ পেয়েছে সেই দৈর্ঘ্য সেই উচ্চতা যাতে সে স্পর্শ করতে পারে একটা আন্তর শ্রুতি। এই যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের

For old, unhappy, far off things,
And battles long ago—

কিংবা

Or hear old Triton blow his wreathed horn

অথবা কীট্‌সের

—Magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn—

স্বরের দিক দিয়ে সেই একই অনির্ব্বচনীয়তা, একটা সূক্ষ্মতর মূর্চ্ছনার আমেজ দিয়েছে আমাদের রবীন্দ্রনাথেরই পূর্ব্বোদ্ধৃত পদটি—

পুরাতন দীর্ঘপথ• পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ—

ছন্দের এই যে তিনটি ধ্বনিক্রম চিত্রশিল্পের ভাষায় বলতে পারি তাদের প্রথমটি হল যেন ফটোগ্রাফ—আলোকচিত্র; দ্বিতীয়টির সাথে তুলনা করতে পারি পাশ্চাত্যের ক্লাসিকাল শিল্প; আর তৃতীয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচ্যের শিল্প। প্রথমটি প্রত্যক্ষপ্রতিষ্ঠ, দ্বিতীয়টি কল্পনা-প্রতিষ্ঠ, তৃতীয়টি ধ্যানপ্রতিষ্ঠ।

অর্থের দিক দিয়েও তির্য্যকভাবের বা ধ্বনির অনুরূপ একটি ক্রম নির্দ্দেশ করা যেতে পারে তবে ছন্দের যে তৃতীয় পদের কথা বললাম তার মধ্যে আমরা দেখতে পারি শুধু ছন্দের নয় তার সাথে অর্থেরও তির্য্যকভাব। ফলত সুর ও অর্থ এই উভয়ের "ধ্বনি" মিলে এই স্তরের কাব্যকে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অপরূপত্ব দিয়েছে। তবুও, ছন্দ ছাড়াও কেবল অর্থের দিক দিয়ে তির্য্যকভাবের একটা বিবর্তন বা ক্রমধারা, কথাটা অন্তত বুঝাবার জন্য, আমরা দেখাতে চেষ্টা করব।

প্রথম স্তর রূপক (allegory)। উপমা, উৎপ্রেক্ষা—বাস্তবিকের স্থানে তাত্ত্বিক, প্রাকৃতের স্থানে অপ্রাকৃত, জড়ের স্থানে সজীব প্রভৃতি কলাকৌশলের দ্বারা বক্তব্যবস্তুর স্পষ্টতা রূঢ়তাকে আড়াল করে দেওয়া হয়। এই যেমন স্পেনসারের

Full many mischeafs follow cruel Wrath
Abhorred Bloodshed and tumultuous Strife,
Unmanly Murder and unthrifty Scath—

এখানে ভাব ও ভাবের আচ্ছাদন যে রূপ, এরা দুটি গাঢ় সংযুক্ত নয়; রূপটি ভাবের গায়ে যেন শিথিল বা আলগা হয়ে আছে, তাকে খুলে ফেলা কঠিন নয়। কিন্তু এমনও হতে পারে ভাব ও রূপ, অর্থ ও অর্থের মূর্ত্তি বা চিত্র এমন দৃঢ়বদ্ধ ওতপ্রোত মিশ্রিত যে দুটিতে পৃথক করা যায়না—দুটি একই অনুভূতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ, এদিক আর ওদিক। তখনই উঠি দ্বিতীয় স্তরে—উদাহরণ স্পেনসরেরই

As faire Aurora in her purple pall
Out of the east the dawning call—

একে allegory বা রূপক বলা চলে না—এ হল symbolism প্রতীক। এই প্রতীকেরও উচ্চতর স্তর আছে—আর তাই অর্থধ্বনির তৃতীয় বা পরম পদ। এখানে অর্থ ও রূপ যে সম্পৃক্ত, একীভূত, কেবল তাই নয়—এমন ভাবে ও দুটিতে মিলেমিশে গিয়েছে যে তার ফলে উভয়ের অতিরিক্ত একটা বস্তু জন্ম পেয়েছে, কি একটা ইন্দ্রজালের প্রভাবে অভিনব জগতের, চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। এই যেমন বার্ণস এর—

The White moon is settling behind the white wave
And time is settling with me—

কিংবা ব্লেকের (Blake)—

Tyger, Tyger burning bright
In the forests of the night—

অর্থগত এই ধ্বনির ক্রম আমাদের প্রাচ্যের কাব্যেও অনুসরণ করতে পারি। স্থূল রূপক হল এই—

আত্মানং রথীনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথীং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্—

তারপর মধ্যম পদ, প্রতীকের সূত্রপাত এই—

উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ

কিংবা

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

পরিশেষে, উত্তমপদ, ধ্যানের সমাধির লোকের অর্থবহনধ্বনি

তমো আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে

কিংবা

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বংপূষনপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

ইংরাজী আর সংস্কৃত হইতে এই যে অর্থগত ধ্বনির দুটি ক্রমধারা দেখালাম তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্যটি নির্দ্দেশ করবার জন্যই উদাহরণগুলি আমি এ ভাবে গ্রহণ করেছি। প্রথম ও কতকটা দ্বিতীয় স্তর মোটের উপর এক ধরণের হলেও, তৃতীয় স্তরে একটা বৈষম্য দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য কবির প্রেরণা মূলতঃ প্রাণময়, আর প্রাচ্য কবির প্রেরণা জ্ঞানময়—বৈসাদৃশ্য এখান হতেই উঠেছে। প্রাচ্য কবির অর্থ, তা যতই গূঢ়ের অনির্ব্বচনীয় কিছু হোক না, তা কবির চেতনায় জাগ্রত বস্তু-তন্ত্র হয়ে ফুটে উঠেছে—তাই অতিপ্রাকৃত বস্তুর কথা তাঁর হাতে প্রাকৃত বস্তুর আলেখ্যের মতই পেয়েছে একটা দৃঢ়তা নিশ্চয়তা সৌষীম্য। Mysticism বলতে আমাদের মনে যে একটা mist এর ধারণা ঘনিয়ে আসে, বাস্তবিকপক্ষে প্রাচ্যের তথাকথিত mystic সৃষ্টিতে উর্দ্ধতর চেতনা লব্ধ রূপায়নে সে রকম কিছু নাই, সেখানে বরং রয়েছে অনাবৃত দিবালোকের স্পষ্টতা, নিঃসন্দেহ জ্ঞানের স্বচ্ছতা। সুতরাং এখানে যে প্রতীক বা symbolism সেটিকে আর আচ্ছাদন বলে মনে হয় না—সেটি হয়ে উঠেছে প্রকাশক, রূপ বা রূপকের নিজস্ব অস্তিত্ব বা দ্যোতনা যেন নাই, অর্থেরই সাথে একীভূত হয়ে গিয়েছে। তাই এখানে অর্থের দিক দিয়ে ধ্বনির বা তির্য্যক-ভাবের আস্বাদ এই জন্য কিছু পাই বটে যে সে অর্থ হল অধ্যাত্ম অতীন্দ্রিয় অনির্ব্বচনীয় লোকের বস্তু—কিন্তু আসলে অন্তত সমানে সে ধ্বনি ফুটে উঠেছে এখানেও ছন্দধ্বনির সহায়ে। অন্যপক্ষে Burns-এর যে পদটি উপরে উদ্ধৃত করেছি, কিংবা পাশ্চাত্য মিসটিক কবি এ ইর—

—to the deep, the deep replies
And in far spaces of the soul
The oceans stir, the heavens roll—

এখানে কবি চলেছেন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকে ভর করে নয়, কিন্তু অনুভবের স্পর্শালুতার গৌণতাকে ধরে—এখানে অনুভবের বস্তুটি কেমন দূরের রহস্যময়ের মধ্যে রয়েছে, কবি তাকে কি একটা সূক্ষ্ম সংযোগ সূত্রের সহায়ে স্পর্শ করেছেন অথবা কেমন স্বপ্নের আবেশে তার কাছে গিয়ে পড়েছেন। প্রাচ্যের ঋষি কবি যেখানে কেবলই বলছেন সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে, জ্যোক চ সূর্য্যং দৃশে সেখানে পাশ্চাত্যের ঋষি বলছেন (A. E.)

Our hearts were drunk with a beauty
Our eyes could never see.

এখানে যে ধ্বনি বা তির্য্যকভাব তা সাক্ষাৎ ভাবে অর্থেরই অবদান। এই অর্থগত ধ্বনিকে জোর দেবার জন্য, পরিস্ফুট করে ধরবার জন্য অবশ্য এখানে ছন্দের ও ধ্বনিগত মূর্চ্ছনাকে আশ্রয় করা হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বেই বলেছি, শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টির মধ্যে, কবিত্বের উত্তম পদেও দুটি অঙ্গ পৃথক করা যায় না।

* * *

৩

অর্থগত ধ্বনির ক্রমে, আর এক প্রকার একটু বৈসাদৃশ্য আমাদের বাংলা কাব্যের সহায়ে আমি দেখাব এবার। প্রথম স্তরটিতে বিশেষ পার্থক্য নাই—রূপকের সহায়ে তির্য্যক ভাব এই—যথা চণ্ডীদাসে

শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে
সেই সরোবরে গিয়া মনপদ্ম প্রকাশিয়া
হংস প্রায় হইয়া রহিব—

এই রূপক কিন্তু এমনভাবে ব্যবহার করা যায় যে বাস্তবিকই ত অর্থের আচ্ছাদন নয়, আবরণ হয়ে পড়ে—অর্থকে গুপ্ত গুহ্য রাখার জন্যই রূপকের ব্যবহার হয়। Nostradamus এর ভবিষ্যবাণী, Book of Revelation-এর রূপক হেঁয়ালীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বৌদ্ধ দোঁহার "সন্ধ্যাভাষায়" তার প্রতিরূপ পাই। কিংবা ধরুন রাগাত্মিকা পদের এই—

প্রথম দুয়ারে মদের গতি
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়—

এর অর্থ জানে এক ঐ পথের সাধকেরা—এর নাম hermetic কবিতা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ ধরণের সূত্র বা মন্ত্র কাব্য নয়—এখানে যে তির্য্যকভাব তা কাব্যগত ধ্বনি নয়, তা বিরাটের অনির্দ্দেশ্যের দিকে আমাদিকে নিয়ে যায় না—তাতে আমাদের নিয়ে যায় যেন একটা চোরাগলির অন্ধকারের মধ্যে—আমি বলছি কাব্যের দিক দিয়ে, সাধনার দিক দিয়ে নয়। এখানকার লক্ষ্য obliquity (তির্য্যক প্রকাশ) নয়, এখানকার লক্ষ্য obscurity (অপ্রকাশ)। তবে চণ্ডীদাসের হাতে চোরাগলিও সময়ে সময়ে কেমন প্রায় স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে ওঠে। এই দেখুন গূঢ়ার্থ বা হেঁয়ালীকে, আমরা যার নাম দিয়েছি প্রতীকাত্মক বা মধ্যম পদের কাব্য সেই স্তরে কেমন তুলে ধরেছেন—

এ দেহে সে দেহে একই রূপ
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ—

এমন কি আরও দূরে চলিয়া গিয়াছেন, সে হেঁয়ালীকে একেবারে উত্তম পদেই নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—

কূলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ
ঢেউএর উপরে ঢেউএর বসতি
ইহা জানে কেউ কেউ—

বুদ্ধি এখানে স্পষ্ট অর্থ কিছু ধরতে পারে না—তবু এখানে গভীরতর অর্থের ধ্বনি পাই—এখানেও সে অর্থকে ছন্দেরও একটা ধ্বনি পরিপুষ্ট প্রতিরণিত করে তুলেছে।

এই ধরণের যে বক্রতা—হেঁয়ালীর, ধাঁধাঁর, "সিন্দুর-বিন্দুর্বিধবাললাটে"র বক্রতা—বাস্তবিকপক্ষে খাঁটি তির্য্যকভাব বা ধ্বনি নয়। কারণ এ বক্রতা হল কেবল পরিভাষার কথা। নূতন একটা ভাষায় যে অবোধ্যতা এখানেও রয়েছে সেই অবোধ্যতা। শব্দের, সংজ্ঞার আভিধানিক অর্থ আয়ত্ত

হলেই বাক্যের অর্থ জলের মত স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থেরই মধ্যে ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধির অতিরিক্ত রহস্য কিছু নাই—অনির্দ্দেশ্য অস্পষ্ট কিছুর প্রতি ইঙ্গিত নাই।

তবে একটি কথা, এই ধারার কাব্য সত্যকার কাব্য বলে আপনাকে প্রচার করে নাই, সত্যকার কাব্যের মর্য্যাদা দাবি করে বসে নাই। এগুলি হল কাব্যজগতের আশে-পাশের সৌখীন সৃষ্টি, উদ্বর্ত্ত—bye products

কিন্তু এই "উদ্ভট"-কাব্য ছাড়াও কাব্যের প্রশস্ত পাকা রাস্তাতেই আর এক রকম বক্রতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়—যার নাম দেওয়া যেতে পারে ব্যাসকূট। অর্থকে ঢেকে রাখবার জন্য, তার চারদিকে একটা কুহেলিকা প্রহেলিকা অর্থাৎ ধ্বনির আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য কবিরা বাক্যের গঠনে এনে দেন একটা বিপর্য্যয় অর্থাৎ তার অঙ্গ সব দেন কেটে ছেঁটে, ভেঙ্গে মুচড়ে, ওলটপালট করে। ব্রাউনিংএর শেষ যুগের লেখা এই জন্যে হেঁয়ালী হয়ে উঠেছে—অর্থের গাঢ়তায় গভীরতার জটিলতার দিক দিয়ে যে সে কবিতা দুর্ব্বোধ তা নয়, দুর্ব্বোধ্যতার কারণ পদবিন্যাসের অন্বয়ের দুষ্করতা। Hopkins এ বিষয়ে বোধ হয় অতিমাত্রায় পৌছেছেন। তিনি "brimful in a flash"এর পরিবর্ত্তে "brim, in a flash, full" লিখেই সন্তুষ্ট হন নাই (বোধ হয় জর্ম্মন পদগঠনের অনুকরণে), "through the other" কথাটিকে সংহত করে বলেছেন "throughter"! কাব্যের আত্মা ধ্বনির সন্ধানে Hopkins ভাষাকে ছন্দকে নিয়ে যে কি উৎকট হঠযোগ সাধন করেছেন তা বিচিত্র বিস্ময়কর। ফরাসীভাষায় mallarmé ও ঐ রকম কিছু করতে প্রয়াস করেছেন। ফরাসী ভাষার যে সহজ অনাবিল স্বচ্ছতা তার মধ্য দিয়ে অনির্দ্দেশ্যের ধ্বনি ফুটিয়ে তোলা সুকঠিন বলেই তিনি ঐ কৃচ্ছ্রতপস্যার পথ ধরেছিলেন। কিন্তু তবুও মনে হয় আধ্যাত্মিক জগতে সহজ সাধনাই নিয়ে যায় সত্যে, কাব্য জগতেও সহজই নিয়ে যায় সুন্দরে।

* * *

৪

যুগে যুগে—কবি হতে কবি—কাব্যের আত্মা এই ধ্বনিকে প্রকাশ করবার জন্য কত না রকমারি উপায়, কৌশল অবলম্বন করেছে। আধুনিক যুগ যে ভঙ্গী ধরেছে তা একান্ত অভিনব অভাবনীয় তুলনাহীন—আধুনিকের বিশ্বাস এতদিন পরে এবার জগতে সত্যকার কবিতা, শ্রেষ্ঠতম কবিতা যথার্থতঃ সৃষ্টি হতে চলেছে, কবিতা দেবীর এবার পুরাপুরি নবজন্ম—রূপান্তর।

ছন্দকে বাক্যবন্ধকে এ যাবৎ মনে করা হত কবিতার কাঠামো, দেহ, বাহন, প্রকাশ যন্ত্র বলে। কিন্তু আজকাল তাকে বিবেচনা করা হয় বন্ধন অন্তরায় হিসাবে। রচনার গড়নের যে রীতি নীতি—বাঁধন ছাদন—তা ভেঙ্গে ছিঁড়ে কেটে দেওয়া হয়েছে—সেখানে আনা হয়েছে বন্ধনহীনতা, মুক্তি, স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছাগতি। এমন কি গদ্যের বাঁধনে পর্য্যন্ত কাব্য আর বন্দী হতে চায় না—আরো উন্মুক্ত অবকাশ সে চেয়েছে। এক জাতীয় রাষ্ট্রনীতি যেমন বলে যে সকল রকম শাসনই হল সুশাসনের অন্তরায়—শাসনের অবসান ও একান্ত অভাব অর্থাৎ অ-শাসনই পরম সুশাসন, শিল্পক্ষেত্রের আধুনিকেরা এই ধরণের এক নীতি অনুসরণ করেন।

আধুনিকেরা যে আমূল পরিবর্ত্তন বা বিপর্য্যয় আনতে চেয়েছেন তা কাব্যের মূল ধরেই টান দিয়েছে। তা ছন্দোগত ত বটেই, বিশেষভাবে বস্তুগত। প্রাচীনদের যে ছন্দোগত ধ্বনি তা সূক্ষ্ম ধরণের, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র—আধুনিকের শ্রবণেও জিনিষ যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে নাই। ছন্দের ধ্বনিকে তাঁরা আমোল দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁরা ছন্দেরই যে বিসর্জ্জন দিয়েছেন—তাঁরা চেয়েছেন টেলিগ্রাফী ভাষার চলন—প্লুতগতি অর্থাৎ উল্লম্ফন। বস্তুকে অর্থকে তাঁরা একেবারে ঢেলে সাজতে চেয়েছেন। প্রাচীনেরা যত রকমে অর্থকে ধরে তির্য্যকভাব ফুটিয়ে তুলেছেন, ছন্দের মত এতেও আধুনিকের কবি-চেতনা তৃপ্তি পায় নাই। সে অর্থের, তার বিষয়বস্তুর দিয়েছে একটা নূতন গড়ন, ঘটিয়েছে সেখানে ওলট-পালট। কেবল কাঠামোর মধ্যে নয়, ভিতরের বস্তুর সারাংশের মধ্যে বিপ্লব বিপর্য্যয় কি জিনিষ? ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই—উদাহরণেরই পরিচয়। ১৯৩৫ সালের * এক কবি বলেছেন শুনুন—

The God approached dissolves into the air
Magnolias, for instance, when in bud,

* The Year's Poetry—1935

Are right in doing anything they can think of;
Free by predestination in the blood,
Saved by their own sap, shed for themselves,
Their texture can impose their architecture;
Their sapient matter is already informed.

যে মূল কথাটি কবি এখানে বলেছেন তত্ত্ব হলেও তা হেঁয়ালী নয়—তবে হেঁয়ালীর কাছাকাছি টেনে নিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শ্লেষে ব্যঙ্গে গুলিয়ে নস্যাৎ করে দিতেছেন পুরুষকার দেবতাটিকে। এর জন্য তিনি আশ্রয় করেছেন কতখানি পরাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরিক বিদ্যাবত্তা। অর্থকে এই রকমে নানাদিক থেকে যুগপৎ প্রতিফলিত করে তাকে প্রতিধ্বনিত করে তুলতে চেয়েছেন। ছন্দোগত প্রতিধ্বনি তিনি চান নাই—কারণ ছন্দের দোল হল প্রাণের হৃদয়ের অনুভবের দোল, আর এ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আধুনিকেরা সযত্নে পরিহার করতে চেয়েছেন। তাঁদের কারিগরি হল মস্তিষ্কের কাঠখোট্টা কাঠামে ফেলে কবিতার রূপটি গড়ে তোলা।

আরও পরিষ্কার হেঁয়ালী বা ধাঁধাঁর মধ্যে নিয়ে যেতে আধুনিকেরা যে কসুর করেছেন তা নয়—শুনুন আর একজন ৩৫ সালের কবিতার কথা—

Twining of serpents! Halitosis of lions!
be backward from the body,
Be speed from the wind and lightness in the air,
following no sandy path from Italy
but moth-swift, palpitating, where
by wind's plume silver splashed
the untroubling negro water
Strives with the light, O Whitely blades-

বুঝলেন কিছু? এটি মোটেও তত্ত্বকথা নয়—এটি হল সমুদ্রযাত্রার ছবি!!

এই পথেই বুঝি সে নিয়েছে আধুনিক যুগের একটা অপরূপ বক্রতা—এটিও প্রধানতঃ অর্থগত। এতে কাব্যের—শুধু কাব্যের কেন সাধারণভাবে সকল শিল্পের একটা অদ্ভুত—বিকট বললেও অত্যুক্তি হবে না—ধারা সৃষ্টি করেছে। তার নাম surrealism—"পরাবাস্তবতা"। এর জন্মের ইতিহাস এই। শিল্পী দেখলেন জগতের, মানবজীবনের মোটামুটি কথাগুলি পূর্ব্বতন শিল্পীরা সবই বলে ফেলেছেন, শুধু তাই নয় একই কথা পুনঃপুনরুক্ত হয়েছে যুগে যুগে দেশে। স্পষ্ট ব্যক্ত সর্ব্বজনসুলভ অনুভব উপলব্ধির মধ্যে নবীন শিল্পী চমৎকারিত্ব কিছু আর দেখলেন না। তিনি খুঁজতে বের হলেন তাই অসামান্য অসাধারণ লোকবহির্ভূত কিছু। তাঁর ভিতরের কবিপ্রাণ চায় "ধ্বনিকে"—অধিকন্তু-কিছুকে, সুদূরকে, এই সুদূর, অধিকন্তু-কিছু বা ধ্বনিকে চিরাচরিত সনাতন কথাবস্তুর মধ্যে—মানুষের বাহ্য চেতনার বিষয় গণ্ডীতে—তিনি আর কোন মতে ধরতে পারেন না। এমন কি, এই সব পরিচিত পুরাতন কথা-কাহিনীকে ছন্দের বোল দিয়ে দোল দিয়ে যতই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ধরবার চেষ্টা করা যাক না কেন—বস্তুবিক পক্ষে তা সত্যকার অধিকন্তু-কিছু হয়ে দাঁড়ায় না। তাই আধুনিকেরা চাইলেন সম্পূর্ণ নূতন জগৎ অধিকার করতে—শিল্পীকে বললেন জাগ্রত ছেড়ে স্বপ্নের লোকে উঠে আসতে—স্বপ্ন অর্থ কল্পনা নয়, বাস্তবিক সুপ্তিগত স্বপ্নকে তাঁরা শরীরী করতে চাইলেন। সম্মুখের জগৎ নয় পিছনের জগৎ, ব্যক্ত চেতনা নয় অব্যক্ত অবচেতনা হল তাদের কাব্যলোক—পূর্ণ বাস্তব বা আসল অখণ্ড সত্য একই সমতলে সরলভাবে প্রসারিত নয—তা হল বহুতল সমন্বিত। কাব্যসৃষ্টিতেও প্রতিবিম্বিত হবে এই বহুতলের সংমিশ্রণ। কাব্যের তির্য্যক ভাব এ ধারায় পেয়েছে একটা বিশেষ বক্রতা—মূল প্রেরণা হয়ত ছিল বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত কিন্তু কার্য্যতঃ ক্রমে সে বক্রতা অর্থ হয়েছে কৌটিল্য অর্থাৎ বিকৃতি। ধ্বনির, মার্গাতিরিক্ত কিছুর অন্বেষণে গিয়ে আমরা এসে পড়েছি এখানেও এক চোরাগলির মধ্যে। প্রাচীনের "মেলডি" ছেড়ে চেয়েছিলাম বুঝি "সিম্‌ফনী"-কিন্তু গড়ে তুলেছি বিস্তারিত কলরব—সহজ ভাষায় এক কথায় যাকে বলা যেতে পারে প্রলাপ। আপনারা মনে করতে পারেন আমার এ হল অতিশয়োক্তি—আদৌ না, না দেখলে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না আধুনিক কবিরা কত নিরঙ্কুশ। শুনুন একটু নমুনা—

A kick in the pants once more,
and the empty sardine-tin thinks itself holy
A kick with the heel on the jaw
and it is a divinity
which swims in pure honey
not caring about protozoons
sea-horses
or heavenly pebbles that flatter from eye to eye
and carry reason
with a little sauce and some broken teeth
into the society of cabbage···stumps···

এই বোধ হয় যথেষ্ট। এ কবিতা স্বয়ংপ্রকাশ, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—

৫

ঠিক এ ধরণের কিছু বাংলা সাহিত্যে এখনও আবির্ভূত হয় নাই। আমরা বোধ হয় কথঞ্চিৎ পিছনে পড়ে আছি। আমাদের অতি-আধুনিকেরা প্রাণের সহজ সরসতা, গভীর ঐকান্তিকতাকে বাদ দিয়ে মস্তিষ্কে স্থিতিলাভ করতে অনেকখানি পেরেছেন বটে; কিন্তু পুরোপুরি উদ্ভট হয়ে যেতে পারেন নাই। তবে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন, কয়েকটা কৌশল বা প্যাঁচ আয়ত্ত করেছেন ইতিমধ্যে এবং আশায় আছেন—শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।

পরাবস্তুতন্ত্রীরা চেয়েছেন বহুল বিবিধ অর্থের—নানা জগতের নানা ক্ষেত্রের, নানা চেতনার ও অনুভবের—সংমিশ্রণ ও যুগপৎ প্রকাশ। একটির পর একটি করে চিন্তার অনুভবের তানবিস্তার—একটি ধারাকে শেষ করে তবে আর একটির আরম্ভ—এক সময়ে চোড্যানবধারণম্—এই হল প্রাচীন পদ্ধতি। আধুনিক চায় বহুর বিচিত্রের বিপরীতের বিরোধীর সমবায়, বৃহৎ জটিল কলধ্বনি; তার লক্ষ্য বা তার পরিণাম, অর্থ বিশেষ স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলা নয়, কিন্তু নানা অর্থের আলাপনা একটা প্যাটার্ণ—জ্যামিতিক প্যাটার্ণ—সৃষ্টি করা। ছন্দের দিক দিয়েও সে চায় সুর নয়—সুর ত সস্তা মেয়েলী জিনিষ—এই রকমেরই গতির প্যাটার্ণ (অনেক সময়ে স্থূলভাবে লাইনগুলিকে ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের করে সাজিয়ে এই প্যাটার্ণের ইঙ্গিত দেওয়া হয় যথা, E.E Cummings)। ধ্বনিসৃষ্টির একটি উপায় হল, কথায় ভাবে ফাঁক রেখে রেখে চলা—এই ফাঁকই কল্পনার ব্যঞ্জনার অবসর করে দেয় (এরই সুপ্রাচীন নাম "লক্ষণা")। আধুনিক যুগে এই ফাঁককে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করে দেওয়া হয়—ফাঁকের পরিবর্তে তাই দেখা দিয়েছে গহ্বর—এবং গহ্বরের উভয় পারের মধ্যে কোন মিল বা সারূপ্য নাই। আগে ফাঁক ছিল যতি মাত্র, পৃথক অথচ সদৃশ জিনিষের সংযোগ সেতু। কিন্তু এখন—আচ্ছা একটু নমুনা তবে শুনুন—

গবাদের ওপারেতে বাঘ
হাই তুলে অকস্মাৎ দেয় গড়াগড়ি
কি দুর্ব্বল ভঙ্গিমাটি তার—
জুতোর ফিতেটা গেছে খুলে
নীচু হয়ে সমতলে বাঁধে—

কবির বলার উদ্দেশ্য "নাই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে"—অর্থাৎ জংলী বাঘটা বন্দী, তাই নিশ্চিন্তে তুমি ওর সামনে জুতোর ফিতে বাঁধছ, কিন্তু—আহা, কি ট্রাজেডি!

প্রথম কথা, অর্থকে বাক্যকে উহ্য করে রাখলেই যদি কাব্য গড়ে ওঠে তবে বেদান্ত সূত্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য জগতে আর নাই (এক তান্ত্রিকের মন্ত্র হ্রীং ক্লিং ছাড়া হয়ত)। তার পর কথায় বা চলনে এখানে যাদু কই? ছন্দের সুরের রেশ ধ্বনি যে সুদূরের দিকে নিয়ে চলে—কোথায় সে অনির্ব্বচনীয়তা, সে ইন্দ্রজাল, সে ম্যাজিক?

সাক্ষাৎভাবে, স্থূলভাবে বাক্যের মধ্যে অর্থের মধ্যে ফাঁক—গহ্বরই—রেখে রেখে ধ্বনির প্রকাশ জাপানী কবিতার বিশেষত্ব—তা হতে পারে, জাপানের ভাষায় এ ধারা নিশ্চয় একান্ত সরল সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তার অনুকরণে বাংলায় যখন বলি—

শীতল স্থির আকাশ
গ্যাস নিবে গেছে
জাগে নি কো কাক
বাতাস—পচ্

শুধু কাঁপে তার শুধু বাজে শ্বেত বক্ষ তার—

তখন আমাদের রসপিপাসু হৃদয় কতখানি বেজে ওঠে, কতখানি কি ভাবে কাঁপে? শুনুন দেখি এর পরে পুরাতন কবিকে আবার একটু—

The winds come to me from the fields of sleep

অথবা, আমাদের রবীন্দ্রনাথের সেই অতিপরিচিত—

ওপারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমির তলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা—

পার্থক্য কোথায়? একটিতে রয়েছে গদ্যের আবহাওয়া, আর একটিতে কাব্যের সুরভি—একটির মূলে কৌতূহল আর একটির তন্ময়তা।

কাব্যে টেলেগ্রাফী ভঙ্গীর স্থান থাকতে পারে, সম্পূর্ণ বিসদৃশ বিজাতীয় উপকরণ (incommensurables) এক পাটায় বাটা যেতে পারে, মহান্ (sublime) ও তুচ্ছকে (ridiculous) একই জোয়ালে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে হয়ত—কিন্তু সে জন্য চাই একটা অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি। শেক্সপীয়রের এ ক্ষমতা ছিল—বাল্মীকির এ ক্ষমতা ছিল (কুম্ভকর্ণ যিনি grand style এ বর্ণনা করেছেন)। আধুনিকের প্রতিষ্ঠা একদিকে রূঢ় তর্কবুদ্ধি, অন্যদিক স্থূল অমার্জ্জিত ইন্দ্রিয় অনুভব—কিন্তু এ দুটিকে রূপান্তরিত করে তুলতে পারে যে তৃতীয় শক্তি, এক গাঢ়তর চেতনা তাকে ত পাই না।

কাব্যের কবিত্ব,—কাব্যের প্রাণ, ধ্বনি মূলতঃ এই গাঢ়তর চেতনার শ্রী ব্যতীত আর কি? এ হল চেতনার সম্প্রসারণ ও ঊর্দ্ধায়নের ফল। কবিচেতনা, সত্যকার কবিচেতনা সহজ চেতনা হতে ভিন্ন স্তরের ভিন্ন দরের জিনিষ। সাধারণ চেতনার সঙ্কীর্ণতা ও অগভীরতা অতিক্রম করে কবিচেতনা পেয়েছে একটা বিস্তীর্ণতা ও অতলতা—সাধারণ বস্তুও তিনি যখন দেখেন, তা দেখেন এই বিস্তীর্ণতা ও অতলতার ভিতর দিয়া, সুতরাং ঐ বিস্তির্ণতা ও অতলতাই সকল জিনিষের চারিপাশে তার আবহাওয়ার মত তাকে ঘিরে থাকে—এরই নাম হল ধ্বনি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমার কবিতা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মদির জ্যোৎস্না রাতে—
আমার কবিতা উপহার দিনু তোমার কোমল হাতে।
গোপন মনের জমান মধুরে, বঁধুরে দানিনু আজ,
কবিতার মাঝে রূপ পেল তাই ভুলে পৃথিবীর কাজ।
রূপালী আকাশ, রূপালী পৃথিবী, কবিতায় জেগে চাঁদ,—
মধু টলমল, ভাবে বিহ্বল, ক্ষণ-সুখে উন্মাদ।
ফুল-মদ-বহ-বাস,
ডানা মেলে আসে—আকাশে বাতাসে বিমোহন
উচ্ছ্বাস।

জীবনের গান, যৌবন গান বিকশি' উঠিছে মনে,—
বিকশি উঠিছে প্রেম-শতদল হৃদয়ের বাতায়নে।
কবির ভাষায় কবিতা লিখিনু: অভিজ্ঞতার বাণী,
ভাল লাগিবে তো—আমার কবিতা? লাগিবেনা
আমি জানি।

যদি কভু ভাল লাগে,
সেদিন জানিব সার্থক শ্রম সুনিবিড় অনুরাগে।

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৫

রাত্রি গভীর। বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশন্ ছাড়িয়ে এসে ট্রেণ তখন শিউপুরের প্রান্তর ভেদ ক'রে হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সন্ধ্যার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথম দু-চার সেকেণ্ড নিদ্রা ও স্বপ্নের প্রভাব কাটিয়ে নিজের যথার্থ অবস্থা এবং অবস্থান নির্ণয় করতে কাট্‌ল, তারপর পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লে, বাঙ্কের উপর বেণ্টলী নেই, অগোচরে কখন্ কোন্ ষ্টেশনে জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গেছে, অপর দিকের বেঞ্চে প্রিয়লাল শুয়ে রয়েছে,—সম্ভবতঃ নিদ্রিতই। তারা দুজন ব্যতীত সে কামরায় তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।

চিন্তামগ্ন অবস্থায় কিছুক্ষণ সন্ধ্যা স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইল। ভাবতে ভাবতে এক সময়ে সত্যিই তার মনে মনে হাসি পেলে। আশ্চর্য্য! এও হয়? সময়ে সময়ে অদৃষ্টকে যখন খেয়ালে পেয়ে বসে তখন বোধ হয় এই রকমই হয়! Truth is stranger than fiction ব'লে ইংরেজিতে একটা যে কথা আছে তা হ'লে সব সময়ে তা মিথ্যে নয়! সাধারণ পরিবারের একজন সাধারণ মেয়ে সে, সাধারণ ভাবে জীবন অতিবাহিত করবে মনে মনে এই কথাই জান্‌ত, বিয়ে হ'ল এক আশাতীত ধনীর গৃহে, তারপর জীবন যে প্রবাহে বেয়ে চল্‌ল তাকে অসাধারণ বল্‌লে খাটো ক'রেই বলা হয়। চূড়ান্ত হ'ল তার আজকে! যে স্বামীর আশ্রয় পাবার জন্যে একদিন সমস্ত দেহ-মন পণ ক'রে উন্মত্ত হয়ে ছুটে গিয়ে প্রত্যাখাত হয়েছিল, আজ সেই ব্যক্তির সঙ্গে রেলগাড়ীর একই কক্ষে একাকী আবদ্ধ হ'য়ে ছুটে চলেছে! আইনের চক্ষে এখনও হয়ত সে তার স্বামীই, অথচ···!

সহসা সন্ধ্যা সে-দিক্‌কার মনের কবাটটা বন্ধ ক'রে দিলে। মনে প'ড়ে গেল প্রমথর কথা। কি অদ্ভুত মানুষই না তিনি! নীচু হ'য়েই সর্ব্বদা আছেন, অথচ ধরতে গেলে নাগাল পাওয়া যায় না, এতই উঁচু! মারাত্মক সংক্রামক রোগে পীড়িত বন্ধুর সেবার জন্যে অনেকেই হয়ত' ছুটে যায়, কিন্তু এমন অবলীলার সঙ্গে কেউ যায় না। সন্ধ্যার নিষেধে প্রমথর ভর্ৎসনার কথা মনে প'ড়ে গেল, 'ছিঃ ঊষা! এ কি কথা বলছ! জীবনটা তুচ্ছ নয় বটে, কিন্তু এত বড়ও নয় যে, এই বিপদে সুরেশকে পরিত্যাগ করতে পারব!' এ-ই হ'ল প্রমথর মনের সহজ সবল পরিচয়। এর মধ্যে পর-হিতৈষণার কৃত্রিম আস্ফালন নেই, বাহাদুরী নেই। স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণতায় সে প্রমথর কত পিছনে প'ড়ে আছে, অথচ কথায় কথায় প্রমথ বলে, সন্ধ্যার সংস্পর্শে এসে সে মানুষ হ'য়ে গেছে। আশ্চর্য্য মানুষ যা হোক!···প্রমথর চিন্তায় সন্ধ্যার মন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। জানলার দিকে মুখ ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে মনে মনে বিশ্বনাথকে স্মরণ ক'রে বল্‌লে, ঠাকুর, ভালয় ভালয় নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে এনো!

ভাবতে ভাবতে কখন্ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে নিদ্রা ভেঙে গেল। ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে দেখ্‌লে দপ্‌দপ্ করে আলো জ্বলছে, আর সম্মুখেই প্রিয়লাল দাঁড়িয়ে রয়েছে; জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি আমাকে ডাকছিলেন?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "হ্যাঁ, বোধহয় স্বপ্ন-টপ্ন দেখছিলেন।"

লজ্জিত-স্মিত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কেন, চেঁচাচ্ছিলাম বুঝি?"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বল্‌লে, "হ্যাঁ, কাছাকাছি দুবার।" তারপর নিজের শয্যায় ফিরে গিয়ে ব'সে বললে, "প্রথমবার অল্পক্ষণ, আপনিই ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়বার বেশ খানিকক্ষণ, কাজেই না ডেকে থাকতে পারলাম না।"

অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "ছি ছি, দেখুন দেখি, অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম!"

প্রিয়লাল ব্যস্ত ভাবে বল্‌লে, 'না, না, একটুও নয়। ঘুমিয়ে থাক্‌লে আমি আপনার শব্দ কখনই শুনতে পেতাম না। আমি তখন জেগে ছিলাম। কিন্তু মিসেস্ মুখার্জ্জি, হয় আপনি অল্পক্ষণের জন্য জেগে ব'সে থাকুন, নয় অন্যদিকে মাথা ক'রে পাশ ফিরে ভাল ক'রে শুন্। সময়ে সময়ে এক-একটা স্বপ্ন, বিশেষত দুঃস্বপ্ন, এমন পেছনে লেগে থাকে যে, ঘুমিয়েছেন কি অম্‌নি আবার তার হাতে পড়েছেন।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "একটু জেগেই ব'সে থাকি, আপনি শুয়ে পড়ুন।" হাতের রিষ্ট-ওয়াচ দেখে বল্‌লে, "প্রায় চারটে বাজে। কতদূর এলাম জানেন কি?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কতদূর এলাম তা ঠিক বল্‌তে পারিনে, তবে জৌনপুর ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ।" মাথার শিয়র থেকে টাইম টেবল্ নিয়ে দেখে বল্‌লে, "এবার শাগঞ্জ পৌঁছলাম ব'লে।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "সাহেবটি কখন্ নেবে গেল জানেন?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "জানি। রাত তখন দেড়টা হবে, মোগলসরাইয়ে নেবে গেল। কিন্তু আপনি শুয়ে পড়ুন মিসেস্ মুখার্জ্জি, স্বপ্নে-স্বপ্নে আপনার ঘুম ভাল ক'রে হতে পারেনি, অথচ রাতও আর বেশী নেই।"

সন্ধ্যা বললে, "আপনিও ত সমস্ত রাতই জেগে আছেন, আপনিও শুয়ে পড়ুন।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "সমস্ত রাত জেগে আছি তা ঠিক নয়, তবে ঘুম ভাল হয়নি। ট্রেণে আমার ভাল ঘুম হয় না। তা ছাড়া—" কথা শেষ না ক'রে প্রিয়লাল হাসতে লাগ্‌ল।

ঔৎসুক্যভরে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া কি?"

"একটু পাহারা দিয়েছি আপনাকে।" ব'লে প্রিয়লাল ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠল।

সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে এবার আপনি ঘুমোন, আমি জেগে থাকি। আমি যথেষ্ট ঘুমিয়েছি, আর ঘুমোবার দরকার নেই, রাতও শেষ হয়ে এসেছে।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বল্‌লে, "না, মিসেস্ মুখার্জ্জি, অনুগ্রহ করে আপনি আর আমার ও অপবাদের কারণ হবেন না। একেই ত আপনার স্বামী আমাকে সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ফেলেছেন যাদের বোঝা অপরে বহন করে, তার ওপর যদি শোনেন যে খানিকটা পথ আপনি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাহ'লে আর কোনোদিনই তাঁর সেই শ্রেণী থেকে মুক্তি পাবার আশা থাকবে না। তার চেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন, আমিও একটু গড়াবার চেষ্টা দেখি, যদিও এ আমি নিশ্চয় জানি যে ঘুম হবে না।"

অগত্যা সন্ধ্যা জানালার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, এবং রাত্রি শেষের সুশীতল স্নিগ্ধতার প্রভাবে নিদ্রাগত হতে বিলম্ব হ'ল না। ঘুম যখন ভাঙল তখন ট্রেণ একটা ষ্টেশনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত কক্ষ উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে প্লাবিত। শয্যার উপর উঠে ব'সে অপ্রতিভ মুখে সন্ধ্যা বললে, "ঈস্ এত বেলা হয়ে গেছে তবু ঘুম ভাঙেনি!"

প্রিয়লাল তার বেঞ্চে ব'সে একটা ইংরাজি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল; বললে, 'ঘুম ভেঙেছে ত মিসেস্ মুখার্জ্জি, আপনি ত নিজেই উঠেছেন"

সে কথার কোনো উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ ক'রে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কোন ষ্টেশন ডক্টর চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "অযোধ্যা। অভাগিনী সীতার শ্বশুরবাড়ি।"

ক্ষণকাল নির্ব্বাক থেকে মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "অভাগিনী বলছেন কেন সীতাকে?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "বল্‌ব না মিসেস্ মুখার্জ্জি? দুর্ব্বলচিত্ত স্বামীর হাতে প'ড়ে কি অবিচারটাই না বারম্বার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। অবশেষে এই অযোধ্যা নগরীতে বসুন্ধরার গর্ভে প্রবেশ ক'রে তিনি নিদারুণ অপমান আর মনস্তাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু তাই ব'লে রামচন্দ্রকে দুর্ব্বলচিত্ত বল্‌ছেন কেন? আমার ত' মনে হয় তিনি খুব সবলচিত্ত ছিলেন ব'লেই সীতাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ জেনেও প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য ও-রকম আচরণ করতে পেরেছিলেন। প্রজারঞ্জক রাজা ব'লে পৃথিবীজোড়া খ্যাতিও ত' তাঁর আছে।"

সন্ধ্যার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল

বল্‌লে, "এ আপনি মুখে বলছেন বটে, কিন্তু এ আপনার মনের কথা নয় মিসেস্ মুখার্জ্জি,—এ আপনি শ্লেষ ক'রে ব'লছেন। আমি জানি, আমাদের বাঙলা দেশের প্রত্যেক আত্মসম্মানে সচেতন মেয়ের মনে রামচন্দ্রের প্রতি গভীর অভিমান আছে। রামায়ণের কবি শুধু একজন রামচন্দ্র আর একজন সীতার কাহিনী লিখেই থামলেন, কিন্তু সেই রামায়ণের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কত রামচন্দ্র আর কত সীতা যে এল গেল, তার খবর কেউ রাখে কি?"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ সহসা আরক্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "মিছিমিছি এ আক্ষেপ কেন করছেন ডক্টার চৌধুরী? এই অদৃষ্ট-বাদের দেশে সে খবর রেখে কোনো লাভ আছে কি? যত অবিচারই রামচন্দ্র করুন না কেন, সীতার অদৃষ্ট দিয়ে তার সমস্তটার কাটান হ'য়ে যাবে। সীতা দুঃখ পেলে তাতে রামচন্দ্রের অপরাধ কোথায়?—তিনি ত শুধু নিমিত্তের ভাগী। শুধু কি তাই? পত্নীনিপীড়ন করার মহত্ত্বে তিনি সকলের কাছে বাহাদুরিই পাবেন,—কেউ বলবে এমন প্রজারঞ্জক রাজা আর হয় না, কেউ বা বলবে আর কিছু।"

সন্ধ্যার এই সুতীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার আঘাতে প্রিয়লালের মুখ কালো হ'য়ে উঠল। এ তিরস্কার তার প্রতি কতখানি প্রযোজ্য তা উপলব্ধি ক'রে, সন্ধ্যা সাধারণভাবে তার মন্তব্য প্রকাশ করছে, এই ভ্রান্ত ধারণাও তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলে না। ক্ষণকাল নির্ব্বাক থেকে দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে বললে, "আপনার অনুযোগের একটি কথারও আমি প্রতিবাদ করিনে মিসেস্ মুখার্জ্জি, কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনার তিরস্কারের সবটা মাথায় পেতে নিতে বাধ্য। কথাটা সবিস্তারে বলবার প্রয়োজনও নেই, বললে হয়ত অশোভনও হবে, তবে এটুকু আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে আমার কাহিনী শুনলে আপনি বুঝতে পারতেন, আমি নিজেও আপনাদের এই বাঙলা দেশের একজন অত্যাচারী রামচন্দ্র।"

সহসা প্রিয়লালের এই নির্ম্মুক্ত আত্মস্বীকৃতি এবং আত্মপ্রকাশে সন্ধ্যা বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রিয়লালের কাহিনী যে তারই হৃদয়ের রক্তাক্ষরে লেখা কাহিনী তা' ত প্রিয়লাল জানে না, সুতরাং তার বিবৃতি কোন পথে কি ভাবে অগ্রসর হয়ে তাকে বিপন্ন করবে সেই দুশ্চিন্তায় মনে মনে চঞ্চল হয়ে সে বললে, "থাক, ডক্টার চৌধুরী, এ-সব কথার আলোচনায় কোনো ফল নেই,—এ শুধু আপনাকে অকারণ কষ্ট দেবে।"

বিষণ্ণমুখে প্রিয়লাল বললে, "সত্যিই কোনো ফল নেই, কারণ আমার সীতাও নিজেকে এমনভাবে বিলুপ্ত করেছেন যে, কোনোদিন দেখা হয়ে যে মার্জ্জনা ভিক্ষা করবার সৌভাগ্য পাব সে পথ আর নেই।" তারপর সন্ধ্যা হয়ত এ-সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পছন্দ করছে না আশঙ্কা ক'রে অপ্রতিভ মুখে বললে, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জ্জি, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন ক'রে ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা টেনে আনা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। সময়ে সময়ে মানুষের এমন দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্ত আসে যখন সে কোনোমতেই নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারে না। আমারো বোধহয় ঠিক সেইরকম একটা মুহূর্ত্ত এসেছিল,—নইলে পূর্ব্বে ত আর কখনো কারুর কাছে এ-সব কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার হয়নি।"

এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থেকে মৃদু ব্যথিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আপনার কথা শুনে দুঃখিত হলাম ডক্টার চৌধুরী, কিন্তু এ-সব কষ্টকর প্রসঙ্গে আর কাজ নেই। আপনি স্থির হোন।"

ট্রেণ তখন অযোধ্যার ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছিল। ক্ষণকাল সন্ধ্যা ও প্রিয়লাল উভয়ে নিজ-নিজ চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে নীরবে বসে রইল। অবশেষে মৌনভঙ্গ ক'রে সন্ধ্যা ডাকলে, "ডক্টার চৌধুরী!"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "আজ্ঞে?"

"ফয়জাবাদ আর ক'টা ষ্টেশন পরে?"

"এর পরে ফয়জাবাদ সিটি, তারপরে ফয়জাবাদ জংশন।"

"আমি বলি ডক্টার চৌধুরী, ফয়জাবাদে না নামলে আপনার যদি কাজের ক্ষতি হয় অথবা অন্য কোনো অসুবিধা হয়, তা হ'লে আমার সঙ্গে আপনার লক্ষ্ণৌ গিয়ে কাজ নেই। এটুকু পথ দিনে-দিনে অনায়াসে একা যেতে পারব। চিঠি গেছে, কাল হাওড়া ষ্টেশন থেকে তার করে দিয়েছে, ষ্টেশনে গাড়ি নিয়ে লোকজন আসবে, কোনো অসুবিধে হবে না।"

প্রিয়লাল বললে, "একটি বন্ধুর জন্যে আমার ফয়জাবাদে নামা। সে যদি এর মধ্যে লাহোর চ'লে গিয়ে থাকে তাহ'লে ফয়জাবাদে নামার কোন প্রয়োজনই আমার থাকবে না।"

"তিনি ফয়জাবাদে আছেন কি চ'লে গেছেন সে খবর আপনি ষ্টেশনে পাবেন ?"

"নিশ্চয়ই পাব। থাকলে সে আমাকে নাবিয়ে নিতে ষ্টেশনে আসবে।"

সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে ত কোনো অসুবিধে নেই, ফয়জাবাদ ষ্টেশনেই কথাটা বোঝা যাবে।"

মনে মনে কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে প্রিয়লাল বললে, "তা হয়ত যাবে।"

কিন্তু ফয়জাবাদ ষ্টেশনে যখন গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল তখন কথাটা খুব সহজে বোঝা গেল না, একটু জটিল হ'য়েই দেখা দিলে। প্রিয়লালের বন্ধু গোপিকারমণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উন্নয়নে ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িগুলো লক্ষ্য করছিল, প্রিয়লালকে জানলার ধারে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে তাড়াতাড়ি প্রিয়লালের কামরার পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রিয়লাল বললে, "কি গোপি, খবর সব ভাল ত ?"

গোপিকারমণ বললে, "ভাল। নেমে এস প্রিয়। কুলি ডাকি ?"

প্রিয়লাল নামবার কোনো লক্ষণ আদৌ প্রকাশ না ক'রে বললে, "রোসো, একটু ভেবে দেখি।"

বিস্মিত কণ্ঠে গোপিকারমণ বললে, "ভেবে দেখবে আবার কি হে ?"

কণ্ঠস্বর একটু নিচু ক'রে প্রিয়লাল বললে, "সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি আমার বন্ধুপত্নী, তাঁকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দেবার ভার আমার উপর আছে।"

মৃদুস্বরে বললেও কথাটা সন্ধ্যা স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিল; প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "সমস্ত রাত ত' আপনি হেফাজৎ ক'রে নিয়ে এলেন, এখন এটুকু পথ আমি অনায়াসে যেতে পারব। আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে যেতে পারেন ডক্টার চৌধুরী।"

সন্ধ্যার কথা শুনে উৎফুল্ল হ'য়ে গোপিকারমণ বললে, "ঐ ত উনি নিজেই বলছেন, তবে আর কি, চল।"

প্রিয়লাল বললে, "উনি ভদ্রতা করে বলছেন ব'লেই আমি অভদ্রতা ক'রে আমার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করতে পারি কি-না তাই ভাবচি। উনি এ কথা অনেক আগে থেকেই বলছেন, কিন্তু লক্ষ্ণৌ এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ। এত আগে ওঁকে একা ছেড়ে দিলে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন হবে না কি?"

ক্ষুণ্ণ হ'য়ে গোপিকারমণ বললে, "সে কথা তুমি ভেবে দেখ। কিন্তু কাশ্মীর আমার যাওয়া হ'ল না এ কথাও তোমাকে ব'লে দিলাম।"

"কেন ?"

"কেন ? একা আমি তৎপর হ'য়ে ফয়জাবাদ থেকে লাহোর গিয়ে তোমাদের সঙ্গে একত্র হব, এই পরিচয় তুমি আমার জানো ?"

গোপিকারমণের কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি করব। লক্ষ্ণৌ থেকে ফয়জাবাদ এসে তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাব।"

সহাস্যমুখে গোপিকারমণ বললে, "একমাত্র বন্দী অবস্থাতেই যদি হয়.—স্বেচ্ছায় স্বচেষ্টায় যে হবে না তা নিশ্চয়। কিন্তু এ রকম ভবঘুরে হ'য়ে আর কতদিন কাটাবে প্রিয় ?"

প্রিয়লাল স্মিতমুখে বললে, "যত দিন না ভবলীলা সাঙ্গ হয় ততদিন।"

"বাজে কথা রাখ,—কথার উত্তর দাও।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, "তা তুমি কি করতে বল ? বাড়িতে ব'সে বন্দী হ'য়ে কাটাতে বল না কি ?"

গোপিকারমণ বললে, "নিশ্চয় বলি !—ভাল রকম একটি খোঁটা গেড়ে।"

গোপিকারমণের কথা শুনে প্রিয়লাল এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে রইল; তারপর মৃদুস্বরে বললে, "খোঁটা ত উপড়ে গেছে গোপি। জীবনে দুবার খোঁটা গাড়া যায় না কি ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোপিকারমণ বললে, "দুবার ? তুমি যদি ফয়জাবাদে নামতে তা হ'লে এমন একজন লোক দেখাতে পারতাম যার উপস্থিত ছ' নম্বরের খোঁটা চলছে।"

শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্য না থাকলে অতটা সৌভাগ্য হয় না ভাই ! আমরা পাপিষ্ঠ পামর মানুষ, আমাদের এক খোঁটার বেশি ওঠবার সাধ্য নেই।"

প্রিয়লালের কথা শুনে গোপিকারমণও হাসতে লাগল।

ট্রেণ ছেড়ে দিলে ট্রেণের সঙ্গে চলতে চলতে গোপিকা বললে, 'তা হলে লক্ষ্মৌ থেকে ফিরছ ত?"

প্রিয়লাল বললে, "ফিরছি।"

ট্রেণটা একটু এগিয়ে গেলে সন্ধ্যা বললে, "অনর্থক এ কষ্টটা না ক'রে এখানেই নামতে পারতেন ডক্টার চৌধুরী।"

সন্ধ্যার এই পৌনঃপুনিক নির্বন্ধে মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে প্রিয়লাল বললে, "জীবনে এমন অনেক-কিছু করতে পারতাম মিসেস মুখার্জ্জি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক'রে উঠতে পারিনি। বুঝতেই ত' পারছেন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি।" তারপর সন্ধ্যাকে কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে বললে, "এক কাজ করলে হয়—লক্ষ্মৌয়ে আপনাকে পৌছে দিয়ে ষ্টেশন থেকেই ফয়জাবাদ ফিরলে হয়। রসুন, টাইম টেবলটা দেখি।" টাইম্‌টেবেলটা দেখে বললে, "চমৎকার ট্রেণ আছে। লক্ষ্মৌয়ে আমরা পৌচচ্ছি নটার সময়, আর একটার কাছাকাছি লক্ষ্মৌ থেকে একটা ট্রেণ ছেড়ে ফয়জাবাদ পৌছবে বেলা চারটের একটু পরে।"

সন্ধ্যা বললে, "লক্ষ্মৌয়ে যখন অতক্ষণ সময় পাচ্ছেন তখন ষ্টেশন থেকেই ফেরবার দরকার কি ডক্টার চৌধুরী,—বাড়ি গিয়ে অনায়াসে স্নানাহার ক'রে ত' আসতে পারেন।"

প্রিয়লাল কিন্তু কিছুতেই সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হল না; বললে ষ্টেশনে যখন রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে তখন স্নানাহারের কোনো অসুবিধাই হবে না, বাড়ী গেলেই বরং সঙ্গোপনীতা সন্ধ্যাকে নূতন অতিথির সেবা সংকারের দ্বারা অসুবিধায় ফেলা হবে।

লক্ষ্মৌয়ে পৌছে দেখা গেল মোটার এবং একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে গৃহরক্ষক বসন্ত চৌবে ষ্টেশনে এসেছে।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি চৌবেজী, সব ভাল ত?"

চৌবে আনত হয়ে সন্ধ্যাকে নমস্কার করে বললে, "আপকা দোয়াসে সব কুশল মা-জী।" তারপর প্রমথকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে বললে, "বাবুসাহেব কাঁহা মা-জী?" সন্ধ্যা বললে, "তিনি পথে নেবেছেন, কাল পৌছবেন।"

প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে অবতরণ করে সন্ধ্যা প্রিয়লালকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে কি স্থির করছেন ডক্টার চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বললে, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জ্জি, এ ব্যবস্থা আমার পক্ষে খুবই সুবিধার হচ্ছে,—কোনো অসুবিধে হবে না।"

যুক্তকরে সন্ধ্যা বললে, "আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করলেন ডক্টার চৌধুরী। যদি কিছু ত্রুটি অপরাধ হয়ে থাকে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।"

শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "আপনি যে অপরাধ করেছেন তা আমার চিরকাল মনে থাকবে মিসেস্ মুখার্জ্জি, কিন্তু আমার বাক্যে এবং ব্যবহারে যদি কিছু অশিষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে অনুগ্রহ করে তা ভুলে যাবেন। আচ্ছা নমস্কার।"

"নমস্কার।"

জিনিসপত্র নিয়ে সন্ধ্যা প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে চ'লে গেলে প্রিয়লাল ওয়েটিং রুমে উপস্থিত হ'ল। মনটার একটা দিক বিষণ্ণতার মেঘে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কারণ কিন্তু তার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যথাকালে স্নানাহার সমাপন ক'রে একটা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে প্রিয়লাল প্ল্যাটফর্ম্মে একটা ইজিচেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করলে। পড়তে পড়তে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তারপর কি ভেবে একটা কুলিকে ডেকে বললে, "চিজ্ উঠাও।" প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে, "বাটলারগঞ্জ মুখার্জ্জি সাহেবকা কোঠী মালুম হ্যায়?"

ড্রাইভার সাগ্রহে বললে, "মালুম হ্যায় সাহেব।"

জিনিষপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে প্রিয়লাল বললে, "চলো।"

অর্দ্ধপথ এসে কিন্তু সহসা মনটা একটা অপরিমেয় বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে উঠল। ছি, ছি, এ ত ঠিক প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্কল্প নয়! এ কিসের আকর্ষণ! কিসের মোহ! অন্যায়, ভারি অন্যায়! পাঞ্জাবী ড্রাইভারের দিকে মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রিয়লাল বললে, "রোকো।"

পথপার্শ্বে গিয়ে গাড়ি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

"ষ্টেশন ওয়াপস্ চলো।"

সবিস্ময়ে ড্রাইভার প্রিয়লালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

আরও একটু দৃঢ়স্বরে প্রিয়লাল তার পূর্ব্বাদেশের পুনরুক্তি করলে। তখন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পাঞ্জাবী ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটে চলল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়েই কিন্তু পুনরায় মন গেল বদলে। ষ্টেশনে উপনীত হয়ে ড্রাইভারের হাতে একটা টাকা দিয়ে বললে, "একঠো বড়া টাইমটেবল্ খরিদ করকে লাও।"

অনাবশ্যক দ্বিতীয় টাইমটেবল্ খরিদ হয়ে এলে প্রিয়লাল বললে, "চলো বাটলারগঞ্জ।"

প্রিয়লালের ভ্রান্তিশীল খেয়ালী মনকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ড্রাইভার বাটলারগঞ্জের দিকে ধাবিত হ'ল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বৌদ্ধ বিহারে কয়েকদিন

শ্রীরাধাভূষণ বসু, বি, এস্-সি

ছুটি—ছুটি—ছুটি! ছুটির আনন্দ ছেলেমানুষকে যেমন করে পেয়ে বসে আমার এই যৌবন দিনেও ছুটির আনন্দে মন তেমনি করে নেচে ওঠে—ঘরের বাইরে মন যায় ছুটে। কিন্তু ছুটি মাত্র দশ দিন···কাজেই বেশী দূরের পাড়ি চলবে না···অল্পেই সন্তুষ্ট হইতে হবে—উপায় নেই।

বন্ধুবর ত্রিদিব বাবু ওরফে ভাদু বাবুর পরামর্শে ভেবে দেখ্‌লাম নালন্দা, পাটনা প্রভৃতি বিশেষ দূর নয়. অল্প দিনেই শেষও করা যাবে। সব দিক্ দিয়েই সুবিধে দেখে তখন ঠিক করে ফেল্‌লাম পাটনা গমনই বিধেয়। ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়া চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্র, নালন্দার সেই বিরাট বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, জরাসন্ধের গিরিব্রজপুরী বা রাজগীর প্রভৃতি যেন কল্পনায় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল। স্থির হল পাটনা বেহার ন্যাশনাল কলেজের ইকনমিক্স্ এবং ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের গৃহে গিয়ে আস্তানা বাঁধা যাবে।

রাত্রির গাড়ীতে রওনা হলাম—পথের কথা যাকে বলে একেবারে ঘটনাবৈচিত্রহীন।...গাড়ীতে ভীড় মোটেই ছিলনা, কাজেই দুটো কথা কাটাকাটি, ঝগড়া বা বচসা যে হবে তারও উপায় ছিল না···নিরুপদ্রব আরামে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে ঠিক সময়ে পাঞ্জাব মেল পাটনা জংশন ষ্টেশনে আমাদের নামিয়ে দিলে।

সমস্ত দিনটা কেবল গল্পেই কাট্‌ল···বিমান বাবু গল্প পেলে অবশিষ্ট বিশ্ব বিস্মৃত হন···আমাদের ভাদু বাবুও সে বিষয়ে কম যান না। বিদেশে এসে ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গল্প কর্‌তে আমি অভ্যস্ত নই···মুসাফির মন আমায়··· চুপ করে থাকতে চাইলনা। শেষ পর্য্যন্ত চুপচাপ বসে থাক্‌তে পার্‌লামনা···সন্ধ্যার অন্ধকারে "গোল-ঘর" দেখ্‌তে বার হয়ে পড়লাম। এই গোল-ঘরটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ···কোম্পানীর আমলে তৈরী হয়েছিল···শস্য মজুদ করে রাখার জন্যে। বিরাট একটা গোলাকার ঘর...ইটের গাঁথনী আর খুব উঁচু। গোল-ঘরের ওপর থেকে পাটনা সহরের বেশ চমৎকার পাখচক্ষু (Bird's Eye) দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এর দুপাশ থেকে

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠনাগার—পাটনা

মাথার ওপরে যাবার জন্য সর্পিল সোপানাবলী আছে...মাথায় একটা গোল দরজামত ছিল, তার ভেতর দিয়ে শস্য ফেলে দেওয়া হত নীচে, আর নীচে একটা দরজা আছে সেখান থেকে দরকার মত বার করে নেওয়া হত। মাথার গোল দরজাটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে...গোলঘরের ব্যবহারও এখন নেই... এ কেবল একটা দ্রষ্টব্য জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

রাত্রে বাসায় ফিরে বিমান বাবুর ভাই অমল বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম স্থির করা গেল।

পরদিন ভোর না হতেই অমল বাবু পূর্ব্ব রাত্রের প্রতিশ্রুতি মত আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন। আমিও যত শীঘ্র পারলাম তৈরী হয়ে যাত্রার জন্য রাস্তায় পা বাড়ালাম। দেখি অমল বাবু দুখানা ভাল সাইকেল আমাদের জন্যে ঠিক

করে রেখেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সাইকেল আমার পক্ষে, স্থাবর না জঙ্গম, কোন শ্রেণীর বস্তু। দুচাকার ভক্ত আমি বরাবরই, দুচাকার সওয়ার হতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত...এতে বিদেশে যত্র-তত্র যাবার সুবিধেটা খুব...কারণ এই যন্ত্রটীকে এমন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়েও চালনা করা সম্ভব অপরাপর যান-বাহনের যে

গোল-ঘর—পাটনা

পথে প্রবেশ করবার কোন উপায় নেই। বললাম, সাইকেল আমার পক্ষে স্থাবর বস্তু নয়। শুনে অমল বাবু খুসি হলেন এবং তাঁর দুজন সাইক্লিষ্ট বন্ধুকে দলভুক্ত করে নিলেন। চারজনেরই পরিধানে আধা-সাহেবী পোষাক,—দলটি দেখাতে লাগ্‌ল একটা ছোট-খাট ব্যাটালিয়নের মতো।

এইবার আরম্ভ হল আমাদের আশ মিটিয়ে ঘোরা আর আমার প্রাণভরে দেখা। নিউ টাউন্, ওল্ড্ টাউন, পাটনার আশে পাশে যেদিকে খুসী দুচাকা চালিয়ে দিলাম। দিন নেই দুপুর নেই, বিকেল নেই, এমনকি রাত্রির প্রথম দিকটা পর্য্যন্ত নেই, ঐ এক কাজ...কেবল ঘোরা আর ঘোরা। মাঝে মাঝে দুরত্বের বিরতির* মধ্যে ক্যামেরাটাকে কাজে লাগিয়ে নেওয়া হত...আবার সুরু হত পাল্লাপাল্লির দৌড়। গৃহকর্ত্তা এবং গৃহকর্ত্রী উদ্বিগ্ন হতেন, স্নান, আহার এবং নিদ্রার অনিয়মে শরীর অসুস্থ হবে। আমি আশ্বাস দিতাম, তাঁদের নিশ্ছিদ্র আতিথেয়তাকে পরাজিত করে অসুস্থ হবে শরীরের সে শক্তি নেই!

পাটনার দ্রষ্টব্য স্থান সকল একে একে যথাসম্ভব শীঘ্র শেষ করলাম। পাটনা কলেজ, সেনেট হাউস, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী, ইউনিভারসিটি বিল্ডিংস্, ক্যাভেন্‌ডিশ হাউস, ফ্যারাডে হাউস্, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, খোদাবক্স লাইব্রেরী, ট্রেনিং কলেজ, দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বাড়ী, বি, এন, কলেজ,

মিউসিয়ম—পাটনা

গীর্জ্জা, মেয়েদের কনভেণ্ট, মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল,... হার্ডিং পার্ক, গভর্মেণ্ট হাউস, কাউন্সিল হাউস, হাইকোর্ট, নিউ মার্কেট, সিভিল জেল, জেনারেল পোষ্ট-অফিস প্রভৃতি সমস্তই যেন একটা দ্রুতবিলীয়মান আবর্ত্তে চক্ষুর উপর দিয়ে ঘুরে গেল। চিত্র-জগতে তাদের বন্দী করবার জন্য ক্যামেরা বেচারিকে খুব খানিকটা খাটিয়েও নেওয়া গেল। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই গত ভীষণ ভূমিকম্পের চিহ্ন আজও সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে।...মেরামতের কাজ তখনও চল্‌ছে। নিউ টাউন-এর সকল বাড়ী একেবারে নতুন বল্লেই হয়, অথচ প্রকৃতির মদোন্মত্ততাকে উপেক্ষা করতে কেউই পারেনি। কেবল প্রাচীন গোল-ঘরটী দেখ্‌লাম ঝটিকাক্ষুব্ধ বনানীর মধ্যে পিতামহ বটবৃক্ষের মতো অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন বিমান বাবুর সঙ্গে স্থানীয় মিউসিয়মে যাওয়া গেল। বাড়ীটী বেশ সুন্দর...প্রাচ্য স্থাপত্যকলার একটি সুন্দর

নিদর্শন,...তুলনায় কিন্তু কলকাতা মিউসিয়মের কাছে নিতান্ত ছোট। দ্রষ্টব্য তেমন বিশেষ কিছু নেই...বিশেষত্বের মধ্যে কেবল একটা প্রকাণ্ড fossilized গাছ আছে দেখলাম। কিউরেটার শ্রীযুক্ত মনমোহন ঘোষ মশাইয়ের সঙ্গে বিমান বাবুর আলাপ ছিল...তাঁর সৌজন্যে মিউসিয়মের Strong roomএ Show caseএ রাখা নানারকম তামা, রূপা আর সোনার মুদ্রা দেখায় সুবিধে হল। মুদ্রাগুলি প্রায় সমস্তই হিন্দু এবং বৌদ্ধ যুগের...বেশীর ভাগই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের...স্থানীয় খননের ফলে পাওয়া গেছে। ছেলেবেলায় ইতিহাসের পুস্তকে এই রকম অনেক মুদ্রার ছবি দেখেছিলাম...এতদিনে চাক্ষুষ দেখে পরিতৃপ্ত হলাম।

সন্ধ্যায় বিহার ইয়ংমেন্স ইনষ্টিটিউটে একদিন যাওয়া গেল। বিমানবাবুই তার সেক্রেটারী। জয়পুর থেকে এক খ্যাতনামা গায়ক এসেছিলেন...সেদিন তাঁর গান হচ্ছিল···আর সেই উপলক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যেটা একরকম মন্দ কাটলনা...যদিও গায়ক মশাইয়ের খ্যাতির তুলনায় তাঁর গানের মোহিনী শক্তি আমাদের কানে অনেকখানিই পিছিয়ে পড়ছিল।

জৈন মন্দির—পাটনা

একদিন রাত্রে পাটনা সিটিতে "গুরুদ্বোয়ারা" অথবা "গুরু-দ্বার" দেখ্‌তে গেলাম। এবার আমি একলাই গেলাম, কারণ আমার প্রবাসী বাঙ্গালী বন্ধু তিনজনেই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আটকে পড়েছিলেন। বিশেষ কোনো অসুবিধে হল না...জিজ্ঞাসা করতে করতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলাম। "গুরুদ্বোয়ারা" হচ্ছে শিখ-গুরু, গুরু গোবিন্দসিংহের জন্মস্থান। "গুরুদ্বোয়ারায়" মন্দিরের ধ্বজার ওপর আকাশ-প্রদীপের মত লাল, সবুজ, নানা রংয়ের বিজলী-আলো

সেক্রেটারিয়েট—পাটনা

জলে......অনেক দূর থেকেই ঐ ধ্বজা দেখা যায়···রাত্রে ঐ আলোকগুলোর জন্যে দূর থেকে মন্দিরটি খুব সুন্দর দেখায়। মন্দিরের আশেপাশে অনেক শিখ বসবাস করেন দেখলাম... স্থানটিকে একটি ছোটখাট শিখ colony বলা চলে। মন্দিরটী বেশ বড় ... সেখানে অনেক শিখ সমবেত হয়ে মন্ত্র উচ্চারণ আর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের সাহায্যে গান করছিলেন...ধূপ-ধুনার গন্ধে মন্দিরটীর অভ্যন্তর সুরভিত হয়ে উঠেছে—মন্ত্রোচ্চারণ শুনে মন ভক্তিতে ভরে যায়··· মাথা আপনা থেকেই সেই ইতিহাসবিখ্যাত শিখ-গুরুর উদ্দেশ্যে নত হয়। গুরু গোবিন্দ সিংহের নাম নিশ্চয়ই সকলে জানেন···তাঁর পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। কেবল ভাবি এই রাষ্ট্রগুরুর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আর তাঁর অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কথা।··· তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি···তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত আর তাঁরই সাহসে অনুপ্রাণিত "খালসা", "শিখ" তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই পবিত্র গান শুনলাম...কিছু প্রণামী দিয়ে,

গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আবার পথে বেরিয়ে এলাম। ফেরার পথে পাটনায় "চক্" দেখলাম।...এই "চক্" প্রত্যেক পুরান সহরের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ...দিল্লী, আগরা, মথুরা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, গয়া, পাটনা...সকল সহরেই "চক্" বর্ত্তমান...এমন কি কলকাতাতেও "চাঁদনী চক্" আছে। অন্য সব সহরের মত পাটনার চকও একসুরে বাঁধা...দোকান, বাজার আর ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ী...মধ্যে মধ্যে সরু নোংরা গলি।

একদিন স্থির করলাম "কুমরাহর" দেখ্‌তে যাব। স্থানটি চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্র, তথা অশোক রাজার রাজধানীর

শোণ-ভাণ্ডার গুহায় যাওয়ার পথ—রাজগীর

কাছে। এখানে Archoeological Department থেকে অনেক খোঁড়া খুঁড়ি হয়েছে, এখনও হচ্ছে...চন্দ্রগুপ্তের পাটলিপুত্রের অনেক জিনিষই খুঁড়ে পাওয়া গেছে এখানে। দিনটা ছিল পূর্ণিমা...বিমান বাবুর খেয়াল হল রাত্তিরে "কুম্‌রাহর" যেতে হবে...ভাদু বাবুও সায় দিলেন...দিনেতো সবাই দেখে, রাত্তিরে কজন যায়? যুক্তি মন্দ নয়, তবুও আমি প্রথমে একটু আপত্তি দেখালাম, কারণ প্রথম কথা ভাল করে দেখা যাবে না...টর্চ্চের কতটুকুই বা ক্ষমতা...দ্বিতীয়তঃ ক্যামেরার সদ্ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু আমার কোনও কথাই শেষ পর্য্যন্ত টেঁক্‌ল না।...

সন্ধ্যে বেলায় আমার সততনির্ভরসহ টর্চ্চটা নিয়ে তিন জনে "কুমরাহর" রওনা হলাম...পায়ে চলার পথে। যায়গাটা পাটনা জংশন ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে, বরাবর E. I. Ry. লাইনের ধারে ধারে বক্তিয়ারপুরের দিকে পথটা চলে গেছে। গল্প আর গানের মধ্য দিয়ে রাত্রি ৮টা নাগাত গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলাম। এই কি সেই চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত সুন্দর পাটলিপুত্র নগর? চারদিকে নাতিবিস্তৃত বন...আশে-পাশে জনমানবের চিহ্ন নেই বল্‌লেই হয়...এমন কি নগরের ধ্বংসাবশেষও কিছু নেই যেখানে গুরু চাণক্যের খোঁজ করব। একটা প্রকাণ্ড পাথরের অশোক স্তম্ভের খানিকটে ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে দেখ্‌লাম...খুব ভারী বলে সেটা মিউসিয়মে নিয়ে যাওয়া হয়নি...আর যা কিছু পাওয়া গেছে খননের ফলে সবই স্থানীয় মিউসিয়মে স্থান পেয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্র নগরের অনেক চিহ্নের উদ্ধারসাধন হয়েছে...শুন্‌লাম কাঠের বাড়ীর জিনিসপত্র, কাঠের তক্তাও অনেক পাওয়া গেছে। ইতিহাসে পড়েছিলাম চন্দ্রগুপ্ত কাঠের কেল্লা তৈরী করেছিলেন...কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। মাটির নীচে খুঁড়তে খুঁড়তে এই সব পাওয়া গেছে। যায়গাটাতে বহু গর্ত্ত হয়ে গেছে ......বর্ষার জল জমে মেলাই পুকুরের সৃষ্টি করেছে। এখনকার পথের সমতা থেকে কত নীচে পাটলীপুত্র নগর ছিল তা দেখ্‌বারও উপায় নেই। জানা গেল, বর্ষার জল শীতকালে একেবারে শুকিয়ে যায়...তখন পাটলীপুত্রের কোনও চিহ্ন মিল্‌তে পারে হয় তো। মনটা বড় দমে গেল...অনেক আশা করে এসেছিলাম...একেবারে নিরাশ! প্রকৃতির খেয়ালের কাছে মানুষের ক্ষমতা বা চেষ্টা কত নগণ্য আর অকিঞ্চিৎ-কর! প্রবল প্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, অশোক...তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্যের কোনও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নেই...এমন কি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজধানী পাটলীপুত্র গভীর মাটির নীচে সমাধি লাভ করেছে...কেবল Archoeological Departmentএর একটা কাষ্ঠ-ফলক আজ তার লুপ্ত অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে...নিয়তির এ কি পরিহাস! মানব-

কীর্ত্তির নশ্বরতা আর ক্ষণভঙ্গুরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এর চেয়ে বুঝি আর কিছু নেই! কবি Shellyর লেখা "Ozymondias" কবিতাটা মনে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ করে থাকার পরে বিমান বাবু প্রথম কথা কইলেন, 'কি, ভায়ার পাটলীপুত্র দেখায় সাধ মিট্‌ল? আমি ত বলেইছিলাম...দিনের বেলা এলে তুমি এর চেয়ে তফাৎ কিছুই দেখ্‌তে না...দেখ, রাত্রে কুমরাহর কত নিস্তব্ধ আর চাঁদের আলোয় কত সুন্দর।' কথাটা খুবই সত্য··এর পরে ছবি নেবার জন্যে দিনের প্রখর রৌদ্রেও কুম্‌রাহর্ গিয়েছি...কিন্তু সে রাত্তিরের মত অত সুন্দর লাগেনি।

একদিন সকাল বেলা কল্‌কাতাগামী ডাউন শিয়ালদা এক্সপ্রেসে বিমান বাবু, ভানুবাবু আর আমি নালন্দার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পাটনার দু-তিনটে ষ্টেশন পরে বক্তিয়ারপুর জংশনে নেমে বক্তিয়ারপুর বেহার লাইট্ রেলওয়ে করে নালন্দা যেতে হয়। অবশ্য বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীর পর্য্যন্ত নালন্দা হয়ে মোটর যাবার রাস্তাও আছে...কিন্তু সে পথ তত আরামদায়ক নয়।

বেলা ১০টার সময় নালন্দা পৌঁছে গেলাম। ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় আমাদের জিনিসপত্র রেখে কেবল খাবারের টিফিন-ক্যারিয়র দুটো নিয়ে এক কুলীকে গাইড্ করে আপাততঃ নালন্দা মিউসিয়মের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। মিউসিয়মটি খুব ছোট···স্থানীয় খননের ফলে যা কিছু পাওয়া গেছে সবই এখানে আশ্রয় পেয়েছে। খবর নিয়ে জানা গেল মিউসিয়মের কর্ম্মকর্ত্তার নাম শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু। শুনে আমাদের বিমান বাবু যেন অকূলে কূল পেলেন। সতীশ বাবু তাঁর বিশেষ পরিচিত। ইতিপূর্ব্বে সতীশ বাবুর অতিথি হয়ে তিনি বার দুই নালন্দা বেড়িয়ে গেছেন। কুলীকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে আমরা সতীশ বাবুর খোঁজে গেলাম...তিনি তখন Excavation fieldএ কাজ তদারক করছিলেন। স্থানটা মিউসিয়মের খুব কাছে···তখনি তাঁকে খুঁজে বার করা হল···সঙ্গে দেখি বন্ধুবর চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত...আধাসাহেবী পোষাকে তাঁর শ্রীঅঙ্গ শোভিত...একটা নোটবুকে অনবরত কি লিখে চলেছেন। তাঁকে দেখে আমি যতটা আশ্চর্য্য হলাম, আমাকে দেখে তিনি ততোধিক। তাঁকে ঐখানে ঐ অবস্থায় দেখতে পাব আশা করিনি...অনুসন্ধানে জানলাম তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের রিসার্চ ওয়ার্ক করতে গেছেন ওখানে। বেলা তখন অনেক হয়ে গেছে। কাজেই দেখাশোনার ব্যাপার পরের জন্যে স্থগিত রেখে আমরা সকলে সতীশ বাবুর আস্তানায় উপস্থিত হলাম, এবং যথাসম্ভব শীঘ্র স্নানাহার সেরে নিয়ে মিউসিয়মের আম্রকুঞ্জে দেহটাকে একটা 'চার পাই' এর ওপর এলিয়ে দিলাম। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সতীশ বাবুর

সাধারণ দৃশ্য—রাজগীর

আতিথ্যের কোনও ত্রুটী হয়নি সেকথা এখানে স্বীকার করতেই হবে।

মিউসিয়ম দেখতে বেশী সময় লাগলনা—ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা Excavation fieldএর দিকে অগ্রসর হলাম। অসংখ্য বাড়ী, ঘরের উদ্ধারসাধন করা হয়েছে ......গুণে শেষ করা যায় না...স্তূপ, আচার্য্যের ঘর, ছাত্রদের থাকবার ঘর, পড়ার জন্যে ইট বাঁধান বেদী, পূজার যায়গা, বক্তৃতামণ্ডপ, ইট বাঁধান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উঠান, কুয়ো, জলের নালা তার আর সংখ্যা নেই। কি সুন্দর ইটের গাঁথনী! ইটগুলি সারনাথের মত নানা রকম কারুকার্য্য করা। তখনকার দিনে ভূমিকম্প প্রায়ই হত। একবার ভূমিকম্প হয়ে একটা স্তূপ বা বাড়ীর খানিকটে হয় তো পড়ে

গেল…সেই ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে না ফেলেই তার ওপর আবার নূতন স্তূপ বা বাড়ী তৈরী করা হত। একটা বড় স্তূপ দেখলাম…তার আধখানা মাত্র রাখা হয়েছে…Section দেখাবার জন্তে। তাতে ধ্বংসাবশেষের পর পর সাতটা বিভিন্ন স্তর দেখা গেল! গত ভূমিকম্পে এই স্তূপটার অনেক ক্ষতি হয়েছে…অন্য অনেক ছোট ছোট স্তূপ বাড়ীর অংশেও ভূমিকম্পের ছাপ বর্ত্তমান দেখ্‌লাম। ভূমিকম্পের ফলে অতবড় বিরাট নালন্দা বিশ্ববিত্যালয় যেখানে ১০,০০০ ছাত্র থেকে পড়াশুনা করত (Residential University) একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল…তার ধ্বংসাবশেষের ওপরও ভূমিকম্পের আক্রোশ

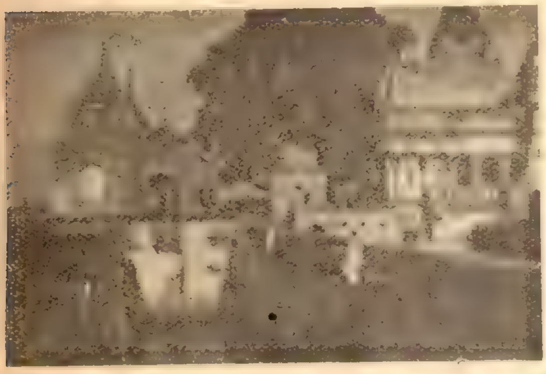

উষ্ণ-প্রস্রবণ, কুণ্ড এবং স্নানের ঘাট—রাজগীর

কম নয়! তখনকার দিনে ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষে পাবার জন্তে বাড়ীর বনেদের গাঁথনীও অন্য রকমের হত। সতীশবাবু দেখালেন এক যায়গায় বনেদের গাঁথনী…খানিকটে এখনকার মত পাকা ইটের গাঁথা…তার ওপরে পর পর ইট এবং বালির স্তর…যাতে করে ভূমিকম্পের ফলে বনেদ ফেটে গেলে অথবা ফাঁক হয়ে গেলে বালি দিয়ে সেই সব ফাঁক বন্ধ করে বনেদকে সুদৃঢ় রাখা যেত। এই সব দেখে মনে হয় বিহারের ভূমিকম্প কিছু নতুন নয়…তা না হলে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রের কেল্লাই বা কাষ্ঠের তৈরী হবে কেন? ভূমিকম্পের সঙ্গে বিহারের পরিচয় বহুদিনের আর বহুবারই ভূমিকম্প বিহারের বুকের ওপর তার বিজয়-নিশান উড়িয়ে গেছে।

আর এক জায়গায় একটা নতুন জিনিষ দেখলাম… নালন্দা যে সময়ে তৈরী হয়েছিল সে সময়ে খিলানের বড় একটা প্রচলন ছিল না…সারনাথেও খিলান দেখা যায় না… কিন্তু নালন্দাতে ইট দিয়ে তৈরী বড় বড় কয়েকটা খিলান দেখলাম। খিলানগুলো খুব চওড়া আর একদিক বন্ধ…এক একটা গুহার মত…বোধ হয় এখানে পূজা এবং আরাধনা হত। সেই কোন্ যুগে তৈরী হয়েছে…কিন্তু কালের অপরিসীম ক্ষমতাকে পরাভূত ক'রে এখনও অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে…শুধু ইট আর সুরকীর গাঁথনি!… আর বিশেষত্ব দেখ্‌লাম কোনও জায়গায় কাঠের একটা টুক্‌রারও চিহ্ন নেই…কড়ি কাঠ, দরজা, জানালা,… কিছুরই নিদর্শন নেই… কেবল ইটের তৈরী ইমারতেরই অস্তিত্ব দেখা যায়। দু-এক যায়গায় ক্বচিৎ দরজার চৌকাঠ দেখা গেল…পুড়ে একেবারে কাল কাঠকয়লা হয়ে গেছে। এই রকম পোড়া চৌকাঠ খান দুই নালন্দা মিউসিয়মেও আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে খুব সম্ভব একটা বড়গোছের আগুন লেগে যায় সমস্ত বিত্যালয়টিতে…যাতে করে কাঠের জিনিষের কোনও চিহ্ন নেই…যে দু-একখানা অর্দ্ধদগ্ধ চৌকাঠ দৈবক্রমে রক্ষে পেয়েছিল সেগুলোই তার প্রমাণ।

নালন্দায় খোঁড়া-খুঁড়ির কাজ এখনও চলছে। কতদিন আর লাগ্‌বে কে জানে। এখনও বহু স্তূপ, ঘর, বাড়ী সমাধি লাভ করে আছে যা' খুঁড়ে বার করতে বহু সময় আর অর্থের প্রয়োজন। যতটুকুর উদ্ধার সাধন হয়েছে তাতেই নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয়। সমস্ত নালন্দা বিশ্ববিত্যালয়কে আবার কোনও দিন লোকচক্ষুর সাম্‌নে আনা যাবে কি না কে জানে? Archoeological Departmentই এর উত্তর দিতে পারেন। নালন্দার বিশ্ববিত্যালয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধণের কীর্ত্তি…প্রায় হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষে ১০,০০০ ছাত্রের উপযোগী Residential University ছিল। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতের সভ্যতা…ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কত প্রাচীন …নালন্দার বিশ্ববিত্যালয় তার প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? কিন্তু শুধু নালন্দাই নয়, হরাপ্পা আর মহেঞ্জোদড়োতেও তার প্রভূত প্রমাণ সঞ্চিত আছে।

নালন্দার উদ্ঘাটিত ক্ষেত্র (Excavated area) এত বিস্তৃত যে দু-একখানা ফটোর কাজ নয়…আকাশ-দৃশ্য নিলে তার বিরাটত্বের কিছু ধারণা করা যেতে পারে। তবুও যে

কখানা সম্ভব ছবি নেবার আশায় ক্যামেরাটাতে হাত দিলাম··· কিন্তু এত নিরাশ বুঝি কেউ হয়নি আজ পর্য্যন্ত! সতীশ বাবু জানিয়ে দিলেন যে ছবি নেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ···সামনেই Archoeological Departmentএর একটা এনামেল প্লেটে বড় বড় অক্ষরে সেই কথাগুলো লেখা আছে।...সতীশ বাবু সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায় বাধ্য হয়ে আমাকে নিরস্ত হ'তে' হ'ল। কথাবার্ত্তায় জান্‌লাম যে Archoeological Department থেকে খাড়া হুকুম দেওয়া হয়েছে যে খনন কার্য্য সম্পূর্ণ শেষ হয়ে তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ কোনো ছবি তুলতে পার্‌বেন না। এই হুকুমের অনতিবর্ত্তনীয়তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সতীশ বাবু বল্‌লেন যে, কল্‌কাতার কোনও সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা জমিদার নিষেধ করা সত্ত্বেও ফটো তুলেছিলেন ...কিন্তু তিনি Excavation Area হতে বাহিরে পদার্পণ করামাত্র সমস্ত প্লেট্‌গুলির ভার হ'তে তাঁকে বিমুক্ত করা হয়েছিল। অতঃপর সতীশ বাবুকে অনুরোধ করে অনুমতি নেবার আশা মোটেই রইল না।

ফের্‌বার পথে পাশের একটা ফাটল থেকে এক প্রকাণ্ড কাঁক্‌ড়া বিছে বেরিয়ে একেবারে আমাদের পায়ের কাছে এসে উপস্থিত হল···হাতের লাঠিটা তুলেছি মারতে...অমনি বিমান

জৈন মন্দির—রাজগীর

বাবু হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, হাঁ হাঁ কর কি কর কি। নালন্দায় প্রাণীহত্যা······দেখ্‌ছনা? বলে পাশের একটা উঁচু থামের ওপর আসীন বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখালেন। সত্যি, সেই ধ্যানী, প্রশান্ত বুদ্ধ মূর্ত্তির দিকে তাকালে হিংসা, দ্বেষ সবই আপনা হতেই চলে যায়। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বুদ্ধ-বানী স্মরণ করে ভক্তিতে মাথা আপনিই নুয়ে পড়্‌ল··· বেচারী কাঁক্‌ড়া বিছে নিস্কৃতি পেয়ে প্রাণ নিয়ে ততক্ষণে সরে পড়েছে।

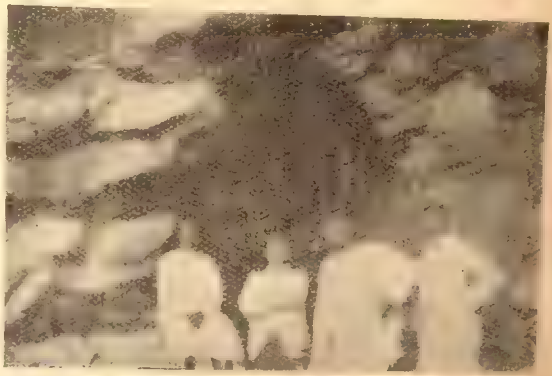

সপ্তপর্ণি গুহার মধ্যে একটি—রাজগীর

এখানেও পাণ্ডার উপদ্রব আছে দেখ্‌লাম···কাছেই একটী মন্দির আছে; বিমান বাবুরা সেই মন্দিরে গেলেন...আমি ফির্‌লাম। মিউসিয়মে ফিরে দেখি একদল ভদ্রলোক মিউসিয়মের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন...জানিনে কার জন্যে। সকল স্থানেই আমার অবাধ আর স্বচ্ছন্দ গতি দেখেই বোধ হয় তাঁরা ধারনা করেছিলেন যে আমি সেখানকার এক জন কর্ত্তাব্যক্তি। আমার মত তাঁরাও ছবি তোলা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে শেষে মিউসিয়মের সাম্‌নে নিজেদের একটা group ছবি তোলবার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেবার মালিক আমি নই তবে সতীশ বাবু এ বিষয়ে কোনও আপত্তি কর্‌বেন না মনে মনে স্থির করে অনুমতি দিলাম। এই উদারতার কৃতজ্ঞতায় আমিও সেই group-এ স্থান পেয়ে গেলাম। আলাপে জান্‌লাম হ্যাট্‌কোট্ পরিহিত ভদ্রলোকটী দানাপুরে কাজ করেন...নাম Mr. J. P. Ray....পঞ্জাবী...আর সঙ্গী দুজনের মধ্যে একজন তাঁর গুরুদেব আর অপরটী চেলা। এক কপি ছবি পাঠাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন...ঠিকানাটাও তাঁর নোটবুকে লিখে নিলেন। ভদ্রলোক শেষ পর্য্যন্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষেও করেছিলেন।

এবার নালন্দা শেষ করে রাজগীরের দিকে এগোবার পালা। সন্ধ্যের সময় সতীশ বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে ষ্টেশনের দিকে চল্লাম। চারু বাবুও আমাদের সঙ্গী হলেন। তাঁরও ইচ্ছা রাজগীর দেখে যান। সেখান থেকে তিনি তাঁর কাজে পাটনায় ফিরবেন। সন্ধ্যে ৭৷৷০ টায় একটা ট্রেন বক্তিয়ার-পুর থেকে নালন্দা এসে পৌছায়...সেই ট্রেণ রাত ৮ টার কিছু পরে রাজগীরকুণ্ড ষ্টেশনে পৌছে গেলাম। কোথায় থাকা যায় এ নিয়ে এক সমস্যা উপস্থিত হল; শেষে থাকবার স্থান ধর্ম্মশালাতে পাওয়া গেল। এখানে শ্বেতাম্বর আর দিগম্বর

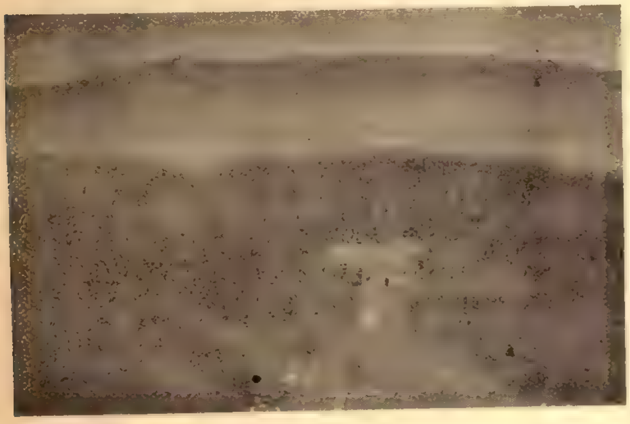

দূর হ'তে শোন-ভাণ্ডার-গুহা এবং পর্ব্বত—রাজগীর

দুই সম্প্রদায়ের দুটী খুব বড় ধর্ম্মশালা আছে। বলা বাহুল্য, রাজগীর এখন জৈন-প্রধান যায়গা। চারু বাবু জানালেন শ্বেতাম্বরী ধর্ম্মশালায় তাঁর এক জন বিশেষ বন্ধু সপরিবারে এসে আছেন...নালন্দাতে দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে...তাঁর মারফত তিনি একটা ঘর রিসার্ভ করে রেখেছেন। অতএব সকলে শ্বেতাম্বরী ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপন স্থির করলাম। চারু বাবুর বন্ধু শ্রীযুক্ত রণেন বাবু......বেশ অমায়িক ভদ্রলোক, কল্‌কাতায় থাকেন,...পেশা জমিদারী। চারু বাবুর রিসার্ভ করা ঘর পাওয়া গেলনা...কারণ, একে ঐ সময়ে ধর্ম্মশালায় ঘর পাওয়া কষ্টকর...তার ওপর ভূমিকম্পে ঐ ধর্ম্মশালার অধিকাংশই পড়ে গেছে। বিরাট বাড়ী...গত ভূমিকম্পে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে এর...৩।৪ হাজার লোক ধরে এত বড় সিমেন্টকরা উঠান কেবল ভাঙ্গা ঘরের রাবিশ বোঝাই হয়ে আছে। যাই হোক্, রণেন বাবুর স্ত্রী দুই এক দিন পূর্ব্বে পাটনাতে তাঁর পিতৃব্যগৃহে গমন করায় রণেন বাবু নিজের দুখানা ঘরের একখানা আমাদের ছেড়ে দিলেন। এই ঘরটাতে আমাদের সকলের স্থান হওয়া একটু কষ্টকর বিবেচিত হওয়ায় বিমান বাবু ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে পরিচয় দিতে, ম্যানেজার নিজে এসে একটা বেশ বড় ঘর দেখে দিলেন। রণেন বাবুর অতিথিসৎকার অবিস্মরণীয়। ভদ্রলোক লোক জন দিয়ে, অবশেষে নিজ হস্তেও লুচি ভেজে দিলেন আমরা পরের দিন পাহাড়ের ওপর খুন্নিবৃত্তি করব বলে। প্রত্যুষে রণেন বাবু আমাদের ডেকে দিলেন। তাঁর লোক জনেরা চা তৈরী করে দিল। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ধর্ম্মশালায় আলাপ হয়েছিল ...তিনি ধর্ম্মশালায় কিছু দিন হতে আছেন...পাহাড়ের পথ-ঘাট সব তাঁর জানা...তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক হতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু টিফিন-ক্যারিয়রদুটী কে নেয়? বড় জটিল সমস্যা। পাহাড়ের ওপর খাবারের হাঙ্গামা করা আমার মোটেই ইচ্ছে ছিলনা...তার চেয়ে খেয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু গণতন্ত্রবাদের যুগে অধিকাংশের মতই গ্রাহ্য, সুতরাং আমার কথা টিঁকল না। আমি কিছু নিতে আপত্তি জানালাম, কারণ আমার ক্যামেরা আর বৃহদাকার টর্চের পরে আর কিছু নেওয়া সম্ভবপর হবেনা। চারু বাবুও তাঁর ক্যামেরা আর নোট বই-এর দোহাই দেখালেন। বিমান বাবুও জানিয়ে দিলেন যে তিনি ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে নেই। অগত্যা ভাদু বাবু এগিয়ে এসে বললেন 'কাকেও কিছু নিতে হবেনা... খাবারের বিভাগ আমার' বলে টিফিন-ক্যারিয়রদুটী বেশ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে বহনোপযোগী করে একটী নিজে নিলেন আর একটী সদ্যপরিচিত ভদ্রলোককে দিলেন।

আমরা পাঁচজনে রাজগৃহ অথবা জরাসন্ধের গিরিব্রজপুরীর দিকে এগোতে লাগলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল পাহাড়... এ যেন ঠিক 'যেদিকে ফিরাই আঁখি কেবলি পাহাড় দেখি,' অবস্থা। এখন যে স্থানটাকে জরাসন্ধের গিরিব্রজপুরী বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে ঠিক যে সেইখানেই গিরিব্রজপুরী ছিল

তা জানতে গেলে ভীম, অর্জ্জুন অথবা চতুর চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষ্য তলব করতে হয়। তবে মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী এই যায়গাকেই মেনে নিতে হয়...চারদিকে সুউচ্চ পাহাড় আর তার মাঝখানে সমতল যায়গা...একটা নদীও খুব কাছাকাছি আছে...রাজধানী করার উপযুক্ত স্থান নিঃসন্দেহ। প্রকৃতিই এই স্থানটাকে সুরক্ষিত করে রেখেছে...একে রক্ষে করার জন্যে সিপাই ফৌজের বিশেষ প্রয়োজন দেখিনে। এক যায়গায় খানিকটে পাথরের গাঁথা পাঁচিল আছে দেখ্লাম... সকলে বল্লেন গিরিব্রজপুরীর পাঁচিল। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করে ফটো নেওয়া গেল।

রাজগীরের 'হট্ স্প্রিং' বিখ্যাত...অনেকে বাত ও অপরাপর বেদনা ভাল করার মানসে এখানে এসে প্রস্রবণের গরম জলে স্নান করেন। ঝরনাটা ঠিক যে কোন্খান থেকে উঠেছে দেখা যায় না...তবে একটা নল দিয়ে তার জল এসে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ছে...জল খুব গরম...খেতে কেমন জানিনে...তবে স্নানে সুখ আছে নিঃসন্দেহ। হট্ স্প্রিং-এর পাশেই কয়েকটা মন্দির আছে। এক ধারে মেয়েদের কাপড় ছাড়ার ঘরও একটি আছে। ঝরণা দেখেই বিমান বাবুর খেয়াল হল স্নান করতে হবে...সকালের ঠাণ্ডা মিঠে হাওয়ায় গরম জলে স্নান নিশ্চয়ই আরামদায়ক। ভানু বাবুরও তাই মত। পাহাড় ভ্রমণ শেষ করে স্নান করলে ভ্রমণজনিত ক্লেশের উপশম হবে মনে করে চারু বাবু আর আমি আপাততঃ ওকাজে বিরত থাকলাম। স্নান সেরে আবার বিমান বাবুর মাথায় নতুন মতলব এল...খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করা। টিফিন ক্যারিয়রদুটো বোঝা বিশেষ। খাবার খেয়ে ওদুটো কথঞ্চিৎ হাল্কা ক'রে ফেলতে পারলে একটু সুবিধা হয়। এই সিদ্ধান্তই হল চরম। তথাস্তু। খাবারের বিভাগ ভানু বাবুর ...সযত্নে টিফিন-ক্যারিয়রের ঢাকনী খুলে ফেললেন—কিন্তু খাবার কই? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সব কটা বাটিই দেখা হল...কা কস্য পরিবেদনা...কোথায় খাবার? দ্বিতীয় ক্যারিয়রটারও অবস্থা তাই। পরস্পর মুখ চাওয়া চাই করছি... টিফিন-ক্যারিয়র দুটো যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে অট্টহাস্য করছে! এমন ভুলও মানুষের হয়! খালি টিফিন-ক্যারিয়র আর ভর্ত্তি টিফিন ক্যারিয়রের ওজনেরও অনেক তফাৎ...অতখানি পথ হাতে করে বয়ে নিয়ে গিয়েও তা বোঝা যায়নি। দৈব নিতান্তই প্রতিকূল বলতে হবে। একচোট হাসি পড়ে গেল। ভানুবাবু বলে উঠ্লেন "বাবুদের যা বুদ্ধি!" কিন্তু কার নির্বুদ্ধিতার জন্যে এমন ঘট্ল কেউই বল্তে পারে না। মিছে

বুদ্ধমূর্ত্তি—নালন্দা

সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই...খাওয়ার বাতিক যখন হয়েছে কিছু খেতেই হবে। মন্দিরের কাছে এক চানাচুর-ওয়ালার কাছে কিছু ছোলাভাজা, কড়াইভাজা ইত্যাদি আর কিছু স্বদেশী প্যাঁড়া কিনে চিবোতে চিবোতে ওপরে উঠ্তে লাগ্লাম। জিনিসগুলো মুখরোচক ছিল না মোটেই তবু Hunger is the best sauce, কাজেই সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে গেল।

পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলো জৈন মন্দির আছে...প্রায় সব মন্দিরেই তখন পূজা, আরাধনা হচ্ছিল। একটা মন্দিরে কতকগুলি জৈন মেয়ের কণ্ঠে বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণের গান শুনলাম...সকাল বেলার সেই মধুর আবহাওয়ায় মন্দিরের মধ্যে ঐ রকম সমবেত বালিকাকণ্ঠের গান সত্যই এক স্বর্গীয় আনন্দ এনে দিলে। মন্দিরগুলো একে একে দেখে শেষ করে আমরা সপ্তপর্ণী গুহার দিকে এগুলাম। পরপর পাশাপাশি

সাতটি গুহা...এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন আগে...আবার কেউ কেউ বলেন, এখানেই ভগবান্ বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম বাণী প্রচার করেন। সাতটীর মধ্যে যেটী সব চেয়ে বড়, সেইখান থেকে তথাগতের বাণী ছড়িয়ে পড়ত সেই গুহার অনেক নীচে সমবেত ভক্ত আর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা গভীর সুড়ঙ্গ ...অত উঁচু থেকে কি করে যে রেডিওর বিনা সাহায্যে বাণী প্রচার সম্ভবপর হত তা নির্দ্ধারণের ভার Archoeological Department আর আমাদের চারু বাবুর ওপর ছেড়ে দিয়ে দল সমেত গুহাটার একটা স্মৃতি চিহ্ন নিলাম।

এবার নামবার পালা...যথা সম্ভব আস্তে আস্তে আর সাবধানে নেমে শোন-ভাণ্ডার গুহা দেখতে গেলাম। শোন-ভাণ্ডার গুহা সম্বন্ধে কেউ বলেন এই খানেই ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধকে মল্ল যুদ্ধের পরে মেরে ফেলেন, আবার কেউ বলেন যে এই খানে জরাসন্ধের ধনভাণ্ডার ছিল, আর তাই থেকেই এর নাম হয়েছে শোন-ভাণ্ডার। এ দুই মতের হয়তো

মিউসিয়ম সংলগ্ন উদ্যান—নালন্দা

কোনটাই সত্যি নয়...তবে এটা ঠিক যে এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন আর রাজগীরের বহু গুহার মত এটাও সেই কাজে ব্যবহৃত হ'ত। গুহাটা বেশ বড়...ভিতরের চারিদিক ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

বেলা প্রায় ১২টা বাজে দেখে আর বেশী কিছু দেখা মুলতুবি রাখাই স্থির হ'ল। আমাদের প্রত্যেকের ছ্যাকা গাড়ীরও তখন "পাদমেকম্ ন গচ্ছামি" অবস্থা! ফিরবার পথে হট্‌স্প্রিং-এ স্নানটা সেরে নিলাম...কিন্তু যা আশা করেছিলাম হ'ল ঠিক তার উল্টো...বেলা

মিউসিয়ম—নালন্দা

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসের জলের তাপ বেড়ে গেছে যথেষ্ট... স্নান করব কি...গায়ে ফোস্কা পড়ার উপক্রম...কোনও মতে কাকস্নান সেরে আড্ডায় ফেরা গেল। রণেন বাবু ক্ষুন্ন মনে খাবারের ট্র্যাজেডির কথা উত্থাপিত করলেন...তিনি খাবার দিয়েছিলেন তাঁর নিজের টিফিন ক্যারিয়রে...আর সেটা আমাদের ক্যারিয়রদুটোর পাশেই ছিল। যা হোক্, রাজগীরের কুকুরদের একদিন রীতিমত ভোজ হয়ে গেল...সকলেই ত শ্রীকৃষ্ণের জীব!

তারপরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত...রণেন বাবুর সৌজন্যের জন্য তাঁকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার জানিয়ে বিকেল ৩টার সময় পাটনার দিকে রওনা দিলাম। রাত্রে পাটনা পৌঁছে, পরদিনই গৃহস্বামী বিমানবাবু, গৃহকর্ত্রী সুচিত্রা দেবী এবং অন্যান্য প্রবাসী বন্ধুদের কাছে বিদায়ের পালা শেষ করে ঘরে ফিরবার ইচ্ছায় ডাউন শিয়ালদহ এক্সপ্রেস্ ধরলাম...ঘরমুখো বাঙালীর ছেলে ঘরের পথেই ফিরে চলল...কিন্তু সে ফেরার কাহিনী বৈচিত্র্যহীন।

শ্রীরাধাভূষণ বসু

গীতায় কর্ম্ম ও যজ্ঞ

শ্রীঅনিলবরণ রায়

১

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ্ অকর্ম্মণঃ ॥
গীতা ৩।৮

"তুমি [বুদ্ধি দ্বারা] নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম কর, কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই মহত্তর. এমন কি কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইবে না।"

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টং। প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায় সকলেই নিয়ত কর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি নিত্য কর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, এখানে "নিয়তং কর্ম্ম" অর্থে পূর্ব্ব শ্লোকের * মর্ম্ম অনুসারে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া [নিয়ম্য] যে কর্ম্ম করা যায় (controlled action) কেবল তাহাই বুঝায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরায় নিয়ত কর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে। সন্ন্যাসীগণ যে বলিয়া থাকেন, শরীর ধারণের জন্য ভিক্ষা প্রভৃতি যে-সব কর্ম্ম না করিলে নহে তদ্ব্যতীত অন্য সমুদয় কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে হইবে, গীতার মধ্যে কোথাও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে, যজ্ঞ দান তপস্যা এই সকল কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সকল কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন,

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ১৮।৫

আর যজ্ঞ দান প্রভৃতি কর্ম্মকে গীতা অতি উদার অর্থে ব্যবহার করিয়াছে, এ সবের দ্বারা কেবল শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মই বুঝে নাই। সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মই করিতে হইবে, কিন্তু তাহা যেন হয় নিয়তং কর্ম্ম অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম। কর্ম্মকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে প্রথম অবস্থায় শাস্ত্র আমাদের সহায় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং গীতাও তাহা অন্যত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে,

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ১৬।২৪

কিন্তু এখানেও গীতা শাস্ত্র বলিতে শ্রুতি, স্মৃতি বা অন্য কোন বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থ নির্দ্দেশ করে নাই। অশুদ্ধ বাসনা কামনাদির বশে [কামকারতঃ] না চলিয়া সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে কর্ম্ম করাই প্রাথমিক সাধনা, এবং শাস্ত্র অনুসরণ বলিতে ইহাই বুঝায়। পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবনের সকল বিভাগেই শাস্ত্র প্রণীত হইতেছে, কোন্ কার্য্য কি ভাবে সম্পাদন করিলে তাহা উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার নিজ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতে পারে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা নানা নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত হইতেছে। এইভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চারুকলা, সঙ্গীত, এমন কি দাবা খেলা, তাস খেলা সম্বন্ধেও বিস্তারিত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাচীন ভারতের মনীষিগণও জীবনের নানা বিভাগের জন্য এইরূপ নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং সাধারণ প্রাকৃত জীবনকে সংযত ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিতে এই সকল শাস্ত্র বিশেষ সহায়রূপে পরিগণিত হইত, গীতাতে তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক শাস্ত্রের অনুসরণকেই গীতা কর্ম্ম সাধনের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বলে নাই। ক্রমশঃ এই সব বাহ্য নীতি, বাহ্যিক শাস্ত্র ও বিধিনিষেধের

* যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
গীতা ৩।৭

ঊর্দ্ধে উঠিয়া, আমাদের যে আভ্যন্তরীন স্বভাব বা মূল প্রকৃতি তাহার অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম *। কিন্তু পরিশেষে আমাদের ভিতরে ও ঊর্দ্ধে যে ভগবান বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই ইচ্ছা দ্বারা যখন আমাদের সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইবে, তখনই তাহা হইবে শ্রেষ্ঠ। কেবল এইরূপ কর্ম্মই মুক্ত পুরুষের যথার্থ ও সত্য কর্ম্ম, মুক্তস্য কর্ম্ম। এই রকম কর্ম্ম বর্জ্জন করিবার চেষ্টা ঠিক নহে; অজ্ঞানের বশে যাঁহারা মনে করেন যে, এই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াই মুক্তিলাভ করা যায়, তাঁহাদের সেই ত্যাগ তামসিক।

পূর্ব্ব শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে সেই শ্রেষ্ঠ, মনসা নিয়ম্য আরভতে কর্ম্মযোগম্, এবং ঠিক ইহার পরই এই সাধারণ নীতি হইতে একটি বিশেষ বিধান বাহির করিলেন, ইহার সারটুকুকে লইয়া ইহাকে একটি নির্দ্দেশে পরিণত করিলেন, নিয়তং কুরুকর্ম্মত্বম্, তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। পূর্ব্ব শ্লোকের 'নিয়ম্য" শব্দকে লইয়া এখানে "নিয়তং" করা হইয়াছে, এবং "আরভতে কর্ম্মযোগম্"কে লইয়া এখানে "কুরুকর্ম্মত্বম্" করা হইয়াছে। বাহ্যিক বিধি-নিষেধের অনুসরণে গতানুগতিক কর্ম্ম নহে, পরন্তু মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার শিক্ষা।

"কৃষ্ণ বলিলেন, এইরূপ আত্মসংযমের সহিত কর্ম্ম কর। আমি বলিয়াছি যে, জ্ঞান বুদ্ধি কর্ম্ম অপেক্ষা বড়, জ্যায়সি কর্ম্মণঃ বুদ্ধি, কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই যে, কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মশূন্যতা বড়, বরং ইহার বিপরীতটাই সত্য, কর্ম্ম জ্যায়ঃ হ্যকর্ম্মণঃ। কারণ জ্ঞান বলিতে কর্ম্মত্যাগ বুঝায় না, সমতা এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্তিই বুঝায়। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিম্নতর ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে ও শুদ্ধ বিষয় শূন্য আনন্দে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে [নিয়তং কর্ম্ম], জ্ঞান বলিতে বুদ্ধির সেই অবস্থাই বুঝায়। কর্ম্মযোগের দ্বারা ভক্তিযোগ সম্পূর্ণ হয়; আত্মমুক্তিদায়ক বুদ্ধিযোগ কামনাশূন্য কর্ম্মযোগের দ্বারা সার্থক হয়। এইরূপে গীতা নিষ্কাম কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছে এবং সাংখ্যদের কেবল বাহ্যিক, শারীরিক বিধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীন জ্ঞানের প্রণালীর সহিত যোগ প্রণালীর সমন্বয় করিয়াছে।" [শ্রীঅরবিন্দের গীতা ২য় খণ্ড পৃঃ ৮, ৯]

আমাদের এই জীবন হইতেছে একটি যাত্রা Journey, কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকৃতির বিকাশ সাধন করিয়া আমরা সকলেই অমৃতত্বের উদ্দেশ্যে চলিয়াছি। এই যাত্রায় শরীর আমাদের অপরিহার্য্য সহায়, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। কর্ম্ম না করিলে এই শরীরকে পর্য্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব নহে। তৎকালে সাংখ্য শিক্ষার প্রভাবে কর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছিল, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন তাহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গীতা নানাভাবে এই কর্ম্মত্যাগ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করিয়াছে এবং কর্ম্মের উপযোগিতার উপর পুনঃ পুনঃ জোর দিয়াছে। ইহা সত্বেও শঙ্কর নিজ মায়াবাদের অনুসরণে কর্ম্মত্যাগকেই গীতার প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে কতই না কষ্টকর ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যকে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার পিতৃবন্ধু সার্ব্বভৌম ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন হে। সব কথা বেশ বুঝিতে পারিতেছ ত?" শ্রীচৈতন্য হাত জোড় করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, "আজ্ঞে, সূত্রগুলির অর্থ বুঝিতে কোন কষ্টই হইতেছে না, তবে সেগুলির উপর ভগবান ভাষ্যকার যে অর্থ আরোপ করিয়াছেন তাহা আমার কাছে একেবারেই দুর্ব্বোধ্য।"

২

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচর ॥
গীতা ৩।৯

* ইহার উত্তরে কেহ হয়ত বলিবেন যে, শাস্ত্র স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিবারই উপদেশ দিয়াছে। কিন্তু কাহার মূল স্বভাব কি তাহা তাহার ভিতর হইতেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কোন সামাজিক বিধি বিধান বা শাস্ত্রের দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। শাস্ত্র কেবল প্রথম অবস্থাতেই সহায় হইতে পারে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, শাস্ত্রবাক্যের মোহে মানুষ নিজের স্বরূপের সন্ধান পায় না, তাই গীতা শাস্ত্র বর্জ্জনেরও বিধান দিয়াছে, যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। (১৭।১)

"যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম তাহা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিয়া এই সংসার কর্ম্মে বদ্ধ হয়; হে কৌন্তেয়, তুমি সকল আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কর।"

পূর্ব্বশ্লোকে "নিয়তং" কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে অর্থাৎ বাসনা কামনা হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কর্ম্মের প্রেরণা কোথা হইতে আসিবে? সাধারণতঃ লোকে ইন্দ্রিয়গণের রাগদ্বেষ হইতে, প্রাণের বাসনা কামনা হইতেই কর্ম্মের প্রেরণা লাভ করে, সে সবকে বর্জ্জন করিলে মানুষ কিসের জন্য কর্ম্ম করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরেই এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিতে হইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, গীতা যজ্ঞ বলিতে কেবল জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ বা অগ্নিতে কোন বস্তুর হোম করাই বুঝে নাই। বস্তুতঃ গীতার সময়ে বৈদিক যাগ যজ্ঞ সকল ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের কথা হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয় (২৫৯ অধ্যায় ৭-৯ শ্লোকে) লোকে ভিতরের নিগূঢ় অর্থ না বুঝিয়া গতানুগতিক ভাবে যে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে গীতা তীব্রভাষায় তাহার নিন্দা করিয়াছে (২।৪২)। তথাপি গীতা বৌদ্ধগণের ন্যায় যজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই, যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম সত্যটি গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ শব্দকে অতি উদার অর্থ প্রদান করিয়াছে। যজ্ঞ যেমন দেবতাদের উদ্দেশে করা হয়, আমাদের ভিতর ও বাহিরের সকল কর্ম্মই সেইরূপ ভগবানে উৎসর্গ করিতে হইবে,

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭

গীতা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিতে এইভাবে সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা বুঝিয়াছে। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ," এই শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করিয়া অনেকেই বলিয়াছেন যে, এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ ঈশ্বর। কিন্তু এইরূপ কষ্টকল্পিত গৌণ অর্থ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। গীতা যজ্ঞ শব্দে যজ্ঞই বুঝিয়াছে। তবে যজ্ঞ মাত্রেরই লক্ষ্য হইতেছেন ভগবান। সকল জীব, প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই ভগবানের জন্য, ভগবান হইতে আসিতেছে। ভগবানের দ্বারা বিধৃত রহিয়াছে, ভগবানের অভিমুখে চলিয়াছে। অতএব এই সমুদয়কে যজ্ঞরূপে ভগবানে অর্পণ করিলে আমাদের জীবনের যাহা নিগূঢ় সত্য তাহারই অনুসরণ করা হয়। অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া আমরা এই সত্য হারাইয়া ফেলি, স্বার্থভাবের বশে কর্ম্ম করি, তাই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। প্রাচীন টীকাকারগণ যে এখানে "যজ্ঞ" শব্দের "ঈশ্বর" অর্থ করিয়াছেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতেও যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিতে কেবল বৈদিক যজ্ঞ এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মগুলিই বুঝায় না; যে কর্ম্মই হউক না, তাহা যদি ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাতে জীবের বন্ধন হয় না।

সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মকে নিস্বার্থ কর্ম্ম বলা হয়, সেগুলি প্রকৃত নিষ্কাম নহে, ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্ত্তে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য; সমাজের জন্য, দেশের জন্য, মানবজাতির জন্য যে সকল কর্ম্ম করা হয়, সে সকল দৃশ্যতঃ নিষ্কাম হইলেও তাহাদের মূলে কামনা রহিয়াছে। আবার কৃষ্ণ বার বার বলিয়াছেন যে, সকল কর্ম্মই আমাদের প্রকৃতির দ্বারা, প্রকৃতির গুণ সকলের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আমরা যখন শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করি তখনও আমরা নিজেদের প্রকৃত অনুসারেই কর্ম্ম করি।— বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, নানা মুনির নানা মত যেটি আমাদের রুচি বা সংস্কারের অনুযায়ী হয় আমরা সেই শাস্ত্রটিই গ্রহণ করি। সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মের বিধি শাস্ত্রে আছে সেগুলি পরোক্ষভাবে আমাদের স্বার্থেরই অনুকূল, আমাদের ভোগবাসনা সকল চরিতার্থ করিবার, আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভাব, সংস্কার, অহঙ্কার চরিতার্থ করিবার সহায়। কিন্তু যদি কেবল সেই সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের কথা ধরা যায় যেগুলির সহিত আমাদের কোন স্বার্থের সম্পর্ক নাই, সেগুলিও আমরা আমাদের প্রকৃতির বশেই করিয়া থাকি। কারণ, আমাদের প্রকৃতি যদি অন্যরূপ হইত, প্রকৃতির গুণসকল যদি ভিন্নভাবে আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির উপর ক্রিয়া করিত তাহা হইলে আমরা ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে যাইতাম না, হয় আমরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের ভোগেচ্ছা অনুসারে কর্ম্ম করিতাম অথবা নিজেদের যুক্তিমত আদর্শের অনুসরণ করিতাম, অথবা হয়ত সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া একক তাপস বা সন্ন্যাসীর

জীবন যাপন করিতাম। আমাদের বাহিরের কোন আইন কানুন বিধিনিষেধ মান্য করিয়া আমরা কখনই নিঃস্বার্থ হইতে পারি না, কারণ আমরা কিছুতেই আমাদের বাহিরে যাইতে পারি না। শুধু আমাদের ভিতরের যে শ্রেষ্ঠ সত্তা রহিয়াছে তাহাতে উঠিতে পারিলে, আমাদের যে মুক্ত আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মার সহিত এক অতএব যাহার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই সেই আত্মাকে লাভ করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃতভাবে নিঃস্বার্থ ও আমিত্বশূন্য হইতে পারি। আমাদের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, যিনি বিশ্বের অতীত, বিশ্বের কোন কর্ম্মের দ্বারা অথবা নিজের ব্যক্তিগত কোন কর্ম্মের দ্বারাই বদ্ধ নহেন, তাঁহার সহিত যখন আমরা সজ্ঞানে যুক্ত হই, তাঁহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই, তখনই আমরা সকল বন্ধনের অতীত হই, সকল কর্ম্ম করিয়াও ভগবানের ন্যায়ই চিরমুক্ত থাকিতে পারি। গীতা ইহাই শিক্ষা দিয়াছে কামনাশূন্যতা ইহারই উপায়মাত্র, জীবনের লক্ষ্য নহে। সকল কর্ম্ম ভগবানে যজ্ঞরূপে অর্পণ করিতে হইবে, এইভাবেই ভগবানের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা ও ভক্তি দৃঢ় হইবে, পরিশেষে আমরা ভগবানকে লাভ করিয়া তাঁহার মধ্যেই বাস করিয়া সকল বন্ধনের, সকল শোক দুঃখ ভয়ের অতীত হইব।

সাংখ্যগণের মতে সকল কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে," কর্ম্মের দ্বারাই জীব বন্ধন-দশাগ্রস্ত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারাই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে—শাস্ত্রোক্ত এই বাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গীতা বলিতেছে যে যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম তাহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয়, অতএব তাহাতে বন্ধনের আশঙ্কা নাই। বস্তুতঃ সংসারের সকল কর্ম্মই প্রকৃতি কর্ত্তৃক ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সম্পাদিত, এই বিশ্ব-লীলা এক বিরাট যজ্ঞ, একমাত্র ভগবানই এই যজ্ঞের অধীশ্বর ও ভোক্তা। কিন্তু যতক্ষণ আমরা অহংভাবের অধীন ততক্ষণ এই সত্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, পরন্তু অহংয়ের ভোগবাসনার তৃপ্তির জন্য, অহংভাবের বশে কর্ম্ম করি, এই অহংভাবই বন্ধনের গ্রন্থি। কোনরূপ অহংচিন্তা না করিয়া ভগবানের উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে এই গ্রন্থি খুলিয়া যায় এবং পরিশেষে আমরা মুক্তিলাভ করি।

গীতা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিতে কেবল বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান বা বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম বুঝে নাই। কোন বাহ্যিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করা গীতার প্রকৃত শিক্ষা নহে। আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, সে সবই আমাদের মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্ম, এই সকল কর্ম্মকে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিলে আমাদের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয় এবং ক্রমশঃ আমাদের প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর সাধিত হয়, ইহাই গীতা শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম। অনেকেই গীতার নিয়তং কর্ম্ম" বলিতে বেদের নিত্য কর্ম্ম বুঝিয়া থাকেন এবং গীতার "যজ্ঞার্থ কর্ম্ম" বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনাশূন্য হইয়া বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বুঝিয়া থাকেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "গীতার অর্থ এরূপ স্থূল ও সহজ নহে, এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং দেশ-কালে সীমাবদ্ধ নহে। গীতার শিক্ষা উদার, মুক্ত, সূক্ষ্ম এবং গভীর, ইহা সকল যুগের এবং সকল মনুষ্যেরই উপযোগী, কেবল কোন বিশেষ দেশ, বা কোন বিশেষ যুগের নহে। বিশেষতঃ ইহা সকল সময়েই বাহ্য বিধিনিষেধের, খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের গতানুগতিক ধ্যানধারণার গণ্ডী ছাড়াইয়া মূল সত্যের দিকে গিয়াছে, আমাদের প্রকৃতির, আমাদের জীব-নের প্রধান তত্ত্বগুলিরই হিসাব লইয়াছে। উদার দার্শনিক সত্য এবং ব্যবহারোপযোগী আধ্যাত্মিকতা লইয়াই গীতার শিক্ষা—ইহাতে ধর্ম্মের গোঁড়ামি নাই, বাঁধাধরা বিধিনিষেধ বা বিশেষ দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ নহে"। [শ্রীঅর-বিন্দের গীতা]

আমার নিজের জন্য, আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা আদর্শসিদ্ধির অভিপ্রায়ে, আমি এই কাজ করিতেছি, এইরূপ ভাবই "সঙ্গ"। ইহা হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। আমাদের এই জীবন পাইয়াছি ভগবানের কাজ করিবার জন্য, জগৎমাঝে ভগবানের আত্মপ্রকাশে সহায়তা করিবার জন্য—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেই আমরা সকল সঙ্গ ও আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে পারি। "আমি করিতেছি" এই বোধ যতদিন থাকিবে ততদিনও সকল কর্ম্ম ভগবানের জন্য করিতে হইবে। সকল স্বার্থচিন্তা, ব্যক্তিগত লাভ বা ভোগের লালসা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি হইতে নির্ম্মূল করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমশঃ অহংভাব দূর হইয়া যাইবে, তখন আমরা অনুভব করিতে পারিব যে আমরা কর্ম্মী নহি, কেবল নিমিত্ত

মাত্র, ভগবদ্‌শক্তিই আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া জগৎমাঝে ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।

৩

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
গীতা ৩।১০

"পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত জীব সমূহ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক।"

তৎকালে সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে বিরোধ ছিল গীতা নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে তাহার সমাধান করিয়াছে। সাংখ্যদের মতে সকল কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, অতএব বর্জ্জনীয়, জ্ঞানই মুক্তিলাভের পন্থা। গীতা বলিয়াছে সাংখ্যদের ন্যায় বাহিরে কর্ম্মত্যাগ উচিত নহে, তাহা সম্ভবও নহে; ভিতরে সাংখ্যজ্ঞান রাখিয়া অনাসক্তভাবে সমুদয় কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রকৃতি ভগবানের জন্য সকল কর্ম্ম করিতেছে, পুরুষ কেবল দ্রষ্টা, এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই সাংখ্য ও যোগের সমন্বয় হয়, এবং ইহাই গীতার শিক্ষা। অতঃপর মীমাংসক ও বৈদান্তিকগণের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, গীতা তাহারই সমাধান করিতে অগ্রসর হইতেছে। এইটিও জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বন্দ্ব, তবে এখানে কর্ম্ম বলিতে শুধু বৈদিক কর্ম্ম, এমন কি শুধু বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানই বুঝায়। মীমাংসা বা বেদবাদীগণের মতে এইরূপ কর্ম্মের দ্বারাই শ্রেয়ঃ লাভ হয়। বৈদান্তিকদের মতে প্রথম অজ্ঞান অবস্থায় এইরূপ কর্ম্ম সহায় হইলেও শেষ পর্য্যন্ত এ সবকে বর্জ্জন করিতে হইবে, কারণ ইহারা মুক্তিলাভের অন্তরায়। এই বিরোধের সমাধান করিতে গীতা বলিয়াছে, ফলের আশায় দেবগণের উদ্দেশে যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা বিঘ্নস্বরূপ বটে, কিন্তু যিনি সকল দেবতার আদি সেই ভগবানের উদ্দেশে সমস্ত জীবন ও কর্ম্ম যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিলে তাহার দ্বারাই পরম গতি লাভ করা যায়। এই সমন্বয়সাধন করিতে গীতাকে যজ্ঞ শব্দের উদার ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে গীতা প্রথমে প্রচলিত ভাষাতেই যজ্ঞতত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছে।

গীতা যজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝে তাহা দুইটি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করা হইয়াছে, একটি এখানে তৃতীয় অধ্যায়ে, অপরটি চতুর্থ অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে যে ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যেন গীতা যজ্ঞ বলিতে বেদোক্ত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা স্পষ্টভাবেই যজ্ঞকে উদার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক বলিয়াছে। তবে এই তৃতীয় অধ্যায়েও গীতার ভাষা এমন যে, সহজেই যজ্ঞকে উদার অর্থে বুঝা যাইতে পারে, এমন কি তাহা ছাড়া অন্য অর্থ করিতে গেলেই সমস্যায় পড়িতে হয়। প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন, ইহার ব্যাখ্যা করিতে কেহ বলিয়াছেন, যজ্ঞ শব্দে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম সমুদয়ই বুঝায়। আবার কেহ বলিয়াছেন এ স্থলে যজ্ঞ শব্দে হিন্দুর নিত্য কর্ত্তব্য পঞ্চ মহা যজ্ঞই * লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভেই ভগবান এই সব কর্ম্মতালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও কষ্টকল্পিত। যজ্ঞের প্রকৃত অর্থ হইতেছে আত্মোৎসর্গ, নিজেকে এবং যাহা কিছু লোকে নিজের বলিয়া মনে করে তাহা প্রেম ও ভক্তির সহিত অপরকে অর্পণ করাই যজ্ঞের মূল নীতি। সৃষ্টির প্রথমেই বিশ্বপিতা এই দিব্য নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, ইহার দ্বারা লোকে ক্রমশঃ অহংভাবের ক্ষুদ্রতা ও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া ভাগবত জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই যে পরার্থে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, ইহারই স্থূল দৃষ্টান্ত ও রূপক হইতেছে দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। বৈদিক যজ্ঞ, হিন্দুর নিত্য কর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ এ সবই ঐ বিশ্বনীতির বিশিষ্ট প্রয়োগ বা স্থূল প্রতীক। গীতা চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছে। গীতার মতে সকল কর্ম্ম, সকল জীবনকেই যজ্ঞ বলিয়া দেখিতে হইবে, যজ্ঞ ভিন্ন জীবনযাত্রা চলিতেই পারে না; তবে অজ্ঞানীরা যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া যজ্ঞ করে, অবিধিপূর্ব্বকম্, তাই তাহারা সম্যক ফললাভ করিতে পারে না।

প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন,

* অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলি ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

শঙ্করাদি ব্যাখ্যাকারগণ এখানে "প্রজা" শব্দে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মনুষ্য বুঝিয়াছেন। তাঁহারা যজ্ঞ শব্দের যে সঙ্কীর্ণ অর্থ ধরিয়াছেন তাহাতেই তাঁহাদিগকে এই কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কারণ বৈদিক যজ্ঞাদিতে কেবল তিন বর্ণেরই অধিকার ছিল। কিন্তু এখানে ইহা অতি স্পষ্ট যে, প্রজা বলিতে সমুদয় সৃষ্ট জীবই বুঝাইতেছে। প্রজাপতি কেবল ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণেরই পতি নহেন, তিনি সকল জীবেরই পিতা, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সকলের কল্যাণের জন্যই তিনি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা প্রসব কর।" বিশ্ব-সৃষ্টি এক বিরাট যজ্ঞ, সকল বস্তুই এই যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিতেছে, একে অপরকে সৃষ্টি করিতেছে ও তাহার মধ্যে আপনার বৃহত্তর সত্তা পাইতেছে। জড় প্রসব করিয়াছে উদ্ভিদকে, উদ্ভিদ প্রসব করিয়াছে প্রাণীকে, প্রাণী প্রসব করিয়াছে মানুষকে—এখন মানুষ প্রসব করিবে অতি-মানব কেন না পার্থিব ক্রমবিবর্ত্তনের এখনও শেষ হয় নাই এবং মানুষই তাহার চরম ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নহে। পৃথিবীতে যাহাতে অতি-মানবের, দেব-মানবের আবির্ভাব হয় সেজন্য মানুষকে তাহার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে হইবে, ইহাই মানবজাতির প্রতি ভগবানের নির্দ্দেশ, ইহাতেই মানবজীবনের পরম সার্থকতা।

"যজ্ঞই হউক তোমাদের সকল অভিষ্টভোগদাতা।" ভগবান জীব সৃষ্টি করিয়া সেই সঙ্গে যজ্ঞের নীতি প্রবর্ত্তন করিলেন যেন ইহার দ্বারা তাহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের অভিলষিত ভোগসমূহ লাভ করে। যাঁহারা বলেন এই জগৎ মিথ্যা মায়া, এই সংসারের ভোগসম্পদে যত-শীঘ্র সম্ভব জলাঞ্জলি দিয়া কৌপীন ধারণই মানুষের কর্ত্তব্য, তাঁহারা গীতার এই সকল কথার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যাই দিতে পারেন না। গীতা অন্যান্য স্থলেও ভোগের প্রশংসা করিয়াছে, যথা, ভোক্ষ্যসে মহীম্, ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্। অথচ গীতা খুব জোরের সহিতই বলিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া কামরূপ দুর্দ্দমনীয় শত্রুকে বিনাশ করিতে হইবে। গীতার কর্ম্মের মূল নীতি হইতেছে, মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ, ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া যেন কর্ম্ম করিও না। ফলের আকাঙ্ক্ষা করিব না অথচ ফল লাভ করিব, ভোগ করিব ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? ফলের ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের স্বভাব-গুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মধুসূদন সরস্বতী একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা বুঝাইয়াছেন, যথা আম্রফলের জন্য লোকে আম্রবৃক্ষ রোপন করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সুগন্ধ কামনা না করিয়াও পায়। বস্তুতঃ গীতা কামনা ত্যাগকে জীবনের লক্ষ্য করিতে বলে নাই। গীতা যে কাম ত্যাগ করিতে বলিয়াছে তাহা হইতেছে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির কাম। তাহার উৎপত্তি হইতেছে রজঃগুণ হইতে, রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। যে ব্যক্তি নীচের প্রকৃতির রাজসিক কামনা ও অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া পরাপ্রকৃতির ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার মধ্যে যে বাসনাকামনার উদয় হয় তাহা দোষের নহে, বর্জ্জনীয় নহে কারণ ভগবান নিজেই সেই ইচ্ছা বা কাম, ধর্ম্মাবিরুদ্ধভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ। এই যে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম, ইহা পুণ্যকামনা বা নীতিসঙ্গত কামনা নহে, গীতা ধর্ম্ম অর্থে পুণ্য, সাত্ত্বিকতা বা নৈতিকতা বুঝে নাই, স্বভাবের দ্বারা, স্ব-প্রকৃতির মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম্ম, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। পরা প্রকৃতির মধ্যেই রহি-যাছে আমাদের মূল স্বভাব, আমাদের ধর্ম্ম। ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সমগ্র জীবন ও কর্ম্ম উৎসর্গ করিয়া আমরা নীচের প্রকৃতির দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হই, পরাপ্রকৃতির দিব্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন আমরা হই সত্যকাম, তখন আমাদের সকল অভি-লাষ স্বতঃই পূর্ণ হয়, কারণ সে সব হয় আমাদের মধ্যে ভগবানেরই আত্মতৃপ্তির অভিলাষ। তাহা নীচের প্রকৃতির ভোগসুখের লালসা নহে, তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই লীলার আনন্দের, আত্মপ্রকাশের আনন্দের সন্ধান।

৪

দেবান্ ভাবয়তাঽনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

গীতা ৩। ১১

"এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর, দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনার দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিবে।"

বেদের রহস্য তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান সকল বহুকাল হইল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজও হিন্দুর জীবন মূলতঃ সেই বৈদিক যজ্ঞের আদর্শেই অনুপ্রাণিত। দেবদেবীগণের পূজা আহ্বান হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, হিন্দু ভোগ্য বস্তুসমূহ অগ্রে দেবতাকে অর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রসাদস্বরূপ সংসারের সুখসম্পদ উপভোগ করে। দেবতাদের উদ্দেশে হিন্দুর এই যজ্ঞ আরাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মের লোকেরা হিন্দুকে নিন্দা করে, বলে হিন্দু বহু দেবতা, বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, ইহা অজ্ঞান, কুসংস্কার। ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়; চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতা বলিয়া পূজা করা অসভ্য, অশিক্ষিত মনের ভ্রম, বড় জোর কবি হৃদয়ের কল্পনা, Figures of speech, ইহার মূলে কোন সত্য নাই। এইরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভগবানের একত্বে হিন্দুও বিশ্বাস করে, ব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ং হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, দর্শনেই সর্ব্বাগ্রে বলা হইয়াছে। তথাপি হিন্দু সেই বেদের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু দেবতার পূজা আরাধনা করিয়া আসিতেছে। অতি গভীর অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে হিন্দু এই জড় জগতের পশ্চাতে জ্যোতির্ময় দেবজগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, হিন্দুর দেবদেবীর আরাধনা অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অসভ্য, বর্ব্বরজাতির ইট, পাথর, পুতুল পূজা নহে। নিতান্ত অজ্ঞ মূর্খ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, সেও বলিবে ভগবান একই, তবে যে আমরা নানাদেবতার আরাধনা করি, সে সব সেই একই ভগবানের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন রূপ মাত্র। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সবই এক। ইহা সেই বেদেরই অতি প্রাচীন কথা,—একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি। এই একের বহু রূপ, বহুর একত্ব হিন্দু অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করে; কিন্তু হিন্দুর কাছে যাহা সহজ, পাশ্চাত্য বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতেরাও তাহা ধারণা করিতে পারেন না, তাই তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ও সংস্কারের অনুসরণে বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে লোক-চক্ষে হীন করিয়া তোলেন।

আজ জড় বিজ্ঞানও সেই প্রাচীন বৈদান্তিক সত্যকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই জগতের মূলে একই শক্তি, Energy, ক্রিয়া করিতেছে। শক্তি (Energy) এবং জড়, (Matter) এই দুইটী মূলতঃ এক বলিয়া বুঝা যাইতেছে, শক্তিরই একটি বিশেষ ঘনীভূত অবস্থা হইতেছে জড়। বিদ্যুৎ, চৌম্বক শক্তি, আলো, তাপ, গতি সবই সেই এক মূল শক্তির বিভিন্নরূপ ও ক্রিয়া। বিদ্যুৎ হইতে গতি উৎপন্ন হইতেছে, গতি হইতে তাপ উৎপন্ন হইতেছে, আবার তাপ হইতে গতি, গতি হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে, এই সকল শক্তির আদান প্রদানের দ্বারাই এই আশ্চর্য্যময় জগৎব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু এই যে মূল বিশ্ব-শক্তি বিভিন্ন নাম ও রূপের ভিতর নিজেকে প্রকট করিতেছে, বিজ্ঞান কেবল ইহার বাহ্যিক যান্ত্রিক (Mechanical) ক্রিয়াটিরই সন্ধান পাইতেছে এবং সেই যান্ত্রিক ক্রিয়ার ধারা গুলিকেই Laws of Nature, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বলিয়া আবিষ্কার করিতেছে। কিন্তু এই ক্রিয়ার পিছনে যে চৈতন্য রহিয়াছে বিজ্ঞানের টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপে তাহা ধরা পড়ে না। চৈতন্যকে আমরা জানিতে পারি কেবল অনুভূতির দ্বারা, কোন যন্ত্রের দ্বারা নহে। যখন আমরা এই আত্মশক্তির সহিত ঐক্যানুভূতিতে এক হই তখনই ইহার গভীরতম রহস্যগুলি অবগত হইতে পারি, এবং সেজন্য আমাদিগকে আমাদের নিজেদের চৈতন্যের গভীরে যাইতে হয়, কারণ আমাদের চৈতন্য ঐ বিশ্ব-চৈতন্যের সহিত মূলতঃ এক। ইহাই বৈদান্তিক জ্ঞানের প্রণালী, এবং এই প্রণালীর দ্বারাই ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ জগৎ সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

আমাদের শারীরিক অনেক ক্রিয়াই অভ্যাস বা সংস্কারের বশে যন্ত্রবৎ সম্পাদিত হয়, আমাদের চৈতন্য সেখান হইতে সরিয়া থাকে, এবং তাহাতে দৈনন্দিন জীবন ব্যাপারে অনেক সুবিধা হয়। ঠিক সেইরূপেই যে চৈতন্যময়ী শক্তি এই বিশ্বরূপে প্রকট হইতেছেন, নিজের গভীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তিনি নিজেকে রাখিয়াছেন পিছনে, বাহিরের ব্যাপারকে যন্ত্রবৎ নিয়মানুসারে চলিতে দিতেছেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত জগতের প্রত্যেক শক্তির প্রত্যেক ক্রিয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে চৈতন্য। এই যে সকল চৈতন্যময় শক্তি জাগতিক ব্যাপার সমূহের অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে,

ইহারাই দেবতা। এই সব দেবতা এক ভাগবত শক্তি হইতেই উদ্ভূত, তাহারই বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন বিভাব। গীতায় দেবগণ এইরূপই বিশ্ব-শক্তি, তাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীর দেবতা নহেন। ইহারাই বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের সকল ব্যাপার সংগঠিত ও পরিচালিত করিতেছেন, ভাগবত শক্তির সহকারীরূপে এই আশ্চর্য্যময় বিশ্ব-নাট্যের অভিনয় করিতেছেন।

দেবগণ হবির্ভোজী, মানুষ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়া দেবগণকে পুষ্ট করিবে, প্রতিদানে দেবগণ বৃষ্ট্যাদির দ্বারা মানুষকে পুষ্ট করিবেন, ইহাই বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের বাহ্য তত্ত্ব। কিন্তু এই বাহ্য তত্ত্বের পশ্চাতে একটি নিগূঢ় অধ্যাত্ম তত্ত্ব ছিল, কালক্রমে তাহা লোকে হারাইয়া ফেলে, স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আবার নূতন করিয়া যজ্ঞতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার মতে এই অনুষ্ঠানটি একটি গভীর অধ্যাত্ম সত্যের প্রতীক বা রূপক। চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে, যে অগ্নিতে হোম করিতে হইবে তাহা জড় অগ্নি নহে, তাহা ব্রহ্মাগ্নি, তাঁহাতে যে ঘৃত আহুতি দিতে হইবে সে ঘৃতও ব্রহ্ম। বস্তুতঃ বেদের ভাষা এবং বৈদিক অনুষ্ঠান সকল ছিল রূপকাত্মক। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে সোমরস ছাঁকিয়া পান করিবার কথা আছে।

তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে শোচন্তো
অস্য তন্তবো ব্যস্থিরন্।

ঋগ্বেদ ৯।৮৩।২

—'তাঁহার তপ্ত সুরা যাহাতে ছাঁকিয়া শুদ্ধ করা হয়, সেই ছাঁকুনি বিস্তৃত রহিয়াছে স্বর্গে (দিবস্পদে—In the seat of Heaven), ইহাতে জ্যোতির্ম্ময় তন্তু সকল সাজান রহিয়াছে।"

ছাঁকুনির বর্ণনা হইতেই বুঝা যায় যে, বেদে যে সোমরসের কথা আছে তাহা বাস্তবিকই উপমা মাত্র, রূপক, কারণ প্রকৃত পার্থিব সোমমদিরা ছাঁকিবার যন্ত্র স্বর্গে কেন পাতা থাকিবে এবং তাহার তন্তু সকল কেন আলোকরশ্মি বিতরণ করিবে? এখানে যে জ্যোতির্ম্ময় ছাঁকুনির বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা হইতেছে শুদ্ধ মন, শুদ্ধ হৃদয়ের রূপক এবং ঐ ছাঁকুনির তন্তু-সকল হইতেছে শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ ভাব। শুদ্ধ মনকে দৌ বা স্বর্গ বলা হইয়াছে, কারণ স্বর্গ যেমন পৃথিবীর উপরে, পৃথিবীর অপবিত্রতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনই শুদ্ধ মন ও দেহ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য ও শিহরণ হইতে মুক্ত, প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত। আমাদের সাধারণ হৃদয় মন ভোগ্য বস্তুর ঘাত প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ বিচলিত হইয়া উঠে, এইরূপ অক্ষম অশুদ্ধ হৃদয় মন লইয়া জীবনের প্রকৃত গভীর আনন্দ ভোগ করা যায় না। সাধনার দ্বারা, সংযম অভ্যাসের দ্বারা, হৃদয় মনকে শুদ্ধ, শান্ত, রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবনের যে তীব্র, গভীর, অফুরন্ত বিশুদ্ধ আনন্দ তাহা উপভোগ করিতে পারা যাইবে।

জগতে অনুস্যূত যে আনন্দধারার রূপক সোমরস, বেদে তাহাকেই সোমদেব বলা হইয়াছে। কিন্তু এই আনন্দধারা সর্ব্বত্র বিস্তৃত, অরূপ, নিরাকার, Impersonal। ইহা ছাড়া সোমদেবের সাকার রূপও আছে, সোমদেব নিরাকার আনন্দ-ধারাও বটেন আবার সাকার দিব্য পুরুষও বটেন। বেদে অন্যান্য দেবতাদেরও এইরূপ দুইটি দিক আছে, যথা, অগ্নি জগতের সর্ব্ববস্তুর অন্তস্থলে রহিয়াছে, যাহা বাহ্য জগতে অগ্নি ও জ্যোতিরূপে প্রকট তাহাই আবার মানুষের হৃদয়ে তপস্যার শিখারূপে, ভগবদ্‌মুখী আকাঙ্ক্ষা ও দিব্য ইচ্ছাশক্তি-রূপে বিরাজিত; আবার সাকার Personal অগ্নি দেবতাও রহিয়াছেন। মানুষ যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে সম্বর্দ্ধিত করিবে, ইহার নিগূঢ় অর্থ এ যে, মানুষের মধ্যে যে সকল দিব্য শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে, আত্মোৎসর্গের দ্বারা সে সকলকে পুষ্ট ও বিকশিত করিবে। বেদের মধ্যে একটি কথা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, দেবানাং জনিমানি। ইহার অর্থ হইতেছে, জগতের মধ্যে বিভিন্ন ভাগবত ধর্ম্মের (Divine Principles) ভাগবত শক্তির প্রকাশ, বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে বিভিন্নরূপে ভগবানের প্রকাশ। মানুষ মূলতঃ ভাগবত সত্তা, ভগবানেরই অংশ। কিন্তু মানুষের দেহ, প্রাণ, মনের যে সাধারণ ক্রিয়া তাহা অজ্ঞান, অপূর্ণ, বিকৃত। নীচের প্রকৃতির এই সকল বিকৃত ক্রিয়াকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য সত্তা, দিব্য শক্তি, দিব্য আনন্দের ক্রিয়ার বিকাশ করিতে হইবে। ইহার জন্য মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দেবরূপে ভগবানের যে আবির্ভাব

তাহাকেই বেদে দেবতাদের জন্ম বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বিশেষ স্তরের বিশেষ ধর্ম্মের দেবতা আছেন—মনবুদ্ধির দেবতা ইন্দ্র, ইচ্ছা শক্তির দেবতা অগ্নি, আনন্দের দেবতা সোম। আমরা যখন ভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করি, দিব্য জীবন লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষারূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখায় কাম ক্রোধাদি নীচের প্রকৃতির ক্রিয়া সকলকে আহুতি দিই, তখন আমাদের মধ্যে দেবগণ অর্থাৎ ভাগবত শক্তি সকল সম্বর্দ্ধিত হন, এবং সেই সকল শক্তি আমাদিগকে দিব্য জীবনে গড়িয়া তোলেন, আমরা পরম শ্রেয় লাভ করি।

"পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ"। এই যে পরস্পরকে সংবর্দ্ধিত করিবার কথা, ইহা দ্বারা গীতা একটি গভীর বিশ্ব-সত্য নির্দ্দেশ করিয়াছে। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার চলিতেছে এই আদান প্রদানের দ্বারা। দেব, মানব, প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় সবের মধ্যেই চলিতেছে এই যজ্ঞ ক্রিয়া। আধুনিক বিজ্ঞান জড়জগতের যে সূক্ষ্মতম উপাদান ইলেকট্রন ও প্রোটনের সন্ধান পাইয়াছে তাহারাও কেহ একক থাকিতে পারে না, পরস্পরের সহিত আদান প্রদানের দ্বারাই তাহারা প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল সংঘটন করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রহিয়াছে নতুবা এই বিশ্ব এক মুহূর্ত্তেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। মেঘ হইতে সমুদ্র হইতেছে, সমুদ্র হইতে মেঘ হইতেছে। মাটি জল বায়ু হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষলতা জীব জন্তুর আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে, জীব জন্তু মরিয়া লতা বৃক্ষের সার হইতেছে। ইহাই প্রবর্ত্তিত জগৎ চক্র। এই আদান প্রদান মানব সমাজেরও ভিত্তি। জনক জননীর আত্মদানে সন্তানের সৃষ্টি হইতেছে, সন্তানের মধ্যে তাঁহারা আবার নূতন জন্ম লাভ করিতেছেন। যখন আমরা কাহারও শুভ কামনা করি, তাহার ত শুভ হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও শুভ হয়। মানব সমাজে এই আদান প্রদানের নীতি যেদিন চরমোৎকর্ষতা লাভ করিবে, সেইদিন এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আজ মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য যে বিপুল প্রয়াস করিতেছে, স্বার্থ চিন্তা ভুলিয়া সকলেই পরের জন্য যখন সেই প্রয়াস করিবে, তখন আর কাহারও কোন অভাব থাকিবে না, এই সংসার হইতে সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইবে, এই সংসারই হইবে প্রেমের রাজ্য এবং ভূতলে এইরূপ প্রেমের শান্তির, আনন্দের রাজ্য স্থাপন করাই গীতা শিক্ষার নিগূঢ় লক্ষ্য।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

কাছে এসো

শ্রীপ্রতাপ সেন

তোমারে পাইনি আজো আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতায়,
পাইনি তোমারে বুকে শঙ্কাহীন প্রশান্তির মাঝে ;
উদ্বেগ-উদ্বেল মনে পেনু তোমা' সিন্ধু জনতায়,
কিংবা চলমান্ রথে, অবাঞ্ছিত মানব-সমাজে।
যতবার চাহিয়াছি বাঁধিতে নিবিড় ক'রে তোমা',
যতবার মুগ্ধ-চোখে চাহিয়াছি তোমার আননে,
তুমি শুধু নীচু-মুখে, স্মিত-চোখে করিয়াছ ক্ষমা,
সম্মতির মৌনতায় কুসুমিত করেছ কাননে।

আজ এই প্রবাসের সঙ্গহীন, ক্লান্ত-অবসরে,
অসংখ্য আলোর মাঝে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি, রাণি,—
আমার বুবুক্ষু হিয়া প্রতিক্ষণে তোমারেই স্মরে,
তোমার স্বপন দিয়া রচিতেছি কবিতার বাণী।
উড়াও অলকরাশি, বাড়াইয়া দাও হাতখানি,
দূরে আর থাকিও না, কাছে এসো, আমার ইন্দ্রাণি !

———

অন্তঃশীলা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

খুকুকে উপকথার উপদ্রবে পাইয়া বসিল।

পিসীমা বিরক্ত হইয়া বলেন, "আর পারিনে বাপু, তোর ফরমাস খাটতে খাটতে যে মুখে ব্যথা ধ'রে গেল! কেবল গল্প আর গল্প!—দুদণ্ড স্বস্তিই না হয় দে বাছা!"

দোতলার জানালার পাশেই কাঁঠালি-চাঁপার গাছটা ফুলে ফুলে একেবারে দেউলি হইতে চলিয়াছে। মিষ্টি গন্ধে নীচের সমস্ত বাগানটা ঝিমাইয়া পড়িয়াছে যেন। দুপুরের উদাস নিঃসঙ্গতার মাঝখানে ছাতের কার্ণিশ হইতে পায়রাদের মৃদুমধুর প্রেমগুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যায়।

আদর করিয়া পিসীমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদার করিয়া খুকু বলে, "বলোনা পিসীমা লক্ষ্মীটি। সত্যি বলচি, তোমার সেই নাগকন্যার গল্পটা আমার ভা-রী ভালো লাগে।"

সোণার চশমা পরিয়া কার্পেটের ভিতর নিপুণ হাতে ছুঁচ চালাইতে চালাইতে পিসীমা বলেন, "সোণা আমার, মাণিক আমার, কাজ নষ্ট করে না। দেখছ না কতদিন থেকে কাজটা হ'য়ে উঠছে না, যে ক'রে হোক্ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হ'বে যে! গল্প পরে হ'বে, খেলা করোগে এখন, কেমন?"

খুকুর অভিমান হয়, রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া বলে, "ভারী তো কাজ! কী হবে ও ছাই দিয়ে?"

—"নইলে তোমার জামাই যখন আসবে, তখন তাকে কিসে বসতে দেবো, বলো তো?" খুকুর ডালিম-রাঙা গাল-দুটিতে কে যেন সিঁদুর লেপিয়া দেয়। লজ্জিত মুখখানা পিসী-মার আঁচলে লুকাইয়া বলে, "ধোৎ।"

পিসীমার চোখের দৃষ্টি অপরিসীম স্নেহে স্নিগ্ধ কোমল হইয়া ওঠে। ফুটফুটে চাঁদের মতো কচি মুখখানাতে চুমো খাইয়া বলেন, "পাগলী আমার!"

ব্যস,—অটল সঙ্কল্প যায় ভাঙিয়া। অসমাপ্ত কার্পেট, কাঁটা, উল মাটীতে লুটাইতে থাকে। সামনে বাগানের ওপারে খানিকটা দূরে কাঞ্চন নদীর কাকচক্ষু জলের উপর সূর্য্যের আলো ভাঙিয়া চুরিয়া সহস্র খণ্ড হইয়া জ্বলে। নদীর বুক হইতে একটা ঠাণ্ডা বাতাস উঠিয়া আসে, চাঁপার গন্ধে মাতাল হইয়া বাগানের বিলাতী ঝাউগাছের পাতায় পাতায় শন্‌শনানির সঙ্গীত জাগাইয়া তোলে, পিসীমা গল্প বলিতে সুরু করেন।

চিরন্তন শিশুমনের দুয়ার খুলিয়া যায়। নীল আকাশে ওই যে চিল্‌টা ডানা মেলিয়া দিয়াছে, ওরই মতো সমস্ত মন কল্পনার বাঁধ টুটিয়া অসীমের অঙ্গনে বে-হিসেবী হইয়া উড়িয়া চলে। সেই কোথায় কোন্ পাতালপুরীর অন্ধকারে নাগপাশ বন্দী হইয়া রাজকন্যা সোণার পালঙ্কে মূর্চ্ছিত, বত্রিশ নাগ ফণা মেলিয়া রুদ্ধ দুয়ারে পাহারা দেয়; কাল অজগরের মাথার মণি লইয়া রাজকুমার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়, সাপের ফণা নত হইয়া পড়ে, জীয়ন কাঠির ছোঁয়াচ লাগিয়া রাজকন্যা হাতীর দাঁতের পালঙ্কে জাগিয়া উঠিয়া বসে,—দিকে দিকে বাজিয়া ওঠে কাড়া-নাকাড়া।

—দুপুরের রৌদ্রের উপর কোমলতার আমেজ লাগে, বাগানের উপর ছায়া নামিয়া আসে। পিসীমা অনুযোগের স্বরে বলেন, 'যাও, হ'ল তো এবার? আসনখানা আজো সারা ক'রতে পারলুম না। কাল থেকে যদি দুপুর বেলা এম্‌নি ক'রে বিরক্ত করো দুষ্টু মেয়ে, তা' হ'লে আর কোনো দিন গল্প ব'লব না, কক্ষণো না।"

খুকু হাসি মুখে বিনুনী দুলাইয়া নীচে নামিয়া যায়।

ভাই বোনের মধ্যে ওই সব চাইতে ছোট।

সুতরাং আদরের মাত্রাটা একটু বেশী হইলেও এমন অস্বাভাবিক নয়। বয়স সাত আট বছরের কাছাকাছি আসিয়াছে, কিন্তু বাড়ীর লোকে একেবারেই ভুলিয়া গেছে যে খুকু কোনোদিন বড় হইয়া উঠিতে পারে। এতবড় বাড়ীটার এত কোলাহল ছাপাইয়া উঠিয়া ওর কলকণ্ঠ চারিদিকে বাঁশীর

মতো ছড়াইয়া পড়ে। বাড়ীর সবাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার কাণ তুলিয়া সে বাঁশী শুনিয়া লয়।

লাল রেশমী রিবন্ বাঁধা বেণীটি দুলাইয়া খুকু বাড়ীর কম্পাউণ্ডে স্কিপ্ করে। সবুজ ফ্রকটির প্রান্ত বাতাসে ওড়ে, কাণের ছোট ছোট হীরার দুল ঝুটুটি চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলে। পরিশ্রমে গোলাপী গালের উপর দিয়া দু' একটি ঘামের বিন্দু গড়াইয়া পড়ে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে. কাঞ্চনের ও পারে বনচ্ছায়ার আড়ালে সূর্য্য ডুবিয়া যায়। ঝি মার হাত ধরিয়া খুকু অন্দরে যায়।

মা বলেন, "এদিকে আয়, ছাখ্ দিকি, চেহারার কি শ্রী হ'য়েচে! সারাদিন কেবল ছুটোপাট্, মেয়ে না যেন দস্যি ... আঁা, হ'ল কী পায়ে? কাঁটা ফুটেছে?"

খুকু ধব্‌ধবে পা-খানা মায়ের সাম্‌নে মেলিয়া দেয়, "এই ছাখো।"

—"তা তো দেখ্‌চি! গিয়েছিলে কোথায়?"

—"বাগানে, গন্ধরাজ তুল্‌তে।"

মা সযত্নে কাঁটাটা তুলিয়া লইয়া বলেন, "নাঃ, তোমায় নিয়ে এক মিনিট শান্তি নেই আমার! আবার যদি কখনো একা একা বাগানে যাবে, তা' হ'লে টের পাবে মজাটা! নাও, এখন হাত পা ধুয়ে পড়্‌তে বোসো গিয়ে, মাষ্টার মশাই আস্‌চেন।"

এই জিনষটাই খুকু সব চাইতে অপছন্দ করে। মাষ্টার মশাই মারেন না বটে, কিন্তু ওঁর চেহারা দেখিলেই খুকুর ভয় ধরিয়া যায়। সমস্ত মাথাটা জুড়িয়া প্রকাণ্ড টাক, কেবল কাণের দু'পাশে দুইগোছা করিয়া শাদা চুল। মস্ত পাকা এক জোড়া গোঁফ, মুখের উপর কতকটা তার লাল, ছোট্‌দা বলে তামাক খাইলে নাকি অম্‌নি হয়। জানেন কেবল কতকগুলো কটমট কথা,—'ঐক্য, বাক্য, কুবাক্য' এই সব। উপকথা বলিবেন তো নাই ই, ছোট্‌দার সাথে বেচারী যে একটু গল্প করিবে, তাও দু' চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। বেঁটে খাটো চেহারা, ওঁকে দেখিলেই খুকুর আপনা হইতেই কেমন করিয়া যেন 'রাম্‌পেল্‌টেল্‌স্কিন্' এর গল্প মনে পড়িয়া যায়।

খুকু মুখখানা কঁচুমাচু করিয়া বলে, "আমি আজ আর পড়্‌তে যাব না মা।"

—"কেন?"

—"ভালো লাগেনা আমার।"

মা আদর করিয়া বলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, যাও। পড়াশুনো যে না করে, সে মুখ্যু হ'য়ে থাকে। সবাই তা'কে নিন্দে করে। যাও, প'ড়ে শুনে এসো, দেখো আজ কেমন নতুন একটা গল্প ব'লব তোমায়।"

গল্পের প্রলোভনে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও খুকু পড়িতে যায়।

মাষ্টার মশাইয়ের ছাত্র তিন জন। খুকু, ছোট্‌দা আর মেজ্‌দি। মেজ্‌দির এবার কী একটা পাশের পড়া, কাজেই তা'কে লইয়া মাষ্টার মশাইকে বেশী ব্যস্ত থাকিতে হয়। ছোট্‌দা সুর করিয়া পড়ে—

"ক'রবনা আর জলস্পর্শ,
চিতোর রাণার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ—"

খুকু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "চিতোর রাণা কে ছোট্‌দা?"

কথাটা মাষ্টার মশাই শুনিতে পান্। ভ্রূকুটি করিয়া বলেন, "উহু, গল্প নয়, গল্প নয়। এই যে, পড়ো এই খানটায়,—

"অঞ্জনা নদীতীরে খঞ্জনী গাঁয়ে,
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে—"

খুকু পড়িতে থাকে।—

"জীর্ণ ফাটল-ধরা এক কোণে তারি,
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী—"

কিন্তু মন বইয়ের সীমার মধ্যে বন্দী থাকিতে চায় না। জানালার বাইরে ঝাঁকড়া অশথ্ গাছটার মাথার উপর দিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডল চোখে পড়ে। ওর মনে পড়ে, ওই তারাগুলিকে দেখাইয়া পিসীমা কতদিন সাত ভাই চম্পার গল্প বলিয়াছেন। সেই যে আকাশ ভরিয়া পূর্ণিমার চাঁদ নিজেকে উজাড় করিয়া দেয়, রাজার নিরালা বাগানের এক কোণে জ্যোৎস্নার রং

মাখিয়া পারুল দিদি সোনা মুখখানা বাহির করিয়া সাতভাই চম্পাকে ডাকিতে থাকে, সাতটি টুকটুকে রাজার ছেলে কুঁড়ির মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়া সাড়া দিয়া বলে...

খুকুর চোখ জড়াইয়া আসে, মাথাটি কখন এক সময় টেবিলের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে, ঝিমা আসিয়া কোলে করিয়া ভিতরে লইয়া যায়।

সকালে খুকুর পড়াব পাট নাই।

সুতরাং যথাসম্ভব ছুটোছুটি এবং দুষ্টুমি করিয়া ও সময়টার সদ্ব্যবহার করে, উপরে নীচে চঞ্চল একটি বিদ্যুৎশিখার মতো খুকু খেলিয়া বেড়ায়।

প্রথমতঃ বড়দার ঘর।

বড়দা একরাশ ওকালতীর নথি বিছাইয়া বসিয়া থাকেন, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় তাঁর হইয়া ওঠে না। তবু একবার খুকুর দিকে তাকাইয়া বলেন, "হ্যালো খুকু, গুড মর্ণিং। কিন্তু আপাততঃ এখান থেকে যাও, ব্যস্ত আছি একটা কাজ নিয়ে, বুঝলে?"

খুকু সেখান হইতে সরিয়া পড়ে, তারপর আসিয়া উপস্থিত হয় মেজদির মহলে।

আসন্ন পরীক্ষার চাপে মেজদির তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত, মোটা খাতাটার উপর দিয়া অশ্রান্তভাবে ফাউন্টেন্ পেন্‌টা ছুটিয়া চলে। সুতরাং খুকুর আবির্ভাব তাঁকে খুশী করিতে পারে না। ও টেবিলের কাছে আগাইয়া যায়, খুট্ খুট্ করিয়া এটা ওটা লইয়া নাড়াচাড়া করে।

মেজ্‌দি অস্বস্তি বোধ করিয়া বলে, "এই খুকু, এখন জ্বালাস্‌নি আমাকে, নীচে যা।" ও যাইবার নাম করে না। বলে, "ওই লাল টুকটুকে বইটা দাওনা মেজ্‌দি, একটু ছবি দেখ্‌ব শুধু। কোনো গোলমাল ক'র্‌বনা, দেখে নিয়ো তুমি।"

মেজ্‌দি ওর কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, তাই সন্ত্রস্ত স্বরে বলে, "না না, ছবি নেই, তুই পালা।"

—"ওই লাল বইটা—"

"আঃ, ওটা ডিক্সনারী, ওতে কোনো ছবি থাকে না। তুই স'রে পড়্‌তো খুকী, আমার পড়ার বজ্ঞ ক্ষতি হচ্ছে।"

খুকু তবু যাইতে চায় না। লাল নীল পেন্‌সিলটা তুলিয়া লইয়া বলে, "তবে দেখো, আমি একটা ছবি আঁকচি মেজ্‌দি, —একটা পাখী—"

মেজদি বিব্রত হইয়া ওঠে। হাত হইতে পেন্‌সিলটা কাড়িয়া লইয়া বলে, "নাঃ, কী জ্বালা রে!—দোহাই বোনটি, যাও এখন. আমি বিকেলে স্কুল থেকে আস্‌বার সময় তোমার জন্যে লজেন্স্ কিনে আন্‌বো দেখো এখন।"

—"আন্‌বে তো ঠিক্?"

—"ঠিক্ আনব। যাও তুমি—"

অতএব সেখান হইতে খুকুকে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। এইবার রওনা হয় ছোটদার ঘরের দিকে।

ছোট্‌দা তখন বড় বড় ক্লাশ টাস্কের অঙ্কের পঙ্কে নিমজ্জিত, ওকে আসিতে দেখিয়া যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। খাতাটা এক দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলে, "আয়।"

পড়ায় ফাঁকি দিতে ছোটদার জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। সে কাজে খুকুর প্রচুর সহায়তা মেলে। একটা টুল টানিয়া লইয়া বলে, "সেই যে তুমি 'সিণ্ডারেলার' গল্প ব'লবে ব'লেছিলে, বলোনা ছোড়দা। সেই মেয়েটা, যে ছাই মেখে উনুনের পাশে ব'সে থাকত,—শেষে তার পরীমা এসে—"

ছোটদা একবার সতর্ক চোখে বাহিরে তাকাইয়া বলে, "তবে তুই দোরটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়, মা যদি দেখতে পায় ভারী ব'কবে তা হ'লে।"

অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচরের মতো খুকু দাদার আদেশ পালন করে। তারপরে দুটি ভাই বোনে গল্পের আসর জমিয়া যায়। দাদা শেলফ হইতে একখানা "চাইল্‌ডস অ্যানুয়াল" টানিয়া নামাইয়া আনে, তারপরে একসঙ্গে ছবি দেখা এবং গল্প বলা চলিতে থাকে। কখনো বা পড়িয়া শোনায়,—

"Hark, hark, hark,
Dogs do bark,
The beggars are coming to the town,
Some in rags
Some in jags
Some in velvet gowns—"

ছবি দেখিয়া খুকুর বেজায় হাসি পায়, খিল খিল করিয়া

মিষ্টি হাসিতে সমস্ত ঘরখানা ভরাইয়া দেয়। শঙ্কিত হইয়া ছোটদা বলে "এই বোকা, হাসিস্‌নি অতো জোরে, মা টের পেলে তখন—"

সেই স্নো হোয়াইটের গল্প, থি বিয়ার্সের গল্প, পুস্ ইন্ বুটসের গল্প, কতবার হইয়া গেছে তবু শুনিয়া শুনিয়া খুকুর তৃপ্তি হয়না। তেম্‌নি করিয়াই অধীর ঔৎসুক্যে বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া ও দাদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, স্নো হোয়াইটের দুঃখে ওর মন ব্যথাতুর হইয়া ওঠে, বুট পায়ে বিড়ালের খরগোস ধরিবার কাহিনী শুনিয়া ও হাসিয়া লুটোপুটি খায়।

ঠং করিয়া ও ঘরের ক্লকটায় সাড়ে নয়টার ঘণ্টা বাজে, মজলিস ভাঙিয়া যায়। বাবার উপরে আসিবার সময় হইয়া আসিল, এখুনি হয়তো সিঁড়িতে তাঁর চটির শব্দ শোনা যাইবে। খুকু সুট করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, ছোটদার উচ্চকণ্ঠে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠে—

'ক'র্‌বনা আর জলস্পর্শ
চিতোর রাণার পণ—"

এবার একেবারে নীচের তলায়।

একরাশ কুটনো লইয়া ঝি মা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। খুকু পেছন হইতে ছুটিয়া যাইয়া একেবারে পিঠে ঝাঁপাইয়া পড়ে —"ঝি মা—"

বঁটীতে হাত কাটিতে কাটিতে কোনোমতে বাঁচিয়া যায়। ঝি মা চটিয়া বলেন, "দেখচ এখুনি কেটে যাচ্ছিল আমার আঙুলটা, এমন চঞ্চল তুমি হয়েছ দিদিমণি! কাজের সময় এমন ক'রে বুঝি পড়তে হয় লোকের পিঠের ওপর?"

খুকু অপ্রতিভ হয়। বলে "কিন্তু আজ তোমায় সেই গল্পটা ব'লতে হবে দুপুর বেলা, 'কেটোনা কেটোনা মাসী রাজা মোদের ভাই'—কেমন ব'লবে তো?"

কতকগুলো তরকারীর খোসা, মোচার খোলা লইয়া খুকু সংসার পাতিয়া খেলা আরম্ভ করে। প্রকাণ্ড একটা সংসারের গিন্নী ও, অতএব কাজের অন্ত নাই। সেই যে সকাল হইতে কাজের ঝক্কি আরম্ভ হইয়াছে, বেলা বারোটা বাজিয়া গেল, তবু ও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল কই? কর্ত্তা খাইয়া কাছারী গেলেন, তারপর আসিল স্কুলের ছেলেরা, খুকুর নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাদের খাওয়া তদারক না করিলে চলেনা। দুখানা মাছ না হইলে মণ্টুর খাওয়া হয়না। তরকারীতে বামুন ঠাকুর ঝাল একটু বেশী দিলে বলাই কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া দেয়। সুতরাং ওকে উপস্থিত থাকিতেই হয়। তারপর স্নান, আহ্নিক, পূজা অর্চনা সারিয়া খাওয়া দাওয়া করিতে বেলা দুটো তো বাজিবেই।

খুকু নিজের মনে কত কীই যে বকিয়া যায়।

ঝি মা মুখ টিপিয়া হাসেন, "একেবারে পাকা গিন্নী যেন। বলি, ও কর্ত্রী ঠাকরুণ, এ বেলা রাঁধলে কি গা? ঘাসের চচ্চড়ি, কাদার পায়েস, নিমের শুকতুনী, তেলাকুচোর অম্বল আর কী কী?"

খুকু রাগ করিয়া বলে, "ধাঃ, ও সব নয়। ভারী তো জানো তুমি!"

বাবা বাইরের বৈঠকখানা হইতে ভিতরে আসেন, ওঁর অফিসের সময় হইয়া আসিল। ডাক দিয়া বলেন, "নাইতে যাবে না খুকু মা?"

খুকুর খেলা পড়িয়া থাকে, বাবার হাত ধরিয়া সে স্নান করিতে যায়। ওকে না হইলে বাবার ভালো করিয়া স্নান হয় না, ওকে সাথে বসাইয়া না খাইলে পেট ভরে না তাঁর। তাই দাদা দিদিরা মার কাছে মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলে, "খুকুই কী বাবার সব, আর আমরা সবাই ভেসে এসেচি বানের জলে?"

মা স্মিত মুখে বলেন, "ও যে তোদের সবার ছোট রে!"

—"হোক্‌না সবার ছোট, তাই ব'লে বাবার ওপর একাই ভাগ বসাবে বুঝি? আমাদের বুঝি একটুও দাবী দাওয়া নেই?"

প্রত্যুত্তরে মা একটু হাসেন শুধু।

বেলা বাড়িয়া ওঠে।

বাবা অফিসে বাহির হইয়া পড়েন, ছোট্‌দা মেজদি ওরা স্কুলে চলিয়া যায়। খাওয়া দাওয়ার পর্ব্ব শেষ করিয়া মা আসিয়া ওকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যান্।

বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে।

গরম পড়িয়াছে অতিরিক্ত, নদীর দিককার রেলিং ঘেরা ছোট বারান্দায় একখানা শীতলপাটি বিছাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মা শুইয়া পড়েন। খুকু ধরিয়া বসে, "মা, গল্প বলো একটা!"

—"কী গল্প ব'ল্‌ব?"

—"সেই গল্পটা বলো, যেটা তুমি কাল দুপুরে ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'রে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে। সেই দক্ষপ্রজাপতির গল্প, —চাঁদের সঙ্গে তাঁর মেয়েদের বিয়ে—'

—"আচ্ছা শোন তবে। কিন্তু খবর্দ্দার, উঠে যেতে' পাবে না এখান থেকে—"

গল্প আরম্ভ হয়, কিন্তু বেশীক্ষণ বলিতে পায় না। ফুর ফুরে ঠাণ্ডা নদীর মিষ্টি হাওয়ায় মায়ের চোখের পাতা ঘুমে ভারী হইয়া আসে।

অধৈর্য্য হইয়া খুকু মাকে ঠেলিয়া বলে, "বলো না মা কী হ'ল তার পরে?"

মা সচেতন হইয়া ওঠেন।—

—'হ্যাঁ, কী ব'লছিলুম? তারপর রাজচক্রবর্ত্তী দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন ক'রলেন, প্রকাণ্ড যজ্ঞ, তিন ভুবনে অমনটি আর কেউ দেখেনি। তা'তে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সবাই-কার নেমন্তন্ন হ'ল, হ'লনা কেবল শিব ঠাকুরের—"

মা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

খুকু ডাকে, "মা, ও মা—"

মা তন্দ্রাজড়িত স্বরে বলেন, "উঁ।"

—"গল্প—"

'উঁহু, চুপ ক'রে ঘুমোও এখন আমার পাশে শুয়ে, গল্প কাল হ'বে।"

মার আর সাড়া মেলে না।

খুকু অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের মনে বিড়বিড় করিয়া ছড়া কাটে, কথা বলে। ভাবে, মা কী ভীষণ ঘুমাইতে পারে! কেমন করিয়াই যে মানুষ এই দুপুর বেলা এম্‌নি করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, আশ্চর্য্য যা হোক্! খুকু যদি মা হইত, আর মা যদি খুকু হইত, তাহা হইলে ও মাকে এম্‌নি করিয়া ঘুমাইতে তো দিতোই না, বরঞ্চ উল্টো ছুটোছুটি করিবার জন্য ছাড়িয়া দিত নিশ্চয়।

অবশেষে খুকুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। এক সময় উঠিয়া পড়িয়া পিসীমার কাছে গিয়া উপস্থিত হয়, গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "নাগকন্যার গল্পটা বলো পিসীমা।"

এম্‌নি করিয়া সমস্ত বাড়ীটার মর্ম্মে মর্ম্মে খুকু একটা সুরের মতো সারাদিন ধরিয়া বাজিতে থাকে। ওর আয়ত কালো গভীর চোখ দু'টি ভরিয়া রূপকথার রঙীন্ স্বপ্ন, ওর চলার তালে তালে যেনো দখিন্ হওয়ার দোলা লাগাইয়া যায়। ও যেনো বনশ্রীর বুকে বসন্তের অপর্য্যাপ্ত অপচয়, সবাই অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণ করে, অথচ অতিরিক্ত হইয়া ছাপাইয়া পড়ে অঞ্জলি হইতে, অশ্রান্ত ওর দানে ওকে ভুলিয়া থাকা সহজ, কিন্তু সে দান যদি কোনোদিন রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে সে না পাওয়ার ব্যথাটাই সব চাইতে বেশী হইয়া বাজিতে থাকে।

খুকুর জ্বর,—কাল রাত হইতে।

বিছানার উপর ও পড়িয়াছে, চোখ্ দুটি বোজা। পদ্মের মতো মুখখানা পাণ্ডুর হইয়া গেছে। নিঃশ্বাস পড়িতেছে জোরে জোরে।

কার্পেটের কাজে পিসীমার মন বসিতেছে না। সাম্‌নে কাঁঠালি চাঁপার গাছটায় অজস্র ফুলের সমারোহ, উগ্রগন্ধে চারিদিক ভরিয়া গেছে। কার্পেট, উল্ পড়িয়া আছে তেম্‌নি করিয়া, উদাস দৃষ্টি মেলিয়া পিসীমা বাইরের দিকে তাকাইয়া আছেন।

বাবা আজ অর্দ্ধেক খাইয়াই অফিসে গিয়াছেন। মার আজ দুপুরবেলা ঘুমাইবার অবকাশ নাই। জ্বরের রেমি-শান্ হয় নাই, বসিয়া বসিয়া, খুকুর মাথায় বাতাস করিতেছেন। ওদিকে কেমন করিয়া যেন ঝি মার চরকায় বার বার করিয়া সুতো কাটিয়া যাইতেছে। উপকথা শুনিবার উপদ্রব করিতে কেউ নাই,—তবু কাজ একবিন্দু অগ্রসর তো হয়ই না, বরঞ্চ নষ্টই হইতেছে বোধ হয়।

ছোটদা আজ স্কুল হইতে সকাল সকাল চলিয়া আসিয়াছে, ক্লাসে ওর মন বসে না। চিলে কোঠার ধারে চাইল্ড্‌স্ অ্যানুয়াল খানা লইয়া আন্‌মনে পাতা উলটাইয়া চলিয়াছে। ওর বন্ধু ওকে ফুটবল খেলিবার জন্য অনেকবার ডাকিয়া গেল, ছোটদা সাড়া দিলনা। শুনিতেই পায় নাই যেন। ভাবে, খুকুর গা-টা কী গরম। জ্বর হওয়াটা বড্ড বিশ্রী জিনিস সত্যি।

বড়দা নথি ফেলিয়া একটা থর্ম্মোমিটার লইয়া ঘরে ঢোকেন।

—"ভাখো তো মা জ্বর কত এখন?"

সন্ধ্যা হইয়া গেছে, এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া ও-পাশের অশথ্ গাছটার পাতায় পাতায় আলোছায়ার মায়া-জাল রচনা করিয়াছে। মাষ্টার মশাই অ্যালজেব্রাখানা লইয়া কী একটা ফর্‌মুলা বুঝাইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু চিরদিনের গ্রন্থকীট মেজদির মন পড়ার বই হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেছে। মনে হইতেছে, চারিদিকে কোথায় একটা প্রকাণ্ড রিক্ততা, অন্তঃশীলা সুরের ফল্গু যেন অকস্মাৎ পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। রূপকথার সেই কুঁচবরণ কন্যা, মেঘবরণ চুল, বন্দিনী হইয়াছে মায়ামন্ত্রে, মরণ-কাঠির ছোঁয়াচ লাগিয়া সমস্ত পৃথিবীটাই ঘুমন্ত-পুরীতে পরিণত হইয়াছে।

আকাশে একটী বড়ো তারা চোখে পড়িতেছে, জ্যোৎস্নায় নিষ্প্রভ। খুকুর রোগ-পাণ্ডুর চোখের করুণ স্বপ্নময় দৃষ্টি যেন।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পদের বিপদ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিকাশ ত্রস্তভাবে বাড়িতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা ক'রিল —"কাকা কোথায় গেল গা? বড্ড দরকার, এদিকে আর একটুও সময় নেই, অথচ..."

পশ্চিমের ঘর হইতে সাড়া আসিল—"কেন রে বিনু? আমর এই দাদার ঘরে।"

বিকাশ অগ্রসর হইতে হইতে বলির্ল—"তোমরা আমায় ব'লচ বটে যেতে, কিন্তু..."

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, কারণ সে ঘরে প্রবেশ করিতেই বাবা হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বাবার বন্ধু লোকনাথবাবু অত্যন্ত বেশীরকম মাথা গুঁজিয়া মাদুরটার উপর আঙুল দিয়া একটা '৪' মন্ত্র কষিতে লাগিলেন এবং কাকা তীক্ষ্ণ মনোযোগের সহিত সেই অঙ্গুল চালান লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ডান হাতের আঙুলে হঠাৎ গরম লাগায় সে কারণটা বুঝিল, স্ফূর্তির চোটে অন্যমনস্ক হইয়া হাতে সিগারেট সুদ্ধই চলিয়া আসিয়াছে।

একটু পরে কাকা মাথা না তুলিয়াই বলিলেন—"হুঁ, কি ব'লছিলি বল।"

সে তাহার পূর্ব্বেই শ্যাণ্ডেল জোড়া থেকে পা গলাইয়া লইয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে।

ছোকরা কাল শ্বশুরবাড়ী যাইবে। আজ সকাল থেকে ক্রমাগত এইভাবে কল্পিত-বাস্তব নানা প্রয়োজনে চরকি ঘোরা ঘুরিতেছে, আর পদে পদেই মারাত্মক রকম ভুল করিয়া বসিতেছে। নূতন সম্পদ,—মাথা ঠিক রাখা দায়।

মা রান্নাঘরের দাওয়ায় কুটনা কুটিতেছিলেন। বিকাশ নিকটে গিয়া মুখটা শুকনো গোছের করিয়া বলিল—"তোমরা জিদ্ ক'রচ বটে আমার যাবার জন্যে, কিন্তু..."

শৈল তরকারি কোটার শিক্ষানবিশি করিতেছিল আড়চোখে চাহিয়া লইয়া বলিল—"কিন্তু, আমার পায়ে জুতো নেই।"

বিকাশ চটিয়া উঠিয়া বলিল—"দেখচ মা, চুপ করুক তোমার মেয়ে ব'লচি, নইলে..."

শৈল বটিটা ঠেলিয়া একটু পিছনে সরিয়া বলিল—"নইলে জুতো পেটা ক'রব ওকে।"

মা ধমক দিয়া বলিলেন—"থাম্ শৈলী, বড় ভাই হয় না!" পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—"জিদ্ ক'রে কি অন্যায়টা হয়েচে,—জোড়ের পর যাসনি, তাদের একবার দেখতে সাধ হয় না?"

"সাধ হ'য়ে মাথা কিনেচে। আর একটি দিন মোটে সময়, অথচ...নাঃ, সাত পুরুষে কেউ যেন জামাই না হয় বাবা, সায়েবদের বেশ..."

মা মুখ তুলিয়া রাগিয়া বলিলেন—"কেন, ওদের শ্বশুর জামাই হয় না?"

ভগ্নীর দিকে বক্রদৃষ্টি করিয়া বিকাশ কহিল—"শৈলী, তোমার মুখটেপা হাসি আমার সহ্যি হয় না, হাসবি তো স্পষ্ট করে হেসে দেখ কি মজাটা করি।

...শ্বশুর জামাই হয়, কিন্তু...ফের শৈলী!...আমি কিন্তু মা, বাবার সেই মান্ধাতার আমলের শাল গায়ে দিয়ে যেতে পারব না; তা' ব'লে দিচ্চি।"

মা আবার প্রশ্ন করিলেন—"কেন তা শুনি?"

শৈল উঠিয়া, আরও দূরে সরিয়া বলিল—"সায়েব জামাইরা গায়ে দেয় না।"

বিকাশ একটা পাতাহীন দীর্ঘ লাউডাটা তুলিয়া লইয়া সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। মাকে বলিল—"হ্যাঁ, কোথায় একটু হাত পা ছড়িয়ে ব'সব, না ক্রমাগত কাঁধে পিঠে জড়িয়ে —জড়িয়ে—জড়িয়ে—"

শৈল দূর হইতে সন্দিগ্ধভাবে লাউড'টা লক্ষ্য করিতেছিল। বিকাশ বলিল—"আচ্ছা মা, কিছু বলব'না, যদি ওবর থেকে আমার শাণ্ডেল জোড়াটা আস্তে আস্তে এনে দিস্।...কি ভুলটাই যে ক'রে ব'সেছিলাম মা...দেখ'—ভুলের কথায় মনে প'ড়ে গেল,—ভাগ্যিস!"

ব্যস্তভাবে উঠিতে উঠিতে বলিল—"ছোট আবার ভেনোর দোকানে; এই এক্ষুনি সেখান থেকে এলাম! কাল যদি গাড়ি ধ'রতে পারি তো কি ব'লেচি; ঠিক শেষ সময়টিতে মনে প'ড়বে কি একটা ভুলে ব'সে আছি। অথচ কেউ যে একটা কথা মনে করিয়ে দিয়ে উপকার ক'রবে..."

মা চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে বলিলেন—"ডাঁটাটা কোথায় ফেলে গেলি?"

উঠানের মাঝখান থেকে বিকাশ বিরক্ত ভাবে বলিল—"হ্যাঁ, খুব পেচনে ডাক'এর ওপর; ডাঁটা আমি কাঁচা চিবিয়ে খেয়েচি..."

মা ঘুরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"অবাক কাণ্ড ক'রলি, ডাঁটা যে তোর গলায় জড়ান; ঐরকম ভাবে সদর রাস্তা বেয়ে দোকানে যাবি?...দেখত!"

বোধ হয় ফুরসতের অভাবেই অপ্রতিভ না হইয়া কাঁধ থেকে ডাঁটাটা নামাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"শাল জড়ানর কথা ব'লতে গিয়ে র‍্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। বাবার শালটা তুলে রেখ' মা; এইখানেই এ রকম ভুল হ'চ্চে, নিয়ে গেলে কী যে কাণ্ড হবে!—ওর আঁচলার চওড়া কালো লতা-পাতায় আমার মাথা গুলিয়ে যায়, আবার না দেখেও থাকা যায় না,—কি গোলমেলে কাণ্ডকারখানা বল দিকিন!—একটা পাতা এদিক দিয়ে বেরিয়ে অন্য একটা পাতার মত কিসের সঙ্গে জড়িয়ে·· তার ওপর একটা ফুল এসে প'ড়েচে—মাঝখান দিয়ে একটা চওড়া লতা······ফুলটা না গোলাপ, না পদ্ম, না ঘেঁটু—যত মনে করি ভাবব না, ততই যেন সবগুলো মাথায় কিলবিল ক'রতে থাকে।...তুলে রেখ' মা, আমার হাঁসিয়া-ওয়ালা শালে কাজ নেই।"

ঘুরিয়া একরকম ছুটিয়াই আবার থমকিয়া দাঁড়াইল; কপালে তর্জ্জনী চাপিয়া বলিল—"দেখ, ব'ললাম কিনা?—কি যে ভুলে গিছলাম দিলে ভুলিয়ে!"

"ভেনোর দোকানে তো যাচ্ছিলি।"

"সে কে না জানে, কিন্তু..."

শৈল নিজে আসিল না,—বাপ খুড়াদের কথায় ফোড়ন দিতেছে। ছোটভাইয়ের হাতে চটিজোড়াটা পাঠাইয়া দিয়াছে। সে আসিয়া দাদার দিকে জুতা দুইটা উঁচা করিয়া দাঁড়াইল। বিকাশ অন্যমনস্কভাবে সে দুটা বাঁহাতে লইয়া কতকটা স্বগতভাবে বলিয়া উঠিল—"হ'য়েচে,—ক্লিপ—সেফ্‌টিপিন—সেফ্‌টিপিন,—তরল আলতা—স্নো—আর কি লি'খছিল?..."

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল, আব্দারের সুর করিয়া বলিল "কা'র এ স্নো দাদা? আমার জন্যেও একটা এনো' না।"

তাহার কথায় বিকাশের হুঁস হইল—মার সামনেই বউয়ের পাঠান ফর্দ্দটা আওড়াইয়া যাইতেছে। চাহিয়া দেখিল—মা মুখ নীচু করিয়া মিটি মিটি হাসিতেছেন; পুত্রের অবস্থা দেখিয়া মুখ উঠাইতে পারিতেছেননা।

বিকাশ একরকম ছুটিয়াই পলাইতেছিল; মা না ডাকিয়া পারিলেন না—"ওরে জুতো জোড়াটা পায়ে দিয়ে নে; কী হ'ল ছেলের গো?" বিকাশ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আগাইয়া আসিল। একজনের উপর ঝাল ঝাড়িতে পাইয়া যেন বর্ত্তাইয়া গেল; বলিল—"শৈলী, গেছিস্ তো ভুলে? না, গিলে ফেলেচিস্?—দাদার শ্যাণ্ডেল বড় মিষ্টি কিনা .."

শৈল দূরেই ছিল, বলিল—"তাই যত্ন ক'রে পকেটে পুরে রেখেচ।"

বিকাশ পকেটের দিকে লক্ষ্য করিয়া অপ্রতিভ বিস্ময়ের সহিত বলিল—"কখন এল!"

কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষা করিবার তাহার আর অবস্থা নাই। পকেট হইতে জুতাজোড়াটা ছুঁয়ে ফেলিয়া আঙুলের ডগায় টানিতে টানিতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

খাইতে বসিয়া ক্রমাগতই আহার-বিভ্রাট ঘটাইতেছে। মা প্রশ্ন করিলেন—"হ্যাঁরে, শ্বশুরকে চিঠি দিয়েচিস্ তো?—ক'দিন থেকে তোর যা হ'য়েচে..."

শৈল বলিল—"কাকা দিয়ে দিয়েচেন কাল; ওর ভরসাতেই আচে কিনা সব।"

বিকাশ হঠাৎ হাত দু'টো গুটাইয়া সিধা হইয়া বসিল; চোখ দু'টা কপালে তুলিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ!"

মা কিঞ্চিৎমাত্রও বিস্মিত না হইয়া বলিলেন "কি হ'ল ?"

"শ্বশুরের কথায় মনে পড়ে গেল,—সায়েবকে এখনও দরখাস্ত পাঠান হয় নি। জীবন নন্দীও সাড়ে দশটার গাড়ীতে চ'লে গেল। ঠিক চাকরিটি যাবে। দেখি যদি ডাকটা ধ'রতে পারি..."

মার দিব্যি দেওয়া সত্ত্বেও উঠিয়া পড়িয়া আঁচাইতে আঁচাইতে শৈলকে বলিল—"যা তো; লক্ষ্মী দিদি আমার, সাধন ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেটটা নিয়ে আয় তো—পরশুই ব'লে এসেচি, অথচ যে নিয়ে আসব একবার গিয়ে ...মা, এমন কথা শোনে শৈলরাণী..."

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আবার ডাক্তারের সার্টিফিকেট কেন ?"

"হ্যা, সোজা কথায় ছুটি দেবে কি না—সাধনকে বল'লাম লিখে দেবে—বাস থেকে পড়ে গিয়ে পা' টা সাংঘাতিক রকম ম'চকে গিয়েচে..."

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দেখ কাণ্ড!—বালাই, ষাট; শত্রুর পা মচকাক্..."

"শত্রুর পা মচকালে আমায় ছুটি দেবে কেন ?"—বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি হু'টা কুলকুচু করিয়া ঘরে ঢুকিল।

দরখাস্তটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে দু'টা ভাঁজ করা কাগজ, একটা ডাকের খাম। একটা কাগজ বিকাশের হাতে দিয়া বলিল—"সাধনদাদা দিলে।"

সার্টিফিকেট-টা পড়িয়া মুড়িয়া রাখিয়া বিকাশ দরখাস্তর বাকীটুকু শেষ করিতে লাগিল।

শৈল পিছনে একটু দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"দাদা, এই খামটার ঠিকানাটুকু লিখে দেবে ?—বৌদিদির..."

বিকাশ বিরক্তভাবে বলিল—"যা যা জ্বালাতন করিস নি কাজের সময়।"

তাহার পর আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিল; জিজ্ঞাস করিল—"তা ও টিকিট দেওয়া খাম কেন ? আমায় বুঝি বিশ্বাস হ'ল না ?"

শৈল অনুযোগের নাকী সুরে বলিল—"তুমি বড় ভুলে যাচ্চ ক'দিন থেকে..."

বিকাশ আবার লিখিতে সুরু করিয়া বলিল—"অ পোড়ার মুখ!—যা, আমার দ্বারা হবে না...'বড্ড ভুলে যাচ্চ'!"

একটু পরে, শৈল তখনও পিছনে দাঁড়াইয়া আছে অনুভব করিয়া বলিল—"রেখে যা, যখন ফুরসৎ হবে লিখে দোব।"

শৈল তাহার চিঠিটা আর খামটা সাধনের সার্টিফিকেটের সঙ্গে রাখিয়া আর একবার অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল—"দু'টি পায়ে পড়ি দাদা, সে বেচারি হা-পিত্যেস ক'রে আচে গো।"

'সে বেচারি' কিসের জন্ম যে হা-প্রত্যাশা করিয়া আছে ভাবিয়া বিকাশ মনে মনে একটু হাসিল। সেই সরসতার বশে খামটাতে বধূর নামটা লিখিল, ঠিকানাটা লিখিল, তাহার পর আফিসের খামটাতে ঠিকানাটা লিখিতে যাইবে, বাহিরে ডাক পড়িল—"বিকু আচিস্ ?"

বিকাশ প্রশ্ন করিল—"সাধন ?"

"পেয়েচিস্ সার্টিফিকেটটা ?...দেখ' সেখানে গিয়ে যেন সত্যি সত্যি খোঁড়া হ'য়ে ব'সে থেক না, আমাদের কাছে আবার ফিরে এস ভালয় ভালয়।"

বিকাশ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাচ্চিস্ ?"

"একটু পোষ্টাপিসের দিকে।...আচ্ছা আসি, একটু তাড়া আচে।"

বিকাশ ব্যস্তভাবে বলিল—"একটু দাঁড়া ভাই; হাফ্-এ মিনিট।" তাড়াতাড়ি দরখাস্তটা মুড়িয়া ভাঁজ করা কাগজের একখানা তাহার মধ্যে রাখিয়া খামে পুরিল, মুখটা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—"এই এলাম ব'লে—এক সেকেণ্ড..."

কি মনে হইল শৈলর খামেও অন্য ভাঁজ করা কাগজটা ভরিয়া বন্ধ করিল, তাহার পর বাহিরে গিয়া দুইটা চিঠি সাধনের হাতে দিয়া বলিল—"একটু ফেলে দিস্, বড় আর্জেণ্ট।"

সাধন উপরের খামটার উপর নজর ফেলিয়া হাসিয়া বলিল—"মানে—মূর্চ্ছা যেও না—আসচি !"

বিকাশ হাসিয়া উত্তর করিল—"ওটা শৈলীর; আমারটা নীচে, তার বক্তব্য—"মর'গে সব—কলম পিস্, শর্ম্মা আসচে না।"

বি, পি, রেল হইয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতে হয়। গাড়ী

ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেই শ্বশুরকে অগ্রণী করিয়া একটি মাঝারি গোছের দল প্লাটফারমে জমিয়া উঠিল,—ছ'টি শালা, তিনটি ছোট ছোট শালী, একজন খুড়তুত ভায়রা ভাই, আরও তিন চারটি নূতন মুখ—বিকাশ চিনিতে পারিল না। দেখিল সবার মুখেই দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন;—সে হাসিতে গিয়া তাড়াতাড়ি মুখটা বিষণ্ণ করিয়া লইল, মনে ভাবিল—এ আবার কি ব্যাপার!

নামিতে যাইবে, শ্বশুর তাড়াতাড়ি—"হাঁ-হাঁ, দাঁড়াও বাবাজি, দাঁড়াও" বলিতে বলিতে গাড়ীর দোরের কাছে গিয়া তাহার ডান হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন; বড় ছেলেকে বলিলেন—"তুই বাঁ হাতটা ধর, ভাল ক'রে—দেখিস্।"

"এইবার নাবো বাবা; দেখ যেন হ্যাঁচকা ট্যাঁচকা না লাগে। ঠিক ধ'রেচি তো আমরা? জোর পাচ্চ?...খু—ব আস্তে..."

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর যে বিকাশের মাথায় যেন সব ওলট-পালট হইয়া গেল। গুছাইয়া ভাবিবার সময়ও নাই,—শ্বশুর-শালায় তাহাকে একরকম টাঙাইয়া ধরিয়াই তাহার নামিবার অপেক্ষা করিতেছে। বিকাশ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পাচ্চি"—অসঙ্গতির ভয়ে আওয়াজটাও সাধ্যমত ক্ষীণ করিয়াই বলিল।

দুজনে ধরিয়া ধরিয়া তাহাকে খানিকটা দূর লইয়া গেল; তারপর তাহার বলিষ্ঠ শরীরের গুরুত্বের জন্য যেমন যেমন তাহাদের হাত ভারিয়া আসিতে লাগিল বিকাশও নিজের পায়ের উপর নির্ভরতা বাড়াইয়া দিতে লাগিল। সেটা অনুভব করিয়া শ্বশুর একটু আশ্বস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন—"খুব বেশী তাহ'লে লাগেনি বাবাজি, নয়?"

বিকাশ মনে মনে বলিল—"হ'য়েচে; এ পোড়ারমুখী শৈলীর কাজ—কালকের চিঠিতে নির্ঘাৎ সার্টিফিকেটের কথাটা লিখে থুয়েচে'; কিন্তু তখনই মনে হইল—তাহা হইলে, তো এইটুকুই প্রকাশ পাইবে যে সে আফিসকে প্রবঞ্চনা করিয়া আসিতেছে...অবশ্য সেটাও আবার একটা মস্তবড় লজ্জার কথা—যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে...

শ্যালক তাগাদা দিল—"জামাইবাবু, বাবা জিজ্ঞেস করচেন..."

ইহাদের সবার উৎকণ্ঠার জ্বালায় একটু ভাবিয়া দেখিবারই কি সময় আছে? বিকাশ তাড়াতাড়ি শ্বশুরের প্রশ্নের উত্তর করিল—"আজ্ঞে না ততটা লাগে নি।"

"জগদম্বা রক্ষা ক'রেচেন; কি রকম করে চোটটা...!"

বিকাশ বোধ হয় নিরুপায়ভাবে মোটরের কথাই বলিতে যাইতেছিল ছোট শালীটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বাঁচাইল,—যদিও আরও এক গুরুতর সমস্যায়ই ফেলিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্‌খানটায় লেগেচে জামাইবাবু?"

বড়শালা ধমকাইয়া বলিল—"তোর সেকথায় কাজ কি ছুটকি?—আ মর!"

বিকাশ স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিল।—আসলে এত অল্প সময়ের মধ্যে জায়গাটা তাহার ঠিকই করা হয় নাই এখনও, বলিলেও একটা ফুলো কি আঁচড় দেখাইতে হয়, না হইলে আফিস প্রবঞ্চনার ব্যাপারটা বড় বিশ্রীভাবে স্পষ্ট হইয়া ওঠে।...সময় পাইয়া সে এই নববিধ বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিল।

একটা গরুরগাড়ী ছিল। অতিরিক্ত যত্ন এবং উৎকণ্ঠিত প্রশ্নাদির ভয়ে বিকাশ নিজে হইতেই খুব সাবধানে আরোহণ করিল। শ্বশুর প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গে রহিল, বাকি সকলে হাঁটিয়াই চলিল। মুখটা আর বিকাশকে চেষ্টা করিয়া বিষণ্ণ করিতে হইল না, বিস্ময়ে এবং দুশ্চিন্তায় আপনিই নিষ্প্রভ হইয়া রহিল। একটু পরে শ্বশুর সামান্য একটু ভাঙিলেন কথাটা, কিন্তু তাহাতে ব্যাপারটার চারিদিকে কুহেলিকা ঘনীভূতই হইল মাত্র।—

"তোমার শাশুড়ি ত কেঁদেই খুন—বলে—'কেন বাচ্ছ বাপু ইষ্টিশানে ঘটা ক'রে—বাছা কি আমার আসতে পারবে' আমারও মনে তাই হচ্ছিল, তবুও সাহস দিয়ে বললাম—'তার খুড়োর চিঠি পেয়েচি বিকাশ আসবে, আজকের চিঠিটা কিছু নয়'...বললাম বটে 'কিছু নয়'—এদিকে কিন্তু আমার নিজেরই খটকা লেগে আছে—খামকা লিখতেই বা গেল কেন আঘাতের কথাটা?..."

বিকাশ ঘাড় বাঁকাইয়া শ্যালককে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—"কৈ, আমার তো একেবারেই কিছু লাগে নি। মনেই পড়চে না যে..."

শ্যালক প্রশংসার মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"আপনাদের হ'ল ফুটবল খেলা হাড়, ওসব চোটকে বড় একটা আমল দেন কি না।"

বিকাশ নিরাশ হইয়া চুপ করিয়া গেল, বুঝিল আপাতত শ্যালকের ভগ্নীপতি-গৌরব ডিঙাইয়া প্রকৃত কথাটা বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা।

ভায়রা ভাই মুখটা আগাইয়া আনিয়াছিল; বিজয়দর্পে, ফিস্‌ফিসানিতেই বিসর্গ যোগ করিয়া শ্যালককে বলিল—"আমি ব'ললাম না—ওটা ঠাট্টা? সহরে আজকাল ওই সব ধরণের ঠাট্টা চালু। কে লিখলে, কি অর্থ এটা যদি চট ক'রে ধরাই প'ড়ল তো আর মজাটা কি হ'ল?...কি বলুন বিকাশদা?"

ধরা না পড়িবার মজাটা বিকাশ হাড়ে হাড়ে অনুভবই করিতেছিল, স্পষ্ট কিছু না বলিয়া একটু হাসিল মাত্র। ভায়রা ভাইকে একটু স্বপক্ষে পাইয়া প্রকৃত তথ্যটা বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তাহ'লে প'ড়েছিলেন চিঠিটা মদন বাবু?—কি লেখাছিল বলুন তো?"

ভায়রা ভাইটি যাহাকে বলে 'আহ্লাদে' গোছের। সৌজন্যে গদ্‌গদ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দেওয়া কেন? আবার মদন বা—বু!···যান।"

সৌজন্যের চাপে দরকারী কথা মারা যায় দেখিয়া বিকাশের মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল, সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—"তা'তে কি হ'য়েচে বলুন না।"

ভায়রা ভাই একটু দোল খাইয়া আব্দারের সুরে হাসিয়া বলিল—"না, কক্ষণও ব'লব না; আগে 'তুমি' বলুন।"

বিকাশ তাহাকে মনে মনে 'তুমি' র চেয়ে ঢের নিম্নস্তরের শব্দে অভিহিত করিয়া তাহার সঙ্গে গোটাকতক অকথনীয় গালাগালও জুড়িয়া দিল। এ অবস্থায় যতটা সম্ভব হাসি-হাসি মুখ করিয়া বলিল, "আচ্ছা শুনিই না, চিঠিটা পড়া হ'য়েছিল কি না।"

"ঐ দেখুন, এড়িয়ে গেলেন; ভারী চালাক, ইস্‌!..." বলিয়া ভায়রা ভাই নিজের চতুরতায় হাসিয়া উঠিল।

গোড়া থেকেই মন ভাল নয়, তাহার উপর এই ন্যাকামির অত্যাচার,—বিকাশের ডান হাতটা একটা শক্ত মুঠায় পাকাইয়া উঠিল। ভায়রা ভাইয়ের প্রার্থিত অসৌজন্যটা কোথায় গিয়া পহুঁছিত বলা যায় না, শ্বশুরের কথায় ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল। বলিলেন—"নেমে বাড়িতে ঢোকবার সময় বাবাজি, যতটা পার সহজভাবে চলবার চেষ্টা ক'র, না হ'লে তোমার শাশুড়ী-এরা সব কেঁদে কেটে অনর্থ ক'রবে; অথচ আবার যেন এমন ভাবে লুকোতে যেও না, যাতে আমরা, যারা জানি, তাদের ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়তে হয়। বুঝলে তো?"

বিকাশের একবার মনে হইল—এই শেষ সুযোগ; আরম্ভও করিল—"কিন্তু বাবা, আমার যখন..."

শ্বশুর মুখের কথা কাড়িয়া বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, যা ব'লবে তা বুঝেচি বৈকি।—তখন আর কি ক'রবে?—নিরুপায়..."

বিকাশ হতাশভাবে মৌনতা অবলম্বন করিয়া শ্বশুরের কথাটার মানে বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় একটা মোড় ঘুরিয়া গাড়ীটা বাড়ির সদরে দু'টা ধানের মরাই-য়ের মাঝখানটায় আসিয়া হাজির হইল।

একপাল নানাবয়সের স্ত্রীলোক, ছোটবড় অনেকগুলি ছেলে মেয়ে,—খোঁড়াবর দেখিবার উৎসাহে যে দলটা একটু বেশীরকম পুরু হইয়াছে, বেশ বোঝা যায়। সকলের মুখটা আশা এবং ঔৎসুক্যে যেন দীপ্ত হইয়া আছে।

মাঝখানে শাশুড়ী,—অঞ্চলে মুখ, নাক, আর চোখের খানিকটা ঢাকিয়া পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিতেছিলেন। স্বামী আর পুত্র নামিতেই কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। "জোড়ের পর প্রথম শ্বশুর বাড়ি এল বাছা কি না খোঁড়াতে খোঁড়াতে!" বলিয়া এমন উচ্ছ্বসিতভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন যে তাহার অল্পমাত্রই চাপা থাকিতে পারিল। স্বামী একটু বিরক্ত ভাবেই বলিলেন—"ওগো না গো না, তেমন কিছু লাগে নি; কৈ খোঁড়াচ্ছে?—দেখ দিকিন চোখ মেলে..."—বলিয়া গাড়ীর পিছনে দাঁড়াইয়া খুব সতর্ক দৃষ্টিতে বিকাশের পায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খোঁড়ায় কিনা দেখিবার জন্য চারিদিক্‌কার দলটা আরও আগাইয়া আসিয়া, বিকাশ যেখানটা নামিবে সেখানটা ঘেরিয়া দাঁড়াইল। ভীড়ের মধ্যে বেশ একটু ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল।

বিকাশের নামিতে একটু দেরি হইতেছিল ;—হইবারই কথা, কেননা খুব সহজ, সুস্থ পায়ে জোর করিয়া সহজভাবে চলিবার মত শক্ত অভিনয় আর নাই, বিশেষ করিয়া এতগুলি উৎসুক সমালোচকের সম্মুখে। তাহার উপরও বিপদ এই যে ফরমাসী 'সহজ' এর মধ্যে কতটা আবার ল্যাংচান ভাব মিশাইলে ওদিকে শ্বশুর মহাশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন না সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই ব্যস্ত হইয়া পড়িবার মর্ম্মও তাহার অজ্ঞাত ছিল না—অর্থাৎ একেবারে বেপরোয়াভাবে চলিতে গেলে সেটা কৃত্রিম ভাবিয়া শ্বশুর, শালা সবাই আসিয়া তাহাকে আবার টাঙাইয়া তুলিবে। শ্বশুর শাশুড়ীকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করার এই দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়িয়া বিকাশ একটু ইতস্তত করিতেছিল, শাশুড়ী কান্নার আর একটা উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়িয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"বাছা আমার যে নামতে পারচে না গো!—এগিয়ে ধর না গিয়ে। তোমারও কি এটা তামাসা দেখবার সময় হ'ল?"

বিকাশ সহসা আবার কি ভাবিয়া যেন মরিয়া হইয়াই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল।—সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই একরকম লাফাইয়াই নামিয়া পড়িল এবং সাধ্যমত জড়তাটা কাটাইয়া শাশুড়ীকে গিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর বেশ সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আমার তো মা কিছুই হয় নি, এই দেখুন না; আপনারা মিছিমিছি ভাবচেন।"

বড় হঠাৎ হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয় শ্বশুর ব্যস্ততার কোন লক্ষণ দেখাইবার অবসর পাইলেন না, মনে মনে সুধু জামাইয়ের কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করিলেন—আহা. তাঁহারই উপদেশ পালন করিবার চেষ্টায় এই নিগ্রহ তো! শাশুড়িও বুঝিলেন জামাই তাঁহার দুশ্চিন্তা লাঘব করিবার জন্য হাসিমুখে আত্মনির্য্যাতন সহ্য করিতেছে—আহা, এমন জামাই!—চোখে আবার বন্যা নামিল, বলিলেন—"তাই হোক, বাবা, আমাদের ভাবনা মিছেই হোক…কি করে লাগল বাবা বিকাশ? হাড় কি দুখানা হয়ে গিছল? কবে হাঁসপাতাল থেকে ফিরলে সেখানে?…"

আর বলিতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত অশ্রু চাপিতে চাপিতে হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে জামাইকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। বিকাশ একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল।

কর্ত্তা উম হইয়া উঠিলেন—"হাড় দুখানা হতে যাবে কেন? ভাল জ্বালাতন! আর হাঁসপাতালে গিছল এখবর আবার কে দিলে তোমায়? হাড় দুখানা হয়ে গেলে ওরকম চলতে পারে লোকে? না বাড়ি ছেড়ে এত দূর…"

হঠাৎ কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

গিন্নী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি ক্ষ্যামা দাওতো বাপু; পাষাণ! তোমার ভয়ে ছেলেটা ভাল ক'রে সহজভাবে চলতে গিয়ে কি কষ্টটাই যে সহ্য করচে তা বোঝবার তোমার ক্ষ্যামতাই নেই।"

দাঁড়াইয়া বলিলেন—"না বাবা তুমি খুঁড়িয়েই চল একটু, আমার মাথা খাও। পা-ধন বড়-ধন' জবরদস্তি করে কাজ নেই কারুর ভয়ে। আমার অদিষ্টে যখন নেকাই আচে আজ এই দেখব তখন তুমি আর কত সামলাবে বাবা?"

ভায়রাভাই আগাইয়া আসিল এবং তাহার আসল অভিমতটা যাহাই হোক আপাতত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—"তবু যে এমন পা নিয়েও এসেছে আমাদের মনে করে…"

বিকাশের চোখে দৃষ্টি পড়ায় থামিয়া গেল।

ছেলেদের দল নিরাশ হইয়া পাৎলা হইতেছিল,—একজন ছুটিয়া বাহির হইয়া চাপা গলায় বলিল—"এই! দেখসে সব, এবার খোঁড়াবে, রাঙাখুড়ী দিব্বি দিয়েচে…"

কর্ত্তা ধমক দিয়া উঠিলেন—"তোরা বাদিকিন সব,—তামাসা পেয়েচে!…শোন' কথা—ভয়ে খোঁড়াচ্ছে না! তা'হ'লে ভয়ে তুমি কান্নাও বন্ধ করে দিতে…"

গিন্নী সহানুভূতিতে ক্রন্দমানা একজন বর্ষীয়সীকে কহিলেন—"দেখচো তো ক্ষান্ত দিদি?—এইটে ঝগড়ার সময় হ'ল?—দোরে জখম জামাই!…হুফুলে কি হবে?—রেল থেকে কি ক'রে যে চ্যাংদোলা করে বাপে ব্যাটায় নিয়ে এসেছে তা কি…ও মাগোঃ…"

আবার খানিকটা অশ্রুনিকাশ করিয়া বুকটা হাল্কা করিয়া বলিলেন—"চল' বাবা ভাণ্ডা পাটিকে আলগা ক'রে চল।"

বিকাশ শৈলর উপর মনে মনে গর্জ্জাইতেছিল—বাড়ি গিয়া তাহাকে আস্ত পুতিবে। কিন্তু আপাতত যখন উপায়ই নাই তখন কি ভাবে কতটা আলগা করিবে পাটাকে তাহাই

ভাবিতে লাগিল। শাশুড়ী বলিলেন, "চল বাবা; কান্ত দিদি তুমি না হয় ভাই ওদিকটা ধর—...হ্যাঁ...এইবার চল' সোনা ধন আমার...আহা জোড়ে এসে কেমন হাসিমুখে ফিরে গেল বাছা আমার, আর আজ বাছার শুকনো মুখখানির দিকে যে চাইতে পারা যাচ্ছে না গো!"

ভায়রাভাই জ্যেষ্ঠশাশুড়ীর সাহায্যে আসা সমীচীন বোধ করিল। সামনে আসিয়া বলিল—"চলুন না বিকাশদা; নিজের বিয়ে করা শ্বশুর বাড়ীতে নেংচে নেংচে ঢুকবেন; তাতে লজ্জা কি? এতো আর—এতো আর..."

কোথায় ল্যাংচানয় লজ্জা হওয়াটা স্বাভাবিক তাহার একটা যুতসই উদাহরণ না পাইয়া থামিয়া গেল। তারপর নিরুপায় বিকাশ খোঁড়াইতে আরম্ভ করিলে উৎসাহিত করিবার জন্য দক্ষিণ হস্তের চেটোটা তালে তালে ঘুরাইয়া বলিল—'এই তো, বাঃ! আর আপনি তো আর—সাধ ক'রে খোঁড়াচ্ছেন না বিকাশদাদা যে...আর জেঠাইমাও মনে ক'রচেন ঘরের ছেলে ঘরে তুলচি..."

চৌকাঠের নিকট আসিতে শাশুড়ী চোখ মুছিয়া স্নেহ-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"সোয়াস্তি পাচ্ছ না কি বাবা?"

বিকাশ শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল—"অনেকটা।"

গিন্নী মুখটা একটু কুঞ্চিত করিয়া পাষাণহৃদয় স্বামীর দিকে একটা কটাক্ষ হানিলেন।

* * *

প্রথম অভ্যর্থনার হিড়িকটা কাটিয়া গেলে কথাবার্ত্তায় বিকাশের নিকট অবশ্য আসল ব্যাপারটা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল,—আজ দুপুরের ডাকে শৈলর চিঠির পরিবর্ত্তে সাধনের সার্টিফিকেটটা আসিয়া হাজির হইয়াছে। ইহাতে শৈলর উপর হইতে দোষটা সরিয়া যাওয়ায় মনটা আরও যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল—'সাধন হতভাগা ঠিক সেই তালের মাথাটিতে এসে যদি তাড়াহুড়ো ক'রে থামের গোল-মাল না বাধিয়ে দিত··' কিন্তু তাহাতেও স্থায়ী সান্ত্বনা পাওয়া গেল না। ওদিকে আবার আফিসে, সার্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে শৈলর চিঠি গিয়া কি অঘটন ঘটাইতেছে তাহাই বা কে জানে···

এখানে পত্রটার অসঙ্গতি ধরিবার মত যখন কাহারও ঘটে বুদ্ধি নাই তখন সে আর মক্ষম ভুলটার কথা ভাঙিল না। শুধু বলিল—সাধনের এ ডাক্তারিগিরি ফলাতে যাওয়া কেন?...নতুন পাশ করেচে কিনা—ভাবলে জানিয়ে খুব বাহাদুরী করলাম।...একটু লেগেছিল সামান্য, ভাবলাম সেখানে থাক-লেই তো খেলাধুলা আফিস,—তাই..."

শাশুড়ী চোখ মুছিয়া বলিলেন—"বেশ করেচ বাবা।"

ভায়রাভাই বলিল—"আর বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি কি আলাদা ভাবতে আচে?—বলুন না জেঠাইমা!—কথাতেই তো বলে যে .."

কি যে বলে মনে না পড়ায় চুপ করিয়া রহিল।

শ্বশুরবাড়ির অত সাধের আদরযত্ন—সব জড় হইয়াছে ডান পায়ের হাঁটুতে। জামাইয়ত্নের বাকী সবখানি পড়িয়া গিয়াছে দারুণ অবহেলায়। মনে সুখ নাই মোটেই। খোঁড়ানটা ক্রমে ক্রমে কমাইয়া আনিয়া পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বিকাশ বলিল—"কালই তবে যাই, আফিসের ছুটিটা পেলাম কিনা... নতুন চাকরি ··"

শ্বশুর বলিলেন ডাক্তারবাবু লিখেছেন—"পূর্ণ বিশ্রাম নিতে এক সপ্তাহ।"

এত দুঃখতেও বিকাশের হাসি পাইল। তখনই আবার ভাবিল—অজ্ঞ চাষাভুষো গোছের শ্বশুর না হইলে তাহারই ছিল আজ আরও লজ্জায় পড়িবার পালা।

বলিল—"বলেছিল বটে; কিন্তু মা যে কি চমৎকার ওষুধ সব দিয়েচেন আমার তো আজই যেন পনর আনা কমে গেচে ব'লে বোধ হ'চ্চে ·"

কতদিন পরে এই যেন একটু জুতসই কথা কহিল; ফলও হইল।—শাশুড়ী স্মিত হাস্য করিয়া বলিলেন—"ও আমার দিদিমার দেওয়া ওষুধ! এঁদের এখানে হেতচ্ছেদ্দা করেন ব'লে কি ও যা-তা? · তা' কাল আর নয়, পরশু তখন যা হয় হবে। চাকরির কথা কি আর বলব বল? কিন্তু খোঁড়া-যাত্রা মিটিয়ে আবার একবার এস গিগ্‌গীর বাবা···"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীত

শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মণ্ডল

কুচবেহারের পল্লী সঙ্গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার ইচ্ছা বহুদিন হইতে পোষণ কবিতেছিলাম। ভয় ছিল হয়ত উহা উপহাসাস্পদ হইবে। কারণ বঙ্গসাহিত্যে বা সঙ্গীত-রাজ্যে কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীত এখনও তাহার আসন দৃঢ় কবিতে পাবে নাই। করার স্বল্পবিস্তর চেষ্টা চলিতেছে মাত্র! কবিবর হেমেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থে কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীতের জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দিয়াছেন এবং সুগায়ক বন্ধুবর আব্বাস উদ্দীন ঐ গানটি এবং আরও অনেক এতদ্দেশীয় পল্লীসঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন এবং তাহা বিশেষ সমাদরও পাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে "কুচবেহারেব দুইটি পল্লীসঙ্গীত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ "বিচিত্রায়" প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছি, এবং ঐ প্রবন্ধটি গত আষাঢ় মাসের "বিচিত্রায় প্রকাশিতও হইয়াছে। সাহিত্য ও সঙ্গীতরাজ্যে কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীত একেবারে অপাংক্তেয় নহে দেখিয়া ঐ পল্লী-সঙ্গীত সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনার এই দুঃসাহস।

পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছিলাম, আমি প্রধানতঃ এতদ্দেশীয় পল্লীসঙ্গীত সংগ্রহ ও শিক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিতে-ছিলাম মাত্র। সম্প্রতি আসাম গৌরীপুরাধিপতি সঙ্গীত-সোপান ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা, মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুব আমাব চেষ্টার প্রশংসায় কৃতার্থ করিয়া এতদ্দেশীয় পল্লীসঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে উৎসাহিত করেন। বিচিত্রা পত্রিকার সহানুভূতি ও রাজা বাহাদুরের উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা (?) করিতে মনস্থ করিয়াছি। আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীতের উৎপত্তি, তাহাব প্রাচীনতা, বিশ্বের সঙ্গীত রাজ্যে তাহার মূল্য কতটুকু ইত্যাদি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে উচ্চবাচ্য না করিয়া শুধু তাহার শ্রেণী বিভাগ ও বিষয় বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলিব মাত্র। * কুচবেহারী পল্লী সঙ্গীতকে আমরা উচ্চাঙ্গের বাঙ্গলা সঙ্গীতের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি না। কারণ নিরক্ষর পল্লী-দুলালদের সহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের তুলনা চলিতে পারে না। তবে বাঙ্গলা সঙ্গীতের মত এই সঙ্গীত তাল ও সুর সম্পদে শ্রেষ্ঠ না হইলেও ভাব ও মাধুর্য্যে একেবারে দরিদ্র নয়।

কুচবেহারী সঙ্গীতগুলিকে প্রথমতঃ (১) বিষয় বস্তু অনুসারে ও (২) সুর সংযোগ অনুসারে এই দুই ভাগে ভাগ কবা যাইতে পারে। বাংলা সঙ্গীতে যেমন সঙ্গীতের ভাব গভীরতা ও তাল অনুসারে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ইত্যাদি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে, কুচবেহারী পল্লী-সঙ্গীতগুলিও সেইভাবে বিষয়বস্তু, সুরবিন্যাস ও ভাব অনুসারে প্রধানতঃ (ক) ভাওইয়া (খ) ক্ষীরল (গ) পয়ার (ঘ) চটকা (ঙ) কীর্ত্তন এই পাঁচভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

ভাওইয়া গানই কুচবেহারে বেশী প্রচলিত। আব্বাস উদ্দীনের "নদীর নাম সই অঞ্জনা" "কি মোরে জঞ্জাল হইলরে" গানগুলি ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। ধ্রুপদ বা খেয়াল বাঙ্গলা সঙ্গীতের যেমন শ্রেণী বিভাগ, "ভাওইয়াও কুচবেহারী সঙ্গীতের তেমন একটি শ্রেণী বিভাগ।

ভাওইয়া গান প্রধানতঃ নায়ক নায়িকার প্রেম সম্বন্ধীয় ও আদি ও করুণ রসপূর্ণ। অধিকাংশ ভাওয়া গানই

* কুচবেহারী পল্লী-গাথা ও পালাগান সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। উক্ত গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধে স্বল্পবিস্তর আলোচনার চেষ্টা করিব।

নায়ক নায়িকার বিরহবেদনার কাহিনী এবং নিরাশার হা-হুতাশ ও তপ্তশ্বাসে পূর্ণ। "কালার গান," "মাধবের গান" "মইষাল বন্ধুর গান," "সাধুর গান," "নাথের গান" প্রভৃতি ঐ ভাওইয়া শ্রেণীর অন্তর্গত।

সমালোচনার সুবিধার জন্য নিম্নে দুইটি কালার গানের পদ উদ্ধৃত করিলাম ঃ

১

কালারে কেমন করিয়া হব দরিয়া পাররে ॥
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে
দেওয়া ঝরে কালা মধু রসে রে ॥
ধু ধু কাশিয়ার ফুল
নদী হইল কালা হুলুস্থুল রে ॥

* * * *

যে নাইয়া করিবে পার
তাকে দিব কানাই গলার হার রে,
পার করিলে যৌবন করিব দান রে ॥

২

আশা দিলেন কালা ভরসা দিলেন
জলের ঘাটে কালা ব'সেয়া থুইলেন রে
আজি আশা দিয়া কালা ভাসাইলেন সাগরে ॥
মুই নারী কালা অভাগিনী—
তরুর তলে কালা বইসে থাকিয়ে
ওরে চিপ দোয়া পড়ে মাথার ঘামরে ॥

* * * *

কালার গান এবং মাধবের গান প্রায় এক ধরণের। ঐ দুই প্রকার গানই দয়িতের উদ্দেশ্যে বিরহিনী নায়িকার প্রেম নিবেদন, এবং প্রিয়তমের যে মধুর প্রাণারাম স্মৃতি নায়িকার হৃদয়ের অন্তস্থলে সুদৃঢ় ভাবে আসন পাতিয়া আছে তাহারই প্রকাশ। "কালার গানের" নায়ক "কালা," সেই নন্দ ঘোষের আদরের দুলাল, গোকুল-মজানো বংশীবদন কালাচাঁদ অথবা কালাচাঁদেরই কোনও সুযোগ্য শিষ্য হাতে "বাঁশের বাঁশী" কাঁধে রঙীন "গামছা"* ঝুলানো পল্লীবালার মনোরঞ্জক "বাবড়ী ঝট্‌কা" † কোনও নটবর কি না সে বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণাদি নাই। উপরে উদ্ধৃত গান দুইটি এবং অন্যান্য কালার গান শুনিয়া দুই "কালার" কথাই মনে হয়। এবং বিশেষতঃ এক নম্বর গানের শেষ কলি ঃ

যে নাইয়া করিবে পার
তাকে দিব কানাই গলার হার রে,
পার করিলে যৌবন করিব দান রে ॥

শুনিলে গোকুলচন্দ্রের কথাই মনে হয়। কারণ ঐ পদগুলিতে শ্রীরাধাপ্রমুখ দ্বাপরের ব্রজগোপিনীদের একনিষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেমের কথাই মনে পড়ে। বাঙ্গলা কীর্ত্তন পদাবলীর নৌকাবিলাস পালার সুন্দর আভাষও ওগানটিতে পাওয়া যায়।

"মাধবের গানের" নায়ক "মাধব"। কোন সে সুদূর অতীত দিনে, কোন শস্যশ্যামলা ঝিল্লী-মুখরিত পল্লীমাতার কোলে, প্রকৃতিদুলাল মাধব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; কোন ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরে, উদাস মনে সে তাহার মধুর বাঁশীর তালে জল আনয়নরতা পল্লীবালাদের চিত্তে চঞ্চলতার সৃষ্টি করিত, তাহার কোন আভাষ ঐ সকল গানে পাওয়া যায় না। তবে সত্যই যদি ঐ গান গুলির নায়ক "মাধব"নামধেয় ব্যক্তিটি এই কুচবেহারের পল্লীমায়ের কোলে তাহার জীবনের লীলা করিয়া থাকে, তবে সে সত্যই সুঠাম, সুপুরুষ, সুরসিক এবং সর্ব্বোপরি সুদক্ষ বংশীবাদক ছিল সন্দেহ নাই। তবে "কালার" মত এই "মাধবকে" লইয়াও একটু গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। কারণ মাধব, কালার প্রকৃতি এবং সমস্ত গুণরাশির সুযোগ্য অধিকারী। এবং "কালাচাঁদের" এক প্রসিদ্ধ নাম মাধব; বিশেষতঃ মাধব নামটি কবিতা বা প্রেমগাথায় নিতান্ত অচল নহে। বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিদের অমর অবদান কীর্ত্তন পদাবলীগুলিতে "কালা" "কানুর" মত "মাধব গেল মধুপুর" প্রভৃতি পদে মাধব নামের উল্লেখ অনেকবার দেখিতে পাওয়া যায়।

* বন্ধু কাজল ভোমরা, কোন দিন আসিবেন বধু
কয়া যাও কয়া যাওরে ॥
যদি বঁধু যাইতে চাও ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাওরে ॥

† কালা করি চেংরা কোনা বাবড়ী উড়ায় বাতাসে
যাও না করে ওরে চেংরা মনের গৌরবে ॥
এবং—"বাবড়ী ঝট্‌কা চিকন কালা মনে লাগিল"
বিচিত্রা—আষাঢ়, ১৩৪২।

"সাধুর গানের" নায়ক "সাধু"। "মাধব" বা "কালার" মত সাধু কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, এবং গৈরিক পরিহিত চিমটাধারী, অথবা ঐ শ্রেণীর কোন মুণ্ডিত মস্তক বা জটাধারীও নহে। সাধু কথার অর্থ এখানে সওদাগর। মনসার ভাসানে এবং ঐ শ্রেণীর অনেক পালায়ও সওদাগরকে সাধু বলা হইয়াছে।

সাধুর গানের নায়ক এক ধনাঢ্য সওদাগর। বানিজ্য-ব্যপদেশে বিদেশগামী সাধুকে লক্ষ্য করিয়া এবং বানিজ্যগামী প্রবাসী সাধুর প্রতি, সাধু-পত্নীর যে উক্তি বা হৃদয়ের ভাবাগুলি প্রদান, তাহাই সাধুর গান। বুঝিবার সুবিধার জন্য নীচে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রসিদ্ধ সাধুর গানটির কয়েক ছত্র তুলিয়া দিলাম :

প্রাণসাধুরে—
যদি যান সাধু পরবাস না করেন সাধু পরার আশরে
নিজ হাতে সাধু রাঁধিয়া খান ভাতরে ॥
কোচের কড়ি সাধু না করেন বেয়, পরার নারী সাধু
আপন নয়রে
ওরে পরার নারী সাধু বধিবে পুরাণ রে।

* * * *

"কালার" গান, মাধবের গান, মইষালবন্ধু ইত্যাদি গানে, পরকীয়া প্রেমের কাহিনী, কথা ও সুরে রূপ পাইয়াছে। সেই জন্য "সাধুর গান" ঐ সকল গানের সহিত একই ভাওইয়া শ্রেনীর অন্তর্গত হইলেও নায়কের প্রয়োজনানুসারে সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ঐ গানগুলি প্রধানতঃ পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধীয়, কিন্তু সাধুর গানের নায়িকা, স্বয়ং সাধুর আসন্ন বিরহ-ব্যথাতুরা, সাধুর পরিণীতা সহধর্ম্মিনী।

মইষাল বন্ধুর গান এ দেশীয় পল্লীসঙ্গীতে বিশেষ প্রচলিত, এবং কালার গান, সাধুর গান ও মাধবের গানের চেয়ে, মইষাল বন্ধুর গানের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মইষাল বন্ধুর গান পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধীয়। এখানে গানের নায়ক, গোকুলচন্দ্রের মত বৃন্দাবনে যমুনা কিনারে গোচারণকারী রাখাল নহেন, এখানে নায়ক এই দেশের স্বল্প পরিসরা স্রোতস্বতীর বুকে কাশ ও ঝাউয়ের বনে সুশোভিত নদীর চরে গোপালের পরিবর্ত্তে মহিষপাল চারণে রত মইষাল এবং গোকুলচন্দ্রের মত ইহাদের শুধু বাঁশী মাত্রই সম্বল নহে, বাঁশের বাঁশী ছাড়াও এই নায়কের হাতে রহিয়াছে এই দেশের নিজস্ব তার যন্ত্র (String instrument) দোতরা। সে দোতরা আবার যে সে কাঠের তৈয়ারী নহে বিশেষ যত্ন-সহকারে ছাতিয়ান *কাঠে নির্ম্মিত।

মইষালের গানের নায়কও ব্রজনায়কের মত স্বার্থপর। কালাচাঁদের মত সেও সরলা অবলা পল্লীবালাদের মন লইয়া (?) ছিনিমিনি খেলা করে। ব্রজবালাদের মত এখানেও নায়িকা অভিসারিকা। নট চূড়ামনি কালাচাঁদের বাঁশীর তানে যেমন সরলা গোপবালাগণ পাগল হইয়া "ত্যজিয়া কুলমান সকলি করিতে দান" ছুটিয়াছিল মইষালের গানের নায়িকাও ব্রজগোপিনীদের মত জল আনিতে গিয়া মইষাল বন্ধুর দোতরার সুরে ভুলিয়া "লাজ মান ডারি" দিয়া প্রেম নিবেদন করে। নীচে দুইটি মইষালের গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ঐ গানই উল্লিখিত বিষয়ের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবে।

১

ওরে মইষালের সাথে করিয়া পিরীতিরে
ওরে কি মোরে জঞ্জাল হইল রে
রাও যে না করে রে মাইষাল মনের গৌরবে
কি মোরে জঞ্জাল হইল রে ॥
পুবালী বাতাসে হাইলারে মধুয়ার আগাল ঢোলে
ওরে রাও যে না করে ইত্যাদি

২

মইষাল বন্ধুরে,
মইষ চড়ান রে বঁধু কোন চরের মাঝে ॥

"নাথের গান"কে মাধবের গানের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। তবে কথা ও সুর সংযোজনার তারতম্য হেতু "নাথের গান" মাধবের গান অপেক্ষা অধিক করুণ রসাশ্রিত। সেই জন্য নাথের গানকে অনেক সময় "করুণ ভাওইয়া" গান বলা হয়।

*ছাইতন কাটিয়া গড়ায় দোতরা
আহা মোর দোতরা পানি খাঁও পানি খাঁও করে।
পুনশ্চ :—ছাইতন খুটার দোতরা
মোক করলু তুই দেশের বাউদিয়া।

নাথের গানের নায়ক, নাথ শব্দে সাদা বাংলায় যাহা অর্থ হয় তাহাই—অর্থাৎ স্বামী। পরকীয়া প্রেমের গন্ধ না থাকায় এই গানগুলি অন্যান্য ভাওইয়া গানের মত আদি ও করুণ রসাশ্রিত না হইয়া শুধু করুণ রসেই গলিয়া গিয়াছে, এবং বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের নিয়মানুসারে পরকীয়া প্রেমের রস ও ভাবমাধুর্য্যের প্রাধান্য হেতু নাথের গানে রস ও ভাবমাধুর্য্যের অপ্রাধান্য হইয়াছে। এবং সেই জন্যই বোধ হয় রসজ্ঞ পল্লীগায়কদিগের মুখে নাথের গান কদাচিৎ শ্রুত হয়। তবে অনেক পল্লীবাসিনী পুরবালা যে অবসর সময়ে "সখীসনে" নাথের গান গুন্ গুন্ করিয়া সুরসংযোগে আবৃত্তি করে, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই, এবং লেখক স্বয়ং সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণদাতার স্থান অধিকার করিলেও অন্তঃপুরচারিণীদের সম্বন্ধে একটী কথাও বলিতে নারাজ। নীচে নাথের গানের কিছু নমুনা দেওয়া হইল।

"খোপেতে কইতর নাইরে কি করে তার খোপে,
ও রে যে নারীর সোয়ামী নাইরে কি করে তার রূপে।
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তোর তারা
ওরে যে নারীর সোয়ামী নাইরে দিনে অন্দিহারা॥"

* * * *

উল্লিখিত গানগুলি ভাওইয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও, এবং "ভাওইয়া" ধ্রুপদ বা খেয়ালের মত একটি শ্রেণীবিভাগ হইলেও ঐ গানগুলি যে সুরে গাওয়া হয় সে সুরটির নামও ভাওইয়া বলা হয়। যেমন বাংলা গানে গজল একটি গানের শ্রেণীবিশেষ হইলেও, যে সুরে ঐ গানগুলি গাওয়া হয় সে সুরকেও গজল সুর বলা হইয়া থাকে। সেইজন্য "কালার গান" "মাধবের গান" ইত্যাদি ছাড়াও অনেক গানকে, (যাহা ঐ সুরে গাওয়া হয়), ভাওইয়া বলা হয়। যেমন আব্বাস উদ্দীনের; "নদীর নাম সই অঞ্জনা"।

ভাওইয়া গানের মত "ক্ষীরল" ও কুচবেহারী পল্লীসঙ্গীতের একটি শ্রেণীবিশেষ, এবং একটি প্রধান সুর। ক্ষীরল গানের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ, প্রেম, বিরহের আশঙ্কা, বিরহ (বর্ষা ও বসন্তে) ইত্যাদি। সুর ও ভাবসম্পদে ক্ষীরল গান ভাওইয়া গানের চেয়ে অনেক উচ্চাঙ্গের। ক্ষীরল সুরের এমন একটা প্রাণমাতানো উদাসকরা ভাব আছে, যাহা যাঁহারা গভীর রাত্রে অথবা ভরা বর্ষায় নদীবক্ষে এই গান শুনিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

ভাওইয়া শব্দের অর্থ আনমনা, উদাসী বা ঘরছাড়া, এবং ভাওইয়া গানগুলিতে উদাসকরা একটা ভাব অন্তর্নিহীত আছে বলিয়া গানগুলিকে ভাওইয়া বলা হইয়া থাকে। কিন্তু "ক্ষীরল" কথাটি ঐ রকমের কোন অর্থ প্রকাশ করে না। ক্ষীরল কথার অর্থ বড় জোর "অতি মধুর" বা ঐ ধরণের কিছু করা যাইতে পারে। (যেমন, মৃদু+ল=মৃদুল, ক্ষীর+ল=ক্ষীরল) কিন্তু ঐ অর্থ ক্ষীরল গানের সে প্রাণমাতানো উদাসকরা ভাবটি প্রকাশ করিতে পারে না। ক্ষীরল শব্দের অর্থ লইয়া অনেক পল্লীসঙ্গীত-গায়কের সহিত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর কাহারও কাছে পাই নাই। কুচবেহারের উদীয়মান গায়ক ও পল্লীসঙ্গীত-অভিজ্ঞ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়ার মুখে শুনিয়াছি প্রথমতঃ যে সকল গানে ক্ষীরল নদীর উল্লেখ থাকিত সেই গানগুলিকে ক্ষীরল গান বলা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ গানের সুরে যে সকল গান গাওয়া হয় তাহাকেই ক্ষীরল বলা হয়। এ সম্বন্ধে সুরেনবাবুর মতের সহিত আমারও মতের ঐক্য হয়। ক্ষীরল নদীর উল্লেখযুক্ত দুই একটি গান শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তখন লিখিয়া না লওয়ায় এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। তবে যতদূর মনে হয়, গানের বিষয়বস্তু ছিল, নায়ক নায়িকার প্রথম প্রেম ও পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধীয়। একটিতে নায়ক বা নায়িকা বলিতেছে—"ওগো বঁধু, কোন সে শুভক্ষণে তোমায় আমায় দেখা হলো ক্ষীরল নদীর পারে। তখন সেথায় ছিলনাকো কেউ। তুমি ছিলে ওপারে আর আমি ছিলেম এপারে, সেই ক্ষণিকের দেখায় আমার মন হারিয়ে গেল তোমার কাছে, তোমায় আমি কেমন ক'রে পাব।" একটি গানের একটি পদ মনে আছে, তাহা এই—"তোমার বাড়ী আমার বাড়ী মধ্যে ক্ষীরল নদী। কেমন করে পাব দেখা পাখা নাই দেয় বিধি।" আর একটি গানের নায়িকা বলিতেছে—

"সখি ক্ষীরল নদীর পারে বঁধুয়ার দোতরার সুরে মন হারালেম, কিন্তু "বঁধুর বাড়ী" যেতে "পন্থের পানি মোর শুকায় না" তারপর বন্ধুর বাড়ী ও আমার বাড়ীর মাঝখানে "নল খাগড়ার বন" কি করে তার দেখা পাব।" গানগুলির

সুরসংযোগও অতি চমৎকার ছিল; এখন দুঃখ হয় তখন কেন গান দুইটি লিখিয়া লই নাই। গান দুইটি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। নীচে বসন্তে বিরহিনীর সম্বন্ধে ক্ষীরল গানের দুই-একটি পদ তুলিয়া দিয়াই ক্ষীরল গানের আলোচনা শেষ করিব।

বসন্তে বিরহিনী (ক্ষীরল)

মনে বড় দুঃখরে সখী চিতে বড় দুখ
ওরে নদীর কাছারের* মত ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক,
ওরে মনকে বুঝাব কত আর॥ (ধুয়া)
পুরুষের বসন্তকালে হাতে মোহন বাঁশী,
আর নারীর বসন্তকালে মুখে মুচকি হাসি॥
মাছের বসন্তকালে করে উজান ভাটি।
আর নদীর বসন্তকালে ভাঙ্গিয়া পড়ে মাটি॥
আর আমার বসন্তে আজি খালি কাঁদা-কাটিরে—

"পয়ার" গানগুলি বাংলা পয়ার ছন্দে রচিত বলিয়া পয়ার নাম হয় নাই। কারণ কদাচিৎ দুই একটা গান পয়ার ছন্দে রচিত দেখা যায়। "পয়ার" গানের কোন বাঁধাধরা সুর নাই, পল্লী-সঙ্গীতের সুরবৈচিত্র্য, এই পয়ার ও চটকা গানেই পাওয়া যায়। পয়ার সাধারণতঃ (১) কুশানের (২) পদ্ম-পুরাণ গানের (৩) দোতরা পালা গানের (৪) জাগ গানের। ইহা ছাড়াও আর দুই চারি প্রকারের পয়ার আছে। পালা-গানের মাঝে মাঝে যে ছোট ছোট গানগুলি মূল গায়েন, ছোকরা ও দোহার দ্বারা গীত হয় তাহাই পয়ার, যথা—কুশান গানে

মূল পদ :—পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরীর রোদনেতে কান্দিল রাবণ॥ (কৃত্তিবাস)
এই পদের শেষে পয়ার :—কালায় বা কিবা গুণ জানে। (ধ্রু)
নারীজাতি বিষয় জাতিরে; কিবা মন্ত্র জানে।
ওরে নাগাইয়া প্রেমের ফাঁসী ধীরে ধীরে টানে॥

স্থানাভাবে বিভিন্ন রকমে পয়ারের উদাহরণ দিতে পারিলাম না। ১, ২, ৩, নম্বরের পয়ারগুলির বিষয়বস্তু প্রেম বিষয়ক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সমালোচনা। ৪ নম্বরের পয়ারের বিষয়বস্তু কথঞ্চিৎ অশ্লীল, প্রধাণতঃ নারী ও পুরুষের যৌনতথ্য সম্বন্ধীয়। সেইজন্য কামদেব পূজা উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তে মাঠে বা নদীতীরে জাগের পালা গীত হয় এবং শুধু গ্রামের রসিক চূড়ামণির দলই, প্রেমের ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযমপূর্ণ গানগুলির অন্তর্নিহিত রসরাশি মক্ষিকার মত নিঃশেষে পান করিয়া আইসে।

"চট্‌কা" গানও পয়ারের মত সুরবৈচিত্র্যে পূর্ণ; কিন্তু ইহার বিষয় বস্তু ও ভাব লঘু, এবং প্রায়ই আদি ও হাস্য রসাত্মক। বাংলা ঠুংরী গানের মত ইহার ভঙ্গী। ছোট ছোট হালকা তালের সাবলীল ছন্দে নানা রকমের মিশ্র সুরের সাহায্যে সহজ সুন্দর গতিতে এই গানগুলি গাওয়া হয়। ভাওইয়ার মত চট্‌কা গানেরও সংখ্যাধিক্য ও যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেখা যায়, তবে এই গানে ভাওইয়ার মত বিরহী হৃদয়ের নৈরাশ্যপূর্ণ মর্ম্মকথার স্থান নাই; ক্ষীরলের মত ছন্দহারা গতিতে অজানার উদ্দেশ্যে বিরাট শূন্যে অথবা প্রেমের ভাব বিপুলতায় বিহ্বল হইয়া রস রা সৌন্দর্য্যসাগরে এই সুর ভাসিয়াও বেড়ায় না। জীবনযাত্রার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ছোট ছোট বাস্তব ঘটনাগুলিকে অথবা আনন্দে ভরা প্রেমমুগ্ধ প্রণয়ী হিয়ার ভাব ও অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া এই গান রচিত হয়, তাই আনন্দ ইহার সহজাত। ফুলের কোমল পাপড়িতে, জলের কল কল্লোলে তরুণীর কাঁখের ছলাৎ ছল্ করা ভরা কলসীতে যে সুর রণিত হয়, বনপথে প্রত্যাবৃত্তা বধূর ভিজা বসনের সলাজ বিব্রত গতির তাল ভাবুকের হৃদয়ে যে আনন্দ দান করে, "চটকা" সুরের প্রেমগাথাগুলিতে সেই আনন্দই মূর্ত্ত হইয়া উঠে। করুণা বা সবভুলানো উদাসকরা ভাব মুহূর্ত্তের জন্যও এই আনন্দের পার্শ্বে আসন পায় না।

কীর্ত্তন গান সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার কিছুই নাই। পল্লীবালাদের নৃত্য-মুখর বিবাহের গান, ব্রত-পূজার গান, প্রভৃতি এই প্রবন্ধে আলোচ্য সঙ্গীতগুলির শ্রেণীভুক্ত নয়, সেইজন্য সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক রহিলাম।

নানাবিধ অসুবিধার জন্য বক্ষ্যমান বিষয়গুলি সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সঙ্গীতজ্ঞ সুধীগণের, বিশেষ ভাবে কুচবেহারবাসী তথা উত্তর বঙ্গের সঙ্গীতোৎসাহী যুবকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই প্রয়াস। আশা করি তাঁহারা অবসর সময়ে এ বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া "ভস্মস্তূপ হইতে রত্নরাজী" আহরণের জন্য যত্ন লইবেন।

শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মণ্ডল

*নদীর পাড়।

সে আজি বিদায় নেবে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সে আজি বিদায় নেবে, আজি তার শেষ অভিসার
শুধু সে বিদায় নিতে একবার আসিবে সন্ধ্যায়
কত রাত্রি আসিয়াছে,—আজি রাত্রে শেষ আসা তার
হয়ত কহিবে কথা, নয়ত ফিরিবে বেদনায়।

আপনি আসিয়াছিল, আপনি সে যদি যায় চলে
আমার দুয়ার হ'তে পদচিহ্ন যদি মুছে যায়,
সে কলগুঞ্জন যদি থেমে যায় কুঞ্জবীথিতলে
কখন আসিবে বলে' রহিব না তার প্রতীক্ষায়।

সে যদি চলিয়া যায়, সে যদি ফিরিয়া পুনঃ আসে
তারই পরিচিত পথে আমন্ত্রিয়া আনিবে তাহারে
এই ফুল এই লতা,—চিরদিন যারা ভালবাসে,
তাদের সবার মাঝে ফিরিয়া সে পাইবে আমারে।

আমি তারে ভালবাসি, এই কথা শুনিবার তরে
সে যদি আসিয়া থাকে, না শুনিলে যদি ফিরে যায়,
না-বলার কি যে ব্যথা, আমি তাহা জানি ভাল করে'
সে যদি না বুঝে থাকে, আমি তারে বুঝাব কথায়?

নিজেরে যে বুঝে নাক', কেমনে সে বুঝিবে আমারে
আমারে বাসিয়া ভাল, সে বুঝে না তারে ভালবাসি,
দ্বিধাবিজড়িত পায়ে সে আসিল প্রিয়-অভিসারে,
অশেষ-চুম্বন সুখে ফুটিল না তার মুখে হাসি।

তাহারে কেমনে আমি বাঁধিব কথার মালা গাঁথি
আমার সে পরাজয় কাঁটা হয়ে বিঁধিবে অন্তরে,
যাত্রা সুরু হইয়াছে একান্ত করিয়া যারে সাথী—
বিদায় যদি সে চায়, আমি তারে রাখিব না ধরে।

শুক্লা নিশি

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

তৃতীয় রাত্রি

আজকার দিনটা মেঘে মেঘে থম থমে, এক কণা আলোরও দেখা নাই—ঠিক আমার শেষ বয়সের দিনগুলোর মতই। কত না অদ্ভুত চিন্তা, কালো কালো ভাবনাগুলো মনটাকে দমিয়ে রেখেছে। অজানা সমস্যাগুলো ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছে মগজের মধ্যে, আর মীমাংসা করবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা বোধ হয় কিছুই নাই আমার।

...আজ দেখা হবে না। কাল চলে আসার সময় আকাশে মেঘগুলো সারবন্দী হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, একটা কুয়াশা উঠে ঢেকে দিয়েছিল দিগন্তের মুখখানা। আমি বললাম, "কাল দিনটা নিশ্চয় খারাপ হবে—" সে কোনও উত্তর দিলে না; নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বোধ হয় কথা বলতে চায়নি। তার কাছে যে সেই দিনটাই দিনের সেরা—এতটুকু মেঘও যেন তার আনন্দের প্রহরে কালো ছায়াপাত না করে।

সে বললে "যদি বৃষ্টি হয় তা হলে আর দেখা হবে না—আমি আসব না।"

ভেবেছিলাম বুঝি আজ বৃষ্টিটা সে গ্রাহ্যই করবে না; তবুও ত কই এলো না—

...আমাদের আলাপ হওয়ার পর কাল তিন দিন পূর্ণ হল। তিন দিন দেখা হয়েছে তার সঙ্গে—আমার তৃতীয় শুভ্র নিশা...

আশ্চর্য্য! আনন্দ জিনিষটা মানুষকে কি অপূর্ব্ব করে তোলে। বুকটা যেন খুসীতে উপ্‌ছে উঠে—সমস্ত মনটা উজার করে ঢেলে দিতে ইচ্ছে হয়...সবাই হেসে উঠুক, চারিদিক ভরে থাক্ আলো,—হাসি আর গানে এই সাধটাই চরম হয়ে ওঠে। আর আনন্দের সে মাতামাতিটা কী ছোঁয়াচে। কাল ওর কথাগুলো এমন মিষ্টি শোনাচ্ছিল—মনটা ওর এমন সরল হয়ে উঠেছিল আমার প্রতি...কি সস্নেহ দৃষ্টিতে, ভালোবেসে চাইছিল আমার পানে...আনন্দের অপরূপ বিলাস। আর আমি...ভেবেছিলাম বুঝি সবই সত্যি ...বুঝি সে...।

আশ্চর্য্য! ভগবান! কী করে মনে হল ওকথা? এমন অন্ধ? যা ছিল সবই ত সে আর একজনের কাছে বিলিয়ে দিয়েছে—আমার জন্যে ত কিছুই নাই। তার কাতরতা, আমার প্রতি তার স্নেহ, ব্যাকুলতা, ভালোবাসা...হাঁ, ভালোবাসাই, ...সব যে শুধু তার দয়িতের সাথে ভাবী মিলনের অসহ আবেগোচ্ছ্বাস...আমিও যেন সে সুখের এক কণা পাই, শুধু তাই।

...সে যখন এল না, আমাদের বসে থাকাই সার হল। তার ভ্রুকুটি কুটিল ললাটে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল—হতাশ হয়ে মনমরা হয়ে পড়ল বেচারী। তার লীলায়িত ভঙ্গী, চটুল চাহনি, উচ্ছ্বসিত কথা সব থেমে গেল। আরও আশ্চর্য্য যে আমার প্রতি তার স্নেহ যেন দ্বিগুণিত হয়ে উঠল—বোধ হয় যদি তার আশা পূর্ণ না হয় তাহলে সে অমনি স্নেহ পেতে চায় আমার কাছ থেকে।

নাস্তেন্‌কা এত মনমরা, এত বিমর্ষ হয়ে পড়ল যে ভাবলাম বুঝি এইবার বুঝেছে সে যে আমি তাকে ভালোবাসি—তাই আমার জন্যে তার এই দুঃখ। আমাদের নিজের মনটা যখন দুঃখের ভারে নুয়ে থাকে, তখনই পরের ব্যথাটা আরো ভালো করে বুঝতে পারি কি না—অনুভূতিটা নষ্ট হয় না মোটে; বরং আরো ঘন হয়ে ওঠে।

ভরা বুক নিয়ে দেখা করতে চললাম—একেবারে উদ্বেল হয়ে...কে জানত যে সব সুখই মিলিয়ে যাবে একটি ফুৎকারে। আনন্দে সে যেন ফেটে পড়ছিল—উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে ছিল পথ চেয়ে, আর উত্তর সে আপনি স্বয়ং। তার যে আসবার কথা। নাস্তেন্‌কা ডাকলে সে কি না এসে থাকতে পারে?

আমি যাবার এক ঘণ্টা আগে থেকেই এসে বসেছিল। আমি যা-ই বলি তাতেই খিল-খিল করে হেসে ওঠে—হেসে লুটোপুটি খায়। কথা কইতে সুরু করেই হঠাৎ চুপ করে গেলাম।

হঠাৎ নাস্তেনকা বলে উঠল, "আজ আমি এত খুসী কেন জানো?…তোমাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে—তোমাকে ভারী ভালো লাগছে আজ।"

নীরবে তার মুখের পানে চেয়ে রইলাম। বুকের মাঝে রক্তের চলাচল দ্রুততর হয়ে উঠল।

—"তোমাকে এত ভালো লাগে কেন জানো? এখনও আমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাওনি বলে। আর কেউ তোমার অবস্থায় পড়লে আমাকে জ্বালাতন করে মারত; হাজারবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, প্রেম নিবেদন করে ব্যতিব্যস্ত করত; কিন্তু তুমি এত ভালো…"

বলেই এত জোর হাতটা ধরে মুচড়ে দিলে যে চীৎকার করে উঠলাম; সে হেসে উঠল।

এক মিনিট পরেই খুব গম্ভীর হয়ে আবার আরম্ভ করলে। 'সত্যি তুমি আমার বন্ধু; ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তোমাকে আমার কাছে। তুমি না থাকলে কী হত আমার? তুমি নিজের পানে একটি বারও চাও নি, শুধু আমার সুখের জন্যই ব্যস্ত। বিয়ে হয়ে গেলেও আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু এমনি অটুট থাকবে, ভাই বোনের চেয়েও বেশী আপন। তাঁকে যতখানি ভালবাসি তোমাকেও বোধ হয়…"

ও রকম ব্যথা বোধহয় জীবনে আর কখনও পাই নি। কিন্তু তবু যেন একটা হাসির ঘূর্ণি দোল খেতে লাগল মনে মনে। বললাম, "ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছ না!…ভয় হচ্ছে? ভাবছ বুঝি আজ আর এলেন না।"

"এতও পারো তুমি; না, না, যাক্ গে,…তুমি যা বললে তাতে ভাববার অনেক কথা আছে, কিন্তু সে কথা যাক এখন। ধরে নাও তাই…সত্যি আজ যেন কী রকম হয়ে গিয়েছি, খালি গা ছম্ ছম্ করে উঠছে বারে বারে…থামো, থামো…"

সেই মুহূর্ত্তেই কার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। অন্ধকারে দেখা গেল একটা মূর্ত্তি এগিয়ে আসছে আমাদেরই পানে।

দুজনাই চম্‌কে উঠলাম। নাস্তেন্‌কা ত প্রায় চেঁচিয়েই উঠল; তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আমি প্রস্থান উঠতে উদ্যত… না ভুল হয়েছে, এ অন্য লোক।

আমার হাতে অপর হাতটি দিয়ে সে বললে, "কি হল? ভয় কিসের? আমার হাতখানা ছেড়ে দিলে যে! এসো এসো ও কি, একসঙ্গে দু'জনাই দেখা করব তাঁর সঙ্গে। দেখাব তাঁকে আমরা দুজন কত ভালোবাসি দুজনাকে।"

আমি কাতরভাবে চীৎকার করে উঠলাম, "দুজনে দুজনকে কত ভালোবাসি!" ভাবতে লাগলাম ওঃ নাস্তেন্‌কা ঐটুকু কথার মধ্যে কত কথাই না বললে তুমি। কোনও কোনও বিশেষ-মুহূর্ত্তে এই ভালোবাসাই যে শরীরটাকে বিবশ করে দেয়, বিহ্বল করে দিয়ে আবেশ টেনে আনে প্রাণে। তোমার হাত দুটি তুষারশীতল; আমার হাতে আগুনের জ্বালা; নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা, তুমি কি দেখেও দেখ না… ওঃ সময়ে সময়ে সুখীর সঙ্গ এমন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে…না না তোমার কি দোষ।

আমার বুকের বোঝা দুকূল ছাপিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠল। বললাম, "নাস্তেন্‌কা, আজ সারাদিন আমার কি করে কেটেছে জানো—?"

"কেন, কেন কি হয়েছে বল—শিগ্‌গির বল। এতক্ষণ বল নি কেন?"

"তোমার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর চিঠিখানা দিয়ে, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে…তারপর—তারপর…বাড়ী গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম…"।

বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে সে বললে, "ব্যস্, হয়ে গেল?"

অতি কষ্টে নিলাজ চোখের জলের কণাগুলোকে থামিয়ে রেখে বললাম, "হ্যাঁ প্রায়; তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার এক ঘণ্টা আগে জেগে উঠলাম, কিন্তু তবু মনে হল যেন আমি ঘুমোই নি মোটেই। কী যে হয়েছিল কিছুই জানি না; তোমাকেই বলতে এসেছিলাম সে কথা। ভেবেছিলাম বুঝি কালের চাকা থেমে গিয়েছে—মনে হচ্ছিল যেন ওই একটি অনুভূতি, একটি বেদনা আমার কাছে চিরন্তনী হয়ে থাকল; ভাবলাম বুঝি সেই একটা মুহূর্ত্তই অনন্তে পরিণত হয়ে গেল—জীবনের সব বলা বুঝি থেমে গেল আমার…। যখন জেগে উঠলাম, মনে হল যেন চিরপরিচিত, চকিতে কোথায় শোনা,

অনেক দিনের ভুলেযাওয়া মাতালকরা উগ্র একটা সুরের রেশ কাণের পাশে গুঞ্জন তুলেছে—মনে হল যেন সারা জীবনটাই সুরটা গুমরে মরেছে আমার প্রাণে প্রাণে আর এখনই বুঝি আজ...।"

শশব্যস্তে বাধা দিয়ে নাস্তেনকা ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, "থামো, থামো সর্ব্বনাশ! এ আবার কি? কিছুই বুঝছি না আমি।"

কাতরস্বরে—তখনও আশার ক্ষীণ রেখা মুছে যায় নি সে স্বর থেকে, তবে রেখা বড়ই ক্ষীণ—বলতে লাগলাম,

"আঃ নাস্তেন্কা, যদি বুঝতে পারতে সেই অদ্ভুত জাগরনীর কথাটা..."

"থামো! চুপ্! ওকথা থাক এখন।" পলকের মধ্যেই দুষ্ট মেয়ে কথাটা বুঝে নিল।

হঠাৎ যেন কথার ফোয়ারা খুলে গেল ওর মুখে। আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে আমাকে হাসাবার কত চেষ্টা করতে লাগল; আর আমি হতবুদ্ধি হয়ে অর্থহীন দু-একটা কথা বলতেই তার অট্টহাসির কাকলী সেগুলো ডুবিয়ে দিলে। মনে মনে রাগ হল আমার—শেষে নাস্তেন্কা ছল করে কপট প্রেম জানাতে চায়।

সে আরম্ভ করলে, "জানো, তুমি এখনও আমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাওনি বলে সত্যি ভারী চটে গিয়েছি। মানুষকে চেনা যায় না কখনও; যাই হোক চিন্তাশীল মশাই, আমি এত সরল বলে দোষ দিতে পাবে না আমাকে। তোমাকে আমি ত সবই বলি...সবই—যা-কিছু এই গোবরপোরা মাথার এসে উদয় হয়।"

দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমি বললাম,

"ওই এগারটা বাজল বোধ হয়"—নাস্তেন্কা হঠাৎ একেবারে চুপ করে এক মনে শুণতে লাগল।

ভীরু দ্বিধাজড়িত স্বরে বলল, "হাঁ, এগারটাই।"

তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি বলে ভারী ব্যথা লাগল মনে। আহা বেচারা...অসহায় সে। কত না ভয়ে ভয়ে ঘড়ির শব্দ শুণেছে—মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। তার জন্যে দুঃখে ভরে উঠল মনটা, কিন্তু কি করে যে সান্ত্বনা দেব বুঝলাম না।

তাকে আশ্বাস দিতে লাগলাম। তাঁর না আসার কত কারণ বার করে কত নজীর দেখিয়ে তর্ক করে বোঝাতে লাগলাম। সে সময় তাকে মিথ্যে কথায় প্রবোধ দেওয়ার মত সহজ কাজ বোধহয় আর কিছু ছিল না জগতে—আর সত্যি, এসব সময়ে যে কেউ খড়ের কুটোটিকেও জড়িয়ে ধরতে চায়, সামান্য একটু সান্ত্বনার কথাকে মিথ্যে জেনেও আশ্রয় করে পরম বিশ্বাসভরে একটুখানি আশার ছায়া দেখলেই উল্লসিত হয়ে ওঠে।

উত্তেজিত হয়ে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য বলতে লাগলাম, "সত্যি নাস্তেন্কা, এ কিন্তু ভারী অদ্ভুত; এখনও তাঁর না আসার কী কারণ হতে পারে? তুমি গুলিয়ে দিচ্ছ আমাকে—আমারও বুঝি সময়ের জ্ঞান হারিয়ে গেল। ভেবে দেখ, হয়ত বেচারা তোমার চিঠিই পায়নি এখনও। হয়ত আসতে পারবে না উত্তর লিখতে বসেছে, চিঠিও কালকের আগে আস্‌তে পারে না। কাল ভোরেই আমি চলে যাব—তোমাকে এসে জানাব কি হল। এর মধ্যে হাজার গণ্ডগোল হয়ে থাকতে পারে। হয়ত যখন চিঠি গিয়ে উপস্থিত, তিনি বাড়ী ছিলেন না; হয়ত এখনও চিঠি পড়ার সময়ই পান নি। কী হয়েছে তা কি কেউ বলতে পারে?"

"হাঁ, হাঁ, আমি ওকথা ভাবিনি। সত্যিই ত, কী হয়েছে তা কি কেউ বলতে পারে!" তার স্বরে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই, সে যেন কোন দূরাগত সুখস্বপ্নের পাণ্ডু স্মৃতির অস্পষ্ট মর্ম্মরের মতই।—"একটা কাজ কর; কাল সকালে একবার যেয়ো; যদি কোনও খবর পাও, এনে দিয়ো আমাকে। কোথায় থাকি জানো ত?" আবার তার ঠিকানাটা বলতে লাগল আমাকে।

তারপর হঠাৎ এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়ল, এমন অসাহায়ভাবে মন দিয়ে শুনতে লাগল আমার প্রতি কথাটি। কিন্তু কোনও কথা জিগেস্ করতেই চুপ্ করে গেল, ত্রস্ত হয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে নিলে; চোখের পানে চেয়ে দেখলাম দুই কপোল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

"ও কি! ছি নাস্তেন্কা, নাস্তেন্কা—কী ছেলেমানুষ, চুপ্ চুপ্, শোন"—

বেচারা হাসবার চেষ্টা করলে, নিজেকে সামলে নিতে চাইল প্রাণপণে কিন্তু চিবুকখানি তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বার বার, আর বুকটা উঠল ফুলে ফুলে রুদ্ধ অসহ বেদনায়।

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বলতে লাগল, "তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি আমাকে এত স্নেহ কর-আমি যদি না বুঝি তা হলে আমি পাষাণেরও অধম। আমার কি হয়েছে জানো? তোমাদের দু'জনকে মিলিয়ে দেখছি মনে মনে। সে কেন তোমার মত হল না? সে ত তোমার মত এত ভালো নয় তবু যে তাকে ভালোবাসি তোমার চেয়েও বেশী।"

আমি নীরব। নাস্তেন্‌কা বোধ হয় আমার কাছে কোনও জবাব পাবে ভেবেছিল।

—"হয়ত এমনও হতে পারে যে এখনও আমি ঠিক চিনি না তাকে। বরাবর যেন একটু ভয়ে ভয়েই এড়িয়ে চলেছি। এমন গম্ভীর যেন একটুখানি অহঙ্কারীর মত। সে যে শুধু বাইরেই অমন তা জানি...মনটা তার আমার চেয়েও কোমল। যখন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম তখন কেমন করে যে চেয়েছিল আমার পানে তা আর জীবনে ভুলব না—তোমার মনে আছে ত—? কিন্তু তবু বড্ড বেশী সমীহ করি তাকে এতেই প্রমাণ হয় না কি যে আমরা দুজন সমান নই?"

উত্তর দিলাম, "না নাস্তেন্‌কা, না; এতে প্রমাণ হয় যে তুমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে তাকেই বেশী ভালোবাস, নিজের চেয়েও লক্ষগুণ বেশী।

"তা না হয় হল, কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে জানো? শুধু তার কথা বলছিনা—এ কথা সবার সম্বন্ধেই খাটে। এ-সব কথা অনেক দিন আগেই ভেবেছি। সবাই আমরা ভাই-বোনের মত একসঙ্গে থাকতে পারি না কেন বলত? সব বিষয়ে যারা শ্রেষ্ঠ তারাও আর সকলের কাছ থেকে কি যেন লুকিয়ে রাখতে চায়—এড়িয়ে চলতে চায়; কেন? সত্যি কথা সরল ভাবে না বলে রিনিয়ে বিনিয়ে বলবার দরকার কি? যে যা তাকে তার চেয়ে অনেক বেশী নিষ্ঠুর..."

আপন মনের আবেগ প্রাণপণে দমন করে বললাম,—"নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা, সব সত্যি...কিন্তু এর অনেক কারণ আছে।"

প্রাণের সব দরদ মাখিয়ে সে বললে,—"না, না এই ত তুমি আর সবারই মত না। কী বলে বোঝাব তোমাকে?... কিন্তু সত্যি মনে হয় যে তুমি আমার জন্যে নিজের যা-কিছু সবই আহুতি দিচ্ছ।"

আমার মুখের দিকে একটা ভীত, চকিত দৃষ্টি হেনে আবার বলতে লাগল, "এ কথা বললাম বলে ক্ষমা করো—তুমি ত জানো নিতান্তই নির্বোধ আমি। সংসারের মাত্র একটুখানি জানি, আর সময়ে সময়ে কোন কথা কেমন করে বলতে হয় মোটেই তা জানি না।"—দুই ঠোঁটে তার স্তিমিত হাসি, স্বরে বেদনায় অপূর্ব্ব ঝঙ্কার।—"শুধু এই কথা বলতে চাই যে তোমার কাছে আমি চিরঋণী...আমিও বুঝি—প্রাণ আছে আমারও। ঈশ্বর তোমাকে সুখী করবেন—তোমার ভাবুকের যে কাহিনী বলেছিলে আমাকে, সে এখন মিথ্যে হয়ে যাক—মানে তোমার সম্বন্ধে আর সে কথা খাটে না। তুমি যা বর্ণনা দিয়েছিলে তার চেয়ে তুমি অনেক—অনেক ভালো। যদি কখনও কাউকে ভালোবাস, ঈশ্বর যেন তাকে দিয়েই তোমাকে সুখী করেন। তার জন্যে কিছুই চাই না আমি—তোমার কাছে থেকেও সে সুখী হবে। আমি জানি তাই বলছি......আমিও নারী......আমার কথা বিশ্বাস করো তুমি।"

নীরব হয়ে, স্নেহভরে আমার হাতটি ধরে সে একটুখানি চাপ দিলে। আমার মুখেও কথা সরল না। কয়েক মিনিট পরে মুখ তুলে নাস্তেন্‌কা বললে, "না, আজ আর আসতে পারে না, অনেক রাত্রি হয়ে গেল।"

দৃঢ়স্বরে বললাম, "কাল আসবেই।"

বিন্দুমাত্র নিরাশ না হয়ে সে বললে, "দেখা যাক; যদি কালও আসে। শুভ বাই কাল পর্য্যন্ত। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বোধ হয় কাল আসব না। তার পরদিন কিন্তু ঠিক আসব—নিশ্চয় আসব......যাই হোক্ না কেন। তুমি নিশ্চয়ই এসো—তোমার সঙ্গে দেখা হতেই হবে—একটা কথা বলবার আছে তোমায়।"

বিদায় নিলাম; আমার হাতটা ধরে সরলভাবে চোখের দিকে চেয়ে নাস্তেন্‌কা বললে, "আমরা চিরদিন এক সঙ্গে থাকব—কি বল?"

"নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা, একলা কি করে যে দিন কাটাই আমি, তা' যদি জানতে—"

ন'টা বাজতেই আর ঘরে থাকতে পারলাম না। বাদলা হলেও বেরিয়ে গেলাম...যেখানে রোজ দুজনা বসি, সেইখানে। তাদের বাসার পাশ দিয়েই গেলাম, লজ্জা এল, চোখ তুলে চাইতে পারলাম না। ঘরে ফিরে গেলাম ভগ্নমনে। কি বিশ্রী ঠাণ্ডা দিন—রাত্রিটা একটু ভালো হলে সারা রাত্রি পথে পথে ঘুরেই কাটিয়ে দিতাম।

কাল...কাল...কাল...কাল আমাকে নাস্তেন্‌কা সব বলবে। আজও অবশ্য চিঠি আসে নি—আগেই বুঝেছিলাম। এতক্ষণেই হয়ত বা দুজনের দেখা হয়ে গিয়েছে.....

চতুর্থ রাত্রি

হায় ভগবান্...কেমন করে যে সব শেষ হয়ে গেল! কিছুই বাকী রইল না। আমি ন-টার সময় গিয়েছিলাম, সে আগেই এসেছিল—অনেক দূর থেকেই তাকে দেখতে পেলাম। প্রথম যেদিন দেখি তাকে ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রেলিংএর ওপর কনুইএর ভর দিয়ে; আমার আসা টেরই পেল না।

আমার চঞ্চলতা দমন করে ডাকলাম, "নাস্তেন্‌কা—"

বিদ্যুৎগতিতে সে ফিরে দাঁড়াল আমার দিকে, বললে, "দাও শিগগির—"

অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম।

দুহাতে শক্ত করে রেলিংটা চেপে ধরে সে বললে, "কই, চিঠি কই? উত্তর পাওনি কোনও?"

বলে ফেললাম, "চিঠি নাই...এখনও আসেন নি...?"

তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন এক নিমেষে কোথায় চলে গেল—অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তার শেষ আশাটাও আমি চুরমার করে দিলাম!

অনেকক্ষণ পরে বুক-ফাটা স্বরে নাস্তেনকা বললে, "এমনি করে আমাকে ফেলে চলে গেলেন?...ঈশ্বর ক্ষমা করুন ওঁকে।"

চোখ দুটো তার যেন মাটিতেই আট্‌কে রইল, আমার পানে চাইবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারলে না। মনে ঝড় উঠেছিল তার সঙ্গে সে যুদ্ধ করছিল প্রাণপণে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রেলিংএর ওপর ভর দিয়ে বেচারা ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল।

"চুপ্, চুপ্, কর লক্ষ্মীটি—" কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে প্রবোধ দিতে আর ইচ্ছে হল না...আর কী বলেই বা সান্ত্বনা দেব তাকে?

"আমাকে প্রবোধ দিও না। তার কথা শুনতে চাই না আর। নৃশংস, অমানুষের মত ফেলে চলে গেল আমাকে—কেন? কিসের জন্যে? আমার চিঠিতে, ওই সর্ব্বনাশী চিঠিতে এমন কী ছিল?"

—বলতে বলতে চোখের জলে তার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল—বুকটা মুচ্‌ড়ে ছিঁড়ে গেল আমার।

নাস্তেনকা আবার বলতে আরম্ভ করলে, "কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্ঠুর—একটা লাইন লিখে জানাবারও সময় হল না; আমাকে চায় না, আমাকে পরিত্যাগ করবে লিখলেও ত কোনও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু তিন দিন হয়ে গেল, আর একটা সামান্য খবরও পেলাম না। অসহায়, নিরাশ্রয়, অভাগিনীর মনটাকে দুই পায়ে এমনি করে দলে যাওয়া তার পক্ষে খুবই সহজ। কোনও দোষ ত করিনি আমি—দোষের মধ্যে শুধু নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তারই পায়ে। এই তিন দিন কী করে কেটেছে আমার...ভগবান্...যখন মনে পড়ে যে আমিই যেচে গিয়েছিলাম তার কাছে, নিজের মান খুইয়ে, পায়ে ধরে, একটুখানি ভালবাসা চেয়েছি...আর তার ফল...!"

—হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে, কঠোর স্বরে বলে উঠ্‌ল, "শোন—" কালো চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল।

—"এ অসম্ভব, হতেই পারে না—কিছুতেই না। হয় আমার, না হয় তোমার ভুল হয়েছে। বোধহয় সে চিঠিই পায়নি এখনও...হয়ত এখনও কিছুই জানে না। মানুষ কী করে...বল তুমিই বল, দোহাই তোমার, বুঝিয়ে বল আমাকে—কিছুতেই বুঝতে পারি না আমি...কী করে মানুষ মানুষের ওপর এমন অত্যাচার করতে পারে? সে যা করেছে অত্যাচার ছাড়া তাকে আর কী বলি? একটা খবরও না—সামান্য পশুপাখীদেরও যে মানুষ এর-চেয়ে বেশী স্নেহ করে। হয়ত কোনও কথা শুনেছে...আমার সম্বন্ধে কোনও কথা কেউ

বলেছে তাকে।” জিজ্ঞাসুভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, “তুমি কি বল ?”

“শোন নাস্তেনকা, শোন—কাল সকালে আমি যাব, গিয়ে বলব তোমার কথা।”

“যাবে ?”

“জিগেস্ করব সব কথা—সমস্ত কথা জানাব”—

“তারপর ?”

“তুমি একটা চিঠি লিখে রাখ ; ‘না’ বলো না—লক্ষীটি আপত্তি করো না। তোমার মূল্য আমি তাকে বোঝাব। সব কথা শুন্‌তে হবে তাকে। তারপর যদি...”

বাধা দিয়া নাস্তেন্‌কা বললে “না, বন্ধু না, ঢের হয়েছে। আমার কাছ থেকে আর একটা কথা, একটি লাইনও পাবে না, খুব শিক্ষা হয়েছে। আমি চিনি না...আর ভালোবাসি না তাকে···সব কথা ভুলে যাব...”

আর বলতে পারলে না।

“নাস্তেন্‌কা, নাস্তেন্‌কা, শান্ত হও, বস এইখানে।”

“আমি শান্তই আছি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এ কিছুই না—শুধু চোখের জল—এখুনি শুকিয়ে যাবে। কেন ব্যস্ত হচ্ছ তুমি মিছামিছি। ভাব্‌ছ বুঝি আকুল হয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, না ?”

আর সমস্ত শরীর মন্থন করে চোখের জল ঠেলে উঠছিল। কথা কইবার চেষ্টা করলাম, স্বর ফুটল না।

আমার হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে সে বলতে লাগল, “বল, বল, তুমি হলে এমনি করতে ? যদি কেউ সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে তোমারই কাছে এসে শরণ নিত, তুমি ফেলে চলে যেতে তাকে ? তাকে দেখে তার পানে চেয়ে কখনও বিদ্রূপের হাসি আসত তোমার ? তুমি তাকে এতটুকু স্নেহ দিতে না কি ? তুমি ত বুঝতে যে সে নিরাশ্রয়, একেবারে একলা। কেউ নেই তাকে দেখবার বা রক্ষা করবার। তোমাকে যে সে ভালোবেসেছে সে কি তার দোষ—বল, বল সেকি তার দোষ ? কী করেছে সে···এমন...ওঃ ভগবান্!”

আর থাকতে না পেরে বললাম, “নাস্তেনকা, নাস্তেনকা, আমাকে তুমি কাঁদাও কেন ? তোমার কথা শুনে বুক ফেটে যায় আমার—মরণও যে এর চেয়ে শতগুণে ভালো। আর থাকতে পারছি না—যে কথা গুমরে উঠছে আমার মনে মনে এতদিন ধরে আজ তা বলবই—বাধা দিও না—বাধা দিও না আমাকে।”

বলতে বলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার হাতটি ধরে অবাক হয়ে সে চেয়ে রইল স্তম্ভিত হয়ে জিগেস্ করলে, “কি হল তোমার ?”

দৃঢ়স্বরে বললাম, “শোন, শোন নাস্তেনকা। যা বলতে চলেছি সবই বাজে কথা—অসম্ভব—উদ্ভট কল্পনা। আমি জানি যে এ হবার নয়, তবু না বলে পারছি না। তোমায় মিনতি করি নাস্তেনকা, ক্ষমা করো আমাকে।”

চোখের জল শুকোতে শুকোতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, “কি, কি, ?”—দুই চোখে তার কৌতূহলের আলো—“কি বলবে আমাকে ?”

—“জানি অসম্ভব—তবু···নাস্তেনকা, নাস্তেনকা তোমাকে আমি ভালবাসি। বাস্—সব বলা হয়ে গেল।” হাতটা দুলোতে দুলোতে বলে চললাম, “এবার ভেবে দেখ তুমি যা বলব তা শুনতে রাজী আছ কি না ?”

নাস্তেনকা বাধা দিয়া বলল, “তারপর···তাতে কি ? এ ত আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম, কিন্তু ভেবেছিলাম বুঝি আমার ওপর তোমার একটুখানি স্নেহ জন্মেছে মাত্র...”

“প্রথমে সে ত শুধু স্নেহই ছিল নাস্তেনকা, কিন্তু এখন··· এখন—তোমার অবস্থা যেমন হয়েছিল সেদিন যেদিন গিয়েছিলে তার কাছে আপনি সেধে, আজ আমারও অবস্থা ঠিক তেমনি। বরং তোমার চেয়েও খারাপ অবস্থা নাস্তেনকা···কারণ সে ত আর অন্য কাউকে ভালো বাস্‌ত না।”

“কী বলছ তুমি কিছুই বুঝছি না যে। এর মানে কি ?—তোমাকে দোষ দিচ্ছি না আমি···কিন্তু তুমি এমন হঠাৎ—ওঃ ভগবান! আমিও যা-তা বলতে আরম্ভ করেছি! তুমি কেন···

হতবুদ্ধি হয়ে নাস্তেনকা চুপ করে গেল।—তারপর রাঙা হয়ে উঠল তার সারা মুখখানা, চোখ দুটো ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলে।

“কী করব নাস্তেনকা—কী করব আমি ?—এ সব আমারই দোষ। তোমার বিশ্বাসের অপমান···কিন্তু না-না,

আমার কোনও দোষ নাই নাস্তেনকা, আমার মন বলছে যে আমার কোনও দোষ নাই—আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারি না—কখনও ভুলেও ব্যথা দিতে পারি না তোমাকে। বন্ধুভাবে তোমার পাশে এসেছিলাম—এখনও বন্ধুই আছি; আমি ত তোমার বিশ্বাসের অপমান করি নি। দু চোখ বেয়ে আমার জল ঝরছে নাস্তেনকা—শুধু চোখের জল, তাতে কি? কারওত কোনও ক্ষতি করেনি—ও এখুনি শুকিয়ে যাবে।"

আমাকে ধরে বসাবার চেষ্টা করতে করতে সে বলতে লাগল, "বস, বস, পায়ে পড়ি, বস চুপ করে, দোহাই তোমার।"

"না, না, নাস্তেনকা বসব না আমি। তোমার কাছে আর যে মুখ দেখাতে পারি না; একটিবার সব কথা খুলে বলব তোমাকে তারপর—চলে যাব। শুধু এইটুকু বলে যেতে চাই যে, তোমাকে যে ভালবাসি সে কথা কোনও দিন টের পেতে দিতাম না—আমার বুকের মধ্যে অতি যত্নে লুকিয়ে রাখতাম তাকে। নিজের কথা নিয়ে এইসময়ে তোমাকে বিরক্ত করতাম না কখনও। কিন্তু আমি আর থাকতে পারলাম না যে। তুমিই ত জাগিয়ে তুললে—এ ত তোমার দোষ, হ্যাঁ, তোমারই দোষ—আমি কি করি বল? তাই বলে তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিওনা আমাকে—তাড়িয়ে দিও না নাস্তেনকা।"

হতবুদ্ধি হয়ে আপনাকে সামলে নিতে নিতে নাস্তেনকা বলে উঠল, "না না, তোমাকে তাড়িয়ে দেব কেন? পাগল হয়েছ?"

—হায় রে বেচারা।

"তাড়িয়ে দেবে না আমাকে? কিন্তু আমি যে নিজেই পালাব ঠিক করে রেখেছিলাম। চলে ত যাবই কিন্তু তার আগে তোমাকে বলে যাব সব কথা। তোমার চোখে জল দেখে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। তুমি কাঁদছিলে, তোমাকে—তোমাকে···আমায় বলতে দাও নাস্তেন্কা, বাধা দিও না—তোমাকে অসহায়া রেখে সে ফেলে গিয়েছে তোমার প্রেমকে পায়ে দলে,—আমার সমস্ত বুকটা কেমন করে দুলে উঠল। তোমার জন্তেই এত ভালোবাসা আমার বুকে, আর সে ভালোবাসা দিয়েও কিছুই করতে পারলাম না আমি। আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছিল···আমি...আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না নাস্তেন্কা—থাকতে পারলাম না, তোমাকে বলতে হলই।"

নাস্তেন্কা বলে উঠল, "বল, বল, আরও বল।" দুটো চোখে তার কী যে চাহনি জেগে উঠল তার আর বর্ণনা করা যায় না।—"তোমার সঙ্গে এমনি করে কথা বলছি বলে বোধ হয় অবাক্ হয়ে যাচ্ছ···বল, বল···তোমাকে পরে বলব—সব কথা বলব তোমাকে।"

"আমার জন্তে তুমি দুঃখ কোরো না...দুঃখ কোরো না। যা হয়েছে তা ত আর ফিরবার নয়। যা বলে ফেলেছি তা আর ফিরিয়ে নিই কী করে? —কি বল? বুঝলে—এইবার তবে বলি শোন। তুমি যখন বসে বসে কাঁদছিলে তখন আমার কি মনে হচ্ছিল জানো?—নাস্তেন্কা, নাস্তেন্কা, বাধা দিও না—আমার কি মনে হচ্ছিল বলতে দাও—মনে হল—অবশ্য একেবারে বাজে—অসম্ভব, ওযে হতেই পারে না—মনে হল যেন তুমি···তুমি—আমার কথা ছেড়েই দাও···তুমি ওকে আর ভালোবাসো না। তারপর মনে হল কাল...পরশু আমি ত ইচ্ছে করলেই আমার প্রতি তোমার মনটাকে টানতে পারতাম...ঠিক পারতাম—তুমি ত নিজেই স্বীকার করেছিলে যে আমায় ভালোবাস তুমি। তারপর...তারপর আর বিশেষ কিছু বলবার নাই। তোমার ভালোবাসা যদি পেতাম তা'হলে যে কী হত শুধু সেই কথাটুকু বলতে বাকী... শোন···শোন···বন্ধু আমার—যাই হোক্ না কেন, তুমি আমার চিরদিনের বন্ধু। আমি একটা নগণ্য লোক—আমার আর দাম কি—অবশ্য এ কথাটার কোনই মানে হয় না নাস্তেন্কা—নাস্তেন্কা, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে। যা বলতে চাই কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারছি না তোমাকে ভালোবাসতাম, এত ভালোবাসতাম যে যদি চিরদিন তুমি তাকেই ভালোবেসে যেতে তা হলেও আমার ভালোবাসাতে তোমার কোনও ভার বোধ হত না। তোমার পাশে শুধু একটি প্রাণ সদা সর্বদা জেগে বসে থাকত, তোমারই মুখের পানে চেয়ে··· সে যে ধন্য হয়ে যেত নাস্তেন্কা, ধন্য হয়ে যেত। নাস্তেন্কা, নাস্তেন্কা...তুমি আমার এ কী করলে?"

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে নাস্তেনকা বললে, "কেঁদো না, কোঁদো না, তোমার চোখের জল সহ্য করতে পারি না আমি। ওঠ, উঠে এস আমার সঙ্গে···কেঁদো না, দোহাই তোমার।"

রুমাল দিয়ে নিজের চোখ মুছতে মুছতে নাস্তেনকা বলতে লাগল, "চল, চল, হয় ত দু' একটা কথা বলব তোমাকে··· আমাকে ফেলে চলে গিয়েছে...ভুলে গিয়েছে আমায়। যদিও এখনও তাকে তেমনি ভালোবাসি—তোমার কাছে গোপন করতে চাই না—তবুও শোন, শোন—যদি···যদি...ধর যদি তোমাকে আমি ভালোবাসি···শুধু কথার কথা বলছি—যদি শুধু বন্ধু, বন্ধু আমার—তোমাকে কত দুঃখ দিয়েছি, কত ব্যথা পেয়েছ আমার জন্যে, তোমার ভালোবাসা নিয়ে ঠাট্টা করেছি...আমি কি নির্বোধ, এ কথা আগে মনে হল না— একেবারে মনে হল না আমার? যাকৃগে আমি মন ঠিক করে ফেলেছি; শোন, শোন—"

"নাস্তেন্‌কা, শোন...আমি একটা কাজ করব—আমি এবার যাই। থেকে মিছামিছি তোমাকে শুধু কষ্ট দিচ্ছি বইত নয়। আমাকে ঠাট্টা করেছিলে বলে দুঃখ করছ তুমি... আমার জন্যে...আমার জন্যে তোমার...না, না, নাস্তেনকা এ সবই আমার দোষ—গুড্‌ বাই নাস্তেন্‌কা, গুড্‌ বাই।"

"দাঁড়াও! দাঁড়াও! একটা কথা শুনবে?"

"কি?"

"তাকে ভালোবাসি, কিন্তু এ আমার কেটে যাবে, কেটে যেতেই হবে···না গিয়েই পারে না; এখুনি ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে...মনে হচ্ছে, বেশ বুঝছি কে জানে হয় ত আজই সব শেষ হয়ে যাবে—ওকে ঘৃণা করি আমি—আমার পানে চেয়ে অবহেলার হাসি হেসেছে আর তুমি আমারই পাশে বসে আমার দুঃখে কেঁদেছ। তুমি ত একদিনও বিমুখ হওনি আমার ওপর, তুমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো আমাকে আর সে আমাকে ভালোবাসে না। আমি, আমিও ভালোবাসি তোমাকে...হ্যাঁ, তোমাকেই ভালোবাসি—তুমি আমাকে যেমন ভালোবাস, তেমনি। তোমাকে আগেই বলেছি শুনেছ ত? তুমি যে ওর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বড়, অনেক মহৎ। সে...সে···"

অভাগিনী এত বিহ্বল হয়ে পড়ল যে মুখে কথা ফুটল না আর। আমার কাঁধে, আমার বুকে মাথা রেখে নীরবে কাঁদতে লাগল। কত সান্ত্বনা দিলাম, কত বোঝালাম, বেচারার চোখের জল কিছুতেই বারণ মানল না। আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "থামো, থামো, এখুনি সব শেষ হয়ে যাবে...তোমাকে, তোমাকে বলব আমি...ভেবো না যে এ চোখের জল···এ কিছু না— আমি বড় দুর্বল...দাঁড়াও, দাঁড়াও একটু।"

কান্না থেমে গেল। চোখের জল মুছে নিয়ে চললাম দুজন। আমি কথা বলতে আরম্ভ করতেই করুণ মিনতি করে সে বলতে লাগল, "থামো, একটু থামো।"

দুজনে চুপ করে রইলাম। অবশেষে, সাহসে বুক বেঁধে নাস্তেন্‌কা বলতে লাগল, "শোন—"

তার মৃদু কম্পিত স্বর আমার বুক সিক্ত করে দিলে মধুর সহস্রধারায়।

"ভেবো না যে আমি এমনি চপল, ক্ষণে ক্ষণে একজনকে ভুলে গিয়ে আর একজনকে ভালোবাসতে পারি। সারা বছর তাকেই ভালোবেসেছি একটি দিনের তরেও... ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, একটি দিনের তরে মনে মনেও অবিশ্বাসিনী হইনি। আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—ঈশ্বর ক্ষমা করুন তাকে! আমাকে উপহাস করেছে, বুকটা রক্তমাখা করে দিয়ে গিয়েছে ...আমি—আমি আর ভালোবাসি না তাকে। আমি শুধু ভালোবাসি মহান, মন যার স্নেহে ভরা, আমার ব্যথার ব্যথী যে শুধু তাকেই। ও ত আমার যোগ্য নয়···যাকৃগে ওর কথা এই খানেই শেষ। নিজের স্বরূপ পরে জানানর চেয়ে এ অনেক ভালো করেছে—যাকৃগে সব শেষ এবার।"

আমার হাতটা চেপে ধরে নাস্তেন্‌কা বলতে লাগল, "কে জানে, হয়ত আমার ভালোবাসাটা আগা-গোড়াই একটা মিথ্যে কল্পনা—হয়ত শুধু কথার কথা, ঠাকুরমাকে লুকিয়ে ভালোবেসেছিলাম, বুঝি সে-পাপে এ-দশা। হয়ত আমার আর কাউকে ভালবাসা উচিত···অন্য কাউকে...যে একটুখানি স্নেহ দেবে আমাকে···আর···আর...।" আকুল হয়ে হঠাৎ মাঝ পথে থেমে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নাস্তেন্‌কা বলল, "থাক্‌ গে ও-কথা এখন; আমি শুধু···শুধু এই বলতে চাই যে যদিও

তাকে ভালোবাসি—না না ভালোবাসতাম, যদি এ সত্ত্বেও তুমি…যদি ভোবো যে তুমি আমাকে এতই ভালোবাসো যে তোমার ভালোবাসা আমার মন থেকে দূর করে দিতে পারবে ওর চিন্তা…আমার ওপর যদি দয়া হয় তোমার…যদি একলা আমাকে আমার নিষ্ঠুর ভাগ্যদাতার পায়ে বলি না দিতে চাও, অসহায়া, নিরাশ্রয়া রিক্ত ভিখারীর মত, যদি চিরদিন এমনি ভালোবাসো…শপথ করে বলাই যে জীবনে তোমার প্রেমের ঋণ…একদিন তোমার ভালোবাসার যোগ্য হতে পারবই, তোমার পায়ে রাখবে আমাকে ?"

চোখের জল উদ্বেল হয়ে উঠল আমার। প্রাণপণ চেষ্টায় সেটা দমন করে আনন্দে উন্মাদ হয়ে বললাম, "নাস্তেন্‌কা… ওঃ নাস্তেন্‌কা—"

নিজেকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে সে বললে, "থাক্ থাক্ হয়েছে, আপাততঃ এই যথেষ্ট ; সব পরিষ্কার হয়ে গেল ; —হল ত ? তুমিও খুসী—আমিও খুসী। এ সম্বন্ধে আর কথা নয়। দাঁড়াও, থামো একটু, আমাকে একটুখানি সাম্‌লে নিতে দাও…ভগবানের দোহাই, যা হোক্ অন্য কিছু বল।"

"ঠিক্ নাস্তেন্‌কা, ঠিক কথা। এ বিষয় নিয়ে ঢের কথা হয়েছে। আমি খুব খুসী। আমি—যাক্‌গে অন্য কথা হোক্, যা হোক্ তাড়াতাড়ি বল কিছু। নাস্তেন্‌কা বল, বল—"

কী কথা যে কইব ! আমরা আর কথা খুঁজে পেলাম না। হেসে, কেঁদে, লক্ষ রকম বাজে অর্থহীন প্রলাপ বকতে লাগলাম। কখনও ফুটপাথ ধরে চলি, কখনও বা হঠাৎ ঘুরে রাস্তা পেরিয়ে একেবারে ও-পাশে। তারপর আবার হঠাৎ নেমে গিয়ে আবার ফুটপাথে—ঠিক ছেলে-মানুষের মত।

আমি বললাম, "নাস্তেনকা, এতদিন একলা কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু কাল…? তুমি ত জানই বড় গরীব আমি, মাত্র বারশ' রুবল সম্বল—কিন্তু তাতে কি ?—কি বল ?"

"বটেই ত—আর তা ছাড়া ঠাকুরমার পেন্সন্ আছে, তাতেই চলে যাবে তাঁর। ঠাকুরমাকেও কাছে রাখতে হবে কিন্তু।"

"নিশ্চয়ই, ঠাকুরমাকে কাছে রাখতে হবে বৈ কি। কিন্তু আবার ম্যাট্রোনা আছে—"

"হ্যাঁ আবার আমাদের ফ্যোক্‌লাও আছে।"

"ম্যাট্রোনা খুব ভালো লোক, কিন্তু একটা বড় দোষ আছে। ওর কল্পনাশক্তি নাই একেবারে—অবশ্য তাতে কোনও ক্ষতি নাই, কি বল ?"

"মোটেই না…শোন, কাল আমাদের বাড়ী এস একবার।"

"তোমাদের বাড়ী ? কেন ? আচ্ছা আসব।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ এসো। আমাদের কাছ থেকে একটা ঘর ভাড়া নিও। আমাদের ওপর তলাটা একেবারে খালি আছে ; একটা বুড়ী ছিল, কয়েক দিন হল সেও চলে গিয়েছে আর ঠাকুরমার ইচ্ছে যে একটা ছেলে ছোকরা গোছের ভাড়াটে আসে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ছেলে ছোকরা গোছের ভাড়াটের কি দরকার। বললেন 'আমি বুড়ো হয়েছি যে রে—তা বলে ভাবিস্ না যে তোর বর খুঁজছি।' কাজেই তখুনি বুঝলাম যে ইচ্ছেটা তাই।"

"নাস্তেন্‌কা—"

দুজনেই হেসে উঠলাম।

"এস এস ঢের হয়েছে। আচ্ছা তুমি থাকো কোথায় ? আমি ভুলে গিয়েছি।"

"ঐ দিকে ; ×. পুলটার কাছে ব্যারানিকভ্‌দের ঘর-গুলোতে।"

"ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটা ?"

"হ্যাঁ, ঐ হাঁদা বাড়ীটাতেই।"

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, খাসা বাড়ী। যত শিগগির পার ও-বাড়ী ছেড়ে আমাদের কাছে আসতে হবে কিন্তু—"

"কালই আসব নাস্তেন্‌কা। অল্প একটু ভাড়া বাকী আছে, অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। শিগগিরই মাইনে পাব।"

"জান, আমি মেয়ে পড়াব ঠিক করেছি। নিজে আরো কিছু লেখা পড়া শিখে নিয়ে পড়াব—"

"চমৎকার—আর আমিও শিগগির আরও কিছু টাকা পাব বোধহয়।"

"কাল থেকে আমাদের ভাড়াটে হয়ে আসছ তা' হলে ?"

"আবার 'সেভেই এর বার্কার' দেখতে যাবে ত ? শিগগির হবে শুনছি।"

"হ্যাঁ যাব বৈ কি, কিন্তু আর ওটা দেখব না; অন্য যা হয় কিছু দেখিও।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমি ..."

কথা কইতে কইতে চলেছিলাম দুজনে যেন নেশার ঘোরে টলতে টলতে। ঠিক পাগলের মতই—কি যে হয়েছিল কিছুই বুঝিনি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সেই খানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকছিলাম, আর তার পর আবার চলা সুরু—কোথায় যে শেষ ভগবান্‌ই জানেন। হাসি......আর একটু পরেই চোখে জল। একটু পরেই ত নাস্তেনকা বাড়ী ফিরতে চাইবে, আমার ত আর ধরে রাখতে সাহসে কুলোবে না—বাড়ীই পঁহুছে দিয়ে আসব।...চললাম...পনের মিনিটের মধ্যেই রোজ যেখানে বসতাম সেইখানে এসে উপস্থিত। নাস্তেনকার বুকটা দুলে একটা নিশ্বাস পড়ল, চোখে জল এসে পড়ল আমার। আমি বিস্ময়ে একেবারে জমে গেলাম...আমার হাতে চাপ দিয়ে নাস্তেনকা বার বার মিনতি করতে লাগল কথা বলতে।

অবশেষে নাস্তেন্‌কা বললে, "অনেক রাত্রি হয়ে গেল যে—এবার বাড়ী ফিরতেই হবে; আর ছেলে-মানুষী করলে চলবে না।"

"হ্যাঁ নাস্তেনকা, কিন্তু আজ আর আমার ঘুম হবে না; বাড়ীও ফিরব না আজ।"

"আমারও ঘুম হবে না বোধ হয়;...আমাকে বাড়ী পঁহুছে দেবে না?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু সত্যি, এবার ঠিক বাড়ী ফিরতে হবে; আর ঘুরে বেড়াব না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ঠিক ফিরব।"

"কথা দিচ্ছ?...জান ত বাড়ী না ফিরলেই নয়?"

"কথা দিচ্ছি। সত্যিই ত বাড়ী না ফিরলে চলে কি করে?"

"চল—"

"এস—দেখ, দেখ নাস্তেনকা, আকাশটার পানে চেয়ে দেখ একবার। কাল ভারী সুন্দর হবে দিনটা। কী নীল আকাশ, চাঁদটা কি সুন্দর। দেখ, দেখ ঐ হলদে মেঘটা ঢেকে ফেললে চাঁদটাকে—না না ঐ উড়ে গেল, দেখ, দেখ..."

কিন্তু নাস্তেনকা মোটেই দেখল না। হঠাৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাথরের মূর্ত্তির মত; এক মুহূর্ত্ত পরেই জড়সড় হয়ে আমার বুকের কাছটিতে ঘেঁসে এল। আমার হাতের মধ্যে তার হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠল বারবার; তার পানে তাকাতেই ভীরু পাখীর মত আরো কাছে সরে এল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কে একজন চলে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের পানে চেয়ে আবার সে চলতে লাগল। আমার বুকটা কেন দুরদুর করে উঠল কে জানে। চাপা স্বরে বললাম, "কে—নাস্তেনকা?"

আরো কাছে সরে এসে অতি চাপা স্বরে সে বললে, "সে ...সে..."—

আমার পা দুটো কাঁপতে লাগল, আর বুঝি দাঁড়াতে পারি না।

হঠাৎ আমাদের পিছনে স্বর শোনা গেল, "নাস্তেন্‌কা—নাস্তেন্‌কা, তুমি?"—সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আমাদেরই দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা।

উঃ ভগবান্—কেমন করে চীৎকার করে উঠল নাস্তেন্‌কা। কেমন করে চমকে উঠল। আমার বুক থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে উড়ে গেল তার পাশে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম দুজনকে, বুকটা ভেঙে গেল না আমার? কিন্তু তার হাতে হাত দিতে না দিতেই বিদ্যুতবেগে আবার নাস্তেন্‌কা ছুটে এল আমার কাছে—আমি নিজেকে সামলাবার আগেই আমার ঠোঁটে এঁকে দিলে তার তপ্ত কোমল ঠোঁটের একটি চুমো। আর তারপর আমাকে একটা কথাও না বলে ছুটে চলে গেল তার কাছে। তার হাত দুটো ধরে টানতে টানতে চলে গেল। অনেকক্ষণ তাদের যাওয়ার পথে চেয়ে রইলাম—ধীরে ধীরে দুজন মিলিয়ে গেল আমার দৃষ্টির বাহিরে...

সকাল

সকাল হতেই আমার রাত্রি ফুরিয়ে গেল। দিনটা স্যাঁৎ-সেঁতে। বৃষ্টির ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌সা হয়ে এসে জানালা সার্সির ওপরে পড়ছে; ঘরের মধ্যে অন্ধকার, বাইরে ধূসর আবরণে সব ঢাকা। আমার মাথাটা বিষম ভার, সমস্ত শরীরটা ক্লান্তি—অবসাদে পাথরের মত ভারী; জ্বরের জ্বালা ধীরে ধীরে সরীসৃপের মত আমার গা বেয়ে উঠে আসছে।

আমার কাছে এসে গায়ের ওপরে ঝুঁকে পড়ে ম্যাট্রোনা

বললে, "আপনার একটা চিঠি এসেছে ; ডাক পিয়ন দিয়ে গেল—"

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললাম, "আমার চিঠি ?—কে লিখেছে ?"

"তা ত জানি না—খুলেই দেখুন না। যে লিখেছে তার নামটা হয় ত আছে চিঠিতে।"

খাম খানা ছিঁড়ে ফেললাম···তারই চিঠি।

"ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাকে। জানু পেতে আজ তোমার কাছে করযোড়ে ক্ষমা চাইছি। আমি তোমাকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বঞ্চনা করেছি। স্বপ্ন...মতিভ্রম... তোমার কথা মনে করে মনটা কেঁদে উঠছে আমার; আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো তুমি।

"দোষ দিও না আমাকে—তোমার প্রতি আমার মন তেমনি আছে, একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি। তোমাকে বলেছিলাম যে ভালোবাসব চিরদিন তোমাকে, তোমাকে ভালোবাসি ···ভালোবাসার চেয়েও বেশী···ওঃ ভগবান্। তোমাদের দুজনকে কি একসঙ্গে ভালোবাসা যায় না ? যদি তুমি···সে হতে—

['যদি তুমি সে হতে—' আমার মনে আবার জেগে উঠল সেই কথা। আবার মনে পড়ল নাস্তেন্‌কা···]

"তোমার জন্যে মনটা যে কী করছে ভগবানই জানেন। আমার মন বলছে যে তুমি আজ ভেঙে পড়েছ। তোমাকে ব্যথা দিয়ে এসেছি আমি, কিন্তু তুমি ত জানই যাকে ভালোবাসা যায় তার দেওয়া ব্যথা মানুষ ভুলে যায় শিগ্‌গিরই। আর তুমি...তুমি ত আমাকে ভালোবাস।

"তোমাকে ধন্যবাদ—হাঁ তোমার ভালোবাসার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। জেগে ওঠার অনেক পরেও যেমন সুখস্বপ্নের ক্ষীণ একটা স্মৃতি থেকে যায়, তেমনি তোমার ভালোবাসা চিরদিন জেগে থাকবে আমার মনে। তুমি কত স্নেহভরে ভাইএর মতই ভালোবেসে আমার কাছে তোমার মনটি খুলে ধরেছিলে, আমার ভাঙা বুকের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য পরম প্রীতিভরে তুলে নিয়েছিলে দুটি হাতে, চিরদিন স্নেহের চোখে দেখবে ব'লে—সে কথা কি কখনও ভুলবার ? আমাকে ভুলে যাও—তোমার স্মৃতির সঙ্গে আমার নারীজীবনের সব কৃতজ্ঞতা মিশে থাকবে—আমার মন থেকে তোমার কথা মুছবে না কোনও দিন···অমূল্যধনের মত গোপনে লুকিয়ে রেখে দেব আমার বুকের তলে। আমার সত্য সুন্দরকে লোকের চোখের সামনে মেলে ধরব না, অবিশ্বাসিনী হব না কখনও। আমি যাই হই, আমার মন অকৃতজ্ঞ নয় ; স্নেহ সে ভোলে না কোনও দিন—তাই কাল এক নিমেষের মধ্যেই ফিরে এসেছে আবার তারই কাছে, এতদিন ধ্যানে, জ্ঞানে, চিন্তায়, জাগরণে, যার স্মৃতির চারিপাশে ঘুরে ফিরছিল।

"আবার আমাদের দেখা হবে—তুমি এসো আমাদের কাছে, ফেলে যেও না আমাকে। চিরদিন আমার বন্ধু, আমার ভাই হয়ে থেকো। আমার সঙ্গে দেখা হলে আবার তোমার হাতটি বাড়িয়ে দেবে না কি...ঠিক আগের মতই ? বল, বল, ক্ষমা কি পাব না তোমার ? ভালোবাসো না তুমি আমাকে ? ···আগে যেমন বাসতে ঠিক তেমনি ?...

"ভালোবাস, ভালোবাস···আমাকে—ছেড়ে যেও না ; তোমাকে যে আমি ভালোবাসি, সত্যিই ভালোবাসি। তোমার ভালোবাসা ব্যর্থ হবে না কখনও, আমি তোমার ভালোবাসার যোগ্য হবই···। আসছে সপ্তাহে বিয়ে হবে আমাদের। আমাকে ভালোবেসেই ফিরে এসেছে সে···কোনও দিন ভোলেনি আমার কথা। ওর কথা লিখলাম বলে রাগ করছ না-ত ? তাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে ইচ্ছে হয়। যাবো ? ওকে দেখে তুমি খুসীই হবে ; হবে না ? ক্ষমা করো আমাকে। মনে রেখো, আর ভালোবেসো।

আমি তোমারই

নাস্তেন্‌কা।"

বারবার অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা পড়লাম। চোখ ফেটে জল এল। চিঠিটা পড়ে গেল হাত থেকে, দুহাতে মুখ লুকোলাম।

ম্যাট্রোনা বলতে লাগল, "শুনছ ? কি হল তোমার ?"

"কি ম্যাট্রোনা ?"

"মাকড়সার জালগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছি—এবার বিয়েই কর আর পার্টিই দাও, যা খুসী।"

ম্যাট্রোনার দিকে তাকালাম···এখনও ওর শরীর থেকে যৌবনের রেখা একেবারে মুছে যায় নি, কিন্তু হঠাৎ কে জানে কেন আমার মনে হল ও যেন লুপ্ত-দেহ-লোলচর্ম্মা......

হীন চক্ষু…। জানি না কেন হঠাৎ মনে হল আমার ঘরটাকেও ম্যাট্রোনার শরীরের মতই অকালে জরা এসে আক্রমণ করেছে। দেয়ালগুলো, মেজেটা, কেমন যেন পাণ্ডু, নিষ্প্রভ—সবই বিশ্রী, নোংরা। মাকড়সার জালগুলো আগের চেয়েও ঘন। কেন জানি না কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে চাইতেই দেখলাম পাশের বাড়ীটাও তেমনি বিশ্রী, কুৎসিত হয়ে গিয়েচে—থামের ওপরে কার্ণিশ ভেঙে পড়ছে, ছাদের আলসে ফেটে চৌচীর—এখানে-সেখানে কালো আর হলদে রংএর ছোপে ঢাকা।

মেঘের পিছনে উঁকি দেবার চেষ্টা করতে করতে সূর্য্য হয়ত বৃষ্টির ঘোমটার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছেন, সব যেন ঝাপসা হয়ে এল আমার চোখের সামনে; হয়ত আমার ভবিষ্যতের সমস্ত ছবিটাই একবার চমক্ খেলে গেল আমার চোখের ওপর দিয়ে—দেখলাম আমি যেন আরো পনের বছর পরে সেই জীর্ণ ঘরে তেমনি বসে আছি—পাশে ম্যাট্রোনা তেমনি দাঁড়িয়ে, দীর্ঘ পনের বছরেও তার এতটুকু বুদ্ধি বাড়ে নি।

না, না, নাস্তেন্‌কা। ও কথা বললে যে তোমার ওপর অবিচার করা হয়। তোমার নির্ম্মল, দুঃখলেশহীন আনন্দের ওপরে আমি কি কালো মেঘের ছায়া ফেলতে পারি? আমার তিরস্কার তোমার মনে ব্যথা দেবে? গোপন অনুতাপে বিষাক্ত করে দেব তোমার মনটাকে?—সুখের চরম মুহূর্ত্তটিতেও সংশয় ভয়ে বার বার দুলে উঠতে দেব? তার হাতটি ধরে বিবাহবেদীমূলে যাবার সময় তোমার কালো চুলে যে মালা জড়িয়ে রাখবে তুমি, তার একটি ফুলও কি আমি দ'লে দিতে পারি?…না, না, নাস্তেন্‌কা, এ জীবনে না। তোমার আকাশ নির্ম্মল হোক্, তোমার মধুর হাসি আরও মধুর হোক্; বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়ুক তোমারই মাথায়—তুমি এক হতভাগাকে যে আনন্দ দিয়ে গিয়েছ সে কথা চিরদিন তার মনে থাকবে—এ জীবনের বাকী কটা দিন তোমারই পানে চেয়ে রইবে সে।

ভগবান্…ভগবান্—পুরো একটা মুহূর্ত্ত এই আনন্দ—মানুষের সমস্ত জীবনটার পক্ষে এ কি নিতান্তই সামান্য?

সমাপ্ত

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

তৃণের কামনা

শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত

হে সবিতা, তব আলোক আশীষে
মন-মালঞ্চে ফুটিল ফুল,
হে কবি, উথলে বাঁশীতে তোমার
হৃদি-যমুনার উভয় কূল।
হে ঋষি, তোমার তপের আলোকে
ঘুচিল মনের অন্ধকার,
হে বনস্পতি, লহ আজি স্নেহে
তুচ্ছ তৃণের নমস্কার।

হে তুমি পুরোধা সত্য-শিবের,
হে চির-সাধক সুন্দরের—
ওহে উদগাতা, মিলনের ঋক্
গাহিলে পূরব-পশ্চিমের!
প্রভাতী পূরবী হইতে হে কবি,
শেষ সপ্তকে মিলিল গান,
হে চিরনবীন, লভ চিরদিন
শত শরতের শ্যামল প্রাণ॥

* কবিগুরুর ষট্‌সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে রচিত

বাংলা বানানের নিয়ম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

ভূমিকা

বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত ভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু-কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে। সুতরাং মহাজন-অনুসৃত পন্থা কোন্‌টি তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয়—যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান-সংস্কার করা। প্রায় দুইশত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাঁহাদের অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ আছে, সেইরূপ মতভেদ সমিতির সদস্যগণের মধ্যেও আছে। বিভিন্ন পর্কের যুক্তি-বিচারের পর সদস্যগণের মধ্যে যতটা মতৈক্য ঘটিয়াছে তদনুসারেই বানানের প্রত্যেক বিধি রচিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে যে নিয়মাবলী সংকলিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া হয়তো কেহ কেহ মনে করিবেন—বানানের যথেষ্ট সংস্কার হয় নাই, কেহ-বা ভাবিবেন—প্রচলিত রীতিতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। বানান-নির্ধারণের প্রথম চেষ্টায় এইরূপ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

সুখের বিষয়, বহু ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চেষ্টায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যদি সাধারণে সংকলিত নিয়মাবলী গ্রহণ করেন তবেই অনেক বাংলা শব্দের বিভিন্ন রূপ অপসৃত হইবে এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষা-শিক্ষার পথ কিছু সুগম হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইবে। আবশ্যক হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৮মে, ১৯৩৬

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা বানানের নিয়ম

গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রায় দুই শত উত্তর পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল উত্তরদাতাই একমত। কোন কোন স্থলে বহুপ্রচলিত বানান

* এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধাদি (বিশেষভাবে উপযুক্ত বোধ হলে) পরে প্রকাশিত হবে। সম্পাদক।

কিঞ্চিৎ বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই। আবার কতকগুলি বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি সমস্ত অভিমত বিচার করিয়া বাংলা বানানের যে নিয়ম গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালাইলে লাভ যত হইবে তাহার অপেক্ষা লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা বেশি হইবে। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে বা শব্দকোষে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য বহু চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু সাধারণ লেখায় তাহা ভারস্বরূপ। প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে অর্থ হইতেই বুঝিয়া লয়। আমাদের ভাষায় বহু শব্দের বানানে ও উচ্চারণে মিল নাই; যথা—'গণ, বন, ঘন; জলখাবার, জলযোগ; আষাঢ়, গাঢ়; সহিত, গলিত; অন্যতর, দুষ্করতর; একদা, একটা; অচেনা অদেখা'। এইপ্রকার শব্দের বানান-সংস্কার করিতে কেহই চান না, প্রদেশভেদে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ভেদ হইলেও ক্ষতি হয় না। সুপ্রচলিত শব্দের যদি বানান-সংস্কার করিতে হয় তবে বানানের জটিলতা না বাড়াইয়া সরলতা-সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।

নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দসম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক। এইপ্রকার শব্দের বাংলা রূপ এখনও বদ্ধ হয় নাই, অতএব সাধারণের যথেচ্ছতার উপর নির্ভর না করিয়া বানানের সরল নিয়ম গঠন করা কর্তব্য।

অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে। বহু স্থলে সংস্কৃত রীতিতেই সমাস-সন্ধির দ্বারা নূতন শব্দ গঠন করা হয়। এজন্য সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।

কেবল বর্তমান লেখক ও পাঠকগণের লাভালাভ হিসাব করিয়া বানানের নিয়ম গঠন করিলে সুবিচার হইবে না। ভবিষ্যতে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে তাহাদের যদি অধিকতর সুবিধা হয় তবেই নিয়ম-গঠন সার্থক হইবে।

শব্দকোষ ভিন্ন সমস্ত বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব। এই প্রবন্ধে বানানের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দেওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে, যথা—'কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক'। অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কর্দম, অর্ধ, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

শেষোক্ত স্থলে রেফের পর দ্বিত্ব সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে বিকল্পে সিদ্ধ, না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়। হিন্দি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় এই দ্বিত্ব হয় না।

২। সন্ধিতে ঙ স্থানে অনুস্বার

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, শংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ অথবা সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'। বাংলার সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, কারণ বাংলায় অনুস্বারের উচ্চারণ ঙ-র সমান।

৩। বিসর্গান্ত পদ

বাংলায় বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বর্জিত হইবে, যথা—'আয়ু, বক্ষ, মন, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত, সদ্য'। কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গসন্ধি যথানিয়মে হইবে, যথা—'আয়ুষ্কাল, পুনঃপুন, প্রাতঃকাল, পুনরাগত, মনোযোগ, সদ্যোজাত'।

'আয়ুঃ, চক্ষুঃ, মনঃ, দুর্বাসাঃ' প্রভৃতি সংস্কৃত পদ বাংলায় প্রায়শ বিসর্গ না দিয়া লেখা হয়। কিন্তু অব্যয় শব্দে কেহ বিসর্গ দেন, কেহ দেন না, যথা—'বিশেষতঃ, বিশেষত'। সর্বত্র একই নিয়ম গ্রহণীয়।

৪। হসন্ত পদ

হসন্ত সংস্কৃত পদের (বা শব্দের) শেষে হস্ চিহ্ন রক্ষিত হইবে, যথা—'বাক্, দিক্, সম্রাট্, উপনিষৎ, বিদ্যুৎ, উদ্ভিদ্, বিদ্বান্, শ্রীমান্'।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৫। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

অসংস্কৃত শব্দে এইরূপ দ্বিত্ব সর্বত্র বর্জনীয়, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, কার্বা, ফর্মা, জার্মানি'।

৬। হস্ চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণত হস্ চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্ চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গন্ধ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্ চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্, তখ্ত্, জেল্ল্, বণ্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্ চিহ্ন বিধেয়, যথা—'খট্‌কা, চুদ্‌বির, এক্‌প্রেস'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্ চিহ্ন বিধেয়, যথা—কট্, কট্, খপ্, সাব্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কারগ্রস্ত, অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—'অচল, গভীর, পাঠ, কনক, করিন, করিলেন'। এই সকল সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। সাধারণত অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্ চিহ্ন বিধেয়।

৭। ই ঈ উ ঊ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—'কুমীর, কুমির ; শীষ, শিষ ; রানী, রানি ; ময়রানী, ময়রানি ; পাখী, পাখি ; শাড়ী, শাড়ি ; ঊনিশ, উনিশ ; চূন, চুন ; পূব, পুব'। কিন্তু তদ্ভব ও তৎসদৃশ ভিন্ন অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব ই বা হ্রস্ব উ হইবে, যথা—'ঝি, দিদি, মাসি, পিসি, কাকি, মামি, ঢাকি, ঢুলি, বাঙালি, ইংরেজি, হিন্দি, রেশমি, পশমি, মাটি, ওকালতি, একটি, ছুটি'।

বহু লেখক তদ্ভব শব্দে মূল অনুসারে ঈ ঊ বজায় রাখিতে চান, পক্ষান্তরে অনেকে সর্বত্র ই উ লেখা উচিত মনে করেন। সেজন্য তদ্ভব ও তৎসদৃশ শব্দে বিকল্প বিহিত হইল। অন্য শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদের হেতু দেখা যায় না, কেবল ই উ লিখিলে বানান সরল হইবে।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৮। ণ ন

অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'।

৯। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত বাংলা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়, যথা—'যত, মত (সদৃশ), কাল (সময়, কল্য, কৃষ্ণ), ভাল (কপাল, উত্তম), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (ডালি, শাখা), এত, এখন, কে, দেখা, খেলা'।

'তো, হয়তো' বানান বিধেয়।

'কোন, এখন, কখন, তখন, প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে এইরূপ বানান বিধেয়—'কোন্ লোক ? কোন কোন লোক বর্ণান্ধ। কোনও লোক আসে নাই। কখন হইবে জানি না। কখন মেঘ কখন রৌদ্র। এমন কখনও হয় না।'

ইয়া উয়া প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের চলিত (ও আধুনিক সাধু) রূপ এই প্রকার হইবে—'একঘরে, জটে, কটমটে, ছটফটে ; জলো, মদো, ঘরো, পড়ো, পটো, খড়ো, ঝড়ো'। উপান্ত্য বর্ণে ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে, যথা—'একঘ'রে, জ'লো'।

১০। ং ঙ

'বাঙালি, আঙুল, রঙের' প্রভৃতি বানান বিধেয়। যদি স্বরচিহ্নযোগ না হয় তবে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং; রঙ ; সং, সঙ ; বাংলা, বাঙলা'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান। 'বাঙ্গালি' ও 'বাঙালি'র উচ্চারণও সমান নয়।

১১। শ ষ স

মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—'আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসি (পিতৃঃস্বসা)'। দেশজ শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'সরেস, করিস, ফরসা (-র্শা), উশখুস'। বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স ও sh স্থানে শ হইবে, যথা—'আসল, খাস, জিনিস, সাদা, সবুজ, মাস্তুল, মসলা, পেনসিল, সিমেন্ট, পুলিস, ক্লাস ; শরবৎ, শরম, শহর, খুশি, পোশাক, পেনশন, বার্নিশ, শার্ট, শেক্স্পিয়র'।

তদ্ভব ও দেশজ শব্দে শ ষ স প্রয়োগের যে নিয়ম দেওয়া হইল তাহা প্রচলিত রীতির অনুযায়ী। প্রায় সকল লেখকই এই রীতি বজায় রাখিতে চান। অধিকাংশ বিদেশী শব্দের প্রচলিত বানানে মূল উচ্চারণ অনুসারে শ বা স লেখা হয়, যথা—'আসল, সবুজ, ক্লাস ; চশমা, পশম, পেনশন' ; কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে, যথা—'মাশুল, মশলা ; সরবৎ, সরম'। নবাগত বিদেশী শব্দের বাংলা রূপে অনেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ বজায় রাখার চেষ্টা করেন। সামঞ্জস্যের জন্য সকল বিদেশী শব্দেই মূল উচ্চারণ-অনুসারে শ স প্রয়োগ সমীচীন হইবে।

বিদেশী শব্দের z ধ্বনির জন্য বাংলায় জ অক্ষর বর্জনীয়।

১২। চন্দ্রবিন্দু

কতকগুলি শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ-সম্বন্ধে লেখকগণ একমত নহেন এবং অনেকে সংশয়গ্রস্ত। বিশিষ্ট লেখকগণের অধিকাংশের মত অনুসারে নিম্নলিখিত বানান নির্ধারিত হইল—

কুচি (টুকরা)। কুঁচি (শূকরাদির লোম)
কুঁজা (কুব্জ, সোরাই)
কুঁদা (লাফান, কুঁদ যন্ত্রে কাটা, কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদি)
কুড়ে (অলস)। কুঁড়ে (কুটীর)
খোঁপা (কবরী)
ছুঁচ (সূচ)
ছোড়া (নিক্ষেপ করা)। ছোঁড়া (ছোকরা)
টেঁকা (স্থায়ী হওয়া)
পুঁথি (পুস্তিকা)
বাটা (পেষণ করা)। বাঁটা (বণ্টন করা)
বেজি (নকুল)।

১৩। ক্রিয়াপদ

সাধুভাষার ক্রিয়াপদের বানানে অধিক মতভেদ দেখা যায় না। অনেকে 'করানো, পাঠানো' লেখেন, কিন্তু অধিকাংশ লেখক 'করান, পাঠান' বানানের পক্ষে। ও-কার অনাবশ্যক, অর্থ হইতেই উচ্চারণবোধ হয়, সেজন্য 'করান, পাঠান' ইত্যাদি বানান বিধেয়। 'করিয়ো, দিয়ো' ইত্যাদি বানানে য় অনাবশ্যক, 'করিও, দিও' বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হইল। অতিরিক্ত ও-কার ঊর্ধ্ব-কমা বা হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক ; কিন্তু ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য কয়েকটি রূপে ' চিহ্ন বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে। সাধু ক্রিয়াপদে

-লাম বিভক্তি স্থানে চলিত ক্রিয়াপদেও -লাম বিধেয়, কারণ ইহা বহু অঞ্চলের মৌখিক রূপে প্রচলিত এবং সাধুরূপেরও অনুযায়ী।

হ-ধাতু

হয়, হন, হও, হস (হ'স), হই। হচ্ছে। হয়েছে। হোক, হোন, হও, হ। হল (হ'ল), হলাম। হত (হ'ত)। হচ্ছিল। হয়েছিল। হবে। হয়ো। হস (হ'স)। হতে (হ'তে), হয়ে, হলে (হ'লে) হবার, হওয়া।

খা-ধাতু

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে, খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাবে। খেও, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে, শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। করলে (ক'রলে), করলাম। করত (ক'রত)। করছিল। করেছিল। করবে। করো (ক'রো), করিস। করতে (ক'রতে), করে (ক'রে), করলে (ক'রলে), করবার, করা।

কাট্-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান।

১৪। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ

'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিতল, ভিতর উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত-রূপ মৌখিকরূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষায় উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা

অসম্ভব। সাধারণ বাঙালির ইংরেজি উচ্চারণ ইংরেজের সমান নয়, তথাপি তাহাতে কাজ চলিতেছে। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াই শিখিতে হইবে।

১৫। বিবৃত অ (cut-এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—'ক্লাব (club) বাস্ (bus), বাল্ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet); সার্কস (circus); ফোকস (focus), অগস্ট্ (August), রেডিয়ম (radium), ফস্ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)'।

১৬। বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat-এর a)

মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

এইরূপ বানানে '্য ্যি'-কে য-ফলা আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দিতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat=হৈট)। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার লাগাইলে ও (অো) হয়, সেই রূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৭। ঈ ঊ

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—'সীল (seal), ঈস্ট্ (east), উস্টার (Worcester), স্পূল (spool)'।

১৮। f v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (Von)'।

১৯। w

w স্থানে প্রচলিত রীতি-অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—'উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)'।

২০। য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড', না লিখিয়া 'এড্ওআর্ড, ওঅর-বন্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

২১। s, sh

১১ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২২। st

ইংরেজির st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স-এর সহিত ট বিধেয়।

২৩। z

z স্থানে জ় বা জ বিধেয়।

২৪। হস্ চিহ্ন

৬ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাজশেখর বসু—সভাপতি
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—সম্পাদক

বাংলা বানান-সংস্কার সমিতি
৩১শে মার্চ ১৯৩৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মাছধরা

শ্রীনলিনী কর্ম্মকার

সংখেপ বাংলা বর্নমালা

শ্রীরমেস সর্মা

প্রাচিনত্বের দোহাই দিয়া, সর্ব্বদা সংস্কারে ভয় ভয় করিলে, বেস্ কাপুরুসতার পরিচয় হয় বটে; কিন্তু মানুস আর হওয়া যায় না; চিরদিন পিছাইয়াই থাকিতে হয়। কাপুরুস-তাই বা বলি কেন? আমোদে, আহ্লাদে, আচারে ব্যবহারে, পান ভোযনে, অসংযত ভোগবিলাসে আমরা ত' বিরত্বের পরিচয়ই দিতেছি; তবে কিনা কবির ভাসায় ইহাকেই বলে—

To vice, industrious। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে ভাল বিসয়ে অগ্রসর হইতে হইলেই আমরা অপারগ; নানা বাযে ওযর আপত্তি আসিয়া পরে তাই কবি বলিয়াছেন—

To Good deeds, timorous and slothful. বাংলা বর্নমালার দাসত্ব ঘুচানের যন্য চেস্টা সুরু হইয়াছে। প্রাচিনত্বের দোহাই সম্বন্ধে অনুহাত এই:

প্রাচীন ভারতে, সব্দ-বিগ্গান ও সংগিত-কলার যে সবিসেস উন্নতি হইয়াছিল তাহা অস্বিকার করিবার উপায় নাই। সেই সময়েই ভসার সংস্কার হইয়া উহা (Sanas-krit) হয়। এবং উহার সংগিত-বিগ্গান-সম্মত বিভাগ হয়। সারির বিগগানে প্রভুত অভিগগতার ইহা এক উত্তম নিদর্সন। সা, রে, গা, মা ইত্যাদি সুরের ঘাটগুলির সরল, খোলাসা উচ্চারনের সুবিধার যন্য, সব্দ, উৎপত্তি স্থানের ক্রম অনুসারে, বর্নমালাকে তখন কন্ঠ্য, তালব্য, দন্ত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা হয়। পাসচাত্য পনডিতগনও বলেন, ইংরাযি বর্নমালাতে এক সব্দ উচ্চারণের একাধিক বর্ণ দেখা যায়, আবার কোন ২ সব্দ উচ্চারণের যন্য বিসেস বর্ণ নাই। কিন্তু দেবনাগর বর্নমালায় ঐ দুই দোস দেখা যায় না। বাংলা বর্ণমালাও দেবনাগর বর্নমালানুযায়ি গঠিত হয়। এই যন্য আমাদের বাংলা বর্নমালাও পুর্ণ—ইহাতে অসমপুর্নতা এবং অত্যাধিকতা দোস নাই।

দেবভাসায় ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ঌ, ৡ, ন, ণ, শ, ষ, স, ব, ৱ য, জ ইত্যাদির উচ্চারণের তফাৎ আছে; কিন্তু বাংলা ভাসায় তাহা নাই। তাহা হইলে, বাংলা বর্ণমালায় এই অনাবসাক বর্নগুলি ডবল ২ রাখার প্রয়োযন নাই। ইহাতে ভাসার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, সিক্ষার্থিগনেরও মহা অসুবিধা হয়। বানানের খুঁটিনাটি, ব্যাকরনের কুট যাল, ভাবের স্রোতে বাধা দেয়; বানানের বাযে চিন্তায়, ব্যাকরনের অযথা বিভিসিকায়, মনের ভাব খুলিয়া বলায় বাধা পরে। এখন, ভাল ২ বিসয়, কাযের কথা, রোযগারের পথের সনধান, সরল ভাসায় ছোট ২ লাইনে, খোলাসা করিয়া বলিতে হইবে। তাহা হইলেই লোকে অল্প সময়ে, অনেক কাযের কথা লিখিতে পারিবে; আর এই নিরক্ষরপ্রায় দেসবাসিকে সহযে, অল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, ভাসা সিক্ষা দেওয়া যাইবে।

পাস্চাত্য গনিসিগনের মধ্যেও এইরূপ সংস্কারের আলোচনা সুরু হইয়াছে; তাঁহারা লিখিতেছেন:

To save time, the rambling circumlocutions of Language must be replaced by short and pregnant expressions and a workable, short Alphabet and straight Grammar. The text bocks must be written in clear, brief, pregnant and easily understandable sentences.

গতিসিল, যাতি, পুর্ন উদ্যমে অগ্রসর হইবার সময় কোন বাধাই মানে না। আত্মবিকাস এবং যাতির উন্নতির ইহাই

বর্তমান বাংলার বর্ণমালা সরলীকরণের জন্য শ্রীযুক্ত রমেশ শর্ম্মা অনেক চিন্তা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে-সময়ে বাংলা বানানের সংস্কার সাধন করছেন সেই সময়ে বর্ণমালা বিষয়ে এ প্রবন্ধটি বিশেষ উপযোগী হবে মনে করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সাধারণের অবগতি ও বিচারের জন্য প্রকাশিত করলাম। সম্পাদক।

ধাবা। গাছ বাহির হইবাব সময় বিষেব বাহিবের আববন যতই সুন্দর হউক তাহাকে-বিরূপ করিয়া, যতই কঠিন হউক উহাকে ফাটাইয়া, নবযাত অংকুর বাহিব হইবেই। অবসা অসাব বিষ পচিয়া যায়, তবু টুটিয়া ফাটিয়া অংকুর বাহিব হইতে দেখা যায় না। আবস্যক পবিবর্ত্তনের বিবোধি হওয়া. অসারতাবই পবিচায়ক, মৌলিকতাব অভাবেব নিদর্সন। আসা কঁরি' দেসবাসি বাংলা ভাসাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া, উহার স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়তা করিবেন।

সংখেপ বাংলা বর্নমালা।

স্বরবর্ন—

অ, আ, ই, উ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ব্যান্‌যন বর্ন—

ক, খ, গ, ঘ।

চ, ছ, য, ঝ।

ট, ঠ, ড, ঢ।

ত, থ, দ ধ, ন।

প, ফ, ব, ভ, ম।

ব, ল, স, হ, ক্ষ।

ং, ঃ, ঁ

রমেস সর্মা
(ব্রহ্মচর্য্য লেখক)

ঘুড়ী

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ইন্দ্রধনু বর্ণ-তনু পুচ্ছ-চিকণ ছোট্ট ঘুড়ী
মত্ত হাওয়া যেমনি পাওয়া বাঁধন-হারা চল্ল উড়ি;
পৃথ্বী চুমি' ছাড়ল ভূমি, বৃক্ষে নমি' ঊর্দ্ধগামী,
পার্শ্বে দুলি' শীর্ষ তুলি' মেঘের জগৎ জোরসে ফুঁড়ি'
তাড়াতাড়ি দিচ্ছে পাড়ি; বাড়ল বায়ুর হুড়োহুড়ি।

ইচ্ছা যে তাব বিমান বিহাব, দেখা শোনা গ্রহের সমাজ;
ব্যোমে ব'সে বুঝবে ক'ষে চলবে কি না উড়ো-জাহাজ,
স্বর্গ ফেঁড়ে নেড়ে চেড়ে, সুধা-পাত্র আনবে কেড়ে,
চন্দ্র ঘ'সে দেখবে যে সে সত্যি কি তার রূপালী সাজ;
বিষ্ণু জ্যোতির উৎস-রীতি আছে কোথা খুঁজবে সে আজ।

আত্মরক্ষা নাই ত শিক্ষা, মত্ত সে ঘোর কল্পনাতে;
অশক্ত তাব ভাবল না আব, উঠল আকাশ আঙিনাতে,
জীবন-ব্যাপাব তুচ্ছ অসাব একটি ফুকার অপেক্ষা তার
গেল ভুলি, কুতূহলী আপন ভাবের মূর্চ্ছনাতে
কড়টি কেটে পড়ল লুটে; নষ্ট সবই -কল্পনাতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের সহজ নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন। এই নিয়মাবলী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। কোন কোন বাংলা কাগজে এই পুস্তিকাসম্বলিত নিয়মগুলি ছাপা হইতেছে। প্রধান প্রধান বাংলা কাগজের আপিসে এই পুস্তিকা পাঠান হইতেছে বলিয়া অনুমান করিতেছি। সব কাগজেরই উচিত, এই নিয়মাবলী নিজ নিজ কাগজে ছাপাইয়া দেওয়া। বাংলায় হাজার হাজার অপ্রধান নানা সাময়িক কাগজও আছে। তাহাদেরও উচিত, প্রধান কাগজগুলি হইতে উক্ত নিয়মাবলী আপন আপন কাগজে তুলিয়া দেওয়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত এই নিয়মাবলীর অতি-প্রচার আশু প্রয়োজনীয়। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ও এই পুস্তিকা নামমাত্র মূল্যে সাধারণ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বাংলা কাগজ-পত্রে ছাপার ভুল কিছু বেশি থাকে। তাহা অনিবার্য নহে। বাংলা বানানের নিয়ম ছাপিবার সময় এ-বিষয়ে খুব বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। ভাঙা টাইপে কোনমতেই এ-সকল নিয়মাবলী ছাপা উচিত নয়। সাধারণ লেখক ও পাঠকের পক্ষে তাহা অতিশয় ভ্রান্তিজনক।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সে অনুরোধ পালন করিয়াছেন। এখন বাংলার সমস্ত ছোট ও বড় লেখকের কর্তব্য,—বাংলা বানানের এই নিয়ম মানিয়া চলা। প্রতিবাদ করিতে হয়, আলোচনা করিতে হয়, বানান-সংক্রান্ত কোনরূপ প্রস্তাব করিতে হয়, সকলকে এই নিয়মের বশবর্তী থাকিয়াই করিতে হইবে। প্রবর্তিত নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয় নহে। যতদিন না পরিবর্তন হয় ততদিন এই নিয়মকেই মানিয়া চলা উচিত। পরিবর্তন যদি কখন না-ও হয় তথাপি এই নিয়ম মানিয়া চলা উচিত। ইহাতে অসম্মানের কিছু নাই, বরঞ্চ ইহা সম্মানজনক। নিয়মানুবর্তিতার (ডিসিপ্লিন) এইটুকু পরিচয়ও বাংলা ভাষার উন্নতিকামিগণ যদি দেন, তো, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তথা উন্নতিকামিগণের নিজেদেরও প্রতি তাহা শ্রদ্ধার পরিচায়ক হইবে।

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ বিশ্ববিদ্যালয় পালন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও, আশা করি, তাঁহার লেখার বানানে অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়প্রবর্তিত নিয়ম পালন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করিবেন। ইহার ফল আশাতীতরূপে ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাহ্য করিলেও রবীন্দ্রনাথকে সকলে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। শুধু রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন বলিয়া বানানের এই রীতি সাধারণের অনুকরণীয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এত প্রচেষ্টা তখন 'অরণ্যে রোদন' হইবে না।

অনেক বাংলা কাগজ অনেক ভাল ভাল বিশেষণযুক্ত কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করিতেছেন; বাংলা বানানের বর্তমান স্বৈরাচারের নিন্দা করিতেছেন; এমনও বলিতেছেন,—তাঁহারা এই নিয়ম দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নিয়ম পালন করিয়া তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে খুশি করিতেছেন না। তাঁহারা সম্পাদকীয় লেখায় এই নিয়ম পালন করিলে তাহার ব্যাপক সুফল অবশ্যম্ভাবী। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের কাগজে প্রকাশার্থে গৃহীত লেখাকেও তাঁহাদের পক্ষে সম্পাদকীয় অধিকার অনুযায়ী এই নিয়মে সংশোধন করিবার জোর থাকা ভাল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান সংস্কার সমিতির সভ্যগণেরও উচিত তাঁহাদের লেখায় অতঃপর তাঁহাদেরই গঠিত নিয়ম মানিয়া চলা। নতুবা তাহা বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে; এবং তাহার ফল-ও অবশ্য শুভ হইবেনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত এই বাংলা বানানের নিয়মের অনেক আলোচনা হওয়া সম্ভবপর। ততোধিক সম্ভবপর, এই সকল আলোচনার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষিত থাকা। বাংলা ভাষার বানানে আমি একজন সরলপন্থী। অবশ্য চরম সরলপন্থী নই। অতিশয় আগ্রহ ও আনন্দের সহিত আমি উক্ত নিয়মগুলি অধ্যয়ন করিয়াছি। বানান নির্ধারণের প্রথম চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় চরম অপরিবর্তনপন্থা ও চরম পরিবর্তনপন্থার মধ্যবর্তী হইয়াছেন। ইহা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ। ঐকান্তিক চিত্তে এই মধ্যপথবর্তী থাকিয়াই আমি সংক্ষেপে কয়েকটি নিয়মের আলোচনা করিতে চাই। 'বিচিত্রা'র আভিজাত্য নিরাপত্তিক। এই কাগজের বিশুদ্ধ মধ্যস্থতায় আমার মত সাধারণ লোকের কথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত জোর পাইবে বলিয়া ভরসা করিতেছি।

১ সংখ্যক নিয়ম ঃ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

এই নিয়মে সংস্কৃত বা তৎসম রেফাক্রান্ত শব্দে দ্বিত্ব হইবে না। শুধু ব্যুৎপত্তির জন্য প্রয়োজন হইলে হইবে।

আবশ্যক না হইলে কার্তিক কি শুদ্ধ? কোথায় আবশ্যক, কোথায় নয় তাহা সাধারণ লেখক বা পাঠক কি করিয়া বুঝিবে? কার্ত্তিক কার্তিক হইলে সাধারণের নিকট তাহার অর্থ-বৈষম্য নাই। দ্বিত্ব বর্জন করিতে গিয়া তাহাকে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হইবে না তো!

৩ সংখ্যক নিয়ম ঃ বিসর্গান্ত পদ

এই নিয়মে বাংলায় বিসর্গান্ত পদের শেষে বিসর্গ থাকিবে না। ভাবিলাম,—ভালই হইল। যেহেতু আয়ুঃ আয়ু হইল, আশীঃ আশী হইল, পুনঃ পুন হইল, অতঃপর আয়ুকাল, আশীবাদ, পুনাগত লিখিতে আর কষ্ট হইবে না। কিন্তু পরেই আবার দেখিলাম,—সন্ধি করিতে গেলে শব্দগুলিকে বিসর্গান্ত মানিতে হইবে। অর্থাৎ, আয়ুকাল, আশীবাদ পুনাগত পুনরায় আয়ুষ্কাল, আশীর্বাদ, পুনরাগত হইয়া গেল। বাংলায় কতকগুলি বিসর্গমধ্য সংস্কৃত পদ এতদিন বিসর্গমুক্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছিল; যথা,—চক্ষুরোগ, চক্ষুজ্জল ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় তাহাদিগকে বন্ধনদশায় ফেলিলেন। কেননা, "সর্বত্র একই নিয়ম গ্রহণীয়"। শব্দগুলির এই বন্ধনদশায় সাধারণ বাংলা লিখিয়েদের যদি কান্না পায় তো তাঁহাদিগকে কি চক্ষুর্দ্বয় থেকে অতঃপর চক্ষুর্জল ফেলিতে হইবে?

৪ সংখ্যক নিয়ম ঃ হস্-অন্ত পদ

এই নিয়মে হসন্ত সংস্কৃত শব্দের শেষে হস্-চিহ্ন রাখিবার বিধান আছে। যথা,—সম্রাট্, শ্রীমান্ ইত্যাদি।

বাংলা বানানে এ-নিয়ম এতদিন মানিয়া চলা হয় নাই। সেজন্য অসুবিধাও কিছু হয় নাই। আজই বরঞ্চ অসুবিধার কথা। কেননা, সাধারণ লেখকদের পক্ষে অতঃপর শ্রীমান্‌কে হসন্ত করিতে গেলে প্রবহমানকেও হসন্ত করিয়া ফেলার সম্ভাবনা। কোন শব্দ কী প্রত্যয়ান্ত এবং প্রথমার একবচনে কাহার কী রূপ এ-সবের খোঁজ কয়জন লেখক রাখিয়া থাকেন? অবশ্য শব্দের জাতিরক্ষার কথা উঠিতে পারে। কিন্তু হস্-চিহ্নের শাসনমুক্ত হইয়া সত্যই কি তাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে? দেখিতে পাই,—দয়াবানের স্ত্রীলিঙ্গে দয়াবতী এবং রোরুদ্যমানের স্ত্রীলিঙ্গে রোরুদ্যমানা যেন সংস্কারসিদ্ধ ভাবেই সকলে এতদিন লিখিয়া আসিতেছেন; হনুমান্ ও যজমান জাতি বাঁচাইয়া নির্বিবাদে পঙ্‌ক্তিভোজন করিতেছে। এমন অবস্থায়, উচ্চারণের জন্য যখন প্রয়োজন নাই, তখন এতটুকু এক হস্-চিহ্নকে বানানবিভীষিকারূপে সাধারণের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া কি নির্দয়তার পরিচায়ক নহে?

৭ সংখ্যক নিয়ম ঃ ই ঈ উ ঊ

এই নিয়মে মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ ঊ থাকিলে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে; যথা, বানী, বানি, পূব, পুব। অন্য শব্দে শুধু ই বা উ; যথা,—'বাঙালি'।

শেষের নিয়মে বিকল্প-বিধান নাই। তদ্ভব বা তৎসদৃশ

শব্দের বানানেও শুধু ই বা উ থাকিলে অতিশয় সুবিধার বিষয় হইত। এ-ক্ষেত্রে বানানের একটি মাত্র রূপ থাকাই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। ৮ সংখ্যক নিয়মে দেখিতেছি,—সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ছাড়া সকল শব্দেই ণত্ববিধান বর্জিত হইয়াছে। ইহা একটি বোল্ড্ স্টেপ। ৭ সংখ্যক নিয়মেও এরকম বোল্ড্ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

৯ সংখ্যক নিয়ম: ও-কার ও ঊর্ধ্ব কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত বাংলা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার ঊর্ধ্ব কমা প্রভৃতি চিহ্নের যথাসম্ভব বর্জন এই নিয়মে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

খুব ভাল। অথচ এই নিয়মেরই শেষের দিকে 'তো' 'হয়তো' বানান বিধেয় বলা হয়েছে। তো, হয়তো বানান ত, হয়ত হইলে উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের কোন ভেদ-ই প্রদর্শন করে না। তবে নিরর্থক ইহাদিগকে তো, হয়তো হইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি। বরঞ্চ কাল (কৃষ্ণ) শব্দটি তদ্ভব শব্দান্তর্গত হইয়া কালো হইয়া যাক; বাঙালির মুখে ইহার শেষে অ-কার উচ্চারিত হয় না. ও-কার উচ্চারিত হয় —বরঞ্চ দীর্ঘ ও-কার। কৃষ্ণ তাঁহার কালো রূপেই বাংলার বানান আলো করিয়া থাক, এবং চখ (চক্ষু) চোখ-রূপে নিপাতন-সিদ্ধি লাভ করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১১ সংখ্যক নিয়ম: শ ষ স

এই নিয়মে মূল সংস্কৃত নিয়মানুসারে তদ্ভব ও দেশজ শব্দে শ, ষ ও স তিন-ই চলিবে বিদেশী ও দেশজ শব্দে ষ বাদ। উচ্চারণ অনুযায়ী শুধু শ য়ের ব্যবহার।

বাঙালির মুখে ণ ও ষ এর যথার্থ উচ্চারণ নাই। ৮ সংখ্যক নিয়মে অসংস্কৃত সকল শব্দ হইতেই ণ নির্বাসিত হইয়াছে; যেমন,—রানি, বামুন, কোরাণ। ১১ সংখ্যক নিয়মে তদ্ভব ও তৎসদৃশ শব্দে ষ থাকিয়া গেল কেন? ইহাকেও অসংস্কৃত সকল শব্দ হইতে নির্বাসিত করা সুখের বিষয়। আঁষকে (আমিষ) আঁস লিখিলে কী ক্ষতি? কুড়ি পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত শাটীর তদ্ভব রূপে সাড়ি বিকল্পে সাড়ী প্রচলিত ছিল; এ-কথা এখনও অনেকের মনে থাকিতে পারে। তখন/ার বাঙালি শ ও স-এরও ভেদ মানে নাই (বাঙালির মুখে এই দুই বর্ণের সত্যই উচ্চারণ-বৈষম্য নাই)। আজ বাংলা ভাষায় ষ-এর যথার্থ উচ্চারণ না থাকা সত্ত্বেও অসংস্কৃত শব্দেও তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকার কি দরকার।

১৫ সংখ্যক নিয়ম: বিবৃত অ (cut-এর u)

এই নিয়মে ইংরেজি বা অন্যান্য বিদেশীয় মূল শব্দের আদ্য অক্ষরের বিবৃত অ বাংলা বানানে আ হইবে। মধ্যে হইবে অ। যেমন,—ক্লাব (Club), ফোকস (Focus), ইত্যাদি।

মধ্যের অ-কেও আ করা উচিত; যথা অগাস্ট (August)। শুধু ষ হইলে নহে; যথা 'রেডিয়ম (Radium)। ছেলেবেলায় আমরা 'অপার চিৎপুর রোড'কে ইংরেজি শিক্ষিত লোককেও বাংলা বলিবার সময় 'অ-পার চিৎপুর রোড' বলিতে শুনিয়াছি। এইরূপ নিয়মে ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বাঁধিয়া দেওয়ার রেওয়াজ অন্য ভারতীয় ভাষাতেও আছে। ফলে উচ্চারণ-বিকৃতির উদাহরণও সে-সব ভাষায় প্রচুর। বেহারে দেখিতেছি,—হ-য়ে ঐ কার দিয়া hat (হৈট) উচ্চারণ করিতে গিয়া অধিকাংশ শিক্ষিত লোক হায়েট বলিতেছেন। 'Way, without, May, hall, talkies' প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে 'বে, বিদাওয়ট, মই, হাল, টওকিজ' প্রভৃতি রূপে সর্বত্র চলিতেছে। অনেক ইংরেজি শব্দ ইতঃপূর্বেই অতি বিকৃত রূপে বাংলায় ঢুকিয়া গেছে। ভবিষ্যতে ঐরূপ সম্ভাবনার সকল পথই যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল। নতুবা 'সাকস (Circus) ফসফোরাস (Phosphorus)—বালব (bulb)—শেষে সারকস, ফসফো-রস, বাল্-বো তে না গিয়া দাঁড়ায়। ১৬ সংখ্যক নিয়মে, বিশ্ববিদ্যালয় 'য্া'-কে একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লইতে বলিয়াছেন। ɪ কেও বিবৃত অ-য়ের উচ্চারণ জ্ঞাপক আর একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া কি অপেক্ষাকৃত শ্রেয় নহে?

২৩ সংখ্যক নিয়ম ঃ য়

এই নিয়মে বাংলা লেখায় য় এর উচ্চারণ দেখাইবার জন্য জ বা জ-এর নীচে ফুটকির বিধান আছে।

'জ'-এর তলায় ফুটুকি চলে চলুক, কিন্তু জ্ জ্র বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ ভ্রমাত্মক বর্ণের প্রচলন না করাই যুক্তিযুক্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তনে বর্ত্তমান বাংলা লেখকদের কথায় কথায় যথেচ্ছাচারিতা এইবার ঘুচিয়া গেল। সব শব্দকেই এখন আর বাংলা মনে করিলে চলিবেনা; কোনগুলি সংস্কৃত, কোনগুলি তদ্ভব, কোনগুলি দেশজ, কোনগুলি বা বিদেশী এ কথা সর্ব্বদাই অতঃপর জানিতে ও মনে রাখিতে হইবে। অন্যথায় প্রতি পদেই পদস্খলন অনিবার্য্য। মোট কথা, অসুবিধা এখন বহু ও বহুবিধ। কিন্তু হউক অসুবিধা। ভবিষ্যতে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে তাহাদের সুবিধা বিধানই এখানে মুখ্য; আজকালকার লেখক ও পাঠকবর্গের "লাভালাভ হিসাব করিয়া" "সুবিচার" করিতে বিশ্ববিদ্যালয় নারাজ। কিন্তু এত বেশি অবিচার করাও কি খুব সুবিচারের বিষয়? বাংলা বানানকে সহজ করিতে গিয়া প্রকারান্তরে তাহাকে জটিল করিয়া তোলাই হইতেছে না কি? যে অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ অশুদ্ধরূপে আজ বাংলায় ভিড় করিয়া বসিয়াছে তাহাদের দশা কি হইবে? কি হইবে এই নিন্দুক, সক্ষম, বহুরূপী, সভ্যতা, চাকচিক্য, কায়া, সকাতর, সেবিকা, সৃজন' ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য অশুদ্ধ শব্দগুলির ভাগ্যে? বাংলা ভাষায় বহু ব্যবহারে ইহাদের প্রতিষ্ঠা। কান ধরিয়া ইহাদিগকে কি শেষে ঘরের বাহির করিয়া দিতে হইবে? কি হইবে আমাদের বিধাতা পুরুষ, পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানি ও দেশনেতাগণের দশায়? ব্যঙ্গ লেখককে সত্যই কি অতঃপর সকলে ব্যঙ্গ করিতে থাকিবে?...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমরা বিচারসহ স্পষ্ট নির্দেশের প্রত্যাশী।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

বিচিত্রায় নূতন বানান

বিচিত্রার দশম বৎসরের প্রারম্ভ হইতে, অর্থাৎ আগামী শ্রাবণ সংখ্যার বিচিত্রা হইতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম যথাসম্ভব অনুসরণ করা হইবে। বিচিত্রার লেখকদিগকেও আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারাও যেন ক্রমশঃ তাঁহাদের লেখায় উক্ত নিয়ম পালন করেন।

সম্পাদক

বিপর্য্যয়

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায়

বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর সিপ্রা তার বন্ধু মীরার অনুরোধে তাদের দেওঘরের বাড়ি যাইতে সম্মত হয়। পিতার অনুমতির অপেক্ষামাত্র। পিতার চিঠি আসিল, দেশের বাড়ি হইতে নয়, দার্জ্জিলিং হইতে এবং সিপ্রাকে সেখানে যাইবার জন্য তাগিদ রহিয়াছে বহু·····। সিপ্রার দাদা বাঙ্গালোরে থাকিয়া পড়ে, 'রিসর্চ্চ স্কলার'। তাকেও নাকি চিঠি লেখা হইয়াছে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিং যাইতে। সিপ্রার মুখে উদ্বেগের ছায়া জাগিল। সে মীরাকে কহিল—বাবার নিশ্চয়ই কোন শক্ত অসুখ হয়েচে। তা নইলে দেশ ছেড়ে বুড়ো বয়সে দার্জ্জিলিং আসা,—কোনমতেই বিশ্বাস হতে চায় না। এ পর্য্যন্ত তিনি দেশ ছেড়ে কোথাও যান নি, পাছে জমিদারীর কোন গোলমাল হয়।

মীরা শান্তস্বরে কহিল—অসুখ হয়েচে বলে আমার মনে হয় না ভাই। অসুখ হলে কলকাতাতেই আসতেন আগে,—এখানে সব বড় বড় ডাক্তার। আমার মনে হয়······

বাধা দিয়া সিপ্রা কহিল—তুই যা বলবি আমি বুঝেছি, তুই বলবি, আমার মা মাত্র চার পাঁচ মাস হলো মারা গেছেন, সে শূন্যতা তিনি এখনও ভুলতে পারেননি—সেইজন্যই দার্জ্জিলিং যাওয়া এবং ছেলে-মেয়েকে ডেকে পাঠানো—এই তো,—না?

মীরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া কহিল—তা ছাড়া আর কী হতে পারে!

সিপ্রার দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠে,—মায়ের কথা মনে পড়ে···।

পরমুহূর্ত্তে সিপ্রা একটু চঞ্চল হইয়া উঠে,—মীরার বাম হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করে—শোক পেলে মানুষ জুড়োতে যায় দার্জ্জিলিং? হৃদয় ভেঙ্গে গেলে লোকে যায় কাশী, গয়া, হরিদ্বার—বাবা গেলেন দার্জ্জিলিং! ডাক্তার দেখাতে যখন এলেন না, অসুখও হয় ত হয়নি। কী দিয়ে এখন মনকে শান্ত করি মীরা?

সিপ্রা তার পিতার স্বভাব জানে, তাই একটা সম্ভাবিত আশঙ্কায় মন কাঁপিয়া উঠিল। না জানি তার পিতা পূর্ব্বের মত নেশা করিতে সুরু করিয়াছেন, সিপ্রার মা নাই যে, শাসনের ভয়ে তটস্থ থাকিবেন। বন্ধুবর্গ হয়ত এই সুযোগে তাঁকে টানিয়া নিয়া গেছে দার্জ্জিলিং। এবং সেখানে হয় ত পুরাতন লিভারের ব্যথাটা নূতন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। আর এইজন্য সিপ্রা আর তার দাদা প্রণবের ডাক পড়িয়াছে। দ্বিরুক্তি না করিয়া সিপ্রা সেইদিনই দার্জ্জিলিং মেলে রওনা হইল।

দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়া সেইদিনই সারারাত্র জাগিয়া সিপ্রা তার দাদার কাছে চিঠি লিখিতে বসে। চিঠি দীর্ঘ নয়। তবু এত সময় লাগিল, তার কারণ—প্রতিটি শব্দ লিখিতে গিয়া সিপ্রার মনে দোলা লাগিয়াছে অসম্ভব। কতবার সে কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল লিখিবার টেবিলে। কত চিঠি ছিঁড়িল। তার পর একটা কথাই শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া লেখনী-মুখে প্রকাশ পাইল—তুমি এখানে এসোনা দাদা। আমি যা দেখেছি, তুমি তা দেখ—এ ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই। তুমি যা আছো তাই থাকো। সব কিছুই এতকাল নিতান্ত লঘুভাবে দেখে এসেছো—কিন্তু সেদিন তোমার রইল না—। ইত্যাদি।

সেদিন সিপ্রা গিয়াছে 'মল'এ বেড়াইতে তার বাবার সঙ্গে। চারিদিকে কেবল মেঘ—সমস্ত পথে মেঘ চলিতেছে, কাছের লোক দেখা যায় না, যেন সব গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। এমনই দিনে বাঙ্গালোর হইতে সিপ্রার দাদা প্রণব আসিয়া উপস্থিত। বাড়ি খুঁজিয়া বারান্দায় উঠিয়া সিপ্রা বলিয়া ডাকিতেই চঞ্চলগতিতে যে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রণব চাহিয়া দেখে সে একটি কিশোরী বধূ—গোলগাল ঢলঢলে চেহারা! লজ্জায় প্রণব এতটুকু হইয়া গেল; কার বাসায় আসিয়া উঠিল

সে! মেঘান্ধকার পথের পানে চাহিয়া কহিল—ওঃ! ভুল হয়ে গেছে, এ বাসা নয়—কিছু মনে করবেন না……বলিয়া দ্রুতবেগে পথে নামিতেই একেবারে মুখোমুখী হইয়া গে’ সিপ্রার সঙ্গে।

সিপ্রার প্রথমেই চোখ পড়িল তার দাদার মুখের প্রতি। কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত ভাব। পথের মধ্যেই পায়ের ধূলো মাথায় নিয়া ও কহিল—আমার চিঠি? আমার চিঠি পেয়েছো?

—হ্যাঁ পেয়েছি, কিন্তু এখানে এসে এত রোগা হয়ে গিয়েছিস!

—আচ্ছা, রাখো তোমার বাজে কথা। কেন এলে? আমি তো তোমায় বারণ করেছিলেম।

—বারণ করেছিস্ বলেই তো এলাম—কী এমন ঘটলো তাই দেখতে।

বাসায় আসিয়া দুইজন চিম্নীর ধারে বসিল। সিপ্রা নীরব, তার দাদা কথক। প্রণব কহিল—এ বাসায় বুঝি পার্টনার আছে? প্রথমবার এসে ফিরে গেছি—একটি বউ দেখে,—অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেম আর কি। ভাগ্যিস্ পথে নামতেই তোর সাথে দেখা। তারপর, বাবা কোথায় সিপ্রা? হঠাৎ কেন এলেন এখানে………উঃ কী ঠাণ্ডা,—এখনও ফেরেননি। আচ্ছা, কি হয়েচে এখানে বল্ তো?

সিপ্রা কথা কহিতে গিয়া থামিয়া গেল—। পর্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল সেই কিশোরী বধূ। কোন ভূমিকা না করিয়া প্রণবের একান্ত নিকটে গিয়া কহিল—প্রথমবার এসে ঘরের ছেলে আমায় অচেনা ভেবে চলে গেলেন, এর মত দুঃখ আর নেই। চান করে এসে খান, শেষে গল্প করবেন,—বলিয়া পর্দা ঠেলিয়া প্রণবের চোখে রীতিমত ধাঁধাঁ লাগাইয়া চলিয়া গেল। সিপ্রা কহিল,—আমি তো তোমায় জানিয়েছি—জীবনে সব কিছুকে এতদিন স্বাভাবিক মনে করে লঘুভাবে দেখে এসেছো—সে দিন তোমার ফুরিয়েছে। বলবার আর কী-ইবা আছে দাদা, বাবা শেষে বুড়ো বয়সে সতীশবাবুর মেয়েটাকে বিয়ে করে………। অশ্রুর আবেগে সিপ্রা সোফায় মুখ গুঁজিল—তারপর ফুলিয়া ফুলিয়া সে কী কান্না! প্রণবের মুখের চেহারা দেখা গেল না,—খোলা বাতায়ন-পথে মেঘ আসিয়া সব কিছু অস্পষ্ট এবং সিক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কতক্ষণ স্তব্ধতা…অবশেষে প্রণব হাসিল,—সিপ্রার কাণে সে হাসি কান্না হইয়া বাজিল। প্রণব সিপ্রার পাশে গিয়া কোলের উপর ওর মাথা তুলিয়া লইল। তারপর মা যেমন শিশুকে সান্ত্বনা দেয় তেমনি করিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—ছিঃ, কাঁদিস্নে সিপ্রা। মা নেই আমাদের সবই সইতে হবে, কিন্তু তোর কান্না সত্যিই আমায় দুর্ব্বল করে দেয়। সংসারে সব হারালেও আমি তোর দাদা তো আছি! দুঃখ কিসের তোর!

সিপ্রা হঠাৎ মুখ তোলে,—চোখ-মুখ আরক্ত। প্রণব সে মুখের পানে চাহিতে পারে না, কিছু কহিতে পারে না—কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেছে। আর্ত্তস্বরে সিপ্রা কহিল—সহ্যেরও একটা সীমা থাকা চাই দাদা! কী-না সইছি! তুমি দূরে থাকো, যত ঝক্কি আমার। একটা কচি মেয়ে এল মা হয়ে। তাকে মা ভেবে থাকতে পারা—সে যে কী দুঃসহ তা তুমি কি করে বুঝবে? দু’দিন বাদে চলে যাবে। বইর সমুদ্রেই তো ডুবে থাকো। সংসারের যত খুঁটিনাটি ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে হবে আমায়, মন যাবে সংকীর্ণ হয়ে।

অবিচল কণ্ঠে প্রণব কহিল—যা হয়ে গেছে সে বিষয়ে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা করে কোন ফল নেই। তুই ভেবে ছাখ্ সিপ্রা—আমাদের চেয়ে আজ বাবার দুঃখ বড়। আর তাঁর চেয়েও দুর্ভাগা নূতন মা—। ওঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদের দয়ার উপর। আমাদের অনুগ্রহ পেয়ে ওঁকে বাঁচতে হবে,—কতখানি বিড়ম্বিত জীবন একবার ভেবে দেখেছিস্ সিপ্রা?

সিপ্রার মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল—দুইচোখে করুণার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল; নারীর বেদনা ওর নারীত্বে আঘাত দিল। সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে যাইতে ও কি ভাবিয়া একটু দাঁড়াইল এবং ঠোঁটের কোনে একটু অবজ্ঞার হাসিও ফুটিয়া উঠিল। প্রণবের চোখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—আসতে আসতেই একেবারে ‘নূতন মা’ শব্দটা তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল! মুহূর্ত্তে সিপ্রা উত্তেজিত হইয়া তিরস্কারের ভঙ্গীতে কহিল—পুরুষ জাতটাই এমন! অতীত যা,—তা’ তাদের কাছে গতিহীন—অসাড়—।

বর্ত্তমানের চঞ্চলতার মূল্যই এদের কাছে বেশী। তুমি তো তুমি, বাবা এমন ছিলেন যে, মদখাওয়া ছাড়া তাঁর কোন ত্রুটি ছিলনা—মাকে কত বড় আসন দিয়েছিলেন। তাঁর মত লোক যখন এমন কাজ করতে পেরেছেন, তখন কি করে তোমাদের উপর বিশ্বাস রাখি?

প্রণব হাসিল। বাহিরের পানে চাহিয়া কহিল—এ চঞ্চল মেঘ-শিশুর মতই তো আমাদের মন,—পরিবর্ত্তন যখন তখন হ'তে পাবে—তোরও হতে পারে...

—যা হয়নি তা নিয়ে কেন আমার মাথা গরম করছো দাদা! বলিয়াই সিপ্রা হাসিল—হাসিতে এতটুকু মলিনতা নাই। তার দাদার গরম কোট খুলিয়া দিতে দিতে কহিল—খালি রাগারাগি করছি দু'জনে সেই কখন থেকে। তুমি না খেয়ে আছো, তা পর্য্যন্ত ভুলেছিলেম দাদা—।

প্রণব প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সিপ্রার হাতে রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌টা খুলিয়া দিতে দিতে কহিল—তুই তো অবুঝ ন'স্‌ সিপ্রা। কতবড় আশা—কতখানি নির্ভরতা আমার তোর উপর, বলিতে বলিতে প্রণবের মুখ অত্যন্ত করুণ হইয়া উঠে,—সিপ্রার হাতখানি ধরিয়া অত্যন্ত নরম স্বরে কহিল—এ অশিক্ষিতা কচি মেয়েটির কী অপরাধ সিপ্রা? এই যে আমায় একান্ত পরিচিতের মত খাওয়ার জন্য বলতে আসা,—এটা ওঁর জীবনে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কী হ'তে পারে। বাবা-ইবে ওকে এসব বলতে পাঠিয়েছেন, তা' আমি বুঝতে পেরেছি, আরও বুঝতে পারছি—আজ বাবার মনের অবস্থা কেমন।

আবার পর্দ্দার বাহিরে 'নূতনমা'র পায়ের শব্দ শুনা গেল,—প্রণব আর একটা পর্দ্দা ঠেলিয়া স্নানের উদ্দেশে সিপ্রার অনুগমন করিল।

* * *

'আমি বৌয়ের মুখ দেখতে চাই,—আমার অমন চাঁদের মত ছেলে'...নূতনমার কথা শুনিয়া সিপ্রা অত্যন্ত বিরক্তিভাব দেখাইয়া সেঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এমনকি এ কথায় পিতা কিরূপ মত প্রকাশ করেন তা' পর্য্যন্ত শুনিবার আগ্রহ রহিল না। উত্তেজিত হইয়া প্রণবের ঘরে প্রবেশ করিয়াই সিপ্রা কহিল—লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে দাদা। এমন বুড়ো কথা যে ওঁর মুখ থেকে কেমন করে বেরোয়—সত্যি অবাক লাগছে। এসব কথা নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকে শুনা নয়। —প্রণব গভীর মনোযোগে কি যেন লিখিতেছিল, সিপ্রা রাগিয়া কহিল—রেখে দাও, তোমার 'থিসিস্‌'। প্রণব মৃদু হাসিয়া কহিল,—কিরে, আবার ক্ষেপেছিস্‌ বুঝি? সিপ্রা প্রণবের হাসিতে জ্বলিয়া উঠিল,—যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ফিরিতে উদ্যত। প্রণব কত করিয়া কাছে আনিয়া বসায়। নূতনমার কথিত কথাগুলোর পুনরোক্তি করিয়া সিপ্রা বিরক্তিতে মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—উঃ—কী জ্যাঠামো! প্রণব চুপ করিয়া থাকে অনেক্ষণ...। তারপর স্নিগ্ধ-গভীর কণ্ঠে কহিল,—আমরা অন্ধের মত বিচার করি সিপ্রা। যে কচি মেয়েটি আসে বৃদ্ধের স্ত্রী হয়ে. তাদের অ-বিকশিত, অনভ্যস্ত মাতৃত্ব-গিরিও ফলাতে হয়—যা অন্যের চোখে অনেক সময় হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়; অথচ এ অভিনয়টুকু তাদের করতেই হয়। আবার বুড়োমী ছেড়ে কিশোরী বধূর মত—যা তাদের বয়সের পক্ষে খুবই শোভন, সেজে গুজে স্ফূর্ত্তি করে, মান-অভিমানের পালা করে দিন কাটালেও লোকে বলবে যা-তা। বিশেষ করে তাদের পূর্ব্ব ঘরের সন্তান সন্ততি। এতখানি লেখা পড়া শিখে তুইও সেদিন বলেছিস্‌ নূতন মা যে কী! লাল বেনারসী প'রে দিব্যি আমার সাথে সিনেমায় গেল, আমি তো গেলেম সেই সেকেলে একটা শাদা কাশ্মিরী শাড়ী পরে।

সিপ্রা কঠোরস্বরে কহিল—না বুঝে-সুঝে তুমি নূতনমার পক্ষ টেনে কথা বলোনা। এসব বুড়ো কথা কি ভালো? আমার ও বাবার চেয়ে তোমার জন্যে ওঁর দরদ হ'লো বেশী। আর ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট—সে আনতে চায় 'পুত্রবধূ'! এসব কথায় কার না গা জ্বালা করে বলতো?

এবার প্রণব হাসিল। হাসিয়া কহিল—অত সূক্ষ্মভাবে ওঁর বিচার করা চলে না বোন, ও বড় অসহায়। আমরা ছাড়া ওঁর কেউ নেই—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই সিপ্রা কহিল—আমার কথা তুমি প্রায়ই বুঝতে পার না দাদা। আমি সত্যিই আর ওঁকে 'দেবদাসের পার্ব্বতী' হতে বলিনে। 'একস্‌ট্রিম্‌' যা তা-ই আশঙ্কাজনক, বুঝলে? সিপ্রা লঘুভাবে ঘরের বাহিরে চলিয়া যায়। প্রণব আবার লিখিতে চেষ্টা করে।

মাস দুই পরের কথা। আষাঢ় মাস। ঝির ঝিরে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে—আজ পাঁচ-ছয়দিন যাবৎ। এ কয়দিন মেঘের আবরণের ফাঁকে ফাঁকে তবু একটু সূর্য্যের আলো দেখা গিয়াছে, আজ একেবারে অন্ধকার। এমন ভাবে 'ফগ' করিয়াছে যে, সে ঘন আস্তরণ ভেদ করিয়া রাস্তার লোক চলাচল, বাড়ি-ঘর কিছুই দেখা যায় না। অপরাহ্নের পূর্ব্বেই সিপ্রা গিয়াছে ওর বাবার সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু-গৃহে বেড়াইতে। প্রণব চুপ করিয়া শুইয়াছিল—পড়িবার বইখানা শিথিল ভাবে বুকের উপর পড়িয়া আছে। অন্ধকারে পড়িতে পড়িতে চক্ষুর আর ধৈর্য্য নাই—অথচ উঠিয়া 'সুইস' টিপিয়া দিতেও তার আলস্য বোধ হইতেছিল।—এমনদিনে চুপ করিয়া আপনাকে নিয়া ভাবিতেই যেন ভাল লাগে। হাসি, গান, গল্প, আলো, আনন্দ—সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া আজিকার আষাঢ়ের ঘনমেঘের মেদুরতায়—অশ্রান্ত ঝির ঝিরে বাদল ঝরায়,—শৈলাবাসের নিস্তব্ধ গৃহকোণে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে প্রণবের মনে হইল ইহা যেন নূতন,—কেমন একটা তীব্র অনুভূতি! কোনদিনও এমন একটা অনুভূতি বেদনা-মধুর হইয়া বুকের মধ্যে সাড়া দেয় নাই। আজ সমস্ত দিনে কিছুই লেখা হয় নাই। এমন অলসতায় পাইয়াছে তাকে! সিপ্রার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত তার হইল না। পিতার মনেও হয়ত একটু ব্যথা দেওয়া হইয়াছে। স্বল্পভাষী পিতা—আজকাল অকারণে কত অবান্তর কথা ফাঁদিয়া সময় কাটান। সৌখিন প্রবাসগৃহে কক্ষ ভরিয়া উঠিয়াছে; অথচ প্রণবের সঙ্গে কেমন একটা লুকোচুরি ভাব। পিতার সমস্ত ব্যাপারেই যেন একটা সঙ্কোচের আভাষ পাওয়া যায়। কোন সৎপরামর্শ বা ভবিষ্যতে প্রণবের কি করা উচিত, কোন সম্বন্ধেই দুই তিন মাসের মধ্যে পিতার সহিত তার কোন কথাই হয় নাই। প্রণব জানে পিতার এ দুর্ব্বলতা কেন। প্রণবের লেশমাত্র দুঃখও এখন আর নাই পিতার দার-পরিগ্রহে। দুঃস্থ সতীশবাবুর সাধ্য ছিল না এ অশিক্ষিতা মেয়েকে পাত্রস্থ করা। ভুল প্রত্যেকেরই জীবনে হয়—তার পিতাও না হয় ভুল করিয়াছেন—কিন্তু গরীব উদ্ধার করা হইয়াছে।

হঠাৎ তড়িতালোকে প্রণবের চিন্তাস্রোত মিলাইয়া যায়,—মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে 'সুইস' টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে নূতনমা। নূতনমা টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল, চোখে মুখে তারুণ্যের দীপ্ত আভা। প্রসাধনের মাত্রাটা আজ প্রণবেরও চোখে লাগিল।—রেশমের গাঢ় নীল শাড়ী, অসাবধানতায় ঘোমটা খসিয়া গেছে, পেছনে কবরী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—মুক্তার মালারও কিছুটা দেখা যায়—কেমন একটা অগোছাল পারিপাট্য। প্রণবের মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল,—মেয়েটি তবে সুখীই হইয়াছে! মৃদু হাসিয়া প্রণব কহিল—আপনিও বুঝি বেড়াতে গিয়েছিলেন? তরল হাসিতে ঘর ভরিয়া নূতনমা কহিল—বাঃ তুমি তো বেশ! এ পাতলা শাড়ী পড়ে এমন ঠাণ্ডায় আজ পথে বেড়ানো যায়? সিপ্রা গেছে ওর বাবার সঙ্গে, আমি যাই নি।

—কেন গেলেন না?

—কেন গেলুম না! সব সময়ই কি সকলের বেড়াতে ভালো লাগে?

কথার শেষে নূতনমার চঞ্চল-হাসিভরা মুখখানি মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নূতনমা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—তোমার যে কী সব কথা, সত্যি...। এতদিন পরে এলে, আমার কি কোন সাধ থাকতে পারে না নিজ হাতে তোমাকে একটু রেঁধে বেড়ে খাওয়াই! বাঙ্গালোরে তো চাকরের হাতেই খেতে।

বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া প্রণব কহিল—বাঃ এসে অবধি তো আপনার হাতেই খাচ্ছি! আর এখন তো রান্নার সময়ও না, কেন আমার জন্যে অনর্থক বেড়াতে গেলেন না।

—আমি না হয় তোমার জন্যে যাইনি, তুমি কেন গেলে না? বলিয়া নূতনমা প্রণবের মুখের পানে চাহিয়া দেখে, প্রণব যেন কি ভাবিতেছে। নূতনমার কথায় চমকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল—আমি কেন যাইনি! আমার শরীর আজ ভোর থেকে বড্ড খারাপ হয়ে আছে—

—শরীর খারাপ! আমাকে কেন ডাকনি? আমি তো বাড়িতেই আছি, আমাকে কেন ডাকনি?

আপনার কণ্ঠস্বরে আপনিই অপ্রস্তুতের লজ্জায় নূতনমা যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। এ যেন তার বলা উচিত হয় নাই, যেন কত বড় অপরাধ…। কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া নূতনমা মৃদুস্বরে কহিল—সিপ্রাও তো ছিল।

শয্যা ছাড়িয়া প্রণব উঠিয়া আসিল,—দুঃখের গ্লানিতে মন ওর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নূতনমাকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—উঠবেন না, আমি ঐ চেয়ারটায় বসছি! সত্যি আমাকে ভুল বুঝবেন না নূতনমা। এমন কোন শক্ত অসুখ আজ আমার হয়নি যে, আপনাদের প্রয়োজন ছিল। অসুখ যদি হতোই, সিপ্রাকে না ডেকে আপনাকেই হয়ত আগে ডেকে পাঠাতেম, যেমন আমার মাকে ডেকেছি।

—নূতনমা কথা কহিতে পারিল না, অপরাধীর মত নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

প্রণবের যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, পিতা আজ ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার ঘরে। জয়ন্ত মজুমদার সম্প্রতি এম-ডি হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। সেবাড়ীর সকলের ইচ্ছা সিপ্রাকে তাঁরা বধুরূপে নেন। প্রণব পিতার উক্তিতে একটু বিচলিত হইয়া কহিল—তা' কি করে হয়! জয়ন্ত বিলেত যাবার আগেই তো শুনেছি সিপ্রার বন্ধু মীরার সাথে তার কথাবার্ত্তা একরকম ঠিক। পিতা হাসিয়া কহিলেন—সেসব কথার কোন অর্থ নেই প্রণব। জয়ন্তর বাপ প্রশান্ত মজুমদার টাকা ছাড়া কোন মেয়ের বাপের সঙ্গে কথা কয়েছে কোনদিন? ভেবে দ্যাখো তোমরা, ছেলেটি খুব ভালো। টাকা না হয় আমরা দিলেমই। প্রশান্তবাবুর চিঠি তোমাদের দেখাচ্ছি। বলিয়া পিতা উঠিয়া গেলেন। মৌনব্রতা নূতনমার দিকে চাহিয়া প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কি মত নূতনমা? আমার তো মনে হয় আমাদের চেয়ে সিপ্রাই ওর সম্বন্ধে বুঝবে ভালো। বড় হয়েছে, লেখাপড়াও শিখেছে,—বিয়ে তো মুখের কথা নয়! মেয়েদের সমস্ত জীবনটা নির্ভর করে বিয়ের উপর!

প্রণবের কথায় সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া নূতনমা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল কতক্ষণ···তারপর দুই চোখের গভীর দৃষ্টি মেলিয়া যখন প্রণবের পানে চাহিল,—প্রণব চমকিয়া দেখিল, —এ যেন আর কোন নারী, যার হৃদয়ের অনুভূতি মূর্ত্ত হইয়া সারামুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কথা কহিতে গিয়া নূতনমার ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—সমস্ত মুখে অপরিসীম বেদনার আভাষ। তবু সে দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিয়া গেল,—সত্যি বোলচ সমস্ত জীবনটা নির্ভর করে! কৈ, আমাকে তো কেউ জিজ্ঞেস করেনি কোনদিন—কী আমার ইচ্ছা। লেখাপড়ার আস্বাদ জানিনে,—তবে আমার মনে হয় অশিক্ষিতেরও ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। ঐশ্বর্য্য দেহকে সাজাতে পারে, কিন্তু মনের শূন্যতা পূর্ণ করবার শক্তি তার নেই।

প্রণব কথা বলা তো দূরের কথা,—নূতনমার পানে চাহিবার শক্তিও তার রহিল না। সমস্ত মস্তিষ্কে ওর বিরাট আলোড়ন সুরু হইয়া গেল। নূতনমা এরই মধ্যে কখন চলিয়া গেছে। প্রণব প্রকৃতস্থ হইতেই দেখে পিতার পশ্চাতে সিপ্রা ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

আষাঢ়ের শেষ···। আজ বৃষ্টি নাই, রৌদ্রও নাই। গাঢ় মেঘে অবলুপ্ত তমসাচ্ছন্ন প্রভাত। এতক্ষণ সকলে মিলিয়া সিপ্রার ঘরে চা খাওয়া চলিয়াছে। চায়ের আসর আজ একেবারেই জমে নাই। প্রণবই খালি একা বকিয়া গিয়াছে। নূতনমা, সিপ্রা অথবা পিতার তরফ হইতে 'হুঁ' 'না' ছাড়া কোন জবাব আসে নাই। প্রণবের এতক্ষণ এমন বিশ্রী লাগিয়াছে যে বলিবার নয়। ঘরে এখন শুধু ওরা দুই ভাই-বোন। সিপ্রা শুষ্ক কণ্ঠে তার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল—প্রশান্তবাবুদের সত্যিই কি তোমরা কথা দিয়ে ফেলেছো দাদা? ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া আহতস্বরে প্রণব কহিল তোর অমতে আমি এমন কাজ করেছি বলে সত্যিই তোর বিশ্বাস হয়? মা আজ বেঁচে নেই,—এ সংসারে আমাদের দুজনের জন্যে দুজনেই শুধু আছি বোন।

প্রণবের এমন ব্যথিত দৃষ্টি, এমন ব্যাকুলতা এখানে আসিয়া সিপ্রা একদিনও দেখে নাই। পিতার পুনর্ব্বিবাহে কত বড় প্রচণ্ড আঘাত তার দাদা নীরবে বহন করিতেছে! যুক্তিতর্কের কাছে নিজের বিদ্রোহী মনকে শান্ত করিয়া এখানে আসা অবধি কী সৌম্যমধুর ব্যবহারই না করিতেছে! অথচ সিপ্রা আসিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ হারাইয়া কী কাণ্ডটাই না করিয়াছে কয়েকদিন পর্য্যন্ত··· তার দাদার রুদ্ধবেদনার একটু আভাশ··'আমাদের দুজনের জন্যে দুজনেই শুধু আছি বোন'।···কথাটা সিপ্রা ক্ষেণীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল

না,···কাঁদিতে লাগিল। প্রণব নিঃশব্দে উঠিয়া সিপ্রার পাশে গিয়া বসে। অনেকক্ষণ কান্নার পর সিপ্রা কহিল...বাবা আজ দুদিন ধরে আমার সঙ্গে ভালো করে কথা কইছেন না, সর্ব্বদাই বিরক্তিভাব...। সত্যি বলছি দাদা, তুমি ভেবে ছাখো... হৃদয়ের মূল্য বাবার কাছে নেই। দুনিয়ায় অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতে পারে,—কিন্তু হৃদয় নিয়ে কি তা সম্ভব? বাবা ভালো করেই জানেন জয়ন্ত মজুমদার মীরার বাগদত্ত বহুদিন আগ থেকেই। আজ অর্থের লোভে সে এখানে সম্মতি জানিয়ে মীরাদের জানিয়েছে "পিতৃ আজ্ঞা, উপায় কি!" সেই জয়ন্ত মজুমদারের হাতে তিনি মেয়ে গছাতে চান।

প্রণব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—কেন, মীরার সঙ্গে যখন জয়ন্তর বিয়ে ঠিক হয়, তখন কি টাকা সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠেনি সিপ্রা ?

—না। আজ বিলেত থেকে আসতেইনা অর্থটা তার বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে! আজ সে ভুলে যাচ্ছে, একটি মেয়ে তারই কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে অবিবাহিত রয়ে গেছে। জয়ন্তবাবু ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে সত্য, কিন্তু তার মনুষ্যত্ব কোথায়!

প্রণব উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সে এত কথা জানিত না। সত্যিই তো, অর্থ নিয়ে যাদের সঙ্গে সর্ত্ত, হৃদয়ের মূল্য তাদের কাছে নাই। তারা দেহ চায়, হৃদয় চায় না, উচ্ছ্বাস চায়··· প্রেমের শান্ত গভীরতা তারা উপলব্ধি করিতে পারে না। সিপ্রা মিথ্যা বলে নাই, হৃদয়ের মূল্য তার পিতার কাছে নাই। পিতার প্রতি মনটা রুক্ষতায় ভরিয়া উঠিল। কেন, তিনি তো অর্থদ্বারাই দরিদ্র সতীশবাবুকে সাহায্য করিতে পারিতেন। কিন্তু এ কী করিয়াছেন তিনি! প্রণব কহিল, সিপ্রা তোকে আমি মুক্তি দিলেম। বাবাকে যা বুঝিয়ে বলবার সে ভার আমার। সিপ্রা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বাহিরের পানে চাহিয়াছিল, প্রণবের কথায় উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর প্রশান্তহাসি হাসিয়া দাদার পায়ের ধূলো মাথায় তুলিয়া নিল; প্রণব স্নিগ্ধ হাসিয়া বোনটিকে হাত ধরিয়া তুলিল...সিপ্রার অজ্ঞাতে দুই চোখ ওর ছল ছল করিয়া উঠিল।

পিতার ইচ্ছা, সিপ্রাও বার বার বলিতেছে তার দাদা সকলের সঙ্গে প্রথমতঃ দেশেই যাউক। তারপর সেখান হইতে বাঙ্গালোর যাইবার পথে প্রণব সিপ্রাকে কলিকাতায় বোর্ডিং-এ রাখিয়া যাইতে পারিবে। অগত্যা প্রণবের যাইবার দিন ষোল-সতেরো দিনের মত পিছাইয়া গেল। আগামীকাল প্রণবের বাঙ্গালোর রওনা হইবার কথা ছিল, তাই মালপত্র গুছান পর্য্যন্ত হইয়া আছে। অথচ এইমাত্র ঠিক হইল সকলের সাথে সে দেশেই যাইবে প্রথম।

অনেক প্রকার সুখাদ্য সামগ্রী বড় একটা ট্রেতে সাজাইয়া নূতনমা এইমাত্র প্রণবের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রণব আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্যস্ততার সহিত মাথায় চিরুণী চালাইতেছে। এখনই তাকে বাহিরে যাইতে হইবে, বাঙ্গালোর না যাওয়ার জন্য একটা 'তার' করা দরকার। নূতনমা টেবিলের ধারে ধারে সযত্নে খাবার সাজাইয়া নিঃশব্দে বাহিরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রণব মুখ ফিরাইতেই নূতনমার মুখে ম্লান জ্যোৎস্নার মত একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। টেবিলের উপর সজ্জিত খাদ্যদ্রব্যের পানে চাহিয়া প্রণব খুশীর প্রাচুর্য্যে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। তারপর নূতনমার মুখের পানে চাহিয়া কহিল···এমন করে খাওয়ালে কারুর বিদেশে যেতে ইচ্ছে করে? আমার মা ঠিক এমনি করে খাওয়াতেন—। নূতনমা মৃদু হাসিয়া কহিল···আচ্ছা, রোজ যদি ঠিক এমনি করে খেতে দিই তাহ'লে বাঙ্গালোরে যাবে না···সত্যি? প্রণব আবার হাসিয়া উঠিল। তারপর সান্ত্বনার স্বরে কহিল...সত্যি, আপনি একেবারে ছেলেমানুষ নূতনমা...খাওয়ার লোভে লেখাপড়া ছেড়ে ঘরে এসে বসে কেউ। কাল আমার না গেলেই নয় যে!

প্রণব নূতন মাকে বলিতে ভুলিয়া গেল যে সকলের সাথে তারও দেশে যাওয়া স্থির হইয়াছে।·· নূতনমার দুই চোখের পাতা আর্দ্রতায় ছল ছল করিয়া উঠিল, আহারেরত প্রণবের তা চোখে পড়িল না। নূতনমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই কহিল...কি, কথা কইছেন না যে বড়!

কথার শেষে জবাব না পাইয়া প্রণব মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে নূতনমার দুটি চোখ উপচাইয়া অশ্রুধারা নামিয়াছে।

...একি, আপনি কাঁদছেন যে! না...না···অমন ভাবে কাঁদবেন না, বিদেশে সকল ছেলেরাই যায়···কথা শেষ না হইতেই নূতনমা ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। খাওয়া

ফেলিবা স্তব্ধ হইয়া প্রণব ভাবিতে লাগিল। তারপরই মুখ মুছিয়া নূতনমার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, কিন্তু নূতনমার সেখানে দেখা মিলিলনা। পিতার ঘরে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া প্রণব বড় আসিতনা শূন্য ঘরখানার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রণব দেখিল সমস্ত ঘরময় যেন বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলিয়াছে; অথচ সৌখিন দ্রব্যসামগ্রীর ছড়াছড়ির অন্ত নাই।

প্রসাধন-টেবিলের ধারে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া প্রণব নূতনমা'র অপেক্ষা করিতে লাগিল। টেবিলের উপর অন্যমনস্কভাবে ওটা-সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে 'রাইটিং প্যাড'টা খুলিতেই এক জায়গায় মেয়েলীহাতের কাঁচা অক্ষরের কতটুকু লেখা প্রণবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। লেখাটুকু প্রণব পড়িল। নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস হয় না, লেখাটুকুর উপর আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া গেল। তারপর ঘরের বাতাস অসহ্য মনে হওয়ায় যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি এখন বারটা প্রায়—। প্রণব জাগিয়া বসিয়া আছে। এতক্ষণ বহু চেষ্টা সত্বেও সে ঘুমাইতে পারে নাই। প্রণবের মনে হইল সংসারে সরল মন নিয়া কাহাকেও বুঝিতে যাওয়ার মত নির্ব্বুদ্ধিতা দুনিয়ায় আর নাই। মনে পড়ে এখানে আসা অবধি ছোট খাট ঘটনার কত কথা। তারপর 'ঐশ্বর্য্য দেহ সাজাতে পারে, মনের শূন্যতা পূর্ণ করতে পারে না' একথার সত্যতা এতদিন প্রণবের মাথায়ই প্রবেশ করে নাই। এতদিন বিদ্যোপার্জ্জনের এতগুলো ডিগ্রি, সভাসমিতিতে বক্তা হইয়া জ্ঞানগভীর বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া– সবকিছু নিমিষের মধ্যে প্রণবের সমস্ত মস্তিষ্কব্যাপী যেন ব্যঙ্গ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সে যেন এতদিন স্বপ্নালোকে ছিল! সিপ্রা একদিন কহিয়াছিল 'এক্স্ট্রিম্' যা তাই আশঙ্কাজনক, আজ সিপ্রার একথাও যে অবহেলা করিবার সাধ্য নাই।··· চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল প্রণব,···তারপর জানালা খুলিয়া উদার আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া প্রণবের কেবলি মনে হইতে লাগিল...এ জগতে মুক্তির আভাষ কোথাও নাই। তাই তো আজ তারায় চন্দ্রে মেঘের বাহুবন্ধন, ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিই উহাদের রূপ ও আনন্দের বিকাশ। প্রণবের মনে হইল সংসারের বন্ধনডোর তার ছিঁড়িয়া গেল, মুক্তির পথও তাই অবরুদ্ধ। মুক্তি··· মুক্তি.. কেমন করিয়া আজ মুক্তি মিলিবে তার! তাহাকে নিয়া সংসারে এ কী ঘটিয়া গেল! অপরাধ কার প্রণব তাই ভাবিতে চেষ্টা করিল। কার বিরুদ্ধে আজ সে এতবড় সমস্যার অভিযোগ আনিবে!

এতক্ষণ ওর শরীরের রক্ত চলাচল যেন থামিয়া গিয়াছিল। নিজের মনকে টুকরা টুকরা করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াও দেখিতে পাইল তা' স্বচ্ছ মুকুরের মত। বিগত মায়ের মুখখানা ছাড়া সেখানে তো আর কোন ছাপ নাই! তবে একী অভিশাপ তার জীবনে! দপ্ করিয়া ওর মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। পাগলের মত প্রণব কেবলি হাঁটিতে লাগিল, দেওয়ালের গায়ে আপনার দীর্ঘ ছায়া দেখিয়া আপনিই চমকিয়া উঠিল। হায়, পৃথিবীর পরমায়ু বুঝি শেষ হইয়া আসিয়াছে তার। মৃতা জননী যেন একান্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন প্রণবকে সান্ত্বনা দিতে—দুইচোখ বাহিয়া প্রণবের অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। মায়ের নীরব সান্ত্বনা ও অশ্রুজলের মধ্য দিয়া ও প্রকৃতস্থ হয়। মালপত্র ওর সবই গুছান আছে আর এখানে নয়—। প্রভাত হইতেই ও শুধু সিপ্রাকে জানাইবে যে ও কার্সিয়ং যাইতেছে। তারপর একেবারে পাড়ি দিবে তার অধ্যয়নের সাধনাস্থল বাঙ্গালোরে···। প্রণবের মনে হইল সে যেন ধূমকেতুর মত এখানে আসিয়াছিল—সংসারের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া চলিয়াছে। দুঃখের হাসি হাসিয়া প্রণব আপন মনেই কহিতে লাগিল... Fate is always mysterious.

শ্রীইন্দ্রাণী রায়

৯১

দিন কতক কাট্‌ল। রোজই সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হয় এবং রোজই আমাদের প্রাণের আদান প্রদান চলে—বারো আনা নীরবে আর বাকী চার আনা ভাষায়। মাঝে মাঝে তাস খেলার বৈঠকও বসেছে তবে সাবিত্রীর খেঁড়ী সব সময়ই ছিলাম আমি। কিছুদিন পরে মুকুন্দদের বাড়ীতে এক যাত্রা-উৎসবের আয়োজন হ'ল। পর পর তিন ছেলের পরে মেয়ে হওয়াতে মুকুন্দর বাবা খুব ঘটা করে অন্নপ্রাশন দিয়েছিলেন। সমস্ত গ্রাম খাওয়ান হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষ্যেই যাত্রা গান।

যাত্রা গান আরম্ভ হওয়ার সময় ঠিক হয়েছিল বিকেল পাঁচটা। সখ হল, সাবিত্রীকে পাশে নিয়ে বসে যাত্রা শুনব। সেই দিনই সকালে সাবিত্রীকে খানিকক্ষণ নিরিবিলি পেয়েছিলাম।

বললাম "সাবি! যাত্রাগানের সময় তুমি আমার পাশে বস্‌বে কিন্তু।"

সাবিত্রীর মুখখানা হঠাৎ কিরকম যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে "ওমা! সেকি কথা! আমি পুরুষদের মধ্যে বস্‌ব?"

একটু ভেবে বললাম "না। ছোট ছেলেমেয়েরা যেখানে বসবে তুমি সেইখানটায় থেক—আমি সেইখানেই একটা ব্যবস্থা করে নেবো'খন।"

মৃদু মৃদু হাস্‌তে হাস্‌তে একটু একটু মাথা দুলিয়ে সাবিত্রী বুঝিয়ে দিলে "না"।

একটু অভিমানের সুরে বললাম "বসবে না তাহলে তুমি আমার কাছে?"

সাবিত্রী বললে "আমি বোঠানের কাছে বস্‌ব"।

বললাম "বেশ তাই বোস"।

এই বলে আর কোনও কথার অপেক্ষা না রেখে খট্‌ খট্‌ করে সেখান থেকে চলে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে আমি আমার শোবার ঘরে চুপ করে চিত হয়ে শুয়ে আছি একলা, এমন সময় আমার শোবার ঘরের দরজাটায় ঠক্‌ করে একটা শব্দ হল। চেয়ে দেখি সাবিত্রী দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে আমার দিকে। ঠোঁটে একটু মৃদু হাসি তখনও মাখান আছে।

বললে "সকাল বেলায় অমন চুপ করে শুয়ে আছ কেন শান্তদা?"

গম্ভীর সুরে বললাম "শুধু শুধু"।

বললে "শুধু শুধু বুঝি লোক অসময়ে চুপ করে শুয়ে থাকে?"

বললাম "হুঁ"।

বললে "ওঠ"। সকাল সকাল চান করে খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও—নৈলে রাত্ত জেগে যাত্রা দেখ্‌বে কেমন করে।"

বললাম "আমার জন্য আর অত মাথা ব্যথা কেন?"

সাবিত্রী খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌ল।

বললে "তবে কার জন্য, বোঠানের?"

বললাম "সে তোমার খবর তুমি জান।"

সাবিত্রী ঘরে এল। বস্‌লে আমার পাশে, আমার খাটের উপরে। হাত খানা এমন ভাবে আমার হাতের কাছে রাখ্‌লে আঙুলগুলি বাড়িয়ে দিলেই ধরা যায়।

বল্‌লে "শোন শান্তদা। একটা মুস্কিল হয়েছে, বোঠান ত চিকের মধ্যে বস্‌বে। চিকের মধ্যে বড্ড গরম হবে, আমি বস্‌তে পারব না।"

প্রাণখানা তখন আমার বুকের মধ্যে আনন্দে নৃত্য করতে সুরু করেছে।

মুখে বল্‌লাম "তবে কোথায় বস্‌বে তুমি ?"

বল্‌লে "তুমি একটা ব্যবস্থা করো।"

বল্‌লাম "কি করে ব্যবস্থা করব। তুমি বোঠানের পাশে বস্‌বে, বোঠান ত আর চিকের বাইরে বস্‌তে পাবেন না।"

বল্‌লে "তাহলে আর বোঠানের কাছে বসা হবে না।"

বল্‌লাম "তবে ?"

বল্‌লে "কি জানি কি করব, বাইরেই বা পুরুষদের মধ্যে বসি কি করে।"

তখন সাবিত্রীর হাত খানি আমার হাতের মধ্যে।

বল্‌লাম "আচ্ছা। আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করব অখন।"

বল্‌লে "করোনা শান্তদা! লক্ষীটী!"

সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে মুকুন্দদের বাড়ী গেলাম। দেখা যাক্ বসবার কি রকম ব্যবস্থা হচ্ছে। যেমন করে হোক্ সাবিত্রী যাতে আমার পাশে বসে তার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। গিয়ে দেখ্‌লাম আসর সাজান হচ্ছিল। আমি আর মুকুন্দ মুকুন্দদের গোমস্তা ঘটক মশাইয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলাম ও আমাদের মতামত জানাচ্ছিলাম। মুকুন্দদের বাড়ীর সামনের রোয়াকটী চিক্ দিয়ে ঘেরা হচ্ছিল মেয়েদের বস্‌বার জন্য। তারই পাশের পূবের দিকের খানিকটা রোয়াক চিক্ দিয়ে ঘেরা হল না, খালি রাখা হল ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বস্‌বার জন্য। বুঝলাম সাবিত্রী এবং তার মত অবিবাহিত মেয়েরা এইখানেই বস্‌বে মেয়েদের কাছে অথচ চিকের বাইরে।

আমি ঘটক মশাইকে বল্‌লাম "ঘটক মশাই! এই খোলা রোয়াকটীর পাশেই একখানা ছোট বেঞ্চি রেখে দেবেন, আমি আর মুকুন্দ বস্‌ব। আমরা ভিড়ের মধ্যে আসরে গিয়ে বস্‌তে পারব না।"

মুকুন্দ বল্‌লে "হ্যাঁ সে বেশ হবে—তাই করবেন ঘটক মশাই।"

ঘটক মশাই বল্‌লেন "বেশ ত। কিন্তু আগে থাকতে বেঞ্চি পেতে রাখলে অন্য ছেলেমেয়েরা এসে দখল করবে; কিংবা হয়ত নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও পাতবে। তার চাইতে গান আরম্ভ হলে আমি নিয়ে এসে তোমাদের জন্য পেতে দেব।"

আমি বল্‌লাম "সেই বেশ হবে।—এদিকটায় ভিড হবেনা—এইখানটায়ই ভাল।"

* * *

সন্ধ্যার একটু আগে যাত্রা আরম্ভ হল। আসর লোকে লোকারণ্য। আমাদের গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেত এসেছেই, আশে পাশের গ্রাম থেকেও অনেক লোক যাত্রা শুনতে এসেছে।

আমার মনের অবস্থা তখন যে ঠিক কি রকম হয়েছিল বোঝাতে পারবনা। দাদার বিয়ের সময়ও যাত্রা শুনেছি, তখন ছিল মনখানা ষোল আনাই যাত্রার আনন্দে ভরা। কিন্তু আজ! আজ আমার মনের রসধারা বিভিন্নমুখী। একটা উৎসবের আনন্দে ত মসগুল হয়ে উঠেছিলামই কিন্তু বড় করে আমার প্রাণের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল যে আনন্দ তার যেন তুলনা নাই। এই উৎসবে, এই মানবের মহামেলায় সাবিত্রী আমার সঙ্গিনী, আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী,—আমার সমস্ত প্রাণের আনন্দ, রসের ধারা, তাকেই আশ্রয় করে দুলে দুলে উঠছিল। অন্য অন্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাবিত্রী বসেছিল সেই রোয়াকটীর ঠিক কিনারায়। পরিধানে ছিল তার একখানি গৈরিক রংয়ের সিল্কের সাড়ী—পরিপাটী করে চুল বাঁধা,—কপালে একটী খয়েরের রংয়ের টীপ। এক এক হাতে কয়েক গাছি চুড়ী এবং গলায় একছড়া বিছে হার বুকের উপরে দুলছে। সাবিত্রীর দিকে চেয়েই, সাবিত্রীর সাজ দেখে বুঝেছিলুম এর মধ্যে মণ্টি বোঠানের হাত আছে। সাড়ীখানি মণ্টি বোঠানের কিনা ঠিক জানিনা, কিন্তু ঐ হার ছড়া যে মণ্টি বোঠানের তা আমি আগেই জানতাম।

সেই রোয়াক ঘেঁসে একটী ছোট বেঞ্চি নিয়ে বসেছিলাম আমি ও মুকুন্দ। যাত্রা হচ্ছে, মাঝে মাঝে সাবিত্রী নিজের হাতখানি রোয়াকের কিনারা দিয়ে এগিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে লোকচক্ষের একটু আড়ালে. ধরা দিচ্ছে আমার হাতে, আবার তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিচ্ছে। মনের তখন যা অবস্থা—সামনে যাত্রাগান হচ্ছে—কি যে হচ্ছে না হচ্ছে আমার যেন খেয়ালই ছিলনা।

উঃ সে কি পুলক! আনন্দের এতখানি আতিশয্য আমি যেন সইতে পারছিলাম না।

এমন সময় চেয়ে দেখলাম আসরের আর এক পাশে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে হরিশ দাঁড়িয়ে আছে। হরিশকে দেখেই তার সঙ্গে কয়েকটা কথা কইবার বিশেষ আগ্রহ হ'ল। সে ভাল ছেলে, কলেজে পড়ে, আমাদের পরীক্ষার খবর বেরুতে আর কত দেরী, সে কিছু শুনেছে কিনা। এবং তাছাড়া পাশ করলে, কলেজে পড়ার কি রকম কি করা যাবে, কোন্ কলেজ কি রকম এ বিষয়েও একটা আলোচনা করবার বিশেষ ইচ্ছে হল। উঠে দাঁড়ালাম। সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় যাচ্ছ শান্তদা?"

বললাম "যাই একটু ঘুরে আসি। ঐ হরিশ দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে একটু কথা কয়ে আসি।"

সাবিত্রী একটু যেন আদরের সুরে বললে "কেন?"

বললাম "দেখি আমাদের পরীক্ষার খবর ও কিছু শুনেছে কিনা।"

মুকুন্দ বলল 'চল, আমিও যাব"।

আমি বললাম "তুই গেলে এ জায়গাটা অন্য কেউ নিয়ে নেয় যদি।"

মুকুন্দ বললে—"ইস্! একটা দরয়ানকে ডেকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে যাচ্ছি।"

মুকুন্দ একটা দরোয়ানকে ডাকলে; বললে "দেখিস্! কেউ যেন এখানে না বসে।"

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করলে "কতক্ষণে আসবে?"

বললাম "এই দশ পনেরো মিনিট।"

সাবিত্রী বললে—"দেরী করোনা কিন্তু।"

আমি আর মুকুন্দ হরিশ যে দিকটায় দাঁড়িয়ে ছিল সেই দিকটায় গেলাম। আমরা যাওয়াতেই আসরের লোকেরা একটু সরে আমাদের বসবার জায়গা করে দিলে। হরিশের দলবলের সঙ্গে আমরা সেইখানটায় বসে পড়লাম।

হরিশের দলে অপূর্ব্ব বলে একটী ছেলে ছিল। সেও কলেজে পড়ে, হরিশের বিশেষ বন্ধু। তার সঙ্গে আমার আগে থেকেই অল্প আলাপ ছিল। ছেলেটী ভারী আমুদে—বেজায় হাসাতে পারে লোককে। ঐখানে বসে বসে যাত্রার অভিনেতাদের নকল করে সে এমন মজা করছিল যে আমরা সবাই হেসে গড়িয়ে যাচ্ছিলাম। দশ মিনিটের ছুটী নিয়ে এসেছিলাম আমি সাবিত্রীর কাছ থেকে, কিন্তু দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা কেটে গেল।

দু একবার উঠব উঠব ভেবেছি, কিন্তু ওঠা হয়নি। তার অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথমতঃ ওদের দলের ঠাট্টা, তামাসা, ইয়ার্কিতে বেশ মজা পাচ্ছিলাম।—দ্বিতীয়তঃ উঠে যেতে কেমন যেন একটা লজ্জা অনুভব করছিলাম। ওরা বিদেশী কলেজের ছেলে, আসরের পিছনে এক পাশটায় একটু জায়গা পেয়েছে। আমরাও এসে বসেছি। এখন উঠে গিয়ে বড় লোকের ছেলে বলে বড় মানুষী দেখিয়ে স্বতন্ত্র বেঞ্চিতে বসাটাও একটা লজ্জার ব্যাপার, এবং এদের ছেড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে গিয়ে বসতেও কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলাম।

এই সব নানান কারণে ওঠা হল না। সাবিত্রীর কথা অবশ্য আমি একেবারেই ভুলিনি। মনকে বোঝালাম "ভালই ত সাবিত্রী একটু বুঝুক না, আমি অত সস্তা নই, চাইলেই সব সময় আমাকে পাওয়া যায় না ইত্যাদি।"

হরিশের দল যখন উঠে গেল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। আমি আর মুকুন্দ হরিশের দলকে বিদেয় দিয়ে ফিরে এলাম আমাদের সেই বেঞ্চিটার কাছে। দরওয়ান তখনও সেইখানেই আছে, বেঞ্চিটাতে কেউ বসেনি।

কিন্তু সাবিত্রী! সাবিত্রী ত নেই সেখানে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কতক কতক সেইখানেই পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে, বড়রা বসে আছে। কিন্তু সাবিত্রী কোথায়? বোধ হয় চিকের ভিতরে গিয়ে বোঠানের কাছে বসেছে। তখন মনটা আবার সাবিত্রীর সঙ্গ পাওয়ার জন্য হু হু করছিল। মুকুন্দর ছোট

ভাইটাকে ডেকে বল্‌লাম "এই মণ্টী বোঠানকে একবার ডাকৃত—আমি এই চিকের পাশটাতে দাঁড়িয়েছি।"

ছেলেটা চিকের ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই বোঠান এসে চিক্ একটু ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলেন "ডাকৃছেন ঠাকুরপো?"

আমি বল্‌লাম "হ্যাঁ—কেমন যাত্রা দেখ্‌ছ?"

বল্‌লেন "চমৎকার গাইছে—না?"

বল্‌লাম "হ্যাঁ।"

ইচ্ছে হল একবার জিজ্ঞেস করি—সাবিত্রী কোথায়—তাকে দেখ্‌ছিনা, ভিতরে আছে বুঝি। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা হ'ল। আমি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বোঠান বল্‌লেন "আহা! সাবিটার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে।"

চম্‌কে উঠ্‌লাম। জিজ্ঞাসা করলাম "কেন?"

বোঠান বল্‌লেন "আপনি জানেন না বুঝি ঠাকুরপো। সাবির যে বড্ড মাথা ধরেছে। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঘুমুচ্ছে।"

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম "নিজের বাড়ী?"

বোঠান বল্‌লেন "না—নিজের বাড়ীতে আর একলা যাবে কি করে। ওর মাও ত এইখানে। এই সামনের ঘরটায় জানালার কাছে খাটে ঘুমুচ্ছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম "কতক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছে?"

বোঠান বল্‌লেন "ঘণ্টা দুই বোধ হয় দেখেছিল—তারপরেই উঠে গেছে।"

যে জায়গাটায় আমি আর বোঠান কথা কইছিলাম, সেখানটার বিশেষ আলো ছিল না, তাই বোঠানের মুখটা ঠিক দেখ্‌তে পাইনি। তাই ঠিক বুঝতে পারিনি বোঠানের চোখে তার নিজস্ব চাপা হাসি খেলে যাচ্ছিল কি না। কিন্তু যেটুকু দেখ্‌তে পেলাম তাতেই আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়েছিল।

একটু ঠোঁট চেপে বোঠান বল্‌লেন "যাই একবার দেখে আসি,—এখন কেমন আছে—আপনার নাম করে একবার ডেকে নিয়ে আসি, কেমন?"

বল্‌লাম "হ্যাঁ, খবরটা নাও।"

বোঠান ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে বল্‌লেন "না, এল না। ঘুমোয় নি, জেগেই আছে। বল্‌লে, বড্ড মাথা ধরেছে যেতে পারব না।"

কোনও কথা খুঁজে পেলাম না। চুপ করে কেমন বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। বোঠান নিজের মনেই বলে যেতে লাগ্‌লেন।

"নিশ্চয়ই খুব বেশী খারাপ হয়েছে। নইলে একটু আধটু হলে শুয়ে থাকবার মেয়ে সাবি নয়। বিশেষতঃ ওর যা সখ—আজ সাত দিন ধরে নেচে বেড়াচ্ছে—যাত্রা দেখ্‌বে।"

বুকের ভিতরটা কেমন হু হু করে উঠ্‌ল। বল্‌লাম "তা বন্ধ ঘরে শুয়ে থাক্‌লে ত মাথা ছাড়বে না। তার চাইতে বাইরে খোলা রোয়াকের উপর এসে একটু শুয়ে থাকুক না। হয়ত মাথা ছেড়ে যাবে—যাত্রাও দেখ্‌তে পাবে।"

বোঠান বল্‌লেন "এ কথা ত ভাল। কিন্তু আমি আর গিয়ে খোষামোদ করতে পারব না। সে একগুঁয়ে মেয়ে। তার চাইতে আপনি একবার যান্ না ভেতরে—পিছনের দরজা দিয়ে। গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলুন। ঘরে আর কেউ নেই। শোনে যদি ত আপনার কথাই শুনবে।"

বল্‌লাম "আচ্ছা, তুমিও চল।"

বল্‌লেন "আমার বয়ে গেছে। এমন জমেছে, এ ফেলে আমি এখন ঐ নিয়ে হৈ হৈ করি।"

যদিও লজ্জা হচ্ছিল, তবুও কি রকম যেন একটা টানে বোঠানের কথা অস্বীকার করতে পারলাম না। ঘুরে পিছনের দরজা দিয়ে মুকুন্দদের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে যে ঘরটায় সাবিত্রী শুয়েছিল সেই ঘরটায় গেলাম।

ঘরে কোনও আলো ছিল না। ঘরের বাইরে দালানে একটি হ্যারিকেন কমান ছিল। ঘরে গিয়ে দেখ্‌লাম খাটের উপর সাবি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লাম 'সাবি'? কোনও উত্তর নাই। আবার ডাক্‌লাম "সাবি"? কোনও উত্তর নাই। পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে ডাক্‌লাম "সাবি"? অঙ্গের কাপড় খানি টেনে টুনে ঠিক করে নিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। কোনও কথা কইলে না।

আগেই সন্দেহ হয়েছিল এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—

মাথা ধরা কিছু নয়, আসল রাগ অভিমানটা আমার উপর। মনে পড়ল "বদসি যদি কিঞ্চিদপি"। সাবিত্রীর পায়ের কাছে বসে পড়লাম। বল্লাম "সাবি! কইবে না কথা?"

হঠাৎ সাবি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্ল। লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। ঘরের সামনেই রোয়াকে মেয়েরা বসে। সাবির কান্নার শব্দ শোনা তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সাবি কি একেবারে পাগল হল!

* * * *

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সাবি উঠে এসে বাইরে রোয়াকে বস্ল। আমি পিছনের দরজা দিয়ে ঘুরে রোয়াকের পাশে এসে দাঁড়ালাম।

— বোঠান চিবুক একটু ফাঁক করে ঈষৎ অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "মাথা ছাড়্ল্ সাবি?"

বোঠানের দিকে চাইতে লজ্জা হচ্ছিল—কিন্তু আমি নিশ্চয় বল্তে পারি, বোঠানের চোখে সেই হাসি ফুটে উঠেছিল যেটা বোঠানের নিজস্ব—সেই দুষ্টু হাসি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

রূপকথা

শ্রীকালিপ্রসাদ বিশ্বাস এম-এ

রাজার কন্যা ঘুরিয়া ফেরে
দুখিনী কন্যা কঙ্কাবতী,
সকাল সন্ধ্যা আলোছায়াশেষে
ঘুরিয়া ফিরিছে কঙ্কাবতী।

রাজার পুত্র ফিরিছে ঘুরে'
দিগন্তরের প্রান্তসীমায়,
আকাশের আলো ছায়া হ'য়ে আসে—
ঘুরিয়া ফিরিছে কঙ্কাবতী।

পথহীন মাঠ, তারাহীন রাতি,
নীরব পৃথিবী নিদ্রা চোখে,
রাজার মেয়ের চোখে ঘুম নাই
ঘুরিয়া ফিরিছে কঙ্কাবতী।

রাজার পুত্র ফিরিছে ঘুরে'
কোথায় কঙ্কাবতীর দেশ—
বন্দিনী বালা কাঁদিছে কোথায়—
কাঁদিয়া ফিরিছে কঙ্কাবতী।

রাজার পুত্র ঘুরিয়া ফেরে
দিগন্তরের প্রান্ত সীমায়,
রাজার কন্যা কাঁদিয়া ফিরিছে,
কাঁদিয়া ফিরিছে কঙ্কাবতী।

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা ও সহিষ্ণুতা

আমাদের দারিদ্র্য ও অনাহার যে কতটা ব্যাপক ও কতটা ভয়ানক তাহার সঠিক ধারণা করা কোন সভ্য, সমৃদ্ধ, সুশাসিত দেশের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। দারিদ্র্য, অনাহার প্রভৃতি বলিতে তাঁহারা যে অবস্থা বুঝিয়া থাকেন, আমাদের অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোকেরাও সম্ভবতঃ সে অবস্থা কাম্য বলিয়া মনে করিবেন। আমাদের দুরবস্থার যথাযথ চিত্র তাঁহাদের সম্মুখে কেহ ধরিলে, একথা স্বভাবতঃই অনেকের মনে উদিত হইবে যে, এত অসহনীয় কষ্ট এত লোকে মুখ বুজিয়া সহিতেছে কেন? কেন, তাহারা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে না? কাজেই, বর্ণনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু অতিরঞ্জন থাকিয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্ত এইচ-এন-ব্রেলস্‌ফোর্ড তাঁহার 'Rebel India' নামক পুস্তকে, ভারতবর্ষের অনেক অবস্থা, গত আইন অমান্য আন্দোলন, সরকারের ব্যবহার, ভারতবাসীদের দুঃখদারিদ্র্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক সত্য ও স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষক ও শ্রমিকদের অবিশ্বাস্য নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনা দিবার পর তাঁহার মনে একথা উদিত হইয়াছে যে, লোকে তাঁহার বই পড়িয়া প্রশ্ন করিতে পারে, "ইহাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবন সম্বন্ধে যদি তোমার বিবরণ সত্য হয় তবে, এই সকল কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহ করে না কেন?" লেখক ইহার উত্তর দিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন পাশ্চাত্য মনের পরিচায়ক; শ্বেত মানুষদের মনোজগৎ হইতেই এই প্রশ্ন আসিতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া লেখক, আমাদের অনাহার ও স্বাস্থ্যহীনতাকে অংশতঃ দায়ী করিয়াছেন এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন:

"আমি সন্দেহ করি, ভারতীয়েরা যে এইরূপ আশ্চর্য্য রকমের ধৈর্য্যশীল ও নিষ্ক্রিয় তাহার আংশিক কারণ এই যে, তাহাদের অধিকাংশই অর্দ্ধভুক্ত। ……শারীরিক স্বাস্থ্যের যে অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য আপনা হইতেই মুষ্টি সঞ্চালিত হয়, সাধারণ ভারতীয় 'কুলী'র সেই শারীরিক স্বাস্থ্যেরই অভাব আছে। এক পাঞ্জাব ব্যতীত, কৃষকদিগেরও শারীরিক শক্তি ইউরোপীয় শ্রমিকের প্রায় অর্দ্ধেক। ম্যালেরিয়ার প্লীহা লইয়া বিপ্লবীরা জীবন আরম্ভ করে না।" *

আমাদের অপুষ্ট শরীর এবং রোগপ্রবণতা যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার নূতন প্রচেষ্টার পথে একটা প্রধান বাধা তাহাতে সন্দেহ করিবার আর কি আছে। শিখ, মরাঠী প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভাল শরীর ও স্বাস্থ্যবিশিষ্ট মানুষ দেখা গেলেও অর্দ্ধাহারের ফলে সাধারণভাবে এ দেশের লোকের যে দৈহিক অবনতি ঘটিয়াছে, সে সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তকেই একস্থানে তিনি বলিয়াছেন:

---

* "I suspect that part of the reason why Indians are so astonishingly patient and passive is that most of them are half starved. ...The average 'coolie' lacks the physique which instinctively resists wrong by an impulsive movement of the fists. Save in the Punjab, even the peasants have about half the muscular power of a European Worker. Rebels do not start life with Malarious Spleens."

"সহরের কুলীরা এবং দরিদ্রতর জেলাগুলির গ্রামবাসীরা আকারে খর্ব্ব, তাহাদের শারীরিক গঠন শোচনীয় রকমের ক্ষীণ এবং পেশীসকল নিতান্ত অপুষ্ট,—এককথায় ইহারা মানুষের ভগ্নাংশ মাত্র। প্রকৃতি এমনই এক ক্ষীণাবয়ব জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ প্রোটীড ও ভিটামিন খাইয়া স্বল্পকালের জন্য তাহাদের দুঃখময় জীবনধারণে সমর্থ হয়। ভারতীয়দের আয়ুষ্কাল গড়পড়তা ২৩'৫ বৎসর; বিলাতের অধিবাসীদের পক্ষে এই অঙ্ক ৫৪ বৎসর।"

সবরমতী আশ্রমের শান্ত এবং প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়া, ভারতীয় চরিত্রের শান্ত নম্রতা এবং অহিংসাধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে ইহার মনে নিম্নোদ্ধৃত চিন্তার উদয় হইয়াছিল।

"...এই জাতির নম্রস্বভাব আমাকে প্রভাবিত ও স্পর্শ করিয়াছিল। তথাপি আমার সাধারণ মনোভাব হইতেছে, ইহাদের এই নম্রস্বভাবের জন্য দুঃখ অনুভব করা, এমন কি ইহাকে অভিশাপ প্রদান করা। ইহাই তাহাদিগকে অসহায়ভাবে একের পর অন্য আক্রমণকারী বিজেতার কবলিত করিয়াছে। ইহাই তাহাদিগকে দৈনিক মহাজন, জমিদার, সর্দ্দার এবং পুলিশের অবিশ্বাস্য অত্যাচারের সম্মুখীন করে। যে কোন শক্তিমান পাশ্চাত্য জাতি ইহাদিগকে (এই সকল অত্যাচারীকে) মুষ্টির সাহায্যেই সংযত রাখিত এবং প্রয়োজন হইলে সেজন্য লগুড, প্রস্তরখণ্ড এবং কাস্তেফলকের সাহায্য লইত।......হিন্দু ফিরিয়া মারিতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকিলে রূঢ়স্বভাব ইংরাজেরা ভারতীয়দিগকে অপমান করিতে, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিতে কখনই যাইত না (ইহারা বর্ত্তমানেও এইরূপ ব্যবহার যখন তখন করিয়া থাকে, এবং অতীতে আরও অনেক বেশী যথেচ্ছভাবে করিত)। ইহারা পাঠান এবং শিখদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করে না। এই যে নম্রতা এবং নিষ্ক্রিয়তা (ইচ্ছা হইলে কেহ ইহাকে কাপুরুষতা বলিতে পারেন) ইহা কি শক্তিক্ষয়কারী গরম আবহাওয়া ম্যালেরিয়া এবং অর্দ্ধ-উপবাসের ফল নহে (পাঠক আপত্তি করিতে পারেন)? ইহাদের প্রভাব ত আছেই, তদুপরি অহিংসার সর্ব্বনাশা মতবাদ এ সকলের শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছে। ইহা (অহিংসার মতবাদ) দুর্ব্বলতাকে যুক্তি দিয়া সমর্থন করিতেছে; নিরাসক্তিকে আদর্শস্বরূপে গ্রহণ করিতেছে; ইহা ক্লান্তি এবং ঔদাসীন্যকে সাধারণ নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। শারিরীকি স্বাস্থ্যহীন থাকিলে লোকে যে প্রকার ব্যবহার করিতে চায় সেই ব্যবহারের জন্য ইহা একটা মহত্ত্বসূচক কৈফিয়ৎ যোগাইয়া দিয়াছে।" *

ইহা অবশ্য আমাদের চরিত্রের উপর অহিংসার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবসম্পর্কীয় কথা। ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রে অহিংসার নীতি গ্রহণ করা ব্যতীত যে উপায়ান্তর নাই, এবং একমাত্র অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়াই যে সাফল্য আসিতে পারে, সে কথা গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন।

---

* Something in the gentleness of this race embraced and touched me. Yet my usual attitude is to deplore their gentleness even to curse it. It has made them the helpless prey of one intruding conqueror after another. It exposes them daily to the incredible oppressions of usurers, landlords, foremen and police, whom any vigorous Western race would have held in check with its fists, and if need be, with sticks and stones and the blades of scythes. The vulgerer type of Englishman would never have taken to insulting and even striking Indians (as he will still too often do, and in the past did much more freely) if there had been any probability that a Hindoo would strike back. He does not treat Sikhs or Pathans in this way. But is not this gentleness and passivity (call it cowardice, if you will) the result (the reader may object), of the enervating heat, of malaria, of semi starvation? These play their part, but this disastrous doctrine of ahimsa has reinforced them. It rationalises lassitude: it takes

এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রন্থকার শুধু মাত্র বাঙালীদের স্বাস্থ্য দেখিয়া এই প্রকারের ধারণায় উপনীত হন নাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের যেসকল স্থানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই উচ্চ ধারণা আছে, লেখকের অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ সেই সকল স্থানের।

পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠনের আরও বেশী ক্ষীণতা লেখক সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছেন। পাঞ্জাবের শিখ প্রভৃতি এবং অন্যান্য স্থানের স্বাস্থ্যবান জাতিদের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। আমাদের অবরোধ প্রথা যে ইহার জন্য অনেকখানি দায়ী তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। মুক্ত আলোবাতাস, স্বচ্ছন্দ চলাফেরা প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও সহজ অধিকার হইতে ইহারা বঞ্চিত। বাল্য-মাতৃত্ব অন্যবিধ প্রধান কারণ। সারবান খাদ্যও পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের ভাগ্যে কম জুটিয়া থাকে।

মেয়েদের অধিকতর হীনস্বাস্থ্যের ফল, আমাদের সন্ততিদের উপর বর্ত্তাইতেছে এবং তাহা আমাদের দৈহিক গঠনের বর্দ্ধমান ক্ষীণতাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

আমাদের ক্ষীণস্বাস্থ্য ও ক্ষীণকর্ম্মশক্তি

আমাদের জনশক্তি যে আমাদের কর্ম্মশক্তির পরিচায়ক নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের জনশক্তির অর্দ্ধাংশ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রহিয়াছে এবং তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা সম্পূর্ণ অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে। গড়পড়তা হিসাবে আমাদের আয়ুষ্কাল অত্যন্ত স্বল্প এবং সে দিক দিয়া দেখিলে লালন পালনেই আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়; কাজ করিবার সময় আমরা খুব বেশী পাই না। আমাদের দেশে যে অত্যধিক অকাল মৃত্যু ঘটে তাহার ফলেও জাতীয় কর্ম্মশক্তির অন্যদিক দিয়াও বিরাট অপচয় হয়। অকালমৃতদের লালন পালনের জন্য জাতির কর্ম্মশক্তির অনেকটা এবং দেশের সম্পদের অনেকখানি ব্যয় হইয়া থাকে। অথচ, ইঁহাদের কর্ম্মশক্তির দ্বারা জাতি লাভবান হইতে পারে না।

আমরা প্রায় সকলেই বৎসরের কতকটা সময় অসুখে ভুগিয়া থাকি, ইহার মোট পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। অসুখের সময় ব্যতীতও ইহার ফল আমাদের স্বাস্থ্য ও কর্ম্ম-শক্তির উপর আরও কিছু দিন ধরিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। নানারকম অসুখের প্রাদুর্ভাবের জন্য আমাদের বহু লোক দীর্ঘদিনের অথবা চিরদিনের জন্যও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে।

আমাদের সকলের কাজ করিবার পূর্ণ সুযোগ থাকিলেও যে কত লোকে কাজ করিতে পারিত না, ইহা তাহার হিসাব। বর্ত্তমানে কাজের ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ বলিয়া সক্ষম এবং অক্ষম সকলকেই আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অলস হইয়া থাকিতে হইতেছে।

কিন্তু, এ সকল কথা অপেক্ষাও ভাবিবার বিষয় হইতেছে এই যে, যাহাদিগকে আমরা কর্ম্মক্ষম বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং যাহারা কাজ করিবার অবসরও পাইয়া থাকে, অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা কত কম। আমাদের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মকুশলতার অভাব ইহার জন্য দায়ী। ১৯২৬-২৭ সালে 'ইন্টার-ন্যাশানাল' টেক্স্‌টাইল ইউনিয়নের যে প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষ পরিদর্শন করেন, তাঁহারা বম্বে প্রেসিডেন্সির কাপড়ের কলসমূহে নিযুক্ত ভারতীয়দের ৩৪ জনের কাজকে ল্যাঙ্কাসায়ারের ১২ জন লোকের কাজের সমান বলিয়া ধরিয়াছেন। অন্যান্য প্রামাণ্য লোকে অবশ্য ভারতীয় যোগ্যতার মাপ ইহাপেক্ষা অনেক বেশী ধরিয়াছেন। 'টাটা স্টীল ওয়ার্কস'-এর কর্তৃপক্ষ একজন ভারতীয় শ্রমিককে একজন ইওরোপীয়ের ⅔ বলিয়া ধরিয়া থাকেন, অর্থাৎ ৩ জন ভারতীয় শ্রমিক ২ জন ইওরোপীয়ের সমান কাজ করে বলিয়া ধরা হয়।

আমাদের সামাজিক আবেষ্টন ও সহিষ্ণুতা

আমাদের সামাজিক আবেষ্টনকে যে বিদ্রোহী ভারতের লেখক, আমাদের প্রকৃতিগত জড়তার অধিকতর শক্তিশালী কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

---

apathy for an ideal: it standardises moods of fatigue and indifference. It provides a noble excuse for conduct which in fact one inclines to adopt because one's physical condition is subnormal

তাঁহার মতে,—"ঐতিহ্য এবং সামাজিক রীতিনীতির চাপ আরও অনেক বেশী শক্তিশালী। ধর্ম্ম এবং জাতিভেদ, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারের জন্য কল্পনাতীত বিস্তৃত বিধান সমূহের নির্দেশ দিতেছে। বিধি-নিষেধসমূহের যে জাল শৈশব হইতে জীবনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে তাহা এমন জটিল ও দুর্ব্বোধ যে, তাহাতে সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রী-লোকের মন শুধুমাত্র নির্দ্দেশবর্ত্তী হইতেই শিক্ষা পায়। অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকৃতির লোক ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা যেপ্রকার চেষ্টা সম্ভব নয়, মাত্র তাহার দ্বারাই ভারতীয়েরা সংস্কারক বা বিপ্লবী হইতে পারেন।"

প্রকৃতপক্ষে, যে আবহাওয়ার মধ্যে আমরা বর্দ্ধিত তাহা দেহমনে আমাদিগকে এতটা অভ্যাসের দাস করিয়া ফেলে যে, সব কিছুকে নতমস্তকে মানিয়া না চলিয়া, প্রতিকারের জন্যও যে সচেষ্ট হওয়া যাইতে পারে সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

আমাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, শারীরিক দুর্গতি, নিঃসহায়তা প্রভৃতির জন্য দেশের রাজ সরকারকে দায়ী করিলেও, ইহার জন্য আমাদের সমাজব্যবস্থার ত্রুটিসমূহের দায়িত্ব সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন: "বৈদেশিক শাসনের অনিষ্টকারিতার মধ্যে নহে, পরন্তু, ইহার মধ্যেই (ভারতের সামাজিক গঠন ও হিন্দুদের সংস্কার) দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির কারণ নিহিত রহিয়াছে। ভারতবাসীরা স্বাধীনতার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করিবার পর, যে সকল দুঃখ হইতে তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, তাহার প্রত্যেকটির জন্যই বিদেশীদিগকে দায়ী করিতে লাগিলেন এবং হয় তাঁহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রভাবকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, না হয় এই সকল জিনিষ অন্ততঃ তাঁহাদের, এই বলিয়া সেগুলিকে আদর্শ-স্থানীয়ই মনে করিতে লাগিলেন। ইহা পরাধীনতার অভি-শাপেরই একটা অংশ। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, অহিংসা, পুনর্জন্ম প্রভৃতি হিন্দুদের সমগ্র প্রাচীন আদর্শ ও মতের উত্তরাধিকার যে, আর্থিক উন্নতি, সামাজিক ন্যায়পরতা এবং শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের পথে নিদারুণ বাধা, এ কথাটা যতই উপলব্ধি করা যাইবে, ভারতবর্ষের দৈনন্দিন পরাভবের শেষ দেখিবার জন্য মনে ততই প্রবল আগ্রহ জাগিবে। এই সকল বাধা দূর করিবার জন্য, জনসাধারণের মনের পরিবর্ত্তন-সাধনের জন্য, যে আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ কুসংস্কারকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, সে সবের সহিত লড়াই করিবার জন্য ভারতীয় জাতিকে সর্ব্বপ্রথম, স্বাধীন ও স্বশাসক হইতে হইবে। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে এই সকল বিশ্বাস এবং প্রথার মূলোৎপাটনের কোন চেষ্টাই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ যে অশ্বশক্তির মাপে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জায় পাশ্চাত্য যে-কোন দেশের অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী তাহাই তাহার উন্নতির একমাত্র অন্তরায় নহে। এটা বাহিরের তুচ্ছ ব্যাপার, সহজেই প্রতিকারযোগ্য; যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদের আন্দোলন ইওরোপকে মধ্যযুগ হইতে উদ্ধার করে, তাহার তুলনায় ভারতীয় সমাজ সমগ্রভাবে এই প্রকার কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই; ইহাই উন্নতির শক্তিশালী অন্তরায়। এইরূপ কোন আন্দোলন ভারতে দৃঢ়মূল হইতে পারে নাই; কারণ ভারত-বর্ষ সমষ্টিগত চিন্তার উপযুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, অবশ্যম্ভাবী-রূপে জাতীয়তাবাদী হইয়াছে। জাতীয়তাবাদ বিদেশীর সমালোচনা করে; ইহা অন্তরমুখী হইয়া অতীতের উত্তরাধি-কারের বিশ্লেষণ করে না।"

বইখানা ১৯৩১ সালে লেখা হইলেও, সমস্যাগুলি এবং সে সম্পর্কে আমাদের ভাবিবার প্রয়োজনীয়তা সমানই রহিয়াছে। সহানুভূতিসম্পন্ন একজন ভিন্নদেশী বুদ্ধিজীবি আমাদের সমস্যাগুলিকে যে-চোখে দেখিয়াছেন, ও তাহার যে সকল কারণ নির্ণয় করিয়াছেন তাহার মূল্য উপেক্ষনীয় নহে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে মানুষের মন কিছু পরিমাণে ভোঁতা হইয়া যায় এবং অনেক অসঙ্গত জিনিস তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুদ্ধিমান লোকদেরও দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। বিদেশীর এই অসুবিধা নাই।

বাংলাভাষায় ইংরাজী ও আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার

বাংলাভাষায় আরবী ফার্সী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং সাহিত্যে দেবদেবীর নামের এবং পৌরাণিক উপাখ্যান

প্রভৃতির সহিত সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিস্তৃত ও স্পষ্টভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোন মুসলমান লেখক যদি লিখিবার সময় মনে করেন যে, তিনি মুসলমান বলিয়া লেখার মধ্যে তাঁহাকে কিছু আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করিতেই হইবে, হিন্দু লেখকদের হইতে ভাষাকে কিছু পৃথক করিতেই হইবে, তাহা হইলে, তাহা যেমন অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইবে, তেমনই পৌনে তিন কোটি বাঙ্গালী মুসলমান প্রত্যহ যে সকল কথা ব্যবহার করেন (এবং যাহা হিন্দুরা ব্যবহার করেন না), হিন্দুরা যদি সে সকল কথার ব্যবহারে আপত্তি করেন এবং বৈদেশিক শব্দ সংগ্রহের সময় এ সকল ভাষার কথা না ভাবেন, তাহাও অসঙ্গত ও অন্যায় হইবে। আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহারের সমর্থনে ব্যবহৃত একটা যুক্তি চোখে পড়িল। আরবী ফার্সী শব্দের অবাধ প্রচলনে হিন্দুদের আপত্তির প্রতিবাদে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইংরাজী শব্দের বা বাক্যাংশের যথেচ্ছ ব্যবহারে (এমন কি অনেক সময় ইংরাজী অক্ষরেই), যে সকল হিন্দু কিছুমাত্র আপত্তি করেন না, তাঁহারাই যে ভাষার শুদ্ধি নষ্ট হইবার ভয়ে, আরবী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে আপত্তি করেন, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহাদের অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা।

ইংরাজী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষা যাহা কিছু, তাহা সবই ইংরাজীর মারফতে লাভ হইয়াছে। অনেক শব্দের শুধু মাত্র ইংরাজী নামই আমরা শিখিয়া রাখিয়াছি এবং চিন্তায় ও কথাবার্ত্তায় সেই সকল শব্দের সাহায্যেই কাজ চালাইয়া থাকি, ভাবপ্রকাশক অনেক ইংরাজী বাক্যাংশও আমরা এইভাবেই চালাইয়া থাকি। মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি থাকিলেও অনেক সময়ই তাহা যথেষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত নহে বলিয়া আমাদের এই ক্রটির কথা। মাতৃভাষার উপর তাহার প্রভাবের কথা আমরা বিশেষ ভাবিয়া দেখিনা এবং লিখিবার সময়ও উপায়ান্তর না পাইয়া ইংরাজীই চালাইয়া থাকি। ইংরাজী-শিক্ষিত আধুনিক বাঙ্গালী-সমাজের চিত্র আঁকিবার জন্যও অনেক সময় লেখকেরা ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের অল্পস্বল্প ইংরাজী জ্ঞান আছে বলিয়া ইংরাজী শব্দ বা বাক্যাংশের জন্য তাঁহারাও খুব বেশী অসুবিধায় পতিত হন না। এ সকল কথা অবশ্য ইংরাজী শব্দের অবাধ প্রচলনের সমর্থনে বলা হইল না। ইংরাজী শব্দ অপেক্ষা আরবী ফার্সী শব্দ সম্পর্কে হিন্দু বাঙ্গালীদের অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কারণ এই যে, বাংলাদেশে ইংরাজী-সাহিত্য, ভাষা বা শব্দের নিজস্ব কোন মূল নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের শিক্ষালব্ধ। কাজেই, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহার আবির্ভাব সাময়িক বলিয়াই সকলে ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইংরাজীর সম্পর্কে আমাদের মনে কোন গভীর ভাবাবেগ না থাকায় ইহা স্থায়ী হইবে না। ধীর বুদ্ধি এবং যুক্তির সাহায্যে আমরা ইহাকে যে কোন সময় বর্জ্জন ও গ্রহণ করিতে পারিব। কিন্তু, আরবী ফার্সী শব্দ সম্পর্কে মুসলমানদিগের একটা মনের টান আছে, যাহা তাঁহাদিগের বিচারবুদ্ধিকে অনেকটা আচ্ছন্ন করিবে বলিয়া হিন্দুরা সন্দেহ করেন এবং ইহাও সন্দেহ করেন যে, এই ঝোঁক তাঁহাদিগকে শুধুমাত্র প্রচলিত শব্দ অথবা প্রয়োজনের সীমার বাহিরেই লইয়া যাইবে। যে প্রভাবের ফলে মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহার একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি আছে। কাজেই, যাহা চিরদিন বা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে এমন কোন প্রভাবের অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকিলে, সেজন্য বিশেষভাবে সতর্ক ও শঙ্কিত হইবার কারণ থাকে।

বাঙ্গালী মুসলমানের উর্দ্দুপ্রীতির কারণ কি

এমন এক দিন ছিল যখন, বাঙ্গালী মুসলমানের নিজেদের মাতৃভাষা পরিহার করিয়া উর্দ্দুকে গ্রহণ করিতে পারিলে বিশেষ গৌরব বোধ করিতেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের একটা সম্প্রদায় এখনও এই মোহ কাটাইতে পারেন নাই। বাংলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ চালাইবার চেষ্টা য অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গতি ও শোভনতার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে, তাহারও পশ্চাতে উর্দ্দুর প্রভাব অনেকখানি রহিয়াছে। কারণ হিন্দীর কাঠামোর মধ্যে আরবী ও ফার্সী শব্দ সাজাইয়া উর্দ্দুর সৃষ্টি হইয়াছে; বাংলার কাঠামোর মধ্যে আরবী ফার্সী শব্দ সাজাইবার প্রেরণা বাঙ্গালী মুসলমানদের একদল সম্ভবতঃ এখান হইতেই পাইয়াছেন। উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইবার ঐতি-

হাসিক কারণ এবং তাহার জন্য প্রয়োজনের তাগিদ ছিল।

বিদেশ হইতে মুসলমানেরা যখন এদেশে আসেন তখন এদেশের লোকের ভাষা বুঝিবার ও নিজেদের কথা তাহাদিগকে বুঝাইবার অপরিহার্য্য প্রয়োজন তাঁহাদের হইয়া পড়ে। এই প্রয়োজন ২।১ জন লোকের নহে, সৈনিক-শিবিরের প্রায় প্রত্যেক সৈনিকের হইয়া পড়ে। কিন্তু, কোন বিদেশী ভাষার কাঠামোটি আয়ত্ত করা যত সহজ, সর্ব্বসাময়িক ভাব প্রকাশের জন্য তাহার সকল শব্দ আয়ত্ত করা তত সহজ নহে। এইজন্য হিন্দীর কাঠামোর মধ্যে নবাগতদের নিজেদের ভাষার শব্দ ভাজাইতে হইয়াছে। অন্যদিকে এদেশীয়েরাও নিজেদের ভাষার সহিত সাধ্যমত ২।১ টি বিদেশী শব্দ মিশাইয়া নবাগতদিগকে কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপেই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে। বিশেষ কোন ভাব বা চেষ্টার অনুবর্ত্তী হইয়া কেহ এই কার্য্যে প্রথমে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু, নবাগত বিজয়ী মুসলমানেরা যখন উর্দ্দুকে ভালভাবে গ্রহণ করিলেন তখন এবং রাজানুগ্রহে ও প্রতিভাশালী লেখকদের হাতে পড়িয়া ভাষা যখন শক্তিশালী হইয়া উঠিল তখন ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মুসলমানদের উপর তাহার প্রভাব অনুরূপ হইল।

মুসলমানেরা এদেশে আসিয়াছিলেন বিজেতারূপে। নিজেদের সম্বন্ধে গৌরববোধ এবং বিজিতদের সম্বন্ধে হীনতাবোধ তাঁহাদের স্বভাবতঃই ছিল। এদেশীয়েরাও নিজেদের নিকৃষ্ট ও বিজেতাদের শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন। ফলে এদেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা মুসলমান হইলেন, সেইজন্য তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান চেষ্টা হইল বিজেতাদের দলভুক্ত বা বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করা। ইস্লামের সাম্যনীতির ফলে তাহার পথে অন্য বাধাও ছিল না—এক ভাষা ছাড়া। হিন্দীভাষী যাঁহারা মুসলমান হইলেন তাঁহাদের পক্ষে উর্দ্দুকে আয়ত্ত করা এবং আপনার করিয়া লওয়া শক্ত হইল না বরং মুসলমান সরকার ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা দিল্লী, আগ্রা ও উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানে হওয়ায় স্থানীয় সকল শ্রেণীর লোকের ভাষাই উর্দ্দু হইয়া উঠিল। কিন্তু, অসুবিধা হইল, অন্যান্য প্রদেশের নবদীক্ষিত মুসলমানেরা পড়িলেন অসুবিধায়। এদেশের রক্ত যে তাঁহাদের ধমনীতে আছে একথার প্রমাণ মুছিয়া ফেলিবার জন্য স্বভাবতঃই চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু, সে চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা বিফল হইল বাংলায়।

ভারতের অন্য যে কোন প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী হইয়াছে; অর্থাৎ আনুপাতিক হিসাবেও এ প্রদেশে নবদীক্ষিতদের সংখ্যা বেশী হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহাদের মাতৃভাষা অনেকটা অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গিয়াছে। পারিবারিক সম্পর্কাদির নাম এবং ধর্ম্ম সম্পর্কীয় শব্দ ব্যতীত ভাষা সম্পর্কে অন্যদের সহিত ইহাদের আর কোন পার্থক্য ঘটে নাই। কিন্তু, মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের হীনভাব (?) ছাপ মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা বাংলায়ও প্রবলভাবে চলিয়াছে এবং তাহার ফলে বাংলাদেশেরও এক-শ্রেণীর অভিজাত মুসলমান আজ পর্য্যন্ত উর্দ্দুকেই তাঁহাদের মাতৃভাষারূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। জনসাধারণকে উর্দ্দু গ্রহণ করান সম্ভব না হইলেও, বাংলার সহিত উর্দ্দু শব্দ মিশাইয়া একটা নূতন ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছিল। সে চেষ্টা অস্বাভাবিকতার চাপেই বিফল হইয়াছে। কিন্তু, বাঙালী মুসলমানদের মন ইহার প্রভাব হইতে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই।

বিজেতাদের সহিত এক জাতীয়ত্বের প্রমাণ হিসাবেই প্রথমে এদেশীয় মুসলমানেরা উর্দ্দু গ্রহণ করেন এবং পরে ইহাকে আভিজাত্যের একটা বিশেষ পরিচয় হিসাবেই ধরা হয়। আভিজাত্যের প্রতি মানুষের মোহ স্বাভাবিক। বাঙালী মুসলমানদেরও এ মোহ থাকা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হয় নাই। উর্দ্দুর প্রতি শ্রদ্ধা যখন তাঁহাদের মাতৃভাষাকে উর্দ্দুমুখী করিতে চায় তখন অন্তরালে থাকিয়া এই মোহই তাঁহাদের মনকে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে হইবে।

আভিজাত্যের আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার ইচ্ছা হয়ত, অস্বাভাবিক না হইতে পারে। কিন্তু, আভিজাত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ জনসাধারণের স্বার্থের কথা ভুলিয়া থাকিবার দিন গিয়াছে। ভাষা সম্পর্কে যে অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে, কোন প্রকার সজ্ঞিব চেষ্টায় ভাষা যাহাতে দুর্ব্বোধ, আড়ষ্ট হইয়া না উঠে, তাহার দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা না দেয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কাজ না করিতে পারিলে জনসাধারণের

শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে এবং এক ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় একদিন বাঙ্গালায় অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পূর্ণভাবে দূর হইবার যে সম্ভাবনা আছে, তাহাও নিশ্চিতরূপে দূরে সরিয়া যাইবে।

বাঙ্গালী মুসলমানদের আরও একটা ভাবিয়া দেখিবার আছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দ্দু, এবং এই ভাষাই তাঁহাদের বংশের অভারতীয়ত্বের পরিচয় হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। অন্যদিকে, চিরদিন বাংলাদেশের লোক বলিয়া বাঙ্গালী মুসলমানদের অনেকের মনে একটা হীনতা ও লজ্জার ভাব আছে এবং উর্দ্দুভাষীদের তাঁহারা নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের একশ্রেণীর অভিজাত যে উর্দ্দুকে মাতৃভাষারূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহারও মূলে এই মনোভাব রহিয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানের উর্দ্দুপ্রীতি এবং নিজ ভাষায় উর্দ্দু হইতে শব্দ চয়নের ঝোঁকের কারণও অনেকটা ইহাই।

কিন্তু, আমরা আশা করি, আধুনিক বাঙ্গালী মুসলমান নিজেদের অথবা নিজপ্রদেশের সম্বন্ধে এই প্রকার হীন ধারণা পোষণ করিতে রাজী হইবেন না। বরং নিজপ্রদেশ এবং নিজেদের বাঙ্গালীত্বের জন্য তাঁহারা গৌরববোধই করিবেন। যে ভাষা বাংলা আসাম প্রভৃতি প্রদেশের প্রায় তিন কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা, এবং যে ভাষাভাষী মুসলমানেরা ভারতবর্ষের অন্য যে কোন ভাষাভাষী মুসলমানদের অপেক্ষা সংখ্যায় গরিষ্ঠ, সে ভাষার কৌলিন্যের জন্য অথবা তাহার ইস্‌লামীকরণের জন্য অন্য ইস্‌লামীয় ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহের কোন অনিবার্য্য প্রয়োজন হইবে না। বরং তিন কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা বলিয়া অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা শ্রদ্ধার সহিত বাংলা শিক্ষা করিবেন। মুসলমানদের সহিত হিন্দুরাও এই ভাষা ব্যবহার করেন বলিয়া মুসলমানদের নিকট ইহার গুরুত্ব কমিয়া যাইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

মুসলমানদিগের বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ইচ্ছার পশ্চাতে হিন্দুদের মনোভাবেরও প্রতিক্রিয়ার কতকটা প্রভাব রহিয়াছে। মুসলমানদের উর্দ্দুপ্রীতি এবং বৈদেশিক শব্দ ব্যবহারের প্রথম ও প্রধান কারণগুলির কথা প্রথমে উক্ত হইয়াছে। ইঁহাদের এই মনোভাবের অসঙ্গতির সূত্র ধরিয়া হিন্দুরা ইঁহাদিগকে তীব্র ও অসহিষ্ণুভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তাহার ফলও ফলিয়াছে। সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে যে সকল যুক্তি ফলপ্রসূ হইতে পারিত তাহাই বিপরীতদিকে মনোভাবকে দৃঢ় ও শক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ধর্ম্ম, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, উৎসব অনুষ্ঠান, আইন, আদালত প্রভৃতি সম্পর্কীয় যে সকল ভিন্ন প্রদেশীয় বা দেশীয় শব্দ বাংলার সমগ্র মুসলমান সমাজ প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যাহার অনেক কথা হিন্দুরাও সাধারণ কথাবার্ত্তায় চালাইয়া থাকেন এমন সকল শব্দের (যাহা গ্রাম্য নহে বা যাহার প্রয়োগ বিশেষ কোন স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে) সাহিত্যে ব্যবহার হিন্দুরা সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবী যখন পূর্ণ না হয় তখন সে যে কতকটা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করে, এবং যুক্তির সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না, ইহা অনেকটা স্বাভাবিক।

জাতীয়জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব কত গভীর ও আমাদের ভবিষ্যৎ তাহার উপর কতটা নির্ভর করিতেছে তাহার গুরুত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই বিষয়টি ধীরভাবে ও ভাবাবেগবিরহিত চিত্তে গ্রহণ করা উচিৎ।

ভাষা দ্বিখণ্ডিত হইলে কি কি ক্ষতি হইবে

মুসলমানদের দ্বারা নিত্য ব্যবহৃত শব্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদের যেমন সাবধান ও উদার হইবার প্রয়োজন আছে, এবং যাহা না হইলে ভাষার দুই সাম্প্রদায়িক বিভাগে বিভক্ত হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে, তেমনই মুসলমানদেরও এ বিষয়ে চিন্তা করিবার কথা আছে।

মুসলমানেরা যদি মনে করিতে থাকেন যে, তাঁহাদের লেখায় বা তাঁহাদের পাঠ্যে আরবী ফার্সী প্রভৃতি ভাষার কিছু সংখ্যক শব্দ থাকা অপরিহার্য্য তবে, ভাষার উপর এবং হিন্দুদের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া হইবেই এবং তাহার ফলে ভাষার দ্বিখণ্ডিত হইবার আশঙ্কাও বাড়িবে। কারণ, হিন্দুরা

এই প্রকার ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পড়িতে স্বভাবতঃই (উচিত হইবে কিনা, সেকথা না বলিয়া, যাহা স্বাভাবিক হইবে তাহাই বলিতেছি) অনিচ্ছুক হইবেন এবং দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্য যাহা লিখিত, তাহার মধ্যে যে সার্ব্বজনীনতা ও সংযম থাকে, উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের লেখা হইতে তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবে। হিন্দুরা যদি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার-চেষ্টার ফলে শুধুমাত্র নিজেদের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন তবে, তাহাও আবার মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধকে বাড়াইয়া তুলিবে। এইরূপে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক বাংলায়ও হিন্দু মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে।

কোন বৃহৎ ভাষাকে মাতৃভাষারূপে পাওয়া একটা বিশেষ সৌভাগ্য। কারণ, শিক্ষার জন্য লোককে প্রধানতঃ মাতৃভাষার উপর নির্ভর করিতে হয়। বিদেশী ভাষা শিখিয়া তাহার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যে কতটা দুরূহ ব্যাপার, তাহার ফলে জাতীয়শক্তির কতটা অপব্যয় হইতে পারে, অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে যে শিক্ষা জুটিয়াই উঠে না, তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী সমাজের আছে। মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্য থাকিলেই তবে জ্ঞান সকলের নিকট অবারিত হয়; যাঁহারা অল্প লেখা পড়া শিখেন (তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী), তাঁহারা জ্ঞান বর্দ্ধনের সুযোগ পান এবং বিদ্যা তাঁহাদের জীবনে কার্য্যকরী হইতে পারে ও প্রকৃত পক্ষে জাতির শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে।

কিন্তু কোন সমৃদ্ধ সাহিত্যই লোকে চেষ্টা করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না। যে ভাষা বহু লোকে ব্যবহার করেন, আনুপাতিক হিসাবে সে ভাষার প্রতিভাশালী মনীষী, শক্তিশালী লেখকের সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক লোকে সে ভাষার বই কেনেন বলিয়া সে ভাষায় পুস্তক লেখা ও প্রকাশ করা লাভের ব্যবসা হইয়া থাকে। ফলে অধিক সংখ্যক লেখক পুস্তক লিখিতে উৎসাহিত হন। মোট পাঠক সংখ্যা বেশী থাকিলে প্রত্যেক বিষয়েরই পাঠক সংখ্যা এমন হইতে পারে যাহাতে সাহিত্যের সকল বিভাগই গড়িয়া উঠিতে পারে। কোন ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশী হইলে, অন্যভাষার যে সকল লোকের তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাঁহাদের সংখ্যাও কাজে কাজেই বাড়িয়া যায় এবং তাঁহাদের অনেককে বাধ্য হইয়া এই ভাষা শিখিতে হয়। ইহাও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার কার্য্যে সহায়তা করে।

সংখ্যার দিক দিয়া বাংলা ভারতের প্রথম ভাষা-না হইলেও দ্বিতীয় ভাষা। সমগ্র পৃথিবীর কথা ধরিলেও দেখা যাইবে যে পৃথিবীর সমৃদ্ধভাষাগুলির কয়েকটি যত লোকের দ্বারা কথিত হয় বাংলাভাষীদের সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা অধিক, তাহাদের সমান এবং কিঞ্চিন্ন্যূন। কাজেই বাঙ্গালীরা অধিক সংখ্যায় লেখা পড়া শিখিলে বাংলাভাষার পূর্ব্বোক্ত সুবিধাসমূহ পাইবার এবং সকল দিক দিয়া উন্নত হইবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে কিন্তু ভাষার রূপ ও বিষয়বস্তু লইয়া যদি বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্ব্বোধের ন্যায় বিবাদে প্রবৃত্ত হন ও তাহাতে ভাষা এবং সাহিত্যের গতি দুই বিপরীতমুখী হয় তবে এই সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে। ইহাতে উভয় সম্প্রদায়ই (অর্থাৎ সমগ্র জাতি) সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, মুসলমানদের ক্ষতি এই অর্থে অধিকতর হইবে যে, বাংলায় এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট সাহিত্যের সুবিধা হইতে তাঁহারা অংশত বঞ্চিত হইবেন এবং সে ক্ষতি অনেকটা মারাত্মক হইবে; আরও বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে নূতনব্রতী (হয়ত আপত্তি হইবে) বলিয়া, সমঝদার পাঠক এবং শক্তিশালী লেখকের সংখ্যা তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত কম হইবে ও সাহিত্য সৃষ্টির কার্য্যও শক্ত হইবে।

কিন্তু, বাংলাভাষা ও সাহিত্য হইতে দেশ যে মহত্তম কল্যাণ আশা করিতে পারে, তাহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কার কথা এখনও বলা হয় নাই। সূক্ষ্ম হইলেও সাহিত্যের প্রভাব অতিশয় শক্তিশালী। আমাদের দেশে অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা লোককে যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা দূর করিবার পক্ষে সাহিত্যের প্রভাব অনেকটা ফলপ্রসূ হইবে। বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে একটা সাধারণ মিলনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতেছে, যাহা অদূর ভবিষ্যতে এই উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী নিঃসন্দেহ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, সাহিত্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাগ গড়িয়া উঠিলে সে আশা সম্পূর্ণভাবে যে শুধুমাত্র লুপ্ত হইবে তাহা নহে,

সাধারণ ভদ্রতা ও সংযমের মাত্রা একবার ছাড়াইয়া গেলে (সাহিত্য সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত হইলে তাহা যাইবেই) সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী যন্ত্র হইবে।

বাংলা হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা হওয়ায় লাভই হইয়াছে

বাংলাভাষীরা যদি হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত না হইয়া শুধু হিন্দু বা মুসলমান হইতেন তবে, ভাষার গঠন বা তাহার বিষয়বস্তু লইয়া বর্ত্তমান অবস্থার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। দেশে যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাব এমন প্রবল না হইত, সন্দেহ ও অবিশ্বাস এত ঘনীভূত হইয়া না উঠিত তাহা হইলেও সাহিত্যের আসরে এই অশোভন দ্বন্দ্ব দেখা দিত না।

কিন্তু, এই সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা ভাষা ও সাহিত্যকে যদি পঙ্গু না করিয়া ফেলে তবে, উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা হওয়ায় বাংলার যে অপরিসীম সম্ভাব্যতা রহিয়াছে, কোন এক সম্প্রদায়ের ভাষা হইলে তাহা কথনই থাকিত না।

প্রাচীন সভ্যতার দিক দিয়া হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই দুইটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী। এই উভয় সম্প্রদায়ের সমগ্র প্রাচীন ভাবসম্পদ, এবং উভয়ের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যের যে শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হইতে পারে তাহা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সম্পত্তি হইবে।

বর্ত্তমানে দেশে যে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, তাহা নিন্দনীয় হইলেও, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পৃথকভাবে তাহা একটা কর্ম্মোদ্যমেরও সৃষ্টি করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার অনিষ্টকারিতা বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারিলে এবং সুপ্রযুক্ত হইলে এই উদ্যমের দ্বারা মুসলমানেরা সাহিত্যের একটা নূতন দিক গড়িয়া তুলিতে পারিবেন এবং ইহা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে কম লাভের কথা হইবে না। (হিন্দুরা তাঁহাদের নবজাগ্রত মনের সমগ্র উদ্যম দিয়া অনেক পূর্ব্ব হইতেই সাহিত্য-সৃষ্টির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া আর তাঁহাদের কথা বলা হইল না।)

বাংলায় সংস্কৃত ও আরবী ফার্সী শব্দ

বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দ অথবা নবগৃহীত সংস্কৃত শব্দের মূল এবং কোন কোন সময় তাহার উৎপত্তির ইতিহাস দেখাইয়া মুসলমান ছেলেদের পক্ষে সে সকল শব্দ শিক্ষার দুরূহতা দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে।

অনাবশ্যক ও দুরূহ সংস্কৃত শব্দের ভারে ভারাক্রান্ত ভাষার বিরুদ্ধে হিন্দুরাই বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলেই দেশজ শব্দসমূহ সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, পুস্তকের ভাষা কথ্য ভাষার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহারা সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষা ব্যবহারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ কোথায়ও করিতেছেন বলিয়া জানা নাই।

যে সকল সংস্কৃত শব্দের বাংলায় অবিরত ব্যবহার হইতেছে, তাহারা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেও, বাংলাভাষা তাহাদিগকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। তাহাদের অর্থ শিক্ষার জন্য সংস্কৃতজ্ঞানের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না, হিন্দু ছেলেরাও তাঁহাদের বাংলার (সংস্কৃতের নহে) জ্ঞান হইতেই তাহাদের অর্থ ও ব্যবহার শিখিয়া থাকেন। কাজেই, এসকল শব্দের সংস্কৃত মূল দেখাইয়া তাহাদের অর্থ শিক্ষার দুরূহতা দেখাইবার চেষ্টা অন্যায়। এ দিক দিয়া সংস্কৃত ও আরবী ফার্সী শব্দের স্থান সমান নহে।

একথা নূতন শব্দের ব্যবহার সম্পর্কেও সত্য। সংস্কৃতের সহিত বাংলার সম্পর্ক খুবই নিকট। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীই যে সকল শব্দ নিতান্ত ঘরোয়া কথাবার্তায় প্রত্যহ অনুক্ষণ ব্যবহার করিতেছেন, তাহার বহু শব্দই হয় সংস্কৃত, না হয় সংস্কৃত হইতে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে কাজেই, নূতন শব্দ সৃষ্টির সময় কাছাকাছি অর্থবিশিষ্ট শব্দের মূল হইতে সৃষ্ট কোন সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ অনেক সময় খুবই সুবিধাজনক হয়। তাহাতে ধ্বনির সহিত আংশিক পরিচয় থাকাতে তাহা শিক্ষা করা ও তাহার অর্থবোধ করা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীর পক্ষেই সহজসাধ্য হয়।

আরবী ফার্সী শব্দ সম্বন্ধে এই কথা ঠিক বলা চলে না। কোন কোন শব্দ সম্বন্ধে ইহা যদিও বলা যায় তাহা হইলেও সংস্কৃতের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অনেক কম হইবে।

সংস্কৃত শব্দের সহিত পাল্লা দিয়া নূতন আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করিলে অন্যান্য কথা বাদ দিয়াও, সে ভাষা মুসলমান বাঙ্গালীদের পক্ষেও সহজবোধ্য হইবে না এবং নব শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে ইহা বাধাগ্রস্ত করিবে।

পণ্ডিত নেহেরুর সমাজ-তান্ত্রিক মতবাদ

পণ্ডিত নেহেরুর সমাজ-তান্ত্রিক মত দেশের রাজনীতিক ও ধনিক মহলে চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। যদিও লোককে আশ্বাসদান কল্পে তিনি তাঁহার আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়াছেন তাঁহাতে কাহারও প্রকৃত শঙ্কার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই মতবাদ দেশের লোকের কাছে সম্ভবতঃ নূতন নহে এবং ইহাও সম্ভবতঃ দেশের লোকের অবিদিত ছিল না যে, পণ্ডিত নেহেরু এই প্রকার মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু, তিনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দৃঢ়তার সহিত এই মত ব্যক্ত করিতে থাকায়, এই সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। কংগ্রেসের ভিতরের ও বাহিরের নেতৃবৃন্দ ইহাতে যে প্রকার আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন তাহাতে এই প্রকার মত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী ছিল তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে যাঁহারা স্বাধীনতা বা তাহার কাছাকাছি কিছু চাহিয়াছিলেন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের অনেকে বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে সুখ সুবিধা বা সামাজিক মর্য্যাদা তাঁহারা যে অনুপাতে ভোগ করিতেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর বর্দ্ধিত সুখ সুবিধা ও মর্য্যাদার ভাগ সেই অনুপাতেই হইবে। ইহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী যখন হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাঁহারা তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন।

আবার বর্ত্তমান কংগ্রেস সভাপতি দেশের জনসাধারণের মধ্যে দেশের ধন সম্পদের সমবণ্টনের আভাষ দিবা মাত্র তাঁহার মতামত লইয়া দেশের মধ্যে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, যদি তিনি কংগ্রেস সভাপতিরূপে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেন তবে, তাহা লইয়াও এতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইত কিনা সন্দেহ।

অনেকে মনে করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা লাভ হইলেও, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ থাকিবেন, অস্পৃশ্য অস্পৃশ্য থাকিবেন, জমিদার জমিদার থাকিবেন, কৃষক কৃষক থাকিবেন, ধনী ধনী থাকিবেন, নির্ধন নির্ধন থাকিবেন। স্বাধীনতার লভ্যাংশ বর্ত্তমানের সুবিধাভোগকারীরাই পাইবেন; অন্যদের ভাগে তাঁহাদের অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু ছিটে ফোঁটা পড়িবে মাত্র। ভারতবর্ষের জনসাধারণ কেন যে দেশের মুক্তি সংগ্রাম হইতে বরাবর দূরে রহিয়াছে, নেতৃবৃন্দ কেন যে তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জনে তেমন সক্ষম হন নাই, তাহারই প্রমাণ আমরা নিত্য যোগাইয়া দিতেছি।

আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, মানুষের অপমান, অমর্য্যাদা, তাহার দুঃখ দুর্দ্দশা, দারিদ্র্য অনাহার দূর করিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা ও উচ্ছ্বাস সংযমের সীমা ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু, যখনই আমরা কঠিন তথ্য ও কঠিনতর কর্ম্মক্ষেত্রের সম্মুখীন হই, তখনই আমাদের দুর্ব্বলতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়া যায়। আমাদের আত্মপরতা, অপরের প্রতি সহানুভূতিহীন নির্ম্মমতা, অশোভন বিদ্বেষ নিতান্ত নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। আমরা সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া স্তোত্র রচনা করিতে পারি এবং আমাদের ঔদার্য্যের পরিচয় হিসাবে স্থানে অস্থানে তাহার আবৃত্তিও করিতে পারি; কিন্তু, শুচিতারক্ষার অজুহাতে মানুষকে সযত্নে শত হস্ত ব্যবধানে রাখিতে চাই। আমরা নারীকে দেবী কল্পনা করিয়া তাহার মহিমাকীর্ত্তনে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া থাকি, কিন্তু, অন্তরে তাহার সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিয়া থাকি যে আলোবাতাসের এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্পর্শে পর্য্যন্ত তাহাকে আসিতে দিতে ভয় পাই। দরিদ্রের দুঃখে আমরা অশ্রুমোচন করিয়া থাকি সত্য, এবং ইহাও সত্য যে তাহা দূর করিবার জন্য অনেক সময় সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হই না। কিন্তু ইহার দ্বারা যে আমাদের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ও ভাববিলাসিতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ পাইতেও বিলম্ব ঘটে না। আমরা দরিদ্রের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায়

তাঁহাকে নিজ অর্থের অংশ অনেক সময় দিতে পারি বটে, কিন্তু, যাহাতে দরিদ্র নিজের অধিকারের বলে, পরিশ্রমের দ্বারা এই সম্পদের অংশ অর্জ্জন করিয়া দারিদ্র্য দূর করিতে পারে, এমন ব্যবস্থাকে বাধা দিবার জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিব। আমাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের মোহ এবং আধুনিক জগতের অনিবার্য্য দাবী, আমাদের জড়বিরোধী আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং বস্তুজগতের অতি কঠিন আঘাত যদি আমাদের মনের মধ্যে তাল পাকাইয়া না যাইত, এই প্রকার পরস্পরবিরোধী জিনিসের সমন্বয়ের ফলে আমাদের মানসিক পঙ্গুত্ব না ঘটিত তবে সম্ভবতঃ আমরা এতটা অসহায় হইয়া পড়িতাম না, এবং কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী জিনিসের একত্র অবতারণা করিয়া হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিতাম না।

নাগরিক অধিকার রক্ষা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রধান সুবিধা এই যে, ইহার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিস্তৃততম ক্ষেত্র আছে। কাহারও অসুবিধা না করিয়া প্রত্যেক দল বা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের মত বা কার্য্য সম্বন্ধে যাহাতে পূর্ণতম স্বাধীনতা ও বিস্তৃততম অধিকার প্রাপ্ত হন তাহাই ইহার অন্যতম লক্ষ্য। পরাধীন দেশের লোক বলিয়া অন্যান্য দেশের লোকে কার্য্যে, চিন্তায় এবং মত প্রকাশে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন আমরা তাহার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র করিতে পারিনা। তবুও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আইন কানুনে এবং মুখের প্রতিশ্রুতিতে এই স্বাধীনতা কিছুপরিমাণে নানা কারণে প্রকাশ্যতঃ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এই অধিকার থাকিলেও প্রতি বিশেষ ব্যাপারে, প্রতি বিশেষ দল সম্পর্কে ও ব্যক্তি সম্পর্কে এই অধিকার যথেষ্ট ভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়া থাকে। আমরা সকলের নাগরিক অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে বিশেষ জোরের সহিত তাহা এই জন্যই চাহিয়া থাকি যে আমরা নিজের অধিকারও অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অন্যায় ভাবে কাহারও অধিকার আজ খর্ব্ব করা হইলে একদিন তাহা আমাকেও স্পর্শ করিতে পারে এই মনে করিয়া যে কোন নাগরিক অধিকার অপহরণের বিরুদ্ধে সকল নাগরিকের প্রতিবাদ উচ্চারিত হওয়া উচিত। অন্য নানা ব্যাপারে এবং অন্য নানা ক্ষেত্রে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে, স্বার্থের বৈষম্য থাকিতে পারে, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু এ একটিমাত্র ক্ষেত্রে বোধ হয় দেশের সকল মতের সকল দলের লোক সমবেত হইতে পারেন। পৃথিবীর অন্য কয়েকটি দেশে, রাজসরকারের অতিমাত্র অসহিষ্ণুতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করিবার স্বাধীনতা লুপ্ত হইতে এবং সরকার পক্ষের সহিত রাষ্ট্রিক মত পৃথক হওয়ায় লোককে অন্য নানা-প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে আমরা দেখিতে পাইতেছি। যে সকল দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আজও সম্মানিত হয়, সেখানেও, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে, মানুষের অধিকার অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয় বা হইতে পারে। ক্ষমতার অপব্যবহার যাহাতে বেশী না হইতে পারে বা হইলেও তাহার প্রতিকার হইতে পারে সেজন্য, নানাদেশে নাগরিক অধিকার রক্ষার কল্পে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের দেশে এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বোক্ত কারণে আরও অনেক বেশী।

পণ্ডিত নেহেরু এজন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা যেমন প্রশংসার যোগ্য তেমনই প্রয়োজন ও সময়ের উপযোগী। শুধু রাজনীতিক মতভেদে এ বিষয়ে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে কাহারও যুক্তিযুক্ত আপত্তি থাকা উচিত নহে।

ডাঃ আম্বেদকরের হিন্দুধর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণার কারণ

হিন্দু সমাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত যে সকল ধারাবাহিক দুর্ব্ব্যবহারের ফলে ডাঃ আম্বেদকর হিন্দুধর্ম্মত্যাগের সংকল্প করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই 'হরিজন' পত্রিকায় তাহার একটা বিবরণ দিয়াছেন।

অস্পৃশ্য জাতির ছেলে বলিয়া প্রথমে বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত পড়িতে না পাইয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ফার্সী পড়িতে হইয়াছে। ক্ষৌরকার তাঁহাদের কাজ করিত না বলিয়া তাঁহার এক ভগিনীকে—

পরিবারের পাঁচ ছয় জন লোকের ক্ষৌরকার্য্য করিতে হইত। এই সকল অবস্থার চাপে সাতারা ছাড়িয়া ইঁহারা বম্বে রওনা হন এবং এখানে এলফিনস্টোন কলেজে ভর্ত্তি হইবার পর মহামান্য গাইকোয়াড়ের নিকট হইতে আম্বেদকর একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি গাইকোয়াড়ের বৃত্তির সাহায্যে আমেরিকায় যান এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি হইয়া বরোদায় ফিরিয়া আসেন। এখানে মহামান্য গাইকোয়াড় তাঁহাকে রাজস্ব বিভাগে লইতে চাহেন, কিন্তু তিনি সারা সহর ঘুরিয়া থাকিবার মত স্থান মিলাইতে পারেন না। অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে এক মিথ্যা পার্শী নাম গ্রহণ করিয়া তিনি এক পার্শী ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিলেন। কিন্তু, পার্শী শীঘ্রই তাঁহার স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং একদিন একদল পার্শী লাঠি লইয়া তাঁহাকে মারিতে আসিল এবং তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিতে বলিল। কোন বন্ধুর গৃহেও স্থান জুটিল না। কোন এক বন্ধু যদিও স্থান দিতে চাহিলেন, তিনি বলিয়া দিলেন যে ডক্টরকে স্থান দিলে, বাড়ীর চাকরেরা সকলেই চলিয়া যাইতে চাহিবে।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ইহা অনেক পুরাণ দিনের কথা। সেইজন্য ডাঃ আম্বেদকর শ্রীযুক্ত দেশাই এর নিকট তাঁহার আধুনিক অভিজ্ঞতার একটা বিবরণ দিয়াছেন।

"আপনি হয়ত বলিবেন এসবই পুরাণ কথা। কিন্তু, আমি আপনাকে মাত্র পনের দিন পূর্ব্বের একটি ঘটনার কথা বলি। সোপালায় একটি সম্মিলন থাকায় আমার সেখানে যাইবার প্রয়োজন হয়। একজন ট্যাক্সি চালক আমাদের কাজ করিতে চাহিয়া আগাম আমাদের নিকট হইতে ২৫৲ টাকা লয়। সে টাকা লইয়া চম্পট দেয় এবং কোন টোঙ্গাওয়ালাও আমাদের লইতে চাহে না। আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হই। আপনি কি মনে করেন যে বোম্বাইএ আমরা মোটরকার পাই? হিন্দুরা আমাদিগকে কামায় না বলিয়া মুসলমান ক্ষৌরকারেরা আমাদিগকে পাইয়া বসে। বম্বে কি এমন কোন হিন্দু হোটেল আছে যেখানে আমাদের স্থান মিলিবে? কিন্তু, সে সব যাক, বরোদায় যেদিন আমি স্থান হইতে স্থানান্তরে কুকুরের মত বিতাড়িত হইয়াছিলাম, সেদিন বড় কষ্টে অশ্রুপাত করিয়াছিলাম; বরোদার এইসব দিনের স্মৃতি আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া তোলে।"

হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহা গভীর লজ্জার কথা সন্দেহ নাই এবং যে কোন লোককেই ইহা হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতে পারে। আমরা অবিরত যে সকল কাজ করি, অভ্যাসের ফলে তাহার অসঙ্গতি আমাদের কাছে আর তেমন ধরা পড়ে না। তাই যদিও, আমরা বহুসহস্র লোকের উপর অনুক্ষণ এইরূপ পাশব ব্যবহার করিতেছি তবু, আমাদের এই অসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই মনে বিশেষ কোন অনুভূতি নাই। ডাঃ আম্বেদকরের উক্তি প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কতকটা সচেতন করিয়া তুলিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

অতসী বোসকে
ক'লকাতায় সকলেই চেনে, বিশেষতঃ ছাত্র সম্প্রদায়।
বিখ্যাত নয় রূপে,
গানেও নয়, নাচেও নয়।
তবু বাংলা দেশ জুড়ে অগণিত ভক্ত তার।
কলেজে কলেজে
ওকে নিয়ে চলে আলোচনা ;
তারই আবর্তে হাবুডুবু খায় ছেলেরা।
প্রফেসারবাও নিজেদের ঘবে
অল্পস্বল্প চর্চা করেন অতসী বোসেব।
কারণ ও শুধু ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট নয় বি-এ'তে এম-এ'তে,
যেমন আছেন ওঁরা ডজনে ডজনে।

অতসী বোস
এম-এ'তে রেকর্ড ব্রেক করেছে আশি পারসেন্ট পেয়ে।
দিকে দিকে এই সংবাদ
ছড়িয়ে গেলো রেডিওর তরঙ্গের মত।

বাংলা দেশে সকলের মনের পাতায়,
ওর নাম আছে লেখা বিদ্যুৎ লেখায়।
বাতাসে যেমন কাঁপে নারকেল পাতা
তেমনি ওর নামে কেঁপে ওঠে সহস্র হৃদয়।

যখন কলেজে পড়ে বি-এ
ওকে ঘিরে তখনই খ্যাতির সৌবভ উঠেছিল সুনিবিড় হয়ে।
আই-এ'তে প্রথম ছিল মেয়েদের মাঝে ;
ওর ক্লাশের রুটিন
মুখস্থ ছিল কলেজের সমস্ত ছাত্রের।
কলেজের সুমুখে, রাস্তায় সিঁড়িতে পার্কে, আশে পাশে,
গুচ্ছ গুচ্ছ ছেলে
ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ি দেখে, সিগারেট ফোঁকে—
কতক্ষণে আসবে অতসী।
সযতন অগোছাল সাজ,
জাপানী রঙীন ছাতা হাতে,
আর খান দুই সরু মোটা খাতা ;
সোনার চশমা আঁটা বড় বড় চোখে।
সে-চোখের উপমা কোথায় ?
দীর্ঘ দৃঢ় তনু তার,
দাম্ভিক চলনভঙ্গী ;
আপনার মূল্যসচেতন শ্যাম মুখশ্রী।
কিন্তু অপূর্ব সুন্দর!
বাস থেকে ও যখন নামে কলেজের ধারে
অতৃপ্ত চোখে ফিরে চায় বার বার পথের পথিক।
পার্কেব রেলিঙের ধাব দিয়ে দিয়ে,
ও যখন চলে,
মেলে জাপানী ছাতা আঁচল উড়িয়ে,

সে যে কী সুন্দর!
বর্ণনা করিতে তার
অক্ষম কলম যায় থেমে।

অতসীর ক্লাশে,
ছাত্রসংখ্যা বেশী হতো রোজই।
মধুলব্ধ ভ্রমরের মতো
নানা কলেজের ছেলে এসে জুটতো গোপনে।
অতসী দর্শন?
শুধু তা-ই নয় রূপে ও নয় পদ্মিনী হেলেন।
মাঝে মাঝে অধ্যাপকদের,
—বোবা ছাত্রী ছিলনা ও ক্লাসে—
বিপদে ফেলত ভারী অদ্ভুত সব কোশ্চেনে।
তখন ওর বিজয়ী রহস্যভরা ঝিকিমিকি মুখ,
মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থির হতো
ছেলেদের চঞ্চল জোড়া জোড়া চোখ।
সুমধুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর,
বাজত সবার কানে শয়নে স্বপনে।
ক্লাসের বাতাস
পরিহাসে সিক্ত হলে ও মধুর হাসিত সহজ,
থাকত না বসে কাঠের পুতুল, নির্ব্বিকার মুখে।
ছুটী হলে পরে
দু'ডজন ছেলে ওর পিছে পিছে স্কোয়ারের কোণে;
অল্প কিছু দেখা যেত মোড়ে।
বাসের আশায়—
দাঁড়িয়ে থাকত সবাই অতি ভদ্র মুখে,
সকলেরই দরকার দু'নম্বর বাস
অতসীর মত।

এম্-এ পাঠ কালে
ছেলেদের মনোযোগ হলো আরও প্রখর।
ছাত্রমহলে ও তখন বিজয়িনী রাণী।
দৈনিক কাগজে
বেরিয়েছে ওরে নিয়ে সচিত্র সংবাদ;
মাসিকে ছেপেছে এক পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি।

ওর শত কথায়,
শিক্ষানিকেতনের বাতাস মুখর।
সিঁড়িতে ও করিডোরে দু'সারে দাঁড়িয়ে থাকে
ওর ভক্ত বহুতর।
এদিক সেদিক থেকে আসে মিষ্টি ধাবালো রিমার্ক;
মাঝ দিয়ে ও চলে যায় কুইন ক্রিশ্চিনার মত।

কিন্তু দুটী মাত্র ছেলে,
স্বাস্থ্যসমুজ্জল আর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ,
ওর প্রসন্ন দৃষ্টি করে যেন লাভ।
তারাই বহন করে ওর বই ভারী হলে;
সাথে সাথে যায় বাসষ্টপে,
হাত তুলে রোখে বাস অতসীর হয়ে।
ওর চোখের ইঙ্গিতে
নিজেরাও চড়ে বসে কোন কোন দিন।
সকলেই বলাবলি করে,
বিভূতিই ওর বেশী প্রিয় কমলের চেয়ে।

কোন কোন দিন
যদি দেখে বিকেলটা ফাঁকা,
গল্পে গল্পে টেনে নেয় নিজেদের বাড়ী
পায়ে হেঁটে; বাড়ী বেশী দূরে নয়।
তারপরে দু'জনে বসে পড়বার ঘরে
আলোচনা করে
প্রফেসার, টেক্সট বুক, পলিটিক্স, রবিবাবু ইত্যাদি;
দু'জনে মিলে পড়ে কবিতা শেলীর।
আর ঘন ঘন চুমুক চলে চায়ে
অতসীর নিজ হাতে করা, আর সোনালী রঙের।
মাঝে মাঝে ওরা সিনেমায়ও যায়,
'প্লাজা' কিম্বা 'আর, কে, ও', 'এম্পায়ারে'ই বেশী
কখন-সখন
'চাংওয়া' 'ব্রিষ্টলেও' যায় ওরা মাঠের ফেরৎ।

কিন্তু যেখানেই যাক্
অতসীর প্রিন্সিপ্‌ল এই—
খরচ বহন করে সমানে সমান।
মেয়েদের সনাতন পরগাছাবৃত্তি ক'রে
অসম্মান করবে না আর নিজের জাতের।

এম-এ'র রেজাল্ট বেরুতে না বেরুতে,
জুটল এসে বহু বিয়ের প্রস্তাব;
লোভনীয়, একান্ত কাম্য যা সকল মেয়ের।
এক আই-সি-এস
আলাপ করে গেল ছুটী নিয়ে এসে।
বহু অধ্যাপক, ডেপুটি ও চাকুরে বড় বড়
ঘোরাফেরা করে;
বেকারের করুণ উমেদারী যেন।
সকলকে ফিরিয়ে দিল অতি সহজেই।
কিন্তু বিভূতি,
ওর সহপাঠী, এম-এ'তে বন্ধু ওর দুটী বছরের,
যার সঙ্গে কাটিয়েছে অনেক অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা মধুর।
যার স্মৃতি
অক্ষয় হয়ে ওর বুকে আছে জেগে,
জীবনের অমূল্য সঞ্চয়।
অল্পে অল্পে গল্পে গল্পে
যার সঙ্গে হয়েছে ধীরে মনের মিলন;
তাকে ফিরাবে কেমন করে?
এক সন্ধ্যায়
আকাশে যখন চাঁদ, আর ক্যানেলের জলে,
ঝাউগাছে ঝিরি ঝিরি হাওয়া,
ইডেন গার্ডেনের এক নিকুঞ্জে বসেছিল ওরা।
রাজনীতি, ভবিষ্যের আর হৃদয়ের
অনেক কথার হলো মৃদু বিনিময়;
বিভূতি হঠাৎ অতসীর হাত নিয়ে মুখে তুলে ধরে
চাইল চুম্বনের চির অধিকার।
অতসী শিউরে উঠল
বাড়িয়ে দিল ওর অধরও সরস।

'কিন্তু বন্ধু' কণ্ঠ ওর সচেষ্ট সহজ,
'সমস্ত জগতে তুমি আমার সব চেয়ে প্রিয়,
জীবন পথের সাথী হবার মত পুরুষ তুমিই,
কিন্তু বিয়েতে এ জীবনে আমাদের মিলন হবেনা।
স্বামী যেখানে প্রভু আর স্ত্রী তার দাসী
আইন আর সমাজের চোখে।'
'কিন্তু অসি' বিভূতি বল্লে ওর হাত কোলে নিয়ে,
'তুমি যদি সত্যি ভালবাস মোরে,
এ সব কি তুচ্ছ নয়?'
'না, মিসেস্ বিভূতি ঘোষাল আমি হব না,
আপন সত্তাকে করব না বিলুপ্ত,
করবনা
সামাজিক সংসারমঞ্চের নেপথ্যে প্রবেশ।'

বিভূতি হেসে বলে
'অতসী বোসই তুমি থেক চিরকাল।'
'তা-ও নয়, বসুঘোষাল হবে কমন পদবী।'
বিভূতি নিরুত্তর; অতসী ব'লে চলে,
'দাম্পত্য জীবনের ভোগে
তোমাদের ভাগে অমৃত, বিষ আমাদের।
যে সন্তান মেয়েদের দাসীত্বের জীবন্ত শৃঙ্খল,
তুমি যদি চাও? যার উপর
আমার কোন অধিকারই আইন করবে না স্বীকার।
যদিও প্রাণের আশঙ্কা, পলে পলে দেহক্ষয় মেয়েদেরই সব।
পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।
শাস্ত্র যে দেশের,
সে দেশের মেয়েদের বিয়ে করা পাপ;
যে মেয়ের নিজের উপর আছে শ্রদ্ধা সম্মান,
মা হয়ে সে দেবেনা ধরা
পক্ষপাতী প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে।
বিভূতি হেসে বলে,
'এসব পুঁথির কথা অসি,
যেয়োনা জীবনে খাটাতে,
দুঃখ পাওয়া ছাড়া তাতে কোন লাভ নেই।

তুমি কি আমার এই পরিচয়ই পেয়েছ,
তোমায় দেখব সমাজের অধিকারের দৃষ্টি দিয়ে?
সমাজ যা বলে বলুক
কিছু ক্ষতি নেই,
যেখানে তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি বাস মোরে।'
কিন্তু অতসী শুনল না কোন কথা,
বিভূতির কাতর কোন অনুরোধ।

অতসী আছে বেশ,
হেথা হোথা করছে মাষ্টারী।
পুরুষের অধিকার সে দাবী ক'রে
কাগজে কাগজে লেখে প্রবন্ধ
আগুন অক্ষরে।
অফুরন্ত স্বাধীনতা
ঝ'রে পড়ে চলনে বলনে।
যেন এক বোদলাগা
চঞ্চল ঝিকিমিকি ঝরণার স্রোত।
পুরুষের পাশে গিয়ে বসে বাসে।
কথা কয় গলা চড়িয়ে সমানে।
সঙ্গী থাকলে
অসঙ্কোচ উচ্ছ্বসিত হাসিতে গল্পে
মুখর করে তোলে বাস।
'জেনানা, বাঁধো একদম্'
পাঞ্জাবীটা ধমক খায় কঠিন মধুর।
স'রে স'রে নিজেরে বাঁচায়ে চলেনা পথ,
বরাবর গতি ওর সরল রেখায়।
জাপানী ছাতির খোঁচায়
আর ওর দৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে,
পথিক বেচারা যত দূরে স'রে যায়।

বিভূতি,
হ্যাঁ, তখনও ক্ষীণ আশা ওর মনে আছে লেগে।
পথে দেখা হ'লে বাসে.
সাথে সাথে যায় অতসীর বাড়ী।
একটি দীন হাসি ঠোঁটে।

কিন্তু অতসী করবেনা মন্ত্রপড়া বিয়ে,
আর এমন অনেক বিভূতি
ওকে ঘিরে ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে।

চাটগাঁ থেকে এলো এক লোভনীয় কাজের অফার।
সজল চোখে এক প্রফুল্ল প্রভাতে
নিজেরে ছিঁড়ে নিয়ে ওঠে চিটাগং মেলে।
গাড়ী চলে, নীচে ওর ব্যথিত হৃদয়,
অনেকগুলি প্রিয় মুখ স্মরণ করে,
আর ওর আবাল্যের চিরপরিচিত ক'লকাতা।
গোয়ালন্দে এলো বেলা বারোটায়,
বর্ষার পদ্মা যেন ক্ষিপ্ত;
অতসীর ভয় করে।
ইণ্টারের জানালায়
অতসী দাঁড়িয়েছিল সূর্য্যাস্ত দেখতে।
লাল আকাশ, লাল জল;
তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পদ্মা ভীষণ সুন্দর।
চারদিকে আসন্ন বিষণ্ণ অন্ধকার
মুমূর্ষু গৃহের অপেক্ষমান মৃত্যুর মত।
সহসা,
বায়ু কোণে উঁকি দিলে ছোট কালো মেঘ,
মুহূর্ত্তে ছড়িয়ে পড়ে আকাশ জুড়ে।
দিল হাওয়া জোর,
আর পদ্মা আরম্ভ করলে যেন প্রলয় নাচন,
তরঙ্গের শত বাহু তুলে।
ক্ষণে ক্ষণে ঝলকাল বিদ্যুৎ,
ক্রুদ্ধ সে কালীঢালা জলে
নেচে ফিরতে লাগল মৃত্যু ঘুরে ঘুরে।
আর পদ্মাজয়ী বিশাল জাহাজ
ডুবে গেল চোখের নিমেষে।
হাজারো নরনারী শিশু
আশ্রয় করলে
কুটিল অতল তরল মৃত্যু।

ঢেউয়ে নাচে কালো কালো মাথা
আর উর্দ্ধপানে অসংখ্য বাহু অসহায়।
এক ডাগর শিশু
ভেসে এলো অতসীর কাছে।
মুহূর্ত্ত ও দ্বিধা করলে;
তারপরে শিশুকে বুকে বেঁধে
যুঝতে লাগল ক্ষ্যাপা তরঙ্গের সনে।
সাঁতার ও জানতো ভালোই,
মেম্বার ছিল হেদোর এক সাঁতারের ক্লাবে।
পর্দ্দা ঘেরায় ওর ছিল বিষম আপত্তি।
ওরা তৃণের মতন
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে গেল কোথায় কে জানে!

তখন রাত্রি অনেক,
অতসী চোখ মেললে;
ক্লান্ত চোখ অবসন্ন দেহ।
শুয়ে শুয়ে ভাবে ওর ঠিকানা কোথায়?
ভিজা বালি লাগে পিঠে,
দূরে দেখা যায় আন্দোলিত কাশ,
আর ভেসে আসে জলের ভীষণ গর্জ্জন,
আর কিছু যায় না দেখা।
চারিদিকে হুয়ে পড়া বিশাল আকাশ
একান্ত নির্ম্মল,
তাতে অসংখ্য তারার ঝিকিমিকি হাসি,
বিদ্রূপের মত লাগে অতসীর কাছে।
এই জনহীন চর,
সুমুখে সুদীর্ঘ রাত্রি,
একা অসহায়,
অতসী কেঁপে ওঠে।
তখনও শিশু ওর বুকে আছে লেগে,
কিন্তু সে অসাড়
শীতল শবের মত।
যা কিছু জানিত 'ফার্ষ্ট এড্'
অতি যত্নে ও প্রয়োগ করলে।

ধিকি ধিকি প্রাণ আছে মনে হয়।
অতসী খুলল ওর পরণের বাস,
অর্দ্ধসিক্তও লাগছিল ভিজা কাপড়ে জামায়।
ওর নগ্ন রূপ,
লাবণ্যে সে মোহময় যৌবনে উচ্ছল
চরের অন্ধকারে যেন দেখা দিল চাঁদ।
শাড়ী নিংড়ে
মুছে দিল সযত্নে শিশুরে
জীবনে প্রথম।
উষ্ণ আদরে
জেগে উঠে শিশু লাগিল কাঁদতে।
আনাড়ী অতসী চেষ্টা করে নানা রকম,
ক্ষুধাতুর শিশু তবু সান্ত্বনা মানে না।
বারে বারে ওর বুকে
কী যেন খুঁজে মরে আকুল আগ্রহে।
অসহ্য পুলকে বেদনায়
ভরে ওঠে অতসীর বুক।
কী এক নবচেতনার
সূর্য্যোদয় হচ্ছে ওর মনে।
যে মাতা ব্যাপ্ত ওর প্রতি রক্ত কণায়,
অতসীর বুকে যে মাতা ছিল ঘুমন্ত,
যার বিকাশের মুখে রেখেছিল ও প্রগতির পাথর,
সে আজ উঠল জেগে দুরন্ত উৎসের মত অকস্মাৎ।
ক্ষুধাতুর শিশুটীর স্পর্শে, কান্নায়,
অপূর্ব্ব অনুভূতিতে ওর মন গেল ভরে।
একটি স্তন নিয়ে
ও শিশুর মুখে দিল ধরে
আচ্ছন্নের মত।
মনে হোল, নারীর জীবনে
এই বুঝি সত্য হায়
করুণ পরম।
কিন্তু অতসীর স্তন,
গন্ধমধুহীন সীজন ফ্লাওয়ারের মত।
আকুল হয়ে শিশু কাঁদতেই থাকে।

রজনীর স্তব্ধ আকাশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে
করুণ সে ক্ষুধার্ত্ত কান্নায়।
আর অতসীর বুক
চূর্ণ হয়ে যায়।
ওর এই বয়স পঁচিশ
মনে হোল লগ্ন গেছে অবহেলায় বয়ে।
সেও ত হতো মা,
আজ ওর বুকের আশ্রয়ে এ শিশু যেতনা শুকিয়ে,
চোখের উপর।

সহসা এক কুৎসিত চীৎকারে
সুষুপ্ত পৃথিবীর যেন সুর কেটে গেল:
কাশের বনে গাঢ় অন্ধকারে
অতসী চেয়ে দেখল সভয়ে
—এক কালো পশু
চেয়ে আছে হিংস্র চোখে।
ওর সমস্ত দেহে খেলে গেল ভয়ের বিদ্যুৎ,
মুহূর্ত্তে শিশুকে বুকে জড়িয়ে দিল দৌড়,
প্রথম মানবীর মত নগ্ন, অনাবৃতা।

আকাশ সুনীল—
চাঁদেরে ঘিরে জাগে কোটি কোটি তারা,
অদূরে উচ্চ কলরোল
ধরণীর গলিত স্নেহের,
বইছে খেয়ালী হাওয়া,
পৃথিবী সেই চিরপুরাতন।
নিশীথে এ নদীতীরে আজ
মুছে গেছে সুসভ্য বিজ্ঞানের নূতন জগৎ
বিংশ শতাব্দীর।
বিপন্ন এই ভীত মেয়ে,
এম-এ পাশ ক'লকাতার অতসী বোস নয়;
সে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে শাড়ীতে ব্লাউজে।
চিরন্তন জগতে ও চিরন্তনী ইভা;
কোথায় আদম?
ইভা আজ শরণ চায় তোমার,
দাও তাকে বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়!

হৃষীকেশ মৌলিক

সকল প্রকার চর্ম্মরোগে প্রকৃষ্ট

ল্যাডকো

নিম সাবান

শিশু অঙ্গে নির্ভয়ে ব্যবহার্য্য

সকল বড় দোকানে পাইবেন।

ল্যাড্‌কো : কলিকাতা

মূক দেবতা

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

একশো পনর নম্বর আপ্ রাজসাহী প্যাসেঞ্জার ঈশ্বরদী ষ্টেশনে এক নম্বর প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়াছিল।

বেলা তখন পাঁচটা চল্লিশ। সমস্ত ষ্টেশনটাকে কাঁপাইয়া সগর্জ্জনে আসিয়া আসাম মেল সম্মুখের দুই নম্বর প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইল। ইহারই একখানি রিজার্ভ করা প্রথম শ্রেণীর কামরায় নন্দিকিশোর গ্রামের জমিদারকন্যা গীতা বসিয়াছিল। এই গাড়ীখানা আসিয়া প্ল্যাটফরমের যে স্থানটীতে থামিল ঠিক তাহার সম্মুখে রাজসাহী প্যাসেঞ্জার ট্রেণের একটী জনবিরল তৃতীয় শ্রেণীর কামরার জানালা গলাইয়া মুখ বাহির করিয়া দিয়া একটী সুশ্রী যুবক বসিয়াছিল—এই দিকে অকস্মাৎ গীতার দৃষ্টি পড়িতেই চকিতে তাহার মুখ বিস্ময় ও বেদনায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র বুকখানি সবেগে আলোড়িত করিয়া একটী অতর্কিত দীর্ঘশ্বাস ফাটিয়া পড়িল। দুইটী অচঞ্চল চোখের দৃষ্টি বহিয়া বুকের ভাষা যেন আর্দ্র হইয়া উঠিল।

·· ···এ কি সেই! সেই মুখ, সেই হাত—মাথা জোড়া তরঙ্গায়িত সেই ঘন কালো চুল—সমস্ত তনু ব্যাপিয়া রূপের যে রংটী লেপিয়া আছে, এ কেবল তাহারই ছিল। চোখ দুইটী ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না, তবুও······

তপন—তপন—তপ······

যুবকটী সচকিত হইয়া উঠিল। এই জনারণ্য হইতে কে তাহার পরিচিত নাম ধরিয়া ডাকিতেছে? তাহার উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি চঞ্চল হইয়া উঠিল—দুইটী কাণ সজাগ করিয়া সে সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িল।

তপন—তপন······

চকিতে মুখ ফিরাইতেই তপনের দৃষ্টি নিশ্চল—বিমূঢ় হইয়া উঠিল। কে এই তরুণী, এতদূর হইতে তপন কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, তথাপি সে-ই যে ডাকিতেছে তাহাতেও তাহার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না—এবং এই নিশ্চিত ধারণাটুকু তাহাকে কম কৌতূহলাক্রান্ত করিল না।

তপন······

তপন উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং দ্রুত পদবিক্ষেপে প্ল্যাটফরম অতিক্রম করিয়া উক্ত কামরার পাশে আসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। বিস্ময়াস্ফুট স্বরে কহিল, একি, তুমি······

গীতা ম্লান হাসিয়া কহিল, তবু যা'হোক চিন্‌তে পার্‌লে...

সেই স্বরের প্রতিটি শব্দাঘাতে তপনের বুক দুলিয়া দুলিয়া উঠিল। কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, সত্যই লক্ষ্য করিনি······

গীতা ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমার ভাগ্য······কেমন আছ?

তপন চমকিয়া উঠিল। মনে হইল গীতার এত শুষ্কস্বর যেন সে কোন দিনই শুনে নাই। অপরাধীর মত কহিল, ভালই আছি······তুমি···

গীতা আর একবার তপনের মুখের উপর চোখ দুইটী বুলাইয়া লইয়া তেমনি ম্লান হাসিয়া কহিল, আমার কথা নাই বা জিজ্ঞেস কর্‌লে···কিন্তু, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? উঠে এসো না?

তপন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিনতিকাতর কণ্ঠে কহিল, থাক্ এখুনি ত ট্রেণ ছাড়্‌বে······

তা' ছাড়ুক—এস তুমি······

না······

না! অকস্মাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া খপ্ করিয়া তপনের হাত চাপিয়া ধরিয়া গীতা কহিল, একটা কেলেঙ্কারি না কর্‌লে··· উঠে এস বল্‌ছি · ···

তপন চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পর যেন একরকম জোর করিয়াই কহিল, কিছু দরকার আছে কি?

দরকার ? কিন্তু গীতা প্রায় কিছুই বলিতে পারিল না। অবরুদ্ধ বেদনার গাঢ় বাষ্প অকস্মাৎ দুই চোখ ছাপিয়া সজল হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নিরুদ্ধ অভিমান উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহার কণ্ঠনালির নীচে ভিড় করিয়া জমিতে লাগিল। জনারণ্যের সহস্র কৌতূহলী চোখের কথা মনে পড়িল না—তপনের হাত মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অবুঝ বেদনায় গীতা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তপন উঠিয়া আসিয়া ভিতরে বসিল। সম্মুখে তখনও গীতা তেমনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। এ কান্নার ইতিহাস হয়ত জানাই আছে, তবুও আজ শুধু অপ্রত্যাশিতই নয় আশ্চর্য্য বলিয়াই তাহার বোধ হইল। সে জানে অন্তর ভরিয়া যে আশা, যে কামনা গীতাকে পাইবার জন্য উন্মাদের মত দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা মায়া মরীচিকার মতই একদিন সাহারার শূন্যগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অলীক স্বপ্নসুখের ন্যায়ই একদিন গীতার সম্মুখেই তাহার জীবনের সুখ-কল্পনা গভীর বেদনায় মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তবুও এই অশ্রু......এই মর্ম্মবেদনা......গীতার মমতাভরা সজল নেত্র দুইটীর করুণ দৃষ্টি......

তপন উদ্‌ভ্রান্ত—অবশ—আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পর এই কঠিন নিস্তব্ধতার নিষ্ঠুর বেদনা এড়াইবার জন্যই যেন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া এক সময় কহিল, বাবা কেমন আছেন ?

গীতা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিল, ভা—ল......

বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া টানিয়া-টুনিয়া আবোল-তাবোল বকিয়া অনেকটা সময় কাটান যায় বটে, কিন্তু যেখানে দুইটী তরুণ হৃদয় এক হইয়া যাইবার জন্য পাগল অথচ শুধু অভিভাবকের রক্তচক্ষুর সজাগ দৃষ্টি নিরন্তর নিশ্চিত ব্যর্থতা আনে সেখানে ভাষা আপনা আপনিই মূক হইয়া যায়। কত কথাই না দু'জনার বলিবার ছিল—অথচ বুকভরা বেদনার বাষ্প, অভিমানের ব্যথা, হতাশার অশ্রু—সব মিলিয়া যেন দু'জনকেই বাক্‌হীন, ভাষাহীন করিয়া দিল। ওধারে ট্রেণ ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তপন যেন অনেকটা অব্যাহতি পাইয়া কিঞ্চিৎ সহজভাবে বলিল, এইবার আসি গীতা...

গীতা তাহার অশ্রুব্যাকুল চোখ দুইটির কাতর দৃষ্টি মেলিয়া ছোট করিয়া কহিল, এস......। তপন উঠিয়া দরজা পার হইতেছিল, গীতা কি জানি ভাবিয়া কহিল, শোন......

তপন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু গীতা সহসা কিছু বলিতে পারিল না। অন্তরের ব্যথা ও অভিমান আজ দুর্ব্বার হইয়া তাহাকে যেন উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। একটু পরে নতকণ্ঠে কহিল, এম্-এ পাশের খবরটা কিন্তু আগে আমিই চাই।

বিস্মিতকণ্ঠে তপন কহিল, এম্-এ পাশের খবর !.........এম্-এ দিয়েছি আমি, কে বল্লে তোমাকে ?

গীতার অশ্রুসজল মুখের উপর হেমন্ত-প্রভাতের স্নিগ্ধ রবির ন্যায় সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, আমি জানি···

জান !···কিন্তু তাতেই বা কি ? গরীবের পাশের খবর তো তোমাদের আনন্দ দেবে না, গীতা······

রক্তহীন বিবর্ণ মুখের ওপর তাহার কালো চোখ দুইটি মর্ম্মান্তিক বেদনায় ম্লান হইয়া আসিল। গীতা কি বলিতে গেল, কিন্তু শুধু তাহার ঠোঁট দুইটি বার কয়েক কাঁপিয়া উঠিয়া আবার স্থির হইয়া গেল।

গাড়ী দুলিয়া উঠিল।

তপন অভিভূতের মতো নামিয়া পড়িল।

দীর্ঘ ট্রেণখানি নিস্ফল ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে সর্পিল গতিতে তপনের অভিভূত চোখের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। গীতা তেমনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার দিকে অশ্রুসজল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তপনের চোখ দুইটা ঝাপসা হইয়া আসিল—তাহার পর এক সময় গতিহীন চোখের সীমার বাইরে বিন্দুবৎ ট্রেণখানি মিলাইয়া গেল।

একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া তপন ধীরে ধীরে আপনার কামরায় ফিরিয়া আসিল।

এইবার তাহার দুই চোখ ভারি করিয়া তপ্ত-অশ্রু শ্রাবণ-বারিধারার ন্যায় নামিয়া আসিল। বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির কপাট সন্তর্পণে উন্মোচন করিয়া অতীতের কত সুখ-স্বপ্ন মধুর মমতায় তাহার সিক্ত আঁখিপল্লবের নীচে জমিয়া উঠিতে লাগিল। নিরতিশয় সুখ ও বেদনায় একটি দিনের স্মৃতি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল—সমস্ত অন্তরখানিকে সেই স্মৃতিটুকু পরম সম্ভ্রম

ও গৌরবে ভরিয়া রাখিয়াছে। জীবনে সে অনেক পাইয়াছে —হারাইয়াছেও অনেক। কিন্তু এই দেনা-পাওনার হিসাব খতাইলে সেদিন সে যাহা পাইয়াছিল বোধ হয় তেমন করিয়া কোন দিনই কিছু পায় নাই—এমন কি গীতাও বুঝি তেমন করিয়া তাহার অন্তর ভরিয়া দিতে পারে নাই। বয়স তাহার তখন বা কতই হইবে, এই পাঁচ কি ছয়······জমীদার বাড়ী পূজার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে—আর তাহারই পাশে ছোট একখানি জীর্ণ কুটিরে জগতে তাহার একমাত্র অবলম্বন মা বোধ করি ঠিক তখনই শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবেন। মায়ের সেই অসাড়, অনড় মুখের কঠিন স্তব্ধতা, ম্লান চোখের হীম-শীতল স্থির দৃষ্টি এখনও তাহার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু সে তখন বুঝিতে পারে নাই, সে কি! অবোধ বালক মা, মা, বলিয়া ডাকিয়াই চলিয়াছে। মা নড়ে-না চড়ে না—তপন অধীর হয়, দুই হাত দিয়া মার মৃত্যু-শীতল মুখখানি সজোরে ঝাঁকি দিয়া আবার ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে মা—মা—ওমা······কে তাহার উত্তর দিবে? মৃত্যু যাহার সকল চেতনা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, পুত্রের সকরুণ স্নেহের আহ্বান কি করিয়া তাহার ভিতর প্রাণের স্পন্দন জাগাইবে? তপন বোঝে না—অধৈর্য্য হয়—কাঁদে। হয়তো সারাদিন খাওয়া হয় নাই, ক্ষুধায় কাতর শরীর ক্লান্ত হয়, চোখ দুইটি বুজিয়া আসে·· তারপর এক সময় মা'র বুকের উপর মাথা রাখিয়া অবুঝ তপন ঘুমাইয়া পড়ে। দিনের আলো নিভিয়া আসে। কিসের একটা গোলমালে তপন জাগিয়া ওঠে—দেখে মা নাই। তাহার কাতর চোখ দুইটি ব্যাকুল হইয়া উঠে—আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠে সে······

তপনকে কে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়। অসীম স্নেহ-স্পর্শে তাহার ছোট্ট সুন্দর মুখখানিকে গভীর মমতায় বুকের ওপর চাপিয়া ধরে—তপন সে স্পর্শ অনুভব করিতে পারে—মুখ তুলিয়া চায়......সে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলে, এই যে মা! ছিঃ, বাবা, বেটা ছেলে কি কাঁদে! সে স্বরে কি ছিল তাহা সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু এমনি করিয়াই বুঝি তাহার মা ডাকিত! তপন বিস্মিত হয়—আশ্চর্য্য হয়! একে কখন সে দেখেনি, মায়ের মত এর মুখ নয়—তবুও সে চুপ করিয়া তাহার বুকে পড়িয়া থাকে, কাঁদিবার কথা ভুলিয়া যায়।·········আর ভুলিয়া যায়, এ ছাড়া তার আর মা ছিল কি না······

গীতাই বা তখন কতটুকু! কিন্তু ঐ বয়সেই গীতাকে তাহার ভাল লাগিত। দু'জনে একসঙ্গে খেলিত, বেড়াইত —কত কি করিত···যেন দুইটি আনন্দ-ঝর্ণা এক সুরে বহিয়া চলিয়াছে। দেখিয়া দেখিয়া গীতার মা বাবা হাসিতেন। গীতার মা বলিতেন, তপনের সঙ্গে গীতার বিয়ে দিলে বেশ হয়! গীতার বাবা হাসে······সে হাসির অর্থ তাহারা বুঝে না, তবুও দুইজন দুইজনের দিকে তাকাইয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠে······

সবই যেন আজিও আছে—কিছুই হারায় নাই, কিছুই খোয়া যায় নাই! সেই তপন—সেই গীতা। দুইটি স্বপ্নবিভোলা তরুণ তরুণীর কলহাস্যে উৎফুল্ল জমিদারদম্পতি আজিও বুঝি আনন্দে তেমনি হাসিয়া উঠেন! দেবতার রাজ্যে তখনও দৈত্যের উৎপাত নামিয়া আসে নাই—প্রেমের রাজ্যে তখনও বৈভবের দারিদ্র্য দেখা যায় নাই। জমিদারদম্পতি তখন দুইটি হৃদয় ভাজিয়া চুবিয়া এক করিয়া, জমীদারগৃহে একটি সুখ-রজনীর কল্পনা করিয়া বোধ করি দিন গণিতেছে। স্বপ্ন—স্বপ্ন—শুধু একটা স্বপ্ন। স্বর্গ দেখে নাই কভু সে—তবুও তপনের দুই চোখের সামনে সেই অদেখা স্বর্গের অতুলনীয় রূপ কুহকিনীর মায়ায় ফুটিয়া উঠে। গীতা—গীতা—তাহার গীতা! সে স্বপ্ন দেখে—ঘুমঘোরে গীতার হাসিভরা ঠোঁটে চুমা দিতে গিয়া জাগিয়া উঠিয়া গভীর বেদনায় ম্লান হইয়া যায়। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে হতাশা বাজিয়া উঠে। মনে হয় বুঝি এমনি ব্যর্থতায় এ ভালবাসা শেষ হইবে। আর ঘুম হয় না। দীর্ঘ রজনীর সুদীর্ঘ প্রহরগুলি বিনিদ্র কাটাইয়া দেয় সে। প্রভাতে উঠিয়া দেখে ঠিক জানালার নীচে বাগানের খালি বেঞ্চটায় গীতা আনমনে বসিয়া আছে—তাহার চোখে-মুখে অনিদ্রার ক্লান্ত ছাপ সুস্পষ্ট। তপন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সুখাবেশ কণ্ঠে ডাকে, তুমি রাত্রে ঘুমাওনি গীতা······

গীতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দেয়, তুমি?

আমিও······দুইজনেই হাসিয়া উঠে। সে হাসির মদির সুখ আজিও তাহার বুকের তলে মাতালের মতো ছুটাছুটি করে।

কিন্তু তপনের আশার শেফালি ঝরিয়া পড়ে। জমিদার গৃহিণী একদিন তা'র মার মতই অতর্কিতে কোথায় চলিয়া যান। গীতা ও সে কাঁদে। নিজের মার মৃত্যু-বেদনা সে কখন অনুভব করে নাই, পরের মার মৃত্যুতে সে আজ বুঝিল মাতৃহারার কী ব্যথা। তপনের বুক ভাঙ্গিয়া গেল.....

তবুও দিন আসে দিন যায়। একটা রঙীন আশার অমূলতা অবলম্বন করিয়া গীতা আর সে স্বপ্ন রচনা করে।

কিন্তু সে স্বপ্নের মতই শূন্যে মিলাইয়া যায়...

কোথাকার কে মোহিতরঞ্জন আভিজাত্যের বিপুল জৌলুস লইয়া জমিদারগৃহে সোরগোল বাঁধাইয়া দিল...... সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের রাজ্যে ঐশ্বর্য্যের সমাদর পড়িয়া যায়। বোধ করি জমিদার শিবপ্রসাদ বাবু তাঁহার ছোট্ট গীতার কথা ভুলিয়া যান, তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রীর কথাও মনে করিতে পারেন না, একদিনের কল্পনা ঐশ্বর্য্যের বিপুল সমারোহে কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া যায়। তপন শোনে মোহিতের সঙ্গে গীতার বিয়ে...চমকিয়া উঠিল সে! বুক বেদনায় ভাঙিয়া আসিল—বিশ্বাস করিতে পারিল না। এত আয়োজন সব কি মিথ্যা...গীতার চোখদুটির ভাষাও কি ভুল। তপন অস্থির হইয়া উঠিল। কাহাকে জানাইবে এ মর্ম্মবেদনা। গীতা আজ অন্তঃপুরে অদৃশ্য...তপন আজ গীতার পক্ষে নিষিদ্ধ। দীর্ঘ বিশ বছরের নিবিড় পরিচয় পিতার ক্রুদ্ধ শাসন আজ মুছিয়া ফেলিতে চায়। অথচ তপনের দুই চোখ ভরিয়া জল উছলিয়া উঠিল...এই ক্ষুদ্র গৃহে এমন কোন্ সুহৃৎ আছে যে তাহাকে সত্য কথাটি বলিয়া দিবে?

কিন্তু শিবপ্রসাদ বাবুই তাহাকে সব জানাইয়া দিলেন, অনেক কথা বলিয়া শেষে তিনি কহিলেন, নানা কারণে তপনের এখানে থাকা প্রীতিকরও নয় বাঞ্ছনীয়ও নয়...গীতারও বয়স হইয়াছে ..কিন্তু তপন গরীব না হইলে এর চেয়ে সুখের আর কি ছিল ইত্যাদি...

গরীব! তপনের হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়িয়া গেল। গরীব ...কিন্তু সত্যই ত সে গরীব...নালিশ করিবে কি?

শিবপ্রসাদবাবু তপনকে কিছুদিনের জন্য একটা মাসহারা দিতে চাহিলেন, কিন্তু তপন কিছুতেই তাহা লইতে স্বীকৃত হইল না। জীবনের এই অত্যন্ত নিষ্ঠুর-সত্য-অভিজ্ঞতা লইয়া সে বাহির হইল পথে—মনে হইল আর কেন? বিচিত্র জীবনের আর জের টানিয়া আরও অজানা বেদনা বাড়াইয়া কি হইবে? তার চেয়ে...

নিষ্ঠুর গীতা তাহার সকল নষ্ট করিয়া দিল। বুঝিল এ তাহার অসম্ভব কামনা—তবুও গীতার সেই কমনীয় মুখ তাহাকে নিভৃতে কত আশার কথাই না শোনাইয়া গেল। বেদনার কথা ভুলিয়া গেল সে, পৃথিবীর মায়াহীন নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিতে পারিল না আর...তাহার অন্তর বাহির ভরিয়া জাগিয়া উঠিল কেবল গীতা—গীতা—

গরীব! সেই ভাল, সেই ভাল। সে দেখাইবে গরীবও বড় হইতে পারে। শিবপ্রসাদবাবু গরীব বলিয়া যাহাকে ঘৃণা করিয়াছিলেন, জীবনের প্রতি রক্তকণা দিয়া সে দেখাইয়া দিবে মোহিতের চেয়ে সেও অপ্রেয় নয়...গীতার অনুপযুক্ত নয়...

কিন্তু ততদিন কি গীতা...

তপন চমকিয়া উঠে। অকস্মাৎ তাহার মুখ কাল হইয়া যায়—একটা বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস গভীর হতাশায় নামিয়া আসে।

কে জানে হয়ত তাহার সাধনা...

কিন্তু কই কোন আয়তির চিহ্নই ত তাহার অঙ্গে দেখা গেল না। তবে কি...

তপনের চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া ইঞ্জিনের সুতীব্র হুইসিল বাজিয়া উঠিল এবং অনতিকাল পরে সশব্দ ধীর মন্থর গতিতে ট্রেণ চলিতে লাগিল।

কয়েক মাস পরের কথা।

প্রাতঃকাল। শিবপ্রসাদ বাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। গীতা সহাস্যমুখে প্রবেশ করিয়া হাতের গেজেটটা পিতার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া কহিল, দেখেছ বাবা, তপন দা' এম্-এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হ'য়েছে!

শিবপ্রসাদ বাবু প্রসন্ন হাসি হাসিয়া কহিলেন, তোর ভারি দুঃখ হচ্ছে, না?

দুঃখ! না বাবা, রাগ হচ্ছে—এমন সুখবরটাও তপনদা' দিলে না...

শিবপ্রসাদবাবু কন্যার অভিমানাহত মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তোদের কথা হয়ত মনেই নেই...

গীতা মলিন হইয়া গেল। ম্লান কণ্ঠে কহিল, মনে নেই বাবা.. তপন দা' ভুলতে পারে আমাদের ।

শিবপ্রসাদবাবু তেমনিভাবে কহিলেন, এমন-ও ত লোকে ভুলে যায়।

গীতার মুখের রক্ত কে যেন চুষিয়া লইল।

শিবপ্রসাদ বাবু কন্যার বিবর্ণ মুখের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু ওর বিলেত যাওয়ার কথা হয়ত তুই এখনও শুনিসইনি...

গীতা চমকিয়া উঠিল, বিলেত!

হ্যাঁরে—হ্যাঁ। এই ত আস্‌ছে মাসের প্রথম সপ্তাহে যাবে। সুশান্ত ওর বন্ধু হয় কিনা, ওরই কাছে শুনলেম, ষ্টেট স্কলারসিপ্‌ পেয়েছে তাই...

গীতার বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত বেদনা গুমরিয়া উঠিল। হায়রে আজ আর সে তপনের কেউ না....একটা ছোট খবরও সে...হায়, আজ যদি মা থাকিতেন...!

কিন্তু পিতার নিকট লুকাইবার জন্যই গীতা কহিল, তোমার চা-টা নিয়ে আসি বাবা?

শিবপ্রসাদ বাবু সংবাদপত্রখানা পাশে রাখিয়া দিয়া গীতার মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, না মা আজ আর চা-টা খাব না—পেটের সেই ব্যথাটা আজ যেন আবার বেমন বেশী বোধ হচ্ছে। তার চেয়ে একটু আদা আর এক গ্লাস জল দিস্‌!

তাই আনি বাবা, বলিয়া গীতা গেল এবং অনতিকাল পরে একখানি ছোট রেকাবিতে করিয়া কয়েক কুচি আদা ও এক গ্লাস জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

শিবপ্রসাদ বাবু কন্যার হাত হইতে আদা ও জল লইয়া খাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, মোহিতকে এইবার লিখে দিই মা—ওরা আসুক...

গীতা চঞ্চল হইয়া উঠিল, কহিল থাক্‌ না বাবা, দিন কতক!

কিন্তু ওরা বড্ড তাড়াতাড়ি কচ্ছে—বড় ঘরের ছেলে, খেয়ালের ত অন্ত নেই মা!...বুড়ো হয়ে গেছি, আমিই বা আর ক'দিন বল্‌, যাবার আগে তোকে ওর হাতে দিয়ে যেতে পারলে...আমি বলি—

গীতা নিরুত্তরে মাথা নীচু করিয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুল কার্পেটের উপর একান্ত মনোযোগের সহিত ঘষিতে লাগিল।

শিবপ্রসাদ বাবু কয়েক মিনিট ধরিয়া কন্যার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বোধ করি একটু হাসিলেন। তারপর পরম স্নেহে কহিলেন, কিন্তু তোর যদি মত নাই থাকে ...আর গরীব হ'লেও তুই যদি তপনকেই...

গীতা বেদনায় নীল হইয়া উঠিল—কে যেন তাহার হৃৎপিণ্ড ধরিয়া সজোরে টান মারিয়াছে। কিন্তু একরকম জোর করিয়াই আনতকণ্ঠে কহিল, না বাবা, তোমার অবাধ্য মেয়ে আমি নই। ভাল বুঝে যেখানে তুমি...কিন্তু অবাধ্য অশ্রু আসিয়া অকস্মাৎ তাহার গলা রুদ্ধ করিয়া দিল এবং বোধ করি পিতার নিকট হইতে তাহাই গোপন করিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

শিবপ্রসাদ বাবুর ঠোঁটের কোণ বহিয়া একরাশ হাসি ঝরিয়া পড়িল, বাব্বা মেয়ে! মরবে, তবু মুখ খুলবে না...

নন্দিকিশোর গ্রামের জমিদারগৃহে সেদিন আনন্দের সমারোহ পড়িয়া গিয়াছিল।

বাহিরের হলঘরে সকন্যা জমিদার শিবপ্রসাদ বাবু বসিয়া ছিলেন। বাহিরে মাঘের সুনির্মল প্রভাতী আকাশ হইতে গলিত সূর্য্যকিরণ শিশুর হাসির মত প্রশান্ত স্নিগ্ধতায় চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শিবপ্রসাদ বাবুর অন্তর বাহির যেন আজ আনন্দে পরিপ্লাবিত।

অকস্মাৎ তিনি গীতার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, তোমাকে কিন্তু খুসী দেখা যাচ্ছে না গীতা......

পিতার স্নেহময় স্বরে গীতার চোখ দুইটী সজল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিল, তোমার ঝাপ্‌সা চোখের ভুল বাবা...

শুনিয়া শিবপ্রসাদ বাবু হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, কিন্তু তোর চেয়েও যে এ চোখের দৃষ্টি সহজ মা!

গীতা হাসিয়া কহিল, তা' হলে আর...চশমা নিতে না

বাবা! আসল চোখের দৃষ্টি ত হারিয়েছেই, চশমা নিয়ে এখন কেবল ভুলই দেখ……

ওরে পাগলী, মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে! আমি কি কখন ভুল দেখি…আমার এই ঝাপ্‌সা চোখের কাঁচের দৃষ্টি আজ যা'কে বনবাদাড়ে টেনে আন্‌ছে, তুই কিন্তু তা'কে দেখ্‌লে খুসীই হবি মা—তখন আর বল্‌বি নে যে আমি ভুল দেখি… আমি……

গীতার সমস্ত মুখখানি সিমূল ফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। আরক্তকণ্ঠে কহিল, যাও বাবা, তুমি ভারি দুষ্টু… আমি বুঝি তাই বলছি……

কি যে বলছিস্ গীতা, সে আজ তোর মা বুঝত বেশী—আর খুশীও বুঝি তাঁর মত কেউ হতো না রে… ..আজ সে নেই, তাই আজ আমার মুখের কথা, আমার বুক ভরা কত বেদনার কথা, কিছুই বলতে পারছিনে ··সে যদি থাকতো!… শিবপ্রসাদ বাবুর চোখের কোণে কি যেন চক্‌ চক্‌ করিয়া উঠিল। কয়েক মিনিট নীরবে থাকিয়া একটি অনতিদীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া তিনি কহিলেন, কিন্তু এত দেরীই বা হ'বে কেন—ট্রেণ ত অনেকক্ষণ গেছে, এতক্ষণও আসে না কেন? তবে কি ষ্টেশনে গাড়ী যায় নি? যা ত মা, দেখ্‌তো তোর দেওয়ান কাকা ফিরেছে নাকি?

গীতা উঠিয়া গেল। কিন্তু বাহিরে গিয়া দেখিবার মত সাহস বা স্পৃহা তাহার আর হইল না। পিতা জানিয়া শুনিয়া নিজ হাতে আজ যে শাস্তি তুলিয়া দিতেছেন……না, না, যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা বহিবার শক্তি তাহার থাকে। নিজের সুখের জন্য যেন সে স্নেহময় পিতার বুকে আঘাত না করে……তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক……

কিন্তু তপন—তপন……গীতার দুই চোখ বহিয়া অবিরল ধারায় তপ্ত অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। দুই হাতে সজোরে বুক চাপিয়া ধরিয়া অসীম যন্ত্রণায় সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হয়ত সে ভুল বুঝিবে…ভাবিবে…না—না—ওগো না—না তুমি ভুল বুঝিও না, আমি তোমারই—তোমারই… কিন্তু কেই বা জানিবে তাহার এ বেদনার গোপন ইতিহাস—তপন ত জানিতে পারিবে না…তিল তিল করিয়া যাহার জন্য সে পুড়িয়া মরিতেছে, প্রাণের মর্ম্মবেদনা দিয়া যে পূজার নৈবিদ্য হৃদয়ের নিভৃত অন্তরালে সে সাজাইয়া রাখিয়াছে—তাহাত তাহার চোখে পড়িবে না! সে দিনের অশ্রু তা'র কাছে একটা উপহাসের মত হইয়া পড়িবে! সে চোখ ফিরাইয়া লইবে—দুইটী চোখের ধারা বহিয়া না জানি ঘৃণার কি পঙ্কিল হাসিই উপচিয়া পড়িবে…অবিশ্বাসিনী সে…তপন—তপন—তপন, একবার কি তুমি আসিতে পারনা? অকস্মাৎ একদিন যেমন সেদিন দেখা দিয়াছিলে তেমনি করিয়া কি আর একবার দেখা দিতে পার না?…সেদিন কত কথা বলিবারই ছিল, তুমি বলিতে দাও নাই—ঘৃণা করিয়াই শোন নাই—এই বুক ভরিয়া কি ভালবাসার……

গীতা—গীতা—ওরে, এদিকে আয় এদিকে আয়, দেখে যা কে এসেছে…

গীতা চমকিয়া উঠিল। মুখ রক্তহীন পাংশু হইয়া গেল। বুকের ভিতর যে স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাই যেন জীবনের গতি রুদ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল, শুষ্ক চোখ দুইটিতে আবার জলধারা নামিয়া আসিল।

মোহিত……জীবনের অর্ঘ্য আজ প্রাণের বিনিময়ে নিঃশেষে তাহার হাতে তুলিয়া দিতে হইবে…

এই দেখো কেমন বোকা মেয়ে—বোঝে না যে ছেলেদের ভালর জন্যই বাপ্‌কে কঠোর হ'তে হয়……জানে না যে তোমাকে অমন ক'রে আঘাত না কর্‌লে হয়ত তোমার পাশ করাই হোতো না…বুঝ্‌লে না, ওরা মনে করে, হাঃ, হাঃ, হাঃ, বাপগুলো বুঝি এমনি কঠোর—এমনি অন্ধ…কিছু দেখ্‌তে পায় না, বোঝে না…বুঝ্‌লে না তপন!

কখন পিতা আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছেন তাহা গীতা লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু ঐ একটি নাম—সেই একটি পরিচিত নাম শুনিয়া গীতা চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার আড়ষ্ট কণ্ঠ হইতে একটা বাষ্পোচ্ছ্বাসের মত স্খলিত হইল, বাবা……

শিবপ্রসাদ বাবু হাসিয়া ফাটিয়া পড়িলেন, কেমন অন্ধরে পাগলি, আমার ঝাপসা চোখের ভুল, না? আমি দেখতে পাইনে, না? হা-হা-হা…তপন বুঝ্‌লে না, ও ভেবেছিল, বুঝি মোহিতই আস্‌ছে……আরে সে কি আস্‌তে পারে? ওর মা যে ওকে তোমার হাতেই দিয়ে গেছে! সে থাক্‌লে…… অকস্মাৎ তাঁহার স্বর ভারি হইয়া রুদ্ধ হইয়া গেল, হাসি-ঝল্‌-মল্‌ চোখ দুইটি অশ্রুতে অশ্রুতে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল এবং বোধ করি অসম্বরণীয় অশ্রুকাতর চোখ দুইটির ব্যথা লুকাইবার জন্যই তিনি দ্রুত পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সাহা

অভিনন্দন

শ্রীমতী রুবী বন্দ্যোপাধ্যায়

১

হে বন্ধু, হে দয়িত, যদিও আমি জানি যে তোমার আমার মধ্যে কত প্রভেদ তবু আমার মন তা মেনে নিতে রাজী নয়; কারণ কত নিদ্রাবিহীন ত্রিযামা রজনী আমরা দুজনে একত্রে জেগে কাটিয়েছি এবং পাখীর গান শুনেছি; বসন্তের দক্ষিণা বাতাস আমাদের হৃদয় এক সময়েই স্পর্শ করেছে।

২

হে প্রিয়, যদিও তোমার আনন উজ্জ্বল আলোকে ভাস্বর ও দীপ্যমান্, আর আমার বদন সাঁঝের ঘনায়মান্ অন্ধকারের নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন, তবু আমাদের মিলনের গোপনক্ষণটি আনন্দের মাধুর্য্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে, কারণ যৌবনের মহাপ্লাবনের ঘূর্ণীতে নৃত্য করতে করতে আমরা উভয়ে পরস্পরের অতি নিকটে এসে পড়েছি।

৩

হে সখা, তুমি তোমার রূপাতীত সৌন্দর্য্যের দ্বারা, মহিমার দ্বারা এই বিপুল বিশ্বকে জয় করেছ আর আমি ম্লানমুখে নতনেত্রে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু তোমার উদার মহিমান্বিত জীবনের একটু হাওয়া এসে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে গেছে এবং আমাদের দুজনের মধ্যে অন্ধকারের যে কালো রেখা রূপায়িত হয়ে উঠছিল তাকে দ্যুতিমতী উষার নবারুণ রাগ স্পর্শে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে।*

---

* ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসের মর্ডার্ণ-রিভিউ পত্রিকায় "বিশ্বভারতী নিউস" হইতে পুনর্মুদ্রিত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা "Greetings" অবলম্বনে লিখিত।

বিদায়ের দান

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়

কি তুমি এনেছ দিতে, পরম আত্মীয়—
স্বপ্ন-সহচরী ;
কোন্ ফুল, কোন্ গান, কোন্ ভাষা হ'বে রমণীয়
বিদায়ের গোধূলি বেলায়,
আজি যবে সুদূরে মিলায়
তৃপ্তিহীন স্বপ্ন কমনীয়।

২

যে গানের সুরে মোরা মিলেছি দু'জনে
পূর্ণ কুতূহলে,
দু'জনার ব্যবধান ভেঙেছে বিজনে
হৃদয়ের সিক্ত আঙিনায়,
বৈশাখের নব পূর্ণিমায়,
সে সুর লবনা আজ মনে।

৩

যে ফুল শুকায়ে গেছে দু'জনার ঘ্রাণে—
গন্ধে কামনার
কত স্বপ্ন পুষ্পসম ফুটিয়াছে প্রাণে,
মেঘে সুপ্ত মৌন অন্ধকারে,
জনমের কোন্ স্মৃতিপারে,
আজ যেন সেও নাহি টানে।

৪

আজি দু'জনার মাঝে যাহা মিলিলনা,
রয়ে গেল ভুল,
জীবনের অসঙ্গতি, যাহা ভুলিল না—
স্বপ্ন মাঝে ব্যর্থ-স্বপ্ন সম,
তারে দাও ভরে' প্রিয়তম
বিদায়ের স্নেহ অর্ঘ্যকণা।

অবোধ

শ্রীসুশীল জানা

...বধূ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নূতন কিছু নয়—এমনটা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

রাজনারায়ণ শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময় কৌশল্যা ডাকিয়া বলিলেন, রাজু, বৌমাকে এই হাতে তুলে দিয়ে যা বাবা।

রাজনারায়ণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—বলিল, রোজ রোজ আমি ওসব পারিনে মা। পারত তুমি তুলে এনে খাওয়াও—না হয় থাক উপ'সে।

কৌশল্যা হাসিয়া বলেন, ছেলে মানুষ—এই চৌপ'র রাত এমনি উপ'সে পড়ে থাকবে! তুলে দিয়ে যা বাবা। আমিই তুলে আনতাম—কোমরে বাতটা যে আজ আবার...

রাজনারায়ণ যাইতে যাইতে গর্গর্ করিয়া বলিল, রোজ কোলে ক'রে ভাতের কাছে বসিয়ে দিয়ে আসতে হবে—এবার থেকে ওসব আমি আর পারব'না ব'লে দিলাম। এই শেষবার...

রাজনারায়ণ ক্রুদ্ধ পদবিক্ষেপে বধূর উদ্দেশ্যে ওপাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

কৌশল্যা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিলেন। কিন্তু সহসা ওপাশের ঘর হইতে রাজনারায়ণের কঠিন কণ্ঠস্বর আর বধূর ফুঁপাইয়া ক্রন্দন—এই দুইটা তাঁহাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। শঙ্কাভরা কণ্ঠে বলেন; কি হ'লোরে, রাজু?

ক্রুদ্ধ রাজনারায়ণ প্রথমটায় হুঙ্কার ছাড়িয়া নিদ্রিতা বধূর একটা হাত ধরিয়া টান মারিয়া খাটের উপর হইতে নীচে আনিয়া ফেলিয়াছিল। বধূ চোখ ঘসিতে ঘসিতে দ্বিতীয়বার কাঁদিবার উপক্রম করিতেই রাজনারায়ণের উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, আরে ছি ছি, কাঁদে কি? খেয়ে ঘুমুলেই...

বধূ তখন পুনরায় মেঝেতে শুইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। বিব্রত রাজনারায়ণ বলিল, আরে আরে, ফের শোও কেন! ও—মা, তুমি পারত এর ঘুম ভাঙাও—আমি পারব'না। রাজনারায়ণ বিরক্ত হইয়া উঠিল।

কৌশল্যার আদেশ কিন্তু সমান ভাবেই রহিল।

অগত্যা নিত্যকারের প্রথামত বধূকে কোলেই তুলিতে হইল।

কিন্তু সেসব দিন বহুদিনই গত হইয়াছে। সে রাজনারায়ণও নাই আর সে নিদ্রালস বধূটিও নাই। যৌবনের রাজনারায়ণকে হয়ত চিনিতে পারা যাইতে পারে কিন্তু মৃন্ময়ী বলিয়া কোন নিদ্রালস বধূকে এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সেই বধূটিকে কোনদিন শ্বশ্রূ কাজ শিখাইতে যাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। বধূর অকর্মণ্যতায় বকিয়া ঝকিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িতেন—বধূ নীরবে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছে। কৌশল্যা বলিতেন, তুমি ঘর ক'রতে পারবে না বাছা -এ আমি ব'লে দিলাম! তিনি উত্তোরত্তোর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন—প্রশ্নজালে বধূর নিষ্কৃতি ছিল না। কিন্তু যাহার জন্য এই সমস্ত সেই বালিকাটি তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে নির্ব্বোধ নয়ন মেলিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। কৌশল্যা শেষ পর্য্যন্ত হাসিয়া ফেলিতেন—বধূর কপোলে চুম্বন দিয়া বলিতেন, শেষ পর্য্যন্ত কেঁদে ফেল্লি মা! এ সব যে শিখ্তে হবে· আমি মরে গেলে তখন তোকেই যে এসব দেখতে হবে মা!

কৌশল্যা গতাসু। সময়ান্তরে তাঁহার সেই নিদ্রালস বধূ মৃন্ময়ী, যাহাকে এক সময়ে ঘুম ভাঙাইয়া খাওয়াইতে হইয়াছে, ক্রন্দন থামাইবার জন্য আদর করিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিতে হইয়াছে—সেই বধূটি বিশৃঙ্খল সংসারের মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে সক্ষম হইয়াছে এবং সে শৃঙ্খলা হয়ত স্বয়ং কৌশল্যাও আনিতে

পারিতেন না। কিন্তু জীবনের মধ্যে একটা সময় আসিল যখন রাজনারায়ণ অনুভব করিল, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই এবং মৃন্ময়ীরও থাকা উচিৎ নয়। রাজনারায়ণের বার্দ্ধক্যের এই নির্ব্বিকার ঔদাস্যের ভাবটুকু মৃন্ময়ীর নিকটে তখনো কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অকিঞ্চিৎকর বিষয়।

এই জিনিষটা যে মৃন্ময়ীর মধ্যে দোষাবহ ত্রুটি—ইহা রাজনারায়ণ লক্ষ্য করিল সেইদিন, যেদিন বার্দ্ধক্যের প্রথম ধাপটায় পা বাড়াইবার সময় এবারের মত শেষবার সংসারের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল।

বৃদ্ধ রাজনারায়ণের শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না। সকাল হইতেই পুঁথিপত্র গুটাইয়া শয়ন করিয়াছিল। অন্যদিন এ সময়টায় তাহাকে সযত্নে রক্ষিত রামায়ণ অথবা মহাভারতখানি পড়িতে দেখা যাইত। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া আসিয়াছে—তাই অস্পষ্ট অক্ষরটাকে লইয়া একটু বিব্রত ভাবেই সুরে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সেদিন টানিয়া টানিয়া সুর করিয়া পড়া আর মাঝে মাঝে কাশীর শব্দ—ইহার কোনটাই ছিল না।

সেই জন্য মৃন্ময়ী একটু বিস্মিত হইয়াছিল। যে লোকটি সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত, এমন কি কোনদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পুঁথির মধ্যে নিবিষ্ট থাকিত—তাহার হইল কী! মৃন্ময়ী অসংখ্য গৃহ-কর্ম্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শ্বশুরের আজ হ'লো কি বৌমা!

সহকারিণী বধূ উত্তর দিল, কেমন ক'রে ব'লব মা! বাবার গলা ত আজ শুনতে পাইনে বড়! ··

এক সময়ে উদ্বিগ্ন মৃন্ময়ীর প্রশ্নে রাজনারায়ণ উত্তর দিয়াছিল, শরীরটা আজ খারাপ বৌ। বাতের ব্যথাটা যেন আজ আবার বেড়েচে।

শম্ভুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সে এসে একটু গরম তেল মালিস্ ক'রে দেবে—বলিয়া মৃন্ময়ী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই রাজনারায়ণ বলিল, বৌ—আমাকে একটু রামায়ণ পড়ে শোনাতে পার?

মৃন্ময়ী সাশ্চর্য্যে বলিল, আমি শোনাব রামায়ণ! সময় কোথা! আজ ভোরে বড় খোকা এসেচে তাকে তাড়াতাড়ি ভাত দিতে হবে, তারপর ছেলে-মেয়েরা, তারপর···

মৃন্ময়ীকে সংসারের বিরাট কার্য্যতালিকার ফর্দ্দ উত্থাপন করিতে দেখিয়া রাজনারায়ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল বৌ, খালি সংসারটাই চিন্‌লে। এবার ওসব বৌমার হাতে ছেড়ে দাও বৌ—পরকালের চর্চ্চা একটু কর। আর কদিন·· ওসব কি আর তোমার সাজে! যাদের সাজবে তাদের হাতে সংসার ছেড়ে দাও। এবার চল বরং কোথাও বেরিয়ে পড়ি

মৃন্ময়ী হাসিল—ভাবিল, বাতুল হইল নাকি! মৃদু হাসিয়া বলিল, এ সংসার ছেড়ে কোথাও কি আমার যাবার যো আছে। ছেলেমানুষদের হাতে সংসার ছেড়ে দিলে তারাই বা চালাতে পারবে কেন!

রাজনারায়ণ মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কেন পারবে না! তুমি যখন এ সংসারে আস তখন তুমি কত বড় ছিলে! আমিই তখন কোলে ক'রে ভাতের কাছে বসিয়ে দিয়ে আসতুম তোমাকে। সেই বয়সেই তুমি সংসার গুছোতে পারলে বৌ, আর বৌমা এত বড় হ'য়েচে—পারবে না! ওসব এবার ছেড়ে দাও ছেলে-মেয়ের হাতে।

বধূ তখন দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মৃন্ময়ী সেই দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, কি গো বৌমা, সংসার চালাতে পারবে ত? তোমার শ্বশুর ব'লচেন তাই—এবার আমাকে ছুটি দাও মা।

হঠাৎ যেন মৃন্ময়ীর কি কাজ মনে পড়িয়া গেল। সমস্ত কথা-বার্ত্তা ওইখানেই চাপা দিয়া ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ নীরবে শুইয়া থাকিয়া বাতের যন্ত্রণায় অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া পাশ ফিরিতেই বধূ বলিল পা দুটো একটু টিপে দেব বাবা?

রাজনারায়ণ উত্তর দিল, না মা বরং একটু রামায়ণ পড়ে যদি শোনাতে পারতে ····ওসব না হয় থাক মা, তুমি যাও—ওদিকে হয়ত কাজ-টাজ পড়ে আছে তোমার।

রাজনারায়ণের এ সমস্ত অভিমান করিয়া বলা। সংসারে কাহারও নিকটে আর তাহার কিছুমাত্র চাহিবার নাই। সে যেন হঠাৎ একজন বাহিরের লোক আসিয়া পড়িয়াছে!···

মৃন্ময়ীও আজ অবহেলা করিয়া গেল! সে আশা করিয়াছিল, মৃন্ময়ী হয়ত নিজেই তাহার আজিকার

অসুস্থ শরীরটার উপরে পূর্ব্বের মত দরদ ঢালিয়া দিবে। কিন্তু মৃন্ময়ীর মধ্যে সে সবের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, অধিকন্তু তাহার একটা অনুবোধ পর্য্যন্ত রাখিল না। সে মৃন্ময়ী আর নাই—যেন বহু দূরে সে সরিয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ অতীতের দিকে লোভাতুরের মত ফিরিয়া তাকাইতেছিল।

শরীর ভাল নয়—এই অজুহাত দিয়া রাজনারায়ণ অভিমানভরে সারা দিনটা উপবাসে কাটাইয়া দিল। মৃন্ময়ী সেই যে একবার ..াসিয়াছিল তাহার পর কাজের চাপে আর একবারও এ পাশ মাড়াইতে পারে নাই। এইটা কিন্তু রাজনারায়ণকে অভিমান সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিতেছিল। বালকের মতই বার বার রাগ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, এ সংসারের মধ্যে আর নয়—জলস্পর্শও করিব না।

বধূ রাত্রে খাবার দিতে আসিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গেল—রাজনারায়ণ ঘুমাইবার ভাণ করিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল।

মৃন্ময়ী সমস্তই শুনিল—একটু আশ্চর্য্য হইল। ভাবিল, এমনটাত কোন দিন হয় নাই—শরীর অসুস্থ হইলেও নয়। সারাদিন উপবাসে, রাগ করে নাই ত! কিন্তু রাগ করিবার কি-ই বা আছে!

মৃন্ময়ী আসিল। বার বার ডাকিবার পর রাজনারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিল, আমাকে একটু সুস্থির হ'য়ে কি শুতেও দেবে না তোমরা! কি চাই বলত? সাধে কি আর সংসার ছেড়ে যেতে চাইরে বাপু!

রাগই করিয়াছে—মৃন্ময়ীর বহু কথা মনে পড়িয়া গেল। অতি অল্প বয়স হইতেই সে এ ঘরে প্রবেশ করিয়াছে—রাজনারায়ণের প্রকৃতি সে ভাল করিয়াই জানে। জানে এবং বহুদিন পরে মনেও পড়িল যে রাজনারায়ণ রাগ করিলে চিরকাল সংসার ত্যাগের বাসনাই জানাইয়া আসিয়াছে। সে সমস্ত কথা মনে পড়িল বটে কিন্তু আজ আর হাসিয়া কাঁদিয়া রাজনারায়ণের অভিমান ভাঙাইতে কিছুমাত্র অগ্রসর হইল না। বরং বিরক্ত হইয়াই বলিল, সকলে তোমরা আমাকেই জালিয়ে মারলে। সেই ন'বছর থেকে এসেচি—করে আর শান্তিতে রেখেচ! যাও, তাই যাও—সংসার যদি না ভাল লাগে তবে যেখানে ভাল লাগে যাও। শান্তিতে একটু থাকতে দাও আমাকে—সারা জীবনটা জ্বলে পুড়ে মরতে পারিনে আর।

তোমার ভাল লাগলে তুমি চলিয়া যাও, আর জ্বালা যন্ত্রণা বাড়াইয়োনা—মৃন্ময়ীর এই কথাটা রাজনারায়ণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে একবার সে উঠিয়া বসিল কিন্তু পুনরায় হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িল। কঠিন কণ্ঠে বলিল শাস্ত্রে আছে পাপের সংস্রবে থাকলে অর্জ্জিত পুণ্যের ক্ষয় হয়। তোমার জন্যে আমার অনন্ত নরকবাস লেখা! আর নয়—কালই বেরিয়ে পড়ব, এ সংসারের আর জলস্পর্শও করবনা।

আমার পাপ! মৃন্ময়ী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—বলিল, তোমার মত ইতর-মনের লোক যতক্ষণ এ সংসারে থাকবে ততক্ষণ আমিও জলস্পর্শ করবনা।

কি হইতে হইয়া গেল। মৃন্ময়ী তখনই গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। রাজনারায়ণ ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

বধূ কাঁদিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া যদিও রাজনারায়ণকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ সম্বন্ধে সম্মত করাইতে পারিল কিন্তু মৃন্ময়ীকে পারিল না। রাজনারায়ণের ক্রোধটা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল এবং তাহা যখন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া অনুতাপে পরিণত হইল তখন বধূ আসিয়া এক সময়ে জানাইল যে রাজনারায়ণ নিজে না অনুরোধ করিলে মৃন্ময়ীর ক্রোধ উপশম করা কঠিন হইবে এবং অনেকাংশে দুঃসাধ্য।

রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ শুইয়া শুইয়া ভাবিল, মৃন্ময়ীর আজ আবার নূতন করিয়া অভিমান ভাঙাইতে হইবে। রাজনারায়ণ একবার ভাবিল সত্যই—পুরাণো দিনগুলা যদি ফিরিয়া আসিত আবার।...আজ যেন বহু দিনকার পুরাতন দৃশ্য একটা নূতন করিয়া অভিনয় হইবে।...রাজনারায়ণ একবার ক্রুদ্ধ হইয়া মৃন্ময়ীকে বলিয়াছিল, হয় তুমি এ সংসার থেকে বেরোও নয় আমি বেরিয়ে যাই—তোমার ছোঁয়া জলও আমি আর খাব না। মৃন্ময়ীও মুহূর্ত্তে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেইক্ষণে পাল্কী আনিতে লোক পাঠাইয়া পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু মৃন্ময়ী

যখন সত্যই চোখ মুছিতে মুছিতে পাল্কীতে উঠিয়াছিল তখন রাজনারায়ণ উপরের একটা ঘর হইতে ইহা লক্ষ্য করিতেছিল। বেহারাদের পাল্কী উঠাইতে দেখিয়া রাজনারায়ণ জানালার নিকটে সরিয়া আসিয়া হুঙ্কার দিয়াছিল, এই, পাল্কী রাখ্ ওখানে।

রাজনারায়ণ ক্রোধী মানুষ—যাহারা তাহাকে চিনিত তাহারা সহসা তাহার বিরুদ্ধে কোন কিছু করিতে যাইত না। রাজনারায়ণের ধমকানি শুনিয়া পাল্কী রাখিয়া বেহারার দলও সরিয়া পড়িল।

রাজনারায়ণ উপর হইতে নামিয়া আসিয়া পাল্কীর নিকটে দাঁড়াইল। পাল্কীর মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মৃন্ময়ী উপুড় হইয়া মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। রাজনারায়ণ আদেশ দেওয়ার মতই বলিল, মৃন্ময়, উঠে এস।

মৃন্ময়ী মাথা ঝাঁকাইয়া অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে উত্তর দিয়াছিল, না—যাবনা আমি...

—যাবে না! আচ্ছা দেখছি কি রকম যাওনা। রাজনারায়ণ দৃঢ় বাহু দিয়া মৃন্ময়ীকে পাল্কী হইতে তুলিয়া আনিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। মৃন্ময়ীর তখন রাগ অপেক্ষা লজ্জাটাই হইয়াছে বেশী, আড়ষ্ট হইয়া রাজনারায়ণের প্রশস্ত বক্ষে লজ্জায় মুখ ঢাকিয়াছে। রাজনারায়ণ বলিয়াছিল, রাগ জিনিষটা চণ্ডাল, আমার আবার এই জিনিষটা একটু বেশী—ভুল হলে আমাকে একটু শুধরে নিও বউ!...

...রাজনারায়ণ ভাবিল, এ সেই বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। সে সব আজ আর ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, আজ মৃন্ময়ীর অভিমান তেমন করিয়া ভাঙাইতে হইবে না। তবু উৎফুল্ল হইল এই ভাবিয়া যে মৃন্ময়ী এখনো সংসারের মধ্যে তাহাকেই কেবল নির্ভর করে। নতুবা অন্য-কেহ অনুরোধ করিলে উঠিয়া আসিত কিন্তু সকলেই ত অনুরোধ করিয়াছে, মৃন্ময়ী উঠিয়া আসে নাই।

রাজনারায়ণের তখন কিছুমাত্র ক্রোধ ছিল না এবং রাজনারায়ণ নিজে যখন মৃন্ময়ীকে ভাবিতে গেল তখন মৃন্ময়ীরও কিছুমাত্র ক্রোধ রহিল না। রাজনারায়ণ উৎসাহিত হইয়া বলিল, খাব যখন আজ রাত্রে ভাতই খাব—লুচি দিওনা বৌমা। মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিল, তুমিও আমার সঙ্গে বসে যাও বউ। রাজনারায়ণ কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জিত হইয়া উঠিল। রাজনারায়ণ ভাবিল, কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে যখন মৃন্ময়ীর অভিমান ভাঙাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া লজ্জিত আড়ষ্ট মৃন্ময়ীকে লইয়া এক থালায় একই সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে।

বধূ ভাত বাড়িয়া দিয়া গেছে। রাজনারায়ণ এই সমস্ত কথা ভাবিতেছিল। মৃন্ময়ী সচেতন করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনারায়ণ সপ্রতিভভাবে থালার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

মৃন্ময়ী সহসা সশব্দ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বৌমা দই দিলে কেন? রাজনারায়ণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, ওটা খেওনা—একে রাত তায় বাত্রে ..আমটাও খেয়োনা।

কেন খাবনা—আলবৎ খাব, বলিয়া রাজনারায়ণ লজ্জিত ভাবে হাসিল।

বধূ মুখ টিপিয়া হাসিয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া সরিয়া গেল।

রাজনারায়ণ হঠাৎ যেন লোভী হইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময়ী হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

কি ভাবিয়া একদিন আঁচলের চাবির গোছা বধূর হাতে দিয়া বলিল, আর নয় মা, এতদিন সমস্ত দেখালাম—এবার চালাও।

রাজনারায়ণ দ্বিগুণ উৎসাহে পুঁথির মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে। মৃন্ময়ীকে বহু বহু তত্ত্ব বুঝাইয়া বলে কিন্তু শ্রোতা সংসারের মধ্যে কোথাও ত্রুটি দেখিলে সমস্ত শাস্ত্রকথা স্থগিত রাখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সব কথাই পাড়িয়া বসে।

সেদিনও মৃন্ময়ী এইরকমটি করিয়া বসিল। দেবর্ষি নারদ মাতৃবিয়োগের পর গৃহ ত্যাগ করিতেছে এমন সময় মৃন্ময়ী বলিল, ভাল কথা নিতাইয়ের কাণ্ডটা দেখেচ! তার আমগাছ ঘিরে বরাবর বেড়া দিয়েছে—আগে দেখিনি, আজ সকালেই ত দেখলুম!

রাজনারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিল, তাতে আবার কি হ'লো! তার নিজের গাছ ঘিরে নিজের জায়গায় বেড়া দিয়েছে—তাতে তোমার কি!

নিজের জায়গায় কি রকম! মৃন্ময়ী বলিল, আমগাছটা ছ'পুরুষের—কতখানি মোটা হয়েচে তার ঠিক নেই। আমাদের জায়গায় না পড়ে পারে না।

রাজনারায়ণ হাসিয়া উঠিল—বলিল মরলেও স্বভাব যায় না বৌ, আব সেই হয়েচে তোমাব।

মৃন্ময়ী লজ্জিত হইয়া উঠিল। বলিল, ত তা ব'লবেই। এসব কি আর তোমার বৌমা লক্ষ্য করতে পারবে—আম'কেই করতে হয়। আজ বিকেলেই আমি বেড়া উপড়ে দেব—মধুকাকা সাক্ষী থাকবে। ব'লে দেব যে, বাপু, হাঙ্গামা করবার আগে আমিন নিয়ে এসে মাটি জরিপ ক'বে দেখ। বড়খোকা বাড়ী আসুক—তোমার দ্বারা এসব হয়ে উঠবে না।

—না বৌ আমি এসব পারব না আর তুমিও আর যেয়োনা ওর মধ্যে। বরং...

মৃন্ময়ী সেদিকে কান না দিয়া বলিতে লাগিল, আবার বড় খোকার লম্বা ছুটি দেখে বিজয়নগরে একবার যেতে হবে। ওদিকে আবার এক মজার কাণ্ড ঘটেচে। জমি-জমা, ঘর-বাড়ী আছে কিন্তু একটা কাণা কড়িও ত কোন দিন পাইনে। আবার কে একজন বাবার দানপত্রকে জাল ব'লতে চায়। হারামজাদা গরীব হলে কি হবে—নাকি মহা ধড়িবাজ। বাবা দানপত্র ক'রে কিছু আমাকে দিয়ে গেলেন এখন আবার এই ফ্যাসাদ। এইগুলো...

রাজনারায়ণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, বৌ খালি ওইসবই চিনলে। সম্মুখের খোলা পুঁথিটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আসতে যদি এর মধ্যে একবার...

মৃন্ময়ী হাসিয়া বলিল, আসিনি আর কি হকম—এই ত দু দণ্ড শুনলাম। আবার এসব না দেখলে দেখবে কে বলত? —টনের দল তোমার শান্তির সংসার যা গড়ত—সে আমি জানি।

রাজনারায়ণ রহস্য করিয়া বলিয়াছিল, মরিলেও স্বভাব যায় না—কথাটা সত্য। বধূর হাতে সংসারের সমস্ত ভার সঁপিয়া দিয়া মৃন্ময়ীর সময় কাটান অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। তাহ'রি সম্মুখে বধূ অন্যকে আদেশ করিতেছে এবং সে নির্ব্বিবাদে তাহা পালন করিতে চলিয়া যাইতেছে অথচ মৃন্ময়ীকে ভাল মন্দ একটা কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছে না—ইহা অসহ্য। মৃন্ময়ী কোনক্রমেই যেন আর নির্বিকার থাকিতে পারিতেছে না। তাহার অভিজ্ঞ মন এবং চক্ষুর নিকটে বধূর বহু কার্য্যের বিচ্যুতি ধরা পড়িয়া যায়। কথাটা সত্য যে যাহারা আদেশ দিয়াই আসিয়াছে তাহারা আদেশ সহ্য করিতে পাবে না, ইহা অনধিকার চর্চ্চা—ইহাই মনে করাইয়া দেয়।

মৃন্ময়ীরও ইহাই মনে হয়—মনে হয় যে, বধূর এই আদেশ দেওয়াটা অনধিকার চর্চ্চা। অথচ সে অনধিকার চর্চ্চাটা মৃন্ময়ী একদিন নিজেই বধূর অধিকারের মধ্যে দান করিয়াছিল কিন্তু তাহা ফিরিয়া পাইতে মৃন্ময়ী অস্থির হইয়া উঠে। তবে ইহা ফিরিয়া পাইতে প্রকাশ করিয়া বলাই হইল মৃন্ময়ীর পক্ষে দুঃসাধ্য।

দুঃসাধ্য হইলেও সেদিন কেমন করিয়া মৃন্ময়ীর মুখ দিয়া কথাটা প্রকারান্তরে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

মৃন্ময়ী বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল, বৌমা, খরচ-পত্র আজকাল বড় বাড়চে কেন। কুমুদকে কুড়িটা টাকা এখন না দিলেই কি হ'ত না। সামলাবে কি করে বুঝিনে।

বধূ হাসিয়া উত্তর দিল, কি করব মা, বাবা বল্লে যে দিতে।

—দিতে বল্লেই কি দিতে হয় মা। তোমার শ্বশুরের কি, তিনি ত হুকুম দিয়েই খালাস—সামলাতে হবে তোমাকেই। আমি হলে এখন খরচ করতুম না, টাকা পেয়েচ হাতে হরদম খরচ ক'রে যাচ্ছ; হিসেব দাও দেখি কত খরচ ক'রেচ। সিন্দুকের চাবি আমায় দাও এবার।

মৃন্ময়ীকে আর বলিতে অবসর না দিয়া বধূ আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া মৃন্ময়ীর পায়ের তলায় ক্রুদ্ধ হইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, তাই নাও মা। লোকের বিপদে বাবার খেয়াল থাকে না—আমারও তখন ছিল না।

রাজনারায়ণ ঘরের মধ্য হইতে সমস্তই শুনিতেছিল। এক সময়ে অসহ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। মৃন্ময়ীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তোমার মন বড় নীচ, বড় স্বার্থপর, বড় ছোট। কোন হিসেবে তুমি ফের বৌমার কাছ থেকে চাবি চাইতে গেলে। ছিঃ

মৃন্ময়ীর মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। লজ্জায়, অভিমানে ও ক্রোধে মেজ ছেলে হিমাংশুকে সঙ্গে লইয়া পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া তখনই সে বিজয়নগরের দিকে রওনা হইল। যাইবার সময় কাহাকেও কিছু বলিয়া যাইবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

বধূ রাজনারায়ণের পদপ্রান্তে কাঁদিয়া বলিল, ওঁকে আমরা ফেরাতে পারব না বাবা...তুমি না হ'লে...

রাজনারায়ণ মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, সে জানি মা—আমি না হ'লে ওকে কেউ ফেরাতে পারবে না। কিন্তু যাক ও, একটু ভেবে দেখুক মা—ভুলটা একটু ভেবে দেখুক।

—কিন্তু উনি যে আর ফিরবেন্ না!...

—ফিরবে, ফিরবে। এ সংসার ছেড়ে ও স্বর্গেও শান্তি পাবে না মা। যতদিন না ফিরবে ততদিন জানবে ওর ভুল ভাঙেনি। ভুল ভাঙলে আপনিই ফিরে এসে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে মা।

মৃন্ময়ীর চলিয়া যাইবার দিন হইতে রাজনারায়ণ ভাবিতেছিল, আর নয়, এই সুযোগে কোন দিকে রওয়ানা হইয়া প'ড়লে কেমন হয়! সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বৃদ্ধ আয়োজন করিতে লাগিল। সঙ্গিও জুটিল কয়েকজন তীর্থকামীর দল।

যাইবার সময় বধূ কাঁদিয়া বলিল, সবাই যদি চ'লে যাবে বাবা, তবে সংসারের ভার কার হাতে দিয়ে যেতে চাও! আমি এসব পারব না, চাবিও নাও আর সংসারের ভার যার হাতে খুসী দিয়ে যাও।

তাই কি হয় মা! বৃদ্ধ বলিল, তুমি ছাড়া এ ভার আর কে বইবে মা!

—কিন্তু বইবার শক্তি তোমরাই যে কেড়ে নিয়ে যেতে চাও বাবা! তোমরা গেলে বইবার সাহসটুকুও যে হারিয়ে যায়! সাহস, শক্তির জন্যে কার দিকে ফিরে তাকাব! ঝড় ঝাপটা যারা সয়েচে তারাই ঝড়ের আগে ব'লতে পারে, কি ক'রতে হবে। তোমরা গেলে কে তখন সাবধান ক'রবে, কে ব'লবে? আমি পারব' না, তোমার সঙ্গেই বেরোব।

—তাই কি হয় মা! সময়ে সব পারবি। দুদিন পরে যে এতদিন তোদের চালিয়েছিল সেই ফিরে আসবে। আমিও আসব—ক দিন আর, বেশী দূর ত যাচ্ছিনে।

রাজনারায়ণ রওয়ানাই হইল। তবে যাইবার সময় বধূকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বোধ করি মিথ্যা করিয়া বলিয়া গেল যে সে আবার ফিরিবে এবং বহুদূরেও যাইতেছে না। বস্তুত সে দূরেই যাইতেছে এবং তখনকার মনের অবস্থা তাহার বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইত যে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছাও তাহার খুব কম।

রাজনারায়ণ শম্ভুকে মাঝপথ হইতে ফিরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, আর তোর যাবার দরকার নেই শম্ভু—তুই ফিরে যা।

শম্ভু তাই ফিরিতেছিল।

মিত্রচকের নিকট আসিয়া দেখিল, পথের পাশে—গাছের ছায়ায় দুইখানা পাল্কী এবং পরিশ্রান্ত বেহারার দল বিশ্রাম করিতেছে। শম্ভু মাঠের মাঝখান দিয় পথ সোজা করিতেছিল কিন্তু মৃন্ময়ীকে হঠাৎ পাল্কীর মধ্যে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণাম করিয়া বলিল, কর্ত্তাকে ছেড়ে দিয়ে এলাম মা।

কর্ত্তাটি কে—মৃন্ময়ীর বুঝিতে দেরী হইল না। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলি শম্ভু?

—কালিনগরকে কোশখানেক ছিল মা। কর্ত্তা তীর্থ ক'রতে যাচ্ছেন।

মৃন্ময়ী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, কে তাঁকে ছেড়ে দিলে শম্ভু? তিনি কি আর ফিরবেন! বৌমা কি...

শম্ভু সঙ্গে সঙ্গে বলিল, যথেষ্ট যথেষ্ট মা—বৌদি যথেষ্ট বাধা দিয়েচেন। কিন্তু না—কিছুতেই না, তিনি কোন কথাই শুনলেন্ না।

তবে আমিও বোধ হয় তাঁকে ফেরাতে পারব' না রে!... বলিতে বলিতে মৃন্ময়ীর চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। বেহারাদের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া সে বলিল, রাম, তাড়াতাড়ি ওঠ বাবা। তাঁকে পথের মাঝখানে ধরতেই হবে।

শম্ভু এতক্ষণ দরজা বন্ধ পাল্কীটায় কে আছে নজর করে নাই। এটায় কে আছেন—বলিয়া দরজা ঠেলিয়া দেখিতেই আঁৎকাইয়া উঠিল। শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, মেজ বাবুর একী হ'য়েচে মা! ফোস্কা প'ড়ে মুখ...সর্ব্বাঙ্গ একেবারে...চেনা যায় না! কি হ'য়েছিল মা!

সে সব পরে শুনিস শম্ভু, তুই ওকে নিয়ে বাড়ী যা। কর্ত্তা কিসে গেছেন রে...ধরতে পারব ত?

—গরুর গাড়ীতে। পাল্কী জোরে হাঁকালে কালিনগরেই ধরতে পারবে ব'লে বোধ হয়।

কালিনগরেই রাজনারায়ণের সাক্ষাৎ মিলিল।

মৃন্ময়ী রাজনারায়ণের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ব'লিল, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ—কবে গিয়েছিলে? আজ তুমি কেন ছেড়ে যাচ্ছ?

—কোন দিন যাইনি বলে আজো যাব না—তার কি কোন মানে আছে বৌ? তাছাড়া তোমাকে ডাকি কি ক'বে! তোমার লোক-জন তোমার আশ্রিত যারা···

মৃন্ময়ী বাধা দিয়া বলিল, আমার ভুল ভেঙেচে গো...তুমি আজ আমাকে আশ্রয় দাও, যেদিকে খুসী নিয়ে চল। তুমি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয়ই নেই। যেটা আছে—সেখানে তুমি না থাকলে আমি থাকব কি ক'রে! আজ আমার সেখানে কোন জোরই নেই যে...

রাজনারায়ণের মুখ কঠিন হইয়াছিল—বলিল, সে কী বৌ। বিজয়নগরের সম্পত্তি—সে ত তোমারি, আর···

—নানা, সে সব কিছু নেই, যা আছে তাকেও বাঁচাতে পারব'না।

মৃন্ময়ী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজনারায়ণ সমস্তই একে একে শুনিল। শুনিল যে, বিজয়নগরে যাইয়া মৃন্ময়ী কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আত্মীয়-বন্ধুরা এতদিন বিজয়নগরের সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছিল এবং মৃন্ময়ী সেখানে সুবন্দোবস্ত করিতে যাওয়ায় তাহারা ইহা উৎপাত ভাবিয়া পথের বাধা দূর করিতে গভীর রাত্রিতে মৃন্ময়ীর পিতৃদত্ত খড়ের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং এই সঙ্গে বাহিরের দরজায় শিকল লাগাইয়া দিতেও ভুল করে নাই। মৃন্ময়ী কোন রকমে নিষ্কৃতি পাইয়াছে বটে তবে অক্ষত নয়। হিমাংশুর সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া গেছে। যদিও তাহাকে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে—তবুও সে বাঁচিবে কি-না ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

রাজনারায়ণ স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, কে কার জমির মালিক জানিনে বৌ, তবে এটুকু ভাল ক'রে জানি যে, আমরা মা-বসুমতীর আশ্রিত, সবাই শরণাগত। তাকে একার নিজের ব'লে ভাগ ক'রতে যাওয়ার জন্যই তোমার এত দুঃখ।...হ্যাঁ, হিমাংশু এখন কেমন আছে বৌ?

মৃন্ময়ী অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে বলিল, তাকে বোধ করি আর বাঁচাতে পারব না। দরকার নেই—আর ওদিকে ফিরব'না, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। আমার দুঃখের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা, বড় আশ্রয় ভুল ক'রে হেলা ক'রে যাদের নিয়ে কাল কাটিয়েছি তারাই আমাকে দুঃখ দেয় বেশী। ওগো, তুমি আমাকে শান্তি দাও, আশ্রয় দাও···

রাজনারায়ণের মুখমণ্ডল এতক্ষণ কঠিন হইয়া ছিল কিন্তু হঠাৎ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এক সময়ে কি যেন সে হারাইয়াছিল, তাহা পুনরায় ফিরিয়া পাইল, কি যেন বহু অপেক্ষিত, বহু আকাঙ্খিত জিনিষটা সার্থক হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল—যাহা সে ফিরিয়া পাইল, তাহা যেখান হইতে আসিয়াছে সেইখানে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় নূতন করিয়া উপভোগ করিবে।

রাজনারায়ণ মৃদু কণ্ঠে বলিল, বৌ, এখন ফিরে যাই চল। এবার ছেলে-মেয়েদের আশ্রয়ে কিছুদিন থেকে হিমাংশু সেরে উঠলে আবার না হয় বেরিয়ে পড়ব'।

গাড়োয়ান সনাতন শুনিয়া শুনিয়া কতকটা বুঝিয়াছিল—কতকটা ঠিক বুঝেও নাই। যেটুকু সে বুঝিয়াছিল তাহারি উপরে সে জোর দিয়া বলিল, হ্যাঁ কর্ত্তা, ঘরকে চল। এমন সোনার সংসার—তাকে ফেলে কিনা বিদেশ-বিভুঁয়ে... আঁধারি হ'য়ে এলো, উঠে পড় কর্ত্তা।

অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, ঘরে ফিরিবার সময় হইয়াছে বটে।

সম্মুখের ওই গৈরিক-রাঙা পথটায় সন্ধ্যার অন্ধকার অল্প অল্প জমাট বাঁধিতেছিল সত্য কিন্তু অন্তরলোকের পথে সুন্দর জোৎস্না উঠিয়াছিল। সেই পথটি রাজনারায়ণকে কেবলি ডাকিয়া ডাকিয়া যেন বলিতেছে—তোমার সম্মুখের পথে নয়, তোমার উদাসীন বাহিরের জগতে নয়—অন্তরলোকের মধ্যে যে একটা পথ আছে, যে পথটা আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা পর্ণ কুটিরের মধ্য হইতে সুরু হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সেইখানে ফিরিয়া এস। রাজনারায়ণ, সেই পথটাই অসীম। তাহার মধ্যে তোমার উদাসী, বৈরাগী মন বিচিত্র সুরে গাহিতেছে।

শ্রীসুশীল জানা

তোমা বই জানি না

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার এম্‌-এ

মেয়েটির চোখদুটি ভীরু, সরল অথচ সতেজ। অনেক কিছুই বোঝে না তাই ভীরু, যেটুকু বোঝে তা'র মধ্যে আর কোনো দ্বিধা নেই, তাই সহজ বিশ্বাসের একটা দৃপ্ততা আছে। গলার আওয়াজে কোমল মনের জোর স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে তবু তারি সঙ্গে জড়িয়ে এল অবুঝ অভিমানের কান্না—যেন কাঁটা দিয়ে শিউলিফুল গেঁথে তুলছে। বল্লে, 'তোমা বই জানি না, আর তুমি—'

'তোমা বই জানি না।'—সেই আদিম যুগের মর্ম্মান্তিক কথা। কেন জানোনা? হায় মুগ্ধা! তুমি জানো না কি নিদারুণ তোমার এই নাজানার পণ। তোমার জন্মক্ষণ থেকে আ'জ পর্য্যন্ত কত তরুণ প্রাণের উৎসুকতা তোমার আশে পাশে মর্ম্মরধ্বনি তুলে দক্ষিণা বাতাসের মত মিলিয়ে এল, তারা তোমার মনের বাতায়ন খোলা পেলে না। কত দূর-দূরান্তরে কত নীরব কামনা ধূপ-সৌরভের মত রাত্রির আকাশে লীন হল, তোমার স্বপ্নেও সে ধূপশিখার ছায়া নেই। ভবিষ্যতে আকস্মিকের প্রত্যাশা তুমি রাখো না। তাই তোমার সঙ্কীর্ণ পথে তুমি ভীরু, তুমি প্রখর, তুমি মধুর, আপন বেগে তুমি চলে যাবে বাধাবন্ধুর পথে; কিন্তু তোমার অন্তরে থাকবে শীর্ণ খরস্রোতার গোপন আর্ত্তনাদ, বাজবে না সেখানে বিশাল ব্যাপ্তির গভীর সঙ্গীত।

তুমি ব'লেছ, 'তোমা বই জানি না।' যেন এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। আমি কিন্তু খুসী হ'তুম, যদি তুমি বলতে পারতে 'তোমা বই চাই না'। তোমার জানা এত কম, তাই তোমার চাওয়ার দাম নেই।

তুমি ভালো ক'রে চোখ মেলে চাও। তোমার চাওয়ার তৃষ্ণা শুধু আমার ওপরেই নিঃশেষ করো না। তোমার ঐ কালো চোখদুটির মধ্যে অনেক ধরে, আমার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী। দেখ, ওখানে আকাশের দাবী আছে, নিখিল জগতের, নিখিল সৌন্দর্য্যের দাবী আছে। তাদের স্থান দাও। তারপর এক বেদনা-বিদ্যুৎ-জাগা মুহূর্ত্তে তোমার চোখ নামিয়ে আনো আমার দিকে, তখনো যদি আমাকেই চাও তবেই আমি তোমার।

—না না, অভিমান নয়—কান্না নয়। জানি, তুমি নিজেকে আমার কাছে বিলিয়ে দিতে চাও, নিঃশেষ করে দিতে চাও। আমাকেই। কেন? নিয়তি? না, বরং বলো, সুযোগ। বেশ, যে সুযোগ একবার এসেছে, সে সুযোগ বারে বারে আসা কি অসম্ভব? অনাগত সুযোগ তোমার মনে কেন নেশা ধরিয়ে দেয় না? জগতের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে তোমার চোখ অন্ধ, শুধু আমার দিকেই তার পূর্ণ রশ্মি বিকশিত হয়ে রয়েছে। আমায় আলাদা ক'রে, জগত থেকে ছিঁড়ে এনে তোমার ঐ অনুবীক্ষণে আর কতকাল কতভাবে দেখবে? দিনের পর রাত আসে, শীতের পর বসন্ত, আর তোমার কেন আমি, আমি, শুধু আমি। কেন?

এই 'কেন'র উত্তর তুমি জানো না। তাই তোমার উজ্জ্বল চোখে জল ঝাপসা হয়ে আসে, আবার মিলিয়ে যায় নতুন আশার সকৌতুক কিরণে। তুমি হেসে ওঠো, সরল করুণ মধুর আত্মবিশ্বাসের হাসি—ভাবো, আমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছি। আর গভীর নির্ভীক অনুরাগে আমাকে তপ্ত আলিঙ্গনের মত জড়িয়ে ধরে তোমার ঐ অদ্ভুত মর্মান্তিক স্বীকৃতি—'তোমা বই জানি না'।

গোড়ায় গলদ

ডাঃ কালীপদ মুখার্জ্জি

বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে মনে হয়—এ রোগের গোড়া কোথায়? রুগ্ন, রোগক্লিষ্ট মাতার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার পরই শিশু যে আবেষ্টন ও আবহাওয়ার মধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহাতে নবজাত শিশুর শরীরপুষ্টির প্রচুর অভাব ঘটে। এই অভাবের জন্য বাহিরের সহস্র সহস্র রোগবীজাণু ঐ দুর্ব্বল দেহের মধ্যে সহজে প্রবেশলাভ করে, এবং সময়মত আত্মপ্রকাশ করিয়া শিশুকে মৃত্যুর দ্বারে লইয়া যায়। রুগ্ন মাতার শুষ্ক স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধের অভাব বশতঃ শিশু আহার্য্য পায় না। দিনে দিনে শিশুর ত্বক শুষ্ক ও কুঞ্চিত হয়; দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, অস্থি শক্ত হয় না বলিয়া শিশু দাঁড়াইতে পারে না, দাঁত উঠিতে বিলম্ব হয়, কথা বলিতে আড়ষ্টতা আসে। শৈশবেই যদি শিশু এই সকল স্বাস্থ্য-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হয় কি করিয়া সে যৌবনে স্বাস্থ্যবান ও উপার্জ্জনক্ষম হইবে? মাতার নিজ স্বাস্থ্য অবহেলার জন্য শিশুর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল।

জীবনের প্রতি পদে শত সহস্র ভীষণ রোগবীজাণুর সহিত যে প্রতিনিয়ত মানব দেহের যুদ্ধ চলিতেছে তাহার অন্ত নাই। এই সমস্ত বীজাণু, লোকের অগোচরে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইহাদের জয় করিতে হইলে দরকার শুধু অধিক সতেজ রক্তকণা, ইস্পাতের মতন দৃঢ় স্নায়ুমণ্ডলী, আর সবল দেহ। রোগনিপীড়িত বাঙ্গালী জাতিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে হইলে, প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় জিনিস এই স্বাস্থ্য-সম্পদ। বর্ষাকালে প্রতি ঘরে বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য হেতু রোগীরা রক্তহীন, অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

বহু বৎসর গবেষণার ফলে "রচিটোনে"র আবিষ্কার হইয়াছে। "রচিটোন" ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণকে দমন তো করেই, অধিকন্তু মাতাকে সবল করে, ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন করে, স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধি করিয়া শিশুকে প্রচুর আহার যোগায় এবং দেহে নব জীবনীশক্তি আনিয়া দেয়। "রচিটোনে"র উপাদানগুলির অদ্ভুত ক্রিয়াশক্তিতে নূতন রক্তকণার সৃষ্টি হয়, স্নায়ুমণ্ডলী পুষ্ট ও সতেজ হয়। অদ্ভুত ও চমকপ্রদ অথচ দ্রুত কার্য্যকারিতা হিসাবে "রচিটোনে"র সমকক্ষ টনিক আর দ্বিতীয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল

দক্ষিণ কলিকাতা বহু মনীষীর জন্মভূমি। ইহার মধ্যে ভবানীপুর আইন ব্যবসায়ীর জন্ম সুপ্রসিদ্ধ। বহু পূর্ব্বে হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি, ও তৎপরবর্ত্তী কালে উকিলগণের অগ্রগণ্য স্বনামধন্য সার রাসবিহারী ঘোষ, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই অকালে কালের আহ্বানে অপসৃত হইয়াছেন; তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিবার জন্ম সুযোগ্য লোকও মিলিতেছে না।

সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতা ভবানীপুরের শেষ প্রদীপটি নির্ব্বাপিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক আর ইহজগতে নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে শ্রীরামপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে তাঁহার জন্ম এবং আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার মৃত্যুও আর এক মহাপুরুষ খ্রীষ্টের দেহনাশের দিবসে সংঘটিত হয়। তাঁহার স্বগ্রাম সিঙ্গুর। তাঁহার শিক্ষা দিক্ষা কর্ম্মক্ষেত্র প্রধানতঃ ভবানীপুর।

বাল্যকালে স্থানীয় সাউথ সুবারবন স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন ও ১৮৮৮ সালে ঐ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিনি স্কুলে ও কলেজে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৯২ সালে সসম্মানে কৃতিত্বের সহিত বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে এম এ ও আইন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল শ্রেণীভুক্ত হইলেও, তিনি হাইকোর্টের পরিবর্ত্তে আলিপুর ফৌজদারী আদালতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অচিরকাল মধ্যে ঐ ব্যবসায়ে তাঁহার নাম ও খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং ক্রমশঃ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী ও উকিল সমাজে অসন্দিগ্ধরূপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। ১৯১৮ সাল হইতে সুরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের সেবার জন্ম পৌর জনসভায় যোগ দিয়াছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি সার সুরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচিত কর্পোরেশনের প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে ইতঃপূর্ব্বে উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানগণের একাধিকার ছিল। ঐরূপ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য এ দেশীয় লোক করিতে সক্ষম নহে এইরূপ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কার্য্যভার লইয়া এইরূপ কৃতিত্বের সহিত উহা সম্পাদন করেন, যে তাঁহাদের ঐ মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই নির্ব্বাচনে সার সুরেন্দ্রনাথকেও বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি নানাবিধ বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যের ও আনন্দের বিষয় এই যে তাঁহার নির্ব্বাচন যোগ্য পাত্রেই ন্যস্ত হয়।

পৌর জনসভার বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া যে নূতন আইন রচিত হয়, উহার জন্ম সার সুরেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের

নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন, এ কথা হয়ত অনেকে অবগত নহেন।

১৯২০ ও ১৯২৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং ১৯২৪ সালে মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। ১৯২৬ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিলাতে Secretary of State এর মন্ত্রণা সভার সদস্য নিযুক্ত হন। কিন্তু ঐ কার্য্যে তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে তথায় সংকীর্ণভাবাপন্ন, অল্পদৃষ্টি জবরদস্ত ইংরাজ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ভারতবাসীদের শাসনব্যাপারে তাহাদের স্বাধিকার লাভের বিরুদ্ধে এরূপ দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচিত হইয়া আছে যে তাঁহার পক্ষে উহা ভেদ করা অসম্ভব। এ জন্য তিনি বিলাতে গিয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াও মনোদুঃখে থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার বিলাতপ্রবাস একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। তিনি সেখানকার অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে আসিয়া নানারূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, এবং অনেক সদাশয় গুণী ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎপরিচয় এবং বন্ধুত্ব লাভ করিয়া ইংরাজগণের নানা গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন।

প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা বিলাতে তাঁহাকে পাইয়া নানারূপে উপকৃত হয় এবং তথাকার তাঁহার আবাসভবন তাহাদের আনন্দ ও আরামভূমি হইয়া উঠে।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, রাজনীতির কোলাহল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি পল্লীর উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেন। পল্লীর শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য তাঁহার শেষ জীবনের একমাত্র কাম্য হয়। তিনি এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার পিতার নামে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে স্বগ্রামে সিঙ্গুরে একটি হাঁসপাতাল, এবং মাতার নামে ৩৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠান সুচারুরূপে চলিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও তিনি কৃষকদিগের করিয়া গিয়াছেন। ইহার বহুকাল পূর্ব্বে—দরিদ্র বিনামূল্যে শিক্ষা দিবার জন্য স্বগ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি স্বয়ং ছাত্রাবস্থায় কিছু কালের জন্য উহার শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি চুঁচড়া ভূতনাথ পাল নামীয় কৃষি বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। হুগলি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাধারণ স্বাস্থ্য বিধায়িনী সভার সদস্যরূপে ঐ কার্য্যে তিনি সবিশেষ পরিশ্রম করিতেন। ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতিতেও তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। ঐ সকল সত্ত্বেও, তিনি স্বেচ্ছায় স্থানীয় লোকাল বোর্ডের সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই এবং ঐ কার্য্যে তিনি যে প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেন। ইহাই ছিল সুরেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

পল্লীর ন্যায় কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। তন্মধ্যে কলিকাতা মেডিকাল ইনষ্টিটিউসনের তিনি স্থাপয়িতা ও সভাপতি, নারীশিক্ষা সমিতির সভাপতি, শিশুরক্ষা সমিতির সহকারী সভাপতি এবং আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে অন্যতম এবং উহার প্রধান পরিচালক ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার ব্যাপারেও তিনি নানাভাবে সহায়তা করেন। বিদ্যাসাগর বাণীভবনের জন্য তিনি এককালীন ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। যে কোন সদনুষ্ঠানে দেশের মঙ্গল হইবে বুঝিতেন, তিনি অন্তরের সহিত উহাতে যোগ দিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন। ঐরূপ সাধারণের হিতকল্পে দান ভিন্ন, জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে সকল দুঃখার্ত্ত ও অভাবগ্রস্ত লোক তাঁহার সমবেদনা ও অর্থ পাইত তাহাদের সংখ্যাও অল্প ছিল না। দান তিনি ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

পরোপকার স্পৃহা তাঁহার এতই স্বাভাবিক ছিল, সত্যানুরাগ এতই প্রবল ছিল এবং ভগবানের উপর এত দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, যে ইহার মূলানুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই পরলোকগত তাঁহার পিতা স্বনামধন্য ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং মাতা শ্রীমতী গোলাপমোহিনীর কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের অনেক দয়ার কাহিনী অদ্যাপিও ভবানীপুর অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। তিনি শুধু দুঃস্থ রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার পথ্যাদির ব্যয়ভারও নিজে বহন করিতেন। তিনি কেবল কোমলস্বভাব ও উদারপ্রাণ ছিলেন না, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস

ও ভগবৎ-বিশ্বাসও পূর্ণমাত্রায় ছিল। সুরেন্দ্রনাথের জননী গোলাপমোহিনীও তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা পরদুঃখকাতরতা, ধর্ম্মে নিষ্ঠা, ও দেবদ্বিজে ভক্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবন মধুময় ছিল। তাঁহার পত্নী শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণপ্রভা মল্লিক তাঁহার স্বামীর সকল সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতেন, এবং কি এদেশে কি বিদেশে ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী ছিলেন। স্বামী-সৌভাগ্য বঞ্চিতা হইলেও এক্ষণে তিনি স্বামীর আবদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আত্ম-নিয়োগ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতি তাঁহার গুরু সার সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতি। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক ও শিষ্য ছিলেন। অদ্যাপিও সুরেন্দ্রনাথের বসিবার ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তথায় আর কোন ছবি নাই, কেবল একখানি বহুমূল্যের ছবি সযত্নে রক্ষিত আছে, সেখানি তাঁহার গুরু সুরেন্দ্রনাথের।

অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সার সুরেন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী হইয়া কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দিতে আরম্ভ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় যখন সমগ্র দেশ প্লাবিত হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব্ব ত্যাগে সমুদয় দেশবাসীর চিত্ত অভিভূত করেন, তখনও সুরেন্দ্রনাথ সোদরোপম চিত্তরঞ্জনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও রক্ষা করিতে পারেন নাই। একদিকে তাঁহার গুরু সার সুরেন্দ্রনাথ যিনি ধীরতার সহিত প্রতিপাদক্ষেপে রাজ-নীতিক অধিকার লাভের প্রয়াসী, অন্যদিকে তাঁহার একান্ত স্নেহাস্পদ চিত্তরঞ্জন যিনি জাতীয় অগ্রদলের নেতা হইয়া সরকারের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতার বিরোধী। এই বিষম দ্বন্দ্বে তাঁহার গুরু সার সুরেন্দ্রনাথেরই জয় হইল এবং এই সময় হইতে কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হয়।

যখন দেশ কোন বিশেষ ভাব-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন সেই দিকে জনপ্রবাহ অন্ধের ন্যায় ছুটিয়া যায়, বিচার-শক্তিও তিরোহিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনে আশাপ্রদ সুফল লাভ হইয়াছে কিনা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু এ কথা অসংশয়ে বলা যায় যে তৎকালে কংগ্রেস ভিন্ন-মতাবলম্বী দেশ-হিতৈষীগণকে অবজ্ঞা ও অনাদরে উপেক্ষা করিয়া দেশের অহিতই সাধন করিয়াছিল। রাজনীতি সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশের কল্যাণ যখন সকল দলেরই লক্ষ্য, সে জন্য তাহাদের মধ্যে একটি মিলনের পথ না রহিলে অনৈক্যে দেশের মঙ্গল হইতে পারে না। এই কথাটি সুরেন্দ্রনাথ, কার্য্যতঃ তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, শেষ জীবনে বিশেষ ভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে Indian Associationএর সভাপতিরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় যে বর্ত্তমান কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুও ঐরূপভাবে একটি সর্ব্বদল সমন্বয়ের চেষ্টা করিতেছেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও ভিন্নমতাশ্রয়ী হইলেও সুরেন্দ্রনাথ নির্ভীকভাবে কর্ত্তব্য পালনে কখনও উদাসীন ছিলেন না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারাগার হইতে মুক্তি লাভের পরে, স্থানীয় হরিশ পার্কে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য যে জন-সভা হয়, তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ঐ সভায় তিনি মুক্তকণ্ঠে দেশবন্ধুর গুণকীর্ত্তন করেন। তৎকালে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

আর একটি ঘটনাও অনেকের সুবিদিত। যে দিবস বাসন্তী দেবী পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হন, সে দিবস মহামান্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রেডিংএর জন্য যে ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়, উহার উদ্যোক্তাগণের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যতম ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঐ সংবাদ শুনিয়া এতদূর বিচলিত হইয়া পড়েন যে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ইহাতে সর্ব্বত্র একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ সুরেন্দ্রনাথ গভীর ভাবাবেগে বিক্ষুব্ধ চিত্তে অসহিষ্ণু হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হন। এই কার্য্যে লোক-সমাজে একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করা সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। যাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে ঐ কার্য্য সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সুরেন্দ্রনাথ একজন খাঁটি লোক ছিলেন। ঐরূপ খাঁটি লোক আজকাল দুর্লভ। তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহার অনুসরণে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। সত্যের অনুরোধে কখনও কখনও তাঁহার ব্যবহার রূঢ় বলিয়া প্রতীত হইত এবং "সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" এই নীতিবাক্যের অনুশাসন তিনি লঙ্ঘন করিলেও তাঁহার হৃদয়ে কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না। পরের দুঃখে সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। লোকেরা যে-কোনরূপ কষ্ট, অভাব বা অসুবিধা হইলেই মল্লিক মহাশয়ের নিকট ছুটিয়া যাইত এবং তাহারা নিশ্চিতরূপে জানিত যে তাহাদের প্রার্থনা অপূর্ণ রহিবে না, বস্তুতঃ অপূর্ণ রহিতও না। তাঁহার গৃহদ্বার সর্ব্বদা অবারিত থাকিত। দীন ভীখারীর পক্ষেও তথায় যাইবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। তিনি সাধ্যমত সকলকে তুষ্ট করিতেন। লোকের যে কোন দুঃখ কষ্ট বা অভাব দূর করিতে না পারিলে তাঁহার আত্মতৃপ্তি হইত না। এজন্য তিনি শারীরিক ক্লেশ, অমানুষিক পরিশ্রম, অকুণ্ঠিতচিত্তে অর্থব্যয় করিতে কখন কাতর হইতেন না।

তিনি বড় স্পষ্টবক্তা ছিলেন। ভণ্ডেরা তাঁহাকে দেখিলেই ভয়ে কাঁপিত এবং ভাবিত যে এই লোকটির হাত হইতে তাহাদের পরিত্রাণ নাই। কিন্তু যদি কেহ অবস্থার বিপাকে পড়িয়া হঠাৎ কোন দোষ করিয়া ফেলিয়া যথার্থ অনুতপ্ত হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া বুকে টানিয়া লইতেন। এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এ সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একবার আলিপুর বারলাইব্রেরীর একজন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া লাইব্রেরী গচ্ছিত কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। পরে সে যখন তাহার দুষ্কৃতির জন্য অনুশোচনা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখন তিনি স্বয়ং ঐ টাকা দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া তাহাকে সেই কার্য্যেই বাহাল রাখেন।

তাঁহার অনুগ্রহলাভে যে কতলোক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে তাহার সীমা নাই। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন সত্য বটে, এজন্য তাঁহার কোন ক্ষোভ ছিল না। তাঁহার বুভুক্ষু হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে নিঃশেষে বিতরণ করিতেন।

তাঁহার মনে হীনতা বা সংকীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। একদা একটি ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রের চাকুরীর জন্য একখানি সুপারিশ চিঠি লইতে আসেন। তিনি তৎপূর্ব্বেই নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। একথা উভয়েই জানিতেন। এ কারণ সেই ভদ্রলোকটি এক্ষণে নিজ প্রয়োজনে আসিয়া দ্বিধাশঙ্কিতচিত্তে আপনার অনিচ্ছাকৃত উল্লিখিত কার্য্যটির উল্লেখ করিতে উদ্যত হইলে সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। আপনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, করিয়াছেন, তবে আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা করিব।" এই বলিয়া তিনি সানন্দে অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এইরূপ আরও অন্যান্য বিবরণ আছে। এই সকল সামান্য সামান্য ঘটনায় তাঁহার চরিত্র পরিস্ফুট।

দেশোদ্ধারের কল্পনা-রচিত স্বর্গে তাঁহার গতি ছিল না। বাস্তবজগতের কঠিন ভূমিতে তিনি বিচরণ করিতেন। "এক বৎসরে স্বরাজ" তাঁহার বুদ্ধিকে কখনও আচ্ছন্ন করে নাই। সেই নিমিত্ত দেশের জন্য যাহারা কেবল হৈ চৈ গণ্ডগোল করিয়া বেড়াইত, তাহাদিগকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। পল্লীর দুর্দ্দশা মোচনে যাহাদের বক্তৃতায় সভাসমিতি মুখরিত হইত, কার্য্যের বেলায় তাহাদের কোন সন্ধানই মিলিত না। এই অসামঞ্জস্যে তাঁহার হৃদয় পীড়িত হইত। এজন্য তিনি নীরবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রশংসার করতালির জন্য তিনি অপেক্ষা করেন নাই।

উৎকট স্বরাজীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একবার কৌতুক করিয়া বলেন, "বাপুরা হে, যে ইংরেজেরা দেড়শত বৎসরের উপর তোমাদের দেশে রাজত্ব করিতেছে সে বেচারীদিগকে এক বৎসরের নোটীশে তল্পী-তল্পা লইয়া পৌষ মাসের মধ্য রাত্রিতে (31st. December) জাহাজে উঠিয়া বিদায় লইতে বলা কি নিতান্ত অহিন্দুচিত ও অভদ্র আচরণ হইবে না!"

তিনি সুরসিক, গল্পপ্রিয়, মজলিসি ও সমজদার লোক ছিলেন। তিনি যখন যে আসরে বসিতেন, তথায় তখন

আনন্দের নির্ঝর বহিয়া যাইত এবং হাস্যকোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইতেছে। তাঁহার নাম চিরদিন সকলের চিত্তে জাগ্রত থাকিবে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎ-

স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

জন্ম—শ্রীরামপুর, ৯ই ভাদ্র, জন্মাষ্টমী, ২২৭৯

মৃত্যু—ভবানীপুর, ২৮শে চৈত্র, গুড ফ্রাইডে, ১৩৪২

আজ তাঁহার কণ্ঠ নীরব, কার্য্যেরও শেষ হইয়াছে। ...র অশেষ গুণাবলী স্মরণ করিয়া আজ স্বদেশ ও বিদেশ

সাগার ও শিক্ষালয় তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী, এম-এ

ফুটবল

লীগের প্রথম হাফের খেলা শেষ হয়ে দ্বিতীয় হাফ আরম্ভ

পুলিস এবং ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় লক্ষীনারায়ণ গোল দিচ্ছে

হয়েছে। আগেকার মত খেলা দেখতে মাঠে দর্শকের তেমন ভীড় হয় না। তারপর খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নিম্নস্থানে এসে পৌঁছেছে প্রতিদিনকার শূন্য গ্যালারি এবং খেলাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। লীগের প্রথম হাফে কয়েকটী খেলা ছাড়া ক্রীড়ামহলে আর তেমন উৎসাহ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত করে- নামজাদা টীমদের হারিয়ে এখনও পর্য্যন্ত অপরাজে-

লীগের প্রথম স্থান অধিকার করে আছে মহমেডান দল। ইষ্টবেঙ্গলকে ২-০, ব্ল্যাকওয়াচকে ৭-০, মোহন বাগানকে ১-০, এরিয়ান্সকে ৪-০ গোলে হারিয়ে অর্থাৎ বিশিষ্ট ভারতীয় এবং ইউরোপিয়ান দলকে অতি সহজেই হারিয়ে মহমেডান দল লীগ বিজয়ী হতে চলেছে। গোল কিপার ওসমান ও ব্যাক সিরাজ উদ্দিনের খেলা বেশ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু টীমের সঙ্ঘবদ্ধভাবে না খেলা, পোষ্টের সামনে এসে গোল দিতে না পারা এবং তারপর দুর্ব্বল হাফ-ব্যাক লাইন দুর্দ্দান্ত মহমেডান ফরওয়ার্ডের আক্রমণকে ব্যর্থ করে নিজেদের ফরওয়ার্ড লাইনকে খেলবার নৈপুন্য ও উচ্চাঙ্গের খেলার অভাব। আব্বাসের সেই চিত্তাকর্ষক খেলা এবার খুব অল্পই চোখে পড়েছে। সেলিম মাঝে মাঝে খুব সুন্দর খেলে কিন্তু টীমের

ড্যালহৌসী বনাম ব্ল্যাকওয়াচ খেলায় ডেভিস একটি অব্যর্থ গোল বাঁচাচ্ছে

আসলটুকু হল হাফ-ব্যাক লাইন! অখিল, আমেদ্, নূর মহম্মদ ও মাসুম যে-কোন প্রতিদ্বন্দ্বী টীমে খেললে আজ খেলার ফলাফল অন্যরকম দাঁড়াত।

. মহমেডান দল আজ লীগ-বিজয়ী হতে চলেছে তার প্রধান

সত্যিকার রত্ন হল রহিম ও রসিদ। এ দুই উন্নত খেলোয়াড়ের জুড়ী কোন টীমেই নেই। ধরতে গেলে রহিম ও রসিদই মহমেডান দলে বেশী গোল দিয়েছে। লীগের দ্বিতীয় স্থানে ব্ল্যাকওয়াচ এবং তৃতীয় স্থানে ক্যালকাটা ও মোহনবাগান।

আর, ক্যালকাটা, ডালহাউসি, এরিয়ান্স, কালিঘাট প্রভৃতি টীমকে ব্ল্যাকওয়াচ হারিয়েছে ; কিন্তু বিশিষ্ট ভারতীয় টীমদের কাছে ব্ল্যাকওয়াচ নিজেদের দুর্ব্বলতা ধরা দিয়েছে। মোহন বাগানের সঙ্গে ড্র, ইষ্টবেঙ্গলের কাছে দু গোল এবং সকলের শেষে মহমেডান দলের কাছে কম করে ৭ গোল—ব্ল্যাকওয়াচের এই কৃতিত্ব বিশেষ সম্মানসূচক নয়! ব্ল্যাকওয়াচ বনাম মহমেডান দলের খেলায় দর্শকের খুব ভীড় হয়েছিল। নিয়ে মোহনবাগান আর সেই অপূর্ব্ব গৌরব রাখতে পারবে না। একদিন বিজয় ও শিব ভাদুড়ী, অভিলাষ, রাজেন সেন, কানু এবং পরবর্ত্তীযুগে কুমার, পাল, রবি গাঙ্গুলি, মনা দত্ত, এস বসু প্রভৃতির চমৎকার খেলা বাংলা এবং বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের সুনাম সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তাদের স্থানে, এ, দেব, এস, চাট্যার্জ্জি, এস বসু, প্রেমলাল, এস চৌধুরী, এন মুখার্জ্জি, প্রভৃতির

ব্ল্যাকওয়াচ বনাম কালীঘাট খেলায় এস্‌ ব্যানার্জ্জি একটি গোল বাঁচাচ্ছে

মহমেডান দল ৮.৯ টী সুযোগ পেয়েও ৭টী গোল দেয় কিন্তু ব্ল্যাকওয়াচ শুধু খেলার দোষে কম করে পাঁচ ছয়টী গোল দিবার সুযোগ নষ্ট করে। আশা করা যায়, ভিজে মাঠে ব্ল্যাকওয়াচ তার প্রতিশোধ নিতে ভুলবে না। এবারও মোহনবাগান ও এরিয়ান্স শুধু স্থানীয় খেলোয়াড় নিয়ে খেলছে। নিকৃষ্ট খেলা দেখলে শুধু লজ্জা নয় একটা গভীর দুঃখ ও বেদনায় সারা অন্তর ভরে ওঠে। সত্যি বলতে গেলে মোহন বাগান টীমকে আবার পূর্ব্বগৌরব ও ক্রীড়ানৈপুণ্য ফিরিয়ে আনতে হলে অন্ততঃ ৭/৮ জন নিকৃষ্ট খেলোয়াড়দের টীম থেকে বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। গোল-কিপার কে, দত্ত

মেডান দলের বিরুদ্ধে অনিবার্য্য গোলগুলি বাঁচিয়ে কে, দত্তের উৎকৃষ্ট খেলা দেখিয়েছে। এবার সে ইণ্টারন্যাসনাল ম্যাচএ খুব সম্ভব খেলবে; তবে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আছে কালিঘাটের এস, ব্যানার্জ্জি এবং ইষ্টবেঙ্গলের পি, ব্যানার্জ্জি। ব্যাকে সন্মথ দত্ত একাই একশ'। লীগে এত সুন্দর ব্যাক কোন টীমে নেই বল্লেই হয়। হামিদকে হারিয়ে পরিশ্রম করে খেলে কিন্তু খেলার মাধুর্য্য নেই। তারপর বেণী প্রসাদ আউটের খেলোয়াড়। এস, চৌধুরীর সেই সুন্দর খেলা আর নেই। এই দুর্ব্বল টীম নিয়ে এখনও পর্য্যন্ত লীগের তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। মোহন বাগানের কৃতিত্ব প্রশংসার যোগ্য! দ্বিতীয় হাফে ভাল করে খেললে রানারস্ পেতে কতক্ষণ?

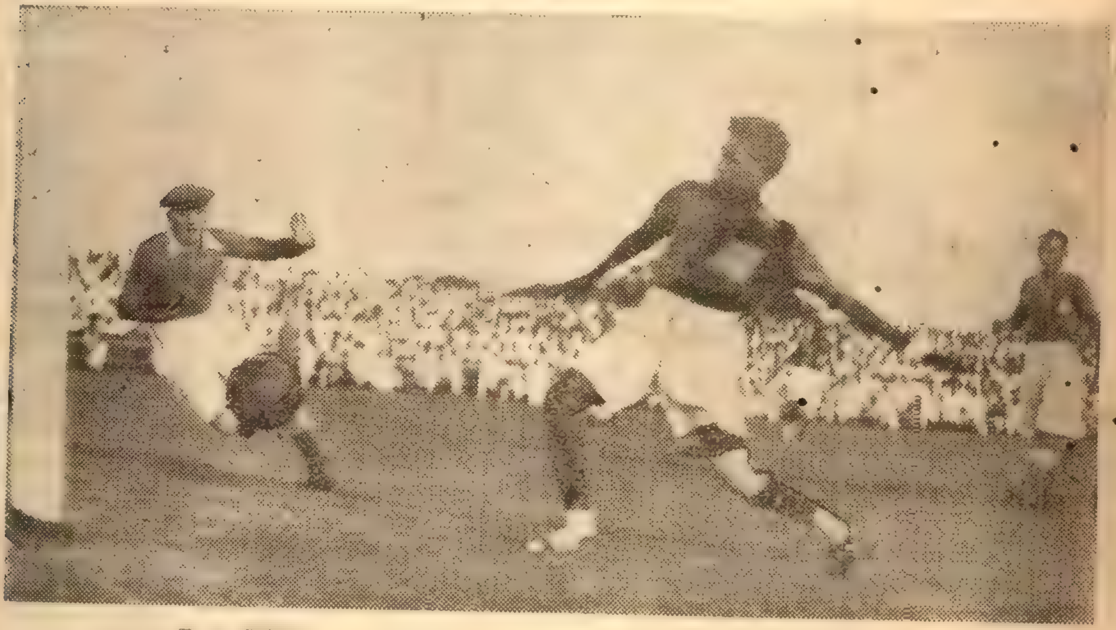

ব্ল্যাকওয়াচ বনাম ইষ্ট বেঙ্গল খেলায় লক্ষীনারায়ণ গোল দিচ্ছে

মোহনবাগানের হাফ-ব্যাক লাইন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়েছে! লাই চাটার্জ্জির পর একমাত্র হামিদ ছাড়া মোহনবাগান এখনও পর্য্যন্ত একটী নামজাদা সেণ্টার-হাফ খুঁজে পেল না। ...চ টীমের জয় ও পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে সেণ্টার-হাফের উপর। প্রেমলাল কোন মতে পিভটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিমলের উচ্চাঙ্গের খেলা বিশেষ উপভোগ্য। ...মের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুর্ব্বল হল মোহনবাগানের ফরওয়ার্ড লাইন! মাঝে মাঝে নন্দ চৌধুরী দু-একটী সুন্দর গোল দিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেয় কিন্তু সেই অনুসারে অতি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করে সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করে দেয় বেশী।

গতবারের চেয়ে ক্যালকাটা দল পুষ্ট ও সবল সন্দেহ নাই। নামজাদা টিমদের হারিয়ে ক্যালকাটা লীগের এত উচ্চ স্থানে পৌছুবে কেউ কল্পনা করেনি। তারপর এখনও "মনসুন" বাকি। সুতরাং ক্যালকাটা টিমকে হারাতে লীগের অতি অল্প টীমই সাহস রাখে। আজকাল ই, বি, আর টীম বলতে শুধু সামাদকে বুঝায় না। মনা দত্ত, কার্ভে ব্রাদার্স, স্পিক, এস বানার্জ্জি প্রভৃতির খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহমেডান দলকে ড্র করতে কাষ্টমস ছাড়া একমাত্র ই, বি, আর সক্ষম হয়েছে। খেলা শেষ হতে মাত্র মিনিট দুই বাকি:

হয়ে দেখল বলটী পোষ্টের বাইরে চলে গেছে! খালি পোষ্টে াহুকর সামাদ গোল দিতে অসমর্থ হয় চোখে না দেখলে

কালীঘাট টীম

সেদিন কেউ বিশ্বাস করত কিনা সন্দেহ! অপরাজেয় মমেডান দলকে হারাবার অপূর্ব্ব সুযোগ সেদিন সামাদই নষ্ট করে। লীগের প্রথম হাফে ই, বি, আর-এর স্থান মন্দ ছিল না কিন্তু পর পর কালিঘাট ও ব্যাকওয়াচের কাছে হেরে ই, বি, আর একটু দমে গেছে! সুন্দর মাঠ ও সকলে প্রাণপণ খেললে লীগের যে-কোন নামজাদা টীমকে একমাত্র ই, বি,

ব্ল্যাকওয়াচ টীম

:ই হারাতে পারবে। এরিয়ান আগেকার মত তেমন াতে পারছে না। লীগের বিশিষ্ট টীমদের হারাতে এক- র এরিয়ান্সকে পূর্ব্বে দেখা যেত। গতবছর মহমেডান দলকে য়ান্স অতি সহজেই হারিয়ে সুনাম অর্জ্জন করে। এবার ফল অন্যরকম দাঁড়িয়েছে। প্রথম ম্যাচে ৪ গোলে ও ীয় ম্যাচে ভিজে মাঠে ৪-১ গোলে জয়ী হয়ে মহমেডান দল

ব্ল্যাকওয়াচ বনাম কালীঘাট। খেলার ফলাফল ড্র

নিয়েছে। মুগ্ধকর খেলা খেলে ছোনে মজুমদার টীম- প্রায় বাঁচিয়ে রেখেছে! মিত্র দিন দিন ভাল খেলছে! াষ, এস, রায় ও সার্পের খেলা বেশ চিত্তাকর্ষক। এরাই দলকে বেশীর ভাগ গোল দিয়েছে! পুরোন রহমনের ত বিদায় নেওয়া উচিত! মহমেডান দলের বিরুদ্ধে আউট তরুন এস রায়ের (জুনিয়ার) উৎকৃষ্ট খেলা বেশ গ্য হয়েছিল। ডালহাউসির বরাত মন্দ। লীগে ত সুবিধাজনক নয়। পুরোন খেলোয়াড় নিয়ে কোন- কে থাকবার সাহস রাখে। গোলে ডেভিস, হাফব্যাকে ও গ্রিনহন, আগেকার ডালহাউসির কিছু সম্মান

রাখতে পেরেছে। এই দুর্ব্বল টীম নিয়েও ডালহাউসি প্রতি- দ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল, কাষ্টমস্ ও কালিঘাটের উপর লীগের স্থান রাখতে সক্ষম হয়েছে। টীম হিসেবে ইষ্টবেঙ্গল বরাবর উৎকৃষ্ট কিন্তু দুঃখের বিষয় লীগের স্থান যেমন হওয়া উচিত ছিল তার পাশে ইষ্টবেঙ্গল একেবারেই পৌছুতে পারেনি। নিজেদের খেলার দোষে জেতা গেমগুলি হার স্বীকার করে ইষ্টবেঙ্গল মাঠে এক রেকর্ড করে চলেছে! দুটী গেম অতি সুন্দর খেলে খেলার বেশীক্ষণ মহমেডান দলকে চেপে রেখে শেষমুহূর্ত্তে ইষ্টবেঙ্গল পরাজয় বরণ করে তাঁবুতে ফিরল। দুর্ব্বল মোহন- বাগানকে ৪ গোলে জয়লাভে যে আনন্দ ও উদ্দীপনা সারা মাঠে ভরে গিয়েছিল তারপর বাজে টীমের কাছে হার স্বীকার করায় ইষ্টবেঙ্গল লীগে অতি নিম্নস্থানে এসে পৌছেছে! লক্ষীনারায়ন ও মূরগেস্ বড় শ্লো। দুলালের সেণ্টার আগেকার মত তত উচ্চাঙ্গের হয় না! তরুণপ্রসাদ প্রতিদিন বেশ সুন্দর খেলছে! ডিফেন্সে কাইসার মহিউদ্দিন ও কে, গাঙ্গুলী উৎকৃষ্ট বল্লেই চলে। পি মজুমদার ও পি, দাসের

মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল এতদিন পর দুইটী রত্ন খুঁজে পেয়েছে! তালুকদারের যোগ্য স্থানে পি, বানার্জ্জির খেলা প্রতিদিন দর্শকদের আনন্দ দিচ্ছে! পরাজয়ের হাত হতে মুগ্ধকর খেলা দেখিয়ে পি, বানার্জ্জি টীমকে রক্ষা করে চলেছে! কাষ্টমস সুদক্ষ করুণা ভট্টাচার্য্যকে পেয়ে সবল হয়েছে! লীগে দু একটা আপসেট ওরাই করেছে! করুণার ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলেই মুগ্ধ! এবার ইন্টার-ন্যাসনাল ম্যাচ খেলবে নিঃসন্দেহ। ডেভিস, সিম্যান গোল-কিপার জার্ডিন-এর খেলা বেশ সন্তোষজনক! রেঙ্গুন, জয়পুর, বাঙ্গালোর, পাটনা, ভারতের নানা প্রদেশের বহু খেলোয়াড় জড় হয়েছে সব কালিঘাট টীমে। টীম হিসেবে কালিঘাট সবচেয়ে সবল, কিন্তু খেলার মাঠে সুন্দর খেলা স্বত্বেও বাজে টীমের কাছে পরপর পরাজয় স্বীকার করে চলেছে! সেদিন মাত্র ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে দুর্দ্দান্ত মহমেডান দলের বিরুদ্ধে যে আশ্চর্য্যকর খেলার পরিচয় দিয়েছে তাতে মনে হয় নিতান্ত দুর্ভাগ্য কালিঘাট আজ লীগের উচ্চ স্থানে পৌছুতে পারেনি বছর কালিঘাট সকলকে অবাক করে লীগের ১ম স্থান অধিকার করেছিল। আজ পুলিসের সঙ্গে ৪ পয়েন্টের তফাৎ। পুলিসের অবস্থা একটু সঙ্গীন। তারা লীগে দু একটী আপসেট করেছে কিন্তু দ্বিতীয় ডি এবারও নামলে কেউ আশ্চর্য্য হবে না। লীগে শেষ স্থান এট্যাচড্ সেক্সনের! তেরটী গেম খেলে করেছে মাত্র চার। তবে আই, এফ, এ রুল পুলিসই নাববে।

ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশীপে বিজেতা জি, ভন, ক্র্যাম (জার্ম্মানী) ও বিজিত এফ, জি, পেরী (গ্রেট ব্রিটেন)

মিস্ সিনোরিটা লিজানা

	খেঃ	জয়	ড্র	পরা	গোল স্বঃ	গোল ।
মহমেডান স্পোর্টিং	১৩	১১	২	০	৩২	৪
ব্ল্যাকওয়াচ	১৪	১০	২	২	৩৩	১৭
ক্যালকাটা	১৩	৬	৩	৪	২৩	১৩
মোহন বাগান	১৩	৬	৩	৪	১০	১০
ই, বি, আর	১৩	৫	৩	৫	১৫	১১
এরিয়ান্স	১৩	৫	৩	৫	৯	১৮
ডালহৌসি	১২	৫	২	৪	৭	১২
ইষ্টবেঙ্গল	১২	৪	৩	৫	১৬	১২

					গোল		
	খেঃ	জয়	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
	১২	৩	৫	৪	১৪	১৬	১১
	১৩	৩	৪	৬	১২	২৩	১০
	১৪	২	২	১০	১০	২৫	৬
শন্মন	১৩	২	০	১১	১০	২৯	৪

নিস

লিংহাম টুর্ণামেণ্ট

বছরের চ্যাম্পিয়ান মিস সিনোরিটা লিজানাকে করেছিল এবার ফাইনাল গেমে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় উইক। বিপুল দর্শকের উৎসাহ নিয়ে খেলা আরম্ভ প্রথম সেটটী খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। মিস শুধু চাতুর্য্য ও দক্ষতার বলে প্রথম সেটটি নেন। সেটে মিস হার্ডউইকের খেলা তত আশাপ্রদ হয়নি। া লিজানা ১০-৮, ৬-২ গেমে মিস হার্ডউইককে করেন। পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনালে প্রবীন জে, ত সহজেই এল, সফিকে ৬-১, ৬-৩ গেমে হারান। বলস্ ফাইনালে মিস হার্ডউইক ও মিস হার্ভে ৬-০, মে অতি সহজেই মিস লিজান ও মিস নোয়েলকে কলকেই বিস্মিত করে দেন।

ফ্রেন্স চ্যাম্পিয়ানসিপ

ডেভিস কাপ টুর্ণামেণ্টের আগে প্রতিবছর ইউরোপের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের ফ্রেন্স চ্যাম্পিয়ানসিপ টুর্ণামেণ্টে দেখা যায়। এবার ফাইনালে সাক্ষাৎ করেছিল টেনিস জগতের দুই বিখ্যাত বীর পেরী [গ্রেট ব্রিটেন] ও ভন্ ক্রেম (জার্ম্মেনী)। গত কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সের তরুণ খেলোয়াড়দের সুন্দর খেলা সত্ত্বেও ফাইনালে উক্ত দলের কোন নামজাদা খেলোয়াড় পৌছিতে পারেনি। খেলার প্রথম হতে ভন ক্রামের মুগ্ধকর খেলাই প্রমান করেছিল যে এবার পেরী সর্ব্বপ্রথম প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে। খেলায় পেরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেটটি নেয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভন ক্রামের কাছে আর দাঁড়াতে পারলে না। ভন ক্রাম ৬-০, ২-৬, ২-৬, ৬-০ গেমে পেরীকে পরাজিত করেন। ভন ক্রামের হাতে দু দুটি লাভ সেট খেয়ে পেরী ডেভিস কাপে এতবড় পরাজয়ের শোধ নিতে সক্ষম হবে কিনা সকলেই উৎসুক হয়ে আছে। গত বছর পেরী ডেভিস কাপ ও ফ্রেন্স চ্যাম্পিয়ানসিপ জয়লাভ করে এক রেকর্ড করেছিলেন। ভন ক্রাম পেরীর কৃতিত্বকে ম্লান করতে চেষ্টা করবে সন্দেহ নেই। লেডিস সিঙ্গলস ম্যাচে মিসেস স্পারলিং (ডেনমার্ক) ৬-৩, ৬-৪ গেমে ম্যাদাম ম্যাথিউ ফ্রান্সকে হারিয়ে আগের চ্যাম্পিয়ান হলেন।

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

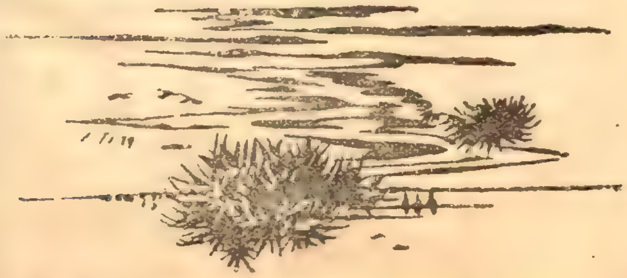

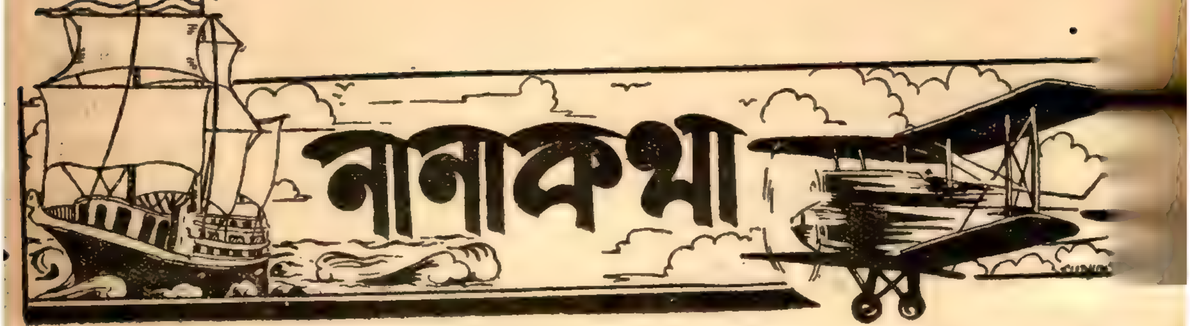

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ১৫ই মে ১৯৩৬ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮২ বৎসর হয়েছিল। অর্থ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, পারিবারিক

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আনন্দের মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘ জীবন তাঁর শেষ হ'ল তাকে নিঃসংশয়ে সফলতার জীবন বলা যায়। কিন্তু এই সফলতা তিনি অর্জ্জন করেছিলেন শুধু নিজের শক্তি এবং দ্বারা, পারিবারিক সাহায্য বিশেষ কিছুই পান'নি। মা বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বসিরহাট চব্বিশ প অন্তর্গত ভাবলা গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের অর্থ সাহায্যে ইনি করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি গভর্ণমেণ্ট এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভ করেন পরীক্ষা দিতে না পারায় কোনো প্রকার এঞ্জিনীয়ারিং লাভে সক্ষম হননি। কিন্তু আসল ব্যাপারে তাতে মাত্র ক্ষতি হয়নি। ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে করতে করতে বুদ্ধি, বিবেচনা, পরিশ্রম, সততা, অ প্রভৃতি গুণে ইনি ক্রমশঃ একজন বিচক্ষণ পাকা এ হয়ে ওঠেন এবং কলিকাতা সহরের জলের কলে বড় ঠিকাদারীর কাজ করতে করতে মার্টিন কোম্পানীতে যো এবং কালক্রমে ভারতবর্ষের কয়েকটী বৃহত্তম এঞ্জি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সেই মার্টিন কোম্পানীর প্রধান অ এবং পরিচালকের গৌরবজনক পদ অধিকার করেন। কোম্পানী স্যার রাজেন্দ্রকে বড় করে এ কথা যেমন স্যার রাজেন্দ্রও মার্টিন কোম্পানীকে বড় করেন এ তেমনি সত্য। সেই জন্য ইউরোপীয় বণিক সমাজে স্যা রাজেন্দ্রের অতিশয় সম্মান এবং প্রতিপত্তি ছিল। ১৯ সালে যখন তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গমন করেন ত সেখানকার বণিক সম্প্রদায় তাঁকে বিশেষভাবে স করেন।

১১ খৃষ্টাব্দে স্যার রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা নগরের পদ লাভ করেন এবং ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে ারে ব্যবসাক্ষেত্রে অসাধারণ সফলতা এবং অন্যান্য গুণের জন্য K. C. I. E. উপাধির দ্বারা ভূষিত

ীতি ক্ষেত্রের একজন প্রত্যক্ষ কর্ম্মী না হলেও, তাঁর দেশের হিতসাধনের সঙ্গে যোগ ছিল। শুধু ্রুলায় বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতির সুব্যবস্থা নিরস্ত ছিলেননা। বাঙলা দেশের জনহিতকর ন খুব অল্পই ছিল যাতে স্যার রাজেন্দ্রনাথের এবং অর্থ সাহায্য ছিলনা। স্যার রাজেন্দ্রনাথের বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি বিশেষ আস্থা ছিল ব'লে মেণ্ট রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সের অন্যতম সদস্য স্বীকৃত আছেন কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ্ন স্যার রাজেন্দ্রনাথ অবশ্য সে পদ গ্রহণ করতে নি।

উচ্চতম স্যার জীবন-যাপন করলেও রাজেন্দ্র- ্র অনুরাগী ছিলেন এবং স্বগৃহে দেবীমূর্ত্তির দির ব্যবস্থা ছিল। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ধর্ম্মান্তর কোনো দিনই তাঁর মনে উদিত হয়নি।

র্জনের যে ক্ষেত্রে বাঙালী প্রতিযোগিতায় অপর য়ের নিকট পরাজিত, সেই ব্যবসা ক্ষেত্রেই স্যার রাজেন্দ্রের মতই গৌরবের উচ্চ সিংহাসন ক'রেছিলেন। সুতরাং পরিণত বয়সে হ'লেও বাঙালী জাতির পক্ষে বিশেষভাবে শোচনীয় নেই। তাঁর উচ্চ দৃষ্টান্ত এবং আদর্শ বাঙালী অনুপ্রাণিত করবে এবং তাঁর কীর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান ম্পানী বহু বিচক্ষণ এবং কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গঠিত ্র দারুণ অর্থ সঙ্কটের দিনে এই আমরা একান্ত া করি।

ক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য রেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৬ বৎসর হয়েছিল। কিছুদিন থেকে তিনি রক্তচাপ রোগে পীড়িত ছিলেন, অবশেষে ঐ রোগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পাবনা জেলার একটী দরিদ্র পরিবারে প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের জন্ম হয়। অতি কষ্টে স্বীয় চেষ্টায় তিনি এম-এ ও এম-বি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় চিকিৎসকের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ঐ ব্যবসায়ে যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করেন।

যৌবন কালেই প্রাণকৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এবং জীবনের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। এক সময়ে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি হয়েছিলেন এবং উক্ত সমাজের অন্যতম আচার্য্য ছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আচার্য্য মহাশয় একজন অনুরাগী কর্ম্মী ছিলেন। বঙ্গবিচ্ছেদের সময়ে দেশে যখন প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন তিনি তাতে যোগদান ক'রে বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশিকতার সপক্ষে অনেক কার্য্য করেছিলেন। বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন।

নিজে দরিদ্র অবস্থায় অতি কষ্টে বিদ্যার্জ্জন করেছিলেন ব'লে দরিদ্র ছাত্রদের দুঃখ তিনি উপলব্ধি করতেন এবং সে বিষয়ে অকাতরে তাদের সাহায্য করতেন। এমন কি তাঁর মৃত্যুর পরও ১৬টি দরিদ্র ছাত্র যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে এজন্য তদনুরূপ অর্থ সিটী-কলেজে দান করবার ব্যবস্থা করে গেছেন।

নানা দিক দিয়ে প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় বাঙলা দেশের একজন সুসন্তান ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুতে দেশ যে বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুনর্নির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনর্ব্বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এই পদের পক্ষে তিনি তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা সপ্রমাণ করেছেন ব'লেই শুধু নয়, তাঁর আরব্ধ কয়েকটী হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন বলে এ নির্ব্বাচন বিশেষ

ভাবে সন্তোষজনক হয়েছে। আমরা আশা করি তাঁর নেতৃত্বে বাঙলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা, বাঙলা বানানের নিয়ম নির্দ্ধারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে। বাঙলা বানানের যে নিয়মগুলি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি নির্দ্ধারিত করেছেন সেগুলি একেবারে সম্পূর্ণ নয়—এবং সেগুলির মধ্যেও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন থাকতে পারে ব'লে আমরা মনে করি।

বাঙলার ব্রতচারী সমিতি

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের নিরবসর উদ্যম এবং পরিশ্রমের ফলে বাঙলার ব্রতচারী সমিতি দ্রুত-বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। বাঙলার হীনস্বাস্থ্য দুর্ব্বল যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাস্থ্য, সাহসিকতা এবং শক্তি সঞ্চারিত করতে এই সমিতি যে অচিরকা[illegible] বিশেষভাবে সমর্থ হয়ে উঠবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ [illegible] অপরিণত কিশোর এবং যুবকদিগকে পরিপূর্ণ মানবতায় গঠি[illegible] ক'রে তোলা এই সমিতির উদ্দেশ্য। বাঙ[illegible] গভর্ণর মহামান্য স্যার জন্ এণ্ডারসন্ পি-সি, জি-সি-বি, [illegible] মহোদয় এই সমিতির মহাপালক এবং শ্রীযুক্ত [illegible] আই-সি-এস মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাপতি ([illegible] President)।

সম্প্রতি ইংলণ্ড হ'তে প্রত্যাবর্ত্তনের পর [illegible] আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ এবং ব্রতচারী ছা[illegible] মহাশয়কে অভিনন্দিত করেন। সেই দিন [illegible] কলেজের ব্রতচারী ছাত্রদের ব্যায়ামাদি পরিদ[illegible]

আশুতোষ কলেজের ব্রতচারী ছাত্রের দল

[মধ্যস্থলে উপবিষ্ট বামদিক হইতে—১। বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি এস্ বাঙলার ব্রতচারী সমিতির প্রতিষ্ঠাপতি ৩। আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়। ৪। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র এম-এ]

...দের যে ধারণা হয়েছে তারই উপর নির্ভর ক'রে সমিতির ...কারিতার বিষয়ে উপরে আমরা ঐ প্রকার মন্তব্য ...প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি।

শীঘ্রই আমরা বিচিত্রার পাঠকগণকে বাঙলার ব্রতচারী ...সমিতির একটি বিস্তৃত বিবরণী উপহার দেবো। শ্রীযুক্ত ...রাজেন্দ্রচন্দ্র মহাশয়কে তাঁর এই মহৎ কর্ম্ম প্রচেষ্টার জন্য ...তাঁকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ...করছি।

ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি

...জেলার বর্দ্ধমান জেলার কৈয়র পোষ্টাফিসের অন্তর্গত একটি ...গ্রামটি ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম ...ম্যালেরিয়া নিবারণের উদ্দেশ্যে গ্রামবাসিগণ একটি ...সমিতি গঠিত ক'রে কার্য্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। গ্রামবাসি-...গণের এই উদ্দেশ্য যে কত মহৎ এবং তাঁদের উদ্যম যে কত ...প্রশংসনীয় তা বলা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। ম্যালেরিয়ায় ...আমাদের সোনার বাঙলা কঙ্কালসার হয়েছে, এই পাপকে ...নানা প্রকারে বিতাড়িত করতে পারলে ব্যাধিজীর্ণ বাঙ্গলা ...পুনরায় সোনার বাঙলায় পরিণত হ'তে পারে। গুইর ...ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি ম্যালেরিয়া নাশের সদৃষ্টান্ত ...স্থাপিত ক'রে বাঙলার সমস্ত ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত অঞ্চলের ...ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় আগত প্রায়। ম্যালে-...রিয়া হ'তে অব্যাহতি পাবার উপযোগী কতিপয় নিয়ম ...সম্বলিত যে ম্যালেরিয়া-পুস্তিকা মুদ্রিত ক'রে গুইর সমিতি ...প্রকাশিত করেছেন, সেই নিয়মাবলী পালন ক'রে অপর ...পল্লীবাসিগণ উপকৃত হ'তে পারেন, তদুদ্দেশ্যে আমরা ...উক্ত পুস্তিকা হ'তে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলাম।

"মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইয়া অন্য যাহাকে ...কামড়াইবে তাহারই ম্যালেরিয়া হইবে। চিকিৎসার দ্বারা ...ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে মুক্ত হইয়া লোকে যে পুনঃ পুনঃ ...আক্রান্ত হয় এবং এইভাবে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, তাহার কারণ ...মশা অন্য রোগীর নিকট হইতে পুনরায় বিষ আনিয়া দেয়। ...গরীব দুঃখী অর্থাভাবে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করাইতে পারে না, তাহারাই হয় ম্যালেরিয়া ডিপো। এই ডিপো-গুলির প্রতিবিধান না করিলে গ্রামের কোন লোকই ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা করিতে পারেন না। অতএব এক সঙ্গে গ্রামের সমস্ত রোগীকে চিকিৎ-সার দ্বারা রোগ মুক্ত করিতে হইবে এবং সমিতি এই গুরু কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে। ইহার জন্য বহু অর্থ প্রয়োজন। গ্রামের লোক নিজ নিজ পরিবারে ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য বৎসরে যে অর্থ ব্যয় করেন তাহা যদি সমিতির হস্তে অর্পণ করেন, তাহা হইলে সমিতির দ্বারা সকলেরই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে।

গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে গ্রামবাসীকে নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যগুলি ধর্ম্মভাবে পালন করিতে হইবে :—

১। (ক) সমিতিকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।

(খ) গ্রামে কাহারও ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে তৎক্ষণাৎ সমিতিকে সংবাদ দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) ম্যালেরিয়া রোগীকে সন্ধ্যা হইতেই মশারীর মধ্যে রাখিতে হইবে, এবং দিবসেও যতক্ষণ সম্ভব মশারীর মধ্যে রাখিতে হইবে।

(ঘ) গ্রামের সকল লোককেই মশারী খাটাইয়া শয়ন করিতে হইবে। সমিতি হইতে সকলকেই স্বল্প মূল্যে ফরমাস্ মত মশারী সরবরাহ করিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে।

২। শরৎকালের হিম অতিশয় অনিষ্টকর। অতএব এই ঋতুতে কেহ ঠাণ্ডা লাগাইবেন না, রাত্রি জাগরণ করিবেন না, ঘরের বাহিরে নিদ্রা যাইবেন না। সকলে সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচারী হইবেন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল যথাযথ পালন করিবেন। রাত্রিকালে ভাতের পরিবর্ত্তে আটার রুটি খাওয়া বিশেষ উপকারী।

৩। গ্রামে মশার উপদ্রবে মানুষ ও গরুর যে কষ্ট হয় তাহা বর্ণণাতীত। এবং মশাই ম্যালেরিয়া রোগের বিষ ছড়াইয়া দেয়। মশককুলকে ধ্বংস করিবার সকল রকম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যথা—

(ক) মশা জলের মধ্যে ডিম পাড়ে। অতএব

গ্রামের সমস্ত জলাশয়ে সপ্তাহে একবার কেরোসিন বা প্যারিস গ্রীন (Paris green) দিয়া মশার ডিম ধ্বংস করিতে হইবে।

(খ) হাঁসে মশার ডিম খাইয়া ফেলে, অতএব গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে কিছু হাঁস পালন করিতে হইবে।

(গ) মাছে মশার ডিম খাইয়া ফেলে, অতএব সকল পুকুর ও ডোবায় প্রচুর পরিমাণে মাছের আবাদ করিতে হইবে।

(ঘ) গ্রামের অনাবশ্যক ডোবাডুবি সব বুজাইয়া ফেলিতে হইবে।

(ঙ) গোখোপরের মধ্যে একটু জল পাইলেও মশা তাহারই মধ্যে ডিম পাড়িয়া বংশ বৃদ্ধি করে। অতএব গ্রামের কোথাও যাহাতে জল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পায়, তদুপযোগী জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) বাদুড় মশার পরম শত্রু। আমেরিকায় পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, একটা বাদুড় এক রাত্রির মধ্যে এক হাজার মশা খাইয়া ফেলে। অতএব গ্রামে যাহাতে বাদুড় বংশ বৃদ্ধি পায় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

৪। গ্রামের জল বায়ু যাহাতে দূষিত না হয় সেজন্য রাস্তা, ঘাট, ভাগাড়, পুকুর সমস্ত সংস্কার করিতে হইবে এবং সমগ্র গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

৫। গুইরের যে সকল অধিবাসী কার্য্যোপলক্ষ্যে বিদেশে রহিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন কর্ম্মস্থলে সহৃদয় ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে সমিতির কার্য্যের জন্য অর্থ, ঔষধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—আগ্রা শাখা

গত ২৪ শে মে ১৯৩৬ আগ্রায় শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাস ভবনে উক্ত পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অধিবেশনের পূর্ব্বদিনে এবং পরদিনে অভিনয় এবং চলচিত্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল।

বাঙ্গলার বাহিরে বড় বড় নগরে এইরূপ সাহিত্য সমিতি যত স্থাপিত হয় ততই মঙ্গল। আমরা আশা করি স্থানীয় বাঙালী সমাজের সহানুভূতি এবং আনুকূল্যে এই পরিষৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

বাংলা বানানের নিয়ম

বহুল প্রচার এবং অবগতির জন্য এবং এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়ে যাতে অনায়াসে আলোচনাদি হ'তে পা... তদুদ্দেশ্যে আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রকাশিত করলাম। ... করি এতদ্দ্বারা অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সফল হবে।

বর্ত্তমান সংখ্যায় এই বিষয়ে একটি আলোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল, এবং ভবিষ্যতেও উপযুক্ত আলোচনাদি হস্তগত হ'লে প্রকাশিত হবে। আমরা আশা করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান-সংস্কার সমিতি বিচিত্রায় এবং অপরাপর পত্রাদিতে প্রকাশিত এই সকল আলোচনা প্রবন্ধগুলি বিচার করে দেখবেন এবং প্রয়োজন বোধ করলে বাংলা বানানের নিয়ম পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত ক'রবেন।

আমরা বাংলা ভাষার সমস্ত লেখকদিগকেও (ব্যাপক অর্থে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত বানান অনুসরণ করতে অনুরোধ করি। ব্যাপারটি ক্রমশঃ যেরূপ জটিল হ'য়ে উঠেছিল তা'তে বানান নির্দ্ধারণের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল, এবং এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে কারও সঙ্কুচিত হবার কারণ নেই।

পূরণ চাঁদ নাহার

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং ভারতীয় চিত্র মূর্ত্তি ও মুদ্রা সংগ্রহীতা পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যানুরাগের জন্য নাহার মহাশয় ভারতের সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করেছিলেন। তিনি এম-এ এবং বি-এল্ পাশ ক'রে অ্যাটর্ণি কার্য্যে প্রবৃত্ত করবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা ঘ'টে উঠলনা; তাঁর প্রবল জ্ঞানস্পৃহা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলনের আকর্ষণ তাঁকে ব্যবহারজীবীর পথ থেকে দূরে টেনে গেল। ফলে জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করলেন। নানা প্রকার মূল্যবান শিল্প দ্রব্য...

নাহার মহাশয় তাঁর গৃহটিকে একটি মিউজিয়মে পরিণত করেছিলেন এবং সেই বিপুল সংগ্রহের সুবিধা যে কোনো লোক ইচ্ছা মাত্রেই লাভ করত। নাহার মহাশয়ের রচিত "জৈন অনুশাসন লিপি" ঐতিহাসিক সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

পূরণ চাঁদ নাহার মহাশয়ের মৃত্যুতে জৈন সম্প্রদায় এবং দেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

"মোহাম্মদী"র ইউনিভারসিটি সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ মাসের "মোহাম্মদী" পত্রিকাটি "ইউনিভারসিটি সংখ্যা" নামাঙ্কিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐ সংখ্যার প্রবন্ধে প্রধানতঃ এই কথাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যেগুলির প্রবন্ধাদিতে হিন্দু ধর্ম্ম এবং দেব দেবীর উল্লেখ আছে অথবা হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে যেগুলি লিখিত হয়েছে সেগুলি পৌত্তলিকতা দোষে দুষ্ট, অতএব মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে অপাঠ্য। "মোহাম্মদী"র ইউনিভার্সিটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে এ বিষয়ে প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং বিস্তারিত আলোচনার আর বেশী প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু একটি বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদী সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই।

শিক্ষার বৃদ্ধি ও বিস্তারের সহিত জাতীয় মনে সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস হয় এবং অপরের ধর্ম্মাদি বিষয়ে সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়, এতদিন এই কথাই আমরা জানতাম। কিন্তু এ স্থলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়িয়েছে একটু ভেবে দেখলে ক্ষতি নেই। ভারতের ষোড়শ শতাব্দীতে ঠিক এই বিষয়ে মুসলমানের মনোগতি কি প্রকার ছিল দেখুন। তানসেন ছিলেন মুসলমান; বাদশাহ আকবরের তিনি সভা-গায়ক এবং অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর এই শ্রেণীর বহু গানের মধ্যে একটি নমুনা শুনুন।

তুম হো গণপত দেব বুধদাতা
লীষ ধরে গজ শুণ্ড।
যোই যোই ধ্যাবত, সোই সোই ফল পাবত
গমন করত লেপ কিয়ে ভুজদণ্ড।
* *
তানসেন তুমকো নিত সুমরত সুর নর
মুনীগুণী গন্ধর্ব্ব শুণ্ড।

এটি ত রীতিমত দেব গণপতির স্তব।

যদি এই তর্কই তোলা যায় যে, তানসেন পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন সুতরাং মুসলমান হওয়ার পরও তাঁর মন হিন্দুকুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, তা হ'লে অন্য উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া যাক্ (যদিও সাধারণতঃ দেখা যায় যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর পরিত্যক্ত ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষটা একটু বেশি মাত্রাতেই প্রকট হয়ে ওঠে)।

শাহ আজম্ একজন উন্নতচেতা ফকীর ও গায়ক ছিলেন, তিনি ধ্রুপদ ও খ্যাল দুই বিষয়েই উত্তম রচয়িতা ছিলেন। তাঁর রচিত একটি গানের নমুনা দেখুন।

ভস্ম ভূষণ অঙ্গ চরচিত গঙ্গা শেখর বহুল রূপ
শিব যোগাড়ম্বরমে ডমরু বাজত ফুঁকত ফণেশ ভারী।
* * *
ধন ধন ধন মহাদেব সিদ্ধদেব দেবলপতি ঋদ্ধি সিদ্ধি দাতা
শাহন শা আজমকো হোয় সুখকারী।

এ গানটি মহাদেবকে অবলম্বন ক'রে রচিত।

এ দুটি গানই বিখ্যাত দুটি ধ্রুপদ, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গায়কের নিকট সুপরিচিত। বাহুল্যভয়ে দুটি গানের উল্লেখ করলাম, প্রয়োজন হ'লে এই শ্রেণীর বহু সংখ্যক গান দিতে পারি।

এবার বিংশ শতাব্দীর মনোভাবের নমুনা দেখুন। যে পত্রিকার লেখক, পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীভুক্ত, সেই মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় প্রথম প্রবন্ধের একটি উক্তি এইরূপ —"স্কুল ও কলেজ স্তরের বাঙলা পাঠ্যগুলির সন্ধান লইলে দেখা যাইবে যে, সেগুলির এক বিরাট অংশ পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে নবপূজার, জড়পূজার, প্রতীক ও প্রকৃতি পূজার কুশিক্ষায় এবং আদিম যুগের অসভ্য মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহিমা প্রচারে।"

অতঃপর মোহাম্মদীর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি আমাদের এই প্রশ্ন যে—শিক্ষার বিস্তার এবং বৃদ্ধির সহিত সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস পায় এবং সহনশীলতা বর্দ্ধিত হয়, এ কথা আর বলা চলে কি? হিন্দু জাতির ন্যায় একটা এত বৃহৎ

জাতির ধর্ম্মের প্রতি এরূপ অসংযত ভাষার প্রয়োগ তাঁর মতো প্রাচীন এবং পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে শোভন হয়েছে কি? তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি, সাংবাদিকতার কার্য্যে নূতন ব্রতী নন, তাঁর আন্দোলনের অপরাপর দিকে হয় ত' অনুযোগের যথার্থ কারণ থাকৃতে পারে, কিন্তু এ ভাবে কি ক'রে তিনি আন্দোলনটি আরম্ভ করলেন তা ভেবে আমরা বিস্মিত হয়েছি। মনে হয় অপরের দ্বারা উত্তেজিত হ'য়েই এরূপে সঙ্গতির সীমা অতিক্রম ক'রে থাকবেন।

সে যাই হোক, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ে সংস্কারবিমুক্ত ব্যক্তি যে বিরল নয় সে কথাও সত্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থিত কাজী নজরুল ইসলাম মহাশয়ের কথাই বলি। তাঁর রচনার মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ যথেষ্ট, অথচ মুসলমান ধর্ম্মের কথাও তথায় প্রচুর পরিমাণে হয়েছে।

সাহিত্য এতদিন নিরুপদ্রব ছিল, কিন্তু সেই মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে এরূপ সমারোহের সহিত করতে দেখে আমরা চিন্তিত হয়েছি। এই বিপদের সমাপ্তি' করবার জন্য আমরা হিন্দু ও মুসলমান উ দায়কে আহ্বান করছি। কোরাণ অথবা অপর মু পুস্তকের উল্লেখ থাকবার জন্যে যেদিন কোনো উ হিন্দু পাঠকের বা ছাত্রের পক্ষে পরিত্যাজ্য হবে নিশ্চয় দুর্দ্দিন বলব। আমাদের সত্যনারায়ণের (গত কথার মধ্যে সেই উদার ছত্রটি "বেদ আর কোরাণ দেখ এক" কোনোদিন যেন কাটা না যায় এই প্রার্থনা

নিবেদন

বর্ত্তমান সংখ্যায় বিচিত্রার নবম বর্ষ পূর্ণ হইল। আগামী শ্রাবণ মাস হইতে অধিকতর সৌষ্ঠবের সহিত বিচিত্রার দশম বর্ষ আরম্ভ হইবে।

বিচিত্রার বার্ষিক মূল্য মণিঅর্ডারে ৬৷৹ টাকা, ভি, পিতে ৬৷৵৹ এবং ষান্মাসিক মূল্য মণিঅর্ডারে ৩৷৹ ভি, পিতে ৩৷৵৹, সুতরাং খরচের দিক দিয়া মণি অর্ডারেই টাকা পাঠান সুবিধা। কিন্তু যে সকল গ্রাহক আষাঢ় মাসের মধ্যে মণি অর্ডারে টাকা না পাঠাইবেন তাঁহার ভি, পিতেই কাগজ লওয়া সুবিধাজনক ভাবেন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রাবণ মাসের বিচিত্রা ভি, পিতে পাঠানো হইবে। কোন কারণে কেহ যদি উপস্থিত গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকেন তাহা হইলে আষাঢ় মাসের কাগজ পাইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমাদিগকে সে কথা অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। অন্যথা ভি, পিতে কাগজ পাঠাইয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান গ্রাহকদিগকে আর পত্রাদি দেওয়া হইবেনা।

টাকা পাঠাইবার সময় পুরাতন গ্রাহকেরা পূর্ব্বক মণি অর্ডারের কুপনে গ্রাহক নম্বরটী (বি পুরাতন কথাটী) লিখিয়া দিবেন, এবং নূতন গ্রাহ অনুগ্রহ করিয়া 'নূতন' বলিয়া উল্লেখ করিবেন, টাকা জমা করিবার সময়ে গোলযোগ ঘটিবার থাকে।

সম্প্রতি তিন চার মাস বিচিত্রার নিয়মিত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এ কথা আমরা স্বীকার করি। অ যে ছাপাখানায় বিচিত্রা মুদ্রিত হয় সেই সাহিত্য ভব নামে বিচিত্রার না হইলেও কার্য্যতঃ বিচিত্রার ছা এতদিন প্রেসটী অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া মুদ্রণ কার্য্যে ঘটিত। আষাঢ় মাস হইতে প্রেসটি পূর্ণাঙ্গ হওয়ায় ভা বিচিত্রা যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমাদের ভরসা আছে।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Pres
21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Saratchandra Mukherjee from 27-1, Fariapooker St. Calcut